পাঠশালা

উচ্চশ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের সচিত্র মাসিক পত্র

চতুর্থ বর্ষ

[আশ্বিন ১৩৪৭—ভাদ্র ১৩৪৮]

সম্পাদক

নরেন্দ্র দেব

প্রকাশক—রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

পাঠশালা কার্যালয়

৩০, কর্নওআলিশ স্ট্রীট, কলিকাতা

নিয়মাবলী

"পাঠশালা" প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয়।

আশ্বিন মাস থেকে পাঠশালার বর্ষারম্ভ।

লেখা ও ছবি প্রতিমাসে অন্তত ৪০ পৃষ্ঠা থাকবে; আকার ডবল ক্রাউন ৮ পেজি। বার্ষিক মূল্য মণি অর্ডারে পাঠালে তিন টাকা। ষাণ্মাসিক দেড় টাকা। ভি পিতে বার্ষিক মূল্য ৩।০ তিন টাকা চার আনা। ষাণ্মাসিক ভি পি করা হবে না।

নগদ মূল্য প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা।

নমুনার জন্য পাঁচ আনার ডাকটিকিট পাঠাবেন।

মফঃস্বলের গ্রাহকগণ প্রকাশকের ঠিকানায় মনিঅর্ডারযোগে টাকা পাঠাবেন। শহরের গ্রাহকগণও ঐ ঠিকানায় টাকা জমা দিবেন।

মাসের প্রথম সপ্তাহে কাগজ না পেলে ডাকঘরের জবাব সহ ১৫ই তারিখের মধ্যে জানা'লে আর এক কপি দেওয়া হবে।

ডাকটিকিট দেওয়া থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠানো হবে। চিঠির উত্তর রিপ্লাইকার্ড পেলে দেওয়া হবে।

বিজ্ঞাপনের হার

কভারের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পৃষ্ঠা ..	২৫৲ টিঃ
ঐ চতুর্থ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন ..	৫০৲
বিজ্ঞাপনের প্রথম পৃষ্ঠা	২২৲
পুস্তকারম্ভের পূর্ব পৃষ্ঠা ..	২৫৲
সূচীর পার্শ্বে অর্ধ পৃষ্ঠা	১৫৲
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	২০৲
ঐ অর্ধ পৃষ্ঠা	১২৲
ঐ সিকি পৃষ্ঠা	৭৲

সিকি পৃষ্ঠার কম বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে না।

রচনার মধ্যে বিজ্ঞাপন	৫০

বিজ্ঞাপন পরিবর্তন ক'রতে হ'লে পূর্বমাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে পাঠা'তে হবে।

বিজ্ঞাপন বন্ধ ক'রতে হ'লে একমাস পূর্বে নোটিশ দেওয়া দরকার

নূতন বিজ্ঞাপন পূর্বমাসের ২০শে তারিখ পর্যন্ত নেওয়া হবে।

এক বৎসরের জন্য বিজ্ঞাপন দিতে চুক্তিবদ্ধ হ'লে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে।

প্রকাশক—রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

পাঠশালা কার্যালয়

৩০, কর্নওআলিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা PHONE—B. B 4099

পাঠশালা

বাৎসরিক সূচী

আশ্বিন ১৩৪৭—ভাদ্র ১৩৪৮

বিষয় — পৃষ্ঠা

কবিতা

গল্প

ভূ-পরিচয়

শিল্পকলা

উপন্যাস

সেকালের কথা

সাহিত্য

ভ্রমণ বৃত্তান্ত

ইতিহাস

পৌরাণিকী

হাস্যকৌতুক

শরীর বিজ্ঞান

চতুর্থ বর্ষ] আশ্বিন—১৩৪৭ [প্রথম সংখ্যা

মহাপূজা

অনিমা দেবী

আমি   স্বপনে দেখিনু পূরব গগনে
ঝলসিছে জ্যোতিলেখা,
নবীন রবির কিরণ ধারায
নিশার তমসা দ্রুত ভেসে যায
মার মন্দিরে চূড়ায চূড়ায
জ্বলিছে কিরণ রেখা ॥

জড় অচেতন নীরব ভুবনে
প্রাণ-কম্পন জাগে,
সরসী হৃদয়ে শারদ সরোজ
ফোটে রক্তিমরাগে।
আলোকের শিশু লতায় পাতায়
রামধনু রঙে নাচিয়া বেড়ায়,
কিশলয় কোলে কুসুম-কলিকা
আধো আধো যায দেখা,

আমি   স্বপনে দেখিনু পূরব গগনে
উদিত জ্যোতির লেখা ॥

প্রভাত রাগিনী বাজিছে মায়ের
সিংহদুয়ার 'পরে

চলে সারি সারি যত পুরনারী
পূজার অর্ঘ করে।
তরুণ অরুণ পুলকে আসিয়া
ললাটে তাদের যায় টীকা দিয়া,
ধূপ-গুগ্‌গুল্‌-গন্ধ ভাসিছে
নির্মল-অম্বরে।
প্রভাত রাগিনী বাজিছে মায়ের
সিংহদুয়ার 'পরে॥
উঠিছে স্তোত্র ভোরের পবনে
ধীর উদাত্তস্বর,
জাগে জয়রব গগনে গগনে
মন্দ্রিয়া চরাচর।
আনে কবিকুল কবিতার হার,
আসিছে শিল্পী লয়ে উপহার,
সকলে সঁপিছে পূজা সম্ভার
মায়ের চরণ 'পর,
মার মন্দিরে প্রণমিছে আসি
অগণিত নারীনর॥
সহসা উদিল গগন ভেদিয়া
জয় জননীর জয়,
মাতৃপূজার মহাপরীক্ষা
জাগিল বিশ্বময়।
জ্বালায়ে যজ্ঞ প্রলয় আহবে
কহেন জননী সন্তান সবে
'মহাপরীক্ষা এইবার হবে—
কা'রা রবে নির্ভয়?
সব সম্পদ সুখ করি দান
কাহারা রাখিবে মার সম্মান?
অনায়াসে হেসে দেবে নিজপ্রাণ
সহি সব ক্ষতি ক্ষয়।"
মাতৃভূমির লাগিয়া মৃত্যু
তাই কি বিশ্বময়?

মায়াবী

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(১)

চন্দ্রদ্বীপের রাজা—

মস্ত বড় রাজা, নাম ডাক খুব। দেশ বিদেশে রাজার নাম, সবাই যমের মত ভয় করে।

না করবেই বা কেন? চিরটাকাল যুদ্ধ করেই তাঁর কাটছে—সসাগরা ধরণীর পরে স্থাপন করেছেন আধিপত্য।

রাজার মনে অহঙ্কার আর ধরে না। তাঁর এখন পৃথিবী জয় করা শেষ হয়েছে, বাকি রয়েছে স্বর্গ। যদি সেটা সম্ভব হয়, চন্দ্রদ্বীপের রাজা উগ্রসিংহ তাও করবেন!

রাজার সভা জম্ জম্ করে, দেশ বিদেশের লোকে রাজধানী ভরে যায়। রাজা তাদের খুব বড় ভালবাসেন, তাই রাজসভায় যারা আসেন, তাঁরাও খুব আনন্দের আসেন।

বহু দেশের রাজা মহারাজা কত ভেট নিয়ে আসেন, গর্বিত রাজা উগ্রসিংহ অনেক সময় সে সব চেয়েও দেখেন না।

উগ্রসিংহের জীবনে আরও একটা ঝোঁক খুব বেশী করে বর্তমান—সে হ'ল মৃগয়া করা। শিকারী নামে তিনি খুব বিখ্যাত। শিকারের নাম শুনলে তাঁর আর রাজ অহঙ্কার থাকে না, আভিজাত্যও থাকে না, যেখানেই হোক তিনি ছুটে যান।

সেদিন রাজসভায় যখন তিনি বসেছেন, ঠিক সেই সময়েই সংবাদ এল। দূর গ্রামে একটা বাঘ ভয়ানক উপদ্রব করতে শুরু করেছে, অনেক লোককে মেরে ফেলেছে।

রাজা উগ্রসিংহের রক্ত গরম হয়ে উঠলো—তিনি তখনই শিকারে যাওয়ার জন্য অধীর হয়ে উঠলেন। চারিদিকে সাজ সাজ রব পড়ে গেল, রাজা নিজেও শিকারের উপযুক্ত সাজে সজ্জিত হয়ে নিলেন।

যে লোকটা বাঘের সংবাদ এনেছিল তাকে উগ্রসিংহ ডেকে পাঠালেন।

লোকটা কাঁপতে কাঁপতে এসে দাঁড়াল।

উগ্রসিংহ জিজ্ঞাসা করলেন, "বাঘটা কত বড়, এ পর্যন্ত সে কত লোক মেরেছে?"

লোকটা হাত জোড় করে উত্তর দিলে, "আজ্ঞে হুজুর, সে বাঘ বাঘ নয়, সে একটা রাক্ষস, ইচ্ছামত রূপ ধরে। কখনও বাঘ, কখনও মানুষ, কখনও হাতী, কখনও রাক্ষস—

উগ্রসিংহ রেগে বলে উঠলেন—"মিথ্যে কথা। আচ্ছা, হোক সে রাক্ষস, হোক সে ভূত, আমি তাকে মারবই,—চলো আমার সঙ্গে—"

ঝম ঝম বাজনা বাজলো—তালে তালে পা ফেলে সারি সারি ঘোড়া চললো, হাতী চললো, সব মধ্যে চললো রাজা উগ্রসিংহের তেজী আরবী ঘোড়া।

(২)

দারুণ বন—

সে বনের ভেতর সূর্যের আলোও পড়ে না, বাতাসেরও প্রবেশ যেন নিষেধ। চাঁদের আলো, সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়ে গাছের পাতায়, তলা যেমন অন্ধকারে ঢাকা তেমনই থেকে যায়।

সে বনের মধ্যে ঢুকে কে কোথায় ছড়িয়ে পড়লো কে জানে—রাজা উগ্রসিংহ কাউকে আর খুঁজে পেলেন না।

আশ্চর্য, বনের মধ্যে একবার ঢুকে পড়ে আর বার হওয়ার পথ পাওয়া যায় না, নিরালা অন্ধকারময় বনের মাঝে পথ কোথায় হারিয়ে গেছে, রাজা পথ খুঁজে সারা হয়ে গেলেন।

তিনি নিজে তো ঘেমে গেলেনই, তার অত বড় এবং জোয়ান আরবী ঘোড়া, সেও হাঁপিয়ে উঠলো অতি বাস্ত, তারও পা যেন আর চলে না।

রাজা ঘোড়া ছোটান—

হাঁপাতে হাঁপাতে ঘোড়া ছোটে—

কিন্তু পথ কই? লোক-লস্কর, সৈন্য-সামন্ত এরাই বা গেল কোথায়? রাজার মাথার ওপর আকাশের লাল রং কালো হয়ে আসে, বনের ভেতরকার অন্ধকার জমাট বাঁধে আরও,—আরও।

উগ্রসিংহ বুঝলেন তিনি রাক্ষসের মায়ায় পড়েছেন, এ মায়া কাটিয়ে বার হওয়া বড় সহজ কথা নয়।

ঝোপের কাছে কি দুটো জ্বল জ্বল্ করে জ্বলছিল, অন্ধকারে জিনিসটাকে বোঝা না গেলেও গন্ধে উগ্রসিংহের ঘোড়া লাফিয়ে উঠলো ভয় পেয়ে।

বাঘের গায়ের বোটকা গন্ধ—

থাবা মারে কি মারে—

বিখ্যাত শিকারী উগ্রসিংহ নিমেষে খাপ থেকে তলোয়ার খুলে মারলেন এক কোপ—

সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়ানক শব্দ—

বন উঠলো কেঁপে, সমস্ত পাখীরা উঠলো জেগে—

চোখ দুটো কোথায় মিলিয়ে গেল।

উগ্রসিংহের ঘোড়া তীরবেগে ছুটলো।

কতদূর—কতদূর। ঘোড়ার পায়ের তলায় কত গাছ মাটিতে শুয়ে পড়ল মাটি রেণু রেণু হয়ে আকাশে উঠলো, রাজা উগ্রসিংহ অবসাদে চোখ মুদলেন।

অনেকদূর ছুটে ঘোড়া এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

সামনে এক নদী, তারই কূলে এক সন্ন্যাসীর কুটির। কুটিরের সামনে দপ দপ করে ধুনির আগুন জ্বলছে, সেই আলোয় দেখা গেল সন্ন্যাসীকে।

একাসনে তিনি বসে আছেন সমাধি-মগ্ন।

রাজা লাফ দিয়ে ঘোড়া হতে নামলেন। দুপুর হতে এই গভীর আঁধার বনে একা ঘুরে বেড়াচ্ছেন, একটা মানুষের মুখ এ পর্যন্ত দেখা যায় নি। সামনে এ সন্ন্যাসীকে দেখে তাঁর দেহে যেন প্রাণ এলো—যদি পথটা পাওয়া যায়। সন্ন্যাসী হয় তো পথের সন্ধান জানেন।

সন্ন্যাসী আর চোখ খোলেন না—

ঘোড়াটা চি-হি-হি করে চেঁচিয়ে ওঠে—

মনে হয় সন্ন্যাসীর গা দুলে ওঠে, মনে হয় তিনি একবার একটু চাইলেন।

রাজা উগ্রসিংহ হাঁটু গেড়ে বসে সকাতরে ডাকেন-"প্রভু, প্রভু, একটু ফিরে চান—দাসের প্রতি এই কথা।—

কে? সন্ন্যাসী চোখ মেললেন—

উগ্রসিংহ হাতযোড় করে বললেন, "প্রভু আমি রা হারিয়েছি, আমায় একটু পথ বলে দিন।"

সন্ন্যাসী কথা বললেন না—কেবল ডান হাতখানা নেড়ে রাজাকে অপেক্ষা করতে ইসারা করলেন।

উগ্রসিংহ বসে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন, ক সন্ন্যাসীর সমাধি ভঙ্গ হবে।

সে সমাধি আর ভাঙ্গে না।

ধুনির আলো একবার ধু ধু করে জ্বলে উঠলো—সে আলোতে রাজা দেখেন সন্ন্যাসীর মুখ—

সর্বনাশ—এ আবার কি?

রাজা শিউরে ওঠেন—

সন্ন্যাসীর মাথা আর কপাল খানিকটা কাটা, রক্ত ধারা গড়িয়ে পড়ছে গাল নাক বেয়ে—

রাজা আড়ষ্টভাবে চেয়ে রইলেন।

(৩)

প্রথম প্রহরের পূজা শেষ হয়ে গেল, দ্বিতীয় প্রহর পূজা আরম্ভ হল।

রাজার মনে পড়ে গেল—আজ শনিবার, অমাবস্যা।

কাপালিক সন্ন্যাসী তাঁকে বলি দেওয়ার ইচ্ছে কা নাকি?

ভয়ে ভয়ে রাজা উঠে পড়েন।

দরকার নেই তাঁর সন্ন্যাসীর সাহায্য নিয়ে, তিনি নিজেই পথ খুঁজবেন।

কিন্তু, এই বা কিরকম? তিনি ঘোড়ায় উঠে যেখানে—যতদূরেই যান, ঘুরে ফিরে এসে পড়েন সেই সন্ন্যাসীর কাছে।

রাজার গা শিউরে ওঠে।

মনে পড়ল সেই লোকটার কথা। সে বলেছিল বাঘটা নাকি রাক্ষস, ইচ্ছা করলে যেমন খুসি রূপ ধরতে পারে।

সন্ন্যাসী চোখ মেললেন—

প্রশান্ত চোখের দৃষ্টি—

তিনি হেসে বললেন, "ভয় নেই রাজা, তুমি কি চাও তা আমি জানি। শিকার করতে বনে এসে তোমার সঙ্গী সাথী সব কোথায় পথভ্রষ্ট হয়েছে, তাও জানি। কোন ভয় নেই, আমি তোমায় বাড়ী পৌছে দেব।"

সন্ন্যাসী সবজ্ঞ—

রাজার ভক্তি উচ্ছল হয়ে ওঠে। রাজা পরম ভক্তি ভরে সন্ন্যাসীর পায়ের ধূলো নিয়ে মাথায় দিলেন।

সন্ন্যাসী রাজাকে পূজার ফল বিল্বপত্র দিলেন, চরণামৃত দিলেন।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন "আপনার কপাল কেটে গেল কি করে প্রভু?"

সন্ন্যাসী একটু হেসে বললেন, "ও কিছু নয় রাজা। চল, তোমায় পৌছে দিয়ে আসি।"

পায়ে হেঁটে তাঁরা চললেন।

আশ্চর্য—এই তো পথ, এইটুকু তো বন। বনের মধ্যে আলো পড়েছে, সব যায়গা দেখা যাচ্ছে। তাতে রাজার হয়েছিল কি, এইটুকু বন তিনি পার হতে পারেন নি, আলো দেখতে পান নি?

সন্ন্যাসীর প্রতি রাজার ভক্তি আরও বাড়লো। সত্যই তিনি রাক্ষসের মায়ায় জড়িয়ে পড়েছিলেন, ভাগ্যে এই সন্ন্যাসী ছিলেন, তাই না মুক্তি পেলেন।

রাজপথ বেয়ে দুজনে চলেন।

সামনে রাজার বিশাল প্রাসাদ। সন্ন্যাসী সে পর্যন্ত রাজাকে পৌছে দিয়ে ফিরে যেতে চান। রাজা তাঁর দুটি পা জড়িয়ে ধরে বললেন, "তা হয় না প্রভু, দাসের প্রতি দয়া করে যখন এসেছেন এতদূর, আমার এখানে কিছুদিন থাকুন, আমি আপনার থাকার সব ব্যবস্থা করে দেব।"

দু একবার আপত্তি করে কি জানি কি ভেবে সন্ন্যাসী রাজি হলেন।

রাজার আর আনন্দ ধরে না।

সেই রাত্রে রাণীকে ডাকেন, মন্ত্রীকে ডাকেন, সকলকে ডাকেন—সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে আশীর্বাদ নিতে বলেন।

রাণী প্রণাম করতে গিয়ে চমকে পেছিয়ে যান—

সন্ন্যাসীর চোখে সাপের মত দৃষ্টি, রাণীর বুকের মধ্যে আতঙ্ক জেগে ওঠে।

আড়ালে রাজাকে ডেকে বলেন, 'এ কাকে এনেছেন মহারাজ,—এ তো মানুষ নয়।'

উগ্রসিংহ হেসে ওঠেন—"মানুষ নয়—কি যে বল রাণী? উনি মানুষ, তবে সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী।"

রাণী কেবল মাথা নাড়লেন।

কেন জানি না, এই সন্ন্যাসীকে রাণী মোটেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। ওর আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হচ্ছিল—দুর্নিবার এক অমঙ্গল ঘনিয়ে আসছে।

এ কথা বলতে রাজা হেসে উড়িয়ে দেন, বলেন—রাণীর মাথা খারাপ হয়েছে।

রাণী লুকিয়ে লুকিয়ে গৃহদেবী মা চণ্ডীর কাছে মাথা খোঁড়েন, প্রার্থনা করেন—মাগো, দেখো, যেন আমার স্বামীর কোন অমঙ্গল না হয়, আর আমার প্রজারা—দেখ মা তাদেরও।

সন্ন্যাসী রাজবাড়ীতে বেশ থেকে গেলেন, রাজা তাঁর জন্য একটা মহল ছেড়ে দিলেন।

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই—

শিকারের দিনে রাজার সঙ্গে যে ত্রিশজন লোক গিয়েছিল, আট দশদিনের মধ্যেও তারা কেউ ফিরে এলো না। আটদশদিন বাদে একটা চাষা হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বললে, "মহারাজ, নদীর ধারে এক জায়গায় উনত্রিশটা মড়ার মাথা আর হাড়গোড় পড়ে আছে। দেখে মনে হয় কে যেন কচি হাড়গুলো চিবিয়ে, মোটা হাড়গুলো শুষে খেয়ে ফেলে দিয়েছে।"

সন্ন্যাসী তাচ্ছিল্যের ভাবে বললেন, "এ সব সেই বাঘের কাণ্ড।"

চাষা বললে, সন্ন্যিসীঠাকুর, বাঘে একেবারে উনত্রিশজন লোককে খেতে পারে না। আর আমাদের গাঁয়ে বাঘ নেই—ওদিকে কোথাও যে উপদ্রব হয়েছে—তাও শোনা যায় নি।

ধমক দিয়ে উগ্রসিংহ বললেন, "তবে আর কি? সে বাঘ এসেছিল, আবার চলে গেছে,—তোমরা তো বেঁচেছ। যাও, বাজে বকো না, নিজের কাজ কর গিয়ে।"

বেচারা চাষা পালাতে পথ পায় না।

(৪)

দিন যায়—

রাজ্যে বাঘের উপদ্রব বাড়ে। রাজবাড়ীর পাশে এক গরীব লোকের বাড়ী তিনটী ছেলে খেলা করছিল—তিনটী-কেই নাকি বাঘে নিয়ে গেছে। তিনটাকে সে কেমন করে টপ টপ করে খেয়ে ফেললে তাই হচ্ছে কথা।

তারপর আরও শোনা যায়—

কোথায় কার বউ রান্না করতে বসেছিল, বাঘ হালুম করে লাফিয়ে পড়ে তাকে মুখে করে নিয়ে পালিয়েছে।

কেউ কেউ সে বাঘ দেখেছে—সে নাকি ভীষণ চেহারা, অমন বাঘ নাকি কেউ কখনও দেখেনি। কি জ্বলন্ত গোল তার চোখ, কি থামের মত মোটা মোটা পা, কি তার লেজ—সে নাকি একটা ছোটখাট হাতী।

রাজার কাছে খবর আসে।

সন্ন্যাসী বলেন, "সহরে এলো বাঘ, কি আশ্চর্য।"

রাজা বাঘ মারবার তোড়জোড় করেন।

আবার একদিন শোনা যায়—একটা দশহাত লম্বা লোক,—দাঁতগুলো তার একহাত করে লম্বা, গায়ে বন-মানুষের মত লোম। সে নাকি মানুষ খায় এবং সহর হতে অনেক মানুষ অন্তর্হিত হয়েছে।

ঐ আবার কি ব্যাপার—

রাজার হাত পা পেটের মধ্যে ঢুকে যায়—তিনি ভাবেন কি করবেন।

সন্ন্যাসী দীর্ঘ জটায় হাত বুলাতে বুলাতে বলেন, "এর বিহিত কর রাজা, সেটা ভূতনা রাক্ষস না বাঘ—অথবা এই তিনটেই এসেছে তোমার রাজ্যে?"

রাজা মাথায় হাত বুলান।

সেদিনে রাণী হঠাৎ ভয় পেলেন।

ঘরে ঢুকতেই দেখতে পেলেন সামনে একটা রাক্ষস মূর্তি—

মাথা তার ছাদে ঠেকছে, ভাঁটার মত চোখ দুটো ঘুরছে, মূলোর মত দাঁতগুলো বার করা, জিভ তার লক লক করছে। দুই হাতের দশটা লম্বা আঙুল দিয়ে আঁকড়ে সে রাণীকে তুলে নিলে—মুখে তার হাসি ধরে না।

ভীষণ একটা চীৎকার করে রাণী অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

ঠিক সেই সময়ে এসে পড়লেন রাজা। রাণীর চীৎকার শুনতে পেয়েই তিনি তার বন্দুকটা নিয়ে ছুটে এসেছেন।

সামনে সেই ভয়াবহ রাক্ষসের মূর্তি দেখে রাজার বুক কেঁপে উঠলো,—হাত হতে বন্দুকটা খসে পড়ে আর কি?

কিন্তু রাক্ষসের হাতে রাণী, এক মিনিট দেরী করার ফল যে কি হবে তা বুঝতে রাজার এক সেকেণ্ড দেরী হল না।

তিনি কাঁপতে কাঁপতে বন্দুক তুললেন, ঠিক রাক্ষসের কপাল লক্ষ করে বন্দুক ছুড়লেন, কিন্তু সে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে বিঁধলো গিয়ে রাক্ষসের হাতের উপর দিকটায়।

কানে একটা বিকট শব্দ এলো, সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে রাজা উগ্রসিংহ মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। তাঁর তখন মনে হয়েছিল ঘর ভেঙ্গে পড়ছে, পায়ের তলার মাটি যেন সরে যাচ্ছে।

কতক্ষণ পরে—

উগ্রসিংহের যখন জ্ঞান ফিরে এলো তখন দেখতে পেলেন রাণী তাঁর পায়ের কাছে পড়ে রয়েছেন, তখনও তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে নি। বন্দুকের শব্দে লোকজন দৌড়ে এসে ছিল, ঘরের ভিতর সাহস করে কেউ ঢুকতে পারে নি, বাইরে দাড়িয়ে ভয়ে তারা কাঁপছিল।

উগ্রসিংহ একজনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমরা কি কিছু দেখতে পেয়েছ, কেউ কি এ ঘর হতে বার হয়ে গেছে?"

রাজার দাসী কাঁপতে কাঁপতে উত্তর দিলে, "আমি দেখেছি মহারাজ,—একটা মস্ত বড় রাক্ষস হুম হাম করতে করতে বার হয়ে গেল।"

উগ্রসিংহ আর গোলমাল না করে রাণীর শুশ্রূষায় মন দিলেন।

সারাদিন পরে বৈকালে রাজা সন্ন্যাসীর মহলে যেতে যেতে শুনলেন তিনি অসুস্থ হয়েছেন, আজ তিনি পূজোর ঘরে যান নি।

রাজা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—

অসুখ হয়েছে, কই, কেউ তো তাকে এ কথা জানায় নি।

সন্ন্যাসীর ঘরে ঢুকে দেখতে পেলেন, তিনি আগাগোড়া মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে আছেন, রাজার ডাক শুনে মুখ খুললেন।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার অসুখ হয়েছে আমায় তো কোনও খবর দেন নি প্রভু।"

সন্ন্যাসী একটু হেসে বললেন, "শরীর ব্যাধি মন্দির, এর জন্যে আর খবর দেব কি বৎস? শুনতে পেলুম কাল রাত্রে নাকি সেই রাক্ষসটা তোমার শোবার ঘরে পর্যন্ত এসেছিল, আমাদের রাণীমাকে পর্যন্ত—"

বাধা দিয়ে উগ্রকণ্ঠে উগ্রসিংহ বললেন, "আর বলবেন না প্রভু, এতদিন আমার এত বিদ্বেষ তার পরে হয় নি, কিন্তু এবার আর আমি সইব না। যেমন করে পারি তাকে মারবই তবে আমার নাম উগ্রসিংহ।"

সন্ন্যাসী খুব খুসী হয়ে বললেন, "বেশ বেশ, এই তো চাই। আমি তোমায় সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করছি বৎস, তোমার জয় হোক।"

(৫)

রাজার রাজ্যে বাড়তে লাগল উৎপাত—

ঘোড়া, গরু, হাতী মানুষ সবই হতে লাগল অন্তর্ধান। রাজার হাতীশালে অতগুলো হাতী ঠেকলো এসে একটায়, অতগুলো ঘোড়ার মধ্যে রইল মাত্র কয়টা।

রাণী সশঙ্ক ভাবে বললেন, "মহারাজ, আমি প্রথম দিনই আপনাকে বলেছিলুম, আজ আবার বলছি,—আপনি ওই ভণ্ড সন্ন্যাসীকে বিশ্বাস করবেন না।' ওকে বিদায় করে দিন, রাজ্যের মঙ্গল হবে।"

রাজা জ্বলে উঠলেন—

"যা তা কথা বলো না রাণী, মুখ সংযত করে কথা বলো। সন্ন্যাসী যে আমার অতিথি হয়ে আছেন, এ আমার সৌভাগ্য, তোমার সৌভাগ্য, আমার সমস্ত প্রজাদের সৌভাগ্য। উনি নিজে না গেলে আমি ওঁকে বিদায় করতে পারব না।"

রাণী চুপ করে যান।

রাজা দিনরাত বাঘ বা, সেই রাক্ষস খুঁজে বেড়ান। এই শোনেন এখানে—তখনি গিয়ে শোনেন সেখানে। ভারি মুস্কিল,—সে কি সত্যই ভূত?

লোকে তাই বলে। সবাই বলে সে নিশ্চয়ই ভূত, ইচ্ছামত মূর্তি বদল করে, ইচ্ছামত মানুষ জীবজন্তু মারে।

রাজা দেখতে পান না—।

সেদিন রাজা সারাদিনের পরে ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসছিলেন সন্ধ্যার পাতলা অন্ধকারে।

হঠাৎ সামনে কি ঝপ্ করে লাফিয়ে পড়ল, পড়েই স্থির হয়ে দাঁড়াল।

রাজা থমকে পিছন সরে গিয়ে তাকালেন—

সেই বাঘ,—

চমৎকার সটান চেহারা। আকারে একটা মস্ত বড় বলদের মত। কি সুন্দর দুটো চোখ তার জ্বল জ্বল করে জ্বলছে—চোখের এমন সৌন্দর্য উগ্রসিংহ কোনদিন দেখেন নি, তাই তিনি বিস্মিত হয়ে অভিভূতের মত তাকিয়ে রইলেন।

তখনই তাঁর জ্ঞান ফিরে এলো—দেখতে পেলেন বাঘের মুখে একটা আট দশ বছরের বালক, তার পেটের জায়গাটা বাঘ কামড়ে ধরেছে। হয়তো খানিক আগেও বালকটি বেঁচে ছিল, এখনও তার নরম তুলতুলে হাত পাগুলো শক্ত হয় নি।

বাঘটা শক্ত করে তাকে কামড়ে ধরে লেজটা অল্প অল্প নাড়ছিল। সে যেন আশা করেনি এখানে হঠাৎ সশস্ত্র-কাউকে দেখবার, সেইজন্য সেও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল।

পালাবার উদ্দেশ্যে সে একটু নড়তেই রাজা তাঁর সাত্-নলা বন্দুকের ঘোড়া টিপলেন।

প্রথম গুলি খেয়ে বাঘটা লাফিয়ে উঠলো, মুখের আহার ফেলে দিয়ে পালানোর চেষ্টা করতেই আবার গুলি; গুলি খেয়ে সে গর্জন করে রাজার দিকে ফিরলো।

রাজার হাত আর কাঁপলো না।

বাঘ লাফ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রম ক্রম করে বার কয়েক গুলি ছুটলো—।

রাজ্যের শত্রু বাঘ লুটিয়ে পড়লো মাটিতে।

থামের মত পা চারখানা কয়েকবার নড়ল,—

কি আশ্চর্য্য—বাঘ নেই এযে সেই দশহাত লম্বা রাক্ষসটা। প্রকাণ্ড বড় জিভটা মস্ত বড় মূলোর মত দাঁতের ফাঁক দিয়ে বার হয়ে পড়েছে। বুকে তিন চারটা গুলি বিঁধেছে।

রাজা সভয়ে পেছনে সরে গেলেন, রাক্ষসটা পড়েও দু চার বার হাত পা ছুড়লো, তার পর আস্তে আস্তে দুই চোখের পাতা মুদে এলো—

রাজা দুইচোখ মুদে ছিলেন—

যখন চোখ মেললেন—

এ কি !! এ কে ? রে !!

কোথায় বাঘ—কোথায় রাক্ষস—

এ যে সেই সন্ন্যাসী।

সেই গেরুয়া পরা, দীর্ঘ জটাজুট, সেই প্রকাণ্ড দাড়ি গোঁফ—

রাজা উগ্রসিংহ দুই হাতে চোখ ঢাকলেন—

বিদ্যুৎ চমকের মত সমস্ত ঘটনা তাঁর মনে ভেসে উঠলো—

সেই লোকটার কথা—

তারপর সেই বন, সেই বাঘ, সেই সন্ন্যাসী, তাঁর কপালে ক্ষত। তারপর রাণীর সন্দেহ এবং রাক্ষসমূর্তিতে রাণীকেই আক্রমণ।

রাজা রাক্ষসের হাতে গুলি করেছিলেন সন্ন্যাসীও সেদিন অসুস্থ অবস্থায় শুয়ে পড়েছিলেন।

তারপর আজ— ?

রাজা মুহূর্তমাত্র সেখানে অপেক্ষা করতে পারলেন না, সবেগে ঘোড়া ছুটালেন।

হাঁপাতে হাঁপাতে রাজা এসে বাড়ী পৌছালেন, ভৃত্যেরা তাঁকে ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঘরে শুইয়ে দিলে।

হাঁফাতে হাঁফাতে উগ্রসিংহ বললেন, "তোমার কথাই সত্যি রাণী, আমারই ভুল হয়েছিল, আমি সন্ন্যাসীকে চিনতে পারিনি। ওই সন্ন্যাসীই মায়াবী রাক্ষস, সেই বাঘ—। উঃ, দুধ কলা দিয়ে কালসাপ পুষেছিলুম রাণী। তবু বড় সান্ত্বনা যে আজই তাকে মেরেছি।"

রাণী শান্তকণ্ঠে বললেন, "আমি আগেই সব চোখে দেখে তা বুঝতে পেরে ছিলুম মহারাজ। ভগবানের কৃপায় আপনার রাধ হাত শনি নেমে গেছে, আর কোনো ভয় নেই।"

রাজা চোখ মুদে পড়ে রইলেন।

নির্বোধের লক্ষণ

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম. এ. বি. টি.

অকারণ ক্রোধ, বিনালাভে অধিক ভাষণ।
উদ্দেশ্য বিহীন প্রশ্ন, চিন্তাহীন মনোবিবর্তন ।।
এই চারি ভাব জেনো পাবে যার মাঝে।
নিশ্চিত নির্বোধ সেই—থাক্ যেই সাজে ।।

দুশ্চিন্তা

বুদ্ধদেব বসু

যাচ্ছে সময় যাচ্ছে চ'লে
ঘণ্টা মিনিট দণ্ড পলে।
গির্জে ঘরের ঘড়ির কলে
বাজলো এগারো, বাজল বারো,
আরো কত বাজে ভাবতে পারো?
ভেবেই দেখনা কথাটাই ওহে,
বারোটার পর একটা না-হ'য়ে
বারোটার পর তেরোটা হ'লে,
চোদ্দ উনিশ একুশ একশো
দেখতে-দেখতে সাতাশ হাজার,
শেষ কি কখনো থাকত 'বাজা'র?
ঘড়ির উপরে বসতো ট্যাক্সো
নয়া দিল্লিতে বানাতো আইন—
তিন পাই করে দেবে সে ফাইন।
তেরো হাজারের বেশি কোনো ঘড়ি
বেজে ওঠে যদি, এক কাঁটা নড়ি—
ঘোরে যদি, তবে প্রতি ঘণ্টায়
প্রাণ যাবে তার ঠেকে কণ্ঠায়।
অবাধ্য ঘড়ি তবু কি থামতো?
আইনের ধার কখনো মানতো?
চড়তো নিলেমে থালা ও ঘটি,
বাজতো দু'লাখ, বাজতো কোটি,
সতেরো শূন্যে হ'তো পরার্ধ,
তবুও ঘড়ির আরো বরাদ্দ।
ফুরুতো ঘণ্টা, ফুরুতো নামতা,
মন্ত্রী মহলে আমতা-আমতা—
দেড় কোটী টাকা ট্যাক্সো জমলো
হতভাগা ঘড়ি তবু কি দমলো।

ক'টা যে বাজলো কে-ই বা গুনতো,
যেই ঘড়ি দেখা ঘুরতো মুণ্ড।
ঘড়ির কাঁটা সে হাতীর শুণ্ড
ঘুরিয়ে কেবলি ঘণ্টা বুনতো।
পাহাড়প্রমাণ জমছে ট্যাক্সো,
হিসেব রাখতে খাটছে একশো
দিগ্‌গজ এম-এ ম্যাথামেটিক্সো,
মস্ত আপিস চলছে ঠিকসে।
কিন্তু কে করে খাজনা আদায়।
ঘড়ির ঘণ্টা গোল যে বাধায়।
রায় বাহাদুর চণ্ডী সাধুর
নামে এক ঘাটে ব্যাঘ্র বাছুর
জল খায়—যদি ঘড়িরা তাকেও
চণ্ডী সাধুর চণ্ড তাঁকেও
পরোয়া না-ক'রে কেবলই বাজতো,
তবে কি সৈন্য যুদ্ধে সাজতো?
গুলি খেয়ে সব মরতো ঘড়ি?
তবু কি জুটতো একটা কড়ি?
তখন হুকুম হ'তো মন্ত্রীর
ভারতবর্ষে মাথা-গুনতির
প্রত্যেক শিশু মেয়ে-পুরুষের
বামুন, মুচী কি জুতো-বুরুশের,
মাসে তিন টাকা বসলো ট্যাক্সো।
হুজুর, রক্ষ, উজোড় রাজ্য।
ফাটতো বুকের শুকনো পাঁজরা,
আয়ের অঙ্ক এমন ঝাঁজরা
দেখতে পাওয়াই যায় কি না যায়—
হায় হায় তবে কী হ'তো উপায়!

ধ্বংস স্তূপে

শ্রীহেমচন্দ্র বাগ্‌চী, এম্‌, এ

ছোট্ট একটি শহর। তা'র নাম নাই বা শুনিলে। সেই শহরের বাহিরে ছেলেদের খেলার মাঠে সন্ধ্যা শেষ হইয়া ক্রমশঃ রাত্রি ঘনাইল। প্রকাণ্ড মাঠ, অনেকদূরে ইস্কুল বিল্ডিংএর ধূসর দেহটি রাত্রির অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখাইতেছে। মাঝে মাঝে এক একটি অতিকায় নিমগাছ—তাহাদেরই একটির নীচে চার-পাঁচজন কিশোর ঘাসের উপর পা ছড়াইয়া দিয়া পরম আরামে গল্প জুড়িয়া দিয়াছে। তাহাদের পরিধানে জারসি এবং হাপ্‌প্যাণ্ট্‌—এক পাশে বর্তমানে অনাদৃত ফুটবলটি পড়িয়া আছে।

একজন বলিল, 'ভালো লাগে না ভাই রোজ রোজ এই খেলা, আমার তো পায়ের বেদনাটা সারলই না কিছুতে। তার উপরে ইস্কুলের টাস্ক্‌, আর পড়াশুনার ব্যাপার ত আছেই। চলো কোথাও একদিকে বেরিয়ে পড়া যাক।'

অপেক্ষাকৃত ক্ষীণকণ্ঠে একজন বলিল, 'বেরিয়ে পড়া কি সোজা কথা?' তার পরের ব্যাপারটি ভাব্‌লে হাত-পা অবশ হ'য়ে আসে। এই ধরো, প্রায় আটটা বাজে। বকুনীটা কি রকম হ'বে, তাই ভাব্‌ছি।'

একজন ঘাসের উপর লম্বা হইয়া শুইয়াছিল। সে বলিল, 'এস শ্রীকান্ত হওয়া যাক্‌, আমি ইন্দ্রনাথ হই, আর তোমরা সবাই এক একজন শ্রীকান্ত হ'য়ে, চলো অন্ধকার রাত্রে খালবিলের মধ্য দিয়ে নিশীথ অভিযানে বা'র হই—কি বলো?'

উত্তর আসিল, 'মন্দ নয়, তবে কি না ইন্দ্রনাথের মত অতখানি সাহস তোমার হ'বে কি না সন্দেহ। শরৎবাবুর লেখা বড় সুন্দর, কি বলো?'

উত্তর আসিল, 'চমৎকার, শ্রীকান্ত পড়্‌তে পড়্‌তে মনে হয়, ঠিক যেন আমরা আমাদের নিজেদের মনের কথা পড়্‌ছি।'

প্রথমে যে কথা বলিয়াছিল, সে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল, 'ডেসক্রিপশন্‌ কি সুন্দর।' এই কথা উঠিতেই সঙ্গে সঙ্গে পাঁচজনে মিলিয়া কলরব আরম্ভ করিল—অন্নদাদিদি, মাছধরবার গল্প, ছিনাথ বহুরূপী, মেজদাদা প্রভৃতি তাহাদের কলরবের মধ্যে শুনা যাইতে লাগিল।

যে শুইয়াছিল, সে উঠিয়া বসিল—তর্ক ক্রমশঃ মারামারিতে আসিয়া দাঁড়ায় দেখিয়া সে ফুটবলটি বগলে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বিনা বাক্য ব্যয়ে রাস্তার দিকে চলিতে লাগিল।

'তাই ত হে, রাত্তির হ'য়েছে'—বলিয়া বাকী সকলেই উঠিয়া তাহার অনুসরণ করিল। ইহাদের নাম যথাক্রমে সুনীল, হেমকান্তি, শৈলেন, অশ্বিনী আর অমল।

পথে যাইতে যাইতে ঠিক হইল, একদিন এমনি ঘুরিতে ঘুরিতে অনেকটা দূর বেড়াইয়া আসা হইবে।

যে কিশোরগুলির কথা বলা হইল, তাহারা ইস্কুলে পাশাপাশি বসে। খেলার মাঠে একসঙ্গে খেলা করে, কোথাও বেড়াইতে বাহির হইলে একসঙ্গে যায়। সেদিন ছুটি ছিল। সকলে একসঙ্গে জুটিয়া নদীর ধারে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। তখনো বেলা আছে। নদীর ওপারে,—যেখানে ছোট রেলের লাইন এবং ছোট ছোট ট্রলির মত গাড়ীগুলি সারি দিয়া দাঁড়াইয়া আছে, সেইখানে সব জুটিয়া ট্রলিতে চাপিয়া সেগুলিকে লাইনের উপর দিয়া ঠেলিয়া লইয়া যাইবে—এইভাবে তাহারা সন্ধ্যাটি কাটাইয়া

দিবে স্থির করিয়াছে। নদীর ধারের পথটি দীর্ঘ। দুই পাশে অশ্বত্থ, বাবলা আর তেঁতুল গাছ তাহাদের দীর্ঘ ডালপালা মেলিয়া পথটিকে একটি কুঞ্জবীথির মত করিয়া রাখিয়াছে। যাইতে যাইতে হেমকান্তি বলিল, 'অ্যাড্‌ভেঞ্চার বলতে কি বোঝ' বলো ত ভাই। আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি নে।'

অশ্বিনী বলিল, 'অ্যাড্‌ভেঞ্চার বলতে দুঃসাহসের কাহিনী—এই ত বুঝি। বিদেশে বোধহয় আমাদের বয়সী ছেলেরা খুব অ্যাড্‌ভেঞ্চার করতে বেরোয়। আমাদের এখানে দুঃসাহস-ই নাই—তা'র আবার কাহিনী।'

হেমকান্তি বলিল, 'অ্যাড্‌ভেঞ্চার আর রোমান্স তফাৎ কি? কথা দু'টি এত বেশী চলে, আমরা বোধ হয় অর্থ বুঝে সব সময়ে শব্দ'টির ব্যবহার করি নে।'

শৈলেন বলিল, 'নে তোর শব্দ আর বানান-সমস্যা রাখ। অ্যাড্‌ভেঞ্চার করবি না কি তাই বল্? সে সাহস আছে?'

অমল বলিল, 'সাহসের অভাব কি? সুবিধা হ'লেই করতে পারি। তোমরা রাজী থাকোত আজই করতে পারি।'

সুনীল মৃদুস্বরে গান গাহিতে গাহিতে পথ চলিতেছিল। ইহাদের কথাবার্তা সে শুনিতেছিল, কিন্তু কোনো কথা সে বোধহয় বলিতে চায় না।

শৈলেন অমলের কথায় বলিল, 'চলো, আপত্তি কি? ফিরে এসে বাড়ীর ধাক্কা সাম্‌লাতে পারবে ত?'

অমল বলিল, 'ঐ ত রোগ, বাড়ী-বাড়ী ক'রেই গেলে। ওদের দেশে আমাদের বয়সী ছেলেরা কি ক'রে ছুটি কাটায় জানো? খবর রাখো? সব দল বেঁধে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানগুলি দেখতে বেরোয়। তাদের কত উৎসাহ, কেমন সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা।'

হেমকান্তি বলিল, 'আজ আমাদের যাওয়া কি ক'রে সম্ভব? বেরুতে গেলে অনেক কিছুর দরকার।'

অশ্বিনী বলিল, 'কিছু না, যাও ত, আজই হ'তে পারে। সব যদি যোগাড় ক'রেই বেরুবে, তাহ'লে অ্যাড্‌ভেঞ্চার আর হ'ল কৈ?

হেমকান্তি বলিল, 'বিপদ-টিপদ যদি হয়! তাছাড়া কাল আবার ইস্কুল আছে। না ভাই আজ বোধ হয় যাওয়া হয় না।'

এইভাবে কথা কাটাকাটি তর্ক-বিতর্কের মধ্যে আজই অ্যাডভেঞ্চার করিতে যাওয়া হইবে স্থির হইল। ততক্ষণে তাহারা ব্রিজের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। দূর হইতে রেল লাইনের বাঁধটিকে ছোটখাটো একটি পাহাড়ের মত মনে হয়। সেই কৃত্রিম পাহাড়ের উপরে উঠিলে সন্ধ্যার অন্ধকারে নদীটিকে একখানি দীর্ঘ আঁকাবাঁকা রূপার পাতের মত দেখায়। পাহাড়ের আশেপাশে আকন্দ, বৈচি আর কাশের বন। সেখানটিতে সূর্যের শেষ বিদায়ের আলোক-রেখাগুলি আসিয়া পড়ে। আকন্দের একপ্রকার উদাস গন্ধ ভাসিয়া আসে। স্থানটিকে একটি স্বপ্নলোক বলিয়া মনে হয়।

পাঁচজনে পাহাড়ের মত উঁচু বাঁধে উঠিবার আঁকাবাঁকা পথ বাহিয়া ব্রিজের উপর উঠিল। যেখান হইতে ব্রিজটি আরম্ভ হইয়াছে, তাহারই একটা বাঁধানো জায়গায় বসিয়া তাহারা কোথায় যাইবে ঠিক করিতে লাগিল। ট্রলিতে তাহারা উঠিবেই। তাহার পর সন্ধ্যার অন্ধকারে টর্চের আলোয় যতদূর সম্ভব হয়, যাওয়া যাইবে। সুনীল আর হেমকান্তি কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছিল। বাকি তিনজনের অর্থাৎ শৈলেন অশ্বিনী আর অমলের খুব উৎসাহ। ব্রিজের উপর হইতে নামিয়া তাহারা ও-পারে ট্রলিতে উঠিবে—তাহার পর নদীর ধার ধরিয়া পশ্চিমমুখে হাঁটিয়া যাইবে। দুই তিন দিনের মধ্যে যতদূর যাওয়া যায়। সুনীল এতক্ষণে কথা বলিল, সে বলিল, 'খাওয়া-দাওয়া'র কি ব্যবস্থা করবে?' শৈলেনের সেই এক কথা। সে বলে, 'এতই যদি ভাববে, তাহ'লে অ্যাড্‌ভেঞ্চার আর কি ক'রে হ'ল?'

তাহারা এইভাবে নিবিষ্ট হইয়া কথাবার্তায় মগ্ন। এমন সময়ে রেলের লাইনে এক বিচিত্র খট্‌-খট্‌ শব্দ উঠিতে লাগিল। টেলিগ্রাফের তারগুলিতে যেন ঝড় বহিতেছে—এমনি সাঁ-সাঁ সোঁ-সোঁ—একটানা আওয়াজ। অশ্বিনী চমকাইয়া উঠিয়া বলিল, 'এই যে ট্রেন এসে পড়েছে। এস থামের উপর নেমে বসি!'

ট্রেন তাহাদের বেশী ভাবনা-চিন্তার সময় দিল না। এক বিচিত্র বাদ্য-যন্ত্রের মত সমস্ত ব্রিজকে ঝন্‌-ঝন্‌ শব্দে

বাজাইয়া ট্রেণ আসিয়া পড়িল। পাঁচজনেই হুড়মুড় করিয়া একটু আগাইয়া গিয়া লাইনের কাঠগুলির নীচে যে ফাঁক ছিল, সেই ফাঁক দিয়া একে একে ব্রিজের থামের উপর নামিয়া আসিল। থামের উপর আসিয়া তাহারা লাইনের নীচে যেখানে অন্ধকার সেই কোণ ঘেঁসিয়া চুপচাপ বসিয়া রহিল। সুনীল একবার মাথাটি কাৎ করিয়া নীচে চাহিল —নদীর প্রবল স্রোত ঠিক নীচেই। একটু অন্যমনস্ক হইলেই আর কথাটি নাই। একেবারে তলাইয়া যাইতে হইবে। আর উপরের দিকে ত চাহিবার কথাই নয়। ঝন ঝন্ করিয়া ব্রিজ কাঁপিতেছে—লোহা, মেসিন্ আর কয়লার এক অপূর্ব্ব সঙ্গং। এর নিমেষে সেই বজ্রনির্ঘোষ আরম্ভ হইল। পাঁচজনের বুকের ভিতরটা ভয়ে ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল। ভূমিকম্পে যেমন হয় তেমনি করিয়া থামটা একবার থর্থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল—তাহার কিছু পরেই শেষ গাড়ীখানি চলিয়া যাইবার শব্দে আশ্বস্ত হইয়া সকলে পরস্পরের মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। একে একে সব আবার উপরে উঠিয়া আসিল। হেমকান্তি হাসিয়া বলিল, 'বাপস, ভয়ে এখনো আমার বুক কাঁপছে।' শৈলেন 'ফুঃ' করিয়া খানিকটা নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, 'তবেই হ'য়েছে, এই সাহস নিয়ে যা'বে কি ক'রে অজ্ঞাত রাজ্যে?'

তখন সূর্য অস্ত গিয়াছে। নদীর উপরটা ছায়ায় আলোয় স্বপ্নময়। আকন্দ আর কাশবন তখনো তোরে গতিতে দুলিতেছে। অমল বলিল, 'মন্দ লাগে না ত।' তাহার পর একে একে সবাই ব্রিজের উপর দিয়া হাঁটিয়া ওপারে চলিয়া গেল। পায়ে হাঁটিয়া যাইবার জন্য ব্রিজের উপর এক ফালি কাঠ পড়িয়া আছে। সারি বাঁধিয়া একে একে যাইতে হয়। পাশাপাশি দুইজনে যাইতে পারে না। কে একজন ব্রিজের আর্চের উপর দিয়া হাঁটিয়া ওপারে গিয়াছিল, তাহারই গল্প শৈলেন সবিস্তারে বলিতে বলিতে চলিল। আর, কে একজন ব্রিজের উপর যখন ট্রেণ যাইতেছিল, তখন এই পায়ে-হাঁটা কাঠের ফালির উপর অতি সাহসে দাঁড়াইয়াছিল—অক্ষত দেহে—এই সব কাহিনী চলিতেছিল। দেখিতে দেখিতে তাহারা নদীর ওপারে চলিয়া গেল।

বাঁধের পাহাড় হইতে একে একে সব নীচে নামিল। ছোট লাইন নদীর ধার দিয়া অনেকদূর আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে। আশে পাশে অগণ্য কাঁটা ঝোপ। ট্রলিগুলির উপরে পাথর বোঝাই করিয়া নদীর ধারে ঠেলিয়া লইয়া যাওয়া হয়, আর সেই পাথর ঢালিয়া নদীর পাড় বাঁধানো হয়। গাড়ীগুলি তখন খালি পড়িয়া আছে। সুনীল আর হেমকান্তি একখানি পাথরের উপর বিরস ক্লান্তমুখে বসিয়া রহিল। শৈলেনকে একটি 'ওয়াগনে' চাপাইয়া অমল আর অশ্বিনী ঠেলিয়া লইয়া চলিল। সুনীল আর হেমকান্তির চোখের সম্মুখ হইতে ট্রলিখানি ঘড় ঘড় করিতে করিতে একটি বাঁক ঘুরিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। পাতা লাইনের উপর দিয়া অমল আর অশ্বিনী ট্রলি ঠেলিতে ঠেলিতে চলিয়াছে—খুব জোরে ঠেলিয়া দিয়া মাঝে মাঝে বিশ্রাম লইতেছে।

সুনীল আর হেমকান্তি বসিয়া আছে। সন্ধ্যা আসন্ন। কেমন যেন শীত শীত করিতেছে। পাশ দিয়া একটি খ্যাকশিয়াল বিদ্যুদ্বেগে পলাইয়া গেল। কয়েকটি বিচিত্র নাম-না জানা পাখী কলরব করিতে করিতে উড়িয়া গেল। তাহাদের মাথায় অস্পষ্ট ছায়াধূসর আলো। সুনীলের প্রকৃতি স্বভাব-ম্রিয়মান। সে গুন গুন্ করিতে করিতে বলিল, 'কি যে হ'বে ঠিক বুঝতে পারছি নে। কোথাকার জল কোথায় দাড়ায়।' হেমকান্তিও অন্যমনস্ক ছিল। তাহারা দু'টিতে ঠিক মনে প্রাণে ইহাদের সঙ্গে সায় দিতে পারিতে ছিল না। ঠিক এমনি সময়ে হুড়মুড় করিয়া একটা শব্দ। অমল দূর হইতে চীৎকার করিতে লাগিল, 'সুনীল, হেম— তোমরা শীগগির এসে—শৈলেন পড়ে গেছে।' হেমকান্তি 'এই রে পেয়েছে' এবং সুনীল 'যা' বলেছি তাই'—বলিতে বলিতে ট্রলির লাইন ধরিয়া দৌড়াইতে লাগিল। ঘটনাস্থলে আসিয়া দেখে, ট্রলি উল্টাইয়া পড়িয়া আছে—শৈলেন নাই। দশ বার হাত খাড়া পাথরের গাদার নীচে নদীর খরস্রোত ছুটিয়া চলিয়াছে। বর্ষাশেষের নদী কূলে কূলে ভরা। স্রোতও প্রবল। তখন আর বেশী ভাবিবার সময় নাই। একে একে চারজন একটু নীচে নামিয়া গিয়া নদীতে লাফাইয়া পড়িল। অশ্বিনী খানিকটা দূরে গিয়া ডুব দিল। সমস্ত বাঁধানো নদীর কিনার ধরিয়া খানিকটা খানিকটা তফাতে থাকিয়া বাকি তিনজনেই ডুব দিল। কিন্তু কোন সন্ধান নাই। এমনি পাঁচ মিনিট গেল। চারজনের প্রত্যেকে এক এক বার মাথা জাগায় আবার ডুবিয়া

দেখে। অবশেষে নদীর ঠিক মাঝখানে শৈলেনের মাথা জাগিয়া উঠিল। বড় বড় চুলগুলি ঝাড়া দিয়া বীরদর্পে বলিল, 'ডুব সাঁতার দিচ্ছিলাম।'

সকলের দেহে প্রাণ আসিল। অশ্বিনী চটিয়া উঠিল, বলিল—একাবারে ডুব-সাঁতার দিলি না কেন হতভাগা। আবার উঠলি কেন?'

শৈলেন হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল,—'তোরা উঠে পড়্—আমি যাচ্ছি।' কথাটা সে যত সহজে বলিল, তত সহজে ঘটিয়া উঠিল না। উজান সাঁতরাইবার শক্তি তাহার আর ছিল না। ইহা বুঝিতে পারিয়া চারজনেই তাহার দিকে সাঁতরাইয়া চলিল। ব্রিজের থামের দিকে পাঁচজনেই তাহাদের অজ্ঞাতসারে ভাসিয়া চলিল। শৈলেন অবসন্নকণ্ঠে বলিল, 'নৌকো দেখ্, প'ড়ে গিয়ে বোধ হয় আমার চোট্ লেগেছে।'

অবশেষে একখানি চলতি ইলিশমাছ ধরা নৌকো দেখিয়া তাহাকে বখশিসের লোভ দেখাইয়া পাঁচজনেই উঠিয়া বসিল। মাঝি বলিল, 'কর্ত্তাবা, কোথায় যেতে হবে?'

ভিজা কাপড় চিপিতে চিপিতে পাঁচজনেই সমস্বরে বলিল, 'যেখানে খুশী।'

'সেটা কি একটা কথা হ'ল বাবা? আপনারা কোথা থেকে আসছ?'—মাঝি জিজ্ঞাসা করিল।

সকলেই পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। অবশেষে শৈলেন বলিল, 'তুমি যা'বা কদ্দূর কর্ত্তা?'

'আজ্ঞে মধুবনী।'

'মধুবনী! আচ্ছা, সেইখানেই যা'ব তোমার সঙ্গে।' তাহাই ঠিক হইল। ভিজা কাপড় নিংড়াইয়া যতদূর সম্ভব জল বাহির করিয়া সকলে তাহা শুখাইয়া লইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিল। দ্বিতীয় বস্ত্রের অভাব—সুতরাং তাহা সম্ভব হইল না। সেই অবস্থাতেই তাহারা মাঝির সঙ্গে গান জুড়িয়া দিল। সুনীল আর হেমকান্তির আড়ষ্ট জড়তা এতক্ষণে কাটিয়া গেল।

মধুবনী যখন তাহারা পৌঁছিল, তখন অনেক রাত্রি। মাঝিকে সব খুলিয়া বলিল এবং তাহারই ভাড়া কুঁড়েঘরে তাহারা রাত্রি কাটাইল। মাঝি তাহার শুকনো কাপড়-চোপড় ছোকরা বাবুদের জন্য আনিয়া দিল। রাত্রে সকলে মিলিয়া লাল চালের ভাত, ইলিশ মাছ ভাজা ও ঝাল সহ খাইয়া পরম আনন্দে কুঁড়েঘরের এক পাশে একখানি ছিন্ন কম্বলের উপর শুইয়া কাটাইয়া দিল। শৈলেনের পায়ের হাঁটুর কাছে খানিকটা ছিঁড়িয়া গিয়াছিল ইহা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই হয় নাই। রাত্রির বিশ্রামের পর ভোরে সে একটু সুস্থ বোধ করিতে লাগিল। হেমকান্তি তাহাকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, 'তুই কি ক'রে পড়ে গেলি শৈলেন?'

'ট্রলি উল্টে। ট্রলি আমাকে পাথর-ছোড়া ক'রে একেবারে জলের মধ্যে যেন ছুঁড়ে দিল। জলে পড়েছিলাম, তাই রক্ষে, নৈলে পাথরের উপর পড়লে আর দেখতে পেতে না—কারণ, সেই অবস্থায় জলে ও পড়তাম নিশ্চয়ই, পড়লে আর উঠতে পারতাম না।'

'খুব খুব বেঁচে গেছ।' তারপর তা'রা মাঝিকে কিছু বখশিস্ দিয়া মধুবনী হইতে বাহির হইয়া পড়িল। সবাই মালকোচা দিয়া কাপড় পরিয়াছে আর পার্শ্ববর্ত্তী কোনো গাছের ডাল ভাঙিয়া লইয়া এক এক গাছি লাঠি করিয়া লইয়াছে। এখন আর কাহারো মনে কোনো দ্বিধা সংশয় নাই। এইবার সত্যকার নিরুদ্দেশ যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে।

হেমকান্তির মনে আবার নূতন করিয়া ভয় দেখা দিল। সে বলিল, 'যদি পুলিশ পিছু নেয়?' শৈলেন বলিল, 'বলব আমরা অমুক গ্রাম থেকে অমুক গ্রামে যাচ্ছি—এতে আর এমন কি আছে?'

অমল বলিল, 'তখনকার ব্যবস্থা তখন হ'বে।'

তাহারা তো এইভাবে চলিয়াছে। তাহাদের পথে কত গ্রাম আসিল, গেল। দুই একজনে তাহাদের জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথা থেকে আসছ তোমরা—কোথায় যা'বে?' শৈলেন অগ্রবর্ত্তী হইয়া বলিল, 'আমরা অমুক গ্রাম থেকে আসছি, অমুক গ্রামে যা'ব।' তাহারা বিশেষ কিছু বলিল না। তবে, এই কথায় তাহারা ঠিক সন্তুষ্ট হইয়াছে কি না বুঝা গেল না।

অমলের ইচ্ছা ছিল, বেশ প্রস্তুত হইয়া অভিযানে বাহির হয়। জলের ফ্লাস্ক, ছোট ছোট লাঠি, প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিষ-পত্র লইয়া বেশ নিশ্চিন্ত আরামে পরমুখাপেক্ষী না হইয়া সুশৃঙ্খলভাবে যতদূর ইচ্ছা চলো—তাহার কোনো আপত্তি নাই। এই দীনভাবে পরের সন্দিহের পাত্র

হইয়া হয়ত যাওয়া যায়, কিন্তু মনে ততটা তৃপ্তি নাই। যাহাই হোক্ তাহারা চলিতে লাগিল। এইবার তাহারা এক বিশাল মাঠে আসিয়া পড়িয়াছে। দুপুরের প্রখর রৌদ্র। এই সময়টায় স্নানাহার সারিয়া তাহারা ইস্কুলে যায়। মাঠের সীমাহীনতা দেখিয়া তাহাদের কেমন যেন মনটা খুঁত্-খুঁত্ করিতে লাগিল। স্নানের জন্য ততটা চিন্তা নাই—যতটা আহারের জন্য।

অশ্বিনী বলিল, 'ডন্ কুইক্সো' পড়েছো? ভাবছি, তা'র মত একটা ক'রে গাধা যদি পাওয়া যেত।' সকলেই হাসিয়া উঠিল। অমল বলিল, 'মন্দ হ'ত না—যতদূর ইচ্ছা চলো। আমারও একটা ক'রে সোনার টুপি পেতে ইচ্ছে করে।'

'আমি ভাব্ছি, এরোপ্লেন হ'লে মন্দ হ'ত না।'—শৈলেন বলিল।

সুনীল বলিল, 'দূর ছাই, মাঠের কি শেষ নেই?'

হেমকান্তি বলিল, 'আর পার্‌ছি নে বাবা, এস খানিকটা বিশ্রাম ক'রে নিই।'

একটা বাব্‌লা-ঝোপের পাশে তাহারা বসিয়া পড়িল। কোথা' হইতে একটি স্নিগ্ধ হাওয়া বহিয়া আসিতেছে। শৈলেন উন্মনা হইয়া উঠিল। সে বলিল, 'তোরা একটু বোস্। আমি দেখে আসি, কাছাকাছি কোথাও পুকুর টুকুর আছে ব'লে মনে হচ্ছে।'—বলিয়া সে একটি লাঠি লইয়া পুকুর দেখিতে চলিল।

খানিকটা দূর গিয়া সে দেখিল, একটা প্রকাণ্ড দীঘি। দীঘিটি পুরাণো। তাহার বাঁধাঘাট ধ্বসিয়া গিয়াছে এবং তাহার কালো জলের উপর আশেপাশের নিবিড় নত বেণুবনের ঘনছায়া। একটু দূরেই একটি প্রকাণ্ড কলা-বাগান। মাঝে মাঝে এক-একটি দীর্ঘাকৃতি নারিকেল গাছ নিতান্ত উদাসীনের মত তাহার ঝিলিমিলি পাতার পানে আত্মহারা হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। দেখিলেই মনে হয়, এককালে এ অঞ্চলে লোকের বসতি ছিল। হয়ত কাছাকাছি এখনো আছে। কিন্তু পূর্বের মত সমৃদ্ধি এবং ঘনতা আর নাই। নিবিড় জঙ্গল। এ গ্রাম হইতে ও-গ্রামে যাইবার ধূলি-ধূসর পথ—তাহাতে গরুর গাড়ীর চাকার দাগ দেখা যায়। সেই পথের দুই ধারেই ঘন বন—কোথায় যে তাহার শেষ হইয়াছে, বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। শৈলেন সেই বাঁধা ঘাটের উপর দাঁড়াইয়া খুব জোরে জোরে কয়েকবার হাততালি দিল। ইহাই তাহাদের সঙ্কেত। বাকি চারজনে দৌড়াইয়া সেখানে নিমেষ মধ্যে চলিয়া আসিল।

তাহার পর দীঘির ঘনকালো জলে স্নানের আনন্দ। তাহার পর সেই বাঁধানো ঘাটের একপাশে বসিয়া এক কাঁদি পাকা কলা এবং ইঁট-ছুঁড়িয়া-পাড়া দুই একটা ঝুনা নারিকেল সহযোগে তাহাদের মধ্যাহ্ন ভোজনের সুখ। এইবার পাঁচজনেরই অভিযানের নেশা ধরিয়াছে। বাহিরে মধ্যাহ্নের রৌদ্র খরতর হইয়া উঠিল। আর তাহারা পাচজনে একটি গুলঞ্চ এবং শ্যামালতার ঝোপের নীচে স্তিমিত নয়নে পড়িয়া রহিল। অসংখ্য পাখী ডাকিতেছে—মৃদু মৃদু বায়ুহিল্লোল। প্রকৃতির এই বিচিত্র মাধুরী সিনেমা ওয়ালারা ধরিয়া লইয়া গিয়া বাহবা পায়। তাহারা সেইখানে শুইয়া শুইয়া সেই কথাই আলোচনা করিতে লাগিল।

হেমকান্তি বলিল, 'আমি যদি ঐতিহাসিক হ'তাম, তা'হলে ঘাটের ঐ ছোট ছোট সুন্দর ইঁট্‌গুলি নিয়ে গবেষণা কর্‌তাম। কি চমৎকার ইঁট্। আচ্ছা, তোমাদের কি মনে হয়? আমার ত মনে হয়, এ দীঘি নবাবী আমলের না হ'য়ে যায় না।'

অমল বলিল, 'দুই একটা গাছ দেখলেই বুঝ্‌তে পারো। দীঘির ও-পারের ঘাটে যে প্রকাণ্ড বটগাছ উঠেছে। ও কি আজকের?'

অশ্বিনী বলিল, 'কত আর হ'বে? ধরো পলাশীর যুদ্ধ হয় সতেরশ' সাতান্ন, সতেরশ' সাতান্ন আর আঠারশ' সাতান্ন—এক শ' বছর—এই ধরো উনিশ শ' আটত্রিশ—কত হয় হিসেব করো।'

শৈলেন বলিল, 'একশ' একাশি বছর। ঐ রকমই হ'বে।'

সুনীল বলিল, 'কত কাহিনী হয়ত জড়িত হ'য়ে আছে এই দীঘির সঙ্গে—কত শতাব্দীর ইতিহাস। কত অখ্যাতনামাদের কাহিনী।'

কেহই আর একথার প্রতিবাদ করিল না। সকলেই স্বপ্নজড়িত বিহ্বল দৃষ্টিতে সেই দীঘিটিকে দেখিতে লাগিল।

তাহারা মনে মনে কি ভাবিতেছিল কি করিয়া বলি? হয়ত তাহারা অতীত গৌরবের কথা, স্বপ্নময় ইতিকথার যুগে চলিয়া গিয়াছিল। দীঘির জলে হয়ত তাহারা প্রাচীন দিনের প্রস্ফুট পদ্ম দেখিতে পাইতেছিল। আর যাহারা সেই ঘন কালো জলের মধ্যে সেই পদ্ম তুলিতে আসিত, তাহারা কে, কোথায় থাকিত—এইপ্রকার প্রশ্ন হয়ত তাহাদের মনে উঠিতে লাগিল।

এমন সময় হঠাৎ সুনীল উঠিয়া দাঁড়াইল। কোথায় বাঁশী বাজিতেছে না। ঐ ত বাঁশীর সুর শুনা যায় ত। পাঁচ-জনেই উঠিয়া উৎসুক দৃষ্টিতে দীঘির ও-পারে চাহিয়া রহিল। কোনো কুলকিনারা পাইল না। অবশেষে বাঁশীর সুর তাহাদের দীঘির মায়া কাটাইয়া দিল। তাহারা উন্মুখ আগ্রহে সেই গরুর গাড়ীচলা ধূলিধূসর পথে নিবিড় বনের দিকে আগাইয়া চলিল।

[আগামী বারে সমাপ্য

সন্তোষ

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

কেন বন্ধু কর খেদ, চিত্ত কর নির্বিভেদ, ঐশ্বর্যে না কর দৃক্‌পাত,
ওই ছাখো ওই ছুটি, চলে ভিক্ষু গুটি গুটি, এ উহার ধরিয়াছে হাত।
অঙ্গ নাই রূপ কোথা? স্বাস্থ্য সেত রূপকথা। হস্তপদ কোনোমতে চলে,
স্বাদ গন্ধ রসহীন, নয়নের দৃষ্টিক্ষীণ, রসনায় কোনোমতে বলে।
নাসা মাত্র ছিদ্র ছুটী, হস্তে নাহি ধরে মুঠি, নিরঙ্গুল, অবশিষ্ট তালু
পথিকের কৃপাপরে একান্ত নির্ভর করে, পথিকেরা কদাপি কৃপালু।
এমনি ইন্দ্রিয়হীন, অন্ধখঞ্জ প্রতিদিন নয়নে পড়িছে অবিরত
তথাপি অশেষ আশা হায় তব সর্বনাশা, যত পাও তুমি চাও তত।
দরিদ্রের কুঁড়েঘরে, বরষার বারি ঝরে কোনোমতে যদি কাটে দিন
দেয় বহু ধন্যবাদ বিধাতার আশীর্বাদ মনে করে সর্বদুঃখহীন।
মর্মর-প্রসাদ-পুরে, ধনী মরে মাথা খুঁড়ে, বজ্রাঘাতে খসে যদি চূণ
অক্ষত শরীরে বাঁচে, তবু তৃপ্তি নাহি আছে, কহে বিধি নিতান্ত নির্গুণ!
সুনিপুণ কারিকরে, কত কারুকার্য 'পরে, কার্ণিশের গড়িয়াছে তোড়া
হায় তাই গেল খ'সে, বিধিমত তারা দোষে, বিধির বিধান আগাগোড়া।
গৃহে নাহি অন্নপাণি, পরিবার বস্ত্রখান নাহি যা'র সে নহে ভিক্ষুক
যা'র কাছে বহু আছে হায় তবু সে-ই যাচে নাহি ঘুচে অভাবের দুখ।
দেখ বন্ধু, খোলো আঁখি অগণিত পশুপাখী বিচরণ করে মহাসুখে
যতো গুণ ততো রূপ, অতি দুঃখে, রহে চুপ, তুমি কেন বিষাদিত মুখে?

মানুষের পূর্বপুরুষ
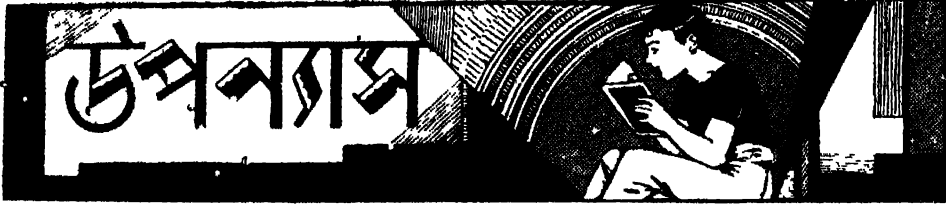
শ্রীনিধিরাজ হালদার

যদিও তাদের জীবন যাপনের ধারা ছিল সাধারণ তবুও তাদের জীবন ধারনের বাধা-বিঘ্ন ছিল বড় কম নয়। ভয়ে তাদের সর্বদাই শশঙ্কিত থাকতে হ'ত, কারণ সিংহ, চিতা-বাঘ, কুমীর, গণ্ডার, এমন কি রাক্ষুসে পাখীরাও তাদের জীবনকে ভয়াবহ করে তুলত। একটা ঘটনার উল্লেখ করলেই বুঝতে পারবে কেমন করে বেবি একদিন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষে পেয়েছিল। আগেই বলেছি আর সব গরিলারা বেবিকে স্নেহের চক্ষে দেখত। কেবল তাদের মধ্যে বেবিকে যে সবচেয়ে সন্দেহ করত সে সর্দার গরিলার ভালবাসায় ঈর্ষান্বিত হয়ে বেবিকে দেখলেই দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বিকট শব্দ করতে করতে তার দিকে তেড়ে যেত। তবে সর্দারের ভয়ে বেশী কিছু করা তার পক্ষে সম্ভব হ'ত না।

এমনি করে দিনের পর দিন চলে যায়। হঠাৎ একদিন সকাল বেলায় বেবি যখন খেলায় মত্ত সেই সময় সেই গরিলাটা হঠাৎ কি ভেবে বেবিকে তেড়ে গেল। তার ভীষণ মূর্তি দেখে বেবির ত' ভয়েই প্রাণ উড়ে গিয়েছিল। প্রাণ ভয়ে দৌড়তে দৌড়তে সামনে একটা লম্বা গাছ দেখে বেবি তাড়াতাড়ি তার মগডালে গিয়ে উঠল একেবারে। গাছের এবড়ো-খেবড়ো ছালের ঘষড়ানিতে তার হাত পা কেটে ক্ষত বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। সারা শরীরটা রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছিল। আগডালে উঠে বেবি ভাবলে এই পল্কা ডালে গরিলাটা তার ভারী শরীর নিয়ে কখনই উঠতে পারবে না। কিন্তু, গরিলাটা যখন বেবিকে ধরতে পারলে না তখন রাগ তার বেড়ে গেল আরও। দু'হাতে সে গাছের গুঁড়িটাকে জড়িয়ে ধরে বেশ করে নাড়া দিতে আরম্ভ করলে। সে চাইছিল বেবিকে গাছ থেকে ফেলে দিতে। ভয়ে বেবি প্রাণপণে গাছের ডাল জড়িয়ে ধরে ভগবানের নাম স্মরণ করতে লাগল। ভাগ্যগুণে বেবিকে সে যন্ত্রণা বেশীক্ষণ কিন্তু ভোগ করতে হয় নি। কোথা থেকে সর্দার গরিলাটা ঝড়ের মত ছুটে এসে ভয়ঙ্কর এক চিৎকারে বনটাকে শুধু কাঁপিয়েই তোলেনি সারা বনের পশু পাখীর মনে এক আতঙ্কের সৃষ্টি করে দিল। সে ডাক যে না শুনেছে সে কিছুতেই ধারণা করতে পারবে না কি ভয়ানক গর্জন সে। যে গরিলাটা বেবিকে আক্রমণ করেছিল সে সর্দারের সেই ভীষণ আওয়াজ শুনে যেই তাড়াতাড়ি করে পালাবার উপক্রম করছে অমনি সর্দার গরিলাও ছুটে গিয়ে তার টুঁটি চেপে ধরলে। লেগে গেল দু'জনে লড়াই। দু'জনেই ক্ষত বিক্ষত হ'ল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সর্দারের কাছে হার মেনে বেবির শত্রু সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

সেইদিন থেকে বেবির মনে সর্দার গরিলার ওপর সত্যিকারের শ্রদ্ধা এল। সে ভাবতে পারেনি কেমন করে গরিলা সর্দার একটা মানুষের জন্যে তারই জাতের আর একজনকে বিহিমত শাস্তি দিতে পারে। মানুষের জীবনে এ রকম ভালবাসা বিরল বললে অত্যুক্তি হবে কি? সর্দার গরিলা সেইদিন থেকে বেবিকে চোখের আড়ালে একটুও থাকতে দিত না। এমন কি সে নিজের বৌ, ছেলেপুলেকে পর্যন্ত ছেড়ে বেবির সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বেড়াত। তার নিজের জাতের ওপর সর্দার গরিলাটা এমন বিরূপ হয়ে উঠেছিল যে অন্য কেউ সামনে এলেই রেগে উঠে তাকে তাড়া করত, আর বেবিকে নিজের কাছে ধরে রাখত। তার যেন ভয় হ'ত যদি বেবি তাকে ছেড়ে অন্য কোথাও পালিয়ে যায়।

মানুষের জীবনে যা' ঘটেছে বলে শোনা যায় না, আর বেবির জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা যেটা সেই অভাবনীয় ঘটনাটা না ঘটলে তার আফ্রিকার জঙ্গলের জীবনকাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে গরিলা সর্দারের শক্তি ক্রমেই কমে আসছিল বলে তাকে আর কেউই তেমন শ্রদ্ধা বা ভয় করত না বড়। অবশ্য এ কথা মানুষ মাত্রেই জানে যে শক্তিশালী চিরকালই বলহীনের ন্যায্য অধিকারকে অগ্রাহ্য করে থাকে। যাক্, অন্যান্য গরিলারা যাই করুক না কেন, বেবি কিন্তু তার একমাত্র বন্ধুকে অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞা করত না মোটেই। আর সর্দার গরিলাও তা' বুঝত বলেই বেবিকে ভালবাসত অত।

সারাদিন ঘুরে ঘুরে বেবির শরীরটা সেদিন এত অবসন্ন হয়ে পড়েছিল যে, সে আর একটুও চলতে পারছিল না। তাই বিশ্রামের জন্যে এক জায়গায় একটু বসতেই বেবি তন্দ্রাভিভূত হয়ে পড়ল। কিন্তু নিরালা বনে একলা ঘুমিয়ে পড়া কি রকম বিপজ্জনক তা' বুঝত বলেই বেবি কিছুতেই ঘুমুতে পারছিল না। তন্দ্রার সঙ্গে যুদ্ধ করছিল। এই অবস্থায় হঠাৎ সে অনুভব করলে কে যেন দু'হাতে তাকে তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরছে! চোখ চেয়েই বেবি দেখতে পেলে বুড়ো গরিলাটা তাকে বুকে চেপে ধরেছে। যদিও সে ঐ সর্দার গরিলাটাকে চিনত তবুও তার সেই আচরণে বেবি বিস্মিত হয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে গরিলাটার কাণ্ড দেখতে লাগল। গরিলাটা বেবিকে তুলে নিয়ে নিজের কোলের ওপর শুইয়ে রেখে পা দুটো নাড়াতে লাগল, আর আস্তে আস্তে মাথায় পিঠে চাপ্ড়াতে লাগল। ঠিক যেন মায়ে নিজের ছেলেকে আদর করছে, ঘুম পাড়াচ্ছে।

তার সেই গভীর ভালবাসার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়ে কৃতজ্ঞতায় বেবির প্রাণ ভরে উঠল। সে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাল। যখন চোখ চাইলে তখন বেবি দেখলে গরিলাটার দুই চোখ জলে ভরে গিয়েছে। [ক্রমশঃ

ছেলে বুড়া

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

তোমরা কচি, তোমরা কাঁচা, আনন্দ মুকুল,
আমরা হলাম বৃন্ত শিথিল ঝরার আগের ফুল।
তোমরা প্রভাত, আমরা যে সাঁঝ,
আমরা বিরাম, তোমরা যে কাজ,
তোমরা হলে সত্য খাঁটি, আমরা নেহাৎ ভুল।

তোমরা আনো আশার আলো, অরুণ মনোহর,
আমরা ঢাকি ডুবুডুবু সায়াহ্ন ভাস্বর।
সঙ্গীতে যে তোমরা মধু,
স্বরলিপি আমরা শুধু,
তোমরা কায়া, আমরা ছায়া, ছায়ার কি আর দর?

তোমরা বৃহৎ, তোমরা মহৎ, হতেই ত পারো,
আমরা ত জোর 'পন্পী', না হয় 'মহেঞ্জোদারো'।
তোমরা আষাঢ়, আমরা যে মাঘ,
দিল্লী তোমরা, আমরা প্রয়াগ,
জ্যোতির্লেখা—অস্তাচলের ধার নাহি ধারো।

তোমরা লাটিম বক্ষভরা ঘূর্ণনেরি আশ,
খেলা শেষে পরিত্যক্ত আমরা মলিন তাস।
সমর ঘোটক যাচ্ছো চলে,
আমরা আছি 'পিঁজরা পোলে'
তোমরা মরাল, ভগ্নপাখা আমরা যে রাজহাঁস।

তোমরা রাজীব তোমরা সজীব, আমরা ত চিত্র,
পরপারের যাত্রী, ঘাটেই জাগছে বহিত্র।
গেলাম যাহার ভিত্তি পাতি,
সৌধ গড় তোমরা গাঁথি,
তোমরা হবে দেশের দশের যুগেরি মিত্র।

বাঙলা-সাহিত্য পরিচয়

অধ্যাপক শ্রীতারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম্-এ

শিবায়ন

মোহেঞ্জোদড়োতে ভূগর্ভ খননের ফলে যে সকল দ্রব্যাদি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে সেখানে খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০-৩০০০ অব্দে এক উন্নত, সুসভ্য জাতি বাস করিত। বস্তু-প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া ইহাদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, ধর্ম-কর্ম, প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছু স্পষ্ট ধারণা করা যাইতে পারে। অনেকে মনে করেন যে ভারতবর্ষের এই আর্য-পূর্ববর্তী জাতির সহিত ঋগ্বেদের আর্যগণ পরিচিত ছিলেন। তাঁহারা যাহাদিগকে কৃষ্ণগর্ভ, অনাস, দাস এবং দস্যু বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তাহারাই সে-সময়ে মোহেঞ্জোদড়োতে বাস করিত। ইহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখা হইত। ইহাদের ধর্ম আর্য-ধর্ম হইতে বিভিন্ন, কারণ ইহাদিগকে অন্যব্রত বলা হইয়াছে।

মোহেঞ্জোদড়োতে যে-সকল মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে একটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাতে একটি ত্রি মুখ, ত্রি-নেত্র মূর্তি এক বৃক্ষতলে উপবিষ্ট, তাহার মস্তকে তিনটী শৃঙ্গের মুকুট এবং চারিপাশে বিবিধ প্রকারের পশু বিরাজ করিতেছে। এই মুদ্রা হইতে সকলে অনুমান করিয়াছেন যে সেখানে এমন একটি দেবতার পূজা হইত যাঁহাকে পরবর্তী শিবের বা পশুপতির পূর্বাভাস বলা যাইতে পারে। কাজেই, শৈব-ধর্মের মূল আমাদিগকে মোহেঞ্জোদড়োর ধ্বংসস্তূপে লইয়া যাইতেছে।

প্রকৃতির মধ্যে যে ধ্বংসের লীলা, ঝড় ঝঞ্ঝার প্রবল প্রকোপ, তাহা কোনও দেবতার ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে অনুমান করিয়া ঋগ্বেদে তাঁহাকে রুদ্র নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ইনি শান্ত থাকিলে প্রকৃতিও শান্ত থাকিয়া আমাদের মঙ্গল করেন বলিয়া ইনি-ই শঙ্কর, শম্ভু, শিব। পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে এই দেবতা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রুদ্রমূর্তি ধারণ করিলে সৃষ্টি লয়প্রাপ্ত হইবে এবং তুষ্ট হইলে জগতের অসীম কল্যাণ সাধিত হইবে।

"বৈদিক আর্যজাতির সহিত মোহেঞ্জোদড়োর আর্যেতর অথবা অনার্য জাতির সংঘর্ষ ও সংমিশ্রণের ফলে বৈদিক সভ্যতার সকল স্তরেই পরিবর্তন দেখা যায়। এই পরিবর্তনের ফলে মোহেঞ্জোদড়োর (পশুপতি)-মুদ্রায় চিত্রিত দেবতার সহিত বৈদিক রুদ্র-শিবের সামঞ্জস্য সাধিত হইয়া পৌরাণিক এবং লৌকিক শিবের সৃষ্টি হইয়াছে। এরূপ অনুমানের কারণ এই যে, শিবের কাহিনীতে দুইটি স্পষ্ট বিপরীত চরিত্র-ধর্মের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাদের একটি আর্য এবং অপরটি অনার্য-ধর্ম হইতে আসিয়াছে। আর্যদের ধর্ম ধ্যান-ধারণা, যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহাতে কঠোর সংযমের প্রতি নির্দেশ রহিয়াছে। কিন্তু অনার্যদিগের ধর্মসম্বন্ধে ঋগ্বেদে কটূক্তি করা হইয়াছে। ইহাদিগের ধর্ম ইন্দ্রিয়ের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া মন-প্রাণ দিয়া প্রকৃতির সহজ ও স্বাভাবিক গতি-প্রবৃত্তিকে প্রত্যক্ষ করা। "আর্যেরা ছিল মনোধর্মী অর্থাৎ চিন্তাশীল, আদর্শবাদী, তত্ত্বানুসন্ধিৎসু, সংযমনিষ্ঠ ও অধ্যাত্মপরায়ণ। আর অনার্যেরা ছিল প্রাণধর্মী অর্থাৎ ক্রিয়াশীল, বাস্তববাদী, ভোগলিপ্স ও দৈবনিষ্ঠ। আর্য ও অনার্যের দেবতা যখন এক হইয়া গিয়াছে তখনও, সেই দেবচরিত্রে আর্য ও অনার্যের বিশিষ্ট ভাবধারার ছাপ পাশাপাশি রহিয়া গিয়াছে। শিব যখন মনোধর্মী আর্যের দেবতা তখন তিনি যোগীশ্রেষ্ঠ, সতীপতি, উমাধব, আর যখন তিনি প্রাণধর্মী অনার্যের দেবতা তখন তিনি ভোলানাথ, গঞ্জিকা ধুস্তুরসেবী, উচ্চ নীচ ভেদহীন, আভিজাত্য গর্ববিরহিত।"

শৈবধর্মকে প্রাচীনতম লোকধর্মের অন্যতম বলা যাইতে পারে। কাজেই বাঙলা-সাহিত্যেও শৈবধর্ম লইয়া গ্রন্থ-

রচনা সর্বাগ্রে হইয়াছিল বলিতে হয়। এই সাহিত্যের কোনও প্রমাণ আমরা পাই নাই, তবে ইহা অনুমান করিবার মত দু'একটি উপাদান আছে। এখানে 'ধান ভানতে শিবের গীত' প্রবচন এবং 'শিব ঠাকুরের বিয়ে হচ্ছে তিন কন্যে দান'—ছড়ার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সকল রচনা কিরূপ ছিল তাহা জানিবার উপায় নাই, তবে এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে যে ইহারা অনার্য-ধর্মী লৌকিক কাহিনী লইয়াই রচিত হইয়াছিল।

শৈবধর্ম লইয়া বাঙলা মঙ্গল কাব্যের যে শাখা গঠিত হইয়াছে তাহাকে শিবায়ন বলা হয় (শিব+অয়ন=যাহা হইতে শিবের জ্ঞান অধিগম্য হয়?)। শিবায়ন-গ্রন্থ সকল যে-সময়ে রচিত হইয়াছিল তখন বাঙলা দেশ পুরাণ-প্রভাবিত ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম-শাসিত। তাই ইহাদের মধ্যে শিবের ঐ দুই প্রকার বিভিন্ন-ধর্মী চরিত্রের সমাবেশ দেখা যায়। দুই প্রকার কাহিনীর পার্থক্য এত প্রকট যে ইহাদের মধ্যে কোনও সামঞ্জস্য সাধিত হইতে পারে না। ইহারা কেবল ইহাদের উৎপত্তির দুইটি উৎসের কথাই সপ্রমাণ করিয়া দেয়।

মজার খেলা
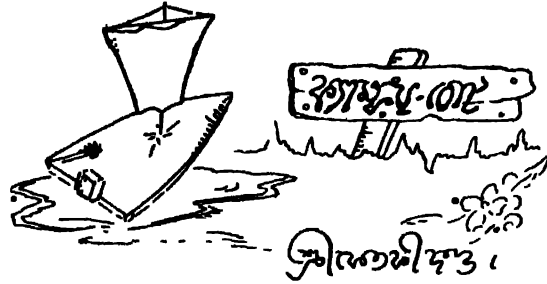
খুব ছোট্ট দু'ইঞ্চি কি আড়াই ইঞ্চি একটা পিস্‌বোর্ড থেকে রেসিংবোটের ছাঁচে একটুক্‌রো কেটে নাও।

এখন ওর মাথার দিকে একটু পেছনে সোজা দেখে একটা দেশলাই কাঠি মাস্তুল হিসাবে খাড়া করে, পালের মত করে খানিকটা কাগজ লাগিয়ে দাও।

একটা কর্পূরের টুকরো (camphor) লুডোর ছকের ঘুঁটির মত চৌকাস করে কেটে, তোমার বোটের পেছনে ঠিক মাঝামাঝি একটা খাঁজ কেটে কর্পূরটা এমন ভাবে বসিয়ে দাও, যাতে তার অর্ধেক বোর্ডের তলায় থাকে।

এসব হয়ে গেলে, একটা এনামেলের গামলায় অল্প গরম জল এনে, নৌকাটা ছেড়ে দাও, কর্পূরটা গলে হিস্ হিস্ শব্দ করতে করতে নৌকাটাকে খানিকক্ষণ ছুটিয়ে নিয়ে যাবে।

সাবধান যেন একটুও তেল কোথাও না লাগে,—তাহলে কিন্তু কিছু হ'বে না।

পরম্পরা

শ্রীরাধারাণী দেবী

গৃহস্থবাড়ীর শাশুড়ী আর বৌ।

বৌটি ছেলেমানুষ। ঘোমটা টেনে সারাদিনই সংসারের কাজকর্ম করে।

শাশুড়ীই সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী, কিন্তু মানুষটি ভারি ঠাণ্ডা। স্বভাবটি খুব চাপা। কৃপণ প্রকৃতি, সহজে অন্যকে খেতে দিতে নারাজ অথচ চক্ষুলজ্জাটিও আছে। গুণের মধ্যে তাঁর পরমগুণ, মুখের কথাগুলি স্নিগ্ধ মিষ্টি। কখনো কাউকে চড়াকথা বলতে পারেন না।

কর্তা বলেন, এমন লক্ষ্মী সুগৃহিণী সংসারে বড় দেখা যায় না।

ছেলে বলে, আমার মায়ের মত আদর্শ-মা কারুরই নেই।

শুধু বৌটি শাশুড়ী সম্বন্ধে মন্তব্য করেনা কখনো।

কৃপণ শাশুড়ী বৌটিকে বারোমাস আধপেটা খেতে দেন। বৌয়ের পাতে ভাত দেবার সময়ে আপন মনেই বলেন—

টাকা যা' আনেন কর্তা তায়'
জমিদারের খাজনায় যায়।
ঘরের চালে খড় ছাওয়াতে
বলদ জোড়ার জাব্ খাওয়াতে
ছেলের রোজগার সব ফুরায়॥

হিসেবীগিন্নী তাই প্রতিদিন আমি জোগাই অন্ন।
পারতোনাকো চালাতে এমন, যে-কোনও মেয়ে অন্য।

বৌ কিছু বলেনা। হেঁটমুখে আধপেটা খেয়ে ক্ষিদে নিয়ে রোজ উঠে যায়।

২

গেরস্থর সব্জীবাগানে সে বছর বরবটী আর সিম এত ফলেছে যে, গরু বাছুরেরও যেন খেতে অরুচি ধরে গেছে।

সুগৃহিণী শাশুড়ী করলেন কি, সমস্ত পাকা সিম আর ঝুনো বরবটী গাছ ঝেড়ে পাড়িয়ে বৌমাকে দিয়ে তার বিচিগুলি বের করে রৌদ্রে শুখিয়ে ভাঁড়ারে তুলিয়ে রাখালেন। সিম-বরবটীর শুখনো খোলাগুলি উনানে জ্বালানী করলেন।

না খেতে পেয়ে বৌটি দিন দিন ক্রমশঃই রোগা হয়ে যাচ্ছে। শাশুড়ী চাল বাঁচাবার ফন্দী করে বৌকে ভাতের বদলে রোজ সেই শুখনো বরবটী আর সিমের বিচি সিদ্ধ করে খেতে দিতে লাগলেন। বললেন—

"চাউল সিদ্ধর চেয়েও ভাল বরবটী সিম সিদ্ধ।
শীর্ণ শরীর হয় মোটা আর বয়স হয় না বৃদ্ধ॥

স্বামী শ্বশুর মনে করেন, সত্যই বুঝি তাই হয়। বৌ ক্ষিদের জ্বালায় বাধ্য হয়ে ঘোমটার আড়ালে চখের জল ফেলতে ফেলতে সেই অখাদ্যগুলি কষ্টেসৃষ্টে খায়। এমনি করে দিন কাটে।

অগ্রহায়ণ মাস। ঘরে ঘরে নবান্ন উৎসব। শাশুড়ী আর বৌ একসঙ্গে খেতে বসেছে। দু'টি পাথরের খোরায় দু'জনের নবান্ন মাখা রয়েছে। এমন সময়ে বৌয়ের স্বামী এসে সখ্ করে মায়ের খোরা থেকে এক গ্রাস নবান্ন তুলে নিয়ে মুখে পুরল। সেটা খাওয়া হলে স্ত্রীর খোরা থেকেও একগ্রাস নবান্ন তুলে খেয়ে দেখল। তারপরে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল, হ্যাঁ মা, খেয়ে দেখলাম, তোমার নবান্ন

মাখা হয়েছে সুগন্ধি নতুন চাল, নতুন খেজুরে গুড, মর্তমান কলা আর ঘন ক্ষীরে। কিন্তু বৌয়ের নবান্ন ভিজে ক্ষুদ, বিচেকলা আর পিটুলি গোলায় মাখা।

তবে কি তুমি বৌকে কষ্ট দাও নাকি?

শাশুড়ী বলে উঠলেন, ষাঠ্‌! ষাঠ্‌! কী যে বলিস বাছা। আমার কত সাধের কত দুঃখের বৌ! আমার একমাত্তর ছেলের একটামাত্র বৌ। বড়ো ভাগ্যের সামিগ্রী। তাঁকে কখনো কষ্ট দিতে পারি আমি? তবে—কি জানিস বাছা! সংসারে সব কিছুরই একটা আয় পয় আছে।

যার যেমন পয়-অপয়
তার কপালে তেমনি হয়।
একই থালে মাখা নবান্ন
আমার ভাগ্যে ক্ষীর-পরমান্ন।
বৌয়ের ভাগ্যে পিটুলী ক্ষুদ।
পয় আর অপয় কী অদ্ভুত॥

ছেলে মনে করলে, তাই বুঝি হবেও বা। বৌ অপয়া বলেই এমন ঘটেছে।

মা যে তার সুশীলা লক্ষ্মী, কে আর না জানে?—

৩

অনেক বছর কেটে গেছে।

কর্তা গেছেন মারা। শাশুড়ী হয়েছেন বুড়ো আর অন্ধ। ছেলে অর্থ উপাজন করতে দূর বিদেশে চলে গেছে। মাঝে মাঝে ছুটী পেলে বছরে দুই একবার বাড়ী আসে। বৌ-ই এখন সংসারের গিন্নী।

বৌটির স্বভাব ঠিক শাশুড়ীরই মতন হয়েছে। তেমনি মিষ্টি হাসি, সবাইকে মিষ্টি কথা, শান্ত স্বভাব। পাড়া প্রতিবেশী সকলে বলে—লক্ষ্মী শাশুড়ীর লক্ষ্মী বৌ বাপু! অন্ধ শাশুড়ীকে বউ নিজের হাতে গ্রাস তুলে খাইয়ে দেয়। অন্যের হাতে দিয়ে তার মন নিশ্চিন্ত হয় না। বৌয়ের শাশুড়ী সেবা দেখে গ্রামের লোক ধন্যধন্য করে।

কিন্তু অন্ধ শাশুড়ীর অর্ধেকও পেট ভরে না বৌ হাতে মেখে যা মুখে তুলে দেয়। অর্ধেক দিন ভাতের বদলে দেয় ফেন্‌। খাওয়াতে খাওয়াতে খুব মিষ্টি করে হেসে হেসে বলে—

তোমার ছেলের যা রোজগার
তার কথা মা তুলোনা আর।
নুন আনতেই পান্তা ফুরায়
গলা ভেজেনা পানি।
ডাইনে টানলে বাঁয়ে কুলোয় না
ভাঁড়োতে মা-ভবানী॥

শাশুড়ী মনে মনে সবই বোঝেন। নিজের নিরুপায় অবস্থা বুঝে চুপ করে থাকেন।

ছেলে বিদেশ থেকে বাড়ী এলে শাশুড়ী একদিন ছেলেকে কাছে ডেকে বললেন,—বাবা, বুড়ো হয়েছি। শরীর দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে। রাত্রে আমাকে অন্য কিছু খেতে না দিয়ে যদি পোয়াটাক সন্দেশ কিংবা ছানার ব্যবস্থা করে দিয়ে যাও, তাহলে আমার খেতেও ভাল লাগে আর শরীরে বল হয়।

ছেলে তৎক্ষণাৎ ময়রাকে ডেকে পাঠিয়ে ব্যবস্থা করে দিতে গেল মায়ের জন্য প্রত্যহ একপোয়া করে টাটকা সন্দেশ যেন দিয়ে যায়।

বৌ শুনতে পেয়ে ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসে স্বামীকে বাধা দিয়ে বললে,—ওমা সে কি! আমি থাকতে মা ময়রার দোকানের সন্দেশ খাবেন? আমি তবে রয়েছি কি জন্যে? নিজের হাতে ঘরের গাইয়ের দুধ দুয়ে, নিজের হাতে নরম আঁচে ছানা কাটিয়ে, নিজের হাতে সরেস সন্দেশ তৈরী করে দেব। ময়রার সন্দেশ—সে তো শুধু চিনির ডেলা আর বাসি ছানার চটকানি।

ছেলে খুব খুসি হয়ে বললে, তবে তাই ভালো।

বৌ দু'দিন শাশুড়ীকে একটু করে সন্দেশ খাইয়ে তারপরে করলো কি, মানকচু পুড়িয়ে বেশ করে ঠেসে সন্দেশের আকারে পাকিয়ে রেকাবিতে সাজিয়ে রাখতে লাগল। ছেলে রোজই দেখে খুসি হয়ে ওঠে—বৌ সান্ধ্যবেলা রান্নাঘরে নিজের হাতে ছানা ঠাসছে, সন্দেশ তৈরি করে শ্বেত পাথরের রেকাবে সাজাচ্ছে মায়ের জন্য।

রাত্রি বেলায় শাশুড়ীকে খাওয়াতে বসে বৌ মিষ্টি গলায় বলে—মাগো,—

খাসা ছানার অধিক ভালো পোড়াকচু খাসা
অন্ধ চোখে দৃষ্টি আসে, খিদেও বাড়ে খাসা

শাশুড়ীর মনে পড়ে যায়, শীর্ণ রোগা বৌকে সে এমনি যুক্তি দেখিয়েই সিম্‌বিচি সিদ্ধ গিলাইয়েছিল একদিন।

৪

দিন যায়—বছর কাটে।

বৌ ইদানীং শাশুড়ীকে আর ভাত মোটেই দেয় না। চাল ডালের ক্ষুদ কুঁড়ো নষ্ট হয় বলে সেইগুলিই সিদ্ধ করে শাশুড়ীর খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। তাও অন্ধের সামনে ফেলে দিয়ে চলে যায়, খাওয়া হল কি হলনা চেয়ে দেখে না। অন্ধ শাশুড়ীর খাবারের পাতের একপাশে বেড়াল এসে মুখ দেয়, অন্য পাশে কাক এসে ঠোকর দেয়। শাশুড়ীর ঘরে শাশুড়ী কোনোদিন চালের ক্ষুদ কোনো দিন বা ডালের কুঁড়ো খেয়ে দিন কাটায়, বৌ কিন্তু নিজের ঘরে বসে খায় মাছের মুড়া, পিঠা পরমান্ন।

একদিন ছেলে বিনা খবরে হঠাৎ এসে পড়েছে বিদেশ থেকে। এসে দেখে, মায়ের ঘরে অন্ধ মা হাতড়ে হাতড়ে খাচ্ছেন কুঁড়ো সিদ্ধ—এদিকে বৌয়ের ঘরে বসে বৌ খাচ্ছে মাছের মুড়ো, পিঠা পরমান্ন।

ছেলে আশ্চর্য হয়ে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলে,—এ কি কাণ্ড দেখছি? তুমি কি তবে আমার বুড়োমাকে কষ্ট দাও নাকি?

বৌ খুব স্নিগ্ধ গলায় মিষ্টি হেসে বললে, তুমি কি পাগল হয়েচ? তুমি থাকো বারোমাস বিদেশে। সংসারে আপন-জন বলতে এক ঐ মা ছাড়া আমার আর কে আছেন বলো তো? তবে কি জানো,—

সধবা নারীর কল্যাণ চাই তো।
বিধবার মুখ দেখিনা তাই তো।
মাছের মুড়ো আমি না খেলে
মরবে যে বাপু ওনারই ছেলে।
তাইতো ওনাকে খাইয়ে কুঁড়ো
অনিচ্ছায় মুখে তুলি এ মুড়ো॥

ছেলে মনে করলে, কি জানি, তাই হবেও বা। মায়েরই ভালোর জন্যই বৌ এই ব্যবস্থা করেছে। স্ত্রী যে তার সুশীলা, লক্ষ্মী,—এ কে আর না জানে॥

শরতের মেঘ

শ্রীগোরা মুখোপাধ্যায়

ওরে হাল্‌কা মেঘের দল!
কোন্ সে দেশের পানে এমন ছুটিস্ অবিরল?
কার তরে আজ নীল সায়রে ভাসালি তোর নাও,
ছড়িয়ে পেঁজা তুলোর রাশি হাওয়ায় উড়ে যাও।
দেশ বিদেশে ঘুরে ঘুরে
যাবি কি শেষ হিমের পুরে
যেথায় কেবল কুজ্ঝটিকা কেবল তুষারজল।
চলিস্ বেগে ছাড়িয়ে বিশাল তেপান্তরের মাঠ,
পাহাড় সারির কোলটি ঘেঁসে ছাড়িয়ে গাঁয়ের হাট।
ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমীতে
গান গেয়ে যায় হরষচিতে
কাণ না দিয়ে সেই গানে ধাস্ অস্থির চঞ্চল।
কার লাগিরে ছুটিস্ তুলে হাল্‌কা ধবল পাল।
কার স্বপনে সন্ধ্যা সকাল হস্‌রে এমন লাল।
এগিয়ে চলিস্ সমুখপানে
কোন্ দেবতার পরম টানে
কে আছে ওই আকাশে ভাই, কোন সে ঠাকুর বল
ওরে শুভ্র মেঘের দল।

আধুনিক মুসলমান মনীষী

যামিনীকান্ত সেন এম-এ, বি-এল

আধুনিক মুসলমান জাগরণ নানাদিকে আত্মপ্রকাশ করছে। উচ্চশিক্ষা, রাজনীতি, যুদ্ধক্ষেত্র, সাহিত্য ও শিল্পে মুসলমান প্রগতি অব্যাহতভাবেই চল্‌ছে। তা'তে করে নূতন নেতা সৃষ্ট হচ্ছে নানাদেশে। শুধু রাজাদের ইতিহাস এযুগের ইতিহাসের শেষকথা বহন করে না। যাদের রাজ-মুকুট নেই তাদের শক্তিই এযুগে অসামান্য।

চীনদেশে উপর্যুপরি যুদ্ধবিগ্রহে যে কয়েকটি সেনাপতি মাতৃভূমির জন্য আত্মোৎসর্গ করে খ্যাতি লাভ করেছেন, অনেকে শুনে' বিস্মিত হবেন যে তার ভিতর একজন মুসলমান সেনাপতিও প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। তাঁর নাম হচ্ছে সেনাপতি মুয়াজিম হোসেন বা মাহ্‌ চান্‌ সান্‌। গতযুগে তাঁর নাম খুবই প্রচারিত হয়। অনেকেরই জানা নেই চীনদেশে অনেক মুসলমান আছেন—কিন্তু, জাতি হিসেবে তাঁরা নিজেদের চৈনিক বলেই পরিচয় দেনে। ভারতীয় মুসলমানদের ন্যায় তাঁরা কোনোদিনই নিজেদের আগে 'মোসলেম' পরে চৈনিক বলেন না। তাঁদের প্রবল স্বদেশহিতৈষণা ভারতীয় মুসলমানদের অনুকরণীয়।

এযুগে সমগ্র পৃথিবীতে হিজ্‌ হাইনেস্‌ সার্‌ আগাখাঁর নাম প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। আগা খাঁ উপস্থিত ভারতবাসী হলেও তাঁর পিতামহ ছিলেন পারস্যের অধিবাসী। পারস্য সম্রাট ফতেআলী সার সময় আগা খলেলুল্লা খাঁ কারমান প্রদেশের শাসক ছিল। আগা খলেলুল্লাখাঁর পুত্র আগা হোসেন খাঁ পিতার মৃত্যুর পর তাঁর পদ লাভ করেন।

এঁরা ইসমাইলি মুসলমানদের গুরু স্থানীয়। খোজা সম্প্রদায় এই সম্প্রদায়েরই শাখা। এরা প্রত্যেকেই নিজেদের আয়ের কতেক অংশ আগা খাঁকে দিয়ে থাকেন। এই অংশকে জাকৃকত বলা হয়।

মুয়াজিম হোসেন

মহাম্মদ সাহ যখন পারস্যের সম্রাট হন তখন আগা হোসেন খাঁকে সৈনিকদের সেনাপতি করা হয়। কারণ আগা খাঁর সাহায্যেই ইনি সম্রাট হ'ন। এর পর আগা খাঁ আবার সম্রাট মহাম্মদ সাহেব বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। তাঁকে পরাজিত ও বন্দি করা হয় কিন্তু পরিশেষে মাপ

করা হয়। তিনি ভারতবর্ষে এসে পড়েন। এখানে তিনি ইংরাজরাজকে নানাভাবে সাহায্য করে "হিজ হাইনেস্" উপাধি ও গভর্নমেণ্টের পেনসন পান।

পিতার মৃত্যু কালে আগা খাঁর বয়েস ছিল মাত্র দশ বৎসর। তিনি বিলেতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। তাঁর

সার আবদুর রহিম

শিষ্যেরা পারস্যোপসাগর আফ্রিকা এবং অন্যত্রও আছে। বিলেতে সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া আগা খাঁকে উইণ্ডসর প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করেন।

১৯১০ খ্রীঃ তিনি নবাব মোহসিন মুলুকের সহায়তায় আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং এজন্য ত্রিশলক্ষ টাকা সংগ্রহ করেন। মুসলমানদের প্রধান রাষ্ট্রীয় সমিতি **"All India Muslim League"** তিনিই স্থাপন করেন। তিনি গভর্নমেণ্টের বিশেষ পক্ষপাতী। যখন হার্ডিঞ্জ বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ বিধি প্রত্যাহার করেন তখন আগা খাঁ গভর্নমেণ্টের স্বপক্ষে মন্তব্য করেন। তিনি ১৯৩০-৩১ সালে গোলটেবিল বৈঠকে ভারতীয় প্রতিনিধিদের সভাপতিরূপে উপস্থিত হন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে **World disarmament Conference**এ ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জেনেভাতে লীগ অফ্ নেশন্স্ এর সভায় সভাপতিত্ব করেন। এত বড় সম্মান ভারতের আর কেউ পায়নি। তিনি **India in transition"** নামে একখানি বই লিখেছেন। বিলাতের ঘোড়-দৌড়ে বিখ্যাত ডার্বি দৌড়ে তাঁর ঘোড়া তিনবার জয়লাভ করে ১৯৩০, ৩৫ ও ৩৬ খ্রীষ্টাব্দে। বিলাতে এটা একটি খুব বড় সম্মান। ইনি অধিক বয়সে একজন ফরাসী মহিলাকে বিবাহ করেছেন।

সম্প্রতি ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান আইন সভার সভাপতি হয়ে সার আবদুর রহিম যশস্বী হয়েছেন। ভারতবাসীর পক্ষে এ সম্মান সামান্য নয়। সার আবদুর রহিম বাঙ্গালা দেশের লোক। তিনি কিছুকাল মাদ্রাজের হাইকোর্টে জজ ছিলেন। পরে বাঙ্গালাদেশে এসে নানাকাজে আত্ম-নিয়োগ করেন। ভারতের প্রধান আইনসভার একজন সভ্য হিসাবেও তিনি নিজের অশেষ কৃতিত্ব দেখান। সার আবদুর রহিম সমগ্র মুসলমান সমাজকে গৌরবান্বিত করেছেন।

সার মহম্মদ ইকবাল পঞ্জাবের প্রসিদ্ধ কবি। তিনি ইসলামী সংস্কৃতি প্রচার করেও যশস্বী হয়েছেন। তাঁর

মহম্মদ ইকবাল

"হিন্দুস্থান হামারা" প্রভৃতি কবিতা উর্দুতে খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। সমগ্র উর্দু সাহিত্যে এরূপ প্রভাবশালী কবি ভারতবর্ষে এ যুগে আর জন্মায়নি। সার মহম্মদকে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট **Knight** উপাধি দ্বারা সম্মানিত করে

উপযুক্ত লোকেরই গুণের সমাদর করেছেন। আধুনিক মুসলমান মনীষীদের ভিতর স্যার মহম্মদের নাম সকলের উপর। সমগ্র ভারত শ্রদ্ধার সহিত এই কবির কবিতা পাঠ করে থাকেন।

আধুনিক ভারতীয় চিত্রকরদের ভিতর আবদুর রহমান চাঘতাই নিজের প্রতিভায় যশস্বী হয়েছেন। এই শিল্পীর নানাচিত্র বর্ণলালিত্যে ও রূপগৌরবে সিদ্ধি লাভ করেছে। চাঘতাই সাহেবের বহু চিত্র বিলাতের "Studio" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। আবদুর রহমান চাঘতাই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবর্তিত নব্য প্রাচ্য পদ্ধতি মতে চিত্র আঁকতে ভালবাসেন। তবে তার ভিতর মোগলাই ঢং ও প্রভাব খুব বেশী।

ভারতবর্ষের কোন কোন মুসলমান প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টে শাসকের পদেও কাজ করছেন। ছত্রির নবাব তার ভিতর একজন। ইনি শিক্ষিত লোক। নিজের প্রতিভায় নিজকে উন্নীত করেছেন। মৌলানা মহম্মদ আলী জাতীয়নেতা হিসাবে সমগ্র জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তিনি ভারতের মোসলেম সমাজের গৌরবস্বরূপ। এমনিভাবে আন্তর্জাতিক জাগরণে ভারতের মুসলমান সমাজও ধীরে ধীরে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। মুসলমান মনীষীরা নানাক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিভা দেখাতে অগ্রসর হচ্ছেন। স্যার ফেরোজ খাঁ খান্নুন সম্প্রতি বিলাতের "হাই কমিশনার" নিযুক্ত হয়েছেন। পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খাঁ রাষ্ট্র-পরিচালনে যে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন, সিন্ধুর ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ আল্লাবক্স যে স্বদেশিকতা ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছেন মুসলমান সমাজে তা অতুলনীয়। সীমান্ত জাতির মোসলেম নেতা খাঁ আবদুল গফুর খাঁ সমগ্র ভারতের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। কংগ্রেসের বর্তমান রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ মোসলেম শাস্ত্র ও শরীয়ৎ
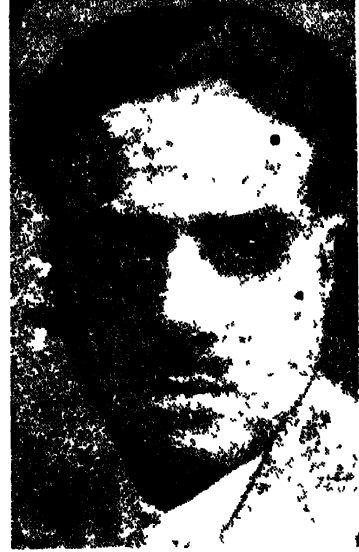
আবদুর রহমান চাঘতাই

ইত্যাদিতে অসাধারণ পণ্ডিত। এঁদের জন্মভূমির প্রতি প্রীতি ও প্রেম মিঃ জিন্নার অনুগত মুসলমান সমাজের অনুকরনীয়। এঁরা প্রকৃত মুসলমানের ন্যায় স্বদেশের কল্যাণে সকল প্রকার সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার ঊর্দ্ধে উঠতে পেরেছেন। শিক্ষার অধিকতর প্রচার হলে নব্য মুসলমান সমাজ আবার সভ্য সমাজে শ্রেষ্ঠস্থান লাভ করবে সন্দেহ নেই।

উঁচু ও নীচু

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম. এ. বি. টি.

নীচু জন যদি উঁচু পদ পায়, ভাবে সে ধরারে সরা।
নীচু উঁচু কারো গায় লেখা নাই—ব্যবহারে যায় ধরা ॥

যারা দেখে মাত্র চারটি রং

শ্রীচিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য

যদি আমাদের পরিচিত সমস্ত জিনিস, সকল পদার্থ কেবল মাত্র দোরঙা হ'ত, পৃথিবীতে আর কোনো রংই না থাকত, শুধু থাকত সাদা আর কালো, ব্যাপার কী অদ্ভুত দাঁড়াত ভাবতে পারো? ছেলেদের বই পড়তে কোনো অসুবিধা হ'ত না, তা ঠিক, কিন্তু মেয়েদের কাপড়-জামা পছন্দের বেলায়? বিপদ সেদিকেই শুধু নয়, কত রকমারি রঙের ফুল, পশু, পাখী, গাছ, পাতা, ফল, নীল আকাশ আর সবুজ ধানের ক্ষেত, সুন্দর সুন্দর কতো ছবি—কিছুই দেখতাম না কেউ, সবই, হয় সাদা, নয় তো কালো, বড়ো জোর সাদায়-কালোয় মিশিয়ে ধূসর রঙের। অমন বিবর্ণ জগতে কি দুদিন কেউ খুশী মনে কাটাতে পারতো?

শুনলে অবাক হবে নিশ্চয়ঃ ওই রকম দোরঙা জগতে অনেকেই বাস করে এবং খুব খুশী মনেই সারা জীবন কাটায়, সে-জগৎ কোথায় জান? আমাদেরই এই পৃথিবী। আসল কথা কি? রং দেখতে-পাওয়া না-পাওয়া রঙিন বস্তুর উপরেই সবটা নির্ভর করে না, লাল কাপড়কে লাল দেখেনা এমন অনেক লোকই আছে, রং দেখতে-পাওয়া না-পাওয়া নির্ভর করে দর্শকের চোখের দৃষ্টির ওপর, রং-দেখতে-পায়-না বা' লালকে সবুজ বলে, সবুজকে নীল বলে—এমন দৃষ্টি যাদের তাদের আমরা 'রং-কানা' বলি। কোথাও তা'রা রং খুঁজে পায় না, রঙের কথা বললে তা'র হয় কিছুই বুঝতে পারে না, নয়ত, ভুল বলে। তাদের চোখে এ পৃথিবীতে মাত্র দুটি রং আছে প্রথমটি সাদা আর দ্বিতীয়টি কালো,—অবশ্য কালো একটা রঙের নাম আমরা দিয়েছি বটে, কিন্তু আসলে কালো মানে হ'চ্ছে অন্ধকার—যেখানে কোনো রংই নেই, —ব্যাপারটা ভালো ক'রে বুঝিয়ে বলছি। আগে কয়েকটি মজার খবর বলি শোনো। আমাদের বাড়ীর মধ্যে এবং আশেপাশে যে সব বিড়াল ঘুরে বেড়ায় তারা রং-কানা। 'সাদা' ও কালো ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না। মৌমাছিরা, আর কোনো কোনো জাতের মাছ সব রঙের মধ্যে শুধু নীল আর হলদে রং দেখতে পায়, বাদ বাকি সব রংই তাদের চোখে হয় সাদা, নয় কালো, বড়ো জোর ধূসর। আমরা যে সব লোককে রং-কানা বলি তা'রাও ঐ মৌমাছি আর রং-কানা মাছেদের মতো শুধু নীল আর হলদে রং দেখতে পায়, বাদ বাকি সব রংকেই সাদা, বা কালো, নয়তো ধূসর দেখে। অমন রং-কানা মানুষ যদি কখনো বড়ো শহরের রাস্তায় রাত্রিতে মোটর্ চালাতে যায়, কিংবা ট্রেইন্-এর ড্রাইভার্ হ'য়ে রাত্রিতে ট্রেইন্ চালাতে যায় তবে বিপদের আশংকা প্রতি মুহূর্তে, কারণ, মোটর চালাবার সময় বড় শহরের রাস্তার মোড়ে, যাতায়াতের সুবন্দোবস্তের জন্য, লাল আর সবুজ আলো থাকে, লাল আলো দেখালে গাড়ী থামাতে হয় আর সবুজ আলো দেখালে চালাতে হয়, রেইল্‌ওয়ে স্টেশনেও সেই নিয়ম, গাড়ী চালাবার সময় চালক যদি লাল আর সবুজ রংকে ধূসর দেখে তবে বিপদ্ ঘটা কি আশ্চর্যের কথা? অমন রং-কানা ড্রাইভারদের সুবিধার জন্য নূতন ব্যবস্থা এই করা হয়েছে যে, লাল আলোকে খাঁটি লাল না ক'রে কমলাভ লাল করা হয়েছে—মানে, লালের সঙ্গে বেশ কিছু হলদে মেশানো হ'য়েছে, আর, সবুজের সঙ্গে বেশী নীল দিয়ে নীলাভ সবুজ করা হ'য়েছে, খাঁটি সবুজের বদলে। তার ফলে রং-কানা ড্রাইভার্ লালকে দেখে

ধূসরাভ হলদে বা ঘোলা হ'লদে, আর সবুজকে দেখে কালচে নীল।

আচ্ছা, বলতে পারো ? জগতে কোনো কোনো মানুষ, আর, জীবজন্তু পশু পাখীর মধ্যে মৌমাছি, মাছ আর, —আলো, ফুলের পাপড়িতে বা রঙিন কাপড়ে যে-লাল রং আমরা সবাই দেখতে পাই তা হ'ল সূর্য কিংবা কোনো দীপের আলো। দীপ থেকে আলোকরশ্মি পাপড়িতে, বা কাপড়ে এসে পড়ে, তারপর সেখান
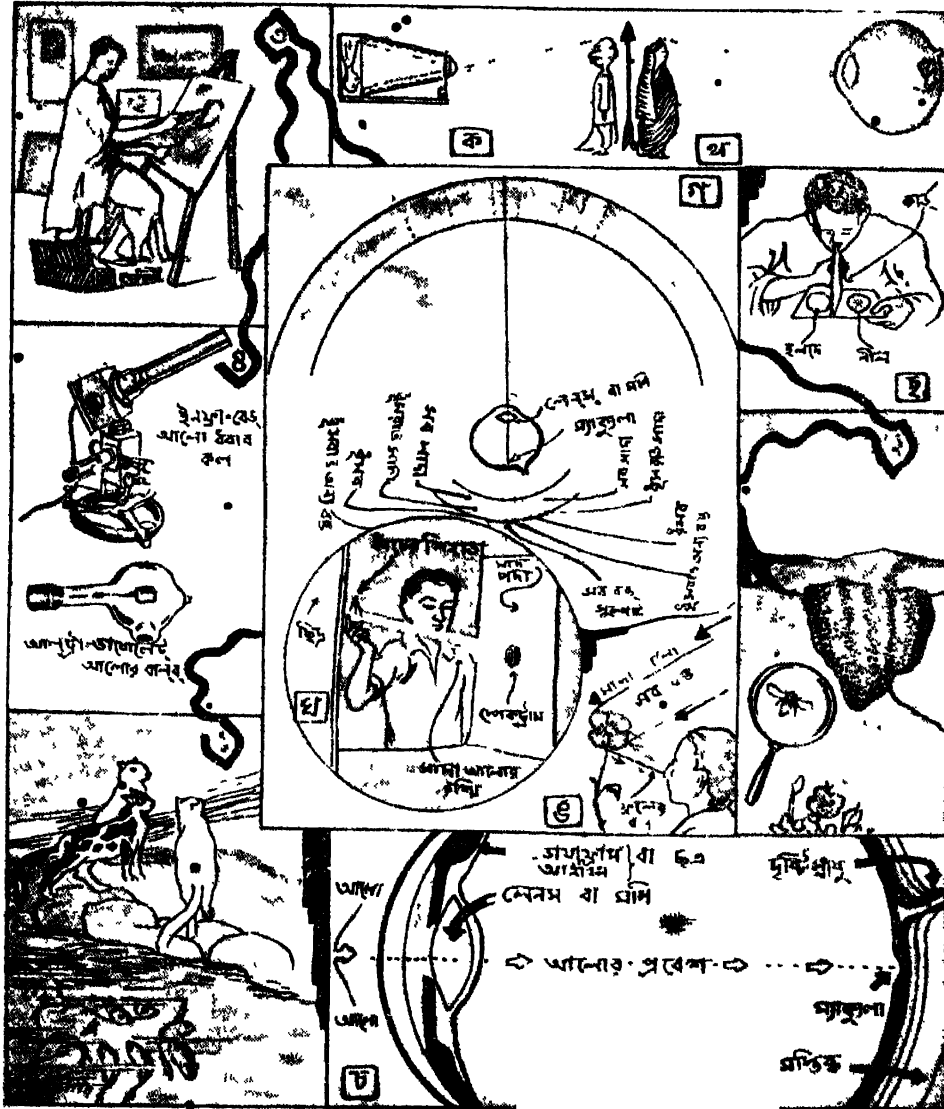
বিড়াল, এমন 'রং-কানা' হ'তে গেল কেন ? ওদের চোখে কী হ'য়েছে ? রংগুলোই বা ওদের চোখে ঠিক মতো যায় না কেন ? দোষ কি চোখের ? না, রঙের ?

তোমরা জাননা বোধ হয় যে রং মাত্রেই হ'ল আসলে থেকে ঠিকরে আসে আমাদের চোখে, আসলে ফুলের বা কাপড়ের প্রকৃত কোনো রং নেই, রং বলে যেটাকে আমরা চিনি তা আমাদের দৃষ্টিতে প্রতিফলিত ঐ সূর্য বা প্রদীপের আলোক বা কিরণের একটুকরো [চ নং ছবি দেখ]।

কিন্তু প্রতিফলিত হওয়ার মধ্যে একটা মজার কাণ্ড ঘটে' যায়, কোনো কোনো বস্তু কতকগুলি করে' রং গিলে ফেলে। সূর্যের সাদা আলোর মধ্যে সাতটা রং মিশে আছে, সেই সাতটা রং যখন একসঙ্গে এসে ফুলের পাপড়ির ওপর পড়ে তখন পাপড়ি সাতটি রঙের মধ্যে ছটি রং বেমালুম খেয়ে ফেলে, বাকি একটি রং, ঐ লাল রংটিকে চতুর্দিকে ঠিক্‌রে দেয়; আমাদের দৃষ্টি তার উপর পড়লে লাল রংটি আমাদের চোখে এসে লাগে, আমরা ভাবি ফুলটি কী সুন্দর, কী টুকটুকে রাঙা। লাল কাঁচের মধ্যে দিয়ে সাদা কাগজের দিকে চেয়ে দেখলে কাগজকে লাল দেখি, আমরা তখন বেশ জানি যে, সে-কাগজ মোটেই লাল নয়, সাদা কাগজ থেকে সাদা আলো ঠিক্‌রে এসে পড়ে কাঁচের গায়ে। মানে, একসঙ্গে সাতটা রঙেরই আলো এসে পড়ে কাঁচের গায়ে। সাতটা রং একসঙ্গে মিশলেই সাদা হয়ে যায়। কাঁচ ছটি রং চুষে খেয়ে ফেলে, বাকি শুধু লাল আলো টুকু আমাদের চোখকে দান করে। রঙিন্-জিনিস মাত্রেই রঙিন্-আলো দান করে প্রত্যেকের চোখেই, শুধু কালো জিনিস একেবারে ঘোর কৃপণ, তার হাত দিয়ে একটি কণা আলোও গলে বেরোয় না, কালো আর অন্ধকার একই কথা। অন্ধকার যা কালো জিনিস্ সব রংই গিলে ফেলে।

এখন কথা হ'চ্ছে, সকল রঙিন্-জিনিসই যখন সকল চোখকে কোনো না কোনো একটা রঙ-দান করে তখন রং-কানার চোখই শুধু রঙের অভাবে বিবর্ণ হয়ে থাকে কেন? বোঝা যাচ্ছে গোলমাল রঙিন্-জিনিসে নেই, যতো গোলমাল ঐ চোখ নিয়ে। রঙিন্-আলো নিয়ে চোখ কী কাণ্ড করে' তা নিয়ে দৃষ্টি-বিজ্ঞানীরা অনেক গবেষণা করে' রঙিন্-আলো আর চোখ সম্বন্ধে আমাদের অনেক প্রশ্নের জবাব সোজা করে' বুঝিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সে-জবাব বুঝতে হ'লে আগে আমাদের একবার দেখে নেওয়া দরকার চোখ জিনিসটা কী ভাবে তৈরী।

কোটোর থেকে উপড়ে এনে দেখলে চোখ জিনিসটার আকার দেখায় অনেকটা ছোট্ট পেয়ারার মতো, পেয়ারার বোঁটার দিকের চূড়োর মতো একটা ঢিবি চোখেও আছে, কোটোর মধ্যে থাকলে চোখের সেই চূড়োটুকুই আমরা দেখি, বাকি প্রায় তিনগুণ থাকে কোটোরের মধ্যে। চোখ হ'ল এই পেয়েরা-আকারের, ছোটো, অথচ খুব উচুদরের শক্তিশালী ক্যামেরা বিশেষ। ক্যামেরা যেমন বাইরের জিনিসের ওপর থেকে আলোছায়াকে ক্যামেরার ভেতর এনে কাঁচের ভেতরপিঠে সেই জিনিসের ছবি ফুটিয়ে তোলে, ক্যামেরা যেমনভাবে কোনো জিনিসের ওপর তার নজর একাগ্র করলে, ফোকাস্ ঠিক হ'লে, ভেতর পিঠের কাঁচে ছবিও স্পষ্ট হয়, চোখের কাজও ঠিক তেমনি—কোনো-জিনিসের ওপর নজর একাগ্র করে' সে-জিনিসের ছবিকে চোখের ভেতর পিঠে ফুটিয়ে তোলা, তারপর ভেতরপিঠ থেকে ছবির খবর আর বর্ণনা স্নায়ুর টেলিগ্রাফী সাহায্যে আমাদের মগজে, কিনা বুদ্ধিতে গিয়ে পৌছয়।

ক্যামারের মতো, চোখেরও সাম্‌নের দিকে লেন্‌স্ বা মণি আছে একটি, সেটির আকারও অবিকল কাঁচের লেনস্-এর মতো, শুধু কাঁচের বদলে অতি পাৎলা স্বচ্ছ কতকগুলি কাচা পদায় চোখের মণি তৈরী, পর্দাগুলি পেঁয়াজের মতো স্তরে স্তরে জড়িয়ে সাজানো, পেঁয়াজের মতোই চোখের মণির মাঝখানটি এক বিন্দু দানায় এসে থেমেছে। মণিটির সংকোচন-প্রসারণ গুণ খুবই বেশি; নজরকে দূরে কাছে নেওয়ার সময়ে ঐ গুণ কাজ করে, বুড়ো বয়েসে সেগুণ আর থাকে না চোখের মণিতে। তাই বুড়োমানুষের নজরের জোর কমে' যায়। মণিটি থাকে—আমরা যাকে চোখের তারা বলি, সেই কালো চাক্‌তিটির ঠিক নীচে। মণি বা তারা কোনোটিই কালো নয়, মণির ওপর ফুটো-ওয়ালা আরেকটি চাক্‌তি আছে সেটিই কালো। ক্যামেরায় যাকে ডায়াফ্রাম্ বলা হয়, যা দিয়ে বাইরের আলোর সঙ্গে যুঝতে হয়, চোখের মধ্যে সেই ফুটোওয়ালা কালো চাক্‌তির নাম আইরিস্, পরিভাষা অনুসারে আমরা ছত্র বল্‌তে পারি। এই গেল চোখের সাম্‌নের দিকের কথা। [ক, খ, চ-ছবি দেখ।]

চোখের ভেতর পিঠে, ঠিক মাঝখানটিতে ছোটো একটু জায়গা চাপা, গর্তপানা, সে-জায়গার ইংরেজী নাম ম্যাকুলা, খাপছাড়া যার রং তাকে ম্যাকুলা বলা হয়, চোখের ম্যাকুলা দেখতে যেন হলদে একটি বিন্দু, আসে পাশে তার সব সাদা। মণির মধ্যে দিয়ে বাইরের জিনিসের ছবি এসে যতক্ষণ না ঐ হলদে গর্তে পড়ছে ততক্ষণ আমরা সে-জিনিসকে স্পষ্ট দেখিনে,

ম্যাকুলার বাইরে পড়লে আমরা স্পষ্ট দেখি। এই ম্যাকুলার সঙ্গে আর এক পাশের দৃষ্টি-স্নায়ুর যোগ আছে, সেই স্নায়ু আমাদের মগজে নিয়ে যায়—ম্যাকুলা থেকে ছবিকে।

ম্যাকুলার চারপাশ থেকে কতকগুলি সূক্ষ্ম ঘড়ির কাঁটার মতো কাঁটার মুখ এসে ম্যাকুলার কেন্দ্রে মিলেছে, সেই কাঁটাগুলিরও ঘড়ির কাঁটার মতোই তীরের ফলার মতো মুখ; আর শেষ দিকটা বোঁটার মতো, ক্রমশ সরু হয়ে ছড়িয়ে গিয়ে শেষে, চোখের ভেতর-পিঠ থেকে ফুঁড়ে বারপিঠ পর্যন্ত চলে গেছে, বারপিঠে গিয়ে কতকগুলি স্নায়ুর সঙ্গে মিশেছে, সেই স্নায়ু আবার দৃষ্টি-স্নায়ুর সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। এখন, যতক্ষণ ছবি ঐ ফলার উপর পড়ে ততক্ষণই আমরা বাইরের দৃশ্যকে স্পষ্ট দেখি, যখন ছবি তাঁদের বোঁটার উপর পড়ে তখন আমরা ঝাপসা দেখতে থাকি। রামধনুর ছবির দিকে তাকালে রামধনুর ছবির যতটা আমাদের চোখের ম্যাকুলার মধ্যে আসে ততটা আমরা স্পষ্ট দেখি, তার দুপাশের বাড়তি-দিকে গেলে ক্রমশ ঘোলা, কিংবা ধূসরও হয়ে যেতে থাকে। মোট কথা, শুধু ঐ চোখের ভিতরকার কাঁটার ফলা দিয়ে আমরা বিভিন্ন রঙের তফাৎ ধরতে পারি, আর তাদের বোঁটা দিয়ে যখন দেখি তখন মাত্র সাদা আর কালো বা ধূসর হয়ে যায় সব রংই।

ব্যাপারটা নিজেরা পরখ করে' দেখতে পাবো। একখানা কাগজে চারটি বৃত্ত এঁকে বৃত্ত চারটিকে যথাক্রমে লাল নীল হলদে আর সবুজ এই চার রঙে ভরে ফেল। তারপর কাগজখানি যদ্দুর পারো ডান দিকে ধরো, কিন্তু চেয়ে থাকো নাকের সোজা কোনো একটা জিনিসের দিকে, দৃষ্টি ফিরিয়ো না সে জিনিস থেকে কিছুতে, তারপর কাগজখানিকে ডানদিক থেকে ক্রমশ চোখের কাছে নিয়ে আসতে থাকো, আর বুঝতে চেষ্টা করো, কাগজের দিকে না তাকিয়েও, কাগজের ওপরকার রঙিন চাকাগুলো দেখতে পাচ্ছো কিনা, দেখিতে নিশ্চয়ই পাবে। না তাকিয়েও, বই পড়বার সময়ে পাশে বসে কেউ যদি জিব ভ্যাঙায় তবে দেখ কি করে? রঙিন চাকাগুলিও দেখতে পাবে কিন্তু স্পষ্ট নয়, ধোঁয়াটে। যখন কাগজখানিকে ঠিক সামনে ধরবে ঠিক তখনই এক এক চাকার রং একের পরে এক করে স্পষ্ট দেখবে। চারটে চাকার রংই স্পষ্ট দেখবে না একই সঙ্গে। যখন যে রংটি ঠিক নজরের সীমার মধ্যে থাকবে তখন সেটিকে স্পষ্ট দেখবে। আর সবই অস্পষ্ট বা ধূসরও দেখবে, শুধু হলদে আর নীল রংকে বেশি স্পষ্ট দেখবে, বাকি দুটি, লাল আর সবুজ, প্রায় কালো বোধ হবে। চোখের কাঁটার ফলা দিয়ে আমরা সব রংকে ভিন্ন ভিন্ন করে দেখতে পারি, বোঁটা দিয়ে শুধু নীল আর হলদেকে ভিন্ন করতে পারি আর সব কালো আর সাদার রকমফের মাত্র মনে হয়।

মৌমাছির চোখের কাঁটার ঐ ফলাগুলি নেই। আর বেরালের চোখে নীল আর হলদেও ধরা পড়ে না। কারণ, ফলা তো ওদের চোখে নেইই, বোঁটাও এত মোটা যে তা দিয়ে নীল আর হলদেও ধরা পড়ে না।

[ক্রমশঃ

তিতো-মিঠে

শ্রীশচীকান্ত রায়

তিতো কহে মিঠে ভাই কি গুণ তোমার
রসনার তৃপ্তি ছাড়া নাহি কিছু আর।

তিতো বটে হই আমি যদিও নিশ্চয়
জীবের অশেষ হিত আমা হতে হয়।

৩১শে মার্চ, মঙ্গলবার, বেলা ১২টা !

শ্রীতাপস রঞ্জন সরকার

১

(সন্দেহ)

সেদিন ৩রা ফেব্রুয়ারী। রাত্রি হয়েছে। আকাশ বেশ পরিষ্কার। পূর্ণ চন্দ্রের আলো সমস্ত ছাদের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। ছাদের এক কোনে বসে বিজয় ও সমীর নিবিষ্ট মনে বর্ষার কূলেকূলে ভরা খর স্রোতা যমুনার প্রচণ্ড প্রবাহের দিকে চেয়ে আছে। হঠাৎ একটা শৃগালের কর্কশ ধ্বনি হাওয়ার সঙ্গে ভেসে এসে এই অজানা স্তব্ধতাকে ক্ষণকালের জন্য ভেঙ্গে দিল। বিজয় সমীরকে বল্লে, "কাল সারারাত তোমাদের গুপ্ত ধনের রহস্য ভেদ করে শরীরটা বেশ একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আজ একটু শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর বিছানায় গিয়ে বিশ্রাম নেওয়া দরকার।" এই বলেই বিজয় উঠে পড়লো। যমুনার স্রোত তরঙ্গ সংকুল। ওই সময় বেশ জোরে হাওয়া বইছিলো। নদীর বুকে ঢেউ গুলো হাওয়ার তালে ভীষণ শব্দে নাচতে শুরু করেছে। বিজয়ের চোখে পড়লো সেইরাত্রে ফেনিল যমুনা বক্ষে একটা ছোট নৌকা প্রাণপণে তীরের দিকে আস্‌বার চেষ্টা করছে। কিন্তু নৌকাখানা যেন ভীষণা উন্মাদিনী যমুনার উত্তাল তরঙ্গের সাথে আর পাল্লা দিতে পারছে না, বিজয় দাঁড়িয়ে ছাদের আলসের দিকে ঝুঁকে পড়ে একদৃষ্টে তাই দেখ্‌তে লাগলো। কতটুকু সময় কেটেছে ঠিক নেই। হঠাৎ দূর থেকে একটা ইঞ্জিনের মৃদু শব্দ যেন বিজয়ের কানে এলো। বিজয় সেই আওয়াজের দিকে কর্ণপাত ক'রে যমুনার জলে যতদূর দৃষ্টি যায় লক্ষ্য ক'রে দেখলে বহু দূরে একটা আলো নড়ছে। ক্রমশঃ আলোটি কাছে এসে পড়্‌লো। বিজয় দেখলো যে একখানা মোটর বোট তীরবেগে সেই নৌকাখানা লক্ষ্য করে ছুটে আসছে। ক্রমশঃ বোটটি একেবারে কাছে এসে পড়লো। কয়েক মিনিট পরেই বিজয় দেখলে আর একটি মোটর বোট তার পিছনে তাড়া করে আসছে। তারপর আরও একটি মোটর বোটকে ছুটে এসে পূর্বোক্ত বোটের পেছনে ছুটে যেতে দেখ্‌লো। জ্যোৎস্নার আলোতে শেষের বোট দু'টি বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিলো। বোটের ভেতর অনেকগুলো লোক রয়েছে দেখা গেল।

ব্যাপার দেখে হঠাৎ কি একটা সন্দেহ এসে বিজয়ের মনে উঁকি দিলে। বিজয় শেষের বোটটির নাম ও নম্বর জ্যোৎস্নার মৃদু আলোয় বেশ ভাল করে দেখে পকেট বইয়ে নোট করে নিলে—"কোষ্টারিকা N 2029। তারপর নিঃশব্দে ছাদের উপর থেকে নেমে গেল। সমীরও তার অনুসরণ করলে।

২

উইল চুরি

ঘুমিয়ে পড়বার আগে বিজয় সমীরকে পূর্বোক্ত ঘটনাটি সবিস্তারে বললে। কিন্তু সমীর ব্যাপারটিতে বিশেষ মনোযোগ দিল না বিজয় একটু চিন্তিত মনে অনেক রাত্রি পর্যন্ত বিনিদ্র যাপন করলে।

পরদিন ভোর বেলায় সমীর তার মোটর বাইকটি নিয়ে বেড়াতে বের হোল। সে যখন এস্প্ল্যানেড রোডের মুখে এসে বাঁয়ে ঘুরবার উপক্রম করছিলো ঠিক সেই সময় কোত্থেকে একটা কাগজের মোড়ক তার সামনে ছিটকে

এসে পড়লো। সমীর তৎক্ষণাৎ "বাইকটি" থামিয়ে ব্যস্তভাবে সেই কাগজের মোড়কটি হাতে তুলে নিয়েই একেবারে পকেটস্থ করলে।

কাগজের মোড়কটা যেদিক থেকে এসে পড়েছিল সেদিকে তাকিয়ে দেখলে একটা প্রকাণ্ড পাঁচতলা বাড়ী। কিন্তু কাগজের মোড়কটি এলো কোত্থেকে? এ বিরাট বাড়ীর কোন তলায় কোন ঘরের কোন জানালা দিয়ে? সমীর পকেট থেকে 'বায়নাকুলার' বের কোরে চারদিক্ দেখতে লাগলো। হঠাৎ সেই বাড়ীর তিনতলার একটা ছোট বারান্দায় সে যে দৃশ্যটি দেখতে পেলে তা সত্যিই সন্দেহজনক। সমীর দেখলে যে সেই ছোট বারান্দায় চার পাঁচ জন লোক ধ্বস্তাধ্বস্তি করছে ও ঘন ঘন নীচের দিকে তাকিয়ে তারা কি যেন খুঁজছে। সমীর তাড়াতাড়ি "বাইক" চালিয়ে কিছুদূর এগিয়ে এসে একটা বেশ নির্জন জায়গায় গাড়ী থামিয়ে দাঁড়ালো তারপর কাগজের মোড়কটা পকেট থেকে বের করে খুলে পড়তে লাগলো,

"৩১শে মার্চ মঙ্গলবার বেলা ১২টার সময় যে কোনো লোকের নিকট এই উইলখানি পাওয়া যাইবে সেই ব্যক্তিই আমার বাৎসরিক ছয় লক্ষ টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি এবং হীরামুক্তা জহরত অলঙ্কারাদি যাবতীয় অস্থাবর ঐশ্বর্যের মালিক হইতে পারিবে।

যদি চ আমার সাবালক একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ অজয়কান্ত রায়চৌধুরী বর্তমান, তথাপি আমি ইচ্ছা করিয়াই নানা কারণ বশতঃ তাহার নামে আমার সম্পত্তি উইল করিতে সক্ষম হইলাম না। আমি আমার সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসে জমা রাখিয়া গেলাম। উল্লিখিত দিনে ও ঠিক সময়ে যে ব্যক্তি এই উইলখানা কোর্ট অব ওয়ার্ডসে উপস্থিত করিতে পারিবে সেই ব্যক্তিই সমস্ত সম্পত্তি বুঝিয়া লইতে পারিবে। অবশ্য আমার পুত্রকেও "যে ব্যক্তির" মধ্যে ধরা যাইবে। শ্রীমান্ অজয় কান্তের নামে আমি আমার নিজ বসত বাড়ীখানা ও কি-ছু ন-গ-দ টা-কা রা-খি-য়া গে-লা-ম।

শ্রীসঞ্জীবকান্ত রায়চৌধুরী।"

শেষের ক'টি অক্ষর দেখে সমীর বেশ বুঝতে পারলে যে পরলোকগত সঞ্জীববাবু ভয় ও ত্রাসের সঙ্গে এই উইলখানা লিখে নাম সই করেছেন। ঠিক সেই সময় হঠাৎ সোঁ করে কোত্থেকে একটি ছোট্ট ওডনত্তুবড়ী এসে সমীরের পায়ের কাছে পড়লো এবং পড়বা মাত্রই তুবড়ীর খোলটি ফেটে গিয়ে সামান্য একটু ধূম নির্গত হোল। সেই ধোঁয়ার আঘ্রাণ পাবা মাত্র সঙ্গে সঙ্গেই সমীরের চেতনা বিলুপ্ত হোল।

যখন সমীর জ্ঞান ফিরে পেল তখন সে দেখে যমুনায় একটি মোটর বোটে শুয়ে আছে। সমীর উঠে বসেই প্রথমেই পকেটে হাত দিল, কিন্তু কোথায় সেই অদ্ভুত উইল? সমস্ত পকেট তন্ন তন্ন কোরে খুঁজেও উইল পাওয়া গেল না। এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা সমীরের চোখের সামনে ভেসে উঠলো। বোটের ভেতরে শুধু একটি লোককে সে দেখতে পেলে। সেই ব্যক্তি তখন বোট চালাচ্ছে। লোকটির সুদীর্ঘ তনু, দিব্য গৌর কান্তি দেখে মনে হোল সে উচ্চ বংশজাত। সমীর জিজ্ঞেস করলে, "মশাই, আপনার নামটি জানতে পারি কি?" লোকটি উত্তর করলে, "শ্রীঅজয়কান্ত রায়চৌধুরী।" নামটা শোনবা মাত্রই সমীর আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলে ফেললে, "দেখুন, আপনারই পিতার নাম বোধহয় ৺সঞ্জীবকান্ত রায়চৌধুরী। তিনি যে অদ্ভুত উইল লিখে গেছলেন, একটু আগে হঠাৎ তা অপ্রত্যাশিত ভাবে আমার হাতে এসে পড়েছিল। কিন্তু সেটি আবার এইমাত্রই খোয়া গেছে। আপনি হয়ত আমাকে চেনেন না। আমার নাম—

অজয় তৎক্ষণাৎ উত্তর করলে, "হাঁ, জানি, শ্রীসমীর বসু। দেখুন, আপনাকে আমি যমুনার ধারে অজ্ঞান অবস্থায় দেখতে পেয়ে আমার এই বোটে তুলে নিয়ে আসি। অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও জ্ঞান ফিরে এল না দেখে, আপনার পরিচয় পাবার জন্য আপনার পকেট হাতড়েছি। মাপ করবেন। আপনার কার্ড জানতে পারলুম আপনি প্রসিদ্ধ এ্যামেচার ডিটেক্টিভ সমীরবাবু। উইলখানি আমার বাড়ী থেকে চুরি গেছে। যদি উদ্ধার করে আমার এই উপকারটুকু করেন, আমি যথাসাধ্য আপনাকে পুরস্কৃত করবো। আশা করি আপনি একাজের ভার নিতে দ্বিধা করবেন না।" সমীর বললো, "দ্বিধা কোরব কি বরং আনন্দই পাব। উইলখানা আমি জ্ঞান হারাবার আগে বেশ ভাল করে পরীক্ষা করে দেখেছি। দেখুন, উইলে আপনার পিতার লেখার ধরণ দেখে আমি

এইটুকু আন্দাজ করেছি যে, কোন লোকের এই সম্পত্তির উপর লোভ ছিল। সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই আপনার পিতার পরিচিত ছিলেন। কোনো একদিন আপনার পিতার অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে ছোরা অথবা পিস্তল উচিয়ে প্রাণ নাশের ভয় দেখিয়ে এই উইলখানা লিখিয়ে নেয়। আচ্ছা আপনি বলতে পারেন, আপনার পিতা কি পূর্বে আপনার নামে কোন উইল করেন?" অজয় বল্লে, "না, সমিরবাবু তাঁকে উইল কোরতে দেন নি। তিনি বাবার এমন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন যে বাবা তাঁর পরামর্শ ভিন্ন একপাও চলিতেন না। তাঁকে সব কথাই তিনি বলতেন এবং তাঁর কথা শুনেই সব কাজ করতেন। তিনি বাবাকে প্রায়ই বলতেন যে উইল করবার এখনও ঢের সময় আছে। বাবা এই বিষয়ে আমার কোন মত নিতেন না বা আমার সঙ্গে কোন আলোচনা করতেন না।" এই সময়ে সমীরের হঠাৎ সেই বোটের নামের উপর নজর পড়লো। সমীরের তৎক্ষণাৎ মনে পড়ল কালরাত্রে বিজয় তাকে যে বোটের নাম বলেছিল সেই নামই এই বোটের। সমীর তখন জিজ্ঞাসা করলে "আপনি কাল রাত্রে এই বোটে কোরে কি কারুর অনুসরণ করেছিলেন? আমার বন্ধু ভারত বিদিত গোয়েন্দা বিজয় রায় তা দেখতে পেয়েই ব্যাপারটা কতক অনুমান করেছিলো।" অজয় বললে, "কত বড় বড় রহস্য যিনি প্রতিদিন ভেদ করছেন তাঁর পক্ষে এ অনুমানটা নিতান্ত কঠিন কিছুই নয়।" এই সময় বোট এসে বিজয়দের ঘাটে নোঙর করলে। [ক্রমশঃ

হলিউডে বীনা

প্রতুলচন্দ্র সরকার

ঘুম থেকে বীনা যখন উঠলো তখন বেশ সকাল হ'য়ে গিয়েচে—পাম্ গাছের সারির মাথায়, ম্যাগ্‌নালিয়া ও রডোডেনড্রন ফুলের বাগানে, শিশির ভেজা সবুজ ঘাসের মাঠে, আলো ঝলমল্ করচে। খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়ে বীনা চেয়ে রইলো, কোথায় ভারতবর্ষ, বাঙলাদেশ, কোলকাতার বালিগঞ্জ—আর এই উদার নীল সাগরের কোলঘেঁসা সমুজ্জল স্বপ্নপুরী।

লাল কাঁকরের সুন্দর রাস্তায় লোকজনের চলাফেরা আরম্ভ হয় নি, একদল ছেলে হল্লা করতে করতে চ'লেচে সান্টামনিকার সমুদ্রতীরে, আর একদল মেয়ে সাইকেলে গান করতে করতে যাচ্ছে পাইন বনে ঘেরা বিভারলি পাহাড়ের দিকে। অপলক দৃষ্টিতে বীণা চেয়ে দেখতে লাগ্‌লো, অধীর আনন্দে তার সমস্ত শরীর যেন অবশ হয়ে এলো, মনে মনে সে না বলে থাকতে পারলে না—'সত্যি, কি সুন্দর দেশ!'

কতক্ষণ সে খোলা জানালার ঠাণ্ডা হাওয়ায় বিমুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল কে জানে, হঠাৎ চমক ভাঙ্‌লো তার মায়ের ডাকে—'ঘুম থেকে উঠেছিস বিনি?'

—হ্যাঁ, মা—

—টেলিফোনে শার্লি তোকে ডাকচে,—

—শা—র্লি, আনন্দে বীণা প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো।

পাশের ঘরে ছুটে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নিয়ে বল্লে, হ্যা—লো, বীনাদি—স্পিকিং।

—গুডমর্ণিং বীনাদি, শার্লি হেসে বল্‌লো আমি ভেবেছিলুম তুমি হয়তো ঘুম থেকে ওঠোনি—

—'গুডমর্ণিং শার্লি', বীনাও হেসে উত্তর দিল, উঠেচি একটু আগে। সকাল বেলায় যে আমায় হঠাৎ মনে পড়লো কি ব্যাপার ব'লতো?—'আজকের সকালটা কি চমৎকার, না', শার্লি উৎসাহিত হ'য়ে ব'ল্‌লে। ভাবলুম সমুদ্র তীরে বেড়াতে গেলে বেশ হয়, যাবে বীনাদি—

বেশ তো চল্‌না, ইট্ উড্ বি এ গ্র্যাণ্ড ফান্,—

—মেনি থ্যাঙ্কস,-শার্লি খুসি হয়ে বললে, 'তুমি তৈরী হয়ে নাও, আমি গাড়ী পাঠিয়ে দিচ্ছি ···Bye Bye রীনাদি, তোমায় একটু বিরক্ত করলুম, কিছু মনে কোরো না, প্লিজ—

—'Bye Bye শার্লি। রীনাও কথা শেষ করে, রিসিভারটা রাখতে রাখতে মা'কে ব'ললে, কি চমৎকার মেয়ে শার্লি, আমি সঙ্গে না গেলে ওর বেড়ান হবে না, এই জন্যই সত্যি আমার ওকে এত ভাল লাগে মা।

*　　*　　*　　*

এক জাগায় তারা গাড়ী রেখে নেমে পড়লো। পিপার গাছের সারির মধ্যে দিয়ে, আলোছায়া ঘেরা লাল রাস্তায় দু'জনে চ'লতে লাগলো। রাস্তা ছাড়িয়ে খানিকটা দূরে এখানে ওখানে ছোট ছোট বাড়ী, নানা রঙের টালির ছাদ, অপরূপ ফুলের বাগানে ঘেরা। লাল, হলদে সাদা গোলাপের ছড়াছড়ি, নীল ডালিয়া, হলদে আইরিশ, লাল কার্পেসন্ যেন রঙের আলো ছড়িয়ে দিয়েচে। ক্রিসন্থিমাম, বোগেনভিলিয়া, হেলিয়াস্থাস্, হাস্নাহানা বাতাসে দুলচে—সত্যি এ যেন ফুলের রাজ্য। গল্প করতে করতে দু'জনে চ'লতে লাগলো, পাইন গাছের ফাঁকে ফাঁকে ছোট বড় গীর্জার চূড়া দেখা যাচ্ছে, হঠাৎ শার্লি অস্ফুট স্বরে রীণার কাণে বললে, ঐ দেখ আমাদের ডিয়ানা 'দি সোপ্রানো' * আসচে সাইকেলে, দাঁড়াও একটু মজা করি—ডিয়ানা আপন মনে শিষ দিতে দিতে আসছিল, শার্লি আর রীনা দু'জনে গা ঘেঁষে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়লো, ডিয়ানাও সেই সময়ে ওদের দিকে বিস্মিতভাবে তাকিয়েই সাইকেল থেকে নেমে পড়লো।

—'গুডমর্ণিং মাদাম'। শার্লি মিলিটারী কায়দায় কপালে হাত ঠেকিয়ে অভিবাদন করে হেসে উঠলো।

—'গুডমর্ণিং শার্লি' বলে ডিয়ানাও হেসে উঠলো। তারপর কেমন আছো · তোমায় ত' আজকাল দেখতেই পাই না, কেন ব'লতো? '—এই তো দেখা হোল,' মৃদু হেসে মিষ্টি স্বরে শার্লি বল্‌লে। আচ্ছা, এসোনা ডিয়ানা আমাদের সঙ্গে··· ও হাঁ, এঁর সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়েদি, আমার ভারতীয় বন্ধু মিস্ রীনা সেন, ইনিও চমৎকার গান গাইতে জানেন, পিয়ানো বাজানো ও টেনিস্ খেলাতেও ইনি প্রথম শ্রেণীর আর্টিষ্ট। রীনার সঙ্গে করমর্দন করে ডিয়ানা মিষ্টি হেসে বল্‌লে, 'আমাদের সৌভাগ্য যে আপনি আমাদের দেশে বেড়াতে এসেছেন, যেদিন শুনলুম শার্লি কে আপনি চিঠি লিখেছেন সেদিন যেমন বিস্মিত তেমনি আনন্দিত হয়েছিলুম, কারণ কোনও ভারতীয় বন্ধুর সঙ্গে যে ওর চিঠিতেও আলাপ হবে, এ আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি·· আচ্ছা, জায়গাটা আপনার কেমন লাগ'ছে বলুন তো?......

'—সত্যি, যেমন আশ্চর্য তেমনি চমৎকার' আনন্দের সুরে রীনা ব'ল্লে। 'এত সুন্দর ও নিখুঁৎভাবে তৈরী ও সাজানো যে অনেক সময় রূপকথার দেশ বলে মনে হয়—'

'—আপনার ভারতবর্ষও খুব সুন্দর দেশ শুনেছি', ডিয়ানা উৎসাহিত হ'য়ে বল্‌লে। 'সময় সময় এত ইচ্ছে হয় আপনাদের রবীন্দ্রনাথ, শ্রীরামকৃষ্ণ, মহাত্মা গান্ধীর দেশে যেতে, ...আচ্ছা, মিস্ সেন আজ আমায় মাপ করবেন, তাড়াতাড়ি রয়েচে এত আনন্দ পেলুম আপনার সঙ্গে আলাপ করে, একদিন আপনার বাড়ীতে নিশ্চয়ই যাবো।'

'—হাঁ, আসবেন নিশ্চয়ই' আনন্দের সুরে রীনা ব'ল্‌লে, 'আচ্ছা আসুন, নমস্কার' সাই'কেলে উঠতে উঠতে শার্লির দিকে ফিরে ডিয়ানা ব'ল্‌লে, 'চলি ভাই শার্লি, আমার গানের lesson নে'বার সময় হ'য়ে এলো, কিছু মনে কোরো না, প্লিজ—'

*　　*　　*

সমুদ্র তীরে দু'জনে যখন পৌঁছালো, ক্যালিফোর্ণিয়ার অপূর্ব সূর্যের আলোয় চারিদিক সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেচে। কত হাসি মুখ ছেলেমেয়েরা বেড়াতে এসেচে—বালির ওপর খেলা, ছুটোছুটি, হাসি-গল্প, আনন্দ-কোলাহল, সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। রীনা মন্ত্র-মুগ্ধের মতো চেয়ে দেখতে লাগলো, তারও ইচ্ছে করছিল এই বিচিত্র আনন্দ উৎসবে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে! কোলকাতায় কি এ সম্ভব? সেই একঘেয়ে স্কুলে যাওয়া, বাড়ী আসা, পড়া তৈরী করা, বন্ধুদের সঙ্গে এলোমেলো গল্প করা বা বেড়াতে যাওয়া, সিনেমা দেখা—এর চেয়ে বেশি সে আর কি ক'রতো?

ফ্রেডির সঙ্গেও রীনার আলাপ হোল, ওর চপলতা,

* উঁচুদরের গায়িকাকে ইংরিজিতে সোপ্রানো (Soprano) বলে।

কথা ব'লার কৌতুকময় ভঙ্গিতে রীনা খুসী না হয়ে পারলো না। ববিকেও বেশ সুন্দর লাগলো। আরও অনেক ছেলেমেয়ের সঙ্গে আলাপ হোল। যাবার সময় ফ্রেডি শার্লিকে গম্ভীর ভাবে ব'ললে, 'মনের মত বন্ধু পেয়েছো, তোমার ত' আর দেখা পাওয়াই যাবে না—'

'কি যে ব'লো', শার্লি সলজ্জ হেসে ব'ল্‌লে, 'এসনা যেদিন যখন খুশী আমার ওখানে, কতো দিন যাওনি বলোত—' ..

'আচ্ছা যাবো,' অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিয়ে রীনাকে ব'ললে, ভারী খুশী হলুম মিস্ সেন, আপনার ওখানে এক দিন গিয়ে ভারতীয় গান শুনবো কিন্তু,.. আচ্ছা, আমি তা'হলে, Bye Bye ...'

'Thank you very much' রীনা খুশীর সুরে ব'ললে, Bye Bye—

* * * *

রীনারা এই সপ্তাহে ভারতবর্ষে ফিরবে। যাবার আগের দিন শার্লির বাড়ীতে রীনার চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল, ফ্রেডি, মিকি, ববি, জেন—এরাও সব এসেচে। রীনার "ফেয়ার ওয়েল পার্টিতে" রীনার পাশে শার্লি বসেচে ঝলমলে রঙিন বেনারসী সাড়ি পরে, কাণে ঝুমকো, গলায় সরু হার, হাতে চুড়ি—কপালে টিপ,—কে ব'লবে ও বাঙালীর মেয়ে নয়। লম্বা টেবিলে নানা রকম খাবার সাজানো, রঙিন ফুলদানিতে অপরূপ ফুলের গুচ্ছ। সকলেরই মুখে অপূর্ব আনন্দের দীপ্তি। যে যার খুশীতে গল্প করছে। হঠাৎ ফ্রেডি আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলো,— 'Here Comes our Soprano !' সকলেই দরজার দিকে চাইতেই, ডিয়ানা হাসি মুখে এগিয়ে এসে চেয়ারে বসতে বসতে বললে,—'Excuse me friends, একটু দেরী হয়ে গেল !' তারপর শার্লির দিকে ফিরে চাইতেই আশ্চর্য হ'য়ে গেল,—'ওমা, একে ?'

'আজ ও একেবারে বাঙালীর মেয়ে'। রীনা মৃদু হেসে ব'ললে, 'কি চমৎকার দেখতে লাগছে বলুন তো !'

'...The charming princess of the orient !' ডিয়ানা আনন্দের সুরে ব'ললে। 'হ্যা, রীনা ব'ললে, বাঙলা ভাষায় বলতে গেলে সত্যিই ও আজ 'স্বপনপুরীর রাজকন্যা' শার্লি মৃদু হেসে মুখ নীচু ক'রে রইল।

সকলে মিলে মহা আনন্দে খাওয়া শেষ করলে, রীনাকে পেয়ে সকলে কত আনন্দিত, মুগ্ধ, যেন কত দিনের প্রিয় বন্ধু সে। রীনাও এদেরই একজন হয়ে গিয়েছে, ভুলেই গিয়েচে যে ও হলিউডে বেড়াতে এসেছে। কলকাতায় তার বন্ধু ইরা, মালতী, প্রমীলা, দীপ্তির চেয়ে শার্লি, ডিয়ানা, ফ্রেড্ডি, জেন, ববি—এরা বন্ধু হিসেবে কেউই কম নয়। বিশেষ করে আজকের আনন্দময় দিনটা—জীবনে কোন দিন কি সে ভুলতে পারবে ?

বন্ধুরা সকলে রীনাকে বিদায়-অভিনন্দন জানালে। প্রথমেই শার্লি দাঁড়িয়ে উঠে বললে—

"প্রিয় বন্ধুগণ, রীনাকে বন্ধু হিসেবে পেয়ে আমরা যে কত আনন্দ ও উৎসাহ পেয়েচি তা ভাষায় বুঝিয়ে বলবার নয়। প্রথম যেদিন রীনার চিঠি পেলুম, সেদিন সত্যিই মুগ্ধ হয়ে গেলুম ওর সহজ আন্তরিকতায়, ওর সরল, সুন্দর মনের পরিচয়ে। ভারতবর্ষের এবং বিশেষভাবে বাঙলা-দেশের ছেলেমেয়েরা যে কত সরল, আনন্দময় তা' রীনার বন্ধুত্বেই জানতে পেরেছি এবং তাদের সকলকেই আমি রীনার মারফতে প্রীতি ও ভালবাসা জানাচ্ছি। যদিও এটা দুঃখের কারণ যে রীনাকে আমাদের মধ্যে আর পাব না, তবুও এই মনে করে আমার আনন্দ হচ্ছে যে, আজ যে বন্ধুত্বের সুমধুর প্রীতির বন্ধনে আমরা ধন্য হয়েচি, তা' কখনো পুরোনো হ'বে না। আমাদের আশায়, কাজে, কল্পনায় প্রতিদিন নব নব আনন্দের বার্তা বহন করে আনবে সাগর পারের বন্ধুটী "। ..

এরপর ফ্রেডি দাঁড়িয়ে উঠে বললে—

"প্রিয় বন্ধুগণ, প্রথমেই বিনীতভাবে স্বীকার করচি যে বক্তৃতা দেওয়ার মতো শক্তি বা কৌশল সত্যিই আমার নেই, সামান্য দু'চার কথা ব'লতে যদি ভুল করি তবে আশা করি কেউ অপরাধ নেবেন না। কুমারী রীনা সেন যে আমাদের সকলের কত আপনার ছিল, তা' ভাষায় বুঝিয়ে বলবার নয়। তার বন্ধুত্বে আমরা সবাই মুগ্ধ, আনন্দিত, না জানি ভারতবর্ষ, বাঙলাদেশে আরও কত সুন্দর, অপরূপ। আমি রীনাকে ও তার প্রতিনিধিত্বে বাংলাদেশের ছেলেমেয়েদের আমার অন্তরের প্রীতি নিবেদন ক'রচি।

* * * *

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতায় কেটে গেল—সকলেরই মুখে একটা শান্ত করুণ কোমলতা। রীনাও নিঃশব্দে মুখ নীচু করে বসেছিল, তার ব্যথাভরা মুখখানি বেদন-সুন্দর, চোখ দু'টি যেন সজল হ'য়ে উঠেছে। অতি কষ্টে আস্তে আস্তে উঠে সে ব'ললে,—

"প্রিয় ভাইবোনেরা, আজ তোমরা সবাই স্নেহে, আনন্দে, প্রীতিতে যে-ভাবে তোমাদের এই বিদেশিনী বন্ধুকে অভিনন্দিত করেছ, ভাষায় তা প্রকাশ করবার শক্তি আমার নেই, শুধু এই ব'লতে পারি, আমি মুগ্ধ হয়েচি, ধন্য হয়েচি। তোমাদের স্বপ্ন-সুন্দর দেশে কোন-দিন আসবো, এ আমি কল্পনাও করতে পারিনি। কিন্তু আজ তোমাদের স্নেহে, সুমধুর প্রীতিতে যে আনন্দ পেয়েচি তা' কখনও অমলিন হ'বে না, চিরদিন সমুজ্জ্বল থাকবে আমার মনে। তোমাদের সকলকেও তোমাদের প্রিয়তম বন্ধু শার্লিকে অশেষ ধন্যবাদ ও প্রীতি জানাচ্ছি। আমার জন্মভূমি—বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের ছেলে-মেয়েদের তোমরা প্রীতি ও ভালবাসা জানিয়েচ, তাদের পক্ষ থেকেও আমি তোমাদের অশেষ ধন্যবাদ জানাই ও সেই সঙ্গে মনে প্রাণে কামনা করি, তোমাদের ও তাদের মধ্যে স্নেহ ও প্রীতির বন্ধন আরও মধুর ও আরও সুন্দর হোক্।" সকলে সমবেত কণ্ঠে চিৎকার করে বলে উঠলো—"থ্রী চিয়ার্স ফর মিস্ রীনা।"

হিজল দীঘির পাড়ে

কাঃ আঃ রহমান

হিজল দীঘির পার।—নাম মনে হ'তেই গা' শিউরে উঠে। সে এক মস্ত মাঠ—সবদিকেই প্রায় মাইল দুয়েক। মাঠের মাঝখানে একটা বট গাছ—তার বয়স কত কেউ ঠিক বলতে পারে না।

হিজল দীঘির পারে রাতে ডাকাতের বড় ভয়। তারা দল বেঁধে বট গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকে—আর সুবিধা পেলেই পথিকের ঘাড়ে পড়ে—তার সব লুটে নিয়ে যায়। আগে নাকি মাঝে মাঝে খুনও হ'ত, কিন্তু এখন সেটা অনেক কমে গেছে।

রাতে কেউ এ মাঠে পা' বাড়াতে সাহস করত না। ডাকাতের উৎপাত এমনি বেড়ে গিয়েছিল।

হারাণ সেদিন কেশবপুর কাছারী থেকে টাকা আনতে গেছে। টাকা নিয়ে সেই দিনই তাকে ফিরতে হবে—পরের দিন সদর খাজনা দেওয়ার শেষ তারিখ। হিজল দীঘির পারের মাঝখান দিয়ে যে রাস্তা গেছে সেইটেই তার ফেরবার পথ।

হিসাব পত্র করে টাকা নিতে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে গেল। রাতে তাকে যেমন করে হোক হিজল দীঘিরপাড় পার হ'তেই হবে। হারাণ যখন মাঠের ধারে এল তখন সন্ধ্যে উৎরে গেছে।

সে টাকাগুলি বেশ করে কোমরে বেঁধে চাদর খানা মাথায় জড়িয়ে নিল। তারপর তার তেলে পাকান লাঠিটা কাঁধে তুলে নিয়ে মাঠে পা'দিল।

মাঠে পা বাড়াতেই তার প্রাণটা দুরু দুরু করে উঠল। ভয়কে প্রাণ পণে দমিয়ে রেখে সে ঝড়ের বেগে ছুটে চল্‌ল—যত তাড়াতাড়ি মাঠ পার হওয়া যায় ততই মঙ্গল।

ঠিক বট গাছের কাছে আসতেই তার প্রাণটা কেমন ছ্যাঁৎ করে উঠল। চাঁদের আবছা আলোয় চারিদিকটা এক বার চেয়ে দেখল—কোথাও কেউ নেই।

পথের দিক চেয়ে সে আবার হন্ হন্ করে ছুটল।

গাছ পেরিয়ে যেতেই আড়াল থেকে শব্দ হ'ল—দাঁড়াও।

হারাণের অন্তর শুখিয়ে গেল। সে থমকে দাঁড়াল। গাছের আড়াল থেকে তিনটী মানুষ বেরিয়ে এল। তারা হারাণের কাছে এসে দাঁড়াতেই সেও নিজেকে সামলে নিয়ে রুখে দাঁড়াল—আজ মরিয়া হয়ে এক হাত লড়ে তবে ছাড়বে।—ফলে তুমুল লড়াই।

হারাণ তাদের সঙ্গে লড়াই করে, আর গ্রামের দিকে এগিয়ে আসে। তিন জনের আক্রমণ রোধ করে সে গ্রামের অনেকখানি কাছে এসে পড়ল। ডাকাত দল অগত্যা লাভের বদলে হারাণের লাঠীর দু এক ঘা খেয়ে বিদায় নিল।

হারাণের পথ চেয়ে তখনও কাছারীতে বসে আছি—আজ রাতেই সব ঠিক করে কাল সকাল সকাল টাকা পাঠিয়ে দিয়ে তবে রেহাই। রাত নয়টায় সে, তার বিশাল দেহখানা নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির। ঘরে এসেই ধপাস করে সে মাটিতে বসে পড়ল। আমি আশ্চর্য হয়ে কারণ জিজ্ঞাস করায় সে সমস্ত ঘটনা খুলে বললে।

দেখলাম—তার শরীরের অনেক জায়গা জখম হয়েছে —দু এক জায়গা কেটেও গেছে। হিজল দীঘির পাড়ে ডাকাতের হাতে পড়ে হারাণ ছাড়া আর কেউ ধনে প্রাণে ফিরে এসেছে বলে শুনিনি।

হারাণকে জিজ্ঞাস করলাম—"তুমি তিন তিনজন ডাকাতের হাতে পড়ে কিরূপে বেঁচে এলে?"

সে বললে—"মরণ নিশ্চিত জেনে, দুহাতে লাঠী ধরে যখন রুখে দাঁড়ালাম—তখন আমি একাই যেন একশ' হয়ে উঠলাম। আমার এ পাকা হাতের লাঠীর নীচে এসে কেউ আমায় ধরতে পারল না। ভগবানের কৃপায় তাই প্রাণ নিয়ে বেঁচে এসেছি।"

হারাণের কথায় বুঝলাম—মানুষের ভিতর এমন ক্ষমতা লুকিয়ে রয়েছে যা' দিয়ে ইচ্ছে করলে সে অতিমানবের কাজ করতে পারে। এ ভগবানের দেওয়া শক্তি।

শেফালিকা

শ্রীশচীন্দ্রনাথ গুপ্ত

অমরার মন্দাকিনী শিশিরের নীরে
আপনার চারু তনু স্নাত করি' ধীরে
পরি' বাস শুচি শুভ্র শারদ সমীরে
ফুটে শেফালিকা।
আমোদিয়া দশ দিশি অতুল সুবাসে
ক্ষণিক জীবন তার উতল বিলাসে।
নিবেদিয়া বিনিঃশেষে নিয়তি সকাশে
ঝরে শেফালিকা।

রাজর্ষি

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মল্লিক

প্রথম দৃশ্য

[গেরুয়া বসন পরিধান করিয়া হাতে কমণ্ডলু লইয়া ও খড়ম পরিয়া ঋষি বিশ্বামিত্রের প্রবেশ। স্থানটি গ্রামের সরু পথ। ঋষি পথ বেয়ে চলতে চলতে বলছেন।]

বিশ্বামিত্র। শ্রীভগবানকে লাভ করতে আমায় কি ভীষণ তপস্যাই না করতে হ'য়েছে। আজ সেই তপস্যার ফলেই না আমি রাজর্ষি উপাধি লাভ করেছি।

[এক তাপসকুমারের প্রবেশ।]

বিশ্বামিত্র। কে? তাপসকুমার না? হ্যাঁ তাপস-কুমারই তো। বৎস।

তাপসকুমার। আমায় ডাকছেন প্রভু?

বিশ্বামিত্র। হ্যাঁ বৎস। তোমার চোখ লাল কেন? তোমার শরীর কাঁপছে কেন? তুমি কথা বল্‌তে গিয়ে হাঁপিয়ে পড়লে কেন? তবে—তবে কি তুমি—ছিঃ ছিঃ লজ্জার কথা। তাপস। তুমি মহুয়ার মধু—

তাপসকুমার। পিতা—

বিশ্বামিত্র। তবে। বৎস তবে?

তাপসকুমার। এক ফোঁটা জল দিতে পারেন? জলাভাবে আমার এই অবস্থা।

বিশ্বামিত্র। জলাভাবে? কি বাতুলের প্রলাপ বকৃছ তুমি।

তাপসকুমার। গুরুদেব! আমি নিষ্ঠাবান্ তাপসের সন্তান হ'য়ে মিথ্যা বলছি না। দেশে আজ এক ফোঁটা জল নেই। পুষ্করিণী, নদ, নদী, সাগর, উপসাগরের সমস্ত জল বালুকাময় মরুভূমিতে পরিণত হ'য়েছে। প্রতিদিন শত শত নরনারী জলাভাবে, খাদ্যাভাবে মৃত্যুকে বরণ কর্চ্ছে। দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে।

বিশ্বামিত্র। আশ্চর্য!

[তাপসকুমারের প্রস্থান। অন্য পথ দিয়া এক পথিকের প্রবেশ।]

বিশ্বামিত্র। পথিক!

[পথিক বিশ্বামিত্রের পায়ের উপর শুইয়া প'ড়িল।]

বিশ্বামিত্র। পথিক কি চাই?

পথিক। আছে? দেবেন? দেবেন? আহা—হা মহাপুরুষ আপনি—এক মুষ্টি অন্ন।

বিশ্বামিত্র। অক্ষম। [পথিকের প্রস্থান।]

বিশ্বামিত্র। তাইতো! সত্যিই দেশের আজ একি অবস্থা? আমি কি এর কিছুই কর্ত্তে পারি না। আমি কি মিথ্যাই রাজর্ষি হয়েছি? আমার দেশ আজ হা-জল, হা-অন্ন করে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করছে। কিন্তু কি করি, কেমন করে এখন দেশকে মহামারীর হাত থেকে রক্ষা করি। রক্ষা আমায় কর্ত্তেই হ'বে। রক্ষা আমি করবো। দেবতা-দের দেখাব যে আমার শক্তি কতখানি। (আকাশের দিকে চাহিয়া) বরুণ জল দাও। জল দাও। জল দাও। একি! একবার বিদ্যুৎও চমকালো না? একবার মেঘও গর্জন করল না? একবার ঝড়ও উঠ্‌ল না। এত স্পর্দ্ধা! রে নিষ্ঠুর জলদেবতা, আমি তোকে শাস্তি দেব। কিন্তু আগে দিতে হবে দেবতাদের দলকে বিশেষ ভাবে শিক্ষা। তাদের জানিয়ে দিতে হবে যে, ওদের চামড়া দুধের মত সাদা আর আমাদের চামড়া কয়লার মত কাল বলে আমরা ঘৃণার পাত্র নই। ওরা দেবতা আর আমরা মানুষ এই পার্থক্য আজ আমি সকল দেবতাদের মন থেকে মুছিয়ে দেব। জানিয়ে দেব, আমরা ওদের ক্রীতদাস নই। ওরা প্রভু হ'লেও, ওরা সৃষ্টিকর্তা হ'লেও আমাদের ভিতর স্বাধীন মানবাত্মা আছে প্রজারও রাজাকে পরিচালনের ক্ষমতা আছে।

[উন্মত্ত ক্রোধে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে]

বিশ্বামিত্র। গ্রামবাসী দল!, ছুটে এস, আজ আমরা দেবতাদের করব ধ্বংস। [প্রস্থান]

[দেবতাদের প্রবেশ।]

ইন্দ্র। বিশ্বামিত্র ক্ষেপেছে।

নারদ। তা' জানতুম।

কৃষ্ণ। কি জান্‌তে।

নারদ। জানতুম যে তোমাদের কাজটা ভাল হয় নি।

অগ্নি। আরে রেখে দাও। আমরা দেবতারা চির-দিনই দেবতা। চিরকালই পৃথিবীর ওপরে স্বর্গে বাস করব।

ইন্দ্র। কিন্তু শান্তিতে থাকতে যে পারো না ভাই।

[দেবতাদের প্রস্থান]

(জনৈক ঋষি, গ্রামবাসিগণ ও বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

জনৈক ঋষি ও গ্রামবাসিগণ। প্রণাম রাজর্ষি।

বিশ্বামিত্র। এখন এ সব লৌকিকতা নয়। এস আজ আমরা এক যজ্ঞ করি। তাতে কুকুরের মাংস উৎসর্গ করব। দেখিয়ে দেবো যে, ইচ্ছা করলে দেবতাদের আমরা স্বর্গ হতে তাড়িয়ে নরকেও নামিয়ে নিতে পারি।

ঋষি। কিন্তু তাতে লাভ?

বিশ্বামিত্র। লাভ? তুমি কি বলছ ঋষি। দেশে জল নেই, খাদ্য নেই—মৃত্যু এসে করছে দেশকে শাসন। আর তুমি বলছ লাভ? তুমি কি চাওনা নিজের অধিকার? চাওনা তুমি বাঁচবার জন্য অন্ন, বায়ু জল?

সকলে। চাই—চাই চাই।

বিশ্বামিত্র। তবে এস যজ্ঞ আরম্ভ করা যাক।

(দৃশ্যান্তর)

(দেবতাদের প্রবেশ)

ইন্দ্র। এইবার সব পণ্ড হবে।

নারদ। জানি পণ্ড হবে।

অগ্নি। যাও নারদ, তোমাকে আর কথা বলতে হ'বে না।

নারদ। সত্যকথা মাত্রই শুনতে খারাপ লাগে।

ইন্দ্র। মহেশ, আমি শ্যেন পক্ষীরূপে মাংস হরণ করব।

নারদ। এই খবরটা, ততক্ষণ আমি ঋষিকে দিয়ে আসি গে।

বরুণ। দেবর্ষি, তুমি বড় জ্বালালে দেখছি।

(দৃশ্যান্তর)

বিশ্বামিত্র। (যজ্ঞ করতে করতে।) দাও মাংসের পাত্রটি দাও।

(সহসা শ্যেন পক্ষীরূপী ইন্দ্র সেই মাংস পাত্রটি হরণ করিলেন ও একটি অমৃত পূর্ণ পাত্র রাখিয়া গেলেন।)

বিশ্বামিত্র। হা হা হা। রে মূর্খ, ইন্দ্রত্ব দেখাও আমাকে?

(ইন্দ্র যথাস্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন)

বিশ্বামিত্র। ওটি কিসের পাত্র?

ইন্দ্র। অমৃতের।

বিশ্বামিত্র। চমৎকার। কিন্তু কি হ'বে ঐ অমৃত?

ইন্দ্র। এ পানে ক্ষুধা আর থাকে না, দেবত্ব লাভ হয়।

বিশ্বামিত্র। রে মূর্খ। একা আমার ক্ষুধা, তৃষ্ণা মিটিয়ে লাভ হ'বে না। আমি এ যজ্ঞ সম্পন্ন করব।

ইন্দ্র। দয়া করে ও কাজটা ক'রো না ঠাকুর।

বিশ্বামিত্র। তবে দেশকে বাঁচাও—দেশে জল দাও।

ইন্দ্র। তথাস্তু।

[ইন্দ্রের অন্তর্ধান ও আকাশ হইতে জল, ঝড় দেখা দিল।]

বিশ্বামিত্র। ধন্য। আমি আজ ধন্য হলাম। এত দিন পরে সত্যই আজ আমার 'রাজর্ষি' নাম সার্থক হ'ল। দেশের অর্থ, দেশের সম্পদ, দেশের সব কিছুই নির্ভর করে ঐ বৃষ্টির উপর। ঐ বৃষ্টির জলধারায় আর রৌদ্রের তেজে হ'বে আমাদের ধরিত্রী উর্বরা। ধরিত্রীর সেই উর্বরা মৃত্তিকায়—হ'বে প্রচুর শস্য। দেশের সহস্র দুঃখ কষ্টের হ'বে অবসান। প্রজা হয়েও আমরা পা'ব শান্তি। পৃথিবীর ছেলে মেয়েরা পেটপুরে খেয়ে বাঁচবে।

সকলে। জয় রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের জয়।

বিশ্বামিত্র। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আজ আমি সত্যই রাজর্ষি। কিন্তু ওরে দেশমাতার নির্বোধ সন্তান দল। তোরা জয়-ধ্বনি দে' দেশমাতার। বল দেশমাতার জয়, দেবতাদের জয়, আর মা-ধরিত্রীর জয়।

সকলে। "জয় দেশমাতার জয়, দেবতাদের জয়, মা-ধরিত্রীর জয়।

মামাবাবুর নস্যির ডিবে

শ্রীগৌরপ্রসাদ গুপ্ত

গল্প আরম্ভ করবার আগে আমার মামাবাবুটির একটু পরিচয় দিয়ে রাখি। মামা আমার আজ বছর চারেক হ'ল ডাক্তারী পাশ ক'রে বেরিয়েছেন, পসারের কথা আর নাই ব'ললাম। তবে ডাক যে নেই সে কথা ব'ললে মিথ্যে বলা হবে, কিন্তু তাদের মধ্যে সাড়ে পনেরো আনাই মেসো, পিসে, কাকা, মামা, খুড়ো।

চিকিৎসায় না হোক্ মামা আমার কৃপণতায় বেশ নাম কিনে ফেলেছেন এবং হাত চিৎ বড় সহজে উপুড় হয় না। এ হেন মামার কাছ থেকে কি ক'রে আট আনা পয়সা আদায় ক'রেছিলুম সেই কথাই আজ বলবো।

সেবার হঠাৎ গ্রীষ্মের সময় মামা আমাদের এই দারুণ গরম দেশে হাওয়া বদলাতে কিংবা দু এক পয়সা রোজ-গারের জন্যে এলেন। তিনি বলেন হাওয়া বদলাতে, কিন্তু আমরা বলি পসার জমাতে। যাই হ'ক, তাঁর আসায় আমরা খুসীই হ'লুম। মামা এসেই এক হাত জিভ কেটে ব'ললেন, "ওই দেখ, তোদের জন্যে এক প্যাকেট মুড়ী লজেন্স আনতে ভুলে গেলুম, এমন পোড়া মন হ'য়েছে যে এই সামান্য কথাটাও মনে থাকে না।" ভগবান জানেন কিনেছিলেন কিনা, আর যদিও কিনে থাকেন তো ভুলে যাওয়ার জন্য তাঁর মনকে অশেষ ধন্যবাদ, কারণ মুড়ী লজেঞ্চুস্ খাওয়ার আর বয়স নেই।

যাই হ'ক দিন দুয়েকের মধ্যেই দু-তিনটি রুগী পেয়ে মামার আর হাসি ধরে না। একথা আমাদের মেনে নিতেই হবে যে তাঁর চিকিৎসা ভাল, কারণ দু-তিনজনের মধ্যে কোনওটিকেই তাঁর একবারের বেশী দু-বার ওষুধ দিতে হয়নি। এমন সময় এক কাণ্ড হ'ল। হঠাৎ একদিন রুগী দেখে মামা ভয়ঙ্কর গম্ভীর মুখে বাড়ী ফিরলেন। তাঁর মুখ দেখে বুঝলুম আজ একটা কিছু হ'য়েছে। আন্দাজ ক'রেছিলুম বোধ হয় কোনও রুগীর বিশেষ অবস্থা খারাপ এবং সেই জন্যেই মামার মন খারাপ। কিন্তু জিগ্যেস ক'রে জানলুম, রুগীটুগীর কিছুই নয়, মামা আমার সকাল থেকে নস্যির ডিবেটি হারিয়ে ফেলেছেন। আমি তখুনি নস্যি এনে দেব কিনা, জিগ্যেস করতেই মামা হা হুতাশ্ ক'রে ব'ললেন যে নস্যি, তাঁর কাছেই আছে তার জন্যে দুঃখ নেই, কিন্তু ডিবেটির জন্যেই তাঁর মন খারাপ। তাঁর অবস্থা দেখে আমার বড় কষ্ট হ'ল এবং নস্যির ডিবেটি কিরকম দেখতে জিগ্যেস ক'রতেই মামা যা ব'ললেন তা এক মস্ত ব্যাপার। কৌটোটি কাঠের তৈরী, প্রায় দু-ইঞ্চি লম্বা এবং এক ইঞ্চি চওড়া। ওপরে কোমিয়ামের পাড় দিয়ে মোড়া এবং কারুকার্য করা ঢাকনির ভিতরদিকে Made in France এই কথাটি লেখা আছে। কৌটোটি তাঁর কোনও বন্ধু জন্মদিন উপলক্ষে উপহার দিয়েছিলেন, তাও আজ বছর দশেক আগেকার কথা। এর মধ্যে দু-একবার দু-একজন হাতসাফাই ক'রেছিলেন কিন্তু প্রত্যেকবারই মামা চোরের ওপর বাটপাড়ি ক'রে সেটি ফের হস্তগত ক'রেছিলেন, কিন্তু এবার কিছুই হদিস পাচ্ছেন না।

কৌটোটির ভাবনায় মামা আমার একেবারে মুসড়ে প'ড়লেন। বোধ হয় পুত্রশোকও মানুষকে এতখানি কাতর করে না। তিনি মাঝে মাঝে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলছেন এবং হায় হায় ক'রে উঠছেন। অমন কৌটো নাকি বাজার ঢুঁড়লেও পাওয়া যাবে না, ফ্রান্সে না গেলে। হঠাৎ তিনি আমাকে একেবারে চেপে ধরে ব'ললেন, "কেন বাবা ভাবাচ্ছিস, নিয়ে থাকিসতো দিয়ে দেনা,

তোকে একটা খুব ভাল উডপেন্সিল কিনে দেব ইত্যাদি। আমি তো একেবারে আকাশ থেকে প'ড়লুম, কৌটো চোখেই দেখলুমনা চুরির দায়ে ধরা প'ড়লুম। আমি যত বলি আমি জানিনা, তিনি তত চেপে ধরেন। দু-পয়সার পেন্সিল থেকে ঘুস্ একআনার তোড়াবে গিয়ে দাঁড়াল, কিন্তু শেষে যখন বুঝলেন সত্যিই আমি নেইনি তখন একটি বৃহৎ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে ধপ ক'রে ব'সে প'ড়লেন। তাঁর অবস্থা দেখে সত্যিই আমার কষ্ট হ'ল, আমি তাঁকে কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন জিগ্যেস ক'রতে তিনি যা ব'ললেন তা এই—সকালে রুগী দেখতে যাবার আগে তিনি বাগানে একটু পায়চারি ক'রছিলেন। সেই সময় একটিপ্ নস্যি নিয়ে অভ্যাস মত ডানদিকের ট্যাঁকে গুজে রেখেছিলেন কিন্তু তার পরেই সেটি পাওয়া যাচ্ছে না। বাগান ছাড়া সেটি যে আর কোথাও পড়েনি তা মামা একেবারে হলফ ক'রে ব'লতে পারেন।

সুযোগ বুঝে আমি এই ফাঁকে কিছু বাগাবার চেষ্টায় ব'ললুম, "আচ্ছা, খুঁজে দিলে কি দেবেন?" এবার মামা একেবারে ফস্ ক'রে চার আনা ব'লে ফেললেন। কিন্তু এত ভারি কাজ কখনও চার আনায় হয়? আমি এক টাকা দাবী ক'রলুম। শেষে অনেক দর কষাকষির পর আট আনায় রাজী করান গেল। তারপর সুরু হ'ল খোঁজা-খুঁজির পালা। বাগান প্রায় চষে ফেলেও কোন লাভ হ'ল না, এবং বাড়ীতেও সেই অবস্থা। মামা মাঝে মাঝে চিৎকার ক'রছেন "কিরে! পেলি?" কৌটোর শোকে তিনি স্নান ক'রলেন না এবং সামান্য খেয়েই বিছানায় আশ্রয় নিলেন। শোবার আগে হুমকি দিয়ে ব'ললেন, "ঘুম থেকে উঠে যেন কৌটো পাই। এ বাবা তুমিই নিয়েছ, মিছি মিছি আমার আট আনা পয়সা খসাবে। এই যুদ্ধের বাজারে আট আনা পয়সা কি কম?" তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে কৌটোটি আমিই লুকিয়েছি এবং পয়সা পেলেই দিয়ে দেব।

অনেক খোঁজাখুঁজিতেও যখন কোনও ফল হ'ল না আমিও এসে তার পাশেই শুলাম। দেখলাম মামা আমার বেশ নাক ডাকাচ্ছেন। আমার কিন্তু ঘুম এলনা, শুয়ে শুয়ে কৌটোটি কোথায় থাকতে পারে তাই ভাবছি, এমন সময় মামা একটি বৃহৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাশ ফিরলেন। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি তাঁর বাঁদিককার কোমরের কাছে ট্যাঁকটি অসম্ভব ফুলে আছে। দেখেই কেমন সন্দেহ হ'ল, আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দেখি নস্যির ডিবেটি ট্যাঁকে আচ্ছা ক'রে প্যাঁচানো আছে। ভারি মুস্কিলে প'ড়লুম, সন্ধান পেলুম তো মাল খালাস করা একটি ব্যাপার। এই অবস্থায় ব'ললেও মামুর কাছ থেকে পয়সা আদায় করা সম্ভব নয়। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলুম। হঠাৎ মাথায় একটা ফন্দি এসে গেল। আস্তে আস্তে বাবার দাড়ি কামাবার সেট থেকে একটি ব্লেড এনে দিলুম তাঁর ট্যাঁকের ওপর দিয়ে চালিয়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে মালও খালাস হ'য়ে গেল। কিছু না ব'লে দিলুম এক ঘুম।

ঘুম থেকে উঠে দেখি মামা তখনও হাহুতাশ ক'রছেন এবং আমি উঠতেই পেয়েছি কিনা জিগ্যেস্ ক'রলেন। আমিও তক্ষুনি পুরস্কার দাবি ক'রলুম। কারণ দেরী ক'রলে মামা যখন বুঝবেন যে তাঁর গ্যাঁট ফাঁক, তখন পুরস্কার তো দূরে থাক মার কাছ থেকে দু-এক ঘা পিঠে পড়বারও সম্ভবনা আছে। মামা ব'ললেন, "দেখেছ দিদি, আমি তখনি ব'লেছিলাম ওই লুকিয়েছে, কেবল বদমাইসি ক'রে আমার আট আনা পয়সা খসালে। আমিও ছাড়বার পাত্র নই। ব'লে দিলুম পয়সা না দিলে জিনিস দেওয়া হবে না। সুতরাং মামাকে অনিচ্ছা সত্বেও ব্যাগ খালি ক'রতে হ'ল। তারপর সুরু হ'ল জেরা। আমি আগাগোড়া সব বললুম এবং এই শুনেই মামা ট্যাঁক দেখে আবার শোকোচ্ছ্বাস শুরু ক'রলেন। কাপড়খানি নাকি একেবারে নতুন, যদিও দু-তিন জায়গায় রিপু করা আছে। মোটে ৪।৫ ধোপ গিয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে মার কাছে নালিশও ক'রলেন। তক্ষুনি ভয়ে আমি মাঠের দিকে দিলুম চোঁ চাঁ দৌড়।

সন্ধ্যে বেলা এসে দেখি মা মুচকে মুচকে হাসছেন এবং মামাবাবু নাকি ভুল ক'রে ডানদিকের গ্যাঁটে না রেখে বাঁদিকে রাখার জন্যে তাঁর স্মরণশক্তিকে অনেক গালমন্দ দিয়ে রুগী দেখতে বেরিয়ে গেছেন। ঘরে গিয়ে দেখি আমার ছোট বোন কাপড়টিকে সেলাই ক'রছে এবং এর জন্যেও মামাকে চার পয়সার লজেঞ্চুস্ খসাতে হ'য়েছে তবে মামা আমার আট আনার মধ্যে একটি সিকি অচল চালিয়ে দিয়েছিলেন, সেটি এখনও আমার কাছে আছে।

ভার্জিন সয়েল

দেবেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায

[লেখক আইভ্যান টুর্গেনিভ। জাতিতে রাশিয়ান। জন্ম ১৮১৮। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লেখকদের অন্যতম। এই বইখানা ঠিক উপন্যাস নয়, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রাশিয়ার নিহিলিষ্টরা যে সমাজ বিপ্লবের প্রচেষ্টা করেন তারই ইতিহাস উপন্যাসের আকারে দেবার চেষ্টা করেছেন। সাধারণতঃ লেখকরা যে অর্থকষ্ট পেয়ে থাকেন টুর্গেনিভের বেলায় তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। তিনি বিত্তশালী ছিলেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ফরাসী দেশে তাঁর মৃত্যু হয়]

বিকেলের পড়ন্ত রোদে সেণ্টপিটার্সবার্গ সুন্দর অতিসুন্দর। এখন বসন্তের হাওয়া সুরু হয়েছে বইতে, বরফ পড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পাঁচটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে লোক বেরিয়েছে বেড়াতে, ফিরতে সেই রাত। হয়ত খেয়ে নেবে কোন রেস্তরাঁতে। আবার কেউ কেউ বলে 'খাবার দরকার কি গো,' এমন সুন্দর দিনে বেড়াতে বেরুলে কি আর খাওয়ার কথা মনে থাকে ?"

আচ্ছা এমন সুন্দর দিনে বেড়াতে না বেরিয়ে পাঁচতলার একখানা ঘরে দরজা জানালা এঁটে কজন লোক চুপিচুপি কি আলোচনা করচে বলত ? চল দেখে আসি।

ঐযে অল্প বয়সী সুন্দর দেখতে ছেলেটি ? ওর নাম হচ্চে নেজ্‌দানভ্ আর ঐ যে একটি মেয়ে বসে বসে পা দুলচ্চে ওর নাম হচ্ছে মাসুবিনা আর সোফায় যে দুজন বসে আছে তাদের একজনের নাম হচ্চে ওষ্ট্রোদুমভ্ আর একজনের নাম পাকলিন।··· চুপি চুপি কি এত ওদের আলোচনা।

ঐ যে ওষ্ট্রোদুমভ্ কি বলছে এস কান পেতে শোনা যাক।

"হ্যাঁ ভাই নেজ্‌দানভ্ কাজের জন্যে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছ ?"

"হ্যাঁ, শহরে আর মন টেঁকেনা। শহরের এই কোলাহলের বাইরে বহু দূরে পল্লীমায়ের কোলে যদি যেতে পারি তা হ'লে জীবনে আর কিছুই চাইনে।"

"শহরে থেকে কি কিছুই করা যায় না ?"

"হয়ত যায়, কিন্তু থেকে থেকে আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটা ছবি—সে ছবি কিসের জান ? সর্বহারা অসহায় কৃষকদের। শত অত্যাচারেও যারা এতটুকু প্রতিবাদ জানায় না, পোড়া ভাগ্যকে দোষী করে নীরবে চোখের জল মোছে দিনের পর দিন। আমার খালি মনে হয় শহরের এই সমারোহের মাঝখানে থেকে লাভটা কি ? মানুষ হয়ে যদি মানুষের দুঃখ না দূর কর্তে পারলাম তা হলে এ পৃথিবীতে এলাম কেন ?

ওষ্ট্রোদুমভ্ কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু এমন সময় সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ হল। এমন সময় কে ? পুলিশ নয় ত ? খানিক পরে দরজার কড়া উঠল নড়ে। নেজ্‌দানভ্ দরজা খুলে দিতে ভেতরে এলেন এক ভদ্রলোক। তাঁর চেহারা আর পোষাক দেখে বোঝা গেল যে তিনি শুধু ভদ্রলোক নন রীতিমত বড়লোক। কুণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, "মসিয়ে নেজ্‌দানভের সঙ্গে দেখা হতে পারে কি ?"

"আজ্ঞে আমার নামই নেজ্‌দানভ্ আপনার কি দরকার বলুন"

"ও বেশ বেশ, দেখুন, কাগজে এই বিজ্ঞাপনটা দেখে আসছি। আপনাকে একটা কাজের ভার দিতে চাই ·· নেবেন কি ?"

বলুন কি কাজ—"

এমন কিছু নয়, আমার ছেলেটিকে পড়াবার ভার আমি আবার শহুরে মানুষ নই কিনা—আমি আমার

জমিদারীতেই থাকি, মানে কাজের ভাবটা নিলে আপনাকে আমার গাঁয়ের বাড়ীতেই থাকতে হবে বুঝলেন কিনা।

নেজ্দানভ্ যেন স্বপ্ন দেখছে। সত্যি কি তার জীবনের আশা সফল হবে? কিন্তু এই বড়লোকটার সঙ্গে এক সঙ্গে থাকা? সেও যে এক অসম্ভব ব্যাপার। ওদের যে ও চিরকাল ঘেন্না করে এসেছে।

"ভাববার কিছু নেই মঁসিয়ে নেজ্দানভ্, ভাববার কিছু নেই। মাসে মাসে একশ রুব্ল্ করে পাবেন। শহর ছেড়ে আমাদের মত গেঁয়ো ভূতদের সঙ্গে থাকতে হবে, অল্প হলে চলবে কি করে?"

"আজ্ঞে হাঁ, সে ত ঠিক।"

"তা হলে রাজি?"

"আজ্ঞে হাঁ মঁসিয়ে—"

"সিপিয়াজিন আমার নাম, তবে আমাদের জাতের কাণ্ড ত জানেন? আমাদের মত অপদার্থ লোকদের আবার বড় বড় উপাধি দিয়ে বসে আছেন। ঐ যে কথায় বলে না 'বাঁদরের গলায় মুক্তর মালা' আমাদের দশাও তাই বুঝলেন কিনা—তা হলে—"

"আজ্ঞে হাঁ আমি রাজী।"

মঙ্গলবারদিন সকালবেলায় সিপিয়াজিনের জমিদারীতে হাজির হল নেজ্দানভ্। সিপিয়াজিনের সংসারে লোক নেই বেশী। স্ত্রী, ছেলে কোলিয়া আর আশ্রিতা এক ভাগ্নী মারিয়ানা। মারিয়ানার চোখে কেমন করুণ ভাব একটা। সিপিয়াজিনদের মত দাম্ভিক বড়লোকদের মধ্যে থেকে সে যেন সম্পূর্ণ আলাদা। খুব ভাল একখানা ঘর পেলে নেজ্দানভ, কিন্তু তা হলেও নতুন জায়গায় ঘুম কি আসে ছাই। কেবলই ঘুম ভেঙ্গে যেতে লাগল। বাড়ীর চৌকিদারদের কর্কশ কণ্ঠ কানে আসে 'হুঁসিয়ার' সঙ্গে সঙ্গে দূর থেকে আর একজন বলে ওঠে 'খবরদার'। বড়লোকদের বাড়ী নয় ত' যেন জেলখানা—।

প্রায় পনের দিন পর সিপিয়াজিনের শালা মার্কেলভ এল বেড়াতে। নেজ্দানভের সমবয়সীই হবে। খাওয়া দাওয়ার পর শুতে এসে, নেজ্দানভ দেখলে তার ঘরে মার্কেলভ বসে। ও ত অবাক।

"কিছু মনে করবেন না" মার্কেলভ বলে "আপনার কাছে একটা চিঠি নিয়ে এসেছি।"

চিঠিখানা খুলে দেখলে তাতে লেখা আছে—মার্কেলভ তাদের দলের লোক। ওদের হেড কোয়ার্টার মস্কো থেকে মাঝে মাঝে মার্কেলভের হাতদিয়ে নেজ্দানভের কাছে খবর পাঠান হবে।

চিঠি পড়া শেষ হলে মার্কেলভ বল্লে, "দেখুন আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা আলোচনা কর্বার ছিল—এখানে বলতে সাহস হয় না, দেওয়ালেরও কান আছে জানেন ত?"

"বেশ ত কেমন করে গোপনে আলোচনা হতে পারে আপনিই বলুন।"

"আমি বলছিলুম কি আমার বাড়ীতে গেলে হয় না? কাল দুপুরেই ফিরে আসবেন।"

"সে ত ভাল কথা, কিন্তু আমি ত স্বাধীন নই, এঁদের মত না নিয়ে—"

"এই কথা? আমি দিদিকে বলে দেব অ'খন—"

সেই রাত্রিতেই মার্কেলভের বাড়ীতে এল নেজ্দানভ। এসে দেখলে অনেক লোক হাজির হয়েছে সেখানে, মাস্‌কিনা ওস্ট্রোডমভ্ পাকলিন সবাই। কৃষকদের ভেতর কেমন করে আন্দোলনটা সুরু করা যায়, এই বিষয়ে আলোচনা কর্তে কর্তে রাত কাবার হয়ে গেল।

ফেরবার পথে নেজ্দানভ ভাবলে—সত্যি এতদিন কিছুই করা হয় নি, পনেরটা দিন, কম ত নেহাৎ নয়—কাজের লোক হলে হয় ত এর মধ্যেই একটা ওলট পালট করে দিতে পার্ত।

পাশের গাঁয়ের জমিদার মঁসিয়ে কোলমিয়েটজেভকে সিপিয়াজিন প্রায়ই নেমন্তন্ন করতেন। ডিনার খেতে খেতে একদিন তিনি নেজ্দানভকে বল্লেন, "শুনেছেন চাষা ব্যাটাদের কাণ্ডখানা?"

"আজ্ঞে না। কি কর্লে তারা?"

"একেবারে খুন মশাই, একেবারে খুন! প্রিন্স মাইকেলকে চাষারা একদম প্রাণে মেরে ফেলেছে! যত ভাবছি তত রক্ত গরম হয়ে উঠছে, দিন দিন এ সব কি হচ্ছে বলুন ত—"

নেজ্দানভ বল্লে, "কিন্তু আমার মনে হয় প্রিন্স মাই-

কেলের মত যারা প্রজাদের রক্ত শুষে আজীবন অর্থসঞ্চয় করে তারা যত মরে ততই ভাল। পৃথিবীর কলঙ্ক ওরা—"

"আপনি এ কি বলছেন মঁসিয়ে নেজ্‌দানভ্‌—আপনি কি আমাকে অপমান করতে চান?"

"সে কি। অপমান করলাম কি করে?—"

"প্রিন্স মাইকেল আমার বন্ধু, তাঁর অপমানসূচক কথা বললে আমাকেও অপমান করা হয়, এটা বুঝেন না? পেটের দায়ে চাকরী করতে এসে এত লম্বা লম্বা কথা কিসের হে?"

"ওরে বাপরে। আর ভয় দেখাবেন না। এই দেখুন আপনার ভয়ে আমার পা কাঁপছে ঠক ঠক করে—"

সকলে নেজ্‌দানভের কথায় একেবারে অবাক্ হয়ে গেল। এমনভাবে কথা যে ও বলতে পারবে এ কেউ আশা করে নি। নেজ্‌দানভ্‌ এবিষয়ে কর্তাকে আর কিছু বলার অবসর না দিয়ে সটান উঠে গিয়ে নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দিলে। খানিক পরে দরজায় টোকা পড়ল। জোর নয়, খুব আস্তে আস্তে। দরজা খুলে নেজ্‌দানভ্‌ দেখলে—মারিয়ানা।

"একি? আপনি এত রাত্তিরে?"

"হঁ্যা, একটা কথা জানাতে এলাম। ওদের কথাবার্তায় মনে হচ্ছে যে আজ আপনি যে রকম ব্যবহার করেছেন, তাতে আর আপনাকে বোধ হয় এরা রাখবে না।"

"না রাখুক ক্ষতি কি? এ জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যাব—"

"কোথায় যাবেন?"

"দেশের কাজ করব বলে যারা জীবন পণ করেছে, তাদের কি অত ভাবতে গেলে চলে? নদীর স্রোতে শেওলা ভেসে যেতে দেখেছেন? আমাদের জীবনটাও ঠিক ঐ শেওলার মত, ভাসতে ভাসতে চলে যাই, হয়ত কোথাও কিছুক্ষণের জন্য আটকা পড়ে গেলাম, তারপর আবার যে কে সেই—"

"আমিও যদি আপনার মত জলের স্রোতে ভেসে যেতে পারতাম—"

"কেন? আপনার আবার দুঃখটা কিসের?"

"বড়লোকের বাড়ীর আশ্রিতদের কেমন করে দিন কাটে তাকি জানেন না মঁসিয়ে নেজ্‌দানভ্‌?"

"ধরা গলায় নেজ্‌দানভ্‌ ধীরে ধীরে বল্‌লে—জানি।"

মারিয়ানা চলে গেলে নেজ্‌দানভ্‌ ঘরের জানলা দিলে খুলে। রাত শেষ হতে দেরী নেই বেশী, চাঁদের পাণ্ডুর আলো জানলা দিয়ে ঘরে এসে পড়ল, সেই দিকে তাকিয়ে নেজ্‌দানভের মনে হল নরম বিছানায় শুয়ে নিরুদ্বেগে রাত কাটান হয় ত এই শেষ। কাল থেকে যে নতুন জীবন আরম্ভ করতে হবে না কে জানে।

পরদিন সকালে সিপিয়াজিনের সঙ্গে দেখা হতেই নেজ্‌দানভ্‌ ভাবলে হয় ত এইবার চলে যেতে বলবে, কিন্তু কোন কথাই বল্‌লেন না তিনি। তাঁর অতিরিক্ত শান্ত মুখ দেখে নেজ্‌দানভ্‌ ভাবলে ঝড় উঠবে শীগগির, বোধহয় এইটে তার পূর্বাভাষ। কুণ্ঠিত হয়ে নেজ্‌দানভ্‌ বল্‌লে, আমায় দুদিনের ছুটী দেবেন?"

"ছুটী? দুদিনের? কোথায় যাবেন আপনি?"

"মার্কেলভের কাছে একটু যেতাম।"

"তা বেশ ত' যান না—"

মার্কেলভের কাছে যেতে মার্কেলভ বল্‌লে, "আমাদের দলে একজন বাড়ল ভাই।"

"কে তিনি?"

"এখানকার ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার সোলমিন। তাঁর কাছে যাবে?"

"আপত্তি কি? দুদিনের ছুটী ত রয়েছে হাতে—"

সোলমিনের সঙ্গে অনেক কথা হল ওদের। আসবার মুখে নেজ্‌দানভ্‌ বল্‌লে, "শুনলাম আপনার ফ্যাক্টরীর শ্রমিকদের জন্য না কি অনেক কিছু করেছেন?"

"কিছু না। কিছু না। একটা হাঁসপাতাল করেছি মাত্তর—। কিন্তু, তাও কি সহজে পারলাম—আমার মনিব বল্‌লেন—ওদের আবার অসুখ কি হে? খেতে পাইনে খেতে পাইনে মুখে বলে বটে, কিন্তু চেহারা দেখ দিকি ওদের, যেন এক একটা যমদূত।"

সকলে হেসে উঠল। কিন্তু সোলমিনের মুখ দেখে নেজ্‌দানভ্‌ বুঝলে মুখে হাসলেও ভিতরে তার ধনীদের উপর কতখানি রাগ জমা হয়ে রয়েছে।

কথায় কথায় সোলমিনের কথা সিপিয়াজিনের কানে উঠল। একদিন নেজ্‌দানভ্‌কে ডেকে বল্‌লেন তিনি,

"আচ্ছা, শুনলাম সোলমিনের সঙ্গে নাকি পরিচয় আছে আপনার? তা আপনি বললে তিনি কি আমার এখানে আসবেন না একবার?"

"কেন বলুন ত?"

"আমার ফ্যাক্টরীটা তাঁকে দেখাতাম একবার। একটা পয়সাও লাভ হয় না আমার ওটা থেকে। শুনেছি খুব ভাল ইঞ্জিনিয়ার তিনি। যদি একবার দেখে শুনে গলদটা ধরে দিতে পারতেন এই জন্যে বলছি আর কি—"

"তা বেশ ত' আপনি নেমন্তন্ন করে পাঠান তাঁকে, আর আমিও চিঠি লিখে দিচ্ছি একখানা।"

সোলমিন এল চিঠি পেয়ে। ফ্যাক্টরী দেখে বললে সিপিয়াজিনকে "এ চলবে না, বুঝলেন? মানে, আগাগোড়া সব কিছু বদলাতে হবে আপনাকে, আর এর পেছনে খাটতেও হবে খুব বেশী। আপনারা সে পারবেনও না—"

কোলমিয়েটজেভ উঠল ফোঁস করে, বললে, "পারব না কি মশায়? এত বড় বড় জমিদারী চালাচ্ছি, আর সামান্য এ কাজ—হুঁ:—

"জমিদারী চালানো থেকে এ কাজটা একটু আলাদা। অনেক বড় লোকই ব্যবসা করব বলে টাকা ফেলে বটে, কিন্তু অভিজ্ঞতা ত' নেইকিছু, কাজেই লালবাতি জ্বলতে দেরী হয় না।"

"বড় লোকদের আপনি একটা অপদার্থ বলে মনে করেন তা হ'লে" কোলমিয়েটজেভ বল্লে রেগে।

"মোটেই না, মোটেই না। এই দেখুন না কত কাজের মতো কাজ করেছেন তাঁরা—ধরুন যেমন ট্যাক্স দেওয়া থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে চলা, ভাল ভাল চাকরীগুলি একচেটে করা, ষ্টেট থেকে আর প্রজাদের কাছ থেকে কত রকম সুবিধে আদায় করা—এসব কাজ কি অপদার্থের দ্বারা হয় নাকি মশায়?"

রাগে কালো হয়ে উঠল কোলমিয়েটজেভের মুখ। হয়ত কেলেঙ্কারী হ'ত একটা, কিন্তু, সিপিয়াজিনের জন্যে তা হ'লনা। হাজার হক নেমন্তন্ন করে ডেকে এনে অতিথিকে অপমান করা যায় না।

রাত্তিরে ডিনারের পর সোলমিন এল নেজদানভের ঘরে। বল্লে, "ডেকে পাঠিয়েছ কেন হে?"

'একটা পরামর্শ করব—?

"কি পরামর্শ"

"মঁসিয়ে সিপিয়াজিনের ভাগ্নী মারিয়ানাকে দেখলে বোধ হয়, উনি আমাদের দলে আসতে চান—তা এ বিষয়ে আপনার মত কি?"

"বেশত, নিয়ে এস না তাকে। থাকবার জায়গার জন্যে ভেবনা—আমার ফ্যাক্টরীতে এসে থাকতে পাবে যতদিন ইচ্ছে—"

একটা ভার নেমে গেল নেজদানভের বুক থেকে। সেই রাত্রেই সোলমিন ফিরে গেল ফ্যাক্টরীতে, কথা রইল, পরদিন সকালে নেজদানভ মারিয়ানাকে নিয়ে চলে আসবে।—

রাত্রের মধ্যেই দুজনে গুছিয়ে নিলে ওদের জিনিষ-পত্তর।—কেউ উঠবার আগে নেজদানভ একটা গরুর গাড়ী নিয়ে এল ডেকে।

ক্যাঁচ কোঁচ শব্দে গাড়ী চল্ল মেঠো পথ দিয়ে। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় ওদের শীত কচ্ছিল বেশ। নেজদানভ বল্লে, "আপনার কষ্ট হ'চ্ছে খুব, না?"

মারিয়ানা বল্লে, "পাগল হ'লেন নাকি? সোনার খাঁচা থেকে পাখী যখন বেরিয়ে পড়ে তখন কি আর সে দুঃখ কষ্টের কথা ভাবে—?"

"তা সত্যি . ...বল্লে নেজদানভ।

সোলমীনের ফ্যাক্টরীতে এসে উঠল ওরা। নেজদানভ এবার কাজ আরম্ভ কল্লে ভীষণ ভাবে। সকাল বেলায় বেরিয়ে প'ড়ে ঘুরতে লাগল গাঁয়ে গাঁয়ে চাষাদের কাছে—তাদের ডেকে ডেকে বলতে লাগল—"তোমরা কি করছ? তোমাদের জাগবার সময় কি এখনও হয় নি?"

চাষারা ভাবলে কোত্থেকে পাগল এসে জুটল দেখ। কেউ বল্লে চাঁদা করে চাঁটি মেরে ঘুচিয়ে দাও ওর পাগলামী—। দিন দিন শুখিয়ে রোগা হয়ে যেতে লাগল নেজদানভ। মারিয়ানা জিজ্ঞেস কর্ল্লে বলত—"কৈ কিছু হয় নি ত।"

একদিন পাকলিন এসে বললে "মার্কেলভ ও আরো অনেকে ধরা পড়েছে। পুলিশ খুঁজছে নেজদানভকে।"

পরের দিন সকালে মারিয়ানা শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখলে নেজদানভ চেয়ারে রয়েছে বসে।

দিনের বেলাকার পোষাক পরা। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে মারিয়ানা, "একি! আপনি ঘুমোন নি সারা রাত?"

"না, বসে বসে ভাবছি"

"কি এত ভাবনা আপনার শুনি?"

"কেন, ভাববার কি কিছুই নেই?"

"ও! সেই পাকলিনের কথা বুঝি? তা এতে ভাববার কি আছে? বেরিয়ে পড়লে দেখবেন সব ঠিক হয়ে গিয়েছে। আপনিই ত বলেছিলেন স্রোতের শ্যাওলার মত নাকি আপনাদের জীবন—ভুলে গেছেন বুঝি সে কথা? ...

নেজ্‌দানভ্‌ খানিক চুপ করে থেকে হঠাৎ মারিয়ানার একখানা হাত ধরে বল্‌লে, "আমায় ক্ষমা কর্তে পার্‌বে?"

"সে কি! ক্ষমা চাইবার মতো কি করেছেন?"

"আছে। তোমায় বলি শোন, আমি আর এ দলে থাকতে চাইনে। আমার মনে হয় না যে এই ভাবে কাজ চালালে সত্যিকারের কাজ কিছু করা হ'বে"।

এই সময় সোলমিন ঘরে ঢুকে বললে, "ওহে! তোমরা তৈরী হয়ে নাও। খবর পেলাম পুলিস আসছে এখানে।" সোলমিনের কথা শুনে নেজ্‌দানভ্‌ উঠে দাঁড়াল। মারিয়ানা বল্‌লে, "কোথায় চল্‌লে?"

"এখুনি আসছি" দরজা থেকে ফিরে এসে আবার বল্‌লে, "আচ্ছা মারিয়ানা, জীবনে যদি আর আমাদের দেখা না হয়?"

"আঃ, সকাল থেকে কি পাগলের মত বকছেন বলুনত?" নেজ্‌দানভ্‌ কিছু বল্‌লে না, হাসল একটুখানি খালি। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাগানে দাঁড়াল। রদ্দুর উঠে পড়েছে। পাখীদের গান গিয়েছে থেমে, কোত্থেকে রডোডেনড্রনের মিষ্টি গন্ধ আসছে ভেসে। পুলিস আসছে ধরতে, তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হ'বে। আস্তে আস্তে রিভলভারটা বের করে গলার ওপর রাখল নেজ্‌দানভ্‌।

শীতকালের সকাল, তাই ছ্যাঁৎ করে উঠল রিভলভারের ঠাণ্ডা নলটা গলায় ঠেকে। কি সুন্দর পৃথিবী—ভাবলে নেজ্‌দানভ্‌ তারপর খুট করে আওয়াজ হ'ল একটা, আগুনের মত কি লাগল গলায়, নীল রঙের তারা ফুটে উঠল চোখের সামনে। ধরাধরি করে নিয়ে এল সকলে তাকে। জ্ঞান ছিল একটু, সোলমিনকে ডেকে বল্‌লে, মারিয়ানাকে বিয়ে কোরো ভাই, জীবনে সুখী হ'বে" মারিয়ানাকে বল্‌লে, "চল্‌লাম! এ পৃথিবীতে অপদার্থের স্থান নেই। আমি ত পার্‌লাম না, আশা করি তোমরা সর্বহারাদের দুঃখ দূর কর্‌বে একদিন।" সকাল বেলাকার রোদ এসে পড়ল সার্সীময়। শীতের আমেজ একটু কমে গেল। পুলিস এসে দেখলে আসামী শুয়ে—মুখে কিন্তু তার হাসি রয়েছে লেগে এখনও, ঠিক যেন "বড্ড ফাঁকি দিয়েছি তোমাদের" এই ভাবখানা।

প্রতিশোধ

(কবীর)

শ্রীপ্রবোধকুমার মজুমদার

যে তব পথের পরে কাঁটা দেয় বিছাইয়া
দাও তুমি বিছাইয়া তার পথে ফুল,
তোমার বিছানো ফুল তার কাছে নহে ফুল
তার পায়ে বিঁধে ফুল যেন তীক্ষ্ণ শূল।

প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়াল

দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত

আমরা সর্বদা যা দেখতে পাচ্ছি, বা শুনছি, তা' আমাদের কাছে মোটেই অদ্ভুত বলে মনে হয় না। কিন্তু অভাবনীয় কিছু ঘটবে দেখলেই, সহজে তা' বিশ্বাস করতে পারি না। বরং অবাক হয়ে যাই।'

আকাশ থেকে শিলা বৃষ্টি হবে— এটা প্রকৃতির স্বাভাবিক ধর্ম। কিন্তু সময় সময় এমন সকল অভাবনীয় প্রাকৃতিক লীলা দেখি বা শুনি, তাতে আমাদের ভয় খাইয়ে দেয়। সত্য বলে বিশ্বাস হয় না। নিছক আজগুবি বলে মনে হয়।

সম্প্রতি একদিন দৈনিক পত্রিকায় দেখলুম, বিহার প্রদেশের মজঃফরপুর নামক জায়গায় মাছ বৃষ্টি হয়েছে। অতি অদ্ভুত ঘটনা নয় কি? কিন্তু এ রকম অদ্ভুত ঘটনা আরো অনেক জায়গায় ঘটেছে, তা' শুনতে পাওয়া যায়। মাছ, ব্যাঙ্, এমন কি ইঁদুর বৃষ্টিরও অনেক ঘটনা পাওয়া যায়। মিঃ বিপ্লের "দি ওমনিবাস ও বিলিভ্ ইট্ অর্ নট্" নামক পুস্তকে উল্লেখ আছে, মিঃ বিপ্লের একজন বন্ধু তাঁকে লিখে জানিয়েছিলেন যে ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে অস্ট্রেলিয়ার অন্তর্গত কুইন্সল্যাণ্ডের লংগ্রিচ্ শহরে তিনি মাছ বৃষ্টি দেখেছিলেন। বৃষ্টির সময় তিনি নিজে কতকগুলি মাছ কুড়িয়ে দেখেছিলেন যে তারা জীবিত আর লম্বায় দেড় ইঞ্চি থেকে তিন ইঞ্চি পর্যন্ত।

এ রকম বৃষ্টির কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিক বলেছেন যে—যেখানে জল খুব বেশি নয়, সেখানে জলের উপর জলস্তম্ভ বা ঘূর্ণিবায়ু প্রভাবিত হয়ে জলস্থিত মাছ, ব্যাঙ্ ও ব্যাঙাচি প্রভৃতি উড়িয়ে মেঘের কাছে নিয়ে যায়। পরে সেই মেঘ বাতাসে ভেসে অন্যত্র গিয়ে তার থেকে বৃষ্টি হয়। এই রকম বৃষ্টিপাতের সঙ্গে যে সকল জিনিষ পড়তে দেখা গেছে, সেগুলি আকাশের বেশি উঁচু থেকে পড়েনি বলে জানা গেছে।

'মিঃ বিপ্লের উক্ত পুস্তকে রক্তবৃষ্টির ঘটনারও উল্লেখ আছে। ১৯২৮ সালের ২৯শে জুন মঙ্গোলিয়ায় রক্তবৃষ্টি হয়েছিল। মঙ্গোলিয়ার এই রক্তবৃষ্টি লোকের মনে ভয়ের সঞ্চার ক'রেছিল। সাময়িকভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যও নাকি অচল হয়ে গিয়েছিল। ভীষণ আমাশার প্রকোপ দেখা দিয়েছিল। মঙ্গোলিয়রা ভীত হয়ে গরু, বাছুর, গাড়ী, ঘর ছেড়ে চতুর্দিকে পলায়ন করে।

কয়েক বছর আগে আকাশ থেকে এই রকম রক্তবৃষ্টি হতে দেখে ফ্রান্সের অন্তর্গত ক্লারমন্ট্ প্রদেশের লোকেরা ভেবেছিল, বুঝিবা পৃথিবীর প্রলয় উপস্থিত।

এই রকম বৃষ্টির কারণ কি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ কিছু পাওয়া যায় নি। প্রমাণযোগ্য কোন ব্যাখ্যাও করা যায় না। কারো কারো মতে বৃষ্টির পূর্বে বায়ুমণ্ডল লাল রংয়ের ধূলায় পূর্ণ ছিল এবং এই জন্যই বৃষ্টির রং লাল হয়েছিল। হোমার ভার্জিল ও প্লুটার্চ রক্তবৃষ্টির উল্লেখ করে গেছেন। প্লুটার্চ বলেছেন,—মৃত লোকের দেহ থেকে রক্ত বাষ্পে পরিণত হয়ে মেঘে আশ্রয় লয়। পরে সেই মেঘ থেকে পৃথিবীতে রক্তবৃষ্টি হয়।

আধুনিক মত এই যে, 'লিপিডোপ্টেরা' নামক এক রকম গাছের ফল থেকে একসঙ্গে বহু পরিমাণে লাল রংয়ের রস নির্গত হয়ে আকাশে সঞ্চিত হয়। বৃষ্টির সময় জলের সঙ্গে মিশে তা' পড়তে থাকে। এটাকে লোকে ভাবে 'রক্তবৃষ্টি'। আলজি ও রোটিফার্—এই দুটিও এক রকম লাল রংয়ের রসওয়ালা গাছ।

এই রকম গাছ গাছড়ার রসের জন্যই মেরুপ্রদেশের বরফের রং লাল।

ভবিষ্যতে হয়তো একে একে প্রাকৃতিক অদ্ভুত লীলা আরো অনেক ঘটবে শুনতে পাব। এই সবই প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়াল।

আমাদের দেশে মহাভারতে এবং রামায়ণে বহুস্থানে রক্ত বৃষ্টির উল্লেখ আছে।

ভারত ইতিহাসের ধারা

শ্রীকুমারেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৩,০০০,০০০,০০০ বর্ষ পূর্বে সৌরজগৎ একটা প্রকাণ্ড বাষ্পময় জলন্ত পিণ্ড ছিল। ধীরে ধীরে এই জলন্ত পিণ্ড ঠাণ্ডা হইতে থাকে ও ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া সূর্য, নবগ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহকণিকা, ধূমকেতু প্রভৃতিতে পরিণত হয়। অপেক্ষাকৃত ছোট পিণ্ডগুলি শীঘ্র শীতল হয়। ১,০০০,০০০,০০০ বর্ষ পরে জলন্ত পিণ্ড ক্রমে উত্তপ্ত দ্রব পিণ্ডে পরিণত হয় ও এই দ্রব গোলকের উপর সরের ন্যায় পাথরের পাতলা আস্তরণ জমে।

১৯৭২৯৪৮১০১ খৃষ্ট পূর্বাব্দে বর্তমান শ্বেত বরাহ কল্পের আরম্ভ।

১৯৫৫৮৮৩১০১ খৃঃ পূঃ অর্থাৎ কল্পারম্ভের ১৭০৬৪০০০ বৎসর পরে হিন্দুপুরাণের মতে পৃথিবীর উৎপত্তি বা সৃষ্টি হয়। সৃষ্টির আদিতে ১ম মন্বন্তরের প্রভু স্বায়ম্ভুবমনু ৭১ মহাযুগ পর্যন্ত শাসন করেন। এক মহাযুগ ৪৩২০০০০ বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী। একটি মহাযুগ আবার চারিটি প্রধান যুগে বিভক্ত। এক মহাযুগে সত্যযুগ বা কৃতযুগ ১৭২৮০০০ বৎসর, ত্রেতাযুগ ১২৯৬০০০ বৎসর, দ্বাপরযুগ ৮৬৪০০০ বৎসর ও কলিযুগ ৪৩২০০০ বৎসর হয়। কলিযুগের দ্বিগুণ দ্বাপর, কলির তিনগুণ ত্রেতা, ও কলির চারগুণ সত্যযুগের আয়ু। ২য় মনু স্বারোচিস ২য় মন্বন্তরে ৭১ মহাযুগ পর্যন্ত শাসন করেন। ৩য় মনু উত্তমৌজঃ ৩য় মন্বন্তরে ৭১ মহাযুগ পর্যন্ত শাসন করেন। ৪র্থ মনু তামস ৪র্থ মন্বন্তরে ৭১ মহাযুগ পর্যন্ত শাসন করেন। ৫ম মনু রৈবত ৫ম মন্বন্তরে ৭১ মহাযুগ পর্যন্ত শাসন করেন। ৬ষ্ঠ মনু চাক্ষুষ ৬ষ্ঠ মন্বন্তরে ৭১ মহাযুগ পর্যন্ত শাসন করেন। বর্তমানে ৭ম বৈবস্বত মনুর শাসনকাল প্রচলিত। তাঁহার সময়ের ২৭টি মহাযুগ গত। ২৮তম মহাযুগের সত্য ত্রেতা, দ্বাপর, যুগ গত ও কলিকালের ৫০৪০ বৎসরও গত। ২৮তম মহাযুগের কলিকালের আদি সন্ধি চলিতেছে। ৩২৮৯৯ খৃষ্টাব্দে কলিযুগের আদি সন্ধি শেষ হইবে ও প্রকৃত কলিকাল আরম্ভ হইবে। ৩৯৮৯৯ খৃঃ এ প্রকৃত কলিযুগের সমাপ্তি ও কলিযুগের অন্ত্য সন্ধি আরম্ভ হইবে। ৪২৮৮৯৯ খৃঃ কলিযুগের অন্ত্য সন্ধির অবসান হইবে। বৈবস্বত মন্বন্তরের ২৮তম মহাযুগের অবসান হইবে।

প্রত্ন পাষাণ যুগ (Colithic Age)—এই যুগে মানুষ সবে পশুত্ব ছাড়িয়ে মনুষ্যাকার ধারণ করে। হাড়ের বা ধারাল বা ছুঁচলো পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করে। অস্ত্র নির্মাণ করিতে তখনও শিখে নাই।

৫০০০,০০০ হইতে ১০,০০০ বর্ষ পর্যন্ত প্রাচীন পাষাণ যুগ। এই যুগে মানুষ চকমকি পাথরের অস্ত্র গড়িতে শিখে। যাদুঘরে এই যুগের অস্ত্র রাখা আছে।

৫৫০,০০০ বৎসর পূর্বের নরকঙ্কাল (Pithecanthropus) যবদ্বীপে ১৮৯২ খৃঃঅব্দে এবং ৫০,০০০ বর্ষ পূর্বের নর কঙ্কাল জার্মানীর Neanderthal দেশে পাওয়া গিয়াছে। এই রূপের মানুষ য়ুরোপে ২৫০০০ বৎসর বাস করে। উত্তর প্রাচীন পাষাণ যুগে Cromagnon ও Grimaldi জাতীয় লোক সম্ভবতঃ ঈজিপ্ট হইতে য়ুরোপে প্রবেশ করিয়া Neanderthal বংশ ধ্বংস করে। Cromagnon জাতের লোকেরা লম্বা, ফর্সা, চওড়া মুখ ও লম্বা নাকওয়ালা ছিল। Grimaldiরা সম্ভবতঃ নিগ্রোদের মত ছিল। এই দুই জাতি য়ুরোপে প্রায় ১৫০০০ বৎসর বাস করে। ইহারা হাড়ের সূচী ও বর্শা,

নির্মাণ করিত। মাটির বাসনও তৈয়ার করিত ও গুহার গায়ে ছবি আঁকিত।

২০,০০০ হইতে ৩০,০০০ বর্ষ পূর্বে য়ুরোপে Aurignaciansরা বাস করিত। ইহারা খুব উন্নত শিল্পী ছিল। গুহার গায়ে সুন্দর সুন্দর চিত্র পেরেনিজ পাহাড়ে পাওয়া গিয়াছে। সায়োন নদীর তীরে ফ্রান্সে প্রাপ্ত Soultreansদের নির্মিত বর্শাফলক পাওয়া গিয়াছে। ইহারা বেশী উন্নত শিল্পী ছিল না কিন্তু ভাল যোদ্ধা ছিল। ইহাদের পর ১৬০০০০ বর্ষ পূর্বে Magdelaniansরা য়ুরোপে বাস করে। ইহারা ভাল শিল্পী ছিল না কিন্তু হাড়ের harpoon বা বর্শাফলকের আবিষ্কার করে। ইহা কাহারও শরীরে বিদ্ধ হইলে বাহির করা কষ্টকর হয়।

৬ বা ৭ হাজার বৎসর পর্যন্ত য়ুরোপ খুব ঠাণ্ডা ছিল। লোকেরা বাধ্য হইয়া বেশীর ভাগ সময়ে গুহার ভিতর কাটাইত। সেই একঘেয়েমি দূর করিবার জন্য আগুন জ্বালিয়া তাহারা গুহার দেওয়াল চিত্রিত করিত। সেই সময়কার জন্তু শিকারের চিত্র বা যুদ্ধের চিত্র আঁকিত। প্রাচীন প্রস্তর যুগের সমস্ত জাতিগুলির মধ্যে Magdelaniansরাই শিল্পের অধিক নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে।

১০,০০০ হইতে ৬০০০ বর্ষ পর্যন্ত নবীন পাষাণ যুগ। এই সময়ে মানুষরা অগ্নি আবিষ্কার করে ও সুরুচি সম্পন্ন সুদৃশ্য পাথরের অস্ত্র ও যন্ত্র নির্মাণ করে। আগুনে তাতাইয়া জলের ছিটা দিয়া ফাটাইয়া ও উত্তমরূপে পালিশ করিয়া পাথরের অস্ত্রাদি নির্মাণ করিত। এই সময়ে স্বর্ণ ধাতু আবিষ্কৃত হয়। তামা ও টিন আবিষ্কৃত হয়। ব্রঞ্জ নামক মিশ্র ধাতুর তলওয়ার, বর্শা প্রভৃতি নির্মিত হয়। উত্তর ভারতে তামার অস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। টিন না থাকায় ব্রঞ্জ নির্মিত হয় নাই। য়ুরোপে ব্রঞ্জ বহুকাল প্রচলিত ছিল। পয়সা ব্রঞ্জের তৈয়ারি। পরে লোহার আবিষ্কার হয়। উত্তরভারতে নব প্রস্তর যুগের পর তাম্রযুগ ও পরে লৌহ যুগ আসিয়াছিল। ব্রঞ্জযুগ ভারতবর্ষে নাই।

ঝড়ের সময় গাছের ডালে ডালে ঘর্ষণের ফলে জঙ্গলে আগুন লাগিতে দেখিয়া শুষ্ক কাঠ ঘষিয়া অগ্নি উৎপাদনে সফল হয় মানুষ ও শীত নিবারণ করিতে শিখে। শিকারকে চকমকি পাথর ছুড়িয়া মারায় তাহা অন্য পাথরের উপর পড়িয়া স্ফুলিঙ্গ বাহির হয়। এইরূপেও অগ্নি আবিষ্কার হয়। অগ্নিহোত্র ব্রাহ্মণরা এখনও অরণি কাষ্ঠ ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া তাহাতে আহুতি দেন। দক্ষিণ ভারতে প্রস্তর যুগের পর লৌহযুগ আরম্ভ হয় তাম্রযুগের চিহ্ন পাওয়া যায় না।

ধনের পরিণাম

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম. এ. বি. টি.

ধনহীন জন ভাবে মনে মনে পেতাম যদি প্রচুর ধন।
খাইয়া বারেক দেখিতাম তবে ভোজনে স্ফূর্তি আছে কেমন
হায় প্রহেলিকা সবই দেখি ফাঁকা অর্থ পেলেই ক্ষুধাটি যায়।
"কি খাব" এ কথা ভুলিয়া তখন "কেমনে খাইব" ভাবি যে হায়

রণ-রঙ্গ

(১)

একটা গুজব রটেছিল যে হিট্লার নাকি ১৫ই অগষ্ট্ লণ্ডনে গিয়ে চা পান করবেন। লণ্ডনের একটি সমিতির ঐদিন সাংবাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে চা-পার্টির অনুষ্ঠান ছিল। অতিথি, অভ্যাগত, নিমন্ত্রিত সকলেই এসে সমবেত হয়েছেন। চা'য়ের সময় প্রায় উত্তীর্ণ হয়, আহ্বানকারীরা তবুও প্রস্তুত হচ্ছেন না দেখে সবাই একটু বিস্ময় বোধ করছিল। ওঁরা তখন জানালেন যে দুজন বিশিষ্ট অতিথির আসবার কথা আছে, তাই তাঁরা একটু অপেক্ষা করছেন। এমন সময় বাইকের ঘণ্টাধ্বনি করতে করতে হন্তদন্ত হ'য়ে একজন টেলিগ্রাফ-পিয়ন এসে দু'খানি টেলিগ্রাম দিয়ে গেল। আহ্বানকারীরা মহা আড়ম্বরে সেই টেলিগ্রাম দুখানি সমবেত সকলকে পড়ে শোনালেন। প্রথমখানি এসেছে জার্মানীর 'বার্চেসগার্টন্' থেকে। পাঠাচ্ছেন শ্রীযুক্ত এডল্ফ্ হিট্লার। জানিয়েছেন—"বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে আবদ্ধ হয়ে পড়ায় আজ এই ১৫ই অগষ্ট্ পূর্বপ্রতিশ্রুতিমত লণ্ডনে গিয়ে চা-পানের আনন্দ থেকে আমাকে বঞ্চিত থাকতে হ'ল। এজন্য বিশেষ লজ্জানুভব ও দুঃখ বোধ করছি। দ্বিতীয়খানি আসছে সুদূর ইটালির রোমনগরী থেকে। পাঠাচ্ছেন শ্রীযুক্ত বেনিটো মুসোলিনী। জানিয়েছেন—দাদা এডলফেরই আদেশে আফ্রিকার কাফ্রীদের সম্বন্ধে একটা কিছু ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত আছি বলে আমি আজ আর লণ্ডনের পথে দাদার সঙ্গী হ'তে পারলাম না। এজন্য বিশেষ দুঃখিত। আপনাদের চা-পার্টির সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

সমবেত নিমন্ত্রিতেরা চা-পানে বিলম্বজনিত সমস্ত বিরক্তি ভুলে আনন্দে করতালি দিয়ে উঠলেন।

(২)

লণ্ডনে বিমান আক্রমণ হচ্ছে। শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে মা গিয়ে ঢুকেছেন 'এ-আর-পি'র পাতাল-আশ্রয়। গোলেমালে ছেলে ঘুম থেকে উঠে পড়েছিল। বহুক্ষণ হয়ে গেল, তবু নিরাপত্তাজ্ঞাপক বংশীধ্বনি হচ্ছেনা, অথচ রাত বাড়ছে দেখে মা ছেলে ভুলানো গান গেয়ে গেয়ে ছেলেকে ঘুমপাড়াবার চেষ্টা করছিলেন। ছেলে হঠাৎ বলে উঠলো "লক্ষ্মীমা আমার। দয়া করে গানটা একটু থামাও। তোমার গানের জন্য আমি যে কানে আর জার্মাণ বোমা ফাটাবার একটুও শব্দ পাচ্ছি না। আমায় তুমি মেশিনগানের গান একটু শুনতে দাও। অন্ততঃ বিমান বিধ্বংসী কামান কেমন গর্জন করে উঠছে সেটাও একটু না হয় শুনি।

(৩)

গোয়েরিং বললে গোয়েবল্স্ কে—আরে ভাই বড় 'দিক্' করলে ওই ব্রিটীশ 'আর এফ্-এ'র ছোকরাগুলো! বেশ ছিলুম নিশ্চিন্ত হয়ে। ঝাঁকে ঝাঁকে বিমান রাত্রিবেলা লণ্ডনে পাঠিয়ে আমরা দিব্যি আরামে ঘুমাচ্ছিলুম, কিন্তু একি ফ্যাসাদ শুরু হ'ল রাতারাত? কাল রাত্রে ওদের

জ্বালায় প্রায় তিনঘণ্টা ঘুমুতে পারিনি—কানের কাছে ক্রমাগত ভটা-ভট্‌!

গোয়েবল্‌স্‌ ঠোঁটের উপর একটি আঙুল চাপা দিয়ে বললে—"চুপ! চুপ! কে এখনি শুনতে পাবে! দেওয়ালেরও কাণ আছে। আমি প্রচার করিছি, মাত্র আধঘণ্টা ঘুমের ব্যাঘাত হয়েছিল।

গোয়েরিং রেগে ঘুসো পাকিয়ে বললে—সে তুমি যা খুশী করগে—আমি কিন্তু আজ ইংল্যাণ্ডকে ৬ ঘণ্টা জাগিয়ে রেখে কালকের ঘুমোতে না দেওয়ায় শোধ নেব।

(৪)

লণ্ডনের এক প্রসিদ্ধ হোটেলের বারান্দায় ব'সে ডিনারের পর কফি খাচ্ছিল মেয়েরা। এমন সময় বেজে উঠলো 'এ-আর-পি'র সতর্কতা মূলক ঘণ্টাধ্বনি। একটি সৌখীন স্ত্রীলোক কফির পেয়ালাটি নিঃশেষ করে সামনের ট্রে'খানিতে ধীরে সুস্থে নামিয়ে রেখে বিরক্ত হয়ে বললেন "আঃ! এই নাজী বর্ব্বরগুলোর একটু কি সময়-অসময় জ্ঞান নেই। যখন তখন তেড়ে আসছে।"

আর একটি মহিলা তাকে সমর্থন করে বললেন—'ঠিক বলেছ' জার্ম্মাণ হূনগুলো বেজায় বেরসিক। আমাদের নাচটা শুরু হয়ে গেলে যদি আসতো আপত্তি ছিল না।" আর একজন বললেন—"দেখ দিকিনি ভাই! এমন চাঁদনী রাত, শরতের রূপ যেন প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গে দীপ্ত হয়ে উঠেছে—এটা কি পাতালে গিয়ে ঢোকবার উপযুক্ত সময়?" এবার একটি বয়স্কা মহিলা বললেন—মাটীর নীচেয় তো লোকে মরবার পরই যায়। যত নষ্টের গোড়া ওই আইবুড়ো কার্ত্তিক। আমাদের জীবন্ত কবরে নিয়ে গিয়ে ঢোকাচ্ছে।
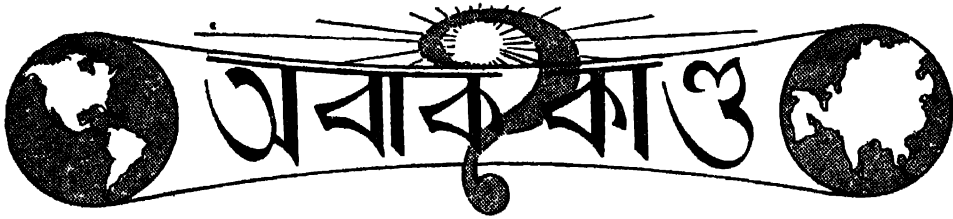
শ্রীহরিনারায়ণ ভট্টাচার্য

চড়মারা বাজী

রাশিয়ায় শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে একটা খুব প্রিয় খেলা হ'ল পরস্পরের গালে অনবরত চড়মারা। এর খেলারও প্রতিযোগিতা হয়। একবার এই রকম একটি চড়মারা খেলার প্রতিযোগিতায় মাইক্যালকো গোনিয়ুক এবং ওয়াসিল্‌ বেজবোরোদিনী নামে দু'টি লোকে প্রায় ৩৬০ ঘণ্টা ধরে পরস্পরের গালে চড় মেরে সকলকে আশ্চর্য করে দিয়েছিল। খেলুড়েদের এ খেলায় আমোদ হয় কিনা বলা শক্ত, কিন্তু দর্শকেরা যে এই চড়মারা খেলা ভয়ানক আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করে সেটা বোঝা যায়—প্রতি চড়ের সঙ্গে তাদের উল্লসিত অট্টহাস্য শুনে।

পদশূন্য নর্ত্তক

ফরাসী নৃত্যকলার প্রতিভাবান শিল্পী মঁশ্যে সিবাস্তিঁয়ে স্পিনোলা ষোড়শ শতাব্দীতে ফ্রান্সকে এক নূতন নৃত্য কৌশল শিক্ষা দিয়ে অমরত্ব অর্জন করে গেছেন। কিন্তু তোমরা শুনে আশ্চর্য হবে যে, তাঁর বয়স যখন মাত্র ১১ বছর, তখনই একটা দারুণ দুর্ঘটনায় তার দু'টি পা'ই ভেঙে যাওয়ায় একেবারে কেটে বাদ দিতে হয়েছিল। সেই থেকে তিনি কাঠের পা' ব্যবহার করতে শেখেন এবং সেই কাঠের পায়ের সাহায্যেই পরে নৃত্যকলায় অদ্ভুত দক্ষতা দেখিয়ে গেছেন। কাঠের পা নিয়ে তিনি নাচতেন বলে নাচবার সময় পায়ের তালে তালে খটাখট্‌ শব্দ হ'ত। কাঠের মেঝের উপর নেচে য়ুরোপ আজও সেই খটাখট্‌ শব্দটি বজায় রেখেছেন
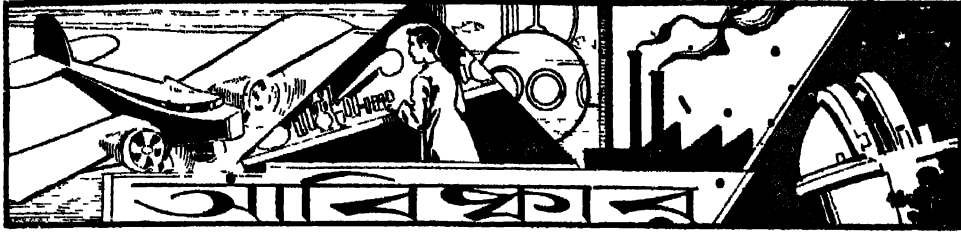
ইস্পাতের রেশম।

কথাটা শুনতে 'সোনার পাথর বাটির' মতো মনে হচ্ছে, না? কিন্তু ব্যাপারটা সত্য। বিজ্ঞানের জোরে হয়ত সোনার পাথরবাটিও একদিন সম্ভব হতে পারে। এই ইস্পাতের রেশম অর্থাৎ মাথার চুলের ন্যায় অতি সূক্ষ্ম ইস্পাতের আঁশ বা চোকলা প্রতিদিন রাশি রাশি তৈরি হচ্ছে জার্মাণী ও ইংলণ্ডে। কারণ এই ইস্পাতের সূক্ষ্ম সূতা য়ুরোপের সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় কলকব্জা ঘসে মেজে পরিষ্কার রাখার কাজে লাগে। সম্প্রতি সেখানকার হোটেলওয়ালা ও গৃহস্থেরাও কেবলমাত্র তাদের ধাতব তৈজস পত্রই পরিষ্কার রাখার জন্য নয়, কাঁচের বাসন এমন কি কাঠের আসবাব পত্রও ঘসে মেজে ঝেড়ে মুছে সাফ্ করে রাখে। তোমরা শুনে আশ্চর্য হবে যে, এই ইস্পাতের রেশমের সংস্পর্শে কাঁচের জিনিস এবং পালিশ করা দামী কাঠের আসবাবে এতটুকু আঁচড় বা দাগ পড়ে না। আজকাল ঘরের মেঝে, মোটর গাড়ী, প্রভৃতি সাফ্ করবার জন্যও এই ইস্পাতী রেশমের প্যাড ব্যবহার হচ্ছে।

পিসবোর্ডের রেকর্ড।

তোমরা বোধ হয় জানো যে, গ্রামোফোনে যে রেকর্ড বাজানো হয় তা গালার তৈরি। গালার দাম একটু বেশী, তাই গ্রামোফোন রেকর্ড সস্তায় বিক্রী করতে পারা যায় না। অথচ সস্তায় দিতে না পারলে বিক্রী বাড়ে না। অনেকেরই হয়ত একটা গ্রামোফোন কেনবার সখ ও সামর্থ দুইই আছে, কিন্তু নিত্য নূতন রেকর্ড অত দাম দিয়ে কেনবার ক্ষমতা নেই। রেকর্ড যদি সস্তায় দিতে পারা যায় তাহলে গ্রামোফোনেরও বিক্রয় বাড়বে। এই জন্য গালার বদলে অন্য কিছুর সাহায্যে রেকর্ড তৈরি করবার চেষ্টা চলছিল। সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান ল্যাক রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের চেষ্টায় পিসবোর্ডের রেকর্ড তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। চাকতিখানি পিসবোর্ডের হবে, তার দু'পিঠে পাতলা গালার পোচ লাগিয়ে চমৎকার রেকর্ড তৈরি করা চলবে। খরচ চার পাঁচ আনার বেশী পড়বে না। পিসবোর্ডের রেকর্ড একখানি প্রায় দেড়শবার বাজানো চলবে।

হাতের মাপে জিনিস।

নিউইয়র্কের এঞ্জিলো রাইসেন্জ্ নামে একজন আবিষ্কারক বিবিধ জিনিস তৈরি করছেন ঠিক আমাদের হাতের মাপে। ফাউন্টেন্ পেন্ ঠিক যে ভাবে ধরে আমরা লিখি, আমাদের বৃদ্ধাঙ্গুলি এবং তর্জনি ও মধ্যমা কলমটির গায়ে যেখানে যেভাবে লাগে সেইখানটি ঠিক সেই আঙুলের চাপের মাপে একটু টিপে ঈষৎ খাল করে এমন ভাবে তৈরি হচ্ছে যে কলমটি ধরতে আঙুলের উপর আর একটুও চাড় পড়বে না এবং অনেকক্ষণ আরামে ধরে দ্রুত লেখা যাবে। কলমের মতো দাড়ি কামাবার ক্ষুরের বাঁট, পেন্সিল-কাটা চাকু ও খানা খাওয়ার ছুরি কাঁটা চামচের হাতল, জলখাওয়ার গ্লাস, হাতুড়ি, স্ক্রুড্রাইভার প্রভৃতি যন্ত্রপাতির বাঁট, মোটর গাড়ীর ষ্টিয়ারিং হুইল্ ও বাইকের হ্যাণ্ডেল সবকিছুই আমরা ঠিক যে ভাবে মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে ব্যবহার করি, আমাদের হাতের সেই তালু ও আঙুলের চাপ এবং খাঁজ অনুসারে অতঃপর সমস্ত জিনিস তৈরি হবে।

সস্তায় এক্স-রে ফটো।

তোমরা জান বোধ হয়, শরীরের ভিতরে কিছু রোগ হলে, যেমন পেটের ভিতর, বা বুকের ভিতর কিছু হলে তা চোখে দেখা যায় না, কিন্তু এক্স রে আলো ফেলে তার ফটো তোলা যায়। ধরো, পড়ে গিয়ে কারুর কোমরে খুব লেগেছে, ফুলেছে, ব্যথা হয়েছে কিন্তু কোন হাড় সরে গেছে কিনা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না বাইরে থেকে। সেখানে

এক্স-রে প্লেটে ফটো নেওয়াই একমাত্র উপায় সঠিক ভাবে অবস্থাটি জানাবার। কিন্তু এই এক্স রে প্লেটে ফটো নেওয়া এতদিন অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ব্যাপার ছিল। দরিদ্র লোকের পক্ষে সে ব্যয় বহন করা বিশেষ কষ্টকর। হাসপাতালেও বিনামূল্যে এক্স-রে প্লেট তোলে না। তাই, দরিদ্রের বন্ধু মার্কিন ডাক্তার এস, আই, হার্শ দীর্ঘদিনের চেষ্টায় এক নূতনযন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন, যার সাহায্যে এক্স-রে প্লেটে ফটো নেওয়ার খরচ এখন আর এক আনার বেশি পড়বে না। কোটীপতিদের দেশ মার্কিন মুলুকের চেয়ে দরিদ্র ভারতবর্ষে এ যন্ত্রটি বিশেষ কাজে আসবে।

শ্রীগ্রন্থাগারিক

রাক্ষুসে আফ্রিকা—শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র চক্রবর্তী। দাম আট আনা। দেবসাহিত্যকুটীর ২২।৫ বি ঝামাপুকুর লেন।

বইখানি আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে ভীষণ দানবাকৃতি গরিলা, পশুরাজ সিংহ, গুণ্ডা, দাঁতাল বুনোহাতী, ভয়ঙ্কর বুনো মোষদল, দুর্দান্ত গণ্ডার, জিরাফ, জেব্রা, হরিণ, হায়েনা, গণ্ডার, কুমীর, অজগর প্রভৃতির কাহিনী। শিকারীর শিকার বৃত্তান্ত রূপে অতি সুন্দররূপে বর্ণিত। পড়তে শুরু করলে শেষ না করে উঠা যায় না। শতাধিক পৃষ্ঠায় উৎকৃষ্ট ছাপা, কাগজ, বাঁধাই ভালো। মলাটে বহুবর্ণ রঙীন চিত্র ও বইয়ে অনেকগুলি রঙীন চিত্র আছে। এরূপ একখানি বই মাত্র আট আনা দামে খুব সস্তা বলতে হবে।

জনসাহিত্য—রাখালদাস চক্রবর্তী। মূল্য আট আনা চয়নিকা পাবলিশিং হাউস, ৭নং নবীনকুণ্ড লেন, কলিকাতা। গুটি পাঁচেক সমালোচনা প্রবন্ধের চল্লিশ পৃষ্ঠার বই। ছাপা ও মলাট ভাল। লেখক স্বদেশের এবং য়ুরোপীয় সাহিত্য প্রসঙ্গে বর্তমান যুগের সাহিত্যের স্বরূপ ও দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে সংক্ষেপে যা' বলতে চেয়েছেন তা প্রশংসার যোগ্য। এক কথায়, বইখানি আধুনিক সাহিত্যের সমালোচনা।

ময়দানবের বাতি—শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত সাহিত্যো-পাধ্যায়। মূল্য পাঁচ আনা। বসু সাহিত্যমন্দির, রাণা-ঘাট, নদীয়া।

বইখানি খুব ছোট ছোট বালক বালিকাদের উপযোগী করে রচিত। প্রথম ভাগ পড়া শেষ করে দ্বিতীয় ভাগের বানান শেখার আগেই এই সুন্দর গল্পের বইটি ছেলেমেয়েরা পড়তে পারবে। বড় বড় টাইপে সুদৃশ্য নীল কালিতে ছবিসহ ছাপা। যাদের জন্য লেখা, তারা নিশ্চয়ই খুসি হবে।

কথা ও কবিতা—যতীন্দ্রমোহন রায় ও জ্যোতির্ময় ঘোষ সম্পাদিত কবিতা সংগ্রহ পুস্তক। মূল্য এক টাকা। প্রকাশক—ভারত বুক এজেন্সি, ২০৬, কর্নওআলিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে ছোট বড় মোট চৌত্রিশটি কবিতা আছে। তার মধ্যে অর্ধেক অর্থাৎ সতেরোটি কবিতা সম্পাদকদ্বয়ের স্বরচিত। বাকী সতেরোটি কবিতা ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ৺অতুলপ্রসাদ সেন প্রভৃতি হইতে শ্রীগৌরহরি গায়েন, শ্রীদীনতারণ মণি পর্যন্ত সর্বশ্রেণীর লেখকদের রচনা সংগৃহীত। বইখানির ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

পোল্যাণ্ড গত বৎসর 'ড্যানজিগ্ করিডর' জার্মানীকে প্রত্যর্পণ করতে অসম্মত হওয়ায় জার্মানী ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ সালে পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে। এইসূত্রে ব্রিটেন ও ফ্রান্স পোল্যাণ্ডকে সাহায্য করবার জন্য চুক্তিবদ্ধ থাকায় ৩রা সেপ্টেম্বর জার্মানীর বিরুদ্ধে তারাও যুদ্ধ ঘোষণা করেন। য়ুরোপে পঁচিশ বছর পরে আবার এক বিরাট সমরানল প্রজ্বলিত হ'য়ে ওঠে। দেখতে দেখতে আজ এক বৎসর পূর্ণ হয়ে গেল, কিন্তু সে আগুন এখনও নিভল না। কবে যে এ নির্বাপিত হবে তার কোনো নির্দেশও পাওয়া যাচ্ছে না। জার্মানীর যুগান্তকারী রণযজ্ঞে য়ুরোপের ছোট বড় বহুদেশই একেএকে আত্মাহুতি দিলে। পোল্যাণ্ড গেল, ডেনমার্ক গেল, নরওয়ে গেল, ইংলণ্ডের চ্যানেল দ্বীপগুলি গেল, হল্যাণ্ড গেল, বেলজিয়ম গেল, ল্যাক্সেমবুর্গ গেল, শেষে য়ুরোপের মুকুটমণি ফ্রান্সও জার্মানীর প্রচণ্ড আক্রমণে পরাজয় স্বীকার করে নাজী-বাহিনীর পদানত হ'তে বাধ্য হ'ল।

*   *   *   *

একমাত্র ব্রিটেন এখনও একা বীরবিক্রমে জার্মানীর নৃশংস অভিযানকে একহাতে বাধা দিচ্ছে, এবং অপর হাতে সাংঘাতিক প্রত্যাঘাত করছে তাকে। ইটালী এসে গত জুনমাসে জার্মানীর সঙ্গে যোগ দিয়েছে তাদের এই বিশ্বধ্বংসলীলায়। ফ্রান্সের পতনের মাত্র কয়েক দিন পূর্বে সে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে একেবারে নেহাৎ অকারণে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসেছে। ভূমধ্যসাগরের অধিকার নিয়ে বিবাদ তার নিতান্ত একটা অজুহাত মাত্র! সমস্ত পৃথিবী জুড়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সুবিস্তৃত। ভূগোলের মানচিত্রখানির দিকে চেয়ে দেখলে তোমরা দেখতে পাবে তার অধিকাংশই লাল। সপ্তসাগরে প্রতিষ্ঠিত তার প্রবল একাধিপত্য। আটলাণ্টিক মহাসাগরের একদিকে মহাদেশ আফ্রিকা থেকে শুরু করে প্রশান্ত মহাসাগরপারে ক্যানাডা পর্যন্ত এই বিশাল ভূখণ্ডের মধ্যে নানাস্থানে ব্রিটিশ পতাকা সগৌরবে উড্ডীয়মান। এশিয়া মহাদেশে গ্রেট ব্রিটেনের বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য তাকে প্রাচ্যের অধীশ্বর করে রেখেছে।

*   *   *   *

ক্ষুদ্র ইটালি আজ সেই ব্রিটিশ সিংহকে বিপন্ন দেখে আঘাত করতে অগ্রসর হয়েছে। আফ্রিকায় সে ব্রিটিশ অধিকারে পদার্পণ করেছে। উত্তর কেনিয়ার ভিতর দিয়ে এসে সে ব্রিটিশ সোমালিল্যাণ্ড দখল করেছে। সুদান, এ্যালেকজান্দ্রিয়া, কায়রো, এডেন্ ওদিকে মাল্টা ও জিব্রাল্টারেও তার বিমানপোত বোমা বর্ষণ করছে।

*   *   *   *

পঁচিশ বছর আগে জার্মানীকে একা লড়তে হয়েছিল সমস্ত য়ুরোপের বিরুদ্ধে। সে দিন ইটালি ছিল ব্রিটেন ও ফ্রান্সের দিকে। রাশিয়াও ছিল মিত্রশক্তির পক্ষে। জার্মানীকে একসঙ্গে বাধা দিতে হয়েছে পশ্চিম সীমান্তে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের মিলিত শক্তিকে। পূর্বসীমান্তে রুশের বিপুল বাহিনীকে, দক্ষিণে ইটালীর আক্রমণকে। সুদীর্ঘ চার বৎসর ভীষণ বিক্রমে সে সমগ্র য়ুরোপের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। জয় যখন প্রায় তার করতলগত সেই সময় য়হুদী-ষড়যন্ত্রে দেশের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও মিত্র শক্তির মিলিত নৌবহরের প্রচণ্ড অবরোধের ফলে জার্মানী পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। পঁচিশ বছর পরে আজ আবার যে যুদ্ধে সে ব্যাপৃত হয়েছে তাতে ইটালীকে সে পেয়েছে তার স্বপক্ষে, রাশিয়া তার শত্রু না হয়ে মিত্ররূপে অবস্থান করছে। সমগ্র য়ুরোপ তার পদানত। কেবলমাত্র অপরাজেয় ব্রিটেনকে সে করায়ত্ত করতে পারেনি এখনও।

*   *   *   *

তোমরা যারা ইতিহাসের ছাত্র, বোধহয় পড়েছ যে প্রায় কিঞ্চিদধিক একুশ পঁচিশ বছর আগে য়ুরোপে এক

মহাবীর বিশ্বজয়ের কল্পনায় উৎসাহিত হয়ে দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিলেন। তিনি বিশ্ববিশ্রুত বীর নেপলিয়ঁা বোনাপার্ত। তিনিও সমস্ত য়ুরোপকে তাঁর পদানত করেছিলেন। কিন্তু, ব্রিটেনকে অবনত করতে পারেন নি কিছুতেই। সেদিন নেপলিয়নকে বাধা দেবার জন্য ব্রিটেনের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল জার্মানী ও রাশিয়া। রাশিয়া গোড়ার দিকে নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে তার অধীনতা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়ে ছিল, কিন্তু পরে সে বিদ্রোহী হয়। নেপলিয়ন রাশিয়ার সেই বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে ছিলেন। সেই অবসরে জার্মানী ও ব্রিটেনের মধ্যে একটা গোপন চুক্তি হয় নেপলিয়নকে জব্দ করবার জন্য। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিপুল ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে নেপলিয়নকে 'ওয়ারশ' থেকে প্রত্যাবর্তন করতে হয়। কিন্তু, কে জানতো যে সেদিন তাঁর ভাগ্যরবি 'ওয়ারশ'র আকাশেই অস্তাচল চূড়াবলম্বী হয়েছে। জার্মানীর সাহায্যে ব্রিটেনেরই হাতে শেষে নেপলিয়ন পরাজিত ও বন্দী হয়েছিলেন। কে বলতে পারে আজ একশ বছর পর অপরাজেয় ব্রিটেনের কাছে উদ্ধত জার্মানীরও সেই অবস্থা হবে না।

* * * *

পোল্যাণ্ড গেছে, কিন্তু পোল্যাণ্ডের প্রধান নেতারা আজ ইংলণ্ডের আশ্রয়ে শক্তি সঞ্চয় করছে। নরওয়ের রাজা হাকন তাঁর পার্শ্বচরদের নিয়ে ব্রিটেনে অবস্থান করছেন। হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামের রাষ্ট্রীয় ধুরন্ধরেরাও এসে ব্রিটেনের পতাকাতলে আশ্রয় নিয়েছে। জেকোশ্লোভাকিয়া তার অপমান আজও ভুলতে পারেনি। ফ্রান্সের স্বাধীনতা-কামী সৈনিকেরা ও নৌ-সেনাধ্যক্ষরা বৃটেনে সমবেত হয়েছে। সমগ্র বৃটিশসাম্রাজ্য আজ মুক্তহস্তে বিপন্ন ব্রিটেনকে সাহায্য করছে। বিশ্ববিজয়ী ব্রিটিশ রণপোত ও বাণিজ্য বহরের শক্তি বৃদ্ধি করেছে—নরওয়ে, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের রণতরী ও বাণিজ্যবহর। হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম এমন কি ফ্রান্সেরও সমুদ্রপারের সাম্রাজ্যখণ্ড থেকে ব্রিটেনের কাছে সাহায্য আসছে নিত্য নানাভাবে। পৃথিবীর অপর গোলার্ধ আমেরিকাও বৃটেনের বন্ধু। সপ্তসাগরাধিপতি ব্রিটেন শত্রুরাজ্যের সমস্ত বন্দর অবরোধ করে রেখেছে। শুধু খোলা আছে তার আকাশ পথ। সেই পথেই সে ব্রিটেনকে পুনঃপুনঃ আক্রমণ করে বিধ্বস্ত করবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে বটে, কিন্তু ব্রিটেন—ব্রিটেন। সে শত্রুর কাছে পরাজয় মানতে রাজি নয়।

মিছে শোক

শ্রীঅনিলকুমার চক্রবর্ত্তী পুরাণবন্থ

সকালে ফুটিয়া ফুল সাঁঝে ঝরে যায়,
কোরকের তাতে কিছু নাহি আসে যায়।
সেইরূপ মানবের জনম-মরণ,
মিছে শোক তাপ সয় প্রিয় পরিজন।

'পাঠশালা' চতুর্থবর্ষে নব কলেবরে প্রকাশিত হল। সুদীর্ঘ তিন বৎসর কাল যে তার নিজের প্রতিষ্ঠা ও সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখে অগ্রসর হয়েছে, আশা করা যায় চতুর্থ বৎসরে সে আরও উন্নত হয়ে চলতে পারবে, এর ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্য আরও বাড়বে, এবং পাঠক পাঠিকা ও গ্রাহক গ্রাহিকাদের প্রীতি ও সহানুভূতি লাভে উৎসাহিত ও ধন্য হবে।

পাঠশালায় এবার 'প্রশ্নোত্তর বিভাগ' নিয়মিত চলবে। এই বিভাগের ভিতর দিয়ে গ্রাহক গ্রাহিকারা তাদের অনুসন্ধিৎসা ও জ্ঞান নানাদিকে বাড়াতে পারবেন এবং এই সূত্রে পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাবেন। পাঠশালার এই বিভাগে যার যা প্রশ্ন থাকবে গ্রাহক গ্রাহিকাদের সবপ্রথম সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দেবার সুযোগ দেওয়া হবে। "চিঠিপত্র" বিভাগেও তাদের অভাব অভিযোগ ও মতামত প্রতিমাসে ছাপা হবে। আশ্বিনের পাঠশালা কেমন লাগলো, বা কার্তিকের 'পাঠশালায়' সবচেয়ে কি ভাল লেগেছে এই বিভাগে লিখে জানাবে। 'অঙ্ক ক্রীড়া নয় অক্ষর ক্রীড়া' নামে একটি কথার খেলা এবছরের পাঠশালায় প্রতিমাসে থাকবে। তাছাড়া 'শব্দ-সন্ধান' প্রতিযোগিতায় পাঠশালার গ্রাহকদের অনুরোধে এবছর থেকে নির্ভুল উত্তর দাতাকে পাঁচটাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। পাঠশালার নিত্য নূতন ধরণের 'ধাঁধা' পাঠশালার পড়ুয়াদের প্রচুর আনন্দ দেবে নিশ্চয়।

পাঠশালায় এবছর যে-প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়েছে তাতে পাঠশালার গ্রাহক গ্রাহিকারা যোগ দিলে শ্রেষ্ঠ রচনায় দক্ষতা অর্জনের বিনিময়ে তাঁরা কতকগুলি ভাল ভাল বই সংগ্রহ করে রাখবারও সুযোগ পাবেন। এ থেকে ক্রমে তাঁদের নিজেদের একটি ছোট খাটো 'লাইব্রেরী' গড়ে উঠতে পারে। 'প্রবন্ধের' পরই 'গল্প', তার পরই 'কবিতা' এইভাবে প্রতিমাসে নূতন নূতন প্রতিযোগিতা চলবে। বাংলা দেশের প্রসিদ্ধ গণ্যমান্য শ্রেষ্ঠ লেখক লেখিকাদের রচিত গল্প, উপন্যাস, কবিতা, ইতিহাস, ভ্রমণ, জীবনকাহিনী, পৌরাণিক কাহিনী, দেশ বিদেশের সাহিত্য, শিল্প, বাণিজ্য, চিত্রকলা এবং বিজ্ঞানের নানা বিভাগ পাঠশালায় নিয়মিত থাকে, তাছাড়া আরও অন্যান্য বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়েরও প্রতিমাসেই সন্নিবেশ করা হয়। 'হাস্য কৌতুক' এবং 'অবাক-কাণ্ড' পাঠশালার আর এক বিশেষত্ব। 'পাঠশালা' তাদেরই কাগজ যারা কেবলমাত্র গল্প পড়ে সময় নষ্ট না করে, অবসর সময়টা আনন্দের সঙ্গে অনেক কিছু জানতে ও শিখতে চায়।

পৃথিবীর কোন দেশে কি নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হ'চ্ছে পাঠশালায় প্রতিমাসে তার সংবাদ দেওয়া হয়। 'বিশ্ববার্তা' বিভাগে জগতের বর্তমান অবস্থার বিশদ আলোচনা থাকে। 'বিচিত্র সংবাদে' এমন সব খবর সংগ্রহ ক'রে দেওয়া হয় যা অদ্ভুত, বিস্ময়কর অথচ শিক্ষাপ্রদ। অনেক ভুলে যাওয়া প্রাচীন খবরও থাকে। পাঠশালা শিক্ষায় অগ্রসর উচ্চশ্রেণীর ছেলে মেয়েদের কাগজ। ছোটদের জন্য নয়।

গ্রাহক গ্রাহিকাদের রচনা প্রকাশযোগ্য হলে সাদরে তা পাঠশালায় প্রকাশিত করে তাদের উৎসাহ দেওয়া হয়। 'পাঠশালা'ই একমাত্র কাগজ যাতে গ্রাহক গ্রাহিকাদের রচনাগুলি অবজ্ঞার সঙ্গে একত্রে জড় করে একপাশে বিশেষ করে "গ্রাহকদের জন্য" চিহ্নিত কোন পৃষ্ঠায় না ছেপে সকলের রচনার সঙ্গে সমান আদরে ও মর্যাদায় স্থান দেওয়া হয়।

*　　*　　*　　*

মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের দরবারে হাজির হ[illegible] জন্য ভারতের বিভিন্ন দলের চূড়ামণিদের আর[illegible] ডাক পড়েছিল। ভারতবর্ষকে স্বায়ত্ত শাসন[illegible] নয়, দিল্লীর কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদে ভার[illegible] প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা শাসন সংক্রা[illegible]

সমিতি গঠন করবার উদ্দেশ্য নিয়ে। ভারতের সকল দলের প্রতিনিধিদের এই সম্মিলিত পরিচালক সমিতি উপস্থিত ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে এক যোগে কাজ করুক। তাদের সমস্ত শক্তি ও প্রভাব নিয়ে ভারতকে ইউরোপীয় যুদ্ধে ব্রিটেনের সাহায্যার্থ সর্বপ্রকারে প্রস্তুত করুক। যুদ্ধের পর যতশীঘ্র সম্ভব ভারতবর্ষকে 'ওয়েষ্ট্ মিনিস্টার স্ট্যাটুর' অনুরূপ কোন ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন যে দেওয়া হবে—ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট সে সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। অবশ্য তৎপূর্বে ভারতকে তার আভ্যন্তরীণ সমস্ত ভেদাভেদের গোলযোগ, সাম্প্রদায়িক-স্বার্থ-বুদ্ধি-প্রণোদিত সমস্ত বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্ব নিঃশেষে চুকিয়ে ফেলে সবাইকে একমত হতে হবে। অথবা নিজেদের মধ্যে পরস্পর—আপোষ রফা করে একটা যুক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে।

* * *

প্রস্তাবের মধ্যে নূতন কিছু আশার বাণী না থাকায় এবং ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের কাছে কংগ্রেস তাদের যে নিম্নতম দাবী জানিয়েছিল—অর্থাৎ যুদ্ধের পর ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হবে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হোক—এবং উপস্থিত গণভোটের দ্বারা নির্বাচিত একটি গণপরিষদের উপর ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন-পরিচালন-পদ্ধতি নির্ধারণের ভার দেওয়া হোক—এর কোনটিই ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট স্বীকার না করায়, কংগ্রেস বড়লাটের প্রস্তাব গ্রহণে তাঁদের অক্ষমতা জানিয়েছেন। 'মোসলেম লীগ' বড়লাটের প্রস্তাব গ্রহণে প্রস্তুত হতে পারেন, যদি ব্রিটিশগভর্নমেণ্ট তাঁদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থ রক্ষার অক্ষয় কবচ স্বরূপ পাকিস্থানের পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করাতে সাহায্য করেন। হিন্দু মহাসভাও বড়লাটের প্রস্তাব গ্রহণে প্রস্তুত আছেন যদি ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট হিন্দুসম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা রীতিমত কায়েমী করে দেন। তথাকথিত 'হরিজন' বা 'শিডিউলড ক্লাস্' যারা আগে 'অস্পৃশ্য' বা 'ডিপ্রেসড ক্লাস' বলে পরিচিত ছিলেন, তাঁরাও বড়লাটের প্রস্তাব গ্রহণে সম্মত আছেন যদি হরিজনদের বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুজনদের সঙ্গে তাদের সমান অধিকার দেওয়া হয়। জাতীয় দল, উদারতিক দল, সমাজতান্ত্রিকদল, এমন কি সুবিধাবাদী মানব দলও এ প্রস্তাব মাথা পেতে নিতে রাজি আছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে দেশশুদ্ধ লোকের মধ্যে রাজি, হাফ্ রাজি, নিমরাজি প্রায় সকলেই। একা কংগ্রেসই শুধু গররাজি। সুতরাং, আমাদের মনে হয় বড়লাটের প্রস্তাব কার্যে পরিণত হতে কিছুই আটকাবে না। নিরুপদ্রব বাধাকে হেলায় অবহেলা করে মহাসমারোহে ভারতের সর্বদলের অনুগত ও পদানত প্রতিনিধিদের নিয়ে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ানুযায়ী কেন্দ্রিয় শাসন পরিষদে নব নিযুক্ত বিশালতর কার্যপরিচালক সমিতির শুভ উদ্বোধন হবে। কংগ্রেস শুধু একঘ'রের মত পরিত্যক্ত হয়ে একপাশে মুখ শুকিয়ে দাঁড়িয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে অহিংস দৃষ্টিতে চেয়ে দেখবে। যুদ্ধের পর যতশীঘ্র সম্ভব এই প্রাচ্যভূমে পাকিস্থান গেকে উঠবে, হিন্দু মহাসভার দলটি বিন্দু বিসর্গ না পেয়েও মহত্তর হবে, হরিজনেরা জনে জনে স্বরায় হরিহর হয়ে উঠবে, মানবেন্দ্র রায়ের দল হয়ত ক্রমে দেবেন্দ্র গৌরবে অধিষ্ঠিত হয়েছে দেখা যাবে।

* * *

কংগ্রেস গোড়া থেকেই এ যুদ্ধে ভারতকে যোগ দিতে নিষেধ করলেও এবং যুদ্ধ ব্যাপারে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে কোন প্রকার সাহায্য করতে সম্মত না হলেও, যোগদান সরকার চাব দিতে না দিতেই লোক দলে দলে দিচ্ছে। বরং, তাদের মধ্যে অনেককেই হতাশ হয়ে ফিরে আসতেও হচ্ছে। কারণ, গভর্নমেণ্ট সকলকে নিচ্ছেন না। সৈনিক হব, যুদ্ধ করতে শিখবো, সামরিক কুচকাওয়াজে যোগ দেব,—যোদ্ধার উর্দি প'রে, বন্দুক বেয়নেট রাইফেল রিভলভার প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে, ক্যাপ্টেনের 'স্যামব্রাউন বেল্ট' 'ষ্টার ষ্ট্রাইপ' কাঁধে বেঁধে, কোমরে টোটাভরা কোমরবন্দ এঁটে অসির ঝন্ ঝনার সঙ্গে মিলিটারী বুটের খট খট শব্দে গট গট করে চলবো—ভারতের কল্পনাপ্রবণ তরুণ যুবকদের এ এক মোহময় স্বপ্ন। যার কাছে যেটা দুর্লভ তার কাছে সেইটাই জীবনের প্রেয়। পরাধীন ভারতের নিরস্ত্র যৌবন তাই সশস্ত্র সৈনিকের বীর বৃত্তিকে একান্ত বরণীয় মনে করে। তাদের নির্বীযতার জড়ত্ব ভুলে, দীর্ঘকালের কর্মহীন ক্লীবত্ব পরিহার করে তারা মানুষের মত খাড়া হয়ে দাঁড়াতে চায়। সুযোগ এসেছে দ্বারে—বিচারের সময় নেই তাদের। যুদ্ধ বিদ্যা ও

রণ কৌশল শিখে জগতের আর সকল জাতির মতই সামরিক সম্ভ্রম ও গৌরব অর্জন করতে চায় তারা। উপায় ছিল না এতদিন; আজ তা হাতের কাছে উপস্থিত। এ সুযোগ কি তারা ছাড়তে পারে? সমস্ত নিষেধ অগ্রাহ্য করে তারা ছুটে যাবেই, ঝাঁপিয়ে পড়বেই তারা এই মহা-আহবে। কেউ তাদের বাধা দিতে পারবে না। সৈনিক হবার সুযোগ পেলেনা যে ছেলেরা, শহরকোটালের অধীনে নগর রক্ষীর কাজে ঢুকে পড়তেও ইতস্ততঃ করলে না তারা। সিভিকগার্ডের দল দেখতে দেখতে পুষ্ট হয়ে উঠলো। নিষ্ক্রিয়পন্থী কংগ্রেসের সাধ্য কি যে এই প্রাণ বন্যার প্রবল প্রবাহকে বাধা দেয়। যৌবনোচ্ছল জীবনের উদ্দাম গতিকে ঠেকিয়ে রাখার মত শক্তি চরকা ও খাদির মধ্যে নেই। অগণিত সৈন্যবাহিনী তাই দিনে দিনে সুসজ্জিত হয়ে চলেছে আজ ভারতের সিংহদ্বার খুলে য়ুরোপে, আফ্রিকায়, মিশরে, এডেনে, মালয়ে, সিঙ্গাপুরে। চলেছে তাদের পিছু পিছু অপ্রমেয় বিবিধ সমর সম্ভার। ভারতের রাজন্যবর্গ ও প্রজাপুঞ্জের সঞ্চয়ের বাঁধ ভেঙে কোটী কোটী টাকা চলেছে আজ জল স্রোতের মত প্রবাহিত হয়ে ব্রিটেনের রণ-বিধ্বস্ত বলের সংরক্ষণ কার্যে সহায়তা করতে। নিরুপায় কংগ্রেসের কোন সাধ্য নেই যে ভারতের এই সাহায্য দান সে বন্ধ করে। সুতরাং অশক্তের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকে অবহেলার সঙ্গে তুচ্ছ করেই শক্তিমান্ ব্রিটেন এগিয়ে চলবে তার সংকল্প সাধনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে। প্রবল যে সে সম্ভ্রম করে শুধু বলবানকেই। দুর্বলকে সকল দেশের লোকেই হেয়জ্ঞান করে।

*　　*　　*

'মাধ্যমিক শিক্ষা বিল' নিয়ে বাংলাদেশে খুব হুলস্থুল হয়ে গেল এবং সম্ভবতঃ আরও হবে। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলির উপর অধিকার ও দেশের ছেলেমেয়ের শিক্ষার ভার হিন্দুদের হাতে সম্পূর্ণ না রেখে, মুসলমানরাও তাদের সঙ্গে সমানভাবে এ বিভাগের পরিচালক হ'তে ইচ্ছা করেন। এই অধিকার নিয়েই বেধেছে যত গণ্ডগোল। বাংলা সরকারের শাসন পরিষদে এখন মুসলমানেরাই দলে ভারি এবং সম্ভবতঃ ভবিষ্যতেও বরাবরই দলে তাঁরা এমনি ভারিই থাকবেন, কারণ বাংলাদেশের অধিবাসীদের মধ্যে তাঁদেরই সংখ্যা বেশি। অবশ্য যদি না ইতিমধ্যে হিন্দু মহাসভা, কংগ্রেস ও জাতীয় দলের চেষ্টায় "কমিউন্যাল এ্যাওয়ার্ড" রূপ ম্যাকডোনাল্ডের দানপত্রখানি উড়ে যায়। কারণ, ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্টের প্রবর্তিত ভারত শাসন সংস্কার বিধির বলে মুসলমানেরা এদেশে সংখ্যা গরিষ্ঠ হয়েও সংখ্যালঘিষ্ঠের সমস্ত বিশেষ সুবিধাগুলি ভোগ করবার সুযোগ পাচ্ছেন। কিন্তু সে যাই হোক, বর্তমান মন্ত্রীমণ্ডলী মুসলমান সম্প্রদায়ের যেভাবে উন্নতি ও কল্যাণের চেষ্টা করছেন তা যথার্থই প্রশংসনীয়। হিন্দুদের হাতে অবশ্য এতটা ক্ষমতা কখনও আসেনি, তবে যেটুকু হাত তাদের এক সময়ে ছিল, তার কোনও সুযোগই তাঁরা নেননি, বা নিতে সাহস করেন নি। নিজেদের সম্প্রদায়ের যাতে উন্নতি হয়, ভাল হয়, হিন্দুদের মধ্যে এ ইচ্ছা কারুর কারুর মনে থাকলেও, তার জন্য নির্লজ্জ সম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দিতে তাদের চক্ষুলজ্জায় ও বিবেকে বেধেছিল। এটাকে হয়ত হিন্দুর সহজাত উদার প্রকৃতি ও অসাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির পরিচায়ক বলে প্রচার করা চলে, কিন্তু, নির্বুদ্ধিতা ও দুর্বলতা তাতে চাপা পড়ে না। আমরা হিন্দু ও মুসলমান যে পরস্পরকে বিশ্বাস করিনি এবং পরস্পরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারি নি এটা স্বীকার করাই ভালো। কর্পোরেশন বিলই বল, শিক্ষা বিলই বল আর জমিদারী-মহাজনী বিলই বল, সবেরই মূলে নিহিত রয়েছে এই প্রবল অবিশ্বাস। মুসলমানেরা মনে করেন যে হিন্দুর অধিকারে এগুলো থাকলে মুসলমান সম্প্রদায় কোনদিনই মাথা তুলে দাঁড়াতে বা বড় হয়ে উঠতে পারবে না, আবার হিন্দুরা মনে করছে এসব অধিকার মুসলমানদের হাতে চলে গেলে হিন্দুরা মারা পড়বে। কাজেই এই হৈ চৈ, হট্টগোল, বাগবিতণ্ডা, ঘোর প্রতিবাদ। এরকম চিৎকারে ও কলহে বিশেষ কোন ফল হবে বলে মনে হয় না। কারণ, শাসন ক্ষমতা ওরা দলে ভারি বলে ওদের হাতে রয়েছে যখন, তখন প্রতিপক্ষকে চটিয়ে হিন্দুর কোন লাভ নেই। বরং আমরা যদি পরস্পরকে বিশ্বাস করতে শিখি, পরস্পরের উপর নির্ভর করতে শিখি, এবং উভয় সম্প্রদায়ের স্বার্থ, কল্যাণ ও উন্নতির জন্য পরস্পর মিলে মিশে বন্ধুভাবে কাজ করবার চেষ্টা করি, তাতে হয়ত' বিবাদ বিসম্বাদের চেয়ে সুফল পাওয়া যেতে পারে।
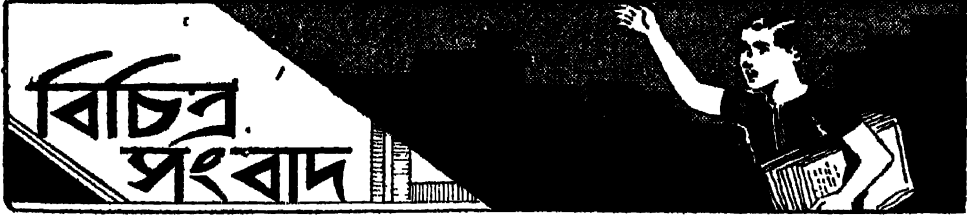
শ্রীস্বদেশরঞ্জন চক্রবর্তী

১। আজ হইতে ৩৭৩৫ বৎসর পূর্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

২। গত বছর লণ্ডনে পুলিশ কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ১৮৭১২। এবৎসর বাড়িয়া ৩৩১৩৯ হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১০৩১৭ জন কর্মচারী পুলিশ যুদ্ধবিভাগের জন্য রিজার্ভ আছেন।

৩। আমেরিকায় একটি অতিকায় বিমান নির্মাণে আড়াইলক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে। ইহাতে ২৮ টন ওজনের বোমা বহন করা চলে। একবার পেট্রোল ভর্তি করিয়া লইলে ৬৫০০ মাইল অনায়াসে চলিতে পারে।

৪। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রথম ভারতীয় কাপড়ের কল স্থাপিত হয়।

৫। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে জনৈক পার্শী বোম্বাইএ দ্বিতীয় মিল স্থাপন করেন।

৬। সমগ্র বাংলাদেশে বর্তমানে ৮০ কোটি গজ বস্ত্রের প্রয়োজন, তন্মধ্যে বাংলায় প্রস্তুত হয় মাত্র ২০ কোটি গজ।

৭। সমগ্র ভারতে ৩৭৯টি কাপড়ের কল আছে। তন্মধ্যে বাংলায় মাত্র ২২টি।

৮। ইলিয়ট নামক জনৈক ইংরাজ ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজী ভাষায় সর্বপ্রথম শিক্ষাবিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

৯। বিলাতে ছেঁড়া কাগজ, ন্যাকড়া, মাংসের হাড়, কাঠিকুটি, দেশলাইএর খালি বাক্স প্রভৃতি হইতে বছরে পঁয়ত্রিশ লক্ষ পাউণ্ড লাভ হয়।

১০। বর্তমানে কয়লা, জল ও বাতাস হইতে রবার ও নকল ব্রাস তৈয়ারী হইতেছে।

১১। পুরান বই, ছেঁড়া কাগজ ও সেলুলোজ হইতে রেশম প্রস্তুত হইতেছে।

১২। মাটা তোলা দুধ হইতে কেশিন প্রস্তুত হয় এবং তদ্দ্বারা বস্ত্র, ছাতার হ্যাণ্ডেল, নকল রেশম, মোজা, কম্বল ও ওভারকোট প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে।

১৩। কোরিয়ায় এক প্রকার কাপড় পাওয়া যায় যাহা পশমের মত অথচ কয়লা ও চূণের চেয়েও চারগুণ কঠিন এবং মজবুত।

১৪। সামুদ্রিক গুল্ম ও শৈবালাদি হইতে জাপানীরা উৎকৃষ্ট পশম বাহির করিয়াছেন। ইহা পচে না ও আগুনে পুড়ে না। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে বৃটেনেও ইহার একটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

১৫। পাইন বৃক্ষের কাণ্ড হইতে, রঞ্জন, তার্পিন, কর্পূর, লাইকোবিস প্রস্তুত হইতেছে ও তাহা হইতে বিবিধ নকল ধাতু প্রস্তুত হইতেছে।

১৬। আলকাতরা হইতে নকল মৃগনাভির সৃষ্টি হইতেছে।

১৭। জীবজন্তুর হাড়পাঁজরা হইতে নকল ফসফরাস তৈয়ারী হইতেছে। আর ফসফরাস হইতে দেশলাইএর কাঠি নির্মিত হইতেছে।

১৮। চুরুটের ছাই হইতে বিবিধ মাটির খেলনা ও তৈজস পত্রাদির সৃষ্টি হইতেছে।

১৯। ভাঙা কাঁচ হইতে পথনির্মাণের উপযোগী ইট তৈয়ারি হইতেছে।

২০। স্কটল্যাণ্ডে চূর্ণ কাচ হইতে কাচের মিহি মজবুত সূতা তৈয়ারি হইতেছে এ কাচ আগুনে তাতে না। ইহার সূতায় সিনেমা থিয়েটারের অগ্নিরোধক পর্দা তৈরী হইতেছে। এ সূতা ঠিক মাকড়সার জালের মত। একটি কাচের মার্বেল হইতে নব্বই মাইল দীর্ঘ মিহি সূতা তৈয়ার

শ্রীহট্ট থেকে গ্রাহক নং ৩১৫২—শ্রীমান বেণীকুমার দে চৌধুরী জানতে চেয়েছেন :—

প্রশ্ন ঃ—

১। বর্তমান ভারতে উল্লেখযোগ্য কয়জন দার্শনিক আছেন ?

২। তাঁহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কে ?

৩। কাজী নজরুল ইসলামের জীবনী আছে কি ?

৪। যদি থাকে তবে সে কাহার লেখা ?

৫। যদি না থাকে তবে তাঁহাকে অন্তরঙ্গ ভাবে যিনি জানেন, তিনি এই প্রতিভাবান মোস্‌লেম কবির জীবনী সংক্ষেপে আমাদের জানাবেন কি ?

পাঠশালার গ্রাহক গ্রাহিকাদের মধ্যে যদি কেহ বেণী-কুমারের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন তবে ১৫ই কার্তিকের মধ্যে পাঠশালা সম্পাদককে তা লিখে পাঠালে আগামী সংখ্যায় সে উত্তর প্রকাশিত হবে। উত্তরের সঙ্গে নাম ঠিকানা ও গ্রাহক নং স্পষ্ট করে লিখতে যেন ভুল না হয়। কার্তিক সংখ্যা থেকে কোনো গ্রাহক বা গ্রাহিকার একটির বেশি 'প্রশ্ন' নেওয়া হবে না। 'উত্তর' কিন্তু যে কোনো গ্রাহক গ্রাহিকা একাধিক প্রশ্নের দিতে পারেন। গ্রাহক গ্রাহিকারা যে প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম হবেন 'ভুতো-গোয়েন্দা' তার জবাব দেবেন।

অক্ষ ক্রীড়া নয়—অক্ষর ক্রীড়া

'TELEGRAPH' এই শব্দটির মধ্যে যতগুলি অক্ষর আছে তার সাহায্যে আর কি নূতন শব্দ তৈরি করা যায় বলো ?
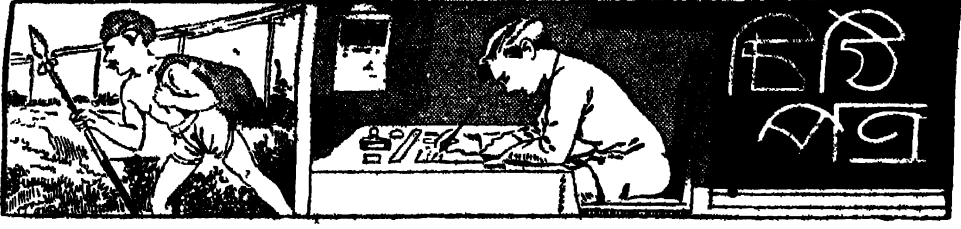
আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

কলিকাতার গ্রাহক শ্রীমান বঙ্কিং রায় (ন ২৯১৯) আলোকচিত্র প্রতিযোগিতার জন্য কয়েকখানি সুন্দর ছবি তুলে পাঠিয়ে ছিলেন, কিন্তু একাধিক গ্রাহকগ্রাহিকা আমাদের জানিয়েছেন যে তাঁদের ক্যামেরা নেই, তাঁরা ছবি তোলার সুযোগ পান না বলে আলোকচিত্র প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারেন না। অল্প কয়েকজন মাত্র ধনী গ্রাহকগ্রাহিকাদের ক্যামেরা আছে, সুতরাং এই প্রতিযোগিতায় প্রতিবারই তাঁরাই পুরস্কার পান। আর সকলে বঞ্চিত হয়। সুতরং এরূপ কোনো প্রতিযোগিতা এদেশের কাগজে দেওয়া উচিত নয় যাতে সকল গ্রাহকগ্রাহিকা বা তাদের মধ্যে অধিকাংশ যোগ দিতে না পারে। আমরা এ যুক্তি খুব সমীচীন বিবেচনা ক'রে পাঠশালার চতুর্থ বৎসর থেকে 'আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা' বন্ধ করেছি। তাই বঙ্কিংবাবুর ছবিগুলি তাঁকে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে ফেরত দিতে হয়েছে। তবে, প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার দেওয়া বন্ধ করলেও আমাদের কোনো গ্রাহকগ্রাহিকা যদি কোনো সুন্দর ছবি তুলে পাঠান আমরা পাঠশালায় তা' সাদরে প্রকাশ করবো।

শব্দসন্ধান ও ধাঁধাঁ

ফরিদপুরের শ্রীমান বীরেন্দ্রনারায়ণ সরকার (গ্রাঃ নং ২৩৬১) আমুদপুরের শ্রীমান অশ্বিনীকুমার মণ্ডল (গ্রাঃ নং ৩২৮০) হাওড়ার শ্রীমান সুধাংশুকুমার বসু, গোবরক্ষপুরের কুমারী কণিকা মুখোপাধ্যায় (গ্রাঃ নং ২১৯৩) সাহাজাদপুরের শ্রীমান কালিদাস সাহা (গ্রাঃ নং ৩০৭৮) হাওড়ার শ্রীমান অমরেন্দ্রনাথ সরকার ও বিভূতিভূষণ নন্দী, কুমারী হেনা দে, দিল্লীর শ্রীমান সুশীলচন্দ্র ঘোষ (গ্রাঃ নং ২৩৪৯) ভবানীপুরের শ্রীমান দিলীপকুমার সেন। রায়পুর-সিপির কুমারী উমা বাগচী প্রভৃতি পাঠশালার বহু গ্রাহকগ্রাহিকা ও পাঠক পাঠিকা 'শব্দ-সন্ধান' ও 'ধাঁধাঁ' তুলে দেওয়া সম্বন্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সুতরাং পাঠশালার চতুর্থ বর্ষে 'শব্দ-সন্ধান' ও 'ধাঁধাঁ' নিয়মিত প্রতিমাসে প্রকাশিত হবে। উপরন্তু শব্দ-সন্ধানের যিনি নির্ভুল উত্তর দিতে পারবেন তাঁকে নগদ পাঁচটাকা পুরস্কার দেওয়া হবে স্থির হয়েছে।

গ্রাহক হবার কি নিয়ম ?

হাতীগঞ্জের শ্রীমান সুধীরচন্দ্র দেবরায় জানতে চেয়েছেন যে 'পাঠশালা' কেন তিন মাসের ও ছ'মাসের জন্য গ্রাহক নেওয়া বন্ধ করলেন। পাঠশালার উচিত অন্ততঃ ছ' মাসের জন্য গ্রাহক হ'তে চান যাঁরা তাদের সুযোগ দেওয়া। আমরা তাঁকে জানাচ্ছি যে যদি কোনো গ্রাহক গ্রাহিকা একেবারে একবৎসরের চাঁদা ৩৲ টাকা পাঠাতে না পারেন, তাহ'লে মণি অর্ডার ক'রে ছ'মাসের চাঁদা ১॥০ টাকা পাঠালেও তাঁকে গ্রাহক ক'রে নেওয়া হয়। ডাক খরচ আলাদা দিতে হয় না। কিন্তু, যাঁরা পাঠশালার কোনো মাসের পুরানো কাপি বা এক বছরের পুরানো 'সেট' নিতে চান তাঁদের ডাকঘরের নূতন নিয়ম অনুসারে এক কপির জন্য অতিরিক্ত ⁄১০ পয়সা এবং সেট পিছু ১৴০ আনা ডাক খরচ দিতে হবে।

রচনা পাঠানোর কি নিয়ম ?

যে কেউ রচনা পাঠাতে পারেন। রচনা কাগজের এক পিঠে লিখে পাঠাতে হয়। ডাকটিকিট দেওয়া থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয়, নইলে ছিঁড়ে ফেলা হয়। রচনা যত ছোট হয় ততই ভাল।

আশ্বিন—১৩৪৭

নিয়মাবলী—(১) ধাঁধা-সম্পাদকের মতে শব্দসন্ধানের যেটি সবচেয়ে নির্দোষ ও নির্ভুল সমাধান,—তার সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে উত্তর মেলা চাই। নির্ভুল সমাধানটি পরের মাসের পাঠশালায় প্রকাশিত হবে। (২) সাদা ঘরগুলির প্রত্যেকটিতে একটি ক'রে সংযুক্ত বা অসংযুক্ত অক্ষর বসবে। (৩) প্রতি সংখ্যার প্রতিযোগিতা-কুপনখানি কেটে ভর্তি ক'রে পাঠাবে সেই মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে। দেরি হ'লেই বাতিল। খামের উপরে ঠিকানা লিখবে—"শব্দ সন্ধান" পাঠশালা কার্যালয়, ৩০ কর্ণওআলিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। (৪) হরফগুলি সব পরিষ্কার হওয়া চাই—কাটাকুটি চলবে না। বানান ভুল হ'লে ভুল ধরা হবে। (৫) যে কোন পাঠক পাঠিকা যতগুলি ইচ্ছা কুপন পাঠাতে পারবে। (৬) 'শব্দ-সন্ধান'-সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ব'লে মেনে নিতে হবে।

সঙ্কেতসূত্র

—পাশাপাশি—

১। আজকাল এরই যুদ্ধনীতি সমগ্র য়ুরোপ শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নিয়েছে।

৩। মানুষের অন্তরাত্মা শেষ পর্যন্ত কখনও একে স্বীকার করে না।

৫। এ যদি অনন্ত না হ'ত তাহ'লে সকলেরই চোখের জল সার হ'ত।

৭। মন না মতি।

৯। এ মানুষ নয়, অথচ একে অমানুষও বলা চলে না, তবে কি বলবো?

১১। এমন দিনে পাঠশালার পড়ুয়াদের উৎসাহের অন্ত থাকে না।

১৩। স্ত্রীলোকের ভূষণ

১৪। অবিচ্ছিন্নভাবে।

১৫। এ অন্তঃসার শূন্য।

১৬। পশ্চিমদেশের ব্যবসায়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

১৮। জলের গতি বিশেষ।

২০। প্রাণভরা সমবেদনা ও সহানুভূতি নিয়ে ব্যথার ব্যথী হ'তে পারে যে।

২১। উল্টে পাল্টে বিদেশে ঘোরা।

২২। এ ভেসে চলে

২৩। 'শর'র দেওয়া সঠিক উত্তরের সঙ্গে ...না মিলে গেলে শব্দসন্ধানের কোনও উত্তর নির্ভুল বলে গণ্য করা হয় না।

২৫। চিন্তা

২৬। জলে স্থলে ও শূন্যমার্গে একমাত্র আলোকরশ্মিরই এ ক্ষমতা আছে।

—উপর নীচে—

১। বহুকাল পরে আবার এখানে 'নবমেধযজ্ঞের' অনুষ্ঠান হ'চ্ছে দেখে জগৎ স্তম্ভিত।

২। এর দোষে মানুষের নানা বদনাম হয়।

৩। কাঁকে উদ্দেশ করে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ব'লেছিলেন—
"জন্মান্তরে শতবার যে নির্জন তীরে
গোপনে হৃদয় মোর আসিত বাহিরে
আর বার সেই তীরে সে সন্ধ্যাবেলায়
হবে নাকি দেখাশুনা তোমায় আমায়"

৪। যদি যথার্থ ভক্তিভরে তন্ময় হয়ে করা যায় তবে এ অপূর্ব সঙ্গীত হ'য়ে ওঠে।

৬। আজকাল এর গতি ওপর দিকে।

৮। সকলেরই এখানে প্রতিবিধানরত হওয়া উচিত, কিন্তু শৃঙ্খলার অভাবে তা' ঠিক হচ্ছে না।

৯। এ ভুল হয় দেখি প্রধানতঃ অমনোযোগিতার জন্যই।

১০। অতি অল্পেই এ পাওয়া যায়।

১২। প্রাচীন, প্রসিদ্ধ ও অভিজাত বলতে যা বোঝায়।

১৬। এর ভয়ে যে শ্রেয়ঃকে অস্বীকার করে সে মানুষ নয়।

১৭। গৃহশূন্য

১৯। সেকালে অনেকেরই কাছে এ পাওয়া যেত।

২১। এ যদি ঠিক না হয় তাহলে দেশের দুর্দশার আর অন্ত থাকে না।

২৪। কবিপতি পরিহীন, কেন হ'ল, কতদিন?

ভাদ্রের শব্দসন্ধানের ফলাফল

ভাদ্র মাসটা শোনা যায় ভাল নয়। তাই বোধ হয় এই ভাদ্র মাসে পাঠশালার বর্ষশেষে 'শ-র'র কাছে পাঠশালার সমস্ত গ্রাহকগ্রাহিকা ও পাঠকপাঠিকা এমন শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হয়েছেন।

'ভাদ্রের' 'পাঠশালা'র 'শব্দ-সন্ধান' ছিল গতবৎসরের মধ্যে সবচেয়ে সহজ। যে কোনো বুদ্ধিমান ছেলেমেয়ে একটু অবহিতভাবে চেষ্টা করলে অনায়াসেই এর সম্পূর্ণ নির্ভুল উত্তর দিতে পারতেন. কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে ভাদ্রের শব্দ-সন্ধানের উত্তরে এমন একজনও কেউ সে রকম মনোযোগের পরিচয় দিতে পারেন নি। নির্ভুল বা একভুলের কথা দূরে থাক, ভাদ্রে পাঁচভুলের কম যে একজনেরও হয়নি। এরকমত কখন হয় না।—এতে বোঝা যাচ্ছে যে গতমাসে 'শব্দ-সন্ধান' সমাধানের উত্তরে 'শ-র' প্রতিযোগিতাদের যে ইঙ্গিত করেছিলেন সেদিকে প্রতিযোগিরা বিশেষ কেউ লক্ষ্য রাখেন নি। তা যদি রাখতেন তা'হলে 'ভূতল', 'অতল', 'নিতল', 'বিতল', ইত্যাদি একই অর্থবাচক বিভিন্ন শব্দের মধ্যে নূতন বা অধিক প্রচলিত নয় যেটি অর্থাৎ 'বিতল' শব্দটি সহজেই নির্বাচন করতে পারতেন। 'প্রভেদ', 'বিভেদ', বা 'আবাস', 'নিবাস' ও দুয়ের মধ্যে 'বিভেদ' ও 'আবাস', বেছে নেওয়াও তাদের পক্ষে সহজ হ'ত। 'অভদ্র' ও 'অভব্য'র মধ্যে প্রথমোক্তদের সঙ্গে পাঠশালার শব্দ-সন্ধান প্রতিযোগিদের সকলেরই প্রায় পরিচয় আছে। সুতরাং শেষোক্তকেই এখানে স্মরণ করা উচিত ছিল। 'অমল' 'বিমল' সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে।

"Fifth Column" কে সনাক্ত করতে অধিকাংশ প্রতিযোগীই পারেন নি। অথচ তাঁরা যদি ভেবে দেখতেন যে মানুষের ভিতরের রিপুরাই তার প্রধান শত্রু। 'পঞ্চম-বাহিনী' বলতে বোঝায় আমাদের ভিতরেরই শত্রু! ষড় রিপুর মধ্যে পঞ্চম কে? একটু অনুধাবন করলেই তাঁদের পক্ষে 'মদ' শব্দটি আবিষ্কার করা কঠিন হতনা।

উপর নীচে ২২নং ঘরে যেতে অনেকেই 'গৃহে' এসে

পৌঁছেছেন বটে, কিন্তু তাঁদের মধ্যে যদি একটুও কবিত্ব বোধ থাকত তা'হ'লে 'গৃহ'কে তাঁরা 'গেহ' বলে উল্লেখ করে প্রকৃত রসবোধের পরিচয় দিতে পারতেন।

'শ-র' ঠিকই আশা করেছিলেন যে তার চপলমতি ও চঞ্চলবুদ্ধি প্রতিযোগিরা নিশ্চয় লিখবে 'উদাসী' ও 'মাধবী' কেননা এই দুটো শব্দই তাদের সহজেই মনে আসবে কিন্তু, 'উদাস' এবং 'মাধব'ও যে হয় এটুকু ধৈর্যের সঙ্গে তারা ভেবে দেখবে না।

'ক্রোধ' ও 'লোভ' এদুটি বিসর্জন দিয়ে সাধু সেজে যারা 'ব্যাধ' ও 'ক্ষোভ' শব্দ দুটি বসিয়েছেন 'শ র'র মতে 'শব্দ সন্ধানে'র নির্ভুল উত্তর তাঁরা যে কোনো দিন দিতে পারবেন এ ভরসা খুবই কম। কাজেই, এবার শব্দ-সন্ধানের উত্তরে প্রতিযোগিরা সকলেই অসংখ্য ভুল করে বসে আছেন। যে ক'জনের সবচেয়ে কম ভুল হয়েছে মাত্র পাঁচ থেকে দশের মধ্যে যাদের ভুল সীমাবদ্ধ, কেবল তাঁদেরই নাম দেওয়া হল। দশের বেশি ভুল যাঁরা ক'রেছেন তাঁদের আর সকলের সামনে অপদস্থ করা উচিত নয় বলে 'শ র' তাঁদের নামগুলো চেপে যাওয়াই ভাল মনে করছেন।

আশ্বিন থেকে, অর্থাৎ 'পাঠশালার' চতুর্বর্ষ থেকে যার কাছে শব্দ-সন্ধানের নির্ভুল উত্তর পাওয়া যাবে তাকে নগদ পাঁচটাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। নির্ভুল উত্তর যদি কারুরই না হয়, তাহলে সবচেয়ে কম ভুল যার হবে তাকেই উক্ত পুরস্কার দেওয়া হবে। যদি একাধিক গ্রাহক গ্রাহিকা বা পাঠক পাঠিকার উত্তর নির্ভুল হয় তবে পুরস্কারের টাকা তাঁদের মধ্যে সমান অংশে ভাগ করে দেওয়া হবে। কিন্তু, সবচেয়ে কম ভুল যদি তিন ভুলেরও বেশি হয় কোনোবারে, তা'হ'লে কাউকেউ সেবারে পুরস্কার দেওয়া হবে না। পাঠশালার ছাপা কুপনখানি ছাড়াও সাদা কাগজে ছক এঁকেও যতগুলি ইচ্ছা উত্তর পাঠানো চলবে, যদি অবশ্য তার সঙ্গে গ্রাহক নং উল্লেখ করে অন্তত একখানিও ছাপা কুপন থাকে। যাঁরা পাঠশালার গ্রাহক নন, কেবল পাঠক মাত্র, তাঁরাও এ প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারেন, এবং যতগুলি ইচ্ছা কুপন পাঠাতে পাবেন, কিন্তু, গ্রাহকদের মতো একখানি ছাপা কুপনের সঙ্গে যতগুলি ইচ্ছা সাদা কাগজে ছক্ এঁকে উত্তর পাঠাবার সুযোগ তাঁরা পাবেন না। তাঁদের প্রত্যেক উত্তরটির জন্য এক একখানি পাঠশালার পৃথক্ ছাপা কুপন ব্যবহার করতে হবে।

৫ থেকে ১০টি পর্যন্ত ভুল যাঁরা করেছেন—

অশ্বিনীকুমার মণ্ডল, পমবাকোল, ইয়ং মেন্স এসোসিয়েশানের সভ্যবৃন্দ, হাওড়া, উদয়ভানু সিংহ, কলিকাতা, উমা বাগচী, বায়পুর সিপি, ঊষারাণী মুখোপাধ্যায়, গোবরুপুর, কণিকা মুখোপাধ্যায়, মির্জাবাজার, কালিদাস সাহা, সাহাজাদপুর, গোপিনাথ ঘোষ, নজরুল, দিলীপকুমার সেন, ভবানীপুর, নবীনকুমার চৌধুরী, চাঁদখিরা, নিরঞ্জন রায়চৌধুরী, টাঙ্গাইল, 'দুষ্টু' কলিকাতা, বাবুলাল ও সন্তকুমার, আহম্মদপুর, বিনয়ভূষণ বসু, শ্রীপুর, বিমলকুমার চক্রবর্তী, কলিকাতা, মধু, অহি, পণ্ডিতমশাই, মাষ্টারমশাই ও লাইব্রেরীর সভ্যরা, মুগ-কল্যাণ, মধু প্রাদাস ও ক্লিসটাস, মুগকল্যাণ, মানসী রায়, গোবাবাজার, বন্দু, ঝাপু, পেসু, কাবুল পাঁচু, দেবু, রিষড়া, রিষড়া বয়েজ লাইব্রেরীর সভ্যবৃন্দ, রিষড়া, 'লতা' বারাকপুর, লিলি স্যামুয়েল, বারাকপুর, হরিকমল পুরকায়স্থ, শিলং, হেনাদেশীল, গোয়াবাগান, শিশিরকুমার সেনগুপ্ত, কলিকাতা; সুজাতা সিংহ, পূর্ণিয়া; সুধাংশুকুমার বসু, হাওড়া, সুনীতকুমার মিত্র, কলিকাতা, স্নাহাদেবী রায়, কামাল-কাচনা।

নির্ভুল সমাধান—ভাদ্র ১৩৪৭

"শব্দ-সন্ধান"

(প্রতিযোগিতা কুপন)

(যে কোনো পাঠক বা পাঠিকা এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারেন, এবং যতগুলি ইচ্ছা কুপন পাঠাতে পারেন)

১		২ জি		■	৩ প	রা	৪	
	■		■	■		■		■
৫ রো	৬	■	৭ ম	৮	■	৯	ন	১০ ব
১১	র	১২	■	১৩		না	■	
■	■	১৪ নি		ত	■	১৫	ল	■
১৬	১৭ স্নি		■	১৮ ধা		■	■	১৯
২০ দ			■		■	২১		র
২২	য়	■	২৩		২৪ ক	ল	■	
২৫ ম			■	২৬ প্র				ন

(পাঠশালা, আশ্বিন)

নাম ....

ঠিকানা ....

....

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আগামী **১৫ই** কার্তিকের মধ্যে কুপনখানি পাঠশালা-কার্যালয়ে পৌঁছনো চাই।

☞ (কুপনে কোনো কাটাকুটি বা বানান ভুল চল্‌বে না।)

নিয়মাবলী

"পাঠশালা" প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয়।

আশ্বিন মাস থেকে পাঠশালার বর্ষারম্ভ।

লেখা ও ছবি প্রতিমাসে অন্তত ৬০ পৃষ্ঠা থাকবে; আকার ডবল ডিমাই ১২ পেজি।

বার্ষিক মূল্য মণি অর্ডারে পাঠাইলে তিন টাকা। ষাণ্মাসিক দেড় টাকা। ভি পিতে বার্ষিক মূল্য ৩।০ তিন টাকা চারি আনা। ষাণ্মাসিক ভি পি করা হইবে না।

নগদ মূল্য প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা।

নমুনার জন্য পাঁচ আনার ডাকটিকিট পাঠাইবেন।

মফঃস্বলের গ্রাহকগণ প্রকাশকের ঠিকানায় মনিঅর্ডারযোগে টাকা পাঠাবেন। শহরের গ্রাহকগণও ঐ ঠিকানায় টাকা জমা দিবেন।

মাসের প্রথম সপ্তাহে কাগজ না পেলে ডাকঘরের জবাব সহ ১৫ই তারিখের মধ্যে জানা'লে আর এক কপি দেওয়া হবে।

ডাকটিকিট দেওয়া থাকিলে অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠানো হবে। চিঠির উত্তর রিপ্লাইকার্ড পেলে দেওয়া হবে।

বিজ্ঞাপনের হার

কভারের প্রথম পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে না।

ঐ দ্বিতীয় ও তৃতীয় পৃষ্ঠা	২৫৲ হিঃ
ঐ চতুর্থ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন	৫০৲
বিজ্ঞাপনের প্রথম পৃষ্ঠা	২২৲
পুস্তকারম্ভের পূর্ব পৃষ্ঠা ...	২৫৲
সূচীর পার্শ্বে অর্ধ পৃষ্ঠা	১৫৲
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	২০৲
ঐ অর্ধ পৃষ্ঠা	১২৲
ঐ সিকি পৃষ্ঠা ..	৭৲

ঐ সিকি পৃষ্ঠার কম বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে না।

রচনার মধ্যে বিজ্ঞাপন	৫০৲

বিজ্ঞাপন পরিবর্তন ক'রতে হ'লে পূর্বমাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে পাঠা'তে হবে।

বিজ্ঞাপন বন্ধ ক'রতে হ'লে একমাস পূর্বে নোটিশ দেওয়া দরকার।

নূতন বিজ্ঞাপন পূর্বমাসের ২০শে তারিখ পর্যন্ত নেওয়া হবে।

এক বৎসরের জন্য বিজ্ঞাপন দিতে চুক্তিবদ্ধ হ'লে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে।

প্রকাশক—রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

পাঠশালা কার্যালয়

৩০, কর্নওআলিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা PHONE—B B. 4099

প্রাপ্তিস্থান—সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

[শ্রীযুক্ত হরেন ঘোষের সৌজন্যে

ভয় নাই ওগো ভয় নাই, অভয়াবে করো আরতি,

শিল্পী—শ্রীনন্দলাল বসু]

চতুর্থ বর্ষ.] কার্তিক—১৩৪৭ [দ্বিতীয় সংখ্যা

পরিচয়

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায

বহুযুগ ধ'রে ছিনু আশা ক'রে এতদিনে পেনু পরিচয, তব পরিচয।
আজি ঝঞ্ঝায ডুবে গেছে হায পাথারে আমার তরীচয, ভরা তরীচয়।
যা' ছিল বেসাতি হীরা সোনা মোতি,—
বক্ষের বল,—চক্ষের জ্যোতি,—
গেছে সব গেছে,—নিঠুর নিযতি নিঃস্ব করেছে—করি' জয, মোরে করি' জয
একা বসি' তীরে ভাসি' আঁখিনীরে, কে তুমি পুছিলে পরিচয়, মম পরিচয ?

আজি দুর্দিনে আঁধার বিপিনে নাহি দিশি, নাহি সরণি, মিলেনা সরণি।
জনহীন দেশে আসিয়াছি ভেসে ডুবে গেছে মোর তরণী, সোণার তরণী।
আজি তাণ্ডবে নাচে মহাকাল
আকাশ ছাইয়া উড়ে জটাজাল
বাতাস উতলা, জলধি মাতাল, দিবা সে তিমির-বরণী, নিশীথ-বরণী!
পাগলে পিশাচে থিয়া থিয়া নাচে,—থরথর কাঁপে ধরণী, কাঁপিছে ধরণী।

কে তুমি আসিলে আলোক প্রতিমা—আজি এ নিবিড় আঁধারে, বিজন আঁধারে ?
সরস পরশে ঘুচালে হরষে নিমেষে নিখিল বাধারে, বিপুল বাধারে।
কে তুমি আসিলে উজলি বিভায়
মোর স্তম্ভিত স্তিমিত দিবায় ?
দক্ষিণ বায় ভরে দিলে হায় প্রাণের শূন্য আধারে, রিক্ত আধারে ?
কে তুমি আসিলে হাসির আভাস বিজন বেদনা আঁধারে, গভীর আঁধারে।

এসে কিগো তুমি, এলে কি আমার চিরজীবনের দয়িত, হৃদয়-দয়িত ?
তোমারি লাগিয়া রজনী জাগিয়া কুসুমনিচয় চয়িত, ছিল যে চয়িত।
যা'র পথ চেয়ে বারে বারে মোর
উৎসবনিশা হ'য়ে গেছে ভোর
সে কি তুমি ? কহ হে প্রিয় কঠোর, সে কি তুমি মম দয়িত, জীবন-দয়িত ?
বেলা গেলে র'য়ে এলে অসময়ে পূজাবলি হ'লে ব্যয়িত, বিফলে ব্যয়িত ?

যেদিন আমার ভরা-ভাণ্ডার তব তরে ছিনু সাজায়ে, যতনে সাজায়ে,—
ডেকেছিনু স্নেহে সুশোভিত গেহে আরতি ঘণ্টা বাজায়ে, শঙ্খ বাজায়ে।
সেদিন তখন হয় নি কি বেলা ?
আজি পথপাশে পড়িয়া একেলা,
এখন আসিলে খেলিতে কি খেলা, দয়া নাকি তব সাজা এ, আমার সাজা এ ?
সবার মাঝারে ভুলেছিলে, আজ কেন মনে হ'ল রাজা হে, সহসা রাজা হে ?

তবে কি দেবতা শুনিয়াছ কথা যে কথার মোর ভাষা নেই, মুখে ভাষা নেই ?
তবে কি আমার পূজা-উপচার যায়নি বিফলে পাষাণেই, পূজি পাষাণেই ?
তবে কি দেবতা সবি শুধু ভুল ?
তোমার পূজায় নাহি লাগে ফুল ?
তারি তরে তুমি আপনি ব্যাকুল কোনো কূলে যার আশা নেই, কোনো আশা নেই ?
শুনেছ আমার প্রাণের কামনা বাহিরে যাহার ভাষা নেই, মুখে ভাষা নেই।

সাঁপুড়ে

শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী স্বরস্বতী

(১)

সে দিন রবিবার—

নীলমণি বাবু এতক্ষণে সেদিনকার সংবাদ পত্রখানা পড়বার অবকাশ পেয়েছেন। সকাল বেলাই আজ দাবার দল এসে পড়েছিল, এবং বেলা বারটা পর্যন্ত দাবা খেলা চলেছে। রোদ বেড়ে উঠলে সকলেই সরে পড়েছেন। খাওয়া দাওয়া মিটিয়ে নীলমণি বাবু ঘরে আসতেই মনে পড়লো আজ কাগজ পড়া হয় নি।

বিছানায় শুয়ে পড়ে তিনি কাগজখানা খুলে হেডিং গুলোর 'পরে চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিলেন, বেশ একটু ঘুমের ভাব আসছিল।

বৈঠকখানা ঘরটি নিস্তব্ধ, ভিতর বাড়ীর গোলমাল এখানে এসে পৌঁছয় না। চাকর ভৃত্যে জানালাগুলো বন্ধ করে দিয়ে গেছে, ঘরটা বেশ ঠাণ্ডা, তার ওপরে ছিল ফ্যানের হাওয়া। দরজার কাছে শব্দ হতে নীলমণিবাবু বিরক্ত হয়ে উঠলেন,—এই দুই ঘণ্টা অবকাশ সময়ে যদি কেউ আবার দাবা খেলতে আসে—তিনি নিশ্চয়ই তাকে তাড়িয়ে দেবেন—

খানিকক্ষণ সব চুপচাপ—

নীলমণিবাবু খুসি হয়ে চোখ মুদে রইলেন—যাক কেউ আসেনি—ঘুমানো যাবে এখন।

কিন্তু চোখে ঘুম আসে না।

অভ্যাস নাই ঘুমের—প্রতিদিন দশটার মধ্যে খাওয়া সেরে কোর্টে দৌড়িতে হয়, ফিরতে কোন কোন দিন সন্ধ্যাও হয়ে যায়। ভালো উকিল বলে তাঁর খ্যাতি আছে, কাজেই দুপুরে মক্কেল অভাবে তাঁকে বসে ঢুলতে হয় না। মাসে বড় জোর চারটে রবিবার আসে—এ চারদিন বিশ্রামও হয়—ঘুম হয় না।

তা না হোক, তবু চোখ মুদে পড়ে থাকাটাও কর্মী-জীবনের মস্ত বড় অবসর, ধরতে গেলে বিলাসিতা। সপ্তাহে একদিন করে মাসে চারদিন নীলমণিবাবু এই বিলাসিতা সার্থক করে নেন।

টুক টুক টুক—

আবার শব্দ হয়, এবারে বেশ একটু জোরে—রাগ করে চোখ মুদেই নীলমণিবাবু হাঁক দেন—"কে, কে ওখানে—?"

অতি কোমল একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"আমি'—

নীলমণিবাবু আশ্চর্য হয়ে চোখ মেললেন—"কে, মণ্টি, আঁা, এই ঠিক দুপুরে তুই বেড়াচ্ছিস - এখনও ঘুমুস নি—?"

মণ্টি এতক্ষণ পরে সাহস পেয়ে দরজার ভিতরে পা দিলে, বললে, "ঘুমুতে গিয়েছিলুম বাবা, ঘুম হয় নি। সকালে আজ অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়েছিলুম কি না—?"

পিতা পাশ ফিরে শুলেন, জড়িত কণ্ঠে বললেন,—"যা যা, শুয়ে পড় গিয়ে, দুপুরবেলা আর হৈ হৈ করে বেড়াস নে, অসুখ করবে।"

মণ্টি আস্তে আস্তে তাঁর বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল, একটুখানি চুপ করে থেকে বললে, "তোমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেব বাবা—?"

পিতা তাতে অরাজি নন,—দেয় যদি দিক না—ছোট ছোট নরম তুলতুলে হাতে সে যদি হাত বুলায় এখনি ঘুম আসবে সন্দেহ নাই।

মণ্টি নিঃশব্দে তাঁর মাথায় হাত বুলাতে লাগল,

আবারে পিতার চোখ মুদে এলো, নাক ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে লাগল।

সাহস পেয়ে মন্টি ডাকলে—"বাবা—"

পিতার উত্তর নাই।

মন্টি আবার ডাকলে—"বাবা—"

"কি—" নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে তিনি উত্তর দিলে মন্টি একটা ঢোঁক গিলে বললে,—"একটা লোক এসেছে, সাপ খেলা দেখাতে চাচ্ছে ডাকব তাকে ?"

ঘুমের ঘোরে নীলমণি বাবু বললেন, "হুঁ—"

কিন্তু তাঁর এই হুঁ করার যে কোন মূল্যই নাই তা মন্টি জানে, তাই আবার ডাকলে, "বাবা—" নীলমণিবাবুর সত্যই খুব ঘুম এসেছে, সাড়া পাওয়া গেল না।

মন্টি এবার মাথায় একটা ঠেলা দিয়ে ডাকলে, "ও বাবা, শুনছো—"

রাগ করে নীলমণিবাবু বললেন, "হ্যা, কানের মাথা খাই নি, শুনছি, বল—"

সে কণ্ঠস্বরে মন্টি একটু থতমত খেয়ে গেল, তখনই সে ভাব সামলে নিয়ে বললে, "একটা সাপওয়ালা এসেছে, খেলা দেখাবে—ডাকব—?"

নীলমণিবাবুর ইচ্ছা হচ্ছিল তার গালে চড় বসিয়ে দেন। উঃ, এতটুকু ছেলে, মাত্র ছয় বছর বয়েস, এর মধ্যে কি চালাকিটাই না শিখেছে ? মাথায় হাত বুলিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে মন যুগিয়ে সে আস্তে আস্তে নিজের আরজি পেশ করছে।

কিন্তু রাগটা তিনি সামলে নিলেন—বললেন, "না—"

কাতরকণ্ঠে মন্টি বললে, "বেচারা দুতিনদিন কিছু খায় নি বাবা, খেলা দেখিয়ে সে যে পয়সা পাবে সেই পয়সা দিয়ে খাবার খাবে। আহা, তাকে ডাকিনা বাবা—?

দুতিনদিন খেতে পায় নি তাতে মন্টিরই বা কি ? কিন্তু মন্টির মনে দয়াবৃত্তি যখন জেগে উঠেছে তখন সেটা নষ্ট করা পিতার পক্ষে উপযুক্ত কাজ হবে না।

কাজেই তিনি বললেন, "আচ্ছা যাও, তাকে ডেকে বারাণ্ডায় বসাও গিয়ে—"

বলা বাহুল্য মন্টি দুই লাফে অন্তর্ধান হল—।

(২)

"বাবা ও বাবা—"

নাঃ, জ্বালাতন করলে ছেলেটা। তাঁর যেন নাভিশ্বাস উপস্থিত হয়েছে তাই সে নাম ডাকছে। এই ঠিকদুপুর বেলায় একঘেয়ে বাবা আর বাবা। মন্টিকে শাস্তি দেওয়া দরকার—

অত্যন্ত রাগ করেই নীলমণি বাবু চোখ মেললেন।

দরজার উপর দাঁড়িয়ে ও আবার কে—? ধড়ফড় করে তিনি উঠে বসলেন।

দরজার উপর পাকা পাঁচহাত লম্বা একটি লোক, ঢিলে পায়জামা ও ঢিলে পাঞ্জাবী তার গায়ে, মাথায় একটা মস্ত বড় পাগড়ী, পায়ে নাগরা সেটাও তেমনি প্রকাণ্ড।

গায়ের রং এককালে তার বোধ হয় ফর্সাই ছিল, এখন রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে। বড় বড় চোখের তারা একেবারে কটা, কিন্তু তার চুল যা দু'চার গোছা পাগড়ির বাইরে এসে পড়ছিল তা কালো।

তাঁর পানে তাকিয়ে নীলমণি বাবু মিনিট পাঁচেক কথা বলতে পারলেন না।

পাশেই দাঁড়িয়েছিল মন্টি, পিতার কাছে বিনম্রভাবে সে পরিচয় দিলে—"এই রসিদ, বাবা,—"

রসিদ,—তবেই আর কি, মাথা একেবারে কিনে ফেলালে। সাপুড়েদের সঙ্গে এর পার্থক্য আকাশ পাতাল। হোক না ময়লা পায়জামা, পাঞ্জাবী, পুরানো ছেড়া জুতা, তামার মত গায়ের রং তবু—তবু তার নাম রসিদ, সে আফগানিস্থানের লোক না হয়ে যায় না। এ রকম লোকদের কেউ কোনদিন বিশ্বাস করতে পারে ? ছয় বছরের ছেলে মন্টি যে এই ভীষণাকৃতি লোকটার সঙ্গে এক কথায় বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হল—নাম জেনে ফেললে, আশ্চর্য। আর নাম সে যখন জেনেছে তার বাড়ীঘর, বংশ তালিকা সবই যে তার জানা হয়ে গেছে তাতে সন্দেহ নাই।

নীলমণি বাবু কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাবে কেবল বললেন,—"বৈঠো—"

হয়তো পায়জামা পরা লোকটা তাঁর ঘরের আরাম কেদারাটাই নির্বাচিত করে বসে পড়বে তাতেও কেমন অশান্তি বোধ হতে লাগলো। কিন্তু উপায় নাই, বসতে যখন বলেছেন, সে যদি তাঁর পাশেও এসে বসে, তাতেও

তাঁর আপত্তি আর চলতে পারে না। আইন বলবে তিনি তাকে বসতে বলেছেন, কোথায় বসবে তা যখন নির্দেশ করেন নি, তখন সে অনায়াসে তাঁর পাশে বসতে পারে, তাঁর ভেলভেট নির্মিত আরাম কেদারায় বসতে পারে, এমন কি জুতাশুদ্ধ পা দুখানাও টেবিলের 'পরে তুলে দিতে পারে। এতে তিনি নালিশ করলেও কোন ফল হবে না— তিনিই পরাজিত হবেন।

যাই হোক—লোকটা ভদ্র, সে বসল না। দাঁড়িয়ে থেকেই দুইহাত কপালে ঠেকিয়ে সম্পূর্ণ এ দেশীয় প্রথায় নমস্কার করলে—পরিষ্কার বাংলা ভাষায় বললে, "না বাবুজি, বসব না, খোকাবাবু সাপের খেলা দেখতে চাইলে, তাই এসেছি।"

এ রকম লোকের মুখে এমন বাংলা শুনে নীলমণি বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি জাত, তোমার দেশ কোথায়—?"

সে উত্তর দিলে, "আমি আফ্রিদী, আমার দেশ অনেক দূর—সীমান্ত প্রদেশে একটা গাঁয়ে বাবুজি, আমার নাম রসিদ—সেখ রসিদ—"

আফ্রিদী—বন্য আফ্রিদী, সর্বনাশ—।

এদের প্রতিহিংসার কথা অনেক পড়া যায়, এরা না পারে দুনিয়ায় এমন কাজই নাই। সেই দুর্দান্ত আফ্রিদী আজ তাঁরই ঘরে। বিশ্বাস কি, যদি একটা ছোরাই বসিয়ে দেয়—যদি গলাটা টিপেই ধরে?

তিনি তখনই তাকে বিদায় দিতেন—কিন্তু মন্টি সাপের খেলা দেখবার জন্য দারুণ উৎসুক হয়ে উঠেছে, অগত্যা তাঁকে উঠতেই হল।

মস্ত চওড়া বারাণ্ডা—মন্টি প্রস্তাব করলে এই বারাণ্ডাতেই খেলা হোক।

শঙ্কিত পিতা বলতে গেলেন—"না না, যদি ঘরে দোরে ঢুকে যায়—"

মন্টির আফ্রিদী বন্ধু অভয় দিলে, "কোন ভয় নেই বাবু, খুব বাধ্য সাপ, আমার কাছেই থাকবে কোথাও যাবে না।"

সে তার ঝুড়ি হতে সাপ বার করলে—

কি প্রকাণ্ড আর কি সুন্দর নানাজাতীয় সাপ,—একটা ঝুড়ির মধ্যেই সাত আটটি রয়েছে। রসিদ তাদের নিয়ে নানা রকম খেলা দেখালে—

তা হলেও বৈচিত্র্য এর মধ্যে এমন কিছু ছিল না যাতে মন্টি ছাড়া আর কেউ মুগ্ধ হতে পারে। নীলমণি বাবু সাপুড়েকে বিদায় করে দিতে ব্যগ্র হয়েছিলেন, তাই একটা সিকি পকেট হতে বার করে তার দিকে ফেলে দিলেন, বললেন, "যাও—"

মন্টি ভারি ক্ষুণ্ণ হল,—বললে, "কি ও, রসিদের আরও খেলা আছে যে বাবা—।"

সাপুড়ে

পিতা বললেন, "আর খেলা দেখতে হবে না—যাও বাপু—এবার তুমি যাও, একটু বিশ্রাম নিতে দাও দুপুরটায়—"

রসিদের তাতে আপত্তি নাই সে বোঝাটা ঘাড়ে ফেললে—।

একটা ছোট ঝুড়ির দিকে চেয়ে মন্টি বলে উঠলো,— "বা রে রসিদ সাহেব, এই সাপটা দেখালে না—এটা—"

বলতে বলতে সে ঝুড়ির ঢাকনিটা খুলতেই একটা ভীষণ শব্দ করে লেজের উপর ভর দিয়ে দেড়হাত প্রমাণ লম্বা একটা সাপ উঁচু হয়ে দাঁড়াল।

ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই রসিদ ক্ষিপ্র হস্তে তাকে চাপা দিয়ে

ফেললে—সবনাশ এটা একেবারে বুনো সাপ খোকাবাবু, এর বিষদাঁত ভাঙ্গা হয় নি।”

নীলমণি বাবু থরথর করে কাঁপছিলেন—

বললেন, “আর দরকার নেই বাপু, তুমি মানে মানে বিদায় হলেই আমি এখন বাঁচি।”

আস্তে আস্তে রসিদ বার হয়ে গেল, যাওয়ার সময় একবার মন্টির পানে কেবল তাকিয়ে গেল।

(৩)

কয়েকটা দিন কেটে গেছে—আবার পরের শনিবার।

কোর্ট হতে বাড়ী ফিরতে হঠাৎ পথের ধারে একটা বস্তির সামনে মন্টিকে দেখা গেল—সে সেই আফ্রিদীটার পাশে বসে অবাক হয়ে যেন কি শুনছে, আফ্রিদী বোধ হয় তাদের গল্প শুনাচ্ছে।

মোটরে ব্রেক কসতে কসতে গাড়ী খানিক দূর গিয়ে তবে থামলো। নীলমণি বাবু হুঙ্কার ছাড়লেন—“মন্টি—”

পিতা যে আজ নিয়মিত সময়ের অনেক আগেই কোর্ট হতে ফিরবেন তা মন্টি স্বপ্নেও ভাবে নি, হঠাৎ তাঁর ডাক শুনে সে বিবর্ণ হয়ে গেল

গুড়ি গুড়ি সে এসে কাছে দাঁড়ালো—সঙ্গে সেই সেও রসিদ। অনুনয়ের স্বরে সে বললে, “খোকা বাবুর কোন দোষ নেই বাবুজি, আমিই ওকে ডেকে এনেছি।”

“আর কোনদিন ওকে ডেকে আনবে না বলছি—বলে মন্টিকে গাড়ীতে উঠিয়ে নিয়ে নীলমণি বাবু মোটর চালাতে আদেশ দিলেন। ওই লোক—সাপ নিয়ে যার ব্যবসা, তার সঙ্গে কেউ কোনদিন ছেলে পুলেকে মিশতে দিতে পারে? উঃ, কি সেই সাপটা, আর এক সেকেণ্ড দেরী হলেই মন্টিকে ছোবল দিত আর কি। না, ওর সঙ্গে মিশতে না দেওয়াই ভালো—।”

বাড়ী ফিরে মন্টিকে সাবধান করে দিলেন সে যেন আর সেই আফ্রিদীর কাছে না যায়। ওরা যে কি রকম বন্য জাতি—কি রকম প্রতিহিংসা পরায়ণ তা ভালো করে বুঝিয়ে দিলেন। মন্টি যাতে ভয় পায় সে জন্য বেশ ভয়ের গল্পও বলে ফেললেন। নির্বাক মন্টি সব শুনে গেল, কোনও মন্তব্য প্রকাশ করলে না।

পরদিন রবিবার—

নীলমণি বাবু দুপুরে বৈঠকখানায় শুয়ে কাগজ পড়ছিলেন, চোখের কোন দিয়ে হঠাৎ দেখতে পেলেন মন্টি দরজার পর্দা একটু সরিয়ে দেখে উধাও হয়ে গেল।

নিশ্চয় সেই আফ্রীদি সাপুড়ে এসেছে,—

নীলমণি বাবু উঠে পড়লেন—

যা ভেবেছেন ঠিক তাই—গেটের বাইরে বসে দুজনে গল্প আরম্ভ করে দিয়েছে। মন্টি রসিদের কোলের ’পরে একেবারে ঝুঁকে পড়েছে, তার চোখে বিস্ময়ভরা দৃষ্টি,—

“মন্টি—”

মন্টি চমকে লাফিয়ে উঠলো, রসিদও সন্ত্রস্তে উঠে দাঁড়াল—।

নীলমণি বাবু কেবল মাত্র বললেন, “আয়—” অতি করুণ চোখে মন্টি তার বন্ধুর পানে চাইলো—

হাত দুখানা জোড় করে সেই পুরা পাঁচহাত লম্বা লোকটি অনুনয়পূর্ণ কণ্ঠে কহলে, “খোকাবাবু আমায় ডাকে নি বাবুজি, আমিই খোকাবাবুকে ডেকেছি। শাস্তি যদি দিতে হয় আমাকেই দেন—”

শুষ্ক হেসে নীলমণি বাবু বললেন, “না না এর জন্যে শাস্তি আর কি—ওতো আর সাপ নিয়ে খেলতে যায় নি। তবে দুপুর বেলাটা একটু বিশ্রাম করা দরকার কিনা—”

বিচারক পিতা—আসামী ছয় বৎসরের পুত্র মন্টি—

পিতা জিজ্ঞাসা করলেন—“রোজ রসিদ আসে—?”

মন্টি শুষ্কমুখে উত্তর দিলে—“হ্যা—”

নীলমণি বাবু তাকে কোলের মধ্যে টেনে নিলেন, বললেন, “আমি যে তোমায় বারণ করছিলুম মন্টি, ওরা ভারি খারাপ জাত—কোনও দিন ওরা ভালো ব্যবহার করতে পারে না, তবু—”

মন্টি তাঁর বুকের পরে মাথাটা রেখে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো,—রসিদকে সে যে অনেকখানি ভালোবেসে ফেলেছে তার চোখের জলই তার প্রমাণ দিলে।

অনেক কষ্টে সেদিন পিতা তাকে ভুলালেন।

চাকরদের কাছে শোনা গেল রসিদ প্রতিদিন আসে, সারাদিন মন্টির সঙ্গে তার গল্প চলে। মন্টির মা জানালেন মন্টি কোন খাবার খায় না, বাইরে থেকে নিশ্চয়ই কিছু খায়। চাকরেরা বললে রসিদ অনেক খাবার নিয়ে আসে, মন্টিকে তারা খেতেও দেখেছে।

নীলমণি বাবুর ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠলো।

মন্টির উপর রসিদের প্রভাবের কথা শুনে তাঁর এক বন্ধু গম্ভীর মুখে বললেন, "এ সব মন্ত্রের বলে হচ্ছে। আফ্রিদীরা অনেক রকম তন্ত্র মন্ত্র জানে শোনা যায়, তাতে নাকি তারা সাপ বাঘকেও বশ করতে পারে—মন্টি তো একটি ছয় বছরের ছেলে, তাকে বশ করা যে বিশেষ শক্ত হবে তা নয়। এই বেলা মন্টিকে ওর কবল হতে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও হতে পারে, এর পরে আর কিছুতেই পারা যাবে না।

নীলমণি বাবুর দুটি চোখ গোল হয়ে গেল।

(আগামীবারে সমাপ্য)

ইংরাজি সাহিত্যের ধারা

(এলিজাবেথীয় যুগে নাট্য সাহিত্য)

অধ্যাপক ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, পি-এইচ-ডি

(১)

এলিজাবেথীয় যুগের প্রধান কীর্তি হইতেছে ইহার অতুলনীয় নাট্য-সাহিত্য। এই নাট্য সাহিত্যের বৈচিত্র্য ও প্রসার এত অধিক যে স্বল্প পরিসরের মধ্যে ইহার একটা মোটামুটি পরিচয় দেওয়াও অসম্ভব। এই যুগের নাট্যকারদের মধ্যে সর্ব-প্রধান শেকশপিয়ার। শত শত গ্রন্থে ইহার নাট্যপ্রতিভার বিশ্লেষণ ও রসাস্বাদের চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু এখনও ইহার সৃষ্টি-রহস্যের চরম তথ্য উদ্ঘাটিত হয় নাই। আমরা এই ক্ষুদ্র পরিচিতিতে মার্লো, শেকশপিয়ার ও বেনজনসন—এই ত্রি-রত্নের সম্বন্ধে কিছু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব।

মার্লো শেকশপিয়ারের পূর্ববর্তী।—মাত্র উনত্রিশ বৎসর বয়সে তাহার তরুণ শক্তির পূর্ণ পরিণতির পূর্বেই এক সরাইখানায় উচ্ছৃঙ্খল দাঙ্গা হাঙ্গামার মধ্যে তাঁহার জীবন নাট্যের উপর যবনিকাপাত হয়। তিনি দীর্ঘতর জীবন লাভ করিলে শেকশপিয়ারের সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারিতেন কিনা এই বিষয়ে নানাবিধ অনুমানমূলক বিতর্কের অবতারণা হইয়াছে। এই সমস্ত অনিশ্চিত সম্ভাবনা বাদ দিলেও মার্লো যাহা লিখিয়াছেন তাহার উপরই তাঁহার গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রথমতঃ তিনি নাটকের মধ্যে জলন্ত উৎসাহ--উদ্দীপনা, কল্পনার স্ফরিত ঊর্দ্ধগতি, গীতিকাব্যের মূর্চ্ছনা ও শব্দঝঙ্কার সঞ্চারিত করিয়া ইহাকে উন্নত ধরণের আর্টে পরিণত করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ নূতন যুগে মানুষের মন যে অপরিমিত উচ্চাভিলাষ ও অসাধ্য-সাধনের আকাঙ্ক্ষার বাষ্পোচ্ছ্বাসে আন্দোলিত হইতেছিল, তিনি নাটকের চরিত্রাবলীর মধ্যে তাহাকে রূপ ও ভাষা দিয়াছেন। তাঁহার তৈমুরলঙ্গ (Tamberlame) দিগ্বিজয়ের দুরন্ত বাসনায় কক্ষচ্যুত গ্রহের ন্যায় ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহার Jew of Malta অপরিমিত ধন-সঞ্চয়ের নেশায় বিভোর। তাহার Dr Fast is জ্ঞানাহরণের অতৃপ্ত প্রেরণায় শয়তানের সঙ্গে চুক্তি করিয়া তাহার আত্মাকে বিসর্জন দিয়াছেন—বুদ্ধি-সর্বস্ব সর্বজ্ঞতার কণ্টক-মুকুটের জন্য নীতি ও ধর্মজ্ঞানকে অস্বীকার করিয়াছেন। শেষে যখন চুক্তির মিয়াদ ফুরাইয়াছে ও শয়তান অঙ্গীকৃত দাবী মিটাইবার জন্য হাজির হইয়াছে তখন সেই নিঃসঙ্গ মধ্যরাত্রে উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষার মুহূর্তে ফষ্টাসের অসহ্য অন্তর্দ্বন্দ্ব জ্বালাময়ী ভাষায় প্রকাশ লাভ করিয়াছে। এই দৃশ্যের নাটকীয় সংঘাত তীব্রতায় অতুলনীয়।

নাট্য সাহিত্যে মার্লোর স্মরণীয় অবদানের মধ্যে দুইটী উল্লেখযোগ্য। (১) নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত প্রকাশের উপযোগী দৃঢ়বদ্ধ, ওজস্বী ভাষা ও অমিত্রাক্ষরছন্দের প্রবর্তন (২) ও জীবন্ত, প্রাণশক্তিতে ঐশ্বর্যশালী চরিত্রসৃষ্টি। অবশ্য এই সমস্ত নাটকোচিত গুণের সঙ্গে তাঁহার কতকগুলি ত্রুটিও ছিল। (১) তাঁহার পরিধি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ—তাঁহার ভাষা ও চরিত্র পরিকল্পনার মধ্যে বৈচিত্র্যের একান্ত অভাব। (২) তাঁহার রচনায় Humour বা মার্জ্জিত হাস্যরসের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। (৩) স্ত্রী-চরিত্র অঙ্কনেও তিনি সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া অধিকাংশ সমালোচকই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে সুদীর্ঘ জীবনের অধিকারী হইলেও তিনি শেকশপিয়ারের সমকক্ষ হইতে পারিতেন না।

(২)

শেকশপিয়ার সম্বন্ধে কোন মন্তব্য অপরিহার্য কারণে উচ্ছ্বসিত স্তুতিবাদের মতই শোনাইবে। অথচ তাঁহার সমগ্র নাটকাবলী অভিনিবেশ সহকারে পাঠ না করিলে ইহাকে যুক্তিহীন আতিশয্য বলিয়া মনে হইতে পারে।

শেক্সপীয়ার

তাহার সম্বন্ধে ভিন্ন দেশের ও ভিন্ন রুচির সমালোচকদের মধ্যে যে আশ্চর্য ঐকামত রহিয়াছে, তাহা অন্য কাহারও ক্ষেত্রে হয় নাই। তিনি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার—এই মতবাদ একেবারে সর্ববাদীসম্মত। অবশ্য Bernard shaw এর মত দুই এক জন আধুনিক নাট্যকার শেকশপিয়ারের এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী মাহাত্ম্যে কিছু সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু, এই সংশয় মূলতঃ নাটকের উদ্দেশ্য ও নাট্যরচনার পদ্ধতি লইয়া—শেকশপিয়ারের প্রতিভা খর্ব করার কোন অভিপ্রায় ইহাতে লক্ষিত হয় না। বিশেষতঃ বার্নাডশর সমস্ত মতবাদের মধ্যেই একটা চমকপ্রদ অতিশয়োক্তি থাকে—যাহাতে তিনি প্রচলিত সনাতন সংস্কারের ভিত্তি পর্য্যন্ত নড়াইয়া দিতে চাহেন। তাহার বক্তব্যের প্রকৃত লক্ষ্য পাঠক-সমাজে ঘোষণা করা যে শেকশপিয়ারের বিষয় নির্বাচন ও রচনা পদ্ধতি বর্তমান যুগের সমস্যার সহিত সম্পর্ক রহিত ও ইহার সমস্ত উৎকর্ষ স্বীকার করিয়া লইলেও আধুনিককালে ইহা অচল।

শেকশপিয়ারের এই সর্ব-স্বীকৃত চরম উৎকর্ষের কারণ কি? (১) প্রথমতঃ চরিত্র সৃষ্টিতে তাঁহার সিদ্ধহস্ততা, তুলনা বিহীন তাঁহার নাটকে আমরা যত অধিক সংখ্যক জীবন্ত নরনারীর সাক্ষাৎ পাই, এত অন্য কোন নাট্য সাহিত্যে নাই। তাঁহার প্রায় প্রত্যেক চরিত্র প্রাণ-শক্তিতে চঞ্চল, জীবনের নিগূঢ় রসে পরিপূর্ণ। মনে হয় তাহাদের দেহে কাঁটা ফুটাইলে উষ্ণ রক্তস্রোত বাহির হইয়া আসিবে। তাহাদের ভাষা, ভাব-ভঙ্গী, ব্যবহার, গভীর হৃদয়াবেগ—সমস্তই চরিত্র-কল্পনার সহিত আশ্চর্যরূপ সামঞ্জস্য পূর্ণ। সাধারণতঃ সাহিত্যে সৃষ্ট নর-নারীর সহিত বাস্তব জীবনের ব্যক্তিবৃন্দের একটা পার্থক্য দেখা যায়—জীবনের পূর্ণাঙ্গতা সাহিত্যে প্রায় প্রতিফলিত হয় না। জীবনে যে সমস্ত লোকের সংস্পর্শে আমরা আসি, তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের একটা অতৃপ্ত কৌতূহল থাকিয়া যায়—মনে হয় তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইলাম না। জ্ঞাতের পিছনে অজ্ঞাত অংশ উঁকি মারিয়া তাহাদের চারিদিকে একটা রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করে—তাহাদের ব্যক্তিত্বের পরিধিও প্রসার আমাদের জ্ঞানের সীমা ছাড়াইয়া বর্ধিত হয়। সাহিত্যে জীবনের যে খণ্ডাংশ অঙ্কিত হয়, তাহার বিশ্লেষণে কিন্তু একটা সম্পূর্ণতা থাকে—সাহিত্যিক আমাদিগের সম্মুখে যে অংশটুকু মেলিয়া ধরেন তাঁহার রহস্য সূত্রটুকুও আমাদের হাতে তুলিয়া দেন। শেকশপিয়ারের চরিত্রাবলী আমাদের মনে বাস্তব জীবনের মানবের ন্যায় একটা অমীমাংসিত জিজ্ঞাসার উদ্রেক করে। তাহাদিগকে

উল্‌টাইয়া-পাল্‌টাইয়া দেখিয়াও যেন তাহাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা কোনও শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারি না। নাটক-সীমার বহির্ভূত তাহার পূর্বজীবন ও উত্তর জীবন লইয়া আমরা নানা প্রশ্নের অবতারণা করিয়া থাকি। যেমন সত্যিকার মানুষের চরিত্র ব্যাখ্যা লইয়া তেমনি শেকশপিয়ারের সৃষ্ট—চরিত্রাবলীর প্রকৃতি পর্য্যালোচনার অশেষ প্রকারের মতভেদ বর্তমান। ফলস্টাফ কি সত্য সত্যই কাপুরুষ ছিলেন? হ্যামলেটের হৃদয়ের গভীরতম স্তরে কোন জীবনাদর্শ আত্মগোপন করিয়া আছে? ওথেলোর নৃশংস দানবীয়তা কি স্বাভাবিক? রাজা লীয়রের উদ্ভট খেয়ালকে গোড়া হইতেই পাগলামির পর্যায়ভুক্ত করা যায় কি না? ম্যাকবেথের অধঃপতনের দায়িত্ব তাহার, না তাহার স্ত্রীর বেশী—এই সমস্ত জটিল প্রশ্ন আমাদের মনকে নানা সংশয়ে আন্দোলিত করিতে থাকে। তাহাদের মুখের কথা, নাট্যকারের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ও নির্দেশ এ সমস্ত সাক্ষ্য যেন আমরা সম্পূর্ণ মানিয়া লইতে পারি না—অবিশ্বাস কোথা হইতে মাথা তুলিয়া উঠে। নাট্যে যাহা ব্যক্ত হইয়াছে তাহার পিছনে অব্যক্ত অংশ আমাদের মনে ছায়াপাত করে ও আমাদের বিচার-বুদ্ধিকে সন্দেহাকুল করিয়া তোলে। ইহাই শেকশপিয়ার সৃষ্ট চরিত্রগুলির উৎকর্ষের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

(২) শেকশপিয়ারের নাটক সম্বন্ধে লক্ষ্য করিবার দ্বিতীয় বিষয়, তাহাদের জনপ্রিয়তা। সুদূর এলিজাবেথীয় যুগ হইতে অতি আধুনিক কাল পর্যন্ত এই বিষয়ে এক বিস্ময়জনক রুচিগত ঐক্যের নিদর্শন মিলে। অনেক নাট্যকার যুগবিশেষের সমস্যা লইয়া কারবার করেন—ভিন্ন যুগে রুচি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের পূর্বপ্রতিষ্ঠা ম্লান হইয়া আসে। আবার অনেকে সৌন্দর্যতত্ত্বের উচ্চ ভূমিতে দাঁড়াইয়া প্রকৃত জন-সাধারণের রুচির অনুবর্তনকে নিন্দনীয় মনে করেন—বর্তমান সাফল্যের জন্য সনাতন আর্টের বলি দেওয়া যাঁহারা অত্যন্ত অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। শেকশপিয়ারের মধ্যে এরূপ কোন অবজ্ঞা বা আত্মাভিমানের চিহ্নমাত্র নাই। জনসাধারণের সঙ্গে তাঁহার একটা অতি সহজ ও স্বাভাবিক মিলন-ক্ষেত্র রচিত হইয়াছে—কৃত্রিম শিক্ষাভিমান এই মিলনের পথে কোন-রূপ বাধা সৃষ্টি করে নাই। শেকশপিয়র যুগের সমস্ত ইতর, রুঢ় রুচিকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, ও আশ্চর্যভাবে ইহাদিগকে বিশুদ্ধ সংস্কৃত করিয়া চির সৌন্দর্যালোকে উন্নীত করিয়াছেন। সেকালের লোকে ভাঁড়ামিতে আমোদ উপভোগ করিত। শেকশপিয়ারের অনেক নাটকে এই ভাঁড় আবির্ভূত হইয়া সাধারণ লোককে রস পরিবেশন করিয়াছে। কিন্তু এই স্থূল অমার্জিত হাস্য-পরিহাসের মধ্যে কবি এমন একটি সুর লাগাইয়াছেন, এমন করুণ মূর্চ্ছনা ঝঙ্কৃত করিয়াছেন যাহাতে তাহার প্রকৃতি সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে—ভাঁড়ামির অর্থহীন প্রলাপের মধ্যে জীবন সম্বন্ধে গভীরতম অন্তর্দৃষ্টি বিদ্যুৎস্ফুরণের ন্যায় ঝলকিত হইয়াছে। তৎকালীন শ্রোতৃবর্গ মারামারি রক্তপাতের পক্ষপাতী ছিল—শেকশপিয়ার এই রুচি পূর্ণ মাত্রায় সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু এই খুনাখুনি ও রক্ত প্রবাহের মধ্যে নিয়তির নিগূঢ় লীলা, ন্যায় বিচারের সূক্ষ্ম ক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়া এই অস্বাভাবিক সংঘটনগুলিকে উদার বিশ্বনীতির অঙ্গীভূত করিয়াছে। আকস্মিকের মধ্যে চিরন্তনের আবিষ্কার, বিশেষ যুগের খেয়ালের মধ্যে সর্বযুগ-সাধারণ সনাতন নীতির প্রয়োগ নাট্যকারের উৎকর্ষের একটা মানদণ্ড।

শরতে

শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী

ছেয়েছিল বনবীথি বকুলের ফুলে ফুলে,
কদম কেশর ঝুরে শুখায়েছে তরুমূলে;
কে আবার দিল ঢালি, উজাড়ি পূজার ডালি,
সিত সেফালিকা রাশি, কি জানি কি মনভুলে।

বিকশিল শতদল, কার রাঙা পদ লোভে,
কাহারে ঢুলাবে বলে' কাশের চামর শোভে,
আগমনী গান গেয়ে, তরী বেয়ে চলে নেয়ে,
মুখরিত গীতরবে, ভরা নদী দুলে কূলে।
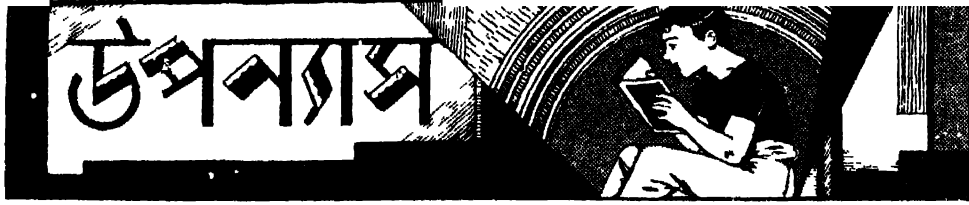
৩১শে মার্চ, মঙ্গলবার, বেলা ১২টা!

শ্রীতাপসরঞ্জন সরকার

৩

ছদ্মবেশ

সমীর ও অজয় বাড়ীতে ঢুকলো কিন্তু বিজয়কে বাড়ীতে পাওয়া গেল না। চাকরকে দু'কাপ চায়ের হুকুম দিয়ে তা'রা গল্প করতে লাগলো।

চা খাওয়া শেষ হয়েছে এমন সময় বৈঠকখানা ঘরের সামনে সদরের গলিপথে এক হিন্দুস্থানী কাপড়ওয়ালা ঢুকে বললে, "কাপড়া চাই বাবু? বহুৎ কিসম্ কা আছি আছি দেশী ছিট লে আয়া হুজুর। দাম্ ভি বহুৎ সস্তা।" লোকটিকে দেখে মাড়ওয়ারী বলেই মনে হোল। মাথায় ময়লা একটা বিকানীরী পাগড়ি, পায়ে ধুলোকাদা মাখা ছেঁড়া নাগরা জুতো। গায়ে এক চাপকান প্যাটার্ণের দড়ি বাঁধা মেজাই। ছোট একটি নাদুস নুদুস ভুঁড়িও তা থেকে ঠেলে উঠেছে দেখা যাচ্ছে। সমীরের হঠাৎ মনে কেমন সন্দেহ হ'ল যে বেটা ফেরিওয়ালা হঠাৎ একেবারে বাড়ীর ভেতর ঢুকে পড়লো কেন? মতলব আছে নাকি কিছু? বিরক্ত হয়ে বললে—কুছ নেই মাংতা—যাও, ভাগো—কোঠী কা অন্দরমে ঘুষা কাহে? নিকালো।" কিন্তু সমীরের কথা শুনে তার মুখের দিকে চেয়ে হিন্দুস্থানী ফেরিওয়ালাটা মুচকি মুচকি হাসছে দেখে সমীর উঠে পড়ে চট করে তার হাতটা বজ্র মুষ্টিতে ধরে ফেলে বললে — "তোম কোন হ্যায়?"

হিন্দুস্থানীটি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে—বিস্ময়াবিষ্ট অজয় চৌধুরীকে সম্বোধন করে বললে—"আমি আপনার পিতার লিখিত সেই রহস্যময় উইল চুরির ব্যাপারটিরই একটা সূত্র পাবার আশায় আজ সকালে বেরিয়েছিলাম, পেয়েওছি একটা সূত্র, আশা করি এই সূত্রই আমাদের কাজের প্রধান সহায় হয়ে উঠবে।" অজয় ও সমীর এই অজ্ঞাত অপরিচিত মাড়োয়ারী ফেরিওয়ালার কথা শুনে বিস্ময়ে মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইলো। এক মিনিট নিস্তব্ধে কেটে গেল। কারো মুখে কোনো কথা নেই। সমীর নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে বলে উঠলো, "সাবাস্ বিজয়। আশ্চর্য ছদ্মবেশ ধরেছিস। আমি তোকে একটুও চিনতে পারিনি। বাইরের লোকের পক্ষে চেনা তো আরও দূরের কথা।" বিজয় বললো, "যদি চিনতেই পারবে তাহ'লে আর ছদ্মবেশের বাহাদুরীটা কী? হাত খানি ছাড়, কব্জীতে বেজায় লাগছে।" সমীর অপ্রতিভ হয়ে হাত ছেড়ে দিলো। বিজয় এক টানে তার নকল দাড়ি গোঁফ খুলে ফেলে বললে—"এখন কাজের কথা বলি। শুনুন অজয়বাবু আপনাকে গোটাকতক প্রশ্ন করব আপনি তার সঠিক উত্তর দিতে চেষ্টা করবেন।"

অজয় বললে—"জিজ্ঞাসা করুন?'

বিজয়—"আপনার পিতার মৃত্যু হবার পর আপনি কবে এবং কোথায় উইলটি প্রথম দেখতে পান?"

অজয়—"আমি ওখানা বাবার সিন্দুকেই পেয়েছিলাম। অশৌচান্তে শ্রাদ্ধশান্তির জন্য টাকাকড়ির প্রয়োজন হওয়ায় প্রথম সেদিন সিন্দুক খুলি, সেইদিনই পাই।"

বিজয়—"তারপর?"

অজয়—"এরকম অদ্ভুত উইল লিখে রেখে যাবার কারণ কি ঠিক বুঝতে না পেরে আমি উইলখানি নিয়ে সরিৎবাবুর কাছে যাই। আপনি জানেন বোধ হয় তিনি

আমাদের পিতৃবন্ধু, হিতাকাঙ্ক্ষী, তিনি বললেন যে ওর অর্থ আমাকে পরে বুঝিয়ে দেবেন, উপস্থিত উইল সিন্দুকেই তুলে রাখতে বললেন। আমিও ওখানা আবার সিন্দুকেই তুলে রেখে দিই। কিছুদিন আগে, অর্থাৎ এই ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়াতেই সরিৎবাবু আমাকে বললেন উইলখানা নিয়ে আসতে, আমি সিন্দুক খুলে দেখি উইলটি নেই। সরিৎবাবুকে বললুম 'উইলখানা সিন্দুকে পাওয়া যাচ্ছে না,—কিন্তু তিনি এ সংবাদ শুনে বিশেষ কিছু বিচলিত হ'লেন বলে মনে হোলো না। তিনি বরং স্তম্ভিতের মতো নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন।"

বিজয়—"সিন্দুকের ডুপ্লিকেট চাবি আছে ?"

অজয়—হ্যাঁ, একটা আমার কাছে আছে আর একটা বাবার আমল থেকেই সরিৎবাবুর কাছে থাকে।"

বিজয়—"আচ্ছা, সিন্দুকটার কাছে কি সে ঘরের দেয়ালে কোনো জানালা আছে ?"

বিজয়, "হ্যাঁ, ঠিক সিন্দুকটার উপরেই দেয়ালের গায়ে ঘরের একটা জানালা আছে।"

বিজয়—"জানালাটায় লোহার গরাদ বা রেলিং দেওয়া আছে কি ?"

অজয়—"কোনো জানালার গরাদ নেই, ওদিকে বাবার ছিল একটু সাহেবীয়ানা সখ।"

বিজয়—"আচ্ছা, উইল চুরির আগে কি সরিৎবাবু আপনার বাড়ীতে খুব ঘন ঘন আসতেন ?"

অজয়, "হ্যাঁ, প্রায় প্রত্যহই আসতেন, কিন্তু এখন খুব কমই আসেন। আর, এলেও আগেকার মত আত্মীয়তা করেন না। এখন যেন তাঁকে সব সময়ই নিতান্ত বিষণ্ণ ও চিন্তাকুল বলে মনে হয়, কথাও খুব কম বলেন।"

বিজয়,—"হুঁ। আচ্ছা আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ৩১শে মার্চ মঙ্গলবার, বেলা ১২টার মধ্যে এই উইল চোরকে আমি নিশ্চয় ধরতে পারবো আশা করি।"

অজয়—"আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আচ্ছা, এখন তাহলে আমি আসি ?"

বিজয়—"হ্যাঁ, আর দেখুন আপনি ৩১শে মার্চ পর্যন্ত খুব সাবধানে থাকবেন। আপনার সাংঘাতিক বিপদের সম্ভাবনা আছে।"

অজয়, "যে আজ্ঞে!" বলে একটা নমস্কার করে আস্তে আস্তে গেট পার হয়ে চলে গেল। তখন সুমীর বিজয়কে জিজ্ঞাসা করলে, "উইলের ব্যাপার তুমি কি করে জানলে ? আর এমন ছদ্মবেশে গিয়েছিলেই বা কোথায় ?"

বিজয় বললে, "কাল রাত্রেই আমি ব্যাপারটা অনেকখানি অনুমান করেছিলাম। তারপর আজ সকালে তুমি যখন বেরিয়ে গেলে আমিও তোমার পিছু পিছু একটা 'বাইক' নিয়ে যাই। যাবার উদ্দেশ্য ছিল অবশ্য অন্যত্র, কিন্তু, আমি দেখতে পাই যে একটা লোক তোমার পিছু নিয়েছে। কাজেই আমি সেই লোকটার অনুসরণ করি। সেও একখানা 'বাইকে' যাচ্ছিল। তুমি যে 'মোটরবাইক' নিয়ে বেরুবে তা হয়তো লোকটা ভাবেনি, কাজেই কিছুদূর যাবার পর তোমাদের মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই বাড়তে লাগলো। শেষে লোকটা আর তোমাকে ধরতে পারলে না। ক্ষুণ্ণ মনে 'বাইক' ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরলো। আমিও ছাড়বার পাত্র নই, একটু দূরে এগিয়ে গিয়ে পরে আমিও বাইক ঘুরিয়ে নিয়ে তার পিছু পিছু গিয়ে লোকটা কে এবং তোমাকে তার অনুসরণ করবার কারণটা কি—জানা দরকার মনে করলুম। আমার সংশয় অনেকটা দূর হল—যখন দেখতে পেলুম যে সেই লোকটা বরাবর সরিৎবাবুর বাড়ীতে গিয়ে ঢুকলো। তুমি বোধ হয় জান না যে কাল রাত্রে যখন তুমি ঘুমিয়ে পড় তখন আমি আবার আস্তে আস্তে বেরিয়ে যাই। তোমার দিব্যি নাক ডাকছিল, কিন্তু আমার কিছুতেই ঘুম আসছিল না। যমুনার বুকে মোটরলঞ্চের রেস আমার মনে ভীষণ অশান্তি সৃষ্টি করেছিল। রাত্রি বোধ হয় তখন ১টা। আমি সোজা একেবারে যমুনার ধার দিয়ে যেতে যেতে 'নীল ঘাটে' উপস্থিত হ'য়ে দেখি যে সেখানে দু'খানা মোটর লঞ্চ বাঁধা রয়েছে। টর্চ জ্বেলে দেখি একটা বোটের নাম, কুমারিকা 'W, 4002' আর একটার নাম, 'রোমান্স S, 926' বোট লাইসেন্সের নোট বইখানা পকেট থেকে বের করে দেখি 'কুমারিকার' মালিক এই অজয়ের পিতৃবন্ধু দুর্মদ সরিৎবাবু এবং 'রোমান্সের' মালিক ভদ্রবেশি জোচ্চোর নামজাদা নবীন রায়। উভয়কে আমি ভালরকম জানি। তোমার বোধ হয় মনে আছে যে, কাল রাত্রে যমুনায় তিনখানা মোটর বোট দেখেছিলাম

তার একখানার নম্বর আমার নেওয়াই ছিল 'কোষ্ঠারিকা N, 2021' কিন্তু দু'খানা দেখছি এক ঘাটেই বাঁধা রয়েছে। কোনটা কাকে অনুসরণ করেছিল? এরা কি পরস্পরের বিরোধী? সম্ভব নয়। তাহলে এক-ঘাটে থাকত না। তবে সেটাও থাকা সম্ভব যদি একখানা আর একখানাকে ধরে বেঁধে থাকে। হঠাৎ আমার দৃষ্টি পড়লো 'রুমাবিকা'র হালের দিকে। দেখি তার পিছনে হালের সঙ্গে 'বোমাস্' লোহার শিকল দিয়ে বাঁধা রয়েছে। তখন আর আমার বুঝতে বাকী রইলো না যে কে কাকে অনুসরণ করেছে, এবং কে কার বন্দী হয়েছে। সেখান থেকে ফিরে আমি তাড়াতাড়ি সরিৎবাবুর বাড়ীর দিকে রওনা হই। সেখানে গিয়ে দেখি তখনও নীচের একটা ঘরে আলো জ্বলছে। এত রাত্রে আলো জ্বলে কেন, জানবার কৌতূহল হ'ল। পাঁচিল টপকে বাগান পার হয়ে ঘরের কাছে গিয়ে শুনি ভেতরে কারা কথাবার্তা বলছে। একটি জানালার ধার ঘেঁসে গিয়ে দাঁড়ালুম। মিনিট দশেক দাঁড়িয়ে রইলুম, কিন্তু তাদের কথাবার্তা কিছুই স্পষ্ট শুনতে পেলুম না। কেবল দুটো কথা আমার কানে এল "উইল" আর "৩১শে মার্চ মঙ্গলবার, বেলা ১২টা।" ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিলো। তাই সেখান থেকে চলে আসবার সময় অসাবধানতা বশতঃ পায়ে বাগানের মধ্যে কিসে ধাক্কা লেগে বেশ একটু শব্দ হয়। তাড়াতাড়ি একটা ঝোপের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে ক্ষণকাল অপেক্ষা করে দেখলুম যে কেউ সে শব্দ শুনে বেরুল কি না আমার খোঁজ করতে—কেউ এল না দেখে আমি তখন কতকটা নিশ্চিন্ত হয়েই বাড়ীর দিকে রওনা হ'লাম। বাড়ীতে ঢুকে যখন দরজা বন্ধ করি তখন দেখি যে দরজার কাছ থেকে প্রায় পঁচিশ হাত দূরে একটি লোক যেন ছুটতে ছুটতে এসে থমকে দাঁড়ালো। আমি বুঝতে পারলুম যে সেই শব্দ শুনেই এই লোক গোপনে আমার পিছু নিয়েছিলো। আমি তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে ঘরে এসে শুয়ে পড়ি। কিন্তু ঘুম তখন চটে গেছে। যে কথাদুটো শুনে এসেছিলুম তাই নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে ভাবতে মাথায় এলো যে ৩১শে মার্চ মঙ্গলবার, বেলা ১২টার সঙ্গে এই উইলের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে নিশ্চয়। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি মনে নেই। আজ সকালে তোমার পিছু নিয়েছিল যে লোকটা তাকে যখন ফিরে এসে সরিৎবাবুর বাড়িতে ঢুকতে দেখলুম তখন আমি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে কাপড়ওয়ালার ছদ্মবেশ ধরে ছিটের মোট ঘাড়ে নিয়ে একেবারে সোজা সরিৎবাবুর বাড়ির ভেতর গিয়ে ঢুকে পড়লুম।

ভিতরে গিয়ে দেখি সরিৎবাবুও কয়েকজন লোক গাড়ী বারান্দার নীচেয় বসে কি সম্বন্ধে যেন আলোচনা করছে। আমাকে দেখে সরিৎবাবু বল্লেন, "এ বাড়ীতে কোনও কাপড়ের দরকার নেই। তুমি যেতে পারো।" আমি তখন সেখান থেকে খানিক দূরে সরে এসে বাগানের মধ্যে ঘাড়ের মোট নামিয়ে কাঁধের গামছাখানা নেড়ে বাতাস খেতে ও ঘন ঘন ঘাড় মুখ মুছতে লাগলুম; যেন ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম করছি এই ভাব দেখিয়ে একটা গাছের আড়ালে আমার কাপড়ের বস্তার ওপরই বসে পড়লুম। সেখান থেকে ওদের না দেখতে পেলেও কথাগুলো বেশ শুনতে পাচ্ছিলুম। একজন বলছিল, "আমি কথা দিচ্ছি আপনাকে সরিৎবাবু, আপনি যদি আমাকে নগদ পাঁচশো টাকা দেন তা'হলে আমি ৩১শে মার্চ মঙ্গলবার বেলা ১২টার আগে নবীন রায়ের বাড়ী থেকে যে করেই হোক্ উইলখানা উদ্ধার করে এনে আপনাকে দেবোই দেব।" বাস্, আর বেশী কিছু শোনবার জন্য সেখানে বসে থাকা নিরাপদ নয় বলে আমি তৎক্ষণাৎ একেবারে দে চম্পট।"

"ব্যাপারটা কি তা বোধ হয় ধরতে পেরেছ?" সমীর জিজ্ঞাসা করলে।

"হ্যাঁ যতদূর অনুমান করতে পারি, আমার মনে হয় ব্যাপারটা হ'য়েছে এই যে—নবীন রায় চোরের উপর বাটপাড়ি করেছে।" বিজয় বলতে লাগলো, "সরিৎবাবুর মনটা কেন যে এমন বিগড়ে তাও এইবার পরিষ্কার বুঝতে পারছি। কি করে উইলটি এখন নবীন রায়ের কবল থেকে উদ্ধার করা যায় এই নিয়ে বেচারি এখন বড়ই চিন্তিত। অজয়বাবুর বাড়ীতে কেন যে আজকাল অত কম যাতায়াত করেন তাও বেশ বোঝা যাচ্ছে। সেয়ানায় সেয়ানায় কুলাকুলি চলেছে—নবীন ভার্সেস্ সরিৎ, কে হারে কে জেতে। ৩১শে মার্চ মঙ্গলবার বেলা ১২টায় এর ফাইন্যাল হবে। আমাদের পথও অনেকটা সুগম হয়েছে। এখন আমাদের প্রধান কাজ হচ্ছে নবীনের

হাত থেকে সরিতের হাতে পড়বার আগে উইলখানা আমাদের উদ্ধার করতেই হবে।

সমীর বললে—নবনেট। একটা ডাকাত—খুনে বলাও চলে। আমি বলি কি, সতর্ক লক্ষ্য রাখা যাক। উইলখানা নবীনের কাছ থেকে সরিৎবাবুর হাতে এসে পড়লে উদ্ধার করা অনেক সহজ হয়ে যাবে।"

বিজয় বললে—তা' মনেও ভেব না সমীর। ডাকাত ও খুনেদের চেয়েও ভয়ানক ক্রিমিন্যাল হ'ল যারা ভদ্রসমাজে ভালমানুষ সচ্চরিত্র ও বিশ্বাসী সেজে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-পরিজনের সর্বনাশ করে। অজয়বাবুর পিতৃবন্ধু এই সরিৎ সাগরের বন্ধুটিকে আমার সেই রকম একটি গভীর জলের মৎস্য বলেই মনে হচ্ছে। যাক্, এখন চল, বেলা হল, নাওয়া-খাওয়া সেরে নেওয়া যাক্।

(ক্রমশঃ)

ভূতালোক

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

কুনুরের তীরে বড় এক জলাভূমি,
সে দিকে রাত্রে কদাচ যেয়ো না তুমি।
দূর হতে ঠিক দেখিতে পাইবে রাতে
পেত্নীরা সেথা আলোকের জাল পাতে।
যদি হয় ধন রাজ্যও লাভ বা
ত্যজো সে ভূতের আড্ডিশ আব্বা।

২

একদিন ঠিক রাত্রি এগারটায়
দেখিনু সেদিকে সারি সারি আলো যায়।
ভাবিলাম তবে কথা এ সত্য বটে
ভূতের এ থানা গ্রামের সন্নিকটে।
মজিদ মিঞাকে ডাকিয়া বলিনু ভাই
আজিকে ভূতের দাপাদাপি দেখা চাই।

৩

দুজনে দুইটা বন্দুক করে লয়ে
চলিনু বুকটা দুম্‌দুম্ করে ভয়ে।
লোহা ও আগুন সঙ্গে যা হ'ক আছে
ভূতেরা নেহাৎ ঘেঁষিতে নারিবে কাছে।
আমাদিগে দেখে আলোগুলা উঠে নামে
কখনো ডাহিনে, কখনো বা ছুটে বামে।

৪

দুজনে দাঁড়ায়ে দেখিলাম মোটামুটি
ভূত না থাকুক, আলোকের ছুটাছুটি।
কখনো নিভিছে, কখনো জ্বলিছে পুন
সাধ্য থাকেত সংখ্যা তাদের গুনো।
গভীর আঁধার, নির্জন চারিধার,
রাত্রে জলার রূপ সে চমৎকার।

৫

ঝিল্লি ডাকিছে, বহে শন্ শন্ হাওয়া,
কে যেন বলিছে, গিয়াছে শিকার পাওয়া'
খোণা কণ্ঠেতে বলে কবি হাউ মাউ
ওরে মানুষের গন্ধ এখানে পাঁউ।
ভূত মোরা নই, আমরা আলেয়া গো
এসোনা এখানে যাও ঝট্ ভাগো।

মামু

শ্রীযুক্তা সুখলতা রাও

রাজা নারায়ণচন্দ্রের মেজাজ কতকটা সেকেলে রাজাদের মতই, যদিও তিনি জমিদার মাত্র, 'রাজা' তাঁর খেতাব। পুণ্য অর্জনে দান করিতে তিনি মুক্ত হস্ত, কিন্তু তাঁর প্রজাদের দুঃখ আর ঘোচেনা। রাজবাড়ীর চারিদিকে ছোটখাট একটি শহর গ'ড়ে উঠেছে। শহরের পরেই ধানের ক্ষেত নানা রকম শাক সবজির ক্ষেত, মাঝে মাঝে এক একটি গ্রাম। আরও দূরে, ঝোপ জঙ্গল ও কাঁকর মাটি ক্রমে গভীর জঙ্গলে গিয়ে মিশেছে।

রাজার একমাত্র সন্তান রথমোহন বড় শহরে থেকে পড়াশোনা করে, তার চলিত নাম মোহন। জমিদার বলে, জমিদারী মেজাজ তাকে এখনও পেয়ে বসেনি। মোহনের সঙ্গে থাকে দু চারটি চাকর, বামনঠাকুর ও মোহনের সমবয়সী আত্মীয় গোপাল। সহরটি ছড়ান, বাড়ীগুলি জমকাল নয়, তবে প্রায় সব বাড়ীতেই লাগোয়া ছোট একটু বাগান আছে। মোহনদের বাড় থেকে নদী দেখা যায়। বাড়ীর পিছনদিকে একটা সরু গলি, সেখানে কয়ঘর ধোপা ও জেলের বাস।

দোতালার একটা ঘরে মোহন পড়ে। সামনে পরীক্ষা, তাই সে এখন ভোর চারটায় উঠে পড়তে বসে। প্রায় প্রতিদিনই, পিছনের গলি থেকে একটা কান্নার সুর তার কানে ভেসে আসে, মনে হয় ছোট একটি মেয়ে কি ব'লে ব'লে যেন কাঁদছে, 'মা' কথাটা বেশ স্পষ্ট শোনা যায়। মোহনের মন খারাপ লাগে। এক একবার ভাবে, চাকর পাঠিয়ে খবর নেবে কে কাঁদে, আবার মনে করে 'ওরা কি ভাববে?'

একদিন সে বললে গোপালকে "চল না ভাই দেখে আসি কে কাঁদে?" গোপাল ত হেসেই অস্থির "পাগল নাকি, কে কোথায় কাঁদছে তাতে আমাদের কি?" "না ভাই, এ পাড়ার লোকেরা বড় গরীব। আমার দেখতে ইচ্ছা হয় ওরা কেমন থাকে, কি খায়, ওদের ছেলেমেয়েরা কি ভাবে মানুষ হয়।" "আমরা নিজমূর্তি ধ'রে গেলে ত ওরা ঘরে দোর দেবে, কথা কইবে না, সন্দেহ করবে 'কোনও মতলবে এসেছে', যদি 'হারুণ অল রসিদ' হ'তে পার, কিংবা রূপকথার সেই চাদরখানা যোগাড় করতে পার, যেটা গায়ে দিলে অদৃশ্য হয়, যদি কিছু করতে পার।"

কথাটা মোহনের মাথায় ঘুরতে থাকল। কলেজের ছেলেদের কাছ থেকে ছদ্মবেশের কিছু সরঞ্জামও যোগাড় হতে দেরী হ'ল না। পূজার ছুটীতে গোপাল বাড়ী গেছে, মোহন বাড়ীতে চিঠি দিয়েছে 'যেতে দুচার দিন দেরী হবে।" সেই দুচার দিনের মধ্যে এক সন্ধ্যা বেলা, বিশ্বু চাকরের সাহায্যে, সে এক ফেরিওয়ালা সেজে কিছু দইবড়া ও 'গুলগুলা' নিয়ে গলির ভিতর গেল ফেরি করতে। প্রথমেই দেখলে একটা বড় চালাঘরের দাওয়ায় ব'সে দুচারজন লোক তাশ খেলছে। তার ঠিক লাগোয়া একটা চাল ডাল আলু পেঁয়াজের দোকান। তারই পাশে ছোট একখানা চালাঘর। ঘরের দরজা দিয়ে নীচু হ'য়ে ঢুকতে হয়, সামনে একটা ভাঙা রোয়াক। রোয়াকে ব'সে এক বুড়ী একটা জামবাটী মাজছিল, খোলা দরজা দিয়ে মিট-মিটে ডিবরির ঝাপসা আলোয় দেখা যাচ্ছিল, মেঝেতে ছেঁড়া মাদুরের বিছানায় কাঁথা জড়ান দু তিনটি ছেলেমেয়ে, কেউ ঘুমিয়েছে, কেউ বা 'বড়া গুলগুলা' ডাক শুনে মাথা তুলে দেখছে। রাতের খরচ বাঁচাবার জন্য সন্ধ্যার আগেই তাদের খাওয়ার পাট শেষ হয়।

ফেরিওয়ালা জিজ্ঞাসা করল "বুড়ি, তোমাদের পাড়ায় রোজ কাঁদে কে?" বুড়ী একটু বিরক্ত হয়ে বলল "কেউ কাঁদে না।" "কাঁদে বৈকি, আমি রোজ ভোর বেলা শুনতে পাই।" বুড়ী কিছু জবাব দেবার আগেই, কাঁথার ভেতর থেকে একটি ঝাঁকড়া মাথা বেরিয়ে মিহি গলায় বলল "হাঁ লো নানী, স্বস্তি কাঁদে, সেই কথা শুধোচ্ছে।" বুড়ী তাকে ধমক দিল, "তুই চুপ ক'রে শো।"

পরদিন আবার সেই ফেরিওয়ালা একটু সকাল সকাল সেই গলিতে 'দই বড়া' ডেকে চলল। দু' একপা যেতেই শুনতে পেল ঝাঁকড়া চুল মেয়েটি ডাকছে "এই দই বড়া! এ দিকে এসো।" "বড়া নেবে?" ব'লে ফেরিওয়ালা তাড়াতাড়ি কাছে গেল। মেয়েটি মাথা নেড়ে বলল "না গো না, বড়া নেব না, আজ পয়সা নাই। বলছিলাম কি, কেউ কাঁদে না, খুস্তি বিনা শ্বশুর বাড়ী যাবে, তাই কান্না শিখছে।" মোহনের মনে প'ড়ে গেল, তাদের দেশে কোন কোন অঞ্চলে, শ্বশুর বাড়ী যাবার সময় মেয়েকে কাঁদতে হয়, আর আগে থেকে সেই কান্নার বাঁধা ছড়া শিখতে হয়। "ও হো—তাই বলো। আর তুমি কবে কাঁদতে শিখবে?" "আমি ত শিখেই গেছি, অনেক পদ বলতে পারি, এই শোন না—" বলে সে গেয়ে চলল।

"পাচিরি পাচিরি, সুনা পাচিরি,

অর্থাৎ—

পাঁচিল পাঁচিল, পাঁচিল সোনার,
ভাঙ্গল খেলার ঘরটি আমার,
বো গো। (মা গো)
কেবা কি বইল বাবার সাথে,
বাবা দিল তুলে তাদের হাতে,
বো গো। (মা গো)
পথের পাশেতে পানের বরজ,
বুঝবে তারা কি আমার দরদ
বো গো। (মা গো)

"বাঃ, তবে ত তোমাকেও শ্বশুর বাড়ী পাঠিয়ে দিলে হয়!" "উঁহু—" ব'লে মেয়েটি জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে আপত্তি জানাল, "আমি কক্ষনো যাব না।" "কেন বল ত?" "তোলে আর মোটে বাড়ীতে আসতে দেবে না।"

সত্যই তাই। এদের সমাজে মেয়ে যখন শ্বশুর বাড়ী যায়, চিরকালের জন্য সব ছেড়ে যায়। তাই বুঝি এদের ছড়া কাটা কান্নাও এত করুণ!

এমন সময়ে একটা গোলমাল শুনে মোহন চেয়ে দেখে চালের দোকানের ধারে, রাস্তার উপরে ৮, ১০ বছরের একটি ছেলে প'ড়ে আছে, দোকানের সিঁড়ির পাথরে ধাক্কা লেগে তার কপাল কেটে রক্ত পড়ছে। ছেলেটি দোকানীর কাছে একটি আলু চাইছিল, বার বার যেতে বলতেও যখন সে গেল না, তখন দোকানী রেগে তাকে দিল এক ধাক্কা, তাতেই সে পড়ে গেছে। গোলমাল শুনে আশেপাশের বাড়ী থেকে লোকজন বেরিয়ে পড়েছে। এর মধ্যে কোথা থেকে একটি স্ত্রীলোক ছুটে এসে ছেলেটিকে টেনে তুলে নিল আর দোকানীকে যা ইচ্ছা তাই বলে চ'লে গেল। বুড়ী নানীও দোকানীকে দু'চার কথা শুনিয়ে দিতে ছাড়ল না "আহা, ছেলে মানুষ, খেতে পায় না, ভাত জোটে ত নুন জোটে না। একটা আলু বই ত নয়, না হয় দিতেই। বেচারা পান্তার সঙ্গে পড়িয়ে খেত। আর দিলে নাই যদি, এমন ক'রে ঠেলা মারলে কেন? কেমন মানুষ গো তুমি?" দোকানী দাঁত খিঁচিয়ে উঠল "অত দরদ যদি ত তুমি দিলে না কেন? সকলকে বিলোতে গেলে আমার দোকান পাট তুলে দিতে হবে। পান্তার সঙ্গে আবার আলু চাই। বাবুগিরি দেখ না।"

সেদিন থেকে ব'সে মোহনের মুখে যেন ভাত উঠে না। কত ভাল ভাল খাবার তাদের বাড়ীতে ফেলা যাচ্ছে, আর তাদেরি পাশে ছোট একটি ছেলে একটি আলুর কাঙাল, ছোট একটি মেয়ে পয়সা নেই বলে সামান্য তেলে ভাজা বড়া কিনে খেতে পায় না।

বাড়ীতে গেলে, মোহন দেখে সেখানেও সেই ব্যাপার। গরীব লোকদের খাওয়া পরা চলা ভার, চালে খড় নেই, বৃষ্টি হলে ঘর ভিজে যায়, ভিজা কাপড় গায়েই শুকায়। তার মনটা একেবারে খারাপ হয়ে গেল। এর কি কোনও প্রতিকার নেই? আবার সে ছদ্মবেশ ধা'র ক'রে, চললো ঘুরতে ওদের পাড়ায়। জানলেন কেবল তার মা, আর জানল চাকর বিশু।

গ্রামের লোকে বলাবলি করে "বিশুর যে নূতন মামু এসেছে। সে বড়ই ভাল লোক। পর বইত নয়, তবু সকলের সুখ দুঃখে কত তার দরদ।" কেউ বলে "লোকটা সবাইকেই কিছু কিছু দেয়, এত পায় কোথা?" আর কেউ বলে "জানিস না? বিশু বলেছে ওর ঢের টাকা।" "টাকা থাকলেই কি মানুষ দেয়? মনটা বড় হওয়া চাই।"

পরের বছর বন্যায় দেশ ভেসে গেল। গরীব চাষীদের কষ্টের সীমা রইল না। ধান সব নষ্ট হয়ে গেছে, তারা খাজনা দেবে কোথা থেকে? তাই সকলে মিলে পরামর্শ ক'রে জমিদারের কাছে গেল—খাজনা মাফ ক'রে দিতে

হবে। নারায়ণচন্দ্র হিসাবী লোক, বললেন খাজনা মাফ করলে তিনি খাবেন কি? নিরাশ হ'য়ে ফিরে এসে চাষীরা পরামর্শ করতে লাগল কি করা যেতে পারে। অনেক কথার পর ঠিক হ'ল। খাজনা তারা দেবে না, জমিদারের লোক এলে লাঠি মেরে তাড়িয়ে দেবে।

সেখানেও বিশুর মামু এসেছে। এখন সে সকলেরি মামু, সবাই তাকে ভালবাসে। আর, বাসবে নাই বা কেন? নিজে সে জঙ্গল থেকে বাঁশ কাটিয়ে এনে তাদের ঘর বেঁধে দিয়েছে, ছেলে মেয়েদের কাপড় দিয়েছে, চালও বিলিয়েছে অনেক। কিন্তু একজন আর কত দিতে পারে, কয় দিনই বা দেবে? সে এখানের বাসিন্দাও নয়।

যেমন হয়ে থাকে, খাজনা আদায় নিয়ে রাজা প্রজায় দাঙ্গা ক্রমে বেড়ে চলল। শেষে একদিন খুব বাড়াবাড়ি হ'ল। দু' চারজন জখম হবার পরে, জমিদারের লাঠিয়ালরা শ্রান্ত হয়ে পড়েছে, গ্রামের বিদ্রোহীরাও যেন আর লাঠি ধরতে পারছে না, এমন সময়ে হঠাৎ দূরে শোনা গেল ভয়ানক গোলমাল, দু চারজন ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল "আগুন লেগেছে, ভীষণ আগুন, গ্রাম পুড়ে যায়।" সবাই চেয়ে দেখে আকাশ লালে লাল, আগুন আর ধোঁয়া হু হু করে আকাশের দিকে উঠছে। সর্বনাশ! কোথায় রইল দাঙ্গা আর কোথায় রইল খাজনা, তারা উঠতে পড়তে—ছুটল যে যার ঘরের দিকে। এরি মধ্যে একদল ছেলে পুকুর থেকে কলসী ভরে জল এনে ঘরের চালে তুলে দিচ্ছে। চালের উপর দাঁড়িয়ে বিশুর মামু, কোমরে কাপড় জড়িয়ে কলসী কলসী জল ঢালছেই, ঢালছেই, দু চারজন সাহসী ছেলে ও তার সঙ্গে জুটেছে। হঠাৎ একটি মেয়ের চীৎকার শোনা গেল "মামু গো; আমার ছেলেকে বাঁচাও।" "কই, কোথায় সে?" "এই ঘরে, এই ঘরে।" জলন্ত ঘরের ভিতর থেকে আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। চালের খানিকটা প'ড়ে গিয়েছিল, সেই ফাঁক দিয়ে মামু লাফিয়ে পড়ল ভিতরে। একটু পরেই ঘরের দরজাটা সে ভেঙ্গে ফেলতে, ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল একজন স্ত্রীলোক, ছোট একটি ছেলে কোলে ক'রে। তার পিছনে এল মামু, কিন্তু দরজার চৌকাঠ পার হবার আগেই, বাকী চালটা হুড়-মুড় করে দরজা ঢেকে প'ড়ে গেল। লোকেরা 'হায় হায়' ক'রে দৌড়ে এসে যখন মামুকে টেনে বার করেছে, তখন তার পরচুলা কোথায় উড়ে গেছে, কালো মিশমিশে কোঁকড়া কোঁকড়া চুল কপালে ঝুলে পড়েছে, শরীর নিস্পন্দ স্থির। অবাক হয়ে সকলে দেখে—একি! এ যে তাদের জমিদার-বাড়ীর ছেলে মোহন বাবু। মোহনকে নিয়ে তারা যখন রাজবাড়ীতে পৌছাল, তখন অচেতন মোহনকে ঘিরে রাজার চোখের জলের সঙ্গে প্রজাদের চোখের জল মিশে গেল।

দীর্ঘ তিন মাসের পর মোহন যেদিন বিছানা ছেড়ে উঠে বসল, নারায়ণচন্দ্র তার প্রজাদের ডেকে বললেন—মোহনের কাছে তোমরা যেমন ওর ভাইএর মত, তেমনি আজ থেকে আমার কাছেও তোমরা মোহনেরই ভাই।"

নূতন সংজ্ঞা

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

বল দেখি আত্মীয় কাহারা?—
-তোষামোদ চায় কিংবা পদে পদে ত্রুটি ধরে যারা।
এ সমাজে বন্ধু কারে বলে?—
-বিপদে যে হয় খুশী, সম্পদে যে হিংসানলে জ্বলে।

বল দেখি কুটুম্ব কে তব?—
—দাবী করে যেই জন সামাজিক-কর নব নব।
বল তুমি মুরুব্বি কাহায়?—
—এক গুণ ইষ্ট ক'রি ন'গুণ যে প্রতিশোধ চায়
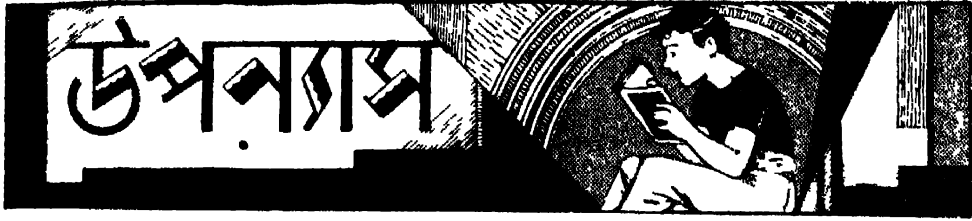
মানুষের পূর্বপুরুষ

শ্রীনিধিরাজ হালদার

আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে বিপদের সম্ভাবনা যে পদে পদে তা' আর বোধহয় নতুন ক'রে তোমাদের বলতে হবে না। গরিলা সর্দারকে সহায় ও সঙ্গী পেয়ে বেবি কোন দিনও মনে করতে পারেনি যে গাছের ডালে তার চড় বিশ্রাম স্থানটা সাপ, আর হিংস্র চিতাবাঘের দৌরাত্ম্যে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।

আগেই বলেছি যে গরিলা-সর্দার এক মুহূর্তও বেবিকে ছেড়ে থাকতে পারত না। আর এই গরিলা বন্ধুর সাহায্যে বেবি যে কতবার মৃত্যুর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে তার কিছু কিছু নমুনা তোমাদের দিয়েছি।

গরিলাদের বিকট রাক্ষসের মত আকৃতি দেখে মনে করতে পার যে তারা রক্ত মাংস খায়, তা' কিন্তু মোটেই নয়। ফল, মূল, কলা গাছ, দাম [illegible] এই সব হচ্ছে তাদের খাদ্য। আর বনে এ সব খাদ্যের অভাবও বিশেষ হয় না। মাংস না খেয়ে মানুষও যে গরিলাদের মত শক্তিশালী হতে পারে তা' ঐ গরিলাদের দেখে বোঝা যায়। খাওয়ার দিক দিয়ে প্রথমে বেবির নিজেরও খুব অসুবিধা হ'ত বটে, শেষে তার ঐ সবগুলি ভাল লাগত। এমন কি তার শরীরের উন্নতির পরিপোষক ব'লে বুঝতে পেরেছিল সে ওগুলোকে।

একদিন সকালবেলায় বেবি, আর সর্দার গরিলা খাবার খুঁজতে যখন বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল তখন বেবি হঠাৎ দেখলে দূরে একটা আখের বনে কতকগুলো কালো কালো মাথা উঁচু হয়ে উঠছে, আর নামছে। বনের মধ্যে নতুন জানোয়ারের সন্ধান পাওয়া গেছে ভেবে বেবি একটু যেই এগিয়েছে অমনি দেখতে পেলে ছোট, বড় একদল গরিলা মহা উৎসাহে আখ খাচ্ছে। আখের ক্ষেত দেখে তার খুব আনন্দ হ'ল এই ভেবে যে নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও মানুষের বাস আছে তা' হ'লে।

গরিলাদের সঙ্গে মিশে আখ খাবে, বেবির কাছে এটা খুবই একটা নতুন রকম আনন্দ, সে তাই এগিয়ে যাচ্ছিল সেইদিকে, কিন্তু মুহূর্তে একটা ভীষণ দৃশ্য দেখে বেবির

বনমানুষ দাঁড়িয়ে আছে

সর্বশরীর যেন আতঙ্কে কাঁপতে লাগল। আখ ক্ষেত্রের মাঝখানে একটা মেয়ে গরিলা তার বাচ্চাটাকে নীচে বসিয়ে দিয়ে আখ চিবোচ্ছিল, এমন সময় বাচ্চাটা ভীষণ

চীৎকার ক'রে উঠতেই বেবি দেখতে পেলে একটা ভয়ংকর অজগর বাচ্চাটাকে ল্যাজ দিয়ে জড়িয়ে ধরছে।

ভয়াবহ শত্রুর হাত থেকে বাচ্চাকে বাঁচাতে গরিলারা একসঙ্গে অজগরের দিকে তেড়ে যাবার আগেই বেবি তার কোমরবন্ধ থেকে লম্বা বাঁকা ছুরিখানা বা'র ক'রে একলাফে অজগরের ওপর পড়েই সজোরে সাপটার মাথায় সেই ছুরিখানা বসিয়ে দিলে! সঙ্গে সঙ্গে গরিলা-সর্দার তার ধারালো দাঁত দিয়ে মোটা সাপটার চকচকে ল্যাজটা ধরলে কামড়ে। অজগরও তার সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে গরিলাদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করতে লাগল।

বনমানুষের এক জাত—শিম্পাঞ্জি
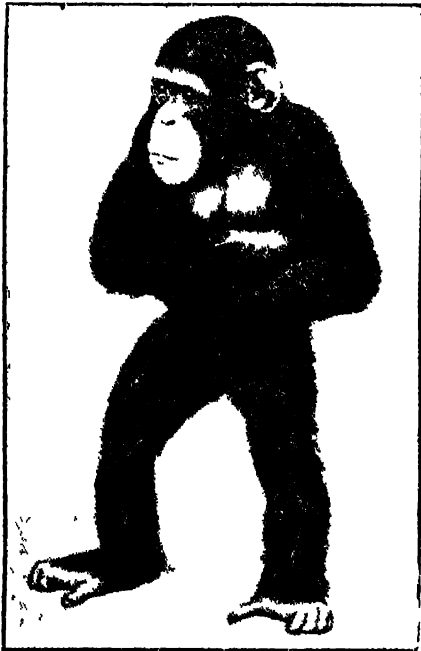
কিন্তু সভ্যতার শেষ নিদর্শন স্বরূপ বেবির ছুরির উপযুপরি আঘাতে শেষ পর্যন্ত সাপকে প্রাণ হারাতেই হ'ল। কিন্তু, একটা বড় আশ্চর্যের বিষয় বেবি লক্ষ্য করলে যে—বাচ্চা গরিলাটার বিপদে তার মা ছাড়া আর কোনও গরিলার মুখেই কোন রকম দুর্ভাবনার চিহ্ন দেখা গেল না।

যাই হোক, বেবির সাহায্যে গরিলা-সর্দার অজগরের ভবলীলা সাঙ্গ করবার পর আবার তারা মহা উল্লাসে আহার খাওয়া শুরু করলে। একটু আগেই, যে অতবড় একটা বিপদ দেখা দিয়েছিল তার তিলমাত্র চিহ্নও তাদের হাবভাবে বোঝবার উপায় ছিল না।

অকস্মাৎ আকাশে ঝড়ের অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে লাগল। বনের পশু পাখী, কীট পতঙ্গ আপন আশ্রয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। ঝিঁঝিঁর ডাক সারা বনটাকে তখন মাতিয়ে তুলেছিল। তার ওপর পশুরাজের ভীষণ গর্জন, চিতা হায়েনার দাপটে বিশাল বনটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল। যে যার আশ্রয়ের জন্য গরিলারাও ক্ষেত ছেড়ে চলে গেল। তারপর বেবি যখন একটা গাছের উচু ডালে শোবার জন্য নিজের বিছানা তৈরী করছিল সেই সময় গরিলা-সর্দার কি যেন মনে ক'রে আস্তে আস্তে গাছে উঠতে আরম্ভ ক'রে দিলে। তার দেহের ভারে ডালপালাগুলো মড় মড় শব্দ করতে লাগল, যেন ভেঙ্গে পড়ে আর কি। ক্রমে সে বেবির কাছে গিয়ে মুখটা তার কাছে রেখে দু'হাত দিয়ে বেবিকে জড়িয়ে ধরে' কচি ছেলেকে আদর করবার মত আদর করতে লাগল।

বেবি যে গরিলা-সর্দারকে খুব বিশ্বাস করত এ কথা তোমরা জান তাই চুপ করে গরিলা-সর্দারের বুকের মধ্যে বসে রইল সে। এইভাবে কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর গরিলা-সর্দার সেইখানেই রাতের মত আশ্রয় নিলে আর বেবি আরও একটু ওপরে উঠে শোবার ব্যবস্থা করে ফেললে।

ভীষণ অরণ্যের অন্ধকার রাত্রে ভূত প্রেতের মত গাছের ডালে রাত কাটানো যদিও বেবির গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল, তবু, সেদিনের অত্যন্ত গরমে বেবির আর কিছুতেই ঘুম হচ্ছিল না। হঠাৎ কিসের একটা শব্দে বেবির ঘুমাবার সাধ কোথায় যেন পালিয়ে গেল। সে দেখতে পেলে গরিলা-সর্দার গাছের ডালে দু'পায়ে ভর ক'রে দাঁড়িয়ে নীচের দিকে চেয়ে কি দেখছে, আর রাগে তার সমস্ত শরীরটা যেন ফুলে ফুলে উঠছে। নীচের দিকে তাকাতেই বেবি দেখতে পেলে আর একটা ভীষণ অজগর গাছে ওঠবার চেষ্টা করছে। বেবির তখন জানতে বাকি থাকল না যে এ অজগরটা আগের সাপটার জুড়িদার। সে তার সঙ্গীর হত্যাকারীদের ওপর প্রতিশোধ নিতে এসেছে। তোমরা হয়ত জান না সাপেরা কি রকম প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়। এ রকমও দেখা গেছে

যে জুড়িদারের মৃত্যুর শোধ নিতে সাপে পঞ্চাশ মাইল পথও অতিক্রম ক'রে এসে হত্যাকারীকে দংশন করেছে।

গরিলা-সর্দার জানোয়ার হ'লেও সে কথাটা নিশ্চয়ই জানত। তা' না হ'লে সে তার নিত্যকারের বিশ্রাম-স্থান গাছতলা ছেড়ে ভারী দেহটা নিয়ে কষ্ট ক'রে কেন গাছের ডালে আশ্রয় নিলে? গরিলা-সর্দার সাপটার উপস্থিতি সহ্য করতে পারলে না। একেবারে মরিয়া হ'য়ে সে লাফিয়ে পড়ল নীচে। আর দু' হাত দিয়ে অজগরটার মুণ্ডুটা চেপে ধরে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরলে।

বেরি প্রথমটা হতভম্ব হ'য়ে গিয়েছিল। পর মুহূর্ত্তেই গরিলা-সর্দারকে সাহায্য করা নিতান্ত প্রয়োজন ভেবে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এল। কিন্তু যখন সে নেমে এল তখন গরিলা-সর্দার নিজের বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বিরাট চীৎকার ক'রে উঠল। এ তার বেরির কাছে নিজের জয় ঘোষণা করা।

বেরির প্রাণ গরিলা-সর্দারের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভ'রে উঠল। সামান্য একটা মানুষের জন্য বনের একটা অসভ্য জানোয়ার কেমন ক'রে নিজের প্রাণকে বার বার বিপন্ন ক'রে নিশ্চিৎ মৃত্যুর হাত থেকে তাকে বাঁচাচ্ছে।

বেরি মনে মনে ঠিক করলে এর কিছু প্রতিদান দেওয়া চাই। তারপর একদিন সে সমস্ত বনটা ঘুরে ঘুরে অনেক ফল মূল যোগাড় ক'রে গরিলা-সর্দারকে সঙ্গে নিয়ে আশপাশের গরিলা ভাইদের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। মাঝে মাঝে গরিলা-সর্দার ও বেরি এমন চীৎকার করতে লাগল যে সে শব্দ গরিলাদের কানে যেতে না যেতেই সবাই বিশেষ ব্যস্ত হ'য়ে এক জায়গায় এসে জড় হ'তে লাগল। এক এক ক'রে প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জন কচি-বুড়ো গরিলা জড় হ'য়ে বনের অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গায় এক তুমুল হট্টগোল শুরু ক'রে দিলে।

এ বিরাট দৃশ্য উপভোগ করবার সৌভাগ্য বেরি ছাড়া আর কারও ভাগ্যে হয়েছে কিনা জানিনা। যাই হোক, বেরি তাদের প্রাণ ভ'রে ফল মূল খাওয়ালে, তারপর তাদের সঙ্গে খেলায় মেতে উঠল। ঐ দিন বেরির বন্য জীবনে সবচেয়ে আনন্দে কেটেছিল। তার পর থেকে সকল গরিলাই বেরির বন্ধু হ'য়ে উঠল। এখন আর তার কেউ শত্রু নেই।

তোমরা হয়ত সকলেই জান যে আমাদের দেশের চেয়ে আফ্রিকা আরও বেশী গরম দেশ। সুতরাং, বেলা বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গরমও বেড়ে চলতে লাগল। সূর্য্যদেব তখন প্রায় মাথার ওপর। শরীর যেন আগুনের ঝলকে পুড়ে যাবার উপক্রম হ'ল। গরিলারা একে একে তখন অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা আস্তানা খুঁজে নিতে চ'লে গেল। বেরিও তার বিশ্বস্ত অনুচর সর্দার গরিলাকে সঙ্গে নিয়ে প্রখর রৌদ্র-তাপ থেকে বাঁচবার জন্য জনহীন নির্জ্জন বনে খুঁজে পেতে এক ছায়া-শীতল আশ্রয়ের ব্যবস্থা ক'রে নিলে।　　[ক্রমশঃ

দিন ও রাত্রি

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

অস্তমান দিনদেবে নমস্কার করি'
　　　ভূতলে নামিল বিভাবরী।
রহিল সুস্নিগ্ধ কণ্ঠে ডাকি' সবাকারে—
"বিশ্রামের শয্যা তব পাতিয়াছি, হের চারিধারে,
　　　নরনারি।
যাহার যা-কিছু কর্ম্ম আসিয়াছ সারি',
　থামিয়াছে ক্লান্তি-কোলাহল,
　শান্তিমৌন হের ধরাতল।
ক্ষুব্ধ বাহিরের ডাকে ব্যস্ত ছিলে দিনে,
এবে অন্তরের মাঝে প্রীতিস্নিগ্ধ শান্তি লহ চিনে'।
—সে অন্তর, সে বাহির একই সূত্রে গাঁথা—
আলো-আঁধারের মতো—আঁখি সাথে যেন
　　　আঁখিপাতা

　　বিশ্বপাতা
সবিতা—সে পিতা তব, আমি তব মাতা!"

রসসিদ্ধ নাগার্জুনের কথা

অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী, এম-এ

কোশল নগরে বিজয়ব্রহ্ম নামে রাজা ছিলেন। সেখানে প্রফুল্ল নামে একজন অতিশয় ধনী শ্রেষ্ঠী অর্থাৎ বণিক বাস করিতেন। শ্রেষ্ঠী প্রফুল্লের স্ত্রীর নাম প্রতিমা। প্রতিমা ছিলেন প্রতিমার মতই সুন্দরী। দয়া দাক্ষিণ্য সচ্চরিত্রতা প্রভৃতি গুণে প্রফুল্ল ও প্রতিমার মত মানুষ বড় দেখা যায় না। কিন্তু তাঁহাদের পরম দুঃখ ছিল এই যে তাঁহাদের কোনো পুত্র জন্মে নাই। স্বামী স্ত্রীতে মিলিয়া কত যাগযজ্ঞ করিলেন কিন্তু কিছুতেই তাঁহারা পুত্রমুখ দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে কে একজন বলিলেন, "বৈরোটীতে পার্শ্বনাথ চৈত্যে দেবীর পূজা কর।" উভয়ে পরম ভক্তিভরে দেবীর পূজা করিলে দেবী প্রসন্ন হইয়া বর দিলেন, 'আচার্য নাগহস্তী পরম তপস্বী সিদ্ধপুরুষ, তাঁহার আশীর্বাদ লাভ করিলে তোমরা পুত্রমুখ দেখিতে পাইবে।" শ্রেষ্ঠী প্রফুল্ল ও তাঁহার পত্নী ভক্তি ও শ্রদ্ধার অর্চনা দ্বারা আচার্যপ্রবরকে সন্তুষ্ট করিলেন। আচার্য বর দিলেন, "কোনো চিন্তা নাই, পুত্ররত্ন তোমাদের ঘরে আসিতেছে।" প্রতিমা বলিলেন, "বাবা, পুত্র যদি হয় তবে প্রথম পুত্রটিকে আপনার চরণে সমর্পণ করিব।"

পুত্র হইল, পুত্রটি নানালক্ষণে সুলক্ষণ দেখা গেল। যেমন তাঁহার বুদ্ধি তেমনি তাঁহার রূপ। সকলে বলিলেন, "প্রতিমা, এমন পুত্র কোন্ প্রাণে তুমি সাধুর চরণে সমর্পণ করিবে?" প্রতিমা বলিলেন, "যখন কথা দিয়াছি, তখন তাহা নিশ্চয় পালন করিব।"

চারিদিকে কান্নার রোল উঠিল, তাহারই মধ্যে পিতা মাতা সাধুর চরণে আট বৎসরের পুত্রটি সমর্পণ করিলেন। মাতাপিতাকে ছাড়িয়া যাইতে পুত্রের অত্যন্ত কষ্ট হইল, কিন্তু সাধুর ভালবাসার গুণে কিছু দিনের মধ্যেই সে সব দুঃখ ভুলিয়া গেল। এই পুত্রই ভবিষ্যতে পাদলিপ্তাচার্য বলিয়া খ্যাত হইলেন। পাদলিপ্তাচার্য নাম তাঁহার কেন হইল সে কথা পরে বলা যাইবে।

বালকটিকে শিক্ষার জন্য আচার্য নাগহস্তী যোগ্য গুরু মণ্ডনের কাছে পাঠাইলেন। আশ্চর্য প্রতিভা গুণে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বালকটি নানা বিদ্যায় পারদর্শী হইলেন। সেই অল্প বয়সেই তাঁহার প্রতিভার অপূর্ব পরিচয় পাওয়া গেল। একবার পাটলীপুত্র নগর হইতে তিনি লাট প্রদেশে ওঁকার নগরে গিয়াছেন। বয়স অল্প, বালকদের সঙ্গে খেলাতেই মাতিয়া আছেন। এমন সময় কয়েকজন প্রতিবাদী তাঁহার সহিত তর্ক-যুদ্ধ করিতে আসিলেন। কোথাও কেহ নাই দেখিয়া তাঁহাদের মধ্যে একজন কি মনে করিয়া মুরগীর মত "কু-ক্কু-ড়ু-কু" করিয়া উঠিলেন, বালকও ঘরের মধ্য হইতে কুক্কুট-বিজয়ী বিড়ালের মত "ম্যাঁও-ও" করিয়া উত্তর দিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বীরা ইহাতে বড়ই লজ্জিত হইলেন। বুঝিলেন, উপহাসেও বালকটি তাঁহাদিগকে হারাইয়া দিল। তবু তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘরের ভিতরে কে?" বালক বলিলেন, "আমি", তাঁহারা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কে?" বালক উত্তর করিলেন, "কুকুর"। এই বালবুদ্ধির কাছে তাঁহারা পুনরায় হার মানিলেন।

বালকটি একবার তাঁহার গুরুর কাছে প্রার্থনা করিলেন, "প্রভু আপনি অশেষ বিদ্যার আকর, দ্রব্যগুণাদি কোনো শাস্ত্রই আপনার অবিদিত নাই। এমন কোনো বিদ্যা আমাকে কি দিতে পারেন যাহাতে আমি আকাশে উড়িতে পারি? ভূমিতে জলে নানাভাবে বিচরণ করিবার বিদ্যা জানি, কিন্তু আকাশ আমার মনকে ক্রমাগত টানিতেছে।" গুরু বলিলেন, "মেয়েরা যেমন পায়ে আলতা দেন তেমনি তুমি যদি এই ১০৮টি দ্রব্য যথাবিধি মিশাইয়া পায়ে লেপন করিতে পার তবে তাহার গুণে তুমি আকাশে উড়িতে পারিবে। অতিশ্রম সহকারে ১০৮টি দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া ও যথাবিধি মিলাইয়া বালকটি এই বিদ্যা আয়ত্ত করিলেন। পায়ে ঔষধি লেপন করিয়া তিনি আকাশ পথে যেখানে ইচ্ছা যাইতে লাগিলেন। সকালে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যের পর পাদলেপন করিয়া তিনি প্রথমেই গুজরাতে শত্রুঞ্জয়ের তীর্থে যান, তার পর যান দক্ষিণ দিকে মানখেটপুরে, তার পর আরও বহু তীর্থ ঘুরিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া আহারাদি করেন। পাদলিপ্ত করাতেই তাহার নাম হইল পাদলিপ্ত আচার্য।

একবার তিনি গোদাবরী নদী পার হইয়া রাজা সাতবাহনের নগরে উপস্থিত হইলেন। সাতবাহন রাজা যেমন বীর তেমনই বিদ্বান, দাতা ও নানাবিকর্মের রসিক। তাঁহার নগরটি নানাদেশদেশান্তরাগত পণ্ডিত ও কলা-কুশলীদের দ্বারা পরিপূর্ণ। নগরের পণ্ডিত ও গুণীরা যখন শুনিলেন পাদলিপ্তাচার্য তাহাদের নগরে উপস্থিত, তখন তাঁহারা একটি বাটী কানায় কানায় ঘৃতে পরিপূর্ণ করিয়া পাঠাইলেন, মুখে কিছুই বলিলেন না। ভাবটা এই, "এই নগরটি পণ্ডিতে ও গুণীতে এই ঘৃতের বাটীর মতই কানায় কানায় পরিপূর্ণ, তোমার আর স্থান হইবে কোথায়?" তখন পাদলিপ্ত তাহার মধ্যে একটি তীক্ষ্ণ সূচী রাখিয়া বাটীটি ফেরৎ পাঠাইলেন। অর্থাৎ "এই সূচীটির মতই তীক্ষ্ণ মেধা লইয়া ইহার মধ্যে আমি আমার প্রবেশ সম্পন্ন করিয়া লইব।" যাহাহউক, রাজা তাঁহাকে সমাদর করিয়া লইয়া আসিলেন। তিনিও সেখানকার গুণী ও পণ্ডিতগণসহ রাজাকে নানা বিদ্যায় ও জ্ঞানের আলাপ-আলোচনায় পরিতৃপ্ত করিয়া চলিয়া আসিলেন।

পাদলিপ্তের শিষ্যগণের মধ্যে নাগার্জুনের নাম জগদ্বিখ্যাত। ভারতীয় রসায়নশাস্ত্রের তিনি একজন মহাগুরু। জৈনগ্রন্থ মতে ইঁহার জীবনচরিত্র অতি অদ্ভুত। ঢংক পর্বতে রাজপুত্র রণসিংহের কন্যা ছিলেন অতি সুন্দরী। অপরূপ লাবণ্যবতী স্নেহময়ী সেই অভিজাত কন্যাকে দেখিয়া নাগরাজ বাসুকি মুগ্ধ হইলেন ও তাঁহাকে পত্নীরূপে পরিগ্রহ করিলেন। সেই কন্যার গর্ভে নাগরাজের যে পুত্র হইল তাহারই নাম হইল নাগার্জুন। নাগরাজ স্বয়ং আপন পুত্রকে শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নাগেরা পৃথিবীর পুত্র, পৃথিবীর সব পদার্থের গূঢ় তত্ত্ব তাহাদের জ্ঞাত। পুত্রস্নেহবশে নাগরাজ তাহা আপন পুত্রকে শিখাইতে লাগিলেন। নাগরাজ তাহাকে প্রত্যেকটি গাছ লতা পাতা, ফল মূল ধাতু প্রভৃতি চিনাইলেন ও প্রত্যেকের গুণাগুণ শিক্ষা দিলেন। পিতার প্রভাবে নাগার্জুন সব-সিদ্ধিলাভ করিয়া সিদ্ধপুরুষ হইলেন। প্রত্যেক বস্তুর রূপ-গুণ-স্বাদাদি বিষয়ে নাগার্জুন সুপটু হইয়া উঠিলেন।

যথাকালে নাগার্জুন জগদ্বিখ্যাত গুরু পাদলিপ্তের কাছে বিদ্যাশিক্ষার জন্য উপস্থিত হইলেন। গুরুও নাগার্জুনকে যোগ্য পাত্র দেখিয়া স্নেহভরে উত্তমরূপে সর্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ করিয়া তুলিলেন। পাদলিপ্তাচার্য পায়ে কি সব ঔষধ মাখিয়া আকাশ পথে উড়িয়া যান। নানা তীর্থে স্নান ও দেবদর্শন করিয়া আসিয়া শিষ্যদিগকে সর্বশাস্ত্রে উপদেশ দেন। শিষ্যদিগকে সকল শাস্ত্রই শিখান বটে কিন্তু আকাশে উড়িবার বিদ্যার তত্ত্ব তিনি কাহাকেও শিখান না। উড়িবার জন্য যে পাদলেপ অর্থাৎ পায়ে লেপন করিবার ঔষধ তাহার উপকরণগুলি নানা বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া তিনি নিজেই সংগ্রহ করেন, নিজেই তাহা ঘসেন, বাটেন, মেশান, কাহাকেও ডাকেন না বা সাহায্য চান না, তাই শিষ্যেরাও কেহ এই বিদ্যা তাহার কাছে প্রার্থনা করিতে সাহস পান নাই।

অন্যান্য শিষ্যদের কথা জানা নাই, কিন্তু নাগার্জুনের চিত্তটি ছিল সর্ববিধ কৌতূহল পরিপূর্ণ। তিনি প্রতি দিনই দেখেন গুরুর এই আকাশে উড়িবার কাণ্ড। বহু বৎসরের পুরাতন শিষ্যেরা কেহই গুরুকে কিছু জিজ্ঞাসা করেন না, গুরুও কাহাকেও কিছু বলেন না। নাগার্জুন ভাবিলেন—তিনি আর কয় দিনের শিষ্য? অথচ, মনে কৌতূহলের তাঁর অন্ত নাই। অবশ্য এটাও বুঝিতে

পাবেন যে গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়াও কোনো লাভ হইবে না। নাগার্জুন তখন গুরুর আকাশ পথে যাত্রা করিবার পূর্বে ও পরের সব কাণ্ডগুলি বিশেষ মনোযোগ সহ লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। গোপনে নানা ঔষধ সংগ্রহ করিয়া গুরু গোপনেই নানা প্রক্রিয়া করিয়া মেশান। সেই "সম্পন্ন" প্রলেপটি মেয়েদের আলতা পরিবার মত পায়ে মাখাইয়া গুরু আকাশপথে যাত্রা করেন। ফিরিয়া আসিলে শিষ্যদের কেহ না কেহ তাঁহার পা ধোয়াইয়া দেয়। তারপর ওঁর শিষ্যদের লইয়া লেখাপড়ার কাজে প্রবৃত্ত হ'ন।

কিছুদিন যায়। নাগার্জুন সবই নিঃশব্দে লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছেন। এক একদিন তিনি নিজেই গুরুর পা ধোয়াইবার কাজে আসিয়া উপস্থিত হন। একদিন তিনি এমন একটি স্থানে পা ধোয়াইলেন যে গুরুর পা ধোওয়া জলের কতকটা সেখানে বহিয়া গেল। গুরু চলিয়া গেলে তিনি সেই জল অতি সাবধানে চাখিয়া দেখিলেন। পিতার কৃপায় নাগার্জুনের সব ঔষধের স্বাদগ্রহ শক্তি হইয়াছিল। অর্থাৎ স্বাদের দ্বারাই তিনি ঔষধটি যে কি তাহা বলিয়া দিতে পারিতেন। গুরুর পাদোদক চাখিয়া তিনি অতি সাবধানে হিসাব করিয়া একশত সাতটি বস্তুর সন্ধান পাইলেন। বাকী একটি বস্তু কিছুতেই চিনিতে পারিলেন না।

যাহাহউক, ইহাতেও নাগার্জুন নিরাশ হইলেন না। তিনি ঐ ১০৭টি বস্তুকেই নানাভাবে মিলাইতে চেষ্টা করিয়া দেখিতে লাগিলেন কি করিলে সবগুলি ঠিকমত মিল খায়। তাঁহার চেষ্টা যখন সিদ্ধ হইল তখন নির্মিত ঔষধটি পায়ে লেপন করিতে দেখা গেল তিনিও বেশ খানিকটা উড়িতে পারেন। মুরগী যেমন মাটি হইতে কতকটা দূর পর্যন্ত উড়িয়া গিয়া আবার মাটিতে পড়িয়া যায়, তেমনি তিনিও বার বার কতকটা উঠেন ও পড়িয়া যান। এই উড়িবার প্রয়াসের ফলে পড়িয়া গিয়া তাঁহার সর্বাঙ্গে ভীষণ আঘাত লাগিল। গায়ের ব্যথায় নাগার্জুন শয্যাগত হইলেন।

নাগার্জুন পীড়িত এই কথা শুনিয়া গুরু তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া শুনিলেন যে নাগার্জুন কতক পরিমাণে উড়িতে পারিয়া পড়িয়া গিয়া এইরূপ ব্যথা পাইয়াছেন। গুরু ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বৎস নাগার্জুন, এই বিদ্যা তুমি কোথায় পাইলে?" নাগার্জুন বলিলেন, "প্রভো, আপনারই শ্রীচরণ প্রসাদে এই বিদ্যালাভ করিয়াছি।" গুরু বলিলেন, "কি বলিতেছ, আমি তো তোমাকে এই বিদ্যা কখনও শিখাই নাই।" তখন কেমন করিয়া গুরুর উপদেশ না লইয়াই এই বিদ্যা তিনি লাভ করিয়াছেন তাহা নাগার্জুন বর্ণনা করিলেন।

১০৮টি উপকরণের মধ্যে যে ১০৭টিকেই নাগার্জুন কেবলমাত্র স্বাদগ্রহশক্তি প্রভাবেই বুঝিতে পারিয়াছেন জানিয়া আচার্য বিস্মিত হইলেন, খুসীও হইলেন। তিনি বলিলেন, "গুরুর উপদেশ বিনাই এতটা যখন জানিয়া ফেলিয়াছ তবে আর বাকীটুকু তোমার কাছে গোপন রাখি কেন? ঐ ১০৭টি বস্তু অন্য জলে না মিশাইয়া "ষাটি" নামে পরিচিত আউস ধানের চাউলে প্রস্তুত "আরনালে' মিশাইতে হইবে।" চাউল সিদ্ধ করিয়া জলে ভিজাইয়া রাখিলে যে বাজি বা অম্ল (আমানি) হয় তাহারই নাম "আরনাল"। নাগার্জুন সব বস্তুর স্বাদ জানিতেন কিন্তু ধান-চাউল পচাইয়া যে আমানি হয় তাহার স্বাদ তাঁহার জানা ছিল না। নাগার্জুনও তখন পাদলেপবিদ্যা লাভ করিয়া সবত্র স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

নূতন বিদ্যালাভের আনন্দে নাগার্জুন নানা দেশ বিদেশে উড়িয়া বেড়াইতেছেন এমন সময়ে একদিন গুরু বলিলেন, "দেখ বৎস, অপার দ্রব্যগুণ শাস্ত্রের এখন তুমি অধীশ্বর। এই যে তোমার মহা অধিকার, ইহাকে কেবল নিজের খুসী, লাভ বা আরামের জন্য ব্যবহার করিও না। বিদ্যামাত্রই বিশ্বহিতের জন্য। ব্যক্তিগত লাভের বা স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিদ্যাকে ব্যবহার করিলে বিদ্যারই অবমাননা হয়, তাহাতে সকলেরই অকল্যাণ ঘটে। সর্বাপেক্ষা অকল্যাণ ঘটে তাঁহার, যিনি এত বড় সম্পদের অধিকারী হইয়াও তাহার অপ্রয়োগ করেন। আমি যে এতদিন তোমাদের পাদ-লেপবিদ্যা শিখাই নাই তাহা কেবল তোমাদের যথোপযুক্ত যোগ্যতা লাভের প্রতীক্ষায়। যোগ্যতা লাভ করিয়াছ দেখিলে আমি নিজেই এই বিদ্যা দিতাম। না চাহিলেও দিতাম। জগতে আধি ব্যাধির আর অন্ত নাই। দুঃখ দারিদ্র্য লাগিয়াই আছে। হে বৎস, রসসিদ্ধিশাস্ত্রে সিদ্ধ হইয়া

তুমি অনন্ত বিশ্বের হিতের জন্য তাহা সকলের কাছে স্থাপন কর।"

রসসিদ্ধি শাস্ত্রমতে এমন করিয়া রস বা পারদের সিদ্ধি করা যায় যে তাহাতে সর্ব রোগ দূর হইয়া মানুষ অমর হয়। তাহার স্পর্শ গুণে ধাতুমাত্রই স্বর্ণে পরিণত হয়। আচার্য পাদলিপ্ত বলিলেন, "এই শাস্ত্র না জানিলে জগতের উপকার করিবার যে ইচ্ছা তাহা ভাল করিয়া পূর্ণ হয় না। স্বার্থ ও লোভ জয় করিয়া রসসিদ্ধি লাভ কর এবং সেই সিদ্ধির দ্বারা জগতের কল্যাণ কর।"

গুরুর কথায় নাগার্জুন রস সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কত স্বেদন-মর্দন-জারণ-মারণ চলিল কিন্তু রস আর স্থির হয় না। তখন শুনিলেন পার্শ্বনাথের শ্রীমূর্তির কাছে বসিয়া ক্রিয়া করিলে সিদ্ধি হইবে। কিন্তু আসল শ্রীমূর্তি কোথায়? পূর্বকালে দ্বারবতী নগরে শ্রীসমুদ্রবিজয় সেই মূর্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। পরে দ্বারবতীনগরী আগুনে পুড়িয়া যায়। তাহার পর সমুদ্র প্লাবনে নগরী জলের নীচে চলিয়া যায়, মূর্তিও তলাইয়া যায়। বহুকাল পরে কান্তিপুরবাসী ধনপতি নামে এক বিদেশযাত্রীর জাহাজ ঐ শ্রীমূর্তির কাছে আসিয়া আটকাইয়া গেল। কে বলিল, এখানে জৈনপ্রতিমা আছে তাই জাহাজ ঠেকিয়াছে। তখন নাবিকেরা ডুব দিয়া সমুদ্রের তল হইতে সাতটি সূতার মোটা দড়া দিয়া প্রতিমাটি তুলিল এবং ধনপতি নিজ দেশে লইয়া গিয়া সেই সমুদ্রোত্থিত প্রতিমাটি প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

এখন নাগার্জুন ভাবিতে লাগিলেন, সেই প্রতিমা কি উপায়ে পাওয়া যায়? জ্ঞানী বৃদ্ধেরা বলিলেন, "যদি কোন মতে তাহা উৎপাটিত করিয়া আকাশ পথে লইয়া আসিতে পার তবেই হয়।" এই কথা শুনিয়া নাগার্জুন কান্তীপুরে গেলেন। গিয়া দেখেন মন্দির রক্ষা কাজে ধনপতির ব্যবস্থা খুব পাকা। তার উপরে দৈবজ্ঞেরা আসিয়া ধনপতিকে খবর দিলেন, "তোমরা এই প্রতিমা সাবধানে রক্ষা কর। এক মহাধূর্ত প্রতিমা হরণের চেষ্টায় চারিদিকে ঘুরিতেছে।" মন্দির রক্ষকেরা সকলে আরও সাবধান হইয়া দিবারাত্রি অতন্দ্রভাবে মূর্তি রক্ষা করিতে লাগিল।

দেবদর্শন করিবার ছলে নাগার্জুন গিয়া দেখেন চারি পুত্র ও বহু রক্ষকসহ অতি সাবধানে ধনপতি স্বয়ং মন্দির রক্ষা করিতেছেন। সকলে এমন সতর্ক যে শ্রীমূর্তি হরণ করা অসম্ভব। উপায় না দেখিয়া নাগার্জুন সেখানে যাতায়াত আরম্ভ করিলেন এবং পরিচয় ও প্রীতির আদান-প্রদান আরম্ভ করিলেন। ইহাতে সকলের বিশ্বাস উৎপন্ন হইতে লাগিল। দেখিলেন শ্রীমূর্তির মঙ্গল আরতির সময়ে সকলে এক কালেই মাটিতে মাথা নত করিয়া দেবতাকে প্রণাম করেন। সেই অবসরে প্রথমে বেদীর উপর হইতে ক্রমে ক্রমে প্রতিমাটির গাঁথুনী-আলগা করিয়া রাখা হইল। পরে একদিন আকাশ পথে প্রতিমা লইয়া নাগার্জুন অন্তর্হিত হইলেন।

নাগার্জুন এই প্রতিমা লইয়া সেডী নদীর তীরে স্থাপন করিলেন। জ্ঞানী বৃদ্ধেরা বলিলেন, "এই রস প্রতিমার সম্মুখে সর্বলক্ষণ সম্পন্না মহাসতী নারীর দ্বারা মর্দন করাইতে হইবে।" এমন নারী পাওয়া যায় কোথায়? সকলেই বলিলেন, রাজা সাতবাহনের পত্নী নাগার্জুনের ভগ্নী চন্দ্রলেখা এইরূপ সুলক্ষণা নারী। তখন নাগার্জুন বিশ্বহিতের জন্য তাঁহাকে এই রস সিদ্ধির কাজে যোগ দিতে অনুরোধ করিলেন। প্রতিদিন তাঁহাকে উপদেবতার সাহায্যে সেডী নদীতীরে আনাইয়া প্রতিমার কাছে রস মর্দন করান ও প্রতি রাত্রে তিনি বাসান্তে ফিরিয়া যান। ক্রমে নাগার্জুন তাঁহাকে রসসিদ্ধির সব গূঢ় কথা জানাইলেন।

কথাটা খুব গোপন রাখা উচিত ছিল, কিন্তু রাণী চন্দ্রলেখা একদিন কথায় কথায় আপন দুই পুত্রকে এই রহস্যটা বলিয়া ফেলিলেন। রস সিদ্ধি হইলে যে মানবের সকল দুঃখ দুর্গতি দূর হয় তাহা রাজপুত্রদের জানা ছিল অথচ তাহা পাইবার মত চরিত্রসিদ্ধি তাঁহাদের হয় নাই। রাজপুত্রেরা নাগার্জুনের চারিদিকে গোপনে ঘুরিয়া সন্ধান লইতে লাগিলেন কবে রস সিদ্ধি সম্পূর্ণ হয়। একদিন খবর পাওয়া গেল যে রসসিদ্ধি হইয়াছে। তাঁহারা তখন নাগার্জুনকে মারিয়া সিদ্ধরস হরণ করিবার উদ্যোগ করিলেন। তাহারা শুনিয়াছিলেন দর্ভাঙ্কুরের দ্বারা আহত হইলে নাগার্জুনের মৃত্যু ঘটিবে। তাই তাহারা অর্থবলে লোক নিযুক্ত করিলেন এবং নাগার্জুনকে হত্যা করাইলেন। অথচ সেই সিদ্ধরস নাগার্জুনের মৃত্যুর পর তাঁহারা লাভ করিতে পারিলেন না। তখন হতাশ হইয়া রাজপুত্রেরা ভাবিতে লাগিলেন, "হায়, কি অন্যায় কর্ম করিলাম। এহেন গুণী ধর্মাত্মা মাতুল নাগার্জুনের প্রাণ গেল, আমাদেরও কিছুই লাভ হইল না, অথচ বিশ্বজগতের যে উপকার হইত তাহাও সমূলে নষ্ট হইল।

নাগার্জুনের আরব্ধ কাজ সম্পন্ন হইয়াও মানবের কোনো প্রয়োজনে লাগিল না। কি প্রণালীতে তিনি কাজ করিতেছিলেন তাহাও বলিয়া যাইতে পারিলেন না। মানব সংসার একটি মহা সাধনা হইতে বঞ্চিত হইল। যেখানে লোভ ও স্বার্থ বিদ্যমান সেখানে জ্ঞান ধ্যান বা সাধনা কিছুতেই কোনো কল্যাণ নাই।

রঘু সর্দার

শ্রীযুক্তা শৈলবালা ঘোষজায়া

(সত্য ঘটনা)

সূর্য ডুব—ডুবু প্রায়।

নিরতিশয় উত্তেজিত মস্তিষ্কে রঘু সর্দার গঙ্গার পাড়ের উপরকার সঙ্কীর্ণ-মেঠো পথ ধরিয়া, দ্রুত বেগে হাঁটিয়া চলিয়াছিল। বাঁ কাঁধে টাকার থলি এবং ডান হাতে তাহার প্রাণ ও মান রক্ষক পাকা বাঁশের মজবুত লাঠি। সঙ্গে আর কেহ নাই।

শ্যামপুকুরের জমিদার বাবুদের সে প্রধান নগদী বা পাইক। গঙ্গার ওপারে প্রধান জমিদারীতে বাবুরা বাস করেন। গঙ্গার এধারে বিভিন্ন মৌজায় বিভিন্ন গমস্তা ও নগদীরা আদায় তহশীল করে। প্রত্যেক মহালের গমস্তা বৎসরান্তের আদায়ী টাকা হিসাব সহ শ্রাবণ ভাদ্র মাসে সদরে গিয়া বাবুদের দরবারে দাখিল করে। তালপুর মৌজার গমস্তা বিশ্বনাথ চাটুয্যে এবার তাহা করে নাই। টাকা গুলি সে আত্মসাৎ করিয়াছিল। বিস্তর তলব তাগাদার পর শেষে সদর হইতে বাবুরা রঘু সর্দারকে টাকা আদায় করিতে গমস্তার নিকটে পাঠান। গমস্তা দুই দিন ধরিয়া গা ঢাকা দিয়া লুকাইয়া বেড়ায়। শেষে রঘুর হাতে ধরা পড়ে। কাল হইতে বহু প্রকার ধমক ধামক শাসন বসন করিয়া, অনেক কষ্টে নগদ আট শো টাকা আদায় করিয়া রঘু সর্দার শ্যামপুরে ফিরিয়া চলিয়াছে। গঙ্গা পার হইবার জন্য নৌকা ধরিবার উদ্দেশ্যে মেঠো পথ ধরিয়া পার ঘাটার দিকে চলিয়াছিল।

সবই নগদ টাকা। ওজনে দশ সের ভারি, কিন্তু রঘু সর্দারের পক্ষে সে ভার নিতান্ত তুচ্ছ। যেন একটা অতি হাল্কা তুলার বালিশ লইয়া সে অবলীলা ক্রমে চলিয়াছে।

গমস্তার বিশ্বাসঘাতকতায় সে রাগে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিয়াছিল। সমাজের বর্ণশ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণ, বলিয়া বাবুরা বড় সম্মান ও বিশ্বাস করিয়া তাহাকে বিনা জামিনে তহশীলদারের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বিশ্বাসের মর্য্যাদা সে রাখিয়াছে ভাল! লোকটা কি দারুণ নীচাশয়! কয়দিন ধরিয়া রঘুকে কত রকমে প্রতারিত করিয়াছে, টাল বাহানা করিয়া, মিথ্যা কথায় তাহাকে নাস্তানাবুদ করিয়াছে, সব কথা রঘুর মনে পড়িতেছিল। রঘু রাগে ফুলিতেছিল। যাঁহাদের অন্ন খাইয়া গমস্তার বিপুল ভুঁড়িটির এতখানি শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, কিনা তাঁর টাকা চুরি করিয়া তাঁহাদেরই সম্পত্তি নীলামে চড়াইবার মতলব। এ ব্যক্তি যদি ব্রাহ্মণ, তবে চণ্ডাল কে?

রাগের মাথায় কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া রঘু দ্রুত হাঁটিতেছিল। ডান পাশে বালুকার অনতিপ্রশস্ত গঙ্গা। জলের মাঝে মাঝে চড়া পড়িয়া রহিয়াছে। সমুদ্র দূরে, তাই এখানে গঙ্গায় জোয়ার ভাটার আবেগ উচ্ছ্বাস নাই। স্রোত মৃদু। এমন কি বদ্ধ জলাশয়ের মত স্থানে স্থানে কিনারায় শ্যাওলা জমিয়াছে।

পথের বাঁ দিকে আউশ ধানের ক্ষেত। মধ্যে মধ্যে পাট ক্ষেত। নিকটে কোথাও লোকালয় নাই। চারিদিক নিস্তব্ধ নির্জন।

পার ঘাটা এখনও আধ মাইল দূরে।

দ্রুত হাঁটিতে হাঁটিতে রঘু হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল। দেখিল বাঁ পাশের ক্ষেতের পাটগুলা ঘন ঘন দুলিতেছে,

বর্শা উচাইয়া, ষণ্ডামার্ক চেহারার তিন জন লোক চট্‌পট্‌ বাহির হইয়া সামনের পথ আগলাইয়া দাঁড়াইয়াছে।

তাহাদের মাথায় পাগড়ী, চিবুক ঢাকিয়া গালপাট্টা বাঁধা। শুধু চোখগুলি দেখা যাইতেছে। তাহারা পরিচিত ব্যক্তি কি না বুঝা গেল না। কিন্তু অভিসন্ধি তাহাদের ভাল নয়, সেটা নিঃসন্দেহে বুঝা গেল।

রঘুর কাঁধে বহু কষ্টে সংগৃহীত—প্রভুর টাকা। এ টাকা ত খোয়াইলে চলিবে না।

রঘু চকিতে পিছন দিকে চাহিল। সেখানেও ধান-ক্ষেতের আড়াল হইতে ঠিক তেমনি গালপাট্টা বাঁধা, পাগড়ী আবৃত তিনটা মাথার সারি রঘুর বাঁ পাশ ও পিছন দিক আগলাইয়াছে, দেখা গেল। তাহাদের প্রত্যেকের হাতে লাঠি।

অর্থাৎ সামনে, পিছনে ও বাঁ পাশে, শত্রুর দল তিনদিক হইতে আগলাইয়াছে। খোলা আছে শুধু ডান দিক। সে দিকে মা গঙ্গা।

মুহূর্ত্ত মাত্র দ্বিধা না করিয়া রঘু টাকার থলি ও লাঠি, গামছা দিয়া পিঠে বাঁধিল। তারপর এক লাফে উঁচু পাড়ের উপর হইতে গঙ্গায় ঝাঁপাইয়া পড়িল। তীর বেগে ডুব সাঁতার কাটিয়া খানিক দূরে গিয়া মাথা তুলিল। পিছন দিকে চাহিয়া দেখিল আক্রমণকারীরা তাহাকে ধরিবার জন্য গঙ্গায় ঝাঁপ দেয় নাই। তাহারা সারি সারি লাঠি হাতে, গঙ্গার পাড়ের উপর হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া আছে।

স্পষ্ট বোঝা গেল, তাহারা এতটা ভাবে নাই। ভাবিলে হয়ত গঙ্গার জলে নামিয়া দু চার জন সে দিক আগলাইবার চেষ্টা করিত

রঘু সাঁতার কাটিতে কাটিতে ঘাড় ফিরাইয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া গণিতে লাগিল—"এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়—!"

অর্থাৎ আততায়ীরা, ছয় জন মাত্র।

সামনে দেখা গেল একটা চড়া। সন্ সন্ বেগে সাঁতার কাটিয়া গিয়া রঘু তাহার উপর উঠিয়া দাঁড়াইল। হাঁপ ছাড়িয়া, লাঠি ও টাকার থলি পিঠ হইতে নামাইল। লোকগুলার দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহারা তখনও নিশ্চেষ্ট হইয়া হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া আছে।

কূট বুদ্ধি গমস্তার বুদ্ধি কৌশলের নিকট পরাস্ত হইয়া চেঁচামেচি রাগারাগি করিয়া রঘু সর্দারের মাথা গরম হইয়াছিল। এবার অন্য বিপদের ধাক্কা খাইয়া সহসা তাহা আশ্চর্য রকমে ঠাণ্ডা হইয়া গেল। বিশ্বাসের সুযোগ লইয়া যাহারা বিশ্বাসঘাতকতা করে, রঘু তাহাদের আন্তরিক ঘৃণা করে। কিন্তু, লাঠি হাতে, গায়ের জোরে যাহারা সামনাসামনি আক্রমণ করে, তাহারা অপেক্ষাকৃত সম্মানের পাত্র। যদিও লোভ তাহাদের অবৈধ এবং তাহারাও ঘৃণার্হ সন্দেহ নাই, তবু, মানিতে হইবে যে, তাহারা হাত পা খেলাইয়া খাটিতে প্রস্তুত—এবং শক্তি ও সাহসের চর্চায়ও তাহারা অক্ষম নয়,—যদিও এটা উপার্জনের অন্যায় পন্থা।

রঘুর মনে হইল, তব ইহারা বিশু চাটুজ্যের চেয়ে ভাল। বিশুর মত ইহারা মনিবকে ঠকাইয়া খায় না।

হঠাৎ তাহার মনে হইল, সে তো এই আক্রমণোদ্যত শত্রুদের হাত ফস্কাইয়া তাহাদের ফাঁকি দিয়া পলাইয়া আসিয়াছে। যদিও, লড়িবার ভয়ে নয়, মরিবার ভয়ে নয়—শুধু প্রভুর টাকা বাঁচাইবার জন্য।... তবু এটা পলায়ন ত?

বীরের আত্ম-সম্মানে আঘাত লাগিল। জমীদার রাজা বাবুরা যেখানে বিদ্রোহী প্রজা ও প্রবঞ্চক গমস্তাগুলাকে শাসন করিতে পারেন না, সেখানে রঘু সর্দারের লাঠি তাহাদের সিধা করে, জমিদারির দখল নিয়ে দাঙ্গায় প্রতিপক্ষের লেঠেল মণ্ডলীকে সিধা করে এই রঘু। সে-হেন প্রতাপশালী রঘুর হাতের লাঠি আজ এই ছয়টা দস্যুর দুর্বুদ্ধি না সংশোধন করিয়া যদি ফেরে ত, লাঠির মর্যাদা থাকে কই?

রঘু চাহিয়া দেখিল, গঙ্গার পাড়ে সেই দস্যু ছয়জন পাথরে খোদা মূর্ত্তির মত নিস্পন্দ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। বোধ হয় সাঁতরাইয়া চড়ার দিকে যাইবে কি না, তাহাই ভাবিতেছে।

রঘু কৌতুকস্মিত মুখে, টাকার থলিটা ডান হাতে উঁচু করিয়া তুলিয়া তাহাদের দেখাইয়া সজোরে ঝাঁকানি দিল। ভিতরে নগদ আটশো টাকা ঝম্ ঝম্ শব্দে বাজিয়া উঠিল।

থলিটা চড়ার মাঝখানে নামাইয়া, রঘু উচ্চ কণ্ঠে হাঁকিয়া বলিল "দেখেছিস? এই রাখলুম টাকার থলি হেথা।

দাঁড়িয়ে থাক তোরা, আমি গিয়ে লড়ছি তোদের সঙ্গে। যদি হারি, এই টাকা রইল তোদের বখশিস্‌। নইলে ।"

লাঠি পিঠে বাঁধিয়া, ভিজা কাপড়খানা বেশ জুৎবরাৎ করিয়া আঁটিয়া সাঁটিয়া পরিয়া রঘু জলে ঝাঁপ দিল। তীর বেগে সাঁতার কাটিয়া তাহাদের দিকে চলিল।

লোকগুলা তাহার দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। এমন অসম সাহসে নিমন্ত্রণ করিয়া টাকার থলি বাজি রাখিয়া কেহ কস্মিন্‌কালে তাহাদের সঙ্গে লড়ে নাই। একা মানুষটা তাহাদের ছয় জনার সঙ্গে লড়িবে বলিতেছে—। রঘুর স্পর্ধা দেখিয়া তাহারা বিস্মিত হইয়া গেল।

রঘু কিন্তু তাহার বলিষ্ঠ বাহুর ক্ষিপ্র সঞ্চালনে সাঁতার কাটিয়া মুহূর্ত্তে তীরে উঠিল। লাঠি তুলিয়া পল্লীর ভ্রাতা সম্বোধনে তাহাদের আত্মরক্ষা ও আক্রমণের ভঙ্গীতে আপ্যায়িত করিয়া বলিল "চ'লে আয়—এইবার।"

চড়ায় অরক্ষিত টাকার থলি। লুব্ধ দৃষ্টিতে সে দিকে বারকতক চাহিয়া, ছয়জন দস্যুই একসঙ্গে লাঠি উঁচাইয়া টাকার রক্ষককে ধ্বংস করিবার জন্য ভীম বিক্রমে রঘুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল!

বোঁ বোঁ শব্দে রঘুর লাঠি ঘুরিতে লাগিল। লাঠি আর দেখা গেল না। মনে হইল, যেন একটা সুদীর্ঘ শাদা সুতা চক্রাকারে তাহার চতুর্দ্দিকে অবিরাম প্রচণ্ডবেগে ঘুরিতেছে, আর তার মাঝখানে রঘুর হাল্কা দেহখানি বিদ্যুতের মত আঁকিয়া বাঁকিয়া নানা কৌশলে খেলিতেছে।

সন্ধ্যার আঁধারে, নির্জ্জন গঙ্গাতীর, ঠকাঠক ঠকাঠক্‌ লাঠির শব্দে, ফটাফট্‌ বাঁশ ফাটার তীক্ষ্ণ ধ্বনিতে ভরিয়া উঠিল।

চক্ষের পলকে রঘুর লাঠির ঘায়ে দুই জনের বর্শা ভোঁতা হইয়া গুঁড়াইয়া গেল। তাহারা তখন ইট, পাথর কুড়াইয়া ছুঁড়িতে লাগিল, কিন্তু রঘুর দ্রুত ঘূর্ণায়মান লাঠিতে আহত হইয়া সেগুলা বিপরীত দিকে ছিট্‌কাইয়া আসিয়া একজনের চোখে এবং একজনের পায়ে বাজিল। তাহারা অকর্ম্মণ্য হইয়া বসিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে আর একজনের মাথা ফাটিল, অন্যজনের হাঁটুর হাড় ভাঙিল, এবং পঞ্চম ব্যক্তির ডান হাতের কব্জি গুঁড়াইয়া গেল।

ষষ্ঠ ব্যক্তি ব্যাপার দেখিয়া প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

প্রচণ্ড দমকে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া, রঘু সর্দার পুনশ্চ পিঠে লাঠি বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল "নাঃ, দেরি ক'রে দিলি তোরা। পার-ঘাটায় যাবার সময়ত আর নেই। গাং সাঁৎরে-ই চললুম শ্যামপুর। পহর খানেক রাতের মধ্যেই সদর কাছারীতে পৌছুতে পারবো।—"

"জয়মা গঙ্গা।" বলিয়া সে আবার ভাগীরথী তরঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং সাঁতার কাটিয়া চড়ায় উঠিল। টাকার থলি ও লাঠি পুনরায় পিঠে বাঁধিয়া মাঝ গঙ্গা পার হইয়া রঘু সটান ওপারে গিয়া উঠিল।

রাত্রি এক প্রহরের পূর্ব্বেই শ্যামপুরে পৌছিয়া সে টাকার থলি মনিবের পায়ের কাছে নামাইয়া দিয়া হর্ষোৎফুল্ল মুখে প্রভুদের অভিবাদন করিল। মনিব তাহার মুখে সমস্ত বিবরণ শুনিয়া আনন্দে তাঁহার পিঠ চাপড়াইয়া সগর্ব্বে বলিয়া উঠিলেন—"সাবাস্‌ রঘু।"

পাশাপাশি

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

অভিমান না থাকিলে, স্নেহের গরব
রহিত কোথায়?
হাসিতে কে হোতো খুসী, রোদন সৃজন
না হ'লে ধরায়?
মরুভূমি না রহিলে, সলিলের কভু
হোতো কি আদর?
শীত যদি না থাকিত, কোথা বসন্তের
হইত কদর?

বৃথা কিছু এ জগতে হয়নি রচিত
সকলি সার্থক,
থাকে হেথা পাশাপাশি মুকুতা, সিকতা
কুসুম, কণ্টক।
সকলেরি দাম আছে, যেওনা ভুলিয়া
কেহ নহে হেয়,
সবারে সোনার চোখে দেখিতে শিখিও
লাভ হবে শ্রেয়।

স্পীড

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন কর এম-এ

(দৃশ্য—পুলিশকোর্ট ; স্থান—প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত
মামলা—ক্রাউন্ ভার্স্যস্—তড়িৎসেন।)

[কাঠগড়ায় আসামী তড়িৎসেন হাতকড়ি বাঁধা অবস্থায় দণ্ডায়মান। তবু দুই হাতে ধরিয়া আছে সে প্রকাণ্ড একটি ঘণ্টা ও মেগাফোন। পরিধানে মালকোঁচামারা ধুতি ও শার্ট, কিন্তু কোমরে বেল্ট্ বাঁধা। কোমরে সেই চামড়ার বেল্টের সঙ্গে একটি মোটর-হর্ন্ বাঁধা। দুই পায়ে বুট জুতোর তলায় চাকাওয়ালা স্কেটিং স্লিপার আঁটা। ডান কান ও বা কানের দুইপাশে ঝুলিতেছে দুইখানি কার্ড্ সুতা দিয়া বাধা। উহাতে বড় বড় হরফে লাল কালিতে লেখা—Left, Right। সরকার পক্ষের উকীল কচুরায় হাকিমের কাছে মামলা দায়ের করিতেছেন।]

কচুরায়। ইয়োর অনার, পুলিশের মতে আসামীর গুরুতর শাস্তি পাওয়া উচিত, যদিও আইনের কোন্ ধারামতে তাহা ঠিক নির্দেশ করিতে পারিতেছি না। কিন্তু আসামী যে অপরাধী তাহাতে কোনও ভুল নাই। আসামী তড়িৎসেনের ইহাই প্রথম অপরাধ নহে। পূর্বেও বহুবার নানাবিধ অবাঞ্ছনীয় কার্য দ্বারা পুলিশের কর্তব্য পথে এই ব্যক্তি বাধাদান করিয়াছে। কিন্তু অপরাধ কোন্ শ্রেণীর, তাহা নির্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন। সেপ্টেম্বর মাসের ৪ঠা তারিখে বড়বাজার ও ষ্ট্র্যাণ্ডরোডের মোড়ে বেলা দশটার সময় উক্ত আসামী পুলিশ কনস্টেবল জালিন্দর সিং কর্তৃক ধৃত হয়। তাহাকে নিম্নলিখিত আট দফা অপরাধগুলির যে কোন একটি অথবা একাধিকের জন্য অভিযুক্ত করা যাইতে পারে :—

১। মারপিট।

২। শান্তি ভঙ্গ।

৩। কর্তব্যকার্যে বাধাদান।

৪। শারীরিক আঘাত দিবার চেষ্টা।

৫। অপমানসূচক এবং অসম্মানজনক ব্যবহার।

৬। ভীতি উৎপাদক শব্দ ও অঙ্গভঙ্গি করা।

৭। জনসাধারণের অহিত সাধনে লিপ্ত থাকা অথবা থাকার প্রয়াস।

৮। রাজপথে বে-আইনী জনতা সৃষ্টি করা।

উপরোক্ত আটটি ধারার একটিতেও অভিযুক্ত করা যদি সম্ভবপর না হয়, তবে মস্তিষ্ক বিকৃতির জন্য তাহাকে "ল্যিউনাসি অ্যাক্টে" ফেলা হউক। রাজপথ দিয়া আসামী তড়িৎসেন অত্যন্ত বেগে চলিতে পারে। সেপ্টেম্বর মাসের ৪ঠা তারিখে বেলা দশটার সময় যখন রাস্তা এবং ফুটপাথে অফিস আদালতগামী লোকজনের অত্যন্ত ভিড় ছিল—আসামীকে সেই সময় ফুটপাথের উপর দিয়া অতি বেগে ধাবমান অবস্থায় দেখা যায়।

ম্যাজিষ্ট্রেট। কাহারও সহিত ধাক্কা লাগিয়াছিল কি ?

কচুরায়। নো ইয়োর অনার, ঠিক ধাক্কা লাগে নাই তবে—

ম্যাজিষ্ট্রেট। কেহ আঘাত পাইয়াছে বা আহত হইয়াছে কি ?

কচুরায়। নো ইয়োর অনার, তবে উভয় প্রকার বিপদ ঘটিবারই সম্ভাবনা ছিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট। প্রোসীড্।

কচুরায়। ইয়োর অনার। আসামী—হাঁটুর উপর

কাপড় তুলিয়া মালকোঁচা বাঁধিয়া পথ দিয়া ছুটিবার সময় মেগাফোনের সাহায্যে বিকট চিৎকার করিতেছিল—

আসছি তেড়ে, যাওরে সরে,
পড়লে ঘাড়ে, লাগতে পারে,
কাঁদবি 'মাগো', জল্‌দি—ভাগো।—

এই বলিয়া ঐ মেগাফোনের সাহায্যে বিকট চীৎকার করিতে করিতে আসামী দৌড়াইতেছিল। ঘন ঘন ঐ ঘণ্টা বাজিতেছিল, কটিদেশে বাঁধা ঐ মোটরের হর্ণের কর্ণপ্রদাহকারী এবং প্রাণ চমকিতকারী বিকট শব্দে পথ ঘাট মুখরিত করিতেছিল। হর্ণ এবং ঘণ্টা ও কণ্ঠের ধ্বনিতে নিকটেই কোথাও আগুন লাগিয়াছে মনে করিয়া ভীত, চমকিত পথিকগণ লম্ফ ঝম্ফ প্রদানপূর্বক পথ ছাড়িয়া হুড়াহুড়ি করিয়া ছুটিতেছিল। কেহ বাড়ীর রকে, কেহ গাছে, কেহ ল্যাম্পপোষ্টে উঠিয়া স্ব স্ব জীবন রক্ষার চেষ্টা করিতেছিল। কেহ কেহ প্রাণভয়ে পাহারাওয়ালার কাঁধের উপরও উঠিয়া পড়িয়াছিল। নিকটেই অগ্নিকাণ্ডের ভয় ছাড়া অনেকের ধারণা হইল বুঝি বা পিছন হইতে কোনও মোটর গাড়ী বা 'দমকল'—হঠাৎ ফুটপাথে চড়িয়া তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। অনেকে মনে করিল—

ম্যাজিষ্ট্রেট। কে কি মনে করিল অথবা না করিল তাহার উপর কেস্ চলিতে পারে না। ঘটনা কি হইয়াছিল বলুন—

কচুরায়। বাট্ ইয়োর অনার, কাহারও কাহারও এই আকস্মিক চীৎকারে এর বিশ্রী শব্দে প্যালপিটেশন, ব্লড প্রেসার, সেরিব্রো কমপ্লিকেশন, হিষ্টিরিয়া, মৃগী এমন কি পতন ও মূর্চ্ছা ইত্যাদিও হইয়া পড়িল। জনসাধারণের স্বাস্থ্য এবং শান্তিভঙ্গের জন্য আমি অপরাধীকে দণ্ডিত করা হউক এই প্রার্থনা করিতেছি।

ম্যাজিষ্ট্রেট। সরকার পক্ষে কোনো সাক্ষী আছে?

কচুরায়। ইয়েস্, ইয়োর অনার, কনস্টেবল জালিন্দর সিংকে এখুনি হাজির করিতেছি।

পেয়াদা। (উচ্চৈস্বরে) কনস্টেবল জালিন্দর সিং হাজির?—

[কনস্টেবল্ জালিন্দর সিং সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠিয়া আদালতের হলপ্ ইত্যাদি যথারীতি আনুসঙ্গিক শেষ করিল]

কচুরায়। ইয়ে আসামীকে তোম্ পছান্‌তা হায়?—

জালিন্দর। (সরকারী উকিলকে)। হাঁ হুজুর। উয়োত একদম্ বদ্‌মাস্ বাউরা হায়—

ম্যাজিষ্ট্রেট। অনর্থক গৌরচন্দ্রিকা না করিয়া কি হইয়াছিল সাক্ষীকে বলিতে বলুন।

জালিন্দর। (সেলাম করিয়া) বহুৎ আচ্ছা সরকার। (থামিয়া) হুজুর, কহনেত ম্যয়, মগর, লেকেন—বহুৎ শরম লগতা হায়।

ম্যাজিষ্ট্রেট। কোর্ট শরম করিবার স্থান নহে। স্পষ্ট ভাষায় কি ঘটিয়াছিল কোর্টকে জানাও।

জালিন্দর। সরকার। হাম আসামীনে ঠাহ্‌রনে বোলা—উয়ো ঠাহ্‌রা নেই, মগর্ হম্‌কো হুজুর উও "ধুর শালা" বোলা। পর ম্যায়নে কুছ নহী কহা। শ্রেফ বোলা—"গালী মৎ দেও।" উও কহ্‌নে লগা—"হামি রাস্তামে জো লোক হাঁটতা, উস্‌কো হঠনে শিক্ষা দেতা।" ইতনে মে রস্তেপর বহুৎ ভিড জমা হোনে লগা, অওর উনকো মিজাজভী বহুৎ গরম মালুম হুয়া। আসামীকে ভলাইকে লিয়ে তব হম্ উস্‌কো পকড়কে থানামে হাজির কিয়া।

ম্যাজিষ্ট্রেট। "আসামীকে ভলাইকে লিয়ে" কাহে বোলা সমঝায় দেও—

জালিন্দর। সরকার হামনে সাচ্ বোলা—উসকে জান্ কি খ্যায়রিয়তকে লিয়ে।

ম্যাজিষ্ট্রেট। (সরকারী উকিলকে)—কাহার জান্ বিপদে পড়িয়াছিল? আসামীর জন্য জনসাধারণের প্রাণ লইয়া টানাটানি হইয়াছিল কি?

জালিন্দর। নহী হুজুর। আসামী তো সাপকে মাফিক ইধর উধরসে নিকল জা রহা থা। পর উস্কো পাকড লেনে পর পাবলিক্ বহুৎ গরম হোকে উস্‌কে চারো তরফ ভীড করনে লগা। মালুম হোতা থা কি মৌকা মিল্‌নে পর উসপর্ হমলা করেগা। উস্‌কো মার ডালেগা ইস্ লিয়ে উস্‌কে জান্ কি খ্যায়রিয়তকে লিয়ে উন্‌হে জল্‌দীসে পকড়কে থানেমে লে গয়া।

ম্যাজিষ্ট্রেট। (আসামীকে) এ ব্যাপারে তোমার কিছু বলিবার আছে? আসামী পক্ষের উকীল ওল পাল উঠিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটকে অভিবাদন জানাইয়া বলিল—ইয়োর

অনার, আসামী পক্ষে যা বলিবার তা আমি নিবেদন করিতেছি—ইয়োর অনার, 'গতিই' আজকালকার প্রাণ। জগতে সবই হুহু করিয়া চলিয়াছে। পথে পায়ে হাঁটিবার আর উপায় নাই। গরুর গাড়ী উঠিয়া গিয়াছে, এক্কাও ঘোড়ার গাড়ীর অবস্থাও তদ্রূপ। এখন ট্রাম, বাস, মোটর, রেল, জাহাজ, এরোপ্লেন ইত্যাদির দ্বারা জীবনের পারিপার্শিক মাপা হয়। 'স্পীডই' বর্তমানে মানুষের শ্রেষ্ঠ কাম্য।

আসামী। Exactly so, ইয়োর অনার—"স্পীডম্ স্বর্গ, স্পীডম্ ধর্ম, স্পীডহি পরমং তপঃ, স্পীডেরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্বদেবতা।"

ম্যাজিষ্ট্রেট। (আসামীর উকিলকে) আসামী কি বলিতেছে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

ওলপাল। আমি বুঝাইয়া বলিতেছি ইয়োর অনার। আসামী বলিতেছে—বর্তমানে একমাত্র স্পীডই উন্নতির সোপান। আমাদের শিক্ষা সংস্কৃতি ও সভ্যতা উপস্থিত স্পীড্ দিয়াই মাপা হয়। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষ অপেক্ষা বহুগুণে সভ্য, কারণ, তাহারা ঘণ্টায় মাত্র দুই মাইল যাইতেন। আর আমরা ঘণ্টায় দু'শো মাইল যাই। পদব্রজে গমনাগমন এখন অসভ্যতা। একেবারেই ইতরজনোচিত কাজ। মোটর এযুগে একমাত্র আভিজাত্যের পরিচায়ক। যত বেগে ইচ্ছা চালান, পথিকদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলুন, তাহাদের দেহে কদম ছিটাইয়া দিন, পথ হইতে সরিতে বিলম্ব হইলে মিষ্টি সম্ভাষণ ও মধুর ভাষা প্রয়োগ করুন, কাহারও কিছু বলিবার নাই, যতক্ষণ না চাপা দিতেছেন। চাপা দিবার পরও পলায়নের কত সুবিধা আছে আর একান্ত ধরা পড়িলে দু'দশ টাকা জরিমানা মাত্র। কারণ যে চাপা দেয় এবং যে চাপা পড়ে এই দুই শ্রেণীর মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। একজনের জীবন অমূল্য আর একজনের জীবনের দাম দু'দশ টাকা মাত্র।

আসামী। ইয়োর অনার। আমি তাই গরীব পথিকদের,—যাহারা মোটরে চড়িবার সৌভাগ্য হয়ত জীবনে পাইবে না, অথচ তাহাদের চলার গতিবেগ যাহাতে মোটরের সমকক্ষ হইতে পারে, সেই উপায় শিক্ষা দিতেছিলাম।

ম্যাজিষ্ট্রেট। একজন ডাক্তার ডাকার প্রয়োজন।

আসামী তড়িৎ সেন। (সে কথায় কান না দিয়া) 'কার' ওয়ালারা আজ 'বে-কার'দের প্রাণ অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। পথে বাহির হইয়া 'কার'রা আশা করে যে বালক, বৃদ্ধ, মহিলা, শিশু, মাড়োয়ারী ও ষাঁড়, গরু, বেড়াল, মুর্গী ইত্যাদিরা হর্ণের আওয়াজ পাইবামাত্র ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া যে যেদিকে পারিবে সরিয়া পড়িবে। হইতেছেও তাই। 'কার'দের অত্যাচারে 'বেকার'রা আজ পথে পথে উৎপীড়িত।

ম্যাজিষ্ট্রেট। চুপ্। অত কথা বলিও না। 'কার' এবং 'বে-কার' বলিয়া কাহাদের বুঝাইতে চাহিতেছ?

তড়িৎ। ইয়োর অনার। যাহারা মোটরকারে চড়ে, তাহারাই 'কার' আর যাহাদের মোটরকার নাই এবং চড়িতে পায় না তাহারাই 'বে-কার'। এখন হুজুর আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে পৃথিবীর স্পীড দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে, কারণ স্পীড বৃদ্ধিই সভ্যতা, কৃষ্টি এবং উন্নতির মাপকাঠি। স্পীড কমাইয়া দিলে সভ্যতার মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে। সুতরাং সে চেষ্টা না করিয়া 'বে-কার' পথিক এবং প্রাণ বাঁচাইবার জন্য পলায়নপর জীবজন্তুদের এখন স্পীড বাড়ানো সম্বন্ধে—শিক্ষা দেওয়া অবশ্য প্রয়োজন হইয়াছে। আমার মনে হয় অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা দ্বারা ইহাদের কুক্কুটের মত ত্বরিত সঞ্চারণ, সতর্কতা এবং দ্রুত পলায়নের তৎপরতা লাভ করাইতে হইবে। কুক্কুট, ইয়োর অনার, ভগবানের এক অপূর্ব সৃষ্টি। গতিশীলতা এবং উপস্থিত বুদ্ধির জন্য ইহাদের সমকক্ষ আর কেহ নাই। বিপদের এবং প্রয়োজনের সময় মুহূর্ত মধ্যে একমাত্র কুক্কুটই অসাধারণ বেগবৃদ্ধি করিতে পারে। নমনীয় গ্রীবার দুই ধারে দুই চক্ষু স্থাপিত থাকায় এবং ক্রমাগত শির সঞ্চালনের দরুণ যে-কোনো দিক হইতে নিঃশব্দে মোটর সমাগম হইলেও সে ঠিক টের পাইয়া যায় এবং উপস্থিত বুদ্ধিবলে তৎক্ষণাৎ অতি ক্ষিপ্রতা এবং তৎপরতার সহিত লাফাইয়া, ঝাঁপাইয়া এবং উড়িয়া মোটর আসিয়া চাপা দিবার পূর্বেই নিরাপদ স্থানে পলাইয়া জীবন রক্ষা করিতে পারে। মোটরের গতি অপ্রতিহত থাকে বলিয়া আমাদের উন্নতিও বাধা পায় না। এক কথায় কুক্কুটই যে-কোনো রাজধানীর রাজপথে পথিক শ্রেষ্ঠ।

কচুরায়। এ' সব অবান্তর কথা।

ম্যাজিষ্ট্রেট। সাইলেন্স প্লীজ। প্রোসীড জেন্টেলম্যান।

তড়িত। ইয়োর অনার। আজকাল লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবেন যে 'ফুটপাথ'. 'রাস্তার' সঙ্গে গতি-প্রতিযোগিতায় ক্রমেই পিছাইয়া পড়িতেছে। যে অনুপাতে পথগামী যানবাহনের গতিশীলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে, সে অনুপাতে ফুটপাথগামী জীবদের গতি তো বৃদ্ধি পায়ই নাই বরং অতিপরিশ্রম ও অনাহারে হ্রাসই হইতেছে। সেইজন্য যদিও বা কেউ দৌড়াইতে অথবা দ্রুত হাটিতে পারে তাহাকে, সম্মুখের ধীর পদবিক্ষেপে গজেন্দ্রগামী পথিকদিগের জন্য অযথা অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। সুতরাং শক্তি এবং সময়ের অপব্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে জাতিরও অবনতি ঘটিতেছে। কারণ গতিই উন্নতি। রাস্তা হইতে মোটরকার মোটরবাইক ও অন্যান্য চক্রযান কর্তৃক বিতাড়িত ফুটপাথে আশ্রয় লাভকারী বে-কার পদাতিকেরা নিশ্চল চিত্তে নিজ ইচ্ছা মত ঘুমাইতে ঘুমাইতে হাঁটিয়া থাকে। কারণ তাহারা উত্তমরূপেই জানে যে,আর চাপা পড়িবার ভয় নাই। ইহাতে আমার মত ব্যস্ত এবং কর্মঠ ব্যক্তিকে, যাহার অনেক কাজ আছে এবং স্পীডও আছে, অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। তাই ইহাদের সজাগ করিবার জন্য আমি হর্ণধ্বনি করিয়া দৌড়াইয়া যাইতেছিলাম। আমার মোটরগাড়ী নাই, তাই স্পীড্ বাড়াইবার জন্য চরণ জুড়িতে চক্রপাদুকা সংযুক্ত করিয়াছি। স্পীড্ বাড়াইবার প্রথমযুগে আমি যখন নিঃশব্দে দৌড়াইয়া, লাফাইয়া, ঝাঁপাইয়া চলিতাম, তখন কোনো কোনো পথচারী ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া গিয়া জামা কাপড় ছিঁড়িয়া কাদা মাখিয়া আমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এমন কি কেহ আমাকে ভায়লেন্ট এ্যারেস্ট্ও করিয়াছিলেন। তাই বাধ্য হইয়া সতর্কতামূলক ঘণ্টার ও হর্ণধ্বনির ব্যবস্থা করিবার পর হইতে দেখিতেছি যে দুর্ঘটনার আশংকা ক্রমেই দুরীভূত হইতেছে। পথিকেরা সরিয়া যাইবার শিক্ষা কেবলমাত্র রাস্তায় নামিলেই পাইত, সুতরাং ফুটপাথে চলাকালীন সম্পূর্ণ অন্ধভাবে চলিবার চেষ্টা করিত, এখন ফুটপাথ ও রাস্তা উভয় স্থানেই সমভাবে তাহারা সতর্কতা অবলম্বনে শিক্ষা পাইতেছে। এতদ্দিনে তাহারা গতির সম্মান দিতে শিখিতেছে। অতএব মানবসভ্যতার উন্নতিকে প্রতিদিন পথে ঘাটে সাহায্য করিতেছে।

কচুরায়। ইয়োর অনার। আসামী শিক্ষাদাতার ভাণ করিয়া হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠান করিতে উদ্যত হইয়াছে ॥

ওলপাল। ইয়োর অনার। আমার মক্কেল মারপিট করে নাই। যদি হর্ণধ্বনি অ্যারেস্ট্ বা অপরাধ হয় তবে প্রত্যেক মোটর চালক তাহা করিতেছে। আমার মক্কেল কাহাকেও শারীরিক আঘাত দেয় নাই বরং বাঁচাইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে। রাস্তায় ভিড় করিবার অপরাধে তাহাকে অভিযুক্ত করা যায় না, কারণ সেজন্য দায়ী পুলিশ কনেষ্টবল। যেহেতু আমার মক্কেল বরাবর জনতা দূর করিবারই প্রচেষ্টা করিয়াছে। দ্রুতগামী মোটর যেমন অপেক্ষাকৃত ধীরগামী গাড়ীকে হর্ণ দিয়া সরিয়া যাইতে বলিলে কোনও অপরাধ হয় না, তেমনই এইব্যক্তির হর্ণধ্বনি করাতে কোনরূপ দোষ হইতে পারে না। আমার মক্কেল মন্থরগামী পথিকদের পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইতে ইঙ্গিত করিয়াছে। বরং লোককে সাবধান না করিয়া আচমকা ঘাড়ে পড়িলেই দোষ হইত। তাহা ছাড়া লক্ষ লক্ষ হর্ণ-ধ্বনিতে যদি জনসাধারণের শান্তিভঙ্গ না হইয়া থাকে, তবে আর একটীর বৃদ্ধিতেও হয় নাই ধরা যাইতে পারে। অবশ্য আমার মক্কেলের ব্যবহারে নূতনত্ব আছে। কিন্তু বৈচিত্র্য তো অপরাধ নয় হুজুর। আমার 'লার্ণেড্ ফ্রেণ্ড' আমার মক্কেলের মস্তিষ্ক সম্বন্ধে আদালতকে সন্দেহ জানাইয়াছেন। মস্তিষ্ক সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ থাকিলেও আচরণে সন্দেহের কোনও অবকাশ নাই। যখন প্রথম মোটরগাড়ী, রেল ইত্যাদি আবিষ্কৃত হইয়াছিল তখন আবিষ্কর্তাকে সকলেই উন্মাদ আখ্যা দিয়াছিল। অনেককে মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করিতে হইয়াছিল। আজ আমরা তাহাদের জয় গান করি। অতএব আমার মক্কেলের আচরণকে নিন্দনীয় অথবা ভীতি উৎপাদক বলা চলিতে পারে। সত্যই পদাতিকদের গতিবৃদ্ধির প্রয়োজন হইয়াছে। আমার মতে শীঘ্রই প্রত্যেক পায়ে হাঁটা পথিকদের একটি করিয়া হর্ণ এবং হেড ও টেল্ লাইট ব্যবহার করিতে বাধ্য করা উচিত। এবং একটা মিনিমাম স্পীড্ লিমিট্ ধার্য করিয়া দেওয়া আবশ্যক। তাহাতে জাতির ধী, শ্রী, শক্তি এবং চরিত্র উন্নতি লাভ করিবে। উপরন্তু অপরাধের

সংখ্যাও ক্রমেই হ্রাস পাইবে। কারণ ধীরে ধীরে হাঁটা হইতেই টো টো করিবার অভ্যাস, এবং টো-টো হইতে অলসতা পরে অকর্মণ্যতা এবং পরিশেষে গুরুতর অপ-রাধের সম্ভাবনা।

আমার লার্নেড্ ফ্রেণ্ড্ এখনও এতদূর আধুনিক হইতে পারেন নাই যে আমার মক্কেলের বুদ্ধিমত্তার যথাযথ মূল্য দিতে পারেন। ব্যাপারটা তিনি দৃষ্টির অভাবে বুঝিতে পারিতেছেন না এবং ভবিষ্যৎ 'স্পীড্' জগৎ সম্বন্ধে তাঁহার কোনো ধারণা হইতেছে না। তাঁহার কাছে ব্যাপার যতই দুর্বোধ্য, ঘোরালো এবং ঝাপসা হউক না—মাননীয় বিচারক মহাশয়ের চক্ষে নিশ্চয়ই আমার মক্কেল একজন নবীন আবিষ্কারক ও ভাবষ্যৎ পথিক-গণের বন্ধু বলিয়া গণ্য হইবে। বুঝিতে না পারার জন্য দায়ী আবিষ্কারক নয়, দোষ অনভিজ্ঞের।

অতএব উহাকে শাস্তি না দিয়া, যাহারা উহার সৎ ও মহৎ উদ্দেশ্য বুঝেন নাই তাহাদিগকেই দেওয়া উচিত।

ম্যাজিস্ট্রেট। আসমী বেকসুর খালাস।—কিন্তু, এই মহাপুরুষের কিছুদিন বাঁচিয়া যাওয়া আবশ্যক মনে করি।

(যবনিকা)

আমার খুকি হারিয়ে গেছে

বন্দে আলি মিয়া

আমার খুকী পালিয়ে গেছে—পালিয়ে গেছে নীল আকাশে,
জোৎস্না হয়ে চাঁদের মাঝে লুকিয়ে আছে হয় তো বা সে।
নিশীথ রাতে তারার মালা হয় তো খুকি গলায় পরি'
মেঘে মেঘে বেড়ায় নেচে—ঘুঙুর বাজায় বাতাস-পরী।
হয় তো খুকী আলোর সাথে আসে আমার বাতায়নে,
ফুলের ঠোঁটে দেয় সে চুমু ঘুমের মাঝে দুই নয়নে।
চোখের জলের সাথে যেন বক্ষে আসে বারম্বারই
আমার খুকি পালিয়ে গেছে তবু দেখা পাই গো তারই।
বাতাস হয়ে সকল দেহে বুলায় পরশ আদুল হাতে,
স্বপন হয়ে আমার কাছে আসে খুকী নিশীথ রাতে,
পাখীর মধু কণ্ঠে যেন খুকুর ভাষা শুনতে গো পাই
ভোরের বেলা গান গাহিয়ে ঘুম সে আমার ভাঙায় যে তাই,
খুকু আমার লুকিয়ে আছে হয় তো ফুলের কুঁড়ির মাঝে,
বায়ুর সাথে খেলে সে আজ দুলে দুলে সকাল সাঁঝে।
বৃষ্টি ধারার কল্লোলেতে খুকী আমার নেচে বেড়ায়,
রক্ত রাঙা বসন পরে সন্ধ্যাকাশে গোধূলিছায়।
খুকু যে আর রূপ ধরে গো আস্‌বে নাকো আমার পাশে,
আঁধারে আর আলোয় মিলে খেল্‌ছে খেলা ফুল-সুবাসে।
পালিয়ে গেছে কোন্ বা দেশে—কোন্ বা দ্বীপে—সাগর কোনে।
মোদের কথা সেথা কি আর তাহার কভু পড়্‌ছে মনে॥

অরুণ-রঞ্জনী *—তেতালা

কথা ও সুর—**কাজী নজরুল ইস্‌লাম** স্বরলিপি—**জগৎ ঘটক**

হাসে আকাশে শুকতাবা হাসে।
অরুণ-বঞ্জনী উষাব পাশে ॥
ও কি উষসীব সাথী
বাসব ঘবে জাগে বাতি,
ওকি, সখীব মনেব কথা জানে আভাসে

হাসির ছটায ওব আখি কেন নাচে,
ববিব বথেব ধ্বনি ওকি শুনিযাছে?
ও কেন দিবা আসিবাব আগে
শ্রান্ত বধূব ঘুম ভাঙ্গে,
ওকি, ধরাব সূর্যমুখী ফুটেছে নভে,—
প্রিযতমে প্রথম দেখাব আশে ॥

০				১				+				৩			
‖ সা	-জ্ঞা	পা	-া	সা	জ্ঞা	পা	-া	জ্ঞা	দা	পা	জ্ঞা	ঋা	-ণ্‌া	সা	-া ‖
‖ হা	০	সে	০	আ	কা	শে	০	শু	ক্	তা	রা	হা	০	সে	০ ‖

* এই বাগ কবি কাজী নজরুল ইস্‌লাম রচিত। ইহার বাদী=পঞ্চম ও সম্বাদী=খরজ্। মধ্যম বর্জিত। আবোহী ও অবরোহী দেওয়া হইল।

আরোহী— সা জ্ঞা পা জ্ঞা পা দা সা।
অবরোহী— র্সা ণা দা পা জ্ঞা ঋা সা॥

—স্বরলিপিকার

| সা জ্ঞা -পা দা | দর্সা -া র্সা র্ঋা | দণা দা ণা দা | ণা া ণদা ণপা ||
| অ রু ০ ণ | র ন্ জ নী | উ০ ষা ০ র্ | পা ০ শে ০ ||

|| পা -া পজ্ঞা -া | দা পা পর্সা ণা | ঋর্া র্সা -া -ঋর্া | ণঋর্া -র্সণা -দা -পা |
|| ও ০ কি ০ | উ ষ সী ব্ | সা থী ০ ০ | ০ ০ ০০ ০ ০ |

| দা দর্সা র্সা দা | দর্সা -া দা দজ্ঞর্া | জ্ঞঋর্া -া জ্ঞঋর্া -জ্ঞঋা | র্সা -া ণা ণা |
| বা স ব ঘ | রে ০ জা গে০ | রা ০ ০ ০ | তি ০ ও কি |

| দা দণা -া দা | দণা -া দা পা | জ্ঞা জ্ঞদা পা পজ্ঞা | জ্ঞঋা -া -জ্ঞঋা -সা ||
| স খী ব্ ম | নে ব্ ক থা | জা নে০ আ ভা | সে ০ ০ ০ ||

|| দ্া দসা -া দ্া | দসা -া সা -া | সা জ্ঞা পা পা | সা -জ্ঞা পা -া |
|| হা সি ব্ ছ | টা য্ ও ব্ | আঁ খি কে ন | না ০ চে ০ |

| ঋা পজ্ঞা -া ঋা | ঋা জ্ঞা ঋা সা | ঋা ণ্া সা দ্া | দজ্ঞা -ঋজ্ঞঋা সা -া |
| র বি ব্ র | থে ব্ ধ্ব নি | ও কি শু নি | যা ০ ০ ছে০ |

| জ্ঞা জ্ঞদা পা জ্ঞা | জ্ঞা -া দা পা | পর্সা -া ণা ঋর্া | র্সা ঋর্া জ্ঞর্া সা |
| ও কে নঁ দি | বা ০ আ সি | বা ০ ব আ | গে ০ ০ ০ |

| দা জ্ঞর্া জ্ঞর্া জ্ঞর্া | জ্ঞর্া ঋর্া ঋর্া -া | ঋর্া ণা র্সা দা | দর্সা -া দা দা |
| শ্রা ন্ ত ব | ধূ ব্ ঘু ম্ | ভা ০ ০ ০ | ঙ্গে০ ০ ও কি |

| ণা ণদা -া দা | জ্ঞা জ্ঞা ঋা সা | ঋা সণা দ্া ণ্া | ণজ্ঞা -া -া -া |
| ধ রা ব্ সু | ব্ য মু খী | ফু টে ছে ন | ভে০ ০ ০ ০ |

| দা পা জ্ঞা জ্ঞদা | পা পজ্ঞা জ্ঞা জ্ঞর্সা | র্সণা -সণা দা পা | পজ্ঞা -া -া -া ||
| প্রি য় ত মে | প্র থ ম দে | খা ০ র আ | শে০ ০ ০ ০ ||

সাম্যবাদ

শ্রীআশালতা সিংহ

(১)

মাধুরীর পিসতুত বোন এনারা ক'লকাতায় থাকে। এনার বাবা ক'লকাতা হাইকোর্টের একজন মস্ত বড় ব্যারিষ্টার। সেই অনুপাতে আছে প্রকাণ্ড বাড়ী, খান তিনেক মটর, রেডিও, টেলিফোন, ঝি, চাকর, দারোয়ান, চাপরাশি, বয়, বেয়ারা, বাবুর্চি ইত্যাদি ইত্যাদি ··।

মাধুরীর বাবা সম্প্রতি তাঁর পাশের জমিদারিটা কিনচেন। দলিল রেজেষ্ট্রি হবার আগে যদি কোন আইনের পরামর্শ প্রয়োজন হয় এই ভেবে কাল একবার কলকাতার কোন বড় ব্যারিষ্টারের কাছে পরামর্শ নিতে যেতে চান। সাবধান হওয়াই ভালো, হয়তো কিনে নেবার পরেও আবিষ্কার হতে পারে যে, সম্পত্তিটা আগে থেকেই আর কারো কাছে বাঁধা দেওয়া আছে বা ঐ ধরণের কোন গোলযোগ আছে। মাধুরীর মা বল্লেন, তা অন্য ব্যারিষ্টারের কাছে কেন যাবে, আজকাল ঠাকুরজামাইয়ের এত নাম এত প্রতিপত্তি, তার কাছেই যাওনা কেন?

মাধুরীর বাবা সহজেই রাজী হ'লেন। মাধুরীর মা বাবাও বড়লোক, কিন্তু তাঁরা সেকালের বনিয়াদি ঘরের বড়লোক। চাল চলন সাবেককালের। মাধুরীর ভাই বোন আর নেই, মা বাবা আর নিজে, নিজেদের সংসার বলতে এইটুকু মাত্র। কিন্তু তাদের সংসারে কত যে আশ্রিত ও আশ্রিতা এবং কত যে আত্মীয় স্বজন আছে তার ইয়ত্তা নেই। সমস্ত বাড়ী লোকজনে গম্‌গম্‌ করচে। তাঁদের সকলের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করতে, তাঁদের ঝগড়া দ্বন্দ্ব মেটাতে এবং তাঁদের খাওয়াদাওয়ার তদ্বির করতে মাধুরীর মাকে কত যে খাটতে হয় তারও শেষ নেই। তবু এক দিনের জন্যেও তাঁর বিরক্তি নেই। সকলের খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে বেলা একটা দেড়টার সময় তিনি স্নান করে আহ্নিক করতে বসেন। কলকাতা যাওয়ার কথা নিয়ে যখন মা এবং বাবার মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল তখন মাধুরী কাছেই বসে তাদের গৃহদেবতার জন্য নিত্য-পূজার মালা গাঁথছিল। তাদের বাড়ীতে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহমূর্তি আছে। সন্ধ্যায় আরতির সময় মাধুরীর হাতের সযত্নরচিত ফুলের মালা পরিয়ে দিলে তাঁকে বড় সুন্দর লাগে। মাধুরী মালা গাঁথতে গাঁথতে বললে, মা, আমিও বাবার সঙ্গে ক'লকাতা যাব। পিসীমাদের অনেক দিন দেখিনি। এনা আমাকে চিঠির সঙ্গে তার নিজের ফটো পাঠিয়ে ছিল সেদিন। কী চমৎকার ফটো উঠেচে। এনা বড় হয়ে নিশ্চয় আরও সুন্দর হয়েচে, আমার ভারি দেখতে ইচ্ছা করে তাকে, তার সঙ্গে অনেক কথা আছে। তুমিও চলোনা মা আমাদের সঙ্গে।

কিন্তু এত বড় সংসারের দায়িত্ব ও ঠাকুর মন্দিরের সমস্ত কাজ ফেলে মাধুরীর মায়ের কোথাও চট্‌ করে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই তিনি নিজে না যেতে পারলেও মাধুরীর যাওয়ায় কোন আপত্তি করলেন না। বললেন, বেশ তো, তুমিও যাবে। এখন যাওদিকি মা তোমার বামুন পিসীকে বলোগে তোমার বাবার খাবার আনবে। অনেক বেলা হয়ে গেছে।

বামুন পিসী এ বাড়ীর রাঁধুনী। মাধুরীর দিদিমার আমল থেকে এ বাড়ীতে আছে। বাড়ীর পরিজনদের মধ্যেই একজন হয়ে গেছে। সে যে মাইনে করা লোক তা কারো মনেই পড়ে না। মায়ের অমত না হওয়ায় মাধুরীর কলকাতা যাওয়া স্থির হয়ে গেল।

(২)

হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ী থেকে নেমে মাধুরী অবাক হয়ে চারিদিকে চাইতে লাগলো। অনেক দিন সে ক'লকাতা আসে নি, প্রায় ভুলেই গেছিল। একী বিরাট ব্যাপার। যে দিকে চায় চোখ আর ফেরে না। এর চেয়েও অবাক লাগলো যখন তাদের ট্যাক্সি এসে তার পিসেমশায়দের চারতলা বাড়ীর সামনে দাঁড়ালো। গেটের কাছে মক্কেলদের পাঁচ ছখানা মোটর দাঁড়িয়ে আছে। সামনের থামওয়ালা বড় বারান্দাটা লোকে ভর্তি। দোতলার কোন একটা ঘর থেকে রেডিওর সকাল বেলাকার প্রোগ্রামে একটা রবীন্দ্র সঙ্গীত ভেসে আসছে। বাগানে মালীরা ঘাস ছাঁটচে, কেউ গাছে জল দিচ্ছে। মস্ত বড় কমপাউণ্ড, ফুলে ফুলে ভর্তি বাগান। তার মাঝে মাঝে বসবার জন্যে সবুজ বেঞ্চি পাতা। কোথাও কৃত্রিম ফোয়ারা দিয়ে মৃদু মৃদু জল উৎসারিত হচ্চে। এক পাশে টেনিস খেলার লন। এনাদের বাড়ীতে একবার মাধুরী এসেছিল, তখন তার বয়স কম। পাঁচ ছ' বছর আগে। সে অনেক দিনের কথা। তবে চিঠিতে সে এনার সঙ্গে ভাব রেখেছিল। দু'জনে দু'জনকে চিঠি লিখতো। দুজনেই প্রায় সমবয়সী, তাই চিঠির ভিতর দিয়েও তাদের একটি সখিত্ববন্ধন গড়ে উঠেছিলো। কিন্তু, গেটের কাছে হাঁটুর উপর পর্যন্ত স্কার্ট পরা, বব্ করে চুল ছাঁটা যে মেয়েটি তাকে অভ্যর্থনা করে নামিয়ে নিতে এলো তার সঙ্গে নিজের কল্পনার সেই মানসী এনার কোনই সাদৃশ্য খুঁজে পেলেনা মাধুরী। মনে হ'লো এ যেন কোন অচিন দেশের অজানা মেয়ে। এনার তরফ থেকেও নিরাশা ঘটবার কারণ ছিলো। কারণ, মাধুরীর পাতা কাটা চুলে ও বিশ্রী ঘোর রংয়ের শাড়িটায় শহুরে মার্জ্জিত ভাব ছিলো না। তার উপর এক হাত ভর্তি সোনার চুড়ি। কাণের টপ্‌টার দিকে এনা রীতিমত কটকট্ করে একবার চাইলে। পায়ে জুতোর বদলে আলতা। আলতার টকটকে লাল রেখাটার পানে চেয়ে এনার মাথা ঘুরতে লাগলো। যাক্, এই অবস্থায় কোনমতে তারা দোতালার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতেই এনা বললে, বাথরুমে ঢুকে মুখ হাত ধুয়ে একেবারে তৈরী হয়ে এস মাধুরী দি। আয়াকে ডেকে দিচ্ছি।

মাধুরী এনার চেয়ে এক মাসের বড়। এই দিদি ডাকে তার মুখ স্নিগ্ধ হাস্যে ভরে উঠলো। দোতালার বাঁ দিকের বড় ঘরটায় অনেক মেয়েদের একত্র সম্মিলিত হাস্য ও কলগুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল। সেইদিকে একবার অধীর কটাক্ষে চেয়ে এনা বললে, আজ আমার অনেক বান্ধবী একটু বিশেষ কাজে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তাঁদের বেশিক্ষণ একা বসিয়ে রাখা যায় না। আমি ততক্ষণ যাই। তুমি তৈরী হয়ে এলে পরিচয় করিয়ে দেব।

যেতে যেতে আবার ফিরে এসে এনা বললে, মাধুরীদি, একেবারে স্নানই করে নাও ভাই। আর যদি বলতো আমার কাপড় জামা একপ্রস্থ আয়ার হাতে পাঠিয়ে দিই। তোমার অবশ্য কোন আপত্তি যদি না থাকে। মাধুরী এনার এই সযত্ন আতিথ্যে মুগ্ধ হয়ে বললে, আমার ট্রাঙ্কটা এখনও নীচে পড়ে আছে, তা' তোমার কাপড়ই না হয় উপস্থিত দাও। এনা তার খুব আপটুডেট্ ছাঁটের একটা জামা এবং ফিকে বেগুনী রংয়ের এক দামী শাড়ি পাঠিয়ে দিলে। এবং যেতে যেতে ভাবতে লাগলো, সাবান দিয়ে স্নান করলে বোধ হয় ওই বিশ্রী আলতার দাগ মাধুরীদি'র পায়ের থেকে উঠে যেতেও পারে।

মাধুরী স্নান সেরে পিসেমশায় পিসীমাকে প্রণাম করে উঠতেই বাবুর্চি এসে চা এবং সকালবেলাকার খাবার ডিম টোষ্ট প্রভৃতি দিয়ে গেল। তার চা খাওয়া শেষ হতেই এনা তাকে আর একটুও অবসর দিলে না, বগল দাবা করে নিজের ঘরের দিকে টেনে নিয়ে গেল। সেখানে আট দশটি মেয়ে একত্র হয়ে কি নিয়ে বিষম উত্তেজিত ভাবে আলোচনা করছিল। এনা তাদের সঙ্গে মাধুরীর পরিচয় করে দিয়ে বললে, আমাদের হেডমিষ্ট্রেস মিস গাংগুলীর নাম শোন নি কখনো মাধুরীদি? শুনে থাকবে বোধ হয়? মাধুরী বললে, হ্যাঁ, কালই তো খবরের কাগজে পড়ছিলাম ওঁর নাম। দীন দরিদ্রদের জন্যে ওর খুব মমতা। কাল ওঁর একটি সুন্দর বক্তৃতা কাগজে দিয়েছিল। এনা সগর্বে বললে, আজ যদি তাকে স্বচক্ষে দেখতে চাও তবে আমাদের সঙ্গে মীটিংয়ে চলো। এখনই দেখতে পাবে তাঁকে। কে একটি মেয়ে হাতে একটা সৌখীন দামী ব্যাগ ঝুলিয়েছিল, সে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আরতো সময় নেই এনা। ন'টা পঁচিশে সভা আরম্ভ, আমরা তাহলে উঠি। তুমি মাধুরী দেবীকে নিয়ে ঠিক সময়ে যেও। এনা নীচের গাড়ী

বারান্দা পর্যন্ত নেমে বন্ধুদের এগিয়ে দিয়ে এলো। তারা চলে যেতে মাধুরী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে এনার দিকে চাইলে। এনা বললে, ওদের সঙ্গে আলাপ হয়ে তুমি খুসী হওনি মাধুরী দি? ক্রমে দেখবে, যতই ভাব হবে ততই তুমি মুগ্ধ হবে। আমাদের হেডমিস্ট্রেস্ মিস গাংগুলি একজন প্রচণ্ড সাম্যবাদী। তিনি

মাধুরী তার কথায় বাধা দিয়ে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'সাম্যবাদী' মানে কি ভাই?

এনা বুঝিয়ে দিলে, সাম্যবাদী মানে জানো না? এই যারা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে যে, বিশ্বের সবারই সমান অধিকার। আমাদেরও যে অধিকার এ জগতে, ঐ রাস্তার গরীব মুটে-মজুরগুলোরও তারচেয়ে লেশমাত্র কম অধিকার নয়।—বলতে বলতে এনার গলার স্বর যেন সাম্য ভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো।

মাধুরী খুসী হয়ে বললে, ঠিক বলেচ ভাই। আমার মাও তাই বলেন। তিনি অবশ্য সাম্যবাদ নিয়ে কখনো কিছু আলোচনা করেচেন বলে মনে পড়ে না, কিন্তু আমাদের প্রায়ই বলেন, ঝি-চাকরদের শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখো। সংসারের সমস্ত কাজ এবং দায়িত্ব তো আমারই, কিন্তু একা এত কাজ আমি পারি না বলেই ওদের সাহায্য নিই। এ ভাবে দেখতে শিখলে ওদের প্রতি আর অশ্রদ্ধাসূচক ব্যবহার কখনো করতে পারবে না।

এনা তাড়াতাড়ি তার সিল্কের লেডিজ্ ব্যাগটা খুলে একটা ছোট খাতা-পেন্সিল বার করে বললে, বাঃ ভারি চমৎকার কথাটি তো! দাঁড়াও ভাই, কথাটা নোট করে নিই। আজকের সভাতে মিস্ গাঙ্গুলীদি আমাদেরও কিছু কিছু বলতে অনুরোধ করেচেন। আমি যা বলবো তাতে এ কথাটিও জুড়ে দেব। কিন্তু আর ত সময় নেই, আমি মোটর আনতে বলেচি। আমাদের স্কুলের বড় হলঘরটাতেই সভা হবে। চল মাধুরীদি। জুতা পায়ে দাও ভাই। কি বল্লে? জুতো নেই? আচ্ছা না হয় আমার এই হীললেস্ জোড়াটা পায়ে দিয়ে নাও। দেখ ঠিক ফিট্ করেচে তো? ··টক্ টক্ করে এনা ব্যাগ হাতে ঝুলিয়ে সিঁড়ি নামতে লাগলো। মোটর তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল। মাধুরীও তার অনুসরণ করলে।

(৩)

মিস গাঙ্গুলীর বক্তৃতার সময় সবারই চোখ সজল হয়ে এলো। জগতের সমস্ত দুঃস্থ সর্বহারাদের যখন তিনি নিজেদের সঙ্গে সমান 'আসনে বসাবার, সমান মর্যাদা, সমান শিক্ষার, সমান সুযোগ ও অধিকার দাবী করলেন, তখন ঘরের আবহাওয়া এক বিরাট মহিমায় গম্ গম্ করতে লাগলো। তাঁর পরেই এনার বক্তৃতাটিও বেশ ভালো হ'লো। সে যখন বললে, আমাদেরই সংসারে যে সব ঝি, চাকর, দারোয়ান, বাবুর্চি, কর্মচারী কাজ করে, তাদের আমরা মানুষ বলে যখন গণ্য করিনে, যখন কেবল তাদের খাটিয়ে নিয়েই সুখী হই, ভুলচুক হ'লে নিষ্ঠুর অপমান করি, তাদের আত্মাকে মানবাত্মা বলে অনুভব করিনে, তাদের সুখ-দুঃখকে মানুষের মত বুঝতে, অনুভব করতে, সমবেদনার সঙ্গে গ্রহণ করতে শিখিনে তখন কি স্বর্গ থেকে বিশ্বদেবতার নির্মম রোষ আমাদের উপর বর্ষিত হয় না।

তখন অজস্র করতালিতে অত বড় হলঘরটা ফেটে পড়বার উপক্রম করলো। মিস গাঙ্গুলী এনার মাথায় হাত দিয়ে খুব প্রশংসা সূচক স্বরে বল্লেন, তোমাদের মত মেয়েরাই আমাদের দেশের গৌরব।

গর্বে, আনন্দে, সাফল্যের উত্তেজনায় এনার মুখ লাল হয়ে উঠলো। মোটরে বাড়ী ফিরে আসতে আসতে সে বললে, মাধুরীদি, তোমার খুব পয় আছে ভাই। উঃ, আজকের মীটিংটা একটা গ্র্যাণ্ড সাক্সেস্। প্রথমটা যখন বলতে উঠলুম কী ভীষণ নার্ভাস লাগছিলো, কিন্তু ক্রমেই সঙ্কোচ কেটে যেতে লাগলো। একটুখানি বলেই যেই বুঝতে পারলাম, বেশ হচ্চে, সবারই মনে বেশ রেখাপাত করচে, অমনই মনে একটা উৎসাহ আর জোর পেলাম।

এমনই নানা গল্প হতে হতে তাদের মোটর বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। মাধুরীকে নিজের ঘরে বসিয়ে এনা বিদ্যুৎপাখাটা খুলে দিয়ে বললে, এসে পর্য্যন্ত তুমি বিশ্রাম করতে পাওনি ভাই। বসো এবার। আজ রবিবার স্কুল নেই, সারাদুপুর আমি ফ্রি আছি।

মাধুরী হৃষ্ট মনে একটা সোফায় বসে বললে, খুব ঘুরে বেড়াব, অনেক কিছু দেখব আর শিখব বলেই তো মা কলকাতায় পাঠালেন! তিনি বলেন, মাঝে মাঝে বাইরের

জগতের পরিচয় না পেলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে। তোমাদের এই মীটিংয়ের ব্যাপারটা আমার খুব ভালো লাগলো। মাকে চিঠিতে এর কথা লিখব আমি। যদিও তোমরা যা বললে, সেটা আমার কাছে নূতন কিছু নয়, আমাদের বাড়ীতে রাঁধুনীকে আমরা বামুন পিসীমা বলি। মা বলতে শিখিয়েচেন ছোট থেকে। মা তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করেন যে সে যেন আমাদেরই পরিবারের একজন। আমাদের পুরোন কর্মচারিকে আমরা হারাণ কাকা বলি। আমাদের বাড়ীর মানুষকরা চাকরকে আমরা বলি 'দীনুদা'। পরিবারের সকলের সঙ্গেই পরস্পরের কিছু না কিছু হৃদ্যতার সম্পর্ক।

এনা মাধুরীর কথা শুনতে শুনতে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে মিহিসুরে ডাকলে, বয়, ইউ-বয়। আইসক্রিম আউর সরবং লেআও জলদি। বয় একটা ট্রেতে করে সরবতের কাঁচের গ্লাস এবং কাঁচের ডিশে করে আইসক্রীম নিয়ে এ'লো।

ছোট টেবিলে ট্রেখানি নামিয়ে রাখবার সময় কেমন করে তার হস্তচ্যুত হয়ে হঠাৎ একটা কাঁচের গ্লাস মাটিতে পড়ে ভেঙ্গে গেল। সরবত ছড়িয়ে পড়লো দামী কার্পেটের উপর।

এনা কঠোরস্বরে চেচিয়ে উঠলো, উল্লুক কাঁহাকার। আভি নিকালো হিঁয়াসে।

তার ঐ রাজখাই গলা ও প্রচুর বিক্রম দেখে মাধুরী চমকিত হয়ে উঠলো। বয় বেচারা নীরবে হেঁট হয়ে কাঁচের টুকরোগুলি কুড়িয়ে তুলতে লাগলো। এবং তেমনই নীরবে সে জায়গাটি পরিষ্কার করে যতশীঘ্র সম্ভব আর এক গ্লাস সরবত নিয়ে এল। পাঁচ মিনিট ধরে অবিশ্রান্ত গর্জন এবং গালাগালি করে যেন নিতান্ত পরিশ্রান্ত হয়েই সরবতের গ্লাসে চুমুক দিয়ে এনা বললে, এই সব বেকুব লোকজন নিয়ে জীবন অসহ্য হয়ে উঠেছে। আর পারা যায় না। উঃ, সকালবেলাকার ঐ উত্তেজনাময় বক্তৃতার পর ভারি ক্লান্ত হয়ে পড়ে মনে করলুম একটু বিশ্রাম নেব, এই সব জানোয়ারগুলোর জন্যে সেটুকুও পারবার যো নেই।

জানোয়ারটি ম্লানমুখে অপরাধীর মত সেখান থেকে নিঃশব্দে সরে গেল।

মাধুরী ব্যথিত চিত্তে ভাবতে লাগলো, সাম্যবাদ নিয়ে শুধু কি লেকচার দেওয়া যায় আর কিছু করা যায় না? যারা জানোয়ার তাদের মানুষের পংক্তিতে তুলে নিতে হ'লে সভা করা ছাড়া আরও কিছুর প্রয়োজন হয়, সে প্রয়োজনের কথা মনে পড়তেই মাধুরীর নিজের মাকে মনে পড়ে গেল। এবং এক নিমিষের মধ্যে এই কর্মকোলাহল মুখরিত ক'লকাতা ছেড়ে নিভৃত পল্লীতে মায়ের বাহু-বেষ্টনে ফিরে যেতে তার সারা মন ব্যাকুল হয়ে উঠলো। এমনসময় এনার মা ঘরে ঢুকে অনুযোগ করে বল্লেন, তোরা কি আজ ভাত খাবি নে? সারাদিন শুধু হৈ-হৈ করে বেড়াবি?

এনা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে তার মায়ের গলা বেষ্টন করে বললে, ওয়াণ্ডারফুল হয়েচে মা আজ আমার লেকচার। যদি শুনতে। মাধুরীদি'কে জিজ্ঞাসা কর না।

এনার মা সগর্বে বল্লেন, তা আমি জানি। এই সেদিনও মিষ্টার বোস বলছিলেন, এনার মত মেয়ে, এনার মত প্রতিভা পুরুষদের মধ্যেও বিরল।

এনা আনন্দে একটা ইংরাজি গানের সুরে শিষ দিতে দিতে খাবার ঘরের দিকে এগিয়ে চললো।

এনার মা মাধুরীকে গল্পচ্ছলে এনার কৃতিত্বের আরও কতকগুলি ঘটনা জানাতে জানাতে তার অনুসরণ করলেন। সাম্যবাদের বহির্ভূত সেই জানোয়ার বয়টা তখন কলতলায় সোডা আর সাবান দিয়ে ডিনারের ডিশগুলি ঘষে ঘষে পরিষ্কার করে রাখছিলো।

দক্ষিণ ইটালির অগ্নিকোনে

অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, পি আর এস, পি-এইচ ডি, ডিলিট্

পৃথিবীর আকার কমলা লেবুর মত। পৃথিবীর উপরটায় মাটী পাহাড় সমুদ্র এই সব দেখিতে পাই, এগুলির নীচে পৃথিবীর ভিতরে, নানা প্রকার গলা পাথর, ধাতু ও গ্যাস আগুনে ফুটিতেছে। এই সমস্ত উত্তপ্ত বস্তু পৃথিবীর ভিতরে নড়িতেছে ফিরিতেছে এবং কখনও কখনও পৃথিবীর উপরকার মাটী বা পাহাড় অথবা জলের আবরণ ভেদ করিয়া কঠিন হইয়া আসিতে চায়। যেখানে কঠিন হইতে পারে না, সেখানে যদি মাটীর ভিতরে এই সব গলা পাথর ধাতু প্রভৃতি জোর করে, তাহা হইলে পৃথিবীর উপরে ভূমিকম্প হয়। যেখানে পৃথিবীর তাপ ও অন্য বস্তু বাহির হইতে পারে, সেখানে উষ্ণপ্রস্রবণ ও আগ্নেয় গিরি রূপে দেখা দেয়। মাটির ভিতর হইতে টগ্‌বগে ফুটন্ত জল বাহির হয়, তাহাকে উষ্ণপ্রস্রবণ বলে, এবং পাহাড়ের মাথা দিয়া ধোঁয়া, আগুন, গলিত পাথর, ধাতু প্রভৃতি যেখানে বাহির হয়, তাহাকে আগ্নেয় গিরি বলে। কোথাও কোথাও আগ্নেয় গিরিকে জ্বালামুখীও বলে।

আমাদের দেশে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে উষ্ণপ্রস্রবণ আছে। কিন্তু আগ্নেয় গিরি নাই। বাঙ্গালা প্রদেশে চট্টগ্রামের নিকটে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে, বীরভূম জেলার সিউড়ির নিকট বক্রেশ্বরে, এবং বিহার প্রদেশে রাজগির পাহাড়ে ও মুঙ্গেরে উষ্ণপ্রস্রবণ আছে। ভারতের বাহিরে নানাদেশে আগ্নেয় গিরি দেখা যায়। আমেরিকায়, দক্ষিণ ইউরোপে, আফ্রিকায়, যবদ্বীপে, জাপানে আগ্নেয়গিরি আছে।

ইউরোপে ইটালি দেশের নেপল্‌স্ শহরের কাছেই ভিসুভিয়স নামে একটী বিখ্যাত আগ্নেয় গিরি আছে। আগ্নেয় গিরিগুলির মধ্যে কতকগুলি এখন মৃত অর্থাৎ বহুকাল ধরিয়া সেগুলি হইতে পৃথিবীর ভিতরের তাপ বা গলা পাথর প্রভৃতি বাহির হয় নাই। আর কতকগুলি জীবিত,—এখন সেগুলি থেকে ধোঁয়া, আগুন গ্যাস প্রভৃতি বাহির হয়। ভিসুভিয়স একটী জীবন্ত আগ্নেয়গিরি। জীবন্ত আগ্নেয়গিরির কাছে বাস করা বিপদজনক। অনেক সময়ে জীবন্ত আগ্নেয় গিরি হইতে এত অধিক পরিমাণে গলা ধাতু প্রভৃতি বাহির হয় যে, তাহা গিরির গা ভাসাইয়া আশে পাশে ছড়াইয়া পড়ে, এবং গাছপালা বাড়ীঘর যাহা সামনে থাকে সব ভাসাইয়া গলা পাথরে চাপা দিয়া ধ্বংস করিয়া দেয়। ভিসুভিয়স গিরি ও অন্য কতকগুলি আগ্নেয় গিরি হইতে এইরূপে অগ্নি-উৎপাত হইয়া প্রাচীনকালে ও ইদানীং কত গ্রাম নগর একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছে, কত প্রাণী মারা গিয়াছে। এখন হইতে প্রায় ১৯০০ বৎসর আগে, ভিসুভিয়স পর্বত হইতে এরূপ অগ্নি উদ্গীরণ ও গলিত পাথর প্রভৃতি নির্গম হইয়াছিল যে, এই পর্বতের পায়ের তলায় অবস্থিত দুইটী ছোট ছোট নগর একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বাড়ীঘর-দুয়ার সমেত সমস্ত নগর লাভা বা গলা পাথরে ঢাকা পড়িয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। এখন সেই সব লাভা সরাইয়া এই দুই শহর খুঁড়িয়া বাহির করা হইতেছে, এবং তাহা হইতে আঠারো শত বা দুই হাজার বছর আগে দক্ষিণ ইটালি শহরে কি রকম বাড়ী-ঘর হইত, কেমন রাস্তাঘাট, দোকানপাট হইত, বাড়ী কি ভাবে সাজানো হইত, ইহার আসবাব পত্র কেমন হইত, এই সব বিষয় আমরা চাক্ষুষ দেখিতে পাইতেছি।

১৯২২ সালে আমি ইটালি ভ্রমণকালে নেপল্‌স্ যাই, এবং সেখান হইতে ভিসুভিয়স্ পাহাড় দেখিয়া আসি। সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। ভিসুভিয়স্ দেখাইয়া আনিবার

জন্য কতকগুলি লোক মিলিয়া সমিতি করিয়াছে—যাত্রীদের নিকট হইতে টাকা লইয়া গাড়ী ঘোড়া ও পথ প্রদর্শকের বন্দোবস্ত করিয়া দেয়। আমি এইরূপ একটি সমিতির নিকট ভিসুভিয়স্ দর্শনের জন্য একখানি টিকিট কিনিলাম। আমাকে রেলে করিয়া ভিসুভিয়সের পাদদেশে একটি গ্রামে লইয়া গেল। তাহার পরে সেখান থেকে

নেপল্‌স শহর থেকে দূরে ভিসুভিয়স্
দেখা যাচ্ছে

ঘোড়ার গাড়ী করিয়া আর একটু উঁচুতে লইয়া গেল। সেই স্থানটি পর্বতের গায়ে। তাহার পরে গাড়ী যাইবার পথ আর নাই, ঘোড়ায় চড়িয়া পাহাড়ে যাইতে হয়। একজন পথপ্রদর্শক সঙ্গে চলিল। দুইটা ঘোড়া আনা হইল, সে একটাতে চড়িল, আমাকে আর একটাতে চড়িতে বলিল। আমি আগে কখনও ঘোড়ায় চড়ি নাই। আর এই ঘোড়া দুটিও বিশেষ তেজী ঘোড়া। আমার একটু ভয় করিল, কিন্তু দেখিলাম উঁচু পাহাড়ে উঠিতে হইবে, ঘোড়া দৌড়াইতে পারিবে না। দুইজনে দুই ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া চলিলাম। প্রথমটা গ্রাম বাড়ী ঘর পড়িল, সেগুলি ছাড়াইয়া একটা সরল পাইন গাছের বন পাইলাম। যত উপরে উঠিতেছি, তত তলার দৃশ্য প্রসারিত হইয়া যাইতেছে। নীচের গ্রামের গাছপালা ঘরবাড়ী বেশী করিয়া নজরে আসিল, আর আসিল নেপল্‌স শহর, আর তাহার লাগোয়া সমুদ্র। খানিক পরে আমরা এমন এক স্থানে আসিলাম যেখানে গাছপালা আর নাই, কেবল লাভাচূর্ণ। ঠিক কয়লার গুঁড়ার মত, এই আগ্নেয় গিরি নিঃসৃত গলা পাথরের চূর্ণ সমস্ত দেশ ভরিয়া রহিয়াছে। ঘোড়ার পা গোড়ালি অবধি এই চূর্ণে ডুবিয়া যাইতে লাগিল।

এইরূপে আস্তে আস্তে চলিয়া, আমরা ভিসুভিয়াসের সর্বোচ্চ অংশে উঠিলাম। ঘোড়া একটু নীচে রাখিয়া, আমরা হাঁটিয়া উপরে গেলাম। সেখানে পর্বত শৃঙ্গের যেন একটা গভীর হ্রদ, তাহার কিনারায় দাঁড়াইয়া নীচে তাকাইতে হয়। একটা মস্ত গভীর জলাশয়ের মত, কিন্তু এটা আগুনের হ্রদ। তলার দিক যেন নানা স্থানে ফাটা, ভিতর হইতে ঝিকিঝিকি নীল আগুনের শিখা দেখা যাইতেছে। হ্রদের ভিতরে, একপাশে একটি মস্ত চূড়ার মত, যেন একটি বাটীর মধ্যে এক কোনে একটা তুবড়ী বাজী উপুড় করা। সেই তুবড়ীর মাথা হইতে ক্রমাগত ধোঁয়া বাহির হইতেছে, আর মাঝে মাঝে অগ্নিশিখা, এবং এ ছাড়া মাঝে মাঝে স্ফুলিঙ্গের মত গলা লাভা উৎক্ষিপ্ত হইতেছে।

হ্রদের তলদেশে অনেকটা নামা যায়। আমরা নামিলাম না। অনেকক্ষণ উপরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিয়া আমরা প্রত্যাবর্তন করিলাম।

দুঃসময়ে

বিমল ঘোষ

হে ধূর্জটি, কণ্ঠে তব হিরণ্ময় স্ফটিকাক্ষ মালা
তপস্যার পুণ্য জ্যোতি শোভে চন্দ্র জটিল জটায়,
অশিবের অভ্যুত্থানে পদে পদে অনর্থ ঘটায়—
তৃতীয় নয়ন হ'তে ধ্বক্ ধ্বক্ রুদ্রবহ্নি জ্বালা।

ভারতের হে তপস্যা এ কবির দীন অর্ঘ্য ডালা—
বাঙ্ময় অর্চনা মন্ত্রে সমর্পিনু অশ্রুর বন্যায়
প্রসন্ন নয়নে চাহ চূর্ণ করি অসত্য অন্যায়,
সংসার হয়েছে আজি অভিশপ্ত বন্দী-পশুশালা।

শ্রীপদ ভট্চায্

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায

তাহার নাম শ্রীপদ। কিন্তু 'শ্রীপদ'—এ আবার কেমনতরো নাম। শ্রীপদ ত একটা রোগের নাম। মানেটা অনেকেই ত তোমরা জান। যারা জাননা, তারা অভিধান খুলিয়া দেখ।

আসল নাম তাহার—শ্রীপদ। লম্বা, ছিপ-ছিপে, কাঠির মত চেহারা। বাঁ পা ছাড়া তাহার দেহের ওজন একমণ সাড়ে সাত সের, আর শুধু বাঁ পা-খানার ওজন সাঁইত্রিশ সের, একুনে দুই মণ সাড়ে চারি সের। এইবার বুঝিতে পারিয়াছ বোধ হয় যে, গ্রামের সকলের কাছে কেন তাহার নাম শ্রীপদ ভট্চায্ হইয়া গিয়াছিল ?

দুই ভাই। শ্রীপদ আর শম্ভুপদ। দুই ভাইয়ের পৃথক সংসার। শম্ভুপদর অবস্থা ভাল। গ্রামের হাট-তলায় তাহার একখানি দোকান ছিল, তাহার আয় হইতে তাহার সংসার বেশ সচ্ছলে চলিত। কিন্তু শ্রীপদর অবস্থা খুবই খারাপ। তাহার ভীষণ বাম পদটির ভারে সে কাজ কর্মের প্রায় অযোগ্য হইয়া অতি কষ্টে দিনাতিপাত করিত।

তাহার কষ্ট দেখিয়া গ্রামের জমিদারবাবুর দয়া হইল। তিনি শ্রীপদকে একটি কাজ দিলেন। কাজ—ঠাকুরপূজা। গ্রামে লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির ছিল। সেই মন্দিরে শ্রীপদ পূজারী নিযুক্ত হইল। চাল, দাল, চিনি, বাতাসা, ফল-মূল প্রভৃতির নিত্য-সিধা পায়, আর মাসে পাঁচ টাকা বেতন। সুতরাং শ্রীপদর কষ্ট ঘুচিল। কিন্তু আর একজনের কষ্ট বাড়িল। সে হইল—শম্ভুপদ।

এতদিন শ্রীপদর কষ্টে শম্ভুপদ মনে মনে খুব খুসী ছিল। কিন্তু এখন শ্রীপদর সাংসারিক এই পরিবর্তনে শম্ভুপদ হিংসায় ফাটিতে লাগিল। শ্রীপদ ইহা লক্ষ্য করিল। মনে মনে সে তাহার লক্ষ্মী-নারায়ণকে তাহার দুঃখ জানাইল আর আক্ষেপ করিয়া নিজের মনেই কহিল—'হায় রে! রাম-লক্ষ্মণের, কৃষ্ণ-বলরামের এই দেশে আজ ভাইয়ের ওপর ভাইয়ের এমন হিংসে।'

হিংসাটা শম্ভুপদর দিন-দিনই বাড়িতে লাগিল। কি করিয়া সে শ্রীপদর ক্ষতি করিবে, সর্বদাই সেই—চিন্তায় ডুবিয়া রহিল। অবশেষে বেশ একটা ফন্দী তাহার মাথায় যোগাইল।

জমিদার-বাড়ীর চাকর—কালু। সে কালুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিয়া তাহাকে হাত করিল। তাহার পর দু'জনে কি-একটা পরামর্শ করিল।

সন্ধ্যা হইয়াছে। শরতের মেঘশূন্য সুনীল আকাশের পশ্চিমে কিছু পূর্বে দিবাকর, রংয়ের খেলা করিতে করিতে একেবারে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। সেই রংয়ের তরঙ্গগুলি খানিক আগেও ছিল। এখন আর নাই। তাহা নীল হইয়া নীলাকাশে মিশিয়া গিয়াছে। নিকটের একটা ঝাউ গাছের মাথা হইতে অনবরত সোঁ-সোঁ শব্দ হইতেছিল। একদল পাখী ভোর বেলা বোধ হয় সুদূর কোনও গ্রাম-প্রান্তের নদীতীরের কুঞ্জবনে আনন্দ-ভ্রমণে গিয়াছিল, তাহারা সন্ধ্যা-সমাগমে নিজ-নিজ বাসায় ফিরিতেছিল। কয়দিন পরে বাংলার ও বাঙালীর চির মধুর দুর্গোৎসব। সকলেরই মনে আনন্দ। আকাশে, বাতাসে, রৌদ্রে, ছায়াতে যেন একটা আনন্দের ভাব উপ্ছাইয়া পড়িতেছে। জমিদার বাবু বর্হিবাটীর সুপ্রশস্ত বারান্দায় আরাম-কেদারার উপর বসিয়াছিলেন। পার্শ্ববর্তী বাগানে কামিনী ও রজনীগন্ধা ফুল ফুটিয়াছিল, তাহারই গন্ধে সমস্ত বারান্দা ভরিয়া উঠিয়াছিল। জমিদার বাবু ডাকিলেন—"কালিপদ!" কিন্তু কালিপদর কোন সাড়া পাওয়া গেল না, তাহার পরিবর্তে কাকাতুয়া পাখীটা অনবরত চীৎকার করিতে লাগিল—"যাই বাবু, যাই বাবু, যাই বাবু . ।"

বাবু পুনরায় ডাকিলেন—"কালী! অ কালু!"

তখন কালু খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে বাবুর সম্মুখে আসিয়া হাজির হইল।

বাবু তাহার দিকে চাহিয়া কহিলেন—"খোঁড়াচ্চিস্ কেন ?"

কালু কহিল,—"শ্রীপদ ঠাকুর তার বাঁ-পা দিয়ে খুব

জোরে লাথি মেরেচে, তাই ব্যথায় পা নাড়তে পাচ্চি না, শুয়ে ছিলুম।"

"কখন মারলে ?"

"আজ সকালে। বেলা ৮টা ৯টার সময়।"

"হুঁ। কেন মারলে ?"

"দুটো পূজোর ফুল চাইতে মন্দিরে গিয়েছিলুম। তাইতে তিনি বিষম রেগে গিয়ে বল্লেন—"সময় নেই, অসময় নেই, পুজোর ফুল। যেমন বাবু, তার তেমনি চাকর।" ঐ কথা বলেই বাঁ-পায়ের একটা জোর লাথি মারলেন।"

বাবু কহিলেন—"শ্রীপদ ঠাকুরের এত বড় আস্পর্দ্ধা। আচ্ছা, কাল সকালে এর বিচার হবে।"

রাত প্রায় এক প্রহরের সময় শম্ভুপদর দোকানে মুখো-মুখী বসিয়া—শম্ভু ও কালু। উভয়ের মুখেই আনন্দের চাপা হাসি। শম্ভু কহিল—"চাকুরিটা এইবার যাবে, তার আর কোন ভুল নেই। খোদ বাবুর চাকরকে লাথি।"

কালু বলিল—"পাঁচটা টাকা কিন্তু দিতে হবে, নইলে ছাড়চি না।"

"দোবো, ঠিকই দোবো। কাল সকালে বিচারটা আগে হোয়ে যাক।"

পরদিন সকালে শ্রীপদ ভট্টচার্য্যির বিচার হইল। শ্রীপদকে ডাকানো হইল। কালু আসিল এবং গ্রামের দুই পাঁচ জন ভদ্রলোকও হাজির হইলেন। তখন সকলের সমক্ষে বাবু শ্রীপদকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন—"কাল সকালে তুমি একটা ভয়ানক অপরাধ কোরেচ। আমার এই পেয়ারের চাকর কালুকে তোমার ওই এক-মোণী বাঁ-পা দিয়ে দেড়-মোণী লাথি মেরেচ। সেই আঘাতে"

বাধা দিয়া শ্রীপদ কহিতে গেল—"কাল সকালে ত বাবু আমি"

"চুপ কর। তোমার কোন কথা আমি শুনবো না। তুমি কত করে মাইনে পাও ?"

"পাঁচ টাকা, বাবু।"

"আজ থেকে তোমার মাইনে হোল সাত টাকা। আর ঐ বাঁ-পায়ের সাতটা লাথি রোজ মারতে হবে এই কালুকে।"

সকলে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। বাবু কহিলেন—"ব্যাপারটা একটা চক্রান্ত। শ্রীপদ ঠাকুরকে জব্দ করবার জন্যে একটা চক্রান্ত। কিন্তু চক্রান্তটা ফাঁস হোয়ে গেল। কাল সমস্ত সকালটাই শ্রীপদ ঠাকুর গাঁয়ে ছিল না। আমারই একটা কাজে ওকে খুব ভোরে ৩।৪ ক্রোশ দূরে এক জায়গায় যেতে হোয়েছিল। সেখান থেকে ওর কাজ সেরে ফিরে আসতে বেলা বারটা হোয়েছিল।"

কালুর মুখ চূণ হইয়া গেল। সে লজ্জায় এবং ভয়ে মাথা হেঁট করিয়া কাঠের পুতুলের মত নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। বাবু বলিতে লাগিলেন—"কাল সকালে লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজার ভার দিয়েছিলুম—ও-পাড়ার চক্কোত্তি ঠাকুর-মশাইকে। কিন্তু ৩।৪ ক্রোশ দূর থেকে শ্রীপদ-ঠাকুর তার বাঁ-পা বাড়িয়ে যে লাথি মেরেচে, এতে তার বাহাদুরী আছে। এই বাহাদুরীর জন্যে তার দু'টাকা মাইনে বৃদ্ধি হোল। দূরের লাথি হয় ত সুবিধে মত কালুকে লাগে নি, তাই সাতটা কাছের লাথির হুকুম করলুম।"

* * * *

জমাদার বাবুর ধমকে কালু সব কথাই প্রকাশ করিয়া ফেলিল। বাবু শম্ভুপদকে ডাকাইয়া কড়া কড়া কথা শুনাইয়া দিলেন। সকলের সামনে শম্ভুপদ খুবই অপদস্থ হইল।

সংসারে এক ধরণের লোক আছে, যাহারা নিজ-কৃত অন্যায়ের জন্য অপদস্থ হইলে, সে জন্য লজ্জিত না হইয়া অপমানের প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করে। শম্ভুপদ ছিল সেই ধরণের লোক। সুতরাং সে মরিয়া হইয়া শ্রীপদ ঠাকুরকে জব্দ করিবার পন্থা খুঁজিতে লাগিল। শ্রীপদও কতকটা আভাস যেন বুঝিতে পারিল।

মহালয়ার রাত্রে সে লক্ষ্মী-নারায়ণের 'শীতল' দিয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ঠাকুরের কাছে আপন দুঃখ নিবেদন করিয়া আশীর্বাদ ভিক্ষা করিল। রাত তখন প্রায় এগারটা। এত রাত্রে, শীঘ্র হইবে বলিয়া সে কুমোরপাড়ার পথ ধরিয়া বাড়ী ফিরিল। কুমোরদের বাড়ী ক'খানা ছাড়াইলেই আর লোকের বসতি নাই। দু পাঁচখানা বাগান, পতিত জমি, বেগুন ক্ষেত আর আউস জমি। তারপর মোড় ঘুরিয়া খানিকটা গেলে তবে ও-পাড়ার নন্দীদের বাড়ী।

এত রাত্রে পল্লীগ্রামের নিস্তব্ধতা চারিদিকে থম্ থম্ করিতেছে। শ্রীপদ ঠাকুর এই নির্জন পথের সেই বেগুন ক্ষেতগুলার কাছে আসিতেই, পিছন হইতে তিন চারিজন

লোক তাহাকে জাপ্টাইয়া ধরিল, একজন একখানা চাদর দিয়া তাহার মুখ বাঁধিয়া ফেলিল, যাহাতে সে চীৎকার করিতে না পারে। শ্রীপদ পড়িয়া গিয়াছিল। লোকগুলা শক্ত দড়ি দিয়া তাহার সর্বাঙ্গ জড়াইয়া খুব শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। তাহার পর কয়জনে মিলিয়া তাহাকে গ্রামের বাহিরে চন্দন-পুকুরের পাড়ের জঙ্গলের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া আসিল।

লোকগুলাকে শ্রীপদ চিনিতে পারে নাই। একে অমাবস্যার অন্ধকার, তাহার উপর তাহাদের সকলের মুখে কালো রং মাখা ছিল। শ্রীপদ নিরুপায় হইয়া সেই জঙ্গলের মধ্যে পড়িয়া রহিল, আর মনে মনে লক্ষ্মী-নারায়ণকে ডাকিতে লাগিল।

মিনিট পাঁচেক পরে সেই জঙ্গলের ভিতর একটা সোঁ-সোঁ শব্দ হইতে লাগিল। শব্দটা খুবই কাছে এবং ক্রমেই তাহা বাড়িতে লাগিল। শ্রীপদ আপন জীবন সম্বন্ধে হতাশ হইয়া নির্জীবের মত পড়িয়া রহিল।

সেই সোঁ-সোঁ চোঁ-চোঁ শব্দের আর বিরাম নাই। শ্রীপদ ভাবিতে লাগিল—'কিসের শব্দ? সাপ? না, তা হোলে এতক্ষণ এসে ছোবল দিত। কিংবা হয় ত দেরে, এখনো ঠিক কাছে আসে নি। সাপ যদি না হয় ত কোন বুনো জানোয়ার, কিংবা ভূত, প্রেত, কিংবা ।'

সোঁ-সোঁ শব্দ বাড়িয়াই চলিল। শ্রীপদর নড়িবার উপায় নাই। চুপ করিয়া সে একই ভাবে পড়িয়া রহিল। কিছু পরে তাহার মনে হইল, কে যেন তাহার বাঁ পায়ে সুড়্-সুড়ি—দিতেছে। আরো কিছু পরে মনে হইল, যেন তাহার বাঁ-পাটা হাল্কা হইয়া গিয়াছে। ভয়ে, আতঙ্কে, নৈরাশ্যে সে অজ্ঞানের মত হইয়া পড়িল।

খুব ভোরে কে-একজন চন্দন-পুকুরের ঘাটে নামিতে গিয়া, পাড়ের বন-জঙ্গলের মধ্যে শায়িত শ্রীপদ ঠাকুরকে দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি সেইখানে আসিল। লোকটা অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া দেখিল যে, শ্রীপদঠাকুরের শ্রীপদ আর নাই, তাহা চুপসাইয়া গিয়া স্বাভাবিক আকার ধারণ করিয়াছে। তবে সমস্ত পা-টা যেন একটা পাতলা ছাল দিয়া ঢাকা। সে তখন তাড়াতাড়ি শ্রীপদ ঠাকুরের সর্বাঙ্গের বাঁধন খুলিয়া দিল।

দেখিতে দেখিতে গাঁয়ের বহু লোক সেইখানে আসিয়া জড় হইল স্বয়ং জমিদার বাবুও খবর শুনিয়া সেখানে আসিলেন। তিনি শ্রীপদর মুখে সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া কহিলেন—"শ্রীপদ, তুমিই লক্ষ্মী নারায়ণের যথার্থ পূজারী। তাই তাঁর দয়ায়, বিপদের মধ্যে দিয়াও তোমার একটা বড় ব্যাধি এইরকম অদ্ভুত ভাবে সেরে গেল।

সকলেই বুঝিতে পারিল যে, যেখানে শ্রীপদর বাঁ পা খানা পড়িয়াছিল, সেখানে এমন কোন গাছ বা লতা-পাতা কিছু ছিল, যাহার স্পর্শে এবং দ্রব্যগুণে এই অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছে। সেই স্থানের লতা-পাতা বহু লোক লইয়া গেল এবং পরীক্ষা করিয়া দেখিবার অভিপ্রায়ে সে-সব সযত্নে রাখিয়া দিল। কিন্তু ঠিক যে গাছটির পাতার গুণে এই ব্যাধি সারিয়া গেল, সেটির সন্ধান কেহই পাইল না। হয় ত, দু'একটি চারা গাছ যাহা ছিল, তাহা শ্রীপদর বাঁ-পায়ের সহিত ক্রমাগত বহুক্ষণের সংস্পর্শে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল, আর তথায় ছিল না।

জমিদার বাবু বলিলেন—"লোকচক্ষুর অন্তরালে, এ রকম বহু পাতা আমাদের দেশে আছে, যা বড় বড় রোগ এই রকম আশ্চর্য্যভাবে সারিয়ে দেয়।"

যাহা হউক, শ্রীপদর এই ব্যাপারে সকলেই মনে মনে খুব আনন্দিত হইল। কেবল একজন মনের দুঃখে ও হিংসায় জ্বলিয়া মরিতে লাগিল, সে শম্ভুপদ। শম্ভুপদকে লোকে যা-তা বলিতে লাগিল, লোকের কাছে তাহার মুখ দেখানো ভার হইল।

জমিদারবাবু শ্রীপদর বেতন সেই মাস হইতে মাসিক দশ টাকা করিয়া বাড়াইয়া দিলেন। শম্ভুপদ লজ্জায়, অপমানে, হিংসায় ধিক্কারে সে-গ্রামে আর তিষ্ঠিতে পারিল না। সে বাড়ী-ঘর-দোর বিক্রয় করিয়া অন্য গ্রামে উঠিয়া গেল। সে সব কিনিয়া লইল—শ্রীপদ, না—শ্রীপদ নয় শ্রীপদ। শ্রীপদ নাম তাহার ঘুচিয়া গিয়াছিল। সকলেই তাহাকে ডাকিতে সুরু করিল শ্রীপদ বলিয়া।

দিন-দিনই শ্রীপদ ভট্টাচার্য্যির উন্নতি হইতে লাগিল। অসীম আনন্দ, উৎসাহ ও শান্তির মধ্যে থাকিয়া সে লক্ষ্মী-নারায়ণের শ্রীচরণে নিজের দেহ মন লুটাইয়া দিল।
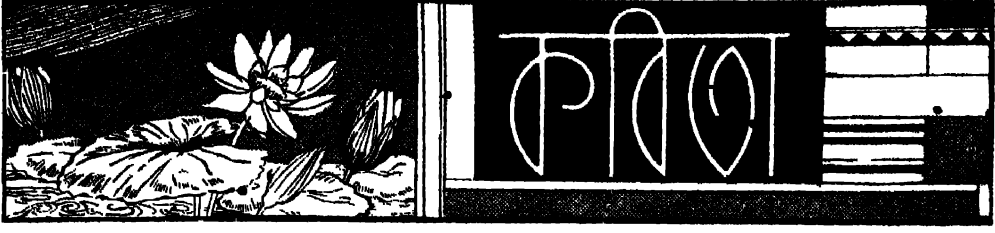
সনাতন ও শ্রীজীব

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

সনাতন বৃন্দাবনে যশ গাহে জনে জনে,
এমন পণ্ডিত আর নাই,
ভক্তকুল-শিরোমণি গণে না পরশমণি
তাঁর কাছে তুল্য সোণা ছাই।
বিজয়ী পণ্ডিত এসে, শুধাইল গর্বে হেসে,
"তুমি নাকি পণ্ডিত অগ্রণী ?"
সনাতন দীন মনে ক'ন অতি আকিঞ্চনে,
"নহি আমি কোনো ধনে ধনী ,
নাহি বিদ্যা যশোধন, আমি অতি অভাজন,
কৃষ্ণের চরণ মাত্র সার,
তুমি অতি মহাশয়, সবে গাহে তব জয়
ভাগ্যে লভি সাক্ষাৎ তোমার।"
পণ্ডিত কহিল তারে, "সুতীক্ষ্ণ শাস্ত্রের ধারে
তোমা-সাথে দ্বন্দ্ব আমি চাহি।"
সনাতন স্মিত হাসে কহিলেন স্বল্পভাষে,
"বিদ্যা মোর কিছুমাত্র নাহি ,
যাহা ইচ্ছা কহ তব জয়পত্রী অভিনব
লিখে দিই আমি তব হাতে,
বিচারে বাসনা নাই নমি আমি সব ঠাঁই
প্রভু মোর সকলের সাথে"
সনাতন গুণাকৃষ্ট শ্রীরূপ লেখেন হৃষ্ট
পত্র পৃষ্ঠে নিজ নাম তার,
পণ্ডিত ভাবিল মনে ভয় পে'ল দুইজনে
মোর সাথে করিতে বিচার।

পণ্ডিত পাইয়া পত্রী, ভাবে আমি একচ্ছত্র।
হইলাম পণ্ডিত প্রধান,
জীব গোস্বামীরে ডাকি কহেন পণ্ডিত হাঁকি,
"জ্যেষ্ঠতাত তব হতমান।
বিচারে আমারে ডরি' জয়পত্রী থরথরি
আমারে লিখিয়া দেন তা'রা।"
শ্রীজীব একথা জানি ক্ষণকাল মৌন-বাণী,
অপমানে হইলেন হারা।
দণ্ড দুই হ'ল পূর্ণ, বিচারে হইয়া চূর্ণ
পণ্ডিতের বাক্য নাহি সরে,
জয়পত্রী ছিন্ন করে' পণ্ডিত ফিরিল ঘরে
শ্রীজীবের যশে দেশ ভরে।
সনাতন জীবে ডাকি, ছল ছল দুটি আঁখি
কহিলেন সজল নয়নে,
"শোন বৎস, কি করিলে, অকারণ দুঃখ দিলে
প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিতের মনে ,
এই বৈষ্ণবের মান সকলের দিবে মান
নিজে র'বে সবার বাহিরে,
তবু হারা-জিতা নিয়ে মিথ্যারে মর্য্যাদা দিয়ে
বড় কর তোমার "আমিরে"।
যতদিনে নাহি যায় অভিমান পুনরায়
ততদিন না দেখায়ো মুখ।"
তপ্ত অশ্রু ঝরঝরে, পড়িল নয়নে ঝরে',
ভেসে' গেল শ্রীজীবের বুক।

ধ্বংসস্তূপে

শ্রীহেমচন্দ্র বাগ্‌চি এম্‌-এ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তাহাদের বেশিদূর যাইতে হইল না। দীঘির ঠিক পিছনেই নিবিড় বনভূমির মধ্যে খানিকটা উঁচু জমির উপর অনেক ভাঙা ভাঙা পুরানো বাড়ী, রাশিকৃত ইট—দেখিলেই মনে হয় এই ধ্বংসাবশেষ কোনো পুরানো প্রাসাদের বা কোনো প্রাচীন দুর্গের। তাহার সম্মুখ দিয়া একটি গভীর খাল কাটা—তাহার কোনো কোনো অংশ এখন মজিয়া গিয়াছে। গরুর গাড়ীর চলা পথ তাহারই উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। আশে পাশে নিবিড় বন, তাহারই মধ্য হইতে এই বিশাল ধ্বংসস্তূপ দেখা গেল। তাহারা পাঁচজনে সেই খালের ধারে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বাঁশীর সুর দুর্গের ভিতর হইতে আসিতেছে। শৈলেন চিন্তিতমুখে বলিল, 'এ জায়গাটার কথা ত কোনোদিন শুনিনি। বড় অদ্ভুত মনে হচ্ছে।' সুনীল বলিল, 'চলো যাই ওখানে—কে বাঁশী বাজাচ্ছে দেখে আসি।'

তাহারা তখন মজাখালের মধ্যে নামিয়া আসিল, এবং অল্প সময়েই সেই ভাঙা বাড়ীগুলির মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। বাহির হইতে যেমন দেখা গেল, ভিতরটা ঠিক তেমন নয়। বাহিরটা উঁচু—ভিতরটা অনেক নীচু। কোনো সিঁড়ি নাই—পাঁচজনেই অসংখ্য কাটাঝোপের মধ্যে লাফাইয়া পড়িল। দুর্গের ভিতরটা নিবিড় জঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছে—এক-একটা ভাঙা বাড়ীর ফাটলে শিকড় চালাইয়া দিয়া কত বছরের সব বড় বড় গাছ। মাঝে মাঝে শালের বড় বড় কড়ি, পাথরের ভাঙা থাম পড়িয়া আছে। অল্প ব্যবধানেই এক-একটা বাড়ী। দেখিলেই বুঝা যায় সাধারণ বাসের জন্য এগুলি নয়—সৈন্যেরা থাকিত বলিয়াই মনে হয়। সেই বিশাল দুর্গের মধ্যে পাঁচজনে আসিয়াই বিস্মিত হইল। দ্বিপ্রহর বেলা শেষ হইয়া বিকালের দিকে চলিয়াছে। নিবিড় বনভূমির ছায়ায় এই পুরানো দুর্গের নির্জনতায় তাহাদের মনে বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গেই একটা অজানা আতঙ্কও দেখা দিল। জঙ্গলের মধ্য দিয়া তাহারা কিছুদূর আগাইয়া গেল। কিছুদূর আগাইয়া যাইতেই আর জঙ্গল দেখা গেল না। শ্যামল দূর্বার আস্তরণ। তাহারই শেষসীমায় একটি পাথরের স্তূপের পাশে এক দীর্ঘাকৃতি বৃদ্ধ পরম আরামে পা ছড়াইয়া দিয়া বাঁশী বাজাইতেছে। সম্মুখে কে বা কাহারা তাহা দেখিবার সময় নাই। অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষে সে বাঁশীর সুরের মধ্যে তন্ময় হইয়া আছে। তাহার দাড়ি সাদা। সাদা পা-জামা—মাথার চুলগুলিও সাদা—তাহাকে দেখিলেই কোনো সম্ভ্রান্ত অ-বাঙালী মুসলমান বলিয়া মনে হয়। তাহার পিছনে যে পাথরগুলি পড়িয়া আছে তাহাও শ্বেত মর্ম্মরের। বিকালের ম্লান আলোয় এই সব-শুভ্র বৃদ্ধটি পাঁচটি কিশোরের মনে অপরূপ হইয়া দেখা দিল। তাহারা আরও একটু আগাইয়া গিয়া সেই তন্ময় বৃদ্ধের কাছাকাছি ভিড় করিয়া বসিল। বৃদ্ধ বাঁশী হইতে মুখ তুলিয়া লইয়া পরিষ্কার বাংলায় বলিল, 'তোমরা কোথা থেকে আসছ ?

শৈলেন এবার সত্য কথা বলিল, 'আমরা ইস্কুল পালিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছি ?'

'বড় ভালো কাজ করো নি।'

'কেন ?'

'কেন তা পরে বুঝবে। এখানে বাঘ আছে, প্রকাণ্ড বড় বড় সাপ আছে—তোমরা বিপদে পড়তে পারো।'

'আমরা ঐ জন্যেই ত—'

বৃদ্ধ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, 'তা' বেশ করেছ। লোকে বলে এটা রাজা গণেশের সময়কার দুর্গ। আমি এখানকার লোক নই—বেড়াতে এসেছি।'

'আপনি বড় সুন্দর বাজান। বাঁশী শুনব বলে অনেকদূর থেকে আমরা আসছি।'

বৃদ্ধ তাহাদের কথায় বাঁশী বাজাইতে লাগিল। সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে যে সুর মানায়, সেই সুর। সকলেই বিশেষ করিয়া সুনীল তন্ময় হইয়া সেই সুর শুনিতে লাগিল। সেই অদ্ভুত মায়া-রাগিণীর মধ্যে সেই নির্জন দুর্গে ধীরে ধীরে সূর্য অস্ত গেল।

* * *

'তাই ত হে, রাত্রি হ'য়ে গেল, তোমরা থাকবে কোথায় ?'—বলিয়াই গান শেষে বৃদ্ধ যেন একটু অন্যমনস্ক হইল। সাহস করিয়া অশ্বিনী বলিল, 'আপনি এই জঙ্গলের মধ্যে কোথায় থাকেন ? সেইখানেই না হয় আমরা আজ থাকব।'

'উঁহুঁ সে ঠিক হবে না। আমার থাকার কোনো স্থিরতা নেই। আমি হয় ত দু'ক্রোশ পথ হেঁটে এখুনি চ'লে যেতে পারি। তোমরা ক্লান্ত হ'য়েছ মনে হ'চ্ছে। তোমরা কি তা পারবে ? অবিশ্যি থাকা যে এখানে যায় না তা' নয়,—তবে খুব কষ্ট হবে। আচ্ছা এস আমার সঙ্গে।'—বলিয়া বৃদ্ধ বাঁশীটি হাতে করিয়া তাহার ঢিলা পা জামার উপর আলখাল্লা ও পাগড়ি পরিয়া তাহাদের আগে আগে চলিতে লাগিল। সকলে নিঃশব্দে তাহার অনুসরণ করিল।

শ্যামল দূর্বার আস্তরণ শেষ হইয়া নিবিড় শিশু আর সেগুন গাছের বন। তবে তাহার নীচে হাঁটিয়া যাইবার অসুবিধা নাই। একটা জায়গায় গাছগুলি খুব ঘন। সেইখানে সন্ধ্যার অন্ধকারে শুকনো পাতার উপর দিয়া খড় খড় করিয়া কি যেন চলিয়াছে দেখা গেল। শৈলেন চম্‌কাইয়া উঠিয়া বলিল—'সাপ।' প্রায় ছোট একটি গাছের গুঁড়ির মত সাপ খুব ধীরে ধীরে চলিয়াছে। তাহারই চলিবার পথে শুক্‌না সেগুনগাছের পাতায় খড় খড় করিয়া শব্দ উঠিয়াছে। সকলেই একটু তফাতে থাকিয়া উৎসুকভাবে সাপ দেখিতে লাগিল। এদিকে ঘন বনের মধ্যে শুভ্র বৃদ্ধ কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল, সেদিকে কাহারও দৃষ্টি পড়ে নাই। সাপটি জঙ্গলের মধ্যে চলিয়া গেলে পাঁচজনেই চকিত হইয়া দেখে বৃদ্ধ নাই। তখন তাহারা একটু দিশাহারা হইয়া পড়িল। শৈলেন বলিল, 'ঠিক বুঝতে পারছি নে। বুড়োটা কোথায় গেল ? নিশ্চয়ই আমরা পিছু পিছু আসছি মনে করে আগিয়ে গেছে। এস দেখা যাক।' সকলে শৈলেনকে আগাইয়া দিয়া তাহার পিছনে চলিতে লাগিল। কিছুদূর আগাইয়া গিয়া দেখে একটি হাত-কাটা জামা গায়ে দিয়া একজন আধাবয়সী লোক একটি লম্বা লগি দিয়া কি যেন পাড়িতেছে। তাহার লগির তাড়নায় ধুপ-ধাপ করিয়া নীচে যাহা পড়িতেছে, সেগুলি বড় একটি টর্চের আলোয় দেখিয়া দেখিয়া সে একটি ঝুড়িতে তুলিতেছে। তাহাদের আসিতে দেখিয়া লোকটি হঠাৎ লগিটা ফেলিয়া দিয়া বলিল, 'কি চাও তোমরা ? এখানে কেন ?'

'আমরা এমনি বেড়াতে এসেছি। এখান দিয়ে বাঁশী হাতে কোনো বুড়ো মানুষকে যেতে দেখেছ ?'

'কৈ না। এখানে আবার বুড়ো কোথায় ? আমরা দু'তিন ঘর লোক এখানে থাকি। বুড়ো টুড়ো কেউ নেই।'

সকলে অবাক হইয়া পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল। অমল অস্ফুটস্বরে বলিল, 'বিপদি দৈত্যম।' পরে উচ্চৈঃস্বরে বলিল।

'সে যাই হোক্, তোমরা আমাদের আজ রাত্রের মত একটু আশ্রয় দিতে পারো ?'

'খুব, খুব। তবে খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট হবে তোমাদের। তা' তোমরা কোথা' থেকে আসছ ? পরিচয়টা না জানলে ত সুবিধে হবে না।'

শৈলেন সব কথা খুলিয়া বলিল। টর্চের আলো তাহাদের মুখে ফেলিয়া লোকটি একে একে সবাইকে একবার দেখিয়া লইল। তাহারই অস্পষ্ট আলোয় শৈলেন লোকটির দিকে একবার চাহিয়া বিহ্বল হইয়া গেল। অমন নিষ্ঠুর, কুটিল মুখ সে জীবনে কখনো দেখে নাই। লোকটি অল্প একটু হাসিয়া বলিল, 'কি খাবে তোমরা ? পেঁপে খাবে ? এই দেখ, এ সব পাকা পেঁপে। খেতে

পারো যত ইচ্ছে। আর একটু দূরেই আমি থাকি। তোমরা একটু ডাকলেই মিষ্টি আর জল নিয়ে আসব। তারপর তোমাদের থাকবার ব্যবস্থা করে দেব। কিন্তু এখানে ভারি ভয়। খুব সাবধানে থাকতে হবে।'—এই কথা বলিয়া লোকটি এক ঝুড়ি পাকা পেঁপে ছেলেদের সম্মুখে আগাইয়া দিল।

অশ্বিনী বলিল, 'তোমার টর্চটা এখানে রেখে যাও। সব ব্যবস্থা হ'য়ে গেলে তারপর ওটা নিয়ে যাবে।'

'নিশ্চয়-নিশ্চয়'—বলিয়া লোকটি টর্চ অশ্বিনীর হাতে দিয়া ধীরে ধীরে বনান্তরালে চলিয়া গেল।

টর্চের আলো মাঝখানে রাখিয়া সকলে পেঁপে খাইতে বসিয়া গেল। দুর্গের প্রকাণ্ড ভাঙা প্রাচীরও সে আলোয় দেখা যাইতে লাগিল। খাওয়া শেষ করিয়া পাঁচজনেই হাত তালি দিয়া আর চীৎকার করিয়া লোকটিকে ডাকিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরেই লোকটি এক বাল্‌তি জল আর একটি ঘটি লইয়া সেখানে আসিল। জল পানান্তে পাঁচজনে লোকটিকে বলিল—'চলো'। লোকটি টর্চের আলো ফেলিয়া দুর্গের প্রাচীরের দিকে চলিতে লাগিল। যাইতে যাইতে অমল বলিল, 'আজ দেখছি অদৃষ্টে ফলাহার।'

অশ্বিনী বলিল, 'আরও কি আছে অদৃষ্টে কে জানে?'

* * *

লোকটি সেই অন্ধকার রাত্রে তাহাদের যেখানে লইয়া আসিল, সেখানে বনের চিহ্নমাত্র নাই। শুধু ঘাসে ঢাকা উঁচু পাঁচিল। আর তাহারই গায়ে অন্ধকার সুড়ঙ্গের মত ঘর। তাহারই মধ্যে টর্চের আলো ফেলিয়া লোকটি বলিল, 'এইখানে থাকো তোমরা রাত্রে। দরকার হ'লে হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে ডেকো। টর্চটা তোমাদের দিয়ে গেলাম। সুড়ঙ্গের মধ্যে বেশী দূর যেয়ো না। আচ্ছা আসি তা হ'লে—'বলিয়া সে যেমন আসিয়াছিল, তেমনি চলিয়া গেল। অন্ধকারের মধ্যে সে তাহার চেনা পথে চলিয়া গেল। মনে হইল, মুহূর্তের মধ্যে সে যেন ছায়া-মূর্তির মত অদৃশ্য হইয়া গেল।

পাঁচজনেরই ভয়ে বুক দুরু-দুরু করিতেছিল। সুনীল হাসিয়া বলিল, 'একেবারে সুড়ঙ্গ-সমাধি।' তাহারা কেহই সুড়ঙ্গের মধ্যে গেল না। বাহিরে ফাঁকা হাওয়ায় ঘাসের উপর পা ছড়াইয়া গাছের ডাল ভাঙা লাঠিগুলি পাশে রাখিয়া টর্চটা নিবাইয়া শুইয়া পড়িল। পরিশ্রান্ত দেহ; ঘুম আসিতে দেরী হইল না। শৈলেনের কৌতূহল বেশী। শুধু তাহারই চোখে ঘুম নাই। মাঝে মাঝে কালপেঁচার অতি বিকট কর্কশ শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে। আর এক সঙ্গে অনেকগুলি বাদুড় বা চামচিকা জাতীয় পাখী সুড়ঙ্গের মধ্য হইতে বাহির হইয়া পাখা ঝটপট করিতে করিতে তাহাদের মাথার উপর দিয়া উড়িয়া যাইতে লাগিল। তাহাদের পিছনেই অন্ধকার সুড়ঙ্গ যেন এক অজ্ঞাত দানবের মত তাহাদিগকে গ্রাস করিবার জন্য উদ্যত হইয়া আছে। শৈলেনের চোখে ঘুম আসিল না। সে টর্চ টিপিয়া তাহারই আলোকে আরও একটু দূর আগাইয়া গেল। দেখিল, পাঁচিলের গা বাহিয়া সারি সারি অনেক সুড়ঙ্গ। এইবার সে পাঁচিল বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। অনেক উঁচু পাঁচিল, স্থানে স্থানে ভাঁট, উলুখড়ের ঝোপ। সেইগুলি ধরিয়া ধরিয়া সে পাঁচিল বাহিয়া উঠিতে লাগিল। অনেক পরিশ্রমের পর সে পাঁচিলের উপরে উঠিয়া দেখে নীচে গভীর খাদ। বোধ হয় সেই খাল—দুর্গে আসিবার পথে যেটি তাহারা দেখিয়া আসিয়াছিল সেইটি। খালের পারে ঝোপঝাড়, আর তাহার পরেই এক বিশাল নদী বহিয়া যাইতেছে। অন্ধকারেও তাহা নদী বলিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং শৈলেন অনুমানে বুঝিল, পাশেই গঙ্গা। একটা শীতল বাতাস নদীর উপর দিয়া বহিয়া আসিতেছে। তাহাতে ভিজা শেহলার গন্ধ। আকাশে মিট্‌মিট্‌ করিতেছে অগণ্য তারা। বাবলা আর ঝাউএর বনের মৃদু বাতাসে সর্‌ সর্‌ মর্‌ মর্‌ শব্দ হইতেছে। শৈলেন মুগ্ধ দৃষ্টিতে এই উদার সৌন্দর্য দেখিতেছিল। কিন্তু তাহার পায়ের চাপে কখন যে ঝুর্‌ ঝুর্‌ করিয়া মাটি খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে, সে খেয়াল তাহার নাই। অন্যমনস্কভাবে একটু সরিয়া দাঁড়াইতেই ঝুপ করিয়া একটি শব্দ হইল। সঙ্গে সঙ্গে একটি আর্ত চীৎকারে শৈলেন পাঁচিলের উপর হইতে অদৃশ্য হইল।

* * *

সেই চীৎকারে প্রথম ঘুম ভাঙিল সুনীলের। জাগিয়া দেখে, পাশে শৈলেন নাই। টর্চ খুঁজিল, টর্চও নাই। তখন সে ব্যাকুল হইয়া বাকী তিনজনকে উঠাইল।

'শৈলেন, শৈলেন করিয়া তাহারা অনেক ডাকিল। কোনো সাড়া পাইল না। তখন হেমকান্তি বলিল, 'আমার বিশ্বাস, সে টর্চ নিয়ে সুড়ঙ্গে ঢুকেছে—চলো আমরাও দেখি।'

অশ্বিনী বলিল, 'কি বিপদ বলো দেখি। আলো না নিয়ে সুড়ঙ্গে যা'বে কি ক'রে? তার চেয়ে সেই লোকটাকে হাততালি দিয়ে আর চেঁচিয়ে ডাকা যাক্।' এই কথায় খানিকক্ষণ তাহারা নিরুপায়ভাবে হাততালি দিয়া আর গলা ফাটাইয়া চীৎকার করিতে লাগিল। বিশেষ ফল হইল না। তখন দেরী করা বৃথা মনে করিয়া তাহারা একে একে সুড়ঙ্গে ঢুকিয়া পড়িল। সুড়ঙ্গের নির্দিষ্ট পথে চলিবার কোনো অসুবিধা নাই। যতদূর ইচ্ছা চলো—কিন্তু যদি পথ হারাইয়া ঘুরিতে থাকো, তাহা হইলেই বিপদ। 'শৈলেন' বলিয়া একবার ডাকিতেই গম গম্ করিয়া সেই আওয়াজ সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সেই শব্দে সচকিত হইয়া কতকগুলি চামচিকা সবেগে ঘুরিতে ঘুরিতে তাহাদের মাথার উপর দিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। অনির্দেশ সুড়ঙ্গের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে চারজনের দম বন্ধ হইবার জোগাড় হইল। হেমকান্তি বলিল, 'চলো, বেরিয়ে যাই।' অশ্বিনী বলিল, 'ব্যস্ত হ'য়ো না।'—বলিয়া সে আগে আগে চলিতে লাগিল। রাত্রি কত বুঝিবার উপায় নাই। ভীষণ অন্ধকার। মাঝে মাঝে কোথা হইতে টুপ্ টুপ্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছে। সেই অবস্থায় মাঝে মাঝে 'শৈলেন' 'শৈলেন' করিয়া চীৎকার আর অনির্দিষ্ট পথের গোলক ধাঁধাঁয় ঘুরিয়া মরা। কিন্তু উপায় কি? পাঁচজনে একসঙ্গে আসিয়া একজনকে কি এখানে রাখিয়া যাইতে হইবে? এই ভাবনার বেগে তাহারা চলিতেছিল। যখন পথ আর শেষ হইল না, তখন সকলেই একসঙ্গে বাহির হইতে চাহিল। কিন্তু সুনীল বলিল, 'যদি বেরুতে গিয়েও পথ না পাওয়া যায়, তা হ'লে?' এই কথায় চার জনেরই মাথা একসঙ্গে ঘুরিয়া উঠিল। অশ্বিনী বলিল, 'বেশ স্থির হ'য়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যাক্।' তখন আর তাহাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বলিয়া কিছু নাই। কিছুক্ষণ পরে উল্টামুখে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া তাহারা আবার চলিতে লাগিল। চলিতে আরম্ভ করিয়াছে এমন সময়ে দপ্ করিয়া তাহাদের সম্মুখে একটা আলো জ্বলিয়া উঠিল। তাহারা সবিস্ময়ে দেখিল, পূর্বের সেই বাঁশী বাজিয়ে শুভ্র বৃদ্ধ একটি মশাল হাতে তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া। বৃদ্ধ কিছু বলিল না, শুধু ইঙ্গিতে জানাইল, 'এস।'

* * *

শৈলেন যেখানে ছিটকাইয়া আসিয়া পড়িল, সেখানে গভীর খাদ। জল আর কাদায় সে স্থানটি এমন চমৎকার যে, শৈলেন সেখানে পড়িয়াই একেবারে কোমর পর্যন্ত কাদায় ডুবিয়া গেল। সে আর কোনো চেষ্টা করিল না। ঠাণ্ডা কাদার মধ্যে যখন তাহার শরীর একেবারে শিথিল অবশ হইয়া আসিতে লাগিল, তখন সে একটি পা তুলিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু বৃথা চেষ্টা, আর একটি পা আবার বেশী করিয়া কাদায় পুঁতিয়া যাইতে লাগিল। দূরে কাদার মধ্যে কি একটা চক্ চক্ করিতেছে না! দপ্ করিয়া একবার জ্বলিয়া উঠিয়া সেটি আবার নিবিয়া গেল। শৈলেন ভয় পাইল না। সে জানে যে, জলাভূমির বিষাক্ত বাষ্পে 'আলেয়া' হয়। কিন্তু দপ্ করিয়া তাহা আবার জ্বলিয়া উঠিল। শৈলেন সভয়ে সবিস্ময়ে দেখিল, সেই আলেয়া তাহার দিকে আগাইয়া আসিতেছে। আলেয়া আগাইয়া আসিল। শৈলেন ভাবিল, কাদা ছুঁড়িয়া নিবাইয়া দিবে। নড়িবার তাহার উপায় নাই। সুতরাং যাহা হয় হোক্, এই ভাবিয়া সে চুপ্ করিয়া রহিল। আলো যখন সম্মুখে, তখন সে অবাক হইয়া দেখিল,—সেই শুভ্র বাঁশী বাজিয়ে বৃদ্ধ—এক হাতে মশাল, আর একটি হাত শৈলেনের দিকে প্রসারিত, মৃদুকণ্ঠে বৃদ্ধ বলিল, 'হাত ধরো'।

* * *

মশাল হাতে লইয়া বৃদ্ধ চলিয়াছে। পিছনে পিছনে চারজন নির্বাক্ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া চলিয়াছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক সুড়ঙ্গের মধ্যে চলিয়া তাহারা বুঝিতে পারিল, সুড়ঙ্গের শেষ হইয়াছে। কোথা হইতে অতি শীতল বায়ু-স্রোত আর ভিজা শেহলার গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে। বৃদ্ধ পিছন ফিরিয়া চাহিল না। শুধু বলিল, 'সামনেই নদী। সুড়ঙ্গ একেবারে নদী পর্যন্ত।' এক কথা বলিতেই, তাহারা দেখিল, প্রায় তাহারা সুড়ঙ্গের বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। সম্মুখেই বিশাল নদী—তাহারই কলধ্বনি তাহাদের কানে

আসিয়া বাজিতে লাগিল। একটা দমকা হাওয়ায় মশাল নিবিয়া গেল। একঝাঁক নিশাচর পাখী তাহাদের মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল—তাহাদের পাখার ধ্বনি যেন মানুষের হা-হা হাসির মত মনে হইতে লাগিল। তাহারা সম্মুখে চাহিয়া দেখিল, বৃদ্ধ নাই। তাহার স্থানে নদীর জলস্রোত তটে আসিয়া লাগিতেছে। সেই অদৃশ্য বৃদ্ধের কথা তাহাদের বড় রহস্যময় বলিয়া মনে হইতে লাগিল। অশ্বিনী বলিল, 'পরে ভাবা যা'বে, এখন শৈলেনের খবর নেওয়া দরকার।' এই কথায় নদীর ধারে ধারে তাহারা নির্বাক্ নিঃশব্দে চলিতে লাগিল।

*   *   *

শৈলেন দেখিল, হাতখানি বড় শীতল। ঠাণ্ডা কাদাও বোধ হয় অত শীতল নয়। যাহাই হউক সে হাতখানি জোরে চাপিয়া ধরিয়া কাদার মধ্য দিয়া চলিতে লাগিল। বৃদ্ধ বলিল, 'ভালো কাজ কর নি। এইবার বুঝেছ ত?

শৈলেন ঘাড় কাত করিয়া বলিল, 'হাঁ, খুব বুঝেছি।' অল্পক্ষণ পরেই সে জমির চড়াই-উৎরাই পার হইয়া যেখানে আসিয়া দাঁড়াইল, সেখান পাঁচিল-হইতে-দেখা নদী বেশী দূর নয়।

'এটা কি গঙ্গা?'—শৈলেন জিজ্ঞাসা করিল।

'হাঁ, এটা গঙ্গা।'—উত্তর আসিল।

'আপনি আমাদের বনের মধ্যে রেখে কোথায় গেলেন?'

'কোথাও ত যাই নি। তোমরা আমাকে পেঁপে পাড়তে দেখো নি?'

শৈলেন সম্মুখে একটু ঝুঁকিয়া অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিতে গেল। মশাল নিবিয়া গেল, আর জমাট অন্ধকারের মধ্যে নদীর কল্লোল যেন অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিল। সে ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিল,—একেবারে নদীর ধারে আসিয়া পড়িয়াছে। টর্চটি তাহার হাত হইতে বহুক্ষণ পড়িয়া গিয়াছে। নদীর ধারে ধারে কাহারা যেন কলরব করিতে করিতে আসিতেছে। আর বৃদ্ধ সেই রাত্রির অন্ধকার-রহস্যের মত কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে।

সুনীলের গলা বেশ স্পষ্ট শোনা গেল—'ফেরারী আসামী। ভূত না আরো কিছু।'

শৈলেন যেন অকূলে কূল পাইল। সে চীৎকার করিয়া বলিল, 'সুনীল, আমি শৈলেন, এখানে—তোমরা এদিক্ দিয়ে এসো।'

'শৈলেন, তুই বেঁচে আছিস্।'—বলিয়া বাকী চারজন সোৎসাহে তাহার দিকে আগাইয়া চলিল। রাত্রির অন্ধকার তখন লঘু হইয়া আসিতেছে। অনেকদূরে ষ্টীমারের বাঁশী যেন বাজিয়া উঠিল।

শেষ

জব্দ করার প্রতিযোগিতা

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সুকুমার আর পঞ্চানন পরস্পরের প্রাণের বন্ধু অথবা পরম শত্রু, এটা সাধারণ মানুষের পক্ষে ঠিক করে বলা কঠিন। মনস্তত্ত্বে যাদের অসাধারণ পাণ্ডিত্য তাদের পক্ষেও এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া সহজ হবে কিনা সন্দেহ। অনেকদিন থেকেই দু'জনের মধ্যে ভাব আছে, দু'জনে গল্প করে, তর্ক করে, বেড়াতে যায়, সিনেমায় যায়—আবার সুযোগ পেলেই পরস্পরকে জব্দ করে। সময় সময় একজনকে জব্দ করার জন্য অপরজন সুযোগ সৃষ্টিও করে নেয়।

কতদিন থেকে যে তারা এ'ভাবে পরস্পরকে জব্দ করে আসছে দু'জনের একজনও বোধ হয় স্মরণ করতে পারবে না। এ পাগলামী তাদের কেন পেয়ে বসল তাও তারা বলতে পারবে না। এখন ব্যাপারটা দু'জনের কাছেই দাঁড়িয়ে গিয়েছে অনেকটা প্রতিযোগিতায়। দু'জনকে প্রশ্ন করলে দু'জনেই জবাব দেয়, 'ও আমায় জব্দ করেছে, আমি ওকে জব্দ করব না?'

ছেলেবেলা হয়তো নিছক ছেলেমানুষী খেয়ালের বশেই একজন আর একজনকে একটু জব্দ করেছিল, বাস্, সেই থেকে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে। এখন তারা বড় হয়েছে, কলেজে ছাত্রজীবন প্রায় শেষ হয়ে এল, এখনও কিন্তু সে প্রতিযোগিতার অন্ত হল না। কি করেই বা হবে? এতো আর সাধারণ লড়াই নয় যে কোন পক্ষ হার না মানলেও দু'পক্ষের মধ্যে একটা বোঝাপড়া করে লড়াই বন্ধ করা সম্ভব হবে। এদের লড়াই যখনি বন্ধ হোক, তখনকার অবস্থাটা হবে এই একজন জব্দ হয়েছে, আর একজন জব্দ করেছে। কাজেই, একজন যদি জব্দ হওয়াটা হজম না করে, এদের যুদ্ধ কোনদিন শেষ হবে না। কে জানে, বুড়ো বয়সে একজনকে জব্দ করেই যদি অপরজন ফাঁকতালে মরে যায়, প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ না দিয়ে তাহ'লে অন্য যে বেঁচে থাকবে সেও হয়তো রাগের চোটে হার্ট ফেল করে সঙ্গে সঙ্গে মরে যাবে। তারপর স্বর্গে গিয়েও দুজনের প্রতিযোগিতা চলবে কিনা; মর্ত্যের মানুষের পক্ষে সে বিষয়ে গবেষণা না করাই ভাল।

কলেজে কয়েকজন বন্ধুর কাছে সুকুমারকে পঞ্চানন মাস তিনেক আগে বড় হাস্যাস্পদ করেছিল। এতদিন সুকুমার প্রতিশোধের সুযোগ পায়নি।

সম্প্রতি পঞ্চাননের জ্বর হওয়ায় সপ্তাহ খানেক কলেজ যায়নি। আজ সে ভাত খেয়েছে এবং ঠিক করেছে পরদিন কলেজ যাবে। আজই সে যেত, কলেজ কামাই করতে তার ভাল লাগে না, কিন্তু বাড়ীর সকলে নিষেধ করাতে বিশেষ করে সকালে এসে সুকুমার পর্যন্ত বারণ করায় আজ কলেজ যাওয়াটা সে বন্ধ রেখেছে। সুকুমারের দরদ দেখে পঞ্চাননের মনটা খুব ভিজে গেছে। মনে মনে সে ঠিক করে ফেলেছে, সুকুমার যদি আর কিছু না করে, তাহ'লে সেও আর সুযোগ পেলেও তাকে কখনো জব্দ করার চেষ্টা করবে না।

বিকালে পঞ্চানন যখন এই সব কথা ভাবছে, সুকুমার এল। বলল,—'কিরে, মিটিং-এ যাবি নাকি?'

'কিসের মিটিং?'

'তুই জানিস্ না? সেই লাইব্রেরীর ব্যাপার নিয়ে।'

কলেজের লাইব্রেরীতে বই-এর অভাব, লাইব্রেরীতে বসে পড়বার জন্য ভাল ব্যবস্থার অভাব, বই দেওয়া-নেওয়ার গোলমেলে ব্যবস্থা, এসব বিষয়ে কলেজের ছেলেদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের কিছুদিন থেকে গোলমাল চলছিল। পঞ্চানন ছিল ছেলেদের পক্ষ থেকে এই

গোলমাল চালানোর অন্যতম পাণ্ডা। খবর শুনে তার অভিমানের সীমা রইল না।

'লাইব্রেরীর ব্যাপার নিয়ে মিটিং, আর ছেলেরা আমায় একটা খবরও দেয়নি।'

সুকুমার সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'জ্বরে ভুগছিস, খবর দেবে কি? তোর জন্য সবাই আপশোষ করছিল, তুই থাকলে মিটিংটা বেশ জোরালো হ'ত।'

সে বিষয়ে পঞ্চাননেরও কোন সন্দেহ নেই। বসে বসে সে ভাবতে থাকে, লাইব্রেরী সংস্কারের আন্দোলনটা এক রকম সেইই আরম্ভ করেছিল, আজ তার অনুপস্থিতিতে ছেলেরা দাবীগুলি রিজোলিউসনে পরিণত করতে গিয়ে হয়তো গোলমাল করে ফেলবে। সে যদি যুক্তিতর্ক দিয়ে সমর্থন না করে, সকলকে যদি বুঝিয়ে না দেয় যে দাবীগুলি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তাদের কত বড় অন্যায় মেনে চলতে হচ্ছে, দাবীগুলো হয়তো ফসকেই যাবে।

পঞ্চানন হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। 'চল, আমিও যাব।'

সুকুমার হেসে বলল, 'বোস্, বোস্ এখনো তো দেরী আছে। কি বলবি একটু ভেবেচিন্তে ঠিক করে নে—না, না সব বক্তৃতাটা লিখে নিতে বলছি না, শুধু পয়েন্ট-গুলি গুছিয়ে একটা কাগজে নোট্ করে নে। এতো আর এমনি বাজে মিটিং নয়, লাইব্রেরীর এ্যানিভার্সারি।'

মিটিংটা যে সত্যই যেমন তেমন বাজে মিটিং নয়, কলেজে পৌঁছেই পঞ্চানন তা টের পেল। বড় লেক্‌চার হলটিতে ভিড় করে ছেলেরা জমা হয়েছে, প্রায় সমস্ত প্রফেসারই উপস্থিত আছেন, স্বয়ং প্রিন্সিপ্যাল পর্যন্ত সশরীরে বর্তমান। ছেলেদের লাইব্রেরী সভায় এদের এরকম সদলবলে উপস্থিত থাকতে দেখে পঞ্চানন একটু আশ্চর্য হয়ে গেল।

সুকুমার বলেছিল, মিটিং আরম্ভ হতে দেরী আছে। কিন্তু বোঝা গেল, মিটিং অনেকক্ষণ আরম্ভ হয়ে গেছে। একজন প্রফেসার বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, পঞ্চানন আর সুকুমার তখন একেবারে সামনে গিয়ে বসবার উপক্রম করছে। প্রফেসার বক্তৃতা শেষকরে বসে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে সুকুমার জোর গলায় ঘোষণা করল, 'প্রেসিডেণ্টের অনুমতি নিয়ে আমি শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চৌধুরীকে কিছু বলতে অনুরোধ জানাচ্ছি। এই বিশেষ অনুরোধ জানাবার কারণ, আমাদের আলোচ্য বিষয়ে পঞ্চাননবাবুর বলার অধিকার সকলের চেয়ে বেশী। পঞ্চাননবাবু সেই মহা-পুরুষের নিকট আত্মীয়, সমস্ত জীবন যিনি জ্ঞানের অনুসরণ করেছেন, যার বাড়ীর প্রাইভেট লাইব্রেরীর সঙ্গে অনেক পাবলিক লাইব্রেরীরও তুলনা হয় না।'

সুকুমার বসতেই পঞ্চানন চাপা গলায় বলল, 'তুই কি পাগল হয়ে গেছিস?'

পঞ্চাননের বৌদির দাদামশায়ের ভাই একজন বিখ্যাত পুরুষ ছিলেন, তাঁর একটি প্রকাণ্ড লাইব্রেরীও ছিল। কিন্তু কলেজ লাইব্রেরীর প্রয়োজনীয় সংস্কার সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়ার বিশেষ অধিকার সেজন্য তার জন্মাবে কেন? পঞ্চানন ভেবে পেল না। মাঝে মাঝে সুকুমার এমন উন্মাদের মত কাজ করে বসে। যাই হোক, সুকুমারকে ভর্ৎসনা করবার সময় ছিল না। বক্তৃতা দেওয়ার জন্য পঞ্চাননকে উঠে দাঁড়াতে হল। প্রথমে সে আরম্ভ করল ছাত্রজীবনে লাইব্রেরীর প্রয়োজনীয়তার কথা নিয়ে তারপর গলা আরও চড়িয়ে বলতে লাগল তাদের কলেজ লাইব্রেরীর শোচনীয় দুরবস্থার কথা—আর সেই সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে দিতে লাগল লাইব্রেরীকে এভাবে অবহেলা করবার জন্য কলেজের কর্তৃপক্ষকে খোঁচা।

সকলে নিঃশব্দে মনোযোগ দিয়ে পঞ্চাননের বক্তৃতা শুনছিল। প্রথমটা সকলের মুখে দেখা গেল একটা বিস্ময়ের ভাব, তারপর সকলে যেন হতভম্বের মত পঞ্চাননের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর আরম্ভ হল ছাত্রদের মধ্যে গোলমাল।

প্রিন্সিপ্যাল তীব্র গলায় বললেন, 'এটা পাগলামী করবার যায়গা নয় পঞ্চানন। লাইব্রেরীর কথা বলার কি তুমি আর সুযোগ পাবে না যে আজ একজন মহাপুরুষের স্মৃতিসভায় যা-তা বকতে আরম্ভ করেছ?'

ছেলেদের নানারকম টিট্‌কারী কানে আসছিল। পঞ্চানন একবার সুকুমার যেখানে বসছিল সেদিকে তাকিয়ে দেখলে। সুকুমার আগেই কোন ফাঁকে উঠে পালিয়ে গেছে। সভার মধ্যে ব্যাভ্রম হয়ে মাথা নীচু করে পঞ্চানন ধীরে ধীরে হল থেকে বেরিয়ে গেল।

জীবনে কখনো পঞ্চানন এরকম জব্দ হয়নি। কলেজে

কি করে মুখ দেখাবে ভেবে না পেয়ে সে ক'দিন কলেজ যাওয়াই বন্ধ রাখল। মনের মধ্যে কেবলি ঘুরপাক খেতে লাগল একটিমাত্র চিন্তা,—প্রতিশোধ চাই, এ অপমানের প্রতিশোধ চাই।

সুকুমারের সঙ্গে দেখা হল দিন সাতেক পরে। পঞ্চানন সহজভাবেই বল্‌ল, 'কিরে কেমন আছিস্ সুকুমার!'

সুকুমারও সহজভাবেই বল্‌ল, 'কিরে ভাল আছিস ত' পঞ্চু।'

হাতে কিছু কাজ না থাকায় দু'জনে সিনেমায় গেল। দু'জনের ভাব দেখে কে কল্পনা করতে পারবে তাদের একজন ভাবছে কি করে অপর জনকে অপদস্থ করা যায় এবং অপরজন ভাবছে কোন দিক থেকে কি ভাবে আক্রমণ আসবে।

দু'জনেই অভিজ্ঞ ও দক্ষ লড়ায়ে এবং সুসময়ের জন্য অপেক্ষা করতে জানে। দিন কাটতে কাটতে মাস কেটে গেল, পঞ্চাননের দিক থেকে প্রতিশোধের কোন আয়োজন দেখা গেল না।

এমন সময় দিন সাতেকের জন্য কলেজ বন্ধ হল। ছুটির আগের দিন সুকুমার বলল, 'কাল পাটনায় যাচ্ছি। যাবি?'

পঞ্চানন ঘাড় নেড়ে বললে—'না, তুই কদিন থাকবি?'

'ছুটির ক'টা দিন থাকব, আবার কদিন?'

সুকুমারের কাকা যাদববাবু পাটনায় ডাক্তারী করেন। পরদিন সুকুমার তার কাকার কাছে ছুটিটা কাটাবার জন্য রওনা হয়ে গেল। পঞ্চাননের এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়ও পাটনায় থাকেন, দু'দিন পরে পঞ্চাননও তার দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়ী বেড়াতে গেল।

কোনদিন যে চিঠিপত্রও লেখে না, বিনা খবরে তার আকস্মিক আবির্ভাবে আত্মীয়টি একটু চমকে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'হঠাৎ?'

'অনেকদিন থেকে পাটনায় বেড়াতে আসব ভাবছিলাম, কদিন ছুটি পেয়ে হঠাৎ মনে হল আপনারা যখন আছেন—'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়—আসবে বৈকি—বেশ করেছো। তোমার বাবার শরীর ভাল তো?'

পরদিন থেকেই পঞ্চানন একেবারে ডিটেক্‌টিভ গল্পের ডিটেক্‌টিভের মত নিজে আড়ালে থেকে যাদব ডাক্তারের সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় করতে আরম্ভ করল।

বছর পঞ্চাশেক বয়েস, দেখলেই বোঝা যায় লোকটি খুব ভালমানুষ। কৌশলে আত্মীয়টির কাছে খবর নিয়েও পঞ্চানন জানতে পারল, লোক হিসাবে যাদব ডাক্তার সত্যই খুব সাধাসিধে, অমায়িক ও পরোপকারী, তবে ডাক্তার হিসাবে তেমন পশার নেই। বোধ হয় ভালমানুষ বলেই।

একটা গোটা দিন খবর সংগ্রহের কাজে ব্যয় করে পরদিন সকালে পঞ্চানন যাদব ডাক্তারের বাড়ীর কাছে একটা মুদীর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে রইল। সুকুমার যদি ইতিপূর্বেই বেড়াতে বেরিয়ে না গিয়ে থাকে হঠাৎ বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসে, দোকানের ভিতরে ঢুকে আত্মগোপন করা চলবে। মিনিট পনের দাঁড়িয়ে থাকার পর যাদব ডাক্তারের বাড়ী থেকে সাত আট বছরের একটি খাকি প্যাণ্ট পরা ছেলে লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে এল। পঞ্চানন তৎক্ষণাৎ তাকে পাকড়াও করলে।

'খোকা শোনো, তুমি ডাক্তারবাবুর ছেলে—না? কলকাতা থেকে তোমার যে দাদা এসেছে, সে বাড়ী আছে?'

খোকা সবেগে মাথা নেড়ে জানালে—'না'।

'তোমার দাদা কবে কলকাতা যাবে?'

'পরশু। তুমি কে?'

'আমি? আমি একজন লোক। ডাক্তারবাবু বাড়ী আছেন?

'আছেন, তুমি যাও না।'—বলে লাফাতে লাফাতে খোকা সবেগে প্রস্থান করল।

যাদব ডাক্তার বাইরের বসবার ঘরের একপাশে আড়াইটি ওষুধের আলমারিওয়ালা ডিস্‌পেনসারীতে বসে রোগীর প্রতীক্ষা করছিলেন।

ঘরে ঢুকেই পঞ্চানন গভীর ব্যাকুলতার সঙ্গে বলল, 'ডাক্তারবাবু, কি উপায় হবে? আমার ছোট ভাই হঠাৎ পাগল হয়ে গেছে। একটা ওষুধ দিন।'

যাদব ডাক্তার বললেন, 'বসুন, বসুন। ব্যস্ত হবেন

না। কে আপনার ছোট ভাই? না দেখে ওষুধ দেব কি করে?'

একটা আধ-ভাঙা চেয়ারে বসে পড়ে পঞ্চানন হতাশ ভাবে বলল, 'তাইতো, এটাতো আমার খেয়াল হয় নি। যা বিপদটা ঘটল হঠাৎ, নিজেরও কি মাথার ঠিক আছে। ক'দিন আগে ছেলেটা এল কলকাতা থেকে, দিব্যি ভাল ছেলে, পাগলামীর কোন চিহ্ন নেই, কাল হঠাৎ মাথাটা বিগড়ে গেল।'

যাদব ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন, 'তারপর?'

পঞ্চানন তার কাল্পনিক ভাইএর পাগল হওয়ার কয়েকটা লক্ষণ বর্ণনা করল। শুনে যাদব ডাক্তার বললেন, 'নার্ভাস ব্রেক ডাউন মনে হচ্ছে। একবার দেখা দরকার। ওকে তো আনা সম্ভব নয়, আমিই বরং একবার—'

পঞ্চানন বলল, 'তাই চলুন ডাক্তারবাবু। আমি একবার পোষ্টাপিস থেকে ঘুরে আসছি, একেবারে একটা গাড়ী নিয়ে আসব।' বলে হাত জোড় করে পঞ্চানন আবার বলল, 'দয়া করে আমার আর একটা কাজ করে দিতে হবে ডাক্তারবাবু।'

পঞ্চাননের ডান হাতের আঙুলগুলিতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ছিল, সেদিকে তাকিয়ে যাদব ডাক্তার বললেন, 'বলুন।'

'বাবাকে একটা খবর দেওয়া দরকার, কিন্তু নিজে চিঠি লিখতে পারছি না। কাল রাত্রে ওকে যখন সামলাচ্ছিলাম, একবার এমন জোরে হাতের আঙুলগুলিতে কামড়ে দিল— এখনো টনটন করছে। আপনি যদি আমার হয়ে একটা চিঠি লিখে দেন—'

যাদব ডাক্তার বললেন, 'বেশ তো। একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি, সে আর এমন কি ব্যাপার!'

পঞ্চানন বলতে লাগল এবং একটা সাদা প্যাডে যাদব ডাক্তার লিখতে লাগলেন।

• শ্রীচরণেষু,

আপনাকে বড়ই দুঃসংবাদ জানাইতেছি। শ্রীমান সুকুমার হঠাৎ—

যাদব ডাক্তার মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার ভাইএর নাম কি সুকুমার?'

পঞ্চানন বলল, আজ্ঞে 'না, শ্রীকুমার।'

'সুকুমার-এর 'সু'কে কালি বুলিয়ে 'শ্রী'তে পরিণত করে যাদব ডাক্তার আবার লিখতে লাগলেন:

—পাগল হইয়া গিয়াছে। কেন যে এরূপ হইল বুঝিতে পারিতেছি না। বোধ হয় অতিরিক্ত পড়াশোনা করার দরুণ। শ্রীমান কখনও শান্ত থাকিতেছে, কখনও ভয়ঙ্কর উগ্র হইয়া উঠিতেছে। শান্ত থাকিবার সময় এরূপ স্বাভাবিক ভাবে কথাবার্তা বলিতেছে যে তখন বুঝাই যায় না যে তাহার মস্তিস্ক বিকৃতি ঘটিয়াছে। উগ্রভাবের জন্য শ্রীমানকে বাধ্য হইয়া ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিতে হইয়াছে। গতকাল একবার স্বাভাবিক ভাবে সুস্থ ভালমানুষের মত কথাবার্তা বলায় এবং চালচলন দেখানয় তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। ছাড়িয়া দেওয়া মাত্র বঁটি লইয়া বামুন ঠাকুরকে কাটিতে গিয়াছিল। আমি না থাকিলে সর্বনাশ হইয়া যাইত। শ্রীমানকে সামলাইবার সময় সে আমার হাতে কামড়াইয়া দিয়াছে।

এখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছি, দুই চারিদিন দেখিয়া কলিকাতা লইয়া যাইব। কিন্তু কলিকাতায় লইয়া যাইতে ভরসা পাইতেছি না। কলিকাতায় একজন বন্ধু নাকি তাহার কি ক্ষতি করিয়াছে, শ্রীমান বলিতেছে কলিকাতা গিয়া তাহাকে হত্যা করিবে। এ অবস্থায় কি করিব জানাইবেন।

আমাদের সতর্কতা সত্ত্বেও শ্রীমান হয়তো লুকাইয়া কলিকাতা পলাইয়া যাইতে পারে, এইজন্য লিখি যে, তাহাকে দেখিবামাত্র আটকাইয়া রাখিবেন। দরকার হইলে বাঁধিয়া রাখিতেও কসুর করিবেন না। নতুবা সে কি সর্বনাশ ঘটাইয়া বসিবে কিছুই স্থিরতা নাই।

আরও লিখি যে, শ্রীমানের কথাবার্তা চালচলন দেখিয়া পাগল হইয়াছে মনে না হইলেও তাহাকে আটক রাখিবেন। পাগল হইলে নানারূপ চালাকি বুদ্ধি মাথায় আসে।

চিন্তা করিবেন না। শ্রীভগবানের কৃপায় শ্রীমান অবশ্যই শীঘ্র আরাম হইয়া যাইবে। ইতি—

প্রণতঃ—যাদব

যাদব ডাক্তার আবার মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার নাম যাদব?' পঞ্চানন বলল, 'আজ্ঞে না—মাধব।'

'ও।' বলে যাদব ডাক্তার 'যাদব'-এর 'য'কে কলমের খোঁচায় 'ম'তে পরিণত করে দিলেন।

চিঠিখানা বাঁ হাতে নিয়ে পঞ্চানন উঠে দাঁড়াল, বলল, আচ্ছা ডাক্তারবাবু আসি। নমস্কার।'

খামের ওপর সুকুমারের বাবার নাম ঠিকানা টাইপ করিয়ে পরদিন পঞ্চানন চিঠিখানা পোষ্ট করে দিল। তার পরদিন সুকুমারের সঙ্গে একগাড়ীতে কলকাতা রওনা হওয়ার আগে যাদব ডাক্তারের নাম দিয়ে সুকুমারের বাবার কাছে এই মর্মে একটি টেলিগ্রাম ক'রে দিল যে, 'সুকুমারের একটি বন্ধুর সঙ্গে সুকুমারকে কলিকাতা পাঠান হ'ল।'

মাঝের একটা ষ্টেশনে পঞ্চাননকে হঠাৎ তার কামরায় উঠতে দেখে সুকুমার যত না অবাক হয়েছিল তার চেয়ে ঢের বেশী অবাক হয়ে গেল সে হাওড়া ষ্টেশনে বাড়ীর প্রায় সকলকেই উপস্থিত দেখে। মায় বুড়ো পিসিমা পর্যন্ত।

সকলের ব্যবহারে, বিশেষ করে পিসির ব্যবহারে, বিস্ময় তার সীমা ছাড়িয়ে গেল। গাড়ী থেকে নামামাত্র পিসী তাকে বুকে জড়িয়ে কেঁদে উঠলেন, 'কেন তোর এমন হল বাবা।'

এত লোকের সামনে পিসির এই কাণ্ডে লজ্জা ও বিরক্তির বশে যেই সে পিসিকে একটু জোরের সঙ্গে ধাক্কামেরে ঠেলে দিয়েছে, পঞ্চানন তখন যে কাণ্ডটা করে বসল তাতে তার সীমা ছাড়ানো বিস্ময় মনের এমন একটা স্তরে পৌছে গেল, যেখানে মানুষ অন্ধকার দেখে থাকে। ছুটে এসে তাকে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরে পঞ্চানন তার বাবাকে বলল, 'শীগগির শীগগির ধরুন শক্ত করে। এতক্ষণ বেশ শান্ত ছিল, আবার আরম্ভ করেছে।'

এতক্ষণ যদিবা আরম্ভ করে নি, এইবার সুকুমার সত্যই আরম্ভ করে' দিল। রাগে প্রায় পাগল হয়ে গিয়ে মুক্তি-লাভের জন্য এমন ধস্তাধস্তি আরম্ভ করে দিল যে কারও আর সন্দেহ রইল না, যে সে সত্য সত্যই পাগল হয়ে গেছে।

দুজন কুলির সাহায্যে ও সকলের মিলিত চেষ্টায় জোর করে হাত-পা বেঁধে তাকে একটা ট্যাক্সিতে তুলে বাড়ী নিয়ে যাওয়া হল, একটা ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে শিকল তুলে দেওয়া হল। সুকুমার ভিতরে গজরাতে লাগল।

সুকুমারের মা আর পিসির কান্না দেখে পঞ্চাননের একবার মনে হল, এবার বোধ হয় একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছে। এতটা জব্দ না করলেও হ'ত। কিন্তু এতদূর এগিয়ে আর তো থামা যায় না।

কদিন ছুটির পর সেই দিন প্রথম কলেজ খুলেছে। ছুটির পর জনদশেক বন্ধুকে সঙ্গে করে পঞ্চানন সুকুমারের খবর নিতে গেল।

সুকুমারের বাবা সেদিন আপিস যাননি। তিনিই বললেন, 'ও ঘুমোচ্ছে।' পঞ্চানন জিজ্ঞাসা করল, 'ডাক্তার বাবু এসেছিলেন? কি বললেন?'

সুকুমারের বাবা বিরস মুখে জবাব দিলেন, ডাক্তার বাবুরাত বললেন বিশেষ কিছু হয় নি, সেরে যাবে। এখন আমার অদৃষ্ট। একটা ইনজেকসন দিয়েছেন, তারপর থেকেই ঘুমোচ্ছে।'

কয়েকদিন পরে কলেজে যেতেই প্রথম যে বন্ধুটির সঙ্গে দেখা হল, সে বলল, 'কিরে সেরে গেছিস?'

কিন্তু সুকুমার কোন জবাব দিল না। তারপর আরও কত বন্ধু ও চেনা ছেলে কতবার ওই ধরণের প্রশ্ন করল কিন্তু সে একটি কথাও বলল না। এমন কি একজন প্রফেসার পর্যন্ত যখন গভীর সহানুভূতির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিহে সুকুমার, মাথার গোলমালটা সেরে গেছে ত?' তখনও সে নির্বাক রইল।

খুব সম্ভব সে অন্যমনস্ক হয়ে ছিল। ভাবছিল, কি ভাবে পঞ্চাননকে জব্দ করা যায়।

ভ্রামরী

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অশোকনাথ শাস্ত্রী, বেদান্ততীর্থ, এম-এ, পি-আর-এস্

(রাজতরঙ্গিনী).

জুয়াখেলায় হার-জিৎ দুইই হ'তে পারে—এ একটা কথার কথা মাত্র। কারণ বেশীর ভাগ জুয়ার ভক্তকে সারাজীবন ধ'রে শুধুই হেরে যেতে দেখা যায়। আর সে জন্য মনে হয় যে, জুয়াচুরি ভিন্ন জুয়াখেলা অসম্ভব, অতএব এ সর্বনেশে খেলা থেকে দূরে সরে থাকাই ভাল। অথচ জুয়াড়ী যারা, তাঁরা হারতে হারতে পথের ভিখারী হয়ে দাঁড়ালেও এ নেশা জীবনে কখনও ছাড়তে পারেন না। আমাদের এই গল্পের নায়কও ছিলেন প্রাচীন ভারতের এমনই এক পাকা জুয়াড়ী। কিন্তু পাকা খেলোয়াড় হ'লে কি হয়, ভাগ্যের দোষে জুয়াখেলায় প্রতিবারই হেরে যেতে যেতে অবশেষে একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর অন্য অন্য জুয়াচোর মুখমিষ্টি বন্ধুরা যখন ষড়যন্ত্র করে তাঁকে পথে বসালেন, তখন তাঁর কেবলই মনে হতে লাগ্‌ল—"আর কেন? এবার আত্মহত্যা করে সব জ্বালা জুড়িয়ে দিই।"

প্রাণের মায়া তাঁর না থাক্‌লেও লাভের আশা তখনও তাঁকে একেবারে ছাড়ে নি। যারা পেশাদার জুয়াড়ী তারা শেষ নিঃশ্বাস ফেলা পর্যন্ত কিছু না কিছু একটা লাভের আশা আঁকড়ে ধরে থাকে।

এই জুয়াড়ীটি লোকের মুখে শুনেছিলেন যে, বিন্ধ্যাচলের কোন এক অতি দুর্গম ও গোপন জায়গায় দেবী দুর্গার ভ্রমরবাসিনী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। সে দেবীমূর্তি অত্যন্ত জাগ্রত। যদি কোন লোক জীবনে একবার সেই মূর্তি দর্শনের সৌভাগ্য পায়, তা হলে জীবনে তার আর কোন অভাবই থাকে না। কিন্তু দেবীর কাছে যাওয়া মানুষের পক্ষে এক রকম অসাধ্য। কারণ, প্রথমতঃ তাঁর মন্দিরের পথ প্রায় অধিকাংশ লোকেই জানে না, দ্বিতীয়তঃ সে পথ শোনা যায় যেমন দুর্গম তেমনই বিপদ আপদে ভরা। এই জুয়াড়ীটি নিজের জীবনের সব মায়া কাটিয়ে দেবীকে একবার দর্শন করবার জন্য আকুল হয়ে উঠ্‌লেন।

দেবী ভ্রমরবাসিনীর মন্দিরে পৌছতে হ'লে যে পথ ধরে চল্‌তে হ'ত, সে অতি দুর্গম পাহাড়ে রাস্তা। একে ত সে পথে জনপ্রাণীরও বাস ছিল না, তার উপর আবার বনের হিংস্র জন্তু জানোয়ারের ভয়ও যথেষ্টই ছিল। আর সবচেয়ে ভয়ানক কথা—ঐ পথের শেষ বিশ ক্রোশ ভ্রমরের ঝাঁকে ভরা ছিল। সে সব ভ্রমরেরা যে কত ভীষণ, তা আমরা এখন ভাবতেও পারি না। এক জাতের ভ্রমর ছিল, তাদের নাম 'শঙ্কুপুচ্ছ'—লোহার পেরেকের মত তাদের বিষাক্ত বড় বড় হুল। সে হুল ফোটালে মানুষের গায়ের নরম মাংস ত দূরের কথা লোহার পাত্‌ পর্যন্ত ছেঁদা হয়ে যেত।

জুয়াড়ীটি ভাবলেন, এ পথে দেবীদর্শনে যাত্রা করা আর জেনে শুনে যমের বাড়ীর দিকে রওনা হওয়া—একই কথা। ঐ সব শঙ্কুপুচ্ছ বজ্রপুচ্ছ ভ্রমরের দল যাতে তাঁকে খুব সহজে কাবু করতে না পারে—তার উপায় তিনি অনেক মাথা ঘামিয়ে ঠিক করে ফেললেন।

প্রথমে তিনি বেশ পুরু দেখে একখানি লোহার পাতের এমন একটি বর্ম তৈরী করালেন, যাতে তাঁর আপাদমস্তক ঢাকা পড়ল। তার উপর তিনি মহিষের চামড়া চার-পুরু করে সেলাই করে নিলেন। তার উপর গোবরমাটি মিশিয়ে বেশ পুরু করে প্রলেপ দিলেন। কাঁচা প্রলেপ রোদে শুকিয়ে নিয়ে তার উপর আবার প্রলেপ চাপালেন। এইভাবে উপরাউপরি বার সাতেক প্রলেপ দেবার পর তাঁর ঐ বর্মটি একটা দুর্ভেদ্য দুর্গের মত হয়ে উঠল। তখন তিনি একটা চলন্ত মাটির ঢিবির মত আকার ধরে ভ্রমরবাসিনী দর্শনে যাত্রা করলেন।

কিন্তু এইভাবে সারা দেহটা লোহা চামড়া আর গোবরমাটিতে মুড়ে পথ চলা কি সহজ কাজ? দু-পা ফেল্‌তে না ফেল্‌তে পা যেন ভেরে আসে—বুকে হাঁফ

ধরে—দম বন্ধ হয়ে ওঠে সারা গা দিয়ে দরদর করে ঘামের ধারা ছুটতে থাকে—মনে হয় বুঝি সর্দি-গর্মি হল এবার। কিন্তু তবু তিনি হাল ছাড়লেন না। অসম্ভব মনের জোর আর দেবীর প্রতি অচলা ভক্তি তাঁকে সকল কষ্ট ও বিপদ উপেক্ষা করিয়েই ঠেলে নিয়ে চলল। সেই অদ্ভুত বর্মের মধ্যে হাঁফাতে হাঁফাতে টল্‌তে টল্‌তে তিনি পথ চল্‌তে লাগলেন। পাহাড়ের উপরের খোলা রাস্তা এইভাবে ক্রমশঃ ফুরিয়ে এল। তারপর সাম্‌নে পড়ল এক প্রকাণ্ড লম্বা গুহা পথ। সে পথ যেমন উঁচু-নীচু তেমনই সরু—আর তেমনই অন্ধকার। সে অন্ধকার এমনই জমাট বাঁধা যে এক হাত দূরেও কোন জিনিষ ঠাহর হয় না। একটু জোরে চল্‌বার চেষ্টা করলেই পদে পদে বিষম হোঁচট খেতে হয়—আবার সেই হোঁচট সামলাতে গেলে দু পাশের পাহাড়ের গায়ে মাথা ঠুকে যায়।

এই গুহাপথের দুই পাশের পাহাড়ের গায়েই সেই সব ভয়ানক ভ্রমরেরা দল বেঁধে থাকত। কোনওরকমে তাদের ঝাঁকে একটু খোঁচা লেগেছে ত আর রক্ষা নেই। দল বেঁধে উড়ে এসে ছেঁকে ধরে কামড় আরম্ভ করবে। এমনই ভীষণ অন্ধকার গুহাগর্ভে আমাদের জুয়াড়ীটি অতি সন্তর্পণে ঢুকে পড়লেন। খানিকটা পথ তিনি পা টিপে টিপে খুব সাবধানে চলেছিলেন। ভ্রমরেরা কিছু বলে নি। তারপর হঠাৎ একটা হোঁচট সাম্‌লাতে গিয়ে তাঁর বাঁ হাতটা ঠেকে গেল পাহাড়ের গায়ে। আর যায় কোথা! হাজার হাজার ভ্রমর ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এসে তাঁকে ছেঁকে ধরল। ভ্রমরেরা যখন উড়ে আস্‌ছিল, তখন তাদের গুঞ্জনধ্বনি মিলে যে ভীষণ 'বোঁ-বোঁ শব্দের সৃষ্টি করেছিল, তাই শুনেই ত জুয়াড়ীটির কানে তালা লাগবার উপক্রম।

কিন্তু অত ভ্রমর একসঙ্গে আক্রমণ করেও তাঁকে প্রথমটা বড় কাবু করতে পারল না। কারণ, তারা উড়ে এসে যখন তাঁর শরীরে হুল ফোটাবার চেষ্টা করতে লাগ্‌ল, তখন সেই মাটির প্রলেপই প্রথমটা তাঁকে বাঁচিয়ে দিলে। হুলের ঘায় মাটি খসে পড়ছিল বটে, কিন্তু ভ্রমরদের পাখার বাতাসে মাটির গুঁড়ো উড়ে তাদেরই চোখ কানা করে দিতে লাগ্‌ল। কানা ভ্রমরগুলো ভয়ানক বিপদে পড়ে নিজেদের বাসাতেই ফিরে যেতে বাধ্য হল। আর তাই দেখে, অন্য অন্য নতুন ভ্রমরের ঝাঁকও তাঁকে আর আক্রমণ করতে সাহস পেল না। এই ফাঁকে তিনি অনেকটা দূর এগিয়ে গেলেন। তখন মুখের গ্রাস ফস্‌কে যায় দেখে ভ্রমরের দল সব এক জোট হয়ে এসে তাঁর বর্মটির উপর চেপে বস্‌ল। মাটির ধুলোয় তাদের চোখ কানা হতে থাক্‌লেও সে কষ্ট গ্রাহ্য না করে তারা মরিয়া হয়ে কামড় দিতে লাগল।

তখনও আট ক্রোশ পথ বাকী। জুয়াড়ী বুঝ্‌তে পারলেন, বিপদ্ ঘট্‌তে আর বেশী দেরী নেই। তাঁর বর্মটা থেকে মাটি খ'সে যাওয়ায় খুব হাল্‌কা হ'য়ে উঠেছিল। তাই তিনি প্রাণ হাতে ক'রে ছুটে চল্‌লেন। ভ্রমরেরাও উড়ে এসে তাঁর বর্মের মহিষের চামড়ার গায়ে পড়তে লাগ্‌ল। চামড়ার সঙ্গে তাদের পাখার আঘাত লাগ্‌তে থাকায় এক বিশ্রী চটাচট্ শব্দ হতে থাক্‌ল। এই ভাবে ক্রোশ দুই পথ যেতে না যেতেই মহিষের চামড়ার চারপুরু শক্ত আবরণটি ভ্রমরেরা কেটে কুচিকুচি ক'রে ফেল্‌লে। তখন তিনি প্রাণপণে ছুট্‌তে আরম্ভ করলেন। পাহাড়ের রাস্তায় হোঁচট খেতে খেতে পা দুখানা ত ক্ষত বিক্ষত হ'য়ে গেল। কামারের দোকানে হাপরের মত আওয়াজ ক'রে জোরে নিশ্বাস পড়তে লাগ্‌ল। সারা গায়ে যেন ঘামের নদী ছুটল। তবু কোনওদিকে লক্ষ্য না ক'রে তিনি মরিয়া হ'য়ে ছুটে চল্‌লেন।

ভ্রমরেরা চারদিক থেকে উড়ে এসে তার লোহার বর্মখানার উপর পড়ছিল। তাতে যে ঝন্ ঝন্ শব্দ উঠ্‌তে লাগ্‌ল, তাতে বিন্ধ্যপর্বতের সে গুহা-পথটি গমগম্ ক'রে উঠ্‌ছিল। এই ভাবে আঠার ক্রোশ পথ তিনি প্রায় অক্ষত দেহে নিরাপদে বেরিয়ে গেলেন। তখনও দেবী-মন্দির প্রায় দুক্রোশ তফাতে। এই সময় হঠাৎ ভ্রমরদের কামড়ে লোহার বর্মখানাও খান্ খান্ হ'য়ে মাটিতে খ'সে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমরেরা তাঁর সারা দেহটি ছেয়ে ফেল্‌লে। দু'হাতে দুই চোখ চাপা দিয়ে তিনি রুদ্ধশ্বাসে ছুট্ দিলেন।

ভ্রমরেরা তাঁর দেহের মাংসটুকু টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে কেটে ফেল্‌তে লাগ্‌ল। সারা শরীরে ছুট্‌ল রক্তের ফোয়ারা। অবশেষে স্নায়ু-শিরা আর হাড় কখানি মাত্র বাকী রইল। এই অবস্থায় অতি কষ্টে চোখ দু'টিকে বাঁচিয়ে তিনি দেবীর স্থানে গিয়ে পৌছুলেন।

আশ্চর্য। মন্দিরের প্রাঙ্গণে পা দিতেই ভ্রমরেরা তাঁকে ছেড়ে সব ফিরে পালিয়ে গেল। তিনি যখন সেখানে পৌঁছুলেন, যেন তাঁর চোখে শুধু একটা উজ্জ্বল আলোর আভা এসে পড়েছিল। সেই আলোর মাঝখানে তিনি যেন পলকের জন্য আবছা দেখেছিলেন—এক অতি ভীমা ভয়ঙ্করী দেবীমূর্তি। তার পরই তিনি ঐ দেবীমূর্তির পায়ের তলায় অজ্ঞান হ'য়ে গড়িয়ে পড়লেন।

দেবী দেখ্‌লেন, লোকটির তখনও প্রাণ আছে নিশ্বাস পড়ছে। তাই তাঁকে বাচাবার জন্য সর্বাঙ্গে পদ্ম হস্ত বুলিয়ে দিলেন। অমৃতের মত হাতের স্পর্শ পেয়ে জুয়াড়ীটির চেতনা ত ফিরে এলই, অধিকন্তু ভ্রমরের কামড়ে ক্ষত বিক্ষত দেহের বদলে এক পরম সুন্দর দেহ লাভ করলেন।

প্রায় একরকম পুনর্জীবন পেয়ে উঠে বসে জুয়াড়ীটি এদিক্ ওদিক্ তাকাতে লাগ্‌লেন। অজ্ঞান হ'য়ে পড়বার ঠিক আগেই যে ভীষণা দেবীমূর্তির একটা অস্পষ্ট রূপ তিনি দেখেছিলেন ব'লে তাঁর মনে ছিল, অনেক খুঁজেও তিনি আর সে মূর্তির কোনও সন্ধান পেলেন না। কিন্তু তাঁর বদলে যাঁর দর্শন জুয়াড়ীটির অদৃষ্টে ঘট্‌ল, সেই পরমা সুন্দরী মূর্তির অদ্ভুত রূপে সারা জায়গাটি যেন আলো হ'য়ে উঠেছিল। মন্দিরের পাশে বাগানের মধ্যে ছিল এক প্রকাণ্ড দীঘী। ঐ দীঘির পাড়ে ছিল একটি লতার ঘর। সেই ঘরের মধ্যে একটি দিব্য রূপবতী কন্যা চুপ ক'রে বসেছিলেন। সে রকম পরমা সুন্দরী মেয়ে পৃথিবীতে দূরে থাক, বোধ হয় দেবলোকে খুঁজে পাওয়া ভার। জুয়াড়ীটি ভাব্‌লেন—এ মেয়েটি নিশ্চয়ই অপ্সরা বিদ্যাধরী গোছের কিছু একটা হবেন। আসলে কিন্তু তিনিই দেবী ভ্রমরবাসিনী দুর্গা। একটু আগে তিনিই ভয়ঙ্কর রূপ ধ'রে মন্দিরের বসেছিলেন। পরে আবার এই সুন্দরীর মূর্তিতে লতাকুঞ্জে বিশ্রাম করছিলেন।

জুয়াড়ীটিকে বেশ সুস্থ হ'তে দেখে তিনি করুণায় ভরা কোমলকণ্ঠে বল্‌লেন—"তুমি পথে খুবই কষ্ট পেয়েছ—কিন্তু তবু এ দুর্গম পথে আস্‌তে ছাড়নি। তোমার এই সাহস দেখে আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমার যে বর ইচ্ছা আমার কাছে চেয়ে নিতে পার।"

জুয়াড়ী প্রথম থেকেই মেয়েটিকে কোনও অপ্সরা ব'লে ঠিক ক'রে নিয়েছিলেন। তাই তিনি ব'লে উঠ্‌লেন—"ভদ্রে। আপনাকে দেখেই আমার সব কষ্ট দূর হয়েছে। তবে আমার মনে একটা সন্দেহ জেগেছে। আপনাকে দেখে ত কোনও দেবতা ব'লে মনে হচ্ছে না। আপনি আবার আমায় বর দেবেন কি ক'রে?"

দেবী তাঁর কথায় একটু হেসে উত্তর দিলেন—"আমি দেবতা হই, বা মানুষ হই, সে চিন্তায় দরকার কি? তুমি বর চেয়ে দেখ, আমি দিতে পারি কি না।"

তখন জুয়াড়ী বল্‌লেন—"বেশ, তা হ'লে আপনি স্বীকার করুন, আমি যে-বর চাইব, তাই আমাকে দেবেন। যদি তা পারেন, বুঝ্‌ব আপনি যথার্থই কোনও দেবতা—

জুয়াড়ীটি ছিল ভারী চালাক। তার মনে যে গুপ্ত অভিসন্ধি ছিল, দেবী পর্যন্ত তা বুঝ্‌বার চেষ্টা করলেন না। বেচারীকে মায়ায় ছলনা করতে গিয়ে নিজেই ঠ'কে বসলেন। জুয়াড়ীটির কথায় তাঁর অভিমানে একটু ঘা লাগ্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে তিন সত্য ক'রে তিনি অঙ্গীকার করলেন—"তুমি যে বরই চাইবে, তাই আমি নিশ্চয় দেব।"

এই ভাবে দেবীকে প্যাঁচে ফেলে চতুর জুয়াড়ী বর চাইলেন—"আমার প্রার্থনা, আপনি আমাকে পতিরূপে স্বীকার করুন।"

এই অদ্ভুত প্রস্তাবে দেবী চম্‌কে উঠ্‌লেন। তখন তিনি নিজের স্বরূপ ধারণ ক'রে জুয়াড়ীটিকে বল্‌তে লাগ্‌লেন—"ওরে নির্বোধ! একি অসঙ্গত আবদার তুই করছিস! আমি যে ভ্রমরবাসিনী দুর্গা। তুই যে বর চেয়েছিস্ তা পাওয়া শুধু তোর কেন, ত্রিভুবনে কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। এছাড়া—রাজ্য, ধন-দৌলত, দীর্ঘজীবন, বিদ্যা, যশ প্রভৃতি যা কিছু চাইবি—সব তোকে দেব।"

কিন্তু, অদ্ভুত লোকের মনের ভাব। মেয়েটিকে সাক্ষাৎ জগজ্জননী ভগবতী ভ্রমরবাসিনী দুর্গা দেবী ব'লে জান্‌তে পারবার পরও জুয়াড়ীর মনের ভাব এক তিলও বদ্‌লাল না। তিনি জেদ ধ'রে বল্‌তে লাগ্‌লেন—"দেবি! আমি ত মরতেই বসেছিলাম। সে অবস্থাতে আপনিই দয়া ক'রে আমার প্রাণ বাঁচালেন। আপনার দেওয়া এ প্রাণ ইচ্ছা করলে যে মুহূর্তে কেড়ে নিতে পারেন, তা আমি বেশ ভাল ভাবেই বুঝি। আমার প্রস্তাবে আপনি রেগে উঠে অনায়াসেই আমায় মেরে ফেল্‌তে পারেন কিন্তু তাতে আমার কোন দুঃখই হবে না। বরং তাতে আপনারই

অপযশ রট্‌বে। লোকে বল্‌বে—আপনি আমার প্রাণ দিয়ে আবার তা কেড়ে নিয়েছেন। তা ছাড়া আমাকে মেরে ফেল্‌লে আপনাকেই মিথ্যাবাদিনী হ'তে হবে। আপনি আমার কাছে তিন সত্য করেছেন, আমি যে-বর চাইব—তাই আপনি আমাকে দেবেন। আমায় মেরে ফেল্‌লে আপনার সে সত্য রক্ষা হবে কি ক'রে ?"

ভগবতী দেখ্‌লেন, উপায় নেই। অগত্যা বল্‌লেন—"তথাস্তু। তবে এজন্মে নয়, পরজন্মে তোমার বাসনা পূর্ণ হবে। এখন এ স্থান ছেড়ে চ'লে যাও। যাবার সময় ভ্রমরেরা তোমায় কিছু বল্‌বে না।"

দেবীর কথা শুনে আনন্দিত মনে জয়াটী ছুটে বেরিয়ে গেলেন মন্দির থেকে। বিন্ধ্যাচলের সীমানা পার হ'য়ে তিনি ঠিক করলেন যে, স্বভাবের নিয়মে মৃত্যুকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করলে চল্‌বে না। যত শীঘ্র সম্ভব পুরাণো দেহটাকে নষ্ট করতে হবে। এই ভেবে তিনি উপস্থিত হলেন গিয়ে প্রয়াগে। সেখানে এক বটগাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়ে জীবন বিসর্জন দিলেন। মরবার আগে গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে স্নান ক'রে মনে মনে কামনা করলেন যেন আস্‌ছে জন্মে ভ্রমরবাসিনীর পতি তিনি হ'তে পারেন।

*

(২)

প্রয়াগে মরণের পুণ্যফলে পরজন্মে জয়াটীটির জন্ম হ'ল কাশ্মীরের রাজবংশে। নাম হ'ল তাঁর রণাদিত্য।

ঐ সময়ে চোল দেশে রতিসেন নামে এক দুর্গাভক্ত রাজা ছিলেন। একদিন তিনি তীরে ব'সে সমুদ্রের পূজা করছেন, এমন সময় দেখতে পেলেন যে, সমুদ্রের ঢেউয়ের ভিতর দিয়ে নাচতে নাচতে যেন এক আঁজলা মণিমাণিক্য ভেসে আসছে। ঢেউ যখন তাঁর কোলের উপরই ঐ বস্তু ঢেলে দিয়ে ফিরে গেল, তখন তিনি দেখলেন, সে ত অচেতন কাঁচ-পাথর-বস্তু নয়—সে এক অপূর্ব জীবন্ত বস্তু। দেবকন্যার মত পরমা সুন্দরী একটি শিশুকন্যা তাঁর কোলে হাত-পা নেড়ে খেলা করছে। রাজার কোন সন্তান ছিল না। তাই এই মেয়েটিকেই সমুদ্রের দান মনে ক'রে ঘরে নিয়ে গেলেন। নাম দিলেন তাঁর রণারম্ভা। এই রণারম্ভাই ভগবতী ভ্রমরবাসিনী দুর্গাদেবীর অংশে জন্ম—নিয়েছিলেন।

খুব ছোটবেলা থেকেই এই রাজকন্যার মুখ থেকে দৈববাণীর মত আশ্চর্য কথা বেরুত। তাতে রাজা রতিসেন ভেবেছিলেন—"এ মেয়ে আমার সামান্য মেয়ে নয়। সমুদ্রের কাছে পাওয়া—নিশ্চয়ই কোন শাপভ্রষ্টা দেববালা। দেবতার সঙ্গেই এর বিয়ে হওয়া উচিত। সাধারণ মানুষ একে বিয়ে করবার যোগ্যই নয়।"

ক্রমশঃ রণারম্ভা বড় হ'য়ে উঠলেন। কিন্তু যে সব রাজা রণারম্ভাকে বিয়ে করবার ইচ্ছে প্রকাশ ক'রে দূত

আমি যে ভ্রমরবাসিনী দুর্গা

পাঠাতেন, তাদের সকলকেই নিজের অসম্মতি জানিয়ে মানে মানে বিদায় দিতেন। এই ভাবে কিছুদিন গেল। তারপর একদিন কাশ্মীর থেকে এক মন্ত্রী এসে রাজা রতিসেনের কাছে কাশ্মীররাজ রণাদিত্য ও রণারম্ভার বিয়ের প্রস্তাব করলেন। কথা পাড়বা মাত্রই রতিসেন অন্য অন্য রাজার দূতদের যেমন মিষ্ট কথায় তুষ্ট ক'রে বিদায় দিতেন, তেমনই এঁকেও ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু হঠাৎ এক অঘটন ঘট্‌ল। রাজান্তঃপুর থেকে রাজকন্যা নিজেই সখীর মুখে বাপকে ব'লে পাঠালেন —"এই কাশ্মীরের রাজাই আমার যোগ্য পতি। এ-সম্বন্ধ

স্থাপনে আপনি কখনও অমত করবেন না।" এর পর তিনি ভক্ত রতিসেনকে আড়ালে ডেকে জানিয়ে দিলেন যে রণাদিত্যের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার জন্যই তাঁর মর্তে জন্ম হয়েছে, এবং রতিসেনের গৃহে এসেছেন তিনি এইজন্যই।

এই ব্যাপারে রতিসেন আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে উঠলেন। খুব ধুমধামের সঙ্গে শুভ বিবাহের জোগাড় চলতে লাগল: তবে কোথায় দক্ষিণ ভারতের শেষপ্রান্তে চোল দেশ, আর কোথায় উত্তর ভারতের মাথায় কাশ্মীর। পাছে ঠিক লগ্নমত বর আসা যাওয়ার বাধা হয়, এ জন্য রতিসেন সপরিবারে মায় প্রজাদের পর্যন্ত সঙ্গে নিয়ে তাঁর বন্ধু কুলুতরাজের দেশে গিয়ে উঠলেন। ও-দিকে রণাদিত্যও খুব ঘটা ক'রে সেখানে বিয়ে করতে এলেন। যথাসময়ে দু'জনের ঠিক শাস্ত্রমত বিবাহ হ'য়ে গেল।

বিয়ের পর রণাদিত্য রণারম্ভাকে কাশ্মীররাজ্যে নিয়ে গেলেন। রণারম্ভাই তাঁর পাটরাণী। পাটরাণী বললেও রণারম্ভার ঠিক মত পরিচয় দেওয়া হত না। কাশ্মীর-রাজ্যের রাজলক্ষ্মীর মতই তিনি প্রজাদের পূজা পেতে লাগলেন। তাঁর অপরূপ দিব্য রূপ ও নানারকম অলৌকিক গুণে সকলেই তাঁকে দেবকন্যা ব'লে মনে করত

তবে মহারাণী রণারম্ভা একটি বিষয়ে খুব সাবধান হ'য়ে চলতেন। নিজের সত্য রাখবার জন্যে তিনি মনুষ্যের ঘরে জন্ম নিয়েছিলেন বটে, কিন্তু স্বামীকে তিনি কখনও ছুঁতেন না। আর রাজা রণাদিত্যও তাঁকে বিয়ে করে-ছিলেন বটে, কিন্তু কোনও দিন তাঁকে অসম্মান করতেন না বা তাঁর কোন ইচ্ছায় বাধা দিতেন না। সামাজিক সম্বন্ধে রণারম্ভা মহারাজের পাটরাণী হ'লে কি হয়, কাজে কিন্তু মহারাজ তাঁকে ইষ্টদেবীর মত ভক্তি করতেন—কখনও তাঁর কথার উপর কথা কইতেন না। লোকে জানত যে কাশ্মীররাজ্য প্রকৃতপক্ষে শাসন করেন মহারাণী রণারম্ভা, —রাজা রণাদিত্য তাঁর তাঁবেদার কর্মচারীর মত। তবে সে আমলে রাজ্য যে রকম সুশৃঙ্খলে চলত, তাতে প্রজাদের কোন রকম অসন্তোষের কারণ ছিল না।

মহারাণী রোজ রাতের বেলায় নিজের আসল দেবীরূপ ধরতেন। তবে রাজা বা অন্য কোন লোক পাছে কিছু সন্দেহ করে এই জন্যে রাজার কাছে একটি মায়ামূর্তি রেখে যেতেন। সে মায়ার মূর্তিটি ঠিক তাঁর মানুষ মূর্তির মতই দেখতে ছিল। মায়ামূর্তিটি ঠিক মানুষের মতই সব কাজ করত—কথা বলত। আর রাজাও মহারাণীর দৈবী মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে তাঁর মায়ায় গড়া মূর্তিটিকেই আসল রাণী বলে ভাবতেন। ওদিকে রাণী ভ্রমরের রূপ ধ'রে বিন্ধ্যাচলে নিজের পীঠস্থানে গিয়ে উপস্থিত হতেন। সারারাত সেখানে থেকে আবার ভোরের বেলায় ফিরে এসে রাজ-বাড়ীতে পৌছেই মানুষমূর্তি ধারণ করতেন—তখন মায়া মূর্তিটি তাঁর শরীরে মিলিয়ে যেত। সারা দিন তিনি এইভাবে নিজদেহে ঘরসংসারের কাজ করতেন। আবার রাত হলেই তিনি মায়ামূর্তিটিকে রাজপ্রাসাদে রেখে ভ্রমরী মূর্তিতে বিন্ধ্যপর্বতে চলে যেতেন।

কিছুদিন এইভাবে যায়। একদিন রাজার বড় ইচ্ছা হ'ল যে—দু'টি শিবমন্দির তৈরী ক'রে তাতে রাণীর আর তাঁর নিজের নাম দিয়ে দুই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। মনের ইচ্ছা পূর্ণ করতে তিনি একজন নামজাদা শিল্পীকে ডেকে পাথরের শিবলিঙ্গ দু'টি গড়বার ভার দিলেন।

শিল্পী অনেক যত্ন ক'রে লিঙ্গ দু'টি তৈরী করে ঠিক মন্দির ও দেবপ্রতিষ্ঠার আগের দিন রাজার সভায় পৌছে দিয়ে গেলেন। ঐ সময় একজন দৈবজ্ঞ—মহারাজের সভায় হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেন। শিবলিঙ্গ দু'টি দেখবামাত্র তিনি বলে উঠলেন—"মহারাজ। এ লিঙ্গ দু'টি প্রতিষ্ঠা করবেন না। এ দু'টিরই ভিতর গর্ত আছে, আর সেই গর্তের মধ্যে ব্যাঙ ভরা রয়েছে। বিশ্বাস না হয়, ফাটিয়ে পরীক্ষা করুন।"

শিবলিঙ্গ ফাটিয়ে দেখতে রাজা প্রথমটা একটু ইতস্ততঃ করছিলেন কিন্তু দৈবজ্ঞ এতই জোর দিয়ে কথাগুলো বলতে লাগলেন যে, শেষ অবধি তিনি আর পরীক্ষা না ক'রে থাকতে পারলেন না। লিঙ্গ দু'টি ভেঙ্গে দেখা গেল, দৈবজ্ঞের কথাই ঠিক। তখন রাজা ভয়ানক ভাবনায় পড়লেন—তাই ত আজ বাদে কাল মন্দির ও দেবতা প্রতিষ্ঠা হ'বে—সব জোগাড় হ'য়ে গিয়াছে, এমন সময় একি বিপদ। সব আয়োজন কি পণ্ড হবে? দুশ্চিন্তায় রাজার মুখ কালীবর্ণ হ'য়ে উঠল। তিনি দু'হাতে মুখ ঢেকে সিংহাসনে বসে রইলেন।

অন্তঃপুর থেকে মহারাণী রণারম্ভা সব ব্যাপারই আগাগোড়া দেখেছিলেন। রাজাকে কাতর হ'য়ে পড়তে

দেখে তিনি সভার মাঝে বেরিয়ে এলেন। রাণীকে রাজসভায় আসতে দেখে সকলে চমকে উঠল। কিন্তু তিনি কোনদিকে চোখ না ফিরিয়েই রাজাকে বললেন—"মহারাজ! আপনার এত ভাবনার কোন কারণ নেই। কাল যাতে আপনার দেবতা প্রতিষ্ঠা নির্বিঘ্ন হ'তে পারে, তার ব্যবস্থা আমি নিজে করব, আপনি নিশ্চিন্ত হোন।" রণাদিত্য এই কথা শুনে রাণীকে জিজ্ঞাসা করলেন—"দেবি। তা আর কি ক'রে সম্ভব হবে? কিছুই বুঝতে পারছি না।" তখন রাণী বল্‌তে আরম্ভ করলেন—

"শুনুন, মহারাজ। সে অনেক দিনের কথা। দেবী পার্বতীর সঙ্গে শিবের বিবাহ। ব্রহ্মা স্বয়ং পুরোহিত। শুভকার্যের প্রথমেই ইষ্টপূজা করতে হয়। সেই উদ্দেশ্যে প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁর পূজার ঝুলির ভিতর থেকে নিজের ইষ্টদেব বিষ্ণুর মূর্তি বার ক'রে বিবাহমণ্ডপে স্থাপন করলেন। তখন দেবাদিদেব মহাদেব দেখলেন যে, ব্রহ্মার একটু ভুল হচ্ছে। কারণ, বিষ্ণুমূর্তি শক্তির প্রতীক। শিবকে বাদ দিয়ে শুধু শক্তির পূজায় যেমন কোনও ফল হয় না, তেমনই শিব বাদ দিয়ে বিষ্ণুর পূজাতেও কোন ফল ফলে না। কাজেই ঐ বিবাহে নিমন্ত্রিত সুরাসুরগণ যে সব স্বর্ণ-রত্ন উপহার দিয়েছিলেন, তাই দিয়ে তিনি নিমেষ মধ্যে এক শিবলিঙ্গ তৈরী ক'রে বিষ্ণুমূর্তিটির পাশে রেখে দিলেন। এই দুই হরিহর মূর্তি কালক্রমে রাবণের হাতে এসে পড়েছিল। রাবণ মূর্তি দুটিকে লঙ্কায় নিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন। রাবণবধের পর বানরেরা গিয়ে ঐ দুটি মূর্তিকে দখল করেছিল। কিন্তু যখন তারা দেখলে যে ও জিনিষ খাবার নয়, তখন তারা বিরক্ত হয়ে মূর্তি দুটিকে উত্তর মানসহ্রদের জলে ফেলে দিল। সেই অবধি মূর্তি দুটি ঐ হ্রদের জলে পড়ে আছে।

মহারাজ। আমি আগেই হ্রদ থেকে ঐ দুটি দিব্য মূর্তি তোলাবার ব্যবস্থা করে রেখেছি। কাল সকালেই আপনি সে মূর্তি দুটি প্রত্যক্ষ দেখতে পাবেন। ঐ দুই মূর্তির প্রতিষ্ঠা করুন, আপনার যশের সীমা থাকবে না।"

এই বলে মহিষী রণারম্ভা অন্তঃপুরে ফিরে এলেন। সেখানে তাঁর গুপ্তগৃহে ঢুকে তিনি আকাশচারী সিদ্ধদের স্মরণ করলেন। স্মরণ করবামাত্র তাঁরা জোড় হাতে দেবীর কাছে হাজির হয়ে বললেন—"মা কি আদেশ, বলুন।"

দেবী বললেন, "মানস সরোবরের জলে যে দুটি রত্নময় দিব্য হরিহর মূর্তি আছে, তা উঠিয়ে এনে আমার ঘরে পৌঁছে দাও।"

"যে আজ্ঞা"—বলে সিদ্ধেরা অন্তর্হিত হয়েন। কিছুক্ষণ পরেই সেই রত্নময় হরিহর মূর্তি রাণীর ঘরে এসে উপস্থিত হল। পরের দিন সকালে প্রজারা এসে দেবমন্দিরে গন্ধপুষ্পে শোভিত সেই দুই মহামূল্য রত্নময় হরিহর মূর্তি দেখে বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে গেল।

রাজা রণাদিত্য ছিলেন পরম শৈব। এইজন্য তিনি প্রথমেই শিবলিঙ্গটি প্রতিষ্ঠা করবার জোগাড় করতে লাগলেন। কিন্তু শক্তিরূপ বিষ্ণুর প্রতিষ্ঠা আগে না হলে শিব প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। রণারম্ভা দেবীর ইচ্ছা প্রভাবে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা হবার আগেই মন্ত্র ভেদ করে ভগবান রণস্বামী বিষ্ণু সেই পীঠে প্রকাশিত হলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখেও সাধারণের আর বিস্ময়ের অন্ত রইল না।

ঐ সময় ব্রহ্মা নামে এক সিদ্ধ পুরুষ সদা সর্বদা দেবীর দর্শনলাভের বাসনায় আত্মগোপন ক'রে দেবী রণারম্ভার মহলে জলের ভারীর কাজ করতেন। রাণী তাঁকে চিন্‌তে পেরেছিলেন, এত দিন কিছু বলেন নি। আজ দেবপ্রতিষ্ঠার দিনে তিনি ঐ ছদ্মবেশী সিদ্ধকেই আড়ালে ডেকে দেবমূর্তি দুটি প্রতিষ্ঠা করবার আদেশ দিয়েছিলেন।

সিদ্ধপুরুষ ও বুঝেছিলেন—'দেবী আমাকে জেনেছেন'। তাই পরম আনন্দে দেবীর আদেশ শিরোধার্য ক'রে তিনি ঐ দেবমূর্তি দ্বয়ের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিষ্ণু মূর্তি প্রতিষ্ঠার পর সাধারণের অলক্ষিতে আকাশ পথে এসে অন্য দেবতার প্রতিষ্ঠা করলেন। কিন্তু যখন তিনি আকাশ থেকে নামছিলেন, তখন কেউ কেউ তাঁকে দেখ্‌তে পেয়েছিল। এই ব্যাপারেও সকলেই আশ্চর্য বোধ ক'রে ছিলেন।

ব্রহ্মার মতই পূজনীয় সেই সিদ্ধপুরুষ ব্রহ্মার বাসের জন্য দেবী রণারম্ভা একটি ব্রহ্মমণ্ডপ তৈরী করিয়ে দিলেন। রাজ্যের যত সাধক ও সিদ্ধপুরুষ সকলেই ঐ ব্রহ্মমণ্ডপে এসে অবাধে সাধন ভজন করতেন।

এর পর দেবী রণারম্ভা দেখলেন যে, তাঁর সত্য পালনের সময় প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। তাই তিনি তাঁর স্বামীকে কিছু অলৌকিক ক্ষমতা দিয়ে বিদায় নেবার ইচ্ছা করলেন।

"হাটকেশ্বর" মন্ত্র জপ করলে পাতালের অধীশ্বর হওয়া

যায় ব'লে শাস্ত্রে কথিত আছে। ঐ দুর্লভ হাটকেশ্বর মন্ত্র বণারস্তা দেবী তাঁর স্বামীকে দান করেছিলেন। বাজা ঐ মন্ত্রসিদ্ধির জন্য প্রথমে ইষ্টিকাপথ ও পবে নন্দিশিলায় বহুদিন কঠোব তপস্যা কবেন। পরে সিদ্ধিলাভ ঘটলে তিনি চন্দ্রভাগা নদীব জলেব মধ্যে নেমে নমুচি দানবের তৈবী পাতাল প্রবেশেব পথ দিয়ে রসাতলে চলে গেলেন। ঐ পথটি একুশ দিন খোলা ছিল। সেই অবারিত দ্বার দিয়ে বাজা প্রথমে নিজে তাব পর প্রজাদের পর্যন্ত পাতালে নিয়ে গিয়ে নানা রকম সুখ ভোগ কবেছিলেন।

তিনি পাতালে প্রবেশ কবতেই দেবী ভ্রমরবাসিনী দুর্গাব অংশ বাণী বণাবস্তা নিজেব মানবী লীলা সংবরণ ক'বে শ্বেতদ্বীপে চ'লে গেলেন।

(রণ বঙ্গ)

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় টেষ্ট্ ম্যাচ

শ্রীকমলা নন্দী

বিপদেব মধ্যে পড়ে যারা বিপদকে উপহাস কবতে পারে তারাই সত্যিকারেব মানুষ। ইংবাজ জাতির আজ কি বিপদ। মদমত্ত একটা লোকেব বিজয় অভিযানে সারা-দেশ আজ বিধ্বস্ত—কি কষ্টে এবং কি ভয়ে যে জন-সাধারণেব দিন-বাত কাটছে তা তাদেব চাইতে আব কেউ জানে না। অথচ তাব মধ্যেই তারা হাসছে, কাগজে ব্যঙ্গচিত্র আঁকছে, বেতারে প্রহসন অভিনয় কবছে। ইংরাজ খেলোয়াড়ের জাত, খেলাধূলাব এত চর্চা প্রায় আর কোনও দেশেই নেই। "Sportsman" বলে তারা খুব গর্ব অনুভব করে। তাদেব খেলার মধ্যে ক্রিকেট বিশেষ আদবণীয়—তাদের জাতীয়বৈশিষ্ট্য,—প্রত্যেক লোকের নেশা। যারা খেলে তারা দর্শকদেব দেবতা। ইংরাজেরা ক্রিকেটের স্বপ্ন দেখে, খেলাব প্রত্যেকটা খুঁটিনাটী, কায়দা, মাব, রান, আউট ইত্যাদি তাদের মাথাব মধ্যে পোকার মত ঘুবে বেড়ায়। তাই লণ্ডন ষ্টক্ এক্সচেঞ্জের একদল লোক মাটীর নীচের এয়াব বেইড্ শেলটাবে বসে বসে এই মহা যুদ্ধকে ক্রিকেট খেলার পর্যায়ে ফেলে তার একটা অভিনব কৌতুক-জনক ফলাফল অর্থাৎ Score Board' বাহির ক'রেছে নীচে সেটা উদ্ধৃত করে দেওয়া হল।

GERMANY vs THE REST

A	U Stria, run out	0
C	Slovakia, c and b Hitler	0
P	O Land c Stalin, b Hitler	10
D	Enmark, run out	0
N	Orway, c Quisling, b Hitler	1
H	Olland, retired hurt	2
B	Elgium, c Leopold, b Hitler	3
Luxe	M Bourg, b Hitler	0
F	R Ance, c Mussolini b Hitler	20
G	B Ritain, not out	20

A Merica, to bat Close of play, 56 for 8

বাণের হিসাব হয়েছে—কোন্ "ব্যাট্‌স্‌ম্যান" কতদিন ধবে "বাউলাবেব" আক্রমণ সহ্য কবতে পেরেছেন।

ক্রিকেট বসিক পাঠকেবা এই জার্মানী বনাম অবশিষ্ট জাতির "মহা ক্রিকেটের" ফলাফলেব মধ্যে প্রতিভাপূর্ণ কৌতুকবসেব আস্বাদ পাবেন। যে জাতি অহোরাত্র ব্যাপী বোমাবর্ষণেব বিধ্বস্ততার মধ্যে এমন ভাবে হাসতে ও হাসাতে পাবে তারা আমাদেব প্রশংসার পাত্র—তাদের জয় অবশ্যম্ভাবী।

সমস্ত ভারতবর্ষ উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিল—কংগ্রেসের প্রস্তাবের উত্তরে ভারতসচিব আমেরী সাহেব 'না' বলার পর কংগ্রেস কোন পন্থা অবলম্বন করবে? অনেকেই অনুমান করেছিলেন এবার আইন অমান্য ও অসহযোগ আন্দোলন পূর্ণ মাত্রায় আরম্ভ করে দেওয়া ছাড়া কংগ্রেসে মুখরক্ষার আর কোনও উপায় নেই। যুদ্ধে যোগ না দেওয়ার জন্য এবং যুদ্ধের ব্যাপারে কোনরকম্ সাহায্য না করার জন্য বোধ হয় কংগ্রেস এইবার প্রকাশ্য ভাবে ভারতবাসীকে অনুরোধ করবে। এর ফলে ভারতরক্ষা আইনের কবলে তাঁরা পড়বেন। প্রবল ধরপাকড় শুরু হবে এবং ভারতবর্ষের চারিদিকে প্রত্যেক প্রদেশেই একটা তুমুল হৈ চৈ বেধে যাবে। বিশেষতঃ যখন বোম্বাইয়ে অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সভা অধিবেশনের কিছুদিন আগেই রাষ্ট্রপতি আজাদ গম্ভীর গলায় সকলকে উপদেশ দিলেন:—দুঃখ বরণের জন্য প্রস্তুত হও, হয়ত শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসকে সংঘর্ষে নামতে বাধ্য হতে হবে। শ্রীযুক্ত রাজগোপাল আচারিয়া, ভুলাভাই দেশাই প্রভৃতি নেতাদের হাবভাব ও কথাবার্তা থেকে তাই মনে হতে লাগলো। মহাত্মা গান্ধীকে তাঁরা অহিংসাব্রত নির্ঝঞ্ঝাটে সাধনা করবার জন্য কংগ্রেস থেকে সরিয়ে দিলেন। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু 'সেবাদল' ও স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে খুব লম্ফ-ঝম্প শুরু করলেন। সকলে ভাবলে মেঘ ঘনিয়ে আসছে—ঝড় উঠবে।

কিন্তু, বর্তমান যুগটা দেখা যাচ্ছে বিস্ময়ের যুগ। পৃথিবীতে নানা অচিন্তনীয় ও আশ্চর্য ব্যাপার সংঘটিত হচ্ছে। সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপারও সম্ভব হয়ে উঠছে। কাজেই কংগ্রেসের হঠাৎ অভাবনীয় আচরণ দেখেও আর আশ্চর্য হবার কিছু নেই। হালে পানি না পেয়ে কর্তারা আবার অশীতিপরবৃদ্ধ অহিংস-ধর্মাত্মা গান্ধীজীকে ধরে পড়েছেন এ বিপদে রক্ষা করবার জন্য। সমস্ত ভার আবার মহাত্মার হাতে তুলে দিয়ে আত্মপ্রত্যয় হীন দায়িত্বভীরু বাকসর্বস্ব কর্তারা যেন হাঁফ ছেড়ে নিশ্চিন্ততার আরাম অনুভব করে বাঁচালেন। মহাত্মা বুঝিয়ে বলেছেন—তোমাদের ভয় নেই আমি নিজে যাবো বড়লাটের কাছে, তাঁর কাছে এই অনুগ্রহটুকু আমি ভিক্ষা করে নিয়ে আসবো যে অহিংসাব্রতী কংগ্রেসকে তিনি দয়া করে যুদ্ধের বিরুদ্ধে যেতে অনুমতি দিন। তিনি যেন এজন্য ধরপাকড়ের হুকুম না দিয়ে কংগ্রেসের প্রতি অহিংসভাব অবলম্বন করেন। তা নইলে কংগ্রেসের মৃত্যু হবে। অসহায় নিরুপায় কংগ্রেসকে তিনি নিজগুণে রক্ষা করুন।" ছোট ছেলের চাঁদ চেটে খাবার আব্দারও বোধহয় এতটা হাস্যকর নয়!

* * *

সুভাষচন্দ্র বসুকে তো আগেই তিন বছরের জন্য কংগ্রেস য়ুনিভার্সিটি থেকে রাষ্টিকেট্ করে দেওয়া হয়েছে, এইবার তাঁর অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসুর নাম কাটার পালা। অন্ততঃ রাষ্ট্রপতি আজাদ সাহেবের বিবৃতি সেই ইঙ্গিত করছে। বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি আজ দু'দলে বিভক্ত। একদল গান্ধীপন্থী অপরদল সুভাষপন্থী। গান্ধীপন্থী বি-পি-সি-সি দাবী করেন তাঁরাই যথার্থ কংগ্রেস পার্টি, কারণ কেন্দ্রের সঙ্গে তাদেরই যোগ আছে। সুভাষপন্থী বি-পি-সি-সি বলেন, আমরাই বাংলার অকৃত্রিম কংগ্রেসের দল, কেন্দ্র থেকে যে আজ বিচ্যুত হয়ে পড়েছি সে আমাদের দোষে নয়, কেন্দ্রেরই দোষে। গান্ধীপন্থীরা বলেন—তোমরা বিদ্রোহী, তোমরা হাইকম্যাণ্ডের হুকুম মানোনি, সঙ্ঘের একতা বিনষ্ট করে কংগ্রেসকে দুর্বল করে তুলছো। সুভাষপন্থীরা বলেন—আমরা কংগ্রেসের বর্তমান নীতির বিরোধী বটে, কিন্তু বিদ্রোহী নই। হাইকম্যাণ্ডের স্বেচ্ছাচারিতার আমরা প্রবল প্রতিবাদ জানিয়েছি মাত্র তাকে হুকুম অমান্য বলেনা। বৃটিশ পার্লামেণ্টে একদল সরকার বিরোধী রাজনৈতিক সম্প্রদায় আছে, তারা বর্তমান মন্ত্রীদের কোনও কোনও নীতি মেনে চলা দেশের স্বার্থের পক্ষে হানিকর বলে মনে করে। সভায় তারা মন্ত্রীদের প্রস্তাবের জোর প্রতিবাদ জানায়, তারা কি তবে রাজদ্রোহী? না, বর্তমান শাসক মণ্ডলীর শত্রু?

* * *

বিরোধী ও বিদ্রোহী এক নয়। শ্রীযুক্ত এম, এন, রায় সম্প্রতি যুদ্ধ সম্পর্কে কংগ্রেস নীতি বিরুদ্ধ মত প্রচার করায় তিনিও নামকাটা লিষ্টে পড়বার জন্য অনুমোদিত হয়ে রয়েছেন। সুতরাং, কংগ্রেসকে যদি কেউ দুর্বল করে থাকে সে করেছে কংগ্রেস নিজে। সঙ্ঘের একতা হীনতা যদি কেউ ঘটিয়ে থাকে ত' সে ঘটিয়েছে কংগ্রেসের বর্তমান কর্ণধারেরা। ডেমোক্রেসি বা গণতন্ত্রের মূল মন্ত্রই হচ্ছে ব্যক্তি স্বাধীনতা। কংগ্রেস যদি এই ব্যক্তিস্বাধীনতা অস্বীকার করে স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করলে লোকের কণ্ঠরোধ করবার জন্য শাস্তির খাঁড়া প্রসারিত করে তাহলে যে নাজী ও ফ্যাসিজমকে তাঁরা ঘৃণা করেন তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করা হয় না কি? আর যদি এই নীতিকেই তোমরা মেনে চলতে চাও ও মহাত্মা গান্ধীর একনায়কত্বই স্বীকার করে নাও, তা'হলে গণতন্ত্রের বুলি ছেড়ে সোজা পথে চলো। ছদ্মবেশ ছেড়ে আসল রূপ নিয়ে দাঁড়াও।

রুমানিয়ার রোম্যান্টিক রাজা ক্যারল 'আয়রণ গার্ড' দলের বিদ্রোহের ফলে রাজ্য ও রাজসিংহাসন ত্যাগ করে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁর একমাত্র পুত্রকেই রাজসিংহাসনে বসিয়ে রাজপদে অভিষিক্ত করা হয়েছে বটে, কিন্তু রাজক্ষমতা খর্ব করে দেওয়া হয়েছে অনেক। রাশিয়া ইটালি ও জার্মানির অনুকরণে রুমানিয়াতেও একনায়কত্ব স্থাপিত হল। 'আয়রণ গার্ড' দলের বর্তমান নেতা আর্নেস্কু প্রধান মন্ত্রী ও রুমানিয়ার প্রধান রাষ্ট্রনায়কের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। ভূতপূর্ব রাজা ক্যারলের রাণী ও বর্তমান রাজমাতা রাজ্ঞী হেলেন স্বামীর অসদ্ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে দীর্ঘ দশ বৎসরকাল স্বেচ্ছায় নির্বাসনে বাস করছিলেন। পুত্রের আহ্বানে তিনি রাজমাতার মর্যাদায় আবার রাজ্যে ফিরে এসেছেন।

* * *

ভূতপূর্ব রাজা ক্যারল ব্রিটেন ও ফ্রান্সের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। রুমানিয়ার তৈল ও শস্য প্রভৃতির উপর মিত্রশক্তির সম্পূর্ণ হাত ছিল। কিন্তু বর্তমান য়ুরোপীয় যুদ্ধে জার্মান প্রতাপ দর্শনে ভীত হয়ে রাজা ক্যারল তাঁর পুরাতন বন্ধুদের পরিত্যাগ করে জার্মানি ও ইটালির সঙ্গে সৌহার্দ স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু নূতন মিত্রেরা তাঁকে বিশ্বাস করতে পারেননি। তাঁরা হাঙ্গেরীর বন্ধুত্বকে বেশি মূল্যবান মনে করে রুমানিয়ার উপর চাপ দিয়ে ট্রান্সিল্‌ভেনিয়া অঞ্চলটি হাঙ্গেরীকে প্রত্যর্পণ করতে বাধ্য করেছেন। বুলগেরিয়াকেও 'দব্রুজা'-প্রদেশ ফেরত দিতে হয়েছে। রাশিয়া তো আগেই বেসারাবিয়াটা কেড়ে নিয়েছে। কাজেই রুমানিয়া গতযুদ্ধের পর অন্যায় সুযোগ নিয়ে নিজেকে যতটা বিস্তৃত করে বসেছিল এখন আবার তা গুটিয়ে ছোট হয়ে গেল।

* * *

'আয়রণ গার্ডের' দল হিটলার মুশোলিনীর ভক্ত। তারা এ ভাগ বাটওয়ারা মেনে নিয়েছে এবং জার্মানি ও ইটালির সঙ্গে তাদের অকপট বন্ধুত্ব ঘোষণা করেছে। ফলে রুমানিয়ায় তৈল ও শস্য এখন ভারে ভারে ফরাসী দেশে বা ব্রিটেনে না গিয়ে জার্মানির ভাণ্ডারে উঠছে। রুমানিয়ায় এই 'আয়রণ গার্ডের' অভ্যুত্থান মিত্রশক্তির পক্ষে ক্ষতিকর হল।

কিছুদিন আগে ইংলণ্ডের বর্তমান প্রধান মন্ত্রী ও সমর নায়ক মিঃ উন্‌স্টন চার্চিল এক বেতার ঘোষণায় জার্মান বিমান আক্রমণে বিধ্বস্ত ব্রিটেনের বীর অধিবাসীবৃন্দকে অভয় দিয়ে বলেছেন, গত জুনমাসে ডানকার্কের শোচনীয় পরাভব ও ফ্রান্সের শত্রুর নিকট আত্মসমর্পণের পর ইংলণ্ডের যে অসহায় অবস্থা হয়েছিল আজ তার সে দুর্যোগ রাত্রি কেটে গেছে। সেদিন জার্মানি যদি ব্রিটেনকে আক্রমণ করতো তাহ'লে হয়ত কোনো কোনো বিষয়ে আমাদের আত্মরক্ষার আয়োজনের একটু ত্রুটি তার চোখে পড়তো। কিন্তু ব্রিটেনের রণোৎসাহী নরনারীর প্রাণপণ চেষ্টায় আজ শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করবার জন্য ইংলণ্ড সম্পূর্ণ প্রস্তুত হ'য়ে উঠেছে। চল্লিশ লক্ষ সশস্ত্র সৈন্য জার্মানিকে বাধা দেবার জন্য তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে। বিশ্বত্রাস ব্রিটিশ রণতরী-বহর ইংলণ্ডের সমুদ্রপৃষ্ঠ রক্ষা করছে। এই অর্ণব বাহিনীর সুদৃঢ় বেষ্টনী ভেদ করে আসা কোনো শক্তিশালী শত্রুর পক্ষেই সহজ নয়। ব্রিটিশ বিমানবহরও দ্রুত সংখ্যায় বেড়ে চলেছে। সমগ্র গ্রেটব্রিটেন এক সুরক্ষিত দুর্ভেদ্য দুর্গে রূপান্তরিত হয়েছে।

* * *

বাংলায় একটা প্রবাদ বাক্য আছে—'মাতঙ্গ পড়িলে জালে, পতঙ্গেরা কিনা বলে!' ফ্রান্সের হয়েছে সেই দশা। জার্মানির কাছে আত্মসমর্পণ করায় সমস্ত পৃথিবীতে তার শক্তি হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হ'য়ে পড়েছে। 'ইন্দোচায়না' নিয়ে জাপান তো তাকে যৎপরোনাস্তি হায়রান করছেই, শুনে আশ্চর্য হবে যে ক্ষুদ্র শ্যাম রাজ্য, যার সৈন্যসংখ্যা মাত্র পঁচিশ হাজার, দু'খানি ডেস্ট্রয়ার আর তিনখানি টর্পেডো নিয়ে যার নৌবহর, যার মোট লোকসংখ্যা মাত্র দেড়কোটী সেও ফ্রান্সের ভীসি-গভর্ণমেণ্টকে চোখ রাঙিয়ে বলেছে আমরা 'থেইলল্যাণ্ডের' পূর্বতন সীমান্ত পর্যন্ত ভূমি ফিরিয়ে নিতে চাই। শ্যামরাজ্যের 'থেইলল্যাণ্ড' নামকরণ করেছেন য়ুরোপীয়ানরা। এর পূর্বতন সীমান্ত ছিল ইন্দোচীনের মধ্যে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। অকস্মাৎ ফরাসীকে চোখ রাঙিয়ে রাজ্য দাবী করবার সাহস পেলে কোথা শ্যাম? এর পিছনে কি জাপান আছে না ব্রিটেন?
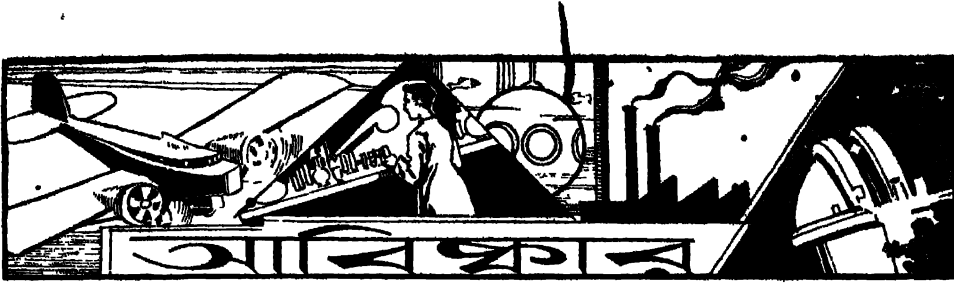
৬০০০ হাজার বছর আগের ভারতবর্ষ•

শীল মোহর।

সম্প্রতি পাঞ্জাবের হরপ্পা অঞ্চলে ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের চেষ্টায় যে সব উপাদান আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে পাঁচ ছ' হাজার বছর পূর্ব্বের প্রাচীন ভারতের অজ্ঞাত পরিচয়ের উপর প্রচুর আলোকপাত হয়েছে। সিন্ধু উপত্যকায় ভারতের প্রাচীন শিক্ষা সংস্কৃতি ও সভ্যতার যে দুটি কেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়েছে সেই মোহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার মধ্যে হরপ্পার প্রভাব প্রতিপত্তি যে মোহেঞ্জোদাড়ো অপেক্ষা দীর্ঘযুগ স্থায়ী হয়েছিল এবং বিস্তৃতও ছিল সে বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। হরপ্পায় যে 'শীলমোহর' পাওয়া গেছে এবং শীল মোহরাঙ্কিত যে জিনিস পাওয়া গেছে তাতে তারিখ আছে খৃঃ পূঃ চারহাজার বছর আগের।

শিলামূর্তি ও ধাতুশিল্প।

হরপ্পায় দু'টি ছোট পাথরের প্রতিমূর্তি পাওয়া গেছে। এর মধ্যে শিল্পীর যে অসাধারণ নৈপুণ্য ও কলা কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায় তাতে ভারতীয় শিল্পের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা পরিবর্তন করতে হবে। যে সব ভূষণ অলঙ্কার ক্রীড়নক এবং সুদৃশ্য ধাতুপাত্র পাওয়া গেছে তাতে বোঝা যায় যে ছহাজার বছর আগেও ভারতে ধাতুশিল্প চরম উন্নতি লাভ করেছিল।

পূর্বপুরুষ।

এই সমাধি ক্ষেত্র যে সমস্ত শবের কঙ্কাল পাওয়া গেছে নৃতত্ত্ববিদেরা তা পরীক্ষা করে, বিশেষ ভাবে মাথার খুলিগুলি নিয়ে গভীর গবেষণা করে জানতে পেরেছেন যে ভারতের প্রধান কয়েকটি জাতিরই পূর্বপুরুষেরা সে যুগেও বিদ্যমান ছিলেন।

শস্যভাণ্ডার।

শহরের মধ্যে দেখতে পাওয়া গেছে নগরবাসীদের জন্য নির্মিত এক বিরাট শস্যভাণ্ডার। এযুগের শহরে এটা একটা অভিনব ব্যাপার। অনুমান হয় নগরবাসীদের ব্যবহারের জন্যই হয়ত এখানে শস্য সঞ্চিত থাকতো, অথবা এ রাজ-কোষের শস্যভাণ্ডার। যারা অর্থ দিতে অক্ষম তারা হয়ত শস্য দিয়েই রাজকর পরিশোধ করতো।

সমাধি ক্ষেত্র।

হরপ্পায় যে বিশাল সমাধিক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পক্ষে তা সম্পূর্ণ নূতন। বিশেষজ্ঞেরা পরীক্ষা করে দেখে অনুমান করেন যে হরপ্পায় যেসব গৃহ ও বাসভবন দেখা যাচ্ছে, সমাধি ভবনের চেয়ে তা অনেক পুরাতন। অর্থাৎ সমাধি ভবনটি সে যুগের তুলনায় সেকালের পরবর্তী সময়ে নির্মিত হয়েছিল। সমাধিভূমিতে খননকালে যে সব সমাধি বেরিয়ে পড়েছে তা থেকে বোঝা যায় সেকালে নর নারীর অন্তিমকৃত্য কি ভাবে অনুষ্ঠিত হত, এবং জন্ম মৃত্যু ও জন্মান্তর সম্বন্ধে সে যুগের লোকের কি ধারণা ছিল।

শ্রমিক-ভবন না সৈনিকাবাস?

আর একটা প্রকাণ্ড বাড়ী এই শহরেই পাওয়া গেছে যার মধ্যে সারি সারি অসংখ্য ঘর। সবাই অনুমান করেছেন, এটি শ্রমিকদের বাস ভবন। কারণ মিশরে এর চেয়ে আন্দাজ ১২০০ বৎসর পরে যে একটি শ্রম-জীবীদের ভবন আবিষ্কৃত হয়েছে এটির সঙ্গে নাকি তার অনেক সাদৃশ্য পাওয়া যায়। আমাদের কিন্তু মনে হয় এগুলি শ্রমজীবী ভবন নয়, সৈনিক নিবাস। সে যুগে শ্রমজীবীর চেয়ে সৈনিকেরই আদর ছিল বেশী।

শারদোৎসবের আনন্দ মেলা

মনের কথা বলে দেওয়া।

'ভূতো গোয়েন্দা' বলছেন পাঠশালার যে কোনো গ্রাহক গ্রাহিকার মনের কথা তিনি গুণে বলে দেবেন।

তোমরা পাঠশালার যে কোনো একটি পাতা খুলে উপর দিকের প্রথম দশ লাইনের মধ্যে যে কোনো একটি লাইনের প্রথম আরম্ভর দিক থেকে দশটি শব্দের মধ্যে যে কোনো একটি শব্দ মনে মনে বেছে নাও। তারপর সেই কথাটির নীচে একটি লাল নীল পেন্সিলের দাগ দিয়ে underline করে রাখ। তোমরা প্রত্যেকে পাঠশালায় যে যে পাতার যে যে কথাটি মনে করে রেখেছ',—আসছে মাসের পাঠশালায় 'ভূতো গোয়েন্দা' তোমাদের প্রত্যেকের সেই মনের কথাটি বলে দেবেন।

মহাশয়—

আমাদের আদরের পাঠশালা চার বছরে পা' দিল— তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এবার তার আটচালায় নতুন পড়া পড়তে চাই।

অনাগত 'ভূতো গোয়েন্দা'কে স্বাগত জানিয়ে জিজ্ঞেস করে পাঠাচ্ছি—এত নাম থাকাতে তিনি কেন 'ভূতো গোয়েন্দা' নাম পছন্দ করলেন আর দ্বিতীয় প্রশ্ন—'কবিতা' ও গল্পের মধ্যে পার্থক্য কি এবং কী—কী?

তিনি যেন আমার প্রশ্নের দয়া করে উত্তর দেন।

মধু ঘোষাল—গ্রাহক নং ২৬৯৬

শ্রদ্ধাস্পদেষু (?) 'ভূতো গোয়েন্দা'

প্রথমেই বলে রাখি ভূতকে আমি শ্রদ্ধা করি না। তাই শ্রদ্ধাস্পদেষু পরে '?' এর ব্যবহার করলাম। মানুষ আপনি আমার অন্তরের শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন, কিন্তু স্পষ্টই আপনাকে জানিয়ে রাখছি আপনার নাম অবশ্যই বদলাতে হবে। আমার গৃহশিক্ষক মহাশয়ের নিকট শুনেছিলাম রুষদেশে এক শিক্ষকের নাকি ভূতের গল্প করার অপরাধে ফাঁসি হয়েছিল। রাগ করবেন না যেন। ভূত কিন্তু বড্ড বদরাগী। আমি নিচের কয়েকটা বিষয় জানতে চাই।

(১) বাঙ্গালা সন কখন হইতে আরম্ভ হয়েছে?

(২) টরপেডোর আবিষ্কর্তা কে?

(৩) আমরা ঘুমাই কেন?

শ্রীকালিদাস সাহা—গ্রাহক নং ৩০৭৮

সাহাজাদপুর উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়
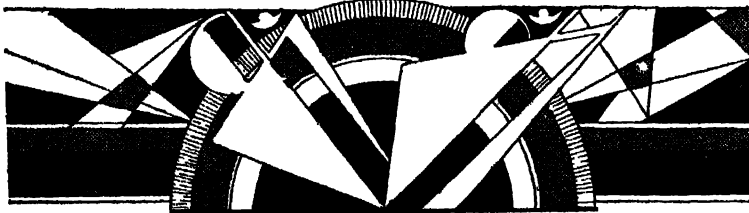
পাঠশালার একজন গ্রাহককে 'USAGE' শব্দটি বানান করতে বলা হ'ল, সে শব্দটির উচ্চারণ ঠিক রেখে বানান করলে বটে, কিন্তু তার প্রত্যেক বর্ণটিই ভুল বললে। বল দেখি সে কি বানান করেছিল?

ছোট গল্প রচনা প্রতিযোগিতা

পাঠশালার গ্রাহক গ্রাহিকাদের মধ্যে যে-কেউ এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবেন। গল্পটি 'ছোট' হওয়া চাই এবং 'গল্প' হওয়া চাই। প্রাচীন গল্প বা রূপকথা অথবা অন্য কোনো ভাষায় প্রকাশিত গল্পের অনুবাদ পাঠালে গ্রাহ্য হবে না। গল্পে বাঙালী পরিবারের আধুনিক অবস্থার বর্ণনা থাকা চাই। ১৫ই কার্তিকের [illegible] সাধারণ এক্সেসাইজবুকের ৫।৬ পাতার বেশি না হয়। কাগজের একপিঠে পরিষ্কার করে লিখে পাঠাবে। মাথার উপর লিখে দিও "গল্প প্রতিযোগিতা"। গ্রাহক নম্বর দিতে ভুলো না যেন। ভাল হাতের লেখার জন্য অতিরিক্ত নম্বর আছে। যার গল্প সবচেয়ে উৎকৃষ্ট বলে গণ্য হবে তাকে নিম্নলিখিত বইগুলির যে কোনো দুখানি বই উপহার দেওয়া

কার্তিক—১৩৪৭

নির্ভুল উত্তরে ৫৲ পাঁচ টাকা পুরস্কার

নিয়মাবলী—(১) ধাঁধা-সম্পাদকের মতে শব্দসন্ধানের যেটি সবচেয়ে নির্দোষ ও নির্ভুল সমাধান,—তার সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে উত্তর মেলা চাই। নির্ভুল সমাধানটি পরের মাসের পাঠশালায় প্রকাশিত হবে। (২) সাদা ঘরগুলির প্রত্যেকটিতে একটি ক'রে সংযুক্ত বা অসংযুক্ত অক্ষর বসবে। (৩) প্রতি সংখ্যার প্রতিযোগিতা-কুপনখানি কেটে ভর্তি ক'রে পাঠাবে সেই মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে। দেরি হ'লেই বাতিল। খামের উপরে ঠিকানা লিখবে—"শব্দ সন্ধান" পাঠশালা কার্যালয়, ৩০ কর্ণওআলিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। (৪) হরফগুলি সব পরিষ্কার হওয়া চাই—কাটাকুটি চলবে না। বানান ভুল হলে ভুল ধরা হবে। (৫) যে কোন পাঠক পাঠিকা যতগুলি ইচ্ছা কুপন পাঠাতে পারবে। (৬) 'শব্দ-সন্ধান'-সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ব'লে মেনে নিতে হবে।

সঙ্কেতসূত্র

—পাশাপাশি—

১। কাণা ছেলের নাম।

৫। এও নাকি চুরি যায়!

৮। এর কণ্ঠস্বরকে কত কবিই যে অমরতা দিয়ে গেছেন।

৯। শুনলে কি প্রত্যয় হবে এ বড়কে আরও বড় করতে পারে আবার ছোটকে আরও ছোট করতে পারে! আশ্চর্য নয় কি?

১১। ঝুনা নারকেলের খোলে খুঁজে দেখলেই পাবে।

১২। সেই মহাকবি কালিদাসের আমল থেকেই বর্ষার কবিরা এ তরুকে প্রসিদ্ধি দিয়ে গেছে।

১৪। ফাঁকি পড়তে না চাও ত' এটি নিয়মিত করে যেয়ো।

১৬। দান-বিতরণের ব্যাপার হ'লেও এমন এলোমেলো ছড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়।

১৮। সম্পাদন, উৎপাদন, নির্মাণ, প্রয়োগ বা নিয়োগ ইত্যাদি বিবিধ কার্য।

[illegible]

[illegible]। মাথায় চুল থাকলেও ‘টেকো’ হওয়া যায়, কিন্তু ‘এ’ হওয়া যায় না।

২২। তিন সত্যির প্রথম শুরুই এখানে।

২৪। পার্বতীর সখী।

২৫। বিক্রম।

২৭। জলে বা স্থলে যিনি শক্তির অধিষ্ঠাত্রী।

৩১। কোনো সম্প্রদায় বিশেষের [illegible] এ [illegible] সম্ভাষণ করলে তারা সবাপেক্ষা অধিক অপমান বোধ করে।

৩২। শব্দসন্ধানের সম্পূর্ণ সঠিক উত্তর দিতে যদি না পার, ‘—’ দুঃখিত হবার কারণ নেই। চেষ্টা করে যাও, ভবিষ্যতে সফল হবেই।

—উপর নীচে—

১। নিবৃত্ত।

২। তোমাদের আবাসগৃহ উ টি দেখ সন্ধান পাবে।

৩। যা পাবার খুবই ইচ্ছা হয়।

৪। যে কোনো সুস্থ মানুষ ইচ্ছা করলেই এ হ'তে পারে।

৯। রাজারাজড়ার ঘরের ছেলেদের বিবাহের পরও এ নামটি ঘোচে না।

৭। সোজা করে নিলে পাই—উল্টেরই জাত ভাই।

১০। হাতের মুঠোতেই পাবে, মুঠো খুলে হাত সোজা করে মেলে দেখ।

১৩। বড় থালা।

১৫। বিশ্ববিশ্রুত ভারত সিংহাসন এঁর ছোট ভাইয়ের হাতে চলে যায়।

১৭। একটু লক্ষ্য ক'রে দেখলে ধরা যায় এরা একই গুরুর শিষ্য।

২০। অপরাপর গ্রহের সঙ্গে পৃথিবীর ব্যবধানের মধ্যে এ যেন সেতু স্বরূপ।

২১। আদান প্রদান।

২২। অর্থাৎ এব ‧ালিক জনসাধারণ।

২৩। শুধু বাংলার নয়, এ অরবিন্দ সারাভারতের—সমগ্র পৃথিবীরই।

২৫। গিয়ে দেখলাম শহর যেন মরুভূমির মত “—” হ'য়ে পড়েছে।

২৬। এর ছোঁয়াতে ছোপ ধরে, দাগও লাগে।

২৮। পাশাপাশি ২৯ সংখ্যার ঠিক বিপরীত।

৩০। বিষুবরেখার কাছাকাছি দেশেই এর প্রাদুর্ভাব বেশি।

অঙ্ক ক্রীড়া নয়—অক্ষর ক্রীড়া

"NO MORE STARS" এই তিনটি শব্দকে মিলিয়ে একটি শব্দে রূপান্তরিত করতে পারো?

Printer and Publisher B. Bhattacharya, Prabhu Press, 30, Cornwallis Street, Calcutta.

"শব্দ-সন্ধান"

(প্রতিযোগিতা-কুপন)

(যে কোনো পাঠক বা পাঠিকা এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারেন, এবং যতগুলি ইচ্ছা কুপন পাঠাতে পারেন)

১ প	২	৩ লো		৪ ন	■	৫	৬ কু	৭ ব
৮	স		■	৯	১০ র	■	১১ মা	
	■	১২	১৩ প	■	১৪	১৫ দা		
১৬	১৭ তী			■	১৮ ক		■	■
■		■	১৯	২০ র		■	২১ নে	
২২		২৩ স	■		■	২৪ জ		■
	■	২৫	২৬ ক	■	২৭		দে	২৮ বী
২৯ কা				৩০	■	৩১ শূ		
	■		■	৩২ ত			■	

(পাঠশালা, কার্তিক)

নাম..

ঠিকানা..

....

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আগামী ১৫ই কার্তিকের মধ্যে কুপনখানি পাঠশালা-কার্যালয়ে পৌঁছনো চাই।

☞ (কুপনে কোনো কাটাকুটি বা বানান ভুল চলবে না।)

নিয়মাবলী

"পাঠশালা" প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয়।

আশ্বিন মাস থেকে পাঠশালার বর্ষারম্ভ।

লেখা ও ছবি প্রতিমাসে অন্তত ৫৬ পৃষ্ঠা থাকবে, আকার ডবল ক্রাউন ৪ পেজি।

বার্ষিক মূল্য মণি অর্ডারে পাঠাইলে তিন টাকা। ষাণ্মাসিক দেড় টাকা। ভি পিতে বার্ষিক মূল্য ৩৷০ তিন টাকা চারি আনা। ষাণ্মাসিক ভি পি করা হইবে না।

নগদ মূল্য প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা।

নমুনার জন্য পাঁচ আনার ডাকটিকিট পাঠাইবেন।

মফঃস্বলের গ্রাহকগণ প্রকাশকের ঠিকানায় মনিঅর্ডারযোগে টাকা পাঠাবেন। শহরের গ্রাহকগণও ঐ ঠিকানায় টাকা জমা দিবেন।

মাসের প্রথম সপ্তাহে কাগজ না পেলে ডাকঘরের জবাব সহ ১৫ই তারিখের মধ্যে জানা'লে আর এক কপি দেওয়া হবে।

ডাকটিকিট দেওয়া থাকিলে অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠানো হবে। চিঠির উত্তর রিপ্লাইকার্ড পেলে দেওয়া হবে।

বিজ্ঞাপনের হার

কভারের প্রথম পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে না।

ঐ দ্বিতীয় ও তৃতীয় পৃষ্ঠা	২৫৲ হিঃ
ঐ চতুর্থ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন	৫০৲
বিজ্ঞাপনের প্রথম পৃষ্ঠা	২২৲
পুস্তকারম্ভের পূর্ব পৃষ্ঠা ...	২৫৲
সূচীর পার্শ্বে অর্ধ পৃষ্ঠা	১৫৲
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	২০৲
ঐ অর্ধ পৃষ্ঠা	১২৲
ঐ সিকি পৃষ্ঠা	৭৲

ঐ সিকি পৃষ্ঠার কম বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে না।

রচনার মধ্যে বিজ্ঞাপন	৫০৲

বিজ্ঞাপন পরিবর্তন ক'রতে হ'লে পূর্বমাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে পাঠা'তে হবে।

বিজ্ঞাপন বন্ধ ক'রতে হ'লে একমাস পূর্বে নোটিশ দেওয়া দরকার।

নূতন বিজ্ঞাপন পূর্বমাসের ২০শে তারিখ পর্যন্ত নেওয়া হবে।

এক বৎসরের জন্য বিজ্ঞাপন দিতে চুক্তিবদ্ধ হ'লে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে।

প্রকাশক—রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

পাঠশালা কার্যালয়

৩০, কর্নওআলিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা PHONE—B. B. 4099

প্রাপ্তিস্থান—সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

চতুর্থ বর্ষ] অগ্রহায়ণ—১৩৪৭ [তৃতীয় সংখ্যা

সূর্য্যাস্ত

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

যায় যায় সূর্য ডুবে যায়।
যায় যদি যাক তার কি আছে উপায়?
কে তার চলার পথ আগুলিয়া দাঁড়াবে সন্ধ্যায়?
দিগন্ত কমলবর্ণ রূপময় শোভাযাত্রা চলে
মরকত পদ্মরাগ মণিদীপ জ্বলে
মেঘের বেদিকামূলে বহ্নিময় শিখা
আশ্চর্য রূপের মরীচিকা-
আকাশ আচ্ছন্ন করে
ছড়ায়ে গোধূলিমায়া রূপছায়া লঘুপক্ষ ভরে
হিরন্ময় বহুরূপী বিহঙ্গের মত
শরীরী স্বপন শত শত।

স্তিমিত প্রবালবর্ণ জ্যোতিরুৎস দিনের দেবতা
যে দেশে প্রশান্ত নীরবতা—
দূর দিগন্তের কোলে যেখানে বঙ্কিম স্বর্ণরেখা
সুরঞ্জিত মেঘপ্রান্তে বিচ্ছুরিয়া বহু বর্ণ লেখা-
সেই নম্র মেঘস্তরে
পাখি ডাকা স্বপ্নে জাগা নীল তেপান্তরে
বৈরাগীর মত চলে যায়
যায় যায় সূর্যাস্ত সূর্য ডুবে যায়।

সূর্য ডুবে যায়
পৃথিবীর অশ্রুধারা ধূসর নদীর কিনারায়।
কল কল ছল ছল কত স্বপ্ন কত তার মায়া
বক্ষে মান গোধূলির বাষ্পে শ্যামছায়া,
তীরে তীরে বনশ্রেণী সোনালী সবুজ ঘন শাখা
আবীর কুঙ্কুম মাখা
অকথিত মিনতির মত
কম্পিত পল্লবপুঞ্জ মৌন ব্যথাহত।

সূর্য কি সন্ধান রাখে ঘাটে বাঁধা জীর্ণ তরণীতে
পৃথিবীর ক্ষুদ্র প্রান্তে অস্ফুট সঙ্গীতে
ভাঙ্গা হাল পাটাতন কাঁদে একা একা,
করুণ অস্তের স্বর্ণ রেখা
ফাটলে ফাটলে তার মৃদু মৃদু বুদ্বুদ কল্লোলে
বিষণ্ণ নদীর কোলে
জননীর অঙ্কশায়ী সন্তানের মত
সায়াহ্নের স্বপ্ন দেখে কত?
দূরে দেখা যায়
আরক্ত মেঘের স্তূপে বর্ণের চিত্রিত আল্পনায়
ব্যথার্ত অক্ষরে লেখা, 'সূর্য ডুবে যায়'।

উপদেবতা

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমরা তখন নিজেদের কাছে আর তরুণ নই,—বড় হয়েছি বলে' মনে করি। বড়দের বৈঠকে উঁকিঝুঁকি মারি। তাঁদের ফাইফরমাজ খাটতে প্রস্তুত। তাঁদের আদেশ পেলে বর্তে যাই। না বললেও—তামাক্‌ সাজি।

গ্রামের শ্রদ্ধেয় কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়—সিমলার পাহাড়ে বড় চাকুরি করেন,—এড্‌জুটেণ্ট্‌ জেনারেলের অর্থাৎ কমেণ্ডার চিফের আপিসের বড়বাবু। সাড়ে চারশো টাকা মাইনে পান্‌। দেখতেও ছ'ফিট্‌ লম্বা সুপুরুষ। শীতকালে আপিস কলিকাতায় আসে, তিনিও আসেন এবং এসেছেন। কলিকাতা তখন ভারতের রাজধানী। গ্রামস্থ বড় বড়রা তার বৈঠকে উপস্থিত। দেশবিদেশের নানা কথা চলছে,—ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ সোম বড় বড় সাহেবদের বদান্যতা, Magnanimity, সকলে উপভোগ করছেন।—সিমলাই স্বর্গ, সাহেবরাই দেবতা।—

আমরা ভিতরে ঢুকতে সাহস পাইনি,—বাইরে থেকেই শুনছি।

জমিদারদের মেজবাবু—প্রমথনাথ ঘোষ বললেন—প্যারীচরণ সরকার আমার জাত মারবার চেষ্টা করে-ছিলেন,—পারবেন কেন,—এ বংশে ও বিষ কোনো দিন তলাইনি। তোমার ও উইল্‌সন্‌, এক্‌শ্যাঙ্কদের thanks দিচ্ছি। অনেক দেশ দেশান্তর ঘুরলে—ভূত দেখেছ কি না বলো।

প্রমথবাবু ছিলেন কালীপ্রসন্ন বাবুর বাল্যবন্ধু। তাঁর কথাবার্তা ছিল—সরস ও মজলিসি।

সকলে হাসলেন, কালীপ্রসন্নবাবুও হাসলেন। বললেন—"তাও শোনাবো,—তোমার এতো ভূত-প্রীতি হোলো কেনো?"

প্রমথবাবু বললেন্‌—"আমাদের যে পাঁচভূত নিয়ে থাকতে হয়, তাদের পরিচয়ের ওপর যে আমাদের বিষয়কর্ম্ম নির্ভর করে. তোমাদের যেমন সাহেব চিনে কাজ করতে হয়'।

কালীপ্রসন্নবাবু বললেন—"তবে একটা সত্য ঘটনা শোনো প্রমথ। গত পূর্ব্ববার যখন সিমলা যাই সেইবারে ঘটেছিল। ভূত আমি কোনোদিন বিশ্বাস করিনি,—তারা থাকতে পারেন, কিন্তু আমাদের সংস্রব রাখেন না। দুর্বলেরা নিজের সৃষ্টিকরা ভয় পেলে, ভূত দ্যাখে—ভূত বলে।—"

প্রমথবাবু বললেন—"আচ্ছা—বলে' যাও, বাধা দেবনা। দেশে তো থাকনা, কেবল মেজার্‌-জেনারেলই দেখছ"।

কালীপ্রসন্নবাবু বললেন—"আগে শোনাই তো।—বেহালার শ্রীযুক্ত বাবুও সিমলের পাহাড়ে কাজ করেন।—সেবার তিনি সেই প্রথম—পরিবার ও তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে পাহাড়ে যান। পূর্ব্বাহ্নে বাসা ঠিক্‌ করে গিয়েছিলেন। সিমলায় বাসা ঠিক্‌ করা কঠিন,—অন্ততঃ এক Season এর জন্যে অগ্রিম ভাড়া দিয়ে নিতে হয়। তিনিও তাই নিয়েছিলেন।—খাট্‌ বিছানা, কোচ্‌, চেয়ার, টেবিল্‌—well furnished,—এই নিয়ম। অন্যান্য প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত,—হাটবাজার আমরাই করে' রেখেছিলুম।

সিমলার "কালীবাড়ী" বাঙালিদের একটি বড় কীর্ত্তি। নূতন কেউ এলে সেইখানেই ওঠেন, অসুবিধার কোনো কারণই নাই।—পরে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করে' নেন্‌। তাঁকে আর তা করতে হয়নি,—একেবারে সাজানো বাড়িতেই প্রবেশ করেন।—তাঁকে স্থিতু করে' দিয়ে,—রাত নয়টায়

আমরা যে যার বাসায় ফিরলুম। তাঁরাও ক্লান্ত ছিলেন, আহারাদি সেরে শয্যা নিলেন।

সকালে খবর নিতে যাওয়া গেল—"কোন অসুবিধা হয়নি তো"? দেখি—শ্রীযুক্তবেহারীর বাবু—বৈঠকখানায় —বিমর্ষমুখে গালে হাত দিয়ে চিন্তাকুল।—চোখমুখ বসে' গিয়েছে, চোখের নীচে কালিমা রেখা।—"ব্যাপার কি, নিদ্রা হয়নি নাকি। নতুন জায়গায়"

"না ভাই—সে সব কিছু নয়।—ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে এনে কি ভুলই করেছি।—বড় বিপদ,—পরিবার তো একলা এসব ওসব করতে পারছেন না, এক রাতেই —তাঁর মুখ দেখলে ছ'মাসের রোগী বলে' মনে হয়। তাঁর কোনো কাজে হাত-পা আসছেনা,—বলছেন—এ বাড়ী আজই বদলাও, না হয় আমাদের দেশে রেখে এসো।—আজ আর তোমার আপিসে যাওয়া হবে না—একা আমি ছেলেপুলে নিয়ে আগাম আড়াইশো টাকা দিয়ে বাসা নিলুম,—এখন '—কি যে করবো ভেবে উঠতে পারছিনা ভাই তাঁর চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে এলো।

ব্যাপার অনুমানে আমরাও স্তম্ভিত। তবু বললুম—"সব খুলে বলতো শুনি।—আজ আর তোমার আপিসে গিয়ে কাজ নেই,—সে আমরা সামলে নেব"—

বললেন,—"কি আর বলবো—পাঁচকান না হওয়াই ভালো। বিশ্বাস করাও কঠিন।—এ বাড়িতে থাকা-বিশেষ ছোট ছেলে মেয়ে নিয়ে,—সম্ভব নয়।—বাগানের সামনে শোবার ঘর দুটির প্রথমটি অপেক্ষাকৃত বড়—সেইটিতে পরিবার, ছেলে মেয়ে নিয়ে রইলেন, পাশের ঘরটিতে আমি। মাঝের দোর খোলা রইল। সকলেই শ্রান্ত, শয্যা নিতেই ঘুমিয়ে পড়া গেল।--

'পাহাড়ের ঠাণ্ডা এখনো মন্দ নয়। ছেলে ওঠায়, তার মা তাকে বাগানের দিকের জানালায় দাড় করিয়ে মূত্র ত্যাগ করান,—নূতন বাসায় বাইরে নিয়ে যেতে সাহস পান নি। তারপর আবার শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছেন। একটু পরেই বিকৃত স্বরে আমাকে ডেকে উঠলেন।—আমিও তখন বিশ্রী একটা কি—বোধ হয় স্বপ্নই হবে, দেখে, জেগে পড়েছি। "কি হোলো কি, ভয় কি। বলতে বলতে গিয়ে দেখি তিনি কাঁপছেন। কাছে বসে চোখে মুখে জল ও মনে সাহস দেবার পর, একটু সামলে বললেন—"তোমার কোনো বন্ধুর বাড়িতে এখুনি চলো, এখানে আর থাকা হবে না।"

—"কি, ব্যাপার কি বলো দেখি?" বললেন—"ছেলেকে ঐ জানালায় প্রস্রাব করিয়ে এনে শুয়েছি,—ঘুমিয়ে পড়েছি কি না, ঠিক বলতে পারি না। দেখলুম—(চারদিকে চাইলেন) দেখলুম—গেরুয়া পরা, গেরুয়া উত্তরীয়, গৌরবর্ণ দীর্ঘাকৃতি পুরুষ, লম্বা চুল, গোঁফ দাড়ি, কপালে রক্ত চন্দনের ফোঁটা, গলায় এক গোছা পৈতে আর রুদ্রাক্ষের মালা, হাতেও রুদ্রাক্ষ। ঈষৎ রুষ্ট ভাবে বললেন,—"আজই তোরা এ বাড়িতে এসেছিস—নূতন লোক, কিছু জানা নেই। যার দ্বারা আমার পবিত্র আসন নষ্ট হয়েছে—সেও বালক। তোরা দেখছি ব্রাহ্মণ, শুদ্ধাচারে থাকাই ব্রাহ্মণের প্রধান পরিচয়,—সেটি মনে রাখিস, আর পালন করিস। স্নানান্তে কাল শ্রদ্ধার সহিত স্থানটি মার্জনা করা চাই। গঙ্গাজল ছড়া দিয়ে ধূপ ধুনা দিন। কালী বাড়িতে গঙ্গা জল পাবি। আর কখনো এরূপ অপরাধ না হয়। ভয় নেই,—এতে তোদের মঙ্গল হবে।—আমি এখানে অনেকদিন আছি, ঐ স্থানটিই আমার আসন। আমি থাকতে তোদের কোনো অনিষ্ট হবে না, ইত্যাদি। তারপর হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন।

—"আশ্চর্য, আমিও ঠিক ঐ এক সময়েই ওইরূপই তাঁকে দেখেছি ওই ব্রহ্মচারী বেশ, আমাকেও ঠিক ঐ কথাগুলিই বলেছেন। তখন আমার মনে হচ্ছিল, পরিবারকে বলবার আগে, তোমাদের জানাবো, তার পর যা যুক্তি হয় করবো। এমন সময় তিনি ভয় বিকৃত কণ্ঠে ডাকলেন।—তিনি তো কিছুতেই আর এ বাসায় থাকবেন না,—আমিও সাহস করি না ভাই।"

অনেক ভাবনা চিন্তা ও আলোচনার পর প্রবীণেরা, তাঁদের মধ্যে আমি ও বেলঘরের বিশ্বনাথ বাবুও ছিলেন, সকলে বললেন,—"এ ঘটনা অস্বাভাবিক বলেই আমাদের সহজেই বিচলিত করে,—ভয় হয়। কিন্তু তাঁর কথাগুলির মধ্যে ভয়ের একটি কথাও তো খুঁজে পাই না, বরং মনোস্থির করে ভেবে দেখলে ভবিষ্যৎ মঙ্গলের ইঙ্গিত ও আভাসই পাই, অবশ্য তিনি যা বলেছেন সেগুলি নিষ্ঠার সহিত পালন করা যদি হয়। তার মধ্যে তো এমন একটি কথাও নাই যা পালন করা কঠিন বা ব্যয় সাধ্য। আর

ব্রাহ্মণের সংসারে ও সব তো নিত্য কর্মের মধ্যে। তাঁর কথা শুনে ভয় পাবার বা দ্বিধা করবার কোন কারণ নেই।"

কালী-বাড়ির পুরোহিত মহাশয় উপস্থিত ছিলেন, তাঁকে সকলেই শ্রদ্ধা ভক্তি করেন। তিনি একটু যেন উত্তেজিত স্বরে বললেন,—"এর মধ্যে বিচারের অবকাশ নেই, আচারের কথাই আছে। তা পালন করার ইঙ্গিতের মধ্যে ওঁর মঙ্গলের সূচনা অপেক্ষা করে রয়েছে। এটা মায়ের কৃপা বলে যেন গ্রহণ করা হয়। এ সব দৈব ঘটনা, অচিরেই এর সুফল পাবেন। ঠাকুর কথা শুনে যেন এ বাসা ছাড়া না হয়। ইচ্ছা করেন ঘরটি বন্ধ কোরে রাখবেন, রোজ শুদ্ধাচারে গিয়ে মা স্বয়ং মার্জনা কোরে, ধূপ ধূনা দিয়ে আর কিছু ফুল বিল্বদল রক্ত চন্দন রেখে আসেন। অসঙ্কোচে যাবেন আসবেন, তাঁকে বাড়ির কর্তা বলে ভাববেন, কিছু বলবার থাকলে বলবেন।—আবশ্যক বোধ করেন যদি তো—ওঁকে একবার কালীবাড়ী পাঠিয়ে দেবেন, আমি তাঁকে সব বুঝিয়ে দেবো।"

বেহালার বউ দ্বারের অন্তরালে থেকে সকলের কথা বার্তা শুনছিলেন। স্বামী অন্দরে প্রবেশ করতেই বললেন —"তুমি ভেব না, ব্যস্ত হয়োনা,—আমি এ-বাসা ছেড়ে অন্য কোথাও যাব না। তিনি আমাদের অভিভাবক রইলেন। এখন তাঁকে যতবার মনে পড়ছে, কই ভয় করছে না তো, তাঁর সুন্দর হাস্যমুখই দেখছি আর তুমি আর অফিসে যাবে না,—আমাকে ধূপ ধূনো, রক্ত-চন্দন, চন্দন পিঁড়ি আর নিত্য ফুল বিল্বপত্র পাবার ব্যবস্থা কোরে দাও। আমি আজই তোমার সঙ্গে গিয়ে মা-কালী দর্শন কোরে গঙ্গাজল নিয়ে আসবো।"—সহসা স্ত্রীর এই পরিবর্তনে বেহালার * * * বাবু অবাক।—তার ভয় ভাবনায় ভারাক্রান্ত বুক থেকে যেন বিশ মন পাথর সরে গেল।—

তারপর তিন বৎসর কেটে গিয়েছে। ইতিমধ্যে সে সংসারে বহু ঘটনাই ঘটেছে—দুরারোগ্য পীড়া, য হতে উত্তীর্ণ হবার আশা আমরা কেউই করতে পারি না। সে সকলের উল্লেখের আবশ্যক নেই। তবে একটি না বোলে পারি না। আপিসে "বেহালার" বাবুর কাজ ছিল বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ—Direct Home Concern-Imperial—রাজ্য সংক্রান্ত একখানি confidential (গোপনীয়) মারাত্মক ফাইল খোওয়া যায়, পাওয়া যাচ্ছিল না। হুলস্থূল পড়ে গেলো। না পাওয়া গেলে চাকরি তো যাবেই। ইতিমধ্যে তার গতিবিধি লক্ষ্য করবার জন্য, ভিতরে ভিতরে ডিটেক্‌টিভ নিযুক্ত করাও হয়েছিল। নজরবন্দী অবস্থা। আহার নিদ্রা নাই, আপিসে আসেন যান পাগলের মতো। আপিসের অন্যান্য সকলেও তটস্থ। কি হয়-কি হয়। কোন্ দিন কার হাতে দড়ি পড়ে। ছুটিছাটা বন্ধ। প্রত্যেক স্থান পঞ্চাশবার কোরে খোঁজা হয়েছে ও হচ্ছে, নিষ্ফল। দেড়মাস হয়ে গেল।

'বেহালার বউকে' এ কথা জানানো হয় কিন্তু স্বামীর অবস্থা দেখে তাঁর ভয় ভাবনা ও সন্দেহ হচ্ছিল — তাঁকে কারণ জিজ্ঞাসা ক কোনো সঙ্গত উত্তরও পাচ্ছিলেন না। 'আপিসের টাকাকড়ির কিছু করেছেন নাকি"—শিউরে উঠলেন, শরীর ও মন থেকে মুহূর্তে সমস্ত শক্তি সরে গেলো। বেলা প্রায় দ্বিতীয় প্রহর, আহারাদি নাই, একেবারে তাঁর ব্রহ্মচারী দেবতার ঘরে গিয়ে উপুড় হয়ে পড়লেন, ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন—"তুমি যে বলে-ছিলে—আমি থাকতে তোদের ভয় ভাবনার কারণ নেই। আবশ্যক হলে আমাকে জানাস তবে এ কি হোলো বাবা! আমি যে কিছুই জানিনা—জানাবো কি? কিন্তু, ওঁকে দেখে মনে হচ্ছে আমাদের বড় বিপদ। তুমি না বাঁচালে আমাদের আর কে আছে বাবা"। কাঁদতে লাগলেন।

শুনতে পেলেন—"তুমি জাননা, কিন্তু যার বিপদ সে তা জানে, তাকেও তো আমার বলাছিল।"

"বাবা, পুরুষের মনের কথা জানি না,—বিপদে জ্ঞান হারা হয়ে গিয়ে থাকবেন, ভুলে গেছেন। কিন্তু আমার যে তুমিই ভরসা,—বাচ্চাবাচ্চা নিয়ে আমি যে তোমার পাদপদ্মে নিশ্চিন্তে আছি, তাঁকে তুমি মাপ করলে,—আকুল কান্না।

"ওটা পুরুষের পৌরুষের স্পর্দ্ধা, দৈবে সহজ বিশ্বাস নাই। যাও—আগে কিছু খাওগে,—সব মিটে যাবে,—যাও।"

তখন বারটা বেজে গিয়েছে। বড় কর্ত্তা এড্‌জুটেণ্ট্ জেনারেল গম্ভীর মূর্তিতে আপিসে ঢুকে চীফ্‌কে

confidential 'আইরন্ সেফ্' খুলতে বললেন—নিজে দেখবেন। তাঁর চেহারা দেখে আপিস সুদ্ধ সকলে কম্পমান। চীফ্ও কম্পিত হস্তে সেফ্ খুললেন। জেনারেল নিজে উঠে গিয়ে ফাইলের পর ফাইল দেখতে লাগলেন। কাবুল, নেপাল, সব দেখা হোলো,—চঞ্চল ভাবে মাথা নাড়লেন। পরে নিজেই চেয়ার টেনে নিয়ে বসে অন্য একখানা ফাইল তুললেন, সেখানি লুসাই সম্পর্কীয়। খুলেই একত্রে গাঁথা কয়েকখানি কাগজ পেলেন,—উপরেই ছিল—তুলে নিয়ে দাঁড়ালেন। চীফকে সেফ্ বন্ধ কোরে তাঁর নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। চাপরে মুখ শুকিয়ে গেল, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন—সেই "হারানো" কাগজ।

আধঘণ্টা পরে তিনি জেনারেল সাহেবের ঘর থেকে অপরাধীর চেহারা নিয়ে ফিরলেন ও সরাসরি "বেহালার বাবুর" কাছে উপস্থিত হয়ে আপিসের (আমাদের) সকলকে ডাকলেন,—বাবু সভয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন। চীফ্ (Major) আমাদের সকলের সামনে নিজের দোষ স্বীকার কোরে তাকে বললেন—"Document"খানি আমাদের রাজ্য রক্ষার মন্ত্রবাহক। মার্শাল-ল (সামরিক আইন) অনুসারে আমার মিলিটারি মর্যাদা, খ্যাতি, চাকুরি সবই যেতে বসেছিল। বিশেষ অনুসন্ধানেও না পেয়ে, আমি বাধ্য হয়ে, তোমার প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার করেছি,—তিরস্কার, পীড়ন, লাঞ্ছনা, গুপ্তচর নিয়োগ—নজরবন্দী রাখা কোনো অত্যাচারই বাকি রাখি নাই। তোমরা যে চিন্তায়, অনাহারে, অনিদ্রায় স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়েছে দেখছি। এ সবই আমারি অপরাধে ঘটেছে। আমি তাই সব সমক্ষে আমার অপরাধের জন্য তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি—আমাকে ক্ষমা করো।"

বাবু বাধা দিলেন। দাঁড়িয়ে ছিলেন,—তাঁর চক্ষু হতে ঝর্‌ঝর্ কোরে জল পড়ে টেবিলের প্যাড ভিজে গেলো। কথা কইতে পারলেন না।

মেজর বললেন—"এসব কথা কেবল আমারি নয়—জেনারেল সাহেব কাজ কর্ম ও কর্তব্য সম্বন্ধে বড় কঠিন, কিন্তু খাঁটি ক্রিশ্চান হৃদয় তাঁর মোমের চেয়েও নরম। এ তাঁরি কথা, তাঁর আদেশ। আমি তাঁকে বিশেষ জানি, দোষ নিয়ে তিনি তোমার ভালো করতে ভুলবেন না। যাও তোমার আজ ছুটি, বাড়ী যাও।

তবে, একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছিনা, কাবুল সংক্রান্ত কাগজ কি করে লুসায়ের ফাইলে,—যাক্, পাওয়া তো গিয়েছে। আচ্ছা যাও, বাড়ী যাও। আমাকে এখুনি ইণ্ডিয়া অফিসে Cable করতে হবে। forget and forgive—তিনি চলে গেলেন।

বালী প্রসন্নবাবু বললেন—"বেলা হয়েছে, আজ থাক্" সত্যই বেলা হয়েছিল তাই বড় কেউ জেদ করলে না না। দু'একজন বললেন—"বাকিটা কিন্তু শোনাতে হবে ভাই।"

প্রমথ বাবু বললেন,—"আমার কেবল শুনলেই হবে না। প্রসন্ন, কিছুদিন কাছাকাছি এগিয়ে ছ, বড় চিন্তায় পড়ে রয়েছি। তোমাদের সিমলের যে বাড়ী তো এখন খালি, এড্রেসটা আমার চাই,—তামাসা নয় ভাই।"

কৃপা ও কৃপণ

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

কৃপার ভিখারী নই মোরা তব কৃপাণেরে করি ভয়।
আমাদের এই আবেদন-প্রভু কৃপার জন্য নয়।
ক্ষতি করিবার বিপুল ক্ষমতা পেয়েছ দৈববলে,
ভয়ে নিরীহেরা হয় যে প্রণত তোমার চরণতলে।
ভক্ত জনের অর্ঘ্য-প্রদান ভাবিতেছ তারে বুঝি ?
মনে রেখ প্রভু ফণী শনি আর অশনিরে মোরা পূজি

বাণী-বন্দনা

শ্রীগিবিজাকুমাব বসু
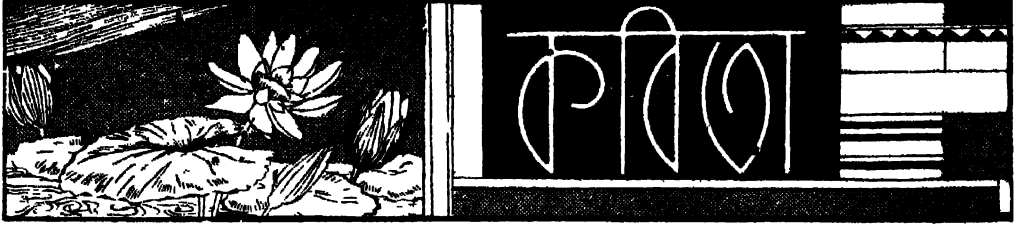
মরমের প্রেমমধু ছন্দে
শ্রদ্ধা আনত কবি শ্রীচবণ বন্দে,
ওই বাঙা পাযে তাব
ঠাঁই হোক অনিবাব
বীণা তব
অভিনব
তুলি সুব ঝঙ্কার
রাখে যেন বাঁধি তাবে পূত প্রীতি-বন্ধে

নেই লোভ যশে আব বিত্তে
তুমি হলে অকরুণ বড়ো বাজে চিত্তে
তোমাব প্রসাদ যাচি
তোমাবেই চাহিয়াছি
সুখে, দুখে
এই বুকে
তোমারেই বাখিযাছি,
জীবনেব তুমি সাব আব মানি মিথ্যে।

নিরুপমা তনু দেহ কান্তি
তোমাবি প্রতিমা ধ্যানে, মনে চিবশান্তি
কোমল নযন নীলে
যে মাধুবী আসি মিলে
তাবি আলো
সব কালো
শুভ্র কবিযা দিলে
নিমেষে সে নিল হবি শত দুখ শ্রান্তি।

বরাভয-ভবা তব পাণিগো
হিযা-শতদলাসনা সঙ্গীত-রাণী গো
তোমাবেই ভালোবাসি
নিও তুমি নিও আসি
মরমের
অর্ঘের
পুষ্পমালিকা রাশি
সেবকেব আরাধিতা সুধাময়ী বাণীগো

বেয়াই-পরিচয়

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

শিবেশ্বর বাবু অকস্মাৎ গর্জন করে উঠলেন—আশা—আশা—এই আশা।

রাগে তিনি যেন ফুলছিলেন। কন্যা আশার বয়স হয়েছে, সে সন্তানের জননী। সে আর বাপের ক্রোধকে তেমন ভয় করে না। আর অভ্যাসেও ভয় কেটে যায়। আশা বল্‌লে, কি বাবা—দাদা এলোনা এখনও?

শিবেশ্বর বাবু বল্‌লেন—সেই ত বলছি। তোদের আমি সহ্য করতে পারি না ঠিক এই জন্যে।

প্রকাণ্ড মাথাটা এদিকে একবার ওদিকে একবার ঘুরে আবার সোজা হয়ে স্থির হ'ল।

আশা বল্‌লে—তা আমি কি করব বাবা?

তবে সব করব আমি? জুতো মারব সে হারাম-জাদাকে। সে শূয়ার আমাকে বলে গেল চারটের সময় মোটর নিয়ে আসব—কোথায় কি? রাস্কেল—ঈডিয়ট।

অগ্নিবর্ষণ হচ্ছিল ছেলে সুধীরের উপর। সুধীরের শ্বশুর বাড়ী শ্যামবাজারে। সেখানে শিবেশ্বর বাবুর আজ যাওয়ার কথা ছিল। সুধীরের উপর আদেশ ছিল চারটের সময় সে মোটর নিয়ে ফিরবে এবং একসঙ্গে সেখানে যাওয়া হবে। কিন্তু পাঁচটা বেজে গেছে তবু সে ফেরেনি। সুধীর ইঞ্জিনীয়ার, সে স্বাধীনভাবে কন্ট্রাকটারের কাজ করে। আশা বল্‌লে—একটু দেরী হ'লই বা বাবা!

—দেরী হ'লই বা? চালাকী নাকি? দেরী হবে কেন? কেন হবে?

শিবেশ্বর বাবুর চোখ দুটো হয়ে উঠল যেন গোল ভাঁটা, ঠোঁট দৃঢ় চাপে উঁচু হয়ে উঠল—সঙ্গে সঙ্গে নাসিকাকম্পন এবং তৎসঙ্গে বিপুল গোঁফ জোড়াটাও ফুলে উঠল। তারপর—তার কথা ছিল—খুব গম্ভীরভাবে—হুম্—নয় এ্যাণ্ড।

আগে বাড়ীতে তার শুধু চলত। কিন্তু আশার ছেলে বন্নু দেখে শুনে কেঁদে বলেছিল—ঠিক যেন হুলো বেড়াল।

'হুম্,

তার উত্তরে লাউড স্পীকারের আওয়াজের মত এমন এক ধমক তিনি মেরেছিলেন যে বন্নু কেঁদে উঠেছিল।—সেই অবধি লজ্জিত হয়ে শিবেশ্বর বাবু বাড়ীতে অভ্যাস করেছেন—হুম।

যাক -এর পরই হুকুম হ'ল—নিয়ে আয় আমার কাপড় জামা। আমি বেরুব—

—দাদা—

—এ্যাও—

এমন একটা গর্জনে আশাকে তিনি সম্বোধন করলেন যে আশা আর প্রতিবাদ করতে সাহস করলে না।

কাপড় জামা হাতে দিয়ে আশা অনেক সাহস করে বললে—চিনে যেতে পারবে ত?

চোখ গোল হয়ে উঠল, ঠোঁট নাক উঁচু হয়ে গেল,—সঙ্গে সঙ্গে গোঁফ,—তারপর—হুঁম। যেতে পারব না? মীরাটের গলির চেয়ে বেশী গোলমেলে কলকাতার রাস্তা? খাইবার পাসের চেয়ে দুর্গম? ইডিয়ট কোথাকার!

আশা সরে পড়ল।

বাইরের সিঁড়িতে লাঠির ও জুতোর সদম্ভ আওয়াজ মিলিয়ে যাবার পর সে বল্লে—মাগো! গোরা সেপাই ঘেঁটে ঘেঁটে বাবার মেজাজ ঠিক লড়াইয়ে গোরার মতই হয়েছে।

মা বল্লেন—গোরা নয় মা, তোমার বাবা লড়াইএ ষেড়া। গুঁতো খেয়ে খেয়ে আমার প্রাণ গেল।

মহেশ্বর বাবু কলকাতায় একরকম নতুন লোক। তার এতটা বয়স কেটেছে বাংলার বাইরে। যুদ্ধ বিভাগের কমিসরিয়েটে তিনি কাজ করতেন। যৌবনে বলতেন—হ্যাঁ, কাজ করতে হয়ত এই কাজ। বেটা ছেলের কাজ। কামান গোলা বন্দুক আর সেপাইদের মধ্যে বাস না করলে উত্তেজনা কোথা? অন্য যে সব কাজ সে হল মেয়ে মানুষের কাজ। ছি:—

ছেলে সুধীরকে তিনি রুড়কীতে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে দিয়েছিলেন। ইচ্ছা ছিল তাকেও যুদ্ধ বিভাগে ঢোকাবেন। কিন্তু শেষে—বদলে গেল মতটা। সুধীরের বিয়ে ঠিক হ'ল কলকাতায় শ্যামবাজারে। ঘটকালী করেছিলেন শিবেশ্বর বাবুর সম্বন্ধী সুরেন্দ্র বাবু। মেয়ে দেখা থেকে সমস্ত পাকা কথাবার্তা প্রায় কয়েকদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। শিববাবুর স্ত্রী এসেছিলেন বাপের বাড়ী ভাইপোর বিয়েতে। সেইখানেই প্রতিবেশিনীদের মধ্যে রমাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যান; সঙ্গে সঙ্গে কথাবার্তাও স্থির হয়ে গেল। শিববাবু অমত করলেন না। ছুটির দরখাস্ত করলেন, ছুটিও মঞ্জুর হ'ল। তাঁর ইচ্ছে ছিল একমাত্র ছেলের বিবাহ বেশ খরচ করেই দেবেন। দিন স্থির হ'ল ১৮ই মাঘ। পৌষ মাসের শেষে সপরিবারে কলকাতায় আসবার কথা। কিন্তু বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত সীমান্ত প্রদেশে গোল বেধে উঠল। ওদিকে বাচ্চাই সাকো আফগানিস্থানে তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে তুললে। যুদ্ধ বিভাগ থেকে পরোয়ানা জারী হয়ে গেল—সর্বদা প্রস্তুত থাক, কখন রওনা হতে হবে তার কোন স্থিরতা নাই। সঙ্গে সঙ্গে শিববাবুর ছুটিও নামঞ্জুর হয়ে গেল। উপায় নাই। কিন্তু শিববাবু একটা ভীষণ দিব্য দিয়ে বললেন—আমার বংশে যদি কেউ এ মিলিটারীতে কাজ করে সে শূয়ার, সে গাধা। তাকে আমি ত্যাজ্য পুত্র করব, সে ছেলেই হোক—আর নাতিই হোক।

যাক বিবাহ হয়ে গেল। ছেলের মামাই কর্ত্তার কাজ করলেন। বিবাহের পর বৌ নিয়ে শিব বাবুর পরিবারবর্গ মীরাটে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাদের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়ে আদেশ দিলেন বাড়ী ঘর তৈরী কর আর সুধীর সেখানে কণ্ট্রাক্টারের ব্যবসা করুক। এ ঝঞ্ঝাট মিটলেই আমি রিটায়ার করব।

বালীগঞ্জে বাড়ী হ'ল। সুধীর আপিস খুললে। তার শ্বশুর ধনপতি বাবু সত্যিই ধনপতি। মহাজনী কারবার ছিল। বৃদ্ধ বয়সে জামাইয়ের সঙ্গে ব্যবসায়ে নামলেন। তিনি দেখতেন হিসেব, সুধীর আঁকত প্ল্যান, তিনি খাটাতেন মুজুর, সুধীর গাধনীতে মারত লাথি।

যাক্ শিবেশ্বর বাবু পরশু সন্ধ্যায় এখানে এসেছেন তল্পী তল্পা গুটিয়ে। ইতি মধ্যে মাসখানেক হ'ল সুধীরের একটি খোকা হয়েছে। শিববাবু পৌত্র দেখবার জন্য মহা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—সুধীরকে বল্লেন—শ্যামবাজার যাব বৌমাকে দেখতে। শ্বশুরকে বলবি তোর—তাঁর ওখানে আজ আমার নেমন্তন্ন।

সেই নিমন্ত্রণ নিয়ে এত ব্যাপার।

শিববাবু রাস্তায় ভাবলেন একটা ট্যাক্সি নেওয়া যাক। কিন্তু আবার মনে হল এখানকার ড্রাইভাররা শোনা যায় অনেক গুণ্ডা, তার চেয়ে 'বাস্' অনেক ভাল—শ্যামবাজার যাবেই সে—পথ ভোলা তার চলবে না। অন্তত: যাত্রীরা পথ ভুলতে দেবে না। কাজেই বাস্ ষ্ট্যাণ্ডে এসে দুবার তিনবার 'শ্যামবাজার' লেখাটা পড়ে, তিনি উঠলেন বাসে। কণ্ডাক্টার হাঁকছিল—ধরমতলা—ডালহৌসি—শ্যামবাজার। বাস্—ছাড়ল।

যাত্রী কম, এক এক সীটে এক একজন বসেছিলেন। বাসখানা ধীরে ধীরে কিছুদূর যায় আর থামে। থামল যদি ত আর যেতেই চায় না। শিবেশ্বর বাবু চটে উঠলেন। চৌরঙ্গী পর্যন্ত যেতেই আধঘণ্টা লেগে গেল। তিনি চটে বল্‌লেন—কি করছ তোমরা। আমার যে দেরী হয়ে যাচ্ছে।

কণ্ডাক্টার উত্তরই দিল না।

তিনি বল্লেন—এই।

কণ্ডাক্টার বল্লে—কি এই-এই বলচেন মশাই? আমরা এমনি ভাবেই যাই। ভারী—। শিববাবুর ঠোঁট, নাক, গোঁফ ফুলে উঠল,—তারপর শোনা গেল—'এ্যাও'। কণ্ডাক্টারটা চমকে উঠল।

একজন সহযাত্রী বল্‌লে—আপনি ট্রামে চড়লেন না কেন? ওদেরকসঙ্গে মারামারি করে কি করবেন?

—ও। আচ্ছা তাই যাব আমি। এই রোখো, রোখো—ময় উতার যাউঙ্গা। গাড়ী ডালহৌসি স্কোয়্যারের কোণে এসে পড়েছিল, তিনি সেইখানে নেমে পড়লেন। ট্রাম আসে-যায়, শিববাবু ঘাড় উঁচু করে পড়েন 'শ্যামবাজার' লেখা আছে কিনা। অবশেষে শ্যামবাজার এল। আফিস-আদালতের ছুটির সময়—কণ্ঠায় কণ্ঠায় যাত্রী ঠাসা। শিববাব উঠে পড়লেন। ভিতরে স্থানাভাব। একটু এগিয়ে গিয়েই একটা সিট খালি হ'ল, একজন উঠে গেলেন। একপাশে ডিস-পেপসিয়ার রোগীর মত খিটখিটে এক বৃদ্ধ বসে রইলেন।

শিববাবু টাল খেতে খেতে গিয়ে সেই সীটে ধপ করে বসে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে বিশাল ভুঁড়িতে কাতুকুতুর মত একটা কুনুইএর গুঁতো খেতে দেখলেন সেই খিটখিটে বৃদ্ধের কুনুইটা তাঁর ভুঁড়িতে বিদ্ধ হয়ে গেছে। তাঁর চোখ দুটো পাকিয়ে উঠল—নাক, ঠোঁট, গোঁফ ফুলে খাড়া হয়ে উঠল। তারপর—হুঁম্।

খিটখিটে বৃদ্ধ চশমাশুদ্ধ দৃষ্টি তাঁর মুখের ওপর ফেলে, মুখটা বিকৃত করে উঠলেন। শিববাবুর মাথাটা ক্রোধে বার কয়েক এদিক ওদিক ঘুরে গম্ভীরভাবে সোজা হ'ল। তারপর তাঁর বিশাল বাহু দিয়ে সহযাত্রীর প্যাকাটীর মতো হাতটা সরিয়ে দিয়ে বল্লেন—হটাও।

খিটখিটে বৃদ্ধ তীব্র দৃষ্টি হানে।

উত্তরে শিববাবু চোখ পাকিয়ে ওঠেন, সঙ্গে সঙ্গে খাড়া হয়ে ওঠে নাক, ঠোঁট, গোঁফ।

ওপাশের বৃদ্ধ বাইরের দিকে চেয়ে বল্‌লেন—কি বিশ্রী চেহারা।

শিববাবু অগ্নিদৃষ্টি হানলেন। মাথাটা বার দুয়েক ঘুরল। তিনি একটু চেপে বসলেন।

রোগা ভদ্রলোককে শিববাবু আতিকালে ইঁদুরের মত ট্রামের দেওয়ালের সঙ্গে চেপ্টে ধরেছিলেন। তিনি কুনুইয়ের গুঁতো দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করে বল্‌লেন—সরে বসুন না মশাই।

শিববাবু আরও একটু চেপে বসলেন।

—শুনতে পাচ্ছেন না?

উত্তর নাই। আরও একটু চেপে গম্ভীরভাবে শিববাবু সম্মুখের রাস্তার দিকে চেয়ে রইলেন।

—এই ঢাউস—পেটমোটা—কালা বেলুন—

—এ্যাও।

চোখ পাকিয়ে, গোঁফ ফুলিয়ে শিববাবু কঠোরভাবে সহযাত্রীর দিকে চাইলেন।

খিটখিটে বৃদ্ধও রোষে দাঁত খিঁচিয়ে তাঁর চোখে চোখ রাখলেন।

শিববাবু ঘৃণার সঙ্গে বলে উঠলেন—খেঁকী কুকুর।

খিটখিটে বৃদ্ধ রাগে পাগল হয়ে উঠলেন বল্‌লেন—খবরদার।

আরও একটু চাপ দিয়ে শিববাবু বল্‌লেন—ছুঁচোর মত ছুঁচলো মুখ।

সহযাত্রীর নড়বার ক্ষমতা ছিল না। নইলে নিশ্চয়ই নিজের অবস্থা ভুলে শিববাবুকে যুদ্ধে আহ্বান করতেন। উপস্থিত শুধু অতি কষ্টে বল্‌লেন—আর তুই?—তুই ত হুমো বেড়াল—

—এ্যাও।

—কি।

সেটা কিন্তু পিষ্ট অবস্থার জন্য অনুনাসিক হয়ে 'চিঁর' মত শোনাল।

শিববাবু বল্‌লেন,—চেপ্টে চিঁড়ে বানিয়ে ফেলব তোকে।

—বটে।—আমি তোকে পুলিশে দেব। সাক্ষী থাকুন

আপনারা—বলে চেঁচিয়ে উঠল রোগা লোকটি। অন্যান্য সহযাত্রীরা সকলেই ঘটনাটা লক্ষ্য করেছিলেন—কিন্তু তাতে এতক্ষণ আশঙ্কার চেয়ে আনন্দই পেয়েছিলেন বেশী। সকলেই মুখটিপে হাসছিলেন। এখন রোগা বৃদ্ধের অবস্থা দেখে তাঁরা শঙ্কান্বিত হয়ে উঠলেন।

একজন তিরস্কার করে বললেন—একি মশাই—দুজনেই আপনারা বয়স্ক লোক—একি আপনাদের আচরণ?

কাণ্ডাক্টার এসে শিববাবুকে বললে—আপনি এদিকে এসে বসুন বাবু।

আপনাদের পরিচয়—

ওদিকে একটা সীট এতক্ষণে খালি হয়েছিল।

শিববাবু হুঙ্কার দিলেন—কভি নেহি। দরকার হয় উনি যেতে পারেন।

উনি বললেন—আমিই বা যাব কেন? আমারও right আছে এ সীটে বসতে।

সহযাত্রীরা অনুরোধ করলে—তাহলে কিন্তু মশাইরা মারামারি করবেন না আর।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

ওপাশের বৃদ্ধ পেষণের কষ্ট ভুলতে পারেন নি। নিম্নকণ্ঠে তিনি বললেন—ইডিয়ট—

—এ্যাও।

শিববাবুর নাক ঠোঁট গোঁফ ফুলে উঠল।

—চোপ!

রোগা বৃদ্ধ রেগে উঠল।

সকলে আবার বলে উঠল—একি মশায়, আবার?

আবার চুপচাপ। কিন্তু মনের রোষে দুজনেই ফুলছিলেন।

শীর্ণ বৃদ্ধ প্রায় মনে মনেই বললেন—হুতোম পেঁচা

শিববাবুর কান বড় তীক্ষ্ণ—বার দুই ঘাড় ঘুরিয়ে তিনি বল্লেন,—তুই চামচিকে।

—তুই হাতী।

—তুই টিংটিংে ফড়িং।

—ননসেন্স।

—রাস্কেল্।

—ড্যাম।

—ষ্টুপীড্।

বেড়ালের ইঁদুর ধরার মত শিববাবু খপ করে দুই হাতে বৃদ্ধকে ধরে ফেল্লেন।

হাঁই করে সকলে এসে পড়তে না পড়তে রোগা বৃদ্ধকে দুটো প্রবল ঝাঁকি তিনি দিয়ে ফেলেন।

কণ্ডাক্টার এসে বললে—নেমে যান আপনারা বাবু। গাড়ীর ভিতর এ রকম—

শিববাবু গর্জে উঠলেন—কভি নেই। সঙ্গে সঙ্গে নাক ঠোঁট গোঁফ ফুলে উঠল।

রোগা বৃদ্ধের কিন্তু আর সে গাড়ীতে থাকতে সাহস হচ্ছিল না, তিনি স্বেচ্ছায় নেমে গেলেন।

অনেক প্রশ্ন করে অবশেষে ঘুরতে ঘুরতে বেয়াই এর বাড়ীর রাস্তা শিবু বাবু খুঁজে পেলেন। মনে মনে তিনি সুধীরের বাপান্ত করছিলেন।

২০ নং বাড়ীতে যেতে হবে তাঁকে। আঠারো নম্বরের কাছাকাছি আর একটা গলি ঐ রাস্তাটাকে কেটে চলে

গেছে। সেখানে আসতেই ও-মোড় থেকে এগিয়ে আসা সেই রোগা বুড়োর সঙ্গে দেখা।

রোগা বুড়ো তাঁকে দেখেই একেবারে খাপ্পা হয়ে উঠেছিলেন। লাফিয়ে উঠে বল্‌লেন—এইবার কি হয় শালা—

—এ্যাও।

গর্জন করে শিববাবু কাপড় সাঁটতে প্রবৃত্ত হলেন।

পিছন থেকে একখানা মোটরের হর্ণে দুজনকেই রাস্তার একপাশে সরতে হল। মোটরটা থেমে গেল।

সুধীর মোটর থেকে নেমে বললে—এই যে। আপনাদের পরিচয় তা'হ'লে হয়ে গেছে ?

দুই বৃদ্ধই দুজনের মুখপানে তাকিয়ে রইলেন।

সুধীর রোগা বৃদ্ধকে বললে—আমার একটু দেরী হয়ে গেল। ফিরে এসে আপিসে দেখি আপনি চিঠি লিখে রেখে 'বাসে' চলে এসেছেন। শিববাবুকে বললে—বাড়ী গিয়ে দেখি আপনিও বেরিয়ে পড়েছেন।

শিববাবু মোটা হলেও বুদ্ধিমান লোক। দুই বাহু বিস্তার করে ধনপতি বাবুকে জাপটে ধরে বললেন—আরে বেহাই যে ? সুধীরের একটু ধাঁধা লাগল—সে বল্‌লে—সে কি আপনাদের পরিচয়—

শিববাবু বল্‌লেন—হয়ে গেছে।

ধনপতিবাবু তখন শিববাবুর আলিঙ্গনের চাপে কোঁক-কোঁক করছিলেন।

হেমন্তে

শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী

মার্গের শীর্ষ কেন হ'ল অঘ্রাণ,
সহজেই টের পাবে, দিকে দিকে লও ঘ্রাণ,
'মিত্রে'র পূজাতে চাই কত আয়োজন,
ফল চাই, ফুল চাই, বান্নারও প্রয়োজন।
পায়স নূতন গুড়ে, পিঠা মুগ-সামুলি ,
সুক্তানি, বড়িভাজা, ঘণ্ট যা' মামুলি।
সরুচাকী, রসবড়া, চালতার অম্বল,
চচ্চড়ি, ভাজাভুজি, বাঙ্গালীর সম্বল।
উম্‌নার, ঝুম্‌নার ইতুকথা,—লক্ষ্মীর
তিল-সোনা-ব্রতকথা, ডালভাত, দইক্ষীর।
নবান্নে নানা নেঠা, জানে সব গিন্নি,
জনে জনে বেঁটে দেবা, যেন কাঁচা সিন্নি।
নয়া-গুড়, নয়া-চাল, দুধ, ফল-ফুলারী,
ক্ষীরপুলি মেওয়া দিলে, হয় আরও দুলারী।
সরষের মূলোফুলে, কলায়ের শুঁটীতে,
সবুজের শোভা বাড়ে, রংদার বুটীতে।
সোনা-ফলা পাকাধানে, ভরে ওঠে ভরাবুক,
আকাশেতে গানভাসে, ছেলেবুড়া হাসিমুখ।
'মৃগশিরা' তারকার নামে বটে পরিচয়,
যদিও হয়েছে এর, তবু শুধু তাই নয়।
জমা দেয় গোলাঘরে, বরষের অন্ন।
জীবনের মার্গে এ' শ্রেষ্ঠ সেজন্য।

ইংরাজী সাহিত্যের ধারা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অধ্যাপক ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, পি-আর এস্, পি-এইচ-ডি

এলিজাবেথীয় যুগে নাট্য সাহিত্য

(৩) তৃতীয়তঃ, উদার অপক্ষপাত মনোভাব শেকসপিয়ারের আর একটি বিশেষত্ব। নাট্যকারের আদর্শ নৈর্ব্যক্তিকতা (impersonality), তিনি চরিত্র সৃষ্টি করিবেন, কিন্তু কাহারও পক্ষাবলম্বন করিবেন না। নানা লোকের মুখে তিনি নানাবিধ মতবাদ আরোপ করিবেন, কিন্তু এই সমস্ত মতবাদের মধ্যে তাঁহাকে ধরা ছোঁওয়া যাইবে না। অধিকাংশ নাট্যকারই এই আদর্শ সম্পূর্ণ রক্ষা করিতে পারেন না। চরিত্রাবলীর মতাভিব্যক্তির মধ্যে তাঁহাদের নিজ মানসিক প্রবণতা বা ঝোঁক অজ্ঞাতসারে ফুটিয়া উঠে। শেকসপিয়ার কিন্তু এই অভিযোগ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। নানা সমালোচক তাঁহার রচনা খুব সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিয়া তাঁহার প্রকৃত মনোভাবের কণা মাত্র আবিষ্কার করিতে পারেন নাই তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র সমূহের অন্তরালে তিনি সম্পূর্ণ আত্ম-গোপন করিয়াছেন। তাহার মুখোস খুলিয়া কেহ তাঁহার প্রকৃত মুখাবয়বের পরিচয় পান নাই। তাঁহার রাজ-নৈতিক ও দার্শনিক মতবাদ, জীবন সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা, তাঁহার পারিবারিক ও সামাজিক আদর্শ - সবই অনিশ্চিত ও রহস্যাবৃত। যাঁহার নিকট এই অনন্ত—বৈচিত্র্যময় মানব-প্রকৃতি একেবারে স্বচ্ছ ও অনাবৃত, তাঁহার নিজ প্রকৃতি কেমন ছিল এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তিনি রাজতন্ত্র বা গণতন্ত্র কিসের পক্ষপাতী ছিলেন—হ্যামলেটের গভীর আত্ম-জিজ্ঞাসা, ফলষ্টাফের আদর্শ লেশহীন বিলাস বাদ, টাইমনের মনুষ্য জাতির প্রতি ঘোর অবিশ্বাস, প্রস্‌পারোর প্রশান্ত জ্ঞান গাম্ভীর্য, মার্কুইসিওর লঘু তরল দৃষ্টি-ভঙ্গী, কোনটা নাট্যকারের আসল প্রকৃতি ও মনোভাবের দ্যোতনা তাহা কেহই জোর করিয়া বলিতে পারে না। তিনি এই সমস্ত পরস্পর বিরোধী আদর্শের মধ্যে এমন সূক্ষ্মভাবে তুলাদণ্ড ধরিয়াছেন যে দাঁড়ি পাল্লা কোন দিকেই অনুমাত্র হেলিয়া পড়ে না।

কিন্তু কোন চরিত্র বিশেষের সহিত শেক্‌স্‌পিয়ারকে একাত্ম করিয়া না দেখিলেও, সমগ্র নাটকাবলী হইতে তাঁহার যে ব্যক্তিত্ব ধীরে ধীরে মূর্তি পরিগ্রহ করে তাহার গভীরতা ও প্রসারে আমরা বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়ি। সৎ, অসৎ, সংকীর্ণ, উদার, উচ্চ, নীচ সকলের প্রতিই তাহার একই প্রকারের স্নেহ দৃষ্টি—কেহই তাঁহার সর্ব-ব্যাপী সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হয় না। সকলেরই মনের কথা তিনি বুঝিয়াছেন, সকলেরই আত্ম সমর্থনে তিনি সায় দিয়াছেন। তিনি সকলের সঙ্গে এক সাধারণ সমতল ভূমিতে বিচরণ করেন—নীতিবিদের উচ্চ মঞ্চ হইতে কাহাকেও সমালোচনা করেন নাই, বিচারাসনে নিজেকে অধিষ্ঠিত করিয়া পাপ-পুণ্য অনুসারে দণ্ড পুরস্কার বিতরণের স্পর্ধিত মনোভাব দেখান নাই। যে ভগবান বিভিন্ন প্রকৃতির নর-নারী সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাদের প্রতি তাঁহার মনোভাব কি তাহা আমরা জানি না, কিন্তু অনুমান করিতে চেষ্টা করি। আমরা কল্পনা করিতে ভালবাসি যে ভগবান সমাজপতির বক্র-চক্ষু লইয়া পাপীর বিচার করিতে চাহেন না। ভগবানের এই উদার, স্নিগ্ধ ক্ষমাশীলতা সম্বন্ধে আমরা শেক্‌স্‌পিয়ারের নাটক হইতে ধারণা করিতে পারি। যে জাতিগত বিদ্বেষ আমাদের সকলেরই অস্থি-মজ্জার সহিত মিশিয়া থাকে, শেক্‌স্‌পিয়ার তাহাকেও সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিয়াছেন। মধ্য যুগে ইহুদী জাতির বিরুদ্ধে একটা ঘোরতর বিদ্বেষ ও অবজ্ঞা ইউরোপের সমস্ত দেশেই বদ্ধমূল ছিল। "ঘৃণিত কুক্কুর"—ইহাই ইহুদীকে সম্বোধন করিবার প্রচলিত প্রথা ছিল। যাহাকে আমরা ঘৃণা করি সে ক্রমশঃ ঘৃণ্যই হইয়া উঠে এই সনাতন নীতি অনুসারে ইহুদীরাও অতি ক্ষুদ্রচেতা, সন্দেহ পরায়ণ,

প্রতিহিংসা-প্রবণ ও অসামাজিক হইয়া উঠিয়াছিল। শাইলক-চরিত্র এই যুগব্যাপী ঘৃণা ও অবিচারের স্বাভাবিক পরিণতি—শেকস্‌পিয়ার তাহার স্বভাবের বিকৃতি ও বীভৎসতা দেখাইতে কার্পণ্য করেন নাই। কিন্তু এই বহু নিন্দিত ইহুদী জাতির প্রতিও তাঁহার মনের কোণে স্নিগ্ধ সহানুভূতি সঞ্চিত ছিল। শাইলকের সপক্ষে যাহা বলিবার আছে তাহা তিনি অনন্যকরণীয় বাগ্মিতা ও অখণ্ডনীয় যুক্তি তর্কের সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন। শাইলকের আত্ম-পক্ষ সমর্থন সূচক অমর উক্তি—'ইহুদীর কি চক্ষুকর্ণ নাসিকা নাই? তাহার সুখ-দুঃখ বোধ, মান অপমান জ্ঞান নাই? তাহাকে আঘাত করিলে রক্তপাত হয় না?'—সমস্ত নির্যাতিত মানবজাতির কণ্ঠ নিঃসৃত প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ-ঘোষণা।

(৪) শেকস্‌পিয়ারের কবিত্ব শক্তি ও মানুষের সামাজিক জীবন সম্বন্ধে পরিপক্ক বহুদর্শিতাও তাঁহার অপ্রতিদ্বন্দ্বী উৎকর্ষের অন্যতম কারণ। নাট্যকারের পক্ষে নিছক কাব্যোচ্ছ্বাসের অবকাশ সীমাবদ্ধ। তিনি নিজের জবানীতে কবিতা লিখিতে পারেন না, সমস্ত তাহার পাত্র-পাত্রীর মুখে আরোপ করিতে হয়। কাজেই চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য না রাখিয়া কবিতা লিখিলে তাহা অপকর্ষেরই হেতু হইয়া থাকে। তাঁহার ট্রাজেডির নায়কেরা ও কমেডির প্রেমিকেরা অতি স্বাভাবিক ভাবে উচ্চাঙ্গের কবিতার মধ্য দিয়া তাঁহাদের আবেগ প্রকাশের ভাষা পাইয়াছেন। ম্যাকবেথ, রাজা লিয়র, ওথেলো, হ্যামলেট, প্রসপারো, রোমিও—ইঁহাদের সকলের গভীর হৃদয়াবেগ যে অতুলনীয় কবিতায় ব্যক্ত হইয়াছে তাহাতে প্রমাণ হয় যে শেকসপিয়ার একখানি নাটক না লিখিলেও কেবল মাত্র কবি হিসাবে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারিতেন।

তারপর জীবন ও ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁহার যে সমস্ত মূল্যবান মন্তব্য আছে তাহা প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই সুপরিচিত। এগুলি যেন অভিজ্ঞতা সমুদ্র মন্থন করিয়া আহরণ করা বস্তু। শেকস্‌পিয়ারের নাটক হইতে উদ্ধৃত বাক্যাংশগুলি প্রবাদ বাক্যের মতই লোকের মুখে মুখে চলা-ফেরা করে। ইংরেজী ভাষার সুভাষিত-সংগ্রহে এক শেকস্‌পিয়ারের অবদান যত বেশী এত আর কাহারও নয়।

এই কয়েকটি মাত্র বিষয়ের আলোচনায় সাহিত্য জগতে শেকস্‌পিয়ারের আসন কত উচ্চে তাহার কিঞ্চিৎ ধারণা হইবে। সমালোচকবৃন্দ যেন পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া মহাকবির গুণাবলী নির্ণয়ে প্রশংসার চরম ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। অপরিমেয় সৃষ্টি রহস্যের কৌশল যদি কোন মানুষ কিছু আয়ত্ত করিয়া থাকেন, তবে সে শেকস্‌পিয়ার। দুজ্ঞেয় মানব হৃদয় তাঁহার নিকট যেন স্ফটিক স্বচ্ছ, তিনি যেন ভগবানের "গুপ্তচর" হিসাবে তাঁহার সর্বদর্শিতার অংশভাক্‌ হইয়াছেন। সৃষ্টি মন্ত্রের গোপন অক্ষর কয়েকটা যেন সৃষ্টি কর্তা তাহার কানে কানে শুনাইয়াছেন। আবার আর এক দিক দিয়া এই মূক, বিরাট, অলক্ষিত অথচ অভ্রান্ত রূপে ক্রিয়াশীল প্রকৃতি দেবীর সঙ্গেও তাহার এক নিগূঢ় সাদৃশ্য অনুভব করা যায়। শেকস্‌পিয়ারের আর্ট এত নিখুঁত ও সূক্ষ্ম যে ইহা মানুষের চেষ্টাকৃত রচনা অপেক্ষা প্রকৃতির স্বতঃ উৎসারিত সৌন্দর্য সৃষ্টির কথাই বেশী মনে পড়াইয়া দেয়। মনে হয় যেন এই বিরাট জড় প্রকৃতির দেহে যে গূঢ় শক্তি অজ্ঞাতসারে কাজ করিয়া ফুল ফোটায়, ফল পাকায়, ঋতুচক্রের আবর্তন নিয়ন্ত্রিত করে, গ্রহনক্ষত্রের নিয়মিত কক্ষ ভ্রমণের প্রেরণা যোগায়, তাহাই যেন মুহূর্তের আত্মবিস্মৃতিতে মানবের সচেতন বুদ্ধির মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়া মহাকবির অনুপম কাব্য সৃষ্টির হেতু হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা উচ্চতর প্রশংসার দ্বারা পৃথিবীর কোন কবিই এ পর্যন্ত অভিনন্দিত হন নাই।

৩

শেকস্‌পিয়ারের পরেই এলিজাবেথীয় যুগের নাটকের অধোগতি আরম্ভ হইল। তাহার পরবর্তী নাট্যকারেরা যথেষ্ট শক্তির অধিকারী ছিলেন—কিন্তু শেকস্‌পিয়ারের ঐশ্বরিক ঐশ্বর্য আর কাহারও ছিল না। ক্রমশঃ নাটকের চরিত্রগুলি অস্বাভাবিক—নাটকীয় সমস্যা অবাস্তব হইতে আরম্ভ হইল। যে নাটক সর্বসাধারণের প্রিয় ছিল তাহা কেবল মাত্র অভিজাত শ্রেণীর প্রীতি সম্পাদন করিতে লাগিল। কবিতার সহিত চরিত্রের অসামঞ্জস্য বাড়িয়া চলিল। অবসাদ ও অস্বাস্থ্যের লক্ষণ চারিদিকে প্রকট হইয়া উঠিল।

শেকস্‌পিয়ারের পূর্ববর্তীদের মধ্যে বেন জনসন সর্বা-

পেক্ষা উল্লেখযোগ্য। অত্যন্ত স্বাধীন চিত্ত লোক ছিলেন—শেক্স্পিয়ারের পদাঙ্ক অনুসরণ না করিয়া তিনি নূতন পথে চলিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এই নূতন পথ নাট্যকর প্রশস্ত রাজপথ ছিল না। তিনি প্রধানতঃ ব্যঙ্গ-প্রধান মনোবৃত্তি লইয়া নাটক রচনায় ব্রতী হইলেন। কাজেই তাঁহার চরিত্রগুলি অতিরঞ্জিত ও একপেশে হইয়া পড়িল। তিনি মানব চরিত্রের বিচিত্র জটিলতা পরিহার করিয়া তাহার একটী বৈশিষ্ট্যের উপর অতিরিক্ত জোর দিলেন। ইহার ফলে তাঁহার নরনারীরা যেন ব্যঙ্গ চরিত্রের (Caricature) সামিল হইয়া পড়িল। মানুষ যদি কেবল একমাত্র খেয়াল বা অভিপ্রায়ের বিকাশ হইত, তাহা হইলে মনুষ্য চরিত্র অতি অস্বাভাবিকরূপে সরল হইয়া পড়িত। পরস্পর বিরোধী ভাবের সমন্বয় বলিয়াই ইহা এত দুর্জ্ঞেয় ও রহস্যপূর্ণ। বেন জনসন এই সত্যকে অস্বীকার করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার অসাধারণ শক্তি সত্ত্বেও তাঁহার নাটকগুলি উচ্চাঙ্গের উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই "Every Man In His Humour" তাহার এ জাতীয় নাটকের সর্বোৎকৃষ্ট

আর একজাতীয় নাটকেও তাঁহার এই ব্যঙ্গ-প্রধান মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে—এগুলি লণ্ডন শহরের "Under world" বা চোর বদমায়েস প্রতারকদের আড্ডা ও ক্রিয়া কলাপ সম্বন্ধে লিখিত। এই সমস্ত নাটকেও বেন জনসনের বিদ্রূপ নিপুণতা উৎকট তীব্রতার সহিত অভিব্যক্ত হইয়াছে। নাটকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের স্থান আছে সত্য; কিন্তু ইহাকেই প্রধান স্থান দিলে নাটক ব্যঙ্গ-কবিতার একটা বিভাগ হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ ব্যঙ্গের সঙ্গে অতিরঞ্জনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। ব্যঙ্গের বিষয়ীভূত ব্যক্তিকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাহার দোষ ত্রুটির উপর অত্যধিক জোর দেওয়া হয়। কাজেই নাটকের যে প্রধান গুণ—গভীর ও অপক্ষপাত চরিত্রাঙ্কন—তাহা এই জাতীয় নাটকে অপরিহার্য ভাবেই বর্জিত হইয়া পড়ে। তথাপি এই প্রতিকূল অবস্থায় মধ্যেও বেন জনসনের নাটকীয় প্রতিভার এতটা বিকাশ হইয়াছে যে তিনি আমাদের সবিস্ময় শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন।

এই বিষয়ে শেক্স্পিয়ারের সঙ্গে বেন জনসনের একটা গভীর প্রভেদ দেখা যায়। শেক্স্পিয়ারের কোন কোন নাটকে চোর বদমায়েস ও লম্পটদের জীবন-যাত্রা বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু ইহাদের বিরুদ্ধে তাহার বিন্দুমাত্র উষ্মা বা বিদ্বেষ লক্ষ্য করা যায় না। তিনি তাহাদের ক্রীড়াশীলতা তাহাদের কৌতুক প্রিয়তা জীবনকে নীতি শাসনের বন্ধন হইতে ছাড়াইয়া লইয়া পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করার ব্যাকুলতা "ক্ষমা সুন্দর চক্ষে" নিরীক্ষণ করিয়াছেন—বিশুদ্ধ হাস্যরসের প্রস্রবণে তাহাদের দেহ মনের পঙ্কিলতা ধুইয়া দিয়াছেন। এই খানেই শেক্স্পিয়ারের মহত্ত্ব ও গৌরব—এইখানেই তিনি তাহার সমসাময়িকদিগকে বহুদূরে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন।

পৃথিবীর সাহিত্যে যে কয়েকটী স্বল্প সংখ্যক গৌরবময় যুগ আছে, এলিজাবেথীয় যুগ তাহার মধ্যে বোধহয় শ্রেষ্ঠতম। গ্রীসে পেরিক্লিসের যুগ, রোমে অগষ্টাসের যুগ, ফ্রান্সে চতুর্দশ লুইএর যুগ ও ইংলণ্ডে রোমাণ্টিক যুগ ইহার সহিত অনেকাংশে তুলনীয়। কিন্তু উচ্ছল প্রাণ শক্তির অবারিত প্রাচুর্যে ও চিন্তা ও কর্মের সমন্বয়ে এলিজাবেথীয় যুগেরই অবিসংবাদিত প্রাধান্য। [ক্রমশঃ

নিন্দক ও নিন্দাবাহী

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

কাজ করে যেই ভুল হয়ই তার, নিন্দাও হয় তার।
নিষ্কর্মার কথা নিয়ে বল মাথা ব্যথা আছে কার?
ভুল না হলেও কর্মী লোকের নেইক অব্যাহতি,
নিন্দার তরে প্রস্তুত তারা, জানে দুনিয়ার গতি
নিন্দার কথা যেজন শোনায় যে জন বার্তাবহ,
মনের স্বস্তি করে সে নষ্ট, সেই হয় দুঃসহ।

সাপুড়ে

শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

গৃহিণী অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। কে তাকে বলেছে আফ্রিদীরা নাকি ছেলে ধরে নিয়ে যায়—নিজেদের দেশে একবার নিয়ে যেতে পারলে বৃটীশ পুলিশ তাদের কিছুই করতে পারবে না।

গৃহিণী বললেন, "যেমন করে পারো ওই আফ্রিদীটাকে এখান থেকে বিদেয় কর—"

কিন্তু, বিদায় কর বললেই যে বিদায় করা যায় না তা নীলমণিবাবু বোঝেন।

বস্তির বাড়ীওয়ালাকে গোপনে তাগিদ দিতে সে রসিদকে বস্তি হতে বিদায় দিলে। কোথায় সে গিয়ে বাসা বাঁধলে কে জানে, তবু জানা গেল সেখান হতেও সে নিয়মিত মন্টির কাছে আসে।

এই পুরা পাঁচহাত লম্বা লোকটার সঙ্গে এতটুকু একটি ছেলের এমনতর বন্ধুত্ব, এ মন্ত্রশক্তি ছাড়া আর কি? যে মন্ত্রে সে দুর্দান্ত হিংস্র সাপকে বশ করেছে, সেই মন্ত্রেই সে এই ছোট ছেলেটিকে বশ করেছে তাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

নীলমণিবাবু গোপনে রসিদকে ডাকেন—বলেন "আমি তোমায় পঞ্চাশটাকা দিচ্ছি, তুমি এখান হতে চলে যাও।"

রসিদ বিপন্নভাবে বলে, "আমি কি করে যাব বাবুজি, আমার কাজই যে এখানে—"

নীলমণিবাবু হাত কচলাতে কচলাতে বলেন, "তা হোক, আমি তোমায় একশো টাকা দিচ্ছি—"

রসিদ নিরুপায় ভাবে মাথা নাড়ে।

টাকার পরিমাণ পাঁচশোতে দাঁড়ালো তবু রসিদ রাজি হল না। কী যে তার এমন বিশেষ কাজ তাও বোঝা যায় না, তবু সে যাবে না। তার নাকি ভয়ানক জরুরী একটা কাজ আছে, যার জন্যে সে সব ছেড়ে—নিজের দেশ, আত্মীয় স্বজন, মন্টির মত বাচ্চা ছেলে ফেলে এসেছে কলকাতায়—

ছেলের কথা বলতে বলতে তার কণ্ঠস্বর ভিজে উঠলো, —সে মুখ ফিরালে।

নীলমণিবাবু একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

তার অবস্থার সঙ্গে নিজের অবস্থার তুলনা ক'রে তাঁর মন গলে গেল। তিনি যদি কোন কাজে বিদেশে যান মন্টিকে ছেড়ে, সেখানে মন্টির মত একটি ছেলেকে দেখলে তার প্রতি স্নেহ পড়াই স্বাভাবিক, বরং না আসাটাই বিচিত্র।

আর তাঁর কথা বলা চললো না।

এর পরে রসিদের যাওয়া আসা এবং মন্টির সঙ্গে মেলা মেশা অবাধ ভাবেই চললো।

গৃহিণী শঙ্কিতভাবে বললেন,—দেখ, লোকটা আফ্রিদী, শেষ পর্যন্ত একটা কিছু না ঘটায়।

নীলমণিবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, "আফ্রিদী তো আফ্রিদী, ও যদি নিগ্রো, চাইনীজ ও হয়, তাহ'লেও আমি কোন কথা বলতে পারব না।"

• •

সেদিনকার খবরের কাগজের একটা বিশেষ খবরে নীলমণি বাবুর দৃষ্টি আকৃষ্ট হল—

খবরটা সীমান্ত প্রদেশের।

দুইটি বাল্য বন্ধু ছিল, এরা দুজনেই বেশ শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, দুজনেই আফ্রিদী সর্দার। দুজনেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল দেশের কাজ করবে—এদেরই মধ্যে একজন কোনও বৃটীশ অফিসারের কাছ হতে প্রচুর উৎকোচ পেয়ে নিজের দেশের অনেক গুপ্ত সংবাদ তাদের দেয় এবং সেইজন্যই অসংখ্য বৃটীশ সৈন্য সেখানে প্রেরিত হয়। দেশের লোক বিশ্বাসঘাতকের বিচারের ভার তারই বন্ধু সেই আফ্রিদী সর্দারের হাতে দেয় এবং সেও দেশের দিকে তাকিয়ে বন্ধুত্ব ভুলে তাকে শাস্তি দেওয়ার ভার নেয়। কারণ, বিশ্বাসঘাতক বন্ধুর জন্যই—দেশে বৃটীশ শাসন চলতে সুরু হয়। দেশের লোকের ভয়ে বিশ্বাসঘাতক তার টাকা কড়ি নিয়ে কোথায় যে পালিয়েছে তা কেউ জানে না, আফ্রিদীরা এই দেশদ্রোহী শয়তানকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

নিঃশ্বাস বন্ধ করে নীলমণিবাবু এই সংবাদটি পড়লেন—।

আফ্রিদী—তবে কি রসিদ? সেই কি বিশ্বাসঘাতক বন্ধু, অথবা অন্বেষণকারীদের মধ্যে একজন?

নীলমণিবাবু ভেবে কুলকিনারা পান না।

পরদিন দেখা গেল রসিদকে,—

তিনি ডাকলেন—"রসিদ সাহেব, একটা খবর দেখে যাও—"

রসিদ এসে দাড়াতে তিনি বললেন, "তোমাদেরই দেশের খবর—"

রসিদ শুষ্ক হাসি হাসলে—"আমাদের দেশের খবর—? কি খবর বাবু সাহেব—?"

নীলমণি বাবু খবরটা পড়ে তাকে বুঝিয়ে দিলেন। কাগজ হতে মুখ তুলে তিনি যখন রসিদের পানে চাইলেন, সে মুখে কোন পরিবর্তন দেখতে পেলেন না।

তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন! সত্যই কি লোকটা তাদের মধ্যে কেউই নয়, সত্যই সে একজন সাধারণ সাপুড়ে—?

রসিদ ভাবহীন হাসি হাসলে—

নীলমণি বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা রসিদ সাহেব, যদি সেই বিশ্বাসঘাতক লোকটাকে তোমাদের দেশের লোক খুঁজে পায়, কি করবে—?"

রসিদ ফস করে উত্তর দিলে, "সাপ দিয়ে তাকে খাওয়ানো হবে বাবু সাহেব, সাপের বিষে সে জ্বলে জ্বলে মরবে।

"সাপ—"

নীলমণিবাবুর দম যেন বন্ধ হয়ে যায়—।

রসিদ একটু হেসে বললে—"সাপও হতে পারে কুকুরও হতে পারে বাবুসাহেব। যে বিশ্বাসঘাতক দেশের শত্রুতা করেছে তাকে যে মরতেই হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সে যেখানেই যাক তার পিছনে লোক থাকবেই। সে কিছুতেই বাঁচতে পারবে না।"

তার চোখ দুটো ধক ধক করে জ্বলতে লাগলো—ঠিক সাপের চোখের মতই—।

(৫)

সে দিন মন্টিকে নিয়ে নীলমণিবাবু ভবানীপুর হতে বাড়ী আসছিলেন।

একটা গলির মোড়ে অনেক লোক জমে গেছে, মোটর হতে দেখা যায় না ভেতরে কি হচ্ছে, লোকের ভিড়ে গাড়ি সেখানে থেমে গেল। জনতার ভেতরে দুর্বোধ্য ভাষায় কথা শোনা গেল—

গলার স্বর শুনে মন্টি সাগ্রহে বলে উঠল—"ও নিশ্চয় আমাদের রসিদ বাবা। ওই রকম শব্দ করে ও সকলের কাছে সাপ খেলা দেখায়।"

ভিড়ের ফাঁক দিয়ে দেখা গেল রসিদই বটে। একেবারে স্বতন্ত্র আকৃতি! দেখে চেনা যায় না—। গোটা চার পাঁচ প্রকাণ্ড বড় বড় সাপ সে পথে ছেড়ে দিয়েছে, তারা যেন তার অনুগত ভৃত্য, সে যা বলছে সাপগুলো তাই করছে।

মন্টি চেঁচিয়ে উঠলো—"রসিদ সাহেব—রসিদ মিঞা—"

রসিদ কেবল একবার চোখ তুলে চাইলে—একটি কথা বললে না, নিজের মনে যেমন সাপ নিয়ে খেলাচ্ছিল তেমনই খেলাতে লাগলো।

তার এমন মূর্তি নীলমণিবাবু কোনদিনই দেখেন নি। তার স্বভাবতঃ লাল চোখ দুটি অধিকতর লাল হয়ে উঠেছে, কপালের শিরাগুলি ফুলে উঠেছে, মনে হয় চোখ ফেটে রক্ত বার হয়ে পড়বে—।

রসিদের চারিধারে অগণ্য লোক জমেছে সবাই আশ্চর্য হয়ে তার খেলা দেখছে।

কোন পেশাদার সাপুড়েও এমনভাবে খেলা দেখাতে পারে না—আশ্চর্য। সাপগুলো তার এমন বশ যে বলা যায় না।

দেখা গেল সে পোষাক বদলেছে, তার পরণে লুঙ্গি, গায়ে হাতকাটা একটা বেনিয়ান, মাথায় ফেজ, গলায় তার সাপুড়ের মত মালা, হাতে মালা,—দেখলে এই মুহূর্তে কেউই বলবে না যে এ সেই ঢিলে পায়জামা আর পাঞ্জাবী পরা আফ্রিদী রসিদ। চোখে তার একজোড়া নীল রঙের চশমা। সবশুদ্ধ তাকে দেখে হঠাৎ কেউই চিনতে পারবে না, নীলমণি বাবুও চিনতে পারতেন না যদি মন্টি না চিনতো।

দেখা গেল সে মন্টিকে চিনবার কোনও লক্ষণই দেখালে না। এক একটা সাপকে যেমন সে শূন্যে ছুঁড়ে কোলে লুফে নিচ্ছিল তেমনিই ধরতে লাগলো।

মন্টি তার এমন খেলা কখনও দেখেনি—সে তাই বিস্ময়ে নির্বাকভাবে তাকিয়ে রইল।

ভিড় ঠেলে তাদেরই গাড়ীর পাশ দিয়ে অন্যভাবে একজন লোক সাপের খেলা দেখতে যাচ্ছিল, তাকে দেখেই মন্টি চেঁচিয়ে উঠলো—"রসিদ—রসিদ সাহেব—"

ঠিক রসিদেরই মত ঢিলে পায়জামা আর পাঞ্জাবী তার পরণে, লম্বাতেও ঠিক তারই মত। এর জামা পায়জামা বেশ পরিষ্কার—মাথার পাগড়ী রঙিন সিল্কের—

কিন্তু সে রসিদ নয়,—সেও আফ্রিদী।

সাপুড়ের কাছাকাছি এসে হঠাৎ সে স্তম্ভিত হয়ে গেল, মনে হল সামনে ভূত দেখে ভয় পেয়ে সে যেন বিবর্ণ হয়ে গেল।

এক মুহূর্ত সাপুড়ে রসিদের মুখখানা ঘৃণায় বিকৃত হয়ে উঠলো—সে সাপের মত তীক্ষ্ণ নেত্রে লোকটার পানে তাকিয়ে রইলো, তারপর দুর্বোধ্য ভাষায় চীৎকার করে কি বলে উঠলো কে জানে।

যে লোকটি এসেছিল সে ফিরলো—

আবার গাড়ীর পাশ দিয়ে যেতে নীলমণিবাবু তাকে স্পষ্ট দেখতে পেলেন। তার মুখখানা সাদা হয়ে গেছে। অত বড় জোয়ান লোকটার সমস্ত শক্তি যেন নিমেষে অন্তর্হিত হয়ে গেছে, সে হাত দুখানা বুকের পরে আড়া-আড়িভাবে রেখে শ্লথ পদে ফিরে চলেছে।

সাপ খেলানো শেষ হয়ে গেল, জনতা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। সকলেরই মুখে মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল—এমন আশ্চর্য খেলা তারা কখনও দেখেনি।

শ্রান্ত রসিদ সাপগুলোকে ঝুড়িতে বন্ধ করে ফিরতে গিয়ে মন্টির দিকে চোখ পড়লো, আনন্দে তার দুই চোখ প্রদীপ্ত হয়ে উঠলো। সে মোটরের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

—"নমস্কার বাবু সাহেব—"

নীলমণি বাবু বললেন, "আশ্চর্য তোমার খেলা রসিদ সাহেব, কই, এমন খেলা তো আমাদের দেখাওনি।"

রসিদ একটু হাসলে, বললে, "সাপগুলো বড় কষ্ট পায় বাবু সাহেব—সেইজন্যে এরকম খেলা আমি বড় একটা দেখাইনে। আজ হঠাৎ কি মনে হল, এই রকম খেলা দেখিয়ে ফেললুম।

মন্টি তার সাপের ঝুড়ির দিকে চেয়ে সোৎসুকে বললে, 'কই, সে সাপটাকে নিয়ে তো খেলা দেখাও না রসিদ সাহেব,—তোমার সেই নতুন ধরা সাপটা—"

রসিদ বললে "না বাবু, সেটার এখনও বিষ দাঁত ভাঙ্গা হয় নি। তার জোর একটু কমলে তারপর বিষ দাঁত ভেঙ্গে ফেলে খেলা করব। এখন সে বন্ধ হয়েই আছে তার খাঁচার মধ্যে।"

তাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছিল, তখনও বোধ হয় তার খাওয়া দাওয়া হয়নি।

নীলমণি বাবু বললেন, "একদিন আমাদের ওখানে এসো—মন্টি তোমার জন্যে ভারি অস্থির হয়েছে।"

রসিদ মন্টির দিকে তাকিয়ে একটু হাসলে মাত্র।

সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় নীলমণিবাবু বাড়ী হতে বার হতে গিয়ে দেখলেন—গেটকের ধারে মন্টি চোখ মুছছে আর রসিদ গম্ভীর বিমর্ষ মুখে দাঁড়িয়ে তার পানে চেয়ে আছে।

নীলমণিবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"ব্যাপার কি ?"

মন্টি বললে—"বাবা, রসিদ সাহেব তার নিজের বাড়ী চলে যাবে বলছে। কেন চলে যাবে বল না বাবা— ?"

নীলমণিবাবু আশ্চর্য হয়ে বললেন, "তুমি চলে যাবে রসিদ—এত শিগগীর যাবে তা তো জানিনে। যে কাজের জন্য এসেছিলে—"

রসিদ স্মিতহাস্যে বললে, "সে কাজ আজই শেষ হয়ে যাবে। রাতারাতি সেটা শেষ করে নেব। কাল সকালেই যাব।

ছেলের দিকে ফিরে নীলমণিবাবু বললেন, "তুমি ভেতরে যাও মন্টি, রসিদের সঙ্গে দু-একটা কথা বলব।"

মন্টি চোখ মুছতে মুছতে ভিতরে চলে গেল।

নীলমণিবাবু বললেন, "আমি তোমায় পাঁচশো টাকা পর্যন্ত দেওয়ার কথা বললুম তুমি তবু কলকাতা ছাড়লে না, আর আজ তুমি হঠাৎ কলকাতা ছেড়ে নিজেই দেশে চলে যেতে চাচ্ছো এর মানেটা কি রসিদ সাহেব—?"

রসিদ আগের মত হেসে বললে, "সবই জানতে পারবেন বাবু সাহেব, কালই সব জানতে পারবেন—আজ আর নাই বললুম—"

সে চলে গেল, একটিবার পিছনেও চাইলে না।

(৬)

বন্ধু এসে বললেন, "ওহে, তোমাদের সেই আফিদা টাকে পুলিসে ধরে নিয়ে গেল দেখলুন।"

নীলমণি বাবু চায়ের কাপটা মুখে তুলেছিলেন মাত্র, নামিয়ে রেখে বললেন, "সে কি?"

বন্ধু বললেন, "সে-কি বলে অবাক হওয়ার মত এর মধ্যে কিছুই নেই। সেদিন নিউজ পেপারে আফ্রিদীদের যে ঘটনাটা দিয়েছিল সে—"

স্তম্ভিতভাবে নীলমণি বাবু বললেন, "সে কি এই?"

বন্ধু বললেন—"হ্যাঁ, আমি দেখলুম পুলিস তাকে হাতকড়ি পরিয়ে হাওড়ায় ট্রেণে ওঠাবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। তার বিচার হবে নাকি তার দেশে—এখানে সে একটা কথাও বলবে না পণ করেছে। ওদের ওখানে তাই পুলিস ওকে নিয়ে চললো—একটা পাওয়ারফুল ম্যান, তার কথার ভ্যালু আছে।"

নীলমণিবাবুর নিশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে আসছিল।

বন্ধু বললে, "আফ্রিদীদের নাম করা সর্দার সে, নাম তার রসিদ ইসমাইল খাঁ বাহাদুর। কিন্তু দেশকে ওরা কি ভালবাসে দেখেছো? যে বিশ্বাসঘাতক শত্রু ওর দেশের সর্বনাশ করেছে, তাকে শাস্তি দেওয়ার ভার ওর হাতে পড়ায় কি কষ্ট করেই না দেশে দেশে তাকে খুঁজে বেড়িয়েছে। হঠাৎ এখানেই সেই শত্রুর দেখা পেয়েছিল, শাস্তিও সে দিয়েছে বেশ। যা শুনলুম তাতে সত্যিই দম বন্ধ হয়ে আসে।"

নীলমণিবাবু জিজ্ঞাসা করলেন "কি শাস্তি?"

বন্ধু বললেন, "ও সাপ খেলাতো—সাপের মন্ত্র ওরা খুব ভালো জানে, পোষ মানাতেও পারে। তোমাদের রসিদ এই রকম অনেকগুলো সাপ ধরে এনেছিল, তার মধ্যে টাটকা ধরা একটা সাপও ছিল যার বিষদাঁত ভাঙ্গা হয় নি, সেই সাপটা দিয়েই সে প্রতিহিংসা নিয়েছে।"

নীলমণিবাবুর সর্বাঙ্গ কণ্টকিত হয়ে উঠলো।

বন্ধু বললেন, "সে নিজেই বলেছে সেই সাপ সে জানলা দিয়ে তার ঘরে ফেলে দিয়েছে, তার বিশ্বাসঘাতক বন্ধু সেই সাপের কামড়ে মরেছে। তারা সাপ সাক্ষ্য রেখে বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল, বিশ্বাসঘাতককে সাপের কামড়ে মরতে হবে এই ছিল কথা। সেই জন্যে সে ইচ্ছা করে তাকে গুলি করে নি, ছোরা মারে নি।"

নীলমণিবাবু স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "গেছে বেঁচেছি। কি ভয়ানক লোক!—এমন করেও ওরা প্রতিহিংসা নেয়।"

বন্ধু বললেন, "সে তোমার মন্টিকে তার শুভকামনা জানিয়ে গেছে, আর যাওয়ার সময় এই জিনিসটা তাকে দেবার জন্য আমার কাছে দিয়ে গেছে—"

তিনি পকেট হতে বার করলেন একখানি পত্র, ইংরাজি ভাষায় লেখা, আর একটি সোনার সাপ—লক্ষ্ণে বিখ্যাত প্রমাণ হবে—।

এই তার বন্ধুত্বের নিদর্শন—

পত্রে কেবল লেখা—

বিদায় আমার ছোট বন্ধুটি—তোমার কথা কোনদিনই ভুলব না। আমার অন্যায়ের সাথী বন্ধুত্বের নিদর্শন তোমায় দিয়ে গেলুম। আর কোনদিনই আফ্রিদী সর্দার তোমার কাছে আসবে না, এই সাপ যেন তার স্মৃতি তোমার ছোট মনে জাগিয়ে রাখে।

তোমার বন্ধু—
রসিদ খাঁ।

শেষ

নাগার্জুনের আত্মদান

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অশোকনাথ শাস্ত্রী এম-এ, পি-আর এস

(কথাসরিৎসাগর)

প্রাচীন ভারতবর্ষে যে সকল মনীষী রসায়ন বিদ্যায় খ্যাতিলাভ করেছিলেন, নাগার্জুন তাঁদের মধ্যে একজন। চিরায়ু নামে উত্তর ভারতে একটি নগর ছিল। সেই নগরে এক রাজা বহু দিন ধরে রাজত্ব ক'রে আসছিলেন, তাই প্রজারা তাঁর নাম দিয়েছিল চিরায়ু। এই রাজারই প্রধান মন্ত্রী ছিলেন নাগার্জুন। বোধিসত্ত্বের অংশে জন্ম বলে মন্ত্রিবর নাগার্জুন নানা বিদ্যায় ও গুণে ভূষিত ছিলেন। সে সময়ে রসায়ন বিদ্যায় তাঁর জোড়া সারা ভারতে আর দেখা যেত না। এ ছাড়া তাঁর দান ছিল অসাধারণ, আর তাঁর মনটি ছিল এতই কোমল যে লোকে তাঁকে 'দয়াবীর' উপাধি দিয়েছিল। মন্ত্রীর রসায়ন বিদ্যার বলেই রাজা নিজে আর নাগার্জুন দু'জনেই দীর্ঘজীবী হয়েছিলেন। রোগ বা জরা তাঁদের দু'জনের কাছেও ঘেঁষতে পারত না।

কিছুদিন পরে মন্ত্রী নাগার্জুনের একটি ছোট ছেলে হঠাৎ মারা গেল। নাগার্জুন এই ছেলেটিকেই তাঁর অন্য সব সন্তানের চেয়ে বেশী ভাল বাসতেন। তাই তার শোকে পাগল হয়ে তিনি ঠিক করলেন যে—রসায়ন প্রক্রিয়ায় অমৃত তৈরী ক'রে তিনি মানুষদের মধ্যে বিলিয়ে দেবেন, যাতে মর্ত্যলোকে সকলেই অমর হ'তে পারে—মৃত্যুশোক কেউ না পায়।

এই ভাবে তিনি অমৃত তৈরী করবার কাজে লেগে গেলেন। অনেক দিন তাঁর রসায়নাগারে দিনরাত পরিশ্রমের পর অমৃত প্রায় তৈরী হ'য়ে এল। কেবল শেষ ওষুধটি মেশাতে বাকী। মন্ত্রিবর এই ওষুধটি মেশাবার জন্য শুধু শুভদিন ও শুভযোগের অপেক্ষা করছিলেন, এমন সময় স্বর্গে ইন্দ্র দেখলেন—মহা বিপদ উপস্থিত। নাগার্জুন যদি বিনা বাধায় অমৃত তৈরী ক'রে উঠতে পারেন, তা হলে ত দেবতা আর মানুষে কোন তফাতই থাকবে না। মর্ত্যলোক থেকে যাগ-যজ্ঞ, পূজা-অর্চনা সব উঠে যাবে। ফলে, যজ্ঞভাগ না পেয়ে দেবতাদের একরকম অনাহারেই কাল কাটাতে হবে। তা ছাড়া পৃথিবীই হয়ে উঠবে স্বর্গের দোসর। কোন লোকই তখন আর দেবতাদের গ্রাহ্য করবে না।

বিপদ যে খুবই গুরুতর, ইন্দ্র তা দেবতাদের বেশ ভাল করেই বুঝিয়ে দিলেন। তারপর দেববৈদ্য অশ্বিনী-কুমার দু'জনকে ডেকে বললেন—"আপনারা দু'জনে নাগার্জুনের কাছে দূতরূপে যান। গিয়ে আমার নাম করে তাঁকে জানাবেন, যেন তিনি অমৃত তৈরী করবার ব্যাপার থেকে নিবৃত্ত হন। কারণ, তাঁর যে ছেলেটির শোকে তিনি এই অঘটন ঘটাতে উদ্যোগী হয়েছেন, তাঁর সেই ছেলেটি এই স্বর্গলোকে পরম সুখে বাস করছে। তা ছাড়া তাঁকে আরও বুঝিয়ে বলবেন যে, অমৃত খেয়ে মানুষের দল যদি সত্য সত্যই সব অমর হয়ে যায়, তাতে মরণের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলেও অন্য দুঃখ কষ্ট ত ঘুচবে না। এই সব অমর মানুষের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়তে থাকলে দু'দিনেই

পৃথিবী ভরে উঠবে—সকলের সেখানে বাস করবার জায়গা হবে কি করে? লোকে তখন খাবেই বা কি? এই সব বিপদের কথা তাঁকে ভাল করে বিবেচনা করতে বল্‌বেন। এতেও যদি তিনি আপনাদের কথা শুনতে রাজী না হন, তখন তাকে ভয় দেখিয়ে বলবেন যে—ভাল কথায় এ কাজ না ছাড়লে তারে দেবতারা অভিশাপ দেবেন, আর, যাতে তাঁর রাসায়নিক অমৃত নির্বিঘ্ন ভাবে তৈরী না হ'তে পারে, এজন্য ইন্দ্রও অলক্ষিতে থেকে তার কাজে বাধা দেবেন।"

অশ্বিনীকুমার দু'জন অন্যের অদৃশ্যভাবে নাগার্জুনের রসায়নাগারে ঢুকে যখন তাকে ইন্দ্রের কথাগুলি জানিয়ে দিলেন, তখন নাগার্জুনের অমৃত তৈরী করবার উৎসাহ অনেকটা কমে এসেছে। স্বর্গবৈদ্যদের কথায় তিনি স্থির ধীর ভাবে অনেকক্ষণ চিন্তা ক'রে দেখলেন যে দেবরাজ ইন্দ্রের কথাগুলি একেবারে তুচ্ছ করবার নয়। তা ছাড়া তাঁর যে ছেলেটির শোকে তিনি ঐ কাজে হাত দিয়েছিলেন, সেই মরা ছেলেটি স্বর্গে বেশ সুখেই আছে শুনে তাঁর মন অনেকটা শান্ত হ'ল। আর তিনি একথা বেশ বুঝ্‌লেন যে, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা যদি তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করবার ইচ্ছা করেন, তবে তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রে অমৃত তৈরী করার চেষ্টায় সফল হওয়া তাঁর পক্ষে খুব সহজ হবে না। কাজেই তিনি হতাশভাবে স্বর্গবৈদ্যদের দিকে চেয়ে বল্‌লেন—"আপনারা নিশ্চয়ই আমার মনের অবস্থা বুঝ্‌তে পারছেন, এত বড় একটা কাজে এতদূর এগিয়ে এসে কাজটা ঠিক সফল হওয়ার মুখে ইচ্ছা ক'রে হাত গুটিয়ে নেওয়া যে কতখানি কষ্টকর, তা অন্তর্যামী আপনাদের আমি আর মুখ ফুটে কি বল্‌ব? আপনারা যদি আর পাঁচদিন পরে আসতেন, তা হ'লে হয়ত দেখ্‌তেন যে পৃথিবীর সব মানুষ অজর অমর হ'য়ে উঠেছে। তবু আপনাদের কথা অমান্য করতে চাই নি। আপনারা দেবরাজকে গিয়ে জানান যে, তাঁর আদেশ আমার শিরোধার্য। আমি আজ হ'তে এ কাজ থেকে বিরত হলাম।" এই ব'লে নাগার্জুন দেববৈদ্য দু'জনের সাম্‌নেই অমৃতের কুণ্ডটি মাটীর মধ্যে পুঁতে ফেল্‌লেন। অশ্বিনীকুমার দুই ভাই নাগার্জুনের মহত্ত্ব দেখে তাঁর অজস্র প্রশংসা করতে করতে স্বর্গে ফিরে গেলেন। ইন্দ্রও তাঁদের মুখে সকল ঘটনা শুনে বিশেষ আশ্বস্ত হলেন যে, মানুষের হাতে তাঁদের আর পরাজয় হ'ল না।

এর কিছুদিন পরে চিরায়ু তাঁর ছেলে জীবহরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেছিলেন। রাজকুমার যখন আনন্দিত মনে তাঁর মাকে প্রণাম করতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন, তখন ছেলের মুখে হাসি দেখে রাণী ধনপরার মুখ গম্ভীর হ'য়ে উঠল। তিনি ছেলেকে আড়ালে ডেকে বল্‌লেন, "বাছা, যৌবরাজ্য পেয়ে বেশী আহ্লাদ করলে ঠকতে হবে। তোমার আগে তোমার অনেক সতাতো ভাই যৌবরাজ্য পেয়েছিল। তারা একে একে সবাই পরপারে চ'লে গেছে। তোমার বাবা যে চিরজীবী। তুমি বেঁচে থাক্‌তে থাক্‌তে যে তিনি মারা যাবেন, আর তুমি তাঁর শূন্য সিংহাসনে রাজা হয়ে চেপে বসবে—এ আশা দুরাশা মাত্র। প্রধান মন্ত্রী নাগার্জুন তোমার বাবাকে যে রসায়ন খেতে দেন, তার শক্তিতে তিনি আজ আটশ' বছর নীরোগ হয়ে বেঁচে আছেন। ইতিমধ্যে তাঁর কত রাণী, ছেলে, নাতি প্রভৃতি মারা গেছেন—তার আর ইয়ত্তা নেই। তাই বল্‌ছি, বৃথা রাজ্য লাভের আশা করলে বিড়ম্বনাই সার হবে।"

রাণী ধনপরার কথায় যুবরাজ জীবহরের মুখ শুকিয়ে গেল। তাই দেখে রাণী বুঝ্‌লেন যে, ওষুধ ঠিক ধরেছে। তখন তিনি ছেলেকে চুপি চুপি বল্‌লেন—"যদি রাজ্য পেতে চাও, আমার কথামত কাজ কর"। ছেলের মনে তখন লোভ ঢুকেছে। রাক্ষসী মায়ের কথায় হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে কুমার জিজ্ঞাসা করলেন, "বল মা, কি করতে হবে"। তখন রাণী কুটিল হাসি হেসে বল্‌লেন, "দেখ বাছা, প্রধান মন্ত্রী বড় সত্যবাদী। তিনি প্রত্যেক দিন দুপুরে খেতে বসবার আগে দুঃখীদের দুঃখ দূর করবার জন্য ঘোষণা ক'রে থাকেন—'যে যা' চাইবে তার কাছে, তিনি তাকে তাই দান করবেন'। কোনও প্রার্থী কোনদিন তাঁর কাছ থেকে বিমুখ হ'য়ে ফেরে না। তুমি যদি তাঁর কাছে গিয়ে তার ছিন্নমুণ্ডটা চাও, তিনি কখনও না দিয়ে পারবেন না। আর মন্ত্রী মারা গেলেই রাজাও নিশ্চয় তাঁর শোকে দেহত্যাগ করবেন, না হয় বনবাসী হবেন। তা হ'লেই এরাজ্য তোমার হবে"।

রাজ্যলোভে উন্মত্ত হ'য়ে জীবহর তার পরদিনই দুপুর

বেলা প্রধান মন্ত্রীর বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলেন। মন্ত্রী নাগার্জুন তখন তার বাড়ীর সদর দরজায় দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে বল্‌ছেন—"যদি কেউ প্রার্থী থাক, নির্ভয়ে এগিয়ে এস। যে যা চাইবে, আমার আয়ত্ত হ'লে নিশ্চয়ই তা দিয়ে দেব"।

জীবহর এগিয়ে গিয়ে বল্‌লেন—"মন্ত্রী মশায়, আমি একজন প্রার্থী'।

মন্ত্রী রাজকুমারকে দেখে প্রথমটা একটু অবাক হ'য়ে বল্‌লেন—"একি! যুবরাজ যে! আপনি প্রার্থী! ব্যাপার কি?'

জীবহর একবার একটু ইতস্ততঃ ক'রে কঠিন স্বরে বল্‌লেন—"মন্ত্রী মশায়, আমার চাই আপনার ঐ মাথাটি"।

নাগার্জুন রাজকুমারের কথায় গভীর বিস্ময়ে স্তব্ধ হ'য়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি কোমলভাবে রাজকুমারকে জিজ্ঞাসা করলেন—"বৎস! আমার রক্ত-মাংস-হাড়-চুল ওয়ালা মাথাটি নিয়ে তোমার কোন্ কাজ সিদ্ধ হবে? আবার, থাক, সে কথাই বা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি কেন? আমি যখন প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, তখন আমার মাথা তোমাকে দিলাম। তুমি তলোয়ার দিয়ে কেটে নাও"।

জীবহর নাগার্জুনের এই রকম নির্ভয় বাক্য শুনে মনে মনে মন্ত্রীর অদ্ভুত চরিত্রের প্রশংসা না করে থাকতে পারলেন না। কিন্তু তখন তার তাড়াতাড়ি কাজ হাসিল করতে হবে। কাজেই নিজের তলোয়ার খুলে মন্ত্রিবরের ঘাড়ে বসিয়ে দিলেন এক কোপ। কিন্তু দীর্ঘকাল রসায়ন সেবনে নাগার্জুনের সারা দেহ এমনই শক্ত হয়ে উঠেছিল যে তলোয়ারখানাই ভেঙ্গে গেল—মন্ত্রীর ঘাড়ে কোপ বসল না। তখন তিনি আর একখানা খাঁড়া নিয়ে আবার কোপ মারলেন। সেখানাও আগের মতই ভেঙ্গে গেল। এই ভাবে কয়েকখানা তলোয়ার আর খাঁড়া ভাঙ্‌তে জীবহর বুঝলেন, মন্ত্রীর মাথা কেটে নেওয়া তাঁর সাধ্য নয়। তখন তিনি হতাশ হয়ে বসে পড়লেন।

এদিকে লোকের মুখে এই সব খবর রাজার কানে পৌঁছুতেই তিনি ব্যাকুলভাবে ছুটতে ছুটতে মন্ত্রীর বাড়ী এসে উপস্থিত। ভয়ানক রেগে প্রথমেই ছেলেকে বন্দী করবার আদেশ দিতে যাচ্ছেন, এমন সময় নাগার্জুন তাকে বুঝিয়ে বল্‌লেন, "মহারাজ! কুমারকে শাস্তি দেবেন না। আমি জাতিস্মর। আমার এখন বেশ স্পষ্ট মনে পড়ছে যে এর আগে নিরানব্বই জন্ম ধ'রেই আমি প্রার্থীদের আমার মাথা কেটে দিয়ে আসছি। এ জন্মে কুমারকে আমার মাথাটি দিতে পারলেই আমার 'শিরোদান-ব্রত' প্রতিষ্ঠা হয়। আমি এতক্ষণ কেবল আপনার দর্শন পাবার আশায় এই মাথাটি কাটতে দিই নি। এবার আপনার সাম্‌নেই আপনার ছেলেকে তা দিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু দোহাই আপনার, মহারাজ! আপনি এমন কিছু ক'রে বসবেন না, যাতে প্রার্থী বিমুখ হ'য়ে আমার ব্রতটি পণ্ড ক'রে দেয়।" ব'লে মন্ত্রিবর রাজাকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন ক'রে একরকমের গুঁড়ো জীবহরের তরোয়ালে মাখিয়ে দিলেন। তারপর মাথা নীচু ক'রে বল্‌লেন—"যুবরাজ! এইবার কোপ মারুন, আর আপনাকে হতাশ হ'তে হবে না।"

রাজকুমার প্রায় উন্মাদের মত ই মন্ত্রীর ঘাড়ে তলোয়ারের কোপ বসিয়ে দিলেন এবার সত্য সত্যই মন্ত্রীর মাথা তার ধড় থেকে ছিন্ন হ'য়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। মন্ত্রীর শোকে রাজা চিরায়ুও সেই তলোয়ারখানি তুলে নিয়ে নিজের মাথা কেটে ফেল্‌তে যাচ্ছিলেন, এমন সময় দৈববাণী হ'ল—'মহারাজ! আপনি এ দুঃসাহস করবেন না। বোধিসত্ত্ব নাগার্জুন নির্বাণ লাভ ক'রেছেন। তাঁর জন্য আপনার আর শোক করা উচিত নয়।"

দৈববাণী শুনে রাজা আত্মবিসর্জন থেকে শান্ত হলেন বটে, কিন্তু আর রাজ্যে ফিরলেন না। জীবহরের হাতে রাজ্যের ভার দিয়ে তপস্যা করতে বনে চ'লে গেলেন।

পাপিষ্ঠ জীবহরের অদৃষ্টে কিন্তু বেশীদিন রাজ্য ভোগ সইল না। নাগার্জুনের ছেলেরা কিছুদিনের মধ্যে পিতৃ-হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য ষড়যন্ত্র করে জীবহরের জীবন হরণ করল। চিরায়ুর আর এক ছেলে বেঁচে ছিলেন। তার নাম শতায়ু। মন্ত্রীরা তাঁকেই রাজা করে রাজ্য চালাতে লাগলেন।*

* কার্তিকের পাঠশালায় পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন শাস্ত্রী মহাশয়ের 'নাগার্জুন' সম্বন্ধে একটি প্রাচীন পুঁথি ও কিম্বদন্তী অবলম্বনে রচিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'নাগার্জুন' সম্বন্ধে রচনাটি 'কথাসরিৎসাগর' হ'তে গৃহীত, সুতরাং এ দু'টির কোনটিকেই ঐতিহাসিক সত্য বলে গ্রহণ করলে ভুল করা হবে। পাঃ সঃ

বিশ্ববিশ্রুত নৃত্য শিল্পী

নটরাজ উদয়শঙ্কর

উদয়শঙ্করের নাম শোনেনি এমন ছেলে মেয়ে বাংলাদেশে বোধহয় খুব কমই আছে। আশা করি, পাঠশালার পাঠক পাঠিকারা অনেকে হয়ত তার নাচও দেখেছেন। কিন্তু এই উদয়শঙ্কর, যাঁর নৃত্যকলা দর্শনে বিশ্বভুবন মুগ্ধ হয়েছে, তিনি কে তা বোধহয় তোমরা জানোনা।

উদয়শঙ্কর

রাণা মহারাণাদের কীর্তিবিজড়িত রাজপুতানার যে সুন্দর শহর উদয়পুর, সেই উদয়পুরের এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে একদা একটি সুদর্শন শিশু জন্মগ্রহণ করেছিল। এই নবজাত কুমারকে সেদিন পরিবারের সকলেই আদরে কোলে তুলে নিয়েছিলেন বটে, কিন্তু, সেদিন তাঁরা কেউই কল্পনাও করতে পারেন নি যে এই শিশু বড় হয়ে একদিন ভারতের গৌরব রশ্মি পৃথিবীর চতুর্দিকে বিকীর্ণ করবেন।

উদয়শঙ্করের পিতা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ডাক্তার শ্যামশঙ্কর চৌধুরী ছিলেন রাজস্থানের অতীত বীরত্ব মণ্ডিত ঝালওয়ার রাজ্যের একজন সুযোগ্য মন্ত্রী। ছেলেবেলা থেকেই পুত্রের চিত্রাঙ্কন ও অন্যান্য শিল্পকলার দিকে একটা সহজ ও স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে দেখে তিনি অল্প বয়সেই উদয়কে বোম্বাইয়ের আর্ট ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন।

আর্টইস্কুলে গিয়ে উদয়শঙ্কর তাঁর অসামান্য শিল্প প্রতিভার এমন বিস্ময়জনক পরিচয় দিয়েছিলেন যে ওখানকার শিক্ষা সম্পূর্ণ হতেই উদয়ের পিতা ১৯২০ খৃঃঅব্দে উদয়শঙ্করের চিত্র বিদ্যায় অধিকতর উৎকর্ষ ও পারদর্শিতা লাভের জন্য বিলাতে পাঠিয়ে দিলেন।

লণ্ডনের 'রয়েল কলেজ অফ আর্টস' নামে প্রসিদ্ধ কলাভবনে বিশ্ববিদিত শিল্পী সার উইলিয়াম রদেনস্টাইনের অধীনে শিক্ষালাভ করে ও নিজের অসাধারণ নৈপুণ্যের গুণে উদয়শঙ্কর সেখানে চিত্র বিদ্যায় আশ্চর্য উন্নতি লাভ করেন। পরীক্ষায় ও প্রতিযোগিতায় সসম্মানে ও সগৌরবে উত্তীর্ণ হয়ে উদয়শঙ্কর বিলাতের 'স্পেন্সার' এবং 'জর্জ ক্লসেন' পারিতোষিক অর্জন করেন। সময় উদয়ের

আলাউদ্দীন খাঁ সাহেব

পিতা শ্রীযুক্ত শ্যামশঙ্কর চৌধুরী মহাশয়ও বিলাতে ছিলেন। তিনি একজন অশেষ গুণী লোক। সাহিত্যে সঙ্গীতে নাট্যে ও অভিনয়ে শ্যামশঙ্করবাবু ছিলেন সবিশেষ সুদক্ষ।

গত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধে ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে আহত ভারতীয় সৈন্যগণের সাহায্যার্থে তিনি লণ্ডনে একটি জলসার আসর ও নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করেন। এই অনুষ্ঠানে গীত বাদ্য নৃত্য ও অভিনয় ইত্যাদিতে যোগ দিয়ে উদয়শঙ্কর পিতাকে নানা ভাবে সাহায্য করেছিলেন

ভারতীয় নৃত্যকলার দিকে একটা প্রবল ঝোঁক করেছিলেন তিনি। তিনি শ্রীমান উদয়শঙ্করকে আপনার দলভুক্ত করে নিয়েছিলেন এবং উদয়শঙ্করের নিকট ভারতীয় নৃত্যকলা শিক্ষা করে নানা দেশে তা প্রদর্শন করেছিলেন। এই ভারতীয় নৃত্য প্রদর্শন কালে বিশ্ববিখ্যাতা নৃত্যপটিয়সী আনা পাভ্‌লোভার প্রধান নৃত্যসহচর রূপে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হবার দুর্লভ সৌভাগ্য

রাধাকৃষ্ণ নৃত্য

উদয়শঙ্করের বরাবরই ছিল। তিনি আপন মনে অবসর ক্ষণে বহু সময় নৃত্য অভ্যাস করতেন। বন্ধু বান্ধবদের অনুরোধে তাঁদের পার্টিতে ও ভোজ সভায় উদয়শঙ্কর নিজের উদ্ভাবিত বিভিন্ন বিশেষ ভঙ্গীর কয়েকটি ভারতীয় নৃত্য প্রদর্শন করতেন। ১৯২৩ খৃঃঅব্দে এইরূপ একটি অন্তরঙ্গের অনুষ্ঠানে নৃত্য প্রদর্শনকালে ভুবনবিদিতা রুষ নর্তকী স্বর্গগতা আনা পাভ্‌লোভার দৃষ্টি আকর্ষণ লাভ করেছিলেন শ্রীমান উদয়শঙ্কর। পাভ্‌লোভার সঙ্গে সঙ্গে তার নৃত্যানুচররূপে পৃথিবীর নানা দেশ ঘোরবারও সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি।

এইভাবে দেশবিদেশে বেড়িয়ে বহু অভিজ্ঞতা ও শিক্ষালাভ করে ১৯২৯ খৃঃঅব্দে উদয়শঙ্কর ভারতে ফিরে আসেন এবং কলিকাতায় সর্বপ্রথম তাঁর নৃত্য প্রদর্শন করেন। অধুনা বিলুপ্ত ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটির

পৃষ্ঠপোষকতায় নটরাজ উদয়শঙ্করের নৃত্যকলা প্রদর্শনের প্রথম আয়োজন করেছিলেন 'ফোর আর্টসের' প্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত হরেন ঘোষ। উদয়শঙ্করের নৃত্যের নূতনত্ব ও মনোহারিত্ব কলিকাতার সুরসিক শ্রেষ্ঠ কলাবিদ্ ও সুধীজন সমাজের মধ্যে একটা চমক লাগিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অর্দ্ধেন্দু প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি কলাবিদেরা উদয়শঙ্করের নাচের ভূয়সী প্রশংসা করেন। দেশের সমস্ত পত্র ও পত্রিকায় তাঁর নাচের অনুকূল সমালোচনা প্রকাশ হয়। একরাত্রেই তিনি বাংলাদেশে বিখ্যাত হয়ে পড়েন।

গুণীশ্রেষ্ঠ, অনন্য সাধারণ শিল্পী ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে রয়েছেন। উদয়শঙ্কর তাঁদের সকলকে একত্র করে একটি মন্দিরে সমবেত করতে চান যে মন্দির হয়ে উঠবে মহাভারতীয় সংস্কৃতিমূলক কলা শিক্ষার কেন্দ্রস্থল।

ইংলণ্ডের 'ডার্লিংটনহল' ও আমেরিকার এবং য়ুরোপের অসংখ্য বন্ধুবান্ধব ও হিতাকাঙ্ক্ষী অনুরাগীদের মুক্তহস্তে সাহায্য দানের ফলে শিল্পীর এই বিশাল কলা-ভবনের স্বপ্ন আজ বাস্তব হয়ে উঠেছে। অম্বর চুম্বী হিমাচলের পাদমূলে প্রাকৃতিক শোভা ও সৌন্দর্যের লীলা নিকেতন আলমোড়া নগরের উপকণ্ঠে সিমতলা অরণ্যভূমে প্রায় ২৮২ বিঘা স্থান নিয়ে এই বিরাট কলাভবন, সঙ্গীত ও

শ্রীমতী সিমকীর পার্বতী নৃত্য

অসি নৃত্য

এরপর কুমারী এ্যালিস বোনার নামে একটি সুইজারল্যাণ্ড বাসিনী মহিলাশিল্পীর সাগ্রহ পৃষ্ঠপোষকতায় ও অর্থানুকুল্যে কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ভারতীয় নৃত্যশিল্পী সুরশিল্পী ও যন্ত্রশিল্পীকে একত্র করে উদয়শঙ্কর একটি দল গঠন করেন এবং য়ুরোপ ও আমেরিকায় ভারতীয় সঙ্গীত ও নৃত্যকলা প্রদর্শনের অভিযান নিয়ে যাত্রা করেন। সবত্রই আশাতীত সাফল্য অর্জন করে প্রভূত যশ ও জয়ের গৌরব-মাল্য কণ্ঠে নিয়ে দীর্ঘকাল পরে তিনি আবার স্বদেশে ফিরে এসেছেন। এবার ভারতে এসেছেন তিনি এক বিরাট পরিকল্পনা নিয়ে। ভারতের নানা প্রদেশে বহু

নৃত্যশালা নির্মাণ হচ্ছে। এই বিশাল শিল্প সাধন ক্ষেত্রের নাম হয়েছে 'উদয়শঙ্কর ইণ্ডিয়া কালচার সেণ্টার'। পৃথিবীর সকল দেশের ছাত্র ছাত্রী এখানে এসে ভারতীয় নৃত্যকলা ও যন্ত্রসঙ্গীত শিক্ষা করবার সুযোগ পাবে। ত্রিবাঙ্কুরের কথাকালি নৃত্য ধুরন্ধর গুরু শঙ্করণ নাম্বুদ্রী, মাহিয়ার রাজ্যের প্রসিদ্ধ গুণী ও যন্ত্রশিল্পী আলাউদ্দীন খাঁ সাহেব প্রভৃতি ভারতবিদিত শিল্পগুরুরা সেখানে সমবেত হয়েছেন। বহু ছাত্র ছাত্রী শিক্ষা লাভ করতে সুরু করেছে। শীঘ্রই তাঁরা কলিকাতায় এসে তাঁদের শিক্ষার পরিচয় দিয়ে যাবেন শোনা যাচ্ছে। শ্রীযুক্ত হরেন ঘোষ এর ব্যবস্থা করছেন।

বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি

ডাঃ সুরেশচন্দ্র দেব ডি-এস-সি

যারা বিজ্ঞান পড়ে তারা মনে করে যে তারা বিজ্ঞান পড়ছে জ্ঞান অর্জন করবার জন্যে। তারা আরও মনে করে যে এই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এমন একটা জ্ঞান যা পেলে তারা প্রকৃতির ওপর কর্তৃত্ব করতে পারবে আর তাতে তাদের সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্য আরও বাড়বে। কিন্তু এ ছাড়া যে বিজ্ঞানের একটা বৃহত্তর দিক আছে তা অবৈজ্ঞানিকেরা ঠিক ধরতে পারে না। আর বৈজ্ঞানিকেরাও এখনও স্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। তাই এই বৃহত্তর দিকটা সাধারণের সম্পত্তি হ'য়ে উঠতে পারেনি।

এই বৃহত্তর দিকটা বুঝতে হ'লে বৈজ্ঞানিক কিভাব নিয়ে তার কাজের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে ফেলে তা জানা দরকার। এই ভাব, যাকে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি নাম দেওয়া যেতে পারে, তা জীবনের ক্ষেত্রে যেদিন সাধারণ ভাবে দেখা দেবে সেদিন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চতুর্দ্দিকে যেসব অনন্য সাধারণ উন্নতি দেখা দিয়েছে সে উন্নতি সমগ্র মানব সমাজের মধ্যে গিয়ে গোড়া নিবে। তখনই আমরা দেখতে পাব যে তার এ দানের সামনে তার এতদিনের এবং ভবিষ্যতেরও সমস্ত চমৎকারিণী আবিষ্কার অকিঞ্চিৎকর হ'য়ে উঠবে।

এই বিশিষ্ট মনোবৃত্তিটির লক্ষণ কি? বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির প্রথম ও প্রধান লক্ষণ সে সম্পূর্ণরূপে সত্যানুরাগী। কাজে কাজেই, প্রকৃতিগতভাবেই কোনও বিশেষ কারুর দিকে তার কোন পক্ষপাতই নেই। তাই তার কাছে একজন মানুষ, একটা কৃমি কীট, বা গ্রহউপগ্রহ সমেত ওই বিরাট সূর্য এই সমস্তের একই স্থান। সূর্যকে দেখলে সে তার পূর্বপুরুষদের মত আত্মহারা হ'য়ে পূজা করতে বসে না, বা কৃমি কীটকে সে ঘৃণ্য বলে পরিত্যাগ করে না। তার বীক্ষণাগারে সকলকারই সমান আসন। তারা সকলেই তার জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার উপকরণ।

কাজে কাজেই তার মনে জেগে উঠে নিজের সম্বন্ধে এক বিচিত্র অকিঞ্চনের, জ্ঞানভিখারী দীনের ভাব। আর সঙ্গে সঙ্গে এসে দেখা দেয় নিজের সম্বন্ধে একটি অপূর্ব গৌরব। সে জানে যে সে নিজে বানরাদের-গোষ্ঠী থেকে খুব দূরে সরে নেই, তবু সে বলতে পারে যে সূর্যের মধ্যে জড় আর উত্তাপ পরস্পর কি নিয়মে আবদ্ধ হওয়াতে তাথেকে ওই রকম আলো নির্গত হতে পেরেছে। জগতে কোনও কিছুই তার কাছে যে শুধু পরিত্যজ্য নয় তাই নয় কোনও কিছুই তার অদ্ভুতত্বে বা বিরাটত্বে তাকে অভিভূত করতে পারে না।

কোথাও অভিভূত হয় না বলে তার কাছে ভাল বা মন্দ বলে কিছুই নেই। জগতের প্রত্যেকটি অণু পরমাণুর নিজের একটি বৈশিষ্ট্য আছে, একটি গৌরব আছে। এই গৌরবের দিকে দৃষ্টি রাখলে তার কাছে সকলেই একটি বিশিষ্ট স্থান পায়। একের অপরের সঙ্গে তুলনা হবার প্রয়োজনই নেই। কাজে কাজেই তার কাছে কেউ বড় বা কেউ ছোট নয়—ভাল মন্দ ত দূরের কথা।

ভাল মন্দ ছোট বড় সে স্বীকারই করে না—তাই তার কাছে স্বাধীনতা একটা নতুনতর সত্যতার রূপ নিয়ে আসে। তার স্বাধীনতা অপরের স্বাধীনতা হরণ করার ওপর নির্ভর করে না, সত্যের অন্তরে যে সহজাত আপনি-মুক্ত স্বাধীনতা বিরাজ করে সে তাকে উপলব্ধি করে নিজের জীবনে। তার জীবন তাই পরের স্বাধীনতা হরণ করবার জন্য নিযুক্তও হয় না।

য়ুরোপ বিজ্ঞানের জ্ঞানকে স্বীকার করেছে—তাই কর্মজগতে সে এত দৃপ্ত—এত অহঙ্কৃত। কিন্তু, সে তার মনোবৃত্তিকে এখনও স্বীকার করেনি। কাজে কাজেই তার মধ্যে গভীরের সে দীনতার এখনও অভাব রয়েছে। যে দিন সেই জীবনের মধ্যে তা উপলব্ধি করবে ও স্বীকার করবে সে দিন বাস্তবিকই সে জগতের শিক্ষকের আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে।

যদু

"বনফুল"

আমি খুব সংক্ষেপে যে ছেলেটিব কথা আজ তোমাদের বলব সে অতিশয় গবীবেব ছেলে ছিল। যদিও সে বাপ মায়েব একমাত্র সন্তান তবু সৌখীন কোন কিছু তাব ভাগ্যে কখনও জোটে নি, এমন কি নাম পর্য্যন্ত নয়। তাব নাম ছিল যদু। দেখতেও যে খুব সুশ্রী ছিল তা নয়, হাড পাঁজরা-সার জীর্ণ বিশ্রী চেহাবা, ম্যালেরিয়া জ্বরে আব পেটের অসুখে ভুগে ভুগে স্বাস্থ্য তার কোন দিনই ভাল হতে পায় নি। হবে কি করে, দুবেলা পেট ভরে খেতেই পেত না।

তাব বাপ কালীমোহন বাবু ছোট ছেলেদেব প্রাইভেট টিউশনি করে মাসে গোটা কুডি পঁচিশ টাকা রোজকার কবতেন আর এই কটা টাকা বোজকার করবাব জন্যে উদয়াস্ত খাটতে হত তাঁকে। পরেব ছেলেদের পডিয়ে রাত্রি দশটা নাগাদ ক্লান্ত শরীরে যখন বাডীতে ফিবতেন তখন নিজেব ছেলেকে পডাবার আর সামর্থ থাকত না তাঁব। কালীমোহন বাবু নিজে খুব বেশী লেখাপড়া করতে পাবেন নি। গবীবের ছেলে ছিলেন, কোনক্রমে কায়ক্লেশে সেকালেব ছাত্রবৃত্তি পবীক্ষাটা পাশ করতে পেরেছিলেন। অর্থাভাবে আর পডা হয় নি।

যদুবা থাকত একটি স্যাঁত সেঁতে খোলাব ঘরে, তার একদিকে মিউনিসিপালিটির একটা পচা নালা, আর একদিকে বডলোক প্রতিবেশী হীরেন্দ্র বাবুদের গোটা দুই খাটা পাইখানা। সামনে সরু একটি রাস্তা, আর রাস্তার উপবে দুনিয়াব যত জঞ্জাল জডো কবা। কেবল পশ্চিম দিকটায় কাদের কপির ক্ষেত ছিল বলে সে দিকটা একটু ফাঁক। ছিল কেবল। এই বাড়িরও মাসে পাঁচ টাকা ভাড়া। না দিয়ে উপায় ছিল না, কারণ টাকা রোজগাব করবার জন্যে শহবে থাকতেই হবে, আব শহবে থাকতে গেলেই এই ভাড়া টানতে হবে। বাসন মাজা কাপড কাচা ঘব নিকোনো থেকে আবম্ভ কবে রান্না বান্না সেলাই ফোঁডাই সবই যদুব মাকে নিজের হাতে করতে হত। ওবই মধ্যে যেদিন একটু সময় পেতেন হীরেন্দ্র বাবুর গোয়াল থেকে গোবব সংগ্রহ করে' ঘুঁটে দিতেন। এত করেও তবু তিনি কুলুতে পাবতেন না। কি করে পারবেন, মাত্র তো কুডি পঁচিশ টাকা আয়, তাব মধ্যে বাডি ভাডাই যেত পাঁচ টাকা, দেশে কালীমোহন বাবুব বুড়ো বাবা থাকতেন তাঁকে পাঠাতে হত পাঁচ টাকা। বাকি দশ পনরো টাকাব মধ্যে তিনজনেব খাওয়া পবা খুঁটি নাটি নানারকম খবচ। এই খুঁটিনাটি খবচের মধ্যে একটা প্রধান খবচ ছিল কালীমোহন বাবুব ওষুধ। একদিন ছেলে পডিয়ে আসবাব সময় বাস্তায় মাথা ঘুবে পড়ে গেছলেন তিনি। শস্তায় হবে বলে পাডায় একজন হাতুডে হোমিওপ্যাথেব কাছে প্রথমে গেলেন, কিন্তু তাঁর ওষুধে কোন ফল হল না। একজন এলোপ্যাথ ডাক্তারবাবু বিনা দক্ষিণায় তাঁকে একদিন দেখলেন বটে কিন্তু তিনি এমন একটা ওষুধের ফরমাস করলেন যাব দাম চার টাকা চোদ্দ আনা। নিয়ম মত খেলে একশিশিতে কুড়ি পঁচিশ দিনেব বেশী চলে না। একশিশি খেয়ে বেশ ফল পেলেন কিন্তু তিনি। ডাক্তার বাবু বললেন আরও তিন চার শিশি খেতে হবে। দ্বিতীয় শিশি কিনতে কিছুদিন সবুব করতে হল। কিনলেন যখন তখন পুরোমাত্রায় খেতে আর সাহস হল না। অত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেলে

পেরে উঠবেন কি করে তিনি। যে ওষুধটা কুড়ি পঁচিশ দিনে শেষ করা উচিত সেটা খেতেন তিনি দুমাস আড়াই মাস ধরে। যতটুকু উপকার হয়।

এই ভাবেই দিন তাদের কাটছিল। তাদের পাড়ার বড়লোক হীরেন্দ্রবাবুর ছেলেরা দামি দামি জামা কাপড় পরত, সুন্দর সুন্দর খেলনা নিয়ে খেলা করত, সেজেগুজে মোটরে চড়ে সিনেমা দেখতে যেত, যদু দূর থেকে চেয়ে চেয়ে দেখত আর ভাবত ওদের অমন আর আমাদেরই বা এমন কেন। ছেলে মানুষ সে, তখনও বুঝত না যে টাকাকড়ি থাকলেই লোকে বড়লোক হয় না, যার বড় মন সেই বড় লোক। বাইরের ঐশ্বর্য নিয়ে যারা মত্ত থাকে প্রায়ই তাদের ছোট মন হয়, গরীবের ঘরেই পৃথিবীর অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ লোক জন্মগ্রহণ করেছেন। আমাদের দেশ গরীবের দেশ। এ দেশে অনেক লোকই দুবেলা পেট ভরে খেতে পায় না, রোগে ভুগে ওষুধ পায় না, শীতকালে কাপড় পায় না, বর্ষার জল গ্রীষ্মের রোদ থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারে না। এ দেশে গরীব হওয়া খুব বেশী একটা লজ্জার কথা নয়, এ দেশই গরীবের দেশ। আমরা সবাই দরিদ্র। মোটরে চড়ে সিনেমা দেখে বাইরে আস্ফালন করে বেড়ায় যারা তারাও দীন দুঃখী। তাদের বাইরের মুখোসটা খুলে ভেতরের চেহারা দেখলে তবে সেটা বোঝা যায়। ছেলে মানুষ যদু কিন্তু অতশত কিছু বুঝত না, নিজেদের দৈন্য দেখে তার ভারী দুঃখ হত কেবল।

যদু যখন একটু বড় হল তখন আর এক সমস্যা দেখা দিল সংসারে। যদুকে স্কুলে পাঠাতে হবে। তার মানেই খরচ বাড়বে। স্কুলের মাইনে বই খাতা পেন্সিল আরও নানা রকমের খরচ। এতদিন যদু বাড়িতেই নিজে যতটুকু পারত পড়াশুনা করত তার মায়ের সাহায্যে। রবিবার দিন তার বাপও একটু সাহায্য করতেন তাকে। কিন্তু একদিন কালীমোহন বাবু বললেন, "এইবার যদু স্কুলে ভর্তি হোক, বাড়িতে থেকে সময় নষ্ট হচ্ছে কেবল—"

রাত্রে শোবার সময়ও এ নিয়ে আলোচনা হল।

"আমি না হয় এ মাস থেকে ওষুধটা আর কিনব না কি বল—"

মা বললেন, "উপকার যখন হয়েছে তখন খাও আরও কিছুদিন। ছেলের ইস্কুলের পড়ার খরচ হয়েই যাবে কোন রকমে—"

"দেখি"—দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ল কালীমোহন বাবুর।

ওঁরা মনে করেছিলেন যদু ঘুমিয়েছে, যদু কিন্তু ঘুমোয়নি, সব শুনছিল সে শুয়ে শুয়ে। তার মনে হচ্ছিল, ঠিক কি যে মনে হচ্ছিল তা বর্ণনা করে বোঝান শক্ত—অবর্ণনীয় একটা বেদনা তার সারা বুক জুড়ে টনটন্ করছিল বিষ-ফোড়ার মতো।...এত দুঃখ কেন তাদের

যদু স্কুলে ভর্তি হল।

তার বাবা মা কোনক্রমে পড়ার খরচ চালাতে লাগলেন। প্রধান খরচ স্কুলের মাইনে বই খাতা পেন্সিল কলম। কিছু বই কালীমোহন বাবু চেয়ে-চিন্তে জোগাড় করতেও পেরেছিলেন। এমনি ভাবে অতিশয় দীন আয়োজন নিয়ে যদু বিদ্যামন্দিরে ঢুকল। বাণী মন্দিরে কিন্তু ধনী দরিদ্রের সমান বিচার, যে গুণী তার ললাটেই জয় টীকা। যদু প্রথম হয়ে ক্লাস প্রমোশন পেল। প্রত্যেক বিষয়ে সে প্রথম। পাশের বাড়ির হীরেন্দ্র বাবুর ছেলেরা, যারা সৌখীন জামা কাপড় পরে মোটরে চড়ে বেড়াত, ঘণ্টায় ঘণ্টায় যাদের প্রাইভেট টিউটররা পড়িয়ে যেত তাদের মধ্যে একজন যদুর সঙ্গে পড়ত, তার ঐশ্বর্যের জাঁকজমক সত্ত্বেও তাকে কিন্তু যদুর নীচেই আসন গ্রহণ করতে হল সরস্বতীর দরবারে।

যদু মহা-উৎসাহে পড়াশোনা করতে লাগল। প্রতি বছরই সে ফার্ষ্ট হয়। সে ভুলে গেল যে সে গরীবের ছেলে, মনুষ্যত্বের বৃহত্তর আদর্শে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার মন। হঠাৎ কিন্তু একদিন একটা নিদারুণ আঘাত লাগল।

সেদিন শনিবার ছিল। স্কুল থেকে ফিরে এসে যদু দেখল যে একটা ফেরিওলা এসে তার মাকে সাধাসাধি করছে কাপড় কেনবার জন্যে। মা যদিও তাকে বার বার বলছেন যে কাপড় কিনবেন না তিনি, তবু সে ছাড়বে না। শেষটা বললে—"দেখুনই না মাঠাকরুণ, দেখতে আর ক্ষতি কি—".

খুলে বসল সে কাপড়ের মোট। নানারকম চকচকে ঝকঝকে সুন্দর সুন্দর পাড়-ওলা কাপড়, দেখলেই কিনতে ইচ্ছে করে। যদুর মা একটু ঝুঁকে একখানি কাপড়ের

জমি দেখতে দেখতে জিজ্ঞাসা করলেন, "কত দাম এ-খানার?"

"তিনটাকা মা—"

"তিন টাকা।"

যদুর মা উঠে দাঁড়ালেন, তিন টাকা দিয়ে একখানা কাপড় কেনা তাঁর পক্ষে অসম্ভব।

"না, আমি কিনব না, তুমি যাও—"

ফেরি-ওলা চলে গেল। যদুর বিষম ভাবী কষ্ট হল।

সে মা-কে বললে—"নাও না মা তুমি কাপড়খানা—"

"অত টাকা কোথায় পাব বাবা—"

সত্যিই তো, যদু চুপ করে রইল।

তারপর সে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়, অনেকক্ষণ একা একা ঘুরে বেড়াল, তার কেবলি মনে হতে লাগল কি হবে লেখাপড়া করে, কি হবে ফার্স্ট হয়ে, যদি সে তার মায়ের দুঃখ না ঘোচাতে পারে। সামান্য একটা তিন টাকা দামের কাপড়, তাও তার মা কিনে পরতে পারেন না পয়সার অভাবে। অথচ তার পড়ার জন্যে মাসে মাসে চার পাঁচ টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে। কি হবে এ অবস্থায় পড়ে শুনে। রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে সেই ফেরিওয়ালাটার সঙ্গে আবার তার দেখা হয়ে গেল।

"তোমার দোকানটা কোনখানে বল তো?"

ফেরিওয়ালা বলে দিলে কোনখানে তার দোকানটা।

সেদিন সন্ধ্যার সময়—কালীমোহনবাবু তখনও পড়িয়ে ফেরেন নি, যদুর মা রান্নাঘরে ব্যস্ত—যদু চুপিচুপি বেরিয়ে পড়ল হাতে একটা পুঁটুলি নিয়ে। ঘণ্টাখানেক পরে ফিরল চোরের মতন, তার বগলে কাগজে মোড়া সেই শাড়িখানা। নিজের প্রাইজের বইগুলো পুরোনো বইয়ের দোকানে বিক্রি করে সেই টাকা দিয়ে সে শাড়ি কিনে এনেছে মায়ের জন্যে। কালীমোহনবাবু তখনও ফেরেন নি, মা উদ্বিগ্ন হয়ে বসেছিলেন।

"কোথা গেছলি তুই?"

যদু কি বলবে, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। অনেক জেরার পর মার কাছে তাকে সব কথা শেষে বলতে হল। শুনে মা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। প্রদীপের ম্লান আলোয় মা আর ছেলে পরস্পরের দিকে নির্বাক হয়ে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মায়ের পরনে সেলাই করা তালি দেওয়া অর্ধ মলিন শাড়ি, ছেলে তার প্রাইজের বই বিক্রি করে মায়ের জন্যে ভাল শাড়ি কিনে এনেছে।

এর পর যদু আর প্রাইজ পায় নি। কারণ আর সে পরীক্ষা দেবার সুযোগই পায় নি। কিছুদিন পরে কালিমোহনবাবু হঠাৎ মাথা ঘুরে রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ে মারা গেলেন। ওষুধ কেনা তিনি অনেকদিন আগেই বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কালীমোহনবাবুর যা হয়েছিল, যদুরও তাই হল, অর্থাভাবে পড়াশুনা বন্ধ করে দিতে হল।

পাঁচ টাকার বাড়ি ছেড়ে, দুটাকার একটা বাড়িতে উঠে গেলেন যদুর মা। যদু চাকরি খুঁজে বেড়াতে লাগল। অনেক খুঁজে কিছু না পেয়ে শেষে রিকশা টানার কাজ জুটল একটা। উপায় কি? নইলে যে না খেয়ে মরতে হয়। যদুর মা একজনের বাড়িতে রাঁধুনিগিরি করতে লাগলেন। যদু রিকশা টানতে টানতে স্বপ্ন দেখতে লাগল—বিদ্যাসাগর, ভূদেব, বুকার টি ওয়াশিংটনের।

এই খানেই গল্পটি শেষ করে দিলে গল্পের দিক থেকে বোধ হয় ভাল হয়, কিন্তু সবটা বলা হয় না। তোমাদের মধ্যে অনেকে ভবিষ্যতে বড় হবে, দেশের দুঃখ ঘোচাবে, তোমাদের জেনে রাখা দরকার দেশের সত্যিকার দুঃখ কোথায়।

যদুর মতো ভাল ছেলে আমাদের দেশে অনেক জন্ম গ্রহণ করে। তাদের মধ্যে ভাগ্যবলে ছিটকে পড়ে দু-চারজন। হয়তো মাথাও তুলতে পারে। কিন্তু, দারিদ্র্যের নির্মম পেষণে অধিকাংশই মরে যায়। খেতে পায় না, পরতে পায় না, কেউ এদের কিছু সাহায্য করে না, এরা অসহায়ভাবে লুপ্ত হয়ে যায়। আমাদের দেশের এমনই দুর্ভাগ্য যে এমন সব রত্নকে আমরা অহরহ হেলায় হারাচ্ছি, এদের দিকে ফিরে তাকাই না পর্যন্ত। এই যে আমাদের দেশ জোড়া দারিদ্র্য এর কারণ কি, এর প্রতিকারের উপায় কি তা তোমরা এখন থেকেই জানতে চেষ্টা কর, ভাবতে চেষ্টা কর, তাহলে হয়তো তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ সত্যিই দেশের দুঃখ ঘোচাতে পারবে। এই যদুই হয় তো একদিন কত বড় হতে পারত, কিন্তু পারলে না। খোলার ঘরের অন্ধকার কোনে যক্ষ্মায় জীর্ণ হয়ে শেষে তিলে তিলে মরতে হল তাকে অকালে। রুগ্ন অনাহারক্লিষ্ট শরীরে রিকশাটানা সইল না।

মোগল রাজ্যে বিচার

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায

(সত্য কাহিনী)

ইতিহাসের একটা কথা বলছি। অনেকদিনের কথা। তখন পাঠান গিয়েছে বাংলা হ'তে উড়িষ্যায়, মোগল-সম্রাট আকবর বাংলা শাসন করবার জন্যে সুবেদার পাঠিয়েছেন গৌড়ে। পূর্ব বাংলায় তখন বারোভুঁইয়ার আধিপত্য। ভুঁইয়ারা এক একটী ছোট রকমের রাজা। এঁদের মধ্যে রাজা ঈশা খাঁ ছিলেন প্রধান, তাঁর কথা বারান্তরে বলব। এবার বাকলা চন্দ্রদ্বীপের রাজার কথা বল্‌ব। তাঁর বিচার হয়েছিল সুবেদারের দরবারে।

এই ক্ষুদ্র রাজার নাম উদয়নারায়ণ। তাঁর বয়স যখন আঠার বৎসর, তখন তাঁর বাপের মৃত্যু হয়। তিনি বাপের সিংহাসন এই অল্প বয়সেই অধিকার করেন। রাজ্য ছিল উলাইল-পরগণায়। তার দুই তিন বৎসর পরে তাঁর নিকটাত্মীয় বাকলা চন্দ্রদ্বীপের রাজার সহসা মৃত্যু ঘটিলে তিনি চন্দ্রদ্বীপের সিংহাসন অধিকার করেন। সুবেদারের বিনানুমতিতে রাজ্যটা অধিকার করায় তাঁর হোলো মস্ত অপরাধ। তাঁকে ধোরে আন্‌বার জন্যে দু' হাজার মোগল সৈন্য চন্দ্রদ্বীপের দিকে ছুটল। তিনি একবার মনে কর্‌লেন, মোগলগুলোকে মেরে তাড়িয়ে দি, কিন্তু ঈশাখাঁর সঙ্গে পরামর্শ না করে এত বড় কাজে প্রবৃত্ত হোতে সাহস করলেন না।—রাজভক্ত অনুগত প্রজার ন্যায় তিনি ধরা দিলেন এবং যথাকালে গৌড়ে নীত হলেন।

গৌড় তখন মস্ত নগর—সমগ্র বাংলার রাজধানী। মোগল পাঠানের আগে হিন্দুরাজার আমলেও গৌড় বাংলার রাজধানী ছিল। দরবার-গৃহের সাজসজ্জা দেখে উদয়নারায়ণ চমৎকৃত হলেন। উদয়কে দেখে সুবেদারও চমৎকৃত হলেন। তাঁর মনে হল উদয় যথার্থই রাজা হোতে জন্মেছে। দীর্ঘাকার সুঠাম বলিষ্ঠ দেহ, উজ্জ্বল গৌরকান্তি, বিদ্যুন্নিক্ষেপী নয়ন, তীক্ষ্ণ নাসিকা যেন পরিচয় দিতেছিল এই নবীন যুবক এক অসাধারণ ব্যক্তি। সুবেদার, উদয়কে আসন গ্রহণ করতে ইঙ্গিত কর্‌লেন। বন্দীরা সচরাচর আসন পান না,—বিচারার্থীর আসনে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হয়, কিন্তু সুবেদার এতটা বন্দীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে, তার সিংহাসনের নিকটেই আসন নিতে বললেন। তবে এ কথাও ঠিক যে, উদয়নারায়ণের মত অবস্থাপন্ন বন্দীও সচরাচর এ দরবারে আসেন না অভিযুক্তরূপে। তিনি নবাব বা সুবেদারের জন্যে কিঞ্চিৎ উপহার এনেছিলেন। চন্দ্রদ্বীপের রাজভাণ্ডারে একছড়া মহামূল্য মণিময় কণ্ঠহার ছিল, তিনি তাহা সঙ্গে এনেছিলেন। এক্ষণে তা' এক সোণার থালায় রেখে নবাবের সামনে এসে দাঁড়ালেন। এক বান্দা সেটা নিয়ে সুবেদারকে দিল। নবাব খুব খুঁসী হলেন। কিন্তু উজির মসিম আলি একেবারেই তা পছন্দ করলেন না। তিনি চান্ উদয়ের উচ্ছেদ। উদয়কে তাড়িয়ে নিজের এক পুত্রকে চন্দ্রদ্বীপের তক্তে বসাবার জন্যে ব্যস্ত। উদয়ের উপর নবাব যাতে বিরক্ত হ'ন, এই চেষ্টাই উজির সাহেব

করছিলেন। মসিম আলির চক্রান্তেই আজ উদয়ের এই দুর্দশা। উদয় তা বুঝেছিলেন, কিন্তু মসিমের প্রভাব নবাবের উপর এত বেশী যে, তিনি চক্রান্তের কথা বুঝেও কিছু করতে পারছিলেন না।

উজির সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে কর্কশ কণ্ঠে বললেন, "উলাইলের ভৌমিক উদয়নারায়ণ, উঠে দাঁড়াও,—(উদয় উঠলেন)— তুমি চন্দ্রদ্বীপ অধিকার করেছ ?

করেছি।

অনুমতি নিয়েছিলে ?

কার অনুমতি ? তোমার ?

সম্মানের সঙ্গে কথা বলবে।

তোমারও বলা উচিত।

জান আমি কে ?

উদয় একটু হেসে উত্তর করলেন, "জানি বই কি। তুমি মহামান্য নবাব বাহাদুরের ভৃত্য, আমি তাঁর প্রজা— তোমার সম্মানের পাত্র।"

উজিরের মুখ লাল হল। সুবেদার মধ্যস্থ হোয়ে বললেন, "উভয়েই পদস্থ ব্যক্তি, ভদ্রভাবে কথা বলা উভয়েরই কর্তব্য। যে ইতর ব্যবহার করে সেই ছোট হয়।"

উজির রাগে ফুলতে লাগলেন। এভাবে প্রকাশ্য দরবারে তাঁকে অপমান করতে আজও পর্যন্ত কেউ সাহস পায়নি। উদয়ের মাথা নেবার জন্যে তিনি বদ্ধপরিকর হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কোন্ অধিকারে চন্দ্রদ্বীপ দখল করেছেন ?"

উদ। উত্তরাধিকার সূত্রে। মৃত রাজা ইন্দ্রনারায়ণ অপুত্রক, আমি নিকটাত্মীয় বিধায়—

উজি। সুবেদারের অনুমতি নিয়েছিলেন ?

উদ। না—নেবার প্রয়োজন হয়নি।

উজি। প্রয়োজন আছে কিনা তার বিচার কর্তা আমরা—

উদ। এমন কোন বিধান নেই যা' অনুমতি নেবার জন্যে আমাকে বাধ্য করতে পারে। আপনি রাজ বিধান দেখান।

উজি। আপনার নামে অভিযোগ হয়েছে, আপনি ষড়যন্ত্র করে চন্দ্রদ্বীপের রাজা ইন্দনারায়ণকে হত্যা করেছেন।

উদ। (সহাস্তে)। অভিযোগকারী কে ? আপনি ?

উজি। যেই হোক, উত্তর দিন্।

উদ। আগে সে আসুক, অভিযোগ করুক, তবে—

নবাব তখন জিজ্ঞাসা করলেন, "ইন্দ্রনারায়ণ আমাদের অনুগত বন্ধু ছিলেন ? তাঁর মৃত্যুর কারণ তুমি অবগত আছ কি উদয়নারায়ণ ?

উদ। শুনেছি তিনি আগ্নেয়াস্ত্র নির্মাণ করছিলেন, সহসা নালিকা যন্ত্র ফেটে তাঁর মৃত্যু হয়। আমি তখন দূরে—

সুবে। আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি—তুমি মিথ্যাবাদী বলে মনে হয় না। শুনেছি তুমি এই বয়সেই একজন বড় যোদ্ধা বলে খ্যাতি লাভ করেছ। আমার ইচ্ছা তুমি সম্রাটের অধীনে সেনানীর কায গ্রহণ কর। সম্মত আছ ?

উদ। মহামান্য সুবেদারের আদেশ অমান্য করতে পারে এমন লোক বাংলায় নেই, যদি অভয় দেন তাহলে—

সুবে। অভয় দিচ্ছি—বল।

উদ। হিন্দুর বিরুদ্ধে আমি অস্ত্র ধরতে পারব না।

সুবে। কিন্তু মোগলের বিরুদ্ধে পারবে—কেমন ?

উদ। আমার দেশের শত্রুর বিরুদ্ধে পারব।

সুবে। আমরা কি তোমার দেশের শত্রু।

উদ। যতদিন আপনি আমাদের ধর্ম, ইজ্জত, স্বাধিকার রক্ষে করবেন—

সুবে। ততদিন আমরা মিত্র, নইলে শত্রু, কেমন ?

উদ। নবাব বাহাদুর ঠিক বলেছেন।

সুবে। আমরা কি তোমাদের স্বাধিকার নষ্ট করছি।

উদ। কতকটা করছেন বই কি।

সুবে। কিরূপে ? খুলে বল।

উদ। পূর্বে মহারাজাধিরাজের সময়ে আমরা সামন্ত-রাজের সমস্ত অধিকার পেয়েছিলাম। এমন কি পাঠান সুলতানের আমলেও আমরা সে অধিকার হ'তে বঞ্চিত হই নি। যুদ্ধের সময় সাহায্য করতে আমরা ছুটে যেতাম, আর রাজস্ব দিতাম, এ ছাড়া হিন্দু বা পাঠান রাজত্বকালে আমাদের সঙ্গে রাজার আর কোনো সম্বন্ধ ছিল না। আমরা নিজ নিজ রাজ্যমধ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলাম।

এখন মোগল সম্রাট আমাদের সে স্বাধীনতা নষ্ট করছেন—জায়গীর কেড়ে নিয়ে অনুগৃহীত ব্যক্তিদের মধ্যে বণ্টন করবার অভিপ্রায় করেছেন। কাজেই—

সুবে। কাজেই সমস্ত রাজারা তাঁদের স্বাধিকার লুপ্ত হ'বার আশঙ্কায় অস্ত্র ধরেছেন। তুমিও কি ধরেছ?

উদ। যদি অস্ত্র ধরতুম, তাহ'লেত এখানে আসতাম না।

সুবে। তোমার স্পষ্ট কথায় তৃপ্ত হয়েছি। তুমি সম্রাটের নকরি গ্রহণ করবে?

উদ। অধীনের প্রতি জাঁহাপনার যথেষ্ট দয়া, কিন্তু আমি হিন্দু হোয়ে হিন্দুর বিরুদ্ধে কিছুতেই অস্ত্র ধরব না।

সুবে। মহারাজ মানসিংহ ত ধরেছেন।

উদ। তিনি সম্রাটকে ভগ্নী দিয়ে মোগল হোয়েছেন।

সুবে। তুমি এ অবস্থায় ভগ্নী দিতে না?

উদ। না, কিছুতেই না।

সুবে। কি বলে সম্রাটকে প্রত্যাখ্যান করতে?

উদ। বলতাম, আগে আপনার ঘরের মেয়েকে আমাদের ঘরে দিন্, তারপর আমার ঘরের মেয়ে দেবো।

সুবে। রাজা তোডরমল, শক্ত সিং মোগলকে ত সাহায্য করেন।

উদ। একজন স্বার্থান্বেষী, আর একজন অভিমানী। তাই তাঁরা দেশের আগে নিজেদের কথাই চিন্তা করছেন।

সুবে। তুমি এই বয়সেই অনেক কিছু শিখেছ। বাক্‌যুদ্ধের পরিচয় পেলাম, এখন অসি যুদ্ধের কিছু পরিচয় পেতে চাই।

উদ। আজ্ঞা করুন।

সুবে। হিঁদুর বিরুদ্ধে নয়—ভয় পেয়ো না—বাঘের বিরুদ্ধে। আমার পশুশালায় কয়েকটা বাঘ আছে, তার ভেতর একটা এসেছে হ'লে সুন্দরবন হোতে। সেটা আকারেও যেমন প্রকৃতিতেও তেমনি। তোমার উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হবে। তার সাথে লড়াই করতে প্রস্তুত আছ?

উদ। নিশ্চয়।

সুবে। না, অস্ত্র নিয়ে। তবে দীর্ঘ তরবারি নিতে পারবে না। যদি জয়ী হও, তাহলে চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য তোমার।

উদয় বুঝলেন, নবাব তাঁকে বিদ্রোহী বিবেচনা করে এই শাস্তি দিলেন। প্রকাশ্যে নিরপরাধকে হত্যা না করে কাজটা বাঘের ঘাড়ে চাপালেন। উদয় তৎক্ষণাৎ উত্তর করলেন, "আপনার প্রস্তাবে আমি সম্মত।"

সুবে। বেশ, বীরের মতই বলেছ। আপনি শুনুন, উজির সাহেব, আপনার উপর ব্যবস্থার ভার রইল। পরশু বিকেলে এই খেলা হবে—ডঙ্কা মেরে সংবাদটা প্রচার করুন, শক্ত খাঁচায় যেন বাঘটাকে আনা হয়।

উজির মহা আনন্দিত। তিনি যা' চেয়েছিলেন, তাই পেলেন। উদয়নারায়ণের মৃত্যু এবার নিশ্চিত জেনে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। (ক্রমশঃ)

আলহা-উদন

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

রাজস্থানের পথে যেতে যেতে দামিনীর অভিসারে
যদি কভু তুমি পাতার কুটীরে দাঁড়াও ক্ষণিক দ্বারে,
শুনিবে যে গান, তাহারি ছন্দ বেঁধেছি বীণায় মোর
কিশোর বন্ধু। এখানে তোমার ভাঙিও ঘুমের-ঘোর
কালো মেঘে ভরা সজল আকাশে বাদলের খোল বাজে,
সাথে জাগে তার আলহার গান ধারা-বরিষণ মাঝে।

তখনো সন্ধ্যা নামেনি ধরায় অবগুণ্ঠন রবি,
নগর প্রান্তে শিব মন্দির,—তাহারি সোপানোপরি
ছেয়েছে আঁধার মলিন আনন কিছু নাহি ভালো লাগে,
অশৌচী বেশ পরে আছে মাতা—কত কথা মনে জাগে।
আলহা, উদন আসিল তখন তরবারি নিয়ে হাতে,
জ্বলে কোপানল নয়নে দোঁহার তীব্র বেদনাঘাতে।

"কহগো জননি, কোন্ নরাধম পিতৃজীবন হারী ?
তোমারি চরণে দিবগো তাহার পাপের জীবন ডারি।"
উদাসিনী মাতা তাহাদের পানে চাহিল একটিবার,
কহিল তাহারা,—'কহগো জননি, মুছেফেল আঁখিধার।'
বীর অঙ্গনা ধীরে ধীরে কহে—"স্নেহের মাণিক দুটি,
কিশোর বয়সে যুদ্ধ করিতে যেওনা আবেগে ছুটি'।
বারোটী বছর চলে গেছে মোর বাদলের পথ বেয়ে,
আজো অশৌচ করি নাই ত্যাগ তোমাদের পানে চেয়ে।
যদি কোন দিন অনাগতক্ষণে নিতে পারো প্রতিশোধ,
মোর অশৌচ হবে অপগত, অশ্রু হবে গো রোধ।
কঙ্কণ মোর ভাঙিব সেদিন কীর্তি সাগর তীরে,
নব গৌরব বক্ষে ধরিয়া ভাঙা ঘরে যাবো ফিরে।

মাণ্ডুর রাজা আঁধার নিশীথে সুপ্ত শিবিরে এসে,
নিয়ে গেল মোর নবনরীহার ঘৃণিত দস্যুবেশে।
হত ঘুমঘোরে—দেশরাজ আর ভীমরাজ দুই বীর,
রাজপ্রাসাদের বটতরুশাখে তাদের ছিন্ন শির,
আজিও দুলিছে—তোমাদের কাছে কহি নাই কোন দিন,
পাছে ব্যথা পাও এই ভাবি বাছা—আমি যে ভাগ্যহীন।"
একথা শুনিয়া কহিল উদন—"দুঃখ করো না মাতা'
মাণ্ডুরাজের মুণ্ড আনিয়া রচিব শৌর্যগাথা।
ও চরণ তব পরশিয়া দোঁহে করিতেছি মাগো পণ
করিব দু'ভাই অরাতি শোণিতে জনকের তর্পণ।"
মায়ের আননে হাসির দীপ্তি ফুটিল সন্ধ্যাবেলা,
আশিসে তাঁহার ভর করি দোঁহে ভাসালো আশার ভেলা।

সহসা বাজিল যুদ্ধ-দামামা ঘনঘন দম্ দম্
মাহোবা রাজ্যে ধ্বনিয়া উঠিল—হর হর বম্ বম্।
ঝন্ ঝন্ রবে ঝনকিয়া অসি আসে বীর দলে দলে।
মাহোবার রাজা সাজালো সৈন্য ত্রিশূল পতাকাতলে।
মাণ্ডুর পথে চলেছে বাহিনী আলহা-উদন সনে,
মাণ্ডু গড়ের সমীপে শিবির পাতিল বাবলাবনে,
বহুদূরব্যাপী শুধু অগণন বাবলাগাছের সারি,
উজাড় হোলো সে সেনাপদতলে—শুনিয়া আসন ছাড়ি',
মাণ্ডুর রাজা কলিঙ্গ রায় কহিল তনয়ে তার—
দূত সহ তুমি শত্রু শিবিরে নিয়ে যাও সমাচার

—কোন্ অধিকারে এ কানন ভূমি শূন্য করিছে তারা?
আনো মোর কাছে তাহাদের শির—উষ্ণ রক্ত ধারা,
সেই ধারা পান করিব হরষে, সহে না যে আর দেরী—"
দেখিতে দেখিতে মাণ্ডু বেড়িয়া বেজে ওঠে রণভেরী।
যত কথা হোলো আলহা শিবিরে রাজ্যের সীমানায়,
সকল কথার শেষ কথা তারা মাণ্ডু রাজ্য চায়,
আর চাহে তারা রাজার মুণ্ড—জ্বলে উঠি কোপানলে
রাজার তনয় সূর্য সিংহ পিতারে আসিয়া বলে।
"যুদ্ধ। যুদ্ধ। গর্জিল রাজা, সাজো সেনা গজ বাজি"
মাহোবা রক্তে হবে হোলি খেলা, আসুক সকলে সাজি।"

মাণ্ডু রাজার অগণিত সেনা শেষ হয়ে আসে সব,
রাজার কুমার হারালো জীবন—উঠিল আর্তরব।
বালক বীরের শরাঘাতে গজ হারায়ে মাণ্ডুরাজ
পরাজিত হয়ে আলহার কাছে পরিল বন্দী সাজ।
আলহা-উদন বীর দুই ভাই লুণ্ঠিয়া রাজধানী,
মাণ্ডুরাণীর কণ্ঠে শোভিত নবনরী খুলে আনি',
ছিন্ন মুণ্ড পাড়িতরু হ'তে সদ্‌গতি করি তার
ফেরে মাহোবায় বিজয়ী যুগল, ওঠে জয় হুঙ্কার।
উৎসব বেশে গাহিছে মাহোবা, বীর মঙ্গলগীতি,
অন্ধকারের অন্তরে বসি' বন্দীর জাগে ভীতি।
শ্রাবণমেঘের সম মুখখানি,—মরণ ঘনায়ে আসে,
মাণ্ডু রাজের পাণ্ডু কপোল নয়নের জলে ভাসে।

আলহা-উদন জননীর কাছে আসিয়া গরবে কহে,
"—বলি দিব মাগো, কহ আদেশ" বন্দী নীরবে রহে।
স্তব্ধ ভুবন, পাখীরা কূজন করে নাক তরুশাখে,
দূরের আকাশ বিস্ময়ে যেন মাটিতে চাহিয়া থাকে।
এমন সময়ে কহিলেন মাতা—"রাজ্য ফিরায়ে দাও,
কি হবে বৎস নর হত্যায়—সত্যের জয় গাও।
যারা চলে গেছে আসিবে না ফিরে, বেদনা যাবে না মোর,
বন্দীরে ক্ষমি' মুক্ত করগো, মুছে দাও আঁখিলোর।
মুকুতার সম পুলক অশ্রু ঝরে চারি দিক হ'তে—
বিশ্বমাতার প্রসাদী কুসুম হাসিল কালের স্রোতে।
গেছে কত যুগ আলহা-উদনে ভোলে নাই আজো কেহ'
বীর জননীর স্মরণ প্রদীপে উজল পল্লী গেহ।

রাজরূপা

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম-এ

(কাশী হিন্দু বিশ্বালয়)

Balzac ঠাট্টা কো'রে লিখেছেন ইংরেজেরা যে দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াতে এত ভালবাসে তার কারণ তাঁদের দেশের চেয়ে আর সব দেশই সুন্দর। আর ফরাসীরা যে ঘর ছেড়ে বার হতে চায় না তার কারণ ফ্রান্সের চেয়ে সুন্দর স্থান পৃথিবীতে আর নেই। এই বিদ্রূপে কোনও সত্য আছে কিনা তা' বিচার করতে পারেন সেই সৌন্দর্য পিপাসু ভ্রাম্যমান, জগতের সহিত যার সাক্ষাৎ পরিচয় হ'য়েছে।

সেইরূপ কবি ও সাধকেরা বলেন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় বিশেষতঃ বর্ষার দিনে যদি আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি, যে সৌন্দর্য তখন চোখে পড়ে, বিশ্বে তা' অতুলনীয়। গৃহকোনেই সৌন্দর্য পিপাসা মেটান যেতে পারে। ভ্রমণ কষ্টকর ও ব্যয়সাধ্য কাজেই উহা অপ্রয়োজনীয়।

কিন্তু এ যুক্তি অনেকেই মেনে নিতে রাজী নন। আমাদের দেশে এমন একদিন ছিল যখন "লিলুয়া যাত্রা" লেখা হো'ত। "উত্তরাপথ—ভ্রমণের" তিনভাগ শেষ হ'য়ে যেতো হরিদ্বারে, একভাগ শেষ হোতো উত্তরাপথে। এখন ভ্রমণ-কাহিনী কমে গিয়েছে, কারণ ভারতবর্ষের চতুঃসীমা প্রদক্ষিণ সহজ হ'য়ে এসেছে রেলকোম্পানীর কৃপায়। বদরী, কেদার, কাশ্মীর, অমরনাথ এমন কি মানস-সরোবরও পুরানো হ'য়ে এসেছে। দুর্গম মানস-সরোবর ও অমরনাথ দেখতে আমরা ব্যাকুল হই। কিন্তু আমাদের আশে পাশে এমন সব মনোরম স্থান পড়ে রয়েছে যা' আমরা জানি না।

রাঁচি ও হাজারীবাগের নিকট "রাজরূপা"র কথা অনেকেই জানেন না। প্রায় ১৫ বৎসর পূর্বে কাশী হ'তে "বঙ্গসাহিত্য" নামে একখানি ত্রৈমাসিক পত্রিকায় গোরখপুরের প্রধান সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্তী মহাশয় "রাজরূপা" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তিনি গো-যানে "রাজরূপা" দর্শন করেন। কাযেই পথের সৌন্দর্যের চিত্র আমরা প্রতি পৃষ্ঠায় দেখতে পাই। এখন মোটরকার, মোটর বাস্ এত জোরে আমাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দেয় যে, পথের সৌন্দর্য দেখবার সময় পাই না।

মোটরযানে হাজারীবাগ বা রাঁচি হ'তে রামগড় ও গোলা হ'য়ে রাজরূপা ৫৩ মাইল। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের 'গোলা রোড' ষ্টেশন হতে রাজরূপা প্রায় ১০ মাইল। হাওড়া হ'তে 'গোলা রোড' ২৩৪ মাইল, ভাড়া মধ্যমশ্রেণী ৬৵৴১, তৃতীয় শ্রেণী ৪।৴০। গোলা হ'তে পদব্রজে বা গো-যানে যাওয়া যায়। পূর্ব হ'তে বন্দোবস্ত করলে Bus বা car পাওয়া যেতে পারে। অবশ্য ব্যস্তবাগীশদের জন্য Car বা Bus না হো'লে চলবে না।

মনে হয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মুসলমানদের আক্রমণে ওদন্তপুরী ও বিক্রমশীলা যখন ধ্বংস হয় তখন কোন তান্ত্রিক সাধক নিরুপদ্রবে সাধনার জন্য এই দুর্গম

স্থানে সাধনার পীঠ স্থাপনা করেন। বিস্মিত হ'য়ে উঠি সেই সাধকের কবি মনের পরিচয় পেয়ে। এমন স্থান-মাহাত্ম্যে যে চিত্ত সহজেই ঈশ্বরমুখী হয়।*

মনে হয় সেই আদিম জঙ্গল এ দেশের আদিম অধিবাসীর ন্যায় এখনও সেই ভাবেই দাঁড়িয়ে আছে। ভীমদর্শন প্রস্তরস্তূপের মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্রকায়া দামোদর প্রবাহিত সঙ্কীর্ণ পথে। তাহার গতিবেগ প্রতিপদে বাধাপ্রাপ্ত, কাযেই তরঙ্গহীন স্রোতধারা যেন বেদনায় মুষড়ে মুষড়ে চলেছে এবং যে সব আবর্তের সৃষ্টি করছে তা' সত্যই ভয়াবহ। গ্রীষ্মে যদি এইরূপ, বর্ষায় তাহার পরিণতি

"রাজরূপার ছিন্নমস্তা"র মন্দির

কি তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। দামোদরের ১০।১৫ ফুট উপর হইতে "ভেড়া" নামে একটি নদীর ক্ষীণধারা প্রপাতের সৃষ্টি কোরে দামোদরের বুকে আত্মবিসর্জন কোরছে। বর্ষায় এই ক্ষীণতোয়া 'ভেড়া' কেমন স্ফীতকায়া হয় তাহা অনুমান করাও কঠিন নয়। এই ছোট্ট নদীতে সাধারণত গ্রীষ্মে যে স্রোত বহে তার গভীরতা ৬ ইঞ্চির বেশী নয়। ছোট ছেলেমেয়েদের ইহা যে লোভনীয়, এমন কি তাদের বাপমায়েদেরও যে বাল্যে ফিরে আসতে ইচ্ছা করে তা উল্লেখ না করলেও চলে।

এই দুটি নদীর সঙ্গম স্থলে "রাজরূপা" মন্দির। মন্দিরে বিশেষ কোন কারুকার্য নাই। দূর হতে কতকটা ঢিপির মত। মন্দিরের মধ্যে কোনও মূর্তি নাই। যে মূর্তি আছে তাহা কতকটা অনুমান করে নিতে হয়। যে সাধক এই মন্দির নির্মাণ করেন তিনি একখানি বড় পাথরের উপর লৌহ শলাকার দ্বারা "ছিন্নমস্তা"র মূর্তি অঙ্কিত কোরে সাধনা করতেন। সে মূর্তি বহুযুগের দেওয়া সিঁদুরের লেপনে প্রায় লোপ পেয়েছে। তবে "ছিন্নমস্তা" নামের সার্থকতা বজায় রেখেছে দেবীর উপাসকেরা। প্রতি দিনই বহু ছাগের মুণ্ড ছিন্ন হয় দেবীকে প্রসন্ন করার জন্য। মূঢ় ভক্তেরা ভুলে যায় যে দেবী জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী "সর্ব্বভূতেষু দয়া রূপেন সংস্থিতা," ছাগরক্তে তাঁহাকে প্রসন্ন করার চেষ্টা মূঢ়তার পরিচয়। কিন্তু এই সহজ সত্য উপলব্ধি করা এই সব ভক্তের পক্ষে সম্ভবপর নয়। এমন কি শাস্ত্রবিৎ মহাজনেরাও পূজার নামে এই নিষ্ঠুরতা প্রশ্রয় দিয়ে নিজেদের বিকৃত বুদ্ধি ও হৃদয়হীনতার পরিচয় দেন। সংস্কারের চাপে তাঁদের মন অসাড় হয়ে পড়াই ইহার কারণ।

পূজারী প্রত্যহ যথাসময়ে দেবীর পূজা করে যান। কিন্তু বর্ষাকালে "ভেড়া" নদীর বেগ এত প্রবল হয় যে কোন মানুষের পক্ষে নদী পার হয়ে মন্দিরে পূজা দেওয়া সম্ভব হয় না। সেইজন্য এই সময় নদীর অপর পার হতে দেবী উদ্দেশে পূজা দিয়ে পূজারী ঠাকুরকে ঘরে ফিরতে হয়। এ পর্যন্ত এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দেবী কোন আপত্তি জানান নাই। কারণ তিনি পূজারী বেচারীর মনোভাব ভাল করেই বোঝেন।

গত কংগ্রেসের সময় রামগড়ে ভারতের বহু মহাজন সমবেত হ'য়েছিলেন। বৃষ্টির জন্য তাঁদের অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হ'য়েছিল। জানি না তাঁদের "রাজরূপা" দেখবার সুযোগ হ'য়েছিল কি না। আশা রাখি বাংলার সৌন্দর্য পিপাসু ও ভাবুক নরনারী এই নৈসর্গিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি "রাজরূপা" দর্শন কো'রে আনন্দ পাবেন।

* ভারতের তীর্থগুলি মনে হয় এই উদ্দেশ্যেই স্থাপিত হয়েছিল। যোশীমঠ, বদরী, কেদার, জ্বালামুখী, কামাখ্যা, পুরী, দ্বারকা ও রামেশ্বর প্রভৃতির কথা ভাবলে সেই সত্যই প্রমাণিত হয়। এখন সৌন্দর্য পিপাসা মিটাবার জন্য বা স্বাস্থ্যের জন্য আমরা এই সব স্থানে যাই। পূর্বে পুণ্য লাভের আশায় ধর্মপ্রাণ মানুষ প্রচুর অর্থব্যয় ও কৃচ্ছ্র সাধনে এই সব দুর্গম তীর্থ পরিক্রমা করতেন।

৩১শে মার্চ্চ মঙ্গলবার বেলা ১২টা

শ্রীতাপসরঞ্জন সরকার

চার
(আঙ্গুলহীন পদচিহ্ন)

খাবার টেবিলে বসে খেতে খেতে বিজয় বললে, "কিন্তু সমীর, নবীনবাবুর কাছেই যে উইল আছে সে বিষয়ে আমি একেবারে নিঃসন্দেহ নই, কেননা ওকথাটা ৫০০৲ টাকা চায় এমন একটা লোকের মুখে শুনেছি বৈতো নয়? লোকটা যে জোচ্চর নয় তা কে বলতে পারে? প্রত্যক্ষ প্রমান চাই। সলিলবাবু যে এর মধ্যে আছেন তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু, উইল যে তাঁর হাতছাড়া হ'য়ে গেছে এমনত' মনে হয় না। সম্ভবতঃ দলের লোকদের ফাঁকি দেবার জন্য তিনি ওটা তাদের কাছে মিথ্যে করে রটিয়েছেন। যাই হোক, আগে আমাদের কর্ত্তব্য সেই সিন্দুকটি পরীক্ষা করা। তারপর কে সিন্দুক খুলে উইল বার কোরে নিয়ে গিয়েছে তা সন্ধান করে বার করা। তুমি অজয়বাবুকে "ফোনে" একবার ডেকে পাঠাও। আমি আজই একবার সিন্দুকটা এবং সে ঘরের পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করে আসতে চাই।"

যথা সময়ে অজয় এসে উপস্থিত হোল। বিজয় তাকে সমস্ত বুঝিয়ে বলে তার সঙ্গেই একটা "ক্যামেরা" একটা 'টর্চ' এবং আবশ্যকীয় অন্যান্য জিনিস নিয়ে অজয়দের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হোল। সমীর ও তাদের সঙ্গে এল।

বিজয় সিন্দুকটির তালা খুলে দেখলে যে তালাটি নষ্ট হয়নি। অজয়কে জিজ্ঞেস করলে, "উইল চুরি যাবার পর কি আপনি সিন্দুকের তালা বদলে ছিলেন—?" অজয় বললে, "না।" বিজয় প্রশ্ন করলে—"সিন্দুকের চাবি আপনি কোথায় রেখেছিলেন?" অজয় উত্তর করলে, "সিন্দুকের চাবি বরাবর আমার সঙ্গে সঙ্গেই রয়েছে।" বিজয় ঘরের বাইরে গিয়ে জানালার ধারে এসে কি যেন ভূমিতে অনুসন্ধান করতে লাগলো। হঠাৎ দেখলে যে ঠিক জানালার নীচেই একটি পায়ের দাগ মাটির উপর অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। একটা হাই পাওয়ারের লেন্স্ বার করে বিজয় পায়ের ছাপটি পরীক্ষা করে দেখলে যে সেই পায়ের কড়ে আঙ্গুলটি নেই। এ ছাড়া বিজয় সে ঘরের ভিতরে বা বাইরে আর উল্লেখযোগ্য কিছুই পেলে না। সেই আঙ্গুল বিহীন পদচিহ্ন দেখে, বিজয় অত্যন্ত উত্তেজিত হ'য়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলো। পায়ের চিহ্ন সম্বন্ধে কোন কথাই সে কাউকে বললে না। মনে মনে ভাবলে, "চুরির রাত্রে বৃষ্টি হওয়ার জন্যই বেচারীর পায়ের যে দাগ পড়েছিল আজ শুকিয়ে উঠে সেটা আরও স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে।" জানালার নীচে ভিজে জমিতে আরও অনেক গুলো পায়ের দাগ অবশ্য পড়েছিল। কিন্তু সে দাগগুলো একটার উপর আর একটা থাকায় বিজয়ের পক্ষে সেগুলো কোনো কাজে আসেনি। বিজয় ও সমীর সেখান থেকে সোজা বাড়ী চলে এলো। সমীর বিজয়কে জিজ্ঞেস করলে, "সিন্দুক দেখে তুমি কি আবিষ্কার করলে?" বিজয় বললে, "চা খাবার সময় হয়েছে, চলো আগে চা-টা খেয়ে নিই। পরীক্ষার আরও কিছু বাকী আছে। এ সম্বন্ধে যা বলবার তা কাল তোমায় বলবো।"

রাত্রে খেতে বসে বিজয় সমীরকে বললে, "দেখ সমীর আমাকে এখনি একটু বেরুতে হবে। তুমি খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়গে। আমি ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই ঘুরে আসবো। কেন বেরিয়ে যাচ্ছি সে বিষয় যদি শুনতে চাও তবে জেগে থেকো, নয়তো কাল সকালেই শুনবে—বুঝলে? আর,

এক কাজ কোরো— আজ রাত্রে গেটের দরজাটা খুলে রেখো। অত রাত্রে এসে ডাকাডাকিটা ভাল নয়। তোমরা একটু সাবধানে থেকো। আমার চাকরটাকে না হয়—তোমার ঘরের সামনে শুতে বলো।"

বিজয় রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। এদিক ওদিক এক বার চেয়ে দেখে অজয়বাবুর বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হল। অজয়বাবু বাইরেই ছিলেন। বিজয় জিজ্ঞাসা করলে, "আপনার বাড়ীতে ক'জন চাকর থাকে?" অজয় উত্তর করলে, "দু' জন।" বিজয় বললে,—তাদের দুজনকেই এখানে ডাকুন, চাকর দুজন উপস্থিত হোলে বিজয় তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করলে, "তোমার নাম কি হে?" সে বললে' "আজ্ঞে, আমার নাম শম্ভু।" বিজয় দ্বিতীয় ব্যক্তিকেও তার নাম জিজ্ঞেস করলে কিন্তু তখন তার দৃষ্টি দ্বিতীয় চাকরটার বাঁ পায়ের উপর নিবদ্ধ ছিল। বিজয়ের সন্দেহটা এই দ্বিতীয় চাকরটার বাঁ পাটি দেখে একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেল। কেননা বিজয় পূর্বেই অনুমান করেছিল যে এই বাড়ীরই কোন চাকর হয়ত টাকার লোভে সেদিন রাত্রে সিন্দুকের ধারের জানালা খুলে রাখতে গেছলো এবং কড়ে আঙুলহীন পাখানি তার প্রমাণ স্বরূপ সেখানে রেখে গিয়েছিল। বিজয়ের প্রশ্ন জিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গেই তার মুখের ভাব একেবারে বদলে গেল এবং সে কম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিল, "আজ্ঞে কর্তা, আমার নাম এই ..ইয়ে· এই সবাই কেষ্টা বলেই ডাকে।" বিজয় ধমক দিয়ে বললে, "তোমার আসল নামটি কি খুলে বলো" কেষ্টা কম্পিত কণ্ঠে জবাব দিল, "আজ্ঞে কর্তা কেষ্টা বলেইত সবাই ডাকে। বাপ মায়েও ঐ বলতো—হুজুর। আর ত কিছু আমি জানিনি।" "চোপরও, নেমকহারাম। যা জিজ্ঞেস করছি বল—। তোর আসল নাম কি?" "আজ্ঞে, হুজুর—শ্রীমানকৃষ্ণচন্দ্র দে দাস। সাকিম মেদিনীপুর, গ্রাম দাঁতন।" বিজয় নোটবই বার কোরে টুকে নিল। কৃষ্টচন্দ্র ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠে বললে—"দোহাই হুজুর! আমি কিছু জানিনি—

পাঁচ

(কেষ্টার উক্তি)

এতক্ষণ অজয় ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে না পেরে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। এইবার বিজয়কে জিজ্ঞাসা করলে, "দেখুন, আমি কিছুই বুঝতে পারছিনা।" বিজয় বললে, "হাঁ, তা' না বোঝবার কথা বৈকি। আপনি ঐ চেয়ারটায় বসুন, আমি আপনাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিচ্ছি।" অজয় চেয়ার টেনে বসে পড়লো। বিজয় বলতে লাগলো, "আপনি বোধ হয় জানেন, সেদিন যখন সিন্দুকটা পরীক্ষা করছিলুম তখন মাটিতে ঠিক জানালাটার নীচেই একটা পায়ের দাগ দেখতে পেয়েছিলুম। আপনি হয়ত' ওটা কিছু দরকারী বলে মনে করেননি, আমার কাছে কিন্তু ওটা বিশেষ একটা জরুরী ব্যাপার। আমি লেন্স বের কোরে সেটা পরীক্ষা করি এবং পরীক্ষা দ্বারা কি জানতে পারি সে-কথা আপনাকে অবশ্য তখন বলে নি। আমি সেই পায়ের দাগে পেয়েছিলুম এমন একটি লোকের পরিচয় যার পায়ের একটি আঙুল নেই। সেই লোকটিকে খুঁজে বার করতে বেশী কষ্ট পেতে হয় নি—সে এই আপনার সম্মুখেই দাঁড়িয়ে।" তাহলে কি আপনি বলতে চান যে· ·" "আহা বলতে চাইব কি, বলা তো হয়েই গেছে।" "বলা হয়ে গেছে? তার মানে?" "তার মানে এই যে, আপনাদের এই এক পায়ের একটি আঙুল কাটা কেষ্টবাবু ঘুস খেয়ে মনিবের সর্বনাশ করেছে। কি হে কেষ্ট, যা করেছ তা আমিই বলবো, না, তুমি বলবে?" কেষ্টা ভয় কম্পিত কণ্ঠে শুধু উত্তর দিল, "আজ্ঞে,—" "তবে শোন, আমিই বলি—মাত্র কয়েকদিন আগে কেউ এসে তোমাকে গোটা কতক টাকা দিয়ে বলে যে অমুক দিন রাত্রে ঐ ঘরের সিন্দুকের ধারের জানালাটা খুলে রাখবে, তুমি টাকা পেয়ে রাজি হয়ে তা খুলে রেখেছিলে। কিন্তু তুমি কি জানো তোমার এই নেমকহারামীর জন্য মনিবের কি ভয়ানক ক্ষতি হয়েছে?" "আজ্ঞে, ও জানালাটা খুলে রাখবার লেগে সরিৎবাবু আমাকে হুকুম করেছিলেন। বলেছিলেন—জানালাটা রাতদিন তোরা বন্ধ রাখিস বলে ঘরের ভেতর আলো বাতাস আসে না, ঘরে একটা ড্যাম্পোর ভ্যাপসানা গন্ধ হয়েছে—ওটা মাঝে মাঝে খুলে রাখিস, তাই খুলেছিলুম হুজুর। কিন্তু রাত্রে আর বন্ধ করে দেবার কথা মনে ছিল না।" "টাকাও কি তাহলে সরিৎবাবুই তোমাকে দিয়েছিলেন?" "আজ্ঞে, কত্তা, টাকা কিসের বলছেন—" ধমক দিয়ে বিজয় বললে "দেখ, চালাকী কোরনা,—এখনি

থানায় টেনে নিয়ে যাবো। সোজা উত্তর দাও। আমি কোন মিছে কথা শুনতে চাইনা।" কেষ্টা মনে মনে ভাবলে যে গোয়েন্দা বাবুর কাছ থেকে মিছে কথা বোলে রেহাই পাওয়া যাবে না। বরঞ্চ সত্যি কথা বললে ঈশ্বরেচ্ছায় মঙ্গলও হোতে পাবে। তখন সে একটা ঢোক গিলে বললে, "আজ্ঞে, কর্ত্তা তেনারা বলেছেন—কারুব কাছে যদি ঘুণাক্ষরে কোনো কথা প্রকাশ কবি আমাব প্রাণ যাবে।" "তোমাব কোন ভয় নেই আমি তোমাকে বাঁচাবো। সব কথা আমাব কাছে খুলে বলো।" "হুজুব যখন অভয় দিলেন আপনাব কাছে আমি আব কোন কথাই গোপন কোরব না।"

"গত বিষ্যুৎবারেব আগেব, বিষ্যুৎবাবদিন সন্ধ্যে-বেলায় আমি যখন বৈঠকখানা ঘব পরিষ্কাব করছিলুম তখন হঠাৎ ঘরের মধ্যে একটা লোক ঢুকেই আমাকে বললে "বাপ কেষ্টধন, যদি একটি কাজ কব তা'হলে আমি তোমাকে খুসী কোবে দোবো।" লোকটাকে চিনিনা এবং কোনও দিন কোথাও দেখেছি বলেও মনে পড়ে না। আমি বললুম, "খুসী কোবে দেবে, তাব মানে?" সে বল্‌লে, "মোটাবকম কিছু বখশিস্ পাবে হে। অথচ কাজটা এমন কিছু কঠিন নয়। যদি তুমি ঐ পাশেব ঘরে জানালাটা আজ রাত্রে খুলে রাখতে পাব তবে তোমাকে এক্ষুনি নগদ পোনবটা টাকা দিয়ে যাবো—পরে আরও পনবো—বুঝলে?"—আমি মনে মনে ভাবলুম—মন্দ কি? সবিৎ বাবুতো মাঝে মাঝে খুলে বাখতে বলেইছিলেন, আজ খুলে বাখলে পনোবা টাকা পাওয়া যায়—তাছাডা জানালাটা খুলে রাখ্‌লে মনিবের মন্দ হবাব ভয় যদি থাকতো তাহলে সরিৎবাবু কেন খুলতে বলবেন? এই ভেবে আমি হাত পেতে টাকা ক'টা নিলুম। যাবাব সময় কাঁ কবে একখানা ছোবা আমার মুখেব সামনে উঁচিয়ে ধবে সে বোলে গেল, "জানালা যদি খুলে না বাখ, বা, কোন কথা যদি কারুব কাছে ফাঁস কব তবে এটা এই বাঁট পর্যন্ত তোমাব বুকে বসিয়ে দেবো।" লোকটা বেরিয়ে গেল। আমার তখন সন্দেহ হ'ল এর মধ্যে কোনো গোল আছে নিশ্চয়—আমি ভয় পেয়ে টাকাটা ফিরিয়ে দেবার জন্য তার পিছু পিছু এগিয়ে দেখি লোকটা চলে গেছে। লোকটাব উদ্দেশ্য যে ভাল নয়—বুঝ্‌তে পারলুম, কিন্তু তখন আর উপায় কি? ভয়ে ভয়ে প্রাণের দায়ে জানালাটা খোলা রাখলুম। তার পরদিন শুনি উইল চুরি হয়ে গেছে। হুজুর আমি এ ব্যাপাবের আব কিছুই জানি না।" বিজয় বললে, লোকটা বাকী পনেরটাকা তোমায় নিশ্চয় দিতে আসেনি?"—"আজ্ঞে না?"—"সরিৎ বাবু ঐসম্বন্ধে তোমায় কিছু বলেন নি?—" "আজ্ঞে উইল চুবির পব দিন থেকেই সবিৎ বাবু যেন আমাকে কেমন সন্দেহ করতে লাগ্‌লেন্। প্রত্যেক বাজেবই নিকেশ চাইতে লাগ্‌লেন। তখন আমার মনে একটা খট্‌কা এসে পড়্‌লো, ভাবলুম সবিৎ বাবু নিশ্চয়ই এই মতলবেই আমাকে জানালাটা মাঝে মাঝে খুলে রাখতে বলেছিলেন। এখন পাছে আমাব মুখ থেকে সব কথা ফাঁস হয়ে প'ড়ে এই ভয়ে আমায় তাডাবাব জন্য পিছু লেগেছেন।" বিজয় বল্‌লো, "আচ্ছা, যে লোকটা তোমাকে টাকা দিয়ে যায় তাব চেহারাটা মনে আছে কি?" "আজ্ঞে তা কিছু কিছু মনে আছে বৈকি। ওব পরণে একটা খাকি সার্ট, একটা হেঁটো ছাঁটা পায়জামা ছিল। হাতে দু'টো হাত মোজা, পায়ে একজোডা খডি মাখা চটেব জুতো, মাথায় একটা খয়েবী বংএর সাহেবি টুপী ছিল। একবাব টুপী খুলে রুমাল দিয়ে যখন মাথাটা মোছে তখন দেখেছিলুম হুজুব বেশ মনে আছে ওব মাথাটা নেড়া ছিল।" "আচ্ছা যাও, তোমার ছুটি, কিন্তু, খুব সাবধানে থেকো। বাডীব বাইরে দিন পোনব একেবাবেই যেয়ো না। সবিৎ বাবু এবাডীতে এলে কি কবেন—কি বলেন সব বিশেষ কবে লক্ষ্য বাখবে। আমাকে সব বলা চাই।—"

ছয়

(গুপ্তদ্বার)

পরদিন সকালে বিজয় সমীরকে গত বাত্রেব সমস্ত ঘটনা বুঝিয়ে দিয়ে বল্‌লে, "কাল বাত্রেব ব্যাপারে একদিক যেমন পরিষ্কার হয়েছে অন্যদিক তেমনি জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।" সমীর বল্‌লে, "পরিষ্কাব হয়েছে কোন দিক্‌টা?" বিজয় বল্‌লে, "কেষ্ট যখন বল্‌লে যে উইল চুরির পরদিন থেকে সরিৎবাবু তাব ওপর একটু কড়া নজর রাখ্‌লেন ও তার প্রত্যেক কাজের হিসেব নিকেশ

চাইতে লাগ্‌লেন, তখন আমার মনে হয় এই সরিৎবাবু লোকটা নিরপরাধ। উনি যথার্থই অজয়ের হিতাকাঙ্ক্ষী—” “কিন্তু সকালে তুমি যে লোকটিকে ‘বাইকে’ কোরে আমার অনুসরণ করতে দেখেছিলে যে সরিৎ বাবুর বাড়ীতে ঢুকেছিলো কেন?” বিজয় বল্‌লে, “এইখানেইতো একটা গলদ রয়ে যাচ্ছে!” সমীর বল্‌লে, “আর একটা কথা হচ্ছে সরিৎ বাবু জানালা খুলে রাখতে বলেছিল কেন?” বিজয় বললে—“ওটা ঘরে আলোবাতাস যাবার জন্যই বলেছিলেন—উইল চুরির উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না।” সমীর বললে “অনুমান করতে পারছ কি—কে জোর কোরে পিস্তল অথবা ছোরা দেখিয়ে সঞ্জীব বাবুকে দিয়ে এই উদ্ভট উইল লিখিয়ে নেয়?” এই সময় হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। বিজয় তাড়াতাড়ি রিসিভার তুলে নিয়ে বল্‌লে, “হ্যালো, কে আপনি?” “আমি অজয়, আপনি কি বিজয় বাবু?” “হ্যাঁ, কেন, কি খবর?” “কাল রাত্রি প্রায় তিনটের সময় আমাদের বাড়ীর চাকর কেষ্টাকে কে বুকে ছোরা মেরে খুন কোরে গেছে।”

[ক্রমশঃ
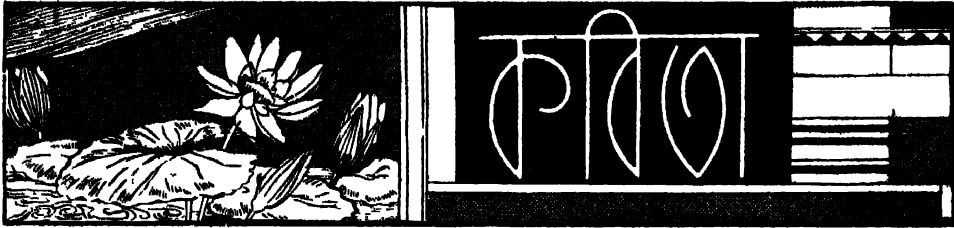
ক্ষুদে দরদী

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

চাঁদের কিরণ গায় মেখে ঐ শুভ্র মেঘের দল
আকাশ বেয়ে যায় যে কোথা বল্ মা আমায় বল্।
আকাশটা ঐ সাগর কি মা মেঘেরা সব তরী,
ওদের দেখে যায় মা কেন হিয়ায় পুলক ভরি’?
সাধ যে কেমন হয় মা আমার মেঘের তরী বেয়ে
আকাশ গাঙে বেড়াই ঘুরে জ্যোৎস্নালোকে নেয়ে।
বেয়ে তরী যাই মা যেথায় আকাশখানার শেষ,
তা হ’লে বল্ হয় মা কেমন? হয় না মা কি বেশ?
ওই আকাশে ঘুরে ঘুরে আর না যদি ফিরি
তখন মা তুই কর্‌বি কি বল্? সন্ধ্যা এলে ঘিরি’
কার কাছে মা দুয়োরাণীর বল্‌বি দুখের কথা,
তোর মুখে মা শুন্‌বে কে বল্ কঙ্কাবতীর ব্যথা?
তেমন ক’রে বল্ মা তখন গলাটি তোর ধ’রে
সারাটি রাত কে ঘুমুবে? আবার যখন ভোরে
ঊষার আলো ঢুক্‌বে ঘরে বল্ মা কেবা বল্
ঘুম ভাঙায়ে বল্‌বে তোরে “চল্ নাইতে চল্”?
কারে মা তুই নাইয়ে দিবি খাইয়ে দিবি কারে
আমি যদি যাই মা চ’লে আকাশের ঐ পারে,
আমি যদি বেড়াই ছুটে মেঘের তরী বেয়ে
আমি যদি যাই হারিয়ে জ্যোৎস্নালোকে নেয়ে?
পাঠশালাতে পাঠিয়ে দিবি তখন মা তুই কারে
দুই গালে দুই চুমো দিয়ে—আবার পথের ধারে
বিকেল হ’লে রইবি চেয়ে—ছুটির পরে শেষে
আস্‌বে কে তোর্ কোলে ফিরে চাইবি কারে হেসে?
না—না—আমি যাব না মা মেঘের তরী বেয়ে,
যাব না মা আকাশ-গাঙে—জ্যোৎস্নালোকে নেয়ে
আমি যদি যাই হারিয়ে, আর না ফিরি ঘরে
একলাটি মা কর্‌বি কি তুই—মন যে ভেবে মরে!

২৩

বাংলা সাহিত্য পরিচয়

অধ্যাপক শ্রীতারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ

বাংলা শিবায়ণ-গ্রন্থ সমূহে শিবের মূল কাহিনীটি এইরূপ :—

দেবসভায় মহাদেব শ্বশুর দক্ষকে সম্মান করেন নাই। ইহাতে অপমানিত হইয়া দক্ষ শিবহীন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। শিবকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই, কিন্তু সতী পিতৃগৃহে যজ্ঞের কথা শুনিয়া বিনা নিমন্ত্রণে শিবের নিষেধ অমান্য করিয়া সেখানে গেলেন এবং পিতার মুখে পতিনিন্দা শুনিয়া দেহত্যাগ করিলেন। শিব রুদ্রমূর্তি ধারণ করিয়া দক্ষের যজ্ঞ পণ্ড করিলেন। দক্ষ ছাগমুণ্ড ধারণ করিয়া কোনও রকমে বাঁচিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার রাজপ্রাসাদ শ্মশানে পরিণত হইল।

সতী হিমালয় কন্যা গৌরীরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং কঠোর তপস্যার ফলস্বরূপ মহাদেবকে পতিরূপে লাভ করিলেন। শিব ছিলেন নিঃস্ব। ভিক্ষান্নে কোনরূপে সংসার চালাইতেন। এই দারিদ্র্য গৌরীর বুকে বড়ই বাজিতে লাগিল।

গৌরীর প্রশ্নের উত্তরে একদা শিব তাঁহাকে জানাইলেন যে ফাল্গুনের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে যদি কেহ উপবাস করিয়া বিল্বপত্র-সহযোগে তাঁহার পূজা করে তবে সে মোক্ষ লাভ করিবে, কারণ শিব ইহাতে পরম তৃপ্তিলাভ করেন।

দারিদ্র্যের যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া গৌরী মহাদেবকে চাষ করিতে পরামর্শ দিলেন, কারণ দেবাদিদেব হইয়া চাকুরী করা ভাল দেখায় না। শিব অনিশ্চিত ফলের জন্য পরিশ্রম করিতে নারাজ হইলেন, কিন্তু অর্থাভাবে অন্য কিছু করা সম্ভব নয় বলিয়া মর্ত্যে গিয়া চাষ করিতে স্বীকৃত হইলেন।

ইন্দ্রের নিকট হইতে জমির বন্দোবস্ত লইয়া বিশ্বকর্মার নিকট হইতে লাঙল লইয়া এবং কুবেরের নিকট হইতে বীজ ধার করিয়া শিব চাষ আরম্ভ করিলেন। পৃথিবী শস্য সম্ভারে ভরিয়া উঠিল, শিবের দারিদ্র্য ঘুচিল।

শিব চাষ লইয়া মর্ত্যেই রহিয়া গেলেন, কৈলাসে যাই-বার নাম করিলেন না। এদিকে পার্বতী ব্যস্ত হইলেন, নারদের পরামর্শে তাঁহাকে আনিবার বহু চেষ্টা করিলেন। কিন্তু একে একে সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। শেষে পার্বতী বাগ্দিনীর বেশে শিবের ক্ষেতে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে ধান ভাঙিতে ও মাছ ধরিতে লাগিলেন। শিব বাগ্দিনীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিবার বাসনা জানাইয়া তাহার সহিত মাছ ধরিতে লাগিলেন। বাগ্দিনী তাঁহার নিকট হইতে প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ পিতলের অঙ্গুরী লইলেন এবং কৈলাসে চলিয়া গেলেন। মহাদেবও তাহার পিছনে পিছনে কৈলাসে ছুটিলেন।

কৈলাসে পার্বতী বাগ্দিনীকে অঙ্গুরী দিবার অপরাধে শিবকে ঘরে আসিতে দিলেন না। নারদের পরামর্শে স্বামীকে চিরদিন বশে রাখিবার মানসে তাঁহার নিকট শাঁখা পরিতে চাহিলেন। শাঁখা কিনিয়া দিবার সঙ্গতি শিবের নাই, অভিমানে পার্বতী পিতৃগৃহে চলিয়া গেলেন

নারদ দুই পক্ষেই আছেন, এখন তিনি শিবকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন। শিব শাঁখারী সাজিয়া হিমালয়ে গেলেন। সেখানে তখন দুর্গাপূজা, পার্বতী শাঁখা দেখিয়া উল্লসিত হইলেন ও স্বামীকে এই ছদ্মবেশ সত্ত্বেও চিনিলেন এবং শাঁখার মূল্য জিজ্ঞাসা করিলেন। শিব ইহার মূল্য আত্মসমর্পণ জানাইলে পার্বতী তাঁহাকে পরনারীর প্রতি আসক্তি এবং অঙ্গুরীদানের জন্য অনন্ত নরকভোগের কথা বলিলেন. শিব ইহা স্বীকার করিয়া লইয়া বলিলেন যে, যে নারী স্বামীকে বৃদ্ধ, জড়, মূর্খ, অপদার্থ জানিয়াও একান্ত-ভাবে তাঁহার সেবা করে, সে-ই প্রকৃতপক্ষে সতী।

পার্বতীর মনে অনুশোচনা দেখা দিল। যাঁহার স্বামী জগৎপূজ্য দেবাদিদেব মহাদেব, তিনি স্বামীকে দারিদ্র্যের

জন্য লাঞ্ছনা দিয়াছেন ভাবিয়া পার্বতীর হৃদয় অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিল। তিনি স্বামীকে ফিরিয়া পাইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন, মিলনে সকল বিবাদের শেষ হইল, হর-পার্বতী কৈলাসে ফিরিয়া গেলেন।

শিবের এই কাহিনীর মধ্যে বহু উপকাহিনী পরবর্তী-কালে প্রবেশ করিয়াছে। এই সকল উপকাহিনীকেও পৌরাণিক এবং লৌকিক আখ্যা দেওয়া যায়। দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করিবার পর শিব সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া উন্মাদের ন্যায় ত্রিভুবন মথিত করিয়া বেড়াইতেছিলেন। বিষ্ণু তখন সৃষ্টি রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে সুদর্শন চক্রের আঘাতে সতীদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়া দিলেন। দেহটি ৫২খণ্ড হইয়া ৫২টি বিভিন্ন স্থানে গিয়া পড়িল এবং এক একটি পীঠস্থানের সৃষ্টি করিল। এই সকল পীঠস্থানের মাহাত্ম্যও শিবায়ন সাহিত্যে আড়ম্বর সহকারে বর্ণিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই কাহিনীটি অর্বাচীন উপ-পুরাণ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

শিবচতুর্দশীর উপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছিল যে বারাণসীর এক ব্যাধ অন্ধকার রাত্রে বনমধ্যে পথ হারাইয়া এক বিল্ববৃক্ষে আরোহণ করে এবং নিদ্রিত হইলে ভূতলে পড়িয়া হিংস্র প্রাণীর হস্তে প্রাণ হারাইবার আশঙ্কায় সারারাত্র একটি-একটি করিয়া বিল্বপত্র ছিঁড়িয়া মাটিতে ফেলিতে থাকে। অজানিতে শিবলিঙ্গের মস্তকে এই বিল্বপত্র পড়িয়াছিল বলিয়া সে মুক্তিলাভ করে। এই কাহিনীটি ক্রমশঃ পল্লবিত হইয়া যে আকার ধারণ করিয়াছে তাহাতে আমরা দেখি যে, হস্তিনানগরীর শিব-ভক্ত রাজা মুচুকুন্দ ও রাণী রুক্মিণী শিবচতুর্দশীর ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য রাত্রি জাগরণ করিবার সময়ে রাণী রাজাকে ঐ ব্যাধকাহিনী বলিয়াছিলেন।

ইন্দ্রের বিদ্যাধর চিত্রসেন ইন্দ্র-সভায় নৃত্য করিতে করিতে মর্ত্যের এক ব্যাধের হরিণ শিকার দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়া তাল ভঙ্গ করে। ফলে মর্ত্যে ব্যাধরূপে জন্মগ্রহণ করিতে সে অভিশপ্ত হয়। চিত্রসেনের কাতরতায় দয়া-পরবশ হইয়া ইন্দ্র বলেন--শাপগ্রস্ত ভদ্রসেন ও রত্নাবতী মৃগ-মৃগীরূপে মর্ত্যে বিচরণ করিতেছে, তাহাদের সহিত সাক্ষাৎলাভ হইলে তুমি মুক্তি পাইবে।

এইভাবে কাহিনীটি আরম্ভ হইয়া চিত্রসেনের শিকার, শিবচতুর্দশীর দিন বিল্ববৃক্ষে সারারাত্র জাগিয়া বিল্বপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়া অজ্ঞাতে শিবের তুষ্টি সম্পাদন এবং ফল স্বরূপ পরদিবস মৃগরূপী ভদ্রসেনের সহিত সাক্ষাৎ, মৃগী-রূপিণী রত্নাবতীর নিকট তত্ত্বকথা শ্রবণ, এবং অবশেষে চন্দ্রভাগা নদীতীরে স্নানান্তে শিবপূজা করিয়া মুক্তিলাভে শেষ হইয়াছে।

মুচুকুন্দ রাজারও এক কাহিনী অর্বাচীন উপপুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে। কাজেই, ইহাকেও শিবের পৌরাণিক কাহিনীর অন্তর্গত করা যাইতে পারে।

শিবের লৌকিক কাহিনী গুলিতে সর্বদাই রুচি বিগর্হিত ভাব দেখা যায়। শিবের পরনারী সঙ্গ, অশ্লীল রসিকতা, ব্যাভিচার, প্রভৃতির জন্য সেগুলির আলোচনা অসঙ্গত হইবে।

শিবই বাংলার সর্বাপেক্ষা অধিক জনপ্রিয় দেবতা। পরবর্তীকালে অন্যান্য লৌকিক দেবতার আবির্ভাব হইলে যখন শিবের প্রাধান্য চলিয়া গেল তখন শিব-কাহিনীর কোন-না-কোন অংশ সেই সকল দেবতাদের কাহিনীর মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়া গেল। তাই আমরা ধর্মমঙ্গল, শূন্য পুরাণ, চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, প্রভৃতিতে শিবের উল্লেখ পাই। ধর্মমঙ্গলের সৃষ্টিপ্রকরণে শিবেরই প্রাধান্য দেখা যায়। শূন্য-পুরাণে শিবের কৃষিকার্য সম্পাদনের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

এসকল ছাড়া আদ্যের গম্ভীরা, শিবের গাজন, প্রভৃতি লৌকিক উৎসব শিবের কাহিনী লইয়াই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। গৌরীকে গৃহে আনিবার চেষ্টায় শাঁখারীর বেশে তাঁহাকে শাঁখা পরাইবার জন্য শিবের হিমালয়ে আগমনের যে কাহিনী আমরা পূর্বে পাইয়াছি, তাহা পরবর্তীকালে বৈষ্ণব প্রভাবে এক অপূর্ব বাৎসল্য রসমণ্ডিত হইয়া আগমনী গানরূপে দেখা দিয়াছে। শিব বাঙালীর ঘরের দেবতা। তাই প্রত্যেক বাঙালী মাতাপিতা নিজ কন্যাকে ভাগ্যবতী শিবজায়া গৌরী মনে করিয়া দুর্গোৎসবের সহিত তাহার পিতৃগৃহে আগমন এক করিয়া ফেলিয়াছে। এবং আগমনী-গানে হৃদয়ের বিরহ-ব্যথা প্রকাশ করিয়াছে। তাই এগানগুলি বাঙালীর জাতীয় সম্পদ হইয়া উঠিয়াছে।

[ক্রমশঃ

মানুষের পূর্বপুরুষ

শ্রীনিধিরাজ হালদার

গভীর জঙ্গলে বাস করা মানে মৃত্যুর সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন। তাই সব সময় সকল জানোয়ারকেই তাদের জীবন নিয়ে কত সাবধানে যে থাকতে হয় তার আর কোন ঠিক ঠিকানা নেই। মানুষের রাজ্যে সবল যেমন দুর্বলের ওপর করে অত্যাচার বনের আইনও ঠিক তেমনি করেই গড়া। একটা বাঘ কিংবা সিংহ যদি একটা হরিণ কিংবা তার মত কোন দুর্বল প্রাণীকে দেখতে পায় তা' হলে সে বেচারীর জীবন নিয়ে পালানো হয়ে ওঠে দুষ্কর। কেউ রক্ষা করবার নেই, কেউ আশ্রয় দেবার নেই। বেচারীকে হতেই হবে মৃত্যু-পথের যাত্রী। 'হয় মারো, না হয় মর' এই হচ্ছে বন্য জীবনে জানোয়ারদের নিজের গড়া বিধান। যতই শক্তিশালী হও না কেন সেখানে মৃত্যুভয় আছেই। তাই ভীষণ শক্তিশালী গরিলারাও অপঘাত মৃত্যুর হাত থেকে বাদ পড়ে না। এ কথা বেরিকে বুঝতে হয়েছিল হাড়ে হাড়ে। গোড়ায় গোড়ায় বেরি মনে করত গরিলা-সর্দার তার সহায় থাকতে মৃত্যুকে সে তুচ্ছ জ্ঞান করবে। সে ভুল কিন্তু তার একদিন ভেঙ্গে গেল যখন তার বন্য জীবনের অতি আপনজনকে হারালো সে বন্দুকের গুলিতে।

দিন তাদের সুখেই কাটছিল, কিন্তু দৈব দুর্বিপাকে এক লুণ্ঠনকারী দস্যুর অত্যাচারে বনের সকল প্রাণীর জীবন হয়ে উঠল অতিষ্ঠ। প্রাণ সবলেরই হয়ে উঠেছিল সশঙ্কিত। দিন যায়, রাত আসে। একদিন ভোরবেলায় বেরি গাছের ওপর তার বিশ্রাম স্থান থেকে নেমেই প্রতি-দিনের মত গরিলা সর্দারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল কিন্তু সর্দার সেদিন আর বেরিকে কোন রকম আনন্দের ভাব দেখালে না। গরিলাটাকে সেদিন অত্যন্ত ম্লান ও বিষণ্ণ মনে হল। হয়ত বা সে বুঝতেই পেরেছিল যে তার দিন ঘনিয়ে আসছে।

গরিলা সর্দার আস্তে আস্তে তার বড় বড় লোমভরা দুটো হাত দিয়ে বেরির গলা জড়িয়ে ধরে মুখের ওপর তার ছোট ছোট দু'টো চোখ নিয়ে কি যেন বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করলে। কিন্তু বেরি বোধ হয় সর্দারের ভাষার প্রকৃত মর্ম বুঝতে পারলে না, সে মনে করলে হয়ত' সর্দার এখন বিশ্রামের জন্য তাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছে।

সে রাত্রে বেরি ভাল করে ঘুমাতে পারলে না, কারণ সর্দারের জন্য সত্যই তার প্রাণের মধ্যে কিসের যেন একটা দুর্ভাবনা জেগে উঠছিল। হঠাৎ একটা দারুণ দুঃস্বপ্নে বেরি ধড়ফড়িয়ে জেগে উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে তার গত দিনের সব ঘটনাবলীই মনে পড়তে লাগল। সর্দার গরিলার তার প্রতি গভীর ভালবাসার কথা মনে পড়তেই সে নিজেকে অত্যন্ত একাকী ভাবতে লাগল, আর তখনি বুড়ো গরিলাকে খুঁজে বার করবার জন্যে গাছ থেকে নেমে পড়ল। এদিক ওদিক চেয়ে দেখে সর্দারকে দেখতে না পেয়ে বেরি চারিদিকে ছুটাছুটি করতে লাগল। তারপর একটা পার্বত্য নদীর সামনে এসে কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে থেকে ওপারে কি দেখে হঠাৎ জলে লাফিয়ে পড়ে সাঁতার কেটে ওপারে উঠে দেখলে একটা গাছতলায় সর্দার চুপ করে বসে আছে। বেরি তাড়াতাড়ি কিছু ফলমূল যোগাড় করে সর্দারের কাছে গিয়ে বসতেই গরিলা সর্দার তাকে কাছে টেনে নিয়ে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে

লাগল। কিছুক্ষণ এইভাবে কাটাব পর সর্দাব বেরিকে হঠাৎ দু' হাত দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধবে করুণ দৃষ্টিতে বেরিব মুখেব দিকে চেয়ে রইল।

বাত তখন বেশ গভীব হয়ে এসেছিল। তাই সদাবকে গাছেব গোড়ায় বেখে বেবি গাছের উপর নিজেব স্থান কবে নিলে। তাবপব যেমন একটু তন্দ্রাভিভূত হয়ে পড়েছে অমনি বন্দুকেব একটা আওয়াজ শুনেই বেবি তাড়াতাড়ি উঠে বস্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝেও নিলে যে, নিশ্চয়ই নিকটে কোন শত্রু তাদেব হত্যা কবতে ওৎ পেতে আছে। সুতবাং বেবি ঠিক কবলে গাছ থেকে নেমে যাওয়া তখন উচিত নয়। সর্দাবেব কথা ভেবেও সে নিরুদ্বিগ্ন হয়ে রইলো যে সর্দাব যেমন ক'বেই হোক্ পালাবার পথ ক'রে নেবে। তাবপব বিপদ কেটে গেলে দু'জনে আবাব মিলিত হবে। সে এই কথা ভাববাব সঙ্গে সঙ্গেই আবাব আওয়াজ। বেরি এও বুঝেছিল যে শ্বেতকায় বণিকদেবই কাজ এটা। তাবা শিকাবেব আশায় বনে বনে ঘুবছে এই কথাই বেবি ভেবে নিলে।

অদৃশ্য শত্রুব ভয়ে বেবি ভীত হয়ে উঠ্‌ল। তাব কেবলই মনে হতে লাগল যে শেষে বন্দুকেব গুলিতেই না প্রাণ যায়। বিপদেব আশঙ্কায় সে কোন মতেই গাছ থেকে নামতে পাবলে না। তারপব চাবিদিক যখন নিস্তব্ধ হয়ে গেল, বিপদ কেটে গেছে ভেবে তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে দেখলে যে গবিলা বন্ধু তখনও গাছতলায় চুপ ক'বে বসে আছে। এই দৃশ্য দেখে বেবি আশ্চর্য্য না হয়ে পাবলে না। বন্দুকের আওয়াজ শুনেও, বিপদ আসন্ন জেনেও সর্দাব বেরিকে শত্রুব মুখে একলা ফেলে না পালিয়ে মৃত্যুকে তুচ্ছ ক'বে সেইখানেই বসে রয়েছে দেখে একেবাবে সে অভিভূত হয়ে পড়ল। এইখানে বলে বাখি যে বন্দুকেব আওয়াজ ত দূবের কথা সামান্য কোন বকম শব্দ হলেই গবিলাবা দলকে-দল অন্ততঃ দু'তিন মাইল গভীবতম বনে পালিয়ে যায়। বেরিকে গাছ থেকে নামতে দেখেই গরিলা সর্দার বেবিকে এক রকম টান্‌তে টান্‌তে ঝোপ ঝাপের মধ্য দিয়ে বন্দুকেব আওয়াজ যে দিক থেকে এসে ছিল ঠিক তার উল্টো দিকে গভীব জঙ্গলেব ভেতর এগুতে লাগল।

হঠাৎ আবার বন্দুক গর্জন ক'রে উঠল। মনে হ'ল এ আওয়াজ যেন তাদের খুব কাছেই হ'ল। গবিলা সর্দার বুঝতে পারলে শত্রু খুব নিকটে; কিন্তু পালাবাব চেষ্টা না ক'রে নির্ভয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল দু'পায়ে ভর দিয়ে। সমস্ত দেহটা তাব রাগে ফুলতে লাগল। জোরে জোরে দু'হাত দিয়ে সে বুক চাপ্‌ড়াতে লাগল, আর ভীষণ হুঙ্কাব দিতে লাগল। শত্রুকে আক্রমণ কবতে সে তখন প্রস্তুত।

শিকারীবদল খুব কাছেই এসে পড়েছিল। গরিলা সর্দাব ইচ্ছে করলেই পালাতে পাবত, কিন্তু বেরিকে একলা ফেলে সে কোন মতেই যেতে পাবলে না। চতুর্দিক থেকে শিকাবীদের চিৎকাব শোনা যেতে লাগল। বেরি দু'হাত দিয়ে জোব ক'বে গবিলা সর্দাবকে টেনে নিয়ে অন্যদিকে পালাবাব চেষ্টা করলে। কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না। এক মুহূর্তে চাব পাঁচটা গুলি এসে সর্দারেব দেহ বিদ্ধ ক'বে দিলে। একটা ভয়ঙ্কব ধ্বনি ক'বে গবিলা সদাবেব দেহ বেবিব গায়ে এলিয়ে পড়ল। বেবিও শত্রুদেব কথা ভুলে গেল। এমন কি তাব একটিবাবও এ কথা মনে হ'ল না যে তাবও জীবন শিকারীব গুলিতে এখনি সাঙ্গ হয়ে যেতে পাবে। সে গবিলা সর্দাবেব পাশে ধপ কবে বসে প'ড়ে দু'হাত দিয়ে জোর কবে তা'কে তোলবাব চেষ্টা কবতে লাগল।

ইতিমধ্যে শত্রুবা একেবাবে কাছে এসে পড়েছিল। বেবি তাদেব আক্রমণ কবতে পারে মনে ক'বে তাবা বেবিব পা লক্ষ্য ক'বে বন্দুকেব ঘোড়াটা টেনে দিতেই বেবির পায়ে তীবেব মত গুলি এসে বিদ্ধ হ'ল। বেরি যন্ত্রণায় অধীব হ'লেও উঠে দাঁড়াবাব চেষ্টা কবলে না। সে লুটিয়ে পড়ল গরিলা সর্দাবেব স্পন্দনহীন দেহের ওপর।

শত্রুরা এসে বেরিকে পিঠমোড়া ক'রে বাঁধলে। যন্ত্রণায় কাতব হলেও বেবি নিজেকে মুক্ত কববাব জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা কবলে। যা' অসম্ভব তা' সম্ভব করতে পারলে না। অসহ্য যন্ত্রণার জ্বালা সহ্য কবতে না পেরে বেরি অজ্ঞান হয়ে পড়ল। তাবপব জ্ঞান ফিরে পেয়ে সে বুঝতে পাবলে যে চারজন কাফ্রী কুলী তাকে বুনো জানোয়াবেব মত একটা বাঁশে বেঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে চলেছে। আগে আগে চলেছে শ্বেতকায় শিকারীর দল।

মাঝে মাঝে তাবা এক-এক জায়গায় বিশ্রাম নেবার জন্যে থামছিল। আর সেই অবসরে বেরিকে নিয়ে ব'সে মদ্যপান করতে করতে নানা রকম ঠাট্টা বিদ্রূপ করছিল।

তাদের ভাবভঙ্গী ও কথাবার্তায় বেবি বেশ বুঝতে পেরেছিল যে তারা ডাচ দেশের লোক, এবং সবাই বেবিকে জন্তু ঠিক করেছে। সঙ্গে সঙ্গে বেবি ঠিক করলে যে কোন রকমেই এদের ভুল সে ভেঙ্গে দেবে না, আর পায়ের ব্যথাটা কমলেই যেমন ক'রেই হোক সে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করবে। শ্বেত বণিকদের মধ্যে একজন বলে উঠল, "দেখ, যতক্ষণ না এর পাটা ভাল হয় ততক্ষণ একে বাধা যাক্ তারপর সহরে চড়া দামে বেচে দিলেই হবে।"

সঙ্গে সঙ্গে আর একজন বলে ফেললে—"আরে, না না, এই জানোয়ারটা হচ্ছে সোণার খনি। ওকে সহরে নিয়ে গিয়ে সার্কাসে দেখাতে আরম্ভ করলে বহুং টাকা আয় হবে। ওকে কোন রকমেই আমাদের হাতছাড়া করা চলবে না।"

এই মতলবটাই সকলের ভাল ব'লে মনে হ'ল। বেবি অজ্ঞান হয়ে থাকার ভাণ করে চুপ করে শুয়ে শুয়ে ওদের আলোচনা শুনতে লাগল। আর কেবলই ভাবতে লাগল ব্যথাটা একটু কম্‌লেই কোন রকমে পালিয়ে আবার সে তার গরিলা বন্ধুদের কাছে ফিরে যাবে। কিন্তু যা' ভগবানের ইচ্ছা নয়, তা' কেমন করে সফল হবে। বেরি যা' ভাবলে তা' আর হ'ল না, কারণ তার পায়ের ব্যথা আর ঘা সারতে অনেকদিন লেগে গেল। ইতিমধ্যে তারা সকলে মিলে বেবিকে একটা প্রকাণ্ড বাঁশের খাঁচায় বন্দী ক'রে রেখে দিলে। আর সেখানকার যত কাফ্রী এই নুতন-রকম অদ্ভুত জানোয়ার দেখতে দল বেঁধে আসতে লাগল।

বন্য জীবনের পর লোকালয়ের মাঝখানে সভ্যতার সংস্পর্শে বেবির নিজেকে আর জানোয়ার ব'লে পরিচয় দিতে ইচ্ছে হ'ল না। সে মনে মনে স্থির করলে যে সে যে মানুষ এ কথা সকলকে সে জানিয়ে দেবে। একদিন বণিকদের একজন খাঁচার কাছে বেরিকে যখন খাবার দিতে গিয়েছে সেই সময় বেরি তাকে পরিষ্কার ফরাসী ভাষায় বললে,—"আমাকে তোমরা খাঁচায় পূরে রেখেছ কেন? তোমাদের সঙ্গে টেবিলে ব'সে আমি খেতে চাই।" বেরিকে মানুষের মত কথা বলতে দেখে সে ত একেবারে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে সে তার সঙ্গীদের ডেকে নিয়ে এল। বেরি তাদের ডাচ ও ফরাসী ভাষায় বুঝিয়ে দিলে যে তারা যে মানুষ আর বাঁদরের মাঝামাঝি একটা নতুন জীব আবিষ্কার করে আনন্দে অধীর হয়েছে সেটা একেবারেই ভুল। মানুষের পূর্ব্বপুরুষ সে নয়, আর সার্কাসে তাকে দেখিয়ে বা কোন লোকের কাছে তাকে বিক্রী ক'রে যে তারা খুব লাভবান হবে মনে করেছে তার উপায় নেই। সে বললে—"তোমরা যে মনে

করেছ আমি একটা নূতন রকম জংলী জানোয়ার,—যা, আজ পর্যন্ত সভ্য জগৎ দেখেনি—তা' নয়। আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ। সভ্য-জগতের সঙ্গে আমারও একদিন সম্পর্ক ছিল।"

শিকারীদের এত সাধের সোণার স্বপ্ন চট্ ক'রে কর্পূরের মত উবে গেল। বেবির কথায় তারা রীতিমত মুষড়ে পড়ল।

সকল সন্দেহের গঙ্গাযাত্রা সুরু হবার পর তারা একটা আয়না এনে বেরির হাতে দিলে। বেরি আয়নায় নিজের চেহারা দেখে বুঝতে পারলে যে মানুষের মত কোন চিহ্নই তার দেহে আর নেই। দীর্ঘদিন ধরে জঙ্গলে গরিলাদের সঙ্গে বাস ক'রে, আর গরিলাদের খাদ্য খেয়ে তার আকৃতি প্রকৃতি কতকটা গরিলাদের মতই হয়ে গিয়েছিল। এটা সে বেশী করে বুঝতে পারলে আয়নার মধ্যে নিজের চেহারা দেখে। তারও মনে—চেহারাটা তার কতকটা বন্য এক গরিলারই মত।

যাই হোক্, বেরির সব কথা শোনবার পর তারা বেরিকে বললে, "তুমি তা' হ'লে তোমার গোঁফ দাড়ী কামিয়ে, স্নান ক'রে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে নাও তা' হ'লে বুঝতে পারব, সত্যিই তুমি আমাদের মত একজন মানুষ।

সভ্যজগতে ফিরে আসার পর যদিও বেরির প্রাণ মাঝে মাঝে গরিলা বন্ধুর জন্যে কেঁদে কেঁদে উঠত তবু আফ্রিকার ভয়ঙ্কর বনে কার কাছেই বা সে আবার ফিরে যাবে? যে বন্ধু তাকে নিশ্চিত-মৃত্যুর হাত থেকে কতবার বাঁচিয়েছে তার কথা ভাবতে বেরির অন্তর ত' কেঁদে উঠবেই, কারণ বন্য জীবনে গরিলা সদারের উপকার বেরির মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত স্মরণ করিয়ে দেবে যে উপকারীকে সে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি।

তবুও সে ফিরে যেতেই চেয়েছিল কিন্তু গুলির আঘাত তাকে অকর্ম্মণ্য ক'রে দিয়েছিল বলে' তাকে বাধ্য হয়েই ফিরে যেতে হ'ল মালটায় তার বাপ মায়ের কাছে।

জাহাজের বাঁশী যেমন বেজে উঠল, বেরির মনটা যেন কেমন চঞ্চল হয়ে উঠল। বিদায়ের চঞ্চলতায় হঠাৎ সে গরিলার ভীষণ ডাকে চতুর্দিক কাঁপিয়ে তুললে। যদিও সে জানলে না যে সে ডাক তার গরিলা বন্ধুদের কাছে পৌঁছেছিল কিনা, তবু তার এইটুকুই একমাত্র সান্ত্বনা ছিল যে, সে আফ্রিকার গহন বনের গরিলা বন্ধুদের কাছে তার বিদায়বাণী জানিয়ে গেল। [ক্রমশঃ

ভারতরক্ষা আইন অনুসারে এক নূতন আদেশ জারি হয়েছে যে, সংবাদ পত্র ও পত্রিকা প্রভৃতিতে কি লেখা প্রকাশ করা হবে এবং কি হবে না সেটা ক্ষেত্র বিশেষে আবশ্যক বোধ করলে গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছামত নির্দেশ করে দিতে পারবেন। আপত্তিকর কোনো রচনা প্রকাশ করলে মুদ্রাকর, প্রকাশক ও সম্পাদক ভারতরক্ষা আইনের কবলে পড়বেন। গভর্ণমেণ্ট প্রয়োজন মনে করলে এরূপ কোনো কাগজের প্রকাশ একেবারে বন্ধ করে দিতে পারবেন অথবা সে কাগজে যা কিছু প্রকাশ করা হবে, তা প্রকাশের পূর্বে গভর্ণমেণ্টকে দেখিয়ে তাঁদের অনুমতি নিয়ে ছাপতে হবে এরূপ হুকুম জারি করতে পারবেন। দু'একখানি কাগজের উপর ইতিমধ্যেই এরূপ হুকুম গিয়ে পড়েছে। সুতরাং, সম্পাদক মহলে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। কেউ কেউ মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণের জন্য বিলাপও সুরু করেছেন, কিন্তু তাঁরা ভুলে গেছেন যে, দেশের অবস্থা আজ স্বাভাবিক নয়। যুদ্ধের আবহাওয়ার মধ্যে আমরা বাস করছি। বামে ও দক্ষিণে শত্রুর অবস্থান এবং ভারতের সাম্প্রদায়িক গোলোযোগ আমাদের অবস্থাকে অধিকতর সঙ্কটজনক করে তুলছে। এ অবস্থায় ছাপাখানার দৌরাত্ম্য কোনো গভর্ণমেণ্টের পক্ষেই বরদাস্ত করা সম্ভব নয়। ব্রিটেনের ন্যায় ব্যক্তি স্বাধীনতা, প্রিয় অবাধ রসনা ও লেখনীর পক্ষপাতি আদর্শ গণতান্ত্রিক দেশেও অনেক আগেই এ ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুতরাং ব্রিটেনের অধীন ভারতবর্ষেও যে সে-আইন প্রবর্তিত হবে, এ আর বিচিত্র কি?

* * * *

কংগ্রেসকে আর ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে ব্রতী একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলে উল্লেখ করলে ভুল করা হবে। অহিংস ঋষি শ্রীমৎ গান্ধী মহাত্মার সর্বাধ্যক্ষতায় সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে কংগ্রেস আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে জগতে প্রেমধর্ম্ম ও অহিংসা নীতি প্রচারের একটি আদর্শ ধর্ম্মসম্প্রদায়। মহাত্মার আশ্রম আছে, নানা জাতীয় শিষ্য সেবকও কিছু কিছু আছে। মোহন্তদের মতো টাকা তুলতেও তিনি সিদ্ধহস্ত এবং ইচ্ছা করলে সেবাগ্রামে একটি পীরামিডের মত বিরাট মঠও প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। তবে তার দ্বারা হয়ত মূঢ় ভারতবাসীদের জনকয়েকের মাত্র হিংসাবৃত্তি দূর হ'তে পারে, কিন্তু তাতে তো তৃপ্তি নেই। মৃতদেশের নির্জীব মানুষগুলো তো এমনিই অহিংস।

ক্লীবত্বপ্রাপ্ত যে জাতি মর্মান্তিক লাঞ্ছনা অপমান ও আঘাতেও হিংস্র হয়ে উঠতে পারে না তাদের কাণে কি আর অহিংস মন্ত্র ফুঁকে আত্মপ্রসাদ লাভ হয়? বামঃ। বলিষ্ঠ প্রাণবন্ত ও প্রচণ্ড সজীব গোটা য়ুরোপকে যদি যুদ্ধ ছাড়িয়ে অহিংস করে তুলতে পারা যায় দ্বিতীয় বুদ্ধ বলে ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকা যাবে। কিন্তু তা করতে হ'লে চাই কোনো এক বিরাট প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে জগতে অহিংসার বাণী ও আদর্শ পৌঁছে দেওয়া। পঞ্চাশ বছর ধরে ধীরে ধীরে শ্রেষ্ঠ ভারতীয় মনীষীগণের দ্বারা গড়ে তোলা এই প্রতিষ্ঠানই যে তারপক্ষে সব চেয়ে উপযুক্ত এটা মহাত্মা ভাল করেই বুঝেছেন। অথবা হয়ত ভগবৎ প্রেরণা লাভ করেছেন যে, এই কংগ্রেসের ভিতর দিয়াই চরকা ঘোরাতে ঘোরাতে এবং তকলী কাটতে কাটতে অর্ধখাদীশ্বর নগ্নপ্রায় মূর্তিতে প্রেমের অবতার স্বরূপ তিনি জগতে 'অহিংসা পরমো ধর্মে.' এই বাণী প্রচার করবেন। এবং শুধু প্রচার নয়, 'ভিনোবা ভাবে' প্রভৃতি বাছাই করা শিষ্যদের দ্বারা ইংরাজের ভদ্রতা ও সহিষ্ণুতার সুযোগ নিয়ে তার শক্তি প্রভাব ও সার্থকতা ও সপ্রমাণ করবেন।

* * * *

ভারতের অতিবড় দুর্ভাগ্য যে মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় এমন একজন জগৎপূজ্য ব্যক্তিও আজ নেতৃত্বের মোহ ও প্রচারের প্রলোভন থেকে মুক্ত হ'তে পারেন নি। স্বদেশের স্বাধীনতা ও মাতৃভূমির কল্যাণের চেয়েও তাঁর কাছে বড় হয়ে উঠেছে আজ স্বমতের প্রতিষ্ঠা ও অহিংস প্রচারের আকাঙ্ক্ষা। মিঃ জিন্না প্রভৃতিকে আমরা দোষারোপ করি তাঁদের ইসলামীর গোঁড়ামী ও মোসলেম স্বার্থের প্রতি পক্ষপাতিত্বের জন্য, কিন্তু মহাত্মার এই খাদী ও চরকার গোঁড়ামী এবং অহিংস নিঃস্বার্থ তৃপ্তির প্রতি পক্ষপাতিত্বও ওদের সঙ্গে তুলনায় কোনো অংশেই নির্দোষ নয়। এই উভয় প্রকার চরম প্রবৃত্তিই ভবিষ্যৎ ভারতের পক্ষে সমূহ ক্ষতিকর। কিন্তু উপায় কি? ধর্মভীরু ভারতবাসীদেরও আজ মহাত্মার পদাঙ্কই অনুসরণ করে অসহায়ের মতো বলতেই হবে—এ ভগবানের ইচ্ছা। ছোট্ট রাজকোটের নগণ্য দেওয়ান স্বর্গগত দরবারী বীরবলের কাছে কূট রাজনীতির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাস্ত হয়ে যিনি অনশন অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছিলেন, বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান সচিব কূটবুদ্ধি চার্চিল, ভারত সচিব আমেরী, ও ভারত সম্রাটের মহান প্রতিনিধি লর্ড লিনলিথগোর সম্মিলিত রাজনৈতিক চালের কাছে পরাস্ত হয়ে এবার তাঁকে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই যুদ্ধের মধ্যেই সত্যাগ্রহ সুরু করতে হয়েছে তা' ব্যক্তিগতই হোক আর দলগতই হোক—তাতে বিশেষ কিছু যায় আসে না। মাত্র একজন ছাড়া ভারতে আজ আর এমন কোনো কংগ্রেস নেতা নেই যিনি সাহস করে বলতে পারেন—হে বৃদ্ধ। তুমি অহিংসনীতি প্রচারের দ্বারা ভারতের সর্বনাশ সাধন করছো। তোমার পাগলামীর দণ্ড নিতে হবে ভারতকে আরও হাজার বছর ধরে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থেকে।

* * * *

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর প্রতি কংগ্রেস সভাপতি শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধে শাস্তি বিধান করায় বাংলা দেশময় হৈ চৈ সুরু হয়েছে। কংগ্রেসের মধ্যে থাকবো অথচ কংগ্রেসের বিধি-নিষেধ অমান্য করবো, শৃঙ্খলা রক্ষা করবো না, নিজেরা স্ব স্ব প্রধান হয়ে উঠবো, অথচ শাস্তি পেলে কংগ্রেসের বিদ্রোহী হয়ে উঠে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের উদ্যত দণ্ডটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করবো, কোনো নেতার পক্ষেই এ মনোবৃত্তি প্রশংসনীয় নয়। এর ফলে তাঁরা কোন দিনই কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারবেন না যে-প্রতিষ্ঠানের সকল সভ্যরা তাঁকে নির্বিচারে মেনে চলবে। তাঁরই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তাঁরই দলের অধীন কেউ তাঁরই আদেশ অমান্য করে একদিন বিদ্রোহাচরণ করতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করবে না। বাংলা দেশে এ কু-দৃষ্টান্তের অভাব নেই। তাদের সংখ্যা আর বাড়ানো উচিত নয়।

* * * *

ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সহিত মতান্তর হওয়াতে পদত্যাগ করেছিলেন এবং কার্যকরী সমিতি যে প্রস্তাব উপস্থাপিত করেছিলেন তা দেশের পক্ষে অশুভ ও গণতন্ত্র বিরোধী বলে তিনি তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা করে তাঁর দলের আপত্তি জানিয়েছিলেন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই প্রতিবাদ সভা শেষ মুহূর্তে নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন, কিন্তু প্রতিবন্ধ হয়েছিল। এই প্রতিবাদ করার অপরাধে সুভাষচন্দ্রকে দণ্ড

দিয়ে ওয়াকিং কমিটি নিজেদের হাস্যাস্পদ করে তুলেছিলেন। কারণ, প্রতিবাদ সভা নিষেধ করে জনমতের কণ্ঠরোধ করা আমলা তন্ত্রেরই মনোবৃত্তির পরিচয়, কংগ্রেস সভাপতির ব্যুরোক্রাট হয়ে ওঠা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের আদেশেরও প্রতিবাদ হওয়া উচিত। সুতরাং, সুভাষচন্দ্র যা করেছিলেন তা ন্যায় সঙ্গত। বিধি বহির্ভূত কোনো কাজ তিনি করেন নি। তাঁকে দণ্ডিত করে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তাঁদের লজ্জা বাড়িয়েছিলেন মাত্র।

* * * *

কিন্তু শরৎচন্দ্রের মামলা তা নয়। শরৎচন্দ্র কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের বাংলার মুখপাত্র। ইতিপূর্বে পরিষদের কংগ্রেসী সভ্যদের দেয় চাঁদা নিয়ে তিনি তদানীন্তন অস্থায়ী সভাপতি রাজেন্দ্র প্রসাদের সঙ্গে বিবাদ করেছিলেন এবং চার্টার্ড একাউণ্ট্যাণ্টদের সঙ্গেও সদ্ব্যবহার করেন নি। সেবার তাঁর পদমর্যাদার খাতিরে ব্যাপারটাকে বেশীদূর গড়াতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু এবার তিনি কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের মনোনীত সভ্যের বিরুদ্ধাচারণ করে নিজের অভিরুচি মত বীরেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরীকে সমর্থন করে প্রকৃতই অপরাধ করেছেন। শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দত্ত মহাশয় সবরকমেই যোগ্য লোক এবং তিনি একজন অকৃত্রিম দেশ সেবক, কিন্তু কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বাংলার বিদ্রোহাচরণ তিনি অনুমোদন করতে পারেননি বলে শরৎ চন্দ্রের উচিত হয়নি কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ডের মনোনয়নের বিরুদ্ধে তাঁর নির্বাচনে বাধা দেওয়া শরৎচন্দ্র এক্ষেত্রে প্রকৃতই কংগ্রেসের নিয়ম ও শৃঙ্খলার প্রতিকূলাচরণ করে অপরাধী হয়েছেন। সুতরাং তাঁকে যে দণ্ড দেওয়া হয়েছে তা' কিছুমাত্র অন্যায় হয়নি। তিনি যে শুধু কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের আদেশ অমান্য করেছেন তাই নয়, তাদের বিরুদ্ধাচরণ করে বিশ্বাসভঙ্গের কাজ করেছেন। তাঁর অপরাধ অমার্জনীয়। যারা 'ডিসিপ্লিন' বা নিয়ম ও শৃঙ্খলা মেনে চলতে পারে না তাদের দ্বারা কোনোদিনই কোনো বড় কাজ হ'তে পারে না। এই জন্যই বাংলার সমস্ত আন্দোলন শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে।

* * *

দলপতির আদেশ ন্যায়ই হোক আর অন্যায়ই হোক যতদিন না আমারা তা নির্বিচারে মেনে চলতে শিখবো ততদিন পর্যন্ত আমাদের মধ্যে 'একতা' হওয়া সম্ভব নয়, এবং সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কোনো কাজ করাও আমাদের দ্বারা হবে না। হিটলারের আদেশ দৈবাদেশের মত মেনে চলার গুণেই অল্পদিনের মধ্যে জার্মানরা আজ এত বড় প্রচণ্ড শক্তিশালী জাত হয়ে উঠতে পেরেছে। মুসোলিনীকে যদি ইটালী অন্ধের মত মেনে না চলতো তা'হলে ইটালি কোন দিনই এত বড় হয়ে উঠতে পারতো না। লেনীন ও স্ট্যালিনকে মেনেছিল বলেই রাশিয়া আজ নবজন্ম লাভ করে নূতন মানুষ হয়ে উঠতে পেরেছে। ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের প্রধান নায়ক চার্চিলের আদেশ যেদিন ব্রিটেন নির্বিচারে মেনে চলতে সুরু করলে ব্রিটেনের সমস্ত শক্তি সে দিন সঙ্ঘবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত হয়ে উঠলো। ফলে, তার সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে, প্রচণ্ড জার্মান-শক্তি ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সমগ্র ব্রিটীশ জাতি তাদের স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তি স্বাধীনতা ভুলে রাষ্ট্রের কল্যাণে সর্বস্ব নিয়োগ করে যুদ্ধে যোগ দিয়েছে। জানি, ইংলণ্ডের অনেকেই হয়ত এ যুদ্ধের একেবারেই পক্ষপাতি নন, তবু দেশ নায়ক যখন এ যুদ্ধ পরিচালনার প্রয়োজন আছে মনে করেন, একজন ইংরাজও তার বিরুদ্ধাচরণ করতে প্রস্তুত নন। এই গুণেই তারা এতবড় হ'তে পেরেছে। দেড়শ বছরের অধিক কাল ব্রিটীশ শাসনের অধীনে থেকেও আমরা তাদের এই মহৎ গুণের অধিকারী হ'তে পারিনি তাই স্বাধীনতা অর্জনের যোগ্যতাও আমরা লাভ করতে পারিনি। আজ যদি প্রাদেশিক গভর্ণররা বড়লাটের আদেশ অমান্য করেন বা বড়লাট যদি ভারত সচিবের আদেশ অমান্য করেন ব্রিটীশ সাম্রাজ্য দুদিনে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। তেমনি শরৎচন্দ্রের দৃষ্টান্ত অনুসরণে যদি প্রত্যেক প্রদেশের কংগ্রেস প্রতিনিধিরা কংগ্রেসের আদেশ অমান্য করতে থাকেন কংগ্রেসও দু'দিনে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা ও বিধিশৃঙ্খলা মেনে চলার মধ্যেই জাতিকে বড় করে গড়ে তোলার বীজ নিহিত আছে, এ কথা যেন আমরা কোনদিনই না ভুলি।

ব্রিটিশ গায়ানা ও তাহার ছেলেমেয়ে

শ্রীভীমাপদ ঘোষ এম্-এ

মস্ত একটা কুমীর কাদার উপর পড়ে ঘুমাচ্ছে। ছেলেরা গোলমাল কর্‌তে কর্‌তে তার পাশ দিয়ে নৌকা বেয়ে চলে যাচ্ছে, কোন কোন দুষ্ট ছেলে দু'একটা ঢিল ছুঁড়ে মার্‌ছে, কিন্তু বুড়ো কুমীরটা আদৌ গ্রাহ্য কর্‌ছে না। মড়ার মত কাদার উপর পড়ে আছে। কিন্তু এখনি হঠাং যদি একটা ছেলে টপ্ করে নৌকা থেকে জলে পড়ে যায় ত' দেখ্‌তে পাবে যে, বুড়ো কুমীরটার গায়ে কত জোর আর, কি ত্বরিত গতিতে সে ছুট্‌তে পারে! এই দেশটি কোথায় বলতে পার?

পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও অন্যান্য নানাদেশ থেকে অসংখ্য লোক দক্ষিণ আমেরিকার ব্রিটিশ গায়নায় বসবাস কর্‌ছে। সেখানে এখন শত শত ক্রোশব্যাপী জমিতে ইক্ষুর চাষ হচ্ছে। চিনির কলে দেশ ছেয়ে গিয়েছে। জর্জটাউন, ডেমেরারা প্রভৃতি অঞ্চলের দানাদার চিনির চাহিদা ইউরোপ ও আমেরিকার বাজারে বেড়ে যাচ্ছে। কাজেই এদেশের সকলেই কোন-না-কোন চিনির ব্যবসায়ের সহিত লিপ্ত।

এদেশের স্কুলগুলির ঘর বড় বড় বাংলোর মত। ঘরের জানালাগুলিতে সব সূক্ষ্ম জাল দেওয়া আছে। মশা এদেশে এত বেশী যে এইরূপ জাল দেওয়া না থাকিলে ছেলে মেয়েরা মশার কামড়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে। ছেলেদের গায়ে সাদা সার্ট বা জামা, আর মেয়েদের গায়ে রঙ্গীন জামা ও মাথায় বাঁধা রুমাল। ছেলে মেয়ে—এক সঙ্গেই পড়্‌ছে। একজন নিগ্রো শিক্ষয়িত্রী এদের পড়াচ্ছেন। আমাদের মত এদেরও মাতৃভাষা ইংরাজী নয়, কিন্তু ইংরাজ রাজত্বে বাস করে বলে এরাও আমাদেরি মত কষ্ট করে ইংরাজি শিখে। ছেলে মেয়েরা সকাল থেকে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত স্কুলে পড়ে। তারপর আহারাদি করে দল বেঁধে ইক্ষুক্ষেত্রে কাজ কর্‌তে যায়।

এদেশে একরকম ইক্ষু মে মাসে ও আর একরকম ইক্ষু অক্টোবর মাস থেকে কাটা হয়। ইক্ষু ক্ষেত্রের পাশেই নদী বা নালা। বড় বড় নৌকায় সদ্যকাটা ইক্ষু সঙ্গে সঙ্গে চিনির কলে চালান দেওয়া হয়, কারণ টাট্‌কা ইক্ষুর রসে বেশ ভাল চিনি হয়। দাঁতওয়ালা পেষণ যন্ত্রে এক একবারে ৮০।৮৫ মণ ইক্ষু বার বার পিষে তা' থেকে রস বার করা হয়। এই রস বড় বড় কড়াইএ জ্বাল দিয়ে তা' থেকে গুড়, চিনি প্রস্তুত করা হয়। জ্বাল দেওয়ার কাজ বেশ পাকা শ্রমিকে করে—কারণ জ্বাল একটু কম বা বেশীর উপর গুড় বা চিনির তারতম্য অনেক নির্ভর করে।

ইক্ষুক্ষেত্রগুলি থেকে ইক্ষু কাটার পর ক্ষেত্রে যে সব শুক্‌নো পাতা থাকে, তা' আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এই ছাই সারের কাজ করে। তারপর জমি উত্তমরূপে চাষ ক'রে আবার তাতে ইক্ষুর নূতন ডগা সারি বেঁধে পুঁতে দেওয়া হয়। দু' রকম ইক্ষুর চাস এখানে হয় ব'লে জমি ফেলে রাখা হয় না। নারিকেলের মত ইক্ষুর কোনও অংশই বাদ যায় না। উপরের পাতাগুলি গবাদি পশুর খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। তারপর তার নীচের ডগা পুঁতে নূতন ইক্ষুর চাষ হয়। ইক্ষু দণ্ড থেকে রস বার করবার পর যে ছিব্‌ড়ে বা খোসা থাকে তাই জ্বাল দিয়ে গুড় বা চিনি প্রস্তুত করা হয়।

এদেশের ছেলে মেয়েরা জল দেখে ভয় করে না। ছোট ছোট নদীনালা সাঁতার কেটে পার হয়। ইক্ষুক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে হেলায় চলে যায় এবং ছেলেবেলা থেকেই ইক্ষু চাষের সমস্ত পদ্ধতি বেশ ভাল করে জেনে নেয়, কারণ বড় হয়ে তাদেরও ত ইক্ষুর চাষ করতে হবে। প্রকৃতির নানা উৎপাত অক্লেশে সহ্য করে কালে এরা নির্ভীক ও পরিশ্রমী শ্রমিক হয়ে উঠে।
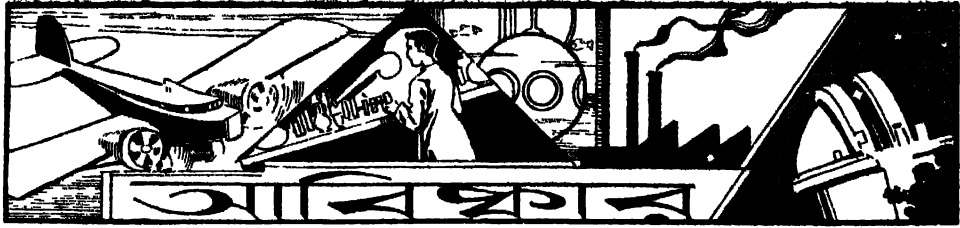
ভাইটামিন-পি

তোমরা গত বৎসর পাঠশালায় 'ভাইটামিন' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে প'ড়েছো বোধহয় যে এপর্যন্ত ছ'রকম বিভিন্ন ভাইটামিন আবিষ্কার করতে পারা গেছে। সম্প্রতি আরও একটি নূতন ভাইটামিনের সন্ধান মিলেছে, এটি 'সাইট্রিন' ভাইটামিন। কমলা, সরবতী বাতাবী প্রভৃতি লেবু জাতীয় ফলের সারই 'সাইট্রিন' ভাইটামিনের প্রধান উপাদান। এই ভাইটামিনের নামকরণ করা হয়েছে 'ভাইটামিন-পি'।

নাইলন

তাঁত, শুয়োর কুঁচি, শোন, ফেঁসে, আঁইস, রোঁয়া থেকে সূক্ষ্ম সূতার কাজ পর্যন্ত সব রকম প্রয়োজনেই চলতে পারে এমন একরকম পদার্থ আমেরিকার রাসায়নিকেরা তাদের বিজ্ঞানাগারে প্রস্তুত করেছেন। এর নাম দিয়েছেন তাঁরা 'নাইলন'। নাইলন যদিও অনেকটা নকল রেশম 'রেয়নের' মতোই, কিন্তু এ এমন এক আশ্চর্য বস্তু যে একে ইচ্ছামত লূতাতন্তুর ন্যায় সূক্ষ্ম সূতায় পরিণত করা যায় আবার লোহার 'রড' বা রেলিংয়ের মত মোটা করেও তৈরি করা যায়। ধাতু নির্মিত চাদর বা ইস্পাতের পাতের মতোও বানানো যায়। নাইলনের বিশেষত্ব হচ্ছে যতই সূক্ষ্ম ও মিহি করা হোক না। তদনুরূপ সূতা বা রেশমের অপেক্ষা ও ঢের বেশি মজবুৎ টেকসই এবং দেখতেও সুন্দর। মার্কিন বিলাসিনীদের সমাজে ইতিমধ্যেই 'নাইলনের' তৈরী মোজা এবং পেটিকোট শেমিজ প্রভৃতি অন্তর্বাস ব্যবহার করা ফ্যাশন হয়ে উঠেছে। ইংলণ্ডেও 'নাইলন' প্রচলিত হয়েছে। ব্রিটেনে এক বিরাট কারখানা স্থাপিত হয়েছে 'নাইলন' প্রস্তুত ও তৎসংক্রান্ত দ্রব্যাদি তৈরি করবার জন্য। 'টুথব্রাশ' 'হেয়ারব্রাশ' প্রভৃতি এখন ব্রিটেনে পশুলোমের পরিবর্তে নাইলনের নকল ফেঁসোয় তৈরি হচ্ছে। পশু-লোমের তৈরি ব্রাশ অপেক্ষা নাইলনের কোঁচে তৈরি ব্রাশ অপেক্ষাকৃত মজবুত ও সুদৃশ্য হয়েছে। টুথব্রাশ সাধারণতঃ শুয়োর কুঁচি দিয়ে তৈয়ারী হয়। ব্যবহার করতে করতে চুলের মুখগুলি চিরে ও ফেটে যায় এবং কেটেও যায়। ভিজলে সহজে শুকায় না। কিন্তু 'নাইলনের' টুথব্রাশ এ সব দোষ থেকে মুক্ত এবং এত অল্পমাত্রায় জল লাগে এতে যে, দেখতে-দেখতে শুকিয়ে ওঠে। মাছ ধরার সূতো এবং জেলেদের জাল তৈয়ারী পক্ষে 'নাইলন' যে বিশেষ উপযোগী তা প্রমাণ হয়ে গেছে। আর সবচেয়ে সুবিধার কথা হচ্ছে এবস্তুর মূল্য রেশম ও সূতার চেয়ে কম। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে 'নাইলন' যে পাট, সূতা, রেশম, রেয়ন, তাঁত, রোঁয়া, প্রভৃতিকে বাজার থেকে নির্বাসিত করে দেবে এ আশঙ্কা পূর্ণমাত্রায় রয়েছে।

সিংহলী ভাষায় টাইপ রাইটার

ভারতের প্রায় সবরকম ভাষাতেই টাইপ রাইটার বা লিপি যন্ত্র পাওয়া যায়। হিন্দি, উর্দু, বাংলা, গুজরাটি এমন কি তামিল-তেলেগু পর্যন্ত। কিন্তু সিংহলী ভাষায় এপর্যন্ত কোনো লিপি যন্ত্র ছিল না। কারণ ওদের অক্ষরের সংখ্যা ৮০, এ ছাড়া যুক্তাক্ষর এবং ফলা-আঁকড়ি-ইলেক্ প্রভৃতি চিহ্নও এত বেশী যে, কোনো কোম্পানীই আর সিংহলী ভাষায় টাইপরাইটার তৈরী করতে পারছিল না। অবশেষে একটি ইংরেজ কোম্পানী সিংহলগভর্ণমেণ্টের অনুরোধে ও পৃষ্ঠপোষকতার আশ্বাস পেয়ে বহু চেষ্টার পর এই অসাধ্য সাধনে সফলকাম হয়েছেন। "তামিল' ভাষায় টাইপ রাইটার তৈরি করতে এঁরা পারেন নি। সে অসম্ভব সম্ভব করেছে এক জার্মান কোম্পানী। শ্যামদেশের ভাষাও অত্যন্ত জটিল, তাই তার অক্ষরে এবং জটিলতর হিব্রু ভাষায় অর্থাৎ য়ুহুদীদের হরফ নিয়ে টাইপরাইটার তৈরির চেষ্টা আজও সম্পূর্ণ সফল হয় নি।

পরাগ ও রেণু

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(পরাগের পরিচয়)
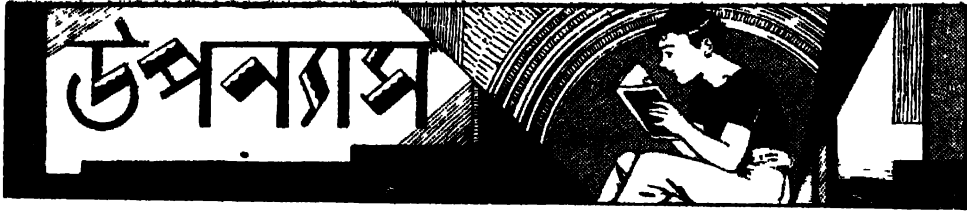
পরাগের বয়স এখন আট বছর। দেখতে ভারি সুন্দর। সে যখন ছোট্ট কচি শিশু তখন থেকেই পাড়ার সকলে তাকে খুব ভালবাসে। এমন কি যে ডাক-পিয়ন পাড়ায় চিঠি বিলি করে সেও একবার খোকা বাবুর খোঁজ ক'রে তাকে আদর না ক'রে যায় না। গয়লা দুধ দিতে এসে খোকাবাবুর জন্য বিশেষ করে একটু বেশী দুধ দিয়ে যায়। তাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে যে সব ফেরিওয়ালারা যায় তারা সকলেই খোকাবাবুকে ডেকে তার হাতে কিছু-না-কিছু উপহার দিয়ে যায়। বাঁশীওয়ালা তাকে বাঁশী দিয়ে যেত, ফলওয়ালা তাকে ফল দিয়ে যেত, গলির মোড়ে যে স্টেশনারি দোকান আছে পরাগের আড্ডা ছিল সেইখানে। সে রোজ সকালে ঝীয়ের কোলে চ'ড়ে কালীবাবুর দোকানে গিয়ে হাজির হ'ত। কালীবাবু আদর করে নিজের বসবার টুলটির উপর তাকে বসিয়ে এক হাতে দিতেন বিস্কুট লজেঞ্জস আর এক হাতে দিতেন চকোলেট টফী। কালীবাবুর দোকানে পরাগ প্রতিদিন সকালে অন্ততঃ একঘণ্টা কাটিয়ে আসতো। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে সে কালীবাবুকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলতো। কালীবাবু অসীম ধৈর্যের সঙ্গে তার প্রত্যেক প্রশ্নের যথাসাধ্য উত্তর দিতেন। এমনি ক'রে কালীবাবুর সঙ্গে পরাগের একটা নিবিড় স্নেহ প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল।

পরাগের মা ঝীকে দিয়ে কালীবাবুকে বারণ করে পাঠাতেন যে তিনি যেন খোকাকে রোজ এত সব জিনিসপত্র না দেন। কিন্তু কালীবাবু সে কথা শুনতেন না। শেষে পরাগের মা একদিন ঝীকে ডেকে মানা করে দিলেন—খোকাকে নিয়ে সে যেন আর কালীবাবুর দোকানে না যায়। ঝী সেদিন আর খোকাকে নিয়ে গেল না। খোকা না আসাতে কালীবাবু অস্থির হয়ে উঠলেন। তাঁর দোকানের কাজে মন লাগলো না। খরিদ্দারদের জিনিসের দাম বাবদ টাকার বাকী পয়সা ফেরত দিতে গিয়ে ভুল করতে লাগলেন। কাউকে বেশী কাউকে কম দিয়ে ফেলে লজ্জিত হ'লেন। শেষে দোকান বন্ধ করে পরাগদের বাড়ী গিয়ে হাজির হলেন। তাঁর ভয় হয়েছিল পরাগের বোধ হয় অসুখ করেছে, নইলে সে এলনা কেন? কিন্তু তাদের বাড়ী এসে 'খোকাবাবু' বলে ডাকতেই পরাগ ছুটে এসে কালীবাবুর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে গল। জড়িয়ে ধরে বললে, 'কাবু' মা মণি আমাকে আর তোমার দোকানে যেতে দেবেন না, বলেছেন। তুমি কেন আমাকে রোজ রোজ অত জিনিস দাও। মা-মণি বললেন, আমি গেলে তোমার দোকানের ক্ষতি হবে।

পরাগের মুখদিয়ে ছোট বেলায় 'কালীবাবু' কথাটা সবটুকু উচ্চারণ হ'তনা। সে কেবল গোড়ার অক্ষর 'কা' আর শেষের অক্ষর 'বু' মিলিয়ে 'কালীবাবু' কে 'কাবু' বলে ডাকতো। আজ সে বড় হয়েছে, কিন্তু কালীবাবুকে এখনও সে 'কাবু' ব'লেই ডাকে। কালীবাবু সেদিন পরাগের মাকে মিনতি ক'রে খোকাকে তার দোকানে পাঠাবার অনুমতি নিয়ে গেছল। কালীবাবু তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে খোকাবাবুর পয়েই তার দোকানের বিক্রী বেশী হয়। খোকাবাবুর হাতে সে যা দেয় তার চেয়ে ঢের বেশী অনেক খরিদ্দারকে 'ফাউ' দিতে হয়। ইঁদুরে কেটে কত জিনিষ লোকসান করে মা, আমি খোকাকে যা দিই তার দাম কিছুই নয়। আমার একটি ছেলে ছিল, ভগবান তাকে ডেকে নিয়েছেন। ছেলের শোকে আমার স্ত্রীও বেশীদিন আর বাঁচলোনা—সেও তার ছেলের কাছে

চলে গেছে। সংসারে আমি আজ একেবারে একা। আমার কেউ নেই মা। খোকাবাবু আমার সব শোক দুঃখ ভুলিয়ে দিয়েছে, দয়া করে খোকাকে একবার করে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও, মা।

পরাগের মা'র দুই চোখ জল ভরে উঠ্‌লো। কালীবাবুর দুঃখের কথা শুনে তিনি খোকাকে আগের মত তাঁর কাছে পাঠাতে রাজী হ'লেন। কালীবাবু দু'হাত তুলে তাঁকে আশীর্বাদ ক'রে গেলেন—'ভগবান তোমার ভাল করবেন মা।'

সেই থেকে খোকা প্রতিদিন কিছুক্ষণ কালীবাবুর দোকানে কাটিয়ে আসে। এখন সে বড় হয়েছে, এখন আর সকালের দিকে কালীবাবুর দোকানে যায় না। মায়ের কাছে বসে পড়াশুনা করে। বিকেলে কালীবাবুর কাছে আসে।

কালীবাবু এখন তাকে চকোলেট টফীর বদলে শ্লেট-পেন্সিল খাতা কলম উপহার দেন। পরাগের 'এয়ারগানটি' কালীবাবুরই দেওয়া। তার পকেটে যে লাট্টু আর লেংতি আছে পরাগ তা কালীবাবুর কাছ থেকেই সংগ্রহ করেছে। পরাগের ছোট্ট টর্চ্চ, রঙীন ছাতি, ব্যাটবল, ফুটবল, হকীষ্টিক্, রেলগাড়ী, এঞ্জিন, মোটরকার, ট্রাইসাইকেল সমস্তই 'কালীস্টোর' থেকে পাওয়া।

কালীবাবুর দোকানে এসে আজকাল পরাগ বাংলা খবরের কাগজ পড়ে কালীবাবুকে শোনায়—কংগ্রেস কি করছে, মহাত্মা গান্ধী কি বলছেন, সুভাষবসুর কী মত, মোসলেম লীগ ও মিঃ জিন্না এবং হিন্দু মহাসভা ও বীর সাভারকার—সবার কথাই সে কাগজে পড়ে। কালীবাবুকে জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা কাবু 'বীর সাভারকার' বলে কেন? তিনি বুঝি খুব বীর? অর্জুনের মতো না মহাবীর কর্ণের মতো?

আচ্ছা, মহাত্মা গান্ধী বলে কেন? মহাবীর গান্ধী বলে না কেন? সুভাষ বসু 'দেশ গৌরব' কেন? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তো দেশ গৌরব।

কাবু তাকে বুঝিয়ে দেয় যে গান্ধীজী ধার্মিক ও সাধু প্রকৃতির লোক, তিনি ভগবান বুদ্ধদেবের মত অহিংসা ধর্ম প্রচার করেন, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের মত প্রেমধর্ম শিক্ষা দেন। তাই ভারতবাসীরা তাঁকে 'মহাত্মা' বলে। তিনি নির্ভিক সত্যবাদী ও সরল। কিন্তু রাজনীতি কুটিলতায় ভরা। সরলতার স্থান নেই সেখানে। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তাই সত্যাশ্রয় করে থাকা চলে না।

চাণক্যপণ্ডিত যাঁর আর এক নাম কৌটিল্য তিনি ভারতের একজন প্রধান রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি বুদ্ধি কৌশলে চন্দ্রগুপ্তকে ভারতসম্রাট করে উত্তর ভারতে এক বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন যার গৌরবময় স্মৃতিচিহ্ন আজও নানাস্থানে দেখতে পাওয়া যায়। তিনি রাজনীতিতে অহিংসা ধর্ম একেবারেই মানতেন না। তাই ভারতের ঐশ্বর্য ও গৌরব বহুপরিমাণে বাড়াতে পেরেছিলেন। কিন্তু পরে ভারতবর্ষ একদিন রাজনীতিতেও সত্যাশ্রয়ী এবং জীবন যাত্রায় অহিংস হয়ে উঠেছিল বলেই ক্রমে শক হূন মোগল পাঠানের হাতে বার বার তাদের পরাজয় ও লাঞ্ছনা ঘটেছে। তুমি যখন বড় হয়ে ইতিহাস পড়বে তখন দেখবে মহাত্মা গান্ধী আজ ভারতবাসীকে যে শিক্ষা দিতে চাইছেন অতীতকালে ভারতের একাধিক বড়-বড় মনীষীরা ভারতবর্ষকে সেই শিক্ষাই দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা কেউ সফলকাম হ'তে পারেন নি। যে য়ুরোপে আজ পরস্পর মারামারি হানা-হানি কাটাকাটি চলেছে তাদের ধর্মগুরু প্রভু যীশুখৃষ্টের উপদেশ হচ্ছে প্রতিবেশীকে ভালোবাসবে। কেউ তোমার একগালে চড় মারলে তারদিকে আর এক গাল ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু য়ুরোপ তা মেনে চলতে পারেনি।

পরাগ কৌতুহলীর ন্যায় প্রশ্ন করে—কেন পারেন নি, কাবু?

কাবু বলেন—ভগবানের এই সৃষ্টি তা'হলে থাকে না। পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী যে পরস্পরের প্রতিহিংসা করেই বেঁচে আছে, সবল দুর্বলকে হত্যা করে পরমায়ু বাড়ায়। পশু পাখীদের মধ্যেও যেমন পরস্পর হানাহানি, মানুষের মধ্যেও ঠিক তাই। জীবহিংসা না করলে মানুষের বাঁচবার যো নেই।

পরাগ বললে—'না কাবু, মা-মণিত' মাছ মাংস খান না। তিনি শুধু নিরামিষ শাকসব্জী তরি-তরকারি দিয়ে ভাত খান। রাত্রে শুধু ফলমূল আর দুধ মিষ্টি খেয়ে থাকেন। তিনি ত জীবহিংসা না করেই বেঁচে আছেন।

কাবু বললেন—তুমি বোধ হয় পড়েছ, আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, এই ফলমূল শাক সব্জী যে-যে গাছে

হয় সেই সব উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে—তারা সবাই সজীব। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রেও এ কথা লেখা আছে। আমরা প্রতি গ্রাস জলের সঙ্গে কত লক্ষ-লক্ষ জীব যে হত্যা করি তা' অনুবীক্ষণ দিয়ে দেখলে বোঝা যায়—ও-সব ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র প্রাণী চোখে দেখা যায় না। প্রতি নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে অহরহ এই রকম অসংখ্য জীবকে আমরা হত্যা করি। প্রতি পদক্ষেপে কত কীট পতঙ্গের জীবন যে নষ্ট করি আমরা—তার সংখ্যা হয় না। দুধ—আমরা যে-দুধ পান করি সে ত' গোবৎসকে তার মাতৃস্তন্য থেকে বঞ্চিত করেই পাই। সুতরাং বুঝতেই পারছো যে নিরামিষ ভোজী হলেই যে কেউ অহিংস জীবন যাপন করেন না বা করতে পারেন না। মাছ যদি আমরা কেউ না খাই, তাহ'লে দেখতে দেখতে দেশের সমস্ত নদনদী পুষ্করিণী মাছে ভরে যাবে, সেই মাছ মরে পচে জল দুর্গন্ধ হয়ে উঠবে, পিপাসায় কাতর হয়ে জলের অভাবে তখন আমরা মরে যাব। মাংস যদি আমরা না খাই তাহলে সমস্ত দেশ ভেড়া ছাগল মুর্গী ও হাঁসে ভরে যাবে। মানুষের থাকবার আর স্থান হবে না। এই যে জীবহিংসা এ ভগবানেরই নিয়মে চলেছে। এ বন্ধ হলে সৃষ্টি ওলট পালট হয়ে যাবে যে!

বাবুর কথা শুনে পরাগ চিন্তিত হয়ে পড়লো। সে মনে মনে স্থির করলে মা-মণিকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করবে পরাগের বিশ্বাস তার মা-মণি যা বলেন সেইটেই ঠিক।

[ক্রমশঃ
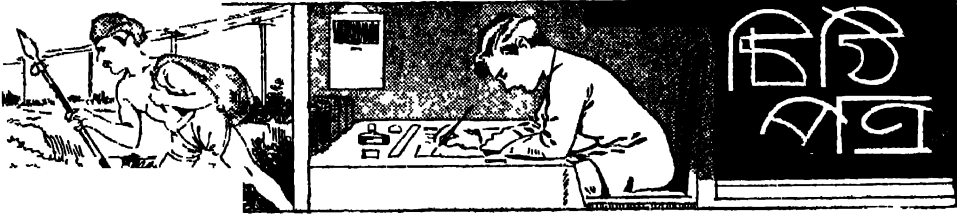
মাননীয় 'পাঠশালা' সম্পাদক মহাশয়,—

দেখ্‌তে দেখ্‌তে 'পাঠশালার' ৩য় বর্ষ শেষ হয়ে গেলো। চতুর্থ বর্ষ আরম্ভ হওয়ায় আপনাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি এবং 'পাঠশালার' দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

অনেকগুলি কাগজেরই গ্রাহক আমি। সত্যি করে বলতে কি, 'পাঠশালা', আমার ভালো লাগে সবচেয়ে বেশী। সুদীর্ঘ ৩ বৎসর 'পাঠশালা'র কোনও এক সংখ্যাও মাসের দ্বিতীয় তারিখে আসেনি। এরূপ নিয়মিত আর একটা পত্রিকাও পাইনে। 'পাঠশালা' এলেই আমি সর্বপ্রথম পড়ি "নানাপ্রসঙ্গ," তারপর 'বিশ্ববার্তা', 'আবিষ্কার', 'গতমাসের খবর'।

আমরা যে সব প্রশ্ন করে চিঠি লিখ্‌বো—তার উত্তর পাঠশালা মারফৎ দিবেন শুনে' খুব খুশী হ'লুম। অনেকের প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে জানবারও অনে—ক কিছু থাকে। যিনি এ বিভাগে কাজ করবেন, তাঁর একটা ভালো দেখে 'ছদ্মনাম' দেবেন। 'ভূতোগোয়েন্দা' নামটা সত্যিই ভাল লাগছে না।

Penfriends পাতিয়ে দেবার ব্যবস্থা কি করলেন? আমি Penfriend পাতাতে চাই।

অনেক লিখে ফেল্‌লাম। আজ এখানেই আসি।

আমার নমস্কার জানিবেন। ইতি।— গ্রাঃ নং—1146

K M saiful Huq

মহাশয়,—

পাঠশালা এই চতুর্থবর্ষে পদার্পণ করিল। ৺ভগবানের নিকট পাঠশালার দীর্ঘায়ু কামনা করি। আমাদের দেশে যতগুলি শিশু মাসিক পত্রিকা আছে তার মধ্যে পাঠশালাকে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া চলে। ইহার ইতিহাস, বিজ্ঞান, পৌরাণিকী, হাস্যকৌতুক, নানাপ্রসঙ্গ প্রভৃতি বিভাগগুলি খুব সুন্দর। আবিষ্কারের কথাটি সর্বশ্রেষ্ঠ। পাঠশালাতে যে 'শব্দ-সন্ধান' প্রতিযোগিতাটি হয় তাহা অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। "শব্দ-সন্ধান" সমাধান করিতে বসিয়া কত মহাপুরুষের জীবনী ও অজানা শব্দের সহিত পরিচয় ঘটিবার সৌভাগ্য হয় আমাদের। পাঠশালা

প্রতি মাসের ঠিক প্রথম দিনই হাতে পৌছায়। এই রকম নিয়মিত অন্য কোনও ছেলেদের পত্রিকা দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি আজ ফরিদপুরের পক্ষ হইতে আপনাদিগ'কে আমাদের ভালোবাসা জানাইতেছি। ইতি—

পাঠশালার প্রিয় বন্ধু—বীরেন্দ্র নারায়ণ সরকার,
গ্রাহক নং 2361 ফরিদপুর,

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

সম্পাদক মশাই! আজ "শরতের সুন্দর প্রভাতে" ঘুম থেকে উঠেই মনে হ'ল আপনার নিকট একখানা চিঠি লিখি। প্রারম্ভেই "বিজয়ার প্রীতিনমস্কার জানাচ্ছি। যদিও বিজয়ী নই বিজিত, তবু আশা করি, প্রসন্ন মনে গ্রহণ করবেন।

এবারকার "শারদীয় পাঠশালা" খুব ভাল লেগেছে। শুধু "শারদীয়" কেন, এর আগের সংখ্যাও। লিখেছেন, কার্তিকের পাঠশালায় সবচেয়ে কি ভালো লাগল, জানাতে। দারুণ প্রশ্ন। কারণ কোন্‌টা রেখে কোন্‌টার প্রশংসা করি! তবুও এর মধ্যে "ভ্রামরী" কাহিনীটি এবং প্রভাতবাবুর "পরিচয়" কবিতাটিই সবচেয়ে ভাল লেগেছে। উপন্যাস দুটিই খুব ভাল লেগেছে। দেবেশবাবুর বৈদেশিক সাহিত্যের অনুবাদ, একটি প্রধান আকর্ষণ। বর্তমানের বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে জান্‌বার বিশেষ আগ্রহ আছে। বিশেষতঃ মোস্‌লেম্‌ সাহিত্য। কারণ, মোস্‌লেম্‌ সাহিত্য সম্বন্ধে মোটেই জানি না। "সাহিত্য ও সাহিত্যিক" বা এই গোছের কোনও বিভাগ পাঠশালায় থাক্‌লে বোধ হয় সুবিধা হত।

আর একটা কথা, পাঠশালা হ'তে 'গতমাসের খবর' তুলে দিলেন নাকি? রাখ্‌তে অনুরোধ করি।

আপনার গুণমুগ্ধ
শ্রীনবনীকুমার চৌধুরী গ্রাহক নং ৩১৫২
লঙ্গাই চা বাগান পোঃ অঃ চান্দশিরা, শ্রীহট্ট

য়ুরোপে যুদ্ধের অবস্থার কিছু পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। জার্মানির ইংলণ্ড অভিযান সম্ভবপর না হওয়ায় একদিকে যেমন পৃথিবীর চোখে ব্রিটেনের মর্যাদা বেড়েছে তেমনি অপর দিকে জার্মানিকে লোক চক্ষে অনেকটা খর্ব হয়ে পড়তে হয়েছে। ইংরেজদের পক্ষ থেকে সংবাদপত্র ও বক্তৃতায় যেন একটা 'দুয়ো-পারলেনা!' গোছের সুর শোনা যাচ্ছে। যদিও প্রধান মন্ত্রী চার্চিল সাহেব বারংবার বলছেন 'বিপদ সম্পূর্ণ কাটেনি' তোমরা যেমন সজাগ আছ তেমনি সজাগ থাকো। সাবধান! মুহূর্তের জন্যও অসতর্ক হয়ো না। শত্রুর আক্রমণ হয়ত হলেও হ'তে পারে কোনো দিন। তবে এ আশ্বাস এবং ভরসাও তিনি দিচ্ছেন যে ব্রিটেন যেভাবে প্রস্তুত হয়েছে তাতে জার্মানীর আর সাধ্য নেই ইংলণ্ডের মাটিতে পা বাড়ায়।

* * *

জার্মানীর দিক থেকে বিমান আক্রমণও পূর্বের চেয়ে অনেকটা ঢিলে হয়ে পড়েছে। এখন আর পঙ্গপালের ন্যায় জার্মাণ বিমানকে ব্রিটেনের উপর আসতে দেখা যাচ্ছে না। শত্রুর বিমানচারীরা বর্তমানে একক উড়ে এসে এলো মেলো ভাবে বোমা বর্ষণ করে পিঠটান দিচ্ছে। তার মধ্যেও দশ বারোখানা করে শত্রুবিমান প্রত্যহ ভূপাতিত করছে ব্রিটিশ 'আর-এ এফ্‌' এর বৈমানিকেরা। শুধু তাই নয়, আজকাল 'আর-এ-এফ্‌' এর দলও রীতিমত প্রতিদিন জার্মানির মাথার উপর চড়াও হয়ে গিয়ে বার্লিন ও অন্যান্য বড় বড় শহরে, কল-কারখানায়, তৈলভাণ্ডারে, জাহাজ-বন্দরে, রেল স্টেশনে, হাঁসপাতালে বোমা ফেলে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে আসছে। এইবার জার্মানি থেকেও শিশু ও নারীদের স্থানান্তরিত করবার ব্যবস্থা হচ্ছে। শহর-বাসীরা আতঙ্কে ঘরবাড়ী ছেড়ে পালাচ্ছে।

* * *

জার্মানি যে কাহিল হয়ে পড়েছে তার মস্ত প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে তাদের কংক্রীটের তৈরি বোমা থেকে। ধাতু নির্মিত বোমা আর তারা ব্যবহার করতে পারছে না। লৌহ ইস্পাত নিকেল এ্যালুমিনিয়ম প্রভৃতির অভাব ঘটেছে তাদের। বিমান বহরও যে সংখ্যায় সংক্ষিপ্ত হয়ে

পড়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে ব্রিটেন আক্রমণে এইবার তাদের ইটালীর বিমান ব্যবহার করা দেখে। জার্মানিকে ব্লকেড বা অবরোধ করা যে ব্রিটেনের সফল হয়েছে এ থেকেই তা বোঝা যায়। যে হিট্লার বার্কেন্সগার্টেন বা মিউনিকে বসে অন্যান্য দেশের নেতাদের আহ্বান করে পাঠাতেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসবার জন্য, সেই হিট্লারকে এখন দেখা যাচ্ছে চারিদিকে ছুটোছুটি করে বেড়াতে। আজ তিনি দৌড়ে আসছেন স্পেনে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর কাছে, কাল ছুটছেন ভীশির ফরাসী নায়ক মার্শাল পেঁতে ও ল্যাভালের সঙ্গে দেখা করতে। তারপর আবার দৌড়ে আসছেন ব্রেমেন গিবিবর্ষে মুসোলিনীর তোষামোদ করতে। এ থেকেও বোঝা যায় জার্মানি এইবার বিপন্ন বোধ করছে নিজেকে, নইলে তার সর্বাধ্যক্ষ এমন চঞ্চল হয়ে উঠেছে কেন?

* * *

আফ্রিকার রণাঙ্গনে ইটালীর শম্বুকগতি প্রমাণ করছে যে যুদ্ধের উৎসাহ তাদের মন্দীভূত হয়ে এসেছে। সমর সাগরে যে জোয়ার দেখা দিয়েছিল তাতে ভাটা পড়েছে। ভাঁটার গতির বিরুদ্ধে রণতরী ধীরে ধীরে উজান বইছে যেন। বল্কানে মাঝে কয়েকদিন অকস্মাৎ একটা হৈ চৈ হ'ল বটে কিন্তু জার্মানির রুমানিয়া গ্রাস করার সঙ্গে সঙ্গে ওদিকের আলোও ম্লান হয়ে এসেছে। বিশহাজার জার্মান সৈন্য বুলগেরিয়ার ও গ্রীসের ভিতর দিয়ে সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের দিকে আসছে বলে যে একটা জনরব শোনা যাচ্ছিল তা যেন হঠাৎ থেমে গেল বলে মনে হয়। এদিকের আগুন কি তবে ছাই চাপাই রইল?

* * *

এমন সময় আচম্বিতে শোনা গেল ইটালী গ্রীস আক্রমণ করেছে। ইটালী যদি গ্রীস দখল করতে পারে তাহলে সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, ইরাক, মিশর সমস্ত বিপন্ন হয়ে পড়বে। ব্রিটিশ রণতরী, সৈন্যবাহিনী ও বিমানবহর তাই ছুটে এসেছে গ্রীস রক্ষা করতে। ইটালীর সংকল্প সিদ্ধ হওয়া কঠিন।

* * *

যুদ্ধের সুদর্শন চক্র ঘুরতে ঘুরতে যুরোপ থেকে এশিয়ার পূর্বপ্রান্তে এসে পড়বার উপক্রম ক'রেছে অনেকে এইরূপ আশঙ্কা করছেন। পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ঘটনাবলী থেকে এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত না হলেও, বিশেষ ভাবে চিন্তা করে দেখলে মনে হয় যে, এ আশঙ্কা অমূলক। কারণ, যে জাপান তার সমগ্র শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েও চীনের ন্যায় এক আধুনিক সমর বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ অস্ত্রশস্ত্র ও রণসম্ভারে একান্ত দীন দেশকে চার বৎসরের প্রাণান্ত চেষ্টাতেও কাবু করতে পারলেনা, ব্রিটিশ ও আমেরিকার মিলিত শক্তির বাধাকে বিচূর্ণ করে অগ্রসর হওয়া তার পক্ষে একেবারেই কি অসম্ভব নয়? ফ্রান্স হঠাৎ বিকল হয়ে পড়েছে তাই ইন্দোচায়নায় জাপান কিছু সুবিধা করে নিয়েছে বটে কিন্তু তার বেশী অগ্রসর হবার চেষ্টা করলেই তাকে হোঁচোট খেতে হবে। চীন ব্রহ্মপথ অবাধে মুক্ত করে দিয়েছে ব্রিটেন। আমেরিকার রণসম্ভার হুহু করে এসে পড়ছে চীনে। জাপান চীন সামলাবে না এদিকে পা বাড়াবে? আমেরিকা জাপানকে যুদ্ধোপকরণ সরবরাহ বন্ধ করেছে। ভারতবর্ষ থেকেও কিছু পাবার আশা নেই তার। ওলন্দাজ পূর্ব ভারতের অভিভাবক দাঁড়িয়েছে ব্রিটেন ও আমেরিকা। সেখানেও দ্বাররুদ্ধ, বন্ধু জার্মানি ও ইটালী নিজেরাই বিপন্ন ও বিব্রত। তাদের কাছেও কোনো সাহায্য পাবার সম্ভাবনা নেই। রাশিয়ার সঙ্গে ম্যাঞ্চুরিয়া নিয়ে অনেক দিনের অসদ্ভাব রয়েছে। সুতরাং মনে হয় এই সব জটিলতার নাগপাশ কাটিয়ে জাপানের পক্ষে 'যুদ্ধং দেহি' বলে এগিয়ে আসা এখন অনেকটা আকাশ-কুসুম।

* * *

যুরোপে কানাকানি সুরু হয়ে গেছে যে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জার্মানি ও ইটালিকে ভিশির ফরাসী গভর্ণমেণ্ট এবং ফ্রাঙ্কো চালিত স্পেন যথাসাধ্য সাহায্য করবেন। মঁশিয়ে ল্যাভালের প্ররোচনায় মার্শাল পেঁতে নাকি এই ব্যবস্থায় সম্মতি দিয়েছেন। এরূপ একটা অভাবনীয় দুর্ঘটনা যদি যথার্থই ঘটে থাকে তাহলে সত্যই এ একটা বিস্ময়কর ব্যাপার বলতে হবে। অবশ্য জেনারেল দ্য গলে, এ্যাডমিরাল মুসলিয়ের প্রভৃতিকে নিয়ে একটা স্বতন্ত্র স্বাধীন ফরাসীদল গড়ে তুলতে ব্রিটেন সাহায্য করেছে ঠিক এবং ঐ দলটি ভিশী গর্ভণমেণ্টের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য চালাচ্ছে একথাও মিথ্যা নয়, তাছাড়া ব্রিটেনের বন্দরস্থ ফরাসী জাহাজগুলিকে আটক করা এবং পাছে জার্মানদের হাতে পড়ে বলে ভূমধ্যসাগরে ও আফ্রিকার বন্দরে অবস্থিত ফরাসী জাহাজ কয়েকখানিকে আক্রমণ করে অকর্মণ্য করে ফেলা প্রভৃতি কারণ ভিশী গভর্ণমেণ্ট দেখাতে পারেন, কিন্তু আসল ব্যাপারটাই তাঁরা বিস্মৃত হচ্ছেন কী করে? এসমস্তই যে ব্রিটেন করেছে ফরাসীজাতির ভবিষ্যৎ মঙ্গল ও কল্যাণের জন্যই।

আশ্বিন সংখ্যার প্রশ্নের উত্তর—

১। বর্তমান ভারতে শ্রেষ্ঠ দার্শনিক তিনজন।

২। তাঁহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন, ডাঃ রাধাকৃষ্ণন।

৩। কাজী নজরুল ইসলামের সংক্ষিপ্ত জীবনী আছে।

৪। লিখেছেন—শ্রীহেমন্তকুমার সরকার এম, এ।

৫। তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, শ্রীনলিনীকান্ত সরকার। যিনি হাসির গান গাহিয়া থাকেন, বর্তমানে রেডিও ডিপার্টমেণ্টের চার্জে আছেন। তাঁকে লিখলে তিনি সমস্ত খবর জানাতে পারেন। ইতি—

শ্রীউমা বাগচী, রায়পুর, সি, পি

গ্রাঃ ১০৪৭

কার্তিক সংখ্যার প্রশ্নের উত্তর—

কার্তিকের পাঠশালার সম্বন্ধে আমি যা' যা' জানি তা জানাচ্ছি।

শ্রীমধু ঘোষাল যা' জানতে চেয়েছেন, তার দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে আমি যা' জানি তা' এই, 'কথিকা' মানে একটি কাহিনী—যাহা আড়ম্বর বিহীন, শুধু প্রয়োজনীয় কথা এবং ছোট্ট। গল্প—একটি কাহিনীকে বিশেষ ভাবে বর্ণনা করা। দুয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথমটিতে অলঙ্কার বাহুল্য নাই দ্বিতীয়টিতে আছে। প্রথমটি অপেক্ষাকৃত ছোট, দ্বিতীয়টি সেই তুলনায় বড়।

শ্রীকালিদাস সাহার প্রথম প্রশ্নের উত্তর, বাংলা সন সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে ৯৬৩ হিজরী ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ হয়।

(৩) সাধারণতঃ রাত্রেই আমাদের ঘুম ধরে। এর কারণ এই যে, সারাদিন পরিশ্রমে আমাদের শরীরের স্নায়ু ক্লান্ত হয়ে পড়ে। দেহ যখন পরিশ্রান্ত হয়, তখনই আমরা ঘুমিয়ে পড়ি।

এবার আমি আপনাকে দুটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছি। প্রথমটি—বর্তমান বাংলার তথা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা কবি কে? দ্বিতীয়—বাংলা ভাষায় বৃহত্তম বই কোনটি? (অবশ্য সঙ্গে লেখক ও পৃষ্ঠা সংখ্যা জানাবেন)

বিনীত—শ্রীনবনীকুমার চৌধুরী

গ্রাহক নং ৩১৫২, লঙ্গাই চা বাগান।

পোঃ অঃ চান্দখিরা, শ্রীহট্ট।

টর্পেডো আবিষ্কার

১৮০৫ খৃঃ অব্দে Robert Fulton নামক জনৈক আমেরিকান্ ভদ্রলোক সর্বপ্রথম জাহাজ ধ্বংস করিবার একপ্রকার অস্ত্র প্রদর্শন করান। একটি বারুদপূর্ণ নূতন রকমের আধার জলের মাঝে ফেলিয়া দিলে উহা কোনও জাহাজের গায়ে ধাক্কা লাগিলেই জাহাজ ধ্বংস হইয়া যায়। তিনি এই ধ্বংসযন্ত্রের নাম রাখিলেন Torpedo.

কিন্তু এই Torpedoর নানা ত্রুটি রহিয়া যায় এবং ইহা

জাহাজে লইয়া যাইতে বিশেষ অসুবিধা হইত। সুতরাং ইহার ব্যবহার বহুদিন পর্যন্ত ভালভাবে হয় নাই।

পরে ১৮৬২ খৃঃ অব্দে অষ্ট্রীয়ার নৌসামরিক কর্মচারী Captain Luppis একপ্রকার ভাসমান ও আপনা হইতেই জলে চলিতে পারে এইরূপ Torpedo প্রস্তুতের উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি এ বিষয়ে Robert Whitehead নামক জনৈক বৃটিশ ইঞ্জিনিয়ারের সাহায্য

Robert Whitehead দুই বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর অভিনব এক উন্নত প্রণালীর Torpedo নির্মাণ করিলেন। তিনি তাঁহার নিজের ও Captain Luppis এর নামানুসারে এই নব নির্মিত Torpedo র নামকরণ করিলেন Luppis-Whitehead Torpedo ইহার ওজন ৩০০ পাউণ্ড, জলের ভিতর ঘণ্টায় ৬ মাইল হিসাবে চলিতে সক্ষম। ইহার ইঞ্জিন ইহারই অভ্যন্তরস্থ কক্ষে সঞ্চিত Compressed Air দ্বারা চালিত হইবে। এবং ১৮ পাউণ্ড পর্যন্ত ডিনামাইটএর চার্জ ইহা বহন করিতে পারিবে।

কিন্তু Austrian Govt এই আবিষ্কারের স্বত্ব গ্রহণ না করায় ইহা বিদেশীর হাতে চলিয়া যায়।

আধুনিক Torpedoর জন্ম হয় এই Torpedo আবিষ্কারের পর হইতে।

অত্যাধুনিক ও অত্যুন্নত ধরণের Torpedo ঘণ্টায় ৩৬ মাইল বেগে ৭০০০-৮০০০ গজ যাইতে পারে। সুতরাং এখন অতি অল্প সময় লাগে একটি দুই এক মাইল দূরবস্থিত জাহাজকে ধ্বংস করিতে। ইহা ৫০০ পাউণ্ড অবধি Explosive Charge বহন করিতে সক্ষম। সুতরাং ইহার বিধ্বংসী শক্তি সহজেই অনুমেয়।

শ্রীমদনমোহন চট্টোপাধ্যায়

আমরা ঘুমাই কেন ?

একটা যন্ত্র—যেমন কতকগুলি কল-কব্জার সমষ্টি মাত্র, —তেমনি আমাদের শরীরও হৃদ্‌পিণ্ড, ফুসফুস, অস্থি, শিরা ও স্নায়ুরূপ কল-কব্জায় তৈরী। যন্ত্রটিকে যেমন অবিশ্রাম চালান যায় না—অন্ততঃ মাঝে মাঝেও তার চাই বিশ্রাম,—আমাদের শরীরও তেমনি অবিরাম অক্লান্ত পরিশ্রম করতে পারে না—বিশ্রাম প্রয়োজন, সেই বিশ্রামের একটা অঙ্গ হচ্ছে ঘুম।

সেই ঘুম আসে কেমন করে।

আমাদের শরীরের মধ্যে যে স্নায়ুগুলি রয়েছে তারা প্রতি নিয়তই কর্মব্যস্ত। তাদের বিরাম নেই—বিশ্রাম নেই। তাদের সেই কাজের ফলে আমাদের শরীরে কতকগুলি বিষ জন্মায় (Toxin)। সেই বিষ শরীরে জমতে জমতে এত বেশী হয়ে পড়ে যে, স্নায়ুকেন্দ্র (Nerve centre) গুলির যে স্তর আমাদের জাগ্রৎ অবস্থাকে সঠিক রাখে, এ তাদের অবশ করে ফেলতে চায়—সেই সময়ই আমরা ঘুমিয়ে পড়ি। অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে স্নায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়া দ্রুততর হয়ে ওঠে এবং তার ফলে ঐ বিষ অনেক বেশী জমে, তাই আমরা পরিশ্রান্ত হলে অত শীঘ্র ঘুমিয়ে পড়ি। যতক্ষণ সেই বিষ শরীরের মধ্যে থাকে ততক্ষণ আমাদের জেগে থাকা কঠিন হয়ে উঠে। ঘুমের সময় বিশেষ ঘুমের প্রথম অবস্থায় এই বিষগুলি শরীর থেকে অন্তর্হিত হয়, তাই আমরা জেগে উঠি ও চাঙ্গা বোধ করি।

মধু ঘোষাল—মুগকল্যান
গ্রাহক নং ২৬৯৬

শ্রীহট্ট থেকে শ্রীমান নবনীকুমার চৌধুরী জানতে চেয়েছেন—হায়দ্রাবাদের মিঃ রাজাউদ্দীন কি নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন ?

আহমদপুর থেকে শ্রীমান অশ্বিনীকুমার মণ্ডল জানতে চেয়েছেন—পাঠশালার ভাদ্রমাসের ধাঁধার রচয়িতা কে ?

কলিকাতার শ্রীমান উদয়ভানু সিংহ জানতে চেয়েছেন—'শিশু-সাহিত্যিক' কাহাদের বলে ?

এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার জন্য পাঠশালার গ্রাহক গ্রাহিকা ও পাঠক পাঠিকাদের অনুরোধ করছি

আশ্বিনের প্রশ্নোত্তরের জবাব দিয়েছেন পাঠশালারই জনৈক গ্রাহিকা। ভূত গোয়েন্দা তাকে সাদর অভিনন্দন জানাচ্ছে।

কার্ত্তিকের প্রশ্নোত্তরেরও জবাব দিয়েছেন পাঠশালার কয়েকজন গ্রাহক। ভূত গোয়েন্দা তাঁদেরও সাদর অভিনন্দন জানাচ্ছে।

মধু ঘোষাল—

'ভূত' অর্থে 'দেবযোনি' বিশেষকে বোঝায়। যেহেতু পাঠশালার সম্পাদক নরেন্দ্র দেব, সুতরাং তাঁর অনুচর যে গোয়েন্দা সে বেচারির ভূত হওয়াই স্বাভাবিক।

কালিদাস সাহা—

'সন' ও 'সাল' আরবিশব্দ। 'অব্দ' বিশেষ অর্থে বাংলা দেশে প্রচলিত হয়েছে মুসলমান বিজয়ের পর তার আগে এদেশে 'সম্বৎ' প্রচলিত ছিল।

শ্রীগ্রন্থাগারিক

ছেলেবেলা

রচয়িতা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রকাশক : বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য : ১৷৹ টাকা, বাঁধাই ২৲ টাকা, পৃঃ ৮৭, ছাপা বাঁধাই ও কাগজ উৎকৃষ্ট।

রবীন্দ্রনাথ আশীতে পদার্পণ করে ছেলেদের জন্য ছেলেমানুষ রবীন্দ্রনাথের কথা লিখেছেন। আশীবছর আগের কথা। সুতরাং এর মধ্যে আছে উনবিংশ শতাব্দীর প্রান্তিক দশকে কলিকাতা শহরের এক শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারের ঘরের ছবি। আর আছে সেই ছবির পটভূমিকায় আজকের বিশ্ববরেণ্য মহাকবির শৈশবের রূপটি। এ যে-কোনো একজন সামান্য লোকের সাধারণ জীবনের ছেলেবেলার কথা নয়, এ ছেলেবেলার কথা যার তিনি জগতের বিস্ময় ও শ্রদ্ধার পাত্র। পৃথিবীর বিদ্বজ্জন সমাজের পূজা এসে জড়ো হয়েছে যার চরণ মূলে। সেই পরম আশ্চর্য মানুষটির ছেলেবেলার কথা জানবার আগ্রহ শুধুই যে কেবল ছেলেদেরই আছে তাই নয়, ছেলেবুড়ো সকলেরই যে একান্তভাবে আছে একথা বলাই বাহুল্য। কবি আমাদের সেই কৌতূহল চরিতার্থ করেছেন তাঁর শৈশব জীবনের অজ্ঞাত লোকে আমাদের টেনে নিয়ে গিয়ে। যথার্থই তাঁর এই ছেলেবেলার কথা পাঠককে টেনে নিয়ে যায় বিস্মৃত অতীতের এমন এক পুরাতন পারিপার্শ্বিকী ও আবহাওয়ার মধ্যে যেখানে মোটর গাড়ী ছিল না, গ্যাসের আলো বা বিজলী বাতি ছিলনা, ট্রাম বাস্ ছিলনা। মেয়েরা সেমিজ পরতেন না, জুতো পায়ে দিতেন না, ঘোমটা না দিয়ে গুরুজনের সামনে বেরুতেন না—ঘেরাটোপে ঢাকা পালকি কিংবা বন্ধ গাড়ীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল তাঁদের গতিবিধি। পড়ার ঘরে জ্বলতো রেড়ীর তেলের প্রদীপ কিংবা সেজবাতি। স্কুল কলেজের বাড়াবাড়ি ছিল না, কেরানী বাবুদের তাড়াতাড়ি ছিল না। মানুষের অবসর ছিল অখণ্ড, জীবনে ছিল উপভোগের প্রাচুর্য। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই যুগের ছেলে। কেমন করে তাঁর দিন কাটতো, শিশু মনের কল্পলোকে হর্ষ ব্যথার দোলা দিয়ে যেত কী সব এলোমেলো ভাবনা, কোনদিকে ছিল তার প্রবণতা—কোথায় ছিল তার বিরোধ—সকল রহস্যেরই সন্ধান মেলে এই ছেলেবেলায়। কেমন করে ধীরে ধীরে কবির শিশু মন চলল শৈশবের গণ্ডী পার হয়ে আরও এগিয়ে বাল্যের সীমান্ত উত্তীর্ণ হয়ে পৌঁছল ক্রমে কৈশোরের কণক তোরণে, ছেলেবেলায় তার অতি চিত্তাকর্ষক কাহিনী অত্যন্ত সহজ স্বচ্ছ লঘু ভাষায় কবি আমাদের শুনিয়েছেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ

রচয়িতা : প্রফুল্লকুমার সরকার

প্রকাশক : শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী এণ্ড সন্স, ২০, ২১ ডি, এল রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য : ১৷৹ দেড় টাকা। পৃঃ ২০৪, ছাপা বাঁধাই ও কাগজ উৎকৃষ্ট।

স্বর্গীয় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যথার্থ ই বলেছিলেন—"বাঙ্গালী হৃদয়-অমিয় ছানিয়া নিমাই কভেছে কায়া—" শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমধর্ম মানব সভ্যতার ভাণ্ডারে বাঙালী জাতির এক শ্রেষ্ঠ দান। কিন্তু, অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে শ্রীগৌরাঙ্গের মহান জীবন ও পবিত্র চরিত্রের সঙ্গে আমাদের ছাত্র সমাজের কোনো পরিচয় নেই। তরুণ ও যুবকেরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সম্বন্ধে অনেকটা অজ্ঞ ও উদাসীন বললেও অত্যুক্তি হয় না। প্রফুল্লবাবু দেশের ছেলেমেয়েদের জন্য শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর জীবনকথা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করে তাদের একটা মস্ত সুযোগ দিয়েছেন এই মহাপুরুষকে বিশেষভাবে জানবার। প্রফুল্লবাবুর রচনার মধ্যে ভক্ত ও কবির কল্পনার আতিশয্য ও অতি প্রাকৃত বর্ণনা নেই। ঐতিহাসিক সত্যের ভিত্তির উপর শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকে তিনিই বোধ হয় এই সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা শ্রী গৌরাঙ্গ জীবনীকে সার্থক ও সুন্দর করে তুলেছে।

নাগরিকা

রচয়িতা : চরণদাস ঘোষ

প্রকাশক : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য : ১৷৹ দেড় টাকা। পৃঃ ১৪৯, ছাপা বাঁধাই ও কাগজ উৎকৃষ্ট।

চরণদাসবাবু সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত। পাঠশালায় তাঁর একাধিক রচনা প্রকাশিত হ'য়েছে। 'মর্তের মা' 'দান' 'কামরূপ' প্রভৃতি একাধিক উপন্যাসে তিনি যে, নিপুণ কথাশিল্পীর লিপি কৌশলের পরিচয় দিয়েছিলেন 'নাগরিকা' তাঁর সে গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখবে। গল্পটি ইতিপূর্বে যখন ভারতবর্ষের ন্যায় একখানি শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রে ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছিল তখনই এর কাহিনীর নূতনত্ব ও ভাষার অভিনবত্ব সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। চরণবাবুর রচনার বিশেষত্বই এই যে তা মামুলী ধরণের গতানুগতিক ব্যাপার নয়। নাগরিকায় আমরা পাই বৌদ্ধযুগের একটি বিচিত্র কাহিনী যার সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এক অপূর্ব রহস্যে বিজড়িত। কৌমুদী ও চিত্রা দুটি নারী দুই বিভিন্নরূপে দেখা দিয়ে আমাদের চমক লাগিয়ে দেয়। দুজনেই তেজস্বিনী—দুজনেই মনোহারিণী—কিন্তু উভয়ের চরিত্রের কী অদ্ভুত পার্থক্য। নগরের শ্রেষ্ঠীকুমার সুদর্শন তরুণ কঙ্কণ, যাঁর মুখে পদ্মের পবিত্র প্রভা, চোখে চাঁদের আলো, দেহে রবির রূপ— তিনি গেলেন—যৌবনে প্রব্রজ্যা নিয়ে বৌদ্ধ মন্দিরে ভিক্ষু সন্ন্যাসী হয়ে। আর তাঁরই জন্য হ'ল সুন্দরী সুকুমারী চিত্রা নগরের শ্রেষ্ঠ 'নাগরিকা।' এমন চিত্তাকর্ষক কাহিনী বাংলা সাহিত্যে অতি অল্পই চোখে পড়ে।

—গতমাসের খবর—

পাঠশালার লেখক-লেখিকা গ্রাহক-গ্রাহিকা ও পাঠক-পাঠিকা সকলকে আমাদের ৺বিজয়ার শুভ-ইচ্ছা ও সাদর অভিবাদন জানাচ্ছি। যে সকল স্নেহাস্পদ বন্ধুরা পত্র লিখে আমাদের প্রীতি-নমস্কার জানিয়েছেন তাঁদের সকলকে আমাদের প্রতি-নমস্কার ও ভালবাসা জানাচ্ছি। পাঠশালা তাঁদের স্নেহ ও সহানুভূতি পেয়ে ধন্য ও গৌরব বোধ করছে। শ্রীভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তাঁরা সকলে সুস্থ দেহে মনে সুখে থাকুন।

* * *

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের আরোগ্য সংবাদে বাংলাদেশ দুশ্চিন্তামুক্ত হ'তে না হ'তেই 'বিশ্বভারতী' প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ কর্মীর অকালে আকস্মিক পরলোক গমনে সকলেই আমরা একটা দুঃখ ও সমবেদনা বোধ করছি। একবৎসরের মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠানের এতগুলি কর্মীর মৃত্যু শুধু যে গভীর শোকাবহ তাই নয়, অত্যন্ত ক্ষতিকরও বটে। স্বর্গীয় কালীমোহন সেন, মহামতি এণ্ডুজ, অমিতা দেবী এঁদের শোক প্রশমিত হ'তে না হ'তে বিশ্বভারতী গ্রন্থ-প্রকাশ বিভাগের কর্ণধার কিশোরীমোহন সাঁতরা এবং শ্রীনিকেতনের প্রাণ গৌরগোপাল ঘোষের অকাল মৃত্যু একান্ত মর্মান্তিক। আমরা এই দুই পরলোকগত বন্ধুর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।

* * *

দেশ-প্রেমিক, ভারতের শ্রদ্ধেয় নেতা ও কংগ্রেসের প্রধান কর্মী শ্রীযুক্ত জহরলাল নেহেরুর চার বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে কেবলমাত্র ভারতবর্ষই নয়, পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যদেশের শিক্ষিত-সমাজও বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়েছেন। বিলাতের পার্লিয়ামেণ্টে এ সম্বন্ধে ভারত সচিবকে নানা প্রশ্ন করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি কোনো সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নি। আশা করি কারা-প্রাচীরের অন্তরালে গিয়ে স্বাধীনচেতা জহরলাল তাঁর পরাধীন জীবনের গ্লানি কতকটা ভুলে থাকতে পারবেন।

* * *

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট তৃতীয়বারের জন্য আমেরিকা যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হয়ে একটা নূতন কীর্তি রাখলেন। ইতিপূর্বে আমেরিকার আর কোনো প্রেসিডেণ্টই তৃতীয়বারের জন্য নির্বাচনে দাঁড়াতে সাহস করেন নি। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট্ একজন সাহসী পুরুষ এবং গণতন্ত্রের একনিষ্ঠ সেবক। রাষ্ট্রপতি পদে এসময় তাঁর নির্বাচন বিপন্ন ব্রিটেনের বুকে সাহস ও শক্তি এনে দিলে। কারণ, রুজভেল্ট্ গ্রেট ব্রিটেনের অকৃত্রিম বন্ধু।

* * *

দেশ-গৌরব সুভাষচন্দ্র বসু কারাভ্যন্তর হ'তে দিল্লীর কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র-পরিষদের সভ্য হবার জন্য নির্বাচন প্রার্থী হয়েছিলেন। আরও চার পাঁচজন যোগ্য ব্যক্তিও এই নির্বাচনে নেমেছিলেন, কিন্তু, কারারুদ্ধ দেশ-সেবকের প্রতি সম্মান ও সহানুভূতিবশে তাঁরা সকলেই সুভাষবাবুর পক্ষে নিজ নিজ নির্বাচনের আবেদন প্রত্যাহার করেন। ফলে, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সুভাষবাবুই কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয়-পরিষদের সভ্য নির্বাচিত হয়েছেন। আমরা তাঁকে এবং যাঁরা তাঁর স্বপক্ষে নির্বাচন থেকে অবসর নিয়েছেন তাঁদেরও সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাচ্ছি।

* * *

ব্রিটেনের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেন সাহেবের মৃত্যুতে আজ এমন একজন শক্তিমান পুরুষ পৃথিবী থেকে চলে গেল যিনি অকৃত্রিম ও অকপট অন্তরে শান্তিকামী ছিলেন। তিনি নিজের মান-মর্যাদার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে মিউনিক-চুক্তির জন্য জার্মানিতে ছুটেছিলেন বলেই—ইংলণ্ড আজ শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবার সুযোগ ও সময় পেয়েছে এবং সফলও হয়েছে। স্বর্গগত চেম্বারলেনের কাছে ব্রিটেনের এ-ঋণ চির অপরিশোধনীয়।

* * *

কবিশেখর কালিদাস রায়ের সুযোগ্য জামাতা ময়ূরভঞ্জ বারিপদ বিদ্যালয়ের সুপণ্ডিত শিক্ষক, পাঠশালার নিয়মিত লেখক সুসাহিত্যিক জগৎমোহন সেন বি-এ মহাশয়ের আকস্মিক পরলোকগমনে আমরা মর্মাহত হয়েছি। তিনি মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে পাঠশালার পূজা-সংখ্যার জন্য একটি সুন্দর রচনা পাঠিয়েছিলেন। আমরা স্থানাভাবে এখনও তা পত্রস্থ করতে পারি নি বলে দুঃখিত। ভগবান তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দিন।

অগ্রহায়ণ—১৩৪৭

নিয়মাবলী—(১) ধাঁধাঁ-সম্পাদকের মতে শব্দসন্ধানের যেটি সবচেয়ে নির্দোষ ও নির্ভুল সমাধান,—তার সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে উত্তর মেলা চাই। নির্ভুল সমাধানটি পরের মাসের পাঠশালায় প্রকাশিত হবে। (২) সাদা ঘরগুলির প্রত্যেকটিতে একটি ক'রে সংযুক্ত বা অসংযুক্ত অক্ষর বসবে। (৩) প্রতি সংখ্যার প্রতিযোগিতা-কুপনখানি কেটে ভর্তি ক'রে পাঠাবে সেই মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে। দেরি হ'লেই বাতিল। খামের উপরে ঠিকানা লিখবে—"শব্দ-সন্ধান" পাঠশালা কার্যালয়, ৩০ কর্ণওআলিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। (৪) হরফগুলি সব পরিষ্কার হওয়া চাই—কাটাকুটি চলবে না। বানান ভুল হলে ভুল ধরা হবে। (৫) যে কোন পাঠক পাঠিকা যতগুলি ইচ্ছা কুপন পাঠাতে পারবে। (৬) 'শব্দ-সন্ধান'-সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ব'লে মেনে নিতে হবে।

সঙ্কেতসূত্র

—পাশাপাশি—

১। স্বদেশের সেবায় যে বিশ্ব-বিখ্যাত দেশপ্রেমিক এই অষ্টমবার কারাবরণ করলেন।

৫। পুষ্প-পরাগ।

৮। পুণ্যবানেরা এর ভয়ে সতত অস্থির, কিন্তু পাপীরা একে একটুও ভয় করেনা।

৯। এ সম্বন্ধ যাদের মধ্যেই ঘটে তারাই দেখা যায় পরস্পরের ঘোরতর বিরোধী হয়ে ওঠে।

১০। অনেক লোককেই এ রকম এক কথায় বোঝানো যায়।

১১। ধার্মিক বলে এর প্রসিদ্ধি আছে।

১২। এ সকলেই শুনতে পায়, অবশ্য যদি বধির না হয়

১৩। উল্টে পাল্টে দেখলে এর মধ্যেই সপ্তকাণ্ড পাওয়া যাবে।

১৫। পাঠশালার কবিতা প্রতিযোগিতায় ইনি পুরস্কার পাবার যোগ্যতা দেখাতে পারবেন।

১৬ কালিদাস বলেন এই ফুলের অঞ্জলি দিয়েই নির্বাসিত যক্ষ আষাঢের নবীন মেঘের অর্চনা করেছিলেন।

১৮। এ যার সঙ্গে মেশে সম্প্রদায়ে ঠিক তার মতই হয়ে ওঠে!

১৯। এর মধ্যে চোরাই মাল লুকানো আছে।

২২। বেকার লোকের এ হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

২৪। সুগ্রীবের ভ্রাতুষ্পুত্র।

২৫। তলোয়ারের বাঁট

২৭। ধৈবতের ডবল পর্দা

২৮। এ মারতে পারলে ভাল শিকারি না হ'তে পারো, ভাল কেরানী হতে পারবে।

২৯। বৈষ্ণব কবিরা 'বহিলাম' কথাটাকে এমনিতর রূপ দিয়েছেন নানাস্থানে।

৩০। সিপাহী বিদ্রোহের জন্য এর নাম বাংলাদেশে আজও বিখ্যাত হয়ে আছে।

—উপর নীচে—

১। Labour-Leader।

২। মহাদেবী

৩। সবচেয়ে বড় ডিম হয় এই পাখীর।

৪। স্ত্রীলোকের চূর্ণকুন্তল এলোমেলো হ'য়ে পড়েছে।

৫। নাগরাজের মৃদঙ্গ এখানে অবিন্যস্ত ভাবে রয়েছে।

৬। এখানে বিশ্রাম লাভের জন্য নির্মিত লতাগৃহটি যথাক্রমে রক্ষিত নয়।

৭। এখানে গাছের ছাল উল্টানো দেখতে পাবে।

১১। এ যার নেই সে কপর্দকশূন্য।

১৪। কেশকীট এখানে ঊর্ধ্বপুচ্ছ।

১৫। এ অতি শিশু।

১৭। আকাশ

২০। মোহনলাল ও মীরমদনের আগে ইনি ছিলেন একজন সুদক্ষ বাঙালী সেনাপতি।

২১। সহযোগী

২৩। এ যে ছেলের নেই তার পক্ষে পাঠশালার পরীক্ষাও উত্তীর্ণ হওয়া কঠিন।

২৪। হাতীর শুঁড়

২৬। এই জাতের জন্মস্থান নির্দিষ্ট নেই। জলে জন্মালে হয় জলজাত, মাটিতে জন্মালে হয় ভূমিজাত।

২৮। যিনি আপনার গুণে সকলের সম্ভ্রমের পাত্র হয়ে ওঠেন।

আশ্বিন, কার্তিকের শব্দ-সন্ধানের ফলাফল

এ বছর পাঠশালার শব্দ-সন্ধানের উত্তরে পাঠক পাঠিকারা বেশ সতর্কতার পরিচয় দিয়েছেন। যাদের একটি-মাত্র ভুল হয়েছে তাঁরা আর একটু সাবধানী হ'লে নির্ভুল উত্তর দিতে পারতেন নিশ্চয়। যেমন, আশ্বিনে পাশাপাশি সংকেতসূত্র ২৫নংরে ছিল 'চিন্তা'। চিন্তা মানুষের মনেই উৎপন্ন হয় সুতরাং ২৫নংরের উত্তর হওয়া উচিত 'মনজা' অর্থাৎ যা মনে জন্মায়। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে মাত্র শ্রীমান শশাঙ্ক শেখর বসু ছাড়া আর কেউ 'মনজা' লিখতে পারেননি। সবাই লিখেছেন—'মনন'। আবার পাশাপাশি ৭নং সূত্রে 'মন না মতি'র স্থানে অধিকাংশই লিখেছেন 'মন', কিন্তু 'মতি'টাই যে এখানে হবে এটুকু সুমতি তাঁদের থাকা উচিত। কার্তিকের 'শব্দ-সন্ধানে'ও একটি ভুলের জন্য যারা পুরস্কার পেলেন না তাঁরা উপর নীচে সংকেতসূত্র ২০নংএ 'রশ্মির' পরিবর্তে লিখেছেন 'রবি'। সংকেতসূত্রে আছে "অপরাপর গ্রহের সঙ্গে পৃথিবীর ব্যবধানের মধ্যে এ যেন সেতুস্বরূপ।" এর উত্তর যদি 'রবি' হয়, তাহলে 'চন্দ্র'ই বা নয় কেন? 'তারা'ই বা নয় কেন? 'র' অক্ষরটি দেওয়া আছে দেখেই আর বেশী কিছু না ভেবে তাঁরা 'রবি' করেছেন বোঝা যাচ্ছে। অনেক সময় অক্ষর বসিয়ে সমাধান-কারিদের প্রলুব্ধ করা হয় ভুল শব্দ নির্বাচনে। এ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে 'শ-র'র সে চেষ্টা সফল হয়েছে! আসলে সেতু হ'ল 'রশ্মি' বা আলোক। অগ্রহায়ণে সমাধানকারীরা আশা করি অধিকতর সতর্ক হবেন। 'শ-র'

আশ্বিন ১৩৪৭

নির্ভুল উত্তর

শশাঙ্কশেখর বসু, ২ সুবরবন স্কুল রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

শব্দ-সন্ধানের নির্ভুল উত্তরের জন্য পাঁচটাকা পুরস্কার ইনিই পাবেন।

এক ভুল

"ফুংচুং", কলিকাতা।

দুই ভুল

অশ্বিনীকুমার মণ্ডল, বীরভূম, গোরা ঘোষ, ব্যাঙ্গালোর, শশাঙ্কশেখর বসু, কলিকাতা।

নির্ভুল সমাধান—আশ্বিন ১৩৪৭

তিন ভুল

অমলকুমার দত্ত ও কুমারী নীলিমা দত্ত, কলিকাতা, উদয়ভানু সিংহ, ঐ, মধুব্রাদার্স এণ্ড সিস্টার্স, মৃগকল্যাণ, রাধারমণ ধর, হুগলী, "লতা", বারাকপুর, লিলিস্যামুয়েল, ঐ, হরিকমল পুরকায়স্থ, শিলং, শিশিরকুমার সেনগুপ্ত, কলিকাতা, স্বাহা দেবীরায়, রংপুর।

চার ভুল

উমা বাগচী, বায়পুর, সি, পি, উষারাণী মুখোপাধ্যায়, গোরক্ষপুর, কণিকা মুখোপাধ্যায়, ঐ, কৃষ্ণপদ পাল, ঢাকা, দিলীপকুমার সেন, কলিকাতা, পপি বসু, পটুয়াখালি, বীরেন্দ্রনারায়ণ সরকার, ফরিদপুর; মিনা, অজু ও খোকন, সাহারাণপুর।

পাঁচ ভুল

অণিমা দেবী, উত্তর পাড়া, নীতীশরঞ্জন দে, ঢাকা, পবিত্র রায়, জামসেদপুর, পার্বতীশঙ্কর মুখার্জি, বীরভূম, মৃন্ময়ী দাসী, দেওঘর, মহামায়া সাহিত্যমন্দির, বৈদ্যবাটী, শর্মিষ্ঠা সরকার, নিউদিল্লী, শেফালিকা সেন, বৈদ্যবাটী।

কার্তিক ১৩৪৭

নির্ভুল উত্তর

গীতা ও বাদল পালিত, C/o S N Palit Esqr, Subjudge Assansole

নির্মলচন্দ্র বসু, ১৫ নারকেলবাগান লেন; আমহার্স্ট স্ট্রীট কলিকাতা।

শব্দ সন্ধানের নির্ভুল উত্তরের জন্য পাঁচটাকা পুরস্কার এঁদের মধ্যে সমান অংশে ভাগ করে দেওয়া হবে। **শ-র**

নির্ভুল সমাধান—কার্তিক, ১৩৪৭

একটি ভুল

অণিমা চৌধুরী, ঠিকানা নাই, কৃষ্ণপদ পাল, মুন্সিগঞ্জ, পবিমল চক্রবর্তী, কলিকাতা, শেফালিকা সেন, বৈদ্যবাটী, মহামায়া সাহিত্য-মন্দির, বৈদ্যবাটী।

দুই ভুল

অণিমা দেবী, উত্তরপাড়া, উদয়ভানু সিংহ, কলিকাতা, উমা বাগচী, রায়পুর, সি পি, গৌরাঙ্গচন্দ্র মাইতি, মেদিনীপুর, জাপু, টুলু, বুলা, দিলু ও রেবা, কলিকাতা, নীরদচন্দ্র রায়, রাজসাহী, "শিশি-বোতল", ব্যাঙ্গালোর, শ্মশানেশ্বর বোঁডার, বর্দ্ধমান।

তিন ভুল

অমলকুমার দত্ত ও নীলিমা দত্ত, কলিকাতা, অমলকুমার মুখোপাধ্যায়, ঐ, অরুণকুমার বাগচী, শ্রীরামপুর, অশ্বিনীকুমার মণ্ডল, বীরভূম, আপ-টু-ডেট্ ক্লাব, রাণাঘাট, দেবব্রত সিংহ, কলিকাতা, পাঁচুগোপাল বসু, বারাসাত, মঞ্জু, সঞ্জু ও মায়া, কলিকাতা, মায়া ও রুণু দাশগুপ্তা, ঐ, মৃণালকান্তি গুপ্ত, সৈয়দপুর, রাধারমণ ধর, হুগলি, হারকমল পুরকায়স্থ, শিলং, 'শক্তি সঙ্ঘ', কোন্নগর; শিশিরকুমার সেনগুপ্ত, কলিকাতা শেফালিকা সেন, বৈদ্যবাটী, স্বাহা-দেবী রায়, রংপুর।

চার ভুল

নিরঞ্জন রায় চৌধুরী, টাঙ্গাইল।

পাঁচ ভুল

শচীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, গোরক্ষপুর, বিশ্বনাথ ও বৈদ্যনাথ সিংহ, বেলফুলিয়া, "ভূদেব গণ্ডা ছাপিয়ে গেল," মুগকল্যান, লিলি স্যামুয়েল, ব্যারাকপুর, সন্ধ্যা মুখার্জি, এলাহাবাদ।

পাঁচ ভুলেরও অধিক যাদের,
নামটি ছাপা হয়নি তাঁদের।
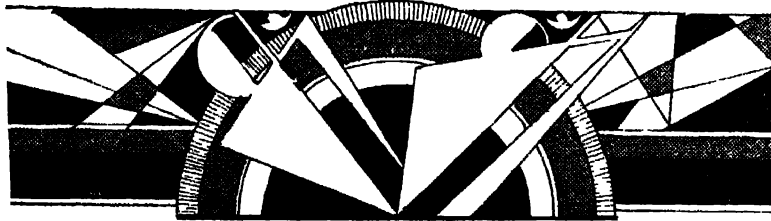
১৬৩৯৩৪৪২৬২২৯৫০৮১৯৬৭২১৩০১১৪৭৫৪০৯৮৩৬০৬৫৫৭৩৭৭০৪৯১৮০৩২৭৮৭ এই বিরাট সংখ্যাটিকে ৭১ দিয়ে গুণ করতে হবে এক সেকেণ্ডের মধ্যে। কী উপায়ে করা যায় বলতে পারো?

আশ্বিন ও কার্তিকের ধাঁধাঁর সঠিক উত্তর একজনও দিতে পারেন নি। এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। কার্তিকের ধাঁধাঁর উত্তরে আহমদপুরের অশ্বিনী মণ্ডল এবং জব্বলপুরের কুমারী নীহার বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকটা কাছাকাছি যেতে পেরেছেন কিন্তু সম্পূর্ণ বানানটি বলতে পারেন নি। পাঠশালার সেই গ্রাহকটি USAGE শব্দটির বানান বলেছিলেন—YOWZITCH আশ্বিনের ধাঁধাঁর উত্তরে তোমরা জেনে রাখো পৃথিবী শুদ্ধ লোক ধরবার জন্য খুব বড় ঘর দরকার হবে না। একখানি ঘর যদি দৈর্ঘ্যে মাত্র আধ মাইল ও প্রস্থেও মাত্র আধমাইল এবং উচ্চতায়ও মাত্র আধ মাইল হয় তাহলেই পৃথিবীর সমস্ত লোক সপরিবারে তার মধ্যে থাকতে পারবে। কেন জান? ঐ ঘরখানির আয়তন হবে ১৮৩৯৯৭৪৪০০০ বর্গ ফুট। এখন পৃথিবীর প্রত্যেক নরনারী ও বালক বালিকার জন্য যদি গড়পড়তা ৬ ফুট উচ্চ ২ ফুট চওড়া আর এক ফুট গভীর স্থান দরকার হয় তাহলেও এই ঘরে দেড়শো কোটীর বেশী লোকের স্থান হবে। পৃথিবীর লোক সংখ্যা কত? আগে ত দেড়শ কোটীর বেশী ছিল না। এখন না হয় দুশো কোটী। তাহলেও ধরবে, তবে একটু ঠাসাঠাসি গাদাগাদি হবে।

রচনা প্রতিযোগিতা

(নিয়মাবলী ও পুরস্কারের জন্য আশ্বিন ১৩৪৭শের পাঠশালা ৬৪ পৃঃ দেখ)

পাঠশালার গ্রাহক গ্রাহিকাদের মধ্যে যে কেউ তাদের 'জন্মভূমি'র উপর সর্বোৎকৃষ্ট কবিতা লিখে পাঠাতে পারবে তাকে আশ্বিনের পাঠশালার ৬৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত পুস্তক তালিকার মধ্যে যে কোনো দুখানি বই তার পছন্দ ও ইচ্ছানুযায়ী সাদরে উপহার দেওয়া হবে। পুরস্কার প্রাপ্ত কবিতাটি পৌষের পাঠশালায় মুদ্রিত হবে। ১৫ই অগ্রহায়ণের মধ্যে কবিতাটি পাঠশালা অফিসে পৌছে দেওয়া চাই।

আশ্বিনের "প্রবন্ধ" প্রতিযোগিতায় যে কটি প্রবন্ধ পাওয়া গেছে তার একটিও ঠিক পুরস্কার পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। তবে এরই মধ্যে বঙ্কিমদাশ গুপ্তের রচনাটিকে সুসংস্কৃত ও যথাসম্ভব সম্পূর্ণ করে নিয়ে পাঠশালায় প্রকাশ করা হবে।

কার্তিকের "গল্প" প্রতিযোগিতায় যতগুলি গল্প এসেছিল তার মধ্যে পুরস্কার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে, দিল্লীর কুমারী শর্ম্মিষ্ঠা সরকারের রচিত "সুহাসের সংসার" শীর্ষক ছোট্ট গল্পটি। পৌষের পাঠশালায় এই গল্পটি ছাপা হবে। ইতিমধ্যে কুমারী শর্ম্মিষ্ঠা কি কি দু'খানি বই চান আমাদের জানালে আমরা তাঁকে বই দু'খানি পাঠাবার ব্যবস্থা করবো। আমাদের অফিসে তাঁর পরিচিত কলিকাতাবাসী কাউকে পাঠালে তাঁকে আর ডাক ব্যয় বহন করতে হবেনা। সেই লোকের হাতে পত্র লিখে পাঠালে তাঁকেই দেওয়া হবে।

শারদোৎসবের আনন্দ মেলা

মনের কথা বলে দেওয়া।

কার্তিকের পাঠশালার যে কোনো একটি পাতা খুলে উপরদিকের প্রথম দশ লাইনের মধ্যে যে কোন একটি লাইনের প্রথম আরম্ভের দিক থেকে দশটি শব্দের মধ্যে যে কোনোও একটি শব্দ যারা মনে মনে বেছে ঠিক করে লাল নীল পেন্সিলের দাগ দিয়ে রেখেছো তারা যে পৃষ্ঠা খুলেছিলে সেই পৃষ্ঠার পত্রাঙ্ক সংখ্যা যত তাকে দ্বিগুণ করে নাও, তারপর সেই গুণফলকে আবার ৫ দিয়ে গুণ করো, তারপর সেই গুণফলের সঙ্গে ২০ যোগ করো, তারপর যে লাইনের শব্দটি দাগ দিয়ে রেখেছ সেই লাইনের সংখ্যাটি অর্থাৎ উপর থেকে এক দুই করে গুণে যে সংখ্যায় তোমার নির্বাচিত শব্দযুক্ত লাইনটি পড়ে সেই সংখ্যাটি তাতে যোগ দাও, তারপর আবার তাতে ৫ যোগ দাও এবং সেই যোগফলকে দশ দিয়ে গুণ করো। তারপর যে শব্দটিতে দাগ দিয়ে রেখেছ তার সংখ্যাটিও অর্থাৎ লাইনের সুরু থেকে এক দুই করে শব্দ গুণতে গুণতে যে সংখ্যায় তোমার চিহ্নিত শব্দটি পড়বে সেই সংখ্যাটিও শেষের গুণফলের সঙ্গে যোগ দাও, তারপর সেই যোগফল থেকে ২৫০ আড়াইশ সংখ্যা বাদ দাও। বাদ দেবার পর যে অঙ্ক বাকি থাকবে তার মধ্যে ঠিক পর পর সাজানো রয়েছে দেখতে পাবে পাঠশালার যে সংখ্যক পৃষ্ঠা খুলে যে সংখ্যক লাইনের যে সংখ্যক শব্দটি তুমি মনে করেছিলে। দেখে অবাক হয়ে যেওনা। জেনো এ 'ভূতো গোয়েন্দা'র অসাধ্য কিছু নেই।

ভূঃ গোঃ

অঙ্ক ক্রীড়া নয়—অক্ষর ক্রীড়া

আশ্বিনের অক্ষর ক্রীড়ার সঠিক উত্তর দিয়েছেন আহমদপুরের শ্রীমান অশ্বিনীকুমার মণ্ডল। 'TELEGRAPH' শব্দটির অক্ষরগুলির সাহায্যে তিনি নূতন শব্দ তৈয়ারী করেছেন 'GREAT-HELP'। অশ্বিনীকুমারের বাহাদুরী আছে। কার্ত্তিকের অক্ষরক্রীড়ার সঠিক উত্তর দিতে পেরেছেন ছ'জন "NO MORE STARS" বাক্যটির অক্ষরগুলি নিয়ে তাঁরা একটি শব্দ তৈরী করতে পেরেছেন "ASTRONOMERS" এই সব বাহাদুর ছেলেমেয়েদের নাম ঠিকানা দিলুম, তোমরা যারা উত্তর দিতে পারোনি তারা আলাপ করো এ'দের সঙ্গে, অনেক কিছু শিখতে পারবে।

অশ্বিনীকুমার মণ্ডল, আহমদপুর। অণিমা চৌধুরী, কুন্তোর। উদয়ভানু সিংহ, কলিকাতা। উমা বাগচী, রায়পুর সি-পি। নীহার বন্দ্যোপাধ্যায়, জব্বলপুর; সি-পি। শক্তিসত্ত্ব, কোন্নগর।

অগ্রহায়ণের ১৫ই তারিখের মধ্যে লিখে পাঠাও 'LAWYERS' কথাটির অক্ষরগুলি নিয়ে আর একটি নূতন কোনো শব্দ বা বাক্য।

Printer and Publisher R Bhattacharya, Prabhu Press, 30, Cornwallis Street, Calcutta.

"শব্দ-সন্ধান"

(প্রতিযোগিতা কুপন)

(যে কোনো পাঠক বা পাঠিকা এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারেন, এবং যতগুলি ইচ্ছা কুপন পাঠাতে পারেন)
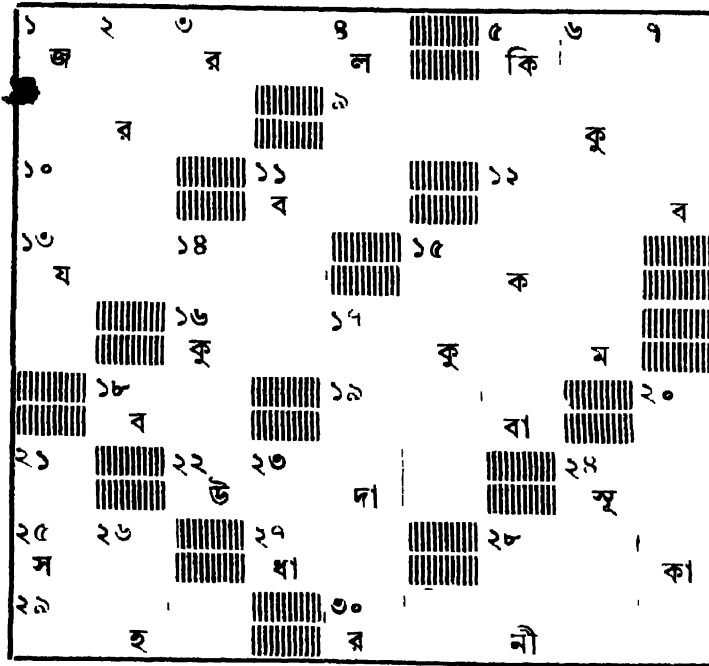
(পাঠশালা, অগ্রহায়ণ)

নাম... ... .

ঠিকানা ....

....

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আগামী **১৫ই** অগ্রহায়ণের মধ্যে কুপনখানি পাঠশালা-কার্যালয়ে পৌঁছনো চাই।

☞ (কুপনে কোনো কাটাকুটি বা বানান ভুল চলবে না।)

নিয়মাবলী

"পাঠশালা" প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয়।

আশ্বিন মাস থেকে পাঠশালার বর্ষারম্ভ।

লেখা ও ছবি প্রতিমাসে অন্তত ৫৬ পৃষ্ঠা থাকবে, আকার ডবল ক্রাউন ৪ পেজি।

বার্ষিক মূল্য মণি অর্ডারে পাঠাইলে তিন টাকা। ষাণ্মাসিক দেড় টাকা। ভি পিতে বার্ষিক মূল্য ৩।০ তিন টাকা চারি আনা। ষাণ্মাসিক ভি পি করা হইবে না।

নগদ মূল্য প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা।

নমুনার জন্য পাঁচ আনার ডাকটিকিট পাঠাইবেন।

মফঃস্বলের গ্রাহকগণ প্রকাশকের ঠিকানায় মনিঅর্ডারযোগে টাকা পাঠাবেন। শহরের গ্রাহকগণও ঐ ঠিকানায় টাকা জমা দিবেন।

মাসের প্রথম সপ্তাহে কাগজ না পেলে ডাকঘরের জবাব সহ ১৫ই তারিখের মধ্যে জানা'লে আর এক কপি দেওয়া হবে।

ডাকটিকিট দেওয়া থাকিলে অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠানো হবে। চিঠির উত্তর রিপ্লাইকার্ড পেলে দেওয়া হবে।

বিজ্ঞাপনের হার

কভারের প্রথম পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন নেওয়া হয় না।

ঐ দ্বিতীয় ও তৃতীয় পৃষ্ঠা	২৫৲ হিঃ
ঐ চতুর্থ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন	৫০৲
বিজ্ঞাপনের প্রথম পৃষ্ঠা	২২৲
পুস্তকারম্ভের পূর্ব পৃষ্ঠা	২৫৲
সূচীর পার্শ্বে অর্ধ পৃষ্ঠা	১৫৲
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	২০৲
ঐ অর্ধ পৃষ্ঠা	১২৲
ঐ সিকি পৃষ্ঠা	৭৲

ঐ সিকি পৃষ্ঠার কম বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে না।

রচনার মধ্যে বিজ্ঞাপন	৫০৲

বিজ্ঞাপন পরিবর্তন ক'রতে হ'লে পূর্বমাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে পাঠা'তে হবে।

বিজ্ঞাপন বন্ধ ক'রতে হ'লে একমাস পূর্বে নোটিশ দেওয়া দরকার।

নূতন বিজ্ঞাপন পূর্বমাসের ২০শে তারিখ পর্যন্ত নেওয়া হবে।

এক বৎসরের জন্য বিজ্ঞাপন দিতে চুক্তিবদ্ধ হ'লে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে।

প্রকাশক—**রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য**

পাঠশালা কার্যালয়

৩০, কর্নওআলিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা PHONE—B. B 4099

প্রাপ্তিস্থান—সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

চতুর্থ বর্ষ] পৌষ—১৩৪৭ [চতুর্থ সংখ্যা

প্রাতঃপ্রণাম

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

(শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম)

পূব-গগনে ফুট্‌ল রঙ
নভের নীল।
পৃথ্বী-বুকে খুল্‌ল কে যে
প্রাণের খিল।
নবীন আশার নূতন তানে
আজ কি স্বপন-মায়া আনে,
ডুবল রঙিণ রঙের স্নানে
পাহাড় ঝিল্‌,
পথের পাশে সবুজ ঘাস
দুল্‌ল দিল।

এখন তুমি চরণ ফ্যালো
আস্তে ধীরে,
প্রভাত-পূজা-আয়োজন এ
বিশ্ব ঘিরে।
ফুল পাতা ও দূর্বা পাশে
একটি কেবল নতি ভাসে,
ঐ যে নীরব মন্ত্র আসে
বাতাস চিরে।
এখন রাখ মাটির 'পরে
চরণ ধীরে।

এখন ও-ভাই কণ্ঠ যেন
না কয় বাণী।
লতায় পাতায় উদয় উষার
প্রণাম খানি।
ভোরের পাখির কণ্ঠমাঝে
পূজার বোধন-গীতি বাজে,
নিখিল ভুবন ভক্তি সাজে
যুক্তপাণি,—
এখন ও-ভাই থামাও সবাই
কণ্ঠবাণী।

এখন কেবল একটি রাখো
নীরব নতি
রঙের ঢেউয়ে যেথায় চুনি
পান্না মোতি,
ঐ যেখানে দূর্বাদলে
হাজার শিশির-বিন্দু ঝলে,—
ধূলার থেকে জুঁই কমলে
যাঁহার গতি
চরণ তলে তাঁহার রাখো
একটি নতি।

সর্ব-বিদ্যা

রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম-এ

বৈদ্যহাটীর ভট্টাচার্যদের উপাধি ছিল 'সিদ্ধান্ত'। রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত তাঁহার সময়ে সিদ্ধান্ত পাড়ার মধ্যে একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার বিদ্যা ছিল অসাধারণ, বিষয়বুদ্ধিও ছিল প্রখর। জীবদ্দশায় তিনি অনেক শিষ্য সেবক করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অবর্তমানে সংসার অচল হইয়া উঠিল।

বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী তাঁহার একমাত্র পুত্রকে লইয়া অতি কষ্টে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। শিষ্য যজমান প্রায় সকলেই একে একে সরিয়া পড়িয়াছেন। কারণ গুরুপুত্রটি লেখাপড়া কিছুই শেখেন নাই—সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান অতি কম। মাতা তাঁহাকে দিয়া কোনও কাজই করাইতে পারেন না। কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলে 'আমি কি জানি?' ব্রাহ্মণী এই অসহায় বিদ্যাবুদ্ধিহীন পুত্রকে লইয়া চারিদিক আঁধার দেখিলেন।

সংসারের একমাত্র অবলম্বন পুরাতন মাইন্দের, ফকির। ফকির কোনওরূপে কলা কচু রোপণ করিয়া বাজার বেসাতি করিয়া সংসারকে এ পর্যন্ত চালু রাখিয়াছে। কিন্তু সেও বৃদ্ধ হইয়া পড়িতেছে, আর বেশী খাটিতে পারে না।

ব্রাহ্মণী একদিন নিরুপায় হইয়া পুত্র নিরঞ্জনকে বলিলেন, "বাবা, আর ত পেরে উঠি নে। বসে' বসে' খেলে রাজার সংসারও দুদিনে ফুরিয়ে যায়। এইবার একটা কিছু উপায় কর। না হলে ত আর বাছাদের মুখে দুটি অন্ন দিয়ে উঠতে পারছি নে।—নিরঞ্জনের অনেকগুলি শিশু-সন্তান, তাহাদের লক্ষ্য করিয়াই তিনি বলিলেন।"

নিরঞ্জন ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া মাতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ব্রাহ্মণী কপালে করাঘাত করিয়া অশ্রু-ভারাক্রান্ত নয়নে ফিরিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু সংসার যে আর চলে না। বলিলেন, 'একবার রাজবাড়ীটা ঘুরে' আয়। পুরাতন শিষ্য, কিছু প্রণামী নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। তাই যা। ফকিরকে সঙ্গে দিচ্ছি, ঐ তোকে চালিয়ে নেবে এখন।'

—'গিয়ে কি বলব?'

—'ওরে তোর কিছুই বল্‌তে হবে না। বল্‌বি শুধু যে আশীর্বাদ করতে এসেছি। এইটুকু পারবি নে?'

নিরঞ্জন উত্তর দিবার পূর্বেই পুত্রবধূ ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, 'তা আর পারবে না? মায়ের যেমন কথা।'

নিরঞ্জন একবার তাহার মায়ের মুখের দিকে, একবার তাহার স্ত্রীর দিকে অর্থশূন্য ভাবে চাহিল।

শেষ পর্যন্ত যাওয়াই স্থির হইল। ব্রাহ্মণী ফকিরকে সব কথা বুঝাইয়া বলিয়া দিলেন।

'তোমারই হাতে সঁপে দিলাম, ফকির। তুমি পুরোনো লোক। তোমার ধর্ম কর্ম যা হয় করো বাছা।'

ফকির বলিল, 'কোনও ভয় নেই, মা ঠাকরুণ। ফকরে অন্-জান্ ছাড়তে পারে, কিন্তু নেমক হারামি কাজ করে না।'

ফকির জাতিতে নমশূদ্র। বাল্যকাল হইতে এই ব্রাহ্মণ-পরিবারের নুন খাইয়া সে মানুষ হইয়াছে।

নিরঞ্জন ভট্টাচার্য রায়ের কাঠির রাজবাড়ীতে রওনা হইলেন। নৌকা রাজবাড়ীর ঘাটে পৌঁছিল, তিনি স্নান আহ্নিক সমাপন করিলেন, বেশ বিন্যাস, ফোঁটা তিলক একটু বেশী বেশী হইল। ফকির পুরাতন গরদটি পাট করিয়া কাঁধের উপর আল্‌গোছে ফেলিয়া দিল। নিরঞ্জনের

কপালে সিন্দুরের ফোঁটা জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছিল, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা শুভ্র উপবীতের পার্শ্বে বেশ মানাইয়াছিল। ফকির খুব সন্তুষ্ট হইল, বলিল, 'এইবার দাদা ঠিক ঠাকুর মশাইয়ের মত হয়েচে। চল, তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি।'

নিরঞ্জন 'দুর্গা দুর্গা, তারা তারা', বলিয়া পা বাড়াইলেন। ফকির গলায় বস্ত্রাঞ্চল দিয়া প্রণাম করিল, কিন্তু পদস্পর্শ করিল না, কেননা সে নীচ জাতি।

পথে যাইতে যাইতে সে অনেক কথাই দাদাঠাকুরকে শিখাইয়া দিল, অশিক্ষিত ভৃত্যের জ্ঞানে যতদূর কুলায়। নিরঞ্জন রাজসভায় প্রবেশ করিলেন। ফকির দ্বারদেশে সন্তর্পণে দাঁড়াইয়া রহিল।

রায়ের কাঠির জমিদারদের প্রজারা ও দরিদ্র প্রতিবেশীরা রাজা বলিত। রাজা বসন্ত রায় কাছারীতে বসিয়া জমিদারীর কাজ-কর্ম দেখিতেছেন। নিরঞ্জন উপবীত জড়াইয়া দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া আশীর্বাদ করিলেন। রাজা তাঁহার বেশভূষা দেখিয়া মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিলেন। নিরঞ্জন সংক্ষেপে বলিলেন, 'গুরুপুত্র।'

বসন্ত রায় বলিলেন, 'ওঃ। অনেক ছোট বেলায় দেখেছি। সিদ্ধান্ত মহাশয়ের কাল হয়েছে কত বছর হ'ল?

নিরঞ্জন ফকিরের শিক্ষা মত বলিল, 'আজ ১২ বছর হ'লো। কালী, কুলাও মা।'

রাজা তাহাকে আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন। 'গুরুপুত্রের নামটি হ'লো কি?'

'আমার নাম? আমার নাম শ্রীনিরঞ্জনপ্রকাশ বিদ্যারণ্য।'

গুরুপুত্রকে বোধ হয় একটু পরীক্ষা করিয়া লইবার ছলে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিদ্যারণ্য মশায়, আজ তিথিটা কি বলুন ত?'

নিরঞ্জন একটু মুস্কিলে পড়িলেন। এই বিষয়টি হতভাগা ফকরে শিখাইয়া দিল না কেন? এখন কি বলি? নিরঞ্জন ভাবিত হইলেন। এদিকে আবার ফকির বলিয়া দিয়াছে যে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে এবং চটপট্ করিয়া দিতে পারিলে ভাল হয়। 'পয়সা কি লোকে সহজে দেয়, তা হোক গে না গুরুঠাকুর। মন ভেজাতে না পারলে কারো হাত দিয়ে পয়সা গলে না দা'ঠাকুর।'

নিরঞ্জন আর কিছু না ভাবিয়াই বলিয়া ফেলিলেন, 'আজ পূর্ণিমা।' কাছারী শুদ্ধ লোক হাসিয়া উঠিল। হাসিলেন না কেবল রাজা বসন্ত রায়। নিরঞ্জন চারিদিকে চাহিলেন, সকলের চোখে মুখেই কৌতুক মিশ্রিত হাসি। বসন্ত রায় গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, 'আজ অমাবস্যা, ঠাকুর। এটুকুও খবর রাখেন না?'

নিরঞ্জন মরমে মরিয়া গেল, ভাবিতে লাগিল, কেনই বা মায়ের কথা শুনিয়া আসিলাম। ফকির ছোট লোক, সে কি জানে? মায়ের ত এটা জানা ছিল, তিনি ত এসব কিছুই বলিয়া দেন নাই।

কাছারী ভঙ্গ হইল। বসন্ত রায় উঠিয়া একটা ছোট রকমের প্রণাম করিলেন এবং অন্য কিছুই না বলিয়া অন্দরে চলিয়া গেলেন। কর্মচারী ও পারিষদেরা উঠিয়া দাঁড়াইল। গুরুপুত্র উঠিতে ভুলিয়া গেলেন। কর্মচারীরা পরস্পর ইঙ্গিত করিয়া আবার হাসিল। তখন নিরঞ্জন ধীরে ধীরে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। কেহ তাহার সহিত একটি কথাও কহিল না।

ফকির দ্বারদেশে অধীরভাবে অপেক্ষা করিতেছিল। নিরঞ্জনের মুখ দেখিয়াই সে বুঝিল যে, সমস্ত ব্যর্থ হইয়াছে।

পথে চলিতে চলিতে দু'জনের মধ্যে কোনও কথাই হইল না। নৌকায় আসিয়া নিরঞ্জন আগে মাথায় খানিকটা জল দিল। তারপরে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, 'ফকির দা, তুমি বাড়ী চলে যাও। কোনওরূপে নৌকাটার ভাড়া দিয়ে দিও।'

ফকিরও কাঁদিল। বলিল, সেজন্যে ভাবনা নেই, দাদা, আমার সঙ্গে আমার নিজের টাকা আছে। নৌকা ভাড়া দিয়ে চল আমরা হেঁটে বাড়ী চলে যাই।

'না দাদা আমি আর ফিরছি না। বামুনের ছেলে, বড় পণ্ডিতের ছেলে হয়, আমি কু-পুত্র। আমাকে রাজা জিজ্ঞেস করলেন 'আজ তিথিটা কি?' আমি বল্লাম, 'আজ পূর্ণিমা, আর সব লোক কিনা হো হো করে হেসে উঠলো। আজ যে অমাবস্যা এ কেউ আমায় বলে দাওনি কেন? ছি, ছি, আমার মরণ হলো না?' এই বলিয়া নিরঞ্জন আবার রুদ্ধক্রন্দনে কম্পিত হইয়া উঠিল। সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সুরে বলিল, 'না, ফকির দা, আমি এই অপমান নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবো না। রাজা মুখ ফিরিয়ে চলে' গেলেন, একটি কথাও বল্লেন না। হায় হায়, আমি

সিদ্ধান্ত ঠাকুরের ছেলে। আমার কিনা এই অপমান। আমি এ জীবন এখুনি ত্যাগ করবো।'

ফকির অনেক বুঝাইল, অনেক কাকুতি মিনতি করিল। কিন্তু কিছুতেই নিরঞ্জনের প্রতিজ্ঞা টলাইতে পারিল না। সে কেবলি বলে, 'বামুনের ছেলে মুখ্খু। রাজসভায় অপমান। সিদ্ধান্ত ঠাকুরের ছেলের। আমার দড়ি জোটে না। ছি ছি-ছিঃ —মা শুন্‌লে বলবে কি? পরিবার গলায় দড়ি দেবে। গাঁয়ে মুখ দেখাব কেমন করে? না ফকির দা, তুমি আর আমায় কিছু বলো না।'

এই বলিয়া নিরঞ্জন পৈতা দিয়া ফকিরের হাতদুটি জড়াইয়া ধরিল।

ফকিরের বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পাইল। সে বিস্তৃত শূন্যের দিকে বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া রহিল। সহসা সে দৃপ্ত হইয়া উঠিল - সে বলিল 'আজ না শনিবার?'

নিরঞ্জন বলিল, হ্যাঁ, এই দেখ না, আমরা বৃহস্পতিবার যাত্রা করেছি আশীর্বাদি করে' মাহেন্দ্রক্ষণে। একদিন রূপসায় ছিলাম। আজ শনিবারই ত বটে গো।'

সে জিজ্ঞাসার ভাবে তাকাইয়া রহিল। ফকির প্রথমত কিছু উত্তর দিল না। তারপরে লাফাইয়া উঠিল।

'তুমি পারবে? দাদা ঠাকুর, পারবে?'

'কি পারব রে? তাই আগে বল।'

ফকির সে কথা যেন শুনিতে পাইল না। সে চীৎকার করিয়া উঠিল। হারে রে রে রে।—ফকিরের পূর্বপুরুষদের মধ্যে অনেকেই ডাকাতি করিত। তাহাদের ছিল এই চীৎকার।

নিরঞ্জন অবাক্ হইয়া গেল। ফকির একটু শান্ত হইয়া বলিল 'আমি যা বলি, তা পারবে? যদি পার, সব অপমান দূর হবে যাবে। যাবেই দা'র— নয়ত আমি ঈশ্বর মণ্ডলের ছেলে নয়।

নিরঞ্জন আশার একটু ক্ষীণ আলোক দেখিতে পাইয়া বলিল। 'কি—কি? আমায় কি করতে হবে।'

'সে আমি এখন বল্‌বো না। সন্ধ্যার পরে বল্‌বো। কিন্তু তুমি ঠাকুর পারবে ত? শ্মশানে যেতে পারবে? ভয় করবে না ত? আজ শনিবার—অমাবস্যা—আজ বড় ভাল দিন। আমি কিছু 'কারণ' কিনে আন্‌ছি দা ঠাকুর। কিন্তু তুমি পারবে ত?'

নিরঞ্জন উত্তর দিল বটে, কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বর জড়াইয়া আসিল। বলিল, 'তুমি সঙ্গে থাকবে ত ফকির দা?'

'আমি থাকবো বই কি? আমি কাছে কাছেই থাকবো। কিন্তু দেখ, যদি ভয় করে ত বলো, তা হ'লে কাজ নেই।'

নিরঞ্জন চুপ করিয়া রহিল। ফকির তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া সিংহের ন্যায় গর্জন করিয়া উঠিল। 'দূর তোর—, সব মিছে। এই না বলছিলে যে প্রাণত্যাগ করবো? ওরে আমার অভিমান রে। বলে হেলে ধরতে পারি নে, কেউটে ধরতে যাব।'

নিরঞ্জন চমকিয়া উঠিল। তাহাদের চিরদিনের ভৃত্য ফকির মণ্ডল হঠাৎ এরূপ ক্ষেপিয়া যাইবে,—ইহা জ্ঞান বুদ্ধির অগোচর। নিরঞ্জন ভাবিতে লাগিল।

ততক্ষণে ফকির একটু শান্ত হইয়াছে। সে বলিল দেখ, দা ঠাকুর, তুমিও মরতে চাইছ। অপমানের লজ্জা নিয়ে বাড়ী ফিরতে পারবে না বলছ। আমি মানা করতাম। কিন্তু বামুনের ছেলে হয়ে তুমি পৈতে দিয়ে আমার হাত ধরেছ। কাজেই আমি আর তোমায় বাধা দেব না। আজ আমরা দুটি ভাই-ই মরবো। কারণ তোমায় ছেড়ে আমি বাড়ী যেতে পারবো না। মাঠাকরুণ তোমাকে আমার হাতে হাতে সঁপে দিয়েছেন না?'

একটু থামিয়া সে বলিল 'হয়, আজ অপমান ঘুচোবো, নয় ত দুজনেই মরবো। কেমন দাদা, বলো এই ঠিক কি না?'

মন্ত্রমুগ্ধের মত নিরঞ্জন বলিল 'ঠিক দাদা ঠিক্।

গভীর রাত্রি। দুর্ভেদ্য অন্ধকার। তারার দীপ্তি যেন সে অন্ধকারকে বিদ্ধ করিয়া রজনীকে আরও মসীলিপ্ত করিতেছে। দূরে শিবার রব ও সঙ্গে সঙ্গে পল্লীর কুকুরের চীৎকার ব্যতীত অন্য কোন শব্দ নাই। বাতাস নিথর, নদীর জলে ঢেউ কদাচিৎ দেখা দিতেছে।

ফকির শ্মশানে সাধনার স্থান খুঁজিতে লাগিল। এক জায়গায় দেখিল সদ্য চিতা নির্বাপিত হইয়াছে। ফকিরের পায়ের আঘাতে দুই একটি মড়ার খুলি গড়াইতে লাগিল। সে ঐ চিতারই নিকটে স্থান নির্দিষ্ট করিল। তাহার পর

সে চিৎ হইয়া সেখানে শয়ন করিল। নিরঞ্জনকে বলিল, 'দাদা ঠাকুর, আমার বুকের উপর ভাল হয়ে বস দেখি।'

নিরঞ্জন তাহাই করিল। ফকির বলিল, 'এইবার 'কারণ'—কর, আমাকে একটু প্রসাদ দিও।'

নিরঞ্জন বলিল, 'ফকির দা, তোমার কষ্ট হচ্চে না ?'

ফকির অতিকষ্টে উত্তর দিল, তা একটু হবে বৈ কি ? কিন্তু একটু পরেই অভ্যেস হয়ে যাবে।'

নিরঞ্জন তাহাকে যথেষ্ট মদ্যপান করাইল। ফকির বলিল,''ঠিক হয়ে বসেছ ত ? ভয় করবে না ত ?'

নিরঞ্জন তখন জপ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সংক্ষেপে উত্তর দিল 'উঁ-হুঁ।'

নিরঞ্জন এক মনে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে লাগিল। ফকির বলিল, 'দাদা, একটুও ভয় পেও না। আমি তোমার কাছে আছি, ভয় কি ? কোনও ভয় নেই, বুঝলে ? ভোর না হলে আসন ত্যাগ করো না, আমায় ডেকো না। আমিও জপ করতে লেগেছি। দুই ভাইয়ে আজ অসাধ্য সাধন করবো তবে ছাড়বো।'

তার পরে ফকির একবার হঠাৎ 'তারা, তারা' করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার পর নিস্তব্ধ।

জপ করিতে করিতে নিরঞ্জন নানা বিভীষিকা দেখিতে লাগিলেন। ভূতপ্রেতের অট্ট হাসি, সাপের ফোঁস ফোঁসানি, বাঘের গর্জানি—কত কি তিনি দেখিলেন, শুনিলেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি টলিলেন না। তাঁহার বিশ্বাস, ফকির দা কাছেই আছে—তাহারই বুকে তিনি বসিয়া আছেন—ভয় কি ? তারপর মরিবার জন্য ত তিনি সংকল্পই করিয়া আসিয়াছেন, মরিতে হয় ত আজই মরিবেন। শনিবার, অমাবস্যা, নিশীথরাত্রি ঘোর শ্মশান —তান্ত্রিক সাধনার এই ত উপযুক্ত সময় ও স্থান। নিরঞ্জন জানিতেন না যে তিনি চণ্ডালের শবের উপর বসিয়া জপ করিতেছেন। ফকির অনেকক্ষণ পূর্ব্বেই নিজের গলায় ছুরি বসাইয়া দিয়াছিল। সাধনার পক্ষে অপঘাত মৃত্যু-জনিত শবই প্রশস্ত—ইহা ফকির বহুবার ভট্টাচার্য বাড়ীতে শুনিয়াছিল। আজ প্রভুপুত্রের কল্যাণে সে নিজের দেহ উৎসর্গ করিল।

দেবী প্রসন্না হইলেন। রাত্রিশেষে রাজা বসন্তরায় বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, পশ্চিম আকাশের কোলে পূর্ণচন্দ্র অস্ত যাইতেছে। প্রথমতঃ তিনি নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, পরে রাণী এবং অন্য পরিজনবর্গকে ডাকিয়া দেখাইলেন। তাঁহারাও দেখিলেন, প্রভাতকল্পা শর্ব্বরীর শশী অপেক্ষাও উজ্জল পূর্ণচন্দ্র অস্তাচলে ঝল্‌মল করিতেছে। রাজা ভক্তি গদগদ হইয়া যুক্তকরে প্রণাম করিলেন। ব্যাপার বুঝিতে না পারিয়া তিনি অনেকক্ষণ পশ্চিম আকাশের দিকে অনিমেষে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর কি মনে করিয়া তিনি 'মা তারা শিবশঙ্করী' বলিয়া দেবীর মন্দিরে গিয়া জপে বসিলেন। ধ্যানে যেন দেখিতে পাইলেন, মায়ের কঙ্কন আজ পূর্ণচন্দ্র-রূপে পশ্চিম গগনে দুলিতেছে।

নিশিশেষে শ্মশানে শব-সাধক নিরঞ্জন দৈববাণী শুনিতে পাইল—তোমার সাধনায় মহাদেবী তুষ্ট হইয়াছেন। আজ পূর্ণচন্দ্রের আবির্ভাব হোক্। তোমার মূর্খত্ব দূর হোক্। তোমার বংশে আর কেহ কখনও মূর্খ হইবে না। তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও, তোমার বাক্য সিদ্ধ, মনস্কামনা পূর্ণ।

তখন নিরঞ্জন আকাশের পানে চাহিয়া দেখিল, সত্যই পূর্ণিমার চন্দ্র অস্তমিত হইতেছে। তিনি তখন আসন ত্যাগ করিলেন। উষার বাতাস ঝির ঝির করিয়া বহিতেছে। দূর গ্রাম হইতে কুক্কুটের ডাক ভাসিয়া আসিতেছে। তিনি ফকিরের দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, উষার অস্পষ্ট আলোকে দেখিলেন—তাহার দেহ হইতে অজস্র শোণিতধারা ঝরিয়া শ্মশান ভূমিতে জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে। তাঁহার মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হইল, কিন্তু তখনই মনে পড়িল দেবী তাঁহার বাক্য সিদ্ধ বলিয়া বর দিয়াছেন। নিরঞ্জন তখন জোরে জোরে ফকিরকে বাক্য দিয়া বলিলেন, ফকির দা, ওঠ। ফকির দা ওঠ। উঠে দেখ আজ তোমার মান রক্ষা হইয়াছে—ঐ দেখ পূর্ণিমার চাঁদ অস্ত যাইতেছে।

ঘুমের অবসানে নিদ্রিত জন যেমন জাগে, ফকির তেমনই জাগিল এবং দুর্বল দেহ কোনওরূপ টানিয়া তুলিয়া দাদাঠাকুরের পায়ের দিকে দুই হাত বাড়াইয়া দিল। উভয়ে আনন্দে অনেকক্ষণ ক্রন্দন করিল। তার পরে ধীরে ধীরে উঠিয়া নদীতে অবগাহন করিয়া স্নান আহ্নিক সমাপ্ত করিয়া নৌকায় ফিরিয়া আসিল।

কিন্তু, সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই কাছারী হইতে তাহাদের ডাক আসিল। রাজা সিংহদ্বার পর্যন্ত আসিয়া গুরুপুত্রকে অভ্যর্থনা করিয়া অন্দরে লইয়া গেলেন এবং রাজা ও রাজপরিজন তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন।

রাজা গলায় বস্ত্র দিয়া বলিলেন 'আমার অপরাধ ক্ষমা করুন ঠাকুর পুত্র। আমি বুঝতে পারি নাই যে আপনি মায়ের কৃপায় সর্ববিদ্যার অধিকারী। আজ হইতে আপনার বংশ সর্ববিদ্যাবিশারদ বলিয়া বিখ্যাত হইবে।'*

* পূর্ববঙ্গে স্থানে স্থানে সর্ববিদ্যার বংশধরেরা এখনও বর্তমান আছেন। তাঁহাদের বংশে পুরুষানুক্রমে প্রচলিত প্রবাদ অবলম্বনে এই কাহিনী রচিত

যারা দেখে মাত্র চারটি রং

শ্রীচিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

পূর্ব প্রবন্ধে মোটামুটি আমরা তিন শ্রেণীর দৃষ্টিশক্তির খবর পেলাম। প্রথমতঃ সাদা আর কালো মাত্র দেখার শক্তি দ্বিতীয়ত নীল আর হল্‌দে দেখার শক্তি, তৃতীয়ত সব রং দেখার শক্তি। দৃষ্টি শক্তির এই শ্রেণী বিভাগ আদিম অবস্থা থেকেই ঘটেনি। আমেরিকা'র কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর ক্রাইসটন্ ল্যাড ফ্রাংকলিন্ বলেন, হাজার হাজার বছর আগে সকল প্রাণীর দৃষ্টি ছিল মাত্র একই শ্রেণীর অর্থাৎ ঐ সাদা আর কালো-দেখার শ্রেণী, সেই হাজার হাজার বছর আগে মানুষ পশু পাখী কীট পতঙ্গ সবারই চোখে সাদা আর কালো ভিন্ন আর কোনো রঙ্ ধরা পড়্‌ত না, রঙের তফাৎ ছিল না এত রকম আজকের মতো সে-যুগে। বেড়ালের দৃষ্টিশক্তি আজও সেই আদিম যুগের অবস্থাতেই রয়ে গেছে। অন্য সব জীবের দৃষ্টির উন্নতি ঘটেছে, যুগের পর যুগ ধরে, একটু একটু করে'। ক্রমশঃ নীল আর হল্‌দে দেখবার শক্তি পেয়েছে বেড়াল ভিন্ন আর সবার চোখ, এইখানে হ'ল দ্বিতীয় শ্রেণীর দৃষ্টিশক্তির উৎপত্তি শুরু। মৌমাছি এই দ্বিতীয় ধাপে এসে থেমে গেল। মানুষ আরো উন্নতি করতে লাগল, ক্রমশ, মানুষের চোখে নীল আর হল্‌দের সঙ্গে লাল আর সবুজ রঙের তফাৎ ফুটে উঠ্‌ল। এই হ'ল প্রাণীর চরম দৃষ্টিশক্তি।

রং যে আলোরই আর এক নাম এ তোমাদের বুঝিয়েছি আগে। এখন আলো হ'চ্ছে ঢেউর স্রোত বা সমুদ্র। ছোটো বড়ো নানান্ মাপের অসংখ্য ঢেউয়ের সমষ্টি। সেই ঢেউ যখন আমাদের চোখের মধ্যে গিয়ে, চোখের ভিতরের পর্দায় ধাক্কা দেয় তখন আমরা আলো দেখি, অন্ধকার দেখি তখন যখন চোখের পাতা বন্ধ করি, মানে আলোর ঢেউকে চোখের মধ্যে যেতে দিই না।

এখন সাধারণত যে-আলোকে আমরা সাদা বা দিনের

আলো বলি, সে-আলোর মধ্যে কিন্তু, নানান্ রঙের আলো এক সঙ্গে মিশিয়ে আছে। ঐ রঙের আলোর প্রত্যেকের ঢেউ আলাদা আলাদা মাপের। কোনো রঙের আলোর ঢেউ লম্বা মাপের, কোনো রঙের বা খাটো। এক-এক-

মাপের ঢেউ চোখের মধ্যে গিয়ে এক-এক-রকমের আঘাত দিয়ে চোখের মধ্যে যে বিভিন্ন চেতনা জাগায় সেই আঘাতের তফাৎ অনুসারেই আমরা রঙের তফাৎ বুঝি। আলোর ঢেউয়ের ধাক্কায় চোখে যে রঙের পরিবর্তন ঘটায় তাকে বলি আলোর ধাক্কায় সাড়া দেওয়া, ভিন্ন ভিন্ন রঙের ঢেউয়ের ধাক্কায় আমাদের চোখের পর্দা ভিন্ন ভিন্ন রকমের সাড়া দেয়।

ডক্টর্ ল্যাড্-ফ্রাংক্লিন্ বলেন, আদিম অবস্থায় দৃষ্টি আজকের মতো রকমারি সাড়া-দেওয়ার বুলি জান্তো না, সব রঙের ডাকেই দু'একটা হাঁ-না গোছের উত্তর দিত। কচি-ছেলেরা ভিন্ন ব্যাপারকে ভিন্ন ভিন্ন কথায় বোঝাতে পারে না; হয় কাঁদে নয় হাসে। আদিম

অবস্থায় চোখের দৃষ্টি ও শিশুর মতো ভিন্ন ভিন্ন রংকে চিন্‌ত না।

আদিম দৃষ্টি-শক্তির ওপর যখন পর পর চারটে রং এসে পড়ত তখন সে দৃষ্টি শক্তি প্রাণপণে চারটে রংকে একই ভাষায় সাড়া দিতে থাকতো। আলো মাত্রেই তার কাছে সাদা, আর আলো যেখানে নেই সেখানে কালো, আর যেখানে আলো-আঁধারে সেখানে ধসর, ফুলের বা পাখীর ফটো দেখে বলা যায় না কিছুতেই সে-ফুলের বা সে পাখীর রং কেমন, তেমনি আদিম দৃষ্টি যেন সব জিনিসরই ফটো দেখতো। আলো থেকে কোনো রঙের ঢেউকে তফাৎ করতে পারত না।

আদিম অবস্থা কাটিয়ে প্রাণী যখন উন্নতির দ্বিতীয় ধাপে পৌঁছল তখন, আলো থেকে দু'টি রঙের আলোর দুরকম মাপের ঢেউকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে চিনে নেবার শক্তি পেলে দৃষ্টিতে। বড়ো থেকে ছোটোকে তফাৎ করা সোজা কাজ। তাই আলোর ছোট বড় ঢেউ অনুসারে দৃষ্টি রঙের-তফাৎ-বোঝা শুরু করলে। বড়ো-ঢেউ-আলোর রং হ'ল হল্‌দে আর ছোটো ঢেউ নীলের।

তারপর বড়ো ঢেউয়ের আর ছোটো ঢেউয়ের মাঝামাঝি মাপের ঢেউয়ের তফাৎ বোঝার পালা। লাল আর সবুজের ঢেউ হল্‌দে আর নীলের ঢেউয়ের মাপের মাঝামাঝি দুরকমের মাপের। হল্‌দে থেকে ছোটো মাপের ঢেউ হ'লেও আজ আমরা দেখতে পাই, কিন্তু নীলের চেয়ে ছোটো হ'লে আর দেখতে পাই না। তা হ'লে বোঝা যাচ্ছে যে, আজ আমরা যে রং দেখতে পাচ্ছি তা দৈবাৎ একদিন দেখ্‌তে শুরু করে' দিই নি, যুগের পর যুগ ধরে' আজকের দৃষ্টিশক্তিকে গড়ে তুল্‌তে হ'য়েছে। এখনো আমাদের দৃষ্টিশক্তি অনেক রংয়ের খবর পায় না—যাদের ঢেউ নীলের ঢেউয়ের চেয়ে ছোটো মাপের।

প্রিসম্‌ বা তেকোনা কাঁচের কলকের মধ্য দিয়ে সূর্যের একটি রশ্মিকে যদি এক সাদা পর্দায় ফেলা যায় তবে সে-রশ্মির পাক খুলে রামধনুর সব কটা রঙের ধাত রং ছড়িয়ে পড়ে। ইংরেজী নাম, ঐ পাক খোলা আলোর স্পেকটাম। দড়ির পাক খুলে ফেললে যেমন তার আঁশ-গুলো ভিন্ন ভিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়ে, স্পেক্‌ট্রামে তেমনি সাদা আলোর মধ্যেকার ভিন্ন ভিন্ন রঙগুলোকে আলাদা করে দেখি

স্পেক্‌ট্রাম-এর মধ্যে প্রত্যেকটি রং পর পর সাজিয়ে পড়ে, তাদের সাজিয়ে পড়বার নিয়ম এই রকম, প্রথমে বেগ্‌নী, তারপর পরপর, কড়ানীল, নীল, সবুজ, হল্‌দে, কমলা, শেষকালে লাল। এদের সবাইকে আমরা দেখি, কিন্তু বেগ্‌নীর বাইরেও আরেক রং আছে—তার ইংরেজি নাম আল্‌ট্রা ভায়োলেট্‌, রবিঠাকুর নাম দিয়েছেন বেগ্‌নী-পারের আলো। আর লালের বাইরে আর এর রং আমাদের চোখ দেখ্‌তে পায় না,—তার ইংরেজি নাম-করণ হয়েছে ইন্‌ফ্রা-রেড, আমরা বলতে পারি লাল পারের আলো। এই দুরঙের আলোতে কোনো জিনিসের ফটো তুল্‌তে শুধু পারি চোখে দেখ্‌তে পাইনে এই আলোতে আজও।

সাদা আলো যেন নানান্‌ রংয়ের আলোর সুতোয় পাকানো দড়ি—এমনি ধারা একটা আভাস তোমাদের দিয়েছি। কিন্তু দড়ির উপমার চেয়ে নানান্‌ রং গোলা জলের ঝরণার উপমা হ'লে আলোকে বুঝতে সুবিধে হবে। সাদা আলো হ'ল সেই নানান রংয়ের আলো মেশানো একরকম রঙের ঝরণা, সেই ঝরণাধারায় আমাদের চোখ যখন ধুয়ে যায় তখন দৃষ্টিবলে সাদা আলো দেখ্‌ছি। এই নানা রং মেশানো ঝর্ণা কেমন করে' উৎপত্তি হয়? কী করে' অতোগুলি রং মিশে সাদা হয়ে যায়?

উত্তরটা তোমরা নিজেরাই দিতে পারো যদি চেষ্টা করো। একখানা কাগজে পাশাপাশি দুটি বৃত্ত এঁকে, একটিকে হল্‌দে অন্যটিকে নীলে ভর্তি করো, তারপর একখানা পোস্টকার্ড দিয়ে দুই বৃত্তের মাঝখানে দেওয়াল দাও, দেয়ালের এক মাথা তোমার দু'চোখের মাঝখানে, মানে, নাকের ডগায় ধরো, অন্য মাথা তো কাগজের বৃত্ত দুটির মাঝখানে আছে। [৬নং ছবি দেখ।] এখন নিশ্চয় এক চোখে একটির বেশি বৃত্ত দেখছ না। চেষ্টা করো, একই সময়ে দুচোখে দুটি বৃত্তকে দেখ্‌বার।

অদ্ভুত কাণ্ড বলে' ঠেক্‌বে তখন, যখন দেখ্‌বে যে শুধু নীল আর হল্‌দে নয়, থেকে থেকে একদম সাদা দেখাচ্ছে সমস্ত কাগজ খানাকেই, কখনো বা নীল বৃত্ত যাচ্ছে কোথায় উড়ে শুধু থাকৃছে হল্‌দে, আর কখনো শুধু নীল,

হল্‌দে যাচ্ছে উড়ে, শেষটা হঠাৎ একবার সাদা হয়ে মুছে যাচ্ছে দুটো রং, দেখা যাচ্ছে সাদা কাগজখানা। কিন্তু আসলে মিশে যাচ্ছে দুটো রংয়েব আলো তোমাব চোখেব মধ্যে দিয়ে গিয়ে মগজের মধ্যে। নীল আর হলদে আলো মিলে সাদা হয়ে যা'চ্ছে।

সাদা আলোব মধ্যেই নীল আব হল্‌দে আলো ডুবে আছে, তাব মানে ঐ নীল আব হল্‌দেব মধ্যে বামধনুব সব বংয়ের আলোই আছে। হল্‌দেবংয়েব ঢেউকে যদি দুবকম মাপে দুভাগ করা যায় তবে এক ভাগে পাবে লাল আলো আব এক ভাগে পাবে সবজ। তাব মানে লালেব সঙ্গে সবুজকে জুড়ে দিলে হল্‌দে বংয়েব আলো পাওযা যায়। এবাবও তোমবা নিজেবা পবখ্‌ কবতে পাবো আমাব কথা সত্য কি না, ঐ যেমন ভাবে নীল হল্‌দেতে মিশিযে ছিলে মগজেব মধ্যে, তেমনি ক'বে নীলেব জায়গায় লাল বৃত্ত এঁকে নাও, আব হল্‌দেব জায়গায় সবুজ নিশ্চয লালে সবজে মিলে গিয়ে হল্‌দে হবে।

এই যে মিশে যাওয়াব ব্যাপাব ঘট্‌ছে পবখ্‌ কবাব সময়ে চোখেব ভেতব দিযে মগজেব মধ্যে, সেই ব্যাপাবই ঘট্‌ছে বাইবে সাদা আলোব মধ্যে, হল্‌দে আলোব মধ্যে। যাবা লাল বা সবুজ আলো দেখ্‌তে পায না, বেবাল বা মৌমাছিবা, বা বংকানাবা, তা'বা হল্‌দেব ঢেউয়েব ভাঙা টুক্‌বো দেখ্‌তে পায় না, খুব ছোটো আব খুব বড়োব তফাৎ না হ'লে অল্প বিস্তব তফাৎ তাদেব চোখে ভিন্ন রকমেব সাড়া তোলে না। হল্‌দেব এক একটি ঢেউকে আমবা লম্বা বলছি, কিন্তু কত লম্বা তা যদি শোনো তবে অবাক হয়ে যাবে নিশ্চয, কিন্তু, ধাবণা কবতেও পাব্‌বে না সে কতখানি। শুধু গোটা কতক সংখ্যা কানে আসবে মাত্র, তবু বল্‌ছি শোন: হলদেব এক একটি ঢেউ লম্বায় এক ইঞ্চিব এককোটি কোটি ভাগেব পনব অংশ। সে ঢেউ কতোটুকু তা মনে মনে আঁকতে পাবো? এই বকম ঢেউ যদি পবপব নিবেনব্বই কোটি নিবেনব্বই লক্ষ নিরেনব্বই হাজাব নশো পঁচাশিটে বাখো তবে হল্‌দে বং দেখতে পাবে। এই রকম সূক্ষ্ম মাপেরই তাবতম্য হিসাবে আমবা মাত্র চার বকম বংয়ের আলো দেখতে অভ্যস্ত হয়েছি আজ পর্যন্ত: হল্‌দে লাল সবুজ আর নীল। বাদবাকি যে-কটা রং আমবা দেখি তা ঐ চাব বংয়েবই মিশ্রণ। যেমন বেগ্‌নী হ'ল নীল লালেব মিশ্রণ, কমলা হ'ল লাল হলদেব। ঐ চাব রং আব তাদেব নানা মিশ্র বংয়েব বাইবে, আবো একশো একষট্টি বকমেব ভিন্ন ভিন্ন বংয়েব খবব দৃষ্টি বিজ্ঞানীবা পেয়েছেন। পৃথিবীতে মোট একশো পঁয়ষট্টি রকমেব বং আছে। তাদেব মধ্যে লাল, নীল, হল্‌দে, সবুজ আব এই চাবেব মিশ্রণ ছাড়া অন্য সব রংই আমাদেব চোখে কালো। সে-সব বঙের আলোয় কোনো জিনিষেব ফটো তুলে দেখাতে পাওযা যায় মাত্র। কাজেই বাকি একশো একষট্টিব নাম শুনে কোনো লাভ নেই, জিনিষ ছাড়া নাম শুধু কথা মাত্র, 'বেগ্‌নী পারের আলো' আমাদেব মনে কোনো বংয়েব আলোই ফুটিয়ে তোলে না, কাবণ আমবা চোখে দেখিনে তাকে।

বিজ্ঞানীবা বলেছেন, যে-নিয়মে আদিম চোখ থেকে আজকেব এই চাববং-দেখা-চোখে পৌছন গেছে, সেই ইভলিউশ্যন্‌ বা বিবর্তনেব ফলে ভবিষ্যতে, হাজাব হাজার বছব পবে, মানুষ, আজকেব অদৃশ্য-বংযেব আলো দেখবার মতো চোখ পাবে। এ যুগেব মানুষেব তাতে দুঃখের কাবণ অবশ্য কিছু নেই, কাবণ চোখে না দেখেও সে আলোব সমস্ত খবব এ যুগেই বিজ্ঞানীবা বা'ব কবেছেন— একি কম গৌববেব কথা! যে সব আলো ভবিষ্যতের মানুষ হযত' চোখে দেখ্‌বে সে-সব আলোব খবব আমরা পেয়েছি, নিজেদেব হাতে-তৈবী-চোখেব সাহায্যে—সে চোখেব নাম ক্যামেবা। তবে চোখে দেখা আব ক্যামেরাব সাহায্যে দেখায় আকাশ পাতাল তফাৎ, ক্যামেবার সাহায্যে ববিঝ চোখেব অদৃশ্য বং আছে, কিন্তু কেমন দেখ্‌তে সে বং তা বুঝিনে। অতএব, শুধু চোখের দিক থেকে ধব্‌লে, মানুষে বেড়ালে মৌমাছিতে তফাৎ অতি সামান্য। কোথায় একশো পঁয়ষট্টি বকম বং আর কোথায় মানুষ দেখে চাবটি বং—মাত্র চাবটি বং।

৩১শে মার্চ্চ মঙ্গলবার বেলা ১২টা

শ্রীতাপসরঞ্জন সরকার
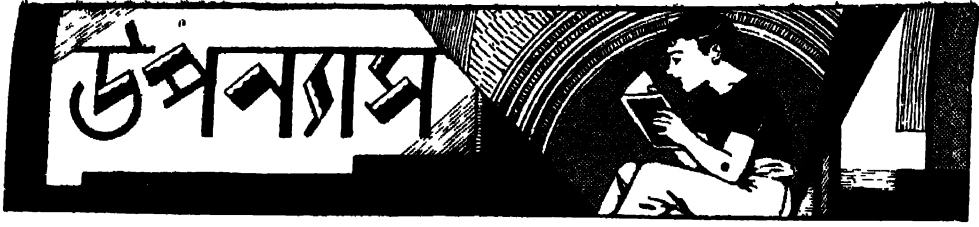
"প্রায় তিনটের সময় হঠাৎ একটা চীৎকার শুনে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। আমি তাড়াতাড়ি লাইট জ্বেলে যেদিক থেকে শব্দ আসছিলো সেদিকে যাই। কেষ্টার ঘর থেকে একটা গোঙানির শব্দ শুনে সেই ঘরের দরজা ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে দেখি কেষ্টার শরীর রক্তে রক্তময়। আমাকে দেখে সে শুধু "নেড়ামাথা" এই কথাটি বোলে প্রাণত্যাগ করে। তার বুকের ওপর একটা ক্ষত দৃষ্ট হয়, কিন্তু কোন অস্ত্র পাওয়া যায় নি। বোধ হয় আসামী অস্ত্রখানা নিয়েই পালিয়েছে। আর একটা আশ্চর্যের কথা এই যে আসামী কোথা দিয়ে এই ঘরে ঢুকেছিল এবং কোথা দিয়েই বা বেরিয়ে গেছে—আমি এখনও ঠিক করতে পারিনি। আমি ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ দেখেই ভেঙ্গে ঢুকেছি। কিন্তু ভেতরে কেষ্টা ছাড়া আর কাউকে দেখতে পাইনি। ঘর থেকে বেরুবার আর কোনো পথও নেই।"

বিজয় বললো, "আপনি ঘরের ভেতরে কাউকে ঢুকতে না দিয়ে দরজা বন্ধ করে রেখে দিন। আমি এখুনি আসছি।"

সমীর ও বিজয় অজয়ের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হোল। সমীর সোজা বাড়ীর ভেতরে ঢুকে পড়লো কিন্তু বিজয় ভেতরে না গিয়ে কেষ্টার ঘরটার চারিদিক দেখতে লাগলো। কেষ্টার ঘরের ঠিক নীচেই একটা প্রকাণ্ড ফুলের বাগান, সেজন্য সেখানকার মাটি একটু নরম। বাগানে প্রচুর ফুল ফুটেছিলো। বিজয় দূর থেকেই দেখতে পেলো একটা যায়গায় ফুলগাছগুলো নুয়ে পড়েছে। বিজয় এগিয়ে এসে সে যায়গায় কতকগুলো পায়ের দাগ দেখতে পেলো। অতঃপর সে দাগ ধরে এগিয়ে যেতে লাগলো। কেষ্টার ঘরের ঠিক পেছনে এসে দাগ শেষ হয়েছে। কিন্তু পেছনের দেওয়ালটার কাছে এসে পা দুটোর দাগ এতো গভীর ভাবে মাটিতে চেপে বসে গিয়েছে কেন? বিজয় সামনে তাকিয়ে শুধু উঁচু দেওয়াল-টাই দেখতে পেলো। সমান দেওয়াল, না আছে কোথাও কোন জানালা, না কোথাও কোন দরজা। ছাদটা এতো উঁচু যে ওখান থেকে লাফ দিলে একেবারে দফা শেষ। তবে এখানের দাগ দু'টো এত গভীর কেন? বিজয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেওয়ালটার চারিদিকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো। হঠাৎ হাত চারেক উঁচুতে একটা রক্তের দাগ দেখা গেল। এতো উঁচুতে দেওয়ালটার বাইরের দিকে রক্তের দাগ এলো কোথা থেকে?

বিজয় তখন বাড়ীর ভিতর দিয়ে কেষ্টার ঘরে ঢুকলো। ঐ তো ঘরের ভেতর দিকেও ঠিক পেছনের দেওয়ালটাতেও ঐ রকম যায়গায় একটা রক্তের দাগ রয়েছে। বিজয় কাছে এসে দাগটা পরীক্ষা করে দেখলো যে ওটা একটা রক্তমাখা হাতের কতরাংশের ছাপ। এখানে এই দেওয়ালের গায়ে রক্তের দাগ কেন? তবে কি আসামী এখানে হাত মুছেছে? তা হয়তো হোতেও পারে। কিন্তু দেওয়ালের বাইরের দিকেও কি হাত মুছেছে? অসম্ভব। ওখানে তো টুলের ওপর না দাঁড়ালে হাতই যাবেনা। নিশ্চয় এর ভেতর কোন রহস্য আছে। বিজয় হঠাৎ কি ভেবে ঐ রক্তের দাগটার ওপর হাত দিয়ে একটু জোরে দেওয়ালে চাপ দিল। অমনি সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার দেওয়ালের কতকটা অংশ সরে গিয়ে পাশের দিকে ঢুকে গেল। একি! এ যে একটা গুপ্ত দ্বার! বিজয় হাত ছেড়ে দিল, অমনি আবার সেই দেওয়ালের

অংশ—ঠিক যায়গায় এসে পড়্‌লো। বিজয় বললে, "যা ভেবেছিলুম ঠিক তাই। আচ্ছা দেখা যাক্‌ " বলেই বিজয় আবার সেই যায়গায় চাপ দিল। অমনি আবার সেটা খুলে গেল। বিজয় বাইরে লাফিয়ে পড়ল। গুপ্তদ্বার ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল। বিজয় তখন বাইরের সেই দাগটার ওপর হাতের চাপ দিয়ে দেখলে—কোনো ফল পাওয়া গেল না।—বাইরে থেকে দেওয়ালের কোনো অংশও তো অপসারিত হোল না? বিজয় চিন্তিত হয়ে পড়ল এবং আরও মনোযোগের সঙ্গে আশে পাশে লক্ষ্য করে দেখতে দেখতে হঠাৎ নীচু হয়ে কি যেন একটা জিনিষ টেনে তুলে নিয়ে আবার সেই দাগে হাতের চাপ দিতেই সঙ্গে সঙ্গে সেই গুপ্ত দ্বারটা বাইরে থেকেও নিঃশব্দে খুলে গেল

সপ্তম

খুনী কে ?

ঘরে ফিরে এসে বিজয় বল্‌লো, "গুপ্ত দ্বারটা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে আসামীও ধরা পড়ে গেল সমীর।" সমীর বল্‌লো, "কি রকম?" তখন বিজয় পকেট থেকে এক টুক্‌রো ন্যাকড়া বের কোরে বল্‌লে, "এই দেখ তার প্রমাণ। এটা হচ্ছে হত্যাকারীর রুমালের একটা অংশ। সে তার রক্তাক্ত হাতেই গুপ্ত দ্বার খুলে এই রুমাল বের কোরে মুছতে মুছতে নীচে লাফ দেয় কিন্তু হঠাৎ রুমাল-খানা এই গুপ্ত দ্বারের ফাঁকে আট্‌কে যায়। কিন্তু, সেই ব্যক্তি রুমালের অবশিষ্ট অংশটুকুই ছিঁড়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। আমি যখন দ্বিতীয়বার এই দ্বারটা খুলি তখন এই টুক্‌রোটুকু নীচে পড়ে যায়। তারই ফলে বাইরে থেকে চাপ দেওয়া সত্ত্বেও গুপ্ত দ্বার খোলেনি। এই রুমালের ছিন্ন অংশ নীচেয় পড়ে বাধা হয়ে উঠেছিল। এটা টেনে নিতেই গুপ্ত দ্বার আবার খুলে গেল। এই দেখ, রুমালের এই অংশটাতেই লণ্ড্রীর নম্বর রয়েছে, সুতরাং এখন লণ্ড্রী গুলোতে এই নম্বর খুঁজলেই নামটি পাওয়া যাবে।" সমীর বল্‌লে, এটা কিন্তু তুমি নিতান্ত ভাগ্যবলেই পেয়েছ, বিজয়! নয় কি?"

"হ্যাঁ, তা—এটা কতকটা ভাগ্য বলেই জানা গেল বই কি?"

কেষ্টার লাস অভিজ্ঞ অস্ত্র চিকিৎসকের দ্বারা পরীক্ষা করান হোল এবং ছোরা ব্যতীত যে অন্য কোনো অস্ত্র দ্বারা হত্যা করা হয়নি তাও প্রমাণিত হোল। অতঃপর লাস অধিকতর পরীক্ষার জন্য সরকারী থানা হয়ে মেডিক্যাল কলেজের শব ব্যবচ্ছেদাগারে প্রেরিত হোল। বিজয় প্রথমে ভেবেছিলো যে এই উইলের ব্যাপারটা সে নিজেই তদন্ত কোরে বের কোরবে। কিন্তু মাঝখানে হঠাৎ এই খুনের দরুণ বিজয়কে উইল ঘটিত সমস্ত ব্যাপারই পুলিশ ইন্সপেক্টার বিহারীবাবুর নিকট প্রকাশ করতে হ'ল। বিহারীবাবু অজয়কে জান্‌তেন এবং এই সব ব্যাপারে বিজয়ের দক্ষতা ও নৈপুণ্য যে কত বেশী তাও তিনি জান্‌তেন। এইজন্য তিনি এমন একটা সিরিয়াস্‌ কেসেরও সম্পুর্ণ ভার বিজয়ের উপরই ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হোলেন। বলে দিলেন পুলিশের সাহায্য যখন যা দরকার হবে বিজয় পাবে। অজয়কে সাবধানে ও সতর্ক হয়ে বাড়ীতে থাক্‌তে বোলে বিজয় ও সমীর লণ্ড্রীর সন্ধানে চল্‌ল।

পথের মধ্যে সমীর জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা বিজয়, হঠাৎ কেষ্টাকে কে খুন করলে? আর, কেনই বা করলে?" বিজয় হেসে বললে—"এই বুদ্ধি নিয়ে বুঝি—তুমি গোয়েন্দাগিরি করতে চাও?—নিশ্চয় সেদিন রাত্রে যখন কেষ্টা আমাকে উইল চুরির সব কথা বলছিলো তখন ও পক্ষের কোন গুপ্তচর আশে পাশে লুকিয়ে সব শুনেছিলো। তাদেরই এই কাজ। ভেবেছিল কেষ্টাকে সরাতে পারলে আর আসামী সনাক্ত হবে না। সরিৎবাবু—দেখছি ধড়িবাজ লোক।—"

সমীর বললে—আচ্ছা আর একটা প্রশ্ন করবো—ও বাড়ীতে দেওয়ালের গায়ে ওরকম একটা গুপ্ত পথ রাখার কারণ কি?"

"এই বাড়ীটা কবে তৈরী হয়েছে জান কি?"

"হ্যাঁ, ওপরে লেখা আছে, স্থাপিত ইং ১৯০৬ সন, ঠিক পাঁচ বছর দু মাস আগে, কেননা এটা হচ্ছে ইংরেজী ১৯১১ সনের ফেব্রুয়ারী মাস।"

"হ্যাঁ নবীনবাবুও ঠিক সেই সময় এসে এ পাড়াতে

বাস করতে আরম্ভ করেন, তারপর আজ পর্যন্ত তিনি এইখানেই আছেন। ১৯০৭ সালে একবার এই সঞ্জীব বাবুর ৫০০০্ পাঁচ হাজার টাকা চুরি হয়ে যায়। টাকাটা এই গুপ্তদ্বারযুক্ত ঘরেই একটা লোহার সিন্দুকে ছিল। পুলিশ তদন্ত দ্বারা কিছুই কোরতে পারেনি। অবশ্য আমি তখন অন্য কাজে আটকা পড়েছিলুম, নইলে হয়তো বা তখনই এই গুপ্ত দ্বার বেরিয়ে পড়তো। তারপর ১৯০৯ সালের ডিসেম্বরে আবার এই ঘর থেকেই সঞ্জীববাবুর মৃতা পত্নীর বহু মূল্য অলঙ্কার পত্র চুরি হয়। তারপর গতকাল রাত্রিতে কেষ্টা এই ঘরে খুন হয়। আমার অনুমান যে সঞ্জীববাবু যখন এই বাড়ী তৈরী করান তখন এই নবীনবাবুই তার দেখাশুনা ও তত্ত্বাবধান করতেন। খুব সম্ভব তিনিই রাজমিস্ত্রাদের কিছু ঘুস দিয়ে এই গুপ্ত দ্বারটি তৈরী করান। অবশ্য এই রকমটাই আমার ধারণা। তবে হ্যাঁ, এ রকমটা নাও হ'তে পারে। হয়ত বাড়ী তৈয়ারী করিয়েছিলেন অজয়ের পিতৃ বন্ধু সরীৎবাবু। নবীন ছিল তার অনুচর। যাক্, এই বিষয় নিয়ে আর মিথ্যে মাথা ঘামান উচিত নয়।"

সমীর বল্‌লো, "কিন্তু বিজয়, আমার মনে একটা বিষয় আজ কদিন থেকে বিশেষ কোরে উঁকি দিচ্ছে। সেটা কি জান? তোমার হয়ত স্মরণ আছে-অজয়বাবু একদিন বলেছিলেন যে তার বাবা কয়েকদিন পর পরই রাত্রে ঘুমের মধ্যে হঠাৎ কোন শব্দ শুনে জেগে উঠ্‌তেন এবং অন্ধকার ঘরের ভেতর সম্পূর্ণ কালো পোষাকে আপাদমস্তক আবৃত একটি দীর্ঘকায় লোককে ঘুরতে দেখ্‌তেন। কয়েকদিন তিনি ওকে ধরতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু কিছুতেই পারেননি। বাড়ীর সমস্ত দরজা, জানালা, গেট্ সম্পূর্ণ বন্ধ থাকা সত্ত্বেও সেই কৃষ্ণকায়মূর্তির আবির্ভাব হওয়াতে তিনি শেষটা ওটাকে অপদেবতার উৎপাত বলে ঠাউরেছিলেন। আমার মনে হয় বিজয় সেই লোকটা নিশ্চয় ঐ গুপ্তদ্বার দিয়ে আস্‌তো, কিন্তু তার উদ্দেশ্য কি ছিল বোঝা যায় নি।"

বিজয় বল্‌লে, "বন্ধু, তুমি আর একটু ভেবে দেখলেই পরিষ্কার বুঝতে পারতে যে সেই কালো পোষাক পরা দীর্ঘকায় লোকটিই কোনো এক রাত্রে সঞ্জীববাবুকে দিয়ে ঐরকম একটা উদ্ভট উইল লিখিয়ে নিয়েছিল। এই গুপ্ত-দ্বারটা যদি একদিন আগে আবিষ্কার করতে পারতুম তবে কেষ্টা বেটাকে প্রাণে বাঁচাতে পারতুম। কেননা তাহলে আমি আর কেষ্টাকে ওঘরে শুতেই দিতুম না।" কথা বলতে বলতে তারা একটা লণ্ড্রীর সামনে এসে পড়ল। বিজয় বললে—চল হে সমীর চল, আগে এটাতেই ঢুকে দেখি, কারণ এটাই নবীনবাবুর বাড়ীর সবচেয়ে কাছে।"

লণ্ড্রীতে ঢুকে তারা এই মাসের খাতা বের কোরে নম্বর মিলাতে লাগলো, অবশেষে নম্বর মিলে গেল। "আরজেণ্ট খাতায় ১টি রুমাল, নেকটাই, তোয়ালে, সার্ট ও ট্রাউজার ছিল। নাম "আফতাব উদ্দিন খাঁ।" ঠিকানা—১০ চিন্তামণি লেন, উল্টোডিঙি।—বিজয় দোকানদারকে জিজ্ঞেস করলো, "লোকটাকে কি আপনি চেনেন?"

"না।"

"লোকটার চেহারার বর্ণনা দিতে পারেন?"

"পারি",

"বেশ তাতেই আমাদের কাজ হবে, বলুনত শুনি।"

"মুখটা ভাল মনে নেই তবে রংটা বেশ ফর্সা, গায়ে খাকি সার্ট, পরনে ঢিলা পায়জামা আর ন্যাড়া মাথায় একটা গয়েরী রংএর টুপী ছিল।"

"ওঃ। লোকটার মাথাটা বুঝি নেড়া ছিল?"

"হ্যাঁ",

"আপনি কি করে বুঝলেন যে নেড়া মাথায় টুপি পরেছে?"

"লোকটা মাঝে একবার টুপি খুলে নেড়া মাথাটা রুমাল দিয়ে মুছেছিল।"

"ওঃ আচ্ছা ধন্যবাদ, আসি"।

"নমস্কার।"

বিজয় ও সমীর ল্যাণ্ড্রী থেকে বেরিয়ে এলো। বিজয় বল্‌লে, "মরবার সময় কেষ্টা বেটা নেড়া মাথা কথাটি বলেছিলো কেন বুঝছ? এখন আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারবো যে এই আফতাব উদ্দিনই খুনী। কিন্তু, কে এই আফতাব উদ্দীন? আফতাব উদ্দীন কি তার প্রকৃত নাম না ছদ্মনাম? [ক্রমশঃ

দেবীর আবির্ভাব

কাজি আফসারউদ্দিন আহম্মদ

বড়ো দিনের উৎসব। কোল্‌কাতার শোভাসম্পদ্‌ যেন সেদিন দশগুণ বেড়ে গিয়েছিলো। দোকানে দোকানে নানান্‌ রকম খেলনা, পুতুল, খাবারের আমদানি।

যারাই পথ দিয়ে যাচ্ছে, একবারটি চোখ না তুলে পারছে না।

কিন্তু আশ্চর্য। সত্যি আশ্চর্য বৈকি। একবারটিও যে মুখ তুলে চাইলো না, সে—হোচ্ছে কানন। চাইবে কি করে। হাতের মুঠোয় যে একটি পয়সাও তার নেই। ছেঁড়া, ময়লা পোষাক পরণে, পায়ে এক জোড়া নোংরা স্যাণ্ডেল।

ছিন্ন গায়ের কাপড়খানা বুকে চেপে সে পথ চোল্‌চে। দু'পাশের সাজানো-গোছানো দোকানের দিকে একবারটিও তার চোখ ফির্‌চে না।

মাথায় একমাথা রুক্ষ-চুল। এলোমেলো বাতাস এসে বার বার তার দু'চোখে আঘাত করচে। কানন থম্‌কে দাঁড়িয়ে চুলগুলোকে আল্‌তো আদর কোরে ফিকে গোলাপী গালের উপর থেকে কানের ও-পাশটায় সরিয়ে দিলো।

এই নিবিড় ঘন কাজল কালো চুলের উপর কাননের বিশ্রী রকমের ঘেন্না ধরে গিয়েছিলো। তেলের পয়সা জোটে না যাদের তাদের মাথায় এত চুল কেন? কানন বড় একটা পথে বেরোয় না। বাপের কাছে বসে চিত্র বিদ্যা শেখে।

আজ সে পথে বা'র হয়েছে, দারুণ অভাবের তাড়নায় বাধ্য হ'য়ে।

মাস কয়েক পূর্বের কথা। বাবা বোল্‌লেন: "কানন, পারবি তো মা, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তোর মাকে দেখাশোনা কোর্‌তে?

কানন বোলেছিলো: "নিশ্চয় পার্‌বো বাবা।"

বাবা কাননকে চুমু খেয়ে আশীর্বাদ কোরে সুন্দর বনে চলে গেলেন। সেখানে জংগল বিভাগে মোটা মাইনের একটা চাকুরী খালি ছিলো কিনা, তাই।

কিন্তু তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। কানন তার বাবার কোনো খবর পায় নি। সংসার আর চলে না, আজ সে প্রাণপণে ডাকছে: এসো বাবা। ফিরে এসো তুমি। ঘরে যা কিছু ছিল, সব নিঃশেষ হয়ে গেছে। হাতে একটি পয়সা নেই, অথচ মা রোগে বিছানায় শুয়ে, ঔষধ-পথ্য জোটে না।

ছোটো ভাই সোমেন এক ফোঁটা দুধের জন্য কাঁদে—ওর কান্না আর কতো সওয়া যায়।

কানন দিনরাত ভাবে। কেমন কোরে এ-দুঃখের প্রতিকার করা যায়! কিছুই ভেবে ঠিক করতে না পেরে অবশেষে সে আজ বেরিয়ে পড়েছে তার বাপের শিল্পী বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে অবস্থা জানিয়ে তাদের কাছে কিছু সাহায্য ভিক্ষা করতে।

ঠাণ্ডা কন্‌কনে শীত। এক-একটা দমকা হাওয়া আসে আর গোটা শরীরটাকে যেন হিম শক্ত কোরে দিয়ে যায়। পথ চলাই দায়।

কানন শীতে ঠক্‌ ঠক্‌ ক'রে কাঁপছে আর ভাবছে, শীত না হয়ে যদি গোটা বছর গরম হোতো বেশ হোতো। যদি পথটি হতো তরুলতায় ছায়া নিবিড়, আকাশ হতো ঘন নীল, বাতাস রোদের আলোয় চিরচপল, ঘরে ঘরে

খাবার থাক্‌তো। এতোটুকুন খাবারের জন্যে এতোটুকুনও ভাবতে হোতো না কাউকে। তা'—হোলে কি সুন্দরই না হোতো।

ভাব্‌তে ভাব্‌তে কানন এসে একটা মন্দিরের কাছে পৌঁছুলো। দরজা ভেজানো। অত্যন্ত সন্তর্পণে খুলে সে এসে মন্দিরের মধ্যে দাঁড়ালো।

মন্দিরে জগজ্জননী মা ভগবতীর পূজা ও আরতি হয়। মাকে দেখবার আশায়ই সে আজ মন্দিরে ঢুকে পড়েছে। নিমেষে জুড়িয়ে গেল তার দুঃখকষ্ট ও ভাবনা ভরা মনের জ্বালা। দেবীপ্রতিমার মুখে কি প্রসন্ন সুন্দর হাসি, দুটি চোখ উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে—কেমন স্নেহভরা দৃষ্টি।

মায়ের ললাট থেকে জ্যোতিঃ ফুটে বেরোচ্ছে। সম্মুখে পুরোহিত বসে তখন নিবিষ্ট মনে পূজা করছে। কানন হাঁটু গেড়ে, হাত জোড় কোরে বোস্‌লো। মন ওর শ্রদ্ধার আবেগে ভরে উঠলো।

কানন ধীর নম্রকণ্ঠে বল্‌লো, "মা। স্তব স্তুতি যা-কিছু জান্‌তাম, সব ভুলে গেছি। প্রাণে জাগছে শুধু তোমার অসীম করুণার অযাচিত স্নেহের কথা। সে-করুণা, সে-স্নেহের একবিন্দু আমাদের ওপর ছড়িয়ে দাও মা। মার অসুখ ভালো কোরে দাও। আমার আদরের কচি ভাই সৌম্যেনকে খাবার দিয়ে ওর কান্না বন্ধ করো। আর—আর, দয়া কোরে একদিন আমাদের ঘরে পায়ের ধুলো দিও মা। আমি তোমায় নিমন্ত্রণ করে গেলুম

আচম্বিতে মাতৃমূর্তি যেন ঈষৎ কেঁপে উঠলো।

কানন বুঝলো—এ ওর মনের ভুল।

সে চট্ কোরে উঠে দাঁড়ালো। আর দেরি করা যায় না। কলাভবনে যাবার সময় উৎরে যেতে পারে। যদি পিতৃবন্ধুদের সঙ্গে দেখা না হয়?

কলাভবন থেকে কাননকে কিন্তু হতাশ হ'য়ে ফিরতে হ'ল। পিতৃ বন্ধুরা সবাই কপর্দকহীন, নিঃসম্বল। সকলেই তার কথা শুনে সমবেদনা জানালে। বললে ছবি এঁকে দি'ত পারি তোমায়, বিক্রী ক'রে যদি কিছু পাও চেষ্টা করো।

হায়! কী নিষ্ঠুর ওরা সব! সকল কাকুতি বৃথা হোলো। ব্যর্থতার গ্লানি মাথায় কোরে কানন এসে রাজ পথে দাঁড়ালো। দৃষ্টি ওর শূন্য, মনটা দিক্‌ ভোলা।

কানন যখন আপনাকে বড্‌ডো নিঃসহায় মনে কোরে পথের ধারে দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেল্‌ছিলো, তখন অন্য একজন নারী স্নেহ ব্যাকুল দৃষ্টি নিয়ে তাকে বুকে তুলে নেবার জন্য উৎকণ্ঠিত হোয়েছিলো।

তাঁর নাম শিবাণী। তিনি সেই পল্লীর শ্রেষ্ঠ এক ধনীর পত্নী। বাতায়ন হতে কাননকে দেখতে পেয়ে ঝীকে পাঠিয়ে দিলেন মেয়েটিকে ডেকে আনতে।

জলভরা দুটো ডাগর ডাগর চোখ তুলে কানন শিবাণীর দিকে চাইলো।

একী। এযে চেনা মুখ বোলে মনে হয়।

কানন একটি কথাও বোল্‌তে পার্‌লো না। অবাক হোয়ে ভাবতে লাগ্‌লো এ যে সেই মন্দিরে দেখা মা ভগবতী। যাঁর কাছে সে আপন দুঃখ নিবেদন কোরে এসেছিলো। সেই টক্‌টকে রাঙা লালপাড় শাড়ী। সেই মাতৃত্বভরা মধুর দৃষ্টি।

শিবাণী তাকে বুকে টেনে নিয়ে স্নেহ সজল কণ্ঠে বোল্‌লো "কোথায় যাচ্ছিলে তুমি?"

কানন তার কোলে মুখ লুকিয়ে একে একে সব কথা বোল্‌লো।

তারপর সে চারিদিকে চেয়ে দেখলো কী সুন্দর ঘর-খানা। দেয়ালে দেয়ালে ছবি টাঙানো। শ্বেত পাথরের ছোট্ট একখানা টেবিল। তার ওপোর রঙ-বেরঙের ফুলের তোড়া পরিপাটিরূপে সাজানো। রেশমী চাদর ঢাকা গদীআঁটা চেয়ার। মাঝখানে সুন্দর চিমনিতে ঢাকা বিজলীবাতির আলো। বাইরের মতো কনকনে হাওয়া এখানে নেই

শিবাণী একখানা চেয়ার টেনে এনে তাতে কাননকে তুলে বসিয়ে দিলো। ঝী একথালা জলখাবার নিয়ে এল। শিবাণী কাননকে কিছু মিষ্টিমুখ করতে বললে।

কানন কেঁদে ফেললে। বললে "আমার ছোট্ট ভাইটি আমাদের সৌম্যেন যে ক্ষিদেয় একটু দুধ না পেয়ে কাঁদছে মা। তুমি চল আগে সৌম্যেনকে আমরা কিছু খাইয়ে আসি, তারপর আমি খাব কেমন?"—শিবাণী ঘাড় নেড়ে বললে "বেশত তাই চলো।"

কানন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো। তার ভয় ছিলো—হয়তো এই করুণাময়ী তাদের মত দীন দুঃখীর

ঘরে যেতে চাইবেন না।—কিন্তু শিবাণী তাকে একখানা ছবির বই দিয়ে বললে "তুমি ততক্ষণ একটু ছবি দেখ, আমি চট্ করে কাপড় বদলে আসছি, কেমন ?"

কানন অবাক হয়ে গেল। কে এই রহস্যময়ী। তার প্রাণের ব্যথা বুঝে তাকে নিশ্চিন্ত নির্ভয় কোরে দিলেন ? আবার সেই সন্দেহ এলো। এ-মুখ যে তার চেনা। অত্যন্ত আপনার জন।

ঐ মেঘের বরণ চুলের গোছা। ঐ মমতা ভরা দৃষ্টি। ওঁর কাছেই না সে আজ প্রাণের কথা জানিয়ে এসেছিলো।

সে মুগ্ধ বিহ্বল হোয়ে শুনছিলো শিবাণীর কণ্ঠস্বর। এ যেন দূর থেকে ভেসে আসা সেই মন্দিরের আরতির মৃদু ঘণ্টাধ্বনি। তারপর তার মনে হোলো – সে যেন জানু পেতে বোসে প্রার্থনা কোরছে। আর তার সামনে মা ভগবতী—আর—আর—

শিবাণী কাপড় বদলে এসে দেখে, কানন ঘুমিয়ে পোড়েচে। তাড়াতাড়ি গিয়ে একখানা চাদর এনে কাননের সর্বাঙ্গে বেশ কোরে জড়িয়ে দিলে। ঝীকে ডেকে বললে "আস্তে আস্তে তুলে আমার বিছানায় শুইয়ে দাও।"

ঝী বললে—"কোথাকার কে একটা রাস্তার নোংরা কাপড় চোপড় পরা মেয়ে মা, কী যে আপনি বলেন ? ওকে আপনার বিছানায় শোয়াবো কি ?" শিবাণী শুধু বললেন "যা বলছি করো। ওকে আমি নূতন কাপড় পরিয়ে দিয়েছি।"

কানন ঘণ্টাখানেক পরে জেগে উঠলো। তারপর অকস্মাৎ তার খেয়াল হোলো, কোথা সে ? কী কোরতে এসেছিলো। কিন্তু কী কোরে বোসেচে ও

ছিঃ ছিঃ ছিঃ। ছবি দেখতে দেখতে সে ঘুমিয়ে পোড়েচে। লজ্জায় তার মাটির সংগে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছে হোলো। এই যে সে ঘুমিয়ে পড়ে দেরী করে ফেললে মা ভগবতী যদি আর তাদের বাড়ী না যেতে চান।

শিবাণী সান্ত্বনা দিয়ে বোললো "কিছু ভেবনা কানন। একটু দেরী হয়ে গেল।
বাড়ী বেড়িয়ে আসি।"

কাননকে সঙ্গে নিয়ে শিবাণী তাদের মোটরে বেরিয়ে পোড়লো।

বাজারের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে শিবাণী বোললো "আমাদের যে অনেক জিনিষ চাই কানন। চলো তুমি কিনে দেবে, কেমন ?"

কানন খুশি হোয়ে মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানালে। তারপর শিবাণীর জিনিষ কেনার বহর দেখে তার আশ্চর্য লাগলো।

গাড়ী বোঝাই হোয়ে গেচে। ফল, মিষ্টি, দুধ, তরিতরকারি চাল, দাল, আটা, তেল, নুন, ঘী আরোও কত কি।

শেষে এমন অবস্থা হোলো যে আর একটি জিনিষও নেবার উপায় নেই। গাড়ীভর্তি, হাতভর্তি, পকেটভর্তি। সব ভর্তি।"

বাড়ির কাছে এসে কানন শিবাণীর হাত ধোরে টেনে নিয়ে বাড়িতে ঢুকলো। অন্ধকার গলিপথ বেয়ে তাদের ছোটটো ঘরটির সামনে এসে দাড়ালো।

শিবাণী একটু ইতস্ততঃ কোরছিলো। কানন তাকে টান দিয়ে বোললো "বা রে। বাইরে কেন, ভেতোরে চলো না।"

শিবাণী ঘরে ঢুকে দেখে—ঘর অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না। অনেকক্ষণ পরে ক্ষীণ সন্ধ্যালোক দেখা গেল। শুধু এক কোণে একখানা খাট। তার উপর কঙ্কালসার এক নারী শুয়ে, কোলে তার একটি ঘুমন্ত শিশু। না খেতে পেয়ে শুকিয়ে গেছে। খাটের পাশে একখানা চেয়ার—নোংরা, ভাঙা। আর কিছু নেই তাদের।

কাননের সাড়া পেয়ে মা ক্ষীণকণ্ঠে বোলে উঠলো "কে ?"

কানন বোললো "মা, আমি। দেখো না মা, কাকে ধোরে এনেচি।"

স্নিগ্ধকণ্ঠে মা বোললেন "কাকে ধোরে এনেচিস্, মা ?"

শিবাণী এগিয়ে এসে খাটের একপাশে বোসে মায়ের একখানা হাত দু'হাতে চেপে ধোরে বোললো "আমি এসেচি, মা। তোমার অচেনা একটি মেয়ে। তোমার সেবা কোরে ধন্য হবো বোলে।"

মা একবার কৃতজ্ঞ নয়নে শিবাণীর দিকে চাইলেন। শিবাণী ততক্ষণ কাজে লেগে গেচে।

কানন পরীর গল্প পোড়েছিলো। পরীরা একবার সোনার কাঠি ছোঁয়ালে 'পর ঘর দোর ভিটে-মাটির শ্রী

বদ্‌লে যায়। দুঃখ কষ্ট থাকে না, অভাব থাকে না। তার কেবলই মনে হোতে লাগ্‌লো, তাদের বাড়িতেও আজ এক গরীব শুভাগমন হোয়েচে।

শিবাণী প্রথম লণ্ঠনটা ধরালো। সমস্ত ঘর আলোকিত হোলো। তারপর খানিকটা দুধ গরম কোরে সৌম্যেনকে কোলে নিয়ে খাওয়াতে লাগ্‌লো।

সোম্যেন দুধ পেয়ে ভারি খুশি—ঘুমে নেতিয়ে পড়া ভাবটা কেটে গেল। বল্‌-বল্‌ কোরে আবআব কথা কয় আর হাসে। সোম্যেনকে খাইয়ে সোম্যেনের মাকে নিয়ে পোড়লো শিবাণী।

তারপর কাননের পালা।

শিবাণী কাননের হাত মুখ মুছিয়ে চুলটি আঁচড়িয়ে নিজের নোতুন দামি শালখানা দিয়ে তার সর্বাঙ্গ ঢেকে দিলে। তারপর তাকে সযত্নে খাইয়ে দিতে লাগ্‌লো।

কানন আজ বড়ো পরিশ্রান্ত—খেতে খেতে সে আবার ঘুমিয়ে পোড়লো।

মা বোল্‌লেন "এমন বুক ভরা স্নেহ-করুণা নিয়ে তুমি কোন্ স্বর্গ থেকে নেমে এলে, মা? আমি ভেবেছিলাম, কানন আমার পথ হারিয়ে কোথা সর্বনাশ কোরে বোসেচে। ভেবেছিলাম, কচি এই বাচ্চাটাকে নিয়ে আমার এইখানে শুয়ে শুয়েই শুকিয়ে মর্‌তে হবে। তুমি মা, আমার কাননকে ফিরিয়ে এনেচো। আমাদের বাঁচিয়েচো। তুমি দেবী।"

আচম্বিতে মন্দিরে ঘণ্টা বেজে উঠতে কাননের ঘুম ভেঙে গেলো। সন্ধ্যার আরতি সুরু হয়ে গেছে।

চোখ মেলে দেখে—আকাশের বুক থেকে ঝলকে ঝলকে জোৎস্নার আলোক এসে ছড়িয়ে পোড়চে আর উজ্জ্বল তারাগুলো একটি একটি কোরে আকাশের নীল সমুদ্রে সাঁতার কাটতে সুরু করেছে। শিবাণী সন্ধ্যারতির শঙ্খ ঘণ্টা শুনে জানলার ধারে গিয়ে গলায় আঁচল দিয়ে জোড় হাতে চোখ বুজে দাঁড়িয়েছিল। কানন তখন মুগ্ধ বিস্ময়ে আকাশের দিকে চেয়ে আছে। হঠাৎ সিঁড়িতে কার দ্রুত পায়ের শব্দ হোলো। কে যেন ছুটে উপরে আসচে।

পরক্ষণেই একজন লোক ব্যস্ত হোয়ে ঘরে ঢুকে তাড়াতাড়ি খাটের কাছে এগিয়ে গেলো এবং মা ও মেয়েকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো। তারপর আপন মনে অনেক কথা বোলে গেলো। এতোদিন না আসার কারণ কি তাই সে বল্‌ছিলো।

কানন বাবার সাড়া পেয়েই উঠে বসেছিলো। বললে। মা ভগবতীকে দেখেচো, তুমি বাবা?"

—"মা ভগবতী! সে কি।

"হ্যাঁ, বাবা! তুমি অনেকদিন ঘরে ফিরচো না দেখে, আমি মন্দিরে গিয়ে মার কাছে বলে এলাম মা আমাদের দুঃখ দূর কোরে দাও। আর দয়া করে আমাদের ঘরে এস। তাই তো তিনি আমাদের ঘরে এসেচেন। দেখতে পাচ্ছোনা বাবা, ঐ যে তিনি।"

বাপ অবাক হয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে দেখেন জানলার কাছে দাঁড়িয়ে এক অপরূপ রমণীমূর্তি।

কানন বললে "উনিই মা ভগবতী, বাবা! দেখচো না কেমন দেবীর মত রূপ! কপাল থেকে আলো ফুটে বেরুচ্ছে। কেমন জল্‌জ্বলে দুটি সুন্দর চোখ।"

বাবা বললেন "তুই ঠিক বলেচিস, কানন। জগজ্জননী মা আমাদের এমনি দেবীরই বেশ ধরে আসেন। তোর প্রার্থনা সার্থক হয়েচে, মা। তোরই ডাকশুনে মা আমাদের দীনের কুটীরে শান্তি আশীর্বাদ বয়ে এনেচেন।"

নিজে বড় হও

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম. এ বি. টি.

বড় হতে চাও, নিজে বড় হও পূর্বপুরুষের দোহাই মিছে।
তুমি তো দোহাই দিলে অপরের সন্তানের তরে রাখ কি পিছে?

ডিংগো

শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত, এম-এ

অস্ট্রেলিয়ার বনে জংগলে নানান্ রকমের জীবজন্তু আছে বটে, কিন্তু, এক ডিংগো ছাড়া আর কেউই হিংস্রপ্রকৃতির নয়। ডিংগো এক রকম বন্য কুক্কুর—আকারে বেশ বড় এবং সময় সময় মানুষকেও আক্রমণ করে। অস্ট্রেলিয়ার সবত্রই ডিংগো দেখা যায় এবং সংখ্যায় তারা এত বেশী যে মানুষকে সকল সময় সন্ত্রস্ত থাকতে হয় তাদের ভয়ে। দিনের বেলায় ডিংগো বাইরে বেরোয় না, চুপচাপ শুয়ে থাকে গভীর বনে বা গুহার মধ্যে, আর রাত্রি হলেই শিয়াল ও নেকড়ে বাঘের মত ঘুরে বেড়ায় শিকারের সন্ধানে।

অস্ট্রেলিয়ার প্রাণিজগতে ডিংগো এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। ঐ জাতীয় প্রাণী এখন আর নেই। কবে ও কেমন করে ডিংগো ওখানে প্রথম আসে তা' আজও কেউ নির্ণয় করতে পারেনি।

ডিংগোর স্বভাব ও দেহের গঠন অনেকটা নেকড়ে বাঘ ও শিয়ালের মত। তাই থেকে মনে হয় ডিংগো সম্ভবতঃ ঐ জাতীয় প্রাণী।

ডিংগো উচ্চতায় দু' ফুট ছ' ইঞ্চি এবং দৈর্ঘ্যে পাঁচ ফুটেরও বেশী। শরীরের গঠন বেশ বলিষ্ঠ। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পেশীবহুল। মুখ লম্বা ও সরু, কান দুটো ছোট ও খাড়া, ল্যাজ লোমশ ও দীর্ঘ। পিঠের রং লাল ও কালোর মাঝামাঝি। থাবা আর ল্যাজের ডগা সাধারণতঃ শাদা, দাঁতগুলো ছুঁচের মত ধারালো—যখনই কোন প্রাণীকে সে কামড়ে ধরে তখনই তার খানিকটা মাংস অনায়াসে ছিঁড়ে নেয়, আর তার ফলে আহত প্রাণীটির তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটে।

ডিংগোর ডাক নেকড়ের ডাকের মতই গম্ভীর ও ভয়ঙ্কর। ওরা সচরাচর দল বেঁধে শিকার করতে বেরোয়—সাহস ওদের নেকড়ের চেয়ে কম। তবে ওদের মধ্যে যারা বেশী সাহসী ও চতুর তারা মাঝে মাঝে একলাই বেরোয়। একা যারা শিকার করে তারা আবার ক্ষতি করে বেশী এবং তাদের ধরা ভারী শক্ত। ডিংগোরা শিকার করে নিঃশব্দে, কিন্তু শিকার শুরু করার আগে তারা একসঙ্গে ডাকে খানিকক্ষণ।

শিকারী জন্তু হিসাবে ডিংগোর কতকগুলি গুণ আছে। অস্ট্রেলিয়ার জংগলে অন্য যে সব জন্তু আছে তাদের মধ্যে ডিংগোর বুদ্ধিই সবচেয়ে বেশী। দৃষ্টি ওদের খুব তীক্ষ্ণ, ঘ্রাণশক্তি অসাধারণ এবং ফন্দী উদ্ভাবনে সুচতুর। ওরা যখন চলে তখন শব্দ হয় না মোটেই, আর যখন যে কাজে প্রবৃত্ত হয় তা সহজে ছাড়ে না। ওদের প্রধান খাদ্য কাংগারু, ভেড়া, ওয়ালাবি প্রভৃতি জংগলের যাবতীয় পশু ও পক্ষী। অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন স্থানে যারা গরু, ভেড়া প্রভৃতি পশু পালন করে জীবিকার্জন করে তাদের পরম শত্রু ডিংগো। প্রতি বছরই হাজার হাজার গৃহপালিত পশু ডিংগোর হাতে মারা যায়। বস্তুতঃ ডিংগোর অত্যাচারের ফলে পশু-ব্যবসায়ীদের বছরে ক্ষতি হয় প্রায় বিশ লক্ষ পাউণ্ড। তার কারণ এই যে, ডিংগো কোন জন্তু দেখলেই তাকে মারবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। যদি ওরা শুধু

খাদ্যের জন্য পশুবধ করতো এবং ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য যতটুকু দরকার তাইতেই সন্তুষ্ট হত, তাহলে পশুব্যবসায়ীরা অত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হ'তনা। কিন্তু ডিংগোর মধ্যে হত্যা করার প্রবৃত্তি এত প্রবল যে ওরা হত্যা করার সুযোগ পেলে আনন্দে অধীর হয়ে ওঠে। এক পাল ভেড়া বা এক দল গরু বাছুর দেখলে ওরা উত্তেজিত হয়ে ছুটাছুটি করতে থাকে—তারপর সামনে যারে পায় তেড়ে গিয়ে কামড়ে ধরে। ওদের তীক্ষ্ণ দাঁতের কামড় এমনি যে সঙ্গে সঙ্গেই বেদনায় আহত পশুটির মৃত্যু ঘটে। একটি পূর্ণবয়স্ক ডিংগো অনায়াসে যে কোন পশুকে কাবু করতে পারে দাঁত দিয়ে কামড়ে। কুইন্সল্যাণ্ডের পশ্চিমাঞ্চলে একটি ডিংগো পঞ্চাশটা ভেড়াকে মেরেছিল দশ মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে।

আগষ্ট থেকে অক্টোবর এই তিন মাস ডিংগোর শাবক প্রসবের সময়। সাধারণতঃ ডিংগো একসঙ্গে সাত আটটি শাবক প্রসব করে, সতেরোটি শাবকও একসঙ্গে জন্মেছে এমন খবরও পাওয়া যায়। ডিংগো শাবক প্রসব করে গাছের গুঁড়ির কোন গর্তের মধ্যে অথবা গভীর বনের ভিতরে কোনও গোপন স্থানে। ডিংগো-শাবকের শত্রু বনের ভিতরে বড় বেশি নেই—তার ভয় শুধু ঈগল পাখী আর সাপকে।

অস্ট্রেলিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করার পর থেকে ইউরোপীয়ানরা ডিংগোর বিরুদ্ধে অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে আসছে, কিন্তু ষাট বছর আগেও ডিংগোর সংখ্যা যত ছিল আজও ঠিক তাই। বর্তমান সময়ে হাজার হাজার শিকারী ডিংগো মারবার জন্য দেশের সর্বত্র নিযুক্ত রয়েছে আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ ঐ কাজে মোটা টাকাও আয় করছে। সপ্তাহে বিশ পাউণ্ড রোজগার অনেকেই করে। কোনও কোনও প্রদেশে একটি ডিংগোর মাথার দাম দু' পাউণ্ড ধার্য করা আছে, তবে এক পাউণ্ডই হচ্ছে সাধারণ দাম। মেষ ব্যবসায়ের কেন্দ্রে—যেখানে ডিংগো বিভীষিকা রূপে গণ্য—সেখানে একটী ডিংগোর মাথার দাম দুশ পাউণ্ড পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে।

ডিংগো ধরার ফাঁদ পাতা খুব সহজ কাজ নয়—তাতে বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক। ইঁদুর ধরবার জন্য সচরাচর যে জাঁতীকল ব্যবহার করা হয় ডিংগো ধরার কলও প্রায় সেই রকম—তবে আকারে এ কল অনেক বড় এবং এর দাঁতগুলো করাতের দাঁতের মত ধারালো। যে পথে ডিংগো সচরাচর যাতায়াত করে সেই পথে মাটিতে একটি গর্ত খোঁড়া হয় এবং সেই গর্তের মধ্যে জাঁতীকলটা রেখে গাছের পাতলা ছাল দিয়ে গর্তের মুখটা ঢেকে রাখা হয়। তারপর উপরে খানিকটা মাটি ছড়িয়ে দেওয়া হয় এমনি ভাবে যাতে ফাঁদপাতার কোন চিহ্নই না থাকে। আশ-পাশে যদি কিছু বাড়তি মাটি পড়ে থাকে তা খুব সাবধানে সরিয়ে ফেলা হয়, সেখানে যে ফাঁদ পাতা হয়েছে তা যেন একেবারেই বোঝা না যায়, কারণ ডিংগো ভারী চতুর এবং সন্দেহজনক কিছু দেখলেই সাবধান হয়ে যায়।

জাঁতীকলটা মাটিতে কোনও খুঁটির সঙ্গে বাঁধা হয় না, কারণ তাতে বিপদ এই যে, ডিংগো তার অপরিসীম শক্তির সাহায্যে নিজেকে সহজেই মুক্ত করে নেবে। শুধু তার একটি থাবা হয়ত জাঁতীকলে কাটা পড়বে। কিন্তু থাবা হারিয়েও মানুষের অনিষ্ট করার শক্তি তার কিছুমাত্র কমবে না এবং সে যে আর ভবিষ্যতে ফাঁদে ধরা দেবে না তা একরকম নিশ্চিত।

জাঁতীকল খুঁটির সঙ্গে বাঁধা হয় না আরও এইজন্য যে ঐ কলটা টানতে টানতে ডিংগো পালাবে। হয়তো অনেকদূর চলে যাবে—যদি তার পিছনের পা কলে আটকে যায়। সেটা যাতে না ঘটতে পারে তার জন্য একখানা ভারী কাঠ জাঁতীকলের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয় তারের সাহায্যে। এতে ডিংগোর চলাফেরার অসুবিধা ঘটে, তা ছাড়া মাটিতে কাঠের এমন একটা চওড়া দাগ পড়ে যা শিকারী সহজেই অনুসরণ করতে পারে। জাঁতীকলে ধরা পড়েও ডিংগো অনেক সময় কল সমেত বাসায় ফিরে আসে। শিকারী দাগ দেখে ডিংগোর বাসায় গিয়ে হাজির হয় এবং একসঙ্গে দশ বারোটি ডিংগোকে ধরে ফেলে।

যখন কোনো ডিংগো বারংবার গৃহপালিত পশু মেরে কোন জায়গায় আতঙ্কের সৃষ্টি করে এবং তাকে ধরবার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয় তখন শিকারীদের নানান্ রকম কৌশল উদ্ভাবন করতে হয় তাকে ফাঁদে ফেলবার জন্য। কুইন্সল্যাণ্ডের এক মেষ ব্যবসায়ের কেন্দ্রে একটি ডিংগো কয়েক মাস ধরে ভয়ংকর অত্যাচার করতে থাকে, কিন্তু কেউই তাকে ধরতে পারে না। ডিংগোটার মাথার জন্য

পুরস্কার ঘোষণা করা হল, শিকারীরা অনেক চেষ্টা করলে তাকে ফাঁদে ফেলার জন্য, কিন্তু তাদের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হল। ক্রমে ডিংগোটির অত্যাচার এমন বেড়ে উঠল যে ব্যবসায়ীরা পুরস্কারের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে বাধ্য হলেন। পঞ্চাশ পাউণ্ড পুরস্কারের কথা শুনে, আশপাশের নানা জায়গা থেকে দলে দলে দক্ষ শিকারী এল, কিন্তু তারাও কিছু করতে পারলে না। অবশেষে একজন শিকারী লক্ষ্য করলে, ঐ অঞ্চলের পোষা কুকুরগুলো পায়ে কোন চটচটে জিনিস লাগলেই পা চাটতে শুরু করে। এ থেকে তার মাথায় একটি মতলব এল এবং প্রচুর পরিমাণ ঝোলা গুড় কিনে তার সঙ্গে বিষ মিশিয়ে, খোঁয়াড়ের বেড়ার যে অংশ দিয়ে ডিংগোটি ভিতরে ঢুকত সেইদিকে ছড়িয়ে দিলে। পরের দিন সকালে দেখা গেল ডিংগোটা বেড়ার ধারে মরে পড়ে আছে। ডিংগোটি দৈর্ঘ্যে ছিল ছ'ফুট এবং উচ্চতায় প্রায় তিন ফুট আর এর ওজন ছিল একশো তেত্রিশ পাউণ্ড।

বর্তমানে ডিংগোর অত্যাচার কুইন্সল্যাণ্ডে এমন বেড়ে গিয়েছে যে ওখানকার গভর্ণমেণ্ট ডিংগো ধ্বংস করার জন্য উঠে পড়ে লেগে গিয়েছেন। কয়েক বছর গবেষণার পর ডনকিন নামে একজন নামজাদা মেষ ব্যবসায়ী ডিংগো মারার একটি বিষাক্ত টোপ (posion bait) আবিষ্কার করেছেন। গভর্ণমেণ্ট একটি কারখানা খুলে ঐ টোপ তৈরী করছেন প্রচুর পরিমাণে। ভেড়ার চর্বি, ময়দা, লবণ, শুকনো রক্ত এবং সেঁকো বিষ এক সঙ্গে ফুটিয়ে ঐ টোপ তৈরী করা হয়। তৈরী করার সময় কেউ ওতে হাত লাগায় না—পাছে ডিংগো মানুষের হাতের গন্ধ পেয়ে সাবধান হয়ে যায়। টোপটা তৈরী হয়ে গেলে ঐ বিষ চামচের সাহায্যে ছোট ছোট কাগজের টুকরার উপর ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং বিষটা শুকিয়ে যাবার পর কাগজের টুকরাগুলো জঙ্গলের মধ্যে ইতস্ততঃ রেখে দেওয়া হয়। পরিণত বয়স্ক চতুর ডিংগো হয় তো ঐ বিষাক্ত কাগজের টুকরা ছোঁবে না, তবে বাচ্চাগুলো ওর প্রলোভন কখনো সামলাতে পারবে না। সবাই আশা করছে যে এই ব্যবস্থার ফলে ডিংগোর বংশবৃদ্ধি অনেক পরিমাণে কমে যাবে।

সাধারণতঃ ডিঙ্গোরা মানুষকে আক্রমণ করে না—মানুষ দেখলেই ওরা ভয়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু যখন ওরা ক্ষুধার্ত হয় তখন মানুষকে আক্রমণ করতে দ্বিধাবোধ করে না। কুইন্সল্যাণ্ডের পশ্চিমাঞ্চলে একজন মেষরক্ষী একদিন অপরাহ্নে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে হাতে আঘাত পায়। ঘোড়াটা আরোহীকে ফেলে ছুটে পালিয়ে যায়, লোকটি জামা ছিঁড়ে ক্ষতস্থান ব্যাণ্ডেজ করে তার কুটিরের দিকে হাঁটতে সুরু করে। কুটিরটি প্রায় তিন মাইল দূরে। যখন সে হেঁটে চলেছে সেই সময় তার ক্ষতস্থান থেকে রক্ত বেরিয়ে মাটিতে ফোঁটা ফোঁটা পড়তে থাকে। সন্ধ্যার সময়, যখন সে কুটির থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে, পিছনে সে একটা মৃদু শব্দ শুনতে পেলে, ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখে দুটো মস্ত বড় ডিংগো তার পিছু পিছু আসছে আর মাঝে মাঝে থেমে মাটিতে পড়া রক্তবিন্দু শুঁকছে আর জিভ দিয়ে ঐ রক্ত চাটছে। এ দৃশ্য দেখে রক্ষীর প্রাণ ভয়ে উড়ে গেল, এক মুহূর্ত না থেমে সে কুটিরের দিকে ছুটতে শুরু করলে।

কুটিরে ঢুকে যখন সে দরজায় খিল দিয়েছে তখন ডিংগো দুটো সেখানে এসে হাজির। রক্ষীর বন্দুক ছিল না, কাজেই জানলা বন্ধ করে চুপচাপ বসে সে ভোর হওয়ার প্রতীক্ষা করতে লাগল, কারণ সে জানত ভোর হলেই ডিংগোরা সরে পড়বে। রাত্রিতে আরও কয়েকটা ডিংগো এসে তাদের সঙ্গে যোগদান করলে এবং কুটিরের চারিদিকে ঘুরে তারা চেঁচাতে লাগল এবং বার কয়েক দরজাটা ঠেলে খোলবার চেষ্টা করলে। শেষ রাত্রির দিকে চারজন অশ্বারোহী এসে পড়ায় তারা পালিয়ে যায়। আহত রক্ষীটির ঘোড়া আরোহীকে না নিয়ে আস্তাবলে ফিরে আসায় সবাই ভেবেছিল যে নিশ্চয়ই রক্ষীর কোনও বিপদ ঘটেছে, তাই তাকে রক্ষা করবার জন্য এই চারজন অশ্বারোহী তার সন্ধানে বেরিয়েছিল।

আর একবার একজন মজুর কুইন্সল্যাণ্ডের মেষ ব্যবসায়ের কেন্দ্রে সন্ধ্যার সময় বেড়া মেরামত করছিল এমন সময় তিনটে ডিংগো তাকে আক্রমণ করে। ডিংগোদের কামড়ে মজুরটির পা ক্ষত বিক্ষত হলেও সে একটা বড় লাঠির সাহায্যে অনেকক্ষণ তাদের ঠেকিয়ে রাখে। শেষে আরেকজন মজুর ডিংগোর ডাক শুনে বন্দুক নিয়ে ছুটে আসে তখন ডিংগোগুলো ভয়ে পালিয়ে যায়।

আরও ভয়ংকর অবস্থা ঘটেছিল একজন কলার চাষীর। রাত্রে সে যখন বিছানায় শুয়ে আছে সেই সময় একটা প্রকাণ্ড ডিংগো খোলা দরজা দিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে হঠাৎ তাকে আক্রমণ করে। অনেকক্ষণ লড়াই করার পর লোকটি মশালের প্রচণ্ড আঘাতে ডিংগোটাকে কাবু করে ফেলে। পরে কুঠারের সাহায্যে তাকে হত্যা করে।

রাজা অ্যালফ্রেড্

নিরঞ্জন মজুমদার

রাজারা থাকেন ভীতির প্রতীক, অ্যালফ্রেড্ ছিলেন প্রীতির। তাই তাঁর নাম হয়েছে ইংল্যাণ্ডের 'ডার্লিং কিং', প্রিয় রাজা। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে, যে, কলম নাকি বল্লমের চাইতে বলশালী। অ্যালফ্রেড্ দু'য়েরই চর্চা ক'রেছিলেন।

অ্যালফ্রেড্‌কে বলা যায় দ্বিজ, তাঁর জীবনকে স্পষ্ট দু'ভাগে ভাগ করা চলে। প্রথম জীবনে তাঁকে দেখতে পাই অসিহস্তে, তারপরে এলো মসী। তাঁর নিজের কথা।

"মানুষের সকল কার্যই বৃদ্ধ হবে, তারপর প'ড়ার ঝ'রে, যদি না তার পেছনে থাকে জ্ঞান, বুদ্ধি।... যতদিন আমি বাঁচবো, আমি বাঁচবো মহান জীবন। ব্যস্ত থাকবো এমন কাযে যা আমাকে ক'রবে চিরস্মরণীয়।"

এই হোলো তাঁর কথা, আর, তাঁর কথায় ও কাজে ব্যবধান ছিলো অল্পই। এই-পৃথিবীতে বেচে ছিলেন তিনি তিপ্পান্ন বছর, ৮৪৮ থেকে ৯০১ খৃষ্টাব্দ। আর এরই মধ্যে তিনি দেশের অর্ধেক নরনারীকে ক'রেছিলেন শিক্ষিত, ক'রেছিলেন মৃতপ্রায় জাতীয় সাহিত্যের পুনরুদ্ধার, আর, গড়েছিলেন ইংরেজি গদ্যকে।

তাঁর রাজত্বের বেশির ভাগ সময়ই ব্যয়িত হ'য়েছিল উত্তরে ডাকাত ডেন্-দের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে। ডেনরা ছিলো ডাকাত, রাজত্ব ক'ররার দুরভিসন্ধি ছিলো না বটে, কিন্তু, ধনরত্ন লুট ক'রে নেবার লোভ ছিলো প্রচণ্ড। তাই এরা ইংল্যাণ্ডে হানা দিতো সময়ে অসময়ে, প্রায় সারা বছর ধরে। এ-যুদ্ধের অবসান হোলো ৮৭৮ খৃষ্টাব্দে, ওয়েডমুরের সন্ধি স্বাক্ষরিত হ'লে।

সন্ধির পরে অ্যালফ্রেড্ হ'লেন সমস্ত উত্তর ইংল্যাণ্ডের একচ্ছত্র অধিপতি। সব ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হোলো রাজার হাতে, তাই শান্তি এলো দেশে। অ্যালফ্রেড তরবারিকে ব'ললেন: হে বন্ধু, বিদায়। এবার আর রণ নয়, জ্ঞান-আহরণ আর বিতরণ।

রাজার বয়স তখন তিরিশ বছর। কিন্তু উৎসাহ তাঁর অপরিসীম। তিনি শুরু ক'রলেন ল্যাটিনের অ আ ক খ শিখতে--ঠিক যেন ইস্কুলের ছেলেটি। শিখলেন, শেখালেন। অ্যালফ্রেড প্রবর্তন ক'রলেন ইংরেজি ভাষার প্রচলন। এর আগে বিদ্যার সর্বস্ব সংরক্ষিত ছিলো পরভাষায়, ল্যাটিনে। মাতৃভাষাকে মুক্তি দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হ'লেন না, পণ্ডিত আর বিদ্বজ্জনের সঙ্গে একাসনে ব'সে ক'রলেন বিদেশী বহু গ্রন্থের অনুবাদ, ইংরেজি ভাষাকে দান ক'রলেন প্রসারতা।

অ্যালফ্রেড্ চারখানা মূল্যবান ল্যাটিন গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ ক'রেছিলেন: ওরাসিয়ুস্-এর "বিশ্বের ইতিহাস আর ভূগোল", বিড্-এর "ইতিবৃত্ত", গ্রেগরী-র "রাখালের বই" এবং বোয়েথ্যুস-এর "দর্শনের সান্ত্বনা।"

কিন্তু, সমস্ত অনুবাদের চাইতেও মূল্যবান তাঁর সমসাময়িক-ইতিহাস রচনার প্রবর্তন। কেউ কেউ বলেন, এ তাঁর প্রবর্তন নয়, প্রবর্ধন মাত্র, অর্থাৎ, অনেক দিন আগে থেকেই লেখা হ'চ্ছিলো, অ্যালফ্রেড্-এর বিদ্যোৎসাহ একে পুনরুজ্জীবিত ক'রেছিল। অ্যালফ্রেড্-এর নিজের রাজত্ব কালের কাহিনী এতে এমন সরসভাবে লিপিবদ্ধ আছে, যে, এ-ইতিহাস প্রায় সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে। পুরোনো ইংরেজি গদ্যের এমন চমৎকার উদাহরণ আর নেই। অবশ্য, রাজা নিজেই এ-কাহিনী লিখেছেন কিনা সঠিকভাবে জানা নেই।

তাঁর যুগে এ হ'য়েছিলো; এটাই কিছু কম কৃতিত্বের কথা নয়।

আমরা কর্ দিই কেন?
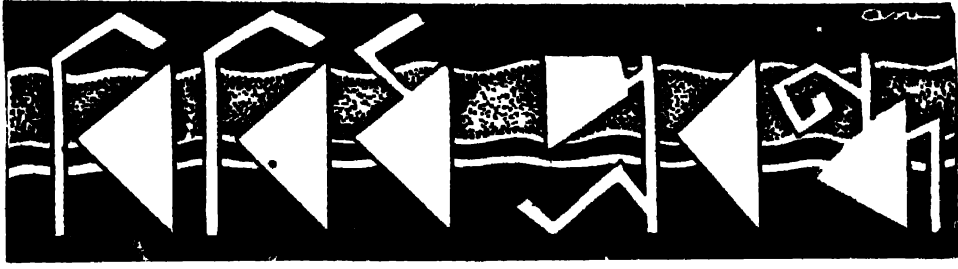
শ্রীইন্দুপ্রকাশ ঘোষ

আমরা যেমন কোনও ফুটবল ক্লাব বা অন্য কোনও সমিতির সভ্য হ'লে সেই ক্লাব বা সমিতির ব্যয় নির্বাহ কর্‌বার জন্য মাসিক বা বাৎসরিক চাঁদা দিয়ে থাকি তেমনই আমাদের এই দেশটাও একটা ক্লাব বা সমিতির মতন, আর এই সমিতির ব্যয় নির্বাহ কর্‌বার জন্য আমাদের নানা রকমে চাঁদা বা কর্ দিতে হয়। তফাৎএর মধ্যে এই যে ক্লাব বা সমিতির সভ্য ইচ্ছা কর্‌লেই না থাকা যায় এবং সভ্য না হ'লে চাঁদাও দিতে হয় না। কিন্তু, দেশে থাক্‌লেই সকলকেই এ দেশের অধিবাসী হ'তে হয় এবং এই বাধ্যতামূলক চাঁদা বা কর্ দিতেই হয়। মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত বা এদেশ ছেড়ে চলে না যাওয়া পর্যন্ত এর আর নিস্তার নেই। কর্ বিভাগে প্রাপ্য কর্ না দিলে দেশের আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হ'তে হ'বে এবং ধন সম্পত্তি বিক্রয় করে গভর্নমেণ্ট প্রাপ্য কর্ আদায় করে নেবে।

এখন দেখা যাক্, এই কর্ যে আমরা দিই, এর বদলে কি পাই। পাই অনেক জিনিষ যা' আমাদের কারও পক্ষে একলা পাওয়া কখনই সম্ভব হ'ত না। এই যে অল্প বিস্তর কর্ আমাদের দেশের সমগ্র অধিবাসী—কি ধনী কি দরিদ্র সকলেই নানাভাবে দিই এইগুলির সমষ্টি একটা বিরাট অর্থ ভাণ্ডার সৃষ্টি করে। এই অর্থ ভাণ্ডার থেকেই আমাদের দেশের নানা রকম জন হিতকর ও জন সাধারণের সুখ সুবিধার উপযোগী কাজ করা হয়। এই সমস্ত অর্থ থেকেই বাঁধান পাকা রাস্তা, পুল, রাস্তার আলো, জলের কল, ড্রেন পাইখানা, ময়লা পরিষ্কার করা, শান্তি রক্ষার জন্য পুলিশ ও আদালত বিভাগ, দেশ রক্ষার জন্য সৈন্য সামন্ত, খবর আদান প্রদানের জন্য ডাক্ ও তার বিভাগ, বেচা কেনা নিয়ন্ত্রিত কর্‌বার জন্য মুদ্রা প্রস্তুত ও প্রচলন বিভাগ, এই সমস্ত কর্ আদায় কর্‌বার বিভিন্ন বিভাগ এবং সাধারণের জন্য পাঠাগার, হাসপাতাল, বেতার প্রতিষ্ঠান, বিশ্রামাগার, উদ্যান এই সমস্তই প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিপালিত হ'চ্ছে। এমনকি এই বিরাট দেশের শাসন সুনিয়ন্ত্রিত করবার জন্য যে সমস্ত গভর্নর ও বড়লাট বাহাদুর এবং তাঁদের মন্ত্রীবর্গ ও পরিষদ প্রতিপালন কর্‌তে যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন হয় সে সমস্তই এই জন সাধারণের প্রদত্ত কর্ থেকেই পাওয়া যায়।

ধনী বা গরীব কেউই এই কর্ দেওয়া থেকে নিষ্কৃতি পায় না। অবশ্য যাঁরা প্রবঞ্চনা করে সরকারকে ফাঁকি দেয়, তাদের কথা আলাদা। তবে যা'র সম্পত্তি ও আয় যত বেশী তা'কে তত বেশী কর্ দিতে হয়। কিন্তু ধনী ও গরীবকে তা'দের আয়ের ঠিক সমান অনুপাতে (Proportionate) কর্ দিতে হয় না। তা'র কারণ যা'র বাৎসরিক আয় ৫০০০৲ টাকা সে যদি শতকরা ১০৲ টাকা হিসাবে ৫০০৲ টাকা কর্ দেয় তা'হলেও তা'র ৪৫০০৲ টাকা থাক্‌বে, কিন্তু যা'র বাৎসরিক আয় মাত্র ৫০০৲ টাকা, তা'কেও শতকরা ১০৲ টাকা হিসাবে ৫০৲ টাকা কর্ দিতে হ'লে তার পক্ষে সেটা কঠিন হয়ে উঠবে। এই সমস্ত বিবেচনা করে আয়করের জন্য বিবর্তিত হার (Graduated Scale) করা হয়েছে, যা'তে, যার আয় যত বেশী তা'র কর-পরিমাণ বা rate ও তত বেশী হ'য়ে যায়। যেমন, যা'র আয়

বৎসরে ২০০০৲ টাকার নীচে তা'কে আয় কর দিতেই হয় না। যা'র আয় বৎসরে ৩০০০৲ টাকা তা'কে টাকা প্রতি সাড়ে চার পাই হিসাবে আয়কর দিতে হয় ৭০।৴০ সত্তর টাকা পাঁচ আনা।

আবার যার আয় বৎসরে ৬০০০ টাকা তা'কে টাকা প্রতি পৌনেআট পাই হিসাবে আয়কর্ দিতে হয় ২৪২৶০ দুইশত বিয়াল্লিশ টাকা তিন আনা। এছাড়া যা'র আয় ২৫০০০৲ টাকারও বেশী তা'কে টাকা প্রতি ২১ পাই হিসাবে কর্ দিয়েও তা'র ওপর আবার অতিরিক্ত কর (Super tax) দিতে হয় এবং মোট ২৭৫৪।৶০ দুই হাজার সাতশো চুয়ান্ন টাকা সাত আনা আয়কর দিতে হয়। অর্থাৎ শতকরা ১০৲ হারের চেয়েও বেশী।

এত হ'ল শুধু আয় করের কথা যা' আমাদের দেশের শতকরা প্রায় ১০।১২ জনের বেশী কেউ দেয় না। এ ছাড়া আরও কত রকম কর্ আছে যা' থেকে ধনী বা গরীব কেউ বাদ যায় না।

মোটামুটি কর্ দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এক হ'চ্ছে প্রত্যক্ষ কর (Direct tax) যা' লোকেদের কাছ থেকে নেওয়া হয়, আর এক হ'চ্ছে অপ্রত্যক্ষ কর (Indirect tax) যা' পণ্যদ্রব্য ও মাদকাদি জিনিষের ওপর নেওয়া হ'য়ে থাকে ও যে কর দেওয়ার সম্বন্ধে ক্রেতা বা জনসাধারণ প্রায়ই সচেতন নয়।

প্রত্যক্ষ কর বা Direct tax প্রধানতঃ নেওয়া হয়ে থাকে আয়কর হিসাবে ও সমস্ত বাড়ীর মালিক ও বাসিন্দাদের কাছ হতে খাজনা (tax) বা Municipal rate হিসাবে। এছাড়া প্রত্যক্ষ কর নেওয়া হয় লাইসেন্স হিসাবে যাঁরা মোটর গাড়ী বা অন্যান্য গাড়ী, ঘোড়া, কুকুর, বন্দুক, বা বেতারযন্ত্র প্রভৃতি রাখেন। গাড়ী চালাতে বা দোকান করতে গেলেও অনেক স্থলে লাইসেন্স হিসাবে প্রত্যক্ষ কর দিতে হয়। এই সমস্ত জিনিষ সৌখীন বা অবস্থাপন্ন লোকেদের পক্ষেই সম্ভব হয় এবং এইজন্যই ধরে নেওয়া হয়েছে যাঁরা এই সমস্ত রাখতে পারেন তাঁদের দেশ প্রতিপালন করবার জন্যও কিছু অতিরিক্ত কর দেবার ক্ষমতা আছে। প্রত্যক্ষ কর আরও এক রকমে নেওয়া হয়। সেটা হচ্ছে Stamp duty বা দলিল দাখিল-কারীর কাছ থেকে। কেউ বেশী টাকা পেলেই তা'র রসিদ দেবার জন্য একটা ১ আনা বা তার বেশী দামের টিকিট লাগাতে হয়। তেমনই সম্পত্তির বিক্রয় বা খরিদ কালে বা উত্তরাধিকারের সময় ও আদালত সম্পর্কিত প্রায় সকল ব্যাপারে অনেককেই অনেক টাকা এই ভাবে Stamp duty দিয়ে প্রত্যক্ষ কর দিতে হয়।

অপ্রত্যক্ষ কর (Indirect tax) নেওয়া হয়ে থাকে জিনিষের ওপর। যেমন মাদক দ্রব্য প্রভৃতির ওপর আবগারী শুল্ক (Excise duty) লবণ কর, পাট কর, নীলকর, দেশলাই বারুদ প্রভৃতির ওপর শুল্ক, আমদানী রপ্তানীর ওপর শুল্ক (Custom duty) বিজলী (Electricity) খরচার ওপর কর, পেট্রোল কর, ক্রীড়ামোদ কর (Amusement tax) ইত্যাদি। এই সমস্ত কর সাধারণতঃ পণ্যদ্রব্যের ওপর ব্যবসায়ীদের দিতে হয় এবং ব্যবসায়ীরা বিক্রয়কালে জিনিষের দামের সঙ্গেই বা টিকেটের দামের মধ্যেই ঐ সমস্ত কর আদায় করে নেন। অর্থাৎ দুই পয়সার দেশলাই কিন্‌লে ঠিক দেশলাই কেনা হয় হয়ত দেড় পয়সার ও কর দেওয়া হয় আধ পয়সা। তেমনই যাঁরা ১ পয়সার বিড়ি বা লবণ কেনেন তাঁদেরও তা'র মধ্যে কতক পরিমাণে কর দেওয়া হয়ে যায়। বায়স্কোপ ও থিয়েটার বা ফুটবল ম্যাচ খেলার টিকিট কিনে কত লোক প্রতিদিন যে কর দিচ্ছেন দেশকে তার সংখ্যা বড় কম নয়।

সমস্ত বিদেশী পণ্যদ্রব্য কেনার সঙ্গে সঙ্গেও তেমনি অপ্রত্যক্ষ ভাবে শুল্ক বা কর দেওয়া হয়ে যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে এই অপ্রত্যক্ষ কর থেকে ধনী বা গরীব কেহই রেহাই পান না এবং এই কর সবাইকেই সমান হিসাবে দিতে হয়। ভেবে দেখলে আশ্চর্য হ'তে হয় যে অত্যন্ত দীন দরিদ্ররা একপয়সার নূণ কিনে পান্তাভাত দিয়ে খেলেও তার মধ্যে দেশের নানা বিভাগ পরিচালনার জন্য গভর্ণমেণ্ট বা দেশকে বাধ্যতামূলক চাঁদা বা কর দিয়ে সাহায্য করে। এই সমস্ত করের সমষ্টি দিয়ে যে কত কোটি টাকার সংস্থান হয় ও তা থেকে দেশের যে কত উন্নতি সাধন হয় ও হচ্ছে তা অনেকেরই ধারণার বাইরে।

আমাদের দেশের শাসন বিভাগকে এই সমস্ত কর এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হয় ও আয় ব্যয়ের খসড়া (Budget) এমন ভাবে তৈয়ারী করতে হয় যাতে প্রতি

বৎসর মোট আদায়ী কর থেকে সমস্ত বিভাগীয় খরচ মেটান যায়। যদি কোনও কারণে খরচ বাড়ে বা যদি দেশের উন্নতি কল্পে জন সাধারণের হিতার্থে নূতন কিছু করা হয় তা হলেই নূতন কোনও কর ধার্য করতে বা কোনও কোনও প্রচলিত করের হার বাড়াতে হয়। যে দেশ যত কম কর আদায় করে সমস্ত খরচ চালাতে পারে সে দেশের প্রজারা তত অর্থশালী হয় ও সমৃদ্ধি লাভ করে। যুদ্ধের খরচের জন্য ও আনুসঙ্গিক বা পরবর্তী ব্যয় সংকুলানের জন্য ইউরোপের এক একটি দেশে ভীষণ রকম কর বৃদ্ধি করতে হয় ও জনসাধারণকে অনেক ক্ষতি ও কষ্ট সহ্য করতে হয় তার ফলে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে যদি জন সাধারণ মিতব্যয়িতার গুণে একতা ও একনিষ্ঠতার দ্বারা সরকারী খরচ কোনও বিষয়ে কমাতে পারে তার ফল জন সাধারণেই পাবে এই ভাবে যে পরবর্তী বৎসরে সেই উদ্বর্ত টাকা থাকার জন্য কোনও প্রচলিত করের হার কমান হবে বা যদি কোনও নূতন খরচ উপস্থিত হয় তাহলে কোনও নূতন কর প্রচলন বা কর বৃদ্ধি করার দরকার হবে না। "কোম্পানীকা মাল্ দরিয়া মে ঢাল" এই প্রবচন অবলম্বন করে আমরা যদি পরিষ্কার জলের কল বিনা প্রয়োজনে খুলে রেখে দিই বা আবর্জনা ফেলবার যায়গায় (Dustbin) আবর্জনা না ফেলে রাস্তাময় ছড়াই তা'হলে সেই অবশ্য প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ করতে বা শহরের আবর্জনা পরিষ্কার করতে বেশী লোক সরবরাহ করতে করপোরেশন বা ভার প্রাপ্ত বিভাগের যে অতিরিক্ত খরচ হবে তার যোগাড় করতে হ'বে আমাদেরই এবং শাস্তিস্বরূপ আমাদেরই দিতে হ'বে আরও অতিরিক্ত কর। কেননা আয় না বাড়লে ঐ অতিরিক্ত খরচ আসবে কোথা থেকে? কারণ, দেশের আয় আসে কর রূপে আমাদেরই কাছ থেকে। আমাদের খরচ আমরা না দিলে দেবে কে? এই সহজ ও সরল কথাটা যে দিন আমাদের দেশের জনসাধারণ বুঝতে পারবে সে দিন অনেক বড় বড় সমস্যার মীমাংসা আপনিই হয়ে যাবে।

মানুষ ও পশু

মৌলভী মহম্মদ মনসুর উদ্দীন এম-এ

Inside Europe নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থ যাহা প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির পাঠ করা কর্তব্য। John Gunther Stalinএর জীবনী সম্পর্কে একটা অদ্ভুত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমি তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"সাইবেরিয়ার একটী ঘটনা আমার বেশ মনে পড়িতেছে। সেখানে আমি এক সময় 'দ্বীপান্তরিত' হইয়াছিলাম। তখন বসন্তকাল। বসন্তকালীন বন্যায় যে সকল কাঠ বিশাল স্ফীতকায় নদীর স্রোত ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য প্রায় ত্রিশজন লোক নদীতে গিয়াছিল। সন্ধ্যার দিকে তাহারা গ্রামে ফিরিয়া আসিল, কিন্তু তাহাদের একজন সঙ্গীকে আর পাওয়া যাইতেছিল না। যখন জিজ্ঞাসা করা হইল, সে কোথায়? তাহারা নিতান্ত নির্লিপ্তভাবে উত্তর করিল যে "সঙ্গিটী সেখানেই রহিয়াছে।" আমি প্রশ্ন করিলাম সেখানেই রহিয়াছে মানে কি? সে আসিল না কেন? তাহারা পূর্ববৎ উত্তর করিল, আসা সম্ভব নয়। নদীতে যা স্রোত, নিঃসন্দেহ জলে ডুবিয়া মরিয়াছে।" অতঃপর তাহাদের মধ্যে একজন তাড়াতাড়ি এই বলিয়া চলিয়া গেল "আমাকে অশ্বটির জল দিতে হইবে।" ইহাতে আমি তাহাদিগকে মানুষ অপেক্ষা পশুর প্রতি অধিক আগ্রহ ও ব্যস্ততা দেখাইবার জন্য যখন ভর্ৎসনা করিলাম, তখন তাহাদের মধ্যে একজন অপর সকলের সম্মতিসহ বলিল "আমরা একটা মানুষের জন্য এত ব্যস্ত হইতে যাইব কেন? মানুষ ত সর্বদা মানুষ সৃষ্টি করিতে পারে, কিন্তু একটি অশ্ব—প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও মানুষ কি একটা অশ্ব সৃষ্টি করিত পারে?"

শব্দ-সমস্যা

শ্রীহরিভূষণ মৈত্র

গাত্র মানে গা যদি হয়
সূত্র মানে সুতা,
'মাত্র' তবে 'মা' কেন নয়,
'জু-ত্র' নয়কো জুতা ?

চক্র যদি হয়বে চাকা
বক্র মানে বাঁকা,
'টক্র' কেন নয়বে 'টাকা',
'অক্র' নয়কো আঁকা ?

কর্দম যদি হয়বে কাদা
তাম্র সে হয় তামা,
'দদম' কেন নয়বে 'দাদা',
'জাম্র'ও নয় জামা ?

অদ্য মানে আজ যদি হয়,
ধান্যতে হয় ধান,
'লদ্য' তবে 'লাজ' কেন নয়,
'গান্য'তে নয় 'গান' ?

পক্ক যদি হয়বে পাকা,
হট্ট মানে হাট,
'ঢক্ক' কেন নয়বে 'ঢাকা'
'লট্ট' সে নয় 'লাট' ?

মৎস্য যদি মাছ হয় বে,
কল্য তে হয় কাল,
'গৎস্য' কেন 'গাছ' নয় বে,
'চল্য' সে নয় 'চাল' ?

ব্যাপার দেখে' কলম ধ'রে
ভাবছি ব'সে তাই
অভিধানটা নতুন ক'রে
লিখতে হবে ভাই।

হাজার হাজার এম্নি তরো
ভুল যে কত আছে,
জানতে যদি ইচ্ছে করো
এসো আমার কাছে।

আধাআধি

শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত, এম, এ

তুকারাম ছিলেন, একজন মহারাষ্ট্রীয় সাধু—শিবাজীর সম-সাময়িক।

তুকারামের সাংসারিক অবস্থা আদৌ ভাল ছিল না। কায়ক্লেশে দিন চলিত। সম্বলের মধ্যে ছিল—মাত্র একখণ্ড আখের ক্ষেত্র।

তুকারাম ছিলেন যেমন নিরীহ ভালমানুষ, তাঁহার স্ত্রীটি ছিলেন তেমনি প্রখর মুখরা। সাক্ষাৎ রণচণ্ডীর মত উগ্রমূর্ত্তি তাঁহার মুখে মুখে কথা বলিবার দুঃসাহস সহজে কাহারও হইত না।

একদিন ঘরে সব বাড়ন্ত। কিছু পয়সা না হইলে খাওয়া পর্যন্ত বন্ধ। তুকারামের স্ত্রী বলিলেন, যাওনা এক আঁটি আখ নিয়ে বাজারে বিক্রী করে যাহয় দুটো পয়সা নিয়ে এসো।

স্ত্রীর কথায় তুকারাম ক্ষেত হইতে এক আঁটি আখ লইয়া বাজারে চলিলেন।

যাইতে যাইতে পথে একদল ছেলের সঙ্গে দেখা।

"তুকা ভাই, আমাদের বড্ড খিদে পেয়েছে—কিছু আখ দেও না আমাদের?" ছেলেদের কাতর অনুনয় সাধু তুকারাম উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি ছেলেদের প্রত্যেককে একখানি করিয়া আখ খাইতে দিলেন। কিন্তু আঁটি ভাঙিয়া আখ বিলাইতে বিলাইতে শেষে আর তাঁহার সম্বল রহিল মাত্র দুইটি।

সেই দুইখানি আখ লইয়াই তুকারাম চলিলেন বাজারে। কিছুদূর গিয়া পথে দেখা এক বৃদ্ধার সাথে। তুকারামের হাতে দু'খানি আখ দেখিয়া বৃদ্ধা কাতর ভাবে বলিল—"দেখো বাছা, আমার সারা শরীর জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, তুমি যদি একটা আখ আমায় দাও।' বৃদ্ধার দুঃখে তুকারামের প্রাণ গলিয়া গেল। তিনি দুইখানি আখের একখানি তাহাকে খাইতে দিলেন॥

ইহার পর কি ভাবিয়া তুকারাম বাড়ীর পথে ফিরিয়া চলিলেন। মাত্র একখানি আখ লইয়া অত দূরে বাজারে গিয়াই বা কী হইবে।

২

দুপুর রৌদ্রে দারুণ ক্লান্ত হইয়া তুকারাম বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার স্ত্রী সেই থেকে বসিয়া আছেন কখন তুকারাম পয়সা লইয়া ফিরিবেন, কখন দু'টি চাউল সিদ্ধ করিয়া সেদিনের মত খাওয়ার ব্যবস্থা করিবেন।

তুকারামকে দেখিয়াই স্ত্রী ছুটিয়া আসিলেন। "দেখোতো! কতখানি বেলা গড়িয়েছে! তোমার যদি কিছু খেয়াল থাকে! নাও, কত পয়সা পেলে বের করো দেখি। জিনিষ পত্র কিনে তবে রান্নার ব্যবস্থা কর্ত্তে হবে।"

পরম শান্তভাবে তুকারাম বলিলেন—"হাঁ দেখো, বাজারে আমি আর যাইনি।"

"মানে?" তুকারামের স্ত্রীর চোখ কপালে উঠিল!

"মানে, পথে কতকগুলি ছেলে আর একটা বুড়ী

ক্ষিদে তেষ্টায় কাতর হয়ে খেতে চাইলো, আখগুলি তাদের বিলিয়ে দিলাম—

"স—ব ?"

"হ্যাঁ প্রায় সবই।" তুকারাম নির্বিকার ভাবেই বলিলেন "তবে এই একটা মাত্র আখ আমি বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছি।" হাতের আখখানি দেখাইলেন।

রাগে দুঃখে তুকার স্ত্রীর মাথায় খুন চাপিল। খঁ। করিয়া স্বামীর হাত হইতে আখের খণ্ডটা কাড়িয়া লইলেন। তারপর ? তারপর সেই সমস্ত আখের খণ্ডটা তুকারামের পিঠের উপর সজোরে মারিয়া ভাঙিয়া দুইখণ্ড করিয়া ফেলিলেন।

সাধু তুকারামের মুখমণ্ডল সরল হাসিতে ভাসিয়া উঠিল। মাটি হইতে আখের খণ্ড দুইটি দুই হাতে পরম আদরে কুড়াইয়া লইয়া বলিলেন—"দেবি। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, আখের খণ্ডটা ঠিক করে দুভাগ কর্তে আমাকে বেশ বেগ পেতে হোত। সে কষ্ট থেকে কিন্তু তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ। এবার এসো দুজনে আধাআধি অংশ গ্রহণ করা যাক্। দেখোতো কতদূর বেলা গড়িয়েছে।"

স্বামীর ক্ষমার পরিধি দেখিয়া তুকারামের অমন কুপিতা স্ত্রীও অভিভূত না হইয়া পারিলেন না। স্বামী যার এমন মহৎ তার আবার দারিদ্র কিসের ?

বিস্ময়

আবুল হোসেন

সারাদিন ধরে মগ্ন থাকেন দাদা আপনার কাজে,
হিজিবিজি ওই লেখা ছেড়ে কভু বাহিরে বেরোয় না যে।
অনুমতি বিনা ঘরে ঢোকা তার সবাকার আছে মানা,
খোকা ভাবে রোজ ঃ কি আছে ওখানে দরকার ভারি জানা।

হঠাৎ সেদিন একটু গেছেন যেই তিনি বাহিরেতে,
অমনি খোকন ছুটে এল সেথা, দেবে না সুযোগ যেতে,
এদিক ওদিক আড়চোখে সব দেখে নিয়ে তারপরে
পা টিপে টিপে কম্পিত-বুকে হাজির হ'ল সে ঘরে।

বই আর খাতা ছড়ান রয়েছে এলোমেলো চারিধারে,
লুঁইয়া পড়েছে টেবিলের পিঠে গ্রন্থাবলীর ভারে,
দোয়াত ভাঙিয়া স্বচ্ছ মেজেতে ডেকেছে কালির বান,
কাত হয়ে আছে একপাশে পায়া ভগ্ন চেয়ারখান।

ধূলো ও বালিতে কবে দেওয়ালের চুনকাম গেছে ঢেকে,
মাকড়সা দল এখানে সেখানে জাল বুনে গেছে রেখে,
দেখে শুনে সব খোকার চোখেতে নিদারুণ বিস্ময়,
এরই তরে এত সাবধান হওয়া, তাও কি কখন হয় ?

দারু-কারু

(ফ্রেটের কাজ)

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

সখ আবার নেই কার। মানুষ মাত্রেরই একটা-না-একটা সখ আছে। হয় তুমি ডাক টিকিট জমাও, নয় দেশলায়ের ছবি সংগ্রহ কর বা এমনি কিছু একটা নিয়ে ছুটির দিনে খানিকটা সময় মশগুল হয়ে থাকই, থাকো। তোমার বন্ধু বান্ধবদের মধ্যেও খোঁজ নিলে দেখতে পাবে, এমনি এক এক জনের মধ্যে এক একটা সখ বেশ কায়েম হয়ে বসে আছে। কারুর সখ পুরানো টাকা-পয়সা সংগ্রহ করা, কারুর সখ অটোগ্রাফ্ নেওয়া, কারুর বা ছবি আঁকা, ফটো তোলা, মাছ ধরা, তাস-পাশা খেলা, গাছ পালা লাগান, সেলাই-ফোঁড়াই করা (অবশ্য এটা মেয়েদের মধ্যেই বেশি) বা জীবজন্তু পোষা। এমনি হরেক রকম সখ হরেক রকম মানুষকে ছেলেবেলা থেকেই পেয়ে বসে অত্যন্ত প্রিয় বন্ধুর মত। কিন্তু এই সখেরও আবার ভালমন্দ আছে, এই সখের মধ্যেই আবার আছে শিক্ষার বহু জিনিস ও রোজগারের বড় রাস্তা। যদি বল, এ-দিয়ে আবার রোজগার হবে কেমন ক'রে? তাহ'লে আমি বলব কেন হবে না, লেখাপড়ার পর ছুটির দিনে ফুরসৎ মত ছবি আঁকা অভ্যাস কর, একদিন 'পাঠশালা' বা এমনি কোন কাগজে ইলাসট্রেশন্ ক'রে তুমি পয়সা পাবে। অবসর সময় চামড়ার ওপর রঙ্-চঙ্ ক'রে মনিব্যাগ, টিকিট কেস্, বুক-কভার করতে শেখ রোজগার হবে। রবিবার গাঁয়ের দিকে বেরিয়ে পড়ে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি তুলে কাগজে দাও পয়সা আসবে। তাছাড়া ফুলের বাগান ক'রে ফুল বিক্রি কর, কাগজের খেলনা তৈরি কর, আসন বোনো (মেয়েদের জন্যে) পাড়া-প্রতিবেশীকেই বিক্রি ক'রে তোমার হাত-খরচ চলে যাবে।

ইউরোপে বড় মধ্যবিত্ত সংসারের ছেলে-মেয়েরা লেখা-পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এমনি সব খেয়াল-খুশির ভিতর দিয়ে যেমন আনন্দ উপভোগ করে, তেমনি আবার বেশ দু'দশ টাকা রোজগার ক'রে নিজেদের লেখাপড়ার খরচও চালিয়ে নেয়। ছেলেবেলা থেকে এই ভাবে স্বাবলম্বী হবার চেষ্টায় তারা শুধু তাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ করে না,—জাতিকেও সম্পদশালী ক'রে তোলে অনেকখানি।

এখানে আমি এমনি একটি সখের কথা আজ তোমাদের কাছে বলব, যার সাহায্যে মাত্র সামান্য কিছু

কাঠের ফার্-ফোরের কাজ বা 'ফ্রেট্-ওয়ার্ক'র যন্ত্রপাতি
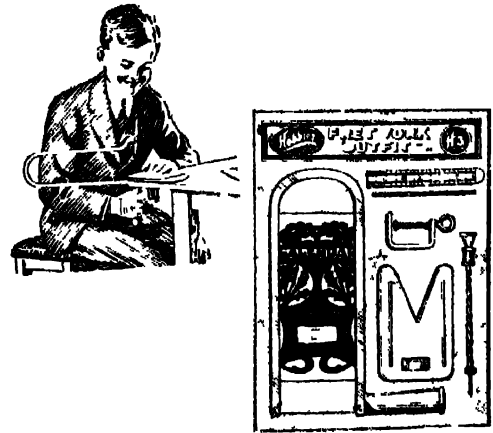
খরচের বিনিময়ে তোমরা একাধারে আনন্দ ও অর্থ দুই পেতে পার। ইউরোপে ছেলে-মেয়েদের, এমন কি বয়স্কদের মধ্যেও বর্তমানে এই সখটি বিশেষভাবে প্রসার লাভ করেছে। এটির নাম হচ্ছে: 'ফ্রেট্ওয়ার্ক' বা 'দারু কারু' আমাদের দেশেও এটির চলন একেবারে যে দেখা দেয় নি

তা বলছি না, কিন্তু এখনও ঠিক ক্যারম লুডোর মত ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করেনি। ফ্রেটওয়ার্কের সবচেয়ে সুবিধা হচ্ছে এই যে, অন্যান্য বহু দামী সখের তুলনায় এর খরচ অত্যন্ত কম। একটি দেড়-দু' টাকা দামের ফ্রেট-ওয়ার্ক সেট্ দিয়ে ইচ্ছে করলে তুমি অতি অল্প সময়ের
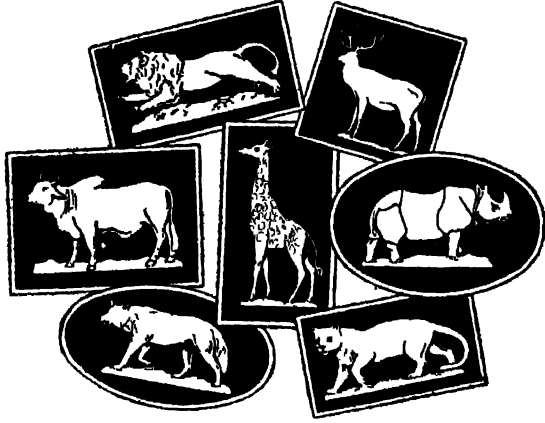
কাঠের জীবজন্তু (দারু-কারু)

মধ্যে বহু প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান জিনিসও তৈরি ক'রে তোমার খুশিকে পূরণ করতে পার।

ছোট ফ্রেটওয়ার্কের উপকরণ সামগ্রীর মধ্যে প্রথমেই যা উল্লেখযোগ্য ও সবচেয়ে প্রয়োজনীয়, তা হচ্ছে তার স-ফ্রেম করাতের আধার। এই 'U' আকারের ধাতুনির্মিত হাতলওয়ালা করাতাধার ও তার সঙ্গে কতকগুলি পাতলা করাত-ফলক, একটি ষ্টীলের ছোট আঁটবার কীলক (clump), একটি তুরপুন (drill) ও একটি ষ্টীলের কাটিং-টেবিলই হচ্ছে ফ্রেটওয়ার্কের প্রধান উপাদান। এ-ছাড়া খুচরো আরও কয়েকটি জিনিস এর সঙ্গে থাকা প্রয়োজন, যেমন . কয়েকখানা বালির কাগজ, একটি ছোট হাতুড়ি, কিছু ছোট পিন এবং কাঠের ফাক জোড়বার জন্যে কিছু পুডিং। সবসুদ্ধ এইগুলি সংগ্রহ হলেই একরকম কাজ আরম্ভ ক'রে দেওয়া যায়। তারপর অবশ্য এই ছোট যন্ত্রপাতির সাহায্যে কাজ চল্‌তে চল্‌তে হয়ত একদিন এমন আসতে পারে, যখন এই দেড়-দু' টাকার সেটে তোমাদের আর মন ধরবে না,—পায়ে চালানো বড় ট্রিডিল মেসিন কেনার সাধ যাবে। কিন্তু সেও খুব এমন একটা মূল্যবান জিনিস নয়, যা কেনা একান্ত দুঃসাধ্য। পায়ে চালানো বড় ট্রিডিল যন্ত্রের অবশ্য সুবিধা অনেক। প্রথমতঃ এতে অত্যন্ত দ্রুত কাজ করা যায়, এবং দ্বিতীয়তঃ সব সময় সোজাসুজিভাবে (vartically) করাত চলার ফলে কাটাও যেমন হয় সুন্দর, করাতও তেমনি ভাঙে কম। তাছাড়া প্রয়োজন হ'লে এই ট্রিডিল মেসিনকে আবার বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যেও চালু করা অসম্ভব নয়, কিন্তু সখের জন্যে বর্তমানে তোমাদের পক্ষে তার কোন প্রয়োজন নেই।

যাইহোক এখন ধরে নেওয়া যাক্ তোমরা ঐ দেড়-দু' টাকারই একটি ছোট ফ্রেটওয়ার্ক সেট্ কিনেছ এবং কাজের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছ। কিন্তু শুধু যন্ত্র দিয়েই ত' আর কাজ হবে না, অতএব এখন প্রয়োজন হবে কাঠের, অর্থাৎ যার উপর তোমরা কাজ করবে।

ফ্রেটওয়ার্কের জন্যে বস্তুতঃ বহু রকম কাঠ ব্যবহৃত হলেও, সব কাঠ দিয়ে কিন্তু এ-কাজ চলে না। এর জন্যে প্রধানতঃ নরম ও গাঁটশূন্য কাঠের প্রয়োজন। ইউরোপে

কাঠের ফুল, আয়না ইত্যাদি (দারু-কারু)

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মেহগিনি, শ্বেত-চেষ্টনাট্, স্যাটিন ওয়ালনাট্, লাইট্ ওক, ফিগার্ড্ ওক্, প্যাডোক্, স্প্যানিশ চেষ্টনাট্ প্রভৃতি কাঠেরই রেওয়াজ বেশি। আমাদের এখানে সাধারণতঃ পাতলা খেল্‌না, ছবি, আরশির ফ্রেম ও বুক কেশ প্রভৃতির জন্যে থ্রি প্লাই অর্থাৎ তিন ভাঁজ ভেনাস্তা কাঠেরই প্রচলন বেশি, এছাড়া কাঁঠাল, শিমুল বা শিশু কাঠের তক্তাও এই কাজে ব্যবহার হ'তে দেখা যায় এবং মূল্যের দিক থেকেও এগুলি খুব মহার্ঘ নয়।

যন্ত্রপাতি ও কাঠের সম্বন্ধে আমরা এক রকম অবহিত হয়েছি, অতএব এখন কাজ চালানোর ব্যবস্থা করা যাক্। কাজ চালানোর ব্যাপারটা মোটেই এমন কিছু একটা গুরুতর বা জটিল জিনিস নয়, যার ফলে এই কাজে সুদীর্ঘ দু'এক মাস বা ততোধিক সময় লাগতে পারে। একটু চেষ্টা করলে, যে কোন লোকের পক্ষে মাত্র দু'চার দিনের অভ্যাসেই হাত সড়গড় ও কাজের উপযুক্ত হয় ওঠা অসম্ভব নয়। প্রথমেই স্ক্রু দেওয়া ক্ল্যাম্পটির (clamp) সাহায্যে ছোট কাটিং টেবিলটিকে ফুট তিন-চার উঁচু টুল বা সাধারণ একটি টেবিলের ধারের সঙ্গে আঁটো. তারপর ঐ আঁটা কাটিং টেবিলের বহিরাংশটা যেখানে 'V' আকৃতিতে কাটা আছে তার ওপর ডিজাইন সমেত কাঠটি রাখ এবং তারপরই 'U' আকারের ঐ করাত ফ্রেমটিতে করাত পরিয়ে কাটার জন্যে প্রস্তুত হও। ফ্রেমে করাত পরানো ব্যাপারটি মোটেই শক্ত নয়, তবে এ-সম্বন্ধে দু'একটি ছোট-খাটো জিনিস জানা প্রয়োজন। যেমন প্রথমতঃ করাতের দাঁতগুলি নিচের দিকে রেখে করাতটি পরাতে হবে, দ্বিতীয়তঃ করাতের দুটি দিকই ফ্রেমের সঙ্গে বেশ শক্ত ও টান করে এঁটে দিতে হবে। তা না হলে তাদের সোজাসুজি চালানো হবে মুস্কিল, এবং করাত-ফলকগুলিও ভাঙবে খুব বেশি। করাতগুলির রকম সম্পর্কেও এখানে আর একটি কথা বলা দরকার। ফ্রেটের কাজের জন্য সাধারণতঃ বাজারে বহু প্রকারের করাত দেখতে পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে কতকগুলি অত্যন্ত ঠুনকো ও অমজবুত। কাজেই সামান্য একটু বেশি দাম দিয়েও সব সময়ে সব চেয়ে ভাল ও মজবুত করাত কেনার চেষ্টা করা উচিত।

এখন ফ্রেটওয়ার্কের সামান্য যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে এবং কোনটাকে কি ভাবে কাজে লাগান যায় তা নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছ। অতএব এখন কি ভাবে কাজ আরম্ভ করবে সেই কথাই বলা যাক। প্রথমদিকে যতটা সম্ভব সহজ ও সরল রেখার উপরই কাজ করা উচিত, কারণ কয়েকটা কাজ করে হাত একটু সড়গড় না হলে শক্ত বা জটিল কাজ করতে গেলে করাতফলক-গুলিও যেমন ভাঙবে বেশি, কাজও নষ্ট হবে তেমনি প্রচুর। অতএব প্রথম দিকে সে হিসাবে ছোট ছোট কাঠের টুকরো থেকে A B C D অ, আ, ই, ঈ প্রভৃতি ইংরেজি বাংলা অক্ষর বা সহজ জীবজন্তুর চেহারা তৈরি করার চেষ্টা মন্দ নয়। এতে ছোট ভাই-বোনেদের অক্ষর পরিচয়েরও যেমন সুবিধা হবে, তেমনি নিজেরও ঘনিষ্ট পরিচয় জন্মাবে এই কাজের সঙ্গে।

প্রথমে যে-মাপের যা করবে তার সাইজ মত বড় কাঠ থেকে এক টুকরা ছোট কাঠ কেটে নাও, তারপর ঐ কাটা কাঠের উপর ফ্রেটওয়ার্ক বিক্রেতাদের কাছ থেকে কেনা ডিজাইন থেকেই হোক বা অন্য কোন বই থেকেই হোক কার্বন পেপার দিয়ে সেই ছবিটি কপি কর। ছবিটি

কাঠের খেলনা পুতুল (দারু-কারু)

কাঠের গায়ে স্পষ্ট ও যথাযথ ওঠার প্রয়োজন। এই বার ছবি সুদ্ধ সেই টুকরো কাঠখানাকে কাটবার পাতের ওপর cutting table এ রাখ এবং এমন ভাবে রাখ, যাতে ক'রে যে লাইনটি থেকে তুমি কাটা আরম্ভ করবে সেই লাইনটি যেন কাটিং টেবিলের ঠিক 'V' আকারের ফাঁকটির মধ্যে পড়ে। তা না হলে কাঠের ভেতরে করাত চালানো সম্ভব হবে কি করে। এরপর এক হাতে কাঠখানাকে ধরে, অপর হাতে করাত নিয়ে সিধে কাটতে কাটতে এগিয়ে যাও। তবে ঐ সময় আর একটি দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে এই যে, ঐ করাত ফলকটি যাতে কোন রকমে না গিয়ে ষ্টিলের কাটিং টেবলে না ঘষে।

অনেক সময় কাঠের উপর সমস্ত ডিজাইনটি আঠা দিয়ে এঁটে দিয়েও কাটা আরম্ভ করা যায় কিন্তু তার একটা বিপদ হল এই যে, যদি কোনরকমে আধ-কাটা অবস্থায় সেটি উঠে পড়ে বা ছিঁড়ে যায় তা হলেই মুস্কিল। তা ছাড়া এই ভাবে ডিজাইনটি একবার এঁটে নষ্ট করলে দ্বিতীয়বার আর তাকে কোনও কাজে লাগান যায় না, অথচ কার্বন কাগজের সাহায্যে ঐ একই ডিজাইনকে বহুবার ব্যবহার করার সুযোগ থাকে। অনেক ক্ষেত্রে বাজারে বহু দেব-দেবী বা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতিকৃতি তোমরা যা বিক্রি

হতে দেখ, সেগুলি ছাপা ছবি সমেত কাঠের গায়ে আঠা এঁটে কাটা হয়েছে বটে কিন্তু এ-ক্ষেত্রে তাদের কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

বিভিন্ন ডিজাইনকে কাটবার সময় যতটা সম্ভব বেশি সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার, ডিজাইনের ব্যাক্ ও সরু কোণগুলির কাছে। কারণ ঐ স্থানগুলিতে একটু সতর্কতা ও ধৈর্য সহকারে হাত না চালালে কাঠ বা করাত দুয়ের একটি নষ্ট হবার সম্ভাবনা। কোন কাঠের মাঝখানে কাটার সময়ও অনুরূপ সাবধানতার প্রয়োজন। ডিজাইনের মাঝখানে ধার-ফোর করে কাটতে গেলে প্রথমেই সেই তুরপুনটির (drile) কথা তোমাদের স্মরণ করতে হবে ? কারণ কাঠের ধার কেটে মাঝখানে গেলে ত ডিজাইনের সবটাই নষ্ট হয়ে যাবে, অতএব ঐ তুরপুনটি দিয়ে ডিজাইনে আঁকা যে কোন একটি লাইনের বাইরে একটি ছেঁদা করে নিতে হবে এবং ছেঁদার ভেতর দিয়ে সোজাভাবে করাত চালিয়ে চলে আসবে লাইনের কাছে। লাইনের কাছে এলেই ত' তুমি রাস্তা পেয়ে গেলে, এবং তখন কেটে যাবার আর অসুবিধা রইল না।

এইভাবে প্রথম দিকে সহজ সহজ ছোট-খাটো জিনিস করতে করতে হাত যখন বেশ অভ্যস্ত হয়ে উঠবে, তখন স্বভাবতই বড় বড় জটিল জিনিস করতে মন যাবে এবং সে-সব জিনিস শুধু তখন খুশির খেয়ালই মেটাবে না, গৃহসজ্জায়ও সাহায্য করবে যথেষ্ট। তখন এই সব কাঠ কেটে অনায়াসে তোমরা বুককেস, ঘড়ির ফ্রেম, আরও বহু প্রকার আর্টিষ্টিক জিনিস তৈরি করতে পারবে। এছাড়া তখন ইচ্ছে করলে বিক্রির জন্য বা বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনকে উপহার দেবার জন্যও কাঠের মোটর গাড়ি, বিভিন্ন ধরনের জন্তুজানোয়ার, পুতুল, পুল এবং গাছ-পালা সুদ্ধ মডেল বাড়ি-ঘর-দোর পর্যন্ত করে দিতে তোমার একটুও বাধবে না। প্রয়োজনীয় সব নিয়ম-কানুন জানা হয়ে গেলে, যা খুশি তাই করা আর শক্ত কি ? তবে উপরের এই সব জটিল জিনিসগুলির জন্যে ভাল মাপ-যোগ এবং কাঠের উপর ড্রয়িংটিও অবিকল হওয়ার প্রয়োজন। তা না হলে বহু ক্ষেত্রেই জোড়া-তাড়ার ব্যাপারে বা খাঁজে খাঁজ মেলার সময় গরমিল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

ডিজাইনের বিভিন্ন অংশকে জোড়ার জন্য সব সময় খাঁজে খাঁজে লাগিয়ে দিলেই যে জোড়ার কাজ শেষ হয় তা নয়, অনেক সময়ে এ-ব্যাপারে এক প্রকার আঠা বা ছোট পিন্ দিয়েও কাজ সারতে হয়। বিভিন্ন টুকরো গুলিকে একসঙ্গে এই ভাবে জোড়ার পরে ঐ কাটা টুকরো অংশ গুলির উপর আর একটি কর্তব্য বাকি রয়ে গেছে, সেটি হচ্ছে ওগুলিকে বালির কাগজের সাহায্যে অপেক্ষাকৃত মসৃণ ও চকচকে করে নেওয়া।

ফ্রেটের কাজে সাধারণতঃ রঙ না দেওয়াই বিধি এবং রঙ না দিলেই যেন তাদের সব চেয়ে ভাল দেখায়। তবে কাঠের স্বাভাবিক রঙের পালিশ লাগিয়ে একটু উজ্জল করে নিতে অবশ্য আপত্তি নেই এবং সে হিসাবে ফ্রেঞ্চ পালিশ মিডিয়মই হচ্ছে সবার সেরা। এরদ্বারা দ্রব্যের গুরুত্বও যেমন বাড়ে, তেমনি হাতে নাড়া-ঘাঁটা করতেও লাগে ভাল।

মোটের ওপর আনন্দ, শিক্ষা ও সাংসারিক প্রয়োজনীয়-তার দিক থেকে ফ্রেটওয়ার্ক বর্তমানে সারা পৃথিবীর সকল বয়সের মেয়ে-পুরুষের মধ্যেই বেশ ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। অবসর সময় তাস-পাশা খেলে, ঘুঁড়ি উড়িয়ে বা বাজে গল্পগুজব করে সময় নষ্ট করার চেয়ে এই ভাবে হাতের কাজ করে যে কি তৃপ্তি পাওয়া যায়—একটি ডিজাইনকে সম্পূর্ণ করে আর একটিতে হাত দেবার জন্যে যে কি দারুণ আগ্রহ জাগে, তা হাতে-হাতে যারা কাজ করেনি তাদের পক্ষে সত্যিই বোঝা মুস্কিল।

আশা-নিরাশা

শ্রীশচীকান্ত রায়

হৃদয়ে তুমুল দ্বন্দ্ব আশা নিরাশায়
বিচারের পথে কেহ নাহি যেতে চায়।

আশা কহে—মোরে নিয়ে বিশ্ব করে জয়
নিরাশা উত্তর করে—বিপর্যয়ও হয়।

এঁরাই অন্ধের আলোকদাতা

বিকাশ রায়

জিন-লাগামের ক্ষুদ্র একখানি দোকান...

দোকানের মালিক বুড়ো মিস্ত্রী সমস্তদিন ধরে একমনে কাজ করে যায় আর তার ছোট ছেলেটি পাশে বসে খেলতে থাকে।

এমনি করেই দিনের পর দিন কেটে যায়?

হঠাৎ একদিন ছেলেটির মাথায় খেয়াল চাপে বাবার মতো সেও জিন তৈরী কোরবে। বুড়ো মিস্ত্রী তখন একমনে কাজ করছে, ছেলেটি চুপি চুপি তার বাবার জিন সেলাই করা বড় ছুঁচটি নিয়ে এসে কাজ আরম্ভ করে দেয়। কিন্তু কাজ করতে গিয়ে এক বিভ্রাট। জিন সেলাই করবার সময় হঠাৎ হাত ফসকিয়ে ছেলেটির চোখে ছুঁচের খোঁচা লাগে। চোখের যন্ত্রণায় ছেলেটি ছটফট করতে লাগলো। তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডেকে আনা হলো। কিন্তু কোনো ফল হলো না। ভালো হওয়া দূরে থাক কিছুদিন পরে ছেলেটি একেবারে অন্ধ হয়ে গেলো।

দুদিন আগেও যে জগতের সঙ্গে ছিলো চাক্ষুষ পরিচয়, পৃথিবীর রূপ, রস, সৌন্দর্য ও মাধুর্য পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলো—আজ সংসারের সমস্ত হাসি ও আনন্দের দ্বার একেবারে রুদ্ধ হয়ে গেলো।

ছেলেটি চোখ হারিয়ে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করতে লাগলো। অন্ধ হওয়া সে কি পরিতাপের বিষয় তা বেশ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে লাগলো—সঙ্গে সঙ্গে

অন্ধের বন্ধু স্বর্গীয় লালবিহারী সাহা
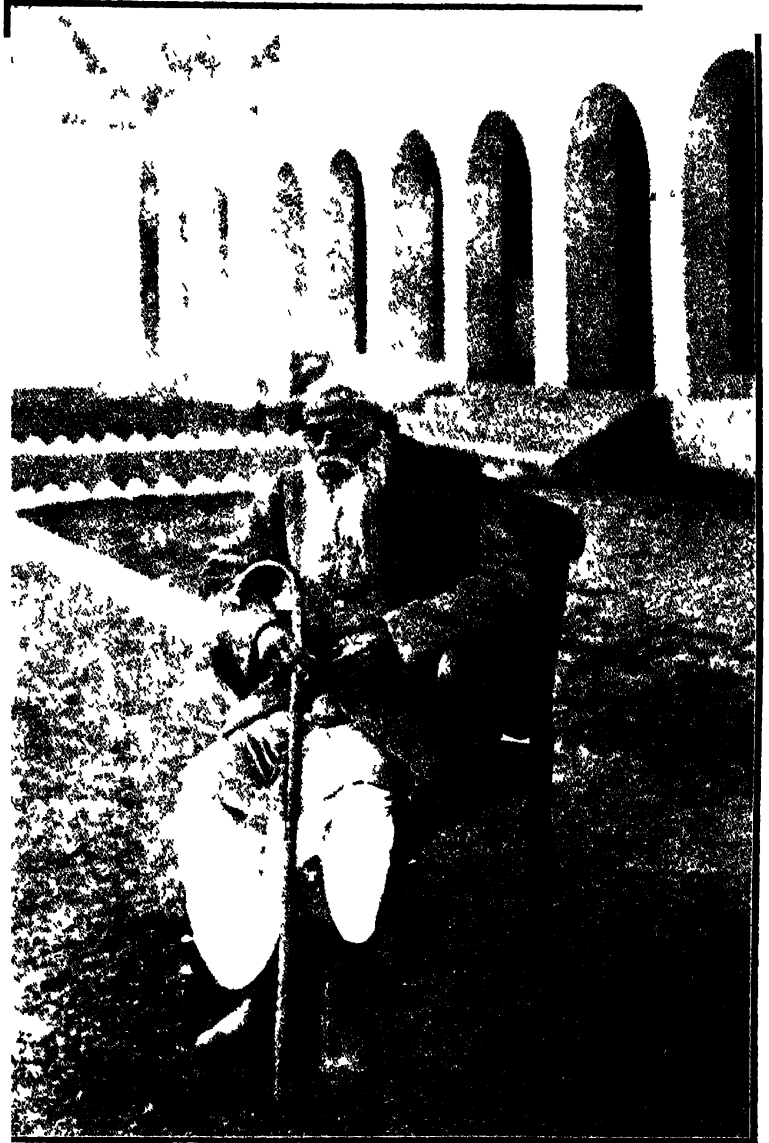
মনে হতে লাগলো পৃথিবীর হাজার হাজার অসহায় অন্ধের দুরবস্থার কথা ?

অবশেষে ছেলেটির চিন্তাধারা এক নতুন রূপ ধারণ করলো ।

সে কেবলই ভাবতে লাগলো অন্ধদের এই অসহায় অবস্থা—তাদের পরমুখাপেক্ষী অনুগৃহীত জীবনের কি শেষ উঠলো। সে চামড়ার পিঠে এইরূপ ছোট ছোট বিন্দুর সাহায্যে অন্ধদের জন্য এক বর্ণমালা সৃষ্টি করলো।

এই ছেলেটিই অন্ধদের মুক্তিদাতা লুই ব্রেল (Lowis Braile)। বিশ্বের সমস্ত অন্ধ আজ এই মহাপুরুষের নিকট কৃতজ্ঞ।.....

লুই ব্রেলের দ্বারা আবিষ্কৃত বলে অন্ধদের এই লিখন-

বেহালার অন্ধ বিদ্যালয়
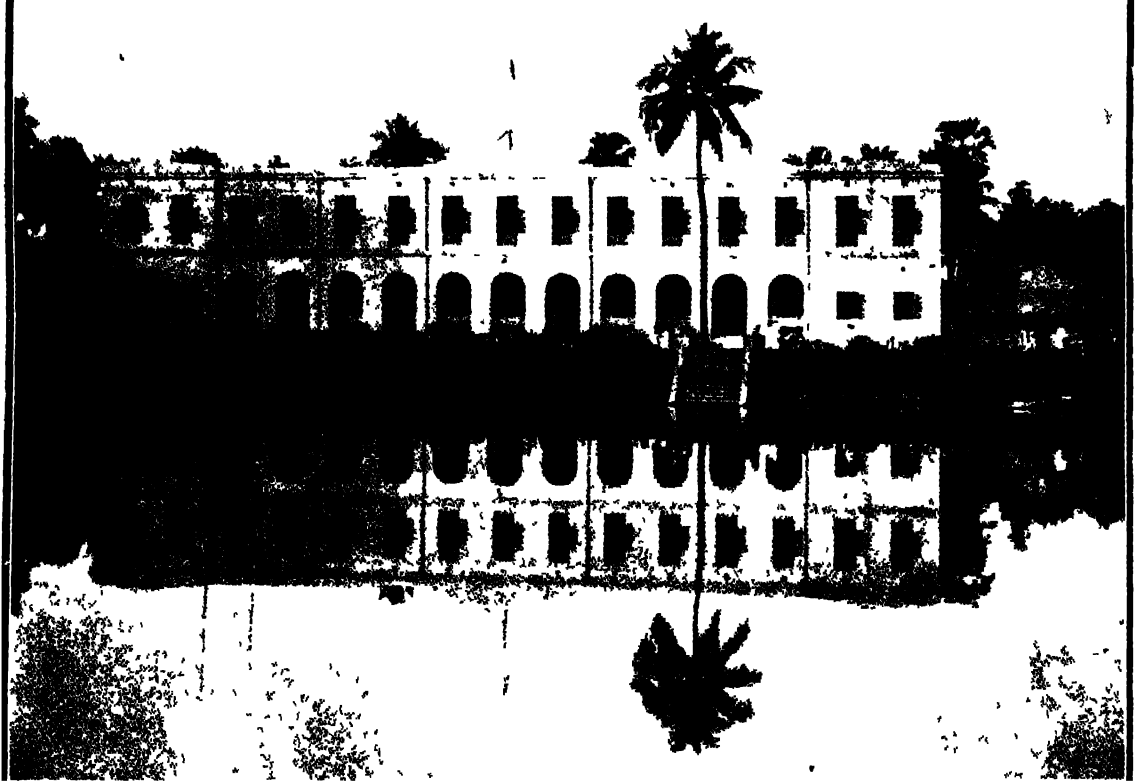
নেই ? চিরকাল কি তাদের এরূপভাবে পরগাছা হয়ে থাকতে হবে—তারা কি মুক্তি পাবে না কোনোদিন ?

চিন্তা করতে করতে ছেলেটির হঠাৎ মনে পড়ে যায়—অনেকদিন সে লক্ষ্য করেছে অর্ধেক ফুটো হলে পেছনের দিকে বিন্দুর মতো খানিকটা জায়গা উচু হয়ে উঠে এবং হাত দিয়ে স্পর্শ করলে উহা বেশ স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায় ? ছেলেটি এই সামান্য জিনিষটাকে নিয়ে গভীরভাবে গবেষণা করতে লাগলো। তার এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো না। বহু পরিশ্রমের পর তার সমস্ত চেষ্টা সার্থকতায় ভরে পদ্ধতিকে ব্রেল পদ্ধতি বলে অভিহিত করা হয়। সমস্ত পৃথিবীতে নানা-ভাষায় আজ এই ব্রেল-পদ্ধতি রূপান্তরিত হয়েছে। অন্ধদের জন্য ব্রেল-পদ্ধতিতে লেখা বহু পুস্তক আজকাল বাজারে পাওয়া যায়।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলা দেশের অন্ধদের জন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে—কলকাতার উপকণ্ঠে বেহালায় এক বিস্তৃত স্থান জুড়ে এই প্রতিষ্ঠান অবস্থিত। শুধু বাংলাদেশে নয় সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি আজ একটা বিশেষ স্থান অধিকার

অন্ধের বর্ণপরিচয়

ইংরাজি ব্রেল-অক্ষর

বাংলায় শাহ-ব্রেল

---

৪৯ বৎসর পূর্বে অধুনালুপ্ত "দাসী" পত্রিকায় প্রবাসী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম ব্রেল-অক্ষর অনুযায়ী অন্ধদের জন্য বাংলা বর্ণপরিচয় কল্পনা করেছিলেন। স্বর্গীয় লালবিহারী শাহার এই বাংলা 'ব্রেল' পদ্ধতি মাত্র তিন চারটি অক্ষর ছাড়া সম্পূর্ণরূপে রামানন্দ বাবুর পরিকল্পনা অনুসারেই রচিত হয়েছে। পাঃ সঃ

করে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করচে। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটির কথা মনে হলেই সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় এক মহাপুরুষের কথা – যাঁর দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দু এই প্রতিষ্ঠানের অঙ্গে মাখা রয়েছে। তিনি মহাত্মা রেভাঃ লালবিহারী শা। সত্যিকথা বলতে কি রেভাঃ লালবিহারী শা যদি নিজের দেহের রক্তপাত করে এই অন্ধ বিদ্যালয় স্থাপন না করতেন তাহলে আজও বাংলাদেশে অন্ধদের জন্য কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতো কিনা সন্দেহ। মহাত্মা লালবিহারী ছাড়া বাংলার অন্ধ-বিদ্যালয়ের ইতিহাস অসমাপ্ত। ....

কিন্তু যেরূপ দুঃখ কষ্ট এবং বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে এই স্কুলটি গড়ে উঠেছে তা ভাবলে সত্যই আশ্চর্য না হয়ে পারা যায় না। নিজে গরীব—মাত্র ৪০৲ টাকা মাহিনায় প্রেসের প্রুফরীডার। এই সামান্য আয়ের উপর তাঁর বিরাট পরিবারের ভার ন্যস্ত। কিন্তু দেশের দুঃখে যাঁর প্রাণ কেঁদে ওঠে তিনি কি স্বার্থপরের ন্যায় নিজেকে সংসারের মধ্যে বন্দী করে রাখতে পারেন?—তিনি নিজ পরিবারের অসীম কষ্টের মধ্যেও ১৮৭৯ খ্রীঃ নিজ ব্যয়ে কলিকাতাস্থিত তাঁর ক্ষুদ্র গৃহখানির মধ্যে এই অন্ধ-বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করেন।

১৯২৫ খ্রীঃ ১২ই জুন অন্ধবিদ্যালয় কলিকাতা থেকে বেহালায় স্থানান্তরিত করা হয়। আজ বেহালায় এই অন্ধবিদ্যালয়ের প্রাসাদ তুল্য গৃহ এবং সর্বতোমুখী উন্নতি দেখে বিস্মিত হতে হয়। মনের মধ্যে কেবলই উদিত হতে থাকে—এ কী করে সম্ভব হ'লো? সামান্য ৪৪ বৎসরের ইতিহাসে একটা প্রতিষ্ঠানের এরূপ উন্নতি সাধারণতঃ দেখা যায় না। ..

১৯২৮ সালের ১লা জুলাই মহাত্মা লালবিহারী শা পরলোক গমন করেন।তাঁর মৃত্যুর পর তদীয় সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত অরুণ কুমার শা মহোদয় অন্ধবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মনোনীত হয়েছেন। অরুণ বাবুও তাঁর পিতার ন্যায় উদ্যোগী কর্মী। তাঁর প্রচেষ্টায় অন্ধবিদ্যালয়ের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে।

অন্ধ বালকেরা বেতের কাজ শিখছে

অন্ধদের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য যে প্রত্যেক বিষয়ে তাদের অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। কিন্তু তারাও যাতে স্বাবলম্বী হয়ে নিজেদের জীবিকা অর্জন করতে পারে সেজন্য বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদের বিশেষ দৃষ্টি রয়েছে। এই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ের মধ্যে লেখাপড়া, সাহিত্য, শিল্প ও ব্যায়াম—এই চারটি বিভাগ খোলা হয়েছে। যে সকল ছাত্র মেধাবী সাধারণতঃ সেই সকল ছাত্রকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করান হয় এবং অন্যান্য

ছেলেদের গান বাজনা এবং বেতের কাজ প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। এরূপ ব্যবস্থায় আশানুরূপ ফল পাওয়া হাতের কাজ দ্বারাও আজ বহু অন্ধছাত্র নিজেদের ভরণ-পোষণ করছেন। · ··

অন্ধ বালকদের সঙ্গীত শিক্ষা

গিয়াছে। ইতিমধ্যে কয়েকজন অন্ধছাত্র লেখাপড়ায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেছেন। এখানে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত সুবোধ রায়ের নাম উল্লেখ করলে বোধ হবি অন্যায় হবে না। নগেন বাবু দুই বিষয়ে এম-এ, — বর্তমানে বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক। তিনি একখানি লজিকের বই লিখে বিশেষ প্রশংসা লাভ করেছেন। সুবোধ বাবু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ও আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইউরোপ ও আমেরিকায় গমন করেন। তিনি আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পি, এইচ, ডি উপাধি লাভ করেছেন। গান বাজনা শিক্ষাদান এবং

অন্ধ হলেও ছাত্রেরা যাতে নানারূপ খেলাধুলা করতে পারে অন্ধস্কুলে তার সুব্যবস্থা করা হয়েছে। তাদের স্কাউটিং
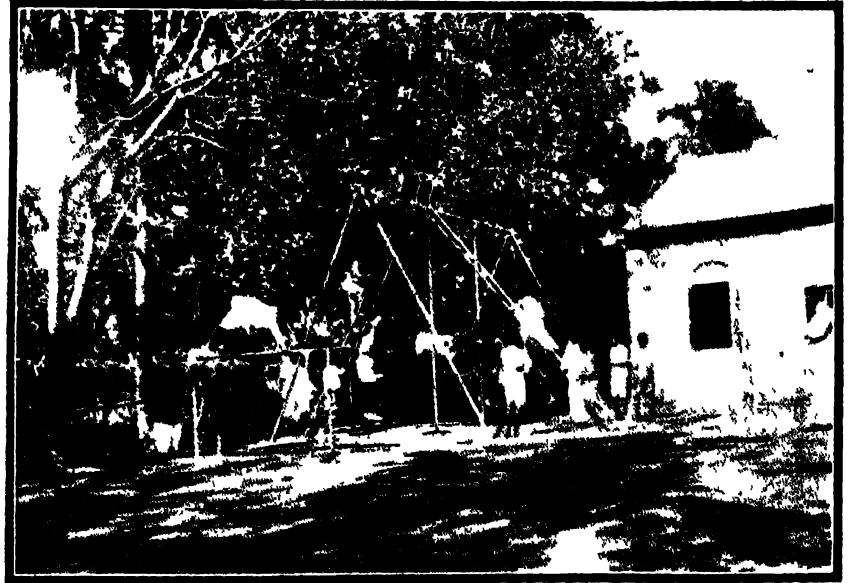
অন্ধ বালকদের ব্যায়াম

শিক্ষাও দেওয়া হয়ে থাকে। স্কুল-সংলগ্ন বিস্তৃত প্রাঙ্গণ তাদের খেলার মাঠ এবং অন্ধ সত্ত্বেও তারা এরূপ সুন্দর

করে স্কাউটিং ও নানারূপ খেলাধুলা করে থাকে যে দেখে আশ্চর্য না হয়ে পারা যায় না। এর জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই প্রশংসা দাবী করতে পারেন। তাঁদের আন্তরিক চেষ্টা ব্যতিরেকে এরূপ অসম্ভব কার্য কোনোদিন সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ।

অন্ধদের তৈরী বেতের কাজগুলি অত্যন্ত সুন্দর এবং প্রশংসনীয়। বহু প্রদর্শনীতে অন্ধদের তৈরী এই হাতের কাজ ভাল পুরস্কার লাভ করেছে। এখানে সামান্য দু এক কথায় তাদের কাজের সম্যক পরিচয় প্রদান করা —সম্ভব নয়। তোমাদের মধ্যে কারো যদি স্বচক্ষে অন্ধদের লেখাপড়া শিক্ষার প্রণালী, খেলাধুলা, স্কাউটিং এবং হাতের কাজ প্রভৃতি দেখতে ইচ্ছা থাকে তাহ'লে স্কুলের প্রিন্সিপাল মহাশয়কে লিখলে তিনি তার বন্দোবস্ত করে দেবেন। তোমাদের মধ্যে যারা কলিকাতায় থাক—আশা করি এ সুযোগ নষ্ট করবে না।
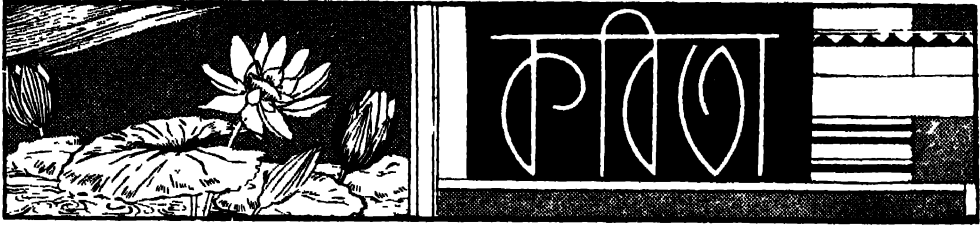
আলোর সম্রাট

[কুমারী পুষ্পবাণী দাস]

আলোর অধিপ, যুগ-অবতার
হে দেবজন্ম-দিশারী,
পরশে তোমার লভিতে চাই গো
জীবন ঊর্ধ্ব-বিসারী।
এ মনোজগতে শুনাইলে তুমি
অতি মানসের গান যে,
জনগণ-মন শঙ্কাহরণ
অতুল তব সে দান হে।
সারা ধরিত্রী নব রূপায়ন
প্রার্থে—নূতন ঋদ্ধি,
তারি মাঝে তুমি বহিয়া আনিলে
যুগ-বাঞ্ছিত সিদ্ধি।

বিস্ময়-ভরা চায় ধরা আজি
আশ্রয় তব চরণে,
বুঝি অবনীর ক্ষয় হলো দুখ,
জয় হলো জরা মরণে।
পূজার থালিকা সাজার আজিকে
সৌরভে ভরি অবনী,
দীপমালা জ্বালি কুটীরে কুটীরে
ধ্বনিব দীপ্ত রাগিণী।
সঙ্গীতময় কবির জীবন
তোমার বাণীর সুরে গো,
আমার জীবন তোমার চরণে
ফুল হয়ে যেন ঝুরে গো।*
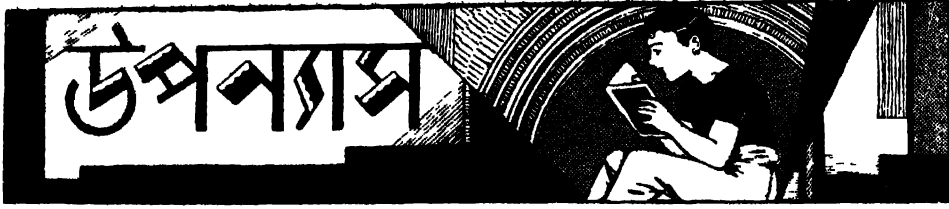
---

* শ্রীঅরবিন্দের ৬৯তম জন্মতিথি উপলক্ষে রচিত।

পরাগ ও রেণু

শ্রীনরেন্দ্র দেব

'মা মণি'

লক্ষ্মীপুরের জমিদার রাজাবাহাদুর মহেন্দ্ররায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার রণেন্দ্র রায় বি-এ পড়বার জন্য কলকাতায় এসে তাঁদের এক ধনী আত্মীয়ের বাড়ীতে ছিলেন। তাঁর খাওয়া-দাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা রাজাবাহাদুর সেইখানেই করেছিলেন। সেইখান থেকেই তিনি কলেজে যেতেন। কুমার রণেন্দ্রের সেখানে আদর যত্নের কোনো অভাব ছিল না। কিন্তু, সেই বাড়ীতেই তাঁদের দূর সম্পর্কের একটি আত্মীয়ার মেয়ে ছিল, তার নাম উমা, তার বাপ মা ছিল না, সে অনাথা দরিদ্র নিরাশ্রয়া বলে তাকে এঁরা বড়ই অনাদরে ও অযত্নে রেখেছিলেন। অত্যাচারও হ'ত তার উপর খুবই। বাড়ীর প্রায় সমস্ত কাজই তাকে করতে হ'ত। তার উপর তিরস্কার লাঞ্ছনা ও অপমানও তার নিত্য প্রাপ্য ছিল

রণেন্দ্র যেদিন প্রথম এ বাড়ীতে আসে সেদিন সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠবার সময় সে উমাকে দেখেছিল কি একটা পাত্র হাতে মেয়েটি তখন নিচেয় নেমে আসছিল। তার টানা টানা বড় বড় চোখ দুটির কোলে অশ্রুজল টলমল করছে। দেখে মনে হ'য়েছিল, সে এই মাত্র একটা কিছু কঠিন আঘাত পেয়েছে তার অন্তরে।

মেয়েটি দেখ্‌তে ছিল ভারি সুশ্রী। একটা নমনীয় কমনীয়তা তার সর্বাঙ্গে যেন জড়ানো। রণেন্দ্রের এ মেয়েটিকে বড় ভাল লেগেছিল। তার দুঃখ কষ্টের কথা জানবার জন্য রণেন্দ্রের মনে একটা আকুলতা জেগেছিল। এক বাড়ীতে থাকতে থাকতে ক্রমে তাদের পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। উমার দুঃখের কাহিনী শুনে রণেন্দ্রের কোমল হৃদয় সহানুভূতিতে ভরে যায়। এই মেয়েটির দুঃখ দূর করবার জন্য সে বদ্ধপরিকর হ'য়ে ওঠে।

বি-এ পাশ করবার পরই রণেন্দ্রের বিবাহ দেবার জন্য রাজাবাহাদুর উদ্যোগ করছিলেন। সেই খবর পেয়ে রণেন্দ্র তার বাবাকে পত্র লিখে জানালে যে এই বাড়ীরই একটি অনাথা আত্মীয় কন্যাকে সে বিবাহ করবে স্থির করেছে, সুতরাং, তার যেন আর অন্যত্র কোথাও বিবাহের ব্যবস্থা না করা হয়।

রাজাবাহাদুর মহেন্দ্র রায় এই পত্র পেয়ে পুত্রের উপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। লক্ষ্মীপুরের দোর্দণ্ড প্রতাপ জমিদার—রাজা বাহাদুর মহেন্দ্ররায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিবাহ করবে একটা অনাথা মেয়েকে? সমাজে তার মাথা হেঁট হবে। লোকের কাছে পরিচয় দিতে তার লজ্জা করবে। তিনি তৎক্ষণাৎ কলিকাতার সেই আত্মীয়কে লিখে পাঠালেন যে রণেন্দ্র যদি এ বিবাহ করে তাহলে তিনি রণেন্দ্রকে ত্যাজ্যপুত্র করবেন। লক্ষ্মীপুরের ত্রিসীমানায় আর তাকে ঢুকতে দেবেন না।

আত্মীয়রা এ সংবাদ রণেন্দ্রকে জানালেন। কিন্তু, রণেন্দ্র তখন নিরুপায়। কারণ, সে ইতিপূর্বেই উমাকে বিবাহ করে তার দুঃখ কষ্টের দুর্বহ জীবন ভার লাঘব করবে বলে তাকে আশ্বাস দিয়েছিল। এখন আর কোন কারণেই সে এই অনাথা মেয়েটির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবে না।

তখন কলিকাতার সেই ধনী আত্মীয়েরা রণেন্দ্রকে জানালেন যে উমাকে তাঁরা আজই এ বাড়ী থেকে দূর করে দেবেন। রণেন্দ্রের পিতার বিরাগ ভাজন হবার সাহস নেই তাঁদের।

রণেন্দ্র অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলেন তাঁদের যে উমাকে কেন আপনারা তাড়িয়ে দেবেন? এতে উমার

কী দোষ? যদি কাউকে তাড়িয়ে দিতে হয় তবে আমাকেই তাড়িয়ে দেওয়া উচিত।

তাঁরা রণেন্দ্রকে জানালেন যে রাজা বাহাদুরের সেই রকম হুকুম। মহেন্দ্র রায়ের পত্রখানিও পড়তে দিলেন। রণেন্দ্র দেখলে যে তার পিতার ক্রোধ উমার উপরই সব চেয়ে বেশী। তিনি উমাকে পত্রপাঠ বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে হুকুম দিয়েছেন এবং রণেন্দ্রকে আজই লক্ষ্মীপুরে পাঠাতে আদেশ করেছেন। রণেন্দ্র যদি পিতার অবাধ্য হ'য়ে এ বিবাহ করে তাহলে পৈতৃক সম্পত্তি থেকে ত তাকে বঞ্চিত করা হবেই, তাছাড়া লক্ষ্মী-পুর থেকেও তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। কোনো আত্মীয়ের কাছেই যাতে সে সাহায্য বা আশ্রয় না পায় সে ব্যবস্থাও করা হবে।

রণেন্দ্র অত্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়লো। একটি দুখিনী অনাথা বালিকাকে সে বিবাহ করবে বলে কথা দিয়েছে। তাকে এই দুঃখময় অপমানকর লাঞ্ছিত জীবন যাপন থেকে উদ্ধার করবে বলে প্রতিশ্রুত হয়েছে, এদিকে পিতা এ বিবাহের বিরোধী। এ বিবাহের ফলে তাকে পিতার বিরাগ ভাজন হ'তে হবে, পৈতৃক সম্পত্তি থেকেও বঞ্চিত হতে হবে। কিন্তু, সেজন্য তার তত দুঃখ ছিল না। সে যে লক্ষ্মীপুরে জীবনে আর কখনো ঢুকতে পাবে না এই বেদনাতেই সে কাতর হয়ে পড়লো। লক্ষ্মীপুর তার জন্মস্থান। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলা নিকেতন লক্ষ্মীপুর। লক্ষ্মীপুরকে রণেন্দ্র যে মায়ের মত ভালবাসে। শৈশবে সে মাতৃহারা। লক্ষ্মীপুরের শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত হরিৎ অঞ্চল, লক্ষ্মীপুরের খরস্রোতা তটিনী নির্মল সলিলা উপলা, লক্ষ্মীপুরের কুসুমিত তরুলতা ও বনরাজি রণেন্দ্রের যে একান্ত প্রিয়। লক্ষ্মীপুর তার জননীস্বরূপিণী। উমাকে যে-কথা সে দিয়েছে এবং যে-প্রতিশ্রুতি তার কাছে করেছে, তা পালন করতে হলে রণেন্দ্রকে বহুত্যাগ স্বীকার করতে হবে। পিতার বিরাগভাজন হতে হবে। বিষয় সম্পত্তি হারাতে হবে, লক্ষ্মীপুর থেকে আজীবন নির্বাসিত থাকতে হবে। আবার, কথা দিয়ে যদি সে কথা না-রাখে, প্রতিশ্রুতি যদি পালন না-করে, তাহলে রণেন্দ্রকে তার মনুষ্যত্বের অবমাননা করতে হবে। তার আত্মসম্মান বিসর্জন দিতে হবে। এ হ'ল কাপুরুষের কাজ। রণেন্দ্র প্রাণ গেলেও এ হীনতা স্বীকার করতে পারবে না। অতএব সে স্থির করে ফেললে যে উমাকে সে বিবাহ করবেই, এর জন্য তার যত ক্ষতিই হোক না কেন, নিজের প্রতিশ্রুতি কখনই সে ভঙ্গ করবে না। নিজের সুখ স্বার্থ রক্ষা করার চেয়ে পরের দুখ দূর করাই তার কাছে মহত্তর কর্তব্য বলে মনে হ'ল।

রণেন্দ্র তাদের সেই ধনী আত্মীয়ের বাড়ী ছেড়ে দিয়ে উমাকে বিবাহ করে একখানি ছোট বাড়ী ভাড়া নিয়ে বাস করতে লাগলো। উমাকে দুঃখ কষ্ট থেকে বাঁচাবার জন্য রণেন্দ্র নিজে যে কত বেশী দুঃখ কষ্ট বরণ করে নিয়েছে বিবাহের পর উমা যখন সে কথা জানতে পারলে তখন আর সে বেচারার আক্ষেপের অন্ত রইল না। বারবার সে সজল চোখে রণেন্দ্রকে বলতে লাগলো—কেন তুমি এ জন্মদুখিনী অভাগিনীর জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করলে।

রণেন্দ্র তাকে প্রবোধ দিয়ে বলেছিল—উমা, আমি যদি আমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে অমানুষের মত তোমাকে লাঞ্ছনা ও দুঃখময় জীবনের মধ্যে ফেলে রেখে পালিয়ে যেতাম, তাহলে কি তুমি আমাকে শ্রদ্ধা করতে পারতে। আমি নিজেও কোনোদিন নিজেকে এই হীন অপরাধের জন্য ক্ষমা করতে পারতুম না।

উমা আর কিছু বলতে পারেনি। রণেন্দ্রকে প্রণাম করে তার পায়ের ধূলা মাথায় নিয়ে রণেন্দ্রকে সুখী করবার জন্য আপনার জীবন উৎসর্গ করেছিল।

ভগবানের আশীর্বাদে সুখীও তারা হয়েছিল। রণেন্দ্রকে তার কলেজের একজন মিশনারী প্রোফেসার খুব ভালবাসতেন। তাঁর চেষ্টায় রণেন্দ্র একটি মস্তবড় সওদাগরী আফিসে মোটা মাহিনার চাকরি পেয়েছিল। সুতরাং, বাড়ীভাড়া ও সংসার খরচ বাদে প্রতিমাসে তাদের কিছু কিছু টাকা ব্যাঙ্কে সঞ্চয় হ'তে লাগলো। উমার সেবায় যত্নে ভালবাসায় ও সুনিপুণ গৃহিণীপনায় রণেন্দ্র জীবনের সকল অভাব ভুলে আনন্দে দিন কাটাচ্ছিল।

বিবাহের এক বৎসর পরেই উমার কোলে পরাগ এল। তাদের সুখ সৌভাগ্য যেন পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। পরাগ পেয়েছিল তার রূপবান বলিষ্ঠ পিতার স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য, আর পেয়েছিল তার মায়ের বড় বড় টানা দুটি কালো

চোখ, ভ্রমর কৃষ্ণ কুঞ্চিত ঘন কেশ। পরাগকে দেখে মনে হ'ত ও যেন একটি দেবশিশু।

কিন্তু তাদের এ সুখের দিন দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি। এক বৎসর আগে, অর্থাৎ পরাগের বয়স যখন মাত্র সাত বছর, রণেন্দ্র একদিন অফিস থেকে অসুস্থ হয়ে বাড়ী ফিরে এল। বিষম জ্বর, বুকে পিঠে ব্যথা। রাত্রে সে জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকতে সুরু করলে, সকালে ডাক্তার এসে বললে 'ডবল নিউমোনিয়া।'

চিকিৎসা ও সেবাযত্নের ত্রুটী হয়নি, কিন্তু রণেন্দ্রকে বাঁচাতে পারা গেল না। পরাগ ও উমাকে অসহায় ফেলে রেখে রণেন্দ্র অকালে ইহলোক ছেড়ে চলে গেল।

রণেন্দ্রের অফিসের কর্তৃপক্ষ তার রাজকর্মে এত বেশী সন্তুষ্ট ছিলেন যে রণেন্দ্রের এই অকাল বিয়োগে তারা অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন। রণেন্দ্রর স্ত্রী উমাকে তাঁরা সমবেদনা ও সহানুভূতি জানিয়ে পত্র দিয়েছিলেন এবং মৃত রণেন্দ্রের পত্নী ও পুত্রের ভরণপোষণের জন্য মাসিক একশত টাকা সাহায্য দানের ব্যবস্থা করেছিলেন। এছাড়া রণেন্দ্রের 'জীবনবীমা' থাকায় উমা এককালীন দশহাজার টাকা ইন্সিওর কোম্পানীর কাছে পেয়েছিল। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বেই রণেন্দ্র কলিকাতার হিন্দু ফ্যামিলি এ্যানুয়িটি ফণ্ডেরও সভ্য হয়েছিল। রণেন্দ্রের মৃত্যুর পর তার স্ত্রীকে যাতে মাসিক পঁচিশ টাকা হিসাবে বৃত্তি দেওয়া হয় রণেন্দ্র সেই ব্যবস্থা করেছিল। অল্প কিছু দিন চাদা দেওয়ার পরই রণেন্দ্র অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় "হিন্দু ফ্যামিলি এ্যানুয়িটি ফণ্ড" যথানিয়মে উমাকে প্রতি মাসে পঁচিশ টাকা বৃত্তি পাঠাচ্ছিল, সুতরাং, সংসারে অনটন বা অর্থকষ্ট তার কিছুই ছিল না।

'মণির মা' বলে একটি স্ত্রীলোক উমার কাছেই থাকে। সে তাদের রান্নাবান্না, বাসন মাজা ও ঘরকরনার সমস্ত কাজই করে। উমার বিবাহের পরই সে তাদের বাড়ী কাজে ঢুকেছিল। পরাগকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে। এই বাড়ীতেই কেটে গেল তার আট দশ বছর। সে উমাকে ভালবাসে ও যত্ন করে নিজের মেয়ের মত। পরাগকেও ভালবাসে ও আদর যত্ন করে আপন সন্তানের অধিক। উমার বিপদের দিন 'মণির মা' কাছে না থাকলে যে উমার ও পরাগের কী হ'ত তা ভগবানই জানেন। রণেন্দ্রর মৃত্যুর পর উমা সাতদিন উঠতে পারেনি, কিছু খেতে পারেনি—কেবলই অবিশ্রান্ত কেঁদেছে। নিজের দুর্ভাগ্য ও অসহায় অবস্থার জন্য যতটা না হোক, অমন দেবতুল্য স্বামীকে জন্মের মত হারানোর শোকেই সে অধীর হয়ে পড়েছিল। সেদিন 'মণির মা'ই তাকে প্রবোধ দিয়ে, সান্ত্বনা দিয়ে, সাহস দিয়ে, আশা দিয়ে শোক জয় করতে সাহায্য করেছিল। পরাগকে বুকে করে নিয়ে সেই ক'দিন ভুলিয়ে রেখেছিল এই মণির মা। উমার কাছে এসে সে বলে—"মাগো, আমাদের খোকাবাবুর কথা যদি শোনো, কে বলবে ও এতটুকু কচি ছেলে।—বড় সুবোধ মা, বড় বুদ্ধি বাছার। আমায় বললে—মণির মা। বাবু কি আমাদের স্বর্গে চলে গেছেন? স্বর্গেত' গেলে মানুষ আর পৃথিবীতে ফিরে আসে না। বাবু আর আমার কাছে আসবেন না, মা-মণির কাছেও আসবেন না, না? মা-মণি তাই অত কাঁদে। আমিও কাঁদি। 'বাবু' আমায় বলে দিয়েছেন যে বাবুর জন্যে যখনই বড় মন কেমন করবে আমি যেন আকাশের চাঁদের দিকে চেয়ে থাকি। বাবু ঐ চাঁদের দেশে চলে গেছেন কি না, তাই। সেখান থেকে তিনি রোজ দেখেন আমরা সবাই কি করছি এখানে। চাঁদের দিকে চাইলে আর আমার মন কেমন করে না। বাবুর হাসি মুখ যেন দেখতে পাই।"

উমা চোখ মুছে বলেন—"সত্যি মণির মা, খোকোন আমার প্রাণপণে চেষ্টা করে তার বাবুর অভাব আমায় ভুলিয়ে রাখতে। দু'হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে আমাকে সে যে কত আদর করে সে আর কি বলবো। ওর যত ছবির বই নিয়ে এসে আমাকে দেখায়। গল্পের বই নিয়ে এসে গল্প পড়ে শোনায়। ওর যত রকম খেলনা আছে সব আমাকে এনে দেয়। বলে, মা-মণি তুমি কেঁদ না, বাবু ঐ চাঁদের দেশে আছেন।"

এমনি ক'রেই পরাগ ওর মায়ের বিষাদ-মলিন মুখে আবার হাসি ফুটিয়েছে, স্বামীর শোক ভুলিয়েছে, সংসারে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছে। [ক্রমশঃ

মোগল শাসনকালে বিচার

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(২)

গৌড় রাজ্য যে কত দিনের তা স্থির করে বলা যায় না। সূর্যবংশীয় মহারাজ মান্ধাতার নাম অনেকেই শুনে থাকবেন। তাঁর গৌড় নামে এক দৌহিত্র ছিল। তিনি বাংলাদেশে রাজত্ব করতেন, রাজধানী প্রতিষ্ঠা করে নাম রেখেছিলেন গৌড়। তারপর ত্রেতা দ্বাপর কেটে গিয়ে কলিতে এলেন কত হিন্দু, পাঠান, মোগল রাজা।

তাই বলছি গৌড় বহু পুরাতন শহর। এই শহরের ইতিহাসে পাওয়া যায় মানুষে মানুষে, পশুতে পশুতে লড়াই হোয়েছে, কিন্তু মানুষ কখনও পশুর সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করেনি। ইটালি ও স্পেনের ইতিহাসে দেখা যায়, রাজার বিরাগভাজন ব্যক্তিকে ষাঁড় ও সিংহের সঙ্গে রিক্তহস্তে লড়াই করতে হয়েছে। বাংলায় কখন হয় নি। এই প্রথম আদেশ প্রচারিত হল, উদয়নারায়ণকে বন্য ব্যাঘ্রের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। এই সংবাদ চতুর্দিকে রাষ্ট্র হবামাত্র দূর দেশান্তর হ'তে রাজধানী অভিমুখে লোক আসতে লাগল।

প্রায় প্রত্যেক দেশের রাজধানীতে রঙ্গভূমি আছে। কোথাও বড়, কোথাও ছোট। গৌড়ের রঙ্গভূমি নাতিবৃহৎ—ত্রিশ হাজার দর্শকের স্থান হতে পারে। একদিকে নবাবের সিংহাসন, তাঁর দুইপাশে আমীর ওমরাহ রাজামহারাজার আসন। তাঁদের মাথার উপরে-দ্বিতলে রূপার জাফরি ঘেরা বারান্দায় বেগমদের আসন। সাধারণ দর্শকদের স্থান যথেষ্ট থাকায় কখন স্থানাভাব ঘটে নি, কিন্তু এবার এত জনসমাগম যে প্রয়োজনবোধে প্রবেশ-দ্বার বন্ধ করতে হ'ল।

রঙ্গভূমির অপর এক দ্বার দিয়ে এলেন শার্দূল মহারাজ। তিনি এলেন চক্রযুক্ত এক বিরাট লৌহ পিঞ্জরে শত হস্ত দ্বারা বাহিত হোয়ে। অধিষ্ঠিত হলেন ক্রীড়াভূমির মধ্যস্থলে। লক্ষ চক্ষু কর্তৃক সম্ভাষিত হোয়ে তিনি এক প্রচণ্ড হুঙ্কার ছাড়লেন, ভাবে জানালেন, আমি তোমাদের গ্রাহ্য করি না। গ্রাহ্য না করবারই মত তাঁর আকৃতি। বিশাল দেহ নিয়ে তিনি এতকাল অপ্রতিহত তেজে সুন্দরবনে রাজত্ব করছিলেন। প্রকৃতিও তদনুরূপ। ভোজনের নিমিত্ত তিনি ক্ষুধার সময়েই যে কেবল জীবজন্তু সংহার করতেন তা' নয়, হিংস্র প্রবৃত্তি অনুসারে সংহার কার্যটা কারণে-অকারণে করেই যেতেন।

তাঁর আকৃতি দেখে জনতা প্রথমটা ভয় পেলে—ভয়ে স্তব্ধ। তারপরে যখন বুঝল খাঁচার মোটা গরাদ ভেঙ্গে বাঘের বাইরে আসবার কোনো সম্ভাবনা নাই, তখন ভয় গেল—নিশ্চিন্তমনে করতালি দিয়ে উঠল। সুন্দরবনেশ্বর তার প্রত্যুত্তর করলেন আবার এক ভীষণ গর্জনে। বহুদূর হ'তেও সে গর্জন শোনা গিয়েছিল।

বাঘের সঙ্গে দর্শকবৃন্দের পরিচয় পর্ব শেষ হলে, তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে ডাকা হ'ল। উদয়নারায়ণ ছিলেন প্রাসাদেরই এক কক্ষে। ঠিক বন্দীর মত না হলেও নগর ত্যাগ করে যাবার অনুমতি ছিল না। আহূত হয়ে উদয়নারায়ণ এলেন রঙ্গভূমিতে। গলা হতে গোড়ালি পর্যন্ত একটা লম্বা আল্‌ফিতে সমস্ত দেহ আবৃত। তিনি রঙ্গভূমে প্রবেশ করে প্রথমেই নবাবকে অভিবাদন করলেন, পরে মাথা তুলে বেগমদের নতি জানালেন, আমীর ওমরাহ ও সাধারণ দর্শকগণকেও সম্মান দিতে ত্রুটি করেন নি। তারপর, গাত্রাচ্ছাদন ফেলে দিয়ে নগ্ন দেহে দাঁড়ালেন। মাথা ঢাকলেন একটি লাল মখমলের টুপিতে। নিম্নাঙ্গে ছিল কটি থেকে জানু পর্যন্ত মোটা একটা জাঙ্গিয়া, সেটা রক্তবর্ণ রেশমের। কোমরবন্ধের দুই পাশে ঝুলছে দুখানি খরশাণিত ছোট খড়্গ। তিনি যখন অর্ধনগ্নদেহে সভামণ্ডপে দাঁড়ালেন, তখন সকলের চোখ তাঁর উপরই গিয়ে পড়ল—

তাঁর দেহের সৌন্দর্যে সভা উজ্জ্বল। বিশ বাইশ বৎসর বয়স, গৌরকান্তি, সুঠাম বলিষ্ঠ দেহ, তীক্ষ্ণ নাসিকা, উজ্জ্বল আয়ত লোচন অনেককেই মুগ্ধ করল। বেগম মহলে একটা চাপা হাহাকার উঠল, কেউ কেউ বলেই ফেললেন, আহা, এমন সোনার চাঁদ ছেলেকে বাঘের মুখে ঠেলে দিলে। সকলের অন্তর হ'তেই উদয়নারায়ণের মঙ্গল কামনা-পূর্ণ একটা প্রার্থনা উঠ্‌ছিল। কেবল মসীম ও তার পুত্র ছাড়া। তারা ভাবছিল, আপদটা যত শীঘ্র যায় ততই ভাল। তাদেরই হিংস্র অন্তরের প্রতিধ্বনি উঠিয়ে ব্যাঘ্রটা যেন পুনরায় গর্জন করে উঠ্‌ল। তার হয়ত ইচ্ছা হচ্ছিল, এই সুখাদ্য ভোজ্য-সমুদ্রের মধ্যে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে। উপর্যুপরি ভীষণ গর্জনে সে তার প্রবল বাসনা প্রচার করল। কাপুরুষ মসীম ভীত হয়ে মনে করলে বাঘটা যদি তার খাঁচা ভেঙ্গে তেড়ে এসে তাকেই আক্রমণ করে। সে তাড়াতাড়ি নাজিরকে হুকুম করলে, "লোকটাকে খাঁচার ভেতর ঠেলে দাও—ও বোধ হয় সহজে যাবে না।" নবাব বাধা দিয়ে বললেন, "রাজা উদয়নারাণ তাঁর সুবিধামত ভিতরে যাবেন।"

উজির। খাঁচার একটা গরাদ নড়চে জাঁহাপনা, মনে হয় সেটা কমজোরী।

নবাব। তাই নাকি? আপনি নিজে গিয়ে এখনি পরীক্ষা করে দেখুন।

কাজেই উজীরকে ভয়ে ভয়ে খাঁচার ধারে আসতে হ'ল, এবং কম্পিত হস্তে তাড়াতাড়ি দু'চারটা গরাদ নিয়ে টানাটানি করতে হ'ল। কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে সেই অল্প সময়ের মধ্যেই এক অসতর্ক মুহূর্তে ব্যাঘ্রপ্রবর এক লম্ফে এসে উজীরের হাত কামড়ে ধরল এবং খাঁচার ভিতর দিকে টান্‌তে লাগল। পশুর গর্জনকে পরাস্ত করে মসীম "কে আছ, বাঁচাও, রক্ষে কর" বলে চীৎকার করে উঠল। সভাতল সে করুণ চীৎকারে শিউরে উঠল, কিন্তু কেউ তাকে রক্ষা করতে অগ্রসর হ'ল না। এমন কি তার পুত্রও নয়। একমাত্র উদয়নারায়ণ তৎক্ষণাৎ বাঘেরই মতো লম্ফত্যাগে খাঁচার সমীপস্থ হলেন এবং বিদ্যুৎবেগে তাঁর অসি-অগ্রভাগ পশুর ললাটে প্রবিষ্ট করিয়ে দিলেন। পশু যন্ত্রণায় অধীর হোয়ে উজীরকে মুক্তি দিল। তাঁকে শুশ্রূষার জন্য বাইরে নিয়ে গেল।

উদয়নারায়ণ আর কালক্ষেপ না করে পিঞ্জর দ্বারে এসে দাঁড়ালেন। পশু ও মানুষ পরস্পরের পানে চেয়ে দেখল- মধ্যে কপাট। পশু চিনিল, এই আমার আততায়ী, করাল দংষ্ট্রা ব্যাদন করে সে তার আয়ুধ দেখাল। উদয় দুই হাতে দুইখানি কৃপাণ নিয়ে ব্যাঘ্রকে তাঁর অস্ত্র দেখালেন। পশুর ললাট হ'তে রক্ত গড়িয়ে তার চোখের উপর পড়ছিল, সে তার দৃষ্টি পরিষ্কার করে নিতে যখন ব্যস্ত, তখন উদয় চক্ষের নিমেষে লৌহ কপাট খুলে ঝটিতি ভিতরে প্রবেশ করলেন। বাঘ তাঁকে ভিতরে আসতে দেখেই শিকারের উপর লাফিয়ে পড়বার আগে যেমন করে থাবা পেতে বসে তেমনি করে গুঁড় পেতে বসল। উদয়-নারায়ণ যখন দেখলেন, পশু লম্ফোদ্যত, তখন তিনি ঝটিতি সরে গেলেন। বাঘ লাফ দিয়ে তাঁর নিকটেই পড়ল। তিনি তখন বাঘের পিছনের পায়ের উপর সজোরে খড়্গাঘাত করলেন—একখানা পা ছিন্ন হোয়ে পড়ে গেল। পশুর চীৎকারে নগর প্রকম্পিত হ'ল। সে ক্রোধে উন্মত্ত, কিন্তু লম্ফত্যাগে অশক্ত, কাজেই মুখ ব্যাদন করত শত্রুর আগমন প্রতীক্ষা করতে লাগল। শত্রু কিন্তু সহজে তার কাছে ধরা দিতে গেল না। বাঘের ছিন্ন পদ হ'তে রক্তস্রোত প্রবাহিত হ'তে লাগল—পশু ক্রমে দুর্বল হোয়ে পড়ছিল, জনতা অধীর হোয়ে চীৎকার করতে লাগল, 'মার ডালো'। উদয়নারায়ণ অবিচলিত চিত্তে ব্যাঘ্রের দৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখছিলেন। বাঘ এত উত্তেজিত হয়েছিল যে, শেষে তিন পায়ের উপর ভর দিয়েই সে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। উদয় চকিতে আবার সরে দাঁড়ালেন—বাঘ নিকটেই পড়ল। উদয় বিদ্যুদ্বেগে লম্ফপ্রদান পূর্বক ব্যাঘ্রের মস্তকে তাঁর ক্ষুদ্র খড়্গ আমূল প্রোথিত করে দিলেন। পশু গতাসু হ'ল।*

বিস্মিত ও আনন্দিত জনতা উচ্চ করতালি দিয়ে উঠ্‌ল, নবাব হাসতে হাসতে উদয়কে ইঙ্গিতে আহ্বান

* Udaya proceeded to the court, but the Nalab refused to re-instate him unless he fought and overcame a tiger Udaya young and fearless accepted the terms, and being skilled in the use of weapons he encounered the brute and killed it, In this way he regained····

[Asiatic Society journal, Vol, XLIII, Page 209]

করলেন। উদয় হস্তাদি ধৌত করে উপযুক্ত বস্ত্রাদি পরিধান করলেন। তৎপরে তিনি সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হ'তে লাগলেন। আমীর ওমরাহ, রাজা মহারাজা উজীর নাজির প্রভৃতি ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। উদয়ের মুখে মৃদু হাসি, দেহ অক্ষত, ক্লান্তিশূন্য। তিনি প্রফুল্ল-বদনে সিংহাসন সমীপে দণ্ডায়মান হোয়ে নবাবকে অভিবাদন করলেন। নবাব উঠে দাঁড়িয়ে উদয়ের কণ্ঠে জয়মাল্য দিলেন, ললাটে রাজটীকা দিলেন, বললেন, "বাকলা চন্দ্রদ্বীপের রাজা উদয়নারায়ণ, তোমার এই অতুল কীর্তি বাংলা চিরদিন স্মরণ রাখবে। আশা করি, তুমি আজীবন আমাদের বন্ধু ও সহায় হয়ে থাকবে।"

দুই দিন রাজঅতিথিরূপে গৌড়ে অবস্থান করবার পর উদয় যখন দেশাভিমুখে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন নবাব উপহার দিলেন বহু অশ্ব ও হস্তী, বেগমরা দিলেন মূল্যবান অলঙ্কার আর কৃতজ্ঞ মসীম দিলেন বিবিধ অস্ত্র ও বস্ত্র।

সুহাসের সংসার

কুমারী শর্মিষ্ঠা সরকার

গ্রাহিকা নং ৩১১৪

(পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা)

ছোটখাট সংসার

স্বামী, স্ত্রী আর গুটিতিনেক ছেলেমেয়ে।

অল্প আয়, তাহারই মধ্যে এই সংসারটির যাবতীয় খরচ যায় লোক-লৌকিকতা সবই করিতে হয়।

পাঁচটা বাজিতে না বাজিতে জলের ছড়্ছড়্ শব্দে সুহাসের ঘুম ভাঙিয়া যায়, দেখে কোলের ছেলেটি এরই মধ্যে কখন উঠিয়া বসিয়া রাত্রে তাহার শয্যার অপরিহার্য অঙ্গ অয়েলক্লথখানি মুখে পুরিয়া লালা মাখাইতেছে। মা'কে চোখ চাহিতে দেখিয়া দন্তহীন মুখে একগাল হাসি। সুহাস স্নেহের প্রাবল্য সামলাইতে পারে না.. ...অধীর আগ্রহে ছেলেকে বুকে চাপিয়া ধরে।

বড়ছেলে বিষাণ বাপের কাছে শোয়। সে নিদ্রিত বাপের পিঠটিকে ঘোড়া কল্পনা করিয়া চড়িয়া বসিয়াছে, এবং মুখে মাঝে মাঝে হ্যাট্ হ্যাট্ করিতেছে, চাবুকের অভাব পূর্ণ করিয়াছে ছোটভাইয়ের পাশবালিসটি।

সুহাস অনুনয় করে, বিষাণ, বাবা লক্ষীছেলে, নেমে এস, ওঁর ঘুম ভেঙে যাবে। :বিষাণের মন তখন অন্যদিকে। পিতার নাসিকাধ্বনি তাহাকে যেন কৌতুকে উচ্ছল করিয়া তুলে। ক্ষুদ্র কচি কচি আঙুলে সুপ্ত পিতার নাকটি সজোরে চাপিয়া ধরে।

'—উ-হু-হু-হু-হু, লাগছে, খোকা ছাড় ছাড়!' ততক্ষণে খোকা হাসিয়া বিছানায় লুটাইয়া পড়িয়াছে।

মেয়ে নূপুর ওরই মধ্যে ক্ষীণজীবি—সে হুটোপাটি, হট্টগোলের মধ্যে পারতপক্ষে যায় না। ছোট ভাইটির বালিসগুলিকে ছেলেমেয়ে কল্পনা করিয়া সে এতক্ষণে শয্যার একপার্শ্বে গৃহস্থালী পাতিয়াছে।

কার্তিক মাস　ভোরের দিকে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে। এই সময়টা আলস্যে পর্যবসিত করিতে সুহাসের ভারী ইচ্ছা করে, কিন্তু উপায় নাই। কেরাণীর স্ত্রী সে, তাকে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় অফিসের ভাত দিতে হইবে। নীচে হইতে ঠিকা ঝির বাসনমাজার আওয়াজ ভাসিয়া আসিতেছে, এখুনি গয়লা আসিবে দুধ দিতে, আর শুইয়া থাকা চলে না। সুহাস উঠিয়া পড়ে, ছেলেদের গায়ে এক একটা গরম জামা দিয়া ওদের সঙ্গে লইয়াই নামিয়া আসে।

তারপর চলিতে থাকে দৈনন্দিন কর্মপ্রবাহ। নিজের কাপড়কাচা, ছেলেদের দুধ খাওয়ান, স্বামীর যথাসময়ে চায়ের জোগাড়, রান্না-বান্নার জোগাড, সুহাসকে একাই সব করিতে হয়। বাহিরে কেহ আসিয়াছে 'চা করিয়া দাও' হুকুম হইল, অথচ মাসের শেষে চা চিনির খরচ দেখিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিবার জোগাড হয়। নূপুরের পেটটা ভাল নয় তজ্জন্য আলাদা পোবের ভাত, গাঁদালের ঝোলের ব্যবস্থা। ছোটছেলের বালি, সুহাস এক এক সময় যেন আর পারিয়া উঠে না।

আহার করিতে বসিয়া সুধীর বলে, "তোমার দিদি-জামাইবাবুর চিঠি এসেছে।—"

গরম ঝোলটা তাড়াতাড়ি পাখার বাতাসে ঠাণ্ডা করিতে করিতে সুহাস সপ্রশ্নদৃষ্টিতে জানতে চায়—"কি লিখেছেন?"

—"তাঁরা সবাই দিন পনেরোর জন্যে এখানে বেড়াতে আসবেন—"

স্বামীর চিন্তাক্লিষ্ট মুখের দিকে চাহিয়া সুহাসের বুকের মধ্যে ধ্বক্ করিয়া উঠে। সে জানে সামান্য চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা মাহিনার কেরাণীর পক্ষে বাড়তি খরচের জন্য টাকা সংগ্রহ করা কতখানি কষ্টসাধ্য।

তাহাকে নীরব দেখিয়া সুধীর হাসিল—কহিল "টাকার কথা ভাবছ, না? কিন্তু পারতেই হবে সু—তাঁরা কখনও আসেন না—তার করে দিই, কি বল?

আফিস হইতে ফিরিয়া সুধীর কাগজ পড়িতেছিল। সুহাস তাড়াতাড়ি দুখানা কচুরি ভাজিয়া এক পেয়ালা চায়ের সাথে আনিয়া দিল। সামান্য কেরাণীর পক্ষে এই রকম জলখাবার চরম বিলাসিতার ব্যাপার, কিন্তু সেকথা সুধীর মুখ ফুটিয়া বলিলে, সুহাসকে শুধু কষ্টই দেওয়া হইবে, তাহাকে নিবৃত্ত করা যাইবে না।

কাগজটা নামাইয়া সুধীর বলিল, 'ছেলেরা সব খেয়েছে?'

"হাঁ গো হাঁ, তাদের না দিয়ে কি তোমায় দিচ্ছি?"

সে কথার উত্তর না দিয়া সুধীর কহিল, "বিষাণের পরীক্ষার ফলাফল বেরিয়েছে, কই আগের মত তেমন তো ভাল হচ্ছে না? তাছাড়া মাষ্টাররা লিখেছেন, তেমন মন দিয়ে পড়াশোনা করে না···।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সুহাস কহিল, "তুমি যদি নিজে একটু দেখ বাপ মায়ে ছেলেকে না দেখলে কি সে ছেলের উন্নতি হয়?" সুহাসের কথা শুনিয়া কেন জানি না সুধীর ক্ষুণ্ণ হয়, বলে, "সেকি আমার অসাধ?"

সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর কেরাণী সুধীরের শরীর মন শ্রান্তিতে অবসাদে ভাঙিয়া পড়ে। তখন কি আর ছেলে পড়াইবার ক্ষমতা থাকে, না ইচ্ছা থাকে? বাপের ধৈর্যের অভাবে ছেলে অধিকাংশস্থলে মার খায়—পড়া তৈয়ারী করিতে পারেনা বলিয়া। লজ্জায় অনুশোচনায় ম্লান হইয়া যায় সুহাস। স্বামীর শ্রান্ত মুখের পানে চাহিয়া সুহাসের ভারী কষ্ট হয়। বলে, "ওর অন্যসব পড়া আমি করিয়ে দেবখন, তুমি শুধু একটু ইংরাজিটা দেখো।

তিন চার মাস কাটিয়া গিয়াছে। এর মধ্যে কেমন করিয়া অশান্তির মূল কোন নিগূঢ় তলদেশে শিকড় গাড়িয়াছে সুহাস তাহা ভাবিয়া পায় না। কিন্তু এটুকু সে বুঝিতে পারে যে তাহারই উত্তাপে সংসারের সব সরসতা বাষ্প হইয়া উরিয়া যাইতেছে।

সুহাসের দিদিদের আসার জন্য মুদীর দোকানে ধার জমিয়াছে, গয়লার পয়সা বাকী, উপরন্তু নূপুর ও টুটুর অসুখের জন্য ডাক্তার খরচ। সুধীরের অল্প আয়, তাহা সত্ত্বেও এই অপরিহার্য প্রয়োজনগুলির জন্য যে অর্থের আবশ্যক তাহা দিতে সে চেষ্টার ত্রুটি করে না বা বাড়তি খরচের জন্য কিছু বলিবে এমন ছোট মন তাহার নহে। তবু মাসের প্রথমে হরেক রকম খরচের বহর দেখিয়া এবং সেই সঙ্গে আপনার অর্থের পরিমাণ জানিয়া তাহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়ে।

পাঞ্জাবীটা ছিঁড়িয়াছে—একটা যেরকম করিয়াই হউক এমাসে তৈয়ারী করিতেই হইবে। সে কথা বলিতে গিয়া সুহাস ধমক খাইল। সাংসারিক দুশ্চিন্তায় এবং অসুস্থতায় সুধীরের মেজাজ যেন দিনদিন্ খিটখিটে হইয়া উঠিতেছে, তার উপর অফিসের একটানা খাটুনী। সুহাস জানে এবং বোঝেও সব, কিন্তু প্রতিকারের উপায় খুঁজিয়া পায় না। সে ভোর হইতে রাত্রি পর্যন্ত রক্ত জল করিয়া এ সংসারের জন্য হাসিমুখে খাটিয়া দেয়, কিন্তু, অভাব অনটন রোগশোকের মধ্যেও সে চায় একটু প্রীতি, একটু

শান্তি—কিন্তু বিধাতা বোধ করি তাহাকে সেইটুকু হইতেও বঞ্চিত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

সুহাস জোর করিয়া কহিল "অফিসে পাঁচজনের কাছে তো তোমায় মান রাখতে হবে, যেরকম করেই হোক জামা করতেই হবে।"

সুধীর একটুতেই যেন জ্বলিয়া ওঠে, তীব্রকণ্ঠে বলে— "যেরকম করে হোক্ করতে হবে মানে কি চুরি চামারী করতে বলো? হতচ্ছাড়া সংসার শুষে খেয়ে ফেললে আমায়, তার ওপোর আবার লেগেই আছে বাইরের শাতশো হাঙ্গামা।"

স্বভাবতঃ স্বল্পভাষী, ধীর, শান্ত প্রকৃতির মেয়ে সুহাস। এতটুকু কথায় এতটুকু ভর্ৎসনায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিবার মত মেয়ে সে নয়—কিন্তু আজ যেন তাহার কি হইল। অভিমানে, ক্ষোভে চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইয়া আসিল। রুদ্ধস্বরে কহিল, "বাহিরের হাঙ্গাম মানে তো, দিদিদের জন্যে খরচ? আমি তো বারে বারে ওদের আসাতে আপত্তি জানিয়েছিলুম। তুমি কেন জোর করে আনলে—" বলিতে বলিতে ঝর ঝর করিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল।

সুধীর নিজের এই রূঢ়তায় নিজেরই উপর সহসা রাগে, লজ্জায় যেন অপ্রতিভের একশেষ হইয়া পড়ে। অনুতপ্ত মুখে কোন কথা না কহিয়া সে আস্তে আস্তে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যায়।

সুহাসের বাবা বড়লোক। মা নাই। বাবা চিঠি লিখিয়াছেন সুহাস ও ছেলেমেয়েদের দু'চারিদিনের জন্য পাঠাইয়া দিতে।

কয়েকদিন বাড়ীটাও যেন অশান্তি ও বেদনার ভারে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। ছেলেরাও যেন চেঁচাইতে ভুলিয়া গেছে। সুধীর অফিস হইতে ফিরিয়া খবরের কাগজ লইয়া নিঃশব্দে সময় কাটায়, আর সুহাসও আপনাকে নীরবতার আড়ালে রাখিয়া কাজ করিয়া যায়।

চিঠি পড়িয়া সুধীর বলিল, "দু-চারদিন ছেলেদের নিয়ে ঘুরে এসো, তোমার শরীরটা ভাল নয় ছেলেরাও ভুগছে।

সুহাস কোনও উত্তর দিল না, নিঃশব্দে হাতের কাজ সারিতে লাগিল। কলিকাতা হইতে সুহাসের পিত্রালয় মোটরে ঘণ্টা দেড়েকের পথ। সুধীর আফিস হইতে ফিরিয়া নিজে রাখিয়া আসিবে এই স্থির হইল। সুহাস ছেলেদের জামা কাপড় গুছাইয়া লইল।

যথাসময়ে ট্যাক্সি আনিয়া, সুধীর দেখিল সুহাসের চুল বাঁধা, কাপড় পরা কিছুই হয় নাই। সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারের মধ্যে জানালার ধারে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছে, আর ছেলেরা তাহার আঁচল ধরিয়া টানিতেছে আর কেবলি বলিতেছে 'যাবে না মা, গাড়ী যে এসে গেল।'

সুধীরের আগমন ওরা টের পায় নাই। বারবার বিরক্ত করাতে হঠাৎ সুহাস নূপুরের পিঠে দুম্‌দুম্ করিয়া গোটাকতক কিল্ বসাইয়া দিল।

ত্বরিতপদে অগ্রসর হইয়া রোরুদ্যমানা কন্যাকে বুকে তুলিয়া শান্ত করিতে করিতে সুধীর ব্যথিত তিরস্কারে কহিল, "ছি সুহাস, এই ভরসন্ধ্যেবেলা অবোধ শিশুকে কি এমন করে মারতে হয়? তুমি যেতে না চাও স্পষ্ট বললেই তো পারতে?" সুধীর পুত্রকন্যাকে লইয়া বাহির হইয়া গেল।

আর সুহাস মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িয়া আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। সে কোথাও যাইবে না। তাহার বাবা যাইতে লিখিয়াছেন বটে কিন্তু সে চলিয়া গেলে তাহার স্বামীকে দেখিবে কে? তিনি যে সম্পূর্ণ তাহারই মুখাপেক্ষী—হোক তাহার স্বামী দরিদ্র—হোক তাহার সংসার অভাবে পূর্ণ, তবুও ভালয়মন্দে মেশান এ সংসার সুহাসের হৃদয় উজাড় করা মায়া মমতায় সযত্নে রচিত নীড়। এ ছাড়িয়া সে কোথাও যাইতে পারিবে না।

সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে একটী অশ্রুময়ী নারীর অন্তর বেদনা মূর্ত হইয়া ঘরের বাতাসকে অকারণে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল।
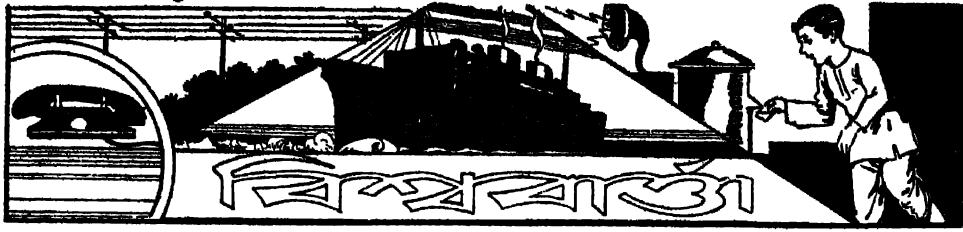
যুদ্ধের গতি ক্রমশ পশ্চিম য়ুরোপের উত্তরাংশ ঘুরে পূর্ব য়ুরোপের দক্ষিণে এসে পৌঁছেছে।

জার্মানি যখন অধিকৃত য়ুরোপের ব্যবস্থা নিয়ে ব্যস্ত সেই ফাঁকে অকস্মাৎ ইটালি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল গ্রীসের উপর। মুশোলিনী মনে করেছিলেন হিট্‌লারের মতো তিনিও তিনদিনের মধ্যেই গ্রীস দখল করে ফেলবেন। কিন্তু অদৃষ্টের এমনিই পরিহাস যে গ্রীস দখল করা দূরে থাক, আজ এই মাসাধিককাল, ইটালি অনবরত গ্রীসের কাছে সমস্ত যুদ্ধে হেরে ক্রমেই পিছিয়ে আসছে। ইটালির দুরবস্থা দেখে অনেকেই অনুমান করছেন যে শেষ পর্যন্ত মুশোলিনীকে না সমস্ত এ্যালবেনিয়া ছেড়েই পালিয়ে আসতে হয়। ক্ষুদ্র এ্যালবেনিয়াকে অন্যায় বলপ্রয়োগে ইটালি গতবৎসর দখল করে বসেছিল। পার্বত্য এ্যালবেনিয়ান জাতি অকস্মাৎ তাদের স্বাধীনতা হারিয়ে ইটালির প্রতি একেবারেই প্রসন্ন ছিল না। শোনা যাচ্ছে তারা নাকি ইটালির বিরুদ্ধে গ্রীসকে নানাভাবে সাহায্য করছে। এটা করা তাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। এ্যালবেনিয়ানদের সাহায্য গ্রীসের খুব কাজে আসছে, তাছাড়া গ্রীসের বন্ধু ব্রিটেন তার সাহায্যে নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করছে। কারণ বিপন্ন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে য়ুরোপের এই পূর্বদ্বার রক্ষণের উপর।

* * * *

ভূমধ্যসাগরে ব্রিটিশ রণতরী বহর ইটালির পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। গ্রীসের ক্রীট কর্ফু প্রভৃতি দ্বীপে ব্রিটিশ বিমান ঘাঁটিসমূহ স্থায়ী আস্তানা গেড়ে বসবার সুযোগ পেয়ে গেল। ইতিমধ্যে একাধিকবার ইটালির বন্দরে ঢুকে মুশোলিনীর বড় সাধের রণতরীর অনেকগুলিকে ব্রিটেনের যুদ্ধ জাহাজ ঘায়েল করে এসেছে। ইটালির উপর বিমাণ আক্রমণ চালানোও এখন ব্রিটিশ আর-এ-এফের পক্ষে খুবই সহজ হয়ে পড়লো। উপস্থিত ব্রিটিশ আর-এ-এফ গ্রীস বাহিনীকে ইটালির বিরুদ্ধে আক্রমণে রীতিমত সাহায্য করছে। ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীও গ্রীসে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি উপনিবেশের সাহায্যও গ্রীসে এসে পৌঁছেচে। সুতরাং গ্রীস ক্ষুদ্র হলেও আজ আর দুর্বল নয়। ব্রিটিশ সহায়তায় বলীয়ান হ'য়ে গ্রীসের স্পার্টান যোদ্ধারা ইটালিকে বিধিমত বিপর্যস্ত করে তুলেছে। জার্মানি যদি বিপন্ন বন্ধুর সাহায্যে না আসে, তাহ'লে গ্রীস হয়ত অচিরে ইটালিকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করতে পারবে। এবং সেই পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইটালির আফ্রিকা অভিযান মিশর আক্রমণ, সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন অধিকার স্বপ্নের মত উড়ে যাবে সে বিষয়ে কোনো ভুল নেই। ভারতের করাচি ও বোম্বাই বন্দর এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত পথ উপস্থিত কিছুদিন নিরাপদ বলে ঘোষিত হবে নিশ্চয়।

* * * *

কিন্তু জার্মানি কি সহযোগী বন্ধুর এই শোচনীয় অবস্থা দর্শকের মতো শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখবেন? ইটালির এই পরাজয়ে যে জার্মানিরও মর্যাদাহানি ঘটবে। ঠিক যে কারণে আমেরিকা আজ ব্রিটেনকে অর্থ, সামর্থ্য ও বিপুল রণসম্ভার দিয়ে সাহায্য করতে উদ্যত হয়েছে, ঠিক সেই একই কারণে ইটালিকে সাহায্য করা জার্মানির পক্ষে অপরিহার্য হয়ে উঠবে। আমেরিকা বলছে—ব্রিটেন যদি এ যুদ্ধে হেরে যায় জগতে গণতন্ত্রের ব্যর্থতা ঘোষিত হবে এবং য়ুরোপে স্বেচ্ছাচারমূলক ডিক্টেটারি শাসনের জয় জয়কার পড়ে যাবে। তার ফলে গণতন্ত্রানুগামী আমেরিকাও অদূর ভবিষ্যতে বিপন্ন হয়ে পড়বে। সুতরাং ব্রিটেন যাতে এ যুদ্ধে জয়ী হয় মার্কিণ যুক্তরাজ্য সর্বতোভাবে সেই চেষ্টা করবেন। এর জন্য যদি তাঁদের শেষ পর্যন্ত যদি যুদ্ধেই নামতে হয় তাতেও আমেরিকা পশ্চাৎপদ হবে না। অতএব, ইটালির পরাজয়ও যে জার্মানি নিঃশব্দে বসে দেখবে না, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয়। কিন্তু, ব্রিটেন ও গ্রীসের মিলিত চেষ্টায় এ্যালবেনিয়া যদি

মিত্রশক্তির দখলে আসে তাহ'লে জার্মানির পক্ষেও এখানে অগ্রসর হওয়া কঠিন হয়ে পড়বে ; এমন কি বন্ধু মুশোলিনীর মত হিটলারেরও শোচনীয় ভাবে পরাজিত হবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। শেষটা কি তবে গ্রীসেই এবারকার মহাযুদ্ধের একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হবে ?

* * * *

ফ্রান্সকে পরাস্ত করে জার্মানি উত্তর ফ্রান্স অধিকার করে বসে আছে। সম্প্রতি খবর পাওয়া গেছে যে 'আলসেস্-লোরেণ থেকে সমস্ত ফরাসী ভাষাভাষী অধিবাসীদের বিতাড়িত করে জার্মানি সে দেশের নূতন নামকরণ করেছে 'ওয়েস্ট্মার্ক'। এখন থেকে 'আলসেস্-লোরেণ' ওই নূতন নামেই ভূগোলের মানচিত্রে বৃহত্তর জার্মানির অঙ্গ-সংলগ্ন হয়ে রইল বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে আবার এ মানচিত্র বদলাবে কিনা কে জানে ? পঁচিশ বছরের মধ্যে পৃথিবীর মানচিত্র কি আবার নূতনরূপে দেখা দেবে ? রুমানিয়ার মধ্যে শোনা যাচ্ছে অসংখ্য জার্মাণ সৈন্য অবস্থান করছে। তারা 'বুখারেস্ট' নগরের রাজপথে প্রকাশ্যভাবে কুচকাওয়াজ করে বেড়াচ্ছে। রুমানিয়ার 'আয়রণ গার্ড' দল নাকি নাজীদের ভক্ত। এদিকে হাঙ্গেরী ও যুগোশ্লাভিয়া জার্মানির সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। বাল্কানে বাকি শুধু বুলগেরিয়া আর তুর্কী। ইটালী ও গ্রীসের মধ্যে একটা হেস্তনেস্ত না হওয়া পর্যন্ত এরা হয়ত কিছুদিন নিরাপদে থাকবে, কিন্তু তারপর যে এদেরও বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে এরূপ আশঙ্কা যথেষ্টই করা যায়। ওদিকে স্পেনের মতিগতিও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। সেখানেও নাকি অসংখ্য জার্মাণ সৈন্য ভদ্রলোকের ছদ্মবেশে আত্মগোপন করে রয়েছে। সময় বুঝে শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আক্রমণ করবে। তাদের লক্ষ্য নাকি 'জিব্রল্টার'। কিন্তু ইংরাজীতে একটা বড় মূল্যবান কথা আছে, 'Man proposes God disposes.' আমাদের মত নির্জীবদের পক্ষে ওই 'ধুয়ো' ধরে থাকাই বোধ হয় নিরাপদ।

* * * *

চীনে একটি অনুমোদিত শাসন পরিষদ খাড়া করে তাদের সঙ্গে সুবিধাজনক সর্তে একটা রাষ্ট্রীয় চুক্তি সম্পাদনের পর জাপান উপস্থিত চীন ছেড়ে ইন্দোচীনের দিকে পা বাড়াচ্ছে। ফ্রান্সের পতন ও রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ের সুযোগ নিয়ে কতকটা সুবিধা জাপান ইতিমধ্যেই সেখানে করে নিয়েছে। এখন তার দৃষ্টি পড়েছে সিঙ্গাপুর মালয় ও পূর্বভারতীয় ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জে। কারণ, পেট্রল, রবার, টিন, নিকেল প্রভৃতি বর্তমান যুগে একটা সভ্যজাতির বেঁচে থাকার পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় কতকগুলি জিনিস জাপানের নেই। সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্য জাপানের মধ্যে যতটা থাক বা না থাক, বাণিজ্য বিস্তারের জন্য জাপানের প্রচেষ্টা অসীম। বিবিধ কাঁচামালের জন্য ব্রিটেনের ন্যায় জাপানকেও আমেরিকা, আফ্রিকা ও ভারতবর্ষের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। কিন্তু চীন আক্রমণের ফলে সম্প্রতি তার চোখ ফুটেছে। জাপান বুঝেছে যে আত্মনির্ভরশীল হতে না পারলে তার সমস্ত শক্তিই বৃথা। ভারতবর্ষ ও আমেরিকা তাকে আর কাঁচা মাল দিয়ে সাহায্য করবে না বলে হাত গুটিয়েছে, অগত্যা জাপান ব্যস্ত হয়েছে কাঁচা মাল উৎপাদন করা কয়েকটি প্রদেশ নিজের আয়ত্ত ও অধিকারে কায়েমী ভাবে রাখতে। কাজেই এমন সুবর্ণ সুযোগ সে ছাড়তে রাজি নয়। ফ্রান্স দুর্বল হয়ে রয়েছে, ব্রিটেন আত্মরক্ষায় ব্যস্ত, এই অবসরে জাপান কাজ হাঁসিলের চেষ্টায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে।

* * * *

কিন্তু চুংকিংএ চিয়াঙ্ কাইশেকের জাতীয় গভর্নমেণ্ট বিদ্যমান থাকতে জাপানের তাঁবেদার ওয়াঙ্ চিং ওয়ের শাসন পরিষদ কি স্থায়ী হতে পারবে ? ব্রিটেন এবং আমেরিকা চুং কিংএর জাতীয় গভর্নমেণ্টকেই স্বীকার করে। তাঁরা চিয়াঙ্ কাইশেকের সঙ্গেই তাঁদের যা কিছু চুক্তি ও সর্ত সম্পাদন করেছেন। শুধু তাই নয় সম্প্রতি আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট্ সাহেব ঘোষণা করেছেন যে তাঁরা চীনের চুংকিং গভর্নমেণ্টকে দশ কোটী টাকা, ধার দেবেন বলে সাব্যস্ত করেছেন। এদিকে ব্রিটেন ব্রহ্মচীনের পথ খুলে দিয়ে চুংকিং গভর্নমেণ্টকে সকল রকম সাহায্যদানের ব্যবস্থা করেছেন। রাশিয়ার সোভিয়েট গভর্নমেণ্টও চায়নায় চুংকিংএর কর্তৃত্ব এখনও অস্বীকার করেনি। জার্মানিও চুংকিং গভর্নমেণ্টকেই স্বীকার করে। অতএব, বেচারা ওয়াঙ্-চিং-ওয়ে যে চীন শাসনে কতদূর কৃতকার্য হবেন সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। চীন যদি

বেঁকে দাঁড়ায় তা হলে জাপানের পক্ষে ইন্দোচীন দখল করা কঠিন হয়ে উঠবে। পাশ্চাত্য গুরুদের কাছে রাজনীতির পাঠ শিক্ষা করে জাপান ঠিক তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণে চলতে সুরু করেছে। প্রাচীন শ্যামদেশ, যে দেশ এখন 'থায়ল্যাণ্ড' নামে পরিচিত, জাপান তাকে প্ররোচিত করে ইন্দোচীনের কতক অংশ তাকে দিয়ে দাবী করিয়েছিল। কিন্তু ফরাসী বিপন্ন হলেও নির্বীর্য হয়নি একেবারে। তারা থায়ল্যাণ্ডের দাবী অগ্রাহ্য করেছে। ইন্দোচীন ও থায়ল্যাণ্ডের সীমান্তে উভয় পক্ষের সংঘর্ষও সুরু হয়েছে। কে জানে এর পরিণাম কোথা গিয়ে পৌছবে।
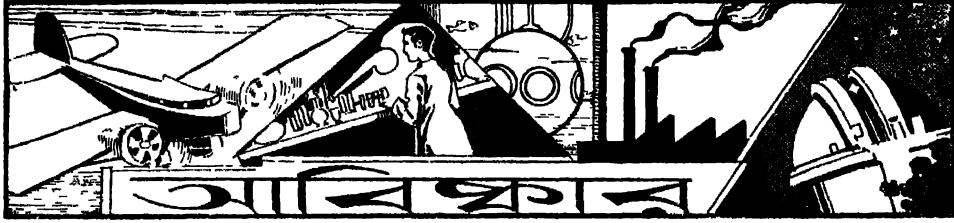
আহতের অব্যাহতি—

এতকাল আহত ব্যক্তির ক্ষতস্থানের ব্যাণ্ডেজ প্রত্যহ খুলে ঘা সাফ্ করে ঔষধ লাগিয়ে আবার ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেওয়া হ'ত। প্রত্যেক বার এই ব্যাণ্ডেজ খুলে ঘা ধোয়ার সময় আহত ব্যক্তির একটা আতঙ্ক উপস্থিত হয়। টানাটানি খোঁচাখুঁচিতে ভীষণ লাগে ও কষ্ট পায় তারা, কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মত যন্ত্রণাদায়ক ছিল এই ব্যবস্থা। আজকাল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ক্ষতচিকিৎসকেরা এ বিধি উল্টে দিয়েছেন। এখন সেই একবার মাত্রই আঘাতের দিন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন চর্মের ঝুলে-পড়া টুকরাগুলি কেটে বাদ দিয়ে ঈষৎ লবণযুক্ত উষ্ণজলে আহত ব্যক্তির ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে ধুয়ে ফেটে-যাওয়া ত্বকের অংশগুলি শিলাই করে দিয়ে ঘা যাতে বিষাক্ত হয়ে না ওঠে এমন কোনও বিষহারক ঔষধ প্রয়োগ করে খুব পুরু মোটা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে একেবারে তার উপর প্ল্যাস্টার এঁটে দেওয়া হয়। অবশ্য তার আগে আহত ব্যক্তিকে 'এ্যান্টি-টিটেনাস' অর্থাৎ 'ধনুষ্টঙ্কার নিবারক' ও "এন্টি গ্যাংগ্রীন" বা পচন নিবারক এক একটি ইঞ্জেক্‌শান্ দিয়ে দেওয়া হয়। এই প্ল্যাস্টার ভেঙে ব্যাণ্ডেজ খুলে দেওয়া হয় ক্ষতস্থান একেবারে সম্পূর্ণ আরোগ্য ও সুস্থ হয়ে উঠলে। তার আগে আর খোলাও হয় না, ধোয়াও হয় না, ওষুধ লাগানোও হয় না। তবে যদি দেখা যায় যে, আহত ব্যক্তির জ্বর ও যন্ত্রণা সুরু হয়েছে তখনই সেই প্ল্যাস্টার সরিয়ে ব্যাণ্ডেজ খুলে ক্ষতস্থানের অবস্থা পরীক্ষা করে দেখা হয়। কিন্তু এ দুর্ভাগ্য বড় একটা কারুর হ'তে দেখা যায় না। এই ব্যবস্থায় আহত ব্যক্তির একটা মস্ত সুবিধা হয় এই যে তাকে দীর্ঘকাল অসহায়ের মত বিছানায় পড়ে থাকতে হয় না। দু'তিন দিনের মধ্যেই সাঙ্ঘাতিক আহত ব্যক্তিও লাঠিতে ভর দিয়ে বা চাকা গাড়ী ঠেলে উঠে হেঁটে ঘুরে ফিরে বেড়াতে পারে।

মগ্নত্রাণ আঙরাখা—

বর্তমান যুদ্ধে সাবমারীণ টর্পেডো ও বোমার আঘাতে অনবরত সমুদ্রে জাহাজ ডুবী হচ্ছে। বহুলোক জলমগ্ন হয়ে প্রাণ হারাচ্ছে। একজন ইংরাজ আবিষ্কারক জলে ডুবে যাওয়া থেকে জলযাত্রীদের বাঁচাবার এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করেছেন। ফতুয়ার মত এ একটি গরম কাপড়ের জামা। এর নাম দিয়েছেন তিনি 'লাইফ্ সেভিং জ্যাকেট্' এই জ্যাকেটের উপরদিকটা মূল্যবান গ্যাবার্ডিন কাপড় যা সম্পূর্ণ ওয়াটার প্রুফ্ তাই দিয়ে তৈরী। ভিতর দিকে আস্তর যেটা সেটা তৈরি করিয়েছেন 'ট্রোপ্যাল' আঁশের সঙ্গে 'ব্যাপক' সংযোগে। এই 'র‍্যাপক' কখনো জল ডোবেনা এবং প্রচুর ভার বহনের শক্তি আছে এর। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে একটা সাধারণ 'লাইফ বেল্ট্' যা একজন লোককে ভাসিয়ে রাখতে পারে সেটা 'র‍্যাপকে' তৈরি হলে চারজন লোককে ভাসিয়ে রাখতে পারবে এবং তার জলে পড়ে থাকার দরুণ ঠাণ্ডাও লাগবে না। এ জ্যাকেটের অতিরিক্ত গুণ হচ্ছে শরীরটি বেশ গরম রাখে।

গ্রন্থগারিক

সায়ন্তনী

রচয়িতা : অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

প্রকাশক : সাহিত্য পাবলিশিং হাউস, ৭নং মুরলীধর লেন, কলি

মূল্য : ২৲ টাকা, পৃঃ ১৪৭, ছাপা বাঁধাই ও কাগজ উৎকৃষ্ট।

অপূর্ববাবু সুকবি বলে সুপরিচিত। পাঠশালায় তাঁর একাধিক রচনা প্রকাশিত হয়েছে। 'মধুচ্ছন্দা' ও 'নীরাজন' কাব্যে তিনি ভাবলোকের যে দুটি বিভিন্ন সুর ঝঙ্কৃত করে ছিলেন, তাঁর এই আলোচ্য নূতন কাব্য সায়ন্তনীতে পুনরায় মানবচিত্তের আর একটি অভিনব সুর তিনি ধ্বনিত করেছেন। এ সুর চারণ কবিদের। সায়ন্তনীর ছন্দগাথায় বেজে উঠেছে পরাধীনতার সকরুণ বেদনা, বন্ধন মুক্তির মন্ত্র গীত, পৌরুষের প্রদীপ্ত বন্দনা, শক্তি ও শৌর্য্যের উদাত্ত স্তোত্র, মনুষ্যত্বের মহিম্ন স্তব। দেশপ্রেমিক এই চারণ কবিকে আমরা সাদর অভিনন্দন জানিয়ে কায়মনে প্রার্থনা করি কবির স্বপ্ন, কবির সাধনা, কবির আশা ও আকাঙ্ক্ষা সত্য হোক, সার্থক হোক।

মৈনাক

রচয়িতা : কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক : কবিতা ভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা

মূল্য : ১৲ এক টাকা, পৃঃ ৪৬, ছাপা বাঁধাই ও কাগজ উৎকৃষ্ট

অতি আধুনিক তরুণ কবিদের মধ্যে কামাক্ষীপ্রসাদ তরুণতম হলেও তিনি শক্তিশালী কবি এবং সুলেখক। 'শবরী' কাব্যগ্রন্থে তিনি যে কবি প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন 'মৈনাক' তাঁর সে যশোস্তম্ভকে মৈনাক তুল্যই সুদৃঢ় করে তুলবে। কামাক্ষীপ্রসাদের রচনায় এলিয়ট, স্পেণ্ডর, অডেনের ধারা এসে তরঙ্গ তুলেছে বটে কিন্তু তাকে ঘোলাটে মলিন বা কদর্য করে তুলতে পারেনি। অতি আধুনিক কাব্যও যে আভিজাত্যমণ্ডিত হতে পারে, প্রোলিটেরীয়ানদের বুর্জোয়া মনোবৃত্তিকে বাদ দিয়েও যে বর্তমানের আবহাওয়ায় নূতন সুরে নবীনের বাঁশী বাজতে পারে 'মৈনাক' তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে। কামাক্ষীপ্রসাদের রচনার বিশেষত্ব এই যে তা এলোমেলো নয়, সঙ্গতি-বিহীন নয়, চিন্তার একটা পারম্পর্য, কল্পনার একটা স্বাভাবিকত্ব এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে আইনস্টাইনের রিলেটিভিটির মতো এগুলি দুরূহ ও দুর্বোধ্য নয়। এর রচনার মধ্যে গতি আছে যা গতানুগতিক নয়, এবং স্থিতিও আছে যা স্থাণু নয় বরং স্থিতি-স্থাপক। আমরা এই তরুণ কবির সাফল্য কামনা করি।•

অ্যাটলাণ্টিকের তীরে

রচয়িত্রী : প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

প্রকাশক : কমলা বুক ডিপো, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

মূল্য : ৸৹ আনা, পৃঃ ১৪৩, ছাপা বাঁধাই ও কাগজ উৎকৃষ্ট

কথাসাহিত্যে যশস্বিনী লেখিকা প্রভাবতী দেবী সরস্বতী সম্ভবতঃ দেশের ছেলেমেয়েদের জন্ত একখানি বড় উপন্যাস দান করলেন এই প্রথম। গল্পটি পাঠশালায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সময় পাঠক পাঠিকাদের কাছে আমরা এই রচনাটির যেরূপ উচ্চ প্রশংসা শুনেছিলাম তাতে মনে হয় 'অ্যাটলাণ্টিকের তীরে' ছেলে-মেয়েদের চিত্তাকর্ষণে সক্ষম হয়েছে। কমলা বুক ডিপো এই গল্পটিকে পুস্তকাকারে প্রকাশ ক'রে এবং মাত্র বার আনা মূল্যে সুলভ প্রাপ্য করে ছেলেমেয়েদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

পণ্ডিচেরীর সাগর তীরে

রচয়িতা : মৃণাল ঘোষ এম-এ

প্রকাশক : নূতন পত্র' পাবলিশিং হাউস, ৪১।১ মিডল রোড, কলিকাতা

মূল্য : ॥৹ আনা, পৃঃ ৩০, ছাপা বাঁধাই ও কাগজ উৎকৃষ্ট

স্বর্গীয় জলধর সেন বাংলা সাহিত্যে ভ্রমণকাহিনীকে একটা বিশেষ মর্য্যাদালাভের অধিকার দিতে পেরেছিলেন, তারপর পঞ্চাশ ষাট বছর ধরে বাংলাভাষায় একই ধরণের ভ্রমণকাহিনী লিখিত হতে দেখেছি। শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'পথে প্রবাসে' প্রথম সে ঐতিহ্য ভঙ্গ করে। ভ্রমণকাহিনীকে শুধু সরস ও সুখপাঠ্য নয় উচ্চাঙ্গের সাহিত্যেও রূপান্তরিত করতে পেরেছিলেন তিনি। আলোচ্য গ্রন্থখানিও একটি ভ্রমণকাহিনী এবং তা লিখিত হয়েছে একটু নূতন ঢঙে। ভাষাটি ভাল, বর্ণনা চিত্তাকর্ষক এবং লেখকের পর্য্যবেক্ষণ শক্তি ও সুক্ষ্মদৃষ্টির পরিচায়ক।

রাজপথ

রচয়িতা : বিধায়ক ভট্টাচার্য্য

প্রকাশক : সরস্বতী সাহিত্য মন্দির, সোণারপুর, ২৪ পরগণা

মূল্য : ৷৴৹ আনা, পৃষ্ঠা ২৯, ছাপা, বাঁধাই, কাগজ উৎকৃষ্ট।

বাংলা নাট্যসাহিত্যে যারা একটা নূতন যুগ প্রবর্তন করেছেন শ্রীযুক্ত বিধায়ক ভট্টাচার্য্য তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর 'মেঘমুক্তি' 'মাটির ঘর' 'বিশবছর পরে' 'মালারায়' প্রভৃতি নাটক সাধারণের কাছে বিশেষ সমাদর লাভ করেছে। বিধায়ক বাবুকে 'শিখা' পত্রিকায় ছেলেদের জন্য নাটক লিখতে দেখে আমরা আশান্বিত হয়েছিলাম যে তারাও এইবার নূতন ধরণের ভাল নাটক পাবে। 'রাজপথ' আমাদের সে আশা পূর্ণ করেছে।

প্রেমরেখা

রচয়িতা : অক্ষয়চন্দ্র চক্রবর্তী বি এ

প্রকাশক : ডি-এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য : ৸৹ বার আনা। পৃষ্ঠা ৮৬, ছাপা বাঁধাই ও কাগজ উৎকৃষ্ট।

নাগপুর দীননাথ হাইস্কুলের বাংলাভাষার শিক্ষক অক্ষয়বাবুর সুলেখক বলে সুনাম আছে। তাঁর এই আলোচ্য গ্রন্থখানিতে নাগপুরের শ্রদ্ধেয় বাঙালী স্বর্গীয় সার বিপিনকৃষ্ণ বসুর জীবনী, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে প্রবন্ধ, 'দেশের ডাক' নামে একটি 'নিবন্ধ' "ডিরোজিও"র উপর এক সুদীর্ঘ কবিতা এবং 'অজ্ঞাত জননায়ক' নামে একটি গল্প সন্নিবেশিত হয়েছে। সবগুলিই বেশ সুলিখিত। নানা বিভিন্ন বিষয়ের সমাবেশে বইখানি বিচিত্র হয়েছে। কিন্তু 'প্রেমরেখা' নামকরণ কেন হ'ল বোঝা যায় না।

ভবানীপুর
৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭
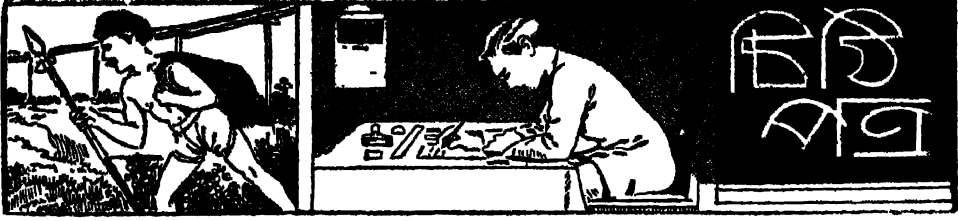
পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত 'শ-ব' মহাশয় সমীপে

সবিনয় নিবেদন—

পাঁচ টাকার চেক পেয়েছি, পুরস্কার পেয়ে খুব উৎসাহ বোধ হচ্ছে, সে কথা আপনাকে না জানিয়ে পারলুম না। পাঠশালা আমাদের যথেষ্ট আনন্দ দেয়। পাঠশালার কথা আমি সকলের কাছে বলি ও প্রশংসা করি, আর পাঠশালার এই শব্দ-সন্ধান আমাদের একটা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এতে আমরা বহু নূতন জ্ঞানের সন্ধান পাচ্ছি। শব্দ-সন্ধান আজকাল সব পত্রিকায়ই বাহির হচ্ছে, কিন্তু সেগুলি কেবলমাত্র লোক ঠকানো ব্যবসা মাত্র। আমি অনেকবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু অনেক ভুল হওয়ার দরুণ পুরস্কার পাইনি। কিন্তু তথাপি নিরুৎসাহ হইনি। কারণ, শিক্ষার আনন্দ পাই। যাই হোক এবারকার চেষ্টার ফল যে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে এই আমার যথেষ্ট পুরস্কার বলে মনে করি। আমার শ্রদ্ধা ও অভিবাদন গ্রহণ করবেন। ইতি

বিনীত
শ্রীশশাঙ্কশেখর বসু

আসানসোল
৩০।১১।৪০

সবিনয় নিবেদন—

আপনার ২২।১১।৪০ তারিখের পত্র সহ আমার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান বাদল ও ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী গীতার পুরস্কারের চেকখানি যথাসময়ে এখানে পৌঁছেছে।

মাত্র গীতা বাদল নয়, বাড়ীর ছেলেমেয়েরা সকলেই ও তাদের বন্ধু বান্ধবেরাও এই পুরস্কারে আহ্লাদিত হোয়েছে। এজন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ। এবারেও গীতা বাদল সোৎসাহে আপনাদের শব্দ-সন্ধান প্রতিযোগিতায় উত্তর পাঠিয়েছে। আপনাদের পত্র পেয়ে তাদের উৎসাহ আরও বেড়ে গেছে।

"পাঠশালা"টির প্রথম সংখ্যা আমি দেখেছিলুম। তাহাতেই আমার মনে হোয়েছিল যে উহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। তারপর আমার ছেলে গ্রাহক হওয়ার পর থেকে আমি মাঝে মাঝে পত্রিকাটি দেখে'ছি। আমার মনে হয় আপনারা নানারূপে এটিকে বাঙ্গলায় ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার একটি উৎকৃষ্ট প্রতিষ্ঠান কোরে তুলেছেন। সর্বান্তকরণে প্রার্থনা ভগবান এই কাজে আপনাদের সহায় হউন ও আপনারা এই কার্যে ব্রতী থেকে বাঙ্গলার আশা-স্থল ছেলেমেয়েদের শিক্ষার পথ প্রশস্ত করতে থাকুন।

পুনরায় আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ভবদীয়
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ পালিত
সাব্‌জজ ও অতিঃ দায়রা জজ্

শ্রীযুক্ত "শ-ব" মহোদয় সমীপেষু—

আপনার স্নেহাশীর্বাদযুক্ত লিপি ও চেকখানি পেয়ে আমরা বিশেষ সুখী হয়েছি। আমি বাদল—আমার পিতা, এবং আমি গীতা—আমার জ্যেঠামশাই শ্রীযুক্ত এস্ এন্ পালিত মহাশয়ও খুব খুসী হয়েছেন ও বলেছেন যে তিনি চেক ভাঙ্গিয়ে ও আরও কিছু টাকা দিয়ে আমাদের জন্য ভাল বই কিনে দেবেন। তিনি আপনাদিগকে পৃথক পত্র দেবেন। আমাদের প্রণাম নিন্। নিবেদন ইতি—

শ্রীমতী গীতা পালিত
শ্রীমান বাদল পালিত

শ্রীযুক্ত "পাঠশালা" সম্পাদক মহাশয়—

প্রথমেই 'শ-র'র বিরুদ্ধে অভিযোগ আন্‌চি—আপনার দরবারে :

'শব্দ-সন্ধানের'র পাশাপাশি ৩০এর সঙ্কেতসূত্রে তিনি লিখেছেন 'সিপাহী-বিদ্রোহ'। আমরা জানি সিপাহী বিদ্রোহ আজকে বলা—নিজেদের অবমাননা, সিপাহী-যুদ্ধ বলা উচিত ছিল নাকি ?

তারপরের অনুযোগ আপনার নামে :—পাঠশালায় Pen friends পাতাবার সুযোগ দেননি আপনি।

শ্রীউমা বাগ্‌চী লিখেছেন—নজরুলের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন শ্রীনলিনীকান্ত সরকার। 'ছিলেন' কেন—এখন কি নেই, জানতে চাইচি।

শ্রীযুক্ত নবনীকুমার চৌধুরীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্চি--আমার প্রশ্নোত্তরের জন্যে।

সব শেষে মনের কথা বলে দেওয়ার জন্য "মিরাকুলাস্" (Miraculous) 'ভূতো-গোয়েন্দা'কে বিস্মিত-আনন্দে সাদর অভিনন্দন জানিয়ে বিদায় নিচ্চি। নমস্কার। ইতি

মধু ঘোষাল—মুগকল্যাণ

মান্যবরেষু সম্পাদক মহাশয়,—

পাঠশালায় Pen friendsদের একটি বিভাগ খোলা হোক। কারণ তা যদি না খোলা হয় তা হোলে আমার মতন বহু Hobby বাজদের অসুবিধা ভোগ করতে হবে। Stamp collection, Autograph collection ইত্যাদি যাদের Hobby আছে, তাদের এটি যে কত সুবিধে করে দেবে তা হয়তো আপনি বুঝতে পারছেন। ইতি—

শ্রীসমীর চৌধুরী

চিঠির উত্তর

মধু ঘোষাল—"সিপাহী যুদ্ধ" লেখা 'শ-র'র নিশ্চয়ই উচিত ছিল। কিন্তু তিনি বলছেন—'শব্দ-সন্ধানের' প্রতিযোগিরা তাতে নাকি সহজেই উত্তরটি ধরে ফেলতে পারতো, তাই তাদের 'ধোঁকা' দেবার জন্য 'যুদ্ধ'র পরিবর্তে 'বিদ্রোহ' লিখেছিলেন।

স্বদেশের এবং বিদেশের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে 'Pen-Friends' পাতাবার সুযোগ পাঠশালায় একাধিক বার দেওয়া হয়েছে। পাঠশালা : প্রথম বর্ষ—দশম সংখ্যা (আষাঢ় ১৩৪৫) ৮৮৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য। দ্বাদশ সংখ্যা (ভাদ্র ১৩৪৫) ১০২০ পৃঃ দ্রষ্টব্য। পাঠশালা—দ্বিতীয় বর্ষ ১ম খণ্ড (পৌষ ১৩৪৫) ৩৪৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

এ বিভাগ এখনও পাঠশালার প্রত্যেক গ্রাহক গ্রাহিকা ও পাঠক পাঠিকার পক্ষে খোলা রয়েছে। যাঁরা 'পত্রী-মৈত্রী' চান তারা অবিলম্বে পাঠশালায় তাঁদের নাম ঠিকানা পাঠান।

সমীর চৌধুরী—'পত্রী-মৈত্রী' (Pen-Friends) সম্বন্ধে তোমার অনুরোধ যে বাহুল্য তা বোধ হয় উপরের উত্তর থেকেই বুঝেছ। তোমার "ডাকটিকিটের" প্রশ্ন পাঠশালায় 'ডাক- ঘর' লেখক অমিয়লাল মুখোপাধ্যায়কে দেওয়া হয়েছে।

আভারাণী ও প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় — 'পাঠশালা'য় মুদ্রিত কুপন একখানির সঙ্গে গ্রাহক নং সহ হাতে আঁকা কুপন পাঠালে গ্রাহ্য হবে (পাঠশালা—আশ্বিন, ১৩৪৭ দ্রষ্টব্য)। এ সুযোগ কেবলমাত্র গ্রাহক গ্রাহিকাদের জন্য। অন্যের পক্ষে মুদ্রিত কুপন ভিন্ন উত্তর পাঠালে গ্রাহ্য হবে না। মুদ্রিত কুপনের জন্য অতিরিক্ত 'পাঠশালা' কেনা ছাড়া উপায় নেই।

উদয়ভানু সিংহ—ম্যাট্রিকুলেশন বেঙ্গলী সিলেকশনে ৮সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লাইনটিই নির্ভুল। গ্রন্থকার মহাশয় মন্দস্মৃতি-বশে ও লাইনটি সঠিক উদ্ধৃত করতে পারেন নি। গ্রন্থাগারিক মহাশয় 'শিশুবোধ' বই থেকেই ওটি তুলে দিয়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের বই থেকে নয়।

সৌরভ সনাতনি—"মানুষের পূর্বপুরুষ" পাঠশালায় ৩য় বর্ষ ২য় খণ্ড শ্রাবণ ১৩৪৭ থেকে প্রকাশিত হ'তে আরম্ভ হয়।

শ্মশানেশ্বর কোঁয়ার—পাঠশালার গ্রাহক হ'তে হ'লে যে মাস থেকে গ্রাহক হবার ইচ্ছা সেই মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে পাঠশালা আফিসে টাকা জমা দিলেই সেই মাসেরই পাঠশালা যথাসময় পাওয়া যাবে।

বৎসরাধিকাল মহাত্মা গান্ধি গভর্নমেণ্টের সঙ্গে কংগ্রেসের আপোষ নিষ্পত্তির অনেক চেষ্টা করেও যখন কৃতকার্য হ'তে পারলেন না, তখন উপায়ান্তর না দেখে তিনি ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন ঘোষণা করেছেন। ভারতের সর্বপ্রধান জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেস তার সমগ্র সভ্য ও সমর্থকগণকে নিয়ে গণ-আন্দোলন হিসাবে এই সত্যাগ্রহ আরম্ভ করেনি। কেবলমাত্র কংগ্রেসের তথা ভারতের জনকয়েক বাছাই করা নেতৃস্থানীয় প্রসিদ্ধ নরনারী মহাত্মার আদেশ ও অনুমতি অনুসারে ও তদীয় ঘোষিত পদ্ধতি অনুযায়ী নিজ নিজ ব্যক্তিগত দায়িত্বে পূর্বাহ্নে কর্তৃপক্ষকে সংবাদ দিয়ে সত্যাগ্রহ ব্রতপালনে অগ্রসর হচ্ছেন এবং স্বেচ্ছায় কারাবরণ করছেন। কর্তৃপক্ষকে পূর্বাহ্নে সংবাদ দেওয়ার ফলে এমনও অনেক ক্ষেত্রে ঘটতে দেখা যাচ্ছে যে, ব্রতী তাঁর সত্যাগ্রহ পালনে অগ্রসর হবার পূর্বেই বন্দী হয়ে বিচারালয়ে ও কারাগারে নীত হচ্ছেন।

*　　　*　　　*

অপরাধ এঁদের গুরুতর। এঁরা আইন অমান্য করে আইন বিরুদ্ধ কাজ করছেন। এই মহাযুদ্ধের সংকটকালে ভারত গভর্নমেণ্ট যখন সৈন্য রসদ অস্ত্রশস্ত্র অর্থ ও অন্যান্য রণসম্ভার সংগ্রহে ব্যস্ত ও বিব্রত, সেই সময় ভারত-রক্ষা আইন লঙ্ঘন করে কয়েকজন ভারতীয় বিশিষ্ট নরনারী এই যে যুদ্ধ বিরোধিতা দ্বারা কারাগারে প্রবেশ করছেন, স্বরাজের পথে ভারতবর্ষ এ আন্দোলনে কতটা অগ্রসর হচ্ছে বলা যায়না, তবে এইটুকু মাত্র জানা যাচ্ছে যে, ভারতের জনকয়েক বিশিষ্ট ব্যক্তি স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যুদ্ধের স্বপক্ষে থাকতে পারলেন না।

*　　　*　　　*

যুদ্ধের অনুকূলে এঁদের সকলের সঙ্ঘবদ্ধ সুদৃঢ় সমর্থন পেলে ভারত গভর্নমেণ্ট যে তাঁদের এই সমরায়োজনে সবিশেষ সহায়তা লাভ করতে পারতেন কোনো সন্দেহ নেই. তবে এ কথাও ঠিক, যে, এঁদের বাদ দিয়েও ভারতবর্ষ থেকে যুদ্ধসম্ভার এবং অর্থ ও লোকবল সংগ্রহে গভর্নমেণ্টকে বেগ পেতে হবে না। কারণ, এঁরা বিদ্রোহী নন, অহিংস ও নিরুপদ্রবপন্থী সত্যাগ্রহী। দেশে অশান্তি ও অরাজকতা সৃষ্টি করতে চান না। নিজেদের কঠোর ত্যাগ ও কঠিন আত্ম-নিগ্রহের দ্বারা এঁরা বিরুদ্ধবাদীদের স্বমতে আনবার দুরাকাঙ্ক্ষ সাধক। এঁদের নৈতিক সমর্থনের একটা নৈতিক ভার আছে বটে, কিন্তু রাজনৈতিক বিরোধিতা সম্পূর্ণ নিরুপদ্রব বলে তার কোনো রাজনৈতিক মূল্য নেই। নৈতিক প্রভাব জগতে কার্যকরী হতে পারে একমাত্র সেই অবস্থায় যখন পৃথিবী থাকে শান্তির মধ্যে এবং নীতির মধ্যে।

*　　　*　　　*

পুরাণে ও ইতিহাসে আমরা এর অসংখ্য প্রমাণ পাই। এই ভাবতেই একদিন কুরুক্ষেত্র মহাসমর নিবারণ করবার সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পাণ্ডব পক্ষের দূত হয়ে কৌরব শিবিরে এসে আপোষ মীমাংসার বিধিমত চেষ্টা করেছিলেন। পঞ্চ পাণ্ডবের জন্য পাঁচখানি মাত্র গ্রাম ভিক্ষা করেও হস্তিনাধিপতি কৌরবেশ্বর দুর্যোধনের কাছে তাঁকে বিফল মনোরথ হয়েই ফিরতে হয়েছিল। শক্তিমত্ত দাম্ভিক দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণের সে প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন নি। ফলে মহাভারতের মহাযুদ্ধ সংঘটিত হল এবং কৌরব ও পাণ্ডব উভয় পক্ষই নিঃশেষে ধ্বংস হয়ে গেল। সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে স্বয়ং জনার্দন উপস্থিত থেকেও সে বিরাট ধ্বংসের ক্ষতি হতে ন্যায় ও ধর্মনিষ্ঠ পাণ্ডব পক্ষকে তিনি রক্ষা করতে পারেন নি। ভারতযুদ্ধে জয়ী হয়েও জয়ের আনন্দ তাঁরা উপভোগ করতে পারেন নি। বিজয়োৎসব সম্পন্ন হবে কাদের নিয়ে? পাণ্ডবের আশে পাশে তখন আর একজনও যে জীবিত নেই। সে বিজয়োৎসব দেখবেই বা কে? কৌরব পক্ষত' তখন নির্মূল হয়ে গেছে। ফলে পাণ্ডবেরা করলেন 'মহাপ্রস্থান'।

আর পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, যাঁকে শ্রীভগবানের অংশরূপে শ্রেষ্ঠমানব কল্পনায় ভক্তেরা পূজা করে—তাঁর কি পরিণাম হল? নিজ বংশের আত্মকলহ তিনি নিবারণ করতে পারেন নি। তাঁর চোখের সামনে উত্তর পুরুষেরা পরস্পর মারামারি কাটাকাটি ক'রে নিঃশেষ হ'ল। বিশাল যদুবংশ ধ্বংস হয়ে গেল। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম ক্ষোভে লজ্জায় ইহলোক ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

* * *

এরপর আরও হাজার হাজার বছর চলে গেছে। কত না বিরাট মহাপুরুষের আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটল, কিন্তু ধরণী আজও অহিংস হয়ে উঠতে পারেনি। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ঐতিহাসিক মানুষের জীবন কেটেছে দেশজয়ে-দিগ্বিজয়ে—যুদ্ধক্ষেত্রে-রণোন্মাদনার মধ্যে। সে ঐতিহ্য মানুষ আজও ভুলতে পারেনি। তার আত্মার মধ্যে সেই রক্তের ক্ষুধা আছে, তার রক্তের মধ্যে সেই রুদ্র আহবের আকর্ষণ আছে, তাই জীব জগৎ থেকে যুদ্ধ আজও বিদায় নেয়নি। পৃথিবীতে যুদ্ধ হবেই। মানুষের বেঁচে থাকাটাই যে অহরহ একটা প্রকাণ্ড যুদ্ধ। আমাদের শরীরের প্রতি রক্তকণিকার মধ্যে কোটী কোটী প্রাণী অবিশ্রান্ত পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। একদল জীবাণু যুদ্ধ করছে আমাদের স্বাস্থ্য ও শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য, আর একদল জীবাণু যুদ্ধ করছে আমাদের জীবনীশক্তি হরণের জন্য, আমাদের রোগাক্রান্ত ও দুর্বল করে প্রাণান্ত করার জন্য। আমাদের প্রত্যেকের দেহের মধ্যে এই যে অবিরাম সংগ্রাম চলেছে, এদের কোনো পক্ষকেই যেমন কোনো উপদেশের দ্বারা কোনো নীতি কথার দ্বারা শান্ত বা স্থগিত রাখা যায় না—রাখা যায় একমাত্র শল্য বিদ্যা (surgery) ও সূচিকাভরণের (injection) জোরে, অর্থাৎ যে দুটো উপায়ের কোনোটাই নিরস্ত্র ও অহিংস নয়। তেমনি একথাও বলা চলে যে, জগতের কল্যাণের জন্যও যুদ্ধের প্রয়োজন আছে। হিংসা যেমন অবস্থা বিশেষে নির্দোষ, যুদ্ধও তেমনি অবস্থা বিশেষ অনিবার্য।

* * *

য়ুরোপে আজ যে যুদ্ধ বেধেছে এ যুদ্ধ যাতে না বাধে সেজন্য কোনো পক্ষেরই চেষ্টার ত্রুটী ছিলনা। হিটলার যেমন বিনা যুদ্ধে অষ্ট্রিয়া অধিকার করেছিল তেমনি বিনা যুদ্ধেই সে চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদেতেন প্রদেশ ও পোল্যাণ্ডের ড্যানজিগ করিডর দখল করতে চেয়েছিল। শান্তকামী চেম্বারলেন ফরাসী বন্ধুদের সঙ্গে একমত হয়ে যুদ্ধ নিবারণের জন্যই হিটলারকে দিয়েছিলেন অবাধে চেকোশ্লোভাকিয়া অধিকারের সুযোগ। কিন্তু লোভ বড় ভয়ানক রিপু। মানুষকে সে উত্তরোত্তর দুরাকাঙ্ক্ষ করে তোলে। চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাস করে জার্মান শক্তি তার বলিষ্ঠ বাহু প্রসারিত করে দিলে পোল্যাণ্ডের দিকে। 'ড্যানজিগ্' তার চাই।

* * *

এযুগেও আর একবার সাগর পারের পাশ্চাত্য ভূভাগে ধ্বনিত হতে শোনা গেল "বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমি দেবনা।" ফলে, শুরু হয়ে গেল নূতন করে নবযুগের নবীন কুরুক্ষেত্র। বেজে উঠলো ধ্বংসের দামামা-মৃত্যুর জগঝম্প। করাল মহাকাল তার ভৈরব ত্রিশূল তুলে প্রলয়ের নৃত্য আরম্ভ করে দিল। বিশ্বভুবন কেঁপে উঠলো তার প্রতি পদক্ষেপের রুদ্রতালে। এলো সে বিপুল কম্পনের স্রোত রঙীণ রক্ত রাখী নিয়ে ভারতবর্ষের মণিবন্ধে বেঁধে দিতে।

* * *

স্বাধীন ভারত হয়ত বললেও বলতে পারতো—"না আমি ও নরশোণিতে কলঙ্কিত রাখী আমার বৈষ্ণবীয় শুচি হাতে বাঁধবো না। আমি যে মোহনচাঁদের তকলিকাটা সূতোয় গাঁথা তুলসীর মালা পরেছি।" কিন্তু আজ প্রায় দু'শো বছর হ'তে চললো যে ব্রিটেনের শাসনে ও পালনে ভারতবর্ষ আবদ্ধ হয়ে রয়েছে, তার মুখে —'আমি যুদ্ধে যোগ দেবনা।' উন্মাদের প্রলাপের মতই শোনাবে। ১লা ডিসেম্বর থেকেই ত প্রতি চিঠির মারফৎ আমরা এক পয়সা করে যুদ্ধ তহবিলে সাহায্য করতে শুরু করেছি। সুতরাং এ যুদ্ধের সঙ্গে ভারতের কোনো সম্বন্ধ নেই বলা বাতুলতা মাত্র নয় কি?

* * *

কংগ্রেসের কর্ণধার ধর্মপ্রাণ মহাত্মা গান্ধি আধুনিক জগতের শ্রেষ্ঠদান বিজ্ঞানকে বর্জন করে, যন্ত্রশক্তির প্রবল প্রভাবকে অস্বীকার করে ভারতকে পুনরায় তার প্রাচীন আরণ্যক সভ্যতার মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন। আগত ও অনাগত কালের অব্যাহত স্রোতকে অতীতের

পানে ফেরাবার চেষ্টা করাও যা, সাগরাভিমুখে প্রবাহিত নদীস্রোতকে তার উৎসমুখে ফেরাবার চেষ্টা করাও তাই! উভয় প্রচেষ্টাই ব্যর্থ ও নিষ্ফল হ'তে বাধ্য। মহাত্মার বিশ বৎসরের চেষ্টাসত্ত্বেও তাই ভারতে বিভেদ ও বিরোধ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। মহাত্মার নেতৃত্ব কালেই দেশে আজ 'মোসলেম লীগের' উৎপত্তি হয়েছে 'হিন্দুমহাসভার' জন্ম হয়েছে। ফরওয়ার্ড ব্লক ও র‍্যাডিক্যাল পার্টি দেখা দিয়েছে। ন্যাশ্যান্যালিস্ট্ ও সোশ্যালিস্ট দলের উদ্ভব হয়েছে। এবং সব চেয়ে মারাত্মক কমিউন্যাল এ্যাওয়ার্ডের 'শিডিউলড্ ক্লাসে'র আবির্ভাব ঘটেছে।

* * *

শত বৎসরের অধিক কাল যুদ্ধ বিরত ভারতবর্ষের অধিবাসীরা ক্রমেই জড় ও অপদার্থ, শান্তিপ্রিয় এবং ভীরু হয়ে পড়েছে। বন্দুকের শব্দে সে চমকে ওঠে। শীতল কামানেরও গায়ে হাত দিতে তার ভয় হয়। কল কব্জা ও যন্ত্রপাতির ঘূর্ণনবেগ ও গর্জন রবে এমন কি ইঞ্জিনের আওয়াজেও তারা ভড়কে যায়, উড়ো জাহাজে উঠতে ইতস্ততঃ করে। লাঠি ধরতেও আজ তারা ভুলে গেছে। তাই, গ্রামে ডাকাত পড়লে তারা আর ঘর থেকে বেরুতে সাহস করে না। জননী জায়া দুহিতার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় তারা আজ অশক্ত ও অক্ষম। দিনে দুপুরে তার চোখের সামনে নারী হরণ হচ্ছে—সম্পত্তি লুণ্ঠন হচ্ছে—দেশের জড়ত্বপ্রাপ্ত যৌবন নির্লজ্জ নির্বিকার চিত্তে দাঁড়িয়ে তাই দেখছে। এদের উদরে অন্ন নেই, দেহে শক্তি নেই, শোণিতে উত্তাপ নেই। তেজ ও বীর্যের অভাবে এরা আজ অর্ধমৃত। লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী প্রতি বৎসর ম্যালেরিয়া প্লেগ কলেরা বসন্ত প্রভৃতি মহামারীতে ইঁদুরের মত মরছে। মূল্য কি তাদের জীবনের? সার্থকতা কি তাদের বেঁচে থাকার—যদি না সে জীবন দেশের কাজে—দশের উপকারে—জাতির কল্যাণে নিয়োজিত হয়?

* * *

যুদ্ধে যোগ দেবার দুর্লভ সুযোগ আজ যদি ভাগ্যে এসেই থাকে, ঝাঁপিয়ে পড়ুক সমস্ত ভারতবর্ষ এই প্রচণ্ড অগ্নি আহবে বীরের মত—পুরুষের মত—মানুষের মতো। স্বাধীনতা কখনও ভিক্ষা ক'রে পাওয়া যায় না এবং পেলেও তা রক্ষা করা যায় না। সুতরাং সেজন্য নারী সুলভ অভিমানবশে এই নিষ্ফল যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের হাস্যকর অভিনয়ে সে যেন আর মিথ্যা আত্মপ্রবঞ্চনা না করে। এই মহাসমরের মৃত্যু-যজ্ঞে যোগ দিয়ে বিশুদ্ধ হয়ে উঠুক তার জড়ত্বপ্রাপ্ত রুগ্ন আত্মা। ফিরে পাক সে আবার তার সুস্থ বলদৃপ্ত যৌবন—তার দুঃসাহসী প্রকৃতি। পৃথিবীর আর পাঁচজনের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমান যোগ্যতা ও মর্যাদা অর্জন করে দাঁড়াতে শিখুক সে। বন্ধন আপনিই চূর্ণ হয়ে খসে পড়বে তার জয়দৃপ্ত পদমূলে। স্বাধীনতার বিজয় মাল্য দোলে একমাত্র যোগ্যতমের কণ্ঠেই। এই কথা স্মরণ করে এই বিশ্বাস মনে নিয়ে বিশ্বের স্বাধীনতার শত্রুদমনে ভারতবর্ষ যোগ্যতা অর্জন করুক। এই নাৎসী-ফ্যাসিষ্টবিরোধী যুদ্ধে দলে দলে যোগ দিয়ে শিখুক যুদ্ধ করতে—যুদ্ধ চালাতে—অস্ত্র ধরতে—প্রাণ দিতে। যুদ্ধ-বিমুখ হয়ে স্বদেশ ও স্বজাতির সর্বনাশ করা উচিত নয়।

রচনা প্রতিযোগিতা

"জন্মভূমি" সম্বন্ধে পাঠশালায় প্রায় পঁচিশ জন গ্রাহক গ্রাহিকার কবিতা আমরা পেয়েছি। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে তার মধ্যে একটিও পুরস্কারযোগ্য এমন কি প্রকাশযোগ্য বলেও বিবেচিত হয় নি। আমরা পুনরায় এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে ১৫ই পৌষের মধ্যে পাঠশালার সমস্ত গ্রাহক গ্রাহিকাকে 'জন্মভূমি'র উপর এক একটি কবিতা লিখে পাঠাতে অনুরোধ করছি। কবিতাটি অন্ততপক্ষে ১৪ লাইন হওয়া চাই। বড় হ'লে কোনো ক্ষতি নেই যদি সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উৎকর্ষ বজায় থাকে। ইচ্ছা করলে একজন একাধিক কবিতাও পাঠাতে পারেন।

—গতমাসের খবর—

যে সকল রাজনৈতিক বন্দীরা জেলের মধ্যে অনশন আরম্ভ করেছেন তাঁদের সম্বন্ধে কোনো সংবাদ কোনো সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশ করা বাংলা গভর্নমেণ্ট নিষিদ্ধ বলে আদেশ জারি করেছেন। অনশনের ফলে সুভাষ-বাবুর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়ায় তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

*　*　*

ব্রিটেনে দীর্ঘকাল যিনি আমেরিকার এ্যাম্বাসাডার বা রাষ্ট্রদূত ছিলেন সেই সর্বজানিত শ্রীযুক্ত জোসেফ কেনেডি তাঁর কাজে ইস্তাফা দিয়েছেন। তিনি আর লণ্ডনে ফিরে যাবেন না বলে ঘোষণা করেছেন। "ব্রিটেনে আর গণতন্ত্রের অস্তিত্ব নেই।" এই কথা প্রচার করে তিনি যে ভুল করেছিলেন তা স্বীকার করেছেন এবং দুঃখ জানিয়েছেন। যুদ্ধের আবহাওয়ায় সাবধানে কথা বলাই ভাল?

*　*　*

বোম্বাই, নাগপুর, বিহার যুক্তপ্রদেশ, উড়িষ্যা ও মান্দ্রাজের ভূতপূর্ব কংগ্রেস প্রধান মন্ত্রীরা যুদ্ধবিরোধী সত্যাগ্রহের ফলে কারারুদ্ধ হয়েছেন।

*　*　*

বরিশালের চাখার গ্রামে মহাসমারোহে 'ফজলুলহক কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলার মহামান্য লাট বাহাদুর স্বয়ং উপস্থিত হয়ে এই কলেজের উদ্বোধন উৎসবে পৌরহিত্য করেছেন। বাংলার প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত ফজলুল হক সাহেব এই কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য আশী হাজার টাকা দান করেছেন।

*　*　*

উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের আলস্টার প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী লর্ড ক্রেগাভনের মৃত্যুতে ব্রিটেনের একজন অন্তরঙ্গ হিতৈষী বন্ধুর তিরোভাব ঘটল। আইরিশ-ফ্রী-স্টেটের কর্ণধার ডি ভ্যালেরার সঙ্গে তাঁর মতের বৈষম্য কোনদিনই দূর হয়নি। বর্তমান যুদ্ধে লর্ড ক্রেগাভনের পরিচালনাধীনে আলস্টার ইংরাজের পক্ষ অবলম্বন করেছিল, কিন্তু দক্ষিণ আয়ার্ল্যাণ্ড এখনও ডি ভ্যালেরার অধীনে নিরপেক্ষ আছে।

*　*　*

কুমারী অপরাজিতা রায় এবৎসর কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম্-এ পরীক্ষায় সসম্মানে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। শ্রীমতী বিভা মজুমদার বাংলাদেশের প্রথম মহিলা পি-আর-এস। তিনি এবার এ্যাষ্ট্রোফিজিক্সের (জ্যোতিষিক ভূতবিজ্ঞান) গবেষণায় অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়ে 'মোয়াট পুরস্কার' পেয়েছেন। দেখা যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়েও মেয়েরা ধীরে ধীরে ছেলেদের ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

*　*　*

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন একজন স্বধর্মনিষ্ঠ, আচারপরায়ণ গোঁড়া হিন্দু ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর পরলোক গমনে সম্ভবতঃ বাংলাদেশের শেষ অকপট গোঁড়া ব্রাহ্মণের তিরোভাব ঘটলো। শাস্ত্রীয় কুলধর্মের প্রতি তাঁর অবিচলিত বিশ্বাসের জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তাঁর মধ্যে গোড়ামী ছিল বটে, কিন্তু ভণ্ডামী ছিল না। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য সত্বেও তিনি বর্ণাশ্রমের প্রবল সমর্থক ছিলেন এবং হিন্দুসমাজ বিধির পরিবর্তন বিরোধী মত পোষণ করতেন।

*　*　*

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার সার মরিস্ গায়ার রাজনৈতিক অপরাধের জন্য দুইজন ছাত্রের ডিগ্রী বাতিল করে দিয়েছেন। রাজনৈতিক অপরাধে ছাত্রদের এরূপ শাস্তিবিধান একটু অভিনব বটে!

*　*　*

বোম্বাই ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়াতে বাংলাভাষার মর্যাদা যতটা না বাড়ুক উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় দুটির গৌরব নিশ্চয়ই বাড়ল।

*　*　*

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ একটু সুস্থ বোধ করতেই শহরের এই ইটকাঠের বন্ধন ছেড়ে তাঁর শান্তিনিকেতনের মুক্ত আলোবাতাসের কোলে সৌন্দর্যময়ী প্রকৃতির স্নিগ্ধ আলিংগনের মধ্যে ফিরে গেছেন। ভগবান তাঁকে সত্বর সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল করে তুলুন।

পৌষের প্রশ্ন

আহমদপুরের শ্রীমান অশ্বিনীকুমার মণ্ডল জানতে চেয়েছেন :—

১৯১০ খৃষ্টাব্দ থেকে "এণ্ট্রান্স্" পরীক্ষা উঠিয়ে দিয়ে "ম্যাট্রিকুলেশন্" পরীক্ষা করা হ'ল কেন ?

কটকের শ্রীমান সমীর চৌধুরী জানতে চেয়েছেন—

বিদেশী রচনা অনুবাদ করতে হ'লে লেখকের অনুমতি দরকার হয় কি না ?

যুগকল্যাণের শ্রীমান মধু ঘোষাল জানতে চেয়েছেন—

অতি আধুনিক বাংলা গদ্য কবিতার বিশেষত্ব কি এবং প্রাক্-আধুনিক প্রচলিত কবিতার সঙ্গে তার পার্থক্য কি ?

কলিকাতার শ্রীমান উদয়ভানু সিংহ জানতে চেয়েছেন—

চশমা পরলে চোখের কি উপকার হয় এবং চশমা না পরলে কি অপকার হয় ? চশমা ব্যবহারের ফলে কি চোখের দোষ বা চক্ষুরোগ ভাল হয় ?

পাঠশালার গ্রাহক গ্রাহিকা ও পাঠক পাঠিকাদের এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে অনুরোধ করি। এই প্রসঙ্গে সকলকে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে প্রতি মাসে একটির বেশী প্রশ্ন করবার নিয়ম নেই। শ্রীমান নবনী কুমার চৌধুরীর ২য় প্রশ্নের উত্তরে একজন বলেছেন স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহের বাংলা ভাষায় অনুদিত অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত বাংলা ভাষায় বৃহত্তম বই। আর একজন বলেছেন স্বর্গীয় দুর্গাদাস লাহিড়ীর রচিত "পৃথিবীর ইতিহাস"। দু'জনেই কিন্তু পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখ করতে না পেরে 'ভূতগোয়েন্দার' উপর সে ভার দিয়ে পাশ কাটিয়েছেন। 'ভূতগোয়েন্দা' জানতে চান পৃষ্ঠা সংখ্যা না জেনে তাঁরা কেমন করে বলতে পারেন যে বাংলা ভাষায় তাঁদের উল্লিখিত বইখানিই বৃহত্তম ? লাইব্রেরীতে সন্ধান করলেই তাঁরা উভয়েই জানতে পারতেন বই দু'খানির পৃষ্ঠাসংখ্যা কত ? অথবা পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতাদের রিপ্লাই কার্ড লিখেও এ সংবাদ জানতে পারতেন। কোনো বিষয় সঠিক ও সম্পূর্ণ না জেনে উত্তর দেওয়া উচিত নয়। ভূতগোয়েন্দার একজন বন্ধু বলেছেন স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সঙ্কলিত "বিশ্বকোষ"ই নাকি বাংলাভাষায় প্রকাশিত বৃহত্তম বই। এঁদের মধ্যে কার উত্তর নির্ভুল হয়েছে আমি নবনীকুমারকে এবং পাঠশালার অন্যান্য গ্রাহক-গ্রাহিকা ও পাঠক-পাঠিকাকে তা প্রত্যক্ষ সন্ধানের দ্বারা পৃষ্ঠাসংখ্যা নির্ণয় করে আগামী মাসের পাঠশালায় জানাতে অনুরোধ করি।

অগ্রহায়ণ সংখ্যার প্রশ্নের উত্তর

১। বর্তমান ভারতে সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা কবি, শ্রীকামিনী রায়। ইঁহার পিতার নাম চণ্ডিচরণ সেন, এবং স্বামীর নাম শ্রীকেদারনাথ রায়। মাত্র ১৫ বৎসর বয়সে ইনি

'আলো ও ছায়া' নামক পুস্তকখানি রচনা করেন, কিন্তু উহা দশ বৎসর বাদে প্রকাশিত হয়।

২। বাংলাভাষায় বৃহত্তম বই হচ্ছে, মহাভারত। ইহা শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ঠিক জানা নাই, ভূতগোয়েন্দাকে জানাতে অনুরোধ করছি।

৩। হায়দ্রাবাদের মিঃ রাজাউদ্দিন নোবেল প্রাইজ পান নাই।

৪। ভাদ্রমাসের ধাঁধাঁর রচয়িতা কে? ভূত-গোয়েন্দাকে জানাতে অনুরোধ করি।

৫। শিশুসাহিত্যক তাঁদেরই বলে, যাঁরা শিশুদের উপযোগী গল্প বা কবিতা লিখতে পারেন।

শ্রীউমা বাগচী, রায়পুর, সি, পি
গ্রাঃ ১০৪৭

১। বাংলার তথা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা কবি 'শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু'।

২। হায়দ্রাবাদের রাজাউদ্দীন নোবেল প্রাইজ পান নি। উনি বিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন বলে গুজব রটেছিল মাত্র।

সৌরভ সনাতনি, অমলনার

১। বর্তমানে রাধারাণী দেবীই সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা কবি।

২। মিঃ রাজাউদ্দিন নোবেল প্রাইজ পান নাই। একটি গুজব উঠেছিল মাত্র।

৩। যাঁরা ছোটছেলেদের জন্য সহজ ভাষায়, ছোট করে এবং উপদেশপূর্ণ গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি লেখেন তাঁদেরই 'শিশুসাহিত্যিক' বলে।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার মণ্ডল, আহমদপুর
গ্রাঃ নং ৩২৮০

১। "মিঃ রাজাউদ্দিন সিদ্দিকি" কি নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন?—গুজব রটেছিল বটে কিন্তু পান নি।

২। শিশুসাহিত্যিক তাঁদের বলা হয় যাঁরা শিশুর ছোট্টমনের সুখদুঃখ অভাব অভিযোগ ও মনের চাহিদাকে সস্নেহ সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখেন ও সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সেগুলিকে রূপান্তরিত করে তোলেন, উদ্বোধিত করেন মানবজীবনের বৃহত্তম আদর্শকে।

৩। স্বর্গীয়া কবি কামিনী রায়কেই শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া যায়।

কুমারী শর্মিষ্ঠা সরকার
গ্রাঃ নং ৩১৯৪

১। বর্তমান বাংলার তথা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা কবি শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী। ইঁহার কাব্যগ্রন্থের নাম লীলাকমল, সীঁথিমৌর ও বনবিহগী।

২। বাংলাভাষার বৃহত্তম গ্রন্থ ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ অনুবাদিত মহাভারত।

৩। হায়দ্রাবাদের রাজা উদ্দীন নোবেল প্রাইজ পান নাই।

৪। শিশু-সাহিত্যিক তাঁদেরই বলে যাহারা শিশু-চিত্তের উপযোগী সাহিত্য রচনা করিতে পারেন।

শ্রীনির্মলকুমার চৌধুরী
জামসেদপুর

১। বর্তমান বাংলা তথা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা কবি হচ্ছেন—শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু।

২। বাংলা ভাষায় বৃহত্তম বই—পৃথিবীর ইতিহাস। লেখক - শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী।

(পৃষ্ঠা সংখ্যার জন্য 'ভূ-গো'র শরণাপন্ন হলাম।)

৩। হায়দ্রাবাদের মিঃ রাজাউদ্দীন নোবেল প্রাইজ পাননি—খবরের কাগজে হুজুগ উঠেছিল মাত্র!

৪। ভাদ্র মাসের ধাঁধার রচয়িতা সম্বন্ধে মনে হয়—একজন,—যিনি ভয়ঙ্কর 'হিউমারিষ্ট' (Humourist) একটি বিরাট হাসির ভূমিকম্প—তিনিই।

৫। 'শিশু-সাহিত্যিক' কাদের বলে :—

ছোট্ট যারা—দাগ ধরেনি যাদের কচি মনে—তাদের কিশোর কল্পনা ভরা মন এমন রেখা যারা এঁকে দিতে পারেন, যা—উদয়াচলের পথে হবে তাদের প্রধান পাথেয়।

মধু ঘোষাল। মুগকল্যাণ

পৌষ—১৩৪৭

নিয়মাবলী—(১) ধাঁধা-সম্পাদকের মতে শব্দসন্ধানের যেটি সবচেয়ে নির্দোষ ও নির্ভুল সমাধান,—তার সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে উত্তর মেলা চাই। নির্ভুল সমাধানটি পরের মাসের পাঠশালায় প্রকাশিত হবে। (২) সাদা ঘরগুলির প্রত্যেকটিতে একটি ক'রে সংযুক্ত বা অসংযুক্ত অক্ষর বসবে। (৩) প্রতি সংখ্যার প্রতিযোগিতা-কুপনখানি কেটে ভর্তি ক'রে পাঠাবে সেই মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে। দেরি হ'লেই বাতিল। খামের উপরে ঠিকানা লিখবে—"শব্দ-সন্ধান" পাঠশালা কার্যালয়, ৩০ কর্ণওআলিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। (৪) হরফগুলি সব পরিষ্কার হওয়া চাই—কাটাকুটি চলবে না। বানান ভুল হলে ভুল ধরা হবে। (৫) যে কোন পাঠক পাঠিকা যতগুলি ইচ্ছা কুপন পাঠাতে পাবে। (৬) 'শব্দ-সন্ধান'-সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ব'লে মেনে নিতে হবে।

সঙ্কেতসূত্র

—পাশাপাশি—

১। এ রূপ চর্চা সকলেরই পরিহার করা উচিত।
৪। এ এক উন্নত অবস্থায় উত্থিত হওয়া।
৭। এ না কাটলে হয় না।
৮। মাত্র তৃণখণ্ডও যে লোকের আশ্রয় মনে হয়।
৯। শ্রেষ্ঠ বা প্রধান।
১০। এ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব।
১১। "ঘনমেঘ গগনে গরজে
দক্ষিণা পবনে তরজে"
১২। স্বর্গাদপি গরিয়সী।
১৪। এখানে যা লেখা থাকে তা আর মোছে না।
১৬। দক্ষরাজ দুহিতা।
১৮। এও তো হয়।
১৯। এ যারা মানে তারা মাননীয়।
২১। বলেই ত দিচ্ছি তবু বার করতে পারবে কি?
২৫। রামচন্দ্র নিজে এঁর কাছ থেকে গিয়ে উপদেশ নিয়েছিলেন।
২৬। এঁর অনুগ্রহ মানুষকে অকর্মণ্য করে দেয়।

—উপর নীচে—

১। একে জয় করা কঠিন।
২। নিষধরাজ
৩। প্রাচীনকালে এ প্রসাধনের খুবই প্রচলন ছিল।
৪। এক সময় মালবের রাজধানী ছিল।
৫। চোখ তুলে দেখ নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।
৬। অধুনায় অনেক স্থলে এর সংযোগে পূর্বের ন্যায়ই স্থিতিলাভ ঘটেছে দেখা যায়।
৮। জীবন্ত লোকের সমাধিস্থান।
৯। এরা কি না বলে ?
১২। বেগবতী ভাগীরথীর উদ্দাম স্রোত একবার এর মধ্যে আটকে পড়েছিল।
১৩। এর মধ্যে ছোট ভাইকেও পাবে।
১৫। গালা।
১৬। এমনতর হৃদয় যাদের তারাই সকল অবস্থায় সুখী।
১৭। অনুমান করা শক্ত নয়।
১৮। বিবাহের পর মেয়েদের এ হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।
১৯। এর মধ্যে যে মাথা ঠিক রাখতে পারে সেই একে কাটিয়ে উঠতে পারে।
২০। কবির হাতে পড়ে এমন উৎকৃষ্ট বহুমূল্য বস্তুরও এই অবস্থা হয়েছে।
২২। তাঁতের এক টানায় যতটা কাপড় হয়।
২৩। ভিক্ষুকের অঙ্গে এরূপ বস্ত্র প্রায়ই দেখা যায়।
২৪। এ অবিশ্রান্ত উপর থেকে নীচেয় আসছে।

অগ্রহায়ণের শব্দ-সন্ধানের ফলাফল

এবার শব্দ-সন্ধান প্রতিযোগিতায় 'শ-র'র কাছে সবাইকে হার মানতে হয়েছে। নির্ভুল উত্তর একজনও দিতে পারেন নি। যাঁরা একভুল করেছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই 'সহযোগী'র প্রতিশব্দ 'দোসর' বসিয়েছেন। 'দোসর' অবশ্য হয়, কিন্তু তাঁরা যদি একটু ভেবে দেখতেন তাহ'লে বুঝতে পারতেন 'দোসর' কথাটির চেয়ে 'সোসর' কথাটি অধিকতর লাগসই। কারণ, 'দোসর' কথাটি 'দোসরা' এই হিন্দি শব্দ থেকে এসেছে, কিন্তু 'সোসর' কথাটি 'সোদর' শব্দের অপভ্রংশ। 'সোসর' মানে এমন একজন সহায়ক বা সহযোগী যাঁর সমান অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। সুতরাং 'দোসর' অপেক্ষা 'সোসর' শব্দই এখানে হওয়া উচিত। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, যে যেসব তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সাবধানী প্রতিযোগী 'সোসর' শব্দটি ঠিকই লিখেছেন, তাঁরা কিন্তু আবার 'বহিলাম' কথাটিকে বৈষ্ণব কবিরা যে-রূপ দিয়েছেন তা ঠিক ধরতে পারেন নি। কেউ 'বহন্তু' লিখেছেন, কেউবা 'বহল' লিখেছেন, কিন্তু বৈষ্ণব কাব্যে কথাটির সুষ্ঠু প্রয়োগ হচ্ছে 'বহলুঁ'। 'বহিলাম' শব্দের 'ল'য়ের আকার উকার হয়ে, 'ম'-কারটি 'চন্দ্রবিন্দু'তে রূপান্তরিত হয়েছে। 'বহন্তু' শব্দের ব্যবহারও ঐ একই অর্থে অবশ্য বৈষ্ণবকাব্যে আছে, কিন্তু 'বহলুঁ' শব্দটিই 'বহিলাম' শব্দের খুব কাছাকাছি নয় কি ?

"শ-র"।

এক ভুল

অরুণকুমার বাগচী, শ্রীরামপুর, কল্যাণী দেবী, কলিকাতা; গীতা ধর, হুগলী, নীরদচন্দ্র রায়, রাজসাহী, শ্মশানেশ্বর কোঁয়ার, বর্ধমান, উদয়ভানু সিংহ, কলিকাতা, কল্যাণকুমার গুপ্ত, শিলং, গীতা ও বাদল পালিত, আসানসোল, বীরেন্দ্রনারায়ণ সরকার, ফরিদপুর, রাধারমণ ধর, হুগলী।

পুরস্কারের ৫৲ পাঁচ টাকা এই দশজনের মধ্যে সমান অংশে ভাগ করে দেওয়া হবে। 'শ-স'।

দুই ভুল

অনিমা চৌধুরী, মানভূম, অনিলকুমার চক্রবর্তী, হরিনাভি, অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়, কানেশ্বর, উমারাণী ঘোষ, হাওড়া, ইন্দু বোস, ফরিদপুর, ননী বসু, বরিশাল, পাঁচুগোপাল বসু, বারাসাত, পার্বতিশংকর মুখোপাধ্যায়, বীরভূম, মঞ্জু, সঞ্জু ও মায়া, কালিঘাট, রথী, রমা, মীরা, রেবা ও রেখা, দিব্রুগড়, রাধারমণ ধর, খুটিয়া বাজার, স্মৃতিকণা কর, কলিকাতা, শ্মশানেশ্বর কোঁয়ার, বর্ধমান।

তিন ভুল

দীলিপকুমার সেন, ভবানীপুর, পংকজমোহন, সিদ্ধার্থকুমার রায়, কোন্নগর, মধু ঘোষাল, মৃগকল্যাণ, মৃণালকান্তি গুপ্ত, সৈয়দপুর, শ্মশানেশ্বর কোঁয়ার, বর্ধমান।

চার ভুল

অনিমা দেবী, উত্তরপাড়া, অনিমা ব্যানার্জি, কাশীপুর, অশ্বিনীকুমার মণ্ডল, বীরভূম, উমা বাগচী, বায়পুর সিপি, দেবব্রত সিংহ, কলিকাতা, নীহার বন্দ্যোপাধ্যায়, জব্বলপুর, বিষড়া বয়েজ লাইব্রেরীর সভ্যবৃন্দ, বিষড়া, স্বাহাদেবী রায়, রংপুর, হরিকমল পুরকায়স্থ, শিলং।

পাঁচ ভুল

"আপটু-ডেট" ক্লাব, রাণাঘাট, আভারাণী ও প্রমথনাথ, লক্ষ্ণৌ, নীতীশরঞ্জন দে, ঢাকা, সুলেখা বসু, বালিগঞ্জ।

পাঁচ ভুলের বেশী যাঁরা করেছেন তাঁদের নাম গোপন রাখা হ'ল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—আসছে মাসে যাঁরা শব্দসন্ধানের উত্তর পাঠাবেন তাঁরা খামের উপর যেন পাঁচ পয়সার টিকিট লাগিয়ে পাঠান, কারণ, যুদ্ধের খরচের জন্য এমাস থেকে ডাকমাশুল বেড়ে গেছে। চার পয়সার টিকিট দিলে চিঠি 'বেয়ারিং হয়ে আসবে। 'বেয়ারিং' চিঠি আমরা নিই না, ফেরত দিই। ফেরত গেলে তোমাদের কাছে ডাকঘর দশপয়সা আদায় করবে। সুতরাং চিঠি ডাকে দেবার সময় দেখে দিও ঠিক পাঁচ পয়সার টিকিট লাগানো হয়েছে কিনা। প্রত্যেক চিঠির খামের উপর "শব্দ-সন্ধান" এই কথাটি লিখতে ভুলোনা। তবে, তোমরা কেবলমাত্র শব্দ-সন্ধানের 'কুপন'খানি কোনো চিঠি তার সঙ্গে না দিয়ে যদি মুখখোলা খামে ভরে "বুক-পোষ্ট" লিখে পাঠাও তাহ'লে তিন পয়সার টিকিটেই পাঠানো চলবে। দু'পয়সা করে তোমাদের বেঁচে যাবে।

নির্ভুল সমাধান—অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭

অঙ্ক ক্রীড়া নয়—অক্ষর ক্রীড়া

'LAWYERS' শব্দটিকে ভেঙে উৎকৃষ্টভাবে রূপান্তরিত করতে পেরেছেন একমাত্র শিলঙের শ্রীমান ক্ষিতিভূষণ গুপ্ত। তিনি উত্তর দিয়েছেন 'SLY WARE' কলিকাতার শ্রীমান অজিতকুমার চক্রবর্তী একটু অসাবধানতার জন্য এটা আবিষ্কার করেও করতে পারেন নি। তিনি লিখেছেন 'SLY WEAR।' বীরভূমের অশ্বিনীকুমার মণ্ডল এবং বর্ধমানের শ্মশানেশ্বর কোঁয়ার একটি পৃথক শব্দ করেছেন 'YAWLERS'। আরও অনেকেই অনেক রকম চেষ্টা করেছেন কিন্তু সফল হতে পারেন নি।

আচ্ছা, আসছে মাসে তোমরা 'UNITED' শব্দটিকে ভেঙে এমন একটি শব্দ তৈরি কর যা, যুক্তকে মুক্ত করতে পারে। উত্তর ১৫ই পৌষের মধ্যে 'পাঠশালা' অফিসে পৌছান চাই।
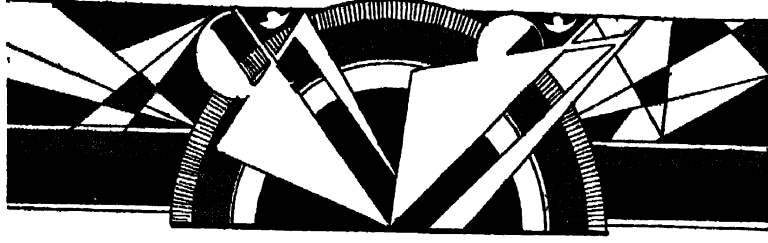
পৌষ—১৩৪৭

এমন একটি বাংলা শব্দ খুঁজে বার কর, যার ইংরাজী ও বাংলা প্রতিশব্দ উভয়ে সংযুক্ত হ'লেও ঠিক সেই অর্থবাচক শব্দটিই পাওয়া যাবে।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার মণ্ডল, (গ্রাঃ নং ৩২৮০)

অগ্রহায়ণের ধাঁধাঁর উত্তর

অগ্রহায়ণের পাঠশালার বিরাট সংখ্যাটি ৭১ দিয়ে এক সেকেণ্ডের মধ্যে গুণ করা যায় যদি তার সামনে বসিয়ে দাও আর একটি ১ আর সবশেষে বসিয়ে দাও আর একটি ৭। ব্যস্, এক সেকেণ্ডে গুণফল বেরিয়ে গেল। ঠিক কিনা 'গুণ' করে দেখ। ধাঁধাঁর সঠিক উত্তর দিতে পেরেছেন মাত্র—সাতজন।

রাণী বোস্, ফরিদপুর, হেনা রাহা, ত্রিপুরা; ক্ষিতিভূষণ গুপ্ত, শিলং, নীহার বন্দ্যোপাধ্যায়, জব্বলপুর, নীতীশরঞ্জন দে, ঢাকা, সুধাংশুকুমার বসু, হাওড়া, মধু ঘোষাল ও মধু ব্রাদার্স এণ্ড সিষ্টার্স, মুগকল্যাণ।

Printer and Publisher R Bhattacharya, Prabhu Press, 30, Cornwallis Street, Calcutta.

"শব্দ-সন্ধান"

(প্রতিযোগিতা কুপন)

(যে কোনো পাঠক বা পাঠিকা এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারেন, এবং যতগুলি ইচ্ছা কুপন পাঠাতে পারেন)

১	২ ন		৩ কা		■	৪ উ	৫	৬ ত
৭ প		■		■	৮		মা	
রা	■	৯	ল	■	১০ শা			■
১১		গ	■	১২ জ			■	১৩
	■	১৪	১৫ লা		■	■	১৬	ষু
■	১৭	■		■	১৮ প			জ
১৯	চা	২০	■	■		■	জ	■
প	■	২১ ত	২২		■	২৩	■	২৪ ঝ
২৫	শা		ন	■	২৬	ন্ন		

(পাঠশালা, পৌষ)

নাম . .. .

ঠিকানা . . . . . .

....

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আগামী ১৫ই পৌষের মধ্যে কুপনখানি পাঠশালা-কার্যালয়ে পৌঁছনো চাই।

☞ (কুপনে কোনো কাটাকুটি বা বানান ভুল চল্‌বে না।)

নিয়মাবলী

"পাঠশালা" প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয়।

আশ্বিন মাস থেকে পাঠশালার বর্ষারম্ভ।

লেখা ও ছবি প্রতিমাসে অন্তত ৫৬ পৃষ্ঠা থাকবে, আকার ডবল ক্রাউন ৪ পেজি। বার্ষিক মূল্য মণি অর্ডারে পাঠালে তিন টাকা। ষাণ্মাসিক দেড় টাকা। ভি পিতে বার্ষিক মূল্য ৩।০ তিন টাকা চার আনা। ষাণ্মাসিক ভি পি করা হবে না।

নগদ মূল্য প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা।

নমুনার জন্য পাঁচ আনার ডাকটিকিট পাঠাবেন।

মফঃস্বলের গ্রাহকগণ প্রকাশকের ঠিকানায় মনিঅর্ডারযোগে টাকা পাঠাবেন। শহরের গ্রাহকগণও ঐ ঠিকানায় টাকা জমা দিবেন।

মাসের প্রথম সপ্তাহে কাগজ না পেলে ডাকঘরের জবাব সহ ১৫ই তারিখের মধ্যে জানা'লে আর এক কপি দেওয়া হবে।

ডাকটিকিট দেওয়া থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠানো হবে। চিঠির উত্তর রিপ্লাইকার্ড পেলে দেওয়া হবে।

প্রকাশক—রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

পাঠশালা কার্যালয়

৩০, কর্নওআলিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা PHONE—B B. 4099

প্রাপ্তিস্থান—সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

চতুর্থ বর্ষ] মাঘ—১৩৪৭ [পঞ্চম সংখ্যা

নূতন যাত্রী

তালিম হোসেন

যাত্রা আমার আজকে ভোবে,
এবাব মোরে ডাক দিয়েছে পথ,
চল্‌তে হবে সে পথ দিয়ে—
যে পথ দিয়ে যায়নি কোন রথ।

যে পথ গেছে অন্ধকারে,
আমার দ্বাবে সেই পথেবি মুখ;
সেই পথেতেই চল্‌ব আমি,
দেখ্‌ব কোথা আঁধার-ঘেরা দুখ।

পুঞ্জীভূত তিমির যেথা,
আমার সেথা নূতন অভিযান;
দুঃখ-ব্যথার নীল-সায়রে
ভাসিয়ে দেব আমার তরী খান।

যে পথ-পাশে ফুল ফোটেনা,
গীত গাহে না ভ্রমর অলি-কুল,
রূপ-আলোকের পুলক-বানে
গন্ধে গানে বয়না সুরেব ভুল;

সত্য পথের সত্যরূপে
ভাগ্য-যূপে আত্ম-বলিদান—
নিত্য যেথায় চল্‌ছে, যেথা
আর্ত্তে-ব্যথায় হয়না অভিমান;

শঙ্কা জাগায়—জানায় মানা
যে পথ ঘিরে অবণ্য পর্বত
আজ্‌কে আমায় নূতন দেশে
ডাক দিয়েছে সেই অজানা পথ।

লক্ষ চলার চরণ-ধ্বনি
তুল্‌ছে রণি' যে পথ পরিচয়—
নূতন ভোরের যাত্রী আমি,
তরুণ আমি,—সে পথ আমার নয়॥

সুখী পরিবার

গোপাল ভৌমিক

(বিদেশী গল্প)

সব গাছের পাতাব চেয়ে বার্ডক গাছেব পাতাগুলো বড় বড় হয়। কোন ছোট মেয়ে বা ছেলে যদি এর একটি পাতা নিয়ে বুকেব সামনে ধরে তবে তার সমস্ত বুকটা ঢেকে যাবে আর সে যদি এর একটি পাতা মাথায় দেয় তবে ছাতার মতই এ পাতা তাকে বৃষ্টির হাত থেকে বক্ষা করবে। বার্ডক গাছ একটা যেখানে জন্মায়, সেখানে দল বেঁধে আরও অনেক গাছ জন্মাতে থাকে। এই গাছগুলো দেখতেও খুব সুন্দর। কিন্তু সুন্দর হ'লে কি হয় তাদেব সমস্ত সৌন্দর্য ধ্বংস করে শামুক। শামুক বার্ডক পাতা খেতে খুব ভালবাসে।

আগেকার দিনেব লোকেরা আবাব শাদা বড শামুক-গুলো খেতে খুব ভাল বাসত। কচি সবুজ বার্ডক পাতাগুলো খেয়েই শাদা শামুকগুলো বাঁচত আর ওবা মনে করত যে ওদের জন্যই ভগবান বার্ডক পাতাগুলো সৃষ্টি করেছেন।

ডেনমার্কে খুব বড় একটা প্রাচীন বাডী ছিল, কিন্তু সে বাড়ীটায় কেউ বাস কবত না—বাডীর অধিবাসীবা সব ম'রে গিয়েছিল। এই বাডীটার কাছে খুব বড একটা বার্ডকেব বন ছিল—সেখানে অনেক শামুক বাস কবত। কিন্তু আজকাল শামুক খাওয়ার প্রচলন না থাকায় এবং বাডীর লোকগুলো ম'রে যাওয়ায় কেউ আব শামুক খেত না। বার্ডক গাছগুলো ক্রমে বাড়তে বাড়তে বাড়ীর বাগানটা পর্যন্ত ছেয়ে ফেলেছিল। এই বার্ডকেব বনে একজোড়া বুড়ো শামুক বাস করত।

তারা নিজেরাও জানত না যে তাদের বয়েস কত; তবে এটা তাদের খুব ভালভাবে মনে ছিল যে এককালে তাদের বংশে অনেক লোক ছিল—আজকাল অবশ্য বুড়ো-বুড়ী ছাড়া আর কেউ নেই। তাবা যে ওখানকার আদিম অধিবাসী নয়—তাবা যে বিদেশ থেকে এখানে এসে উপনিবেশ স্থাপন ক'বেছিল—এ জ্ঞানটাও তাদের ছিল। আর তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ভগবান তাদেব জন্যই বার্ডকবনটি সৃষ্টি ক'বেছেন, তাবা বার্ডকবনেব বাইরে জীবনে কখনও যায়নি, তবে তাবা জানত যে পৃথিবীতে আর একটি জায়গা আছে—সে ওই পুবানো বাডীটা। ওই বাড়ীটায় যে শামুক বেঁধে ডিসে ক'রে খাবাবের টেবিলে দেওয়া হত সে খববও তাবা রাখত। কিন্তু তারপর যে কি ঘটত তা' তারা জানত না। রান্না কববাব সময় এবং ডিসে রাখবার সময় যে শামুকগুলোর কিরূপ মনোভাব হ'ত তা'ও তারা জানত না। তবে বড় লোকের খাবাব টেবিলে ডিসে ক'রে পরিবেশিত হওয়া যে সৌভাগ্যেব বিষয় এটা তারা খুব ভাল ক'রেই বুঝত, এ বিষয়ে জ্ঞান সঞ্চয়ের আশায় তারা ব্যাঙ, কেঁচো প্রভৃতি জীবের শরণাপন্ন হ'ল কিন্তু তাবা কিছু বলতে পাবল না, কাবণ বড়লোকের টেবিলে রূপোর ডিসে ক'বে কেউ ত কখনও তাদেব পরিবেশন করেনি'। যাক, সেই শামুক দুটি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিল যে জগতে তাদের মত আর কাউকে সম্মান করা হয় না। বার্ডকবন তাদের জন্যই দিন দিন বেডে উঠছিল, আর বার্ডকবনের পিছনে ওই বাডীটাও রয়েছে তাদেরই জন্য, কারণ, একদিন না একদিন এই বাড়ীটায় লোক এসে তাদের

ধ'রে নিয়ে গিয়ে রান্না ক'রে রূপোর ডিসে খাবারের টেবিলে রাখবে। বুড়োবুড়ী দুজনে ভাবে এমন সৌভাগ্য কি তাদের হ'বে!

নির্জন বার্ডকবনে তারা খুব সুখে ঘরসংসার করছিল। তাদের ছেলেমেয়ে কিছু ছিল না—তাই তারা একটি সাধারণ শামুককে তাদের পোষ্যপুত্র ক'রে নিয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই শিশু শামুকটি অন্য এক জাতের হওয়ায় তার পালক পিতামার মত বড় হ'তে পারল না। তবু, বুড়ী শামুক একদিন বললে যে খোকা খুব বড় হ'চ্ছে —বুড়ো শামুকও তার সঙ্গে সায় দিল।

একদিন খুব জোরে বৃষ্টি এল। বুড়ো শামুক বুড়ীকে বললে "দেখ, বার্ডক পাতার উপর কি বিশ্রী বৃষ্টির শব্দ শোনা যাচ্ছে।" বুড়ী শামুক উত্তর দিল: "ওঃ এটা বৃষ্টির শব্দ। তাইত, দেখ বার্ডকের গা' বেয়ে জল নীচে গড়িয়ে পড়ছে। এখনই সব ভিজে একাকার হ'য়ে যাবে। যাক, আমাদের নিজেদের ঘর আছে, খোকাও তার নিজের ঘরে আছে। এটা খুব সুখের কথা, কি বল? একথা খুব সত্যি যে ভগবান আমাদের সুখ সুবিধার জন্য যেমন ব্যবস্থা ক'রেছেন, জগতের আর কারও জন্য তত সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করেন নি'। এটা সহজেই বোঝা যায় যে আমরাই ভগবানের সৃষ্ট জীবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। জন্ম থেকেই দেখছি আমাদের জন্য কেমন ঘর রয়ে গেছে—আমাদের জন্য এই বার্ডকের বন র'য়ে গেছে। এই বন কত বড়! কিন্তু এর পিছনে কি আছে আমার খুব দেখতে ইচ্ছা করে।"

বুড়ো শামুক বলে: "এর পিছনে আর কিছু নেই। আর যদি কোন জায়গা থাকেই সে থাকার কি মানে হয়? আমাদের এই বার্ডক বনের চেয়ে ভাল জায়গা আর হ'তে পারে না। আমাদের চাইবার আর কিছুই নেই!"

বুড়ী শামুক বললে: "আমার কিন্তু এ বন ছেড়ে চ'লে যেতে ইচ্ছা হয়। আমার ইচ্ছা করে ওই পুরানো বাড়ীটায় যাই। সেখানে গেলে আমাকে রেঁধে ওরা রূপোর ডিসে ক'রে রাখবে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা সবাই ওখানে গিয়েছিলেন। ভেবে দেখত সে কি সৌভাগ্যের কথা।"

বুড়ো শামুক জবাব দিল: "খুব সম্ভব সে বাড়ীটা ভেঙে গেছে—আর তা' না হলে' সে বাড়ীটা এই বার্ডক বনের নীচে ঢাকা প'ড়েছে। কাজেই, লোক আর আমাদের ধর্‌বার জন্য বেরুতে পারে না। যাক্, এ বিষয়ে তাড়াতাড়ি করবার কি আছে? তোমার কিন্তু সব সময়ে তাড়াহুড়ো কর্‌বার একটা অভ্যাস আছে। তোমার মত খোকারও দেখি এই বদ অভ্যাসটি হ'চ্ছে। সেদিন দেখি ও তিন দিনের কম সময়ের মধ্যেই একটা বার্ডক গাছের গা বেয়ে উপরে উঠে পড়েছে—ওর দিকে তাকিয়ে আমার মাথা ঘুরে' যাচ্ছিল।"

বুড়ী শামুক বল্‌লে: "ছি, খোকাকে গাল দিতে নেই। ও কি চমৎকার নিপুণভাবে গাছ বেয়ে ওঠে বলত। ওই ত আমাদের সুখের আর গর্বের বিষয়। ও ছাড়া আর আমাদের বাঁচবার কি আছে? কিন্তু ওর বিষয়ে আমাদের একটা ভাববার কথা আছে। ওর জন্য কি ক'রে একটি সুন্দর বউ যোগাড় করা যায় বলত? আচ্ছা তোমার কি মনে হয় না যে দূরে এই বার্ডক বনের কোথাও না কোথাও আমাদের বংশের আরও দু' চারটি শামুক আছে।"

বুড়ো শামুক উত্তর দিল: "হাঁ, কাল শামুক নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু আমাদের মত সাদা শামুক আছে কিনা সন্দেহ। কাল শামুকের বাড়ী ঘর কিছু নেই, আর ওরা অতি সাধারণ—অতি নীচ বংশের। ওদের ঘর থেকে কি খোকার জন্য বউ আনা যায়? আমি তোমাকে বল্‌ছি কি করা যাবে। আমরা পিঁপড়েদের ঘটক করে বউয়ের খোঁজে পাঠাব। তারা সব সময় ত এদিক ওদিক দৌড়দৌড়ি করে বেড়াচ্ছে—যেন জগতের সব কিছু কাজ ওদেরই করতে হয়। ওরা নিশ্চয়ই আমাদের খোকার জন্য বউ খুঁজে পাবে।" সেই সময় পাঁচ ছ'টা পিঁপড়ে ওখান দিয়ে যাচ্ছিল—ওরা এই কথা শুনে বলে উঠল: "নিশ্চয়ই, খোকার জন্য সব চেয়ে সুন্দরী কনে কোথায় পাওয়া যাবে সে খবর আমরা জানি। কিন্তু, সে মেয়েটি হয় ত এ প্রস্তাবে কাণ দেবে না কারণ সে রাণী।" বুড়ো এবং বুড়ী শামুক একযোগে বলে উঠল: "তাতে কি আসে যায়? তার নিজের বাড়ী আছে ত? তাইত আমরা চাই।"

পিঁপড়ের উত্তর দিল: "বাড়ী কি? তাঁর রীতিমত

রাজবাড়ী আছে। এ অঞ্চলের সেরা উই-ঢিপির রাজবাড়ী—বাড়ীটার সাতশ' দরজা।"

বুড়ী শামুক জবাব দিল: "ওঃ তোমাদের ধন্যবাদ। তোমরা যদি মনে করে থাক যে বিয়ে করে আমার খোকা উইয়ের ঢিপিতে বাস করবে তবে তোমরা ভুল করেছ। এর চেয়ে ভাল পাত্রীর সন্ধান যদি তোমাদের হাতে না থাকে তবে আমরা শাদা ডাঁসদের পরই এ-বিয়ের ভার দেব। তারা জলে রৌদ্রে উড়ে উড়ে বেড়ায়। এই বার্ডক বনের প্রত্যেক অলি গলি তারা ভালরকম জানে।"

ডাঁসদের কাছে এ কথা বলাতে তারা বললে: "হাঁ, আমরা খোকার বউয়ের সন্ধান জানি। মানুষের পায়ের একশ' পা দূরে একটি ছোট শামুক কন্যা একটি ছোট ঝোপে একলা থাকে। বেচারীর কেউ নেই—আর তার বিয়ের উপযুক্ত বয়েসও হয়েছে। তার নিজের বাড়ীও আছে। এই ত কাছেই তার বাড়ী।"

বুড়ো বুড়ী দুজনেই বলে উঠল: "তবে তাকে আমাদের কাছে আস্‌তে বল। তার নিজেরও একটা ছোট ঝোপ আছে আর আমাদের খোকারও একটা বার্ডক ঝোপ আছে।"

তখন শাদা ডাঁসরা উড়ে গিয়ে কুমারী শামুককে বিয়ের প্রস্তাব জানাল। কুমারী শামুক আটদিন পরে এসে হাজির হ'ল। বুড়ো বুড়ী বউ দেখে বেশ খুসী হল।

এখন শুধু বিয়েটা বাকি ছিল। একটা ভাল দিন দেখে বিয়ে হয়ে গেল। ছয়টি জোনাকী পোকা প্রাণপণে আলো জালিয়ে বিবাহ সভা উজ্জল করে ধরল। কিন্তু বিয়েতে বেশি আমোদ প্রমোদ হল না। কারণ, বুড়ো বুড়ী কেউ বেশী আমোদ ভালবাসত না। বুড়ো শামুক ছেলের বিয়ের আনন্দে এত বেশী অভিভূত হয়ে পড়েছিল যে সে কিছু বলতেই পারল না। কিন্তু বুড়ী শামুক বিয়ে উপলক্ষে খুব মনোরম একটা বক্তৃতা দিল: "দেখ বাছারা, তোমাদের দুজনকে আজ থেকে আমরা সমস্ত বার্ডক্ বনটি ছেড়ে দিলাম। যদিও এই বার্ডক বনই পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র জায়গা নয়, তবু এইটাই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ভাল জায়গা। তোমরা দুজনে বেশ সুখে শান্তিতে এখানে বাস কর—আর ভগবানের কৃপায় ক্রমে ক্রমে যদি তোমাদের বংশবৃদ্ধি হয়—তবে এমন সৌভাগ্য হয়ত একদিন তোমাদের হবে যে সে-ই পুরাণো বাড়ীটার লোকেরা এসে তোমাদের ধরে নিয়ে যাবে। তারপর তোমাদের বেঁধে রূপোর ডিসে করে খাবারের টেবিলে রেখে দেবে। একি কম সৌভাগ্যের কথা।"

এই বক্তৃতা শেষ হবার পর বুড়ো এবং বুড়ী শামুক দুজনেই তাদের ঘরে ঢুকল—তারা আর কখনও ঘর থেকে বেরোয় নি। সেখানে তারা ঘুমুতে লাগল। আর তাদের জায়গায় খোকা শামুক আর তার বউ বার্ডকবনে রাজত্ব করতে লাগল। কালক্রমে তাদের অনেক ছেলে-মেয়ে হওয়ায় শামুকের বংশ খুব বেড়ে গেল। কিন্তু ওদের রান্না করে কেউ রূপোর ডিসে রাখবে এ রকম সৌভাগ্য ওদের আজও হয়নি। কাজেই ওরা খুব সুখেই বাস করতে লাগল আর মনে মনে ভাবল, সেই পুরাণো বাড়ীটা নিশ্চয়ই ভেঙে গেছে আর পৃথিবীর সব লোক নিশ্চয়ই মরে গেছে। কেউ কখনও ওদের এ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কথা বলেনি।

হান্স্ এ্যাণ্ডারসেনের The Happy Family গল্প অবলম্বনে।

বৃথা স্বপ্ন

মোহাম্মদ আনসারী

বাঘ ভাবে নিজ মনে সিংহের স্বপন
ভাবে কত মনে মনে সিংহের গর্জন।
ভয়ে তার কত পশু কাঁপে থরথর।
আরো কত ভাবে বসে এহেন বর্বর ॥
বৃথা বাঘ হতে চায় সিংহের সমান।
পারে কি ত্যজিতে কেউ প্রকৃতির দান ॥
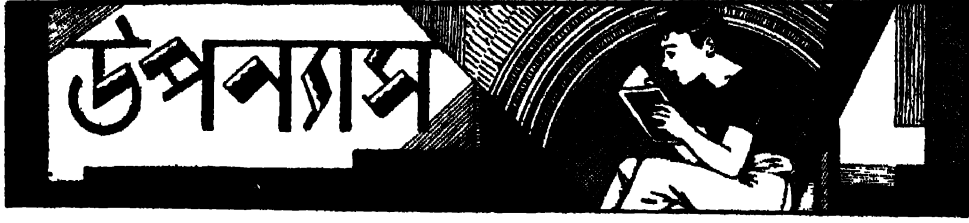
৩১শে মার্চ মঙ্গলবার বেলা ১২টা!

শ্রীতাপসরঞ্জন সরকার

৮

(পরিচয়)

বিজয় ও সমীর দু'জনেই শৈশবে মাতৃ-পিতৃ-হীন। পুলিশের সি-আই-ডি বিভাগের বিখ্যাত ইনস্পেক্টার স্বর্গীয় ব্রজসুন্দর বাবু বিজয়ের পিতার একজন বিশেষ অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর মাতৃহীন বিজয়ের সংসারে আর কেউ না থাকাতে স্বর্গীয় ব্রজসুন্দর বাবু একে নিজ পুত্রবৎ লালন-পালন করেছিলেন এবং গোয়েন্দা বিভাগীয় সমস্ত কার্যই স্বয়ং বিশেষ যত্নের সঙ্গে শিখিয়েছিলেন। নিজের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও প্রখর বিচার বিবেচনা বোধের গুণে অল্প দিনের মধ্যেই বিজয় গোয়েন্দা বিভাগের সমস্ত বিষয়ে শিক্ষালাভ করতে পেরেছিল। উপরন্তু, দু'একটা রহস্যজনক চুরির সন্ধান করে চোরকে ধরে দিতে পারায় পুলিশ শ্রেণীর মধ্যে বিজয় বেশ নাম কিনেছিল। ব্রজসুন্দর বাবু সবাইকে ডেকে বলেছিলেন, "আমার এতদিনের শ্রম সফল হোল।" তাঁর কোন সন্তানাদি না থাকাতে তিনি তাঁর সমস্ত বিষয় সম্পত্তি মৃত্যুর পূর্বে বিজয়কে লিখেপড়ে দান কোরে দিয়ে গেলেন। মৃত্যুর সময় বিজয়কে কাছে ডেকে বলে গেলেন, "বাবা বিজয়, তুমি আমার সুনাম আমার কীর্ত্তি বজায় রেখো।" সেই থেকে বিজয় স্বর্গীয় ব্রজসুন্দর বাবুর যমুনা তীরস্থ এই প্রকাণ্ড দ্বিতল বাড়ীতে বাস করে। কিন্তু, ছোট বেলায় বিজয় তার পিতামাতার সঙ্গে যে বাড়ীতে বাস করত সেই বাড়ীর পাশের বাড়ীতে সুধীর বসু নামে এক ভদ্রলোক বাস করতেন। সমীর তাঁরই একমাত্র ছেলে। শৈশবেই উভয়ের মধ্যে একটা প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়েছিল। কিন্তু ভাগ্য বিপর্যয়ে মাতৃ-পিতৃ-হীন হওয়ার পর বিজয় চলে যায়—দূরে। দীর্ঘকাল আর তাদের দেখা হয়নি। ইতিমধ্যে সমীরও মাতৃ-পিতৃ-হীন হয়ে ভবঘুরের মত দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। একদিন হঠাৎ বিজয় এক পার্কের ধারে সমীরকে দেখতে পায়। সমীর বিজয়কে চিন্‌তে পারেনি। বিজয় তার পরিচয় দেবার পর সমীর আনন্দে অধীর হয়ে পড়ল। চিনতে না পারলেও শৈশবের সঙ্গী বিজয়কে সে ভোলেনি। কথায় কথায় সমীর জানায় যে বর্তমানে সে একরকম বেকার। ঋণের দায়ে কিছুদিন পূর্বে তার শেষ সম্বল বাড়ী খানিও গিয়েছে। আজ সে গৃহহীন, তাই পথচারী। বিজয় সেইদিনই তাকে নিজের বাড়ীতে ধরে নিয়ে আসে। সেই থেকে তারা দু'জন এক বাড়ীতে থাকে। সমীর এখন বিজয়ের সহকারী রূপেই কাজ করে।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, ক্রমে বছর কেটে যায়। সমীর এখন বিজয়ের সঙ্গে থেকে গোয়েন্দাগিরিতে বেশ শিক্ষা লাভ করেছে। বিজয়ের নানা কাজে সে এখন তাকে সাহায্য করে। দু'জনেই পাকা গোয়েন্দা হয়ে উঠেছে। অবশ্য বিজয়ের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কাছে সমীরকে অনেক সময় হার মানতে হয়। অনেক বড় বড় দুর্ভেদ্য জটিল রহস্য ভেদ কোরে দু'জনেই তারা যথেষ্ট অর্থ লাভ করেছে। উভয়েরই আর্থিক অবস্থা এখন ভাল। উপস্থিত তারা এই উইল চুরির রহস্য উদ্ঘাটনে লেগে গিয়েছে। এ ব্যাপারে যদি তারা কৃতকার্য হতে পারে তাহলে অজয় বাবু তাদের প্রচুর অর্থ পারিশ্রমিক দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছেন। তবে তাদের নীতিই হচ্ছে এই যে কারো কাছে

তারা কৃতিত্ব দেখিয়ে হাত পাতে না। কেউ যদি তাদের কাজে প্রীত হয়ে স্বইচ্ছায় তাদের পরিশ্রমের মূল্য স্বরূপ কিছু দান করেন সেইটুকুই খুশী হয়ে তারা গ্রহণ করে।

৯

(সলিল সমাধি)

ল্যাণ্ড্রী থেকে বাড়ী ফিরে এসে বিজয় ও সমীর স্নানাহারের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে বিকেলের দিকে যমুনার ধারে বেড়াতে চল্‌লো। পথে সমীর বল্‌লে, "ভাই বিজয়, খুনী তো ধরা পড়লো, এখন চল আজ একটু স্ফূর্তি করা যাক্।" বিজয় বল্‌লে, "খুনী ধরা পড়লো? তার মানে? শুধু নামটা আমরা পেয়েছি বৈ ত নয়। তুমি যে দেখছি গাছে না উঠতেই এক কাঁদি পেতে চাও? এরকম কত চোর ধরেছি যারা তালাবন্ধ ঘর থেকে রহস্যজনক ভাবে পালিয়ে গেছে। আর এরতো এখনো আমরা দর্শনই পেলুম না। তবে তুমি যখন একটু স্ফূর্তি কোরতে চাইছ তখন চল ঐ মোটরবোটখানা ভাড়া নিয়ে একটু বেড়িয়ে আসা যাক্। আমাদের কাজের কিছু সুরাহা হয়তো হ'তে পাবে।" সমীর হাসতে হাসতে বললে—"তাহলে তাই চল। কিন্তু তোমার দেখছি দিনরাত শুধু কাজেরই চিন্তা।" বিজয় বললে—"জীবনে সাফল্যলাভ করতে হ'লে কাজই ধ্যানজ্ঞান হওয়া উচিত।"

বোট ভাড়া করা হ'লো যমুনার উত্তাল তরঙ্গ ভেদ করে বোট চলেছে। এ পারের জিনিষ সব দূরে চলে যেতে লাগ্‌লো। বোট চালক একমনে বোট চালাচ্ছে আর বিজয় ও সমীর বোটের একেবারে শেষ কিনারায় বসে গল্প করছে। হঠাৎ বোট চালক বলে উঠ্‌লো, "দেখুন, আপনারা একটু কষ্ট স্বীকার করে বোটের মাঝামাঝি সীটটার উপর এসে বসুন। বোটটা একটু কাৎ হয়ে গেছে।" সমীর ও বিজয় সরে এসে বোটের ঠিক মাঝের সীটে গিয়ে বসলো। আধ মিনিট কেটেছে কি না কেটেছে—বোট চালক গোপনে তার ডান পাশে আসন সংলগ্ন কি যেন একটা যন্ত্রে একটু চাপ দিলে। সেটা বিজয়ের দৃষ্টি এড়াল না। কিন্তু, সেই যন্ত্রে চাপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বোটের মাঝখানের যে সীটটায় তারা বসেছিল হঠাৎ সে স্থানটা ফাঁক হয়ে সীটখানা ভিতরদিকে হুমড়ে নেমে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে বিজয় ও সমীর তৎক্ষণাৎ বোটের খোলের ভিতরে ধপাস করে পড়ে গেল। চক্ষের নিমেষে আবার তখনি সে ফাঁক বন্ধ হয়ে সীট উপরে উঠে গেল। এমন চকিতে এ ঘটনা ঘটে গেল যে বিজয় ও সমীর কিছু ভাববার অবকাশ পেলে না। তারা শুধু এই কথা বুঝতে পারলে যে কোন একজন নিদ্রিত লোকের ঘাড়ের উপর তারা—হুড়মুড় করে এসে পড়েছে। কারণ লোকটি তৎক্ষণাৎ যাতনায় একটা অব্যক্ত আর্তনাদ করে উঠ্‌লো। ভয়ানক অন্ধকার, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বিজয় ও সমীর চারিদিক হাতড়ে বুঝতে পারলে যে তারা একটা অপরিসর ইস্পাতের খোলের মধ্যে এসে পড়েছে। বোটের তলায় সংলগ্ন এই ইস্পাতের খোলটি একেবারে জলের গর্ভে ডুবে আছে।

শুধু এক পাশে মাত্র একটি গবাক্ষ পুরু কাঁচের গোল ঢাকনা-আঁটা। যমুনার জল ঐ গবাক্ষ দিয়ে দেখা যায়। বিজয় বল্‌লে, "বন্ধু, স্ফূর্তিটা তোমার একটু বেশী মাত্রায় হ'য়ে দাঁড়ালো যে! বুঝতে পারছ কি। আমরা এখন শত্রুর হাতে বন্দী। এটা যে ওদেরই দলের ভাড়াটে বোট—তা আগে বুঝতে পারিনি। কিন্তু আমাদের পদতলে পড়ে রয়েছে—এ আবার কোন হতভাগ্য? একবার সন্ধান নেওয়া দরকার।" নীচ থেকে একটা গোঙানির শব্দ আস্‌ছিল। বিজয় হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে লোকটাকে ধ'রে তুলে দাঁড় করালে। জিজ্ঞেস করলে, "আপনার এ অবস্থা কেন? আপনি কে? আপনার নাম কি?" লোকটি অতি কষ্টে উত্তর করলে, "আমার নাম সরিৎকুমার দত্ত।" বিজয় চমকে উঠলো। তাড়াতাড়ি বললে—"হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আপনার এ দশা হ'ল কেন?"

"আমি তো সে বিষয় কিছুই জানিনি। শুধু এইটুকু বলতে পারি যে এই বোটে একটু বেড়াতে এসেছিলুম। তারপর আপনাদের মত আমি এখানে পড়ে যাই।"

"কবে থেকে আপনি এখানে পড়ে আছেন?"

"কাল সন্ধ্যেবেলা এসেছিলুম। উঃ, আর বোল্‌তে পারছিনে। দম্ বন্ধ হয়ে আস্‌ছে। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় আমি অত্যন্ত কাতর।"

বিজয় বল্‌লে, "উপরের ঢাক্‌নিটাতো এখানে দাঁড়িয়ে হাত তুলেও নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না। বেটাদের বুদ্ধি আছে দেখছি। খোলটা পাঁচ ছ' হাত নীচু করেছে—নিশ্চয়ই।—আচ্ছা এসত' সমীর, 'দেখি একটু চেস্টা করে। এখানে হাঁটু গেড়ে তুমি বস, তোমার কাঁধে আমি দাঁড়িয়ে দেখি ঢাক্‌নিটা খোলা যায় কিনা।"

বোটের ইঞ্জিনের ঝন্‌ঝন্‌ানি শব্দ তখনও কাণে আস্‌ছে। কাচেব বাইব দিয়ে যমুনার জল দ্রুত গতিতে উল্টো দিকে চলে যাচ্ছে। সমীবেব কাঁধে চাপতে চাপতে বিজয় বললে, "বেরুতে না পারলে কিন্তু আমাদের এই খোলের মধ্যে সলিল সমাধি হবে।"

সমীরের কাঁধে চড়ে বিজয় সোজা হয়ে দাঁড়াল। ঢাক্‌নিতে হাতও পৌঁছল—কিন্তু কোন ফল হোল না। ঢাক্‌নি উপব থেকে খুব শক্ত কবে আট্‌কানো। খোলা তো দূরের কথা—বিজয় প্রাণপণ শক্তিতে এক তিলও সেটাকে নড়াতে পাবলে না। সমীরও চেষ্টা করলে, পারলে না। হতাশ হয়ে সবাই আবার বসে পড়লো। একটু পবে বিজয় বল্‌লে, "দেখুন সরিৎ বাবু, আমি কিন্তু ইচ্ছে করলে—এই কাঁচের ঢাক্‌নিটা ভেঙে জলের ভিতর ঢুকে, পরে আবার উপরে ভেসে উঠতে পারি। আপনি কি তা পাববেন?" সমীর তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, "ওটা আমিও পারবো—কেননা, ডুব সাঁতারে আমি বিশেষ অভ্যস্ত আছি।" সরিৎ বাবুও ধীবে ধীরে বললেন, —"এখন এ বয়সে পারবো কিনা জানিনি—কিন্তু যৌবনে এক সময় জলের তলে ডুব দিয়ে আমি পূরো পাঁচ মিনিট থাক্‌তে পারতুম। ডাইভিংয়েও চ্যাম্পিয়ানসিপ প্রাইজ পেয়েছিলুম। বিজয় বললে,—"যাক্‌, একটা দুশ্চিন্তা গেল। কিন্তু কথা হচ্ছে যে, কাঁচখানা এখন কি কোরে ভাঙা যায়? ঘুসি মেরে ভাঙতে পাবি, কিন্তু ওতে হাত কেটে যাবে। তবে, তারও উপায় আছে—হাতে যদি কাপড় জড়িয়ে নিই—তবে হাত নাও কাটতে পারে। কিন্তু; আর একটা বিপদ আছে—কাঁচ ভাঙবামাত্রই বাইর থেকে হুহু করে জল এসে ঢুকে এ খোলটি ভরে ফেল্‌বে, সঙ্গে সঙ্গে বোট-চালকও ব্যাপারটা জান্‌তে পাববে।" সমীর বললে, "তবে থাক্‌। ও করে কোনো লাভ নেই। বরং চিন্তা কোরে আর কোনো সহজ উপায় ঠিক করা যাক্‌ এসো।" বিজয় বল্‌লে,—"উত্তম, তাই করা যাবে—কিন্তু, উপস্থিত —সরিৎ বাবুর সঙ্গে আমার অনেক কথা ছিল।" সরিৎ বাবু বল্‌লে, "দেখুন, আগে প্রাণে বাঁচবার চেষ্টা করুন। কথা বলবার তখন অনেক সময় পাওয়া যাবে। কাল থেকে এই অন্ধকাব খোলের মধ্যে পড়ে আছি, নাওয়া খাওয়া নেই। শরীবটা বড্ড খারাপ লাগ্‌ছে। এই খোলেব মধ্যে বদ্ধ বাতাসে আমি হাঁপিয়ে উঠছি। কথা বল্‌তে পারৃছি না।"

হঠাৎ বোটের শব্দ থেমে গেল। কাঁচেব ভিতর দিয়ে দেখা গেল, বাইবের জল নিঃস্তব্ধ, কোন স্রোত নেই। দু' একটা মাছ বোটের কাছ দিয়ে ভেসে চলে গেল। খোলের ভিতব কিন্তু ঘোব অন্ধকার কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। শুধু পবস্পরের নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

১০

(নফ্‌রার কীর্ত্তি)

অন্ধকার গহ্বরে তিনটি প্রাণী নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে। বসবার স্থান নেই, একজন হ'লে হয়ত কায়ক্লেশে বসতে পারত, কিন্তু তিনজনের পক্ষে অসম্ভব। কারো মুখে কোন কথা নেই। বোটখানাও থেমে আছে, কেননা বোটেব ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ আর শোনা যাচ্ছিল না। যমুনার জলও স্তব্ধ ও শান্ত ছিল। তিনটি প্রাণীই ভাব্‌তে লাগ্‌লো হয়তো বা উপবে এখন বোট চালক দিব্যি আবামে ঘুম দিচ্ছে। কে জানে এখন রাত্রি কত? হয়তো বা ভোর হয়ে গেছে। প্রখর সূর্যকিরণ এসে যমুনা বক্ষে প্রতিফলিত হচ্ছে, কেউ বা নাইতে এসেছে, কেউ বা পূজা করতে বসেছে। এমনি কত কি ভাবনা তাদের মনের মধ্যে আনাগোনা করছিল। বিজয় ও সমীর বেড়াতে বেরুবার সময় ঠাকুরকে বলে এসেছিল খাবার তৈরী করতে। তারা একটু যমুনার ধারে বেড়িয়ে ফিরে এসে খেয়ে নেবে। রাত্রে তাদের এক জায়গায় যেতে হবে। নফরা চাকরকে বলে এসেছিল তাদের জিনিষপত্র সব একটা সুটকেশে ভরে বিছানাটাও বেঁধে রাখতে। ঠাকুরের খাবার তৈরী শেষ হয়েছে। ঠাকুর খাবার ঢেকে রেখে কিছুক্ষণ বসে রইলো। নফরা চাকরও

সুটকেস গুছিয়ে রেখে বসে আছে কিন্তু কৈ বাবুদের তো দেখাই নেই। ঠাকুরের দু'চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছিলো। নফ্‌রা বার দুই ঠাকুরকে ডেকে সজাগ করে দিলে। কিন্তু রাত বাড়ছে। ঘুমের হাত থেকে রেহাই পাওয়া বড় সহজ নয়। সেও রেহাই পেলে না। ঠাকুর ও চাকরের দিব্যি এক সঙ্গেই নাক ডাকতে সুরু হল। কতক্ষণ এমনি ভাবেই কেটে গেল। হঠাৎ পথের একটা কুকুরের কর্কশ আওয়াজে নফ্‌রা উঠে বসল। কিন্তু কৈ বাবুরাতো এখনো আসেনি'? ঠাকুরকে সে ডেকে তুললে। ঠাকুর বললে যমুনার জলে পড়ে যায়নি ত? কুমীরে টুমীরে নেয়নি ত? নফরা ঠাকুরকে ধমকে উঠলো। কিন্তু হঠাৎ তারও মনে পড়লো, ও পাড়ার শিবু চাকরটাকেতো সে দিন কুমীরে নিয়ে গেছে। তবে কি বাবুদেরও না তা হতেই পারে না, ইত্যাদি পাঁচ সাত ভেবে নফরা ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী তালা বন্ধ করে যমুনার ঘাটের দিকে চললো। ঘাটে এসে দেখলে বাবুরা নেই। ওরা ভেবেছিল ঘাটে বসে বাবুরা হয়ত গল্পে জমে গেছে। কিন্তু কোথায় তারা? ঠাকুরের মুখখানা ভয়ে সাদা হয়ে গেল। অস্পষ্ট-স্বরে বললে—নফরা, ডুবেছে বলেই মনে হচ্ছে। ঠাকুরকে সেখানে দাঁড়াতে বলে নফরচন্দ্র যমুনার তীর ধরে খানিকটা দূর খুঁজে দেখতে গেল। খানিক দূর এগিয়ে সে দেখলে একটি লোক সেখানে হাঁ কোরে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে চেয়ে নদীতে কি যেন দেখছে। নফ্‌রা তাকে জিজ্ঞেস করলে, "কি দেখছেন মশাই?"

"ঐ যে বোটখানা দেখা যাচ্ছে না? ওটাই দেখছি।"

"কেন? ওটাতে দেখবার কি আছে?"

"প্রথম থেকে যদি দেখতে তবেই বুঝতে পারতে ওটাতে দেখবার অনেক কিছু আছে।"

"কেন? কি আছে ওটাতে বলুন না?"

"একটা মস্ত বড় বাঘ। সুন্দরবনের ডোরা কাটা বাঘ।"

"মশাই ঠাট্টা করছেন কি? না সত্যি?"

"যদি সত্যই হয়।"

"তবে আমি আর আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করে বিরক্ত করবো না।"

"আর যদি ঠাট্টা হয়?"

"তবে একটু জিজ্ঞেস করবো বই কি।"

"কি জিজ্ঞেস করবে? করনা?"

"আপনি কি এই ঘাটে দু'টি ভদ্র লোককে বেড়াতে দেখেছেন?"

"কেন? তারা তোমার কে হয়?"

"তারা আমার মনিব?"

"তবে তো দেখ্‌ছি তোমাকে সব বলা দরকার।"

নফ্‌রা অত্যন্ত উৎসুক হয়ে বললে, "হ্যাঁ, মশাই, বলে ফেলুন,—আমাকে না বললে আর বলবেন কাকে? বাবুরা কি তবে কুমীরের পেটে"

অপরিচিত লোকটি বল্‌লে, "একেবারে ঠিক কুমীরের পেট না গেলেও ঐ রকমই একটা কিছু ভয়ানক জীবের পেটে গেছে।"

"অ্যাঁ, বলেন কি? তাঁরা কি আর বেঁচে নেই?"

"বেঁচে হয়ত আছে, কিন্তু ডাঙ্গায় নেই, জলে ঐ বোটটার মধ্যে আছে।"

"কোথায় বোট মশাই? আমি তো দেখতে পাচ্ছিনা?"

"তোমার কি চোখ আছে?"

নফ্‌রা নিজের চোখ দু'টিতে একবার হাত বুলিয়ে দেখে নিয়ে বল্‌লে, "আপনি ঠাট্টা করছেন?"

"কেন? তোমার সঙ্গে কি আমার ঠাট্টার সম্বন্ধ আছে?"

নফরা বললে "তবে—চলুন না ঐ বোটটায় গিয়ে একবার দেখে আসি তাঁরা আছেন কিনা?"

"কি করে যাবে বাপ্‌ধন?"

"কেন, ঐ নৌকাটা ভাড়া কোরে?"

"ভাড়াটা দেবে কে আগে শুনি?"

"তার জন্য আপনাকে চিন্তা করতে হবে না, ভাড়াটা বাবুই দিয়ে দেবেন।"

"আর যদি বাবু বেঁচে না থাকেন?"

"তাহলে কি সত্যই তারা নেই? কেন আপনি স্পষ্ট কোরে বলছেন না?"

"আহা, আমি কি তোমায় বলেছি যে তাঁরা বেঁচে নেই? তাঁরা তো ঐ বোটটাতেই আছেন? তবে—কি অবস্থায় আছেন তা ভগবান জানেন।—"

"যদি বোটটা চলে যায়?"

"তা এক কাজ করনা কেন? শীগ্‌গীর কোরে একটা দড়ি নিয়ে এসো। আমি বোটটাকে এই গাছটার সঙ্গে বেঁধে রাখি?"

"না, না—আপনি ঠাট্টা তামাসা রাখুন। চলুন বোটেই যাই, নৌকা ভাড়া আমিই দেবো।"

"তাতো দেবে, কিন্তু তুমি কি বাপু পিস্তল ছুঁড়তে জান?"

"কেন? তা দিয়ে কি হবে?"

"না, হয়ত হবে না কিছুই, তবে কি না—একটা কিছু হ'লেও হোতে পারে। গুলি চালাতে পার কি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, বাবুদের কাছে থেকে আমিও গুলি চালানো বেশ ভালই শিখেছি। পিস্তলে আমার টিপ দেখে বাবু খুব খুসী হয়ে আমায় বকশিস করেছিলেন।"

"তবে আর ভাবনা নেই। শীগগীর যাও, দুটো টোটা ভরা রাইফেল কিংবা পিস্তল নিয়ে এসো। ঠিক পাঁচ মিনিটের মধ্যে। এই আমি গুণতে সুরু করলুম।"

পাঁচ মিনিটও লাগলো না। নফর বিজয়ের রাইফেল, পিস্তল, টর্চ, দড়ি ইত্যাদি অনেক কিছুই নিয়ে হাজির হল। তারপর তারা নৌকা ভাড়া ক'রে বোটের দিকে চল্‌ল। যেতে যেতে নফ্‌রা জিজ্ঞেস কোরলে, "মশাই আপনার নামটি তো জান্‌তে পারলুম না।"

"কেন? নাম জেনে কি হবে?"

"না-না হবে আবার কি? তবে কিনা.... '

"তবে কিনা'র মানেটা কি?"

নফ্‌রা থতমত খেয়ে বললে—"ওটার মানে তো জানি না বাবু।"

"জাননা? আচ্ছা, না জানলেও তোমার ক্ষতি হবে না?"

"আজ্ঞে না, ওতে আবার ক্ষতি হবে কি?"

ঠাকুর বললে—"কেন খামাখা ভদ্রলোককে বিরক্ত করছিস?"

নফ্‌রা একটু হতাশ ভাবে বললে—"নামটা জানা গেল না।'

[ক্রমশঃ

[জন্ম, ৩১শে ভাদ্র ১২৮৩—মৃত্যু, ২রা মাঘ ১৩৪৪]

শ্রীশম্ভুনাথ ভট্টাচার্য

দুর্য্যোগের কবন্ধের বিষাক্ত নিঃশ্বাসে
দেশজোড়া হাহাকার হাসে অট্টহাসি,
শান্তির আসনাসীনা ছিন্নমস্তা পাশে,
মুমূর্ষু জীবন ছন্দ দানে অর্ঘ্যরাশি।
নীলিমার প্রান্ত চিরে—আলো বন্যা লয়ে
জ্যোতির্ম্ময় রথচক্র নিঃশব্দ ঘর্ঘরে,
মুহূর্ত্তে ছুটিয়া গেল দূরে-দূরান্তরে,
জগতের জন্মাষ্টমী রাত্রি আজ ক'য়ে।
সে দিন অতীত হোল। মহাকাল স্রোতে,
বর্ত্তমানে, অতীত সে নিয়ত ঠেলিছে;
অক্ষয় রচিছে সেতু কালোতে আলোতে,
শবেরে করিয়া শিব নটেশ নাচিছে।
নিঃসরিত তমশীর্ষে—আলো জ্যোৎস্না পার
ধরা হ'তে পাঠালেম প্রণাম আমার।

ভারত ইতিহাসের ধারা

শ্রীকুমারেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

১০০০০ হইতে ৮০০০ খৃঃ পূঃ—লোকমান্য বাল গঙ্গাধর টিলকের মতে আর্যরা উত্তর মেরুতে বাস করতেন। তখন ঐ দেশ এত ঠাণ্ডা ছিল না। ১০,০০০ বৎসর আগে সেখানে বসন্তকাল ছিল। মারাঠিতে টিল্‌ক লেখা হয়, ইহার ঠিক উচ্চারণ টিড়ক। মাঝের অক্ষরটি ল নয়। ইহার উচ্চারণ ড এর কাছাকাছি। এই অন্তর্লকার বেদে ছিল। সংস্কৃততে লোপ পাইয়াছে কিন্তু মারাঠি ভাষায় এখনও বর্তমান। ইংরাজিতে অন্তর্লকার না থাকায় Tilak লেখা হয়। বাঙ্গালীরা ইংরাজি থেকে বাংলা করে নিয়েছেন 'তিলক' কিন্তু ইহা শুদ্ধ নহে। 'টিড়ক'ই শুদ্ধ উচ্চারণ। টিড়ক ঋগ্বেদে, মহাভারতে ভগবদগীতায় উত্তর মেরু বাসের বহু প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। উত্তর মেরুতে বরফ জমতে আরম্ভ হলে সে স্থান আর মনুষ্যের বাসের যোগ্য না থাকায় আর্যগণ দক্ষিণে গমন করিয়া মধ্য এশিয়ায় বাস করেন।

৮০০০ হইতে ৭০০০ খৃঃ পূঃ—প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক দালালের মতে উত্তর মেরু হইতে আর্যগণ আসিয়া মধ্য এশিয়ায় বাস করেন। অত্যধিক শীতের জন্য ও লোক সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য তাঁহারা উত্তর মেরু ত্যাগ করেন। উত্তরমেরুকে দেবলোক আখ্যা দেওয়া হয়। আর্যগণের একশাখা মধ্য এশিয়ায় বাস করে আর এক শাখা য়ুরোপে গমন করে।

৭১০০ খৃঃ পূর্বাব্দে—রাজপুতানা সমুদ্র লুপ্ত হইয়া মরুভূমির আবির্ভাব ঘটে।

৭০০০ হইতে ৬০০০ খৃঃ পূঃ—মধ্য এশিয়ায় তখন মরুভূমি ছিল না, বাসের উপযোগী ছিল। পারসীদের ধর্মগ্রন্থ জেন্দাবেস্থায় আর্যদের আদি বাসভূমি হিমদৈত্য দ্বারা আক্রান্ত হয় এইরূপ উল্লেখ আছে। দেবতারা স্বর্গচ্যুত হন। অবেস্থা গ্রন্থের ভেন্দিদাদ অধ্যায়ের প্রথম ফর্গার্দে উত্তরমেরু হইতে সরিয়া আর্যগণ কোথায় বসতি করেন তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

৬০০০ হইতে ৪০০০ খৃঃ পূঃ—আর্যগণ মধ্য এশিয়ায় বসতি করিয়া সংখ্যাধিক্যহেতু ও জলবায়ু পরিবর্তনের হেতু সে স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। একশাখা ইরাণে বাস করে, তাহারা জারথুস্ত্র ধর্ম পালনকারী পারসীদের পূর্বপুরুষ। পারসীরা এখনও শ্বেত মেষের লোমের পৈতা কোমরে ধারণ করে ও মেয়েদেরও পৈতা হয়। বৈদিক যুগেও পৈতা কোমরে ধারণ করিবার রীতি ছিল, মেয়েদেরও উপনয়ন হইত। গোভিল্যগৃহ্য সূত্রে ইহার উল্লেখ আছে।

ভারতীয় প্রত্ন তাত্ত্বিকগণ রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত গ্রহসংস্থান হইতে সময় নির্ণয়ের প্রয়াস করিয়াছেন। রামচন্দ্রের ঠিকুজি ও ভীষ্মের শরশয্যার সময়ে গ্রহসংস্থান হইতে তাঁহারা স্থির করেন যে প্রায় ৫০০০ বা ৬০০০ খৃঃ পূর্বাব্দে রামায়ণ ও মহাভারত বর্ণিত ঘটনাগুলি হয়। বেদ ইহাদের পূর্বেকার। টিড়কের মতে Preorion period এই সময় ছিল—৬০০০ হইতে ৪০০০ খৃঃ পূঃ—টিড়কের মতে Orion গ্রীক ভাষার শব্দ। বাংলায় Orionকে কালপুরুষ নক্ষত্র কহে। মৃগশিরাও ইহার অন্য নাম। Orion সংস্কৃত 'অগ্রহায়ণ' শব্দের অপভ্রংশ। Orion periodএ অগ্রহায়ণ মাসে বর্ষ আরম্ভ হইত। অগ্রহায়ণ মাসই বৎসরের প্রথম। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন "মাসানাং মার্গশীর্ষোহম্" মাসগুলির মধ্যে আমি মার্গশীর্ষ বা অগ্রহায়ণ। বর্ষারম্ভ ক্রমাগত পশ্চাদ্‌গমন করিয়া বৈশাখে আরম্ভ হয়। Orion periodএর পূর্বে পুনর্বসু নক্ষত্রে বর্ষ আরম্ভ হইত।

'মোডকে'র মতে মহাভারত যুদ্ধ — ৫২২৩ খৃঃ পূঃ বৎসরে হয়।

৫০০০ হইতে ৩০০০ খৃঃ পূঃ—Orion period, এই সময় সূর্য মৃগশিরা রাশিতে গমন করিলে অগ্রহায়ণ মাসে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হইত। বেদের অনেকগুলি মন্ত্র এই সময়ে রচিত হয় বলিয়া অনুমান করা যায়। সেই মন্ত্রগুলি পাঠে মনে হয় যে রচয়িতা ঋষিগণ পূর্বপুরুষদের উত্তরমেরু বাসের কথা তখনও ভুলেন নাই।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার প্রাণনাথ বিদ্যালঙ্কার বলেন —আর্য্যরা ভূমধ্যসাগরের তীরে উদ্ভূত হন ও প্রথমে মিশর দেশে বাস করেন পরে মেসোপটেমিয়া হইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। তাঁহার মতে মিশর ও বাবিলন দেশের রাজাদের উল্লেখ বেদে পাওয়া যায় যথা :—

	ঋগ্বেদোক্ত রাজাগণ	পশ্চিমদেশীয় রাজাগণ	যে দেশে রাজত্ব করিতেন
৪০০০ হইতে ৩০০০খৃঃপূঃ	বতরু ইনপাদ	বাল্ললু (অন্ন পাদ)	উর (বাবিলন)
৩০০০ খৃঃ পূঃ	তরিস	টাবসী	ওপিস
৩০০০ খৃঃ পূঃ	উর্ম্মিনা	উর্নিণা	উব
৩০০০-২৯০০ খৃঃ পূঃ	অন্দমন	এণ্টেমনা	অব্‌ন
৩০০০-২৯০০ খৃঃ পূঃ	ইন্দবঃ	এনান্নাতুম্ প্রথম ও দ্বিতীয়	উব
২৯৫০-২৯০০ খৃঃ পূঃ	উষা	উয	উম্মা
২৮০০ খৃঃ পূঃ	অণ্ড বা অন্ধস	লুগাল (অণ্ড)	লেগাস্
২৬৫০ খৃঃ পূঃ	জব	শব (গণিশাবি)	অক্কাদ
২৬৫০ খৃঃ পূঃ	সাব্‌গণ	সাব্‌গণ	অক্কাদ
২৪৯০ খৃঃ পূঃ	জলগুলা	গলুগুলা	লেগাস্
২৪৫০ খৃঃ পূঃ	চারু (দেব) ?	শার্ক (জি)	কিশ্
২৪৫০ খৃঃ পূঃ	গুহৎ	গুডিয়া	লেগাস্
২৩৫০ খৃঃ পূঃ	বর্চ্চিন্ (বৃষ্ণি)	বর্‌সিন্	সুমের অক্কাদ
২২৫০ খৃঃ পূঃ	অহম্‌বাজন	ইম্মি ডগন	ঈশিন্
২২৫০ খৃঃ পূঃ	গাঙ্গু	গাঙ্গুঙ্গু	উব
২১০০ খৃঃ পূঃ	অশ্বিন্	ঈশ্বী (উব)	হর্বির্ক
১০৩৪-১০৩২ খৃঃ পূঃ	কাণ্ড	কাশণ্ড (নাদিন আখি)	বাবিলন
	মাক্‌ণ্ড	মেখু	ঈজিপ্ট
	মাণ্ডু	নাম্ভ	ঈজিপ্ট
	কব	কাউ	ঈজিপ্ট
	অক্‌সিতোতি	আখেটাটন	ঈজিপ্ট
৩৫০০-৩১৫০ খৃঃ পূঃ	আওয়ীলের ভূমিদান	'সুসাব' (ইরাক) মালিক	ইবাক

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডল ১৩৪ সূক্ত ও প্রথম হইতে ৭ মন্ত্র

মিশর বা ঈজিপ্টের **ইতিহাসের তারিখ**	ঋগ্বেদোক্ত রাজাগণ	ঈজিপ্টের প্রথম বংশের রাজাগণ	ঋগ্বেদের সূক্ত
৪৪০০ খৃঃ পূঃ	মনস	মেনেস	১০-১২৯, ১-৭
৪৩৬৬ খৃঃ পূঃ	টটি	টেটা	১০-১৩০, ১-৭
	নরমেধ (শকপুতো বা মিশব দেশের শকের পুতো)	নাবমেব	১০-১৩২, ১-৭
	গুশান	———	১০-১৩৩, ১-৭
	* অব	———	১০-১৩৪, ১-৭

* খ্রীঃ পূঃ ৯ম হইতে চতুর্থ শতকের মধ্যে আর্য্যগণ দাক্ষিণাত্যে বাস করেন (ভাণ্ডারকর) পাণিনিও কাত্যায়নের সময়ের মধ্যে ৬৬৩২ খ্রীঃ পূঃ (অর্থাৎ কলির আরম্ভের ৩৫৩১ বর্ষ পূর্ব্বে) বশিষ্ঠের যজ্ঞকুণ্ড হইতে চন্দ্রমান যোদ্ধার সৃষ্টি।

৫০০০—৪০০০ খৃঃ পূঃ গাংপুর করদ রাজ্যের গুহায় ক্ষোদিত চিত্রগুলি ও বিক্রমখোলে (রামপুর জমিদারী সম্বলপুর) পাহাড়ে প্রাপ্ত শিলা-লিপি যাহার পাঠোদ্ধার এখনও হয় নাই। শিলালিপি ৩২ ফুট × ৭ ফুট ফেব্রুয়ারী ১৯৩১এ আবিষ্কৃত। সম্ভবতঃ এই লিপি ব্রাহ্মী লিপি ও মহেঞ্জদাড়োতে প্রাপ্ত লিপির মাঝামাঝি সময়কার। বি, এন্, আর, রেলওয়ের নাহরপাঠ ষ্টেশন হইতে ৩ মাইল দূরে রায়গড় ষ্টেটে (**Eastern States Agency**) সিংহানপুরে গুহা গাত্রে প্রাগৈতিহাসিকযুগের অঙ্কিত চিত্র আছে।

সাঁতারের কয়েকটি বিধি

শান্তি পাল

সন্তরণ প্রতিযোগিতায় যেখানে দ্রুতগতির সমস্যা উঠে, সেখানে প্রথম প্রশ্নই হইল প্রতিযোগী সেস্থলে কেমনভাবে এবং কোন্‌খানে দ্রুত, দ্রুততর ও দ্রুততম শক্তি নিয়োগ করিবেন। কোন্ পদ্ধতিতে আপনার গতির লঘুত্ব ও গুরুত্ব নিয়ন্ত্রণ করিবেন? প্রতিযোগিতার ঠিক কোন্ অংশে আপনার সল্পতম এবং কোন্ অংশে প্রচণ্ডতম গতি নিয়োগ করিবেন? আদৌ গতির মাত্রা নিয়ন্ত্রণের বিশেষ প্রয়োজন আছে কিনা? তাহার উত্তর এই—প্রাণপণ শক্তিতে দ্রুতবেগে যাওয়া কখনই উচিত নয়। প্রতিযোগিতায় বরাবর অতি দ্রুত যাওয়া একেবারে নিষেধ। এমন গতিতে যাইতে হইবে, যাহাতে অনায়াসে ও সহজ ভাবে লক্ষ্য পর্যন্ত পৌছিতে পারা যায়। যেন লক্ষ্যে পৌছিবার পূর্বেই না হাঁপাইয়া পড়িতে হয়। পূর্বোক্ত নিয়ম দুইটি স্মরণ রাখিয়া যতটা দ্রুত যাওয়া যায়, ততখানি দ্রুততাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সাঁতারের প্রতিযোগিতায় এইভাবে গতি ঠিক রাখিয়া অগ্রসর হওয়া বড়ই কঠিন; কারণ সমস্ত দূরত্বের মধ্যে সাঁতারুর শক্তিকে সমানভাবে ভাগ করিয়া নেওয়া প্রায় অসম্ভব। একই গতিতে শেষ পর্যন্ত আসিয়া, লক্ষ্যে পৌছিবার সঙ্গে সঙ্গেই সাঁতারুর দমও ফুরাইয়া যাইতে পারে। সাঁতারুরা কখনও কখনও প্রথমেই পুরাদমে গিয়া লক্ষ্যে পৌছিবার পূর্বেই হাঁপাইয়া পড়েন। আবার কখনও কখনও কোনও সাঁতারু একটা 'সেন্সেশানাল ফিনিশ, অর্থাৎ বিস্ময়কর দ্রুতগতিতে শেষটা 'পাড়ি' দিবার জন্য যথেষ্ট দম সঞ্চয় করিয়া রাখা সত্ত্বেও অন্য প্রতিযোগীরা পূর্বেই লক্ষ্যে পৌছাইয়া যান। সে 'ফিনিশ' বা 'শেষ-পাড়ি' আর তাঁহার দেওয়া হয় না। সাঁতারুর সব চেয়ে বড় গুণ গতির 'মান' নির্দ্ধারণ করা। ছুটিয়া যাওয়ার জন্য যে অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন, সেই শক্তিটুকুকে ভাল সাঁতারু প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করিয়া লন। জয়ী হইবার ইহা একটি প্রধান উপায়।

মনোভাব—সাঁতারুদের প্রকৃত 'স্পোর্টস্‌ম্যানের মত মনোভাব থাকা আবশ্যক। অনেক সময় দেখা যায় যে, প্রতিযোগীরা 'সময় চুরি' করেন, অর্থাৎ 'স্টার্টার' বা রওনদারের বন্দুকের আওয়াজ হইবার পূর্বেই জলে লাফাইয়া পড়েন। এই আচরণের মধ্যে আর যাই থাকুক 'স্পোর্টস্‌ম্যানে'র মনোভাব থাকে না। অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের উপর এই প্রকার অন্যায় সুবিধা গ্রহণ করা 'স্পোর্টস্‌ম্যানে'র উচিত নয়। ভাল বিচারক বা সালিস থাকিলে এই জাতীয় সাঁতারুদের প্রতিযোগিতার অযোগ্য বলিয়া বিদায় করিয়া দিতে পারেন, কারণ উহাই নিয়ম। বিচারকের সিদ্ধান্ত প্রতিযোগিদের সকল সময়েই মানিয়া লওয়া উচিত।

বুকঝাঁপ—নির্দিষ্ট স্থান হইতে দণ্ডায়মান অবস্থায় মাথা সামনের দিকে ঝুঁকাইয়া বিনা লম্ফে জলে পড়িতে হইবে, এই সময় মুখ নীচু ও শরীর নিশ্চল রাখিতে হইবে। এবং ঝম্পের গতি ব্যতীত অন্য কোন অগ্রগামী গতি দেওয়া নিষেধ।

(ক) ষাট সেকেণ্ড বা এইরূপ কোন অল্প নির্ধারিত সময়াবসানে ঝম্প শেষ হইবে স্থির থাকিলে (যদি না ইতি মধ্যে মুখ জলের উপর তুলিয়া ফেলা হইয়া থাকে) সাধারণতঃ ঝাঁপ দিবার সময় হইতেই সময় গণনা করা হয়।

(খ) প্রতি ঝম্পের পর সাঁতারু সন্তর্পণে জল ত্যাগ করিবেন। যদি কোন প্রতিযোগী পরবর্তী প্রতিযোগীর গতি হ্রাস করিবার মত জল নাড়িয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহাকে অনুপযুক্ত ঘোষণা করা হয়।

(গ) প্রতিযোগীর শরীরের যে অংশ ঝম্প-মঞ্চ হইতে দূরে থাকিবে, সেই স্থান হইতে ঝম্পমঞ্চের উপর ঝম্প-রেখার দূরত্বেই প্রতিযোগীর ঝম্পের দূরত্ব নির্দ্ধারিত হইবে।

(ঘ) 'চ্যাম্পিয়ানসিপ' অথবা 'লেভেল কণ্টেস্ট' প্রতিযোগিতায় প্রত্যেক প্রতিযোগীকে তিনটি ঝাঁপ দিতে হইবে, এবং তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা দূরের ঝাঁপই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য বা গৃহীত হইবে। 'হ্যাণ্ডিক্যাপ' প্রতিযোগিতায় অনুষ্ঠাতাগণ ঝাঁপের সংখ্যা নির্ধারণ করিবেন।

পিঠ-পাড়ি বা চিৎ সাঁতার—(ক) সাঁতার আরম্ভ হইবার পূর্বে প্রত্যেক সাঁতারুকে জলে সারিবদ্ধ হইয়া,

মঞ্চের দিকে মুখ করিয়া উভয় হস্ত মঞ্চের উপর রাখিয়া দাঁড়াইতে হইবে।

(খ) 'যাও' বলিবামাত্র মঞ্চে জোর ধাক্কা দিয়া চিৎ-সাঁতার বা পিঠ-সাঁতার সুরু করিবেন। ঘুরিবার সময় অথবা সাঁতার শেষ করিবার সময় ছাড়া ইতি মধ্যে আর কোন সময় অন্যভাবে যাইতে পারিবে না।

ঘুরিবার সময় অথবা সাঁতার শেষ করিবার সময়, মঞ্চে হস্ত স্পর্শ করিবার পূর্বে, সাঁতারু যদি বুকের উপর ঘুরিয়া যায়, তাঁহার সাঁতার নাকচ হইবে

বুক-পাড়ি—(ক) উভয় হস্ত একত্রে সম্মুখে ঠেলিয়া একই সময় পিছনে আনিতে হইবে

(খ) পায়ের পাতা দুইটি একত্রে টানিয়া আনিতে হইবে। হাঁটুদ্বয় ভাঙিয়া পৃথক হইয়া যাইবে। পায়ের পাতার বহিঃপরিক্রমিক চালনার সহিত পদদ্বয় একত্র করিতে হইবে।

(গ) স্কন্ধদ্বয় জলের সহিত সমান্তরাল রাখিয়া বুকের উপর থাকিতে হইবে।

(ঘ) ঘুরিবার সময় এবং 'পাড়ি' শেষ করিবার সময় একত্রে উভয় হস্তে মঞ্চ স্পর্শ করিতে হইবে।

মার্চ ১৯৩৫ সনের এ-এস্-এ কমিটির নিয়মানুসারে হস্তদ্বয় ফিরাইয়া আনিবার সময় জলের উপর উঠিতে পারিবে না।

রওনা বা যাত্রা—(ক) প্রতিযোগীর পদদ্বয় মঞ্চ ছাড়িবামাত্র প্রতিযোগী স্টার্ট লইয়াছে মনে করিতে হইবে।

(খ) যাত্রার পূর্বে যাত্রা-জ্ঞাপককে বাজির আরম্ভ কোথায়, শেষ কোথায়, কোনও কিছু প্রদক্ষিণ করিতে হইলে তাহা কিভাবে করিতে হইবে তাহা প্রতিযোগিদের বুঝাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। প্রতিযোগিদের মধ্যে ইহার ব্যতিক্রম করিলে তাঁহাকে অনুপযুক্ত বলিয়া গণ্য করা হয়।

(গ) যাত্রা-জ্ঞাপকের বা রওনদারের অনুমতির পূর্বে 'যাত্রা' লইলে তাহাকে 'ফল্‌স্ স্টার্ট' বা 'বে-রওনা' বলা হয়। এবং ঐরূপ বাজে যাত্রা লইলে প্রতিযোগীকে অনুপযুক্ত গণ্য করা হয়। অথবা তাহাকে পুনরায় মঞ্চে ফিরিয়া আসিয়া অনুমতিক্রমে 'স্টার্ট' লইতে হয়।

শেষ-সীমা পরিষ্কাররূপে তালিকায় লিখিত হইবে।

পোষাক বা সাঁতার-সাজ ('কস্ট্যুম্‌স')—(ক) তুলা, রেশম, পশম বা উহাদের সংমিশ্রণে প্রস্তুত 'কস্ট্যুম' পরিধান করিতে হইবে এবং উহা অস্বচ্ছ হওয়া আবশ্যক।

(খ) তুলা বা রেশম দ্বারা প্রস্তুত পোষাকের রং কালো অথবা ঘননীল হওয়া চাই। কিন্তু পশম দ্বারা প্রস্তুত 'কস্ট্যুম' যে কোন এক রঙের অথবা রং সংমিশ্রণের হইলেও চলিবে, কিন্তু তাহা অস্বচ্ছ হওয়া চাই।

(গ) 'কস্ট্যুম' একই খণ্ড কাপড়ের তৈয়ারী হওয়া চাই এবং কোমরের উপরে, পিঠে, এবং ধারে ছাড়া অন্য কোথাও ফাঁক থাকিবে না। আঁটিবার স্থান কাঁধে হইবে। 'স্কার্ট' জাতীয় 'কস্ট্যুম' পরিধানেও কোন বাধা নাই।

অ্যামেচার বা অবৈতনিক কাহাকে কহে—

(ক) যিনি কখনও অর্থ পুরস্কার অথবা বাজি রাখিয়া প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন নাই

(খ) যিনি কখনও অর্থ বিনিময়ে ব্যক্তিগতভাবে সাঁতার শিক্ষা দেন নাই। তবে বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দকে সাঁতার শিক্ষা দিয়া বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ হইতে অর্থ লইলে তাঁহাকে 'অ্যামেচার' পদ হইতে বিচ্যুত হইতে হয় না।

(গ) যিনি কখনও অর্থ-বিনিময়ে কাহাকেও সন্তরণ শিক্ষা দেন নাই বা সন্তরণে সাহায্য করেন নাই।

(ঘ) যিনি কখনও জ্ঞানতঃ অথবা বিনা প্রতিবাদে এমন কোন প্রতিযোগিতায় অথবা সন্তরণ প্রদর্শনীতে যোগদান করেন নাই, যাহার মধ্যে বৈতনিক বা পেশাদার প্রতিযোগিরাও যোগ দিয়াছিলেন।

(নৌ-সেনা অথবা বিমান বিভাগে চাকুরি করিয়া বিভাগীয় প্রতিযোগিতায় যোগদান করিলে তাহা দূষণীয় নহে।)

নিম্নলিখিত কারণের জন্য যে কোন সাঁতারুকে পেশাদার বলা যাইতে পারে :—

(ঙ) অর্জিত-পুরস্কার বিক্রয় করিলে, বন্ধক দিলে, অথবা অন্য যে কোন উপায়ে তাহার বিনিময়ে অর্থ লইলে।

(চ) পারিতোষিক চাহিলে অথবা নিয়মাতিরিক্ত খরচ চাহিলে, গ্রহণ করিলে, অথবা অন্য কাহাকেও গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে।

(ছ) কোন প্রতিষ্ঠানের সভ্য হইবার জন্য প্রবেশ-মূল্য, মাসিক চাঁদা অথবা ঐরূপ কোন দেয় অর্থের মকুব চাহিলে, বা সুবিধা গ্রহণ করিলে অথবা কাহাকেও বিনা চাঁদায় লইতে অনুরোধ করিলে।

(জ) সাঁতারুদের তত্ত্বাবধান হেতু অর্থ বিনিময়ে কোন প্রকাশ্য 'স্নান-কেন্দ্রে' অথবা ঐরূপ কোন প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত হইলে।

একযাত্রা

ডাঃ শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন সরকার, এম, বি

ভূপু ওরফে ভূপতি ভট্‌চায্‌ আমার বাল্যবন্ধু—

কোলাঘাটের কাছে কোন গাঁয়ে তার এক ঘর শিষ্য ছিল, খুব বড়লোক—সেখানে দু' দিন ধরে কি সব যাগ্‌-যজ্ঞ হবে, তাতে তার পাওনা থোওনা হবে ঢের।

আমি পূজোর বাজার করতে কল্‌কাতা যাবো শুনে সে বলে বস্‌লো, সতেরোই এক সঙ্গে যাবো।

সতেরোই আশ্বিন বৃহস্পতিবার—আমি তাতে আপত্তি জানালাম।

সে বল্লে—শুক্র ও শনি দু' দিন কাজ—রবিবারে সকালেই বিদেয় আদায় হবে, তারপর কল্‌কাতা গিয়ে বাজার-টাজার করে বিকেলের গাড়ীতে বাড়ী ফেরা যাবে, ঠিক পরের দিন হ'তেই পূজো আরম্ভ। "বন্ধুর সাথে ভোজন, ভ্রমণ, ও মৃত্যুপথে গমনে আনন্দ অভিন্ন"। 'তা ছাড়া ভূতের আবার বারবেলা'—ভট্‌চায্‌ বল্লে—'অর্দ্ধাগমে দোষং নাস্তি।' বৃহস্পতিবার রাত্‌ বারোটার পর রেল-গাড়ীর ভাড়া সুবিধে হবে, অতএব 'শুভস্য শীঘ্রং' বাড়ী হ'তে বেলা চারটের মোটরে ইষ্টনাম স্মরণ করে বেরিয়ে পড়লাম। বলা বাহুল্য তারপর আর মোটর ছিল না।

মোটর বাস্‌ চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ থেমে গেল, বুঝি 'বারবেলার' ফল্‌টা এই খানেই ফলে—

মধ্যবয়সী এক মুসলমান, সঙ্গে সাত্‌ আট্‌ বছরের একটী ছেলে—গাড়ীর চালককে বল্‌ছে—"তোমার বাঁশীটা একবার বাজাও—আমার ভাইপো শুন্‌তে চাচ্ছে।" ড্রাই-ভার উঠলো রেগে—আমরা তো চাচার কথা শুনে হেসেই খুন।

সেখান থেকে আরও মাইল দুই এসে দেখা গেল পথের মাঝখানে একটা মোটা গাছের ডাল—অগত্যা গাড়ী দাঁড়ালো—নিকটে কিন্তু কেউ নাই, খানিকটা তফাতে এক পাল রাখাল বালক দাঁড়িয়ে আছে, তাদেরই কাণ্ড মনে করে—ড্রাইভার চাকরটাকে বল্লে, তাদের একটু তাড়া করতে—শুনেই সব দে ছুট—কেবল একটা ছেলের কাপড়ের এক প্রান্ত চাকরটা ধ'রে ফেলতেই সে কাপড় ফেলেই দে ছুট—গাড়ী হ'তে একজন বল্লে—'ওরে তোর কাপড় নিয়ে যা'—সে উলঙ্গ হ'য়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটছে আর বলছে 'প্রাণে বেঁচে থাকলে অমন কাপড় ঢের হবে।' বালকের কথায় আমরা হাসি চেপে রাখতে পারলাম না

চাকরটা ঘুরে আসবার সময় গাছের আড়ালে একটা ধেড়ে গোছের ছেলেকে ফিক্‌ ফিক্‌ করে হাসতে দেখে যেমন বলা—'শালা তুই হাসছিস্‌।'

সে অমনি কাঁদো কাঁদো হয়ে বল্লে—'না হুজুর, আমি কাঁদছি।' আবার গাড়ী শুদ্ধ লোক হেসে উঠলো।

সেই গাছতলায় একটা তালপাতার ছাতা পড়ে ছিল, পায়ে ক'রে এক ধাক্কা মারতেই—স্ফটিক স্তম্ভের ভেতর হ'তে নৃসিংহদেবের আবির্ভাবের মত, ভীত, মূত্র ও মল-ত্যাগে রত একটা ছেলে বেরিয়ে প'ড়ে কাঁপতে কাঁপতে বল্লে—'দোহাই হুজুর, আমি কিছুই জানি না।'

ভট্‌চায্‌ অবাক্‌ হয়ে চেয়ে রইলো—এক গাড়ী লোকের হাসির ধুম দেখে। বাজে সময় নষ্ট হওয়ার জন্যে গাড়ী ছুটলো তীর বেগে।

স্টেশনে পৌছুতে আর মাইলখানেক—

এমন সময়ে এক বৃদ্ধ মুসলমানের ইঙ্গিতে বাস্‌ দাঁড়িয়ে গেল। কণ্ডাক্টার হাঁকলো—'শীগ্রী চাপো—দাঁড়াবার সময়

নাই'—বৃদ্ধের কিন্তু চাপবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না—সে পুঁটলী খুলে কি যেন হাতড়াচ্ছে—

পুনরায় তাড়া পড়লো—'গাড়ীতে বসে পয়সা বের করবে—এখন শীগ্রি চেপে পড়ো—তেল পুড়ছে'—

অনেকক্ষণ বাদে সে ছোট একটী বাটী বের করে বল্লে—'একটু মোটরের তেল—খালেকের মায়ের পায়ে দরদ লেগেছে' একটা প্রকাণ্ড ধমক খেয়ে সে হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো—গাড়ীও পুরোদমে ছুটলো।

সাজাহানের পত্নীপ্রেমের সঙ্গে বৃদ্ধের পত্নীপ্রীতির তুলনা ক'রে গাড়ীতে হাসি ও সমালোচনা বসে গেল।

পথিমধ্যে এতগুলি বিঘ্ন অতিক্রম ক'রেও যথা সময়ে স্টেশনে পৌঁছে গেলুম বটে, কিন্তু শুধু কন্‌সেস্‌ন টিকিটের জন্যে রাত বারোটা পর্যন্ত ব'সে থাকতে হলো।

'হাওড়া'য় পৌঁছে ভট্‌চায—'বি, এন্, আরে' চলে গেল—কথা রইলো রবিবার দশটার সময় 'দর্মাহাটায়' আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে

(২

'দু' দিন পরের ঘটনা—'হাওড়া' স্টেশনে উদ্‌ভ্রান্তভাবে পায়চারী করছি—ট্রেনের আর দেরী নাই—রবিবার বেলা 'বারোটা' পর্যন্ত অপেক্ষা করে ভট্‌চাযের পাত্তা না পেয়ে একাই বাজারের কাজ সেরে পাঁচটার ট্রেনে দেশে ফিরছি। মনে নানা রকমের ভাবনা।

এমন সময়ে দেখি অপরূপ বেশে ভট্‌চায ছুটতে ছুটতে আসছে—ট্রেন ছাড়বার ঘণ্টা বেজে গেল—কোন রকমে তার হাত ধরে টেনে কাম্‌রায় তোলা হ'ল। জিজ্ঞাসা করলাম এ বেশ কেন ভট্‌চায? ছল্ ছল্ চোখে সে উত্তর করলে—কিছু খাবার ব্যবস্থা কর আগে, তার পর সব বলছি।

সুটকেশ খুলে একখানা কাপড় তাকে পরতে দিলাম, পরের স্টেশনে কিছু খাবার খেয়ে সে অনেকটা সুস্থ হলো।—

এক কামরা লোক সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে।

ভট্‌চায আরম্ভ করলো তার কাহিনী—

বেলা ৮টার মধ্যেই শিষ্যি বাড়ী হ'তে বিদেয় হয়ে—'ন'টার সময় হাওড়া পৌঁছেচি। পুল পার হয়ে দর্মাহাটাই যাচ্ছিলাম—'স্ট্যাণ্ড রোডে'র মোড়ের কাছেই—শুভ্র পট্টবস্ত্র পরিহিত, উপবীতধারী একজন ব্রাহ্মণ আমাকে দেখেই—নমস্কার করে দাঁড়ালো—তার বিশাল বপু, ব্রাহ্মণের আভিজাত্যে মুগ্ধ হ'য়ে আমিও প্রতিনমস্কার করলাম।

তিনি বল্লেন 'আজ আমার সুপ্রভাত। দয়া ক'রে অধমের পর্ণ কুটিরে একবার পদার্পণ করতে হবে।

আমি কিছু বুঝতে না পেরে বিস্মিত হ'য়ে চেয়ে রইলাম।

তারপর তিনি বল্লেন—স্বর্গীয় পিতৃদেবের বাৎসরিক শ্রাদ্ধের দিনে প্রতি বৎসর আমি দ্বাদশটী সুব্রাহ্মণের সেবা ক'রে থাকি।

তদুপলক্ষে আজ আমি একাদশটী ব্রাহ্মণের সন্ধান করে তাদিকে ঘরে রেখে এসে আর একটী ব্রাহ্মণের আশায় গঙ্গার ঘাটে গিয়েও ব্যর্থ মনোরথ হয়েছি। অনেক ব্রাহ্মণ স্নান করছেন, কিন্তু প্রকৃত ব্রাহ্মণের পরিচয় কারও না পেয়ে এই দিকে এসে পড়েছি।

এতক্ষণে আমার মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছে—আপনি যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ সন্তান তা আপনার দর্শন মাত্রেই আমার মনে ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে—এখন অনুগ্রহ ক'রে গরীবের সঙ্গে আসুন—সেখানে আরও একাদশটী অতিথি অপেক্ষা করছেন—আহারাদি সমস্তই প্রস্তুত।"

বেলা দশটার সময় আমাকে 'দর্মাহাটায়' যেতেই হবে এই আপত্তি জানিয়ে ব্রাহ্মণের সাদর নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করলাম।

আমার কথায় তিনি হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে বল্লেন—"অনেক কষ্টে আপনাকে পেয়েছি, হয়তো আর অন্য ব্রাহ্মণের সন্ধান হবে না, ফলে আমার কাজ পণ্ড হবে। ব্রাহ্মণের মনে কষ্ট দেওয়া ব্রাহ্মণের উচিত নয়।"

ব্রাহ্মণের কান্নায় আমি স্থির থাকতে পারলাম না।

তাড়াতাড়ি কাজ সেরে 'দর্মাহাটায়' যাবার স্থির হলো।

ব্রাহ্মণের অনুসরণ করলাম; মনে মনে ভাবছি আমি আজ কার মুখ দেখে গাত্রোত্থান করেছি, চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, চতুর্বিধ আহারের কল্পনায় তখন আত্মহারা—

এমন সময়ে তিনি আমার বংশ পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন

আমার পিতামহ নবদ্বীপের বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন, বন্দ্যোপাধ্যায় ঘর উপাধি ভট্টাচার্য্য, নৈকষ্য কুলীন ফুলে—মেল—কাহার সন্তান ইত্যাদি—কিছুই বাদ দিলাম না।

কথা কইতে কইতে আমরা জগন্নাথ ঘাটের উপরে এসে দাঁড়িয়েছি, আমার স্নান আহ্নিক সারা হয় নাই শুনে, তিনি বল্লেন 'গঙ্গায় ও গুলো সেরে গেলে হতো না ?

বাড়ীর ভিতরটা বড় সংকীর্ণ, তা ছাড়া আজ সেখানে লোকের ভীড়, অন্যান্য অতিথি যাঁরা আমার গৃহে 'পা' দিয়েছেন, তাঁরা সকলেই প্রাতঃকৃত্য সেরে সেখানে অপেক্ষা করছেন। গঙ্গার ঘাটে শীগ্রি ক'রে কাজটা সেরে ফেলুন—নইলে আহারের দেরী হবে,—

আমি তাঁর কথায় সম্মত হলাম, এগারোটা পর্য্যন্ত আহারাদি সারতে লাগবে—তারপর দর্মাহাটায় যাবো—

ব্রাহ্মণের বাসাও খুব নিকটে—মাত্র পাঁচ মিনিটের রাস্তা। সুটকেশ হ'তে লালরঙের চেলীখানি বের ক'রে সমস্ত কাপড় চোপড় ও দানসামগ্রী তার জিম্মায় রেখে গঙ্গাগর্ভে নেমে পড়লাম।

আবশ্যকীয় যা কিছু সবই তিনি সংগ্রহ করে দিলেন।

ভাবলাম অনেকদিন গঙ্গায় অবগাহন স্নান হয় নাই। সুযোগ পেয়েছি ছাড়ি কেন ?

"দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে" এই শ্লোকটি উচ্চারণ করতে করতে স্নান সমাপ্ত করে, ঘাটে উঠে আসতেই চক্ষুস্থির—

শুধু সমুদায় কাপড়-চোপড় সহ সুটকেশটিই নয়, শিষ্য বাড়ীতে প্রাপ্ত নগদ পঁচিশটি টাকা ও বাসনাদিও তৎসহ অন্তর্হিত।

আমার সম্বলমাত্র পরণের গামছাখানি—মনের দুঃখে কেঁদে ফেল্‌লাম—ঘাটের বাইরে এসে এদিক ওদিক খোঁজ করলাম—কোন সন্ধানই পেলাম না।

হতাশ হয়ে এক স্থানে বসে রইলাম—তারপর এককান দুইকান হয়ে কথাটা ছড়িয়ে পড়লো—ক্রমে পুলিশের আমদানী হলো। 'গোদের ওপর বিষফোঁড়া'—আমাকে তারা থানায় নিয়ে গেল—নানারকম কৈফিয়ৎ জবাব দিহির পরে আমাকে ছেড়ে দিলে—পরণে গামছা, ক্ষিদের জ্বালায় অস্থির, কোনও দিকে লক্ষ্য না করে ছুটে এসেছি স্টেশনে, জানি তুমি পাঁচটার গাড়ীতে ঠিকই ফিরবে—তোমার দেখা না পেলে, বাড়ী ফিরে যাওয়া অসম্ভব হতো। তোমার নিষেধ না শুনে 'বারবেলায়' যাত্রা করার এই ফল—রাত পোহালে পূজো—কি করে বাড়ীতে মুখ দেখাবো

'গতস্য শোচনা নাস্তি' ইত্যাদি মামুলী সান্ত্বনা বাক্যে ভট্‌চাযকে শান্ত করতে চেষ্টা করলাম। আরও বোঝালাম 'বারবেলা—ফারবেলা' কিছুই নয়, সবই বরাত, আমিও তো এক সঙ্গেই বাড়ী থেকে বেরিয়েছি—

আমার কথায় ভট্‌চায খুসী হ'লো কি না জানি না—কিন্তু গাড়ীর ভেতর থেকে একজন যুবক বলে উঠলো—আপনাদের মন্ত্রপূত কবচে যখন সবই হয়, তখন আপনারা এর বিহিত ব্যবস্থা করছেন না কেন ? আর ফাঁকির পয়সা ফাঁকেই পড়ে। শিষ্যির মাথায় হাত বুলানো পয়সা ফাঁকির ছাড়া আর কি ? এই কথা শুনে ভটচাযি্য চটে লাল—

অনেক কষ্টে তাকে ঠাণ্ডা করলাম। তারপর সব চুপ চাপ।

পূজোর বাজার, ট্রেনে অসম্ভব ভীড়, কত লোক উঠছে—কত নামছে। ক্রমে গাড়ী বর্ধমানে এসে দাঁড়ালো—

রাত তখন ন'টা—যাত্রী ট্রেন, সমস্ত স্টেশনে একটু ক'রে হাঁপ ছেড়ে অতি কষ্টে বর্ধমানে এসে পৌচেছে।

একটা কুলীকে ডেকে সমস্ত জিনিষপত্র নামাবার ব্যবস্থা করলাম।

সবই মিললো—মিললো না—যে মোটটাতে ছেলেদের জামা, কাপড়, জুতা, গিন্নীর বরাতি 'নিরুপমা শাড়ী' আর গন্ধ তৈলাদি প্রসাধন দ্রব্যগুলি রাখা ছিল, যার দাম প্রায় একশো টাকা—আমি সমস্ত গাড়ীটা তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজলাম—

ভট্‌চায বল্লে—'এক যাত্রায়' কি পৃথক ফল হয় ?'

আধুনিক যুগের ড্র্যাগন

শ্রীজয়ন্তকুমার ভাদুড়ী

ছোটবেলা থেকেই আমবা ড্র্যাগনেব কথা শুনে আসছি। তাদেব সম্বন্ধে কত বকম রোমাঞ্চকব কাহিনী পড়েছি—পড়তে পড়তে দেহের প্রতিটি লোম খাড়া হয়ে উঠেছে। 'সুভগদ্বীপ' বা Blessed Islesএ সোনাব আপেল পাহারা দিত এক ড্র্যাগন—হারকিউলিস যাকে হত্যা করেছিল। অথবা সেণ্ট জর্জ যে ড্র্যাগনকে হত্যা করেছিল অথবা যে ড্র্যাগনকে হত্যা কবে সীগফ্রিও 'ড্র্যাগন হত্যাকাবী' উপাধি পেয়েছিল তাদেব সম্বন্ধে নানা লোমহর্ষক কাহিনী পড়েছি। চিত্রে, শিল্পকলায়, ভাস্কর্যে—ড্র্যাগনের ছবিব ছড়াছড়ি। সেই সব অবাস্তব রূপকথাব ড্র্যাগন আব আধুনিক যুগেব সত্যিকারেব ড্র্যাগনের মধ্যে দু'একটা জায়গায় মিল আছে, অর্থাৎ উভয় দেহ আঁশাবৃত (Scales), আর তারা সরীসৃপ। পাখীদের যেমন পালক সরীসৃপদের তেমনি আঁশ আছে।

কিন্তু আধুনিক যুগেব ড্র্যাগন কাবা? ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিকেরা একপ্রকার অতিকায় টিকটিকির সন্ধান পান—তারা দৈর্ঘ্যে দশ বার ফিট পর্যন্ত হয় এবং তাদের দেশ হচ্ছে পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ। কামোডো নামক দ্বীপের নাম অনুসারে এদের নাম (Komodo) ড্র্যাগন হয়েছে। চাইনিজ শিল্পকলায় যে সমস্ত ড্র্যাগনের ছবি দেখা যায় তাদের উৎপত্তির মূল সম্ভবতঃ এরাই অথবা এদের কোনো অতিকায় পূর্বপুরুষ যারা এখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে পৃথিবী থেকে। এদের দীর্ঘ নমনীয় গ্রীবাদেশ, সাপের জিভের মতই দ্বিখণ্ডিত লম্বা জিভ প্রভৃতি মিলে তাদের আকৃতি এমন অদ্ভুত ও ভয়াবহ কবে তুলেছে যে এরা সেকালের গল্পে যে প্রধান অংশ নেবে তাতে আব আশ্চর্য কি? খুব কম লোকই এদের নিজেদেব দেশে এদের হালচাল পর্যবেক্ষণ কববার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। আমাদের অবশ্য এদের দর্শন লাভেব জন্য জু'গার্ডেনে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

কোমোডো ড্রাগন 'মনিটর' (Monitors) নামক টিকটিকি জাতীয় প্রাণী। ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি স্থান এই জাতের আরও কয়েক প্রকার টিকটিকি দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু কোমোডো ড্র্যাগনের মত কেহই আকারে অত বৃহৎ নয়। অবশ্য দু'একটাকে আট ফিট পর্যন্ত দীর্ঘ হতে দেখা গিয়েছে এবং তাদের ওজনও প্রায় আট পাউণ্ড। গল্পের ড্র্যাগনের মত এদের কাছ থেকে আমাদের ভয় পাবার কিছু নেই বরং এরাই আমাদেব ভয়ে ভীত এবং সবদা আমাদের সংস্পর্শ এড়াতে সচেষ্ট।

ভারতের কতকগুলো মনিটর বিষাক্ত বলে বিবেচিত হয়, কিন্তু তাদেব দেহে বিষেব অস্তিত্ব পাওয়া যায় নি। তাদের একমাত্র অস্ত্র হচ্ছে তীক্ষ্ণ দাঁত এবং চাবুকের মত লেজ—আক্রমণ ও আত্মরক্ষা উভয় কাজেই নিয়োজিত হয়। অনেক সময় মনিটরদের লেজের ঝাপটায় অনেকে গুরুতর আহত হয়েছে শোনা গেছে।

কোমোডো ড্র্যাগন ও অন্যান্য মনিটররা—মাংসভোজী। কোমোডোরা না কি বন্য শূকর ও হরিণের বাচ্চা ধরে

খায়। পাখীর ডিম ও কচ্ছপই হচ্চে প্রত্যেকের সবচেয়ে প্রিয়তম খাদ্য। এরা ডিম মুখে পুরে আমরা যে ভাবে ডিম ভাঙ্গি সেইভাবে চাপ দিয়ে ডিম ভেঙ্গে ফেলে এবং তখন ভেতরের কুসুম ও অন্যান্য তরল পদার্থ ধীরে ধীরে উদরদেশে প্রবেশ করে। Mr. Lydekker বলেছেন, একটা বেঙ্গল মনিটরকে ভারতের কোন একটা জুগার্ডেনে রাখা হয়েছিল—সে নাকি এক বছরে ষাটটি ইন্দুর, ছটা ডিম, দশ পাউণ্ড গোরুর মাংস এবং চারটি গিনিপিগ খেয়েছিল। বছর আষ্টেক আগে লণ্ডন জু'তে একজোড়া কোমোডো ড্র্যাগন আনা হয়েছিল—তাদের
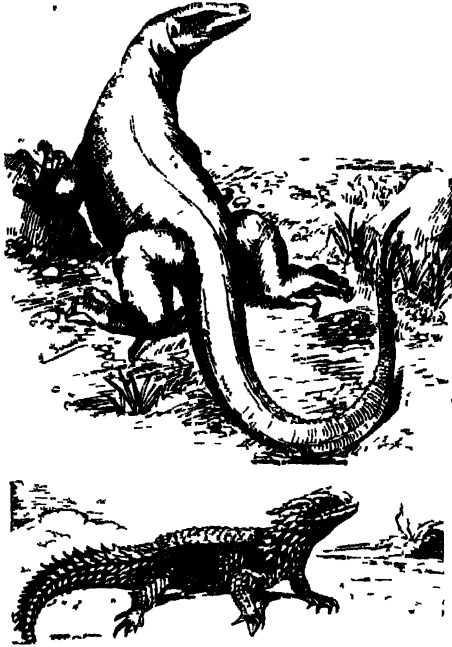
ড্র্যাগন

একটার নাম দেওয়া হয় সুম্‌ব্যাওয়া (sumbawa) আর একটির নাম সুম্‌বা (Sumba)। এখন শুধু সুমবা বেঁচে আছে।

মনিটররাই হচ্ছে আধুনিক যুগের প্রকাণ্ডতম ড্র্যাগন। কিন্তু আকৃতি ছাড়া যদি অন্য বিষয় দেখি তাহলে টিক-টিকিদের আরও দু'একটা জাত আছে যাদের মধ্যে ড্র্যাগনের বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান। এদিক থেকে অষ্ট্রেলিয়ার ফ্রিল্ড লিজার্ড (frilled lizard) সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। আকারে অবশ্য এরা মাত্র তিন ফুট লম্বা—তাও লেজসমেত এবং লেজের দৈর্ঘ্যই হচ্চে এক ফুট। কিন্তু, আক্রান্ত হলে এরা এমন ভয়ংকর মূর্ত্তি ধারণ করে যে বড় বড় শিকারী কুকুররা পর্যন্ত চেহারা দেখে ভয়ে পালিয়ে যায়।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যেমন ফ্রিল দেওয়া জামা পরে—এদেরও ঘাড়ের চারিপাশে তেমনি ফ্রিল দেওয়া চামড়ার আবরণ আছে এবং তাতে ছাতার সিকের মত বিশ্রী দেখতে বড় বড় হাড়ের রড লাগান আছে। এরা যখন বিশ্রাম করে এই ফ্রিল বন্ধ করা ছাতার মত ঘাড়ের চারি ধারে ভাঁজ করে রাখে। আক্রান্ত হলে এরা প্রথমে ছুটে পালিয়ে যেতেই চেষ্টা করে কিন্তু কিছুদূর গিয়ে যখন হাঁপিয়ে পড়ে তখন অনুসরণকারীকে আক্রমণ করবার জন্য ফিরে দাঁড়ায়। তখন হলদে পাড় বসান তাদের বিরাটমুখ ব্যাদান করে—হলদে আর লালের ছিট দেওয়া ফ্রিলগুলো খোলা-ছাতার মত বিস্তৃত হ'য়ে ঘাড়ের চারিপাশে খাড়া হয়ে ওঠে। এরাও আধুনিক ড্র্যাগনের এক একটি জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি।

গল্পের কতকগুলো ড্র্যাগনের ডানা আছে—আধুনিক যুগে তারও দু'একটি নিদর্শন মিল্‌বে। মালয় দ্বীপপুঞ্জে এক প্রকার উড়ন্ত ড্র্যাগন দেখা যায়। তারা টিকটিকিই—তবে এগাছ থেকে ও গাছে উড়ে যাবার জন্য দেহের উভয় পার্শ্বে চামড়ার এক একটা ভাঁজ আছে। এরা যখন গাছের উপর বিশ্রাম করে অথবা ছুটোছুটি করে তখন এই প্যারাচ্যুট দু'টো দেহের দু'পাশে ভাঁজ করে রাখে। কিন্তু নামবার সময় এই প্যারাচুট গুলো খুলে দেয়—তখন দেখা যায় সে দুটি ভারী উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত। লাল, নীল, কাল, কমলালেবুর রংএর নানা ছোপ দেওয়া ডানাধারী সুন্দর একটি প্রাণী নেমে আস্‌ছে। এদের অনেক সময় সুন্দর প্রজাপতির সঙ্গে তুলনা করা হয়। এই প্রকার প্রায় কুড়ি জাতের ড্র্যাগন আছে। কিন্তু কেউই বেশী বড় হয় না।—সবাচেয়ে যে বড় সে মাত্র পনের ইঞ্চি লম্বা। কিন্তু আমার মনে হয় এরকম সুন্দর প্রাণীদের ড্র্যাগন বলা আদৌ যুক্তি সঙ্গত নয়।

এইবার কতকগুলো বিষাক্ত ড্র্যাগনের কথা বলব। যতদূর জানা গেছে তাতে মাত্র দু'জাতের বিষাক্ত টিকটিকির খবর পাওয়া গেছে। তারা গিলামনষ্টার (Gila monster) আর হেলোডার্মা হরিডাম (Helo

derma horidum) নামে অভিহিত। এদের দেখতে অনেকটা এক রকমই এবং টেক্সাস, এ্যারিজোনা এবং মেক্সিকোতেই কেবল মাত্র পাওয়া যায়। গিলামনষ্টার খুব চিত্রিত বিচিত্রিত হয়—এদের সারা দেহে কালো আর বেগুনি রংএর ছোপ ইতস্তত: ভাবে ছড়ান—শুধু লেজের দিকটায় কালো আর বেগুনী রং পর পর একটা নিয়মানুক্রমে লাগান। এদের দাঁতগুলো বঁড়শীর মত বাঁকান এবং নীচের চোয়ালের দাঁতে আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত নালী আছে—নিচের ঠোঁটের ভিতরের দিকে বিষ-থলী আছে—সেখান থেকে বিষ এই নলের মধ্য দিয়ে যাওয়া আসা করে। এরা সাধারণতঃ মরুভূমিতে বাস করে—সাপ, ছোট ছোট টিকটিকি খেয়ে এরা জীবন ধারণ করে।

আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেট্স ও মেক্সিকোর কতকগুলো শিংওয়ালা টিকটিকি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তোমরা পড়েছ রূপকথার ড্র্যাগনরা মুখ দিয়ে নাক দিয়ে অগ্নি উদ্গীরণ করতে পারত। কিন্তু এই শিংওয়ালা টিকটিকিরা তাদের চেয়েও উল্লেখযোগ্য—কারণ এরা চোখ থেকে ঝলকে ঝলকে রক্ত বের করে বেশ কয়েক ফিট দূরে পিচকারির মতো নিক্ষেপ করতে পারে। এদের দেহ বেশ মোটাসোটা—পিট ব্যাঙের মত চ্যাপটা—পিঠে খাড়া খাড়া কাঁটা (Spire) আছে—প্রায় প্রত্যেকেরই মাথায় কাঁটার ঝুঁটি সাজান থাকে। এরা চোখের পাতা থেকেই এই রক্ত বের করে এবং রক্তের পরিমাণও নেহাং কম নয়।

এই শিংওয়ালা টিকটিকির মত অষ্ট্রেলিয়ার কাঁটাওয়ালা টিকটিকি। এরা কদাচিৎ ছ'সাত ইঞ্চির বড় হয়—এদের সারা দেহ কাঁটার বর্মে আবৃত। কিন্তু এরা অত্যন্ত নিরীহ এমন কি নিজের শিকার ধরতেও বিষম বেগ পায়।

অন্যান্য টিকটিকির মত এদেরও উপবাস করবার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। এক একটা প্রায় একমাসের অধিক না খেয়ে থাকতে পারে। এদের বন্দী করে রাখা বড় কঠিন। সাধারণ অবস্থায় এক এক ভোজে এরা হাজার থেকে পনেরশ' পর্যন্ত পিপঁড়ে ধরে খায়—কিন্তু বন্দী হলেই খাওয়া বন্ধ করে দেবে।

ড্র্যাগনদের যে সমস্ত আচার ব্যবহারের কথা বইএ লেখা আছে তার প্রায় প্রত্যেকটাই বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়। অবশ্য হাইড্রা ড্র্যাগনের মত যার অনেকগুলো মাথা ছিল—একটা কাটা পড়লে তৎক্ষণাৎ আর একটা গজিয়ে উঠত—সেরকম কোনও ক্ষমতা আধুনিক কালের ড্র্যাগনের মধ্যে আছে বলে জানা যায়নি।

কিন্তু মাথা না গজাতে পারলেও লেজ গজাতে পারে। টিকটিকিকে ধরলেই তারা লেজ খসিয়ে দেয়, আমরা যখন খসা লেজ নিয়ে ব্যস্ত তখন তারা সেই অবসরে হাওয়া হয়ে যায়—আর টিকটিকি টাকে দেখা যায় না। এর পরে লেজ গজাতে প্রায় মাসাধিক কাল সময় লাগে। অবশ্য যেটা গেছে সেটার মত হয় না। কিন্তু কাজ চলে যায়।

আধুনিক যুগের ড্র্যাগনদের গল্পের এইখানেই শেষ। আমাদের পূর্বপুরুষরা যেসব কাল্পনিক গল্প বিশ্বাস করতেন সে সব যতই অদ্ভুত হোক না কেন, আধুনিক জগতে তাদের চেয়েও কম অদ্ভুত বা বিস্ময়কর ব্যাপারের অভাব নেই -অথচ সেগুলোও সত্যি [ক্রমশ

অপরিচিত বন্ধু

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

তার তুল্য বন্ধু নাই যার সঙ্গে নাই পরিচয়,
করে না সে হিংসা তব, করিতে হয়না তারে ভয়।
কিছুই করে না দাবী, পদে পদে ধরে নাক দোষ,
চায় নাক তোষামোদ, করে না সে অভিমান রোষ।
জানে না লজ্জার কথা, গৃহচ্ছিদ্র করে না প্রচার,
করে না বিপন্ন কিংবা অপ্রতিভ, চাহে না সে ধার।
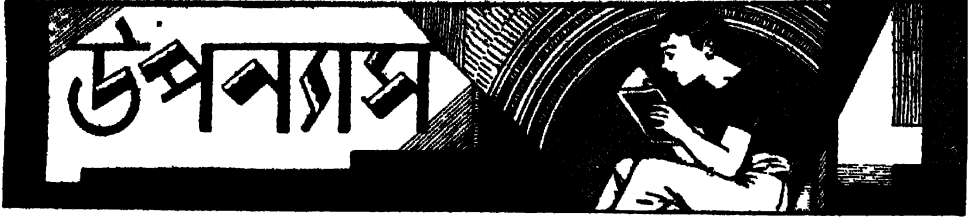
পরাগ ও রেণু

শ্রীনরেন্দ্র দেব

'কালী স্টোর'

ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য পাড়ায় একটি স্কুল হয়েছিল। শ্রীমতী কমলা দেবী, বি-এ-বি-টি, এই স্কুলটি খুলেছিলেন। তিনি পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে তাঁর স্কুলের জন্য ছাত্র-ছাত্রী সংগ্রহ করেছিলেন। সকালে মাত্র এক ঘণ্টা বই পড়া ও এক ঘণ্টা গল্প, বেলা ৭টা থেকে ৯টা। আর বিকেলে এক ঘণ্টা শুধু অঙ্ক আর লেখা, তারপর এক ঘণ্টা খেলা, বেলা ৩টা থেকে ৫টা। পরাগের মা'র সঙ্গে দেখা করে শ্রীমতী কমলা দেবী পরাগকেও তাঁর স্কুলে ভর্তি করে নিয়েছিলেন। মাসিক বেতন মাত্র দু' টাকা।

পরাগ স্কুলের সব ছেলেমেয়ের চেয়ে ভাল পড়া বলতে পারতো, কারণ মার কাছে সে ছোট বয়েস থেকেই লেখাপড়া শিখছিল খুব মন দিয়ে। তা ছাড়া, ছেলেদের মাসিকপত্র আর কালী বাবুর দোকানে গিয়ে খবরের কাগজ পড়ে সে অনেক কিছু শিখ্‌ছিল যা ইস্কুলের বই পড়ে শেখা যায় না। কাবু তাকে প্রতি মাসে 'ভোরের আলো' আর 'শৈশব' নামে দুখানি ছোটদের মাসিক পত্র উপহার দিতেন, পরাগের কাছে এই কাগজ দুখানি ছিল সব চেয়ে আদরের।

সেদিন ইস্কুলে খেলা হ'য়েছিল—'হল্‌দি ঘাটের যুদ্ধ।' পরাগ সেজে ছিল রাণা প্রতাপ সিংহ। রাজপুত সৈন্য পরিচালনা ক'রে রণক্লান্ত পরাগ 'কালী স্টোরে' এসে বিশ্রাম নিচ্ছিল। আর কালীবাবুকে এই যুদ্ধ ক্রীড়ার সবিস্তারে বর্ণনা দিচ্ছিল।—"আমি হয়েছিলাম প্রতাপ সিংহ"—'রাণা প্রতাপ'—জানো তো কাবু; চিতোরের মহারাণা! যাঁর 'চৈতক' নামে নীল ঘোড়া ছিল—"

কাবু বললেন—"স্কুলে তুমি ঘোড়া পেলে কোথা? তার ওপর আবার বলছ নীল ঘোড়া।"

পরাগ মহা উৎসাহিত হয়ে উঠে বললে—আমি রেণুকে বেছে নিলুম আমার ঘোড়া করে। সে হল আমার চৈতক—"

কাবু বললেন—"সে ত একটি সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে, তুমি তাকে নিয়ে কী করে "নীল ঘোড়েকে সওয়ার্" হলে?"

পরাগ বললে—"তা বুঝি জাননা কাবু?" সে ভারি মজা হয়েছিল। সে আজ একটা নীল রংয়ের ফ্রক্ পরে স্কুলে এসেছিল। তাই ত আমি তাকে 'চৈতক' করে নিলুম।"

কাবু বললেন—"বটে। তা সে যে বড় বাজি হ'ল তোমার ঘোড়া হ'তে?"

পরাগ বললে—"কেন হবেনা? রাণা প্রতাপের ঘোড়া কি যে-সে ঘোড়া?"

কাবু বললেন—"তাহ'লেও তবু সে ত' ঘোড়া। আর রাজকুমারী রেণুকা রায় হ'ল—সুবর্ণগড়ের জমিদার মহামান্য রাজা বাহাদুর ভবানীপ্রসাদ রায়ের আদরের ছোট মেয়ে—সে তোমার ঘোড়া হ'ল?"

পরাগ বললে—"হাঁ, হলত। তারপর উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করলে—আচ্ছা কাবু, রাজকুমারীদের বুঝি ঘোড়া হ'তে নেই?—রেণু কি সত্যিই রাজকুমারী?"

কাবু বললেন—"নিশ্চয়। রেণু হ'ল সুবর্ণগড়ের রাজকুমারী।"

পরাগ ক্ষণকাল কি ভাবলে—তারপর গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা বলুনত, ও কি সেই রাজকুমারী যে দৈত্যপুরীতে হাতীর দাঁতের পালঙ্কে শুয়ে ঘুমাত', যাকে রাজার কুমার এসে সোনার কাঠির পরশ দিয়ে জাগাত ?

কাবু বললেন—সেকালের সে রূপকথার দিন আজ আর পৃথিবীতে নেই খোকন! সেদিন রাজার ছেলে উজীরের ছেলে, কোটালপুত্র, সওদাগর পুত্র, নাপিতের পো, কুমোরের পো সবাই একসঙ্গে মিলে মিশে পাঠশালায় পড়তো একসঙ্গে খেলাধূলা করতো, একসঙ্গে মৃগয়ায় যেত। সেদিন ছোট বড় বলে কোনো ভেদাভেদ ছিল না। ওদের মধ্যে সমান মর্যাদা পেত সবাই পরস্পরের বন্ধু হয়ে। তারা একসঙ্গেই দৈত্যপুরীতে গিয়ে হানা দিত, দলবেঁধে যেত রাক্ষস বধ করতে, উদ্ধার করে নিয়ে আসতো রাজকুমারীকে, ঘুমের দেশের পাষাণ প্রাসাদে দুঃসাহসীর মত ঢুকে। কিন্তু, এখন দাঁড়িয়েছে ঠিক তার উল্টো। রাজার ছেলে মন্ত্রীপুত্রকে হেয় জ্ঞান করে, মন্ত্রীপুত্র কোটাল পুত্রকে তুচ্ছ মনে করে—আবার কোটালপুত্র সওদাগরের ছেলেকে হীন মনে করে। সওদাগরের ছেলেও তাই নাপিতের পো কুমোরের পোকে ঘৃণা করে। পদমর্যাদা আর ধনগৌরব মানুষের মনকে এমন বিষাক্ত করে তুলেছে যে মানুষ একটা মিথ্যে আভিজাত্যের অহংকারে পরস্পরের নিকট হ'তে শুধু যে বিচ্ছিন্ন হয়েই পড়েছে, তাই নয়, মানুষ আজ পরস্পরের শত্রু হয়ে উঠেছে। আমাদের দেশের এই সব অন্তঃসারশূন্য ধনমদমত্ত তাসের গোলাম রাজা মহারাজা আর জমিদারগুলোকে আমি ভারতের আবর্জনা বলে মনে করি। তারা এখন জাতির কল্যাণের চেয়ে অনিষ্টই করে বেশি।

পরাগ উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করলে—কী অনিষ্ট করে কাবু ?

কালিবাবু বললেন, অনেক রকমেই অনিষ্ট করে খোকন। প্রথমতঃ তাঁরা অলসও কর্মহীন জীবন যাপন করে দেশ ও জাতির সামনে একটা বিষময় অসৎ দৃষ্টান্ত খাড়া করেন। আমোদে প্রমোদে বিলাসিতায় এবং কুসংসর্গে দিন কাটিয়ে অত্যন্ত ক্ষতিকর আদর্শ স্থাপন করেন তাঁরা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের সামনে। এ ছাড়া আরও কি অন্যায় কাজ করেন তাঁরা জানো ? দীন দরিদ্র চাষী মজুর, শিল্পী, কারিগর সবার উপর অত্যাচার করে তাদের বহু কষ্টার্জিত ধন অপহরণ করেন ওঁরা প্রজার কাছে খাজনা আদায়ের নাম করে। অথচ প্রজার কল্যাণে ওঁরা না করে দেন লেখাপড়া শেখাবার জন্য একটা স্কুল বা রোগের চিকিৎসার জন্য একটা হাসপাতাল, না করে দেন যাতায়াতের সুবিধার জন্য পাকা রাস্তা বা চৈত্র বৈশাখের শুষ্ক জলাশয়ের দেশে তৃষ্ণানিবারণের জন্য পানীয় জলের কোনো ব্যবস্থা। চাষবাসের বা কুটীর শিল্পের কোনো উন্নতি বিধানের দিকেও কিছুমাত্র চেষ্টা নেই। প্রজাদের স্বাস্থ্য ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের প্রতিও তাঁরা একেবারেই অমনোযোগী। তাঁরা বারোমাস বিদেশ থেকে সৌখীন বিলাসিতায় বাবুগিরি করে টাকা নষ্ট করেন আর সেটাকা যোগাতে হয় দেশের যত গরীব দুঃখীকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, গায়ের রক্ত জল করে।

কালী বাবুর মুখের দিকে চেয়ে পরাগ দেখলে তাঁর চোখ দুটো উত্তেজনায় যেন বড় বড় হয়ে উঠেছে। মুখটা লাল হয়ে গেছে। কপালের শির গুলো ফুলে উঠেছে। পরাগ তাড়াতাড়ি বললে, কাবু আমি কিন্তু বড় হয়ে কক্ষণো রাজা মহারাজা বা জমিদার হব না।

পরাগের অবস্থা দেখে ও তার ভীত কণ্ঠস্বর শুনে কালীবাবু অকস্মাৎ নিজের এই উত্তেজনায় নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়লেন, সহজ কণ্ঠে ও হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি বড় হ'য়ে কী হবে ঠিক করেছ খোকন ?

পরাগ গম্ভীরভাবে বললে, বড় হয়ে আমি স্কুলের প্রধান শিক্ষক হব। আমি কমলাদি'র মত একটা স্কুল করবো। সে ইস্কুলে পড়বে যত গরীব দুঃখীর ছেলে মেয়েরা বিনা মাহিনায়। রাণুর মত রাজকুমারী বা জমিদার বাবুদের ছেলে মেয়েরা সেখানে পড়তে পাবে না, কি বলো কাবু ?

কালীবাবু বললেন, ছি খোকোন, তুমিও যদি মানুষ হয়ে মানুষকে ঘৃণা কর, মানুষের মধ্যে পরস্পরের অবস্থা হিসেবে একটা বিভেদ বিচ্ছেদ সৃষ্টি কর, তাহ'লে আর তুমি দেশের কী উপকার করলে ! জাতিরই বা কি মঙ্গল করলে ? তোমাকে বড় হয়ে চেষ্টা করতে হবে সেই রূপকথার প্রাচীন কালের মতো ছোট বড়র ভেদ ভুলে দিয়ে আবার সবাইকে সমান মর্য্যাদা ও সমান আসনে

প্রতিষ্ঠিত করা। ভিন্ন ভিন্ন মানুষ তাদের জীবিকা অর্জনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কাজ কর্ম বা শিল্প ব্যবসায় নিযুক্ত হয় বটে তাব'লে তো তারা অমানুষ হয়ে যায় না! তোমার আমার মতো তারা মানুষই থাকে। কিন্তু, আমরা এমনি অহংকারী যে কোনো জিনিস কিনতে দোকানে গিয়ে দোকানদারকে কিছুতেই নিজেদের সমকক্ষ মানুষ বলে মনে করতে পারি না। আমাদের মনের মধ্যে এই ভাবটাই বড় হয়ে ওঠে যে আমি যখন পয়সা দিয়ে জিনিস কিনছি তখন আমি ওর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আর ও যখন পয়সা নিয়ে জিনিস বেচছে তখন ও আমার চেয়ে হেয়। অথচ, এ কথাটা আমরা একবারও ভেবে দেখিনি যে জিনিস আর পয়সা একই রকম মর্যাদা পাবার অধিকারী। একের বিনিময় ভিন্ন যখন অন্যটি দুর্লভ তখন তারা কেউই পরস্পরের চেয়ে ছোট নয়। তুমি যেমন পয়সা দিচ্ছ আমাকে, আমি তেমনি জিনিস দিচ্ছি তোমাকে, সুতরাং তোমার ও আমার সমান মর্যাদা। মানুষ হিসাবে আমরা পরস্পরের চেয়ে কোন অংশেই হেয় বা ছোট নই।

আবার, আমি ষ্টেশনারী জিনিস বেচি, বইখাতা, কলম পেন্সিল, এসেন্স, সাবান, তোয়ালে, রুমাল, বিস্কুট, লজেঞ্জেস্ নিয়ে আমার কারবার, তাই, আমাকে তোমরা ওরই মধ্যে একটু খাতির করো, আর মধু বেচারা চাল, ডাল, তেল ঘি, নুণ চিনি, লঙ্কা মরিচ বেচে ব'লে, ওকে 'মুদীবাকালি' ব'লে আমার চেয়ে হেয় জ্ঞান করো, এমনি করে ধীরে ধীরে একটা মিথ্যা অহংকার আর নিরর্থক মর্যাদা বোধের মোহে মানুষ মানুষকে অবজ্ঞা করতে ঘৃণা করতে শিখেছে। তাদের মধ্যে নানা স্তর ভেদ ও শ্রেণী বিভাগ হয়ে তারা আজ বিভক্ত ও দুর্বল হয়ে পড়েছে। রাজা মহারাজা জমিদার ও ধনী বড়লোকদের দেখাদেখিইত জনসাধারণের মধ্যেও ঐ 'অস্বাস্থ্যকর' মনোভাব ছড়িয়ে পড়েছে—গর্বিত অহংকারী মর্যাদাভিমানী জমিদারগুলোর উদ্ধত ব্যবহারে আমাদের দেশের ও জাতির সর্বনাশ সাধিত হয়েছে।

কালী বাবু হয়ত আরও খানিক বকে যেতেন এবং পরাগ সব কথা বুঝুক বা না বুঝুক চুপ করে বসে মন দিয়ে সবই শুনতো, কিন্তু তাদের এ আলোচনায় বাধা দিয়ে ঝড়ের মতো ছুটে এল 'মণির মা।' হাঁপাতে হাঁপাতে এসে কালী বাবুকে জিজ্ঞাসা করল—আমাদের দাদাবাবু কি আছেন এখানে?

কালী বাবু কিছু বলবার আগেই পরাগ তার খবরের কাগজ পাতা কেরাসিন তেলের কাঠের বাক্সটি ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললে—কেন মণির মা! এই যে আমি। মা কি আমাকে ডাকচেন?

মণির মা তেমনিই হাঁপাতে হাঁপাতে উত্তেজিত কণ্ঠে বললে—শিগ্‌গীর চলো দাদাবাবু, লক্ষ্মীপুর থেকে তোমার দাদু একজন লোক পাঠিয়েছেন তিনি তোমাকে দেখতে চাইছেন। মা বললেন খোকাকে নিয়ে এস।

কালীবাবু মণির মা'র মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে চাইলেন, মৃদু অস্পষ্ট কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—লক্ষ্মীপুরে খোকাবাবুর আবার দাদু কে আছে? কই, কখনও শুনিনিত?

'মণির মা' বললে—আমিই কি তা শুনছি কখনও, না জানি কিছু? আজ সেখান থেকে লোক আসাতে তবে না জানতে পারলুম যে দাদাবাবু আমাদের লক্ষ্মীপুরের মস্ত জমিদার কুলের একমাত্র বংশধর! পরে আমাদের দাদাবাবুই হবেন সে দেশের রাজাবাহাদুর।

কালীবাবু বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে পরাগের দিকে ক্ষণকাল নির্নিমেষে চেয়ে দেখে বললেন—আমাদের খোকাবাবু হবে লক্ষ্মীপুরের জমিদার!

পরাগের কাছে এ সংবাদ যেমনি বিস্ময়কর তেমনি অসম্ভব বলে মনে হ'ল। সে ক্ষীণ প্রতিবাদ জানিয়ে সলজ্জ কণ্ঠে বললে—না কাবু, আমি লক্ষ্মীপুরের জমিদার হবনা। রাজাবাহাদুরও নয়। আমি যদি ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হ'তে না পারি, তাহলে কাবু তোমার দোকানের সামনে ওই ফুটপাথে আমি বরং ঠিক তোমার মতই আর একটা মনিহারী দোকান করবো। সারাদিন ধরে রকম রকম জিনিস বেচবো নানা ধরণের খরিদ্দারকে।

কালীবাবু পরাগের কথা শুনে হেসে ফেললেন। বললেন, আচ্ছা খোকোন, সে পরামর্শ আমরা দুজনে মিলে আর একদিন করবো, এখন তুমি মণির মার সঙ্গে বাড়ী যাও। মা কেন ডাকছেন শুনে কাল এসে আমায় বোলো।

পরাগ এবার সন্দিগ্ধভাবে মণির মাকে জিজ্ঞাসা করলে—সত্যিই কি আমাকে কেউ খুঁজতে এসেছেন মণির মা? না, তুমি তামাসা করছো? মণির মা সজোরে ঘাড় নেড়ে বললে—হ্যাঁ দাদাবাবু, সত্যি। দেখবে চলো

পরাগ তখন মণির মার হাত ধরে 'কালীষ্টোর' থেকে বেরিয়ে পড়লো। বলে গেল—কাবু, আমি এখনি আসছি খবর নিয়ে, তুমি কিছু ভেবনা।

পথের চিঠি

শ্রীসত্যেন্দুকুমার কুণ্ডু

স্নেহের বড়দিদি,

যেদিন আসি সেদিন তোমার দেখা পাই নি। পথে কী ভাবে এসেছিলাম, তার একটা বর্ণনা লিখছি।

১৯৪০ ৩০শে সেপ্টেম্বর। রাত্রি ৮—৩০ হতে তখনও কয়েক মিনিট বাকী। রেলপথ আলোর আবরণ ভেদ করে অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে দূরে বহুদূরে। আঁকা বাঁকা পথ দিয়ে এখুনি মেলটি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করবে।

ট্রেণের হুইস্‌ল্ বেজে গেল, বন্ধুরা বিদায় নিল। তীক্ষ্ণ নীল সিগন্যালটার গা ঘেঁসে ট্রেণ ছুটে চললো। সেকেণ্ডক্লাস কামরাটায় আমি নিঃসঙ্গ নই। সহযাত্রী এক মাদ্রাজী, এক মাড়ওয়ারী ছাত্র এবং দুজন ধনকুবের মাড়ওয়ারী ভদ্রলোক। তাঁদের দেহে ফুলের মালা, ফুলের তোড়া।

সুখ নিদ্রায় যামিনী শীঘ্র কেটে যায়। রাত তখন চারটে—সহযাত্রী মাড়ওয়াড়ী দুজন গয়ায় নেমে যান। নিদ্রা যায় টুটে। আধ নিমীলিত চোখে শুয়ে থাকি নিঃসাড় হয়ে। ঠাণ্ডা শিরশিরে বাতাস আমার সর্বাঙ্গে চুম্বন করে।

ঊষা তার অবগুণ্ঠন তুলে পৃথিবীর দিকে তাকায়,—শান্ত, সংযত তার দৃষ্টি। প্রথম কিরণ প্রভাতের সূচনা জানায়। মনে হ'লো—

"বহুকাল পরে হঠাৎ যেন রে
অমানিশা গেল ফাটিয়া,
তোমার খড়্গ আঁধার মহিষে
দুখানা করিল কাটিয়া।
ব্যথায় ভুবন ভরিছে,
ঝর ঝর করি রক্ত-আলোক
গগনে গগনে ঝরিছে,
কেহ বা জাগিয়া উঠিছে কাঁপিয়া
কেহ বা স্বপনে ডরিছে।"

দিনের আলো সুপরিস্ফুট হয়ে ওঠে। স্বচ্ছ, নির্মেঘ আকাশে সূর্য ওঠে দীপ্ত হ'য়ে। ভ্রাম্যমান আমার মন—দুর্বার আকর্ষণ আমায় যেন টানতে থাকে। মনের সামনে অপূর্ব সুষমামণ্ডিত স্বপ্নময় জয়পুর সহস্র দর্শনযোগ্য শহরের ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসে আমায় সংবর্ধনা করতে। আমার চারপাশে গাড়ির দেওয়ালগুলি স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে যেন আমায় দেখে। জানালার বাইরে দেখতে পাই নদী নালা গাছপালা সবাই চলা শুরু করে দিয়েছে—শুধু আমায় নিয়ে গাড়িখানাই যেন দাঁড়িয়ে আছে।

এক একটা ষ্টেশন আসে সেজে গুজে তার সমস্ত সৌন্দর্যকে বিকশিত করে আবার পরক্ষণেই মিলিয়ে যায় পিছনে—যেন বর্তমান চলে যায় অতীতে। মোগলসরাই-এ খানসামা এসে জিজ্ঞাসা করে, দিবাহার হবে কিনা। তাকে জানিয়ে দিই ফতেপুরে ভাত ও মাংস চাই। বাইরে

দূরে বহুদূরে দু একটা গিরিশিখর দেখা যায়—অল্পই কুহেলিকাচ্ছন্ন। একটানা চলার শব্দে তন্দ্রায় চোখের পাতা জড়িয়ে আসে।

প্রায় বারোটার সময় খানসামা এসে জাগিয়ে দেয়। বেঞ্চের উপর সাজিয়ে দেয় আহার্য বস্তুগুলি। স্নান আগেই সারা হয়ে গিয়েছিল। ট্রেণ ছেড়ে দিলে খেতে বসি। ঘণ্টা দুই পরে ট্রেটা নিয়ে যায় খানসামা। মধ্যাহ্ন রৌদ্র নিস্তেজ হয়ে আসে। দূরে বনান্তর হতে রাখালে ফিরিয়ে আনে গাভীদল।

আমার মন উদাসী হয়ে ওঠে। নাম জানা পরিচিত স্টেশনগুলি ছুটতে ছুটতে আসে আমার ট্রেণটার কাছে।

গোধূলি আসে। আমার হাতে রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা'। অনুপম ছন্দবন্ধ মনোরম ভাবতরঙ্গ আমার চিত্তে হিল্লোল আনে। আমি একান্তমনে সে কল্লোলধ্বনি শুনি। সন্ধ্যা নামে, স্বচ্ছ নীলাম্বরী অঙ্গে—তার তারকা-খচিত উত্তরীয় আমায় উন্মনা করে তোলে। অচঞ্চল হয়ে আমি বসে থাকি। বাইরের বিরাট প্রকৃতিতে আমি পরিব্যাপ্ত। ভাষাহীন নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি। আমার মাদ্রাজী সহযাত্রীটি স্বদেশীয় বন্ধু পেয়ে তাঁর সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছেন। সারাদিন বিদেশী ইংরাজী ভাষায় কথা কয়ে কয়ে আমি যেন ক্লান্তি অনুভব করি। তাই কথা বলতে আর ইচ্ছা করে না।

বাইরে অমাবস্যার ঘন অন্ধকার। মাটি, গাছপালা, পাহাড়, নদীনালা সব একাকার। মনে হয় বাইরে মহাশূন্যে আকাশ আর পৃথিবী আজ প্রগাঢ় বন্ধুত্ব পাতিয়েছে। তারা দুয়ে মিলে আজ এক হয়েছে।

নামতে হবে তৈরী হয়ে নিই।

দিল্লী স্টেশন এসে গেল। সহস্র কলরোল—কুলি, পুরী মিঠাই, পানবিড়ি। আরোহীদের দৌড়াদৌড়ি কর্মচারীদের তৎপরতা। ট্রেণের সেই একটানা "সামনে চল সামনে চল" গান এইখানেই থামল। নেমে পড়ি ট্রেণ থেকে। কুলিকে আদেশ দিই তেরো নম্বর প্লাটফরমে বি, বি, সি, আই, এর ট্রেণে আমার মালপত্র নিয়ে যেতে। একটা দ্বিতীয় শ্রেণী বড় কামরায় একমাত্র আমি।

কী একটা যেন ভুলেছি, ও গাড়ী থেকে আনতে। কী? কিছুতেই মনে পড়ে না, অথচ মনে হচ্ছে যেন একটা কী!

কে যেন শত কলধ্বনি ক'রে জিজ্ঞাসা করে 'কী'।

সারা প্লাটফরমময় আমি চলে বেড়াই আর ভাবি।

কিছুক্ষণ পরে এ গাড়ি ছেড়ে দিল। বিছানা পেতে নিয়েছি—খাওয়া ও গাড়িতে ব'সেই সেরে এসেছি। একটা স্টেশন পেরিয়ে গেছি তখন মনে পড়ল—কী ফেলে এসেছি। বিশেষ কিছুই নয়—সামান্য টাইমটেবলটি পথে কোন স্টেশনে কিনেছিলাম। অতি সামান্য সন্দেহ নাই, কিন্তু তবু মনটা কেমন বিগড়ে থাকে।

শোবার উদ্যোগ করি। জানলাগুলি বন্ধ করে দিই—দরজায় ক্লিপ এঁটে দিই। আলোটা নিভিয়ে শুয়েছি—এমন সময় মনে পড়ল, আজ মহালয়া—দেবীর বোধন। কলকাতায় হয়ত' কত ধুমধাম হচ্ছে, তোমাদের বাড়িতেও।

ঘুম যখন ভাঙলো, ট্রেণ ছিল তখন দাঁড়িয়ে। আকাশের একটা দিক তখন একটু ফিকে হয়েছে। ঝোপ ঝাড়ের আড়ালে তখনও পর্যাপ্ত অন্ধকার লুকিয়ে-ছিল। তখনও সকল প্রাণী জেগে উঠে আঁধারের শান্তি নষ্ট করেনি। স্টেশনটির নাম 'বুন্দিকী'। ট্রেণটা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। দিনের আলো স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠলো। ট্রেণ চললো আকের ক্ষেত আর কাশের বনের মধ্য দিয়ে। একটা চেনা গন্ধ নাকে এসে লাগে। মাটির যে সৌরভ আছে তা টের পেলাম। মাটির সোঁদা গন্ধ আর ঘাসের ঘোলাটে বর্ণ আমায় স্মরণ করিয়ে দিল 'জব্বলপুরের' কথা। রেল লাইনের দু পাশে ময়ূর চ'রে বেড়াচ্ছে। একটা ছোট পাখী, অনেকক্ষণ ধরে ট্রেণটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উড়ে চললো, কিন্তু বেশিক্ষণ পারলো না। নিকটে ও দূরে ছোট বড় পাহাড়। প্রাণ আমার আনন্দে গান গেয়ে ওঠে—

হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচেরে
হৃদয় নাচেরে।
নব তৃণদলে ঘন বনছায়ে
হরষ আমার দিয়েছি বিছায়ে
পুলকিত নীপ-নিকুঞ্জে আজি
বিকশিত প্রাণ জেগেছে।

নীপ-নিকুঞ্জ নেই। তা হোক, তবু হৃদয় আমার নাচেরে।

জয়পুর আর বেশী দূরে নয়। জলযোগ সেরে নিয়ে পরিষ্কার হ'য়ে নিই। জয়পুর স্টেশন এসে গেছে, তবু মনে নেই। তখনও গুণগুণ করে পড়ছি—

হে নূতন, এসো তুমি সম্পূর্ণ গগন পূর্ণ করি'
পুঞ্জ পুঞ্জ রূপে,
ব্যাপ্ত করি', লুপ্ত করি', স্তরে স্তরে স্তবকে স্তবকে
ঘনঘোর স্তূপে।

হঠাৎ দেখি দরজা খুলে বাবা উঠছেন আমার কামরায়। বিস্মিত হ'য়ে বই বন্ধ করে তাড়াতাড়ি নেমে পড়ি। দাদু হাত বাড়িয়ে দেন। আমি হ্যাণ্ডসেক ক'রে বিলিতি কায়দায় অভিবাদন জানাই।

তোমাদের কুশল কামনা করি। আমার শুভ কামনা মনে রেখো।

ইতি—

তোমাদের—সতুদা

হিন্দু-মোসলমান

শ্রীতাপসরঞ্জন সরকার ও কে, এম্, ছায়ফুল হক

বাংলা মায়ের সন্তান মোরা,
বাংলা মোদের দেশ,
বাংলা ভাষায় কথা কহি মোরা,
পরি বাঙালীর বেশ।
'বাঙালী' নামেই পরিচিত সব,
বাঙলায় যা'রা রয়,
বাংলার জল বাতাসে বাড়িয়া,
বাঙলায় পায় লয়,
তবু কেন শুনি, বলে সব শুধু
"হিন্দু", "মোসলমান",
আজিও কি কেহ জানে নাগো, এরা
একই মা'র সন্তান?
এক মার পেটে জনম লভিয়া
মোরা দুটি সন্তান,
পারি কি কখনো বিভেদ জাগাতে
ভুলি রক্তের টান?
তবু কেন হেন মোরা পরস্পর,
বিদ্বেষ ভাব পুষি'—
হিংসার-বিষ-দহন-জ্বালায়
একে অন্যকে শুষি?

অবুঝ দু'ভায়ে ঝগড়া করিলে
তৃতীয়ে যেমন হাসে,
তেমনি মোদের রেষারেষি দেখে
বিজেতারা উপহাসে।
তবু কেন মোরা ভুল করি সবে,
নেই কি সংশোধন?
উত্তর দাও হে বাঙালী জাতি
এ ভুল ত' অকারণ!
একজাতি হ'তে উদ্ভূত মোরা
এক লহু ধমনীতে,
এক ভাষাতেই কথা কহি মোরা
কাজ করি এক ভিতে।
ভুলে' যাও সবে পূর্বের স্মৃতি
ভোল গো হিংসা দ্বেষ,
বল বল মোরা 'বাঙালী সবাই'
নাহি ভেদ ভাব লেশ।"
বিভেদ ভুলিয়া বাঙলীরা সব,
একত্র হ'বে যবে—
সেই দিন জেনো এ 'বাঙালী জাতি'
জগতে শ্রেষ্ঠ হ'বে।

অভ্যাস

শ্রীঅনন্তলাল মিত্র

অভ্যাস আমাদেব পরম বন্ধু অথবা আমাদেব পরম শত্রু। আমরা অভ্যাসেরই দাস—যাহা কিছু আমাদেব কাজ বা গতি সবই অভ্যাস গত। সুতরাং আমবা নানারূপ অভ্যাসের তাল বা পিণ্ড ভিন্ন আব কিছুই নই।

মনোবিজ্ঞান বলেন কার্য আমরা সম্পন্ন করিতেছি বটে, কিন্তু বিনা প্রযত্নেই সম্পন্ন হইতেছে। কার্যেব বিভিন্ন অংশগুলি জ্ঞান বিবেচনার দ্বাবা ভাবিয়া দেখার আবশ্যক হয় না, ইচ্ছা মাত্রই কার্যটী সম্পাদিত হয়। অর্থাৎ যে কোন কাজ একবার বা একাধিকবার করা হইয়াছে পুনরায় সেই কাজ করাব যে প্রবৃত্তি বা ঝোঁক তাহাকেই আমরা অভ্যাস বলি। এই যে ঝোঁক ইহা আসে আমাদের স্নায়ুমণ্ডলী থেকে। কারণ পুনঃ পুনঃ কোন কার্য সম্পাদন করিলে স্নায়বিক কেন্দ্রসমূহ সেই অভ্যাসের অনুকূলে পরিবর্তিত হইয়া থাকে। সুতরাং অভ্যস্ত কার্য সম্পাদনেব সময় আর জোব দিতে হয় না বা কষ্ট লাগে না। যেমন একখানি কাগজ বা একটী কোট যে ভাবে প্রথমে দু'একবার ভাঁজ করা হয় ঠিক সেই ভাঁজে ভাঁজে তাবপব যেমন বরাবর ভাঁজ পড়ে ঠিক তেমনই আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীকে যে ভাবে খেলান বা সঞ্চালন করা হয় ঠিক সেইভাবেই তাহারা গঠিত হ'য়ে থাকে। সেই কারণেই **Habit is the second nature** বলে, ববং **Ten times nature** বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

কি ভাবে আমরা অভ্যাস গঠন করিতে পারি? অথবা কুঅভ্যাস ত্যাগ ও তৎস্থানে সু অভ্যাস গঠন করিতে পারি? আমাদের কিন্তু এমন শক্তি নাই যে আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি—আমরা আমাদের ইচ্ছানুযায়ী অভ্যাস পবিবর্তন কবিব বা করিব না, কারণ অভ্যাসগুলিব এমনই মজা যে যখন একবার কোন কিছুতে অভ্যস্ত হই সে অভ্যাস ববাবরই চলিতে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পাবে—ভোবে উঠার অভ্যাস যাহাব নাই সে কখনই ভোরে উঠিতে পারেনা। সে ববাবরই বেলা পর্যন্ত ঘুমাইবে। আবার যে খুব প্রত্যূষে উঠে সে কখনও বেলা অবধি বিছানায় শুইয়া থাকিতে পাবে না। তবে কি অভ্যাস পরিবর্তন সম্ভব নয়? নিশ্চয়ই সম্ভব। এই অভ্যাস হচ্ছে আমাদের প্রকৃতির এমন একটী নিয়ম যাহার অনুশীলনে আমরা যথোচিত সময় ও শ্রম ব্যয় কবিলে সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর নৈপুণ্য ও পারদর্শিতা দেখাইতে পাবি। অভ্যাস সর্বদাই স্বতশ্চল। যোগশাস্ত্র মতে অভ্যাস ও বৈবাগ্যেব দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ সম্ভবপর হইতে পারে।

চিত্ত হইতে বজোবৃত্তি ও তমোবৃত্তি বিদূবিত করিয়া চিত্তকে কেন্দ্রীভূত ও বিশুদ্ধ কবিবাব প্রযত্নই অভ্যাস। দীর্ঘকাল নিবন্তব আচরিত হইলে এই অভ্যাস অর্জিত হয়। তপস্যা, ব্রহ্মচয, বিদ্যা ও শ্রদ্ধাব দ্বাবা এই অভ্যাস সুসম্পন্ন হয়। যোগশাস্ত্রে এই হইল অভ্যাসেব সংজ্ঞা। ব্যাকরণ মতে অভ্যস্ত ধাতুব পূর্বভাগকে অভ্যাস বলে। এখন মনোবিজ্ঞান মতে সু-অভ্যাস গঠনের যে কয়টি নিয়ম—তাহা এইগুলি :—

১। পুবাতন অভ্যাস ত্যাগ কবিয়া তাহার স্থলে নূতন অভ্যাস গঠন করিবাব চেষ্টা কর।

২। নূতন অভ্যাসের আদর কর ও পুরাতন অভ্যাসকে ঘৃণা কর।

৩। ঈপ্সিত কর্ম যেন মনের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে নির্ধারিত থাকে।

৪। দৃঢ় সঙ্কল্পে ও প্রেরণায় নূতন অভ্যাস আরম্ভ কর

৫। নূতন অভ্যাস আরম্ভের সময় সতর্ক হও পুরান অভ্যাস যেন কিছুতেই ফিরিয়া না আসে। নূতনের দিকেই সর্ব্বদা মন দিবে।

৬। অভ্যাসগুলি এমনভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ কর যাহাতে পরের পর একটা নিয়মের বাঁধন ও টান থাকে, কারণ, অভ্যাসগুলি পরস্পর পৃথক নয়—তারা পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে আবদ্ধ। যেমন—তৎপরতা বা সময় নিষ্ঠা অনেকগুলি অভ্যাসের সংযোগে তৈরী—ঠিক সময়ে উঠা, দাঁত মাজা, মুখধোয়া, সাজ পোষাক পরা, সত্বর প্রাতঃভোজন সমাপ্ত করা ও বইগুলি গুছাইয়া বিদ্যালয়ের দিকে যাত্রা করা।

৭। নূতন অভ্যাস গঠন করিতে হইলে প্রথম সুযোগেই তাহা ধরিতে হইবে—কখনও প্রথম সুযোগ ছাড়িবে না।

৮। প্রতিদিন অল্প অল্প করিয়া পুরাতন অভ্যাসকে নূতন অভ্যাসে পরিবর্তিত করিতে চেষ্টা কর।

অভ্যাসের উপকারিতা:—১। যে পাঠে বা যে কাজে চিত্তাকর্ষক কিছু থাকে না তাহাতে আপন শক্তির ইচ্ছা দ্বারা মন দেওয়ার অভ্যাস সত্যই প্রশংসনীয়।

ইহার ফলে নানারূপ বাধাবিঘ্নর মধ্যেও অধ্যবসায় আয়ত্ত করিতে শিখায়। অধ্যবসায়ের অভ্যাস সর্বদাই শ্লাঘ্য। অধ্যবসায়ের গুণেই কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র ভবিষ্যৎ জীবনে "বিদ্যাসাগর" হইতে পারিয়াছিলেন।

২। অভ্যাসগুণেই আমরা আমাদের ব্যক্তিত্ব ফুটাইতে পারি। অভ্যাস ব্যতিরেকে ব্যক্তিত্ব অর্জনের উপায় নাই। আমাদের অভ্যাসগত কার্যাবলীর দ্বারা আমরা আমাদের স্ব স্ব চরিত্রের প্রাধান্য ও বৈশিষ্ট্য দেখাইতে পারি।

৩। অভ্যাসের ফলে আমরা কোন কাজে বিরক্ত হই না, বা কাহারও অবাধ্য হই না। ইহাকে বলা হয় সমাজের Balance Wheel বা সামঞ্জস্যের চাকা। এরূপ যদি না হইত তাহা হইলে পৃথিবীতে শৃঙ্খলা থাকিত না। সর্বত্রই বিশৃঙ্খলতা ও অরাজকতা প্রকাশ পাইত।

অভ্যাসের যেমন গুণ আছে তেমন দোষও আছে। কথায় বলে অভ্যাসের দোষ। অভ্যাসের দোষ হইতেছে এই যে, ইহা আমাদের চরিত্র বিকাশকে বাধা দেয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় ১৯৪০ সাল শেষ হইয়া গেল, তারপর যেই ১৯৪১ সাল পড়িল তোমাদের লিখিতে হইবে ১৯৪১ সাল। কিন্তু তোমরা কলম ধরিলে গত বার মাসের অভ্যাসবশতঃ দু চার বারও হয়ত ভুল করিয়া লিখিবে ১৯৪০।

সৈন্যগণকে "Attention" বলিলে তাড়াতাড়ি তাহারা সোজা হইয়া দণ্ডায়মান হয়, একজন সৈন্য আহারে বসিয়াছে—খাদ্য তুলিয়া মুখে দিতেছে—এমন সময় একজন আমোদপ্রিয় ব্যক্তি বলিয়া উঠিল "Attention"। অমনি সৈন্যটি তৎক্ষণাৎ খাদ্য ফেলিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল। একেই বলে অভ্যাসের দোষ বা ভুল।

কেহ সকালে টেবিলে কাজ করিতে বসিবার পূর্বে টেবিলের উপর হইতে ঘড়িটী লইয়া প্রত্যহই দম দিয়া থাকে। যখন এবিষয়ে তাহার অভ্যাস জন্মিয়া যায়, তখন আর ভাবিয়া চিন্তিয়া ঘড়িটি লইতে হয় না। টেবিলের কাছে আসিবামাত্র আপনি ঘড়িটি লয় ও অজ্ঞাতসারে দম দেয়। বস্তুতঃ আমরা যাহাতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ি তাহাতেই আমাদের ইন্দ্রিয়শক্তি নিবদ্ধ থাকে সুতরাং অভ্যাসমাত্রই আমাদের আত্মশক্তি বিকাশের বাধা স্বরূপ হইয়া উঠে।

কিন্তু আমরা দেখিতেছি অভ্যাসের দ্বারাই যখন সামাজিক মানুষের সব কাজ চলিতেছে তখন সু-অভ্যাস গঠন করাই আমাদের কর্তব্য। বাল্যকাল এমন কি যৌবনকালও অভ্যাস গঠনের প্রশস্ত সময়। এই সময়ে যিনি যেমন ভাবে গঠিত হইবেন তিনি ঠিক সেইরূপ ভাবে সংসারে দাঁড়াইতে পারিবেন।

ক্ন্যুট হ্যাম্‌সুন্‌

শ্রীঅসীম দত্ত

নরওয়ে দেশটা খুব ছোট হলে কি হবে, জ্ঞান-বিস্তারের দিক দিয়ে নরওয়েকে বড় দেশের সঙ্গে সমানভাবে তুলনা করা যেতে পারে। এখানকার শতকরা ৯৯ জন লোক শিক্ষিত। সাহিত্য জগতেও এর নাম খুব প্রচারিত।

ক্ন্যুট্‌ হ্যাম্‌সুনের নাম শোনে নি, এরকম লোক শিক্ষিত জগতে আছে কিনা সন্দেহ। আমরা 'ন্যুট হ্যাম্‌সুন' বলি, কিন্তু ন্যুট বলা ভুল হয়। বলা উচিত ক্ন্যুট। 'Hunger' অথবা 'Growth of the Soil' তাঁর পরিচয়-পত্রের পক্ষে যে কোন একখানি বইই যথেষ্ট। সবশুদ্ধ জীবনে তিনি মোট ৪০টা উপন্যাস লিখেছেন, প্রত্যেকটাই এক একটা রত্ন।

১৮৫৯ সালে ৪ঠা আগস্ট নরওয়ের উত্তরে 'লম' গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। পৃথিবীর অন্যান্য মহাপুরুষগণের মত হ্যাম্‌সুন্‌ও ছিলেন গরীব। তাঁর পিতা অতি দরিদ্র ছিলেন। শৈশবে তাঁকে দারিদ্র অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে দিন কাটাতে হয়েছিল। হ্যাম্‌সুনের কাকা ছিলেন একজন ধর্ম্মযাজক। শিশু হ্যাম্‌সুন্‌ সেখানেই খেলা করতেন। গির্জার পাশে গোরস্থানে কবরের উপর ছুটোছুটী করে দিন কাটাতেন। এই ভাবে তাঁর ছেলেবেলাটা কেটেছিল।

হ্যাম্‌সুনের আসল নাম কিন্তু ক্ন্যুট্‌ পিটারসন্‌। তাঁর পিতার হ্যাম্‌সুণ্ড উপসাগরের তীরে একখানি ছোট্ট কুটির ছিল। তাই থেকে তাঁর নাম হ্যাম্‌সুন্‌ দাঁড়িয়ে যায়। হ্যাম্‌সুন্‌কে লেখাপড়া শিখাবার মত তাঁর পিতার যথেষ্ট টাকাকড়ি ছিল না, তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ দেখবার মত সুযোগ জীবনে তাঁর ঘটে ওঠেনি। অথচ সেই হ্যাম্‌সুনের বই সুধী সমাজে আজ পরম আদরণীয়।

হ্যাম্‌সুনের বয়স যখন ষোল, তখন তিনি এক মুচীর অধীনে জুতা সারাবার কাজ শিখতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর প্রকৃতি ছিল অত্যন্ত চঞ্চল, তাই বেশী দিন এ কাজও তিনি করতে পারেন নি। মুচীর কাজ ছেড়ে দেবার পর কিছুদিন তিনি মিস্ত্রীর কাজ আরম্ভ করে-ছিলেন। তখন তাঁকে রাস্তা মেরামত করতে হ'ত। এর পরে কিছুদিন তিনি পাথর ভাঙ্গার কাজ করেন। তারপর তিনি জাহাজে খালাসীর কাজে ভর্তি হলেন। স্বাস্থ্য তাঁর ভাল ছিল, শরীরে শক্তিও ছিল প্রচুর। তাই তাঁর পক্ষে কোনও কাজ পাওয়া মোটেই আশ্চর্য ছিল না।

ছেলেবেলা থেকেই হ্যাম্‌সুনের আমেরিকার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। হ্যাম্‌সুন্‌ জাহাজের কাজে আমেরিকায় এসে হাজির হলেন এবং সেইখানেই রয়ে গেলেন। আমেরিকায় তিনি এক বছর কাটিয়ে দিলেন। তারপর ১৮৮৬ সালে আবার তিনি ক্রিশ্চানিয়ায় ফিরে এলেন। তিনি এক জায়গায় কখনও স্থিরভাবে থাকতে পারতেন না। এক বছর পরে আবার আমেরিকায় পাড়ি দিলেন এবং এবার সেখানে তিনি সুদীর্ঘ চারটী বছর বাস করলেন। প্রথমে তিনি চাষবাসের কাজে মন দিলেন। এর পরে তিনি কিছুদিন শিকাগোতে ট্রাম কন্‌ডাক্টরের কাজ করেন।

হ্যাম্‌সুনের বিখ্যাত জীবনীকার লারসেন্‌ এক জায়গায়

লিখেছেন—"একবার ক্ষুধার জ্বালায় অতিষ্ঠ হ'য়ে তিনি ভগবানকে অভিসম্পাত করেন! একদিন তিনি একটা কসাইয়ের দোকান থেকে কুকুরকে খাওয়াবার নাম করে এক টুকরো মাংস কোটের নীচে লুকিয়ে নিয়ে আসেন। তারপর আড়ালে এসে তিনি সেটাকে চুষতে থাকেন। কাঁচা মাংসের বিস্বাদে তাঁর শরীর রী-রী করতে থাকে। দু' চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় জল গড়িয়ে পড়ে।" জীবনকে তিনি ভোগ করতে চেয়েছিলেন তার পূর্ণতার মধ্য দিয়ে। তাই শত কষ্টের মধ্যেও হ্যাম্‌সুন্‌কে এক দিনের জন্য অসন্তুষ্ট হ'তে দেখা যায় নি।

এর কিছুদিন পরে ১৮৮৮ সালে তাঁর প্রথম বই 'Hunger' একটা ডেনিস্ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হ'তে থাকে। তখন উপন্যাসটার নাম ছিল 'Sult' ১৮৯০ সালে উপন্যাসটা যখন বইয়ের আকারে প্রকাশিত হয়, তখন এটার নাম দেওয়া হয় 'Hunger' বইটা তাঁর দুঃখময় বাল্য ও যুবক জীবনের কাহিনী। 'Hunger' যখন প্রকাশিত হ'ল, তখন হ্যাম্‌সুন্ পাঠক-মহলে সম্পূর্ণ অপরিচিত। কিন্তু কিছুদিন বাদেই তাঁর নাম সুধী-সমাজের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই সময় থেকে তাঁর জীবনের চাকা একদম ঘুরে গেল। ভবঘুরে হ্যাম্‌সুন্ হলেন এবার গৃহী। ক্রিশ্চানিয়াতে তিনি বাস করতে আরম্ভ করলেন এবং গ্রন্থরচনায় মন দিলেন।

এখন থেকে হ্যাম্‌সুন্ তাঁর বেশীর ভাগ সময়ই লেখা-পড়া করে এবং বই লিখে সময় কাটাতে লাগলেন। কর্মী ও শ্রমিক হ্যাম্‌সুন্ দেখা দিলেন সরস্বতীর বরপুত্র হ'য়ে বিশ্ববিশ্রুত সাহিত্যিক রূপে।

গত মহাযুদ্ধের সময় 'Growth of the Soil' প্রকাশিত হয়। এটাকে হ্যাম্‌সুনের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলা যেতে পারে। ১৯২০ সালে তিনি 'Growth of the Soil' বা 'Markens Grode' বইটার জন্য নোবেল্ প্রাইজ উপহার পান। হ্যাম্‌সুনের রচনার সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হ'চ্ছে তাঁর সরল ও সহজ ভাব প্রকাশ ভঙ্গী।

যে অপরিচিত গৃহহীন, অন্নহীন, হ্যাম্‌সুন্ একদিন পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন, কসাইয়ের দোকানে কুকুরকে খাওয়াবার নাম ক'রে সামান্য এক টুকরো মাংস ভিক্ষা করে আড়ালে গিয়ে চুষতেন। নানা দেশ-বিদেশে নিম্নস্তরের শ্রমিকের কাজকর্ম ক'রে দু' মুঠো পেট ভরাবার অন্ন জোটাতেন, আজ সেই হ্যাম্‌সুন্ বিশ্বমানবের কাছে নমস্য। বড় হবার আন্তরিক আগ্রহ থাকলে দুঃখ দারিদ্র তাকে ব্যর্থ করতে পারে না।

কৃপার বালাই

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

কৃপা নাহি চাই, কৃপার জন্য করি নাক সাধাসাধি,
তোমার কৃপায় মত্ত গজেরে রাখ প্রভু শুধু বাঁধি।
কোন প্রার্থনা নাই শুধু শোনো এইটুকু নিবেদন,
খোঁজ ত রাখ না নিঃশেষ হলো দেশের কমল বন।
কৃপা নাহি চাই, তব খর-তাপ টেকো মাথাতেও সই
তব তাপে, বাবু, তপ্ত বালুতে মোরা বড় কাবু হই।

১

পলাতক

কুমারী বেলা গঙ্গোপাধ্যায়

(গ্রাহক নং ৩০১২)

এক

বিহারের অপরিচ্ছন্ন শহরগুলোর মধ্যে এই শহরটা তবু একটু ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে। এখানে কাগজের এক এজেন্সিতে সে কাজ করে। বিনয় তার নাম। সারাদিন ঘুরে ঘুরে কাগজ ফেরী করাই তার কাজ—স্টেসনে, খেলার মাঠে, ক্লাব ইত্যাদিতে রোজই সে যায়। বড় চঞ্চল সে, চোখ দুটো তার কৌতূহলে ভরা।

শহরের সীমানা ছাড়িয়ে দূরে রেলগাড়ীর সাইডিং। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে কতকগুলো ক্লান্ত ইঞ্জিন, শিস দেয়; 'সোঁ সোঁ' করে, তারা বিশ্রাম নেয় সারাদিনের ক্লান্তির পর। সাইডিংয়ের পাশেই উঁচু পাড়-ওলা রেলওয়ে বাঁধের গা বেয়ে নকল ঝরণা—অবিশ্রাম জল ঝরেই চলেছে—একটানা।—তারই ধারে সে রোজ যায়।

শহর থেকে শীতে আগন্তুক চেঞ্জারদের মধ্যে দু'একজন বেড়াতে যান সেখানে। তাদের ডেকে সে কাগজ পড়ায়, আর নিজে তাই মন দিয়ে শোনে। তা'র সাথে পরিচয় হ'ল এমনি করেই। সেদিন কেউ তখনও আসেনি। কাগজ নিয়ে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে সে বসেছিল। তার কাছে যেতেই সে বল্‌ল—'কাগজটা একটু পড়বেন'?—তার নেশা তো তখনও জানতাম না। পড়তে লাগলাম তা'র হাত থেকে কাগজখানা নিয়ে। তারপর থেকেই পরিচয় ঘনিষ্ট হ'য়ে এলো। আমি কাগজ পড়তাম আর সে মন দিয়ে তাই শুনতো, রোজই। মাঝে মাঝে ডাগর চোখের পরিপূর্ণ দৃষ্টি আমার মুখে মেলে প্রশ্ন করত। অদ্ভুত ধরণের খাপছাড়া তা'র প্রশ্ন—'জাপান বড় না ইংল্যাণ্ড বড়? আমরা বাংলা না শিখে ইংরিজি শিখি কেন? কল্‌কাতা কত বড় শহর? বোম্বাইয়ে জাহাজ দেখেছেন আপনি? কাগজে যে হিমালয় অভিযানের কথা লেখে সে কি?... আমাদের এই পাহাড়ের চেয়েও বড়? সুভাষ বোস্‌ কেমন লোক? দুঃখীর দুঃখ বোঝে কি? গান্ধীজী কি আমাদেরই মত গল্প করতে পারেন? ইত্যাদি।

দুই

তার সঙ্গে পরিচয়টা এমনি করেই গাঢ় হয়ে ওঠে। শহরে একজন জাপানী শিল্পী এসেছে,—ছবি আঁকে। খুব সুন্দর ছবি। আমাদের দেশের বড় বড় নেতাদের ছবি, দেশ বিদেশের নেতাদের ছবি, সমুদ্র, পাহাড় আর শিকারের অনেক রকমের ছবি। সে আমায় টেনে নিয়ে যায় সেখানে। চারিদিকে সুন্দর সুন্দর 'অয়েল পেন্টিং'—ওয়াশিংটন্‌, গোর্কী, জগদীশ, রামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, সরোজিনীনাইডু, সুভাষচন্দ্র, জহরলাল—আরও কত কি? ছবিগুলি দেখিয়ে সে নানারকম প্রশ্ন করে—যথাসম্ভব উত্তর দিই।

তাদের জীবনের সাথে পরিচিত হ'তে সে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে ওঠে, বলে "ওঁরা আমাদেরই দেশের লোক?" বলি 'ওঁরা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন ওঁদের সব ভাবনা দেশের জন্য, ওঁরা আমাদের দেশের গৌরব।"—তার কুতূহলী চোখ দুটো বিস্ময়ে জ্বলে ওঠে। মন দিয়ে সে সব শোনে তারপর মাথা দুলিয়ে বলে—"তুমি অমন হ'তে পারলে না,—ধ্যেৎ।"

তিন

কয়েক মাস পরে।—

কাগজ নিয়ে সে বসেছিল আমারই প্রতীক্ষায়। কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস ক'রলাম "এমন চুপ করে যে আজ?" তার চোখ দুটো ছলছল্ করে উঠ্‌ল। আমার চোখের সামনে কাগজের একটা পৃষ্ঠা তুলে ধরে বল্‌ল—"আমার আর বড় হওয়া হ'ল না।" কাগজে হারান প্রাপ্তি নিরুদ্দেশের ঘরে তারই মত একটা ছবি, নীচে লেখা—

"ভাই বিনু—যেখানে থাক শিগ্রী চলে এস, তোমার মা তোমার শোকে মরণাপন্ন।

ইতি দাদু—।"

সেদিন তা'র কাছে সবই শুনলাম, সে পলাতক। বড় হওয়ার নেশায় সে পলাতক, আশ্চর্য ছেলে সে। অনেক বোঝালাম, বললাম বাড়ী ফিরে যাও ভাই, মায়ের চোখের জল আগে মুছিয়ে দাও, তারপর তোমার বড় হওয়া কেউ আটকাবে না। সে অবাক হয়ে বল্‌ল—"যারা বাড়ীতে থাকে, যা'রা মায়ের কাছে আদরে সুখে থাকে, তারাও কি বড় হয়?" অদ্ভুত প্রশ্ন তার। তবু তাকে বোঝালাম "নিশ্চয়ই।"

গোপনে গোপনে তার দাদুর কাছে খবর পাঠালাম, দাদু এলেন, কিন্তু তার খোঁজে গিয়ে দেখি সে নেই, সে পলাতক। বড় হওয়ার নেশায় তাকে পেয়েছে।

* * *

আজও জ্যোৎস্না রাতে ইঞ্জিন সেডের ভেতর চাপা আর্তনাদ শুনি, আজও রেলওয়ে বাঁধের পাশে নকল ঝরণার ছল্‌ছল্ শব্দ শুনি,—মনে পড়ে খালি তার কথাগুলো—"আমার আর বড় হওয়া হ'লো না, যারা বাড়ীতে থাকে তা'রা কি বড় হয়? যা'রা মায়ের কাছে আদরে সুখে থাকে তারাও কি বড় হয়?"

(১)

তোমরা এ্যাড্‌ভেঞ্চারের গল্প শুনতে ভালবাস, না? এস, আজ আমি তোমাদের সত্যিকারের এ্যাড্‌ভেঞ্চারের গল্প শোনাই।

এ্যাড্‌ভেঞ্চারের প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরদিনের, তাই যুগে যুগে মানুষ তৈরী করেছে এ্যাড্‌ভেঞ্চারের গল্প, যে গল্পের প্লট গড়ে উঠেছে অ-জানাকে জানবার, অ-দেখাকে দেখবার, অপরাজিতকে পরাজিত করবার জন্যে মানুষের অশান্ত চেষ্টার এবং আত্মদানের ইতিহাসে। সেই সব কাহিনীই আজ আমি তোমাদের শোনাব।

অনেক দিন আগে এই পৃথিবীতে যে সব লোক বাস করত, পৃথিবী সম্বন্ধে তাদের ধারণা ছিল ভারি মজার। বর্তমান কালের মানুষদের ধারণা থেকে তা ছিল সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আজকাল আমরা পৃথিবীকে যত বড় বলে জানি তখনকার কালের লোকেরা তাকে তার চেয়ে অনেক ছোট বলে মনে করত। এমন কি, অনেকদিন আগেকার

লোকেরা তাদের দেশকেই সমস্ত পৃথিবী বলে মনে করত। যেমন, ব্রিটেনের লোকেরা মনে করত যে ব্রিটেনটাই বুঝি পৃথিবীর সব। আবার ভারতবর্ষের লোকেরা মনে করত যে ভারতবর্ষের বাইরে বুঝি আর পৃথিবীর সীমা নেই। কিন্তু তখন ছিল না পৃথিবীতে ষ্টীমার, বেলগাড়ি, মটর বা এরোপ্লেন যাতে চড়ে মানুষ অল্প সময়েব মধ্যে অনেকদূর যেতে পারত। সুতরাং তখনকার লোকেদের পক্ষে খুব বেশী দূর যাওয়া সম্ভব হত না। তাই আশেপাশেব যেটুকু যায়গা তারা দেখতে পেত সেইটেকেই তাবা সমস্ত পৃথিবী বলে ধরে নিত। তাদের দৃষ্টিসীমার বাইবে যে একটা বিশাল পৃথিবী পড়ে আছে তা তারা কল্পনাও করতে পাবত না। .

পৃথিবীর আকার সম্বন্ধে যখন মানুষেব জ্ঞান আর একটু বাড়ল, তখন তাবা মনে কবলে যে এসিয়ার খানিকটা ও ইউরোপেব খানিকটা—এই বুঝি সমস্ত পৃথিবী। এব কারণ এই যে তখন মানুষ একটু একটু কবে নিজেদেব দেশেব গণ্ডী ছেড়ে বেবোতে শিখেছিল, এবং তখনকাব যানবাহন তাদেব পৃথিবীব ওই অংশ-গুলোতেই নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। পৃথিবীব এই অংশের বাইবে তাবা তখনও যেতে পাবে নি।

ক্রমে ক্রমে মানুষ তার পরিচিত জগৎ ছেড়ে একটু একটু করে দূবে যেতে আরম্ভ কবলে এবং তাব ফলে একটু একটু কবে নতুন দেশ আবিষ্কাব হতে লাগল। তখন মানুষের মনে দেশ আবিষ্কারেব স্পৃহা একটু একটু করে জেগে উঠল।

জলপথেব যাত্রার জন্যে মানুষ প্রথমে ব্যবহার কবত ভেলা। মানুষেব প্রয়োজনীয়তাব ফলে ভেলাব উন্নতি হয়ে সৃষ্টি হল নৌকোব। ক্রমে ক্রমে নৌকোরও উন্নতি হল এবং সৃষ্টি হল জাহাজেব। প্রথমে যে জাহাজ তৈবী হল তা চলত কতকটা দাঁড়ের এবং কতকটা পালেব সাহায্যে। দুর্দান্ত মানুষেরা এই ধরণের জাহাজ নিয়েই পাড়ি দিতে শুরু করল তরঙ্গসংকুল সমুদ্রপথে—দূরে দূরান্তরে। আবিষ্কারের নেশায় উন্মত্ত এই সব লোকেরা তাদের প্রাণ তুচ্ছ করতেও ভয় পেত না। অনেককে অনেক সময় এর জন্যে প্রাণ হারাতেও হয়েছিল। কিন্তু তবুও মানুষ ভয় না পেয়ে যুগে যুগে সমুদ্রপথে পাড়ি দিয়েছে বিভিন্ন দেশ আবিষ্কারের জন্যে। সেই সব দুরন্ত লোকেদের আভিযানের কথাই আজ আমি তোমাদের বলছি।

* * * *

এপর্যন্ত যতদূব জানা গেছে, পৃথিবীর অজানা দেশ জয় কববাব জন্যে সর্বপ্রথম যাত্রা করেছিল ফিনিশিয়ানরা। তাবা ছিল উত্তব প্যালেস্টাইনের লোক। সমুদ্রে ঘুরে বেড়ান এদেব একটা নেশাব মত ছিল। অবশ্য শুধু শুধুই যে তাবা ঘুবত তা নয়, তাদের উদ্দেশ্য ছিল ব্যবসা। তাবা করত কি, ভূমধ্য সাগবেব তীর ধবে ধরে জাহাজে করে ঘুরে বেড়াত। ঘুবতে ঘুবতে সমুদ্রতীরে যে নতুন দেশ তাবা দেখতে পেত সেখানে নেমে ব্যবসা করত, এবং অনেক সময় দলবল নিয়ে গিয়ে অনেক দেশ জয়ও কবত। এই বকম ভাবে তাবা ভূমধ্যসাগরের তীবে অনেক উপনিবেশ স্থাপন কবেছিল এবং অনেক দেশে ব্যবসা কববাব আয়োজন আবম্ভ কবেছিল।

এ সব ছোটখাট যাত্রাব কথা ছেড়ে দিলে, প্রথম বিখ্যাত সমুদ্রযাত্রা হয়েছিল খৃস্ট পূর্ব্ব ৫২০ সালে। এই যাত্রাব নায়ক ছিলেন হ্যানো নামে একজন নাবিক। তিনি ছিলেন উত্তব আফ্রিকার কার্থেজেব লোক এবং কার্থেজ ছিল ফিনিশিয়ানদেব একটা খুব বড উপনিবেশ। ষাটটি বড বড জাহাজ নিয়ে হ্যানো যাত্রা করলেন জিব্রাল্টার বন্দব থেকে। আফ্রিকার সমুদ্র উপকুল ধবে তিনি দক্ষিণদিকে এগোতে লাগলেন। তাঁব উদ্দেশ্য ছিল কার্থেজবাসীদেব ব্যবসা ক্ষেত্র প্রসারিত কবা—নতুন নতুন দেশ আবিষ্কাব করে সেখানে ব্যবসা করা। কিন্তু এই দুঃসাহসী নাবিকদেব ভাগ্যে ব্যবসা ছাড়া আরও অনেক কিছু লেখা ছিল। কয়েকটা যায়গা আবিষ্কার কবেই তাঁরা ক্ষান্ত হলেন না। ব্যবসাবুদ্ধি তাদেব আরও নতুন দেশ আবিষ্কারেব জন্যে প্রণোদিত কবলে। ফলে তাঁরা এগোতে লাগলেন। অবশেষে সাত দিন পরে তাঁরা একটা অজানা দ্বীপে গিয়ে হাজির হলেন। দ্বীপের মধ্যে তারা কয়েকটা দিন বিশ্রাম নিয়ে কাটিয়ে দেবেন বলে মনে করলেন। কিন্তু সেদিন রাত্রে এক অদ্ভুত ঘটনা তাদের দ্বীপ ছেড়ে পালাতে বাধ্য করল। সন্ধ্যের পর সকলে জাহাজে বসে গল্পগুজব করছিলেন। গল্পগুজব করতে

করতে যখন অন্ধকার একটু গভীর হয়ে গেল, তখন হঠাৎ ঢাকের শব্দ শুনে তাঁরা চমকে উঠলেন। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে ঢাকের শব্দ আসছে দ্বীপের ভিতর দিক থেকে। তাঁরা সকলে দ্বীপের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। সেখানে আর এক বিস্ময় তাঁদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। তাঁরা দেখতে পেলেন যে দ্বীপের মধ্যে জায়গায় জায়গায় বনের ফাঁকে ফাঁকে এবং কোথাও বা ছোট ছোট গাছ-পালার মাথার উপর দিয়ে ভীষণ আগুন। ব্যাপারটা কি তা অনুমান করতে তাঁদের দেরী হল না। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে অসভ্য মানুষদের কোনও দ্বীপে তাঁরা এসে পড়েছেন।

পরের দিন সকাল হতে না হতেই তাঁরা জাহাজ ছেড়ে দিলেন। কিন্তু নতুন দেশ আবিষ্কারের নেশা তাঁদের উত্তেজিত করে তুলেছিল। তাই দেশে না ফিরে তাঁরা আরও দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চললেন। এবার তাঁরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করলেন তা আগের চেয়ে ভয়ঙ্কর। পথে যেতে যেতে তাঁরা এক জায়গায় দেখলেন যে সমুদ্রতীর থেকে কিছু দূরে একটা পাহাড়ের গা বেয়ে আগুনের স্রোত নেমে আসছে, এবং বিশেষ একটা জায়গায় আগুনের শিখা একেবারে আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। ব্যাপারটা কি তা তাঁরা কিছুতেই বুঝতে পারলেন না। কোন অপদেবতার কাণ্ড মনে করে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন।

তিন দিন পরে তাঁরা আর একটা দ্বীপে পৌঁছুলেন (আজকাল এটিকে শের্বো দ্বীপ বলা হয়)। দ্বীপটি বেশ বড়। এর মধ্যে ছিল একটা মস্ত বড় হ্রদ। তার মধ্যে আবার ছিল আর একটি দ্বীপ (বর্তমানে এটিকে মেকলে দ্বীপ বলা হয়)। দ্বিতীয় দ্বীপটিতে তাঁরা কতকগুলো বন্য লোমশ লোক দেখতে পেলেন। (এগুলি শিম্পাঞ্জী ছাড়া আর কিছুই নয়)। কিন্তু তাদের সঙ্গে আলাপ করবার মত দুঃসাহস তাঁদের ছিল না। তাই এই পর্যন্ত দেখে শুনেই এবার বাড়ীর দিকে যাত্রা করলেন, কেন না অনেকদিন হল তাঁরা বাড়ী ছেড়ে বেরিয়েছিলেন।

এর পরেও ফিনিশিয়ানরা উল্লেখযোগ্য অভিযান করেছিল বলে জানা গেছে। একজন প্রাচীন ইজিপ্ট অধিপতি, নাম তাঁর নেকো, কয়েকজন ফিনিশিয়ানকে আফ্রিকার চতুর্দিকে ঘুরে আসবার জন্যে পাঠান। এরা সুয়েজ উপসাগর থেকে যাত্রা আরম্ভ করে এবং আফ্রিকার চতুর্দিকে ঘুরে আসে। তারপর ভূমধ্য সাগরের ধার দিয়ে দিয়ে নাইল নদের তীরবর্তী ডেল্টায় গিয়ে পৌঁছয়। তাদের এই যাত্রা সম্পূর্ণ করতে প্রায় তিন বছর সময় লেগেছিল এবং প্রতি বছরের শেষেই তারা কোন না কোন যায়গায় নেমে পড়ে চাষবাস করত, এবং পরের বছরের যাত্রার উপযুক্ত খাদ্য সংগ্রহ করে নিত।

প্রাচীন কালের এই সব যাত্রাতে অনেক সময় লাগত, এবং যাত্রাগুলো বরাবরই হত সমুদ্রের ধার দিয়ে—কোন জাহাজই সমুদ্রের ধার ছেড়ে মাঝ সমুদ্রে পাড়ি দিত না। তখনও পর্যন্ত স্থলের দৃষ্টিসীমার বাইরে যাবার মত দুঃসাহস মানুষের হয় নি। সমুদ্রের ধার দিয়ে অনেকদূর যাওয়াকেই মানুষ তখন চরম দুঃসাহস বলে মনে করত। স্থলের দৃষ্টিসীমার বাইরে না যাওয়ার কারণও অবশ্য একটা ছিল। তখনকার লোকদের ধারণা ছিল যে পৃথিবী চ্যাপটা। সুতরাং যদি কেউ সমুদ্রের ওপর দিয়ে তীর ছেড়ে অনেকদূর চলে যায়, তাহলে সে পৃথিবীর শেষ সীমায় পৌঁছুবে। পৃথিবীর শেষ সীমাটা যে কি রকম তা কারুরই ধারণা ছিল না। তবে তারা কল্পনা করত যে সমুদ্রের পরে পৃথিবীটা হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে, এবং সেখানে কেউ গেলে সে পৃথিবী থেকে ছিটকে পড়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। পৃথিবী যে গোল তা তারা ধারণাও করতে পারত না। তারা কখনও স্বপ্নেও ভাবতে পারত না যে সমুদ্রের অপর পারে অনেক অজানা দেশ আছে, এবং সে সব দেশে তাদেরই মত অনেক মানুষ বাস করে।

কিন্তু যতই সময় যেতে লাগল মানুষ একটু একটু করে বুদ্ধিমান হয়ে উঠল, এবং পৃথিবী সম্বন্ধে তার ধারণাও একটু একটু করে পালটাতে লাগল। ক্রমে এমন একটা সময় এল যখন কতকগুলি মানুষের মনে এই প্রশ্ন জেগে উঠে তাদের চিন্তিত করে তুললে,—পৃথিবী কি বাস্তবিক চ্যাপটা, না গোল?—প্রশ্নটা তাদের মনে হঠাৎ জেগে উঠল না, একটা জিনিষ তারা দেখত যার কারণ তারা কিছুতেই খুঁজে পেত না, এবং এই জিনিষটি দেখেই তাদের মনে ও প্রশ্নটা জেগে উঠল। তারা লক্ষ্য করত

যে যখন কোন জাহাজ ডাঙ্গা থেকে সমুদ্রপথে যাত্রা করত, তখন তা একটু একটু করে যতই দূরে যেত ততই একটু একটু করে তার বিভিন্ন অংশ অদৃশ্য হয়ে যেত—প্রথম অদৃশ্য হত তার তলার অংশ, তারপর তার মাঝের অংশ এবং সবশেষে তার ওপরের অংশ। ব্যাপারটা তাদের অত্যন্ত ভাবিয়ে তুললে। অনেক ভেবেচিন্তে তারা এর একমাত্র সমাধান যা দেখতে পেলে তা হচ্ছে এই যে তাদের পূর্ব ধারণা (পৃথিবী চ্যাপ্‌টা) নিশ্চয়ই ভুল। খুব সম্ভব পৃথিবী গোল।

সমস্ত পৃথিবী এ কথা তখনি মেনে না নিলেও কয়েকজনের মনে ধারণাটা বদ্ধমূল হয়ে গেল যে পৃথিবী চ্যাপ্‌টা নয়, গোল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথাও তাদের মনে জেগে উঠল যে জাহাজে করে সমুদ্রের ওপর দিয়ে অনেক দূর চলে গেলেও কেউ পৃথিবীর শেষ সীমায় পৌছুবে না এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাবে না, বরং যে জায়গা থেকে সে যাত্রা করবে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে সেই জায়গাতেই আবার ফিরে আসবে। এ কথা বোঝার সঙ্গে সঙ্গেই সমুদ্রের দূরদেশে যাবার কথা মানুষ প্রথম কল্পনা করলে।

কয়েকজন দুঃসাহসী নাবিক প্রথম পথ দেখিয়ে সমুদ্রের অজানা পথে পাড়ি দিলে। এদের ইচ্ছে ছিল নতুন নতুন দেশ আবিষ্কার করে ব্যবসাবাণিজ্যের সুবিধে করে নেওয়া এবং সুযোগ পেলে কতকগুলো দেশ জয় করে উপনিবেশ স্থাপন করা এবং সেখানকার শাসনকর্তা হওয়া। অবশ্য, তাদের মধ্যে এমন লোকও দুএকজন ছিল যাদের উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর আয়তন সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান বাড়ান।

* * * *

মহামতি আলফ্রেড যখন ইংল্যাণ্ডের রাজা ছিলেন, তখন ওথেযার নামক একজন লোকের মনে একথা প্রথম জাগে,—সমুদ্রের জলে মাঝে মাঝে বিশাল বিশাল যে বরফের চাঙড় ভেসে যেতে দেখা যায়, সেগুলো আসে কোথা থেকে?—প্রশ্নটা মনে জেগে তাঁকে উতলা করে তোলে, এবং তিনি তাঁর ঘরদোর, আত্মীয়স্বজন সব ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন দুরন্ত সমুদ্রের বুকে পাড়ি দিতে—উত্তরের আশায়। উত্তর মিললো এবং তার সঙ্গে মিললো আরও অনেক কিছু। এই অভিযানের ফলে আবিষ্কৃত হল শ্বেত সাগর, দ্বীপ, নদী এবং উত্তর অন্তরীপ।

তিনি যখন তার অভিযান শেষ করে ফিরে এলেন, তখন তাঁর কাছ থেকে শোনা গেল আশ্চর্য আশ্চর্য সব গল্প—তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা। তাঁর কাছ থেকে এই সব গল্প শুনে তার দেশবাসীদের মধ্যে অনেকের সাহস বেড়ে গেল এবং তারা সমুদ্রযাত্রায় বেরিয়ে পড়ল, যার ফলে আবিষ্কৃত হল গ্রীণল্যাণ্ড, আইসল্যাণ্ড প্রভৃতি দ্বীপ।

এ ত গেল প্রথম দিকের কথা। এরও কয়েক শতাব্দী পরে আসল দুঃসাহসিক অভিযান আরম্ভ হয়েছে বলা যেতে পারে। তখনই মানুষ সমুদ্র ডিঙোতে সাহস করে এবং তার ফলে পৃথিবীর নানা অজানা দেশ আবিষ্কৃত হতে আরম্ভ হয়।

বাণী আবাহন

প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়

এস শিশিরসিক্ত শ্যামল কুঞ্জে পরায়ে কুন্দ হার,
এস গন্ধে ছন্দে ভরায়ে বিশ্ব ঝরায়ে মুকুল-ভার।
এস বিহগ কণ্ঠে অমিয় বণ্টি মধুর মূর্চ্ছনায়
এস বিমল হাস্যে অমি উপাস্যে। বিষণ্ণ বসুধায়।

এস প্রিয় পুলকিত পুষ্প-পূরিত প্রাচীন পল্লী-পথে.
এস আবেগ-কম্প্র নয়ন-নম্র ভক্তহৃদয় রথে
এস মাতৃ-মূরতি বিচ্ছুরি' জ্যোতি উজ্জ্বল মহিমায়,
এস বিমল হাস্যে অয়ি উপাস্যে! বিষণ্ণ বসুধায়।

এস ছিন্ন-ভিন্ন শত-বিদীর্ণ ক্ষিপ্ত ধরণী মাঝে
এস উজল কান্তি ভ্রান্তি-নাশিনী শান্তি-দায়িনী সাজে
এস হত্যালিপ্ত ক্ষিপ্ত জগতে প্রদীপ্ত মহিমায়,
এস বিমল হাস্যে অয়ি উপাস্যে। বিষণ্ণ বসুধায়।

এস মন্থন করি মৃত্যু-সিন্ধু করুণাবিন্দু পাতে,
এস অমৃত বিতরি অন্তর ভরি সংহরি সন্তাপে।
এস বরাভয় করে বীণা সুস্বরে অমল শুভ্রকায়,
এস বিমল হাস্যে অয়ি উপাস্যে বিষণ্ণ বসুধায়।

প্রত্যেক বছরেই বড়দিনের ছুটিতে কলকাতায় যেমন নূতন নূতন সার্কাস আসে, নাচের আসর বসে, গানের জলসা জমে, তেমনি শুরু হয় ভারতবর্ষ জুড়ে যেখানে যত কংগ্রেস, কন্‌ফারেন্স্‌ লীগ ও সভা সম্মেলন। তিন চার দিন ধ'রে খুব হৈ চৈ পড়ে যায়। সভাপতির অভিনন্দন, অভ্যর্থনা সমিতির নির্যাতন, প্রতিনিধিবর্গের গতিবিধি, কত বক্তৃতা, কত প্রবন্ধ পাঠ ও পঠিত বলিয়া গ্রহণ, কত প্রস্তাব উত্থাপন, সমর্থন ও বাতিল, অনুষ্ঠানের কোনোটাই বাদ পড়ে না। বিষয়নির্বাচনী সভার উদ্গীরিত বিষয় বিষে জর্জরিত হ'য়ে উঠেন অনেকেই, তবু কেমন একটা মোহ—একটা আকর্ষণ যেন এর মধ্যে আছে। বছরের পর বছর গাঁটের পয়সা ব্যয় ক'রে কত লোকই না এই সব বাৎসরিক ক্রিয়াকাণ্ডে এসে যোগ দিচ্ছে এবং মেলার শেষে বেশ একটা হাল্‌কা মন নিয়ে ঘরে ফিরে যাচ্ছে। তারপর এগারো মাস যে যার সব চুপচাপ। কারুর আর কোথাও সাড়া পাওয়া যায় না। কেবল নির্জন নিশীথ রাত্রে মাঝে মাঝে যেমন পথচারী নিরাশ্রয় জীবের করুণ চীৎকার গৃহবাসীদের সুখনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটায়, তেমনি শোনা যায় নিখিল ভারত জাতীয় রাষ্ট্র সমিতির প্রাদেশিক দলাদলি নিয়ে অশোভন চীৎকার। লীগ-নেকড়েদের হুঙ্কার ও মহাসভা-ষণ্ডদের গর্জন। এতে শুধু শান্তির ব্যাঘাত ঘটে মাত্র।

* * *

এবার হ'য়েছিল জামশেদপুরে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন। বারাণসীতে বিজ্ঞান কংগ্রেস ও ভেষজ সম্মেলন, নাগপুরে ছাত্র সম্মেলন, মাদুরায় হিন্দুসভা, লাহোরে খ্রীষ্টান সম্মেলন, বাঙ্গালোরে নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন, ভাইজাগে নিখিল ভারত চিকিৎসক সম্মেলন, বহরমপুরে ব্যবহারজীবি সম্মেলন, সিঁথীতে বৈষ্ণব সম্মেলন, পুনায় নিখিল ভারত মুসলমান শিক্ষা সম্মেলন, রাজপুতানার ইন্দ্রগড়ে পর্দাবিরোধী সম্মেলন, বহরমপুরে নিখিল বঙ্গ মিউনিসিপ্যাল কংগ্রেস, উদয়পুরে নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলন। মালিকান্দায় মৎস্যজীবি সম্মেলন। কলিকাতায় নিঃ বঃ সঙ্গীত সম্মেলন, র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রাটিক সম্মেলন, নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সম্মেলন, নিখিল ভারত জাতীয় উদারনৈতিক সঙ্ঘের অধিবেশন, মাদ্রাজে নিঃ ভাঃ দার্শনিক কংগ্রেস, নাগপুরে নিঃ ভাঃ হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল সম্মেলন, বরিশালে নিঃ বঃ আমলা সম্মেলন, দিল্লীতে প্রাদেশিক ফরওয়ার্ড ব্লক সম্মিলন, এমনি আরও কত সম্মেলন হয়ত আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে অন্যান্য দেশে হ'যে গেল।

* * *

এই সব বার্ষিক সম্মেলন ও অধিবেশনের ফলে নিখিল ভারত ও নিখিল বঙ্গের কী যে মহৎ কল্যাণ সাধিত হ'চ্ছে তা নিয়ে তর্ক না তুলে শুধু এই কথাটি আমরা নিবেদন করতে চাই যে বছরের একটি বিশেষ ছুটীর সপ্তাহে একই সময়ে ভারত জুড়ে চারিদিকে যদি এই রকম সব বিচিত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাহ'লে একমাত্র বেকার লোক ছাড়া ত' আর কারুর সাধ্যে কুলান সম্ভব নয় যে সবগুলির কার্যাবলী সম্যক্‌ অনুধাবন করতে পারে। কাজেই এই সব অনুষ্ঠানের অধিকাংশই মাঠে মারা যায়। বাৎসরিক সম্মেলনের সংখ্যা দিন দিন যে ভাবে বেড়ে চলেছে তাতে হিসাব করে দেখা যায় যে প্রতি মাসে পনেরো দিন অন্ততঃও যদি এক একটি দলের সম্মেলন করা যায় তাহ'লেও বারো মাসের মধ্যে তাদের সকলের অধিবেশন পালাক্রমে শেষ করা যাবে কিনা সন্দেহ। তা ছাড়া এ ব্যবস্থার আরও একটা অসুবিধা আছে এই যে, সে ক্ষেত্রে দেশ শুদ্ধ লোককে সব কাজ পরিত্যাগ ক'রে সারা বছর ধ'রে শুধু কংগ্রেস, কন্‌ফারেন্স আর সম্মেলন ক'রেই কাটাতে হয়। সে অবসর নিষ্কর্মা ভারতবাসীদেরও নেই।

* * *

বছরে তিনটি বড় ছুটি আছে, খৃষ্টমাস্‌—

গুডফ্রাইডে আর দুর্গাপূজা। লীগের কল্যাণে ক্রমে ঈদের ছুটিও বাড়তে বাড়তে প্রায় খৃষ্টান ও হিন্দু পরবের সমান সমান হয়ে উঠেছে। এটা হওয়া উচিতও। কারণ সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুর পরবে যদি চার দিন ব্যাঙ্ক বন্ধ থাক্‌তে পারে, সংখ্যাগরিষ্ঠ মোসলেমের পরব উপলক্ষেই বা তাঁদের সংখ্যার অনুপাতে কিংবা অন্ততঃ সমান অনুপাতেও ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে না কেন? পাকিস্থানের সঙ্গে সঙ্গে যদি এটাও মঞ্জুর হয় তাহ'লে বছরে মোট চারটে বড় ছুটি পাওয়া যাবে। সুতরাং এই বার্ষিক সম্মেলনগুলোকে যদি শ্রেণী অনুসারে ভাগ ক'রে ত্রৈমাসিক ক'রে ফেলা যায়, তাহ'লে নিখিল ভারত তথা নিখিল বঙ্গের নিঃসন্দেহ যথেষ্ট সুবিধা হ'তে পারে।

* * *

ধরুন, হিন্দু পর্ব দুর্গাপূজার ছুটিতে যদি অনুষ্ঠিত হয় যত কিছু মোসলেম লীগ, ইস্‌লাম কনফারেন্স উর্দ্দু শিক্ষা ও ওয়াকফ্‌ সম্মেলন এবং খৃষ্টান পর বড়দিনে যদি সুরু হয় যত কিছু হিন্দুসভা, জাতীয় কংগ্রেস, শিক্ষাজীবী, ব্যবহারজীবী, বারুজীবী ইত্যাদি 'জীবী' কন্‌ফারেন্স এবং যুব সম্মেলন, শিশু-সম্মেলন ও সাহিত্য সম্মেলন প্রভৃতি আর মোসলেম পর্ব ঈদের ছুটিতে যদি হয় যত খৃষ্টান কংগ্রেস, কন্‌ফারেন্স এবং গুডফ্রাইডের ছুটিতে যদি হয় কেবল যত নারী ও ছাত্রী সম্মেলন, মহিলা কংগ্রেস, কন্‌ফারেন্স এবং পর্দ্দা-সম্মেলন, তাহ'লে একেবারে বঞ্চিত না হ'য়ে দেশের অনেকেই সবগুলির কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আস্বাদ গ্রহণ ও উপভোগ করবার অবকাশ পেতে পারে এবং কাগজওয়ালারাও সারা বছরের খোরাক সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন।

* * *

কিন্তু, এ হ'ল আমাদের আলনাস্কারের স্বপ্ন। এ হেন নিয়ম ও শৃঙ্খলা অনুসরণে নির্বিঘ্নে কার্য সুসম্পন্ন করতে আমরা যদি জানতুম, বা শিখতুমও, তাহ'লে আমরা কোনদিনই আমাদের স্বাধীনতা হারাতুম না। আমরা সবাই স্ব-স্ব-প্রধান।—সবাই বে-পরোয়া।—ডিসিপ্লিন্‌ জানিনি ও মানিনি বলেই আমরা কখনও এক অখণ্ড মহাদেশ গড়ে তুলতে পারিনি এবং সকলপ্রকার বিভেদ ভুলে একমাত্র আমাদের জন্মভূমির স্বার্থে ও কল্যাণে এক মহাজাতিতেও পরিণত হ'তে পারিনি। যেমন পেরেছে ইংল্যাণ্ড—পেরেছে ফ্রান্স—পেরেছে জার্মানি। এ্যাংলো-স্যাক্সন-রোমান-কেল্ট্‌-নর্ম্যান, ব্রিটন-স্কচ-ওয়েল্‌স সবাই মিলে মিশে এক হয়ে আজ এক বিরাট ব্রিটীশ জাতি গড়ে উঠেছে। মিশে গেছে তাদের মধ্যে আজ নিউটেস্টামেণ্ট, ওল্ড টেস্টামেণ্ট্‌, রোম্যান ক্যাথলিক, প্রোটেস্টাণ্ট, প্রেসবিটিরীয়াণ-ওয়েষ্টমিনিস্টার ও ইস্টার্ণ চর্চ্চ। ইংল্যাণ্ড স্কটল্যাণ্ড-ওয়েলস্‌—মিলে মিশে হয়ে গেছে বৃহত্তর গ্রেট ব্রিটেন। গ্রেট ব্রিটেন তাই হ'তে পেরেছে বিশ্বজগতেও 'গ্রেট'।

* * *

ফ্রান্স ও জার্মানীর বড় হওয়ার ইতিহাসেও দেখতে পাওয়া যায় এই একই একত্বের কাহিনী—জাতীয় বৃহৎ স্বার্থের কল্যাণে জন্মভূমির ভবিষ্যৎ মঙ্গলের সাধনায় ক্ষুদ্র স্বার্থ ভুলে পরস্পরের মধ্যে আত্মনিমজ্জন ও সংমিশ্রণ। ফ্রান্সে আজ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না—কোথায় গেল সে প্রাচীন গ্যলরা—আইবেরীয়ানরা আর বেলগারা? এখানে মিলিত হয়েছিল একদিন গ্রীক, ফিনিশিয়ান, রোমাণ, ব্রিটন, ফ্র্যাঙ্ক্‌ ও ফ্লেমিশ। চলেছিল সেখানে দীর্ঘকাল ধরে বিরোধ, দ্বন্দ্ব, আত্মকলহ, যুদ্ধবিগ্রহ, বৈদেশিক আক্রমণ—যত দিন না তারা নিজেদের পৃথক সত্বা ভুলে এক হতে পেরেছিল। একতাবদ্ধ ফ্রান্স তাড়ালে রোমানদের, তাড়ালে ইংরেজদের, তাড়ালে জার্মানদের। হয়ে উঠলো তারা জ্ঞানে বিদ্যায় ঐশ্বর্যে, বাণিজ্যে, বীর্যে, শিল্পে, সঙ্গীতে ও বিলাসে সমগ্র য়ুরোপের আদর্শ। জার্মানিও ছিল একদিন নানা জাতি ও নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। কিন্তু কোথায় আজ তারা? কোথায় সে টিউটন ম্যাগিয়ার, কোথায় সে শ্লাভ, হুনের দল? সবাই মিলে মিশে এক হয়ে আজ বৃহৎ জার্মানিকার জঠরের মধ্যে নব জন্ম পরিগ্রহ করেছে। ব্যাভেরিয়া ভুলে গেছে তার মর্যাদার দুর্জয় অভিমান, প্রাশিয়া পরিহার করেছে তার সম্ভ্রমের দম্ভ ও অহঙ্কার। হ্যাপস্‌বার্গ ও হোহেনজোলার্ণ রাজবংশের গর্ব তারা বিসর্জন দিয়েছে, তবে না হয়ে উঠেছে জার্মানি আজ এক বিশ্বত্রাস শক্তি।

আমরা যদি এই সব অতীতের ইতিহাসের দিকে

চোখ বুজে, প্রত্যক্ষ প্রমাণকেও অবজ্ঞা করে ভারতবর্ষকে একতাবদ্ধ করবার সাধনা ছেড়ে দ্বিখণ্ডিত করতে চেষ্টা করি তাহলে দ্বিধাবিভক্ত উভয় খণ্ডই সর্বপ্রথম পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে অন্তর্কলহে দুর্বল হয়ে পড়বে। বহিঃশত্রুর আক্রমণে তারা একে একে সহজেই পরাভূত হয়ে বিদেশীর অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হবে। 'পাকিস্থান' আপন স্থানচ্যুত হয়ে শেষে সমগ্র ভারতের সর্বনাশের কারণ হয়ে উঠবে। তাই বলি—আমরা হিন্দু মুসলমান জানি না—আমরা জানি আমাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষকে। সুতরাং ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীকে অর্থাৎ স্বদেশ ও স্বজাতিকে ভাবি অমঙ্গল ও স্থায়ী অকল্যাণের দুর্ভাগ্য থেকে রক্ষা করবার জন্য ধর্মভেদ নির্বিশেষে প্রত্যেক স্বদেশপ্রেমিক হিন্দুমুসলমানের কর্তব্য হবে এই পাকিস্থান পরিকল্পনার প্রতিবাদ ও বিরুদ্ধাচরণ করা। 'আলসটার্' যেমন আয়ার্লাণ্ডের স্বাধীনতার স্বপ্নকে রাহুগ্রস্ত ক'রে রেখেছে, তেমনি ভারতে 'পাকিস্থান' সৃষ্টি হলে সেও হ'য়ে উঠবে স্বাধীন ভারতের আকাশে এক অভিশপ্ত দুর্গ্রহ।

* * *

কিন্তু, সেকথা থাক্। কংগ্রেস্ কন্‌ফারেন্সের মধ্যেই ফিরে আসা যাক্। সাহিত্য-সম্মেলন বছর বছরই হচ্ছে, নিখিল বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, প্রাদেশিক সাহিত্য সম্মেলন, জেলা সাহিত্য সম্মেলন, এবং প্রবাসী সাহিত্য সম্মেলন। কিন্তু, সর্বত্রই দেখি সেই থোড় বড়ি খাড়া, আর খাড়া বড়ি থোড়। সভাপতিদের অভিভাষণ, প্রবন্ধ পাঠ ও প্রস্তাব গ্রহণ ছাড়া কিছুই হয় না। এবার জামশেদপুর সম্মেলন কিন্তু একটা সত্যকার কাজ করবার চেষ্টা করেছেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আজ যে উচ্ছৃঙ্খল অরাজকতা এসেছে তাঁরা সেটাকে নিবারণ করবার উপায় সন্ধান করেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন যে 'করছি' এই একটি ক্রিয়াপদেরই ১২টি বিভিন্ন রূপ বাংলা ভাষায় অধুনা চলছে; যথা—১। করছি, ২। ক'রছি, ৩। কোরছি, ৪। করচি, ৫। ক'রচি, ৬। কোরচি, ৭। ক'র্‌ছি, ৮। ক'র্‌চি, ৯। কর্চ্ছি, ১০। কর্ছি, ১১। কোর্‌চি, ১২। কোর্‌ছি। এখন তাঁরা জানতে চান—কোন রূপটি এর যথার্থ স্বরূপ—কোনটি তার পিতৃপরিচয় থেকে বিচ্যুত নয় এবং এর মধ্যে কোন্ বানানটি তাঁরা অনুসরণ করবেন?

* * *

জামশেদপুর সাহিত্য সম্মেলন তুলেছেন এ অতি সমীচীন প্রশ্ন এবং সময়োচিতও বটে। এই এলোমেলো অসংযত ভাষা বাঙালীর জাতীয় জীবনের অধঃপতন প্রতিবিম্বিত করে। এ ভাষা সমস্যার অতি সুন্দর উত্তর দিয়েছেন পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু। আমরা আগামী মাসে পাঠশালায় তা মুদ্রিত করে দেব। সাধু ভাষা বা কেতাবী ভাষা স্থবিরের ন্যায় নিস্তেজ, কিন্তু চলিত ভাষা যোয়ান। তার মধ্যে প্রাণ আছে, গান আছে, গতি আছে, তেজ আছে এবং সবচেয়ে যেটা বড় কথা—স্ফূর্তি আছে। চলিত ভাষা মানে কোনো বিশেষ অঞ্চলের কথ্য ভাষা নয়। চলিত ভাষা সাধারণ লেখারই ভাষা। এর মধ্যে বাংলা আছে পোর্তুগীজ আছে, ইংরাজি আছে, ফার্শি আছে, পালি আছে, গ্রাম্য আছে, সংস্কৃত আছে, এবং সংস্কৃতের তৎসম ও তদ্ভব শব্দও আছে। এর বিশেষত্ব শুধু সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্ততায়। 'হইয়াছে' এতে 'হয়েচে', 'করিতেছি' এতে 'করছি'। হসন্ত ও উপরের কমা দিয়ে রাজশেখর বাবু ভাষাকে কণ্টকিত করতে নিষেধ করেছেন। অর্থ অনুসারে উচ্চারণের পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী। মৌখিক ভাষার অনুকরণে—'ওপর' 'ভেতর' না লিখে তাই তিনি বলেন 'উপর' 'ভিতর' লেখাই উচিত। অর্থাৎ শব্দের গোড়ার দিকের সাধু বানান ঠিক রাখাই ভাল এবং মাঝের বা শেষের দিকের মৌখিক বানানই চলুক, যেমন কুয়া, মিছা, উঠান, একচেটিয়া স্থলে, কুয়ো, মিছে, উঠন, একেচেটে লেখাই ভাল। পরের মাসে এ সম্বন্ধে আরও আলোচনা করা যাবে।

য়ুরোপে বর্ত্তমান যুদ্ধের গতির প্রতি যাঁরা লক্ষ্য রাখছেন তাঁরা সকলেই আশা করেছিলেন যে এই শীতের সময় নিশ্চয়ই ইংলণ্ডের উপর বিমান আক্রমণ বন্ধ থাকবে। কারণ এ সময় ইংলণ্ডের আবহাওয়া হ'য়ে ওঠে অত্যন্ত জটিল। আকাশ বাতাস আচ্ছন্ন করে দেখা দেয় দুর্ভেদ্য কুয়াশার ঘন আবরণ। রাত্রি সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয় অবিচ্ছিন্ন তুষারপাত। প্রবল উত্তর পশ্চিমের হিম ঝঞ্ঝা (Nor'wester) মানুষকে গৃহাভ্যন্তরে অবরুদ্ধ করে। বিমান অভিযান এ সময় এক প্রকার অসম্ভব, কারণ অত্যন্ত বিপজ্জনক। কাজেই সবার ধারণা হয়েছিল যে, এই দুর্লঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক বাধা শত্রুপক্ষকে ইংলণ্ড আক্রমণের দুরূহ প্রচেষ্টা থেকে বিরত রাখবে নিশ্চয়ই। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে গত ডিসেম্বর মাসের শেষাশেষি খ্রীস্ট-জন্মদিনের অব্যবহিত পরেই ইংলণ্ড যে সময় দারুণ শীতের কবলে সমাহিত ঠিক সেই সময়েই ইংলণ্ডের উপর জার্ম্মাণ বিমান-আক্রমণ সর্বাপেক্ষা প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে। গত পনের মাসের মধ্যে এরূপ ভীষণ বিমান আক্রমণ লণ্ডন সহরে একদিনও হয়নি যেমন হয়েছিল গত ২৯শে ডিসেম্বর রবিবার রাত্রে। এরপর থেকে প্রতিদিনই চলেছে এই নিষ্ঠুর বর্ব্বরতার চূড়ান্ত অভিনয়। ঘুমন্তপুরীর উপর নিশীথ-রাত্রে আকাশপথে দুরন্ত আক্রমণ। অসংখ্য অগ্নি-প্রজ্বালক বোমা নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বিস্ফোরক বোমার সাহায্যে ধ্বংসের তাণ্ডব-লীলা!

* * *

স্বদেশের স্বাধীনতা ও জাতির মর্য্যাদা রক্ষায় বদ্ধপরিকর ব্রিটেন বীরবিক্রমে শত্রুর এই আক্রমণে বাধা দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, 'আর-এ-এফ্' এর দুঃসাহসী বৈমানিকেরা প্রাকৃতিক সমস্ত বাধা তুচ্ছ করে দলে দলে দুর্ব্বার বেগে দীর্ঘপথ অতিক্রমণান্তে শত্রু অধিকৃত ফ্রান্সের নানা সামরিক ঘাঁটীতে ও জার্ম্মানির অস্ত্রশিল্প ও কারখানা বহুল প্রধান শহর-গুলিতে এবং প্রধান প্রধান বন্দরে হাজার হাজার বোমা নিক্ষেপ করে আসছেন। এক বার্লিন শহরেই তাঁরা প্রায় পঞ্চাশবার আক্রমণ করে এসেছেন। এক একবার এক এক স্থানে বিশ হাজার বোমা ফেলা হয়েছে। দীর্ঘকাল আকাশযুদ্ধ এইভাবে যদি চলে তবে অদূর ভবিষ্যতে জার্ম্মাণি ও ব্রিটেন উভয়েই হয়ত ধ্বংস হয়ে যাবে। ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড ও জার্ম্মাণি এরা তিনজনইত ছিল য়ুরোপের ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। এদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে এদেরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে য়ুরোপ আজ প্রগতির পথে অগ্রসর হ'তে পেরেছে। এদেরই বিরাট কীর্তির উজ্জ্বল মহিমায় য়ুরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতা আজ সুদূর প্রাচ্যেও বিস্তার লাভ করেছে। এদেরই জ্ঞান বিজ্ঞান তুর্কীকে মানুষ করে তুলেছে, জাপানকে অজেয় করেছে, ইরাণ, ইরাক, মিশরও আজ এদের প্রভাবে সহস্র শতাব্দীর জড়তা ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়িয়েছে। ভারতেও অতি ক্ষীণকণ্ঠে জাগরণী গানের ঘুম ভাঙানিয়া সুর শোনা যেতে শুরু হয়েছিল। এহেন সময় প্রতীচ্যের এই বিপুল সংঘাতে তাদের আদর্শ যদি চূর্ণ হয়ে যায়, ঘনিয়ে আসবে তবে জগতে দুর্যোগের কাল রাত্রি!

* * *

ইটালি সম্বন্ধে যা অনুমান করা গেছল—ঘট্‌লও তাই। মুখসর্বস্ব মুসোলিনীর শূন্যগর্ভ দম্ভ আজ ধূলায় বিলুণ্ঠিত। অসহায় আবিসিনিয়াকে—আধুনিক সমর-পরিচালনায় অজ্ঞ ও বর্তমান বিজ্ঞান প্রসূত অস্ত্রশস্ত্রহীন অশিক্ষিত আবিসিনিয়াকে সম্পূর্ণ জয় করতে যে বীরপুরুষদের দীর্ঘ দু'বছর হিমসিম খেতে হয়েছিল গ্রীসের সঙ্গে যুদ্ধে যে তারা হারবেই, ব্রিটেনের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে তারা যে ধরাশায়ী হবেই এ ভবিষ্যদ্বাণী অনেকেই করেছিলেন। গ্রীস ক্ষুদ্র হলেও সে আবিসিনিয়ার মত অনুন্নত দেশ নয়। গ্রীস শিক্ষিত ও সাহসী, তার জাতীয় ইতিহাসে

বলবীর্যের ঐতিহ্য প্রাচীন রোমের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। বৃহৎ ইটালি মনে ভেবেছিল সে কেবল সংখ্যার জোরে ও ভয় দেখিয়ে আল্‌বেনিয়ার মতো ক্ষুদ্র গ্রীসকেও গ্রাস করে ফেলবে। কিন্তু, মানুষ ভাবে বটে 'এমন করব, অমন করব' কিন্তু, করবার মালিক যিনি তিনি অদৃশ্যলোকে বসে হাসেন, ক্ষুদ্র গ্রীসকে দিয়েই তিনি অতিদর্পী মুসোলিনীর দর্প চূর্ণ করলেন। আল্‌বেনিয়াকে সে আক্রমণ করেছিল সম্পূর্ণ অতর্কিতে, একেবারে তার অপ্রস্তুত অবস্থায়। তেমনি করেই চেয়েছিল সে গ্রীসকে বধ করতে, কিন্তু বল্কানের ভাগ্য-বিপর্যয়ে ভীত হয়ে গ্রীস তার যথাসাধ্য শত্রু আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত ছিল। তার সাহস ও দৃঢ়তা বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করেছে। ব্রিটিশ বন্ধুর সময়োপযোগী সাহায্যলাভে বলীয়ান হয়ে গ্রীস দিলে ইটালির ললাটে পরাজয়ের কলঙ্ক লেপন করে। এদিকে উত্তরপূর্ব আফ্রিকায় ব্রিটিশ সিংহের প্রতাপে ইটালীর শক্তি ছিন্ন ভিন্ন, ইটালির রণ বাহিনী মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত।

* * *

রাশিয়া বলছে শত্রু নাকি তাদের দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে—তাকে আত্মরক্ষার জন্য সতর্ক ও সজাগ থাকতে হবে, আসন্ন যুদ্ধের জন্য ত্বরায় তাকে প্রস্তুত হ'তে হবে। বিশাল সোভিয়েট্‌ রাষ্ট্রে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। মহা অধিনায়ক স্ট্যালিন্‌ আহ্বান করেছেন প্রত্যেক রুষকে এই আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে দাঁড়াতে। কিন্তু, কে তার শত্রু? কোন্‌ দিক থেকে সে আক্রান্ত হবে?—সে সম্বন্ধে কিন্তু স্পষ্ট কিছু জানা যাচ্ছে না। দুষ্ট লোকেরা অনুমান করছেন 'ও আর কেউ নয়, গোয়েরিং গোয়েবল্‌সএর দল। কারণ, শোনা যাচ্ছে নাকি—পোলাণ্ড ও রাশিয়ার সীমান্তে বিরাট জার্মানবাহিনী সমবেত হ'য়েছে। এদিকে আবার শোনা যাচ্ছে—ব্রেনের গিরিবর্ত্মের অভ্যন্তর ভেদ করে জলস্রোতের ন্যায় বিপুল জার্মানসেনা ইটালির বুকের মধ্যে প্রবেশ করছে। ইটালির বিমান-বিভাগের প্রধান পরিচালক সেদিন প্রকাশ্যভাবেই ঘোষণা করছেন—অতঃপর ইটালির বিমানবাহিনী সম্পূর্ণরূপে জার্মাণ বিমান বিভাগের পরিচালনাধীনে থাকবে। আবার ওদিকে জোর খবর যে ফ্রান্সের অবশিষ্ট অংশও দখল করে নেবার জন্য জার্মাণ-বাহিনী অগ্রসর হ'চ্ছে। মার্শাল পেঁতা নাকি জার্মানদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছেন। ফরাসী নৌবহর ও বিমানবাহিনীকে তিনি কিছুতেই ব্রিটেনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে দেবেন না বলেছেন। নাজীরা যদি বেশী জবরদস্তি করে তিনি সমস্ত জাহাজ ও বিমানপোত আফ্রিকায় পাঠিয়ে দেবেন বলেছেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয়বারের জন্য নির্বাচিত প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট্‌ তারস্বরে ঘোষণা করেছেন—ব্রিটেনকে আমরা রক্ষা করব। তাদের জয়ের উপর শুধু আমেরিকা নয়, সমগ্র পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সুখশান্তি নির্ভর করছে। ব্রিটেনকে আমরা সর্বরকমে প্রাণপণে সাহায্য করব। সমস্ত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে অস্ত্রাগার ও বারুদের কারখানায় পরিণত করতে হবে।

গতমাসের খবর

রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ আপত্তিজনক বক্তৃতা দেওয়ার অপরাধে ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হয়েছেন।

* * *

এবার কলকাতায় ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলওয়াড়েরা একত্রিত হয়েছিলেন। তাঁরা দু দলে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধভাণ্ডারে সাহায্যের জন্য খেলা দেখিয়েছিলেন। পাতিয়ালার মহারাজার অধীনে একদল 'ভাইসরয়ের ইলেভেন' নামে খেলেছেন এবং পাতৌদির নবাবের অধীনে আর এক দল বাংলার 'গভর্ণরের ইলেভেন' নামে খেলেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আগের দিনে একটি সৌখীন খেলায় আহত হওয়ায় পতৌদির নবাব শেষ পর্যন্ত গভর্ণরের দলের নায়কত্ব নিতে পারেননি। প্রসিদ্ধ ক্রিকেটবীর মেজর সি, কে, নাইডু তাঁর পরিবর্তে অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। গভর্ণরের দল এ খেলায় পরাজিত হয়েছেন বটে, কিন্তু দর্শকেরা

সকলে একবাক্যে স্বীকার করেছেন এমন উত্তেজনাপূর্ণ ও প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলা তাঁরা ইতিপূর্বে আর দেখেননি।

* * *

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর কংগ্রেস থেকে বহিষ্কারের পর শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন পাইন, সন্তোষকুমার বসু প্রমুখ বাংলার আরও ১৩জন বিশিষ্ট-সভ্যকে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত করে দেওয়া হয়েছে। শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কংগ্রেসের এই কঠিন হস্তে শাসন পরিচালনা প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু এর পরিণাম ভেবে বাংলা প্রদেশ সম্বন্ধে আমরা চিন্তিত হয়ে উঠেছি। এটা মিটে গেলেই ভাল হত।

* *

ইংরাজী নববর্ষের প্রারম্ভে বাংলা দেশের কয়েক জন বিশিষ্ট নরনারীর মৃত্যু আমাদের অত্যন্ত ব্যথিত করেছে। স্বর্গীয়া অনিন্দিতা দেবী একজন যথার্থ উচ্চ শ্রেণীর চিন্তাশীলা মহিলা লেখিকা ছিলেন। তাঁর রচিত প্রবন্ধগুলিতে মৌলিক চিন্তাধারা ও মনীষার তীক্ষ্ণ বিকাশ দেখতে পাওয়া যেত। তাঁর পরলোক গমনে বাংলাদেশে একজন সত্যকার বিদুষী লেখিকার অভাব ঘটল। ইনি প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীর জননী। এঁর স্বামী গৌরীপুর ষ্টেটের ভূতপূর্ব দেওয়ান।

* *

অধুনালুপ্ত 'জাহ্নবী' পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক 'রামেন্দ্রসুন্দর', 'কান্তকবি' 'রজনীকান্ত' প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের মৃত্যুতে আমরা বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট সেবককে হারিয়েছি। সাহিত্যপরিষদের জন্য, সাহিত্যসেবার জন্য তিনি আজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। ভগবানের নিকট তাঁর স্বর্গগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

* * *

প্রাচীন সাহিত্যিক ও বিশিষ্ট সাংবাদিক নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের তিরোধানে বাংলাদেশ তার আর একটি উজ্জ্বল রত্নকে হারাল। নগেন্দ্রনাথ কর্মব্যপদেশে আজীবন প্রবাসেই যাপন করেছেন এবং প্রবাসেই তাঁর মৃত্যু ঘটল। মৃত্যুকালে তিনি বোম্বাইয়ে ছিলেন। 'ফিনিক্স' 'ট্রিবিউন' প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদন করে ভারতীয় সংবাদপত্র জগতে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বাংলা ভাষায় তাঁর একাধিক সুরচিত গল্প ও উপন্যাস আছে। 'বৈষ্ণব কবিতা' সম্বন্ধেও তাঁর বিশেষ অনুশীলন ছিল। সাহিত্যপরিষদের প্রকাশিত 'বিদ্যাপতি' পদাবলী তিনি পরিষদের তদানীন্তন সভাপতি স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্রের সঙ্গে একত্রে সম্পাদন করেছিলেন। প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁর পুত্র।

* * *

সি-আই-ডি পুলিশ বিভাগের প্রসিদ্ধ কর্মদক্ষ এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার প্রভাতনাথ মুখোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুতে আমরা একজন বিশিষ্ট বন্ধুকে হারালাম। প্রভাতনাথ ছিলেন যেমনই কর্মঠ ও অনলস তেমনই সদাহাস্যময় বন্ধু বৎসল অমায়িক ভদ্রলোক।

* *

লক্ষ্ণৌ আর্ট্‌স্ এণ্ড ক্র্যাফ্‌ট্‌স কলেজের অধ্যক্ষ ভারত প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার এবার নববর্ষে রায়সাহেব উপাধি পেয়েছেন এটা তাঁর সম্মান না অসম্মান এ সম্বন্ধে সংশয় জাগে

* *

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ দার্শনিক পণ্ডিত ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয় এবার নববর্ষে সি-আই-ই উপাধি পেয়েছেন। আমাদের মনে হয় 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিই তাঁর অধিকতর যোগ্য হ'ত।

গ্রন্থগাবিক

ঘরের লক্ষ্মী—(উপন্যাস) (বড়দের জন্য)

রচয়িত্রী : শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবীসরস্বতী

প্রকাশক : শ্রীশঙ্করানন্দ ঠাকুর 'বাণীভবন' ৫৯ আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সুন্দর বাঁধাই ও মনোহর প্রচ্ছদপট। মূল্যবান এণ্টিক কাগজে সুমুদ্রিত। পৃঃ ১৯৮, মূল্য : মাত্র ১৲ টাকা।

গ্রন্থপ্রকাশে 'বাণীভবন' নূতনব্রতী। যুদ্ধের বাজারে এমন একখানি প্রায় ২০০ পৃষ্ঠার সুন্দর বই মাত্র এক টাকা মূল্যে এঁরা দিচ্ছেন দেখে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। এরূপ সুলভ মূল্যে 'ঘরের লক্ষ্মীর' ন্যায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এঁরা যদি ভবিষ্যতে গ্রন্থানুরাগী জনসাধারণকে আরও পরিবেষণ করতে পারেন তাহ'লে বঙ্গসাহিত্যের যথার্থ কল্যাণ করবেন এবং সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন। 'ঘরের লক্ষ্মী' রচয়িত্রী শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী বাংলাদেশের একজন বহু-প্রসিদ্ধা লেখিকা। 'ঘরের লক্ষ্মী' তাঁর লেখনীরই উপযোগী চিত্তাকর্ষক রচনা। পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ করতে গিয়ে আমাদের সমাজ যে আজ অধঃপতনের কোন স্তরে এসে পৌঁছেচে এবং কোন আদর্শে ফিরে গেলে সমাজ আবার সুস্থ ও কল্যাণবহ হ'তে পারে সরমা ও তাঁর কন্যা মৃণালের বিপরীত চরিত্রের সংঘাত আমাদের সেকথা ভাল করেই বুঝিয়ে দেয়। অজয়ের চরিত্রের দৃঢ়তায় পাঠককে মুগ্ধ হ'তে হয় এবং মি. ব্যানার্জির নিরুপায় অবস্থা আমাদের অন্তর সহানুভূতিতে পূর্ণ করে তোলে। আশা করা যায় 'ঘরের লক্ষ্মী' একখানি জনপ্রিয় গ্রন্থ বলে গণ্য হবে।

মহাপুরুষ চরিত—(জীবনী) (ছেলেমেয়েদের জন্য)

রচয়িতা : শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী

প্রকাশক : চক্রবর্ত্তী সাহিত্য ভবন, বজবজ।

কাগজে বাঁধাই এবং এণ্টিক কাগজে সুমুদ্রিত। পৃঃ ১০৯, মূল্য : ॥০ আনা মাত্র।

অষ্টমহাপুরুষের জীবনী ও সাধন কাহিনী এবং উপদেশ সম্বলিত এই সুরচিত গ্রন্থখানি আজকের এই অশ্রদ্ধার যুগে বাঙালীর আস্তিক্য-বুদ্ধি পুনরুজ্জীবিত করুক এই কামনা করি। এতে শ্রীভগবান বুদ্ধদেব, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীরামানুজস্বামী, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য, শ্রীশ্রীতৈলঙ্গস্বামী, কাঠিয়াবাবা, গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ ও পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূত-চরিতকথা কীর্ত্তিত হয়েছে।

কথা ও কবিতা—(কাব্য) (ছেলেমেয়েদের জন্য)

রচয়িতা : কবি শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায় ও জ্যোতির্ময় ঘোষ

প্রকাশক : ভারত বুক এজেন্সি, ২০৬ কর্ণওআলিস ষ্ট্রীট,

সুন্দর বাঁধাই, সুদৃশ্য প্রচ্ছদপট, এণ্টিক কাগজে সুমুদ্রিত। পৃঃ ১২০, মূল্য : ১৲ টাকা মাত্র।

যুগল গ্রন্থকার তাঁদের স্বরচিত কয়েকটি কবিতার সঙ্গে বাংলার বিশিষ্ট কয়েকজন কবির আবৃত্তি উপযোগী কয়েকটি গাথা ও কবিতা সংকলন করে এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করেছেন। আশা করি তাঁদের সাধু উদ্দেশ্য ও শ্রম সার্থক হবে, কারণ কবিতাগুলির অধিকাংশই বেশ সুনির্বাচিত।

নৃমুণ্ড শিকারী—(রোমাঞ্চকর উপন্যাস) (ছেলে-মেয়েদের জন্য)

রচয়িতা : শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

মূল্য : ১৲ টাকা মাত্র, পৃঃ ১৩৩।

রোশ নাই—(পূজা বার্ষিকী) (ছেলেমেয়েদের জন্য)

সঙ্কলনকারী : শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

মূল্য : ১।০, পৃঃ ১৪৭। হেমেন্দ্র, অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব, শিবরাম, প্রবোধকুমার প্রভৃতি সাহিত্যের নবরত্নের ৯টি গল্প।

আধমনী ঘণ্টেশ্বর—(গল্পগুচ্ছ) (ছেলেমেয়েদের জন্য)

রচয়িতা : শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

মূল্য : ।০ আনা, পৃঃ ৯৩। ৭টি গল্প।

অশরীরীর দান—(ভ্যাবাচাকা সিরিজের রোমাঞ্চকর কাহিনী) (ছেলেমেয়েদের জন্য)

রচয়িতা : শ্রীপতিতপাবন মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক : বিশু মুখোপাধ্যায়

মূল্য : ।০ আনা, পৃঃ ৫১।

প্রকাশক : ভরদ্বাজ পাবলিশিং হাউস, ১১নং মোহনলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রত্যেক বইখানিরই সুরঙীণ প্রচ্ছদপট সুন্দর ছাপা, একাধিক চিত্র শোভিত। বাংলাদেশের ছেলেমেয়েদের অতি পরিচিত প্রিয় লেখকদের রচনাবলী সংগ্রহ করে সম্পাদক বিশুবাবু শিশুসাহিত্যে অসাধারণ কীর্তি স্থাপন করেছেন এবং ভরদ্বাজের ভাণ্ডার সম্পদশালী করে তুলেছেন। "ভ্যাবাচাকা সিরিজ" বিশুবাবুর আর এক নূতন অভিযান। ভরদ্বাজের প্রকাশিত এই বইগুলি নিয়ে শিশুমহলে যে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। কারণ, এই এই ধরণের বইই আজকাল শিশুরা চায়।

পাগলের আশা—

মানুষ পাগল হয়ে গেলে তার সম্বন্ধে আমরা প্রায়ই হতাশ হয়ে পড়ি, ক্বচিৎ দু'একজন আপনিই আরোগ্য হয় বটে, কিন্তু, অধিকাংশ পাগল পাগলই থেকে যায়। এদের কি উপায়ে প্রকৃতিস্থ করা যায় এ সম্বন্ধে অনেকদিন থেকেই গবেষণা চলছিল। ফলে এটা জানা গেল যে পাগলরা যদি একটা কিছু ভীষণ মানসিক ধাক্কা খায়, যাকে ইংরিজিতে shock বলে, তাহলে পাগলামী সেবে যায়। কিন্তু ওদের মন প্রকৃতিস্থ নয় বলে মানসিক আঘাত ওবা পায় না, কাজেই বাধ্য হয়ে ওদের শরীরে একটা স্নায়বিক ধাক্কা দেবার প্রচেষ্টা হয় এবং তাব ফলে আশ্চর্য উপকার পাওয়া যায়। ইটালি প্রথম এই পরীক্ষা শুরু করে ইনস্যুলিন, ক্যাম্ফর, মেট্রাজল প্রভৃতি উগ্র ঔষধ পাগলদেব শরীরে ইন্‌জেকসান্ করে। উপস্থিত আবিষ্কৃত হয়েছে যে পাগলদের মস্তিষ্কে বৈদ্যুতিক প্রবাহেব ধাক্কা দিলে আরও সত্বর অধিকতর সুফল পাওয়া যয়। ইলেক্‌ট্রিক শক খেয়ে পাগলরা অজ্ঞান হয়ে যায়, পরে যখন জ্ঞান হয় তখন তাবা সহজ অবস্থায় ফিরে আসে। যদি একবারে না ফল পাওয়া যায় তাহলে বার বার দিতে হয়। এ উপায়ে আবোগ্য নাকি নিশ্চিত।

মহাকায় এঞ্জিন—

আমাদের দেশে যে সব এঞ্জিন রেলওয়ে ট্রেন নিয়ে যায় তারা এই নূতন এঞ্জিনের কাছে নিতান্ত শিশু। রোডেশিয়ার রেলপথে এই এঞ্জিন ট্রেন নিয়ে যাতায়াত করে। বেচুয়ানা ল্যাণ্ড থেকে বুলাবেয়ো পর্যন্ত দূরত্ব প্রায় ৪০০ মাইল। কিন্তু এই এঞ্জিনের প্রচণ্ড শক্তি ও প্রবল গতি তিন চার ঘণ্টার মধ্যে যাত্রীদের এই চারশ' মাইল দূরে পৌঁছে দেয়! এক একটি এই নূতন দৈত্য এঞ্জিনের ২৮ খানি চাকা, ওজন হবে ১৮০ টন, এবং লম্বায় প্রায় ৮৫ ফুট। ৬৫০ টন্ ওজন বা ভাব টেনে নিয়ে এই এঞ্জিন অনায়াসে ঘণ্টায় ১০০ মাইলের বেশী ছুটে যেতে পারে। যদি গতি শিথিল করে চালানো হয় তাহলে এই দৈত্য এঞ্জিন প্রায় ১২০০ টন ওজনের ভার টেনে নিয়ে চলতে পারে। এই এঞ্জিন একটি তৈরি করতে খরচ পড়ে মাত্র ৯ লক্ষ টাকা। সে দিনের ক্ষুদ্র রোডেশিয়া যে সুবিধা ভোগ কবছে ভারতের বড় বড় বেল কোম্পানী আজও এখানে তার ব্যবস্থা করতে পারেন নি।

নির্দোষ কীটারি—

মাছি, মশা, আরশুলা প্রভৃতি অনিষ্টকর পোকামাকড় ও কীটপতঙ্গ বিনাশ কববার জন্য যে সব ঔষধ এ পর্যন্ত বেরিয়েছে তা মানুষ এবং ঘোড়া গরু কুকুর বিড়াল প্রভৃতি গৃহপালিত পশু পক্ষীর পক্ষে সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। সেই জন্য বৈজ্ঞানিকেরা চেষ্টা করছিলেন এমন একটি ঔষধ আবিষ্কার কর'তে যা বক্তমাংসের শবীর বিশিষ্ট প্রাণীদের পক্ষে অনিষ্টকব না হয়। সম্প্রতি তাঁবা 'ফেনোথিয়াজইন' নামে একটি ঔষধ আবিষ্কার করেছেন, যাব মূল উপাদান যদিও আলকাতরা এবং গন্ধক, কিন্তু মানুষ ও তদনুরূপ উষ্ণরক্তময় দেহ বিশিষ্ট প্রাণীদের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরাপদ। শুধু তাই নয়, পোকামাকড কীটপতঙ্গ বিনাশ ছাডাও এ ঔষধ সাদা ইঁদুর ও সাদা খরগোস প্রভৃতির গায়ে লাগালে তাদের সমস্ত রোঁয়া লাল হয়ে যায়।' গরুকে যদি খড়ভুষির সঙ্গে মেখে খাওয়ানো হয় তাহলে গরু দুধ দেয় দিব্যি গোলাপী রংয়ের! যেন দুধে-আলতা গোলা! বৈজ্ঞানিকেরা বলছেন যে মেয়েদের মাথার চুল নাকি এর সাহায্যে সহজেই লাল করে ফেলা যায়।

বরফ-বর্জন—

উত্তরমেরু ও দক্ষিণমেরু চিরদিন কঠিন বরফাবৃত থাকে। পৃথিবীর এত বড় দুই ভূভাগ মনুষ্যবাসের অযোগ্য

হয়ে পড়ে আছে এ মানুষের সহ্য হচ্ছে না। তারা উঠে পড়ে লেগেছে ওখানকার বরফ সরিয়ে ফেলে ওই দুই মহাদেশকে কাজে লাগাতে। বাস ও চাষবাস দুইই যাতে চলে এজন্য চাই বরফ সরিয়ে মাটি বার করা এবং সে মাটি আবার যাতে বরফে না ঢাকা পড়ে যায় তার পাকাপাকি ব্যবস্থা করা। বহুবিধ পরীক্ষার পর সম্প্রতি আবিষ্কার করেছেন তাঁরা যে কয়লার গুঁড়ো নাকি এই বরফের যম। অর্থাৎ জানা গেছে যে এই তুষার স্তূপের নিয়ে মাটির মধ্যে নাকি বিরাট কয়লার খনি আছে। প্রথমটা কতক অংশের বরফ কেটে তারপর মাটি কেটে খনির মধ্যে পৌঁছিতে হবে, তারপর সেই খনি থেকে কয়লা তুলে বরফের উপর ছড়িয়ে রাখতে হবে ধূলার মতো গুঁড়িয়ে। তারপর সূর্যের তাপ ও আলো বাকি কাজটুকু করবে অর্থাৎ রৌদ্রের তেজ কয়লায় আগুন ধরিয়ে বরফ গলিয়ে দেবে।
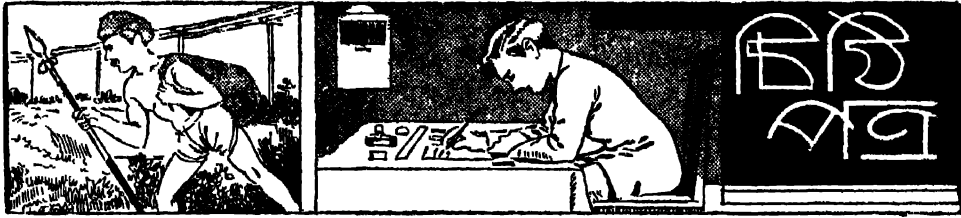
শ্রীযুক্ত "ভূতোগোয়েন্দা" মহাশয় সমীপেষু—

গত অগ্রহায়ণ মাসের প্রশ্নের যে উত্তর উমা বাগচী দিয়েছেন তা'র একটু প্রতিবাদ করতে হচ্ছে। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে তিনি লিখেছেন "বর্তমান ভারতে সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা কবি, শ্রীকামিনী রায়"।

কিন্তু কয়েক বৎসর হলো কামিনী রায় মারা গিয়েছেন। সুতরাং "বর্তমান" কথাটা ব্যবহার করা উচিত হয়নি।

কামিনী রায় মৃতা, সুতরাং তাঁর নামের পূর্বে "শ্রী" হবে না। "শ্রী" ব্যবহার করলে তাঁকে জীবিতা বলে মনে হবে।

৺কামিনী রায়ের স্বামী কেদার নাথ রায়ও মৃত। সুতরাং তাঁর নামের পূর্বেও "শ্রী" বসবে না। ইতি—

বিনীত

শ্রীনীতীশরঞ্জন দে ও শ্রীনিখিলরঞ্জন দে।

শ্রদ্ধেয় "ভূতোগোয়েন্দা" মহাশয়ের সমীপেষু

মহাশয়—

যেদিন প্রথম "পাঠশালায় আপনার নাম দেখলাম সে দিন একটু চমকে উঠেছিলাম। ভেবেছিলাম হয়ত আপনি ভূতের খেলা দেখাবেন। কিন্তু পরে দেখলাম আমার সে ধারণা ভুল। আপনি যে খেলা দেখাতে লাগলেন তা ভূতের খেলার চেয়ে আনন্দদায়ক এবং সে খেলার মধ্যে এমন যথেষ্ট শিক্ষার জিনিস আছে যা আমাদের সকলের শিক্ষা করা প্রয়োজন। যা হোক বেশী কিছু লিখে চিঠির কলেবর বৃদ্ধি করতে চাই না। ইতি—

শ্রীউমাপাল চৌধুরী। গ্রাঃ নং ১০৬৪, রাণাঘাট

শ্রদ্ধাপদেষু—

সম্পাদক মহাশয়, সমীর চৌধুরীর প্রস্তাব আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছি। পাঠশালার খেয়ালী পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে 'পত্রী-মৈত্রী সম্বন্ধ দৃঢ় করিয়া তুলিতে হইলে সত্যই যাহাতে তাহারা পরস্পরের সখের খেয়াল (Hobby) মিটাইতে নিজেদের দাবীদাওয়া অভাব অভিযোগগুলি বিদেশী বন্ধুদের নিকট জানাইতে এবং তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে পারে সেই ব্যবস্থায় ভূতোগোয়েন্দার একটী বিনিময় সভা (Exchange Club) রাখা আবশ্যক মনে করি। ইহার জন্য আপনাদের বড় জোর অর্দ্ধ-পৃষ্ঠা ব্যয় হইবে, তাহাতে কুণ্ঠিত হইলে যুক্তি-বিরুদ্ধ হইবে। কারণ ইহাতে তরুণ প্রাণে যে আশার সঞ্চার হইবে, তাহা অমূল্য। আপনি আমাদের নমস্কার নিবেন। ইতি—

নীলিমা ও অরুণ মুখোপাধ্যায়

২৬।১২।৪০

মাননীয় "পাঠশালা" সম্পাদক মহাশয়—

আপনাদের পাঠশালাকে নিঃসঙ্কোচে একখানি প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা বলা যায়, আমাদের বাড়ীতে আরও ২।৩ খানা মাসিক পত্রিকা আসে, কিন্তু পাঠশালা এলে বাড়ীতে যেরকম কাড়াকাড়ি পড়ে যায়, সেরকম আর কোনটার সময়েই হ'য় না, পাঠশালার উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি। আমার প্রণাম জানাবেন। ইতি—

বিনীতা
কুমারী ফাল্গুনী চৌধুরী,
গ্রাঃ নং ২২০৩

মাননীয়,

ছোটদের সাহিত্য আসরে পাঠশালা আজ নিজের বৈশিষ্টের জন্য বিখ্যাত। আমরা পাঠশালার শুভাকাঙ্খী, তাই কয়েকটি কথা নিবেদন করতে চাই।

বিদেশী শিশুপত্রিকাগুলোর গ্রাহকদের মধ্যে প্রায়ই একটা সুন্দর সংস্পর্ক সৃষ্টি হয়ে থাকে। তারা নিজেরা দল গঠন করে। পত্রিকা মারফৎ তাদের দলের কথা জানায়, একসঙ্গে মাঝে মাঝে মিলে মিশে আমোদ আহ্লাদ করে।

মন্দভাগ্য বশতঃ বাংলার ২।১টি পত্রিকা ছাড়া অন্য কারও এ ব্যবস্থা নাই। একমাত্র রংমশালের ছিল জানি। Illustrated weekly, Orient, Statesman, My Magazine প্রভৃতি ইংরাজী পত্রিকায় young League বা ছোটদের সঙ্ঘ আছে।

তাদের মধ্যে Stamp, সিগারেটের ছবি, ফটো, চকলেটের ছবি, কুপন এই সব বিনিময় হয়ে থাকে। পত্রিকার কর্তৃপক্ষদের চেষ্টায় ছোটদের এই সব সমিতি বেঁচে থাকে।

আমর মনে হয় "পাঠশালায়" এইরূপ একটি সঙ্ঘের সৃষ্টি হলে মন্দ হয় না। ২।১টি পাতা এদের জন্য 'পাঠশালা'কে প্রতিমাসে ছেড়ে দিতে হবে। বছরে ১৲ অথবা ॥০ আনা ঐ রকম একটা কিছু চাঁদা নিয়ে একটা 'ব্যাজ্' জাতিয় কিছু সভ্য-নিদর্শন দেওয়া হবে। মাঝে মাঝে 'জলসা' হবে, আসর বসবে, যারা গাইতে জানে, ছোট ছোট কবিতা লিখতে জানে, ছোটদের গল্প লিখতে জানে তারা আসরে গান গাইবে, কবিতা আবৃত্তি করবে, গল্প পড়ে শোনাবে। সম্পাদকেরাও আমাদের নূতন কিছু দিতে চেষ্টা করবেন।

আশাকরি আমার এ ক্ষুদ্র প্রস্তাবে অসম্মতির কোন কারণ নেই। *

চিঠিখানি পাঠশালায় ছাপালে, অথবা এর মর্ম পাঠশালার পাঠকপাঠিকাদের জানালে অত্যন্ত বাধিত হব।

আমার প্রণাম গ্রহণ করবেন।

প্রণত
শ্রীদেবলকুমার সেনগুপ্ত
গ্রাহক সংখ্যা—২৫৯০

* আপত্তির একটা কারণ আছে। এরূপ আসর কেবল শহরের গ্রাহক গ্রাহিকারাই উপভোগ করতে পারবেন, মফঃস্বলের গ্রাহক গ্রাহিকারা ফাঁকি পড়বেন। (পাঃ সঃ)

* রংমশালের দল উপস্থিত বোধ হয় আর নেই। সম্প্রতি বাংলা 'আনন্দ বাজার পত্রিকা' এরূপ একটি দল গঠনের ব্যবস্থা করেছেন। (পাঃ সঃ)

পত্রের উত্তর—

শ্রীমান দেবলকুমার যে প্রস্তাব করেছেন—ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের—ইংরাজীতে যাদের বলে Kids, তাদের পক্ষে এরূপ 'দলগঠন' অবশ্য খুবই ভাল। অন্যান্য দেশে ছেলেমেয়েদের এরূপ সঙ্ঘ আছে। কিন্তু 'পাঠশালা' পত্রিকা ঠিক বাচ্ছা ছেলেমেয়েদের উপযোগী নয়। একটু বয়ঃপ্রাপ্ত বালকবালিকারাই পাঠশালার গ্রাহকগ্রাহিকা। সম্ভবত দেবলকুমারের প্রস্তাব ঠিক তাদের পক্ষে সমিচীন বলে গণ্য হবে না। তবে নীলিমাদের 'এক্স্‌চেঞ্জ ক্লাব' করা যায়। পাঃ সঃ

শ্রীজয়শ্রীদাশ কল্যাণীয়াসু—'পরাগ ও বেণু' পাঠশালায় অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। শ্রীমান্ বিশ্বনাথ সেনগুপ্ত কল্যাণীয়েষু—'পাঠশালা' তার গ্রাহকগ্রাহিকাদের রচনার জন্য একটি পৃথক বিভাগ খুলে তাঁদের 'Scheduled Class'এর মত অপমানিত করতে ইচ্ছা করেন না। তাঁদের রচনা প্রকাশযোগ্য হ'লে সাদরে আর সকলের সঙ্গে সমান সমাদরেই পাঠশালায় প্রকাশ করা হয়। তোমাদের কোনো প্রশ্নের সঠিক উত্তর যদি তোমাদের পাঠশালার বন্ধু বান্ধবীরা কেউ দিতে না পারেন তাহলে নিশ্চয়ই 'ভূতগোয়েন্দা' তার উত্তর দেবেন।

গত মাসে বর্তমান ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী মহিলা কবি হিসাবে তিনজন মহিলা কবির নাম উল্লিখিত হয়েছে। ভূতগোয়েন্দা বলছেন পাঠশালার পাঠক-পাঠিকা ও গ্রাহক গ্রাহিকাদের ভোটের দ্বারাই স্থির করা হোক এই তিনজনের মধ্যে কে সর্বশ্রেষ্ঠ? শব্দ-সন্ধান কুপনের পিছনে 'ভোটের ফর্ম' ছেপে দেওয়া হ'ল। যিনি যাঁকে শ্রেষ্ঠ মনে করবেন তাঁর নামটি রেখে বাকি দুজনের নাম কেটে দিয়ে নিজেদের নাম ঠিকানা ও গ্রাঃ নং লিখে পাঠাবেন। শ্রীমান মধু ঘোষাল এবং পার্বতীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের পত্রের উত্তরে তাঁদেরও এ কথাই নিবেদন করছি। গত ভাদ্র মাসের পাঠশালার 'ধাঁধাঁ' রচয়িতা হ'লেন 'রিজলী' সাহেব। 'অবাক কাণ্ড' ও 'বিচিত্রসংবাদ' নিত্য ঘটে না। কিছু সংগ্রহ হ'লেই মধুবাবু পাঠশালায় দেখতে পাবেন। যারা গ্রাহক নয় এমন পাঠক-পাঠিকার প্রতি তিনি এত বিরূপ কেন? শ্রীমান সৌরভ সনাতনী কল্যাণীয়েষু—'LAWYERS' শব্দটিকে ভেঙে 'LEWRAYS' (ঈষদুষ্ণ রশ্মি) এবং 'WRY SEAL' (বাঁকা মোহর) এই দুটি শব্দ তুমি পাঠিয়েছিলে, কিন্তু কোনোটিই প্রচলিত নয়। তুমি বলছ—পাঠশালার উত্তর 'SLY WARE' (ধূর্ত জিনিষ) ঠিক হয়নি। অবশ্য WARE অর্থে জিনিষ ধরলে নিশ্চয়ই ঠিক হয় না, কিন্তু তোমার ভেবে দেখা উচিত ছিল যে WARE মানেত' শুধু 'জিনিষ'ই বোঝায় না আরও অনেক কিছু বোঝায়। যেমন WARE মানে জ্ঞাত, বিদিত, অবগত, যথা—'AWARE' শব্দে, আবার WARE মানে সাবধান বা সাবধান হওয়া, সতর্কতা অবলম্বন করা বা পরিহার করা যথা 'BEWARE' শব্দে। সেই রকম এখানে 'SLY WARE' শব্দের অর্থ 'ধূর্ত জিনিষ' নয়, একজন চতুর সতর্ক লোক। ইংরাজি কথ্য ভাষায় রসিকতাচ্ছলে এ শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। তারপর, তুমি জানতে চেয়েছো পাঠশালায় সম্পাদককে লেখা গ্রাহক গ্রাহিকাদের পত্র প্রকাশ করা হয় কি নিয়মে। বিশেষভাবে 'চিঠিপত্র' বিভাগের জন্য লেখা সমস্ত পত্রই পাঠশালায় প্রকাশ করা হয়, যদি না তাতে আপত্তিজনক কিছু বা লেখকের নির্বুদ্ধিতা প্রকাশক কিছু লেখা থাকে। অবশ্য চিঠির অবান্তর অংশ সম্পাদক মহাশয় কেটে ছেঁটে ছোট করে দেন। কারণ, স্থানাভাব।

রচনা প্রতিযোগিতা

এবারও আমরা পাঠশালার বহু গ্রাহক-গ্রাহিকারদের কাছে থেকে 'জন্মভূমির' উপর রচিত তাঁদের একাধিক কবিতা প্রতিযোগিতার জন্য পেয়েছি। তার মধ্যে কলিকাতার গ্রাহক শ্রীমান নীহাররঞ্জন ঘোষ দস্তিদারের কবিতাটিই সর্বশ্রেষ্ঠ ও প্রকাশযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় তাঁকেই পুরস্কার দেওয়া হবে এবং তাঁর কবিতাটি আগামী মাসের পাঠশালায় প্রকাশিত হবে।

আগামী মাসের পাঠশালায় "হাসির গল্পে"র প্রতিযোগিতা হবে। মাঘ মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে রচনাটি পাঠশালা অফিসে পৌছান চাই। সাধারণ এক্সারসাইজ্ বুকের আট পৃষ্ঠার বেশী হলে চলবে না। নাম ও গ্রাহক নম্বর স্পষ্ট করে লিখতে হবে এবং হাতের লেখা ভাল হওয়া চাই। কাগজের দু'পিঠে যেন কেউ লিখে পাঠিও না।

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন—

কটকের শ্রীমান সমীর চৌধুরীর পৌষের প্রশ্নের উত্তরে :—পুস্তক অনুবাদে রচয়িতার অনুমতির দরকার, তবে সেই পুস্তক প্রকাশের ১২ বৎসর পরে লেখকের বিনা অনুমতিতে যে কেহ তাঁহার বই অনুবাদ করিতে পারেন।

নবনীকুমার চৌধুরীর ২য় প্রশ্নের উত্তরে আমার মনে হয় কালীপ্রসন্ন সিংহের "মহাভারত"ই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বাংলা পুস্তক—কারণ ইতিহাস এবং অভিধানকে ঠিক বই বলা যুক্তি-সঙ্গত নয়। ইতিহাস একটী সংগ্রহ-গ্রন্থ এবং অভিধানও তাই। একটি অতীত ঘটনার সংগ্রহ, একটি শব্দ সংগ্রহ। ৺দুর্গাদাস লাহিড়ীর 'পৃথিবীর ইতিহাস' ও ৺নগেন্দ্রনাথ বসুর 'বিশ্বকোষ', এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের পৃষ্ঠার সংখ্যা দিলাম।

বিশ্বকোষের ২২টী ভাগ আছে—১ম ভাগে ৬৯৬, ২য় ভাগে ৫৭৬, ৩য় ভাগে ৬৪০, ৪র্থ ভাগে ৭৩৯, ৫ম ভাগে ৭০৪, ৬ষ্ঠ ভাগে ৭৩৮, ৭ম ভাগে ৭৮০, ৮ম ভাগে ৭৫২; ৯ম ভাগে ৭৬৮, ১০ম ভাগে ৮৬৪, ১১শ ভাগে ৭৬৮, ১২শ ৭৬৮, ১৩শ ভাগে ৭৬৮, ১৪শ ভাগে ৭৭০; ১৫শ ভাগে ৭৫৭; ১৬শ ভাগে ৭৬৬, ১৭শ ভাগে ৭৩৮, ১৮শ ভাগে ৭৬৮, ১৯শ ভাগে ৭৫২, ২০শ ভাগে ৭৬২, ২১শ ভাগে ৭৬৬; ২২শ ৭০৮। সর্বসমেত মোট ১৬৩৪৮ পৃঃ।

৺কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭৭০।

৺দুর্গাদাস লাহিড়ীর ৮ম ভাগ পৃথিবীর ইতিহাসের পৃষ্ঠা সংখ্যা দিলাম—১ম ভাগে ৫০৭, ২য় ভাগে ৫৩৪, ৩য় ভাগে ৫:৮, ৪র্থ ভাগে ৪৯৬, ৫ম ভাগে ৪৬০; ৬ষ্ঠ ভাগে ৪৬২, ৭ম ভাগে ৪৭০, ৮ম ভাগে ৫৪০।—মোট ৩৯৮৭ পৃঃ।

বিনীতা—নীলিমা মুখার্জী

১১৫ই, হরিতকীবাগান লেন, কলিকাতা

গদ্য কবিতা সম্বন্ধে শ্রীমান মধুঘোষালের প্রশ্নের উত্তর :—

৩। আভিজাত্য অনপেক্ষ সর্বজনীন শব্দ সংগ্রহ ও বিভিন্ন ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ গ্রহণ ও সংস্থাপনের মৌলিকত্ব, আধুনিক গদ্য কবিতার বিশেষত্ব। সোজা সরল শব্দের সঙ্গে দুরূহ অপ্রচলিত শব্দ সমন্বয়ে রচিত তীর্যক ও বুদ্ধিবৃত্তি প্রসূত (Intelectual) অথচ চারিপাশের সাধারণের সুখ দুঃখের সহিত সংশ্লিষ্ট গদ্যকবিতা প্রাকআধুনিক যুগে বিরল ছিল। অতি আধুনিক গদ্য কবিতার সুর ও ভাষা প্রাকআধুনিক যুগের মত প্রাদেশিকতা দোষে দুষ্ট, ও সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয় হইয়াও বলা চলিতে পারে। ইহাতে বিশ্বভাবধারার আবেদন ও আকৃতি আছে।

শ্রীকালিদাস সাহা

গ্রাঃ নং ৩০৭৮

শ্রীমান উদয় ভানুসিংহের প্রশ্নের উত্তর :—

চশমা পরলে যিনি চোখে কম দেখেন তিনি ভাল দেখতে পান এবং একটু আধটু খারাপ থাকলে চোখ অনেক সময় ভাল হয়ে যায়। যাঁর চোখ খাবাপ, তিনি চশমা না নিলে তাঁর চোখ আরও খারাপ হয়ে যায়। চশমায় চক্ষুরোগ ভাল হয় না। চশমা দৃষ্টিশক্তিকে আরও খারাপ হতে বাধা দেয়। অনেক সময় ঠিক চশমা না নেওয়ার ফলে চোখ আবও খাবাপের দিকে অগ্রসর হয় ইতি—

বিনীত

শ্রীসুনীলচন্দ্র ঘোষ, দিল্লী

১। শ্রীমান অশ্বিনীকুমাব, আহমদপুর : ভারতীয় সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই 'ম্যাট্রিকুলেশন' পরীক্ষা নাম থাকায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও ১৯১০ সালে 'এণ্ট্রান্স' পরীক্ষা নাম তুলে দিয়ে 'ম্যাট্রিকুলেশন' নাম দিয়েছেন।

২। শ্রীমান সমীর, কটক : বিদেশী রচনা অনুবাদ করতে হলে লেখকের অনুমতির প্রয়োজন।

৩। শ্রীমান মধু, মুগকল্যাণ : গদ্য কবিতাকে এক কথায় 'গবিতা' বলতে পারো। ছন্দযুক্ত সুললিত শ্রুতি মধুর রচনাকেই আমরা কবিতা বলি। তা'ছাড়া সবই গদ্য। গদ্য কবিতার বিশেষত্ব এই যে গদ্যকে নিতান্ত খাপছাড়া অবস্থাতেই কবিতার ছাঁচে ঢেলে তাকে সুললিত শ্রুতি মধুরিমা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। প্রাক্‌আধুনিক কবিতার সঙ্গে তা'ব পার্থক্য এইখানেই যে সে অর্থ ও ছন্দ বর্জিত। ইতি—

শ্রীমান অনিলববণ ঘোষ, গ্রাঃ নং ৩২২৭
দাবড়া—হুগলী।

পৌষের প্রশ্ন

১। কলকাতার কুমাবী নীলিমা মুখার্জি জানতে চান, সেক্সপীয়রেব বচিত সমস্ত নাটকে কতগুলি লাইন, কতগুলি কথা, কতগুলি চরিত্র, কোনটি তাঁব শেষ রচনা, কোন নাটকখানি সবচেয়ে বড় এবং কোনখানি সবচেয়ে ছোট ?

২। দিল্লীর শ্রীমান সুনীলচন্দ্র ঘোষ জানতে চান— 'এভাবেষ্ট' চূডর সঠিক উচ্চতা কত এবং কোনো অভিযানকারী এ পর্যন্ত উড়ো জাহাজে গিয়ে এভাবেষ্ট চূড়য় নামতে পেরেছেন কি না ?

৩। ঢাকার কুমারী রেবা ভদ্র জানতে চান—বাংলাব সর্বপ্রথম মহিলা কবির নাম কি ?

৪। চট্টগ্রামের শ্রীমান বিশ্বনাথ সেনগুপ্ত জানতে চান—৺শরৎচন্দ্রের পর বাংলাব শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক কে এবং তাঁর রচিত বই কি কি ?

৫। রানাঘাটেব কুমারী উমা পাল চৌধুবী জানতে চান—শিশুসাহিত্যে বংলাভাষায় কতগুলি মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা আছে, সেগুলিব নাম কি ? সম্পাদকগণের নাম কি ? এবং তাহাদের মধ্যে কোনখানি শ্রেষ্ঠ ?

৬। ঢাকার নীতীশরঞ্জন দে জানতে চান—বঙ্গদেশে সর্বাপেক্ষা অধিক ছাত্র কোন হাই ইংলিশ স্কুলে এবং উক্ত স্কুলের ছাত্রসংখ্যা কত ?

৭। আহমদপুবের অশ্বিনীকুমার মণ্ডল জানতে চান—পৃথিবীর বৃহত্তম নগব কোনটি এবং ঐ নামে আব কয়টি নগর কোথায় কোথায় আছে ?

৮। যশোহরের শ্রীমান আভাস দাশগুপ্ত জানতে চান—নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্করের আদি নিবাস কোথায় ? (ইনি আরও তিনটি প্রশ্ন করেছেন, কিন্তু পাঠশালায় এক জনেব ১টিব বেশি প্রশ্ন করবার নিয়ম না থাকায় প্রথমটি ছাড়া অন্যগুলি দেওয়া হল না।)

৯। লক্ষ্ণৌয়ের আভারাণী ও প্রমথনাথ জানতে চেয়েছেন—আমাদের মনে ব্যথা বা দুঃখের কারণ ঘটলে বা শারীরিক আঘাত পেলে আমাদের চোখ দিয়ে জল পড়ে কেন ?

১০। হুগলীর শ্রীমান অনিলবরণ ঘোষ জানতে চান— অন্ধ ও বধির যাবা তাদের চালাবে কে ? প্রকৃতি না মানুষ ?

১১। মুগকল্যাণের মধুঘোষাল জানতে চান—কোনো দেশের কোনো বিশিষ্ট লোকের মৃত্যু ঘটলে সংবাদপত্রওয়ালারা কেমন করে রাতারাতি তাঁদের কার্যাবলী সংবলিত সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করতে সমর্থ হন ?

১২। কলকাতার পৃথ্বীশচন্দ্র সেন জানতে চান—"লীগ অফ্ নেশন" কি? তাঁরা কি করেন? এবং কত সালে এর প্রতিষ্ঠা হয়?

১৩। কলকাতার উদয় ভানু সিংহ জানতে চান—একটা বড় ঘর আছে। ঘর খানার সামনের দিকে তিনটি দরজা। আর পেছনের দিকে তিনটি জানালা। পাশে আবার দুটি দরজা। সামনের তিনটি দরজা বন্ধ করা হ'ল। তারপর যখন পাশের দরজা খোলা হ'ল বা বন্ধ করা হল তখন মাঝখানকার দরজা শব্দ করে ওঠে। ঐ দরজাটা বন্ধ করার সময়, আবার খোলবার সময় এই যে অন্য দরজার শব্দ এ কি কারণে ঘটে?

১৪। নসীপুরের সুশীলকুমার সরকার জানতে চান—আমরা মিথ্যা কথা বলি কেন?

১৫। সিমলা শৈল থেকে শ্রীমান পীযূষকান্তি সেন জানতে চেয়েছেন—পাঠশালায় প্রকাশিত উপন্যাস "৩১শে মার্চ মঙ্গলবার বেলা বারোটা"—এ কোন সালের মার্চ মাসের কথা?

১৬। রামপুর হাটের পার্বতীশঙ্কর মুখোপাধ্যায় জানতে চেয়েছেন—কোন বাঙালী সর্বপ্রথম ইংরিজীতে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেন?

পাঠশালার গ্রাহক গ্রাহিকা ও পাঠক পাঠিকাদের এই প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর দিতে অনুরোধ করি। (ভুঃ গোঃ)

একই প্রশ্নের একই রকমের একাধিক উত্তর প্রকাশ করার কোনো মনে হয় না, এজন্য কেবল যাঁদের যে যে উত্তরগুলি সঠিক ও সুবিন্যস্ত সেই সেই গুলি মাত্র প্রকাশ করা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও তাই হবে। গত মাসে "হায়দ্রাবাদের রেজাউদ্দীন সাহেব নোবেল প্রাইজ পাননি" অনেকের দেওয়া এই উত্তর প্রকাশিত হয়েছিল বলেই শ্রীমান উদয়ভানু সিংহ ও অন্যান্য আরও অনেকের দেওয়া এ উত্তর আর প্রকাশ করা হবনি।

এক্স্‌চেঞ্জ ক্লাব

পরিচালক: শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায়

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়—

সবিনয় নমস্কার গ্রহণ করিবেন। সমীরবাবুর পত্রখানি দেখিলাম। উহাতে যে টিকেটখানির উল্লেখ রহিয়াছে, তাহার একখানি আপনাকে ইহার সহিত পাঠাইলাম। এই টিকেটখানি ১৯৩৩—৩৪ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজ-ভারতে অর্থাৎ "গোয়া" প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যবহার ছিল। উহাতে যে যোদ্ধার ছবি আছে, তিনি San Gabrial নামে পরিচিত। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে Vasco da Gama ভারতের পথ আবিষ্কার করিয়া দেশে ফিরিলে ১৫০০ খৃষ্টাব্দে এই Gabrial ১৩খানি পোতে সশস্ত্র ১২০০ শত সৈনিক লইয়া ভারতে আসিয়াছিলেন। ইঁহার প্রতি তদানীন্তন পোপের আদেশ ছিল যে, প্রথমে ধর্মপ্রচারের দ্বারা কার্য সমাধা করিতে চেষ্টা করিবে এবং তাহাতে অকৃতকার্য হইলে তবে অস্ত্র ধারণ করিবে। Gabrialএর এই চেষ্টা ও যত্ন ব্যর্থ হয় নাই। তিনি কালিকট্ ও কোচীনে ধর্মমন্দির স্থাপন করিয়া দেশে ফিরিয়াছিলেন। ইতি—শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায়

অমিয়বাবুর তত্ত্বাবধানে এই মাস থেকেই পাঠশালায় 'এক্স্‌চেঞ্জ ক্লাব' খোলা হ'ল। গ্রাহক-গ্রাহিকারা 'কে—কিসের বদলে—কি চান' পাঠশালার সম্পাদককে জানালে এই বিভাগে তা প্রকাশিত হবে। (পাঃ সঃ)

মাঘ—১৩৪৭

নিয়মাবলী—(১) ধাঁধাঁ-সম্পাদকের মতে শব্দসন্ধানের যেটি সবচেয়ে নির্দোষ ও নির্ভুল সমাধান,—তার সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে উত্তর মেলা চাই। নির্ভুল সমাধানটি পরের মাসের পাঠশালায় প্রকাশিত হবে। (২) সাদা ঘরগুলির প্রত্যেকটিতে একটি ক'রে সংযুক্ত বা অসংযুক্ত অক্ষর বসবে। (৩) প্রতি সংখ্যার প্রতিযোগিতা-কুপনখানি কেটে ভর্তি ক'রে পাঠাবে সেই মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে। দেরি হ'লেই বাতিল। খামের উপরে ঠিকানা লিখবে—'শব্দ সন্ধান" পাঠশালা কার্যালয়, ৩০ কর্ণওআলিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। (৪) হরফগুলি সব পরিষ্কার হওয়া চাই—কাটাকুটি চলবে না। বানান ভুল হলে ভুল ধরা হবে। (৫) যে কোন পাঠক পাঠিকা যতগুলি ইচ্ছা কুপন পাঠাতে পারবে। (৬) 'শব্দ-সন্ধান'-সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ব'লে মেনে নিতে হবে।

সঙ্কেতসূত্র

—পাশাপাশি—

১. বিষপানে শিবের এইরূপই হ'য়েছিল।
৪. কেউ কেউ মনে করেন ভারত উদ্ধারের এই একমাত্র অস্ত্র।
৬. ইনি হিন্দুযুগের একজন ইতিহাস প্রসিদ্ধ নৃপতি।
৮. মাঝিমাল্লাদের এলোমেলো সঙ্গীত।
১০. অলসের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।
১১. যুদ্ধের ব্যাপারে অতি প্রয়োজনীয়।
১৩. গানের আসরে মেলে।
১৫. মনের ভাব প্রকাশের প্রকৃষ্ট উপায়।
১৭. সোজা করে বলা যায়, প্রাণ তোমার এরই মধ্যে রয়েছে।
১৯. ভালো জানা না থাকলে এ ভালো হয় না।
২০. এ সম্রাট প্রায় পছন্দ করে।
২২. পঙ্কজিনী।
২৫. এর পূজাতেও এদেশে অনেকের আপত্তি দেখি।
২৭. উপর নীচের ২ নম্বর ঘরে একে পাওয়া যেতে পারে।
২৮. গুছিয়ে নিতে পারলে মোট একটা হবে।
২৯. এ বড় দুর্লভ।

—ওপর থেকে নীচে—

১. এও ছায়াপথ।
২. লাভের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।
৩. দিনের উল্টা।
৪. চাঁদের একটু অংশ।
৫. নরনারীর হৃদয় এ সহজেই জয় করে।
৯. একে সোজা করতে গেলে মানহানি ঘটবেই।
১২. যা অঞ্জলি পাওয়া যায় তা আর খুঁজতে হয় না।
১৩. ঊর্দ্ধশ্বাস অবস্থা।
১৪. এও একরকম লড়াই।
১৫. ছল।
১৭. শব্দ-সন্ধান প্রতিযোগিতায় যারা নির্ভুল উত্তর দিতে পারবে তারা পরস্পরের বলে গণ্য হবে।
১৮. বনের সিংহ ব্যাঘ্রও মানুষের এই পূর্বপুরুষকে ভয় করে চলে।
২০. এটা তোমাদের মধ্যে বেশী থাকা যেমন অবাঞ্ছিত, একেবারে না থাকাও তেমনি বাঞ্ছিত নয়।
২১. এ রকম জননীকে কেউ স্বর্গাদপি গরিয়সী বলে মানতে চায় না।
২৩ অনেক ধার্মিক বিদ্বান ও বুদ্ধিমানেরও এ ভ্রম হয়।
২৪ আঁট-সাঁট।
২৬ এ মাছের ডিম হয় না।

পৌষের শব্দ-সন্ধানের ফলাফল

পৌষের শব্দ-সন্ধান প্রতিযোগিতায় পাঠশালার সমস্ত গ্রাহক গ্রাহিকা ও পাঠক পাঠিকা 'শ-র'র কাছে ভীষণ হেরে গেছেন। তাঁদের এই শোচনীয় পরাজয়ের কারণ অনুসন্ধান করে জানা গেল যে 'শ-র'র পরামর্শ ও উপদেশ অবহেলা করার ফলেই তাঁরা ধরাশায়ী হয়েছেন। 'শ-র' তাঁদের সকলকে বারংবার সাবধান করে দিয়েছিলেন যে 'শব্দ-সন্ধান' সমাধান করতে বসে সংকেতসূত্র অনুসারে প্রথমেই যে শব্দটি মনে আসবে সেটি ছাড়া অন্য শব্দ আর কি হ'তে পারে যা ঐ সংকেত সূত্রের সঙ্গে মিলে যায় সেইটি ভেবে দেখতে হবে। কারণ 'শব্দ-সন্ধান' নূতন শব্দ শিক্ষার ক্ষেত্র। যে শব্দটি তোমাদের সকলের খুবই জানা সেটি যে 'নির্ভুল' উত্তরের সঙ্গে কখনই মিলতে পারে না এটা মনে রাখা দরকার। শব্দ-সন্ধানের কোনো সোজা রাস্তা নেই। ফাঁকি দিয়ে খুব সহজেই এর সমাধান করা যায় না। যাঁরা ফাঁকি দিয়ে কাজ সারতে চেষ্টা করেছেন তাঁরা সবাই একধার থেকে বেজায় ঠকেছেন। পাশাপাশি ও উপর নীচের ৯নং ঘরে যাঁরা 'পাল' আর 'পাগল' বসিয়েছেন 'শ-র' মনে করেন তাঁরা সবাই পাগল। একমাত্র শিলংয়ের শ্রীমান হরিকমল পুরকায়স্থের এ অখ্যাতির ভাগ্য হয়নি। পাশাপাশি ২১নং ঘরে 'তথাপি' যাঁরা বসিয়েছেন তাঁরা 'শ-র'র অনুরোধ সত্বেও 'তথাচ' ভেবে দেখেননি। অবশ্য রাজসাহীর শ্রীমান শিশিরচন্দ্র রায় প্রভৃতি দু'একজন বুদ্ধিমান ছাড়া। কিন্তু ইনি আবার উপর নীচে ১৫নং ঘরে 'লাক্ষা' বসিয়ে গালার অপর সংজ্ঞা যে 'লাহা' সে সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু শ্রীমান হরিকমল এখানে 'লাহা' লিখে শিশিরের চেয়ে শব্দজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু হলে কি হবে উপর নীচে ২৩নং ঘরে শিশির এবার সঠিক শব্দ 'ক্লিন্ন' বসিয়ে হরিকমলের 'ছিন্ন' লেখার ভ্রান্তির জন্য তাঁকে লজ্জা দিয়েছেন। তবে উপর নীচে ১৮নং ঘরে 'পতি' লিখে শিশিরচন্দ্র কিন্তু হরিকমলের 'পর' লেখার চেয়ে অধিকতর হাস্যাস্পদ হয়েছেন। কারণ, সূত্রে আছে 'বিবাহের পর মেয়েদের এ হওয়া কিছু বিচিত্র নয়' সুতরাং 'হরিকমল' 'পর' লিখে ভুল করলেও সেটা শিশিরচন্দ্রের 'পতি' লেখার ন্যায় মারাত্মক নয়। মেয়েরা আবার কবে কার পতি হয়েছেন? কিন্তু 'শ-র' জানেন বিবাহের পর মেয়েদের 'পত্নী' হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। উপর নীচে ১৩নং ঘরে 'সানুজ' লিখে এঁরা দু'জনেই সূত্রের সঠিক অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে নির্ভুল উত্তর দিতে পেরেছেন, কিন্তু মাত্র আর দু'একজন ছাড়া সকলেই 'অনুজ' লিখে ঠকে গেছেন। উপর নীচে ১৭নং ঘরে যে 'আঁচা' হবে এটা উপরোক্ত দুজন ছাড়া প্রায় শতকরা ৯৯ জন প্রতি-যোগীই 'আন্দাজ' করতে পারেন নি। কাজেই 'শব্দ-সন্ধানের' সঠিক উত্তর এবার একজনেরও কাছ থেকে

পাওয়া যায়নি। এমন কি 'এক ভুল' বা 'দু-ভুল'ও নয়। এবার সবচেয়ে কম ভুল হয়েছে যাঁর, তিনিও তিনটি ভুল করেছেন। সুতরাং 'পুরস্কার' দেওয়া সম্বন্ধে 'পাঠশালা'র শব্দ-সন্ধানের নিয়ম অনুসারে (পাঠশালা আশ্বিন পৃঃ দ্রষ্টব্য) তিনি পুরস্কৃত হ'লেন। এজন্য 'শ-ব' অভিনন্দন জানাচ্ছেন। আশা করি মাঘের শব্দ-সন্ধানের সঠিক উত্তর দিয়ে তিনি সুনাম রাখবেন। মাত্র পাঁচ ভুল পর্যন্ত যাঁদের হয় তাঁদেরই নাম পাঠশালায় প্রকাশ করা হয়, কিন্তু এবার দেখা যাচ্ছে তিন ও চার ভুলের পরই যাঁরা দাঁড়িয়েছেন তাঁরা সবাই পাঁচভুলের দল। (পাঁচ ভূতের নয়।) কাজেই এবার পাঠশালার নিয়মের ব্যতিক্রম করে 'বারো ভুল' পর্যন্ত প্রতিযোগিদের নাম ঠিকানা মুদ্রিত হ'ল। 'বারো ভুলের'ও অর্থাৎ এক ডজনের উপরে যাঁরা গেছেন তাঁদের নাম প্রকাশ করে 'শ-র' আর তাঁর কিশোর বন্ধু ও বান্ধবীদের বিরাগ ভাজন হ'তে রাজি নন।

তিন ভুল

হরিকমল পুরকায়স্থ, শিলং।

চার ভুল

শিশিরচন্দ্র রায়, রাজসাহী, পার্বতীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, বীরভূম।

পাঁচ ভুল

পার্বতীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, বীরভূম। রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, হরিনাভি। মধু ঘোষাল, মৃগকল্যাণ। সুধীরচন্দ্র দেবরায়, হবীগঞ্জ।

ছয় ভুল

অনিলকুমার চক্রবর্তী, হরিনাভি। অবনীভূষণ সরকার, বজবজ্। উদয়ভানু সিংহ, কলিকাতা। কল্যাণী দেবী, টালা। মধু ঘোষাল, মৃগকল্যাণ। মঞ্জু সঞ্জু ও মায়া, কালীঘাট। সুধীরচন্দ্র দেব রায়, হবীগঞ্জ।

সাত ভুল

অশ্বিনীকুমার মণ্ডল, আহমদপুর। মধু ঘোষাল, মৃগকল্যাণ। মঞ্জু সঞ্জু মায়া, কালীঘাট। বিশ্বনাথ সেনগুপ্ত, চট্টগ্রাম। পাঁচুগোপাল বসু, বারাসাত। সুধীরচন্দ্র দেব রায়, হবীগঞ্জ।

আট ভুল

অনিমা দেবী, উত্তরপাড়া। অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়, ফরিদপুর। অশ্বিনীকুমার মণ্ডল বীরভূম। উমারাণী ঘোষ, হাওড়া। উমাশঙ্কর বসু, কলিকাতা। আভা ও প্রমথ মুখোপাধ্যায়, লক্ষ্ণৌ। জয়শ্রী দাশ, গোবরডাঙ্গা। দীলিপ-কুমার সেন, ভবানীপুর। দেবব্রত সিংহ, কলিকাতা। পাঁচু গোপাল বসু, বারাসাত। মঞ্জু সঞ্জু মায়া, কালীঘাট। মধু ঘোষাল, মৃগকল্যাণ। রিষড়া রয়েজ লাইব্রেরী, রিষড়া। সুধীরচন্দ্র দেব রায়, হবীগঞ্জ।

নির্ভুল সমাধান—পৌষ, ১৩৪৭

নয় ভুল

অরুণকুমার বাগচী, শ্রীরামপুর। অশ্বিনীকুমার মণ্ডল, আহমদপুর। ঊষারাণী দেবী, গোরক্ষপুর। কণিকা মুখার্জী, মিঞাবাজার। কালিদাস সাহা, সাহাজাদপুর। গীতা ধর, হুগলী। গীতা ও বাদল পালিত, আসানসোল। গৌরাঙ্গ চন্দ্র মাইতি, মেদিনীপুর। জয়শ্রী দাস, গোবরডাঙ্গা। দীপশিখসাহিত্যমন্দির, শিবপুর। বিনয় দাসগুপ্ত, ডায়মণ্ডহারবার। বিপ্লবকুমার গুহ, চট্টগ্রাম। বিমানকান্তি ঘোষ, সিংভূম। বিশ্বনাথ সেনগুপ্ত চট্টগ্রাম। শশধর বণিক ও আহাম্মদ জামাল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। "সিংহের সম্পূর্ণ ভুল", কলিকাতা। মঞ্জু সঞ্জু ও মায়া, কালীঘাট। স্বাহাদেবী রায়, রংপুর। সুধীরচন্দ্র দেব রায়, হবীগঞ্জ।

দশ ভুল

অজিতকুমার ঘোষ, কলিকাতা। অরুণলাল মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা। আভারাণী ও প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, লক্ষ্ণৌ। উমা বাগচী, রায়পুর, সিপি। উষারাণী দেবী, গোরক্ষপুর, ইন্দু বসু, কণেশ্বর, কণিকা মুখার্জি, মিঞাবাজার। গীতা ও বাদল পালিত, আসনসোল। জয়শ্রী দাস, গোবরডাঙ্গা। ননী, সুধা, জামসেদপুর। নিখিলরঞ্জন দে ও নীতীশরঞ্জন দে, রমণা, ঢাকা। মীরা ও বরুণ, শ্রীহট্ট। সনৎকুমার সেনগুপ্ত, কলিকাতা। সুধীরচন্দ্র দেব রায়, হবীগঞ্জ। হেনা রাহা, ত্রিপুরা। সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, রামপুরহাট।

এগার ভুল

অমলকুমার দত্ত ও নীলিমা দত্ত, কলিকাতা। অণিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, টালা। উমা বাগচি, রায়পুর। উষারাণী দেবী, গোরক্ষপুর। কণিকা মুখার্জি, মিঞাবাজার। কল্যাণী দেবী, টালা। কালিদাস সাহা, মেদিনীপুর। জয়শ্রী দাশ, গোবরডাঙ্গা। জীবেশচন্দ্র রায়, কলিকাতা। নিরঞ্জন রায়চৌধুরী, টাঙ্গাইল। প্রতিমা ঘোষ, বর্ধমান। মৃণালকান্তি গুপ্ত, সৈয়দপুর। শর্মিষ্ঠা সরকার, সালখিয়া। শশাঙ্কশেখর বসু, ভবানীপুর, স্বাহাদেবী রায়, রংপুর।

বারো ভুল

অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়, আজমীর। উষারাণী দেবী, গোরক্ষপুর। নিরঞ্জন রায়চৌধুরী, টাঙ্গাইল। পার্থসারথী বসু, কলিকাতা। পীযূষকান্তি সেন, সিমলা হিল্‌স। বাসন্তী সিংহ, কলিকাতা। রাধারমণ ধর, হুগলী। শঙ্কর, মায়া, যমুনা, গীতি, দীপু চন্দন, মতি ও ইন্দু, বগুড়া। শশাঙ্কশেখর বসু, ভবানীপুর। সিদ্ধেশ্বর মিত্র, কলিকাতা। সুজাতা সিংহ, পুরুলিয়া। সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রাহক নম্বর ২২২২। সুনীল চন্দ্র ঘোষ, নিউদিল্লী।

অক্ষ ক্রীড়া নয়—অক্ষর ক্রীড়া

'PARLIMENT' কথাটির অক্ষরগুলি নিয়ে এমন একটি পদ তৈরী কর যাতে পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যদের স্বরূপ প্রকাশ পায়।

পৌষের অক্ষরক্রীড়া বা 'হরফের হের ফের'

পৌষের যুক্ত-শব্দ ছিল UNITED, একে মুক্ত করলে হবে UNTIED পাঠশালার অধিকাংশ প্রতিযোগী এবার এ খেলায় জিতেছেন। যাঁরা সঠিক উত্তর দিতে পেরেছেন নীচেয় তাঁদের নাম দেওয়া হল—

অজিতকুমার ঘোষ, কলিকাতা। অনিলবরণ ঘোষ, হুগলী। অরুণ বাগচী, শ্রীরামপুর। আভারাণী ও প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, লক্ষ্ণৌ। আভাসচন্দ্র দাশগুপ্ত, যশোহর। অভিজিৎ চ্যাটার্জি, আজমীর। "উই আর সেভেন", ডায়মণ্ড হারবার। উমারাণী ঘোষ, হাওড়া। উমা বাগচী, রায়পুর, খুলনা সি পি। উমাশঙ্কর বসু, কলিকাতা। উদয় ভানু সিংহ, কলিকাতা। কন্যাভবনের ছাত্রীবৃন্দ, কণেশ্বর। কল্যাণী দেবী, টালা। কে. এম. ছায়ফুল হক, ময়মনসিংহ।

কেশবলাল আটা, শালিখা। কালিদাস সাহা, সাহাজাদপুর। গীতা ও বাদল পালিত, আসানসোল। গীতা ধর, হুগলী। গ্রাহক নং ৩০০৯। চিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত, বর্ধমান। জয়শ্রী দাস, গোবর ডাঙা। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা। দীপশিখা সাহিত্য মন্দির, হাওড়া। দীলিপকুমার সেন, ভবানীপুর। নিরঞ্জন রায় চৌধুরী, টাঙ্গাইল। নীতিশরঞ্জন দে ও নিখিল রঞ্জন দে, রমণা ঢাকা। নীলিমা মুখার্জি, কলিকাতা। নীহার ব্যানার্জি, সুধা ব্যানার্জি ও অজয় কুমার, জব্বলপুর। পাঁচুগোপাল বসু, বারাসাত। পৃথ্বীশচন্দ্র সেন, কলিকাতা। প্রবোধকুমার মজুমদার, চাঁদপুর। প্রিয়তোষ গঙ্গোপাধ্যায়, বরাহনগর। ফাল্গুনী চৌধুরী, গ্রাহক নং ২২০৬। বিপ্লবকুমার গুহ, চট্টগ্রাম। বিমলকুমার চক্রবর্তী, কলিকাতা। বিশ্বনাথ সেনগুপ্ত, চট্টগ্রাম। "মধু ব্রাদার্স এণ্ড সিস্টার্স", যুগকল্যাণ। মহিবুব রহমান চৌধুরী, গ্রাহক নং ৩০৭১। মানসী গুহ, অতসী গুহ ও অঞ্জলি গুহ, কলিকাতা। মায়া সেন, কলিঃ। মীরা দাস, গ্রাহক নং ৩২৪৮। মৃণালকান্তি গুপ্ত, সৈয়দপুর। র.ধারমণ ধর, হুগলী। রাম প্রসাদ সিংহ, বেহালা। শঙ্কর নারায়ণ গুহ, বগুড়া। শর্মিষ্ঠা সরকার, শালখিয়া। শশধর বণিক ও আহম্মদ জামাল, মৈমনসিংহ। শৈলেন্দ্রকুমার রায়, গ্রাহক নং ২১৩৯। সনৎকুমার বাগচি ও ননী সুধা, জামশেদপুর। সাধনা বসু, বারুইপুর। সাবিত্রী গাঙ্গুলী, কানপুর। সিদ্ধেশ্বর মিত্র, বালিগঞ্জ। 'সেণ্টু পেণ্টু', রামপুরহাট। সুধীরচন্দ্র দেববায়, হবীগঞ্জ। সুনীলচন্দ্র ঘোষ, দিল্লী। স্বাহা দেবী রায়, রংপুর। সৌরভ সনাতনী, অমলনার। হরিকমল পুরকায়স্থ, শিলং। হেনা রাহা, ত্রিপুরা। হেরম্বকুমার মুখোপাধ্যায়, দিল্লী।
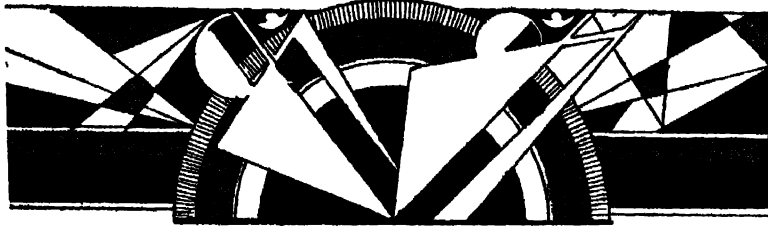
মাঘ—১৩৪১

এমন একটি ইংরাজি শব্দ খুঁজে বের কর—যার বামদিক থেকে এক একটি অক্ষর মুছে দিলেও যেটুকু অবশিষ্ট থাকবে তাতেও এক একটি পৃথক শব্দ বা পদ পাওয়া যাবে এবং তারও অর্থ আছে।

মহিবুব রহমান চৌধুরী, (গ্রাঃ নং ৩০৭১)

পৌষের ধাঁধার উত্তর

শব্দটি "সঙ্গীত" এর ইংরিজী প্রতিশব্দ 'SONG' এবং বাংলা অর্থ 'গীত'। এখন দুটিকে মেলালেই পাওয়া যাচ্ছে 'সঙ্গীত' (SONG+গীত)

মাত্র ৩ জন, ধাঁধার নির্ভুল উত্তর দিতে পেরেছেন,—অসিতকুমার মিত্র, হাওড়া। শৈলেন্দ্রকুমার রায়, কলিকাতা গ্রাঃ নং ৩০০৯। (উত্তরপত্রে এঁর নাম নেই) গতমাসের 'ধাঁধা' পাঠিয়েছিলেন অশ্বিনীকুমার মণ্ডল। শ্রীমান অসিতকুমার তাঁকে একখানি পত্র দিয়েছেন। যাঁরা ভবিষ্যতে 'ধাঁধা' পাঠাবেন তাঁরা এই পত্রখানি প'ড়ে একটু সাবধান হলে ভাল হয়।

ভাই অশ্বিনীকুমার,—

তুমি কিছু মনে করবে না তো? তুমি কি 'ভাইবোন' পড়? তোমার দেওয়া ধাঁধাটি আগেই 'ভাইবোনে' বেরিয়ে গেছে। ধাঁধার উত্তরটি 'সঙ্গীত'—SONG+

গীত। যা হোক এ চমৎকার ধাঁধাঁটি যিনি বার করেছেন তাঁকে ধন্যবাদ। তুমিও কি দেবে না? ইতি—

তোমার বন্ধু,
শ্রীঅসিত কুমার মিত্র
দীপশিখা সাহিত্যমন্দির

হাওড়া।
১৪ই পৌষ, ১৩৪০

নীলিমা, শশধর ও আহম্মদ এবং কালিদাস সাহা ধাঁধাঁর উত্তরে লিখেছেন 'নোনা'=NO+না। কিন্তু এইটি একত্র করলে তার মানে দাঁড়ায় 'একরকম ফল'। 'নোনা'র অর্থত' আর 'না' নয়। শ্রীমান দিলীপকুমার লিখেছেন ইংরিজী MAMMA যার মধ্যে রয়েছে বাংলা 'মা', এবং দুয়েরই অর্থ 'মা'। কিন্তু ইংরিজী শব্দটি যদি MAMMA ধরা হয় তার সঙ্গে বাংলা 'মা' যোগ করলে দাঁড়ায় MAMMA + মা = 'মাম্মামা', এর কোনো অর্থ হয় না। তেমনি শ্রীমান অজিতের উত্তর 'দেওয়াল' 'দে+wall' নিরর্থক। নীহার, সুধা, মীরা ও নীলিমা দেবী লিখেছেন 'জঙ্গল' কিন্তু তাঁরা ভুলে গেছেন যে 'JUNGLE' শব্দ ইংরিজিতে ব্যবহার হলেও ওটা ইংরিজি শব্দ নয়। যেমন বাজার 'BAZAR' শব্দ ইংরিজীতেও ব্যবহার হয় কিন্তু শব্দটি ইংরিজী নয়।

মহিবুর রহমান চৌধুরী লিখেছেন 'অর্থ'। এর অর্থ বোঝা গেল না।

'পত্রী-মৈত্রী' (Pen-Friend)

পাঠশালার নিম্নলিখিত গ্রাহক গ্রাহিকারা পরস্পরের সঙ্গে পেন-ফ্রেণ্ড পাতাতে চান।

শ্রীমান হেরম্বকুমার মুখোপাধ্যায় Co. H. P. Chatterjee Esq, Gali Galian, Near Dariba Bszar Jumma Masjid, Delhi City.

কে এম. ছায়ফুল হক, (ফিরোজ লাইব্রেরী), ময়মনসিংহ।

কুমারী নীলিমা মুখার্জি, ১।১ ই হরিতকী বাগান লেন, কলিকাতা।

শ্রীমান মধু ঘোষাল, যুগকল্যাণ, হাওড়া।

বিশ্বনাথ সেনগুপ্ত, চট্টগ্রাম।

Printer and Publisher R Bhattacharya, Prabhu Press, 30, Cornwallis Street, Calcutta.

"শব্দ-সন্ধান"

(প্রতিযোগিতা-কুপন)

(যে কোনো পাঠক বা পাঠিকা এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারেন, এবং যতগুলি ইচ্ছা কুপন পাঠাতে পারেন)

(পাঠশালা, মাঘ)

নাম.... . .. .

ঠিকানা .. . .

....

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আগামী **১৫ই** মাঘের মধ্যে কুপনখানি পাঠশালা-কার্যালয়ে পৌঁছনো চাই।

☞ (কুপনে কোনো কাটাকুটি বা বানান ভুল চলবে না।)

আমার মতে বাংলাদেশের তথা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা কবি

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু

স্বর্গীয়া কামিনী রায়

শ্রীরাধারাণী দেবী

নাম ——————————

ঠিকানা ——————————

গ্রাঃ নং ——————————

আপনি যাকে ভোট দিতে চান তাঁর নামটি রেখে বাকী দু'টি কেটে দেবেন।

চতুর্থ বর্ষ] ফাল্গুন—১৩৪৭ [ষষ্ঠ সংখ্যা

জন্মভূমি

শ্রীনীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার

(গ্রাহক নং ৩০৭৪)

মনে পড়ে তারে—

দূর প্রবাসের বেদনা ছায়ায় হারায়ে ফেলেছি যারে,
তারে আজি মোর পড়ে মনে বারে বারে।

যার নদীজলে শ্যাম অঞ্চলে কেটে গেছে কত বেলা
স্মরণের তীরে মনোমন্দিরে আজো তারা করে খেলা,

যার ক্ষীর নীরে তরঙ্গ শিরে জ্যোৎস্না ভাসাত তরী
হাসে নীল নভে নির্মল চাঁদ নয়নে স্বপন ভরি,

যার খর্জুর নিম নারিকেল অশথ্ বটের ছায়ে
রচিয়া কুটির বেঁধেছিনু নীড় পাশাপাশি ভায়ে ভায়ে।

যেথা ফুল বাসে স্তব-উচ্ছ্বাসে রজনী হইত ভোর
চির বাঞ্ছিত সে বনভূমিরে মনে পড়ে আজি মোর!

ওগো চির প্রিয়, ওগো বরণীয় প্রথম তীর্থভূমি,
শত যাত্রীর জীব-বিধাতৃ ধাত্রী জননী তুমি।

কত মানুষের আঁখি নীরে ভেজা তোমার গঙ্গাজল,
পিতামহদের কীর্তি কথায় উজল বক্ষতল।

জন্মভূমি গো পরমারাধ্যা! তোমার স্নেহের কোলে
যারা এসেছিল, ভালবেসেছিল, তারা সবে গেছে চলে।

তব উৎসব সভাতল ঘিরে নেমেছে আঁধার রাতি,
ব্যথা নিঃশ্বাস ভরেছে বাতাস, আকাশে নিভেছে বাতি।

শীর্ণ শরীর জীর্ণ জীবন সর্বহারার দল
রুদ্ধ দুয়ারে ভিক্ষুক আজি ম্লান আঁখি ছল ছল।

তবুও তোমারে ভালবাসে তারা—জননী জন্মভূমি
স্বর্গ হতেও গরীয়সী মাগো—মহীয়সী দেবী তুমি!

বাংলা ভাষার আধুনিক রূপ

(জমসেদপুরে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে প্রেরিত)

শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু

সভায় আলোচ্য বিষয় বাংলা ভাষার আধুনিক রূপ। ভাষার রূপের তিন অঙ্গ। (১) লিপি বা বর্ণমালার আকৃতি, (২) শব্দাবলীর প্রকার বা form, এবং (৩) বানান। প্রথম অঙ্গটির আলোচনা করব না, কারণ তার এখনও তেমন তাগিদ নেই। শব্দাবলীর প্রকার নিয়ে বিস্তর বিতর্ক হয়েছে, এখনও তা থামে নি। সাধুভাষা ভাল না চলিতভাষা ভাল? তার ভঙ্গী কিরকম হওয়া উচিত, বঙ্কিমীয়, প্রাচীন রবীন্দ্রীয়, আধুনিক রবীন্দ্রীয়, না অত্যাধুনিক তরুণ-বিক্রীড়িত?

যদি সংজ্ঞার্থ বা definition ঠিক না থাকে তবে বিতর্কে বৃথা বাক্যব্যয় হয়। সেজন্য প্রথমেই, 'মৌখিক লৈখিক, সাধু' আর 'চলিত' এই কটি সংজ্ঞার অর্থ বিশদ হওয়া দরকার। আমার একটা অযত্নলব্ধ মৌখিক ভাষা আছে তা রাঢ়ের, পূর্ববঙ্গের বা অন্য অঞ্চলের। যদি কথাবার্তায় প্রাদেশিকতা বর্জন করতে চাই তবে এই ভাষাকে অল্পাধিক বদলে কলকাতার মৌখিক ভাষার অনুরূপ করে নিতে পারি, না পারলেও বিশেষ অসুবিধা হয় না। কিন্তু আমার মুখের ভাষা যেমনই হক, আমাকে একটা লৈখিক বা লেখাপড়ার ভাষা শিখতেই হবে—যা সর্বসম্মত, যার দ্বারা সকল বাঙ্গালীর সঙ্গে আমার 'সাহিত্য' বা সহযোগ হতে পারে, অর্থাৎ যা সাহিত্যের উপযুক্ত।

মৌখিক ভাষা যে অঞ্চলেরই হক, মুখের ধ্বনি মাত্র, তা শুনে বুঝতে হয়। লৈখিক ভাষা দেখে অর্থাৎ পড়ে বুঝতে হয়। মৌখিক ভাষার উচ্চারণই সর্বস্ব। লৈখিক ভাষার চেহারাটাই আসল, উচ্চারণ সকলে একরকমে না করলেও ক্ষতি নেই, মানে বুঝতে পারলেই যথেষ্ট। লৈখিক ভাষা সর্বসাধারণের সাহিত্যের ভাষা, সেজন্য বানানে মিল থাকা দরকার, উচ্চারণ যাই হক।

আজকাল বাংলা সাহিত্যে যে ভাষা চলছে তার দুই ধারা—সাধু ও চলিত। প্রথম ধারাটি অবশ্য প্রবলতর, কিন্তু তার কিছু পরিবর্তন যে দরকার তা অনেকেরই মনে হয়েছে। পৌষমাসের 'প্রবাসী' পত্রিকায় সম্পাদক মহাশয়ও এইরূপ মত প্রকাশ করেছেন।

সাধুভাষার মানে সৎলোকের বা সভ্যলোকের ভাষা নয়। চলিত ভাষার মানে প্রচলিত ভাষা নয়। বাংলা ভাষার বিশেষণ হিসাবে 'সাধু' আর 'চলিত' দুটিই রূঢ় শব্দ, দুই ভাষাই লৈখিক বা সাহিত্যিক। সাধু আর চলিত ভাষার প্রধান প্রভেদ—সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের জন্য, যথা, 'তাঁহারা বলিলেন' কিংবা 'তাঁরা বললেন', এবং কতকগুলি অ-সংস্কৃত ও সংস্কৃতজ শব্দের জন্য, যথা, 'উঠান, একচেটিয়া, মিছা, সুতা' কিংবা উঠন, একচেটে, মিছে, সুতো'। আর যা প্রভেদ দেখা যায় তা লেখকের ভঙ্গীগত। কেউ বা বেশী সংস্কৃত শব্দ ও সমাস কেউ বা বেশী আরবী ফারসী ইংরেজী শব্দ চালান। কেউ বা পদবিন্যাসে কিঞ্চিৎ নূতনত্বের চেষ্টা করেন। কিন্তু এসকল ভঙ্গী সাধু বা চলিত ভাষার বিশেষক লক্ষণ নয়। একটা ভ্রান্ত ধারণা অনেকের আছে যে, চলিত ভাষা আর পশ্চিমবাংলার মৌখিক ভাষা একই। এর ফলে বিস্তর অনর্থক বিতণ্ডা হয়েছে। সাদৃশ্য এই পর্যন্ত আছে যে চলিত ভাষার সর্বনাম ক্রিয়াপদাদি উল্লিখিত কতকগুলি শব্দের বানান ভাগীরথীতীরস্থ কয়েকটি জেলার শিষ্ট মৌখিক শব্দের উচ্চারণের সঙ্গে মোটামুটি

মেলে। কিন্তু ঐসব জেলাবাসী লেখক যখন চলিতভাষায় লেখেন তখন তিনি তাঁর মুখের ভাষার অনুসরণ করেন না। তিনি তাঁর বন্ধুকে হয়তো বলেন—'গ্যালো রোব্বারে কোথা গেশলে হ্যা?' কিন্তু লেখেন—'গেল রবিবারে কোথা গিয়েছিলে হে।' লেখবার সময় লোকে যতটা সাবধান হয়, কথাবার্তায় ততটা হতে পাবে না।

সাধু বা চলিত যাই হক, সাহিত্যের ভাষা মৌখিক ভাষার সমান হতে পাবে না। তথাপি কোনও এক অঞ্চলের মৌখিক ভাষাব ভিত্তিতেই লৈখিক ভাষা গড়ে ওঠে এবং কালক্রমে একেব পরিবর্তনেব ফলে অপরের পরিবর্তন আবশ্যক হয়। এই পরিবর্তন বিনা বিতর্কে বিনা পরামর্শে সাধুভাষায় কিছু কিছু ঘটেছে। রামমোহন রায় লিখতেন 'তাহারদিগের', তা থেকে ক্রমে 'তাহাদিগেব, তাহাদের' হয়েছে। এখন অনেকে সাধুভাষাতেও 'তাদের' লিখছেন। 'লিখা শিখা শুনা ঘুরা লতানিয়া হয়েন যায়েন' স্থানে সাধুভাষাতেও 'লেখা শেখা শোনা ঘোরা লতানে হন যান' চলছে। এই পরিবর্তন জীবন্ত ভাষাব লক্ষণ এবং তা সাধারণের অজ্ঞাতসারে হয়েছে। ভাষার গতি বুঝে সজ্ঞানে সবিচারে আরও অগ্রসর হলে ক্ষতি হবে না।

লৈখিক ভাষাব অবলম্বন হিসাবে পশ্চিম বাঙ্গলার মৌখিক ভাষারই যোগ্যতা বেশী, কারণ এ ভাষার পীঠস্থান কলকাতা সকল সাহিত্যিকের মিলনক্ষেত্র, রাজধানীও বটে। কিন্তু যদি পশ্চিম বাঙ্গলার উচ্চারণের উপর অতিমাত্র পক্ষপাত করা হয় তবে প্রগতি না হয়ে বিপ্লব হবে। শত চেষ্টা সত্ত্বেও উচ্চারণ আর বানানের সংগতি সর্বত্র বজায় রাখা সম্ভবপর নয়। ও-কার আর হস্‌চিহ্নের বাহুল্যে লেখা কণ্টকিত করায় কিছুমাত্র লাভ নেই, অর্থবোধ থেকেই উচ্চারণ আসে। লৈখিক বা সাহিত্যের ভাষায় রূপ ও পদ্ধতি নিরূপিত ও সহজে অধিগম্য হওয়া আবশ্যক, নতুবা তা সর্বমান্য হয় না, শিক্ষারও বাধা হয়। সুতরাং একটু রফা ও কৃত্রিমতা—অর্থাৎ সকল মোখক ভাষা হতে অল্পাধিক প্রভেদ—অপরিহার্য।

সাধু আর চলিত দুরকম লৈখিক ভাষার পৃথক অস্তিত্বের আর প্রয়োজন আছে মনে হয় না। দুইএর সমন্বয় অসাধ্য নয়। এমন লৈখিক ভাষা চাই যাতে বর্তমান সাধুভাষা আর মার্জিতজনের মৌখিক ভাষা দুইএরই সদ্‌গুণ বজায় থাকে। সংস্কৃত সমাসবদ্ধ পদের দ্বারা যে বাক্‌সংক্ষেপ লাভ হয় তা আমরা চাই, আবার মৌখিক ভাষার সহজ প্রকাশশক্তিও হারাতে চাই না। আমার প্রস্তাব সংক্ষেপে নিবেদন করছি।

(১) ক্রিয়াপদ আর সর্বনামের সাধু রূপের বদলে চলিত রূপ গৃহীত হক।

(২) অন্যান্য অ-সংস্কৃত ও সংস্কৃতজ শব্দের কতকগুলির সাধুরূপ আর কতকগুলির চলিতরূপ গৃহীত হক। যে শব্দের সাধু ও মৌখিক রূপের ভেদ আদ্য অক্ষরে, তার সাধু রূপই বজায় থাকুক, যথা—'ওপর পেছন পেতল ভেতর' না লিখে 'উপর পিছন পিতল ভিতর।' যার ভেদ মধ্য বা অন্ত্য অক্ষরে তার মৌখিক রূপই নেওয়া হক, যথা—'কুয়া মিছা উঠান একচেটিয়া' স্থানে 'কুয়ো মিছে উঠন একচেটে।'

(৩) যে সংস্কৃত শব্দ বর্তমান চলিত ভাষায় অচল নয়, অর্থাৎ বিখ্যাত লেখকগণ যা চলিতভাষায় লিখতে দ্বিধা করেন না, তা যেন বিকৃত করা না হয়। 'সত্য মিথ্যা নূতন অবশ্য' স্থানে যেন 'সত্যি মিথ্যে নোতুন অবিশ্যি' লেখা না হয়।

(৪) বর্তমান সাধুভাষার কাঠামো বা অন্বয়পদ্ধতি বা syntax বজায় থাকুক। ইংরেজী ভঙ্গীর অন্ধ অনুকরণ অথবা অকারণে বিশেষ্য সর্বনাম ক্রিয়াপদের বিপর্যয় বর্জনীয়।

এ ভাষায় অনুবাদ করলে সংস্কৃত রচনার ওজোগুণ নষ্ট হবে অথবা এতে দর্শন বিজ্ঞান লেখা যাবে না এমন আশঙ্কা অমূলক। দুরূহ সংস্কৃত শব্দ এবং সমাসের সঙ্গে মৌখিক ক্রিয়াপদ আর সর্বনাম চালালেই গুরুচণ্ডাল দোষ হবে না।

ভাষার রূপের তৃতীয় অঙ্গ বানান। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানানের কতকগুলি নিয়ম সংকলন করে যে পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন তা সকল সাহিত্যসেবীকেই পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। রবীন্দ্রনাথের সমর্থন ও তাঁর লিখিত দৃষ্টান্তের প্রভাবে নূতন বানানগুলি ধীরে ধীরে প্রচলিত হচ্ছে। সবিস্তার আলোচনা না করে নূতন বানানের কয়েকটি প্রধান বিধি জানাচ্ছি।

(১) হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী, প্রভৃতি সংস্কৃতজাত ভাষায় রেফাক্রান্ত ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হয় না। ব্যাকরণ অনুসারে দ্বিত্ব আবশ্যক নয়। বাংলাতেও দ্বিত্ব বর্জনীয়, 'কর্ম' লিখতে একটা ম যথেষ্ট।

(২) কতকগুলি বাংলা শব্দের শেষে অ-কার উচ্চারিত হয়। যেমন 'ছিল বড় কত', কিন্তু অধিকাংশ শব্দে হয় না, যেমন 'ছিলেন তোমার কেমন।' শেষোক্ত শব্দগুলিতে হস্‌চিহ্ন দেওয়া হয় না, যদিও উচ্চারণ হসন্ত। যদি ভুল উচ্চারণের আশঙ্কা না থাকে, তবে অ-সংস্কৃত শব্দে অন্ত্য হস্‌চিহ্ন বর্জনীয়। 'ওস্তাদ পকেট ডিশ হুক' প্রভৃতি শব্দে হস্‌চিহ্নের কোনও দরকার নেই।

(৩) অ-সংস্কৃত শব্দে ণ থাকবে না, কেবল ন। 'কান বামুন কোরান করোনার' প্রভৃতিতে ন। এই প্রথা নূতন নয়, অনেক খ্যাতনামা লেখক বহু দিন থেকে এরকম লিখছেন। নূতন নিয়মে ন-ব প্রয়োগ সকল অ-সংস্কৃত শব্দেই বিহিত হয়েছে।

(৪) আরবী ফারসী ইংরেজী প্রভৃতি বিদেশী শব্দের মূল উচ্চারণ অনুসারে বাংলা বানানে s স্থানে স এবং sh স্থানে শ হবে। যথা—'জিনিষ সরকার ক্লাস নোটিস' দন্ত্য স। 'শরম শুরু শাগরেদ শেমিজ পালিশ' তালব্য শ। হিন্দী প্রভৃতি ভাষাতেও এই রীতি চলে। অনেক বাঙালী মুসলমান লেখকও এই রকম বানান করেন।

(৫) নবাগত বিদেশী শব্দে অনর্থক অন্তস্থ য় বর্জনীয়। war 'ওয়ার' নয়, 'ওআর'। কিন্তু wire 'ওয়ার'। বক্র আ বা বিকৃত এ বোঝাবার জন্য আদিতে অ্যা এবং মধ্যে বা অন্তে ্যা বিধেয়, যথা—'অ্যাসিড, হ্যাট।'

(৬) পৌষ মাসের 'প্রবাসী পত্রিকায়' সম্পাদক মহাশয় চলিত ক্রিয়াপদের খামখেয়ালী বানানের নিরূপণ চেয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়কৃত নিয়মে তা আছে। 'বল্লেন, কর্‌ছিল' নয়, 'বললেন, করছিল'।

কেউ কেউ বলেন—এই নিয়মের কতকগুলি পালন করতে গেলে নানা ভাষার জ্ঞান দরকার। 'জিনিস'এর মূল 'জিন্‌স', 'শাগরেদ'এর মূল 'শাগির্দ'—তা কত লোক জানে? আমি বলি, জানবার বিশেষ দরকার নেই। ব্যুৎপত্তি না জেনেও আমরা শিখি যে 'উজ্জ্বল'এ ব-ফলা আছে, কিন্তু 'কজ্জল'এ নেই। যাঁরা জানেন এবং যাঁদের উৎসাহ আছে তাঁরা নির্দেশ দেবেন, সাধারণে ক্রমে ক্রমে শিখবে।
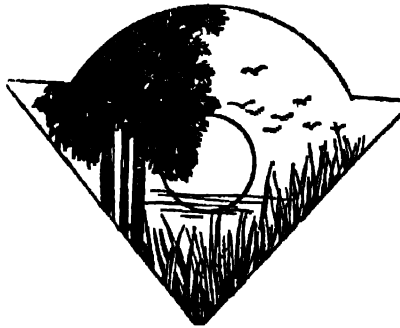
পূর্ববঙ্গের ভূঁইয়া

শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ঈশা খাঁর পরিচয় দিবার আগে বাংলার তৎকালিক অবস্থা সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলা প্রয়োজন। বাংলার শেষ পাঠান সুলতান দাউদ খাঁকে উড়িষ্যার দিকে তাড়াইয়া দিয়া মোগল বাংলার সিংহাসনে বসিল। বসিল মাত্র, কিন্তু, সম্পূর্ণ জয় করিয়া উঠিতে পারিল না। পূর্ববঙ্গের ভৌমিক বা ভূঁইয়ারা দলবদ্ধ হইয়া সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে অস্ত্র লইয়া দাঁড়াইল। ভৌমিকদের দলপতি ছিলেন ঈশা খাঁ। তিনি সুবর্ণ গ্রামের সামন্তরাজ নামে খ্যাত। তাঁহার পিতা ছিলেন হিন্দু, কায়স্থ—নাম, কালাচাঁদ রায়।

ভাটী অর্থাৎ পূর্ববঙ্গে বারোজন ভূঁইয়া বা জমিদার ছিলেন, ইঁহারা সচরাচর রাজা নামে খ্যাত হইতেন। ঈশা খাঁ অন্যান্য ভৌমিক অপেক্ষা বলে বীর্যে ধনে মানে বড় ছিলেন বলিয়াই অন্যান্যেরা তাঁহার আদেশ বড় ভাইয়ের আদেশ বলিয়া মনে করিতেন। ঈশা খাঁ বুঝিয়া দেখিলেন, মোগলের অসীম শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া জয়ী হওয়া ক্রমে অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। ভুলুয়া (নোয়াখালি) উলাইল (ঢাকা), ভূষণা (যশোহর), বিক্রমপুর (ঢাকা) চন্দ্রদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের ভৌমিকরা বিচার করিয়া দেখিলেন মোগলের সহিত সন্ধি না করিলে বাংলা অচিরে মনুষ্যশূন্য হইবে। মোগলের একজন মরিলে দেশান্তর হইতে দশজন আসিতেছে। বাহিরে বাঙ্গালীর ত কেহ নাই।

ঈশা খাঁ একদিন শুনিলেন বিপুল মোগল বাহিনী দিল্লীতে সাজিতেছে। সেনানায়ক শাহাবাজ দম্ভভরে বলিয়াছেন এবার বাংলায় মানুষ রাখিয়া আসিব না। ভূঁইয়ারা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ঈশা খাঁ অবিলম্বে এক সভা আহ্বান করিলেন। যথাকালে মন্ত্রণা কক্ষে সকলে সমবেত হইলেন। গুপ্ত সভা, ঈশা সভাপতি, তিনি বলিলেন, যদি আরাকান ও ত্রিপুরার সাহায্য আমরা পাই, তবেই মোগলকে তাড়াইবার আমরা আশা করিতে পারি।

চাঁদরায় বলিলেন, আর যদি তাঁদের সাহায্য না পাই?

ঈশা। মোগলের সহিত সন্ধি করিতে হইবে।

চন্দ্রদ্বীপের উদয়নারায়ণ তেজের সহিত বলিলেন, সন্ধি! কখনই না। বাংলার ছেলেমেয়ে সকলে অস্ত্র ধরে দাঁড়াবে—মোগলকে নির্বংশ করে আমরা নির্বংশ হ'ব!

বসন্তরায়। তাতে আমাদের কি লাভ উদয়? আমরাই নির্মূল হব, মোগল নির্মূল হবে না।

কেদার রায়। আগে দেখা যাক্ ত্রিপুরা ও আরাকানের সাহায্য পাওয়া সম্ভব কিনা।

পাঠান সর্দার ওসমান। আমরা দশ বিশ হাজার পাঠান ত আছি।

কেদার। আছেন ত উদয়গিরির গুহার ভিতর লুকিয়ে।

ওসমান। ভুলে যাচ্ছেন বীর, বাঘ গুহার মধ্যেই থাকে, সময় বুঝে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

কেদার। আপনাদের সময় আর আসবে না। গুহাতেই থাকুন।

ঈশা। দশ বিশ হাজারে কিছু হবে না সর্দার। অন্তত পঞ্চাশ হাজার চাই। তুমি যাও সাহেব আমাদের পক্ষ থেকে আরাকান রাজার কাছে। তাঁকে সকল কথা বলে সাহায্য চাইবে।

কেদার। ত্রিপুরায় কে যাবে?

ঈশা। আমি নিজে যাব।

বসন্ত। সেখানে গিয়ে যে কিছু হবে, তা মনে হয় না।

ঈশা। চেষ্টা করে দেখি, না হয়, মোগলের সঙ্গে সন্ধি করব।

বসন্ত। একদিন সন্ধি করতেই হবে, আজ তাড়ালেও কাল হয় ত সে আবার আসবে। সোনার বাংলার লোভ কি ছাড়তে পাবে?

সভা ভঙ্গ হইলে ঈশা খাঁ অশ্বারোহণে চলিলেন খিজিরপুরে। এইখানেই তিনি সচরাচর সপরিবারে বাস করিতেন। ইহা বর্তমান নারায়ণগঞ্জ হইতে এক মাইল দূরে। তাঁহার প্রসিদ্ধ দুর্গ "এগারসিন্ধু", খিজিরপুর হইতে বড় বেশী দূর নয়। এই দুর্গের পরিচয় তোমাদের পরে দিব, মোগলের সহিত বাংলার বড় রকমের যুদ্ধ এইখানেই হইয়াছিল। এখন ঈশা খাঁর দৌত্যের কথা বলি।

ঈশা খাঁ দুই শত অশ্বারোহী লইয়া চলিলেন। ত্রিপুরায় যাইতে হইলে চাঁদ রায়ের জমিদারীর ভিতর দিয়া যাইতে হয়। মাঝে মাঝে জঙ্গল। কোথাও গভীর অরণ্য। একদা তিনি অরণ্য পথ অতিবাহিত করিয়া চলিয়াছেন, এমন সময় রমণীকণ্ঠ নিঃসৃত রোদনধ্বনি সহসা তাঁর কর্ণ-গোচর হইল। প্রথমে তিনি উৎকর্ণ হইয়া শুনিলেন, পরে কণ্ঠ অনুসরণ করিয়া বেগে ঘোড়া ছুটাইলেন। সন্নিকটস্থ হইয়া দেখলেন, কতিপয় দুর্বৃত্ত, এক নিঃসহায় রমণীর প্রতি অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে, রমণী যথাসাধ্য আত্মরক্ষা করিতেছে; কিন্তু তার কাতর কণ্ঠধ্বনি প্রকাশ করিতেছিল, ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ঈশা খাঁকে কেহ লক্ষ্য করে নাই। সঙ্কীর্ণ পথ, তিনিই অগ্রগামী ছিলেন, দলের লোকেরা পিছনে। যে দস্যু রমণীর কেশাকর্ষণ করিয়া তাহাকে টানাটানি করিতেছিল, তার হস্ত ঈশা খাঁর খড়্গাঘাতে অচিরে ভূলুণ্ঠিত হইল। দস্যুরা সচকিতে ঈশা খাঁর প্রতি ফিরিয়া দেখিল এবং তাঁকে কাটিতে খড়্গ উঠাইল। কিন্তু সত্বরই তাহারা ঈশা খাঁর সৈন্যকর্তৃক বেষ্টিত হইল। তখন দস্যুরা আত্মরক্ষায় ব্যস্ত হইয়া পড়িল, এবং যে যে দিকে পারিল, পলায়ন করিল। কিন্তু ঈশা খাঁ তাহাদের নিষ্কৃতি দিলেন না,—ছুটিলেন অশ্বারোহণে তাহাদের পশ্চাতে। দস্যুদের কেহ প্রাণ দিল, কেহ বিকলাঙ্গ হইল, কেহ বা বন্দী হইল। তাহারা সংখ্যায় ছিল অনেক। সর্দারকে ধরিয়া ঘটনাস্থলে টানিয়া আনিয়া একটি গাছে বাঁধিয়া রাখা হইল। তারপর ঈশা রমণীর দিকে ফিরিলেন, দেখিলেন, তিনি পরমাসুন্দরী ও যুবতী। জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে মা? রমণী উত্তর না করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন ঈশাখাঁ দস্যুসর্দার সমীপে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এ স্ত্রীলোকটি কে?

দস্যু। কে তা জানি নে, কোনো মেয়ে টেয়ে হবে হুজুর।

ঈশা। বটে। খুব সংবাদ দিলে। চাবুক লাগিয়ে দেখি আরও কিছু সংবাদ জানো কি না।

দস্যু। খোদাবন্দ, বিচার করে দেখুন, আমি একটুও মিথ্যে বলি নি।

ঈশা। একে পেলি কোথা?

দস্যু। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, বল্লুম পথ ভুলেছ, এই দিকে এস, বলতে ও আমার সঙ্গে চলে এল—ওর খসম তাড়িয়ে দিয়ে থাকবে।

ঘোড়ার চাবুক ঈশাখাঁর হাতে ছিল, দুই চারি ঘা চাবুক দস্যুর পৃষ্ঠে পড়িল। তখন দস্যু কহিল, "দোহাই হুজুর। সত্য বলছি, মেয়ে লোকটি পাল্কীতে বসে যাচ্ছিল, লোকজনও সঙ্গে ছিল। তারা আমাদের দেখবামাত্র ভয়ে গাঙের দিকে ছুটে পালাল।

ঈশাখাঁ পুনরায় বিপন্না রমণীর নিকট আসিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, বল মা তুমি কে? জানতে না পারলে আমি যে কোনো ব্যবস্থাই করতে পারছি নে।

রমণী তখন পরিচয় দিলেন, আমার নাম সোনামণি—আমি চাঁদ রায়ের বিধবা ভগ্নী— *

ঈশাখাঁ চমকিয়া উঠিলেন, কহিলেন, কি সর্বনাশ! তুমি আমার বন্ধু চাঁদ রায়ের ভগ্নী। তোমার আজ এই অবস্থা। তুমি কোথা যাচ্ছিলে?

শ্বশুরবাড়ী থেকে, যাচ্ছিলাম গঙ্গাস্নানে।

চল মা, তোমাকে বাড়ী রেখে আসি।

বাড়ী আর যাবো না।

---

* প্রবাদ আছে যে, ঈশা খাঁ এই সোনামণিকে হরণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য চাঁদ রায়ের সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটে। কিন্তু এই কিংবদন্তী যে অমূলক, তাহা আইন ই আকবরি পাঠে বুঝা যায়।

সে কি! কোথা যাবে তবে?

কোনো তীর্থক্ষেত্রে, অথবা গঙ্গাগর্ভে। পাপিষ্ঠ দস্যুরা আমাকে ছুঁয়েছে গৃহে আর ফিরব না।

কোন্ তীর্থে যেতে চাও মা?

বৃন্দাবনে।

তাই হবে, আমি ব্যবস্থা করছি। ঘোড়ায় চড়তে পার কি মা?

আমি শৈশবে দাদার কাছে, যৌবনে স্বামীর কাছে সৈনিকের সকল বৃত্তি শিখেছি।

ঈশা খাঁ তখন বিশ জন শরীররক্ষীসহ সোনামণিকে বৃন্দাবনে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। কিছু অর্থ ও উপদেশ দিয়া বলিলেন, আরও অর্থ ও লোকজন সত্বর বৃন্দাবনে যাইবে।

সোনামণি প্রণাম করিয়া যুক্তকরে ঈশাখাঁকে কহিল, আজ হতে আমি আপনারই কন্যা জানবেন।

"আমি যে মা, মুছলমান।"

"আপনি যাঁর সন্তান আমিও যে বাবা তাঁরই সন্তান, তাঁর নামটি শুধু ভিন্ন বইত নয়।

২

সৎকার্য্যের পুরস্কার সচরাচর যাহা পাওয়া যায়, ঈশা খাঁ তাহাই পাইলেন।—কলঙ্ক—দেশময় রটিয়া গেল তাঁহার কলঙ্ক। পলাতক দস্যুরা প্রচার করিল, একদল দস্যু চাঁদরায়ের ভগ্নীকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। কথাটা ক্রমে চাঁদরায়ের কাণে গেল। তিনি তদন্ত করিলেন। যাহারা সোনামণির শরীর রক্ষী হইয়া তাঁহার শিবিকার সহিত গিয়াছিল, তাহারা বলিল, দস্যুরা ছদ্মবেশে বন্দুকাদি মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে এসেছিল, সুতরাং তাদের বাধা দেওয়া বা অনুসরণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। সোনামণির অন্বেষণে চারিদিকে লোক ছুটিল, ঘরে ঘরে অনুসন্ধান হইল*, বিশ ক্রোশের মধ্যে তাঁহার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। তবে কেহ কেহ বলিল, সৈন্যবেষ্টিত হইয়া এক সুন্দরী যুবতীকে অশ্বারোহণে এই পথে যাইতে দেখিয়াছে। যে কয়জন দস্যু বেত্রাহত হইয়াছিল, তাহারা প্রতিশোধ লইবার বাসনায় প্রচার করিল সোনামণিকে ঈশা খাঁ ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। চাঁদরায় তাহাদের ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহারা দেহের স্থানে স্থানে কাপড় জড়াইয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আসিল, জিজ্ঞাসিত হইবার পূর্ব্বেই কাঁদিয়া উঠিল, কহিল, আমাদের দিদিমণিকে ধরে নিয়ে গেছে।

চাঁদরায়। কে ধরে নিয়ে গেছে?

দস্যু সর্দার। বড় রাজা ঈশা খাঁ।

চাঁদ। ঠিক বল্‌ছিস?

দস্যু। হুজুরের সামনে কি আমরা মিছে বলতে পারি। হুজুর হলেন আমাদের রাজা।

চাঁদ। কোন্ দিকে নিয়ে গেল?

দস্যু। তা ত হুজুর দেখি নি।

চাঁদ। আমাকে খবর দিলিনি কেন?

দস্যু। আমাদের কি খবর দেবার অবস্থা ছিল। দু' দিন পড়ে ছিনু পথের উপর।

চাঁদ। আচ্ছা তোরা এখন যা।

কয়েকদিন পরে চাঁদরায়, পুত্র কেদারকে ডাকিয়া কহিলেন, তোমাকে এ অপমানের প্রতিশোধ নিতে হবে।

কেদার। আপনি কি বাবা, এই লোকগুলোর কথা বিশ্বাস করেন?

চাঁদ। না, সম্পূর্ণ করিনি, তবে আমি লোক পাঠিয়ে জেনেছি, ঈশা খাঁ তার দুর্গে নেই, খিজিরপুরেও নেই। এটাও আমি জেনেছি যে, ঘটনার দিন ঈশা খাঁ, সোনামণির বাড়ীর কাছ দিয়ে গিছল।

কেদার। তাঁর ত্রিপুরা যাবার কথা ছিল, তিনি হয়ত ঐ পথ দিয়ে ত্রিপুরা গেছেন।

চাঁদ। তুমি এখনও বালক, বুদ্ধি শুদ্ধি হয় নি। ঈশা খাঁ ছাড়া আর কারুর সাহস হবে না আমার ভগ্নীকে হরণ করে।

কেদার। কিন্তু পিতা, আমার বিশ্বাস, এ কাজ ঈশাখাঁর দ্বারা সংঘটিত হয়নি। তিনি আমাকে ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ করেন।

চাঁদ। যে পৈত্রিক ধর্ম্ম ত্যাগ করে, সে সব পারে।

* এই অংশ "রাজমালা" বা "আকবরিতে" নাই।

তোমার দ্বারা এ কাজ হবে না দেখছি, যাও, সেনাপতিকে পাঠিয়ে দাও গে।

সেনাপতি জনার্দন আসিয়া অচিরে অভিবাদন করিলেন।

চাঁদ। কথাটা শুনেছ জনার্দন?

জনার্দন। শুনেছি মহারাজ।

চাঁদ। তবে প্রতিশোধ নাও।

জনার্দন। আজ্ঞা করুন মহারাজ—

চাঁদ। ঈশা খাঁর বোন্ বা মেয়েকে ধরে আন্‌তে হবে।

জনার্দন চমকিত হইল। বাপরে! সে সিংহবিবরে কে যাইবে? ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া জনার্দন কহিল, "ঈশাখাঁর ত মেয়ে বা বোন্ নেই।"

চাঁদ। তবে কে আছে?

জনার্দন। আছে এক জেঠ্‌তুতো বোন—সে ওখানে থাকে না।

চাঁদ। যেখানেই থাকুক ধরে নিয়ে এসো।

জনার্দন। সে তার সহোদর ভাই বলরামের কাছে থাকে। তারা হিন্দু, ঈশা খাঁর সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই।

চাঁদ। এই ভাই বোন থাকে কোথা?

জনার্দন। খিজিরপুরের কাছে এক গাঁয়ে। তারা জমিদার নয়, তবে অবস্থাপন্ন লোক।

চাঁদ। মেয়েটা কি বিবাহিত?

জনার্দন। বিয়ে বোধ হয় আজও তার হয় নি। বিয়ে হবার কথা হয়েছিল চন্দ্রদ্বীপের উদয়ের সঙ্গে।

চাঁদ। যাও এখনি, হাজার ঘোড়সওয়ার নিয়ে, মেয়েটাকে ধরে আনা চাই।

জনার্দন। অত লোক নিয়ে গেলে জানাজানি হবে।

চাঁদ। জানিয়েই করতে চাই, লুকিয়ে নয়।

জনার্দন বিদায় হইলে পুত্র কেদার আসিয়া বলিলেন আপনা-আপনির মধ্যে ঝগড়া করা কি ভাল?

তুমি কি এমন গুরুতর অপমানিত হয়েও নীরব থাকতে চাও?

সত্যই যদি আপনি বিশ্বাস করে থাকেন ঈশাখাঁর দ্বারা এ কার্য হয়েছে, তাহলেও এ সময় আপনার নীরব থাকাই কর্তব্য।

তুমি আমার উপযুক্ত পুত্র নও। তোমার মনে তেজ নেই, তুমি ভীরু, কাপুরুষ।

আপনি ভুলে যাচ্ছেন বাবা, অসংখ্য বিদেশী শত্রু আসছে, বাংলাদেশ আক্রমণ করতে, দেশ লুঠ করতে, ধর্ম ধ্বংস করতে, স্বাধীনতা হরণ করতে। প্রতিশোধ নিতে হয় তাদের উপর নিন। তা' না করে এ সময় নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

তুমি জান না কেদার, আমার বুকের ভিতর কি আগুন জ্বলছে। সোনামণি আমার একমাত্র ভগ্নী, বড় প্রিয়, যে তার সর্বনাশ করেছে আমিও তার সর্বনাশ করতে চাই।

আপনি তাহলে স্বদেশের কল্যাণ, ধর্মের পালন, স্বজাতির রক্ষণের দিকে তাকালেন না, নিজের দিকেই তাকালেন। বেশ, দেশ উচ্ছন্ন যাক্, শত শত হিন্দু বিধবা মোগলের অঙ্কশায়িনী হোক, বিগ্রহ শালগ্রাম চূর্ণ হোক, মন্দির ধ্বংস হোক, শস্যক্ষেত্র রক্তরঞ্জিত হোক্—

এ সব তোমার ভীরু মনের কল্পনা।

কল্পনা নয় পিতা, দেশের অবস্থা দেখে আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমাদের এ বাংলার কি দুর্গতি একদিন হবে। যে দেশে আপনার মত ব্যক্তি বিপদের সময় ঘরোয়া বিবাদে লিপ্ত হ'ন, শত্রুকে না মেরে নিজের ভাইকে মারবার জন্যে চক্রান্ত করেন, সে দেশের মঙ্গল কিছুতেই কখনই হ'তে পারে না।

আমার বুক যে অপমানে জ্বলে যাচ্ছে কেদার!

জ্বলুক, যুগ যুগ ধরে' রাবণের চিতা জ্বলুক, শত সোনামণি পুড়ে মরুক, কিন্তু বাংলার মাটিতে রঞ্জিত করে যে বীর্যাভিমানী গৈরিক পতাকা তুলেছেন, দোহাই পিতা, আপনি নিজে তার অপমান করবেন না, আপনি আমাদের এই বীরবংশ অনপনেয় কলঙ্কে মলিন করবেন না।

বলিতে বলিতে বীর যুবক সজল নয়নে কক্ষ ত্যাগ করিলেন। (ক্রমশঃ)

বোন-পো

অধ্যাপক যামিনীমোহন কর, এম-এ

দৃশ্য :—কলিকাতার অভিজাত পল্লীর একটি
বাড়ীতে হালফ্যাসানে সুসজ্জিত কক্ষ।
কাল :—আসন্ন সন্ধ্যা।
কক্ষ মধ্যে একটি তরুণী সোফায় একা বসে
নিবিষ্টমনে উল বুনছেন।

(নেপথ্যে) পিসীমা। ছায়া ও ছায়া, তুই কোথায় মা—

ছায়া। এই যে পিসীমা, আমি এখানে।

(হেমাঙ্গিনী ও তাঁর বোনপো ডাক্তার সত্যচরণের প্রবেশ)

হেমাঙ্গিনী। ওঃ। এইটুকু আসতেই একেবারে হাঁপিয়ে পড়েছি। দিন দিন যেন ক্রমেই কাহিল হয়ে যাচ্ছি। অবশ্য সতু আমার যা করছে নিজের পেটের ছেলেরও বাড়া—

সত্য। কি যে বলছ মাসীমা! তোমার ছেলে পিলে নেই। আমরা করব না তো করবে কে?

হেমাঙ্গিনী। তার ওপর জানিসত ছায়া ও আবার ডাক্তার! ওষুধ, পথ্য, সেবা সবই তো একা ওই করছে। রাতকে রাত—দিনকে দিন—এক নাগাড়ে। ক্লান্তি নেই, এক মুহূর্তও কাছ ছাড়া হয় না। এমন সেবা যত্ন পুরুষ মানুষ করতে পারে তা জানতুম না।

সত্য। এসবই তো আমার কর্তব্য মাসীমা।

হেমাঙ্গিনী। ছায়া এসে তবু একটু তোমার কাজ কমেছে। কি বলো সতু? ও রাতটার আমার দেখাশুনা করছে। তুমি মাঝে মাঝে নিঃশ্বাস ফেলবার ফুরসৎ পাচ্ছ। তা হ্যাঁরে ছায়া, জামাইকে আনলি না কেন মা? বিয়ের সময় গিয়ে পৌছতে পারি নি, তোরাও আসিস না—

ছায়া। ওঁর পুলিশের চাকরী। ছুটী নেই বল্লেই চলে।

সত্য। মিস্টার মুখার্জী বুঝি পুলিশে চাকরী করেন?

ছায়া। হ্যাঁ।

হেমাঙ্গিনী। এই তো হঠাৎ এলি। এই ক'দিনের জন্যও তো তাকে আনতে পারতিস। আচ্ছা, এমন খবর না দিয়ে চলে এলি যে। তোর একলা আসা দেখে সন্দেহ হচ্ছে, জামাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে আসিস নি ত?

ছায়া। না পিসীমা ওঁকে অনেক করে বলেছিলুম। উনি একটা বিশেষ কাজ নিয়ে এখন ব্যস্ত আছেন। সময় হলেই আসবেন বলেছেন। তোমার অসুখ শুনে আমি চলে এলুম। যদিও সত্যবাবু তোমায় চব্বিশ ঘণ্টা দেখছেন লিখেছিলে তবু নিশ্চিন্ত হতে পারি নি।

হেমাঙ্গিনী। তোর চাকরটা কিন্তু বেশ মা। দেখে ভদ্র ঘরের ছেলে বলে মনে হয়। আমাকে খুব যত্ন আত্তি করে। কোথায় পেলি একে?

ছায়া। বিয়ের পর জোগাড় করেছি।

হেমাঙ্গিনী। বেশ কাজের লোক। ওকে হাতছাড়া করিস নি।

ছায়া। না, পিসীমা। কাজ ভালই করে, তবে মধ্যে মধ্যে একটু দুষ্টুমি করে। আর বড্ড বোকা।

হেমাঙ্গিনী। তা হোক বাছা। বেশী বকাবকি করিস নি।

সত্য। মাসীমা কালই না তোমায় বলেছি তোমার শরীরের পক্ষে পূর্ণ বিশ্রাম প্রয়োজন। যত কম কথা বার্তা কইবে ততই ভাল।

হেমাঙ্গিনী। বাছা আমার বড় সাবধানী। সর্বদা চোখে চোখে রাখে। কোনো অনিয়ম অত্যাচার সহ্য করতে পারে না। তা বাবা সত্য, আমি আর ক'দিনই বা বাঁচব,

যত দিন আছি তোমাদের সঙ্গে দুটো কথা মনের আশ মিটিয়ে কয়ে নিই।

সত্য। তোমার ঘুমের পিল্‌টা খাবার সময় হল।

হেমাঙ্গিনী। কোনও জিনিষ ভুলবে না। দাও। জানিস ছায়া, রোজ একটা করে পিল খাই তবে রাত্রে ঘুম হয়।

ছায়া। আজকে পিসীমা ওটা না খেয়েই দেখুন না কেমন থাকেন্।

সত্য। তা হয় না ছায়া দেবী। যদি রাত্রে ভাল ঘুম না হয় তো সকালে ওঁর ভয়ানক শরীর খারাপ হবে।

হেমাঙ্গিনী। সত্যই, যেতে তো বসেছি। একদিন না খেয়েই দেখা যাক না।

সত্য। কিন্তু যত দিন বেঁচে আছেন, ডাক্তার হিসাবে আমার কর্ত্তব্য যাতে শরীর বেশী খারাপ না হয় সেটা দেখা।

ছায়া। একটা দিনে খুব বেশী কিছু এসে যাবে না।

হেমাঙ্গিনী। সত্য, আজ থাক বাবা। দেখাই যাকনা কেমন থাকি।

সত্য। বেশ। শরীর খারাপ হলে, কিংবা ঘুম না হলে তখন কিন্তু আমার দোষ দিও না।

ছায়া। যদি রাত্রে ঘুমুতে না পাবেন তখন না হয় একটা পিল দেবেন। আপনি তো হাতের কাছেই রয়েছেন।

হেমাঙ্গিনী। এটা ছায়া মন্দ বলে নি সতু। আর ধর কাল সমস্ত দিন আর আজ সমস্ত দিন ওষুধ না খেয়ে তো ভালই আছি।

সত্য। এ্যাঁ। বলকি? দুদিন ওষুধ খাওনি। (রেগে) আমার ওষুধ আর চিকিৎসায় যদি তোমার বিশ্বাস না—

হেমাঙ্গিনী। না বাবা তা বলছি না। রাগ করিস কেন? তবে এক আধ দিন ওষুধ বন্ধ করলে ফল ভালই হয়। হ্যাঁ, দেখ তোমাদের সঙ্গে একটু কাজের কথা ছিল। তোমরা দুইজনেই যখন উপস্থিত রয়েছ— আমার উইল সম্বন্ধে—

ছায়া। এর জন্য এত তাড়াতাড়ি কি পিসীমা। বিশেষ করে তোমার এখন পূর্ণ বিশ্রাম প্রয়োজন। কথা কইলে পরিশ্রমের দরুণ শরীরটা খারাপ হয়ে যেতে পারে।

হেমাঙ্গিনী। হ্যাঁ বাবা সত্য, তুমি কি বল?

সত্য। না, এমন কিছু বিশেষ ক্ষতি হবে না। তবে একটু আস্তে আস্তে কথা কও। (ছায়ার ভৃত্য বিমলকে লক্ষ্য করে)

এই—তুই এখানে কেন?

বিমল। আজ্ঞে—

সত্য। এখানে কি করছিস্?

বিমল। উনি বল্লেন জানলার কাঁচগুলো মুছে পরিষ্কার করতে—

ছায়া। হ্যাঁ। এ-বাড়ীর চাকর-বাকররা কিচ্ছু দেখে না।

হেমাঙ্গিনী। মা আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। এসে অবধি যেমন আমার সেবা করছে, তেমনি বাড়ীর চেহারা একেবারে বদলে দিয়েছে—

সত্য। এখান থেকে এখন চলে যা।

বিমল। আজ্ঞে হ্যাঁ। এই যাচ্ছি (প্রস্থান)

সত্য। ছায়া দেবী, আপনার চাকরকে যেন ভদ্রলোকের ছেলে বলে মনে হয়।

ছায়া। ভদ্রলোকের ছেলে তো বটেই। অবস্থা-বিপর্য্যয়ে সে চাকরের কাজ করছে। খুব খাটিয়ে, ভাগ্যগুণে অমন চাকর পেয়েছি।

হেমাঙ্গিনী। তোমরা একটু কাছে সরে এস। বাবা সত্য তুমি যত চিকিৎসাই কর না কেন, আমি বেশ বুঝতে পারছি যে আমার দিন ঘনিয়ে এসেছে। আমার ছেলে-পিলে নেই।

সত্য। আমরা তো রয়েছি মাসীমা।

হেমাঙ্গিনী। তোমরাই আমার সব। তোমরাই তো আমার ভরসা। জান তো আমার বাবা খুব গরীব ছিলেন। বিয়ের সময় বলতে গেলে কিছুই তিনি দিতে পারেন নি। আমার যা কিছু সব আমার স্বামীই রোজগার করেছিলেন। মরবার সময় তিনি আমাকে তাঁর স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তিতে নির্ব্যূঢ় স্বত্ববতী করে দিয়ে-ছিলেন। আমার ভাই, ছায়ার বাবা, আমি বিধবা হবার পর থেকে চিরকাল তার মৃত্যুর সময় অবধি পঞ্চাশ টাকা

করে আমাকে হাতখরচ দিয়ে এসেছে। অথচ আমার কোনো দরকার ছিল না। বারণ করলে বলত "দিদি, বাবা তো কিছু দিতে পারেন নি। আজ ভগবান যখন আমায় ভাল অবস্থা দিয়েছেন, তুমি না নিলে বড় দুঃখ পাব।" (কান্না)

সত্য। উইলের কথাটা যে কি বলছিলে—

হেমাঙ্গিনী। হ্যাঁ। বুড়ো মানুষ, কি বলতে আরম্ভ করে কোথায় চলে যাই। আমার সম্পত্তি স্থাবর অস্থাবর মিলিয়ে অনেক বলা চলে। বাবা সত্য, আমি তোমার একটা ব্যবস্থা—উঃ বড্ড তেষ্টা পাচ্ছে, একটু জল দাও—

সত্য। এই যে দিই মাসীমা—

ছায়া। আপনি কেন কষ্ট করতে যাবেন? আমিই দিচ্ছি।

ছায়া। (জল দিয়ে) এই নাও পিসীমা।

হেমাঙ্গিনী। (জলপানান্তে) আঃ। হ্যাঁ, কি বলছিলুম—

সত্য। আমাকে কিছু দেবার—

হেমাঙ্গিনী। ঠিক ঠিক। তোমাকে মাসিক পাঁচশ' টাকা আয়ের উপযুক্ত কোম্পানির কাগজ দেব। তুমি কিন্তু মূল টাকাটা খরচ করতে পারবে না। যদি বিয়ে-থা কর তো তোমার ছেলেরা টাকাটা পাবে।

সত্য। আর সব সম্পত্তি আর নগদ টাকার কি হবে?

হেমাঙ্গিনী। আমার বাকী যা কিছু স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি থাকবে সব আমার ভাইঝি ছায়া পাবে। আমার এই সিন্দুকে হীরে জহরতের গহনা আর সোনা রূপো যা আছে সে সবও ছায়া পাবে। আমি উইলের খসড়া করে রেখেছি, সিন্দুকেই আছে। কাল উকিলকে দু'জন সাক্ষী নিয়ে আসতে বলেছি। কালই সব পাকা বন্দোবস্ত করে রেজেস্টারি করে ফেলব।

সত্য। কিন্তু মাসীমা, এ-সবের এত তাড়াতাড়ি কি ছিল? শরীর একটু সারুক--

হেমাঙ্গিনী। না বাছা, শরীরের কথা বলা যায় না। কখন আছি, কখন নেই। তখন এই সম্পত্তি নিয়ে মামলা-মকদ্দমা চলবে—সে আমি চাই না। একটু যেন ঘুমের মত আসছে—ছায়া—

সত্য। আমি এখনি ডিসপেন্সারী থেকে তোমার রাত্রের ওষুধটা তৈরি করে আনছি। (প্রস্থান)

হেমাঙ্গিনী। ছায়া, মা, আমার পিঠের দিকের কুশনটা একটু ঠিক করে দেত। এই। এইবার ঠিক হয়েছে। তুই আমার কাছটায় বস্। একটা গান কর না। অনেকদিন তোর গান শুনতে পাইনি। কতদিন পরে এলি একটু কাছে কাছে থাক। একটা ভজন কিংবা কীর্ত্তন শোনা ত' মা।

ছায়া। আচ্ছা, গাইচি—

গান

কোথাও, দেখেছ কি ঘনশ্যামে॥
ময়ূর মুকুট পীত বসন কুণ্ডল শোভে কানে।
কালো বদনে তিলক শোভিছে বিরাজে সে মোর প্রাণে॥
বরষণ লাগি ওরে মেঘরাজি চলে যা নন্দ গ্রামে।
রাখাল সেথায় গো-চারণ ছেড়ে হরে মন প্রেম গানে॥
(তব) নূপুর রুণুঝুণু কুঞ্জগলিতে বল বঁধু কে না জানে।
দরশন দাও গো মীরার প্রভু ত্যজনা ব্রজধামে॥

ছায়া। পিসীমা, পিসীমা—ঘুমিয়ে পড়েছে। সন্ধ্যাও হয়ে গেল। আলোটা জেলে দিই যাই এই বেলা গা'টা ধুয়ে নিই গে। এখুনি হয়ত আবার উঠে পড়বেন।

(প্রস্থান)

(কিছুক্ষণ পরে সতর্কভাবে পা টিপিয়া সত্য ঢুকিল)

সত্য। (হেমাঙ্গিনীকে পরীক্ষা করিয়া) ঘুমুচ্ছে। ভালই হয়েছে। এতদিন সেবা যত্ন করলুম তার প্রতিদান দিলেন মাসে পাঁচশ' টাকা মাসহারা। বাকী সব ভাইঝির। তা হ'চ্ছে না। এ উইলে আমি দস্তখৎ করতে দেব না। জানি, এই রকম একটা কিছু উল্টোপাল্টা করে বসবে, মেয়েদের কথায় নির্ভর করা চলে না তাইত আমি কিছুদিন থেকে ওঁর শরীর খারাপ দেখে ওষুধের সঙ্গে 'আর্সেনিক' মিশিয়ে খাওয়াচ্ছি। ফলও ভালই পাচ্ছিলুম। কিন্তু, এই মেয়েটা আসার পর থেকে তেমন আর কাজ হচ্ছে না। হয় ওষুধ খেতে দেয় না, না হয় বদলে দেয়। এখন তো বুড়ি দিব্য আবার সেরে উঠছে। ভেবেছিলুম উইল করবার আগেই কাজ হাঁসিল করতে পারব। কিন্তু হলনা। আজ রাত্রের মধ্যেই সরাতে না পারলে

সব পরিশ্রম বৃথা হয়ে যায়। এবার যা উপায় করেছি কোন ডাক্তারের বাবারও সাধ্য নেই ধরে। এই আধ-মরা সাপটা পায়ের কাছে ফেলে রাখি। ইনজেকশনের সিরিঞ্জে সাপের বিষ ভরে এনেছি। ফুটিয়ে দিয়েই 'সাপ সাপ' বলে চেঁচিয়ে এই আধ-মরা সাপটাকে মারতে আরম্ভ করব। লোকে মনে করবে সাপের কামড়ে মারা গেছে। আমি সন্দেহের বাইরে থাকব। উইলও পাকা হবে না। (চারিদিকে দেখে) নাঃ কেউ কোথাও নেই। এই ঠিক সময়। মাসীমা, মাসীমা, অগাধে ঘুমুচ্ছে, এ ঘুম আর ভাঙবে না। এত তাড়াতাড়ি উইল না করলে হয়ত আরও কিছুদিন বাঁচতে মাসী—আলোটা নিবিয়ে দিই, অন্ধকারে কেউ দেখতে পাবে না। এইবার —(ইনজেকশনের সিরিঞ্জ নিয়ে এগোচ্ছে এমন সময় কে বলে উঠল—)

আওয়াজ। আর একপা নড়েছ কি গুলি করব।

সত্য। (চমকে) কে ?

আওয়াজ। এখনি সরে এস। ব্যস, ঐখানে দাঁড়াও। নড় না। হাতে পিস্তল রয়েছে। লক্ষ্য আমার অব্যর্থ, (আলো জ্বালিয়া) চিনতে পারছ ? টেবিলের ওপর সিরিঞ্জটা রেখে দাও—

হেমাঙ্গিনী। (ঘুম ভেঙ্গে) অ্যাঁ। অ্যাঁ। একি। এসব কি ব্যাপার ?—ছায়া। ছায়া।

ছায়া। কি পিসীমা, কি হয়েছে ? (ঢুকে) ওকি, তোমার পায়ের কাছে সাপ যে—

হেমাঙ্গিনী। (চমকে উঠে) অ্যাঁ। সাপ—সাপ—ওমা তাইত।

বিমল। ভয় পাবেন না, আধ-মরা সাপ। উহু। খবরদার। সত্যবাবু আপনি ওদিকে যাবেন না। এইদিকে সরে আসুন। হাত দুটো দেখি দিন—পিছন দিকে করুন—

সত্য। চোপরাও বেয়াদপ। তুই বেটা সেই চাকর না ?

বিমল। আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু, পুলিশ অফিসারের স্ত্রীর চাকর—এটা ভুলছেন কেন ?

সত্য। তুই মিছিমিছি একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে এরকম ব্যবহার করছিস্। আমি তোকে পুলিশে দেব। মাসীমা তোমার বাড়ীতে—একটা চাকর—

হেমাঙ্গিনী। তাই তো। কিছুই বুঝতে পারছি না—

বিমল। নো-নো। সত্যবাবু সাবধান। পালাবার চেষ্টা করবেন না।

সত্য। কেন, গুলি করবি নাকি ? কোথাকার একটা কে চাকর—তোর কথায় আমায় চলতে হবে ?—আমি চল্লুম—দেখি তুই কি করতে পারিস—

বিমল। বেশ। (হুইস্‌ল্ দিলেন)

(চারজন পুলিশের প্রবেশ)

পুলিশ। হুজুর।

সত্য। একি। পুলিশ। এরা কোত্থেকে এল।

বিমল। উইলের কথা শুনেই বুঝেছিলুম, আপনি আজ রাত্রেই শেষ চেষ্টা করবেন। তাই পুলিশ সংগ্রহ করে ঘরে লুকিয়ে রেখেছিলুম। একে গ্রেপ্তার কর।

সত্য। কিসের অপরাধে এরা আমায় এমন করে অপমান করছে। একি। জোর করে আমায় হাতকড়ি পরিয়ে দিলে। মাসীমা, তোমার বাড়ীতে এরা এই সব করছে আর তুমি চুপ করে রয়েছ। তোমার চোখের সামনে তোমার বোনপোকে—

বিমল। আপনি আদর্শ 'বোন-পো' যে।

হেমাঙ্গিনী। সত্যিই তো। তুমি কে বাপু ? এমন করে বাছাকে আমার কষ্ট দিচ্ছ কেন ?

বিমল। আমি ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টার বিমলচন্দ্র মুখার্জি।

সত্য। অ্যাঁ বিমল মুখার্জি। ছায়ার স্বামী।

হেমাঙ্গিনী। জামাই। ছিঃ ছিঃ। এতদিন চাকর সেজে—তোমায় কত কথাই বলেছি, না বাপু এসব ছায়ার দোষ। এতদিনে ঘুণাক্ষরেও কিছু জানতে দেয় নি—

ছায়া। তা ছাড়া যে আর উপায় ছিল না পিসীমা।

সত্য। (কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া) ওহোঃ। তাই বলুন মিস্টার মুখার্জি। সম্পর্ক হিসাবে ঠাট্টা করছিলেন। অভিযোগ কিছু নেই।

বিমল। তার উত্তর কোর্ট দেবে। তবে এইটুকু বলে রাখতে পারি যে আপনি এসে পিসীমার চিকিৎসার ভার নিয়েছেন শুনেই আমাকে ছুটে আসতে হয়েছে। আপনি বিখ্যাত বোন-পো। আপনার আগের মাসীর খবর ত জানি। যা সন্দেহ করেছিলুম তাই। এখানে আসার

পরদিন থেকেই দেখছি—আপনার মাসীমাকে আপনি খুন করবার চেষ্টা করছেন। প্রত্যেক ওষুধে বিষ মিশিয়ে দিচ্ছেন। আমি গোপনে ফেলে দিয়ে শিশিতে নির্দোষ ওষুধ ভরে রাখতুম। ঘুমোবার পিল' বদলে দিতুম। আপনার দেওয়া ওষুধগুলো পরীক্ষার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

হেমাঙ্গিনী। ছায়া! ওবে- একি শুনছি ?

ছায়া। হ্যাঁ পিসীমা, এসবই সত্যি।

বিমল। আজকে যা ব্যবস্থা করেছিলেন এর তুলনা হয় না। আধ মরা সাপ এনে, সাপের বিষের ইঞ্জেকশন দিয়ে পরে "সাপ" "সাপ" বলে চেঁচিয়ে সাপকে মেরে সাপের কামড়ে মৃত্যু প্রমাণ করবার চেষ্টা সত্যিই আধুনিক।

সত্য। আমি বলছি এ সব তোমার কারসাজি। জোচ্চুরী, ধাপ্পাবাজী করে আমাকে গ্রেপ্তার করতে চাও। কারণ তোমারও এতে বিলক্ষণ স্বার্থ রয়েছে। নির্বিবাদে সমস্ত সম্পত্তি ভোগ করবার সুবিধা—

বিমল। আপনার যা বলবার আছে কোর্টে বলবেন। তবে এটা বলে রাখি, এখন আপনি যা কিছু বলবেন সব আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য স্বরূপ আমরা ব্যবহার করব। রামসিং—

রামশিং। হুজুর—

বিমল। ইন কো লে জাও থানামে। সাহব কো বোলো হাম আভি আতে হ্যাঁয়।

রামসিং। জী হুজুর। চলিয়ে—

বিমল। সত্যবাবু, কোন রকম গণ্ডগোল না করে চলে যান। নইলে চার্জ বেড়ে যাবে। রামসিং! লে যাও।

রামসিং। জী হুজুর। চলিয়ে—

(সত্যকে লইয়া প্রস্থান)

হেমাঙ্গিনী। এযে কি হয়ে গেল কিছুই বুঝতে পারছি না। সত্য, যাকে আমি ছেলের মত দেখতুম সে কি না আমাকে মারতে গেল। বিমল বাবা—

বিমল। বলুন পিসীমা—

হেমাঙ্গিনী। ও যাই করুক, আমার খুড়তুতো বোনের ছেলে। দেখ বাবা, যেন—জেলে-টেলে দিও না।

বিমল। তা হয় না পিসীমা। আমি সরকারের চাকর। আমার কর্তব্য যত রূঢ় যত অপ্রিয়ই হোক না কেন আমাকে করতেই হবে। আর, আপনাকে বলতে আপত্তি নেই, আপনার এই বোনপোটি পুরানো পাপী। গেলবারে প্রমাণাভাবে ছাড়া পেয়েছিল।

হেমাঙ্গিনী। সাজাটা যাতে হাল্কা হয় সেটা দেখো বাবা।

বিমল। চেষ্টা করব পিসীমা। আমি যাই। থানার কাজটা সেরে এখুনি আসছি। সাপটা আর সিরিঞ্জটা নিয়ে যাচ্ছি। (প্রস্থান)

হেমাঙ্গিনী। ছায়া, মা, আমার কাছে আয়। হ্যাঁরে, এও কি সম্ভব ? আমি যে এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না মা।

ছায়া। পৃথিবীতে এমন অনেক জিনিষ আছে যা চোখে দেখেও বিশ্বাস করা করা যায় না।

যবনিকা

দুঃখ

(রহীম)

শ্রীপ্রবোধকুমার মজুমদার

মনের যতেক দুঃখ রাখ তাহা মনের ভিতরে,
কোরোনাক কভু তাহা বাহিরে প্রকাশ।
শুনিয়া সে দুঃখ কেহ ল'বে নাক উহা ভাগ ক'রে,
অলক্ষ্যে করিবে সবে শুধু উপহাস
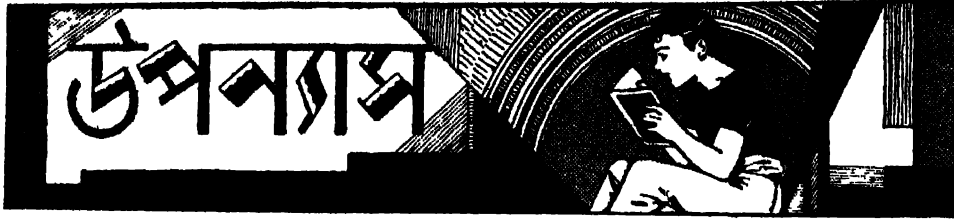
পরাগ ও রেণু

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(লক্ষ্মীপুরের দেওয়ানজী)

'কালীঘাটের থেকে বেরিয়ে মণির মার সঙ্গে পরাগ বাড়ীতে আসবার সময় দেখলে তাদের বাড়ীর সামনে রাস্তার' উপর প্রকাণ্ড একখানি মোটর গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে। এত বড় মোটর গাড়ী পরাগ কখনো দেখেনি। রেণু মস্ত একখানা মোটর গাড়ী চড়ে রোজ স্কুলে আসে বটে কিন্তু এ মোটর গাড়ীখানা দেখে পরাগের মনে হ'ল এখানা রেণুদের গাড়ীর চেয়ে অনেক বড়। সে চুপি চুপি মণির মাকে জিজ্ঞাসা করলে 'এই গাড়ী চড়ে কি সেই লোকটি এসেছেন ?' মণির মা সগর্বে ঘাড় নেড়ে জানালে 'হ্যাঁ।'

পরাগকে উপরে নিয়ে যাবার সময় পরাগ বৈঠকখানা ঘরের দরজায় যে পর্দা ঝুলছিল তার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলে মামণি বৈঠকখানায় আধ-ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছেন।

মণির মা পরাগকে উপরে নিয়ে এসে তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুইয়ে মুছিয়ে পূজোর সময় পরাগের যে নূতন পোষাক হয়েছিল সেই দামী পোষাকটি আর জুতো মোজা পরিয়ে পরাগের ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কোঁকড়া চুলের গোছা চিরুণী দিয়ে সযত্নে আঁচড়িয়ে, মুখে একটু পাউডার মাখিয়ে পরাগের দুই কাঁধ ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে এক মুখ হেসে বললে—কে বলে তুমি আমাদের দাদাবাবু ?—ঠিক যেন রাজপুত্তর। এইবার চলত দাদাবাবু দেখি বুড়ো ওদের লক্ষ্মীপুর জমিদার বাড়ীর বংশধরকে চিনতে পারে কি না।

পরাগের বিস্ময় ও কৌতূহল ক্রমেই বেড়ে উঠছিল। তবে মনে মনে সে এই ভেবে নিশ্চিন্ত ছিল যে মামণি তাকে নিশ্চয়ই ব্যাপারটা সব বুঝিয়ে দেবেন। আজ এই প্রথম তার মনে হ'ল—মণির মা বড় বোকা, সে কিছু জানে না—কিছু বলতে পারে না।

পূজোর সময় পাওয়া দামী পোষাকটি পরতে পরাগেরও খুব ভাল লাগত। সেই পোষাকে সুসজ্জিত হয়ে পরাগ বেশ গর্বের সঙ্গেই বৈঠকখানা ঘরে এসে ঢুকল।

ঘরে ঢুকে পরাগ দেখলে একটি গোঁফ দাড়ি কামানো সৌম্য কান্তি বৃদ্ধ একখানা আরাম কেদারায় বসে রয়েছেন। একটু দূরে তার মা দাঁড়িয়ে আছেন। মা'র মুখখানি কেমন যেন বিষাদে মলিন ও আতঙ্কে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। পরাগের মনে হল মা'য়ের চোখের কোলে যেন সকালের শিশিরের মতো অশ্রুবিন্দু টলমল করছে।

"এই যে খোকা এসেছিস। আয় বাছা, আয় আমার সাত রাজার ধন মানিক !—" বলতে বলতে পরাগের মা ছুটে এসে পরাগকে বুকে জড়িয়ে ধরে সস্নেহে বার বার মুখ চুম্বন করতে লাগলেন। তাঁর দুই চোখ বেয়ে দরবিগলিত ধারে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। পরাগের মনে হ'ল মায়ের কণ্ঠস্বরে কী যেন একটা বেদনা বিহ্বল কাতরতার সুর বেজে উঠছে আজ।

পরাগের দুই চোখও কি জানি কেন অকারণ ছলছল হয়ে এল। সৌম্যকান্তি বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। পরাগের কাছে এগিয়ে এসে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করে দেখলেন। তারপর নিজের মুণ্ডিত মুখ মণ্ডলে বারকয়েক হাত বুলিয়ে সাদরে পরাগের চিবুক স্পর্শ করে বললেন—হ্যাঁ,

লক্ষ্মীপুরের প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার রাজাবাহাদুর মহেন্দ্র রায়ের তুমিই যথার্থ বংশধর বটে !

(মাতা-পুত্র)

সেদিন স্নানাহারের পর পরাগ মায়ের মুখ থেকে যা শুনলে তাতে তার বিস্ময়ের আর সীমা পরিসীমা রইল না। সে ব্যাপারটা ভাল রকম হৃদয়ঙ্গম করবার জন্য মাকে বারংবার প্রশ্ন করে অনেক কথা একাধিকবার জেনে নিয়েছে। সমস্ত ইতিহাস শুনে এবং বুঝে পরাগ বড় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। তাইত। এখন উপায়। সে একজন জমিদারের নাতি! তার বাবা ছিলেন রাজাবাহাদুরের ছেলে। 'কাবু'র কাছে গিয়ে সে মুখ দেখাবে কেমন করে? তারা যে পুরুষানুক্রমে জমিদার, তাদেরই পূর্বপুরুষ যে ছিলেন বাংলার ইতিহাস প্রসিদ্ধ বারোভূইঞাদের একজন, এসব শুনে কাবু কি ভাববেন?

রাজাবাহাদুর মহেন্দ্র রায়—যিনি প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার, লক্ষ্মীপুরের হর্তাকর্তা বিধাতা—তিনি হলেন পরাগের দাদু!—এ শুনে কি আর 'কাবু' তাকে দোকানে ঢুকতে দেবে?

পরাগ তার মায়ের গলাটি দু'হাতে জড়িয়ে ধরে কাতর ভাবে বললে—"মাগো। আমি রাজাবাহাদুরের নাতি হতে চাইনা।"

পরাগের মা কোন উত্তর না দিয়ে ছেলেকে বুকে চেপে ধরে মুখে তার চুমু দিলেন।

পরাগ এবার আব্দারের সুরে বললে "মামণি, আমাদের ইস্কুলের কোনো ছেলে তো রাজাবাহাদুরের নাতি নয়? আমি কেন একলা রাজাবাহাদুরের নাতি হব?"

পরাগের মা এবার স্মিতহাস্যে পুত্রের কপোলে ঈষৎ একটু আঙ্গুলের চাপ দিয়ে বললেন—"কেন খোকা, তোমার সেই নীল ঘোড়া চৈতক হয়েছিল যে মেয়েটি সেই 'রেণুবালা'র দাদুও ত একজন মস্ত রাজাবাহাদুর।"

পরাগ মায়ের এ মন্তব্য ঠিক অনুমোদন করতে পারলে না। ঘাড় নেড়ে বললে "রেণু তো মেয়েছেলে, তাকে ত' আর বড় হ'লে রাজাবাহাদুর হ'তে হবে না? আর আমি যে বেটাছেলে! দেওয়ানজী মশাই বলেছেন বড় হয়ে আমাকেই রাজা বাহাদুর হতে হবে। কাবু বলেন—রাজা মহারাজা জমিদাররা কেউ ভালো লোক নয়, তারা দেশের সর্বনাশ করছে। আমি মামণি সেরকম রাজাবাহাদুর হ'তে চাইনা।

মা বললেন—"বেশত', তুমি বড় হ'য়ে সেরকম রাজাবাহাদুর না হ'য়ে খুব ভাল রাজাবাহাদুর হবে। যেমন হয়েছিলেন—অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্র, বোগদাদের সুলতান হারুণউল্‌রশিদ, চিতোরের রাণা প্রতাপ!"

মাতা পুত্রে সেদিন এই নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা হ'ল। পরাগ বুঝতে পারলে রাজাবাহাদুরের নাতি সে পৃথিবীতে জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই হয়েছে, সুতরাং এখন আর 'হবনা' বলবার কোন উপায় নেই। তবে, সে বড় হ'লে যদি ইচ্ছা করে নিজে একজন 'রাজাবাহাদুর' নাও হ'তে পারে। আর, নেহাৎই যদি তাকে বড় হয়ে রাজাবাহাদুর হ'তেই হয়, তবে সে হবে এমন একজন ভাল রাজাবাহাদুর যিনি প্রজাদের দুঃখে দুঃখী হয়ে তাদের দুঃখ দূর করেন, যিনি গরীবদের বন্ধু, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় অসহায়ের সহায়।

পরাগ শুনলে—ঐ যে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি এসেছেন, পরাগের দাদুই তাকে পাঠিয়েছেন। উনি লক্ষ্মীপুরের দেওয়ানজী বাবু। পরাগকে লক্ষ্মীপুরে নিয়ে যাবার জন্যই ঐ মস্তবড় মোটরগাড়ী নিয়ে এসেছেন তিনি। ঐ মস্তবড় মোটরগাড়ীখানা তার নিজের দাদুর।

'দাদু'। 'দাদু'! পরাগ বারকতক মনে মনে কথাটা আবৃত্তি করে নিলে। ভাবতে লাগলো—কেমন না জানি দেখতে তার সেই না-দেখা দাদু। তিনি কি মামণির মতো পরাগকে ভালবাসবেন! মা বলেছেন—আমি যদি লক্ষ্মীপুরে গিয়ে তাঁর কাছে থাকি তাহ'লে 'দাদু' আমাকে মামণির চাইতেও বেশী ভালবাসবেন। ঈষ্! তা আর হ'তে হয় না। পরাগ বললে—মামনু, আমি লক্ষ্মীপুরে যাব না। তুমি দেওয়ানজীবাবুকে চলে যেতে বলো।

মা বললেন—তা যে হয় না ধন। দাদু নিতে পাঠিয়েছেন, না গেলে যে তাঁর অপমান করা হবে। গুরুজনের আদেশ অমান্য করতে নেই, এতো তুমি জানো! দাদু ডেকে পাঠালে যেতেই হয়। যাবনা বলতে নেই—ছিঃ। তোমার 'বাবা' স্বর্গে না গেলে আজ তিনি নিজেই তোমাকে সঙ্গে করে লক্ষ্মীপুরে নিয়ে যেতেন। লক্ষ্মীপুর তাঁর বড় প্রিয়, সে ছিল তাঁর শৈশবের স্বপ্নভরা সোনার

লক্ষ্মীপুর। তার প্রতি ধূলি-কণাটিকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন।

পরাগ বুঝলে লক্ষ্মীপুব তাকে যেতেই হবে। বললে—কিন্তু তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে মামণি। আমি একলা যেতে পারবনা কিছুতেই, তা তোমায় বলে দিচ্ছি।

মা হেসে বললেন—বেশত', আমায় যদি তোমাব মোটর গাড়ীতে ধরে, তাহলে অন্যান্য জিনিষপত্রেব সঙ্গে বেঁধে নিয়ে যেও।"

পরাগ বলে—ধেৎ। মা যেন কি? তুমি ভাবি বোকা হয়ে যাচ্ছ। তুমিত' গাড়ীতে আমার পাশে বসে যাবে। আর গাড়ীতে যদি দু'জনের জায়গা না হয়, তাহ'লে তুমি আগে বসবে, তাবপব আমি তোমাব কোলে বসে যাবো।

মাতাপুত্রেয় মধ্যে এই ব্যবস্থাই শেষপর্যন্ত স্থির হ'ল, কিন্তু, মায়ের কাছ থেকে উঠে যাবার আগে পবাগ প্রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে বললে—"কাবুর জন্য যে আমাব বড্ড মন কেমন করবে মা। মণির মা বল'ছিল—আমি চলে গেলে 'কাবু'ব মনেও ভারি কষ্ট হবে। আমি কাবুকে ছেড়ে সেখানে কি করে থাকবো? 'কাবু'ও তো আমাকে না দেখে থাকতে পারবে না।

মা বললেন—কেন খোকন, তুমি এখন বড় হয়েছ, তোমাব যখন কাবুর জন্য মন কেমন করবে তুমি কাবুকে সেখান থেকে চিঠি দেবে—

পরাগ উৎসাহিত হয়ে উঠে বললে—হ্যাঁ। ঠিক বলেচ' মা, তুমি লক্ষ্মী, তুমি সোনা মা। আমি কাবুকে বোজ চিঠি লিখবো—কেমন? আমার বোজ রোজই মন বেমন কববে কিনা। আমাদেব মণিব মা যেমন দেশে চিঠি লেখে—মণি অর্ডার করে টাকা পাঠায়, আমিও সেইবকম কাবুকে চিঠি লিখবো আব মণি অর্ডাব করে টাকা পাঠাবো, কাবু আমার জন্য একটা 'এয়বগান্' কিনে দেবে। জানো মা? কাবু আমাকে একটা 'ক্যামেবা'ও কিনে দেবে বলেছে। আমি সেই ক্যামেবায় তোমাদেব সকলের 'ফটো' তুলবো, বুঝলে? আচ্ছা মা, কাবুকে যদি আমার বড্ড দেখবার ইচ্ছে হয়, যদি একটু কথা বলবার ইচ্ছে হয়—তাহ'লে কী হবে?"

মা বললেন—তাহ'লে তুমি তোমার দাদুকে বলে দেওয়ানজীবাবুর সঙ্গে ঐ মস্ত মোটরগাড়ীখানা চড়ে লক্ষ্মীপুর থেকে চলে এসে তোমার কাবুব সঙ্গে দেখা করে যাবে।

পরাগ আনন্দে লাফিয়ে উঠে মাব গলা জড়িয়ে ধরলে।

(দুই বন্ধু)

পবদিন কালী-স্টোবে এসে পরাগ দেখ'লে 'কাবু' একমনে খবরেব কাগজ পডছেন।

পরাগ কাল থেকে মনে মনে ছটফট করছিল কাবুব কাছে একবাব ছুটে আসবাব জন্য, কিন্তু, দেওয়ানজী মশাইকে মা কাল বাতে খাবাব জন্য নিমন্ত্রণ কবেছিলেন, কাজেই পবাগ আব বাড়ী থেকে বেরুতে পাবেনি। দেওয়ানজী মশাইয়েব সঙ্গে গল্প কবতে কবতে বাত্রি হয়ে গেল, পবাগ ঘুমিয়ে পড়ল। তাই আজ সকালে উঠেই সে ছুটে এসেছে।

আজ ববিবাব, ইস্কুলেব ছুটি। আজ সে অনেকক্ষণ বসে কাবুর সঙ্গে গল্প করতে পাববে। দেওয়ানজী মশাই তাকে বলেছে লক্ষ্মীপুবে আছে তাদেব রাজ-প্রাসাদের মত সাত-মহলা মস্ত বাডী, গডেব মাঠেব মত উঠান। বাডীর সঙ্গে প্রকাণ্ড বাগান আছে, ইডেন গার্ডেনেব মতো! লেকেব মত সব বড় বড় পুকুব আছে। লাল মাছ আছে, কত বকম পাখী আছে, পায়রা আছে, হাঁস আছে, ময়ূব আছে, ঘোড়া আছে, গরু আছে, হবিণ আছে খবগোস আছে আব দাদুব আছে 'বাঘা' 'বাঘিনী বলে মস্ত মস্ত দুটো পোষা কুকুব।

শুনে পবাগের মন কৌতুহলে ভবে উঠেছে, লক্ষ্মীপুবে ছুটে যাবাব ইচ্ছে হয়েছে তার অনেকবাব, কিন্তু কাবুব কথা মনে পডতেই সে দমে গেছে। কাবুকে ছেড়ে সে থাকাব কি করে সেখানে?

দোকানেব ভিতব ঢুকে পবাগ আজ আব প্রতিদিনের মত সেই খবরের কাগজ ঢাকা কেবাসিন তেলের বাক্সটির উপব গিয়ে বসলনা, চুপ কবে একপাশে দাঁড়িয়ে রইল। কালীবাবু তার জন্য অধীব আগ্রহে অপেক্ষা কবছিলেন। খবরের কাগজখানা নামিয়ে রেখে জিজ্ঞাসা করলেন—কিগো খোকাবাবু? খবর কি বল?"

পরাগ কোনো উত্তর দিল না। অপরাধীর মতো নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল।

কালীবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন—ব্যাপার কি খোকন? পরাগ এবার কালীবাবুর দিকে মুখ তুলে চাইল। বড় বড় দুটি চোখ তার কানায় কানায় ভরে উঠেছে জলে। কথা বলবার আগে তার পাতলা ঠোঁট দু'খানি বার দুই থর থর করে কেঁপে উঠলো। ধরা গলায় বললে—কাবু, সেদিন তুমি সেই যে যাদের কথা বলছিলে—তোমার মনে আছে?

"কাদের কথা বলোত?"

"সেই যে এদেশের রাজা মহারাজা—"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে, আমরা সেদিন একটু রাজা-রাজড়াদের ধরে নাড়া দিচ্ছিলুম বটে।"

"হ্যাঁ, আর বাংলাদেশের জমিদার বাবুদের কথাও হচ্ছিল—সেই—যখন মণির মা এল আমায় ডাকতে—"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, ওদেরও একটু ধাক্কা দেওয়া হয়েছিল বইকি, ওদের সেই আভিজাত্য গর্বের মূঢ়তা ও দম্ভ, ওদের সেই সৌখীন বিলাসিতায় দরিদ্রের রক্ত-শোষিত অর্থের অজস্র অপব্যয়—"

"হ্যাঁ",

পরাগ এবার একবার একটু ইতস্ততঃ ক'রে দু'একবার ঢোক গিলে বল্লে—তুমি বলেছিলে কাবু—কোন জমিদারকে কখন তোমার দোকানে ঢুকতে দেবে না—

"সে কথা আমি আজও বলছি পরাগ, এবং যতদিন বাঁচব—বলব।"

"কিন্তু কাবু, আমার সম্বন্ধেও কি তুমি তাই করবে?"

"সে আবার কি?"

"আমি—আমি যে—তোমার কাছে মিথ্যে বলবো না কাবু, আমি—আমিও একজন জমিদার, বড় হ'লে আমাকেও নাকি রাজাবাহাদুর হ'তে হবে—দেওয়ানজী মশাই কাল আমাকে বললেন—"

কালীবাবু হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। পরাগের দুই কাঁধের উপর হাত রেখে তাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন—তোমার কোনো অসুখ করেনিত পরাগ? দেখি তোমার হাতটা দেখি—

পরাগের ডান হাতখানা টেনে নিয়ে তিনি তার নাড়ী দেখতে সুরু করলেন।

পরাগ লজ্জিত ও অপ্রতিভ হয়ে বললে—না কাবু, আমি সত্যি বলছি, আমার কোনো অসুখ করেনি, আমি ভালই আছি। সেদিন মণির মা এসে তোমায় যা বলে গেছল সব সত্যি। লক্ষ্মীপুর থেকে দেওয়ানজী মশাই এসেছেন আমায় নিয়ে যাবার জন্য।

কালীবাবু, এবার বসে পড়লেন। মাথায় হাত দিয়ে অনেকক্ষণ কি ভাবলেন, তারপর পরাগের দিকে চেয়ে বললেন—কোথা থেকে কার দেওয়ানজী মশাই এসেছেন বললে?

"লক্ষ্মীপুর।"

"কে তাঁকে পাঠিয়েছেন তোমায় নিয়ে যাবার জন্যে?"

"আমার দাদু।"

"তোমার দাদু? কে তোমার দাদু?"

"লক্ষ্মীপুরের জমিদার। এই যে পড়ে দেখ না—পাছে আমার মনে না থাকে বলে আমি একটা কাগজে সবটা লিখে রেখেছি। দেওয়ানজী মশাই ব'লে ছিলেন তাঁর নাম—প্রবল প্রতাপান্বিত মহামহিম রাজাবাহাদুর শ্রীল শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র রায় লক্ষ্মীপুরাধিপতি বহুজনপ্রতিপালক অশেষমান্যবরেষু—"

কালীবাবু এবার হেসে ফেললেন। কাগজখানা পরাগের হাত থেকে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখে আবার তার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন—তাহলে এখন থেকে তোমার নাম কি হবে খোকন?

"কেন, ইস্কুলে তো আমার নাম লেখা আছে কাবু—শ্রীপরাগ রায়। তুমি কি জান না?"

"সেত জানি, কিন্তু তুমি যখন রাজা বাহাদুর হবে তখন তোমার কী নাম হবে? কি বলে তোমায় সব লোক ডাকবে?"

"আমি যখন তোমার মত বড় হব কাবু?"

"হ্যাঁ গো।"

"আমায় তখন লোকে 'পরাগবাবু' বলবে, যেমন তোমায় সবাই কালীবাবু বলে।"

"দূর বোকা ছেলে। আমিত আর জমিদার নই, রাজাবাহাদুরের নাতিও নই।"

পরাগ কেঁদে ফেললে। বললে—আমিত রাজা-বাহাদুরের নাতি হতে চাইনি। মামণি বললেন—জন্মাবার সময় আমি নাকি রাজাবাহাদুরের নাতি হয়েই জন্মেছি। সে কি আমার দোষ কাবু?

"না না না, তোমার আবার এজন্য কি দোষ হবে খোকন, ছি :—কেঁদ না।" কালীবাবু সস্নেহে আদর করে পরাগকে কোলেব কাছে টেনে নিয়ে নিজের কোঁচাব কাপড়ে তাব চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললেন—ভগবান কাউকে রাজাব ঘরে পাঠিয়ে দেন, কাউকে ভিখারীর ঘরে পাঠিয়ে দেন, মানুষের এতে কোনো হাত নেই খোকন।

"তুমি তাহলে আমার উপব রাগ করবে না ত কাবু?" পরাগ কালীবাবুর সাদর ও সদয় ব্যবহারে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বললে—"লক্ষ্মীপুর এখান থেকে কত দূব বলনা।"

"সে অনেক দূর"—

"তবেই ত মুস্কিল।"

"কেন, মুস্কিল কিসেব?"

"তোমার কাছে যখন তখন আর আসতে পাবোনা। হয়ত অনেকদিন আর তোমাদের কারুর সঙ্গেই আমাব দেখা হবে না—এইজন্যইত আমাব একটুও লক্ষ্মীপুরে যেতে ইচ্ছে করছে না--"

"কিন্তু, যেতে যে তোমাকে হবেই খোকন। তোমাব দাদু যখন দেওয়ানজী মশাইকে পাঠিয়েছেন নিতে—"

"হ্যাঁ, মামণিও বলছিলেন যে যেতেই হবে, নইলে দাদুর অপমান হবে।"

"হুঁ! তাহ'লে তুমিও আমাকে ছেড়ে চললে। আমাব যারা আপনার ছিল একে একে সবাই চলে গেছে। তোমাকে পেয়েছিলুম এই নিঃসঙ্গ জীবনেব মাঝে আনন্দের পুতল রূপে, এতটুকু বেলা থেকে তোমায় নিয়ে নাড়চি চাড়চি। শেষে ভগবান তোমাকেও আমাব কাছে থেকে দূবে সবিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

এবাব কালীবাবু কোঁচাব কাপড়ে নিজের সজল চোখ দুটি ক্ষিপ্র হস্তে মুছে ফেললেন। গলাটা ঝেড়ে নিয়ে বললেন—"তাহোক, ঈশ্বর যা কবেন মঙ্গলের জন্য, এ বিশ্বাস আমাব আছে, তোমারও যেন থাকে খোকন। তুমি যাও তোমার দাদুব কাছে ফিরে, আশীর্বাদ করি তুমি যেন সত্যই বড হ'য়ে দেশেব একজন 'মহামহিম বহুজন প্রতিপালক' হ'তে পাবো—"

পরাগ বললে "মা মণি বলেছেন কাবু, আমি যদি ইচ্ছা কবি তো দেশেব একজন ভাল জমিদার হ'তে পারি, যে সবাইকে ভাল বাসবে, সবার দুঃখ দূর করবে—"

"নিশ্চয়। তুমি তা হ'তে পারবে পরাগ, মায়েব আশীর্বাদ কখনও মিথ্যা হয় না।"

তাবপব কালীবাবুব সঙ্গে পরাগেব চললো বহুক্ষণ ধরে এ বিষয়ে নানা আলাপ আলোচনা।

(ক্রমশঃ)

সুখ-শান্তি

শ্রীঅনিলকুমার চক্রবর্তী পুরাণরত্ন।

তোমার হৃদয়খানি, বালকের মত যদি
উজাড় করিয়া দাও বিশ্বমাঝে ভাই,
অসীম সুখের রাজ্যে হইবে বসতি তব
যার মত সুখশান্তি অন্য কোথা নাই।
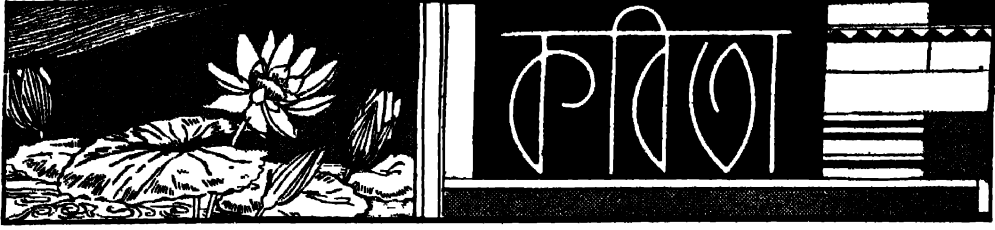
কথার ফের

সেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন

স্বপ্নে দেখেন পড়েছে তাঁর সকলগুলি দন্ত,
সেই অবধি শাহান্‌শাহের নেই ভাবনার অন্ত।
পূব আকাশে চাঁদ উঠেছে, ভোর হয়েছে রাত্রি,
দেখেন রাজা, স্বয়ং যেন কোন্ সুদূরের যাত্রী।
ধুম লেগেছে শহর জুড়ে, হাজার হাজার সৈন্য,
উজির নাজির সবাই হাজির সঙ্গে যাবার জন্য।
শাহান্‌শাহ ব্যস্ত হয়ে ছাড়েন সুখশয্যা,
মনের মতন বেশভূষাতে করেন তিনি সজ্জা।
মাখেন আতর গোলাপ এবং হরেক রকম গন্ধ,
পরিচ্ছদের নানান্ পদে রংবেরঙের ছন্দ।
সম্মুখে তাঁর ঝক্‌ঝকে এক মস্ত বড় আয়না,
বাদ্‌শা যতই দেখেন চেয়ে, দাঁত যে দেখা যায় না।
শরীর যেমন তেমনি আছে, কোথায় গেল দন্ত?
সেই অবধি শাহান্‌শাহের নেই ভাবনার অন্ত।

নহবতের বাদ্যে যখন ভৈরোঁ বেজে উঠ্‌ল
রাজার চোখের নিদ্রা এবং স্বপ্ন হঠাৎ টুট্‌ল।
জেগে উঠেই শাহান্‌শাহ হলেন অতি ব্যস্ত,
বজায় আছে দন্তগুলি বুলিয়ে দেখেন হস্ত।
কিন্তু রাজার মনের কোনে জাগল সভয় বিস্ময়,
ভোরের স্বপন মিথ্যা তো আর হয় না, এটা নিশ্চয়।
বিশ্রী এমন স্বপ্ন দেখা,—কে জানে এর অর্থ?
দন্তহীনের জীবনটা যে একেবারেই ব্যর্থ।
সবাই তাঁকে বুঝায় কত, বুঝতে না চায় মন ত'
ভাবেন রাজা,—স্বপ্নে কেন পড়ল হঠাৎ দন্ত।

হুলুস্থুল্ যে পড়ল তখন শাহান্‌শাহের রাজ্যে,
মন লাগেনা যেন গো আর কারোর কোনই কাযে।
রাজার অমঙ্গলের ভয়ে সবাই তখন স্তব্ধ,
দেশসুদ্ধ বন্‌লো বোবা নেই মুখে আর শব্দ।
হাট বাজারে সবার ঘরে গভীর বিষাদ নিত্য,
রাজ্য জুড়ে সবার যেন শান্তিহারা চিত্ত।
নারী পুরুষ বৃদ্ধ যুবা মূর্খ জ্ঞানবন্ত
সবাই ভাবে স্বপ্নে রাজার পড়ল কেন দন্ত।

রাজার সভায় ছিলেন যত সুবিখ্যাত পণ্ডিত,
আকাশ পাতাল ভাবতে তাঁরা হারিয়ে ফেলেন সম্বিত।
জিজ্ঞাসিলেন রাজা তাঁদের স্বপ্নের কী ভাষ্য,
নীরব সবাই প্রশ্ন শুনে, মলিন সবার আস্য।
বাদশা তখন বলেন রেগে—তোমরা অপদার্থ।
আমার সভায় মাসিক বৃত্তি পাবে না কেউ আর ত।
চললো ভীষণ গবেষণা,—টল্‌টলোমান পৃথ্বী,
জগৎ জানে বাদ্‌শা রাজার কী অতুলন কীর্তি।
ভুলেই গেল সেরার লোকে বর্ষা কি বসন্ত,
সবাই ভাবে, স্বপ্নে রাজার পড়ল কেন দন্ত?

ঘোষেন রাজা সকল দেশে বাজিয়ে ঢাকের বাদ্য,
স্বপ্ন আমার ব্যাখ্যা করা যাহার হবে সাধ্য,
'লক্ষ মোহর পুরস্কার তো আছেই তাহার ভাগ্যে—
মন্ত্রী বলেন—বড্ড বেশী! রাজা বলেন—যাক্ গে!

দেশ বিদেশের চিন্তাশীলে কতই করে চেষ্টা,
অধিক ভাবার ফলে কতক পাগল হ'ল শেষটা।
ধ্যানে বসে' ভাবেন তখন ফকির সাধু সন্ত,
স্বপ্নে কেন শাহান্‌শাহের পড়ল সকল দন্ত ?

বিখ্যাত এক জ্ঞানী এলেন হঠাৎ দেশের প্রান্তে,
ছুটল দ্রুত সবাই তাঁকে রাজার সভায় আন্‌তে।
নিবাস যে তাঁর কোন্ মুলুকে কে জানে তার সন্ধান,
নানান্ ভাষা জানেন এবং বড়ই তিনি বিদ্বান্।
সকল কথা শোনার পরে করেন তিনি চিন্তা,
বাদ্‌শা বলেন, কি বুঝিলেন, শীঘ্র বলে দিন তা'।
সুধী খানিক স্তব্ধ থাকি' করেন মধুর হাস্য,
বলেন পরে, শাহান্‌শাহ ! শোন স্বপন-ভাষ্য।
সাম্‌নে তব মর্‌বে সকল জ্ঞাতি এবং মিত্র,
থাকবেনা কেউ বলতে আপন, ইহাই স্বপ্ন-চিত্র।

শুনেই রাজা গেলেন ক্ষেপে, হলেন ক্রোধে অন্ধ,
হুকুম দিলেন কর্‌তে তাঁকে বন্দীশালায় বন্ধ।
কতই মানুষ এল সেথায় স্বপ্ন বিচার কর্‌তে,
কেউবা গেল জেলে, আবার কাউকে হল মর্‌তে।
দিবারাত্রি ভেবে রাজার নেই দেহে আর কান্তি,
রাজ্য জুড়েও কারো মনেই নেই কিছু আর শান্তি।

এমন সময় রাজার সভায় এলেন আর এক বিজ্ঞ,
সর্ব্ব বিদ্যা জানেন তিনি সব জ্ঞানে অভিজ্ঞ।
স্বপ্ন-কথা শুনে বলেন—কণ্ঠ কী তাঁর মিষ্ট!
"এমন শুভ স্বপ্ন রাজন্ হয়নি ধরায় দৃষ্ট।
সবার চেয়ে দীর্ঘজীবী হবেন প্রভু নিশ্চয়,
একশো বছর শান্তি সুখে রাজ্য করুন নির্ভয়।
এমন আয়ু শত্রু মিত্র কেউ পাবে না অন্য,
নিত্য নূতন কীর্ত্তি যশে জীবন হবে ধন্য।"

শুনেই রাজার অধরপুটে উঠল ফুটে হাস্য,
বলেন, তুমিই ঠিক করেছ মোর স্বপনের ভাষ্য।
লক্ষ মোহর দিলেন তাঁরে দিলেন অনেক বস্ত্র,
সবার উপর আসন দিলেন সভায় করি যত্ন।
চতুর্দিকে রটলো সুনাম, বললে সবাই ধন্য,
সকল জ্ঞানীর মধ্যে হলেন তিনিই অগ্রগণ্য।

এদ্দিনেতে হল সবার ভাবনা ভয়ের অন্ত,
স্বপ্নে কেন দেখেন রাজা পড়তে নিজের দন্ত।
চিন্তা কারো রইল না আর, শান্তি এল রাজ্যে,
রাজায় প্রজায় মাত্‌ল আবার যে যার আপন কার্য্যে
বলার দোষেই অনেক কথাই দাঁড়ায় হ'য়ে মন্দ,
মন্দ কথাও কথার ফেরে হয় না অপছন্দ।

সবাই যখন ঘুমায়

শ্রীপ্রভাত হালদার

নিশুতি রাত্রে আমরা সকলে ঘুমাই ব'লে রাত্রের অনেক খবরই রাখতে পারি না। এমন সব ঘটনা আমাদের চারিদিকে ঘটে যাতে সত্যই আশ্চর্য হ'তে হয়। এক রাত্রের খবর বলি শোন :—আমাদের বাড়ীর পাশে একটি লাইব্রেরী আছে, সেই লাইব্রেরী ঘরে কিছু দিন আগে এই ঘটনা ঘটে।

সেদিন লাইব্রেরী ঘর নিয়মমতই বন্ধ হ'য়েছিল, লাইব্রেরীয়ানের তরফে কোনও ত্রুটি নেই, কিন্তু রাত্রি প্রায় বারটার সময় মনে হ'ল লাইব্রেরী ঘরে কারা যেন রয়েছে। আমার একটু সন্দেহ হ'ল—কোনও বদ লোক বই চুরি করার মতলবে ঘরে ঢুকেছে নাকি?

আস্তে আস্তে পা টিপে গিয়ে একটি জানালার পাশে এসে দাঁড়ালাম, জানালার ফাঁকে উঁকি মেরে আশ্চর্য হ'লাম ঘরে আলো জ্বলছে দেখে। নোটিসবোর্ডের দিকে তাকিয়ে দেখি একখানা কাগজে লেখা—

বিরাট সভা

অদ্য রজনী

স্থান :—লাইব্রেরী হল।

সময় :—রাত্রি বারটা।

বিষয় :—আলোচনা।

সভাপতি :—স্যামুয়েল গলিভার।

বক্তাগণ :—আলাদীন, এ্যালিস, কুমার, বিমল, তুষার কুমারী ও সপ্ত বামন।

নোটিসবোর্ড থেকে নজর পড়লো পাশের র‍্যাকের দিকে। সার বন্দি বই সাজান, কিন্তু বইগুলো যেন নড়ে উঠলো! আমি বিস্মিত হ'য়ে বইগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলাম। বই নড়ে কেন? তোমরা হয়তো আমার কথা শুনে হাসবে বা বিশ্বাস-ই করবে না। আমি তোমাদের এক বর্ণও বাড়িয়ে বলছি না। হুবহু যা' সে রাত্রে দেখেছি তাই লিখছি। গলিভারের ভ্রমণ কাহিনী থেকে বার হ'য়ে এলো স্যামুয়েল গলিভার, পরণে তার অষ্টাদশ শতাব্দির পোষাক, ভারি বুট জুতায় পায়ে খট্‌খট্ আওয়াজ হ'চ্ছে। ঠিক তার পিছনে চলেছে একজন লোক মাত্র দু'ইঞ্চি। বুঝলাম লিলিপুটের অধিবাসী। আরব্য রজনীর মলাট ঠেলে প্রদীপ হাতে আলাদীন বার হ'ল। তার পিছনে নাচতে নাচতে আসছে ফ্রক পরা এলিস। আর এক থাক থেকে হাত ধরাধরি ক'রে নামছে বিমল ও কুমার—তাদের পিছনে আসছে বাঘা কুকুর। বন্দুক পিঠে নিয়ে রামহরি আসছিল কিন্তু বিমল তাকে আসতে দিলে না। বললে,—তোমায় সব তাতেই আমাদের পিছনে আসতে হবে না। এত আর 'যখের ধন' আনতে যাচ্ছি না—যাচ্ছি মিটিং করতে। রামহরি তার কথায় ফিরলো। এদের শেষে নামছে দুহাতে শিশির বর্ণ ফ্রক ধরে তুষার কুমারী আর তার পিছনে সাতটি বামন লণ্ঠন হাতে গান গাইতে গাইতে আসছে। এরা ছাড়া আরও অনেকে এই সভাতে জমায়েত হ'ল। লাইব্রেরী ঘর তখন ভর্তি হ'য়ে গেছে। আমি এক দৃষ্টে তাদের দিকে তাকিয়ে আছি। সব থেকে বিস্মিত হ'লাম দেখে বিমল বাঙালী, আলাদীন চীনের লোক, স্যামুয়েল গলিভার ইংরেজ, অথচ এরা এমন ভাষায় সবাই কথাবার্তা বলতে লাগলো যা' সকলেই বুঝতে পারে।

সভাপতির আসনে বসলো—স্যামুয়েল গলিভার আর

তার টেবলের উপর লিলিপুটের লোকটি স্থান করে নিলে। সভার কাজ শুরু হবার বেশী দেরী নেই, সবাই স্থির হ'য়ে বসে আছে। আলাদীন হাতের প্রদীপটী টেবলের উপর নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল, তারপর সভাপতিকে উদ্দেশ করে বললে--আজ আমাদের এই সভার আলোচ্য বিষয় বিমলবাবুকে জানাতে অনুরোধ করছি।

বিমল পকেট থেকে একটা কাগজ বার ক'রে পড়তে লাগলো, তার মর্ম হ'চ্ছে এই :—

"বর্তমানে আমাদের একটি সমিতি গঠন করবার প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশী তা' আপনারা সকলেই বিশেষ অবগত আছেন। সুতরাং অবিলম্বে একটি সমিতি গঠনের প্রস্তাব করছি আমি। এই সমিতির প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে দেখতে গেলে দেখা যায় যে আমাদের সমাজে উপস্থিত বহু বিভিন্ন প্রকৃতির লোক ভিড় করছে। সেই ভিড় থেকে বাঁচবার একমাত্র উপায় একটি সমিতি গঠন করে আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া।"

এলিস উঠে বললে,—বিমল বাবুর প্রস্তাবে আমি এক মত হ'লেও আমার একটি প্রশ্ন আছে—এই সমিতিতে কাদের প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে বা হবে না—সেটা যেন বিমলবাবু আমাদের জানিয়ে দেন।

সাত বামন একসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললে,—আমরা বিমলবাবুর প্রস্তাবিত সমিতি থেকে আশা করি বাদ যাবনা —কি বলেন বিমলবাবু?

বিমল জবাব দিলে,—সমিতি না গড়ে উঠা পর্যন্ত এ প্রশ্ন উঠতে পারে না।

স্যামুয়েল গলিভার বললেন,—আচ্ছা সমিতি গঠনের পক্ষে ক'জন এবং বিপক্ষে কজন? তাঁরা হাত তুলে জানান।

দেখা গেল একমাত্র তুষার কুমারী বাদে আর সকলেই হাত তুলেছে। গলিভার তুষার কুমারীকে প্রশ্ন করলেন,— একা তোমার অমত কেন?

তুষার কুমারী দাঁড়িয়ে উঠে বললে,—বিমলবাবুর কথাটা আমি ঠিকমত বুঝতে পারিনি। স্পষ্ট ক'রে তিনি আমাদের বুঝিয়ে দিন এ সমিতি আমাদের কি উপকার করবে।

আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম অতটুকু মেয়ের এমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখে। এই সময়ে একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটে গেল। আমি অন্য মনে দাঁড়িয়েছিলাম, এক অসতর্ক মুহূর্তে আমার হাতটা জানলায় লেগে একটু শব্দ হল। সেই শব্দ শুনে বিমলের 'বাঘা কুকুর ডেকে উঠল। আমি সেখান থেকে যেই সরে পড়তে যাব, দেখি আমার চারিপাশে সাত বামন এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। আমি আশ্চর্য হ'য়ে গেলাম এরা কোথা থেকে এলো? একটু পরেই বুঝলুম টপাটপ্ এরা সব জানালা গলে এসেছে। এই সময় বিমল জানালার ধারে এসে বললে,—আপনি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন না—আমি বুঝেছি, আপনার মতলব খারাপ নয়, আপনাকে ভিতরে এসে বসতে হবে। সভাপতির ইচ্ছানুসারে আপনাকে কিছুক্ষণের জন্য নজরবন্দী রাখতে হচ্ছে, কিছু মনে করবেন না।

অগত্যা তাদের সঙ্গে আমাকে ঘরের ভিতর গিয়ে বসতে হ'ল। আমি যাবার পর সভার কাজ যথানিয়মেই চলতে লাগলো।

তুষার কুমারীর প্রশ্নের উত্তরে বিমল বলতে লাগলো, আপনাদের নিশ্চয়ই এ কথা মনে আছে যে আমরা কেউই ভুঁইফোড় নই, সকলেই সাহিত্যিকের হাতে গড়া কিশোর সাহিত্যের নায়ক, সুতরাং নায়কের যতদূর সম্ভব ভাল কাজ করতে হবে। অন্ততঃ শিশু সাহিত্যে। বর্তমানে শিশু সাহিত্যের মধ্যে বহু আপত্তিজনক চরিত্র বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করছে। আমাদের এই সমিতির কাজ হবে যারা নির্বাসিত সৎ নায়ক তাদের ডেকে এনে আমাদের সমাজের মধ্যে নূতন করে প্রতিষ্ঠা করা। কারণ, শিশু সাহিত্যের মধ্যে আমাদের দায়িত্ব অনেকখানি। শিশু সাহিত্যে গলদ দেখা দিলেই আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আগামী কালে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে হলে আমাদের সমাজকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন। বিমলের প্রস্তাব সর্বসম্মতি ক্রমে সমর্থিত হ'ল। সমিতি গঠিত হ'ল এবং নিম্নলিখিত কার্যপদ্ধতি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হ'ল।

১। শিশু সাহিত্যের মধ্যে কোন ভীতিপ্রদ রচনা ও কদর্য নায়কের স্থান নেই। থাকলে তারা সমিতির সভ্যপদ পাবে না।

২। শিশু মনে সৎসাহস, কর্মোৎসাহ এবং আনন্দ নায়কদেরই জোগাতে হবে।

৩। বিজ্ঞানের উপর নায়কদের সাহায্যে শিশুদের গভীর শ্রদ্ধা আনতে হবে এবং ছেলেমেয়েদের মনকে তারা কখন মিথ্যা ছলনায় ভোলাতে পারবে না।

৪। শিশু মনে নায়কদের মহৎ চরিত্রের প্রভাব বিস্তার করতে হবে।

এই রকম কার্যপদ্ধতি স্থির হবার পর ছেলে মেয়েদের কোন শ্রেণীর গল্প, উপন্যাস বা কবিতা ভাল লাগে তা অনুসন্ধান করে জানতে হবে স্থির হল। এ কাজের ভার পড়েছে আমার উপর। সুতরাং, তোমাদের কোন শ্রেণীর রচনা ভাল লাগে আসছে মাসে আমাকে জানাবে। আমি সময় মত সংবাদ পেলে এদের সমিতিকে সে কথা জানাব।

তাদের সভা যখন ভাঙলো তখন আর একটি বড় মজার ব্যাপার হল। আলাদীনের নির্দেশে তার প্রদীপের দৈত্য ভৃত্য আমাদের সকলকে পরিতৃপ্ত ক'রে খাওয়ালে, তারপর সবাই যে যার বইয়ের মধ্যে চলে গেল।

বাঙলা-সাহিত্য পরিচয়

অধ্যাপক শ্রীতারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম এ

শিবের কাহিনী অতি প্রাচীন হইলেও এই দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণনার জন্য সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে কোনও স্বতন্ত্র কাব্য রচিত হয় নাই। খ্রীষ্টীয় ১৬৭৪-৮২ সালের মধ্যে চট্টগ্রামবাসী দুইজন কবি এক মৃগ ও লুব্ধের (ব্যাধের) কাহিনী বর্ণনাচ্ছলে শিব চতুর্দশীর ব্রতের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথম কবি রতিদেব এবং দ্বিতীয় কবি রামরাজা বা রামরায়। এই দুই কবির বিষয়বস্তু এক এবং উভয়ের ভাব ও ভাষার সাদৃশ্য স্পষ্ট। শ্রীযুক্ত মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ মহাশয় এই গ্রন্থ দুইটি সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি এই দুই কবির তুলনামূলক যে সমালোচনা তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় দিয়াছেন, তাহা হইতে উভয়ের রচনার দৃষ্টান্ত নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

এমত ভাবিয়া ব্যাধ বুঝিলেক মনে।
আচম্বিত মহা বৃষ্টি হইল ততক্ষণে ॥
বড়কায় গাছ উপাড়িয়া পড়িল ভূমিত।
কালাবর্ণ মেঘ সব আকাশে পূর্ণিত ॥
শীতে ভীতে কম্পমান হইল শরীর।
ভয়াকুল হইলা ব্যাধ কান্দিতে লাগিল ॥
বিজুলি চমকে মেঘ করিল গর্জন।
মুষল সমান ধার হইল বরিষণ ॥
ঠাঠারের ঘাত্র অগ্নি পড়ে নিরন্তর।
ঘোর অন্ধকার হইল বনের ভিতর ॥

—রামরাজার মৃগলুব্ধ সংবাদ

দেবতার চরিত্র বুঝিতে পারে কোনে।
অকস্মাৎ বায়ুবৃষ্টি কৈলো মঘবানে ॥
ঘরে গেলো দিনমণি রজনী প্রবেশ।
ঘোর অন্ধকার রাত্রি চাপিলো বিশেষ ॥
অকস্মাৎ ঝঞ্ঝাবাত শিলা বরিষণ।
আকাশ ভরিল হৈলো মেঘের গর্জন ॥
বড় বড় বৃক্ষসব বাতাসে ভাঙ্গিলো।
ঠাঠাঘাতে বজ্রাঘাতে ভুবন কম্পিলো ॥
ঘন ঘন বিজুলি চমকে চারি পাশ।
চাহিতে চমকে আখি জীবন নৈরাশ ॥

—রতিদেবের মৃগলুব্ধ

এই সপ্তদশ শতাব্দী হইতে শিবায়ন কাব্য রচনা আরম্ভ হইলেও ইহা অনেক দিন ধরিয়া চলে নাই। সকল কাব্যের মধ্যেই শিবের মাহাত্ম্য-প্রচারক কহিনী লিপিবদ্ধ হইতে থাকায় স্বতন্ত্র আকারে শিবের কাহিনী রচনার সার্থকতা দেখা যায় নাই। এইজন্য শিবায়ন কাব্য অত্যন্ত কম।

মেদিনীপুর জেলার যদুপুর নিবাসী রামেশ্বর ভট্টাচার্য প্রণীত শিবায়নই একমাত্র সম্পূর্ণাঙ্গ কাব্যের আকারে রচিত হইয়াছিল। এই শিবায়নটি ১৬৩২ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭১০-১১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল।

রামেশ্বর কবি অপেক্ষা ভক্তই ছিলেন অধিক। তাই তাঁহার অনুপ্রাস দুষ্ট কাব্যের মধ্যেও রসসৃষ্টির ব্যাঘাত হয় নাই। কবি বিশেষ করিয়া হাস্য রসের অবতারণায় সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। কিন্তু এ সকল অপেক্ষাও আর এক বিষয়ে রামেশ্বরের যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। শিবের কাহিনীর অশ্লীলতা এবং গ্রাম্যতাকে তিনি এরূপ নিপুণতার সহিত ব্যবহার করিয়াছেন যে তাঁহার কাব্য সুরুচির পরিচয় দেয়। নিম্নে রামেশ্বরের প্রতিভার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হইল :—

তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী।
দুটি সুতে সপ্তমুখ, পঞ্চমুখ পতি।
তিনজনে একুনে বদন হইল বার।
গুটি গুটি দুটি হাতে যত দিতে পার।
তিন জনে বার মুখ পাঁচ হাতে খায়।
এই দিতে এই নাই হাঁড়ি পানে চায়॥
দেখি দেখি পদ্মাবতী বসি এক পাশে।
বদনে বসন দিয়া মন্দ মন্দ হাসে॥
সুক্তা খেয়ে ভোক্তা চায় হস্ত দিয়া শাকে।
অন্ন আন অন্ন আন রুদ্রমূর্তিডাকে॥
কার্তিক গণেশ ডাকে অন্ন আন মা।
হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য হয়ে থা॥
মূষগ মায়ের বোলে মৌন হয়ে রয়।
শঙ্কর শিখায়ে দেই শিখিধ্বজ কয়।
* * *
যত পাব তত খাব ধৈর্য্য হব বটে॥

রামেশ্বরই শিবায়ন-শাখায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার পরে আর যে সকল শিবায়ন রচিত হইয়াছিল, সেগুলির মধ্যে উল্লেখ যোগ্য কিছুই নাই। ইহাদের মধ্যে রামকৃষ্ণ-দাস কবিচন্দ্রের শিবায়ন একটি। ইহার যে পুথিখানি পাওয়া গিয়াছে, তাহার প্রথম তিনটি পাতা না থাকায় কবির পরিচয় ও কাব্যের রচনা কাল সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। তবে তাঁহাকেও অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি বলিয়া মনে হয়। ইহা ছাড়া রাম রাম দাস রচিত শিবমাহাত্ম্যের একখানি পুথি রংপুর অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে।

দ্বিজ কবিচন্দ্র নামের ভণিতাযুক্ত একখানি শিবমঙ্গল কাব্য পাওয়া গিয়াছে। ইহার রচনা কাল ১৬৫৬ ৮২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। অনেকে মনে করেন যে এই কবি মল্লভূমি-নিবাসী মুনিরাম চক্রবর্তীর পুত্র শঙ্কর, কারণ ইনিও কবিচন্দ্র উপাধি ব্যবহার করিতেন এবং শিবমঙ্গলে মল্লরাজ বীরসিংহ দেবের কথা উল্লেখ আছে। অনেকে ইহা স্বীকার না করিয়া লইলেও এরূপ অনুমানের যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে।

দ্বিজ হরিহরের পুত্র দ্বিজ মণিরাম বা দ্বিজ সুন্দর 'বৈদ্যনাথ মঙ্গল' নামে একখানি কাব্য রচনা করেন। ইহার রচনা কাল কাব্যে উল্লিখিত হয় নাই, পুথির লিপি কাল ১২১০ সাল।

৺দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে দ্বিজ ভগীরথের শিবগুণ মাহাত্ম্য নামক কাব্যের উল্লেখ করিয়াছেন।

লজ্জা-নিবারণ

শ্রীহীবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সখারামের অবস্থা ভালো। হাঁ, খুবই ভালো, অন্তত লোকে তাই বলে, তবে কিনা—মানুষ পরের অর্থ ও নিজের পরমায়ু একটু বেশী রকম বাড়িয়েই ভাবে, তা যাক্, মোট কথা—সখারাম শাঁসালো যদিচ তার চেহারা ও বেশ-ভূষা এ কথার তারস্বরে প্রতিবাদ করে। আজ তিরিশ বছর তিনি মানুষের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করে আসছেন। হৃদয়ের বিনিময়ে নয় অবশ্য, তার চেয়েও সে বিনিময় অনেক বেশী মূল্যবান ও নিটোল। কারণ, সখারামের ব্যবসা টাকা ধার দেওয়া। সবাইকে কি? আরে রামঃ! সুদে আসলে চতুর্গুণ উশুল হবার উপায় না থাকলে সখারামের ধার সে ধার দিয়েও যায় না। এই কারণে শহরের গলিতে তাঁর দু'খানা বাড়ী উঠেছে। ভাড়া খাটে। ভীষণ মোটা কালো চেহারা সখারামের পরণে ময়লা খাটো কাপড, গায়ে ফতুয়া। কে, এম, দাসের সাত বছর আগে কেনা মজবুত চটি পায়ে ফটাস ফটাস করতে করতে ইংরেজি মাসের পয়লা সন্ধ্যেবেলা ভাড়াটেদের মুখ শুকিয়ে সখা-রামের আবির্ভাব হয়—বাপ্! যেন সাক্ষাৎ যমদূত। জনপ্রবাদ—আজ পর্যন্ত কেউ নাকি ফাঁকি দিতে পারেনি তাকে। সখারাম ফিক্সড্ ইনকামের লোক ছাড়া ঘর চুণকাম করেন না, অর্থাৎ ভাড়া দেন না। ভাড়াটে আসে। প্রশ্ন হয় সর্বপ্রথম 'কি করা হয় মশায়ের?' 'আজ্ঞে ব্রোকার' সখারাম আর পাত্তা দেয় না—তার ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতায় এটা বেশ মালুম হয়েছে যে ব্রোকারের আধুনিক অর্থই হল বেকার। কে ভাড়া আদায়ে গিয়ে শূন্য হাতে রোজ রোজ ফিরে এসে সকার-বকার করবে। কেউ যদি বলেন, 'আজ্ঞে আমি অমুক দৈনিক কাগজের সাব্-এডিটার। সখারাম তাকেও ভাগান। হুঃ দৈনিক কাগজে কাজ—কাজ খুব বটে, কিন্তু মাইনে পাবার দিনটি কেবল তাদের ঠিক থাকে না। এডিটার নামের গভীরতম অর্থ 'Aid-eater' হয়ে দিন চলে যাদের। Aid মানে পরের সাহায্য, Eater মানে ভক্ষক, অর্থাৎ কিনা পরের দয়ার উপর জীবিকার নির্ভর যাদের তাদেরই বলে এডিটর।

সুদখোর প্রাণ্ বাড়ীওয়ালা এই রোমহর্ষক যোগাযোগে পুত্র শোকের অভিশাপ না পেয়েছে এমন পুণ্যবান ধরাধামে নেই। কিন্তু ভাগ্যবান সখারাম। অভিশাপ পাবার আগে থেকেই একেবারে আঁটকুড়ো। কিন্তু, তবুও সখারামের ছেলে আছে। সস্ত্রীক সখারাম সম্পর্কে ভাইপো তথা ভাসুরপো হয় এমন একটি ছেলেকে পোষ্য নিলেন তার দুগ্ধপোষ্য অবস্থা উত্তীর্ণ হবার পরই। তাতে তাঁদের দুগ্ধও বাঁচল, পোষ্যও হলো। সেই হবে তাঁদের উত্তরাধিকারী যদি না উত্তরকালে বলসেভিজম ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর বল প্রয়োগ করে। ছেলেটির ডাক নাম মাদার, ভালো নাম চঞ্চল। এতকাল স্কুলে যাতায়াত করছিল। যেই কুড়ি পার হবার কাছাকাছি হলো অমনি তাকে সখারাম বুড়ি ছুঁইয়ে দিলেন। উদ্দেশ্য মহৎ, এখন থেকে আদাজল খেয়ে লেগে তাকে মানুষ—অর্থাৎ সুদখোর ও বাড়ীওয়ালা করতে হবে। ছেলেটির সম্বন্ধে সখারামের অবচেতন মনে একটা আতঙ্ক আছে—তার একটি মারাত্মক রোগের জন্য। কী রোগ? টি-বি? ক্যানসার? আন্ত্রিক ক্ষত? নাঃ, ওসব কিছু অবশ্য নয়, তবে এ রোগ ও সব রোগের চেয়েও সখারামের কাছে নেহাৎ কম মারাত্মক নয়, তাই সখারাম বর্তমানে বড়ই চিন্তিত ও আতঙ্কিত।

রোগটা হচ্ছে একান্ত লাজুক স্বভাব মাদারের অস্বাভাবিক লজ্জা। ছেলেটা লাজুক, অসম্ভব অভাবনীয়

লাজুক, কাবোর সঙ্গে মিশতে পারে না, যেখানে লোকে-জনের ভীড় তার থেকে একশো হাত দূরে থাকে। কারুর বাড়ী আসতে হলেই লজ্জায় ভয়ে তার হৃদকম্প হয়। তাব মুখে কথা নেই—অত্যন্ত গোবেচারা, আড়ালে আডালেই থাকে, চোখে হবিণ শিশুর সশঙ্ক নিবীহ দৃষ্টি। কখনো বাপমায়েব কাছেও বিছু মুখ ফুটে চায না। সখারাম প্রমাদ গণেন। ভুল হয়েছে এমন ছেলেকে পোষ্য নেওয়া—যত নষ্টেব গোড়া তাব স্ত্রী। সুন্দর মুখ আর গায়ের বঙ দেখে Wrong নম্বব নির্বাচিত কবেছে। কিন্তু দয়াময়ীকে দোষ দেবেনই বা কি কবে। মাদাবেব যিনি ফাদার আব বিশেষ কবে তাব গর্ভধাবিণী মাদাবকে তাঁরা জানেন। উঃ। তিনি ত্তো একখানি খাণ্ডারবাণী ধ্রুপদ। অমন কুরুক্ষেত্র-কাবিণী বণতাণ্ডবিণী জীবনে তাঁবা কমই দেখেছেন। কোঁদলে ও শোকে মত্ত হ'লে তাঁর গলাব পর্দা এতো উঁচুতে চড়ে যে বড বাস্তায় লোকচলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পশুপক্ষীরাও চমকে ওঠে। বাপটিও তাঁরই 'সুলভ' সংস্কবণ বিশেষ। এমন অদ্বিতীয় বাপ-মা'ব এ যখন ছেলে তখন হেরিডিটির গুণাগুণ কিছু না কিছু তাতে বর্তাবেই। কিন্তু বৃথা আশা সখাবামেব—এ ছেলে হলো কিনা লাজুক—তাঁব ব্যবসার পক্ষে যেটার চেয়ে শত্রু আব পৃথিবীতে নেই, চক্ষু-লজ্জা একাজে আনে সর্বনাশ। সখাবাম ঠিক কবেন বোজা হয়ে তিনি মাদারের এ লজ্জাবিষ ঝাড়িয়ে লজ্জা নিবারণ কববেন। বাঘেব ঘবে ঘোঘেব বাসা।

আজ সখাবামেব ভাইবাভাই আসবে। সখারাম ডাকেন মাদারকে। একটু পবে চৌকাটেব কাছে অত্যন্ত সলজ্জ কুণ্ঠিত সংকুচিত মাদাবেব আবির্ভাব হল, মুখে আবিবের রঙ অর্থাৎ লাজুকেব সহজাত আভা। সখাবাম ট্যাকের পাক খুলে একটা ময়লা আধলা পয়সা বের কবে বললে: 'তোমাব মেসোমশাই আসবেন বুয়েচো—তাঁকে খাতির করা চাই। যাও আধপয়সাব বিড়ি কিনে নিয়েসো গে। দ্যাখো—এই ইয়া বড বড দেখে বিড়ি বেছে বেছে আনবে—পয়সায় আটটা। বুয়েচো। খবর্দার ছোটো বিড়ি নেবে না—বড় তাড়াতাড়ি পুড়ে যায়। পাঁচ দোকান ঘুরে ঘুরে দেখে যে দোকানের বিড়ি বড সেইখান থেকে আনবে—একটা ফাউ চাইবে বুয়েচো।'

মাদার কম্পিত কণ্ঠে বললে: 'ফাউ যদি না দ্যায়?' না দিলে ছাড়বে কেন। শুধুশুধু কেউ কি দ্যায়, আদায় করে নেওয়া চাই—না দিলে অন্য দোকান থেকে নেবার ভয় দেখাবে। বুয়েচো!'

একটু পবে মাদার এসে বিড়ি দিল। সখাবাম একটি একটি করে গুণে দেখলে তিনটি। তৎক্ষণাৎ তাকে কে যেন কাটলে এক চিমটি। চমকে উঠে বললে—এ্যাঁ তিনটে কেন? ফাউ আনাব বদলে উল্টে একটা কম! তুই কি দোকানীকে আধলার সঙ্গে ফাউ না নিয়ে ফাউ দিয়ে এলি? ফাউ না দেয় পুরো চারটে দেবে ত। তিনটে কেন হতভাগা? আব একটা কই? নিজে ফুঁকে এলি নাকি? মাদাব কম্পিতকণ্ঠে বললে—'না।' 'তবে কি পড়ে গেছে?' 'না।' 'তবে হাত-মেরেছে নাকি?' (পকেট থেকে নিলে পকেট-মারা বলে, মাদাব হাতে করে নিয়ে এসেছে) 'না।' 'তবে কি হলো? কটা দিলে গুণে দ্যাখনি'—'না' 'এ্যাঁ? দেখনি? সে কি।'—মাদার নতমুখে 'থ'। ঠিক এই সময় দয়াময়ী ঘবে ঢুকতেই উত্তেজিত হয়ে সখাবাম বলেন:—'দ্যাখো দ্যাখো একবার কাণ্ড দ্যাখো—ফাউ আনতে বললুম, উল্টে তোমার গুণধর ছেলে ফাউ দিয়ে এলেন। এ ছেলে দেখচি আমার বাস্তু ভিটেয় ঘুঘু চবাবে।' দয়ামগ্নী মাদাবেব মাথায় হাত দিয়ে মাদাবভৈঃ অর্থাৎ মাভৈঃ দেন, বলেন: 'ওরকম ছেলেপিলেবা পেরথম পেরথম হয়ই গো। তোমার সঙ্গে দিন কত তাগাদায় বেকলে মাদারের লজ্জা আপনি কেটে যাবে।'

মেয়েমানুষ জাতটাই আশাবাদী, ভাবেন সখারাম। পবদিন আবার তলব পড়ে মাদারেব সখাবামের ঘরে। তাকে জানানো হয়—কাল ইংরেজি মাসের পয়লা, সখারামের সঙ্গে খাতা হাতে তাকে ভাড়া আদায়ে বেরতে হবে। শুনে মাদাবের পিলে চমকে ওঠে। কারণ, পরোধর্ম ভয়াবহ।

পবদিন চিরন্তন পোষাক পবে সখাবাম হাঁকেন: 'মাদার।' নবমীর ছাগশিশুর মত কাঁপতে কাঁপতে মাদার এলে সখারাম মিষ্টি করে বলেন: 'চলো বাপ-বেটা দু'জনে আমরা যাই, আজ থেকে তোমাব ব্যবসায় হবে হাতে খড়ি। এই খাতাখান্ রাখো তোমার কাছে সাবধানে—তখন

যে রকম করে বুঝিয়ে দিলুম সেইভাবে নাম বার করবে। বুয়েচো ? এই খাতাই হলো গে আমাদের লক্ষ্মী সরস্বতী কালী দুর্গা নারায়ণ মহাদেব। তেত্রিশকোটী—বুয়েচো। জয় বাবা সিদ্ধিদাতা গণেশ। আশীর্বাদ করো বাবা এই বালকের যেন লজ্জা নিবারণ হয়।'

রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে পথ চলতে চলতে মাদারকে ভাড়াটাদের চরিত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন সখারাম। তারা এক একটি বিচ্ছু। ভালো কথায় টাকা না দিলে দাবড়ানি দিতে হয়। মাদারের মুখ শুকিয়ে চূণ হয়। কী করে দাবড়ানি সে দেবে—এঁ্যা। একটা রুদ্ধ দ্বার বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে জোরসে কড়া নাড়েন সখারাম। কী কড়া আওয়াজ বেরয়। একটি শীর্ণ লোক বেরিয়ে আসে। হঠাৎ মুখ ম্লান হয়ে উঠে তার, সখারাম বলেন,—'নমস্কার জনার্দন বাবু। তা শরীর টরীর ভালো ?' 'না শরীর খুব খারাপ মশাই আজ বেরতেই পারিনি, বড় দুর্বল হয়ে পড়েছি।' বলেন জনার্দন বাবু।

ওরে বাবা এ বলে কী। বেরতে না পারার অর্থ তো আজ অর্থ না-প্রাপ্তি। সখারামের আপশোষে জাগে, শরীরের কথা তুলে অমন বেফাঁস কথা কেন জিজ্ঞাসা করেছিলো সে। তাড়াতাড়ি চাপা দেবার জন্যে বলে, হাঁ, দেখুন, এই যে আমার সঙ্গে ছেলেটি দেখছেন, এটি আমার—'বলে চেয়ে দ্যাখেন তাঁর চারপাশ জনশূন্য। মাদার নেই। চোখের দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখেন দশ বারো হাত দূরে গিয়ে মাদার তাদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। সখারাম সরোষে হাঁকতেই সে জুজুর কাছে এগিয়ে আসার মতো এক পা এক পা করে এসে নত মুখে দাঁড়ায়। সখারাম রাগ চেপে কণ্ঠ মোলায়েম করে জনার্দনকে বলে—'আসচে মাস থেকে এই আসবে টাকা নিতে। ওরই তো সব বুঝেছেন না। মাদার, বাপ্ আমার! জনার্দন বাজপেয়ির নামের পাতাটা বার করে দেখতো গত মাসে কত পাওনা। তা' যান আপনি জনার্দন বাবু, নিয়ে আসুন—ও মাসের পাঁচ আর এ মাসের পনেরো।

'আজ মশাই দশ টাকার বেশি পারব না। দয়া করে আসচে মাসে বাকিটা সব নেবেন।'

সখারাম হাসেন—'পাগল, আপনার পুরো টাকাটা ধরে খরচের হিসাব করেছি যে—যান্ যান্।'

'পারব না বলছি, কেন জুলুম করছেন মশাই।'

'আজ আমার টাকা চাই-ই।' কে, এম, দাসের চটিসুদ্ধ ডান-পা ঠোকেন সখারাম এবং একটু পরেই সখারাম ও বাজপেয়ীর গলাবাজি রাস্তায় ও আশেপাশের বাতায়নে পুরুষ এবং ভদ্রমহিলাদের ভীড় জমায়। অনেকক্ষণ গলাবাজির পর পাঁচ টাকা কমে সব টাকা চুকিয়ে দেবার রফা হয়। বাজপেয়ী টাকা এনে রাগে গজ্রাতে গর্জাতে বলে, 'এই ভদ্রতা, দিন খাতা দিন—'

সখারাম পরম আনন্দে মাদারের কাছ থেকে খাতা নিতে পাশের দিকে ফেরেন, কিন্তু একি! সখারামের চোখ মাদারকে আশেপাশে নিকটে দূরে কোথাও আবিষ্কার করতে না পেরে চরকীর মত ঘোরে। কোথায় মাদার। যতদূর দৃষ্টি যায় কোথাও নেই। খাতা না হ'লে যে টাকা দেবে না। অসহ্য ক্রোধে মাদারের আসল ফাদারের উদ্দেশে পুষ্প বর্ষণ করতে করতে সখারাম বাড়ীর দিকে ছুটেন।

সমস্ত শুনে দয়াময়ী বলেন,—পেরথম পেরথম এই রকম হবেই তো, ক্রমে দিন কতক বাদে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

সখারাম খাপ্পা হয়ে বলেন,—'ছাই হবে, আমার মাথা হবে, আমার মুণ্ডু হবে, ভিটেমাটি চাটি হবে।'

দয়াময়ী সান্ত্বনার সুরে বলেন,—'আহা তুমি ওর হাল ছেড়ে দিলে, ওর হাল কী হবে গো ?' ওযে আর হালে পানি পাবে না।'

মাদার তখন বাড়ীতেই অন্য ঘরে লুকিয়ে আছে। দয়াময়ী স্বামীর কানে কানে বাৎলে দেন এক মহৌষধ। বলেন,—'এবার থেকে এই করো তাহ'লে আর নাবাল হতেও হবে না, মাদারকেও সঙ্গে ধরে রাখতে পারবে।'

সখারাম শুনে তারিফ করে আনন্দ গদগদ কণ্ঠে।

পরের দিন আর ভাড়াটের ভাড়ার টাকা নয়, তিন মাসের সুদের টাকা পাওনা পাড়ার এক ভদ্রলোকের কাছে। বড় নাকাল করছে লোকটি। আজ একটা হেস্তনেস্ত করা চাই। মাদারকে ডেকে সঙ্গে নিলেন। পাশে রেখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সারাটা পথ তাকে পর্যবেক্ষণ করতে করতে একটা বাড়ীর সামনে এসে হাজির হন। না, এবার আর বাছা-

ধনকে পালাতে হবে না। সখারাম দয়াময়ীর মহৌষধের শরণ নিয়ে সহসা নিচু হয়ে তার ঝুলানো কাপড়ের কোঁচা এক হাতে তুলে শক্ত করে ধরেন এবং তিনমাসের পাওনাদারের উদ্দেশে হাঁক ছাড়েন। মাদার কাঁদো কাঁদো হ'য়ে বলে, লোকে দেখতে পাবে—ছেড়ে দিন, দুটি পায়ে পড়ি, আমি পালাব না। ছেড়ে দিন। মাদার কাপড় টানে চারদিক তাকিয়ে।

সখারাম আরও জোরে কাপড় চেপে ধরে বলেন, 'হুঁ হুঁ। এবার ছাড়ছি নে। তোর লজ্জার নিকুচি করে তবে ছাড়ব। এই কাপড় টেনো না বলছি। এই যে দ্বারিক পুরকায়স্থ মশাই, আপনার কি ব্যাপার বলুন তো। তিন তিন মাস পার হয়ে গেল, আসল তো দূরের কথা সুদেরও এক পয়সা উপুড় হস্ত করেননি। এই কি আমার মতো সৎ ব্রাহ্মণ সন্তানের সঙ্গে আপনার ভদ্র ব্যবহার? ছিঃ।'

পুরকায়স্থ ব্রাহ্মণের প্রত্যুত্তরে মাথা চুলকাতে চুলকাতে বেরিয়ে আসে, বলে, 'বড় লজ্জিত আপনার কাছে। কী বিপদে যে পড়েছি রূপচাঁদের অহিংস অসহযোগে। এই দু চার দিনের মধ্যেই—আরে এ কি! ব্যাপার কি!—কাপড় ধরে টানচেন কেন ছোক্‌রার? আমারই মতো সুদের আসামী বুঝি? হাঃ হাঃ হাঃ—' ক'মাস দেয়নি?

সঙ্গে সঙ্গে সখারাম ক'যে এক ধমক দেন অবশ্য পুরকায়স্থকে নয়—সৎব্রাহ্মণ পোষ্য মাদারকে। সে কাপড় ছাড়াবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে, তার জন্যে পুরকায়স্থর দিকে পুরো য়্যাটেনশন দেওয়া হচ্ছে না—দু'দিকের টাল কাঁহাতক সামলান যায়। সখারাম আরো জোরে মাদারের কাপড় টেনে ধরে বলেন,—'খবরদার্ ফের যদি কাপড় টানবি তো ফাদারের নাম ভুলিয়ে দেব। পুরকায়স্থ আপত্তি করে বলেন—আহা, খামকা ভদ্রলোকের ছেলের বাপন্ত করছেন কেন? সুদ দেবে আপনার শুধে; ওত আর পালাচ্ছে না!'

রেগে লাল হয়ে সখারাম বলেন—দেখুন পুরকায়স্থ মশাই, ওসব ন্যাকামি রাখুন, আজ টাকা না পেলে পুলিশ কেস করব। ভালোয় ভালোয় টাকা নিয়ে আসুন—

'আর কয়েকটা দিন—।'

'ওসব শুনতে চাইনে—এই ইউ মাদার। ফের। জানেন আপনার মারণাস্ত্র আমার হাতে—জুচ্চুরী চলবে না এই শর্মার কাছে, যান টাকা আনুন বলচি। এই-এই মাদার আবার। আবার কাপড় টানছিস্—'

'আপনি যা পারেন করুন,' বলেন পুরকায়স্থ। 'তবেরে জোচ্চর!' রুখে ওঠেন সখারাম। মাদার ওদিকে প্রাণপণে কাপড় টানছে—অগত্যা সখারাম দু'হাতে তার কাপড় ধরেন এবং একবার মাদারকে আর একবার পুরকায়স্থকে কটু বাক্য বর্ষণ করতে থাকেন। মরিয়া মাদারের তখন কাপড় ধরে সে কী টান। আর পারছে না সখারাম টাল রাখতে, কিন্তু তিনিও মরিয়া। পুরকায়স্থ স্বপক্ষে ও মাদারের পক্ষে সজোরে প্রতিবাদ জানায়।—সে এক দৃশ্য। রাস্তায় লোক জমে যায়। 'কি? কি ব্যাপার মশাই? এঁ্যা? এই বাচ্চার সঙ্গে টাগ্-অফ-ওয়ার করছেন! আরে থামুন থামুন ও মশাই! ও খোকা।' কিন্তু কে শোনে।

পুরকায়স্থর দিকে সবাই সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তখন তাকায়, পুরকায়স্থ প্রাঞ্জল ভাষায় এই টাগ্-অফ-ওয়ারের গুহ্যতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন:—আর দুঃখের কথা বলেন কেন মশাই। ঐ ছেলেটির বাপ এই কালাপাহাড়ের কাছ থেকে কত টাকা ধার নিয়েচে জানিনা,এখন বাপকে না পেয়ে কাবুলিওয়ালা তার ছেলেকে ধরে টানাটানি করছে। আপনারা সব শিক্ষিত ভদ্রলোক, আপনারা বলুন এটা কি উচিত হচ্ছে ওঁর? বলুন দাদা আপনারা।

আর বেশি কিছু বলতে হল না। সকলে শোরগোল করে তাদের মাঝখানে পড়ে মাদারের কাপড় একটানে ছাড়িয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গেই মাদার উধাও। সখারাম ক্রোধে কম্পিত, চক্ষু রক্তবর্ণ, বলেন, 'কেন আপনারা এসেছেন এর মধ্যে?'

এবার সোরগোল ওঠে বেড়ে: জনতা ঘন হয়:

'এটা কোন্ দেশী ভদ্রতা আপনার—এঁ্যা? বাপের দেনার জন্যে নাবালক ছেলেকে ধরে টানাটানি—ছি ছি।'

'কোন্ শালার ছেলে ও? ভাগুন আপনারা এখান থেকে।'

'মুখ সামলে কথা বলবেন। বে-আইনি কাজ ক'রে আবার তড়পানো। দেব পুলিশ ধরিয়ে—ইতরমোর জায়গা পাননি?

'ইতর আপনারা। চলে যান এখান থেকে।'

'কি? ব্যাটা কালাপাহাড়! হিন্দু কুলাঙ্গার! কাবুলি কশাই। এতো বড় স্পর্ধা।'

'ডাকবো পুলিশ? এখনি বেরিয়ে দেব বলছি—.'

'পুলিশ ডাকবে, ফুলিশ কোথাকার। মেরে হাড় ভেঙ্গে দেবো।

সবাই চেঁচিয়ে উঠল—মারো ব্যাটাকে—

পুরকায়স্থ চাঁটির উদ্বোধন হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাড়াতাড়ি ঘাঁটি ত্যাগ করলেন। তুমুল কোলাহলের মধ্যে দমাদম্ দু চার ঘা পিঠে পড়েওছে এমন সময় পাড়ার পরিচিত লোকেরা এসে ক্রুদ্ধ উত্তেজিত জনতাকে নিরস্ত ক'রে ঘর্মাক্ত জর্জরিত সখারামকে যখন বার করল তখন তিনি হাফাতে হাঁফাতে বললেন, 'ও শালার ছেলেকে আমি আজই ত্যাজ্যপুত্তুর করব, আর ঐ শালা পুরকায়স্থকে আমি দেখে নেব — ডবল হ্যাণ্ডনোট লেখানো আছে।' [ক্রমশঃ

মানুষের জন্ম

জগৎ সেন

কল্পনা করতে পারো?

পাহাড়-পর্বত, নদী-সমুদ্র, গাছ-পালা, পশু-পক্ষী, পোকা-মাকড় সবই রয়েছে, নেই কেবল মানুষ। এমন পৃথিবীর কল্পনা করতে পারো? কি অদ্ভুত ব্যাপার—ভাবো দেখি! পৃথিবীর ইতিহাসে কিন্তু সত্যিই এমন একটা দিন গেছে।

আজ বিজ্ঞান সেটা প্রমাণ করেছে কিন্তু অতি আদিম যুগের বর্বর মানুষ যেন সহজ সংস্কার দিয়েই সেটা আঁচ করে নিয়েছিল। মানুষ যে বিধাতার সর্ব শেষ সৃষ্টি এমন ধারণা অনেক দেশের পৌরাণিক গল্পে পাওয়া যায়। কালিফোর্ণিয়ার রেড্ ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে এমনি একটা গল্পের প্রচলন আছে, সেইটাই বলছি।

বিশ্বস্রষ্টা ঈশা কোয়ার্তি জীবজন্তু সব সৃষ্টি করে শেষে এমন এক প্রাণী সৃষ্টির কল্পনা করতে লাগলেন, যে-জীব অন্য সকলের চেয়ে সব বিষয়েই শ্রেষ্ঠ হবে।

ঈশা কোয়ার্তির নিজের চেহারা কেমন ছিল সেটা তাঁর নাম থেকে অনুমান করলে হয়ত ভুল হবে, কারণ, নামের অর্থ সাধু-ভাষায় হয় 'পুরাণ-বৃক', চলতি কথায় 'বুড়ো নেকড়ে'। ঈশা-কোয়ার্তি কটমটে নাম। আমরা এখন থেকে তাঁকে পুরাণ-বৃকই বলব। বিশ্বস্রষ্টাকে 'বুড়ো নেকড়ে' বলা অশ্রদ্ধার পরিচায়ক।

শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের রূপ পরিকল্পনার জন্য পুরাণ-বৃক প্রাণীদের এক সভা আহ্বান করলেন। পশুরাজ সিংহ এবং ঋক্ষরাজ জাম্বুবান থেকে সুরু করে হরিণ, ভেড়া, হুতোম পেঁচা, ছুঁচো পর্যন্ত কেউ বাদ গেল না।

সভা আরম্ভ হ'ল। পুরাণ-বৃক উঠে বললেন আমি তোমাদের সকলকে সৃষ্টি করেছি বটে, কিন্তু তোমাদের যে শাসন করবে সে জীব আমি সৃষ্টি করতে পারি নি এখনো। সে জীব যে কেমন হবে তাও আমার মাথায় আছে। তবে এ বিষয়ে আমি তোমাদেরও পরামর্শ চাই। আমার প্রস্তাবিত 'মানুষ' নামক জীব কোন কোন গুণ বিশিষ্ট হবে সে বিষয়ে তোমরা আপন আপন মত ব্যক্ত কর।

প্রথমেই পশুরাজ সিংহ দাঁড়িয়ে বললেন, প্রভু, শাসনের কাজে গলার জোরটাই সব চেয়ে বড় জোর। যে যত হাঁক-ডাক করতে পারে সে সেই পরিমাণে শাসন করবার যোগ্য হয়। কাজেই আমি প্রস্তাব করছি যে মানুষকেও আমারই মত গম্ভীর গর্জনের শক্তি দেওয়া হোক। তা' ছাড়া দাঁত এবং নখও আমারই মত ধারালো এবং শক্ত হওয়া চাই। এই থাকলেই শাসনের পক্ষে যথেষ্ট। কেবলমাত্র এই তিনটির বলেই সে বিশ্ব-শাসন করতে পারবে।

ঋক্ষরাজ ভল্লুকের বয়স হয়েছে। তিনি এবার উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—আমি বলি কি, মানুষকে আমার মত দু'পায়ে হাঁটবার ক্ষমতা আর ক্ষিপ্র গতিবেগ দেওয়া হোক। তবেই সে পৃথিবী শাসন করতে পারবে।

ঋক্ষরাজের বক্তৃতা শেষ হতেই হরিণ উঠে দাঁড়াল। বেচারা একে লাজুক, বয়সও কম, তাতে আবার পশুরাজের বিরুদ্ধাচরণ করতে দাঁড়িয়েছে। ওর অবস্থা একেবারে সাংঘাতিক হয়ে উঠল। কোনো রকমে চোখ-কান নাচিয়ে ঘাড় নামিয়ে ঢোক গিলে ও বললে, আমি ঋক্ষরাজের প্রস্তাব সমর্থন করছি। আমার মতে সত্যিই হাঁকডাকের শক্তিতে বিশেষ কোনো ফল হয় না। তার চেয়ে দর্শন ঘ্রাণ এবং কান খুব তীক্ষ্ণ থাকলে ঢের বেশি উপকার হবে। আর ঋক্ষরাজ যে গতিবেগের কথা বললেন তাও আমি মানি। ওটা যেমনি আক্রমণের পক্ষে প্রয়োজন তেমনি পশ্চাদপসরণের সময়ও কাজে লাগে। লড়াইয়ে ব্যবহারের জন্য তীক্ষ্ণ দাঁত ও নখের সঙ্গে আমার শিংএর মত এক-জোড়া ধারালো শিং থাকলেও ভাল হয়।

এইবার উঠল ভেড়া। বললে, প্রভু, মানুষকে আমারই মত একটা শক্ত মাথার খুলি দিন, এক ঢুঁ মেরে যাতে সব অস্ত্রই ভোঁতা করে ছেড়ে দিতে পারে। আর শিং যদি নেহাতই দিতে হয় তবে ও বোকা হরিণের শিংএর মত ডালপালা যেন না থাকে তাতে। দিনে দশবার করে ওর শিং দুটো জঙ্গলের ডালপালা ও লতায় আটকে যায়। ওনিয়ে কি কেউ স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারে? তার চেয়ে বরং আমার এ পাকানো শিংদুটো ঢের বেশি কাজের। এতে মাথার ওজন বাড়ে, এবং তার ফলে ঢুঁ-এর জোরও হয় বেশি।

পুরাণ-বৃক পশুদের এই সব নির্বোধ মন্তব্য শুনতে শুনতে ক্রমেই অধৈর্য হয়ে উঠছিলেন। আর থাকতে না পেরে বললেন, দেখ, আমি দেখছি তোমরা প্রত্যেকেই মনে করো যে তোমাদের নিজেদের যা আছে তাই সব চেয়ে ভাল এবং প্রত্যেকেই চাও যে মানুষ তারই মত হোক। কিন্তু, তোমরা ভুলে যাচ্ছ যে মানুষকে আমি নিজের চেয়েও ভাল করে গড়তে চাই।

এই সময় বাঁদর দাঁড়িয়ে উঠে বললে, প্রভু যা বললেন সে সবই সত্যি। কিন্তু একটা কথা আমার মনে হয়, লেজ না থাকলে মানুষের দেহ একেবারেই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। একটা লেজ থাকায় কত সুবিধা এক বার ভাবুন দেখি?

বানর বললে, আমিও ঠিক তাই বলি। লেজ একটা মানুষকে দেওয়া চাই-ই।

হুতোম পেঁচা এতক্ষণ গম্ভীর হয়ে বসেছিল। এবার আর স্থির থাকতে না পেরে বললে, লেজের উপকারিতা যাই থাক, তা নিয়ে আমি তর্ক করতে চাই না, কিন্তু এক জোড়া ডানা না থাকলে মানুষ সৃষ্টি আপনার ব্যর্থ হবে।

পুরাণ-বৃক ধমক দিয়ে বললেন, আঃ আমার কথাই শেষ হল না, আর তোমরা মিছে চেঁচামেচি সুরু করলে। যা বলি শোন মন দিয়ে। শিং, লেজ বা ডানা—ওসব পশুপক্ষীর কোনো চিহ্ন মানুষের অঙ্গে থাকবে না।

পেঁচা আবার উঠে দাঁড়াল। বললে, ডানাই বা না থাকবে কেন শুনি?

আঃ চুপ কর না। পুরাণ-বৃক আবার ধমক দিলেন। আমি কি স্থির করেছি শোনো আগে।

পেঁচা থামবার পাত্র নয়। বিশেষ করে গোমড়া মুখের জন্যে জ্ঞানী বলে ওর একটা প্রসিদ্ধি আছে। এখন চুপ করে গেলে সে সুনাম নষ্ট হবার সম্ভাবনা। সে আবার বললে, কিন্তু প্রভু ডানা জোড়ার কথাটা ভুললে চলবে না—

পুরাণ-বৃক চটে গিয়ে বললেন, আমি বলছি—ডানা থাকবে না মানুষের। কিছুতেই থাকবে না। পশুপক্ষীর অবয়ব দিয়ে আমি তাকে তোমাদের মত হেয় করতে পারবো না।

'বটে? আমরা হেয়। আমরা হীন। এতক্ষণ প্রভু বলে মান্য দেখাচ্ছিলাম, তাই তোমার এত বাড় হয়েছে। চললুম আমরা এ সভা ছেড়ে। মানুষ আমরাও গড়াতে পারি।' বলে হুতোম পেঁচা সকলকে নিয়ে হৈ হৈ করে উঠে পড়ল। সভায় ভীষণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হল। সভার কাজ পণ্ড হল। সমস্ত প্রাণী গিয়ে জড় হ'ল নদীর ধারে। প্রত্যেকেই নিজের ইচ্ছামত করে মানুষ গড়তে চায়। নদীর কাদা তুলে এনে প্রত্যেকেই মানুষ তৈরি করতে লেগে গেল। পুরাণ-বৃকও তাদের কাছ থেকে দূরে এক ধারে বসে ঐ কাজে লেগে গেলেন।

ক্রমে রাত হল। কাজ করতে করতে জীবজন্তুর দল

একে একে ঘুমের কোলে ঢলে পড়ল। তখন পুরাণ-বৃকের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তিনি আর সকলের কাজ তদারক করতে বেরুলেন, তখন সবাই ঘুমে অচেতন। তাদের হাতের অসমাপ্ত পুতুলগুলো একে একে তুলে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখে পুরাণ-বৃক নদীর জলে ফেলে দিলেন। তাব পব এসে নিজেব কল্পিত মানুষেব মূর্তি সম্পূর্ণ কবলেন। এ কাজে তিনি অন্য পশুদের তৈবি মূর্তি-গুলো থেকে কিছু সাহায্য পেয়েছিলেন কি না কে জানে।

শিং, লেজ, ডানা ইত্যাদি না থাকা সত্ত্বেও কেবল বুদ্ধি বলেই সমস্ত পৃথিবী মানুষেব পদানত হ'ল। তাবপর মানুষ নিজেই সৃষ্টিব কাজে লেগে গেল দেখে ঈশা কোয়াতি সেদিন থেকে গা ঢাকা দিলেন। তাই আব কেউ তাঁকে দেখতে পায় না।

১৪৫৩ খৃষ্টাব্দটি পৃথিবীব ইতিহাসে, এবং বিশেষ করে অভিযান ও আবিষ্কাবের ইতিহাসে, অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বছর। এর আগে ভাবতবর্ষ, চীন, আরব প্রভৃতি প্রাচ্য দেশের সঙ্গে পাশ্চাত্যেব ব্যবসা চলত লোহিতসাগব, এসিয়া মাইনর এবং কৃষ্ণসাগরেব মধ্য দিয়ে। কিন্তু এই বছরে তুর্কীবা কনস্ট্যান্টিনোপল দখল করলে এবং সমস্ত ব্যবসাবাণিজ্য বন্ধ করে দিলে। ফলে ইউরোপের সমস্ত জাতিবই ভারি মুস্কিল হল। তখন ইউরোপেব সমস্ত দেশের লোকেবা নতুন কোন উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করতে লাগল। অবশেষে পর্তুগালেব যুববাজ হেনরীব মাথায় একটা বুদ্ধি এল। তাঁর মনে হল যে হয়ত আফ্রিকা ঘুবে সমুদ্রপথে প্রাচ্যদেশগুলিতে যাওয়া যেতে পারে। তাঁর কথানুযায়ী পর্তুগীজ নৌসেন্যাধ্যক্ষ ডায়াজ যাত্রা করলেন সমুদ্রপথে আফ্রিকা ঘুরে প্রাচ্যদেশগুলোতে যাবার কোন রাস্তা পাওয়া যায় কি না দেখবার জন্যে। আফ্রিকার পশ্চিম উপকুল ধরে তিনি এগিয়ে চললেন—অনেক দুর পর্যন্ত—যেখানে এর আগে অন্য কোন লোক যেতে পারে নি। অবশেষে ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি 'উত্তমাশা অন্তরীপ আবিষ্কার করলেন। কিন্তু ওই পর্যন্ত গিয়েই খাদ্যাভাব ও অন্যান্য নানা কাবণে তাঁব পক্ষে আব এগোন সম্ভব হল না। তিনি দেশে ফিবে গেলেন।

এব কয়েক বৎসব পবে ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টফব কলম্বস নামে একজন জেনোয়াবাসী পশ্চিমদিকে অভিযান করলেন ভাবতবর্ষে আসবাব পথেব সন্ধানে। তাঁর ধারণা ছিল যে ভাবতবর্ষ আটলান্টিক মহাসাগবের অপব পাবে অবস্থিত। সুতবাং আটলান্টিক মহাসাগব অতিক্রম করলেই ভাবতবর্ষে পৌছুন যাবে। তাঁর ধারণার কথা তিনি তাঁর দেশেব বাজাব কাছে বললেন এবং আটলান্টিক মহাসাগবেব ওপাবে অভিযান করবাব জন্য সাহায্য প্রার্থনা করলেন। কিন্তু বাজা ও তাঁব সভাসদেরা তাঁব কথা হেসে উড়িয়ে দিলেন। কলম্বস তখন পর্তুগাল ও ইংল্যাণ্ডের বাজাব কাছে সাহায্য প্রার্থনা কবলেন। কিন্তু তাঁরাও তাঁকে সাহায্য কবলেন না। তিনি তখন স্পেনের কাছে গেলেন। স্পেনও প্রথমে তাকে হতাশ কবলে, কিন্তু অবশেষে অনেক চেষ্টা এবং অনেক বছর অপেক্ষার পর সাহায্য পেলেন। কলম্বাস তখন তাঁর এক-মাত্র পুত্রকে স্পেনে রেখে দুর্গম পথের যাত্রী হলেন। ৩রা আগষ্ট ৮৮ জন দুঃসাহসী নাবিক নিয়ে

কলম্বাস তরঙ্গসংকুল আটলাণ্টিক মহাসাগরে জাহাজ ভাসালেন।

ক্রমাগত তিনি এগিয়ে চললেন। দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল। কিন্তু স্থলের কোন চিহ্নই নেই। কেবলই জল—অপার—অগাধ—অসীম বিস্তৃত জলরাশি। তাঁর দলের লোকেরা ভয় পেয়ে গেল—অজানা পথে যাত্রার শেষ পরিণতি কি তা তারা ভেবে পেলে না। তাই তারা ফিরে যাবার জন্যে জেদ করতে লাগল। কলম্বাস তাদের অনেক বোঝাতে চাইলেন, কিন্তু তারা কিছুতেই বুঝতে চাইল না। তারা কলম্বসকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু কলম্বসের সৌভাগ্যক্রমে তিনি বেঁচে গেলেন, কারণ, এই সময়ে একদিন রাতে অকস্মাৎ তিনি স্থলের সন্ধান পেলেন। তাঁর প্রথম যাত্রার দুমাস নদিন পরে ১১ই অক্টোবর রাত দশটার সময় কলম্বাস জাহাজের সামনে গভীর অন্ধকারে একটা আলোর রেখা দেখতে পেলেন। সঙ্গীদের ডেকে সেই আলো দেখাতে তারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। সেদিন রাত্তিরের মত জাহাজ নোঙর করে রইল। পরের দিন সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গেই তারা দেখতে পেলে সামনে একটি দ্বীপ। যতদূর সম্ভব ভাল জামা-কাপড় পরে দলবল নিয়ে কলম্বস দ্বীপে গিয়ে নামলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই দ্বীপের বুকে স্পেনের রাজপতাকা উড্ডীয়মান হল। কলম্বাস দ্বীপটি স্পেনের রাজার নামে দখল করে নাম রাখলেন 'স্যান স্যালভেডার'।

শীঘ্রই আরও কতকগুলি দ্বীপ আবিষ্কৃত হল। কলম্বস মনে করলেন যে সেগুলি ভারতবর্ষেরই নিকটবর্তী কতকগুলি দ্বীপ। তাই তিনি তাদের নাম রাখলেন পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, এবং সেই দেশের অধিবাসীদের তিনি মনে করলেন ভারতবাসী। তাই তাদের গায়ের রঙ লালচে দেখে তিনি তাদের বললেন 'লাল ভারতবাসী' বা রেড ইণ্ডিয়ান।

১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে কলম্বস স্পেনে ফিরে এলেন তাঁর আবিষ্কারের গৌরব মাথায় নিয়ে। কিন্তু চঞ্চল মন তাঁর স্থির থাকতে পারল না, তাই আবার তিনি বেরিয়ে পড়লেন তাঁর আবিষ্কৃত দ্বীপগুলির উদ্দেশে। এবার স্পেন তাঁকে প্রচুর সাহায্য দান করলে তাঁর সঙ্গে চলল সতেরটা বড় বড় জাহাজ ও পনের হাজার লোক। এবারে তিনি আরও কতকগুলো নতুন দ্বীপ আবিষ্কার করলেন, এবং সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করে এলেন। কিছুদিন পরে আবার তিনি তৃতীয়বার সেখানে গেলেন। কিন্তু এতদিনেও তিনি বুঝতে পারলেন না যে যে দ্বীপপুঞ্জ তিনি আবিষ্কার করেছেন তা এসিয়ার কোন অংশ নয়, সম্পূর্ণ নতুন একটা মহাদেশের খানিকটা।

কলম্বসের মৃত্যুর পর আমেরিগো ভেসপুসি নামক একজন নাবিক পশ্চিম দ্বীপপুঞ্জে গেলেন, এবং তিনিই প্রথম বুঝতে পারলেন যে কলম্বস কর্তৃক আবিষ্কৃত দ্বীপগুলি সম্পূর্ণ একটি নতুন মহাদেশের অংশ। তাঁর চেষ্টায় এই নতুন মহাদেশের আরও অনেক অংশ আবিষ্কৃত হল, এবং এই নবাবিষ্কৃত দেশগুলি "নতুন জগৎ" নামে পরিচিত হল। কিন্তু ১৫০৬ খৃষ্টাব্দে এর নাম বদলে রাখা হল "আমেরিকা"—আমেরিগো ভেসপুসির নাম অনুযায়ী।

১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে ভাস্কো-ডা-গামা ডায়াজের পথে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভারতবর্ষে পৌঁছুবার চেষ্টা করলেন। যখন তিনি উত্তমাশা অন্তরীপের পাশ দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন তাঁকে ভীষণ ঝড়ের হাতে পড়তে হল। শুধু তাই নয়, তাঁর দলের লোকেরাও বিদ্রোহ করল। কিন্তু সমস্ত ঝড়ঝঞ্ঝা বিপদ আপদ তুচ্ছ করে নির্ভীকভাবে তিনি এগিয়ে চললেন। অবশেষে অনেক দিনের যাত্রার পর তিনি আফ্রিকার একটা মস্ত বড় সহরে পৌঁছুলেন। সেখানে একজন বিদেশী বণিক্ তাঁকে ভারতবর্ষের পথের সন্ধান দিয়ে দিলে—ভারত মহাসাগর পার হলেই ভারতবর্ষ। এই পথে যাত্রা করে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ভারতবর্ষে পৌঁছুলেন।

ভাস্কো-ডা-গামা যে বছর ভারতবর্ষ আবিষ্কারের জন্যে যাত্রা করলেন সেই বছরেই জন এবং সিবেষ্টিয়ান কেবট নামক দুজন নাবিক ব্রিষ্টল থেকে যাত্রা করলেন একই উদ্দেশ্য নিয়ে। নানা বিপদ আপদ অতিক্রম করে তাঁরা যখন তাঁদের যাত্রা সমাপ্ত করলেন তখন দেখা গেল যে তাঁরা যা আবিষ্কার করেছেন তা ভারতবর্ষ বা ভারতবর্ষের নিকটবর্তী কোন দেশ নয়, তা সম্পূর্ণ কয়েকটি নতুন দেশ, যেগুলোকে আমরা ল্যাব্রেডর, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড এবং উত্তর আমেরিকার সমুদ্র তীরবর্তী দেশ বলে জানি।

এর পরে জলপথ দিয়ে ভারতবর্ষে আসবার চেষ্টা করলেন ফার্ডিন্যাণ্ড ম্যাগেলান নামক একজন দুঃসাহসী নাবিক। তিনি যাত্রা করলেন পশ্চিম দিকে। ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সমুদ্রে জাহাজ ভাসালেন এবং দক্ষিণ আমেরিকার ধারে এগোতে লাগলেন। অনেকদূর যাবার পর তিনি এক জায়গায় দেখলেন যে সমুদ্রোপকূল দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে, অর্থাৎ সেখানে একটা খাল রয়েছে। এই খালের মধ্য দিয়ে তিনি এগিয়ে চললেন। পথে তাঁকে ভীষণ এক ঝড়ের মুখে পড়তে হল। কিন্তু ভয় না পেয়ে তিনি এগিয়ে চললেন এবং আটত্রিশ দিন পরে একটা শান্ত সমুদ্রে এসে পড়লেন। এই সমুদ্রের নাম তিনি রাখলেন "প্রশান্ত মহাসাগর" এবং যে খালটির মধ্য দিয়ে তিনি প্রশান্ত সমাসাগরে এসে পড়লেন তার নাম রাখলেন "ম্যাগেলান প্রণালী"।

পাঁচটি জাহাজ নিয়ে ম্যাগেলান এগিয়ে চললেন। যখন তাঁর যাত্রার অর্ধেকটা মাত্র শেষ হয়েছে, তখন হঠাৎ ম্যাগেলান একটা দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন। তখন তাঁরা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে। এইখানে একটি দ্বীপে স্থানীয় একদল লোকের সঙ্গে মারামারি করতে গিয়ে ম্যাগেলানের মৃত্যু হল। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর অভিযানেরও শেষ হল না। তাঁর ভারপ্রাপ্ত সঙ্গী সিবেষ্টিয়ান ডেল কোমো অভিযান পরিচালনা করলেন। সঙ্গে তখন তাঁর মাত্র একটি জাহাজ—বাকি জাহাজগুলি সব নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু তাই নিয়েই দুঃসাহসী নাবিক এগিয়ে চললেন। অবশেষে তিনি উত্তমাশা অন্তরীপে পৌঁছুলেন। সেখান থেকে ভারতবর্ষে না গিয়ে তিনি বাড়ীর দিকে ফিরতে লাগলেন। যখন তিনি দেশে পৌঁছুলেন তখন দেখা গেল যে তাঁরা পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরে এসেছেন।

এর পঞ্চাশ বছর পরে স্যার ফ্র্যান্সিস ড্রেক পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরে আসবার জন্য যাত্রা করেছিলেন। এই অভিযানটা হয়েছিল যেমন অদ্ভুত তেমনি আশ্চর্যজনক। ইংল্যাণ্ডের প্লীমাউথ বন্দর থেকে পাঁচটা জাহাজ যাত্রা করল। জাহাজের প্রত্যেকটি নাবিক ইংরাজ। দলের সকলের আগে চলল ড্রেকের নিজের জাহাজ "গোল্ডেন হিণ্ড"। একবারও না থেমে জাহাজগুলো এগিয়ে চলল যতক্ষণ না তারা ম্যাগেলান প্রণালীর কাছাকাছি পৌঁছল। এইখানে এসে দলের লোকেদের মাঝে অসন্তোষ দেখা দিল। হয়ত একটা বিদ্রোহ করত, কিন্তু ড্রেকের দৃঢ় সংকল্প এবং বুদ্ধির জন্যেই তা ঘটতে পারল না। সামনাসামনি দাঁড়িয়ে তাঁর মুখের উপর কথা বলবার মত সাহস একটি নাবিকেরও ছিল না। সুতরাং নাবিকদের ডেকে যখন তিনি তাদের অসন্তোষের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন তখন সকলেই চুপ করে রইল। কিন্তু ড্রেক তাদের মনোভাব জানতেন, তাই তিনি তাদের বোঝাতে আরম্ভ করলেন যে এতদূর এসে আর ফিরে যাওয়ার কোন মানেই হয় না, তবে নাবিকদের মধ্যে যারা ইচ্ছে করে তারা ফিরে যেতে পারে। সকলেই তাঁর কথা বুঝল। তখন আর একটি নাবিকও ফিরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হল না—তাদের মধ্যে বিদ্রোহের যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠেছিল তা সম্পূর্ণভাবে নির্বাপিত হয়ে গেল।

পাঁচটা জাহাজকে ঠিকমত চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার নানা অসুবিধা ঘটাতে, ড্রেক পথে দুটো জাহাজ পুড়িয়ে ফেললেন। বাকি তিনটে জাহাজ নিয়ে তিনি ম্যাগেলান প্রণালীতে প্রবেশ করলেন। অল্পদূর যেতে না যেতেই ভীষণ ঝড় উঠল। ড্রেক মনে করলেন যে শীঘ্রই ঝড় থেমে যাবে। কিন্তু দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল, তবুও ঝড় না কমে বরং বেড়েই যেতে লাগল। কয়েক দিন পরে ঝড়ে বিপর্যস্ত এবং বিধ্বস্ত হয়ে ড্রেকের তিনখানি জাহাজের মধ্যে একখানি ডুবে গেল। কয়েকদিন আগেও যে সব নাবিকেরা ড্রেকের কথায় তাঁর সঙ্গে এগুতে রাজী হয়েছিল, তাদের মধ্যে একদল ঝড়ে ভয় পেয়ে একখানি জাহাজ নিয়ে ফিরে গেল। বাকি রইল শুধু ড্রেকের নিজের জাহাজ "গোল্ডেন হিণ্ড", এবং কয়েকজন অত্যন্ত বিশ্বস্ত নাবিক। কিন্তু ঝড়ের হাত থেকে তারাও সম্পূর্ণভাবে রেহাই পেল না—ঝড়ের তোড়ে "গোল্ডেন হিণ্ড" ভেসে চলল খোলা সমুদ্রে, দক্ষিণ দিকে।

অবশেষে প্রায় সাত সপ্তাহ পরে যখন ঝড় কমল, তখন আমেরিকার পশ্চিম উপকূল ধরে ড্রেক আবার উত্তর দিকে যাত্রা করলেন। এত বিপদেও কিন্তু ড্রেক নিরাশ হলেন না। তিনি সাহসের সঙ্গে এগিয়ে চললেন তাঁর উদ্দেশ্য সফল করবার পথে। পথে আরও কয়েকবার তাদের নানা রকম বিপদে পড়তে হল। সকলের

চেয়ে মুস্কিল হয়েছিল একবার, যখন তাঁরা একটা দ্বীপে নেমেছিলেন। দ্বীপে ঘোরাঘুরি করে ফিরে এসে দেখলেন যে জাহাজের অর্ধেকের বেশী জিনিষ চুরি হয়ে গেছে। বুঝতে তাদের একটুও দেরী হল না যে এ কীর্তি দ্বীপের অধিবাসীদেরই।

যাই হোক, সমস্ত বিপদ আপদ অগ্রাহ্য করে তাঁরা আবার এগিয়ে চললেন। অবশেষে প্রায় দুবছর ন মাস পরে উত্তমাশা অন্তরীপে পৌছলেন এবং সেখান থেকে আরও প্রায় তিনমাস পরে, অর্থাৎ তাদের প্রথম যাত্রার প্রায় তিন বছর পরে তাঁরা প্লীমাউথ বন্দরে ফিরে এলেন—যেখান থেকে তাঁরা প্রথম যাত্রা করেছিলেন।

সারা ইংল্যাণ্ডে ড্রেকের নাম ছড়িয়ে পড়ল, এবং পরের বছর বসন্তকালে সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ নিজে তাঁর সভাসদদের নিয়ে "গোল্ডেন হিণ্ড" জাহাজে এলেন, এবং হাজার হাজার লোকের সম্মুখে দুঃসাহসী নাবিক-সর্দার ড্রেককে "নাইট" সম্মানে ভূষিত করলেন।

আর একদল দুঃসাহসী নাবিক যাত্রা করেছিলেন উত্তর দিকে—নতুন দেশ আবিষ্কার করবার আশায় উত্তর অন্তরীপ ঘুরে সুদূর আর্কটিক সাগরে তাঁরা পাড়ি দিয়েছিলেন। উত্তর দিকের সমস্ত সাগর উপসাগর, নদ নদী, দ্বীপ অন্তরীপ, প্রণালী, এবং যে সব সাগরোপকুলবর্তী দেশ আমরা এখন পৃথিবীর ম্যাপে দেখতে পাই তার সমস্তই আবিষ্কার করেছিলেন এঁরা। এই নাবিক দলের মধ্যে আমরা দেখতে পাই ডেভিস, হাডসন, ব্যাফিন, বেরিং, কুক প্রভৃতি কয়েকজনের নাম। এঁদের মধ্যে সকলের চেয়ে বিখ্যাত হচ্ছেন কুক। তাঁর অভিযান কাহিনী গল্পের চেয়ে কম কৌতূহলপ্রদ নয়। পরের মাসে শোনাব। [ক্রমশঃ
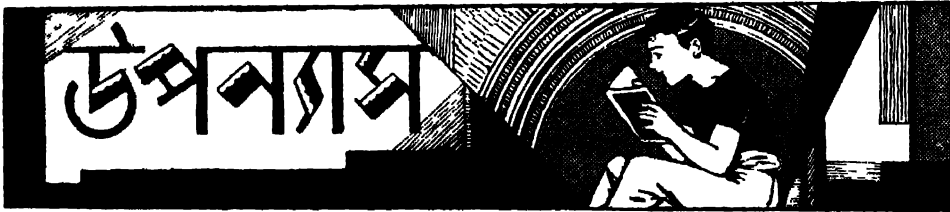
৩১শে মার্চ মঙ্গলবার বেলা ১২টা

শ্রীতাপসরঞ্জন সরকার

অশোকের মতলব

বড় বড় ঢেউ কেটে ছোট্ট নৌকা খানা বোটের দিকে নাচতে নাচতে চল্‌তে শুরু করল। অপরিচিত ভদ্রলোকটিকে নফর এইবার জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা বাবু, আপনি রাইফেল আনতে বললেন কেন?"

"শীকার করব বলে।"

"শীকার আবার কোথায়?"

"ঐ বোটটাতে।" নফরা কিছুই বুঝতে পারলো না। মাঝিকে বললে, "একটু দূনে টান হে কর্তা, ঝট্‌ করে পৌঁছে দাও।"

ভদ্রলোকটি বললে, "কেন হে? তোমার এত তাড়া কিসের?"

"আজ্ঞে যদি বোটখানা চলে যায়?"

ভদ্রলোকটি বললে, "তোমার কি চোখ খারাপ?" নফরা চোখ দুটিকে একবার ঘসে নিয়ে বললে, "আজ্ঞে না।"

"তবে দেখতে পাচ্ছ না কেন?"

"আজ্ঞে, সবই ত দেখতে পাচ্ছি।"

"ঐ যে বোট চালকটা ঘুমিয়ে আছে, দেখতে পেয়েছ?

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"অতএব বোটখানা যে চলছেনা, দাঁড়িয়ে আছে, এটা বেশ বুঝতে পারছো বোধ হয় ?"

নফর লজ্জিত হয়ে বললে—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

ভদ্রলোকটি বললেন, "বেশ, এখন যে কথা বলছি শোন। তোমার মনিব বিজয়বাবু ও সমীরবাবুকে আমি ভালরকম চিনি। তাঁরা যখন নদীর ধারে আসেন তখন আমি ঘাটের কাছে বসে ছিলুম। দেখলুম, তাঁরা ঐ বোটটা ভাড়া করে বেড়াতে চললেন। আমাকে দেখতেই পেলেন না। আমার কাছেই বসে এক ভদ্রলোক মাছ ধরছিলেন। সেই সময় হঠাৎ তাঁর বঁড়শীতে একটা বড় মাছ আটকে যায়। অনেক টানাটানির পর শেষে মাছটা সূতো ছিঁড়ে পালিয়ে গেল। তিনি রাগ করে ছিপখানা যমুনায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেলেন। আমি তখন ছিপটা কোথায় পড়ল দেখতে গিয়ে দেখি বিজয় ও সমীর উঠে বোটের কিনারা ছেড়ে মধ্যে গিয়ে বসছেন। তার পরই দেখি হঠাৎ তাঁরা বোটের ভেতরে পড়ে গেলেন। তখন বোট চালকের কি স্ফূর্তি।

কিছুদূর যাবার পর বোটখানা থামিয়ে লোকটা কার জন্য যেন অপেক্ষা করতে লাগলো। কিন্তু যার জন্য অপেক্ষা করছে সে এখনও এসে পৌঁছায় নি। ও বেটাও নদীর ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুমিয়ে পড়েছে। তুমি দড়ি এনেছ ত ? চল খুব সাবধানে নিঃশব্দে গিয়ে ঐ বেটাকে প্রথমে বেঁধে ফেল্‌তে হবে। তারপর তোমার বাবুদের কি অবস্থা সেটা সন্ধান কোরতে হবে।"

"আজ্ঞে বোটের মধ্যে আর তো কেউ লুকিয়ে টুকিয়ে নেই ?"

"তুমি কি কাউকে দেখতে পাচ্ছ ?"

"আজ্ঞে না।"

"তবে যা বলছি শোন। বোটে গিয়ে উঠেই মাঝিকে বিদেয় দিতে হবে ?"

"সে কি বাবু ? তাহলে ফিরব কি কোরে ?"

তুমি একটি নীরেট। মোটর বোটটাই ত রয়েছে, তুমি কি বোট চালাতে জান না ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ জানি, বাবু নিজে শিখিয়েছেন।"

"বেশ, তবে আর ভাবনা কি ? বোটে গিয়েই মাঝিকে বিদেয় করবে বুঝলে ?"

"নিশ্চয়ই করব।"

"ভাড়াটা সঙ্গে এনেছ কি ?"

"ওই যাঃ ওটাতো ভুলেই গেছি বন্ধু।"

"অ্যাঁ। ভুলে গেছ ? আমি কিন্তু ভুলিনি।"

"তাহলে আপনিই এখন ভাড়াটা দিয়ে দেবেন, পরে বাবুর কাছে চেয়ে নিয়ে আপনাকে দিয়ে দেব।"

"কত লাগবে বলত ?"

"আজ্ঞে, গণ্ডা আষ্টেক দিলেই হবে।"

"তাহলে টাকাটা যে তোমাকে ভাঙ্গাতে হচ্ছে নফর।"

"আজ্ঞে দিন না, ঠাকুরের কাছে হয়ত দুটো সিকি পেতে পারি।"

"তা হলে ভালই হয়েছে, ট্যাঁক থেকে টাকাটা বার করে ভাঙ্গিয়ে রাখি।

নফর বাবুটির ট্যাঁক হাতড়াতে গেল, বাবুটি বললেন, "আহা হা, ভুল করছ কেন নফরচন্দ্র, টাকাটা যে তোমার ট্যাঁকে রেখেছি।"

নফরচন্দ্র ট্যাঁকে হাত দিল, সেখানে সত্যিই ত ট্যাঁকে একটা টাকা গোঁজা রয়েছে। তখন তাহার মনে পড়িল তাড়াতাড়ি ছুটে আসবার সময় একটা টাকা সে ট্যাকে গুজে নিয়েছিল। কিন্তু একথা তার আগেই মনে ছিল না। অত্যন্ত অপ্রতিভ হয়ে ভদ্রলোকটি বললেন, "কি হে মাঝি নৌকা তোমার যাচ্ছে না কেন ?"

"আজ্ঞে হাওয়াটা উল্টো কিনা ?"

"তা হলে তো দেখছি তুমি সব মাটি করে দেবে ?"

নফর ব্যাকুলভাবে বলিল, "একথা বলছেন কেন বাবু ?"

"ঐ যে দেখছো না, আর একটা বোট এদিকে আসছে ? ওটার আগে আমাদের যেতেই হবে, নইলে তোমার মনিব ছুটি গেলেন।

নফর বললে, "গুলি ছুড়বো কি ?"

"কেন ? তোমার হাত নিসপিস করছে নাকি।

না বলছিলাম যে গুলি খেয়ে ঐ দ্বিতীয় বোটটা নিশ্চয় পালাতো।"

"এবং গুলির আওয়াজে প্রথম বোটওয়ালাও ঘুম ভেঙে উঠে দ্বিতীয়র দৃষ্টান্ত অনুসরণে দে দৌড় দেবে।"

নফর ঘাড় হেঁট করে বললে "আজ্ঞে "বুঝেছি, গুলি চালিয়ে কোন ফল হবে না। উল্‌টে আমাদেরই বিপদ

হবে। চলুন, তার চেয়ে আমারাও জোরে নৌকা বাইতে শুরু করি তা'হলে তাড়াতাড়ি পৌছতে পারবো।" "দূর বেটা আমি ভাড়াটে নৌকা বাইতে যাব কেন? অশোক চাটুয্যে এত বোকা নয়।"

"কি বললেন বাবু?" আপনার নাম অশোক চাটুয্যে?"

"আরে রাম:—ভুলে অন্য লোকের নাম বলে ফেলেছি। যাক্ গিয়ে তাতে কিছু ক্ষতি নাই কিন্তু আমি যা বলেছি তা তোমার মনে আছে তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, লোকটাকে নিঃশব্দে বাঁধতে হবে এই তো?"

"বেশ, বেশ, তোমাকে দিয়ে কাজ হবে দেখছি। চুপ। আমরা এসে পড়েছি। এই মাঝি, কোনো শব্দ না কোরে বোটের পিছনের হালের সঙ্গে নৌকটা বেঁধে ফেল।"

নৌকা আস্তে আস্তে বোটের গা ঘেঁসে দাঁড়ালো। মাঝি নিঃশব্দে নৌকাখানা বোটের পিছনে হালের সঙ্গে বেঁধে ফেললো।

তখনও পূর্বোক্ত দ্বিতীয় মোটর বোটখানি এদের কাছ থেকে অনেক দূরে ছিল।

দ্বাদশ

উদ্ধার

অশোকবাবু, নফর ও ঠাকুর তৎক্ষণাৎ মোটরবোটে লাফিয়ে পড়ল। নফর ও ঠাকুর ঘুমন্ত বোটচালককে পূর্ব কথানুযায়ী বেঁধে ফেল্‌লে। লোকটি তৎক্ষণাৎ জেগে উঠ্‌লো কিন্তু তখন আর তার কোন কিছু করা তো দূরের কথা একটু নড়্‌বারও সাধ্য ছিল না। সে চুপচাপ পড়ে রইলো এবং পূর্ব বর্ণিত সেই বোটটির দিকে এক একবার তাকাতে লাগলো। অশোক বল্‌লে, "বাপধন, আর ওদিকে তাকালে কি হবে, ওকে আর এদিকে আস্‌তে হবেনা। এই এই জিনিষটা দেখেছ?" এই বলেই অশোক রিভলবারটি তার বুকের উপর রেখে বললে, "এখন, কোন্ জিনিষটাতে চাপ দিয়ে তুমি বিজয় বাবুদের নীচে ফেলে দিয়েছ সেই জিনিষটা একবার দেখিয়ে দাও তো?" লোকটি কোন কথা না বলে একটা কর্কের মত যন্ত্র দেখিয়ে দিলে। অশোক বল্‌লে, "আচ্ছা এখন তোমার বন্ধুদের ঐ বোটখানাকে বাড়ী মুখো কোরে দিই কেমন?" বলেই সে—

পিস্তল নফরের হাতে দিয়ে রাইফেলটা তুলে নিয়ে গুড়ুম গুড়ুম কোরে দু' তিনটে গুলি বোটের দিকে চালিয়ে দিল। কিন্তু ফল বিপরীত হয়ে দাঁড়ালো। বোটটা বাড়ীমুখো হওয়া তো দূরের কথা আরও দ্বিগুণ জোরে তাদের দিকে আস্‌তে লাগ্‌লো। ও বোট থেকেও গুড়ুম গুড়ুম করে আওয়াজ হল। সাঁ সাঁ কোরে অশোকের কানের পাশ দিয়ে পর পর দুটো গুলি বেরিয়ে গেল। অশোক তাড়াতাড়ি বসে পড়ে বল্‌লে, "গতিক ভাল বোধ হচ্ছে না।" বোট চালককে জিজ্ঞেস করলে, "ও বোটে কে আসছে?" কিন্তু বোট চালক কোন উত্তর দিল না। হঠাৎ দূরস্থ বোটের একটি গুলি বোট চালকের বক্ষ ভেদ করে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে আর্তনাদ করে বোটের উপর মুখ থুব্‌ড়ে পড়ল। অশোক বল্‌লে, "যাক্, পাপের শাস্তি হ'ল। নফর তুমি বোটে ষ্টার্ট দাও আমি রাইফেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি।" নফর বোট চালককে সরাতে গিয়ে দেখ্‌লে তার দেহ প্রাণহীন! এক গুলিতেই বেচারী শেষ হয়ে গেছে। তাকে পাটাতনের ওপর ঠেলে সরিয়ে রেখে, নফর বোটে ষ্টার্ট দিল। বোট আবার তরঙ্গ ভেদ কোরে বিদ্যুৎগতিতে চল্‌তে লাগ্‌লো। অশোকের রাইফেলও মাঝে মাঝে গর্জন করে উঠছিল।

এপক্ষ ওপক্ষ দু'পক্ষ থেকেই গুলির পর গুলি চল্‌তে লাগ্‌লো। কিন্তু কোন গুলিই কোন বোটকে ভেদ করতে পারলো না। মধ্য থেকে তাদের ছুটোছুটিতে যমুনার জল ভীষণ নৃত্য আরম্ভ কর্‌লো। নফর হঠাৎ বোটের মুখ আততায়ী বোটের দিকে ঘুরিয়ে দিলে। অশোক চীৎকার কোরে বল্‌লো, "নফর! তুমি কি কোর্‌লে, শীগ্‌গীর বোট উল্টো দিকে ঘুরিয়ে নাও।" কিন্তু, কে কার কথা শোনে। সে মুখ ঘোরাল না। বোট দু'খানা যখন প্রায় পরস্পরের কাছে এসে পড়েছে। হঠাৎ নফরের রিভলভার থেকে গুলি ছুটতে, আততায়ী মুহূর্তের মধ্যে তার বোটের মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বেগে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলে। অশোকের মুখে তখন হাসি ফুটে উঠলো বল্‌লে, "বাঃ বাঃ নফরচন্দ্র! ব্রেভো! well done! তোমার বুদ্ধি আছে দেখছি।"

নফর এবার কোনও কথা না বলে বোট থামিয়ে দিল। অশোক সেই বোতামের মত যন্ত্রের উপর একটু চাপ দিল অমনি বোটের মাঝখানের একটা অংশ সরে গেল, এবং ভিতর থেকে একটা মৃদু শব্দ শোনা গেল। নফর সেখানে এগিয়ে গিয়ে উপুড় হয়ে ঝুঁকে পড়ে বল্‌লে, "বাবু, আমরা এসেছি, আপনাদের কোন ভয় নাই।" বিজয় চীৎকার করে বল্‌লে, "উঠবো কি কোরে? দড়ি এনেছ কি?" নফর বল্‌লে, এসেছি যখন তখন ব্যবস্থা না করেই কি এসে'ছি! কোনও চিন্তা কোর্‌তে হবে না সব যোগাড় আছে।" অশোক সত্বর মৃতদেহের গা থেকে দড়িটা খুলে নীচেয় ঝুলিয়ে দিল। প্রথমে সরিৎ বাবু তারপর সমীর দড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলো। বিজয় সবার শেষে উপরে এসেই অশোককে দেখে বল্‌লে,—"একি! অশোক, তুই এলি কোত্থেকে?"

অশোক বল্‌লে, "আগে বল্ তুই এখানে এলি কি কোরে?"

বিজয় বল্‌লে—সব বলবো—আগে তোর বক্তব্য শেষ কর্।"

এমন সময় নফর তাদের মধ্যখানে এসে বল্‌লে, "বাবু আমি সব বুঝিয়ে বল্‌ছি—।" এই বলে নফরচন্দ্র খুঁটিনাটি সব কথা মায় ঠাকুরের ঘুসিপড়া পর্যন্ত সবই বুঝিয়ে বললে। বিজয় অশোকের হাতটা চেপে ধরে বললে—"তোর জন্যই এ যাত্রা পৈত্রিক প্রাণটা ফিরে পেলুম।"

নফর জিজ্ঞাসা করলে,—"বাবু এখন এই লোকটাকে জলে ফেলে দিই?"

বিজয় বল্‌লো,—"না—দাঁড়াও আমি একটু দেখে নিই—। এ লাশ থানায় জমা দিতে হবে।" বলে বিজয় মৃতদেহটাকে পরীক্ষা করতে করতে তার পকেট থেকে একখানা চিঠি পেলে। খুলে পড়ে দেখে বিজয় বল্‌লে, "সরিৎ বাবু শুনুন, সমীর, অশোক, তোমরাও সবাই শোন, আমি চিঠি পড়্‌ছি।" বিজয় পড়্‌তে লাগ্‌লো,—

৫ই ফেব্রুয়ারী।

পাঁচ, চুয়াল্লিশ (৫, ৪৪)

তোলারাম, মাসিপুরে, রইলো, চিতপুরে, ঠিকাদার, তেরদিন, জাগ্‌বে, নলডাঙায়, তেজসিংহ, পাঁচদিন, বইবে, লুৎফর, মণিপুরে, সবুজ, রিক্সাতে, তরুতলে থাক্‌বে, বালিপাড়ায়, বুড়াবাবু, ফাঁস, দেখেছে, পরেশ বাবু, রেশমী কাপড, ছেড়েদিয়েছে। বেলেঘাটে, শরীর চর্চা; কোর্‌বে, বেলগাড়ীতে, ছবি রেখেছি। সমরেন্দ্র, মীরগঞ্জে, রয়েছে, বালিপাড়ায়, বুড়াবাবু, বয়েছে, বারীন্দ্র, সাঁঝ-বেলায়, রস খেয়েছে, বে-পা-, স্-শি-ক্-ব-, লে র্-পা-, তে-র্-ধ। বো-স্-আ-, য়-ম-স-, র্‌ঁ-টো-ফু-, মি-আ। ড়-প-, না-,-রা-ধ-, ন-ঘে-, ন-ধা-ব-সা। বে-বা-ট্ আ-, ই-কে-ন-জ-দু-, র-দে-ও। বে-থ্-বা-, ট-বো-, টে-ঘা—

নয়, বিরাশী, নব্বই (৯, ৮২, ৯০)

চিঠি পড়া শেষ হোল। কিন্তু মাথা মুণ্ডু কেউ কিছু বুঝ্‌লো না। বিজয় বল্‌লো, "এখানা একটা গুপ্ত চিঠি। নফরা এই বোট মাঝ নদী দিয়ে সোজা চালা, আমি বোটে বসেই এই চিঠির গুপ্ত রহস্য ভেদ করবো। দাঁড়াও, আগে ওর পকেট থেকে পেন্সিলটা বের করে নাও। যদি কোন কাগজ থাকে তাও বের করে নাও।" নফর লাসের পকেট থেকে পেন্সিল বের করে নিল। কিন্তু কোনও কাগজ পেলে না। অশোক তার পকেট থেকে একখানা কাগজ দিলে বিজয়কে। যমুনার জলে তীব্র আলোড়ন তুলে নফরচন্দ্র মোটর বোট চালাতে শুরু করে দিলে। [ক্রমশঃ

এসো নারায়ণী, দেবী বীণাপাণি।
হৃদি-শতদলে এসো হে কল্যাণি।
জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালো,
অন্তর-আঁধারে আনো আলো,—
দাও ভক্তি চিত্তে—
দাও শুদ্ধবাণী ॥

আজি পঞ্চমী নিশি জাগে আনন্দে—
কোকিল পঞ্চম গাহে মধুছন্দে।
অবিদ্যা-তিমির নাশো,
হৃদয়-সরসী-নীরে ভাসো—
কমলাসনা দেবী—
বেদজ্ঞানী ॥

কথা সুর ও স্বরলিপি—**জগৎ ঘটক**

+		৩			০		১		
গা	-গরা	সা	ধ্া	প্া	প্সা	-া	সা	-া	সা
এ	o	সো	o	না	রাo	o	য	o	ণী

সা	-রা	গা	-া	গপা	পরা	-া	গরা	-া	সা
দে	o	বী	o	বী	ণা	o	পা	o	ণি

\+ ৩ ০ ১

| ধা -সা | রা -গা গপা | গা পা | পা -া পা |
| হৃ ০ | দি ০ শ০ | ত ০ | দ ০ লে |

| পা -া | পর্সা নধা ধা | পা -া | পা ঋগা গা |
| এ ০ | সো০ ০ হে | ক ০ | ল্যা ০ ণি |

| সা -নরা | গা -া গপা | পরা -া | গরা -া সা ||
| দে ০ | বী ০ বী | ণা ০ | পা ০ ণি ||

|| পা -া | পা র্সা র্সা | র্সা -া | র্সা -া র্সা |
|| জ্বা ০ | নে ০ র | প্র ০ | দী ০ প |

| সর্রা -া | র্সা -া -া | সর্রা -া | র্সা -া -া |
| জ্বা ০ | লো ০ ০ | জ্বা ০ | লো ০ ০ |

| র্সা র্গা | র্গা -া র্গা | র্রা -র্গরা | র্রা -া র্সা |
| অ ন্ | ত ০ র | আঁ ০ | ধা ০ রে |

| র্সা ধা | ধা র্রা র্সা | র্সা ধা | ধা পা পা |
| আ ০ | নো ০ আ | নো ০ | আ ০ লো |

| পা গা | গপা রা রা | গরা -া | সা -া -া |
| দা ও | ভ ক্ তি | চি ০ | তে ০ ০ |

| সা -রা | গা -পা ধা | ধর্সা ধা | পা -া গা |
| দা ও | শু ০ দ্ধ | বা ০ | ণী ০ ০ |

| র্সা -নরা | গা -া গপা | পরা -া | গরা -া সা ||
| দে ০ | বী ০ বী | ণা ০ | পা ০ ণি ||

|| সা রা | রন্া -া ন্া | নধ্া -া | নধ্া -া প্া |
|| আ জি | প ন্ চ | মী ০ | নি ০ শি |

+		৩			০		১		
পা	-া	পগা	-া	সরা	রগা	-া	গা	-া	-া
জা	০	গে০	০	আ০	ন০	ন্	দে	০	০
গা	গরা	রা	-া	সা	ধা	ধা	ধা	-া	ধা
কো	০	কি	০	ল	প	ন্	চ	০	ম
পা	পনধা	পা	-পনধা	গা	গপা	রা	সা	-া	-া
গা	হে০	ম	০	ধু	ছ	ন্	দে	০	০
পা	-া	পা	র্সা	র্সা	র্সা	-া	সা	-া	র্সা
অ	০	বি	০	দ্যা	তি	০	মি	০	র
র্সর্রা	-া	র্সা	-া	-া	র্সর্রা	-া	র্সা	-া	-া
না০	০	শো	০	০	না০	০	শো	০	০
র্সা	র্সর্গা	র্গা	-া	র্গা	র্গর্রা	র্গা	র্রা	-র্গর্রা	র্সা
হৃ	দ০	য	০	স	র০	সী	নী	০০	বে
র্সা	র্সসা	র্স	ধধা	র্রা	র্সা	-ধধা	পা	গা	-া
ভা	০০	সো	০০	০	ভা	০০	সো	০	০
গা	গা	গা	-া	রা	রগা	-গার	গরা	-া	সা
ক	ম	লা	০	স	না	০	দে	০	বী
সা	-া	সর্সা	-া	সধা	পা	পা	গা	-পা	রা
বে	০	দ০	০	জ্ঞা	নী	০	০	০	০
সা	-ররা	গা	-া	গপা	পরা	-া	গরা	-া	সা ‖ ‖
দে	০	বী	০	বী	ণা	০	পা	০	ণি

প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ুর প্রবীণ সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জামশেদপুরে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে "সাহিত্যে প্রগতি" শীর্ষক একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখেছিলেন। আমরা তার একটু সার মর্ম এখানে তুলে দিচ্ছি। 'প্রগতি সাহিত্য' বলে কোনো বিশেষ যুগের সাহিত্যের গতিকে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করা চলে না। প্রত্যেক শতাব্দীর প্রত্যেক যুগেই মানুষের সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তার সাহিত্যও বদলে চলেছে ক্রমোন্নতির পথে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলা সাহিত্যের যে অবস্থা ছিল উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যযুগের সাহিত্য এসেছিল তার কাছে 'প্রগতি সাহিত্য' রূপে। আবার সেই উনবিংশ শতাব্দীরই শেষ ভাগের সাহিত্য দেখা দিয়েছিল তার মধ্য যুগের সাহিত্যের আসরে প্রগতি সাহিত্যরূপে। কিন্তু, বিংশ শতাব্দীর এই প্রথমার্ধের মধ্যেই তার প্রগতি সংজ্ঞা পুনশ্চ লোপ পেয়েছে এবং বাংলা সাহিত্য আবার এক নব-প্রগতির দাবী করছে।

*　　*　　*

আজ যাঁরা তাঁদের প্রগতিশীল সাহিত্যিক বলে মনে করছেন, হয়ত একযুগ পরেই তাঁরা হয়ে পড়বেন আবার সেকেলে প্রাচীন যুগের বাতিল সাহিত্যিক। সুতরাং কাল হিসাবে সাহিত্যে প্রগতি-বাদী বলে কোনো সম্প্রদায়ের একচেটে দাবী স্বীকার করে নেওয়া চলে না। চাষী, মুটে মজুর, কারিগর, মিস্ত্রী, ভিখারী, ফেরিওয়ালা, সমাজ পরিত্যক্তা নারী প্রভৃতিদের দুঃখময় জীবনযাত্রা, ধনিক-শ্রমিক, রাজা-প্রজা সম্বন্ধ ও খাদ্য-খাদক-শোষক ইত্যাদি সমস্যা নিয়ে রচিত সাহিত্যও আধুনিক প্রগতি-সাহিত্য বলে কোন বৈশিষ্ট্য দাবী করতে পারে না। কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতির রচনার মধ্যে এদের প্রতি গভীর সহানুভূতি ও দরদের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁরাও এঁদের দুঃখ দুর্দশার কথা ভেবেছেন, অভাব অভিযোগের বিষয় লিখেছেন ও বলেছেন। কিন্তু এঁরা কোনো দিনই নিজেদের 'প্রগতিবাদী' বলে দাবী করেন নি।

*　　*　　*

সুতরাং সাহিত্যে প্রগতিবাদী বলে যাঁরা উচ্চ-কণ্ঠে আজ নিজেদের পরিচয় দিচ্ছেন তাঁরা বাংলা সাহিত্যে নূতন কি সম্পদ এনে দিয়েছেন সেটা বিচার করে দেখা প্রয়োজন। দেখা প্রয়োজন এই প্রগতিবাদীরা এপর্যন্ত চাষী, মুটে, মজুর প্রভৃতি দেশের দুর্গত জনসাধারণের দুঃখ মোচনের জন্য তাদের কল্যাণ ও উন্নতির জন্য কোথায় কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন? তাদের দুর্দশা ও দুর্ভাগ্য দূর করবার জন্য কি কি মঙ্গলপ্রসূ আনুষ্ঠানিক প্রচেষ্টা করেছেন এ পর্যন্ত? শুধু কাগজে কলমে 'আহা' বলাটাই কর্তব্য সম্পাদন নয়। পথের ভিখারীকে মৌখিক সহানুভূতি দেখানো বৃথা। দস্যু, নরঘাতক, পাপী ও পতিতাদের মধ্যে কারো কারো কোন কোন ভাল গুণ থাকা স্বাভাবিক, মানুষ সবটাই ভাল বা সবটাই মন্দ হয় না। কিন্তু, তাদের জীবনের উচ্ছৃঙ্খল দিকটার, পঙ্কিল ও জঘন্য দিকটার চিত্তাকর্ষক ও মনোরম চিত্র এঁকে তার সাহায্যে অপরাধীদের প্রতি সহানুভূতি ও করুণা প্রদর্শনের কোন মানে হয় না। তার ফলে ওদের না পাঠকদের কোনো পক্ষেরই কোন উপকার হয় না বা দুঃখদুর্দশার কোন প্রতিকারও হয় না।

*　　*　　*

যে রচনা পড়ে দুঃখীর দুঃখে যথার্থই প্রাণ কাঁদে সেই রচনাই ধন্য। আন্তরিকতা ও হৃদয়স্পর্শী আবেদন যে সাহিত্যে থাকে সেই সাহিত্যই হয় সত্য। কিন্তু প্রবৃত্তি প্রসূত বা বণিকবৃত্তি প্রসূত যে দূষিত রচনা সে শুধু কদর্যই, সাহিত্যে তার স্থান নেই। যে সাহিত্য মানুষকে পূর্ণ হবার প্রেরণা দেয় সেই রচনাই সার্থক। সাহিত্য যে প্রোপাগ্যাণ্ডা নয়, সার্মণ নয়, মনুসংহিতা বা নীতিশাস্ত্র নয় সে কথা মেনে নিলেও, একথা অস্বীকার করা যায় কি যে—সুসাহিত্যের পরোক্ষ ফল সামাজিক উন্নতি এবং জাতীয় শক্তি স্বাস্থ্য ও আনন্দ বৃদ্ধি? অসংযত

উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়ে অধঃপতনের পথে অধোগামী হয়ে অন্ধের মত এগিয়ে চলা মানেই যে সাহিত্যে প্রগতিবাদ নয় শ্রদ্ধেয় রামানন্দবাবু এই কথাটাই আমাদের বিশেষ করে বলতে চেয়েছেন।

* * *

ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙালীদের অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি রূপে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয় যে সুন্দর অভিভাষণটি দিয়েছেন তার মধ্যে জেনে রাখবার মত অনেকগুলি ভাল কথা তিনি বলেছেন। বাঙালীর গর্ব করবার উপযোগী ও গৌরব স্তম্ভ স্বরূপ যা কিছু ছিল বা আছে সে বিষয়ে বাঙালীকে তিনি যেমনি সজাগ করে দিয়েছেন, তেমনি সজাগ করে তুলেছেন নিজেদের কয়েকটি জাতীয় দোষ বা দুর্বলতার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি বলেছেন—বাঙালীর সকল বিষয়েই একটা স্বাতন্ত্র্য আছে। কি সাহিত্য-ধারায়, কি সমাজ বিধিতে, কি শিক্ষা ব্যবস্থায়, কি ধর্মানুশীলনে সে দলে পড়িয়া কোন কাজ করে না। নূতন পথের সন্ধান দিতে সে জানে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম, মহাজন পদাবলী, সংকীর্তন গান, বাংলার 'শ্রী' রাগ, তান্ত্রিক সাধনার পথ, রঘুনন্দনের স্মৃতি, বিধবার একাদশী, অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ, নব্য ন্যায়, ইত্যাদি বাঙলার অতীতকে চিহ্নিত করে রেখেছে। জাতীয় গৌরবের কথা মাঝে মাঝে শোনা ও স্মরণ করা আমাদের প্রয়োজন। আত্মপ্রত্যয় না হ'লে জাতির উন্নতি হয় না। .... আমাদের উন্নতি ও কর্ম সাধনার পথে তিনটি বাধা আছে। প্রথম, আমাদের পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি নেই, আমরা কাউকেও আমাদের চেয়ে বড় দেখতে চাই না ... দ্বিতীয়, আমাদের সংহতি নেই। দশজনে মিলে একত্রে আমরা কাজ করতে পারি না। তৃতীয়, আমাদের পরমত সহিষ্ণুতার অভাব, যেটা আমাদের মধ্যে দলাদলির প্রধান কারণ। আমারা নিজের কথা নিজের মত্‌ই ধ্রুবসত্য বলে বুঝি, আর কারও মত্‌ শোনবার মত ধৈর্য (এবং সত্য বলে স্বীকার করে নেবার মত ঔদার্য) আমাদের নেই। এ বাধা তিনটি যে দূর করা যায় না তা নয়। আমাদের নানা ব্যর্থতার মূল কারণ খোঁজ করতে হবে এইখানে।

* * *

মাদ্রাজের থিওজফিক্যাল সোসাইটির সভাপতি ডাঃ আরুণ্ডেল কলকাতায় এসেছিলেন। সেদিন য়ুনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে এক ছাত্রসভায় তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছেন তাতে এদেশে প্রচলিত বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির কুফল সম্বন্ধে তিনি বিশদ ভাবে আলোচনা করেন। তাঁর মতে বর্ত্তমান শিক্ষা প্রথার দোষে এদেশের ছেলে মেয়েরা তাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য বা নিজস্ব ভারতীয়ত্ব হারাতে বসেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা তাদের মধ্যে প্রবল ভাবে সংক্রমিত হতে শুরু হয়েছে। তিনি মনে করেন—আমাদের ছেলে মেয়েদের ভারতের নিজস্ব স্বদেশী শিক্ষা ধারায় শিক্ষিত করে তোলবার ব্যবস্থা না করতে পারলে, কি রাজনৈতিক, কি শিক্ষা সম্পর্কিত বা অন্য কোন ক্ষেত্রেই ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা কম। তিনি বলেন প্রাচীন ভারতের ভিত্তির উপরেই ভারতবর্ষের বর্তমান শিক্ষাধারাকে পরিবর্তন করে দাঁড় করাতে হবে। তার প্রধান অবলম্বনস্বরূপ এই তিনটি স্তম্ভ থাকবে—ব্যক্তি, পরিবার, ও জাতি। অর্থাৎ নিজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সকলের যত্ন প্রচেষ্টা ও সাধনা যেন পারিবারিক ও জাতীয় উন্নতির জন্য নিয়োজিত হয়। এই হল এ দেশের মুক্তির উপায়।

* * *

বাঙালীর খাদ্য সম্বন্ধে বহু চিন্তাশীল মনীষী ও বৈজ্ঞানিক বহুবার আমাদের সচেতন করেছেন। আমরা জীবন ধারণের জন্য প্রতিদিন যা খাই, এবং যে ভাবে তা প্রস্তুত করে খাই, সে যে আমাদের দেহের পক্ষে প্রয়োজনীয় পরিমাণ 'ক্যালসিয়ম' ও 'ভাইটামিন' সরবরাহ করতে পারে না এ তাঁরা অনেকেই প্রমাণ সহ আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। কিন্তু বাঙালী আজও উদাসীন। এখনও সে তার আহার্য সম্বন্ধে কোন সতর্কতাই অবলম্বন করেনি। সিদ্ধ ধানের কলে ছাঁটা চাল ফুটিয়ে নিয়ে ফ্যান ফেলে খাওয়া মানে নারকেলের শাঁস ফেলে ছোবড়া খাওয়ার সমান। পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, তাতে মাত্র এক দশমাংশ পরিমাণ ক্যালশিয়ম যদি বা পাওয়া যায় ভাইটামিন না থাকারই মধ্যে। বাঙালীর প্রধান খাদ্য চাল আর আটা ময়দা, অথচ এ দুয়েরই নাকি সমান দুরবস্থা। বিশেষজ্ঞেরা বলেন তার চেয়ে আধাসিদ্ধ

ধানের ঢেঁকিছাঁটা চাল ও জাঁতায় ভাঙা আটা ময়দা অপেক্ষাকৃত ভাল। আমাদের খাদ্যের মধ্যে এক মাত্র পুষ্টিকর জিনিস হ'ল 'দাল'। কিন্তু বাঙালী প্রত্যেকে এক আউন্স বা আধ আউন্স মাত্র দাল একবাটী হলুদগোলা জলের সঙ্গে খায়। প্রত্যেকের অন্ততঃ তিন আউন্স পরিমাণ দাল সিদ্ধ করে প্রত্যহ খাওয়া উচিত। মাংস, ডিম মাঝে মাঝে খাওয়া ভাল, তবে ও সবের চেয়েও শরীরের পুষ্টির জন্য ঢের বেশি প্রয়োজন, কাঁচা শাক সব্জী, ফলমূল ও টাটকা খাঁটি দুধ। গুড় ও চিড়া, কলাযুক্ত ভিজা ছোলা, এবং যবের ছাতু দেহকে সবল ও সুগঠিত করে।

* * *

কলিকাতায় বিমান আক্রমণ প্রতিরোধের আবার একটি মহড়া হয়ে গেল। এবার দেখা হল যে 'হুঁসিয়ারী হুইসল' বাজলে শহরবাসীরা দিনের বেলা তাদের কাজ কর্মের মধ্যে সহসা সতর্কতা অবলম্বন করতে পারে কিনা। এ-আর-পি কমিটি থেকে তাদের যে সব আদেশ উপদেশ ও অনুরোধ করা হয়েছে নগরবাসীরা তা ঠিক ঠিক অনুসরণ করে চলতে পারে কিনা। যথাযথ ভাবে সুশৃঙ্খলতার সঙ্গে এই বিমান ত্রাণ পরিকল্পনা কার্যকারী হয়েছে শুনেও কিন্তু আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারছিনি। লণ্ডনের মতো শহরে যেখানে বিমান-ত্রাণের জন্য সর্ববিধ সুব্যবস্থাই হয়েছে সেখানেও পাতাল-আশ্রয় (Under-Ground Shelter) নির্মাণ করে নগরবাসীদের রক্ষার আয়োজন করেছেন তাঁরা। কিন্তু, আজ প্রায় একবৎসর হতে চলল এখানকার এ-আর-পি, আমাদের বিমান-ত্রাণের ব্যবস্থা করছেন, কিন্তু এপর্যন্ত পাতাল-আশ্রয় সম্বন্ধে তাঁরা একেবারেই উদাসীন। যে সব বাজার, ইস্কুল, বা বড় বড় বাড়ী তাঁরা পথিকের আশ্রয় স্থল বলে ঘোষণা করে চিহ্নিত করে রেখেছেন, বিমান-আক্রমণ হ'লে সেখানে আশ্রয় লওয়া যে কি হিসাবে নিরাপদ আমাদের তা সম্পূর্ণ বোধগম্য হয় নি। তবে 'নেই মামা'র চেয়ে 'কাণামামা' থাকাও ভাল এই হিসাবে 'মন্দ কি'—বলা চলে মাত্র। কিন্তু, বিশটনী বোমার ধ্বংস ও আগুনে বোমার অগ্নিকাণ্ড থেকে রক্ষা পেতে হলে ৫০-৬০ ফুট নীচে পাতাল আশ্রয় ভিন্ন গত্যন্তর নেই।

* * *

বাংলার জনপ্রিয় লোকনায়ক সুভাষচন্দ্রের রহস্যময় অন্তর্ধানে অনেকেই বিস্মিত হয়েছেন। শত্রুপক্ষ বিদ্রূপ করে বলছেন 'যঃ পলায়তি স জীবতি'। কিন্তু সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে অতিবড় শত্রুরও একথা বলা চলবেনা যে তিনি কারারুদ্ধ হবার ভয়ে বা আদালতের বিচারে দোষী সাব্যস্ত হয়ে শাস্তি পাবার আশঙ্কায় গভীররাত্রে গৃহত্যাগ পূর্বক আত্ম-গোপন করে আছেন। কারণ, রাজদণ্ড মাথা পেতে নিতে তিনি চিরাভ্যস্ত। সুভাষচন্দ্রের গৃহত্যাগ সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যা শুনা গেছে তাতে মনে হয় যে অধ্যাত্ম সাধনার আকর্ষণে, মুক্তি বা মোক্ষলাভের আকাঙ্ক্ষায়, ধর্মভাবের অনুপ্রেরণায় আজন্ম সংসার বিরাগী সুভাষচন্দ্র গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছেন। তবে একথাও ঠিক যে এটা শুধু অনুমান মাত্র। সুভাষচন্দ্র তাঁর উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করে এসেছেন বিলাতে থেকে। আই-সি-এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এসেও তিনি কিন্তু সরকারী চাকরি গ্রহণ করেন নি। স্বদেশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। আজ সুদীর্ঘ বিশ বৎসর কাল তিনি স্বদেশের স্বাধীনতার কঠিন সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি এ পথে সকল প্রকার ত্যাগ, কঠোর কৃচ্ছ্রতা, লাঞ্ছনা, শাস্তি কারা-যন্ত্রণা অম্লান বদনে সহ্য করেছেন। তিনি ছিলেন বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শের অনুরাগী বীরধর্মী সাধক। বাংলার বর্তমান ও ভবিষ্যতের জাতীয়যজ্ঞে প্রধান পুরোহিত ছিলেন এই চিরকুমার স্বধর্মনিষ্ঠ দেশ-প্রেমিক। সুভাষচন্দ্রের এই সংসার বৈরাগ্য বাংলাদেশকে যে একান্ত অসহায় করে ফেলবে এই কথা মনে করেই আমরা সাগ্রহে তাঁর প্রত্যাগমন পথে চেয়ে থাকব।
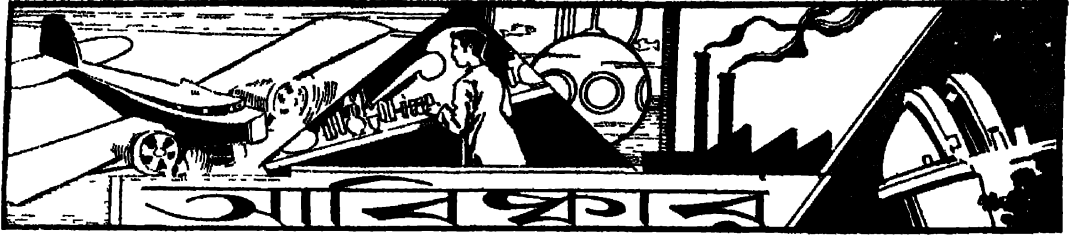
যুদ্ধের হাঙ্গামায় ভারতবর্ষের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় বহু জিনিসের আমদানী বন্ধ হ'য়ে যাওয়ায় গভর্নমেন্টের কৃষি শিল্প ও বিজ্ঞান বিভাগের অনুশীলনকারীরা দুষ্প্রাপ্য জিনিসগুলি এখানে প্রস্তুত হ'তে পারে কি না, তার মালমশলা এদেশে পাওয়া যায় কি না, যদি না পাওয়া যায় তবে উপস্থিত কাজ চালাবার মতো কোনো সাংশ্লেষিক প্রতিভূ পদার্থ (synthetic substitute) আবিষ্কার করা যায় কি না, এ নিয়ে গবেষণা শুরু করেছেন। এ বিষয়ে কিছু কিছু সাফল্যও তাঁরা অর্জন করতে পেরেছেন।

*　*　*

ভারতের রাসায়নিক কারখানাগুলিতে, যেখানে সাবান প্রভৃতি প্রসাধন দ্রব্য এবং বিবিধ ঔষধ ও প্রতিষেধক সামগ্রী প্রস্তুত হয় তাদের পক্ষে গন্ধসার তৈল ও সুরভি (Essential oils and Aromatics) অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ। এসব ভারতে আমদানী হ'ত প্রধানতঃ ইটালি, ফ্রান্স ও জার্মানী থেকে। কিন্তু, এ সমস্ত দেশই উপস্থিত যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ায় সেখান থেকে এখন আর এসব জিনিস ভারতে আসছে না। যা মজুত ছিল তা এই দেড় বৎসরের মধ্যে প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে।

*　*　*

বস্ত্র-শিল্পের পক্ষে রঞ্জন রসায়ন যেমন একটা অপরিহার্য অঙ্গ এবং বিদেশ থেকে রং আমদানী বন্ধ হওয়ায় এখানে যেমন উদ্ভিজ্জ ও সবজীজাত রং নিয়ে কাজ চালানো যায় কিনা, তার পরীক্ষা চলছে, তেমনি উদ্ভিজ্জ তৈল বিনা উত্তাপে নিষ্কাশিত করে এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সযত্নে পরিশ্রুত করে নিয়ে তার সঙ্গে খনিজ তৈল উপযুক্ত পরিমাণে সংমিশ্রিত করে কাজ করা যায় কিনা দেখা হচ্ছে।

*　*　*

পরীক্ষায় জানা গেছে যে রেড়ির তৈল এ ভাবে প্রস্তুত করতে পারলে তার সাহায্যে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতিতে ব্যবহারোপযোগী 'ল্যুব্রিক্যান্ট' তৈল, রেল, মোটর প্রভৃতি গাড়ীর চাকায় ব্যবহারোপযোগী 'গ্রীজ' বা চর্বি জাতীয় তৈলাক্ত পদার্থ প্রস্তুত হ'তে পারে। বিজ্ঞান ও শিল্পানুশীলন বিভাগের ডাইরেক্টারের সঙ্গে সহযোগিতায় কোনও একটি কোম্পানী ইতিমধ্যেই এইরূপ তৈল প্রস্তুত করে বাজারে বিক্রয় করছেন এবং ভারতীয় সমর বিভাগে সরবরাহ করছেন। এই তৈল ব্যবহারে বেশ সন্তোষজনক ফল পাওয়া গেছে।

*　*　*

তুলার বীজ থেকে নিষ্কাশিত তৈল, বিভিন্ন বাদাম থেকে নিষ্কাশিত তৈল এবং অন্যান্য উদ্ভিজ্জ তৈল নিয়েও পরীক্ষা চলছে এবং কোনো কোনোটি থেকে আশাতীত সাফল্য লাভও হয়েছে। এমন কি তৈলচালিত যেসব ইঞ্জিন ব্যবহার হয় যেমন ডীজেল ইঞ্জিন যা 'ক্রুড অয়েল' বা মেটে তেলের সাহায্যে চলে তাও নাকি এই উদ্ভিজ্জ তৈলের এক সংমিশ্রিত উপাদানের সাহায্যে চালানো সম্ভব হয়েছে।

*　*　*

কডলিভার অয়েল প্রভৃতি 'ভাইটামিন' প্রধান তৈলও অধুনা ভারতে আর আমদানী হচ্ছে না বলে মাদ্রাজের দিকে চেষ্টা চলেছে কোনো কোনো সামুদ্রিক মৎস্যের তেল কডলিভার অয়েলের পরিবর্তে ব্যবহার করা চলে কি না। এ বিষয়েও পরীক্ষার ফল বেশ সন্তোষজনক হয়েছে। মৎস্যজাত তৈলের সঙ্গে খাদ্যপ্রাণযুক্ত উদ্ভিজ্জ তৈলের সংমিশ্রণে কড-লিভার তুল্য শক্তিশালী পুষ্টিকর তৈল আবিষ্কৃত হয়েছে।

বর্ত্তমান যুদ্ধে ব্রিটেনকে সকলরকমে সাহায্য করবার জন্য আমেরিকা বদ্ধপরিকর। রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট্ সুস্পষ্ট ঘোষণা করেছেন যে ব্রিটেন যদি এ যুদ্ধে হারে তবে গণতন্ত্র পৃথিবী থেকে লুপ্ত হবে। তখন ডিক্টেটারী শাসনই জগতে প্রাধান্য লাভ করবে, যার ফলে, নিখিলমানবের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ও দুর্বল জাতি সমূহের স্বাধীনতা বিপন্ন হয়ে পড়বে। সভ্যতার আসন দখল করবে এসে দুদ্ধর্ষ বর্বরতা। আমেরিকা যুক্তরাজ্যের ভবিষ্যৎ হয়ে উঠবে শঙ্কাকুল। এই নাজী-ফ্যাসিস্ট্ সঙ্ঘ যদি য়ুরোপ বিজয়ে সমর্থ হয় তবে বিশ্ব-বিজয়ে তাদের বাধা দেবে কে? শক্তিমান ব্রিটেন যদি পরাস্ত ও তার বিশাল নৌবাহিনী বিধ্বস্ত হয় তবে সমুদ্র হয়ে উঠবে অরাজক। প্রশান্ত মহাসাগরে তখন প্রবল অশান্তির ঝড় উঠবে এবং আমেরিকা হয়ে পড়বে সেই দুর্যোগে বিপর্যস্ত। অতএব সময় থাকতে আমেরিকার সাবধান হওয়া উচিত। গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে ব্রিটেনকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আমেরিকার বিশাল সাগর-তীরকে নিরাপদ রাখতে হ'লে যুক্তরাজ্যের সীমানাকে বিস্তৃত করে দিতে হবে অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের বুকে, যেখানে চিরজাগ্রত সতর্ক প্রহরীর মতো সিন্ধুবক্ষ আলোড়িত করে ঘুরে বেড়াবে অপরাজেয় ব্রিটিশ রণতরী বাহিনী।

* * *

আমেরিকা অবশ্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'তে চায় না, কারণ যুদ্ধে তারা নিজেরা লিপ্ত হলে ব্রিটেনকে হয়ত সবদিক দিয়ে সাহায্য করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না, কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য সেখানেও 'সাজ' 'সাজ' রব পড়ে গেছে। প্রয়োজন হলে তারা যুদ্ধে নামতেও ইতস্তত করবে না। যুদ্ধ-নিরপেক্ষ জাতি হিসাবে যুদ্ধমান জাতিকে সাহায্য করবার পক্ষ থেকে আমেরিকার রাষ্ট্রীয় আইন কানুনে যে সব ব্যবহারবিধিগত বাধা ছিল আমেরিকার সেনেট ও কংগ্রেস তা একে-একে সংশোধন ও অপসারণ করে নিচ্ছে। অস্ত্রশস্ত্র গোলা বারুদ জাহাজ রসদ বিমান-বহর প্রতিদিন অজস্র পরিমাণে উৎপাদনের আয়োজন করেছে আমেরিকা, ব্রিটেন যাতে কোনো কিছুর অভাবে এ যুদ্ধে কাবু হয়ে না পড়ে। এমন কি—'ফেল কড়ি—মাখ তেল' বা "cash & carry" বন্দোবস্ত ছেড়ে তারা, ব্রিটেনকে জমিজমা ইজারার বিনিময়ে, নৌ ও বিমান ঘাঁটি পাওয়ার পরিবর্তে ধারে জিনিস দিতেও রাজি হয়েছে। শুধু তাই নয়, মার্কিন সাহায্যের সবচেয়ে বড় কথা হ'চ্ছে ব্রিটেনের শত্রুপক্ষরা যাতে আমেরিকা থেকে একখানা পেন্সিল কাটা ছুরিও না পায়, একটুকরো রুটিও যাতে না তাদের মুখে যায়, একটা আধলাও যাতে না তাদের হাতে গিয়ে পড়তে পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা। সুতরাং উপস্থিত একরকম বলা যেতে পারে যে এ যুদ্ধে আমেরিকা যুক্তরাজ্য ঠিক প্রকাশ্য-ভাবে না হোক, পরোক্ষভাবে পুরোপুরিই ব্রিটেনের পক্ষে যোগ দিয়েছেন।

অতএব, বর্ত্তমান যুদ্ধে জয়লাভ করা গতবৎসর ব্রিটেনের পক্ষে যতটা কঠিন বা অসম্ভব ছিল এবৎসর আর তা নেই। দিন দিন ব্রিটেন সামরিক শক্তিতে জার্মানির সমকক্ষ হয়ে উঠছে এবং আরও একবৎসর সময় পেলে সে যে রণ-সম্ভারে সকলদিক দিয়েই জার্মানিকে অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে পারবে প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল সকলকেই এ ভরসা দিয়েছেন। ব্রিটিশ সামরিক সাহায্যে বলীয়ান হয়ে গ্রীস এলবেনিয়া থেকে ইটালিকে প্রায় বিতাড়িত করবার যোগাড় করেছে। জেনারেল ওয়েভেলের সুযোগ্য অধিনায়কত্বে উত্তর পূর্ব আফ্রিকার কোণ থেকেও ইটালি যেভাবে শোচনীয় পরাজয় স্বীকার করে একটার পর একটা ঘাঁটি ছেড়ে রসদ মালপত্র অস্ত্র শস্ত্র ফেলে পালাতে

শুরু করেছে তাতে আফ্রিকা ইটালি-শূন্য হতে আর বেশিদিন লাগবে না। তবে সম্প্রতি সিসিলেতে জার্মান বিমানঘাঁটি বসে একটু গোলমাল আরম্ভ করেছে। সম্রাট হাইলে সেলাশি আবিসিনিয়ায় প্রবেশ করে ইটালির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। লক্ষাধিক ইটালীয় সৈন্য ব্রিটিশের হস্তে বন্দী হ'য়েছে। আফ্রিকা অভিযানকারী এই ব্রিটিশ সৈন্যদলের মধ্যে নিউজিল্যাণ্ড অস্ট্রেলিয়া ও ক্যানাডার সঙ্গে ভারতীয় রাজপুত শিখ গুর্খা, পাঠান ও পাঞ্জাবী মুসলমান সৈন্যরাও আছে, সুতরাং এ বিজয়গর্বে ভারতেরও অংশ আছে। ওদিকে তুর্কী ও বুলগেরিয়া বেঁকে দাঁড়িয়েছে। রুমানিয়ায় নাৎসীপক্ষপাতী 'আয়রণ গার্ড' দলের বিরুদ্ধে শ্রমিকরা বিদ্রোহ করেছে। এই বিদ্রোহের আগুন যদি একবার য়ুরোপময় ছড়িয়ে পড়ে জার্মান ও ইটালি সে আগুনে অচিরাৎ ভস্মীভূত হয়ে যাবে। এও ব্রিটিশের পক্ষে যুদ্ধ জয়ের একটা প্রধান আশা।

* * *

থাইল্যাণ্ড ও ফরাসী ইন্দোচীনের মধ্যে যে সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল সুখের বিষয় যে জাপানের মধ্যস্থতায় তা স্থগিত হয়েছে এবং উভয়পক্ষের মধ্যে শান্তির আলোচনা আরম্ভ হয়েছে। পরের বিবাদ মেটাবার জন্য জাপানের ত খুব উৎসাহ দেখা যাচ্ছে কিন্তু চীনের সঙ্গে তার নিজের ঝগড়া সে কিছুতে মেটাতে পারছে না কেন? বিশ্বের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে যাঁরা ধুরন্ধর, তাঁরা বলেন এবিষয়ে জাপান এবং চীন উভয়েই নাকি নিরুপায়। বাইরের চাপে পড়ে চীনের সমরনায়ক চিয়াংকাইশেক জাপানের সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করতে বাধ্য হ'চ্ছে। জাপান আজও সোভিয়েট রাশিয়ার কমিউনিস্ট তন্ত্রের বিরোধী। কিন্তু চীন তার পক্ষপাতী, সুতরাং রাশিয়া প্রকাশ্যে জাপানের শত্রু না হলেও চীনের সে বন্ধু। আমেরিকার বিরাট ব্যবসা বাণিজ্যের স্বার্থ রয়েছে চীনে সুতরাং চীনে জাপানের প্রভুত্ব আমেরিকার পক্ষে ক্ষতিকর, প্রাচ্যদেশে ব্রিটেনের বিস্তৃত সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ রয়েছে। চীনকে গ্রাস করে জাপান শক্তিশালী হয়ে উঠুক বা চীনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তারা এশিয়ায় পীতাতঙ্ক (yellow peril) সৃষ্টি করুক ব্রিটেনও এটা চায়না। অতএব চীনের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে না হোক পরোক্ষভাবে এঁরা সকলেই আছেন। ওদিকে জাপানকে বাঁচতে হলে, বড় হ'তে হলে, ব্যবসা বাণিজ্য এবং অর্থ সম্পদে শক্তিশালী ও আত্মনির্ভরশীল হতে হ'লে চীনকে তার না পেলে চলবে না। হংকঙ্, শ্যাংহাই, ইন্দোচায়না ব্রহ্মদেশ, সিঙ্গাপুর, মালয়, পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, ফিলিপাইন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতির উপরও তার লোভ আছে। এ যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ যদি ধ্বংস না হয়, তবে ভবিষ্যতে জাপান এদিকে হাত বাড়াবেই।

গত মাসের খবর

যুদ্ধোত্তর অতি আধুনিক ইংরাজী সাহিত্যের একজন শক্তিশালী লেখক মিঃ জেমস্ জয়ইসের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলিতে তিনি সত্য প্রকাশের যে ধারা অবলম্বন করেছিলেন তাকে রুচিবাগীশেরা ঠিক প্রীতির চক্ষে দেখেন নি। 'ইউলিসিস্' শীর্ষক তাঁর বহু প্রসিদ্ধ গ্রন্থখানি তাই নিন্দা ও প্রশংসা সমানভাবে অর্জন করেছিল। জয়ইসের রচনা তরুণ সাহিত্যিকদের উপর যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় অতি আধুনিক সাহিত্যের প্রত্যেক বইখানিতে।

* * *

ফরাসী মনীষী বার্গসঁর পরলোক গমনে বর্তমান জগতের একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিকের অন্তর্ধান ঘটল।

স্বর্গগত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত লর্ড লোথিয়ানের স্থানে মার্কিণ যুক্তরাজ্যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের রাষ্ট্রদূতরূপে লর্ড হ্যালিফ্যাক্স নিযুক্ত হয়েছেন। ইনি ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার পররাষ্ট্রসচিবরূপে নিযুক্ত ছিলেন। (এখন এণ্টনি ইডেন এঁর স্থলে পররাষ্ট্রসচিব হয়েছেন।) তখন ইনি লর্ড আরউইন নামে পরিচিত ছিলেন। এ সময়ে রাষ্ট্রদূতরূপে আমেরিকায় একজন প্রথম শ্রেণীর উপযুক্ত রাজনীতিজ্ঞকে পাঠিয়ে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন।

* * *

মার্কিন যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে যিনি রুজভেল্টের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন সেই ওয়েন্‌ডেল্‌ উইলকী সাহেব পরাজিত হয়ে রুজভেল্টের বিরুদ্ধে কোনো স্বতন্ত্র দল গঠন করে রাষ্ট্রপরিচালনা ব্যাপারে তাঁর বিরোধিতা না করে সম্পূর্ণ তাঁর অনুশাসন মেনে চলছেন এবং সকল বিষয়ে গভর্ণমেণ্টকে যথাসাধ্য সাহায্য করছেন। এইখানেই আমাদের সঙ্গে ওদের প্রভেদ।

* * *

একখানি আমেরিকান সংবাদ পত্রে সম্প্রতি একটি বিস্ময়কর সংবাদ প্রকাশ হয়েছে। কাগজের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে এক বৎসর আগে হিটলার যুদ্ধ বন্ধ করবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের কাছে একটি শান্তির প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। ওয়াশিংটনে এই শান্তি বৈঠক বসুক এবং রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট হোন এই বৈঠকের সভাপতি। জার্মানরা শান্তির জন্য যে যে সর্ত দিয়েছিল তা নাকি অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত এবং বিপক্ষ-দলের পক্ষে একটুও অসম্মানজনক নয়। মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে হিটলারের এই শান্তি প্রস্তাব বিপক্ষদের জানতে না দিয়ে গোপন করে বসেছিল—কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম!

মার্কিন নৌবিভাগের কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছেন যে ১৯৪০ সালে ৩৭৭০ খানি জাহাজ আমেরিকা থেকে ইংলণ্ডে গিয়ে পৌঁছেচে এবং ২,২২,৬০০০০ টন মাল প্রতি দিনই আমেরিকা থেকে দশখানি করে জাহাজে ইংলণ্ডে এসেছে। সুতরাং জার্মান ব্লকেডের যে কোনো সম্ভাবনাই নেই এখানে এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

* * *

মৈমনসিংহের অধিবাসী ডাঃ রাধাবিনোদ পাল এম-এ, এম-এল কলিকাতা হাইকোর্টের একজন অস্থায়ী বিচারক নিযুক্ত হয়েছেন। ডাঃ পালের ন্যায় যোগ্য লোক আশা করি স্থায়ী আসনলাভ করবেন।

* * *

আগামী প্রবেশিকা পরীক্ষায় এবার৩২০০০ ছাত্র ছাত্রী যোগ দিবেন বলে জানা গেছে।

* * *

গত ডিসেম্বর মাসে এদেশে ১২৭৩২ অর্থাৎ প্রায় তেরহাজার 'রেডিও'র নতুন লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। 'রেডিও' ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। দুবৎসর আগে সারা ভারতবর্ষে রেডিও ছিল মোট ৯২৭৭২ কিন্তু, গতবৎসরের পূর্ব বৎসর এ সংখ্যা বেড়ে হয়েছিল ১,১৯৪১৭ (একলক্ষ উনিশহাজার চারশো সতেরো)। ১৯৪০ সালের হিসাব এখনও প্রকাশ হয় নি।

* * *

সংস্কৃত কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ, পণ্ডিতপ্রবর আচার্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের সি-আই-ই উপাধি প্রাপ্তিতে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে গতমাসে আমরা লিখেছিলাম যে 'সি-আই-ই অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায়' উপাধিই তাঁর পক্ষে অধিকতর শোভন হ'ত। কিন্তু পাঠশালায় এই মন্তব্য পড়ে আমাদের এক বন্ধু এসে আমাদের জানিয়েছেন যে আমরা উপাধি বিতরণ সম্বন্ধে গভীর অজ্ঞতা প্রকাশ করেছি। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়ের সুপারিশেই দেশের সুযোগ্য পণ্ডিতদের 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি প্রদানে সম্মানিত করা হয়। সুতরাং ওটা আর তার পক্ষে গৌরবের হয় কেমন করে—কিন্তু 'সি-আই-ই' উপাধি দ্বারা স্বয়ং ভারত সম্রাট তাঁর সাম্রাজ্যের উজ্জ্বল নক্ষত্রদের চিহ্নিত করে রাখেন। অতএব এ সম্মান উচ্চতর। বন্ধুকে আমাদের ভ্রম সংশোধনের জন্য সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
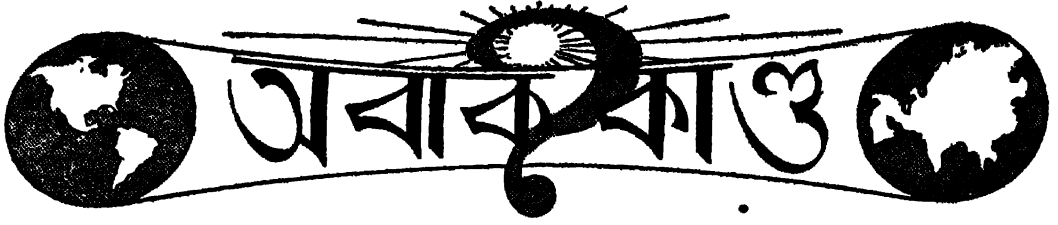
কুমারী শীলা সরকার

একটা যুদ্ধ জাহাজের দাম কত হ'তে পারে আন্দাজ করতে পার? ৩৫,০০০ হাজার টনের একটি আধুনিক যুদ্ধ জাহাজের দাম হ'চ্ছে মোটে—৯,৯৯,৮৮,০০০ কোটি টাকা। একটি আধুনিক যুদ্ধ বিমানের দাম—৫৬,০০,০০০৲; ১০৯০ টনের ডুবো-জাহাজ (সাবমেরিণ) ৪৮,৯৬,৫০০৲, বহু-এঞ্জিন-ওয়ালা বিমান-ধ্বংসী যুদ্ধ-প্লেন্—২,৮০,০০০৲, ৩৫ টনের ট্যাঙ্ক্*—৩,৫০,০০০৲।

পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট মা কে জান? লীনা মেডিনা (Lina Medina) নামে দক্ষিণ আমেরিকার পেরু প্রদেশে মাত্র ৬ বছর বয়সের একটি মেয়ে সন্তানের মা হ'য়েছে খোঁজ পাওয়া গিয়াছে। চিকিৎসকও বিশেষজ্ঞেরা একবাক্যে স্বীকার ক'রেছেন যে মানুষের ইতিহাসে এত কম বয়েসে মা হওয়া এই প্রথম।

আচ্ছা, এক মিনিট সময়ে তোমরা কতরকম কাজ কর'তে পার? তোমরা চেষ্টা করলে এক মিনিটে—১৩৬১০ গজ উড়ে যেতে পার, মোটরে ১০,৮১৯ গজ যেতে পার, হাইড্রোপ্লেনে ৪,১৫৭ গজ উড়তে পার, ১,১৫৩,৩ গজ ওপর থেকে নীচে পড়তে পার, সাইকেলে ৯৪৮ গজ যেতে পার, ৭৪৩ গজ স্কেট্ (skate) করতে পার; ৪৮২ গজ দৌড়তে পার, ২৭৪ গজ হাঁটতে পার, ১০৩ গজ সাঁতার কাটতে পার; ৪১০ বর্গ ইঞ্চি বায়ু নিঃশ্বাস নিতে পার, ১৫০টা কথা ব'লতে পার, ৩০টা থেকে ৪০টা কথা লিখতে পার, ২৬৭ গজ দাঁড় টানতে পার, মুষ্টিযুদ্ধে ৬ বার ঘুসি খেয়ে পড়ে যেতে পার এবং আরও অনেক কিছুই হয়তো পার। কতগুলো পার একবার চেষ্টা ক'রে দেখো না।

মৃতের কণ্ঠস্বর

নিউইয়র্ক শহরের রবার্ট ভিনসেণ্ট গ্রামোফোনের রেকর্ড সংগ্রহ করে রাখেন। তাঁর সখ হচ্ছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের কণ্ঠস্বর ধরে রাখা। অনেকের যেমন হাতের লেখা সংগ্রহ করে রাখার ঝোঁক আছে, ইনি তেমনি গলার সুর, স্বর ও মুখের কথা সংগ্রহ করে রেখেছেন। রবার্ট ভিনসেণ্টের রেকর্ড-রুমে গেলে প্রায় দু'হাজার জগদ্বিখ্যাত নরনারীর কণ্ঠস্বর শোনবার সৌভাগ্য হতে পারে। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই আজ পৃথিবীর পরপারে চলে গেছেন, কিন্তু রবার্ট ভিনসেণ্ট তাঁদের মুখের কথা তাঁদের কণ্ঠস্বর ধরে রেখেছেন। যেমন তাঁর সংগ্রহের মধ্যে আছে কুইন ভিক্টোরিয়ার কণ্ঠস্বর ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেলের কথা, সারা বার্ণহার্টের অভিনয়, ডিজ্‌রেলির বক্তৃতা, রুডল্‌ফ্ ভ্যালাণ্টিনোর গলা, সার আর্থার কোনান ডয়েলের আলাপ, উত্তরমেরু আবিষ্কারক রবার্ট পেরির মেরু আলোচনা ইত্যাদি।

---

* যুদ্ধক্ষেত্রে সাঁজোয়া গাড়ী (armoured cars) বড় বড় বিমান-ধ্বংসী কামান অস্ত্র-শস্ত্র, গোলা-গুলি ও যুদ্ধের অন্যান্য নানা উপকরণবাহী লরি, মোটরযান ইত্যাদিকে বাধা দেওয়ার জন্যে যে কামানসংযুক্ত বিরাট অদ্ভুত দর্শন লোহার গাড়ী ব্যবহৃত হয় তাকে ইংরিজিতে tank বলে।
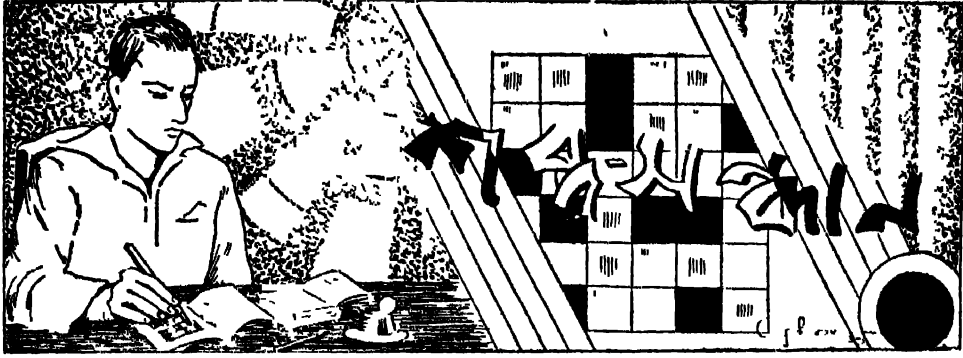
ফাল্গুন—১৩৪৭

নিয়মাবলী—(১) ধাঁধা-সম্পাদকের মতে শব্দসন্ধানের যেটি সবচেয়ে নির্দোষ ও নির্ভুল সমাধান,—তার সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে উত্তর মেলা চাই। নির্ভুল সমাধানটি পরের মাসের পাঠশালায় প্রকাশিত হবে। (২) সাদা ঘরগুলির প্রত্যেকটিতে একটি ক'রে সংযুক্ত বা অসংযুক্ত অক্ষর বসবে। (৩) প্রতি সংখ্যার প্রতিযোগিতা-কুপনখানি কেটে ভর্তি ক'রে পাঠাবে সেই মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে। দেরি হ'লেই বাতিল। খামের উপরে ঠিকানা লিখবে—'শব্দ-সন্ধান" পাঠশালা কার্যালয়, ৩০ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। (৪) হরফগুলি সব পরিষ্কার হওয়া চাই—কাটাকুটি চলবে না। বানান ভুল হলে ভুল ধরা হবে। (৫) যে কোন পাঠক পাঠিকা যতগুলি ইচ্ছা কুপন পাঠাতে পারবে। (৬) 'শব্দ-সন্ধান'-সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ব'লে মেনে নিতে হবে।

সঙ্কেতসূত্র

—পাশাপাশি—

১। সরবিধ জ্ঞান, বিদ্যা ও চারুকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী

৩। দ্বাদশ আদিত্য

৬। তরী বাহন প্রতিযোগিতা

৭। বহু প্রাচীন কাল থেকেই সকল মানুষের চেয়ে এমন কি ভগবান বুদ্ধদেবের চেয়ে এদেশে শ্রেষ্ঠ এক জন্তুরই মূল্যবান্ সম্পদ্ রূপে এটির সমাদর অধিক।

৯। আমাদের বছর আরম্ভ হবার ঠিক ৫১৫ বছর আগে এ অব্দ প্রচলিত ছিল।

১০। এ হলে পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের সকল সম্বন্ধ শেষ হয়ে যায়।

১২। এ না থাকলে পাঠশালা এত দিন উঠে যেত।

১৪। সরলভাবে সামনের দিকে চেয়ে দেখলে ইনি তৎক্ষণাৎ লজ্জিত হন, পিছন থেকে দেখলেও ইনি গিয়ে বিলের মধ্যে আত্মগোপন করেন। এর পরেও যদি এঁকে খুঁজে বার করতে না পার তবেই এঁকে পাবে—পাবলে কিন্তু নয়।

১৬। বলেই দিচ্ছি এ পর্বত চুঁড়লেই পাবে।
১৭। কোনো বিয়ে যে এ ছাড়া হ'তে পারে তা কেউ কোনও দিন শোনে নি।
১৯। পল্লীগ্রামে এ জন্য পুকুরঘাটে যেতেই হয়।
২০। পৃথিবী যখন ছিল অগ্নিময় এ তখন লুকিয়ে ছিল পাথরের দানার মধ্যে।
২১। এ আগামী কাল অর্থাৎ পরের দিনের কথা।
২৩। 'শ-র' তোমাদের "—" ঠকাবার জন্য শব্দটি এখানে এলোমেলো করে রেখেছেন।
২৫। সিন্ধুকীট
২৬। সৃষ্টির অনাদি কাল থেকে দেখে আসছে লোক এর জন্ম হয় সূর্যোদয়ের সঙ্গে।
২৭। এ অতি মনোরম।
২৮। প্রাচীন পারস্যদেশের প্রাদেশিক শাসনকর্তা।

—ওপর থেকে নীচে—

১। কোনও বিষয় বা ব্যক্তির প্রতি অনাসক্তিই এর মূল।
২। এর গায়ে কিছু ছুঁড়ে ফেললে তৎক্ষণাৎ তা আবার ফিরে আসে।
৩। পাশাপাশি যোগ করলে মাছ ধরার কাজে লাগতে পারে।
৪। বিশুদ্ধ সাগর জল এলোমেলো ছড়ান রয়েছে।
৫। তোমরা অনেকেই হয়ত 'ঘুঘু' দেখেছ কিন্তু এ দেখনি।
৮। অশুভ তিথি।
১১। বড় বড় বাড়ীতে এর সন্ধান একাধিক পাওয়া যায়।
১৩। এ মাটি খোঁড়ার কাজে লাগতে পারে।
১৫। ভারতবাসীরা একতাবদ্ধ নয় বলেই এদের মতও সুনির্দিষ্ট নয়, তাই এদেশে এর কোন মূল্য নেই।
১৬। হিমালয় চূড়া বাস্তবিকই "—"
১৮। ইনি যখন দশ দিকেরই অধিপতি তখন এঁর উল্টো দিকেও সন্ধান পেতে পার।
২০। যা দিনকাল পড়েছে, এখন এ যার কিছু আছে সেই নির্ভাবনায় থাকতে পারবে।
২২। এ শুধু দু'জনের কথোপকথন।
২৪। এর স্পর্ধার সীমা নেই—বুদ্ধদেবকেও বিপথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল।
২৫। পুঁথির সঙ্গে দলিল মেনে হিসাব অনুসারে চলে, কিন্তু, বিছানা ও অন্যান্য আসবাব আগলে গাছের ডালেই বাস করে, অথচ দূরের সংবাদ যা কিছু এর কাছেই পাওয়া যায়।

মাঘের শব্দ-সন্ধানের ফলাফল

মাঘের 'শব্দ-সন্ধান' প্রতিযোগিতার একজনও সঠিক উত্তর দিতে পারেন নি দেখে 'শ-র' অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছেন। কারণ, পৌষের প্রতিযোগিতায় শব্দ-সন্ধানীদের শোচনীয় পরিণাম দেখে তিনি মাঘের শব্দ-সন্ধান খুব সহজ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু, তবুও প্রতিযোগীরা বিফল হয়েছেন দেখে তিনি বিশেষ দুঃখিত। 'শ-র' মনে করেন যে এই অকৃতকার্যতার জন্য প্রতিযোগীরাই দায়ী। কারণ, একটু চিন্তা করলেই, একটু সতর্ক হলেই তাঁরা 'শ-র'কে অনায়াসে পরাজিত করতে পারতেন। বাকুই পুরের কুমারী সাধনা বসু সামান্য অসাবধানতার জন্য দু'দুটি ভুল করে ফেলেছেন। উপর নীচের ৪নং ঘরে —চাঁদের একটু অংশ লিখতে শ্রীমান নীরদচন্দ্র রায় প্রভৃতি অধিকাংশ প্রতিযোগী যেখানে "চন্দ্রকলা" লিখেছেন তিনি বুদ্ধিমতীর ন্যায় সেখানে 'চন্দ্রকণা' বসিয়ে যেমন সূক্ষ্ম বিচারের পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি পাশাপাশি ১১নং ঘরে "যুদ্ধের ব্যাপারে অতি প্রয়োজনীয়" জিনিসটা যে কি যদি একটু ভেবে দেখে লিখতেন তাহলে সকলের মত ভুল করে 'কামান' লিখতেন না নিশ্চয়ই। কারণ এটা বুঝে দেখা দরকার যে যুদ্ধে 'কামান' যেমন প্রয়োজন, 'ট্যাঙ্ক'ও তেমনি প্রয়োজন, 'এয়ারোপ্লেনও' তেমনি প্রয়োজন, কিন্তু এসবের চেয়েও যুদ্ধে অতি প্রয়োজনীয় হচ্ছে 'টাকা' অর্থাৎ 'কাহন'। কাহন না হ'লে কামান পাবে কোথায়? দেখছ না, WAR-LOAN তোলবার কত চেষ্টা চলছে? একমাত্র মৈনামের শ্রীমান নীরদচন্দ্র রায় 'কাহন' লিখে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন কিন্তু কুমারী সাধনা ও নীরদচন্দ্র আরও একটা ভুল করেছেন ১৯নং পাশাপাশি ঘরে 'ভাল জানা না থাকলে এ ভাল হয় না' লিখতে 'বন্ধন' লিখে। অবশ্য কুমারী সাধনা বসু বা নীরদচন্দ্র যে এ ঘর পূরণে একাই ঠকেছেন তা নয়, অধিকাংশ শব্দ-সন্ধানীই 'রন্ধন' লিখেছেন। কনেশ্বরের অন্নপূর্ণা দেবীরও মাত্র ২টি ভুল হতে পারত যদি তিনি বানান সম্বন্ধে সতর্ক হতেন। 'ভান' তিনি মূর্ধন্য ণ' লিখে মস্ত ভুল

করেছেন। শ-র বলেন 'কামান' বা 'বন্ধন' এসব শব্দ ত তোমাদের ইনফ্যাণ্ট ক্লাশের ছেলেরাও বলে দিতে পারবে। এখানে তোমাদের ভেবে দেখা উচিত—আরও কি শব্দ আছে যার প্রথমে 'র' এবং শেষে 'ন' আছে (ভা-ন থেকে 'ন' সহজেই পাওয়া গেছে।) এবং যা 'ভাল জানা না থাকলে ভাল হয় না?' একমাত্র অমলনাথ সৌরভ সনাতনী এ শব্দটি নির্ভুল লিখেছেন। সে শব্দটি হল 'রঞ্জন' অর্থাৎ রং করা। যারা ভাল রং করতে জানে না, তারা রং করতে গেলে সে রং ভাল হয় না। কোথাও ছাপকা ছাপকা, কোথাও গাঢ়, কোথাও পাতলা হয়ে পড়ে। এই ছুটি ঘর সামলে লিখতে পারলে কুমারী সাধনা বসুর উত্তর সম্পূর্ণ নির্ভুল হ'তে পারত'। তিনি উপর নীচের ২১নং ঘরে ঠিকই লিখেছেন 'কুমাতা'। নীরদচন্দ্র এখানে 'গোমাতা' লিখে অন্তত 'বি-মাতা'কে অপমান থেকে রক্ষা করেছেন। শ-র মনে করেন যাঁরা এ ঘরে 'বিমাতা' লিখেছেন তাঁরা বিমাতার অবমাননা করেছেন। 'বিমাতা' মাত্রেই 'কুমাতা' নন। এমন 'বিমাতা'ও আছেন যাঁকে 'স্বর্গাদপি গরিয়সী' মনে করতে কোনো সন্তানেরই বাধে না। তারপর আর একটি ঘরেও অধিকাংশ শব্দ-সন্ধানী হোঁচট্ খেয়েছেন, সেটি হ'ল—পাশাপাশি এবং উপর নীচে ২০নং ঘর। পাশাপাশি সংকেত সূত্র হ'ল 'এ সবাই পছন্দ করে'। অসাবধানীরা লিখেছেন 'তাজা' কিন্তু হবে এটা 'সাজা'। কারণ 'পান্তাভাত' বাসি টক দিয়ে খেতে অনেকে পছন্দ করেন, বাসি লুচিও গুড় দিয়ে খেতে অনেকে ভালবাসেন। রসাল মিষ্টান্ন একদিন পরেই খেতে ভাল লাগে। এই রকম অসংখ্য জিনিস আছে যা 'তাজা' অনেকে পছন্দ করেন না। কিন্তু সুসজ্জিত হতে কেনা ভালবাসে? তা ছাড়া পাশাপাশি এখানে 'তাজা' লিখলে উপর নীচে হয় "তারল্য"। সংকেত সূত্রে আছে—"এটা তোমাদের মধ্যে বেশী থাকা যেমন অবাঞ্ছিত একেবারে না থাকাও তেমনি বাঞ্ছিত নয়।" এখন প্রশ্ন হচ্ছে 'তারল্য' থাকা বাঞ্ছনীয় না "সারল্য" থাকা বাঞ্ছনীয়? বুদ্ধিমানেদের বোধ করি বলে দিতে হবে না যে 'তারল্য' থাকা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। এবং বেশী 'সরল' হাওয়াটাও এযুগে অবাঞ্ছনীয়। কারণ, তাহলে তাদের সকলেই ঠকিয়ে দেবে। যেমন 'শ-র' পাঠশালার সরল পাঠক পাঠিকাদের প্রতি মাসে ঠকাচ্ছেন। 'শব্দ-সন্ধানে'র কূপনে 'ভা' স্থলে 'তা' মুদ্রিত হওয়ায় 'শ-র' বিশেষ লজ্জিত। ভিতরের ছকে 'ভা' না থাকলে তাঁকে হয়ত আরও বেশী লজ্জিত হ'তে হত।

ছুটি ভুল

কুমারী সাধনা বসু, বারুইপুর, ২৪ পরগণা। (শব্দ-সন্ধানের পুরস্কার ইনি একাই পাবেন)

তিনটি ভুল

অন্নপূর্ণা দেবী, কণেশ্বর। উমারাণী ঘোষ, কদমতলা। নীরদচন্দ্র রায়, মৈনাম। পাঁচুগোপাল বসু, বারাসত। রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, আরিয়াদহ। লালবিহারী চক্রবর্তী, গোকর্ণ।

চার ভুল

অজিতকুমার ঘোষ, কলিকাতা। গোপীকেশ চক্রবর্তী, আরিয়াদহ। গোপীকা ঘোষ, বজবজ। দীলিপকুমার সেন, ভবানীপুর। দেবব্রত মজুমদার, কলিকাতা। ধ্রুব-রঞ্জন সরকার, হাওড়া। নিরঞ্জন রায়চৌধুরী, টাঙ্গাইল।

নির্ভুল সমাধান—পৌষ, ১৩৪৭

পঙ্কজমোহন সিদ্ধার্থকুমার রায়, কোতুলপুর। বিশ্বনাথ সেনগুপ্ত, চট্টগ্রাম। রণেন্দ্রনাথ ঘোষচৌধুরী, চন্দ্রভাগা। রথীন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, মৈমনসিংহ। রাধারমণ ধর, হুগলী। লালবিহারী চক্রবর্তী, গোকর্ণ। শঙ্করকুমার ভট্টাচার্য, আরিয়াদহ। সলিলকুমার ধর, জামালপুর।

পাঁচ ভুল

গীতাধর, জামালপুর। নিরঞ্জন রায়চৌধুরী, টাঙ্গাইল। পঙ্কজমোহন সিদ্ধার্থকুমার, কোতুলপুর। পাঁচুগোপাল বসু, বারাসাত।

ছয় ভুল

অরুণকুমার বাগচী, শ্রীরামপুর। ইন্দু বসু, কণেশ্বর। উদয়ভানু সিংহ, কলিকাতা। উমা বাগচী, রায়পুর, সিপি।

কণিকা মুখার্জি, গোবরুপুর। কাজি রাজিয়া খাতুন, ঢাকা। কৃষ্ণপদ চট্টোপাধ্যায়, আরিয়াদহ। গীতাধর, জামালপুর। গীতাধর, হুগলী। "ছয়ভুল", বজবজ। পবিত্রকুমার ভট্টাচার্য, হবিনাভি। পাঁচুগোপাল বসু, বারাসত। বিভাভূষণ লাইব্রেরী, চাংড়িপোতা। বিশ্বনাথ সেনগুপ্ত, চট্টগ্রাম। বৈদ্যনাথ শেঠ, বাঁশবেড়িয়া। মীরা ও বরুণ, শ্রীহট্ট। বিসড়া রয়েজ লাইব্রেরী, হুগলী। সলিলকুমার ধর, জামালপুর। সলিলা মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা। সুলেখা বসু, বালিগঞ্জ। স্বাহা দেবী রায়, কমলকাচনা।

সাত ভুল

অমলকুমার দত্ত ও কুমারী নীলিমা দত্ত, কলিকাতা। গীতা ও বাদল পালিত, আসানসোল। গীতাধর, হুগলী। বেলারানী দত্ত, রসপুর। মধুসূদন মণ্ডল ও চন্দ্রকুমার ঘোষ, বালী দেওয়ান গঞ্জ। মিনতি গঙ্গোপাধ্যায়, দেওবন্দ। মীরা ও বরুণ, সীলেট। বেণু সেনগুপ্তা, বরিশাল। শঙ্কর, মায়া, ইন্দু, সুমনা, গীতি, মতি, দীপু, চন্দন, চন্দনবাইসা। সৌরত সনাতনী, অমলনাব।

আট ভুল

অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়, আজমীর। অমিতাভ বসু, বনগ্রাম। অশোককুমার নন্দী, কলিকাতা। উমা বাগচী, রায়পুর, সি-পি। "কথাটা ছিল 'ভাষা', ছাপার ভুলে 'তাষা'—", মিএগ বাজার। কণিকা মুখার্জি, গোবরুপুর। কাজি রাজিয়া খাতুন, ঢাকা। কালিদাস সাহা, সাহাজাদপুর। কিষণ চাঁদ বর্মণ, ময়ূরমহল। পলীবসু, পটুয়াখালি। রেণু সেনগুপ্তা, বরিশাল। হেরম্ব মুখার্জি, অফ্ সিটি ক্লাব, দিল্লী। শিশিরকুমার সেনগুপ্ত, কলিকাতা। শৈলেন্দ্রকুমার রায়, কলিকাতা। সিদ্ধেশ্বর মিত্র, বালিগঞ্জ। সূর্যকুমার দাস, সাহাপুর।

নয় ভুল

আপটুডেট ক্লাব, রাণাঘাট। আবুল হোসেন মিঞা নীলটুলি। উমাশঙ্কর বসু, কলিকাতা। কালিদাস সাহা, সাহাজাদপুর। মিনতি দেবী ও শেফালিকা দেবী, কলিকাতা। হেনা রাহা, ররকাস্তা।

দশ ভুল

অনিলবরণ ঘোষ, দাবড়া। অমরলাল মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা। সমবোধ রাহা, শ্রীপুর।

এগার ভুল

"জনৈক গ্রাহক", সিমলাহিলস।

বারো ভুল

কালিদাস সাহা, সাহাজাদপুর। এম ফিরোজা খাতুন, জলপাইগুড়ি।

ডজন ভুলের উপরে যারা গেছেন তাঁদের পরদার আড়ালে থাকাই ভাল। শ-র

রচনা প্রতিযোগিতা

গতমাসের 'হাসির গল্প' প্রতিযোগিতায় যতগুলি গল্প পাওয়া গেছে তার মধ্যে আসাম নগাঁওর ইটাচালি নিবাসী শ্রীওয়াহেদ আলী মিয়ার (গ্রাহক নং ৩৩০৪) রচনাটিই পুরস্কার যোগ্য বলে গণ্য হয়েছে। আগামী মাসের পাঠশালায় রচনাটি প্রকাশিত হবে।

আগামী মাসে পাঠশালার গ্রাহক গ্রাহিকাদের নিম্নলিখিত বিষয়ে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ রচনা করে পাঠাতে অনুরোধ করছি—

অহিংসা ধর্ম-পালনের দ্বারা জগতের শান্তি ও ভারতের মুক্তিলাভ সম্ভব কি না এবং বহিশত্রুর আক্রমণ থেকে স্বদেশ রক্ষা করা সম্ভব কি না? মহাত্মা গান্ধীর পূর্বে আর কোন কোন মহাপুরুষ নিখিল মানবের হিতার্থে ও জগতের শান্তিকামনায় অহিংসাধর্ম প্রচার করেছিলেন এবং তার পরিণাম কি হয়েছে।

১। কলিকাতার কুমারী নীলিমা মুখার্জির প্রশ্নের উত্তরে বালিগঞ্জের শ্রীমান অসীম রাহা জানিয়েছেন :—

সেক্‌সপিয়রের নাটকে কতগুলি লাইন কথা এবং চরিত্র আছে তা গুণে দেখার কোনো সার্থকতা নেই। তাঁর শেষ রচিত নাটকটি হচ্ছে Henry VIII সবচেয়ে বড় নাটক Othelo, এবং সম্ভবত সব ছোট নাটক Cymbeline.

মুগকল্যাণের শ্রীমান মধু ঘোষাল জানিয়েছেন :—

সেক্‌সপিয়রের রচিত সমস্ত নাটকে মোট ১,১১৯৮৪ লাইন আছে। তাঁর সবচেয়ে বড় নাটক Hamlet এবং সবচেয়ে ছোট নাটক Henry V তার শেষ রচনা Tempest.

আর কেউ এ প্রশ্নটির উত্তর দেবার চেষ্টা করেন নি।

২। দিল্লীর শ্রীমান সুনীলচন্দ্র ঘোষের প্রশ্নের উত্তরে ঢাকার রাজিয়া খাতুন ও টাবির শ্রীমতী 'রাত্রি' জানিয়েছেন :—

এভারেস্টের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ২৯০০২ ফুট। ২৯০০২ ফুট ভিন্ন অপর সকল সংখ্যাই পরিত্যাজ্য। ১৮৪৯ খৃস্টাব্দে মির্জাপুর, ঝিবোল প্রভৃতি ছয়টি বিভিন্ন স্থান থেকে প্রাপ্ত পরিমাপ ফলগুলি সংশোধন ও সমাধান কোরে ১৮৫২ খৃস্টাব্দে ৺রাধানাথ শিকদার ও তদানীন্তন সার্ভেয়ার জেনারেল কর্নেল এভারেস্ট, যাঁর নামে হিমালয় চূড়ার নামকরণ হয়েছিল, তাঁদের হিসাবে ২৯০০২ ফুট (গড়) পাওয়া যায়। এ যাবৎ এই সংখ্যাটিকেই ভারতীয় জরীপ বিভাগ এভারেস্টের জন্য ব্যবহার করে আসছেন। অধুনা বহু বিশিষ্ট বিদেশী ভৌগলিক এভারেস্টের উচ্চতা ২৯১৪০ ফুট নির্দেশ করেন এবং তাঁদের দেখাদেখি আমাদের দেশের অনেক ভৌগলিকও এই সংখ্যা গ্রহণ করছেন ; কিন্তু এই সংখ্যাটি সম্পূর্ণ তাঁদের মন-গড়া। অবশ্য ১৯০৪-০৫ খৃস্টাব্দে জরীপ বিভাগের কর্নেল সার সিড্‌নে বারার্ড ১৮৪৯ খৃস্টাব্দের পর্যবেক্ষণ ফলকে সংশোধন করবার জন্য ০.০০৬৪৫ সংখ্যা (co-efficient) ধরে ২৯১৪১ ফুট পান, কিন্তু তিনি বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে তাঁর নির্ধারিত সংখ্যাকে নিজেই পরিত্যাগ করেন। এযাবৎ এভারেস্টের জন্য ২৮৯৯৪, ২৮৯৯৫, ২৯০০০, ২৯০০৩, ২৯১৪০, ২৯১৪১, ২৯১৪৫ এবং ২৯০৫০ (± ১৫) প্রভৃতি সংখ্যা ব্যবহৃত হয়েছে অথবা এখনও হচ্ছে। কি কারণে ২৯০০২ ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা গ্রহণ করা সমীচীন নয় তা আলোচনা করবার স্থান এ নয়। গত অভিযানগুলির সময়ে উচ্চতা সম্বন্ধে মতভেদ হওয়ায় খুব তর্ক-বিতর্ক হয়। পরিশেষে স্থির হয় যে—The official hieght is 29002 ft

এভারেস্টের চূড়ার উপর বিমান নিয়ে নামা সম্ভব নয়। লর্ড ক্লাইডেস্‌ডেল বিমানে এভারেস্ট ছাড়িয়ে আরও এক হাজার ফুট উঁচুতে উঠেছিলেন। তারপর ধীরে ধীরে নেমে বিমানখানিকে এভারেস্টের এক চুল উপর দিয়ে নিয়ে যান। তিনি লিখছেন—Just a hair's breadth over the menacing summit

৩। ঢাকার কুমারী রেবা ভদ্রের প্রশ্নের উত্তরে লঙ্গাইয়ের শ্রীমান নবনীকুমার চৌধুরী, বালিগঞ্জের শ্রীমান অসীম রাহা, চট্টগ্রামের শ্রীমান বিশ্বনাথ সেনগুপ্ত, চন্দ্রভাগের শ্রীমান রণেন্দ্রনাথ ঘোষ চৌধুরী, মুগকল্যাণের শ্রীমান মধু ঘোষাল ও ররহামগঞ্জের কুমারী গায়ত্রী দেবী জানিয়েছেন :—

বাংলার সর্বপ্রথম মহিলা কবি—'৺দেবী চন্দ্রাবতী' ইনি ময়মনসিংহের দ্বিজ বংশীদাসের (৺বংশীবদন চক্রবর্তীর) কন্যা। এঁর রচিত 'রামায়ণ' অতি সুলিখিত কাব্য। প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের বিশেষ সম্পদরূপে গণ্য।

শ্রীহট্টের কুমারী মীরা দাস, ঢাকার রাজিয়া খাতুন ও কলিকাতার কুমারী নীলিমাদেবী মুখোপাধ্যায়ের মতে চণ্ডীদাস খ্যাত রাগী বা রামমণিই বাংলার সর্বপ্রথম মহিলা কবি। নীলিমাদেবী আরও বলেন রামমণিকে যদি বাঙলী মহিলা বলে স্বীকার না করা হয় তাহলে নীলাচল বাসিনী শ্রীগৌরাঙ্গের অনুরাগিনী ভক্ত সাধিকা মাধবী দেবী র নাম উল্লেখযোগ্য।

*৪। চট্টগ্রামের শ্রীমান বিশ্বনাথ সেনগুপ্তের প্রশ্নের উত্তরে, কলিকাতার নীলিমাদেবী ও অরুণলাল মুখোপাধ্যায়, ঢাকার রাজিয়া খাতুন এবং বালিগঞ্জের শ্রীমান অসীম রাহা জানিয়েছেন—

৺শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পর বাংলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি বীরভূম লাভপুরের অধিবাসী। এঁর রচিত 'জলসাঘর', 'পাষাণ পুরী', চৈতালী ঘূর্ণী', 'আগুন', 'ছলনাময়ী', 'রাইকমল', 'রসকলি', নীলকণ্ঠ, 'ধাত্রীদেবতা', 'কালিন্দী' প্রভৃতি গল্প ও উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের সম্পদ ও গৌরব বৃদ্ধি করেছে।

কলিকাতার শশাঙ্কশেখর বসু, ফরিদপুরের আবুল হোসেন মিঞা, বারুইপুরের কুমারী সাধনা বসু এবং লঙ্গাইয়ের নবীনকুমার চৌধুরীর মতে শরৎচন্দ্রের পর বাংলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক 'পথের পাঁচালী','অপরাজিত','আরণ্যক' প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁর রচিত গল্প ও উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে এক অপূর্ব রসধারা প্রবাহিত করেছে।

কলিকাতার শ্রীমান অজিতকুমার ঘোষ, হাওড়ার ধ্রুবরঞ্জন সরকার ও মৃগকল্যাণের শ্রীমান মধু ঘোষালের মতে শরৎচন্দ্রের পর বাংলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক 'মহা-প্রস্থানের পথে', 'অবিকল', 'অরণ্যপথ', 'কলরব', 'কাজল-লতা', 'নিশিপদ্ম', 'দেশ দেশান্তর' প্রভৃতি গল্প, উপন্যাস ও ভ্রমণ কাহিনী রচয়িতা শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার সান্যাল।

ববহাম গঞ্জের কুমারী গায়ত্রী দেবীর মতে শরৎচন্দ্রের পর বাংলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম-এ, ডি-এল,। এঁর রচিত 'শুভা', 'পাপের ছাপ', 'অভয়ের বিয়ে', 'খেয়ালের খেসারত', 'পিছল পথের শেষে', তরুণী ভার্যা' প্রভৃতি গল্প ও উপন্যাস সাহিত্য ক্ষেত্রে সর্বজন সমাদৃত।

৫। রাণাঘাটের কুমারী উমা পাল চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তরে বালিগঞ্জের শ্রীমান অসীম রাহা, কলিকাতার কুমারী নীলিমা দেবী মুখোপাধ্যায় চট্টগ্রামের বিশ্বনাথ সেনগুপ্ত, কলিকাতার উদয়ভানু সিংহ, মৃগকল্যাণের মধু ঘোষাল, ঢাকার রাজিয়া খাতুন এবং ফরিদপুরের আবুলহোসেন মিঞা জানিয়েছেন—

শিশুসাহিত্যে বাংলা ভাষায় নিম্নলিখিত মাসিক ও সাপ্তাহিকগুলি ছিল, কিন্তু যুদ্ধের বাজারে এর মধ্যে * চিহ্নিত গুলি লোপ পাইয়াছে।

	মাসিক পত্রিকার নাম	সম্পাদক	ঠিকানা	বার্ষিক মূল্য
১	পাঠশালা	নরেন্দ্রদেব	৩০, কর্ণওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা	৩৲
২	কৈশোরক	শ্রীযোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত	পি, ৬৫১এ মহানির্বাণ রোড, কলিকাতা	৩৲
৩.	মৌচাক	শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার	১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলি:	২॥৵০
৪	রামধনু	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য	১৬, টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর	২॥৵০
৫.	জলছবি *	৺রাধাচরণ চক্রবর্তী	২৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা	২॥৵০
৬.	কৈশোরিকা *	শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়	৩২, আপার সার্কুলার রোড, কলি:	২॥০
৭.	রূপকথা	শ্রীরবিরঞ্জন মিত্র মজুমদার	১০৫, রসা রোড, সাদার্ন এভেনিউ, কলি:	২॥০
৮.	শিশু সওগাত	মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন	১১, ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট, কলি:	২।০
৯	মুকুল	শ্রীবাসন্তী চক্রবর্তী	২৯৪নং দর্গারোড, পার্ক সার্কাস, কলি:	২৲
১০	ভাইবোন	শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু	৭, রাজা বাগান ষ্ট্রীট, কলি:	২৲
১১	রঙমশাল	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	৬১, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলি:	২৲
১২	গুলবাগিচা	আব্দুল ওহাব সিদ্দিকী	৩৬, আপার সার্কুলার রোড, কলি:	২৲
১৩.	শিশু সাথী	শ্রীআশুতোষ ধর	৫, কলেজ স্কোয়ার, কলি:	১৸০
১৪.	মাস পয়লা	শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য	১১৪।১এ, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলি:	১।০

. এই প্রশ্নের উত্তরে বিভিন্ন মত প্রকাশ হওয়ায় আমরা এর মীমাংসার জন্য পুনরায় 'ভোট' দেবার ব্যবস্থা করলুম। 'শব্দ-সন্ধান কুপনের পিছনে ভোটের ফর্ম দেওয়া হ'ল, যার যা অভিমত জানিয়ে সই করে ১০ই তারিখের মধ্যে পাঠাবে।

মাসিক পত্রিকার নাম		সম্পাদক	ঠিকানা	বার্ষিক মূল্য
১৫.	শিখা	শ্রীবিজনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়	১২নং রামচন্দ্র মৈত্র লেন, কলিঃ	১৷৷০
১৬.	অঙ্কুর	শ্রী পি, এন, দাশ, এম-এ	১৪০, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিঃ	১৷৵০
১৭.	কচিকথা	শ্রীঅনিলচন্দ্র চক্রবর্তী	অনাথেশ্বর ইস্কুল, কৃষ্ণনগর, নদীয়া	১৷৷০
১৮	নব ভারতী	শ্রীজগদীশ ঘোষ ও অনিল ঘোষ—	ঢাকা	১৷৷০
১৯.	রবিবার (সাপ্তাহিক)	শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য	১১৪।১এ, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা *	
২০	মাছরাঙা	শ্রীবমেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী	২৯।৩, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা	১৷৷০

এই পত্রিকাগুলির মধ্যে সর্ব বিষয়ে বিবেচনা করিলে এবং নিরপেক্ষ সমালোচনা করিলে পাঠশালাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলা যায়।

৬। ঢাকার শ্রীমান নীতিশরঞ্জনদের প্রশ্নের উত্তরে জনৈক গ্রাহক জানিয়েছেন এ প্রশ্ন তিনি পাঠশালায় না পাঠিয়ে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের এডুকেশন ডিপার্টমেণ্টে লিখুন, অথবা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে লিখুন তাঁরা বলতে পারবেন বাংলাদেশের কোন হাই ইংলিশ স্কুলে সর্বাপেক্ষা অধিক ছাত্র এবং উক্ত স্কুলের ছাত্র সংখ্যা কত? কুঃ নীলিমা দেবী জানিয়েছেন—রিপণ কলিজিয়েট স্কুল, ছাত্র সংখ্যা ১৫০০-১৮০০।

৭। আহমদপুরের শ্রীমান অশ্বিনীকুমার মণ্ডলের প্রশ্নের উত্তরে যাদবপুরের শ্রীমান অনিলবরণ মহান্তি জানিয়েছেন—

পৃথিবীর বৃহত্তম নগর লণ্ডন। ঐ নামে দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপে এবং উত্তর আমেরিকার নিউ অর্লীন্‌স্ প্রদেশে আরও দুইটি শহর আছে।

কুমারী নীলিমা দেবী মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন ঐ নামে ক্যানাডার অণ্টারিও প্রদেশে ও যুক্তরাজ্যের লরেল প্রদেশে নগর আছে, স্কটল্যাণ্ডে অর্কনে দ্বীপে ও যুক্তরাজ্যের মোডসন প্রদেশে, ঐ নামে গ্রাম আছে ও চিলীতে ঐ নামে দ্বীপ আছে।

৮। যশোহরের শ্রীমান আভাসং দাসগুপ্তের প্রশ্নের উত্তরে মজঃফরপুরের কুমারী মঞ্জু দত্ত গুপ্তা, পটুয়াটুলির কুমারী পপী বসু, ঢাকার বাজিয়া খাতুন, দাবড়ার শ্রীমান অনিলবরণ ঘোষ, বর্ধমানের শ্রীকিষণ চাঁদ বর্মণ, রায়পুর সি-পির শ্রীউমা বাগচী, চন্দ্রভাগের রণেন্দ্র চৌধুরী, মুগকল্যাণের মধু ঘোষাল, চট্টগ্রামের বিশ্বনাথ সেন গুপ্ত, এবং বালিগঞ্জের অসীম বাহা জানিয়েছেন—

নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্করের পূর্বপুরুষগণের আদি নিবাস যশোহর জিলায় কালিয়া গ্রামে, কিন্তু তিনি জন্মে ছিলেন রাজপুতানায় উদয়পুরে। তাঁর পিতার নাম শ্যামশঙ্কর চৌধুরী, মাতা শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবী, ইনি জমিদার শ্রীযুক্ত অভয় চরণ চক্রবর্তীর কন্যা।

৯। লক্ষ্ণৌয়ের আভারাণী ও প্রমথনাথের প্রশ্নের উত্তরে, দাবড়ার অনিলবরণ ঘোষ, চন্দ্রভাগের রণেন্দ্র চৌধুরী, মুগকল্যাণের মধু ঘোষাল, কলিকাতার নীলিমা দেবী, অজিত ঘোষ, যাদবপুরের অনিলবরণ মহান্তি, ঢাকার বাজিয়া খাতুন এবং কলিকাতার উদয়ভানু সিংহ জানিয়েছেন—

আমাদের সমস্ত শরীর ব্যাপী লূতাতন্তুর আকারে অসংখ্য স্নায়ুজাল বিস্তৃত আছে। সেগুলি মাঝে মাঝে কূট গ্রন্থির (Glands) দ্বারা সংযোজিত। তাকে Nervous System বলে। দেহের যেখানে যে কাজই (Action) হোক সকলই এই Nervous System দ্বারা অনুষ্ঠিত ও পরিচালিত।

মনে কোনোরূপ উত্তেজনা বা দেহে আঘাতের সৃষ্টি হ'লে ঐ স্নায়বিক ক্রিয়ার ফলে মস্তিষ্কে (Brain) সংবাদ পৌঁছয় এবং সেখান থেকে কাজ করবার আজ্ঞা আসে শরীরের বিভিন্ন গ্রন্থির উপর (Gland)—যাকে যে কাজটি করতে হবে। Brain থেকে যে আজ্ঞা আসে তাকে efferent বা motor nerve impulse বলে, আর দেহতন্ত্র হ'তে ব্রেণের অভিমুখে যে nerve impulse যায় তাকে বলে afferent বা Sensory nerve impulse

যখনই মনে ব্যথা বা দুঃখের কারণ ঘটে বা শারীরিক আঘাত পাই—তখনই sensory nerve—গুলি উত্তেজিত হয় (irritated) এবং Brainএ সংবাদ দেয়। সঙ্গে সঙ্গে Brain থেকে Sympathetic Nerveএর দ্বারা আদেশ আসে 'উৎসরণ-গ্রন্থি' Lacrymal Glandএর উপর রস-স্রাবের জন্যে। তখনই Lacrymal Glandটি Stimulated হয় এবং রস-স্রাব করে (Secretion)। এই glandটি থাকে চোখের পশ্চাতে উপরদিকে। নাকের দিকে চোখের কোনে ক্ষুদ্র একটি চুলের মত ছিদ্র আছে—সেটিকে অশ্রুপথ (Lacrymal বা Tear Duct) বলে। Stimulated Glandটির রস ঐ Lacrymal Duct দিয়ে এসে চোখের বাহির অংশটি ভরে তোলে। এই কারণেই আমাদের চোখ দিয়ে জল পড়ে। ঐ রসটিকেই

বলে অশ্রু, আর এই Glandটি রসোৎসাবিনী বা অশ্রু-সৃজনী গ্রন্থি বলে অভিহিত।

১০। হুগলীর শ্রীমান অনিলবরণ ঘোষের প্রশ্নের উত্তরে সাহজাদপুরের কলিদাস সাহা, রায়পুর সিপির উমা বাগচী, কলিকাতার শশাঙ্ক শেখর বসু, রাণাঘাটের উমাপাল চৌধুরী, কলিকাতার অজিত ঘোষ, বালিগঞ্জের অসীম রাহা, কলিকাতার নীলিমা দেবী, যুগকল্যাণের মধু ঘোষাল, মজঃফরপুরের কুমারী মঞ্জু দত্ত গুপ্তা, এবং ফরিদপুরের আবুলহোসেন মিঞা জানিয়েছেন—

অন্ধ ও বধিরকে প্রকৃতিই চালিত করেন মানুষকে উপলক্ষ করে।

১১। যুগকল্যাণের শ্রীমান মধু ঘোষালের প্রশ্নের উত্তরে—মজঃফরপুরের কুমারী মঞ্জু দত্ত গুপ্তা, চট্টগ্রামের বিশ্বনাথ সেন গুপ্ত, কলিকাতার নীলিমা দেবী, চন্দ্রভাগের রণেন্দ্র চৌধুরী, দাবড়ার অনিলবরণ ঘোষ, বালিগঞ্জের অসীম রাহা, যাদবপুরের অনিলবরণ মহান্তি, রাণাঘাটের উমাপাল চৌধুরী, কলিকাতার শশাঙ্কশেখর বসু এবং সাহাজাদ পুরের কালিদাস সাহা জানিয়াছেন—

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনী প্রত্যেক প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র অনেকেই আগে থেকে সংগ্রহ করে রাখেন এবং তাঁর চিত্রও সংগ্রহ করে রাখেন। সুতরাং টেলিফোনে বা টেলিগ্রামে কোনো খ্যাতনামা প্রসিদ্ধ ব্যক্তির মৃত্যু সংবাদ পাবা মাত্র তাঁরা রাতারাতি খবরের কাগজে তাঁর জীবনী ও চিত্র ছাপিয়ে বার কর করতে পারেন।

১২। কলিকাতার পৃথ্বীশচন্দ্র সেনের প্রশ্নের উত্তরে সাহাজাদপুরের কালিদাস সাহা, বরহমগঞ্জের কুমারী গায়ত্রী দেবী, ঢাকার কুমারী বেবা ভদ্র ও রাজিয়া খাতুন, রায়পুর সিপির উমা বাগচী, কলিকাতার উদয়ভাণু সিংহ, যাদবপুরের অনিলবরণ মহান্তি, শ্রীমান অশোককুমার নন্দী, কলিকাতার অজিত ঘোষ, বালিগঞ্জের অসীম রাহা, দাবড়ার অনিলবরণ ঘোষ, চন্দ্রভাগের রণেন্দ্র চৌধুরী, কলিকাতার নীলিমা দেবী মুখার্জি, চট্টগ্রামের বিশ্বনাথ সেন গুপ্ত, পটুয়াটুলির পপী বসু, মজঃফরপুরের মঞ্জু দত্ত গুপ্তা, যুগকল্যাণের মধু ঘোষাল, ফরিদপুরের আবুল হোসেন মিঞা, এবং কুষ্টিয়ার শ্রীমান অনিলকুমার সাহা জানিয়েছেন—

বিগত মহাযুদ্ধের পর সমস্ত মানবজাতি স্থায়ী শান্তির জন্য উদ্‌গ্রীব হয়। মহাযুদ্ধের অবসান হইলে চারিদিকে নূতন নূতন সমস্যা দেখা দিল। ১৯১৯ সালে ভার্সায়ের সন্ধিপত্রে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইলসনের উদ্যমে "লীগ্ অফ্ নেশন" সংগঠনের প্রস্তাব স্বাক্ষরিত হয়। যুদ্ধ শান্তির পর নবসৃষ্টরাজ্য সমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, মিত্র-শক্তিগুলির ভিতরে পরাধিকৃত রাজ্যসমূহের বণ্টন প্রভৃতি বিবদপ্রশ্ন সমাধানের জন্যও ইহার সৃষ্টি হয়। ভবিষ্যতে যাহাতে আর যুদ্ধবিগ্রহের পুনরাভিনয় না হয়, ছোট রাজ্য সমূহের স্বাধীনতার যেন অপমান না হয়, বিশ্বের সমস্ত জাতির ভিতরে যাহাতে সদ্ভাব ও প্রীতির বন্ধন স্থাপিত হয়, এইসকল উদ্দেশ্য লইয়া লীগ অফ্ নেশন স্থাপিত হয়। ইহার গৌণ উদ্দেশ্য ছিল শ্রমজীবিগণের উন্নতি সাধন ও বিভিন্ন দেশের স্বাস্থ্যের উৎকর্ষ বিধান। ইহার প্রধান অঙ্গ তিনটি:—(১) অ্যাসেম্‌ব্লি, (২) কাউন্সিল, (৩) আন্তর্জাতিক বিচার সভা। ১৯২৭ সালে "লীগ্ অফ্ নেশনে সভ্যসংখ্যা ছিল ৫৬। যদিও উইলসন ইহার প্রতিষ্ঠাতা তথাপি আমেরিকা ইহতে যোগ দেয় নাই। ইহার সদস্য হইলে সম্মিলনের অন্তর্গত সকল রাজ্যই অন্যান্য রাজ্যের সহিত সমপদবর্তী। ভারতবর্ষও ইহার সদস্য। বর্তমান কালে ইহা এক ছলনাময় চাতুরীতে পরিণত হইয়াছে। নিরীহ আবিসিনিয়ানদের ইতালী কর্তৃক স্বাধীনতা হরণ এবং নিরপরাধ চীনাদের উপর জাপানীদের অমানুষিক অত্যাচার ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। "লীগ অফ্ নেশনের" শক্তি থাকিলে বর্তমানে জার্মানী পৃথিবীতে যে অশান্তির অনল প্রজ্বলিত করিয়াছে তাহার প্রতিকার হইত। ইহার অস্তিত্ব উপস্থিত না থাকারই মধ্যে।

১৩। কলিকাতার উদয়ভানু সিংহের প্রশ্নের উত্তরে কলিকাতার নীলিমা দেবী, চন্দ্রভাগের রণেন্দ্র ঘোষ চৌধুরী, যাদবপুরের অনিলবরণ মহান্তি এবং কলিকাতার শশাঙ্ক-শেখর বসু জানিয়েছেন—

দরজা বন্ধ করা বা খোলার সময় গৃহাভ্যন্তরস্থ বায়ুমণ্ডল আহত হওয়ার ফলে তরঙ্গ উঠে এবং ঐ তরঙ্গ বিপরীত দিকের দরজায় ধাক্কা খাইয়া বাহির হইতে না পারায় শব্দ করিয়া উঠে এবং শব্দের বেগে দরজা জানালা কাঁপিয়া উঠে। উহা সেই 'ভাইব্রেশান' বা কম্পনের শব্দ। শব্দের বেগ সেকেণ্ডে ১১০০ ফিট। ঘরখানি যদি ৫৫০ ফিটের বেশী লম্বা না হয়, তাহা হইলেই এরূপ শব্দ শোনা যায়। নচেৎ এক সেকেণ্ডের মধ্যেই সে ঘরে প্রতিধ্বনি উঠে এবং দরজা জানালার কোনো শব্দ শোনা যায় না।

১৪। নদীপুরের সুশীলকুমার সেনের প্রশ্নের উত্তরে মজঃফরপুরের কুমারী মঞ্জু দত্ত গুপ্তা, কলিকাতার নীলিমা দেবী, যুগকল্যাণের মধু ঘোষাল, বরহমগঞ্জের কুমারী গায়ত্রী দেবী, রাণাঘাটের কুমারী উমা পাল চৌধুরী, অমলনাথ সৌরভ সনাতনি, বালিগঞ্জের অসীম রাহা, দাবড়ার অনিলবরণ ঘোষ জানিয়েছেন—

আমরা মিথ্যা কথা বলি নিজের সুবিধার জন্য, আত্ম-রক্ষার্থে, ইষ্টসিদ্ধির আশায়, লোক ঠকাইবার জন্য, সত্য গোপন করিতে, স্বার্থ সাধনায়, স্বভাবের দোষ, তিরস্কারের ভয়ে, দোষ ঢাকিতে, স্বকর্ম উদ্ধারের চেষ্টায়, লোকের নিন্দা করিতে, কাহাকেও জব্দ করিবার জন্য, প্রতিশোধ

লইতে বা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে, দায় এড়াইতে ও কাজে ফাঁকি দিতে। মিথ্যা কথা বলা অভ্যাস হইয়া গেলে অনেকে অকারণেও মিথ্যা কথা বলে।

১৫। সিমলা শৈলের পীযুষকান্তি সেনের প্রশ্নের উত্তরে কলিকাতার নীলিমা দেবী জানিয়েছেন—

"৩১শে মার্চ মঙ্গলবার বেলা ১২টা" ১৯৩১ অথবা ১৯৩৬ সালের কথা। বায়পুর সি, পির উমা বাগচী জানিয়েছেন—১৯৩৬ সালের কথা। মুগকল্যাণের মধু ঘোষাল জানিয়েছেন ১৯৩১ সালের কথা। পাহাড়তলীর শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাস ও ফণীন্দ্রনাথ দাস জানিয়েছেন—১৯৩৬ সালের কথা।

কিন্তু, আসল ব্যাপারটি যে ঘটেছিল ১৯১৪ সালে শ্রীমান পীযুষকান্তি নিজেই সেটা আবিষ্কার করেছেন।

১৬। রামপুরহাটের পার্বতীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের প্রশ্নের উত্তরে কলিকাতার নীলিমা দেবী, মজঃফরপুরের মঞ্জু দত্ত গুপ্তা, দাবড়ার অনিলবরণ ঘোষ, বালিগঞ্জের অসীম বাহা, পাহাড়তলীর অরবিন্দ বিশ্বাস ও শ্রীহট্টের অঞ্জলি পাল, শ্রীমান দালিপ সেন, শ্রীমান অশোককুমার নন্দী, ঢাকার রেবা ভদ্র, যাদবপুরের অনিলবরণ মহান্তি এবং মুগকল্যাণের মধু ঘোষাল জানিয়েছেন—

ইংরাজীতে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য প্রথম বাঙ্গালী যিনি উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলেন তিনি যুগ প্রবর্তক মহাপুরুষ প্রাতঃস্মরণীয় রাজা রামমোহন রায়।

ফাল্গুনের প্রশ্ন

(উত্তর ১০ই ফাল্গুনের মধ্যে দিতে হবে)

১। রণেন্দ্রনাথ ঘোষচৌধুরী, চন্দ্রভাগা।
বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে সাহিত্যক্ষেত্রে মূলগত পার্থক্য কোথায় ?

২। সৌরভ সনাতনি, অমলনার।
কোনদেশীয় কুকুর সব চেয়ে ভাল ?

৩। অরবিন্দ দাস ও ফণীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, পাহাড়তলী।
কয়লা হইতে কি কি জিনিস উৎপন্ন হয় ?

৪। অঞ্জলি পাল, শ্রীহট্ট।
পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ 'ডিটেকটিভ্' (গোয়েন্দা) কে, কোথায় করে জন্মেছেন ?

৫। নবনীকুমার চৌধুরী, লঙ্গাই।
'বাংলা সাহিত্য পরিচয়' পাঠশালায় কোন মাস থেকে আরম্ভ হয়েছে ?

৬। মঞ্জু দত্তগুপ্তা, মজঃফরপুর।
বিদ্যুৎ চমকাইবার ঠিক কতক্ষণ পরে মেঘ গর্জন হয় ?

৭। রেবা ভদ্র, ঢাকা।
ফটোগ্রাফি প্রথম কে আবিষ্কার করেন ?

৮। সাধনা বসু, বারুইপুর।
কোনো লোভনীয় খাদ্যদ্রব্য সম্মুখে দেখিলে জিহ্বা সরস হইয়া উঠে কেন ?

৯। কিষণচাঁদ বর্মণ, বর্ধমান।
সর্বপ্রথম বাইসিকেল আবিষ্কার করেন কে এবং কত খৃষ্টাব্দে ?

১০। অসীম বাহা, বালিগঞ্জ।
২৬শে জানুয়ারী ভারতবর্ষে স্বাধীনতা দিবস পালন হয় কেন ? ইহার প্রকৃত অর্থ কি ?

১১। মৃণালকান্তি গুপ্ত, কলিকাতা।
পৃথিবীর কোন কোন জাতির কি কি জাতীয় চিহ্ন ?

১২। মিনতি গঙ্গোপাধ্যায়, দেওবন্দ।
মুসোলিনী, রুজভেল্ট, স্ট্যালিন, হিটলার, এদের মধ্যে তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও চতুর অধিকতর কে ?

১৩। এম ফিরোজা খাতুন, জলপাইগুড়ি।
কাজী নজরুল ইসলাম কি কি বই লিখেছেন, কোথায় পাওয়া যায় এবং প্রত্যেকখানির দাম কত ?

১৪। কাজি রাজিয়া খাতুন, ঢাকা।
শব্দ সন্ধানের উত্তরে বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন বানান না পূর্ব প্রচলিত বানান অনুসরণ করিব এবং কোন অভিধান খানিকে প্রমাণ্য বলিয়া গণ্য করিব ?

১৫। মীরা দাস, শ্রীহট্ট।
বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম মাসিক পত্রিকা কি, সম্পাদক কে, এবং কবে প্রকাশিত হয় ?

১৬। কুমারী পাপী বসু, পটুয়াটুলি।
কংগ্রেসের সর্বময় কর্তা গান্ধীজী কংগ্রেসের চারি আনার সদস্যও নহেন কেন ?

১৭। কুমারী হেনা রাহা, ত্রিপুরা।
বাংলাদেশে তথা ভারতে কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরই কাহার স্থান ?

১৮। আবুল হোসেন মিঞা, ফরিদপুর।
ব্যাঙ্গালোর হইতে প্রকাশিত 'Treasure chest' ছাড়া ভারতবর্ষে ছোটদের জন্য আর কোনও ইংরাজি মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকা

আছে কিনা, উহার নাম ঠিকানা ও বার্ষিক চাঁদার হার কি ?

১৯। শ্রীমান অনিলবরণ ঘোষ, দাবড়া।
প্রেম বড় না কর্তব্য বড় ?

২০। ধ্রুবরঞ্জন সরকার, হাওড়া।
বাঙলায় কোনো বিজ্ঞানের পত্রিকা আছে কিনা, তার নাম ঠিকানা ও বার্ষিক চাঁদা কত ?

২১। শৈলেন্দ্রকুমার রায়, কলিকাতা।
বাংলার পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে কোন বই খানির সবচেয়ে বেশী সংস্করণ হয়েছে, শেষ সংস্করণটি কত সংখ্যক, এবং উহার গ্রন্থকার কে ?

২২। অজিতকুমার ঘোষ, কলিকাতা।
বর্তমানে শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক কে এবং তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী কি ?

২৩। উদয়ভানু সিংহ, কলিকাতা।
সর্বপ্রথম ভারতীয় F. R. S. কে এবং বর্তমানে ভারতীয়দের মধ্যে কজন F. R. S. আছেন ?

২৪। অশোককুমার নন্দী।
আমাদের সাহিত্যজগতে বঙ্কিমচন্দ্র বড় না শরৎ চন্দ্র বড় ?

২৫। অনিল বরণ মহান্তি, যাদবপুর।
ভারতবর্ষে কোথায় ছুঁচ তৈয়ার হয়, যদি এখানে কোথাও না হয় তবে কেন হয় না ?

২৬। উমা পাল চৌধুরী, রাণাঘাট।
উচ্চশিক্ষিত বলতে কী বুঝব ? ম্যাট্রিক পাশ না বি-এ, এম-এ পাশ না বিলাতী ডিগ্রীধারীরাই উচ্চ শিক্ষিত ?

পত্রী-মৈত্রী (Pen-Friend)

নিম্নলিখিত গ্রাহক গ্রাহিকারা পত্রযোগে পরস্পরের সঙ্গে আলাপ পরিচয় ও বন্ধুত্ব স্থাপন করতে ইচ্ছুক :—

কুমারী উমারাণী পালচৌধুরী, C/o K C Pal Choudhury, রাণাঘাট, নদীয়া। শ্রীঅসীম বাহা, বালিগঞ্জ, কলিকাতা। শ্রীঅশ্বিনীকুমার মণ্ডল, আহমদপুর। কুমারী গায়ত্রী দেবী, C/o M K Banerji Choudhuri, বাবহামগঞ্জ, ফরিদপুর। শ্রীধ্রুবরঞ্জন সরকার, ২৯ নীলমণি মল্লিক লেন, হাওড়া। কাজী রাজিয়া খাতুন, ঢাকা।
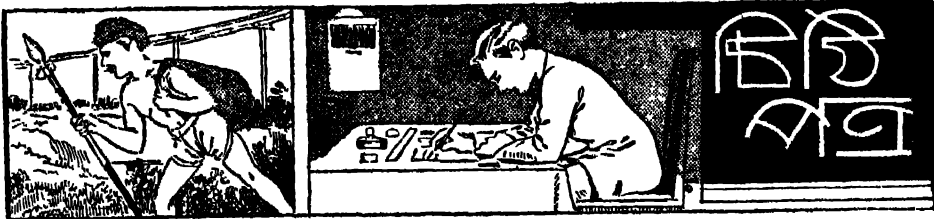
আবুল হোসেন মিঞা, ফরিদপুর

তোমার গতমাসের প্রশ্ন এবং অক্ষর ক্রীড়ার উত্তর ১৫ই তারিখের মধ্যে পাওয়া যায় নি বলে পাঠশালায় প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।

ধ্রুবরঞ্জন সরকার, হাওড়া

তুমি 'প্রশ্নোত্তর' বিভাগে পাঁচটি প্রশ্ন পাঠিয়েছিলে, কিন্তু পাঠশালার নিয়ম অনুসারে কোনো গ্রাহকের কোনো মাসে একটির বেশী প্রশ্ন করবার অধিকার নেই। তাই তোমার কেবলমাত্র প্রথম প্রশ্নটি ছাপা হয়েছে।

নবনীকুমার চৌধুরী, লজাই

তোমার পত্রের উত্তরে জানাচ্ছি যে 'বনমানুষ' থেকেই মানুষের উৎপত্তি, বানরকেও এই হিসাবে মানুষের পূর্বপুরুষ বলতে পারো। জীবজগতের এই ধারা সৃষ্টির ক্রমপরিণতির সঙ্গে অনাদিকাল থেকে চলে আসছে এবং এখনও চলছে। এখন আর হয় না এরকম একটা ধারণা তোমার কোথা থেকে হ'ল ? 'ছাপার ভুল' পাঠশালায় থেকে যাচ্ছে স্বীকার করি। ভুল সংশোধন করতেও চেষ্টার ত্রুটী হয় না কিন্তু তবুও হয় বলেই বিশিষ্ট লোকেরা একে 'ছাপাখানার ভূতের উপদ্রব' বলেন। বারাণসীর অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় অসুস্থ হয়ে পড়ায় 'ইতিহাসের ধারা' আর লিখতে পারেন নি এবং ভবিষ্যতেও আর হয়ত পারবেন না ব'লেই জানিয়েছেন। 'বিদ্যুৎ' লেখক মনোরঞ্জন বাবু "কলিকাতা বিদ্যুৎ সরবরাহ কোম্পানী"র কাজে উপস্থিত এত বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন যে তাঁর আর কলম ধরবার সময় নেই। 'বাংলার পণ্য' অবশ্য আবার প্রকাশ হবে।

'মানুষের পূর্বপুরুষ' শেষ হয়ে গেছে। 'পত্রী মৈত্রী' (Pen friend) হ'চ্ছে পত্রের সাহায্যে গ্রাহক গ্রাহিকাদের পরস্পরের মধ্যে আলাপ পরিচয় ও বন্ধুত্ব স্থাপন। 'বিনিময়-সঙ্ঘ' (Exchange Club) তোমাদের সাহায্য করবে সঙ্ঘমিত্রদের জিনিস পরস্পরের মধ্যে অদল বদল করে নিতে। অর্থাৎ তোমার যদি 'স্ট্যাম্প' জমান সখ থাকে তাহ'লে তোমার কাছে যে দেশের ডাকটিকিট বেশী আছে, তা আর একজনকে দিয়ে, আর একজনের কাছে যে দেশের টিকিট বেশী আছে, অথচ তোমার কাছে মোটে নেই, তা বদলে নিতে পারবে। সেক্সপিয়ারের রচনা সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'ইংরাজী সাহিত্যের ধারা'শীর্ষক প্রবন্ধে পাঠশালায় বিশেষ আলোচনা করেছেন। সেক্সপিয়ারের জীবনী স্কুলপাঠ্য পুস্তকে পাবে। আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে তোমার বক্তব্য অন্যত্র প্রকাশিত হ'ল।

শশাঙ্কশেখর বসু, ভবানীপুর

'আগম' অর্থে 'অগ্রদূত' অর্থাৎ যিনি সকলের আগেই কোনো সংবাদ বহন করে নিয়ে আসেন। 'এরা কি না বলে ?' মানে এরা সবই বলে, অর্থাৎ সব রকম খবরই দেয়।

কালীপদ সাহা, সাহাজাদপুর

তোমার "ক্যালেণ্ডার—নেভার এণ্ডিং" রচনাটি আমরা পাইনি।

সলিলা মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা

বাংলা দেশে প্রথম মহিলা ইংরাজীতে কবিতা লিখেছিলেন—কুমারী তরু দত্ত।

অসীম রাহা, বালিগঞ্জ

'পত্রী-মৈত্রী (Pen friend) 'বিনিময় সঙ্ঘ' (Exchange Club) 'প্রশ্নোত্তর' প্রভৃতি কেবলমাত্র পাঠশালার গ্রাহক গ্রাহিকাদের জন্যই। শব্দ-সন্ধান, ধাঁধা 'অক্ষর ক্রীড়া'ও তাই। তবে উৎসাহী পাঠক পাঠিকারা যদি কেহ এতে যোগ দিতে ইচ্ছা করেন আমাদের কোনও আপত্তি নেই, অবশ্য যদি গ্রাহক গ্রাহিকারা আপত্তি না করেন।

কাজি রাজিয়া খাতুন, ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত বানান অনুসরণ করাই উচিত। রাজশেখরবাবুর 'চলন্তিকা' ও সুবল মিত্রের 'সরল বাঙলা অভিধান' আলোচনা করলেই হবে।

পত্র

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

শ্রীযুক্ত অনিলবরণ ঘোষ শ্রীযুক্ত মধু ঘোষালের তৃতীয় প্রশ্নের যা উত্তর দিয়েছেন, তা থেকে মনে হয় তিনি আধুনিক কবিতাকে অত্যন্ত হেয় বোধ করেন। তাকে কবিগুরুর ভাষায় জানাচ্ছি প্রাক্ আধুনিক ও আধুনিক কবিতার বিশেষত্ব কি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "সাবেক কালের কবিতায় (প্রাক্ আধুনিক যুগের) মাধুরীমার একটা নেশা আছে, কিন্তু এর (আধুনিক কাব্যের) আছে স্পর্ধা। এর মধ্যে ঝাপ্সা কিছুই নেই। তা হ'লে সে কিসের জোরে দাঁড়ায় ? তার জোর হচ্ছে, আপন সুনিশ্চিত আত্মতা নিয়ে। ইংরেজীতে যাকে বলে 'ক্যারেক্টার'। সে বলে—'অয়মহং ভো :—আমাকে দেখ।

নবনীকুমার চৌধুরী, লঙ্গাই

ভাই অসিতকুমার

আমি 'ভাইবোন' নিই না। পড়িবারও সুযোগ পাই না। কেবল পাঠশালা নিই। যে ধাঁধাঁ আমি পাঠিয়েছিলাম সেটা যে 'ভাইবোনে' বেরিয়েছে তাও জানি না। তুমি ভাই আমাকে মিছিমিছি চোর সাজিয়েছ। এটা একটা এমন কিছু কঠিন শব্দ নয় যে অপরের মনেও ঐ শব্দটা উদয় হ'তে পারে না। 'ভাইবোনে' যদি বেরিয়ে থাকে তবে আমারটা পুরাণো হয়ে গেল—এই মাত্র। তবে তোমার অবগতির জন্য লিখছি যে আমার তৈরী আরও ঐ ধরণের গোটাকতক ধাঁধাঁ পাঠশালায় পাঠাবার আগে তোমার কাছে পাঠাবো—কি না জানাবে—ইতি

তোমার বন্ধু

অশ্বিনীকুমার মণ্ডল, আহমদপুর

শ্রদ্ধেয় পাঠশালা সম্পাদক মহাশয়।

গতবার আমার প্রশ্নোত্তরগুলো ছাপান নি। আমি ঘোর প্রতিবাদ জানাচ্ছি। *

তারপর গুরুতর অভিযোগ হচ্ছে এই যে কতকগুলি অসম্ভব রকমের প্রশ্ন প্রশ্নোত্তর বিভাগে স্থান দেন। যেমন পৌষের প্রশ্নের মধ্যে কুমারী নীলিমা মুখার্জি, অশ্বিনীকুমার মণ্ডল আর পীযূষকান্তি সেনের প্রশ্ন। এরকম প্রশ্ন ছাপিয়ে পাঠশালার গ্রাহক গ্রাহিকা যে কত অজ্ঞ তাই দেখান হচ্ছে।

শব্দ-সন্ধান দিন দিন এত কঠিন হ'লে আমরা তো আর পেরে উঠবো না দেখছি। আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নেবেন। ইতি—

বিনীত

বিশ্বনাথ সেনগুপ্ত (চট্টগ্রাম)

* (প্রশ্ন ছাপান হয়েছে, মাঘের পাঠশালা দ্রষ্টব্য :—পাঃ সঃ)

ওঁ

শ্রদ্ধেয় 'পাঠশালা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

মাননীয়েষু,

পাঠশালার 'প্রশ্নোত্তর' সম্বন্ধে আমি দু' একটা কথা বল্‌তে চাই। এর আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষা এবং জ্ঞান বৃদ্ধি করা। সুতরাং তা'তে সেই সব প্রশ্নই থাকা উচিত, যা'তে সত্য সত্যই কিছু শিক্ষণীয় বা প্রয়োজনীয় বিষয় আছে। "সেক্‌সপিয়ারের নাটকে কতগুলি কথা, লাইন এবং চরিত্র আছে?" ইত্যাদি উদ্ভট প্রশ্নকে এবং "এভারেস্ট চূড়ার সঠিক উচ্চতা কত?" "পৃথিবীর বৃহত্তম নগর কোনটি?" প্রভৃতির মত অত্যন্ত সাধারণ প্রশ্নকে (যা'র উত্তর সকলেই প্রায় জানেন) পাঠশালার 'প্রশ্নোত্তরে' স্থান দেওয়ার কোন প্রয়োজন আছে কি? আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নেবেন। ইতি—

বিনীত

শ্রীঅসীম রাহা, বালিগঞ্জ

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,

পাঠশালায় 'পত্রী-মৈত্রী' স্থাপনের চেষ্টা আপনাদের সফল হইয়াছে জানিবেন। কারণ ইতিমধ্যেই বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত হইতে আমরা দুই তিনখানি পত্র পাইয়াছি।

শ্রীমতী নীলিমা দেবী মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

. "পাঠশালা" যেন ক্রমশঃই ভাল হয়ে উঠ্‌ছে। পৌষ সংখ্যাটা আমি "বার বার" পড়েছি। শিল্প, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি জানবার কথা যেমন আছে গল্প, উপন্যাস, কবিতাও মনের খোরাক যোগাতে ব্যস্ত। আর সবচেয়ে লোভনীয় গ্রাহক গ্রাহিকাদের জন্য যে বিরাট ব্যবস্থা। বাংলার আর কোন কৈশোর মাসিকে, এরকম সুবিধা দেওয়াই হয় না। বাংলার ছেলেমেয়েদের যে গড়ে তোলার চেষ্টা তা একমাত্র "পাঠশালা"ই করছে, আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস। 'ধাঁধাঁ', 'শব্দসন্ধান', 'অক্ষর ক্রীড়া', 'প্রশ্নোত্তর' প্রভৃতি আমাদের যে কত শিক্ষা ও আনন্দ দেয় তা আপনাকে না বলে থাকতে পারছি না।

প্রতি মাসে কিশোর-মনের উপযোগী যদি কয়েকটা বইয়ের নাম দেন ত খুব উপকার হয়। এ বিষয়ে আপনার মত কি?

আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করুন। পাঠশালার আশায় এখন থেকে বসে আছি। ওটা "মাসিক" না হয়ে "পাক্ষিক" হলেই ভালো হতো। ইতি—

শ্রীধ্রুবরঞ্জন সরকার, হাওড়া

মাননীয়

শ্রীমান দেবলকুমার সেনগুপ্ত যে প্রস্তাব করিয়াছেন "পাঠশালা মাসিক পত্রিকায় একটী 'বালক সঙ্ঘের' সৃষ্টি হলে মন্দ হয় না" আমি ইহা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। আমার মনে হয় ইহা করা হইলে গ্রাহক গ্রাহিকাদের ভিতর 'একতার প্রভাব বিস্তার হইবে। এই 'বালক সঙ্ঘকে' একটী Badge দ্বারা একত্রভুক্ত করিলে খুবই ভাল হয়। আমার প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

মৃণালকান্তি গুপ্ত, কলিকাতা

সম্পাদক মহাশয় সমীপে

দেবলবাবু যে সঙ্ঘের কথা লিখেছেন সে বিষয়ে আমার মনে হয় আপনার মতই ভাল। এই সঙ্ঘ রংমশালে ছিল। আবার শীঘ্রই আনন্দ-বাজারেও আরম্ভ হবে। কিন্তু, আমরা দূরের মানুষ, এতে যোগ দিতে পারবো না। আমাদের বাড়ীতে বড়দের ভোটে 'পাঠশালা'ই শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকা রূপে গণ্য হয়েছে। পাঠশালার যেন আরো উন্নতি হয় এই প্রার্থনা করি। নমস্কার জানবেন। ইতি—

রেবা ভদ্র, ঢাকা

কুমারী নীলিমা মুখার্জী—সুচরিতাসু

আপনার প্রশ্নটায় কোন বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন নি। বিশেষতঃ প্রশ্নের প্রথম দিকে। আপনাকে যদি বোটানিক্যাল গার্ডেনের বিখ্যাত বটগাছের পাতা কত গুণে দিতে অনুরোধ করি, আপনার প্রশ্নও ঠিক সেই রকম নয় কি?

অজিতকুমার ঘোষ, কলিকাতা

হরফের হেরফের—অক্ষর ক্রীড়া

এবার একটি শব্দ দেওয়া হ'ল Revolution এর হরফগুলি হেরফের করে এমন একটি বাক্য তৈরি কর যাতে বিদ্রোহীদের প্রকৃতি বোঝা যায়।

মাঘের অক্ষরক্রীড়া বা 'হরফের হের ফের'

মাঘমাসের শব্দটি ছিল PARLIAMENT কিন্তু ছাপাখানার ভূতের উপদ্রবে এর মাঝের আর একটি 'A' উড়ে যাওয়াতে শব্দটিতে তোমরা পেয়েছ একটি অর্থহীন কথা—PARLIMENT। ভাগ্যে বাংলায় লেখা ছিল—'পার্লিয়ামেন্টের সভ্যদের স্বরূপ প্রকাশ পায়—এমন একটি পদ তৈরি কর।' তাই বুদ্ধিমান পাঠকেরা অনেকেই এ ভুল ধরতে পেরেছেন, এবং ঠিক উত্তরও দিয়েছেন—Partial men। যাঁরা ধরতে পারেন নি তাঁরাও হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেন নি। যথাসাধ্য এর একটা শব্দ তৈরি করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের সে চেষ্টা আরও বেশী প্রশংসনীয়। শব্দটি 'Parliament'ই হবে ধরে নিয়ে কথা তৈরি করেছেন।

ধ্রুবরঞ্জন সরকার, হাওড়া—Partial Men
স্বাহাদেবী রায়, রংপুর—Lap-Raiment
আবুল হোসেন মিঞা=Earl Pitman

শব্দটি 'PARLIMENT' মনে করেই কথা তৈরি করেছেন—

কুমারী রমারাণী চট্টোপাধ্যায় ঘোষসাহাপুর, অশ্বিনীকুমার মণ্ডল, আহমদপুর, রামপ্রসাদ সিংহ, বেহালা, সূর্যকুমার দাস, সাহাপুর = Pearl Mint
কুমারী সাধনাবসু, বারুইপুর=Intemplar
মীরা দাস, শ্রীহট্ট=Triple-Man
হেরম্ব মুখার্জ্জী, দিল্লী=Plainterm
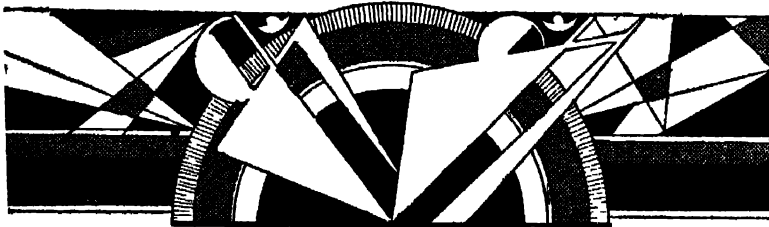
ফাল্গুন—১৩৪৭

এমন কোন পদার্থের নাম কর—যা দেখতে কঠিন ও নীরেট পদার্থ কিন্তু মূলতঃ সকলগুণেই সেটি তরল পদার্থ?

মাঘমাসের ধাঁধাঁর উত্তর

মাঘের 'ধাঁধাঁ' পাঠিয়েছিলেন পাঠশালার গ্রাহক মহিবুর রহমাণ চৌধুরী। তিনি এর সঠিক উত্তর লিখে দিয়েছিলেন=HABIT

H বাদ দিলে A bit (এক টুকরা) A বাদ দিলে bit (টুকরা) B বাদ দিলে it (ইহা) I বাদ দিলে থাকে T=আই (আমি) টি (দাগী)

উত্তর দিয়েছেন—
কাজি বাজিয়া খাতুন, ঢাকা = Habit
শ্রীমতী মলিনা মুখার্জী, কলিকাতা = Apart = Part = Art = Rt (Right)
অনিলবরণ মহান্তী, যাদবপুর = Ago = go = o
কুমারী নীলিমা দেবী মুখোপাধ্যায় ও অরুণলাল মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা = Bleat = Leat = Eat, = At = T
রামপ্রসাদ সিংহ, বেহালা ও সূর্যকুমার দাস, সাহাপুর = Seat, Neat, Meat, Heat, Beat.
হেনা রাহা, ত্রিপুরা = Madam = Adam, = Dam = Am = m = Price = Rice, = Ice = ce = e
কুমারী সাধনাবসু, বারুইপুর = Ado, Sago.
হেরম্ব মুখার্জি, দিল্লী—That – Hat = At = T.

(T মানে ১৬০ সংখ্যা বা ১৬,০০০ সংখ্যার সাঙ্কেতিক চিহ্ন। T মানে সঠিক (Exactly) T মানে দাগী। T মানে এক বিশেষ আকারের লোহা, T মানে 'চা' ও বোঝায়। M মানে ১০০০ সংখ্যা, M অর্থে Mr, Mrs, বা Madamও বোঝায়।)

ভোটের ফলাফল

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু পেয়েছেন মোট ২৪ ভোট।

ভোট দিয়েছেন :—মহামায়া সাহিত্য মন্দিরের সভ্যা ও সভ্যবৃন্দ, বৈদ্যবাটী। সৌরভ সনাতনি, অমলনাথ। মধুসূদন মণ্ডল, বালী দেওয়ানগঞ্জ। বৈদ্যনাথ সেট, বাঁশবেড়িয়া। ইন্দু বোস, কণেশ্বর। অন্নপূর্ণা দেবী শিশু-ভাবতী, কণেশ্বর। উমাশঙ্কর বসু, কলিকাতা। লালবিহারী চক্রবর্তী, গোকর্ণ। এম, ফিরোজা খাতুন, জলপাইগুড়ি। অজিৎলাল মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা। বাজিয়া খাতুন, ঢাকা। পপী বসু, পটুয়াখালি। বিনয়বসু ও সমবোধ রাহা, শ্রীপুর। আবুল হোসেন মিয়া, নীলটুলি। অনিলবরণ ঘোষ, দাবড়া। ধ্রুবরঞ্জন সরকার, হাওড়া। গোপিকা ঘোষ, বজবজ। শিশিরকুমার সেনগুপ্ত, কলিকাতা। অশোক কুমার নন্দী, কলিকাতা, অনিলবরণ মহান্তি, যাদবপুর, উমাপাল চৌধুরী, রাণাঘাট, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈদ্যবাটী, কালিদাস সাহা, সাহাজাদপুর, গায়ত্রী দেবী, বরহমগঞ্জ।

স্বর্গীয়া কামিনী রায় পেয়েছেন মোট ৩৯ ভোট।

ভোট দিয়েছেন :—দীলিপ সেন, কলিকাতা, নিরঞ্জন রায়চৌধুরী, টাঙ্গাইল, রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, আরিয়াদহ, অঞ্জলি পাল, শ্রীহট্ট, হেরম্বকুমার মুখোপাধ্যায়, দিল্লী, গোপীকেশ চক্রবর্তী, আরিয়াদহ, বাদল ও গীতা পালিত, আসানসোল, রণেন্দ্রনাথ ঘোষ চৌধুরী, চাঁদভাগ, সিদ্ধেশ্বর মিত্র, বালিগঞ্জ, পাঁচুগোপাল বসু, বারাসত, উমা বাগচী, রায়পুর, সিপি, মঞ্জু দত্ত গুপ্তা, মজঃফরপুর; দেবব্রত মজুমদার, কলিকাতা, সলিলা মুখার্জি. কলিকাতা, পঙ্কজ মোহন রায়, কোতুলপুর, মীরা দাস, শ্রীহট্ট, সূর্য্যকুমার দাস. সাহাপুর, নীরদচন্দ্র রায়, মৈনাম; শঙ্করনারায়ণ গুহ, চন্দনবাইসা, অমিতাভ বসু, বনগ্রাম; সমীরকুমার ঘোষাল, কলিকাতা, হেনা রাহা, ররকান্তা, গীতাধর, জামালপুর স্বাহাদেবী রায়, রংপুর, অমলকুমার দত্ত ও কুমারী নীলিমা দত্ত, কলিকাতা, রাধারমণ ধর, হুগলী, রিষড়া রয়েজ লাইব্রেরী, রিষড়া, উদয়ভানু সিংহ, কলিকাতা, মৃণাল-কান্তি গুপ্ত, শিয়ালদহ; কিরণচাঁদ বর্মণ, ময়ূরমহল, সাধনা বসু, বারুইপুর, পীযূষকান্তি সেন, সিমলাহিলস্, মিনতি-গঙ্গোপাধ্যায়, দেওবন্দ, গীতাধর, হুগলী, রথীন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, মৈমনসিংহ, উমারাণী ঘোষ, কদমতলা।

শ্রীরাধারাণী দেবী পেয়েছেন মোট ১৪ ভোট।

ভোট দিয়েছেন :—মহামায়া সাহিত্য মন্দিরের সভ্যা ও সভ্যবৃন্দ, বৈদ্যবাটী, শঙ্করকুমার ভট্টাচার্য, আরিয়াদহ, বেলারাণী দত্ত, রসপুর, বিশ্বনাথ সেনগুপ্ত, চট্টগ্রাম; অশ্বিনীকুমার মণ্ডল, আহমদপুর; শৈলেন্দ্রকুমার রায়, কলিকাতা, অজিতকুমার ঘোষ, কলিকাতা; দীপিকা সেন, নৈহাটি, কৃষ্ণেন্দু সিংহ, কাটনি, শান্তিনাথ রায়, এলাহাবাদ, দুর্গাপদ সেন, ঢাকা, নিত্যানন্দ পাল, নদীয়া; আত্রেয়ী দেবী, কলিকাতা।

সম্পাদকীয় মন্তব্য

প্রথমেই বলা দরকার প্রশ্নটাই ভুল। প্রশ্ন হওয়া উচিত ছিল—"ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা কবি কে?" অথবা "বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা কবি কে?" যেহেতু, বাংলা দেশের যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা কবি তিনি ভারতেরও সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা কবি না হতেও পারেন। কারণ, বাংলা ভাষা সমগ্র ভারতের ভাষা নয়। তবে এক্ষেত্রে যদি প্রশ্নকর্তা এই জানতে চেয়ে থাকেন যে "বাঙালী মহিলাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি কে?" তাহ'লে এই ভোটের ফলাফল থেকে তিনি হয়ত সে প্রশ্নের উত্তর পেতে পারেন—যদি জনপ্রিয়তাকেই

শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠিরূপে ধরা হয়। কিন্তু রচনার বৈশিষ্ট্য হিসাবে, ভাব, কল্পনা, ছন্দ, শব্দ ও ব্যঞ্জনার দিক দিয়ে বিচার করতে হলে সাধারণ পাঠকদের ভোটের দ্বারা তা নির্ণয় হতে পারে না। শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু নিঃসন্দেহ একজন বড় কবি এবং তিনি বাঙালী মহিলাও বটে, কিন্তু, দুঃখের বিষয় যে তিনি এক লাইনও বাংলা কবিতা রচনা করেন নি। স্বর্গীয়া তরুদত্ত সম্বন্ধেও এ কথা বলা চলে। সুতরাং বাংলা সাহিত্যের কবি বলে এঁদের কোনো দাবী নেই। বৈদ্যবাটীর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'কেয়া' সম্পাদক মহাশয় এ বিষয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে লিখেছেন 'জীবিতা মহিলা কবিদের মধ্যে মৃতা মহিলা কবিকে টানিয়া আনা যুক্তিসঙ্গত নয়।' আমাদের মতে বিভূতিবাবুর এই আপত্তিই 'যুক্তিসঙ্গত' নয়। কারণ, কবির মৃত্যু হলেও তার কাব্য মরে না। মৃতা কবি ও জীবিতা কবি বলে তাদের রচনা সম্বন্ধে কোনো পার্থক্য নির্দেশ করাই বরং অবৈধ।

বিনিময় সঙ্ঘ

(EXCHANGE CLUB)

পরিচালক শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায়

Exchange Club সম্বন্ধে সমীরবাবুর প্রস্তাব যাহা গত মাসে আমি সমর্থন করি, তাহা কার্যে পরিণত হইয়াছে দেখিয়া, বড়ই আনন্দ পাইলাম। তবে আমার নিবেদন, যে এই সমিতির নাম ইংরাজী 'Exchange Club' না রাখিয়া "পরিবর্ত সঙ্ঘ" নামে এই সমিতিটিকে অভিহিত করা হউক।

"বিভিন্ন দেশের প্রায় হাজার ডাক-টিকিটে পরিপূর্ণ একটি অতিরিক্ত সংগ্রহ আমার আছে, যাহা আমি পরিবর্তন করিয়া ফেলিতে চাই। উহার পরিবর্তে আমার আবশ্যক বিখ্যাত-মনিষী, কৃষি-শিল্প, যানবাহন, জীবজন্তু, নদনদী প্রভৃতির ছবি বিশিষ্ট ডাক টিকিট, যাহা আমার প্রবন্ধাদি চিত্রিত করিতে সাহায্য করিবে। ষ্টানলে গিবন্সের তালিকা নির্দিষ্ট মূল্য ধরিয়া এক টিকিটের পরিবর্তে অন্য টিকিট বিনিময় করা যাইবে, ইহাতে কোন পক্ষকেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না।" *

শ্রীমতী নলিমাদেবী মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা

পাঠশালার মাননীয় সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

"আমি মুদ্রা, ষ্ট্যাম্প, চকোলেটের ছবি, অটোগ্রাফ জমাই।

জার্মানী এবং ফরাসী দেশের মুদ্রার বদলে পর্তুগীজ আর প্রাচীন মুদ্রা দিতে পারি।

গ্রীনল্যাণ্ড, আইসল্যাণ্ড এবং আলবেনিয়ার ষ্ট্যাম্প চাই। তার বদলে বুলগেরিয়া, রাশিয়া আর রুমানিয়ার এয়ার মেল্ ষ্ট্যাম্প দেব।" শ্রীকিষণচাঁদ বর্মণ, বর্ধমান

আমার ঝোঁক—শিশু পত্রিকা (নতুন, পুরাতন, ইংরাজী ও বাঙলা), শিশু-সাহিত্য ও ডাক-টিকেটও সংগ্রহ করি।

আবুল হোসেন মিঞা, ফরিদপুর

অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা-র করনেশন টিকিট, ইরাণ, লুক্সেমবার্গ, লাটভিয়া, U S S R প্রভৃতি দেশের ডাক-টিকিট আমি চাই। জার্মানী, U S A, Australia, Switzerland, South Africa, নেপাল প্রভৃতি দেশের টিকিট আমি বদলে (in exchange) দিতে পারি।

শ্রীঋতরঞ্জন সরকার (হাওড়া)

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়—

আপনাদের পাঠশালা আমার ত' ভাল লাগেই, এমন কি আমার মা পাঠশালা এলে না পড়ে থাকতে পারেন না। পাঠশালা পত্রিকায় বাজে জিনিস মোটেই নেই, প্রত্যেক জিনিস যা পাঠশালায় থাকে আমাদের শিক্ষা করবার মত। আমি এই টিকিট দুখানি পাঠালাম। আমি জানতে চাই এই টিকিট দুখানি কোন দেশে প্রচলিত ছিল এবং এই টিকিটের উপর যে ছবি আছে তাঁদের নাম কি এবং তাদের পদমর্যাদা কি।

ইতি—সলীলা মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা

---

* 'পরিবর্ত সঙ্ঘ' নামটা ভুল হয়, 'পরাবর্ত সঙ্ঘ' হলে ঠিক হয়। কিন্তু, ও নামটা বড় 'কটমটে'। তার চেয়ে 'বিনিময় সঙ্ঘ' রাখলে হয় কিংবা অদল-বদল দল? 'অক্ষর ক্রীড়া' বড় 'কটমটে' বলে এর নাম বদলে 'হরফের হেরফের' রাখা হয়েছে।

পাঠশালার সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

আমি এক্সচেঞ্জ ক্লাবের সহিত U. S A Postage একটি ও Germanyর একটি এই দুইটি টিকিট দিয়া নিম্নলিখিত টিকিট দুইটি চাই।

U S A Postageএর বদলে চাই মাঘ মাসে যে টিকিটখানি সমীরবাবু পাইয়াছেন, পর্তুগীজ ভারতের সেই টিকিটখানি চাই। এখানি না পাইলে HongKong King & Queenএর টিকিটখানি পাঠাইবেন এবং Germanyর টিকিটের বদলে চাই Great Britainএর ১ পেনি দামের George the Vএর যে টিকিটখানিতে রাজা ও একটি সিংহের ছবি দেওয়া, যেটি ২৩শে April 1924 A D তে বাহির হইয়াছিল। Engraved and printed by Messrs. Waterlow and Sons Ltd. on 23rd April 1924 on Stamps Type 112.

এটি না পাইলে George the Vএর ৫৲ টাকা দামের টিকিটখানি চাই। ডাক খরচ বাবদ ৵১০ পয়সা দামের টিকিট পাঠাইলাম। ইতি—

Sunil Kumar Banerji, Rampurhat

গ্রন্থাগারিক

বীরবাহুর বনিয়াদী চাল

রচয়িতা : শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়
প্রকাশক : ইস্টার্ণ ল হাউস, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
মূল্য : ছয় আনা

ছোট ছেলে-মেয়েদের উপভোগ্য হাল্কা হাসির গল্প লেখায় রবীন্দ্রলাল বাবুর হাত যে কত মিষ্টি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ রবীন্দ্রলাল বাবুর 'নতুন কিছু', 'হাল্কা হাসির খাতা', 'বলিত হাসব না' প্রভৃতি একাধিক পুস্তকে ইতিপূর্বেই পাওয়া গেছে। সুতরাং 'বীরবাহুর বনিয়াদী চাল' যে তাঁর মত একজন বনিয়াদী লেখকের দ্বারা পাকা বনিয়াদের ভিত্তিতেই রচিত হয়েছে একথা বলাই বাহুল্য। 'আজগুবী আসর' এবং বাড়ী বদলের 'করুণ কাহিনী' আমাদের মনে হয় প্রত্যেক পাঠকের বহুদিন স্মরণ থাকবে, কারণ, এই ধরণের চিত্র শুধু ছোট ছেলেমেয়েদের কেন, বড়দের কড়া মনেও বেশ একটা গভীর দাগ কেটে দেয়। কচি ও কাঁচা কিসলয় তুল্য কিশোরের দল এই ঝরঝরে নির্মল হাসির গল্পগুলি পড়ে যে বেশ কিছু আমোদ পাবে একথা অসংশয়ে বলা যায়। 'বীরবাহুর বনিয়াদী কাহিনী' রবীন্দ্রলাল বাবুর সুনাম শিশু সাহিত্যের শিশু-মহলে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে।

ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র

রচয়িতা : শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু
প্রকাশক : সংহতি পাব্লিশিং হাউস, কলিকাতা
মূল্য : পাঁচ সিকা

স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রেঙ্গুন অফিসের সহকর্মী ও অন্তরঙ্গ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সরকার বছর পনেরো আগে নরেন্দ্র বাবুর সম্পাদিত ভূতপূর্ব "বাঁশরী' পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুন প্রবাসের জীবন কাহিনী ধারাবাহিক লিখেছিলেন। যোগেন্দ্রবাবুর সেই মূল্যবান রচনাকে বিস্মৃতির অতল গর্ভ থেকে টেনে এনে পুনরায় লোক-লোচনের সম্মুখে ধরে নরেন্দ্রবাবু শুধু যে যোগেন বাবুরই কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন তাই নয় পরলোকগত শরৎচন্দ্রের অনুরাগীদের নিকটও তিনি অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে রইলেন। যোগেন্দ্রবাবুর লিখিত বিবরণই প্রধানত গুছিয়ে নিয়ে শরৎচন্দ্রের গুণ কর্ম বিভাগ ক'রে নূতন ভাবে বিষয়গুলি সাজিয়ে একত্র করে নরেন্দ্রবাবু এই গ্রন্থখানি সম্পাদিত করেছেন। এজন্য তাঁকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছে। আশা করি এ বইখানি জনপ্রিয় হবে এবং তাঁর এই কঠিন শ্রম সফল ও সার্থক হবে। ভবিষ্যতে যাঁরা শরৎচন্দ্রের বৃহৎ জীবনী রচনায় হস্তক্ষেপ করবেন 'ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র' তাঁদের কাজে লাগবে।

সুখবর !

পাঠশালার একাধিক গ্রাহক গ্রাহিকার বিশেষ অনুরোধে আগামী মাস থেকে অন্যান্য সহযোগী পত্রিকাগুলির পরিচয়ও পাঠশালার এ বিভাগে নিয়মিত প্রকাশিত হবে।—(গ্রন্থাগারিক)

ভ্রম সংশোধন

ভরদ্বাজ পাব্লিশিংয়ের প্রকাশিত 'ভ্যাবাচ্যাকা সিরিজের' প্রথম বই "অশরীরীর দান" রচনা করেছেন শ্রীযুক্ত পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়। মাঘের পাঠশালার গ্রন্থ পরিচয়ে এঁর নামটি ভুলক্রমে 'পতিতপাবন মুখোপাধ্যায়' ছাপা হওয়াতে গ্রন্থাগারিক বিশেষ লজ্জিত। আশা করি পতিতপাবন বাবু এ ত্রুটি মার্জনা করিবেন।—(গ্রন্থাগারিক)

Printer and Publisher R Bhattacharya, Prabhu Press, 30, Cornwallis Street, Calcutta

"শব্দ-সন্ধান"

(প্রতিযোগিতা কুপন)

(যে কোনো পাঠক বা পাঠিকা এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারেন, এবং যতগুলি ইচ্ছা কুপন পাঠাতে পারেন)

১ বী		২ পা		■	৩ বা	৪		৫ বি
	■		■	৬		চ	■	
	■	৭	৮ দ	■	৯ শ		■	
১০	১১ ত	■		■	■	১২ ক	১৩	■
■	১৪	১৫ জ	■	১৬ অ		■	১৭ ব	
১৮	■	১৯		ন	■	২০ জ		■
২১ শ্ব			■		■		■	২২
	■	২৩	২৪ মা			■	২৫ প	
২৬ দি		■	২৭	ম্য	■	২৮		প

(পাঠশালা, ফাল্গুন)

নাম . ...

ঠিকানা ... .

....

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—আগামী ১০ই ফাল্গুনের মধ্যে কুপনখানি পাঠশালা-কার্যালয়ে পৌছনো চাই।

☞ কুপনে কোনো কাটাকুটি বা বানান ভুল চলবে না।

৺শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পর আমার মতে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী হ'চ্ছেন—

ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম-এ. ডি-এল.

শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার সান্ন্যাল

নাম

ঠিকানা

গ্রাঃ নং

যাঁকে ভোট দেবেন তাঁর নামটি রেখে বাকী সকলের নাম কেটে দেবেন।

চতুর্থ বর্ষ] চৈত্র—১৩৪৭ [সপ্তম সংখ্যা

চৈত্রে

অণিমা দেবী

শান্ত শুভ্র বৃদ্ধ শীত চলে গেছে ধীরে
অবনীর অন্ত প্রান্তে হিম-মেরু তীরে।
বসন্ত বারতা বহি ফাল্গুন আনিয়াছিল
পাতা-ঝরা গান
দখিনারে করিযা আহ্বান।
আজি এলো দ্বারে
বরষের শেষ মাস সাজি ফুলভারে।

তরুণ অতিথি তুমি,—তুমি ঋতুরাজ,
দূর কর মেদিনীর মালিন্যের লাজ।
বর্ষ ভরি পুঞ্জীভূত গ্লানি অবসাদ,
ঈর্ষা দ্বেষ দুঃখ পরমাদ,
বিশ্ব জুড়ে জ্বলিছে যে অগ্নিময়-রণ,
শান্তির শীতল ধারে করো নির্বাপণ।
অমঙ্গল মুছি আনো শুভ আশীর্বাদ,
আনো বিশ্বে প্রেমের প্রসাদ।

হে চৈতালি,—আজ
ধরণী পরাল তোমা অপরূপ সাজ।
বিহঙ্গের কণ্ঠ হতে গীত-সুধা নিলে কণ্ঠ ভরি।
আকাশ আসিল নেমে নীলাম্বর পরি'
পুষ্পারুণ বনানীর পারে।
চঞ্চল সমীর চলে দিগন্তের দ্বারে।

কুঞ্জে কুঞ্জে ফুলগীতে তরুর মর্মরে
দখিনা সমীর যেন আজিকে গুঞ্জরে
শান্তির যুগের সেই ভুলে যাওয়া গান,
অতীতের হারানো সে তান।
পুরাতন বর্ষ সাথে শেষ হোক্ অকল্যাণ রাত
আসুক নবীন বর্ষে শান্তিময় মঙ্গল প্রভাত॥
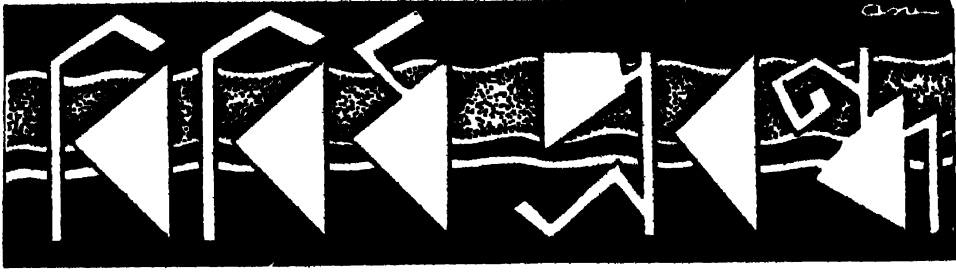
টাকার রহস্য

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দেখা গেল দুনিয়ার হাটে পণ্যসামগ্রীর মূল্য নির্ভর করে তার চাহিদা ও যোগানেব পরিমাণের উপব। অর্থ-শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ কোন নিরীহ ভদ্রলোক বাজারে জিনিসেব দর হঠাৎ উঠতে নামতে দেখে যেন আশ্চর্য ও ক্রুদ্ধ এবং সেই সঙ্গে একটু হতাশও হ'য়ে, হয় ত বল্লেন, "নাঃ, কিছুই বোঝবার উপায় নেই মশাই। এই গেল হপ্তায় পটলের দর ছিল দশ পয়সা, পবশু হয়েছিল দু' আনা, আজ এক লাফে তিন আনা হ'য়ে গেছে, অথচ আলুর দর কালকের চেয়ে আজ দু' তিন পয়সা কম। ব্যাটাদের কারসাজী বোঝা শক্ত।" কিন্তু তোমাদের আগেই বলেছি বিক্রেতারা এর জন্য মোটেই দায়ী নয়। এই ক'দিনেব মধ্যে পটল ও আলুব যোগান ও চাহিদাব নিশ্চয়ই বেশ একটু ওলট পালট হ'য়েছে, তাতেই জিনিষ দুটির দরের এই ওঠা-নামা। ভাল কথা, এখন যদি তোমাদের প্রশ্ন কবা হয়, সব জিনিসেরই মূল্য ত সেই সেই জিনিসের যোগান ও চাহিদার ওপব নির্ভর করে, কিন্তু টাকার মূল্য কিসের উপর নির্ভব করে? প্রশ্নটা শুনে, বোধ হয়, একটু রুষ্ট হ'য়ে উত্তর দেবে, "এ প্রশ্নের কোন মানেই হয় না, টাকার আবার মূল্য কি? কোন্ বস্তুব মূল্য কত সেটা জানতে পারি টাকার সাহায্যে, অর্থাৎ টাকাই হ'ল বস্তুর মূল্য নিরূপণের মাপকাঠি। কাজেই টাকার মূল্য কথাটা 'এক পয়সার মূল্য একপয়সা' বা 'একটা গিনির মূল্য একটা গিনি' বলার মত অর্থহীন।" তোমাদের এ যুক্তির কোন উত্তর দেবার পূর্বে, অনুরোধ করব মাথাটা বেশ ঠাণ্ডা ক'রে 'টাকার রহস্যের' চতুর্থ পরিচ্ছেদে মূল্য ও দর সম্বন্ধে 'পাঠশালায়' যে আলোচনা করা হ'য়েছে, সেটুকু আব একবার পড়ে ফেলতে। কোনো বস্তুর মূল্য জানতে হ'লে, দেখতে হবে ঐ বস্তুটিব বিনিময়ে অপব একটি বস্তু কি পরিমাণে পাওয়া যায়। টাকাকে বিনিময়বাহন বলা হ'য়েছে কেন? টাকাব বিনিময়ে জিনিসপত্র পাওয়া যায় বলেই না? তা' হ'লে 'টাকার মূল্য' কথাটা অর্থহীন বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। টাকা দিয়ে কি পরিমাণ জিনিস কিনতে পারা যায়, টাকাব এই ক্রয়শক্তিই হ'ল তাব মূল্য। এই ক্রয়শক্তি বরাবব সমান থাকে না। ও মাসে চাল, ডাল প্রভৃতি কিনেছিলাম এই এই দরে—চাল ৫৷৹ মণ, ডাল—৬৲ মণ, আটা—৪৸৹ মণ, তেল—৷৹ সেব ঘি ১৷৵৹ সের। এমাসে ঐ জিনিসগুলিই খরিদ কবতে লাগলো—চাল ৫৸৹ মণ, ডাল ৬৷৵৹, আটা ৪৸৶ মণ, তেল ৷৵৹ সেব, ঘি ১৷৷৵১০ সেব, প্রত্যেক জিনিসের দরই অল্প বিস্তব চড়ে গেছে। যখন দু' একটি জিনিসের দর চড়ে বা নামে, তখন বুঝি ঐ জিনিসের যোগান-চাহিদার হ্রাস বৃদ্ধি হ'য়েছে। কিন্তু যখন সাধাবণ দর অর্থাৎ প্রায় সকল জিনিসেরই দর এক সঙ্গে চড়ে যায় বা নামে তখন বুঝতে হবে টাকার ক্রয়শক্তিব (অর্থাৎ টাকার মূল্যের) হ্রাস বা বৃদ্ধি হ'য়েছে। এ মাসে চাল ডাল প্রভৃতির দর চড়ে যাওয়ার কারণ—টাকার মূল্যের হ্রাস। গত মাসে টাকা দিয়ে যে পরিমাণ বস্তু পাওয়া যাচ্ছিল, সেই পরিমাণ টাকা দিয়েও সে পরিমাণ বস্তু পাওয়া যাচ্ছে না। এখন কথা হ'চ্ছে টাকার মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি হয় কেন? সোজা কথায় এর উত্তর হ'ল—অন্যান্য বস্তুর মত টাকারও মূল্য তার যোগান ও চাহিদার ওপর নির্ভর করে। তবে তার

চাহিদা ও যোগান বলতে কি বুঝায়, তার কিছু ব্যাখ্যা করা আবশ্যক।

তোমরা জানো বর্তমান যুগে টাকা বল্‌তে কেবল ধাতু মুদ্রা বোঝায় না,—ধাতু মুদ্রা ছাড়া সরকারী কাগজী মুদ্রাগুলিও টাকার কাজ করছে। লোকে টাকা চায় কেন, অর্থাৎ সংসারে টাকার চাহিদা হয় কেন? নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র খরিদ করবার জন্যই ত। তা' হ'লে একথা বলা চলে, বিক্রির জন্য যে সব পণ্যসামগ্রী উৎপাদন করা হয়, তার পরিমাণের উপর টাকার চাহিদা প্রধানতঃ নির্ভর করে। ওগুলি খরিদ করবার জন্য টাকার আবশ্যক। পণ্যসামগ্রী বেশী উৎপন্ন হ'লে, সেই অনুপাতে টাকারও চাহিদা হয়, কোন কারণে পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন কমে গেলে টাকার চাহিদাও সেই অনুপাতে কমে যায়। এটা এমন কিছু নূতন কথা নয়। মনে কর জিনিস পত্রের যোগান হঠাৎ খুব বেড়ে যাওয়াতে পণ্যসামগ্রীতে বাজার ভরে গেছে, অথচ দেশেতে টাকার যোগান সে অনুপাতে বাড়েনি। বাজারে এত মাল অথচ ওসমস্ত কেনবার মত লোকের পকেটে তেমন পয়সা নেই, কারণ মালের যোগান-বৃদ্ধির সঙ্গে টাকার যোগান বাড়েনি। এ অবস্থায় জিনিসপত্রের দর না কমলে, এই অতিরিক্ত মাল অবিক্রীত থেকে যাবে। এই অবিক্রীত মালগুলি গুদামে পড়ে থেকে নষ্ট হ'লে, ব্যবসায়ীদের ভয়ানক ক্ষতি হবে, তা'ছাড়া, ঐ মালের দরুণ তাদের বহু টাকা আটকে পড়ে থাকবে। এর চেয়ে দর কমিয়ে দিয়ে বিক্রি করলে অন্ততঃ কিছু-না-কিছু পাওয়া যাবে দেখে, বিক্রেতারা মালের দর কমিয়ে দিতে বাধ্য হয়। ফলে সাধারণ দর অর্থাৎ পণ্য-সামগ্রীর দর পড়ে যায়, অপর কথায়, টাকার মূল্য অর্থাৎ তার ক্রয়শক্তি বেড়ে যায়। আবার টাকার যোগান যদি না কমে একই থাকে কিন্তু পণ্যসামগ্রীর যোগান কমে যায়, তা'হলে ফল হবে অন্যরূপ। বাজারে জিনিসপত্রের আমদানী কমে গেছে, অথচ লোকের চাহিদা কিছুমাত্র কমেনি। ঐ মাল কেনবার জন্য খরিদ্দারদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চল্‌বে, ফলে মালের দর যাবে চড়ে। তার মানেই টাকার ক্রয়শক্তি অর্থাৎ মূল্য কমে যাবে। সাধারণতঃ আমরা দেখি, মানুষের সচ্ছল অবস্থার সঙ্গে তার খরচ করবার শক্তিও বাড়ে। আজ যদি সকলের আয় বা উপার্জন দ্বিগুণ হ'য়ে যায়, দেখা যাবে, যারা আধপেটা খেয়ে এক সের চালে দু'দিন চালাচ্ছিল, এখন প্রতিদিন তারা ঐ পরিমাণ চাল খরিদ করছে, যারা এক জোড়া জুতায় সন্তুষ্ট ছিল, এখন তাদের অন্ততঃ দু'জোড়া না হ'লে চল্‌ছে না। খরচ করবার ক্ষমতার বৃদ্ধির সঙ্গে, এইরূপে প্রায় সকলেরই নানা প্রয়োজনের চাহিদা বেড়ে যাবে। পণ্যসামগ্রীর যোগান সেই সঙ্গে বৃদ্ধি না হ'লে এই অতিরিক্ত চাহিদার জন্য জিনিসপত্রের দর আক্রা হ'য়ে যাবে।

টাকার যোগান কমে গেলে, লোকের আয় কমে যায়, তার ফলে সকলে খরচ কমাতে বাধ্য হয়। এ অবস্থায় অতি প্রয়োজনীয় বস্তু ছাড়া অন্য বস্তু কেউ কেনে না, এই চাহিদা কমে যাওয়ার জন্য জিনিসপত্রের দরও কমে যায়। এই থেকে বুঝতে পারা যাচ্ছে, যদি টাকার পরিমাণ দ্বিগুণ হ'য়ে যায় ও পণ্যসামগ্রীর পরিমাণ পূর্ববৎ থাকে (অর্থাৎ টাকার পরিমাণ দ্বিগুণ হবার পূর্বে যা' ছিল তাই থাকে), তা'হলে জিনিসপত্রের দর দ্বিগুণ হ'য়ে যাবে। আবার টাকার পরিমাণ যদি অর্দ্ধেক হ'য়ে যায় ও পণ্যসামগ্রীর পরিমাণ পূর্ববৎ থাকে, সে ক্ষেত্রে জিনিস-পত্রের দরও অর্দ্ধেক হ'য়ে যাবে। টাকার যোগান সম্বন্ধে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা মনে রাখা দরকার। উপরের উদাহরণগুলিতে ধরে নিয়েছি, সমস্ত টাকাই লোকের হাতে হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোন কৃপণ টাকার কোন অংশ মাটিতে পুঁতে বা লোহার সিন্দুকে জমিয়ে রাখেনি। বিনিময় কাজের অর্থাৎ বেচা-কেনার জন্য ব্যবহার না করে টাকার যে অংশ বাক্স-বন্দী থাক্‌বে, সেই অকেজো অংশ বাজার দরের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। যে সব টাকা লোকের হাতে হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে এরূপ চল্‌তি টাকার মোট পরিমাণের সহিত সাধারণ বাজার দরের বিশেষ সম্বন্ধ। এবিষয়ে যাতে কোনো গোলমাল না হয়, অর্থশাস্ত্রের সাবধানী পণ্ডিতরা, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখে এই নিয়মটি ব্যাখ্যা করেছেন, "যেসব টাকা লোকের হাতে হাতে ঘুরছে, এইরূপ চল্‌তি টাকার মোট পরিমাণ ও সেই টাকাগুলির 'চলনগতির' উপর পণ্যসামগ্রীর সাধারণ দর নির্ভর করে।" এই হ'ল অর্থশাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ 'টাকার পরিমাণ তত্ত্ব।' টাকার 'চলনগতি' বল্‌তে কি বোঝায় সে সম্বন্ধে আগামী সংখ্যায় বলা হবে

[ক্রমশঃ]

কুমুদ্বতী

দুর্গাচরণ দাস বি, এ

শ্রীবিষ্ণু অবতার শ্রীরামচন্দ্রের দেহত্যাগের পর। তাঁরি পুত্র—মহারাজ কুশ—তারই সুশাসনে শাসিত অযোধ্যা। যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র। শাসনের সুখ্যাতিতে শত্রুমিত্র ধন্য ধন্য করে। বেড়ে উঠল অযোধ্যার সুখ্যাতি, শ্রীবৃদ্ধি...

গ্রীষ্মকাল·· শরীর ও মন স্বভাবতঃই ক্লান্ত হয়।

দারুণ গ্রীষ্মের প্রখর তাপে মহারাজ কুশ ও আজ ক্লান্ত! ফুরিয়ে গেছে তাঁর উৎসাহ ·· নেই আর কর্মে উদ্দীপনা...কি করা যায়? শরীরেব এ অবস্থা নিয়ে রাজ্যশাসন...অ-স-ম্ভ-ব। অথচ...শাসন-কার্যে সুশৃঙ্খলা অব্যাহত রাখার একান্ত প্রয়োজন।

তিনি জল-বিহার করবেন স্থির করলেন।

"জল-বিহার" ছিল সে যুগের একটা বিশেষ রাজকীয় প্রমোদ অনুষ্ঠান। পুরনারী সমভিব্যাহারে নৌকাযোগে ভ্রমণ করাই ছিল এই অনুষ্ঠানের বিশেষত্ব।

সরযুর বুকে তরী ··আর সে তরীতে মহারাজ কুশ! দুই পার্শ্বে দুই চামরধারিণী—চামর ব্যজনে রত। পুরনারীদের সাহচর্য বিহারকে মনোরম করে তুলেছে। কেউ বাজান বীণা ··মন্দিরার তালে তালে কারুর কণ্ঠ হতে সুরের ঝঙ্কার. কেউ বা আবার বারি-যন্ত্র হতে মহারাজের গায়ে ছিটিয়ে দেন সুরভিত জলের ধারা।·· বিরাট প্রমোদ ব্যবস্থা···

বাঁশী বাজে—পূর্ণ তানে। সে সুরে সরযুর সুনীল জলে পুলক-প্রবাহ চঞ্চল হয়ে ওঠে।

অকস্মাৎ · থেমে গেল গান · বীণার তার বীণা-বাদিনী চমকে দিলে ছিঁড়ে।...মন্দিরাবাদিনীর হাত হতে খসে পড়লো মন্দিরা! মহারাজ কুশ চীৎকার করে উঠলেন—"আভরণ! কোথায় আমার হাতের দিব্য-আভরণ···তাইত। মহারাজের আভরণ ত নেই মহারাজের হাতে।

কিন্তু গেল কোথায়? জল-বিহারের জন্য যখন তরণীতে উঠি, সেত ছিল আমাব হাতে। চামরধারিনী। তাম্বুল-করঙ্কবাহিনী। বীণা-বাদিকা। নর্ত্তকী—গায়িকা। দেখনি কি তোমরা তখন আমার হাতের আভরণ?

সমস্বরে সবাই স্বীকার করলো—

"দেখেছি মহারাজ।"

"অথচ তা এখন নেই। দেখ সব ভাল করে—যদি অজ্ঞাতসারে এখানে পড়ে থাকে।

—না, মহারাজ, নেই—

—কিন্তু গেল কোথা তাহলে?

কোথাও পাওয়া না যাওয়ায় মহাবাজ কুশ চীৎকার করে বলতে লাগলো—"আমার আভরণ চাই নিশ্চয় চাই।—এ হারালে চলবে না। এ আভরণ আমার পরম সম্পদ। মহামুনি অগস্ত্য দেন পিতাকে—জগৎবন্দ্য পিতা আমার আমাকেই দেন সে আভরণ। তাঁর আশিস আভরণে। জগৎবন্দ্য শ্রীরামেব পুণ্যস্মৃতি এ আভরণ আমি যেমন করে পারি উদ্ধার কববই।

তৎক্ষণাৎ মহারাজ কুশ জালিকদের ডাকলেন। বল্লেন—"সরযুর মধ্য হতে যে আমার আভরণ উদ্ধার কবতে পারবে সে পাবে প্রচুর পুরস্কার। তন্ন তন্ন করে সন্ধান কর।"

জালিকেরা প্রাণপণে সন্ধানে প্রবৃত্ত হোলো। তারা সরযুর বুকে ফেললো তাদের জাল। আলোড়িত হোলো সমস্ত জলরাশি। তবুও পাওয়া গেল না কোনো সন্ধান।

অবশেষে, নিরুপায় তারা রাজসমীপে জানালে,—কোথাও ত পেলাম না রাজা।

—তবে গে—ল কোথা? সরযূর মধ্যেই এর সন্ধান হওয়া উচিত।

শেষে একজন জালিক বলে: প্রভু, একটা কথা—যদি অভয় দেন তো বলি।

—নির্ভয়ে বল ··

—সরযূ যখন তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করা সত্ত্বেও এ মিললো না, তখন—আমার মনে হয়—এ জিনিষ নাগরাজ কুমুদ বোধ হয় লুকিয়ে রেখেছেন।

ক্রোধে জ্ঞানহারা মহারাজ কুশ

এদিকে · সরযূর অতল তলে ·

কুমুদ ভগিনী কুমুদ্বতী জলকল্লোলের তালে তাল মিলিয়ে গান গাইছিল। হঠাৎ এক উজ্জ্বল আলোক প্রবাহ সরযূর গভীর তল আলোকিত করে তুলল। কী ব্যাপার? জলের ভিতরে অপরূপ জ্যোতিঃপূর্ণ একটা কবচ। তারই আলোক-প্রভায় আলোকিত সরযূর জল। কুমুদ্বতী কবচটীকে বার বার নিরীক্ষণ করে পরলো আপন হাতে। অপূর্ব তার রূপ আরও মনোরম হয়ে উঠল—নাগরাজ কুমুদ তাড়াতাড়ি এসে বলেন—

—এই কুমু, খোল্—খোল্—শিগ্গির—

—কেন দাদা। না—ও আমি খুলবো না। বেশ মানিয়েছে আমায়।

—আরে—ও যে মহারাজ কুশের কবচ। হারিয়ে তিনি পাগলের মত হয়ে গেছেন। তার জিনিষ তাঁকে দিতে হবে যে।

—দিতে ত হবে দাদা। কিন্তু একটু ভুগিয়ে দেবো। রাজারাজড়া লোক—অত বেহুঁস হওয়া কি ভাল? বলতে বলতে রহস্যের হাসি হেসে ওঠে কুমুদ্বতী। বার বার নাগরাজ বলেন—

—দে এইবার—আর নয়—অনেকক্ষণ হয়েছে—কুমুদ্বতী মিনতি করে:

—লক্ষ্মীটী দাদা। দাঁড়াও ভাই—আর একটু—আর একটু। তোমার মহারাজ কেমন চীৎকার করছেন—শুনতে ভারি মজা লাগছে। আর একটুখানি—লক্ষ্মী ভাই—

এদিকে—

মহারাজ কুশ বার করলেন তাঁর দিব্য তূণীর হতে এক ভীষণ অস্ত্র—গরুড়াস্ত্র—

—কুশের আভরণ লুকিয়ে রাখার প্রতিফল কি, আশা করি, নাগরাজ এবার তা মর্ম্মে বুঝতে পারবেন।

মহারাজ অস্ত্র ক্ষেপনে উদ্যত—ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তেই—উচ্ছলিত সরযূর বারিধারা—আর জলের মধ্য হতে একটা গম্ভীর আরাব—যেন করী-বৃংহন—

কিছুক্ষণ পরে—নাগরাজ কুমুদের উত্থান—সাথে তার একটি পরমাসুন্দরী কন্যা—যেন কিন্নরী—এত তার রূপ। রূপের আলোয় সরযূর কালো জলেও আলো।—এ কন্যার নাম—কুমুদ্বতী—

মহারাজ কুশ ভাবছিলেন—সরযূর গহীন তল যে এ হেন রূপসীকে লুকিয়ে রেখেছে এ ত তার জানা ছিল না।

এমন সময় নাগরাজ প্রণাম করলেন।

আপনিই নাগরাজ কুমুদ?

মহারাজের এক প্রজা।—সরযূর তলে আমার জল—

আশা করি, উপলব্ধি করেছেন—

মহারাজের আভরণ গোপন রাখবার দুর্বুদ্ধি আমার কখনও হয় নি।

—তবে?

—এই যে মেয়েটি এ আমারই বোন—কুমুদ্বতী। ফুটন্ত কুমুদের মত ওর শোভা। ও খেলছিল অতল-তলে আপন মনে। এমন সময় আপনার হস্তচ্যুত কবচ খুলে পড়ে গেলো সরযূর গহীন তলে। ও ছেলে মানুষ—ও তো বোঝে না—কে আপনি—কি মূল্য আপনার এই পরম দিব্যকবচের। তাই ও আপনকণ্ঠে ধারণ করে কবচের অপরূপ রূপ নিরীক্ষণ করছিল।

ওর এ অপরাধ ক্ষমা করুন মহারাজ—

—প্রীত হলাম আপনার কথায়, নাগরাজ। নির্ভয় —আপনি। সম্বরণ করলাম আমার গরুড়াস্ত্র—

—এই সেই আপনার আভরণ। পরে কুমুদ্বতীকে আদেশ করলেন নাগরাজ—"যাও কুমুদ্বতী, তোমার আপন হাতে মহারাজকে প্রত্যর্পণ কর।"

কুমুদ্বতী ধীরে ধীরে কুশের কাছে এগিয়ে এলো। ধীরে ধীরে মুখখানি তুলে নিঃসঙ্কোচে বলতে লাগল—"তুমিই মহারাজ! এত বেহুঁস তোমার! এই নাও—

তোমার আভরণ। আর—এর পর থেকে—একটু সাবধান হোয়ো মহারাজ। রাজারাজড়া লোকেদের অত অসাবধান ভাল নয়।”

মুগ্ধ মহারাজ কুশ। অভিভূতের মত তিনি বললেন—“আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করো কুমুদ্বতী। সত্যি—বড় অসাবধান আমি। আমাকে অসাবধানতা থেকে রক্ষা করবার ভার নেবে তুমি কুমুদ্বতী?”

কুমুদ্বতী নিরুত্তর। উত্তর দেন কুমুদ:

সে তো ওর ভাগ্য মহারাজ। পরম সৌভাগ্য ওর। এস কুমুদ্বতী—মহারাজ কুশের হাতে তোমাকে সম্প্রদান করি। বলে—মহারাজ কুশের হাতে কুমুদ্বতীকে সম্প্রদান করলেন নাগরাজ।

কুমুদ্বতী কি বলতে গেল—“মহারাজ”

—চুপ—আমি কোনো কথা শুনতে চাইনা কুমুদ্বতী। এ তোমার শাস্তি—আমার আভরণ আটক করে রেখেছিলে তুমি—তোমাকে আটক হতে হবে। হাসতে হাসতে বলেন মহারাজ কুশ। পুরনারীদের হুলুধ্বনি আর মঙ্গলশঙ্খ রোলের ভিতর দিয়ে বিবাহ হয়ে গেল।
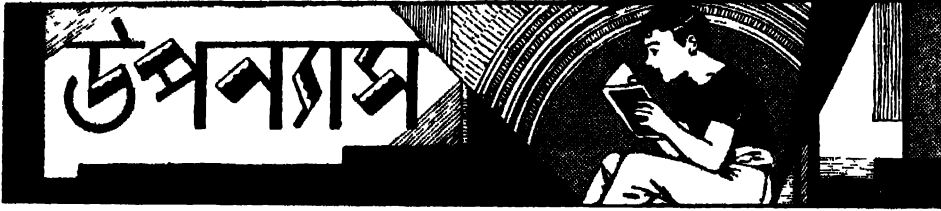
৩১শে মার্চ মঙ্গলবার বেলা ১২টা

শ্রীতাপসরঞ্জন সরকার

ত্রয়োদশ

গুপ্তচিঠি

বিজয় কাগজখানা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো কিন্তু চিঠির মর্ম উদ্ধার করতে পারলে না। উত্তেজনায় তার মুখ লাল হয়ে উঠলো। তবুও ধৈর্য ধরে সে চিঠির গুপ্ত কথা আবিষ্কারের চেষ্টা করতে লাগল। মিনিটের পর মিনিট চলে যেতে লাগল। বোটখানাও অবিশ্রান্ত গতিতে ছুটে অগ্রসর হ'তে লাগল। সবাই হাঁ করে বিজয়ের মুখপানে চেয়ে রয়েছে। সকলেই চিঠির গুপ্ত কথাগুলো জানবার জন্য উদ্‌গ্রীব। হঠাৎ বিজয় আনন্দে লাফিয়ে উঠে বললে, “অর্ধেকটা চিঠি বুঝতে পেরেছি কিন্তু আর অর্ধেকটা এখনও বুঝতে পারিনি। দেখেছ সমীর, শত্রুপক্ষ কি রকম চালাক। একটা চিঠিতে দু'রকম কায়দা করেছে। আচ্ছা দাঁড়াও এ চালাকিও আমি ভেদ করছি। এই তো এখানে তীর এঁকে দিয়েছে। আবার পিছনেও দেখছি আর একটা তীর। প্রথম তীরটার মানে বুঝতে পেরেছি।”

সমীর বললে, “কি বুঝতে পেরেছ?”

“এই প্রথম তীরটা জানিয়ে দিচ্ছে যে শেষের অংশটুকু প্রথম তীরটার গোড়ার দিক থেকে অর্থাৎ দ্বিতীয় তীরের মাথার দিক থেকে পড়তে হবে। হ্যাঁ, সমীর ধরে ফেলেছি ওদের চালাকি। আমি এখন চিঠিখানা পড়ে যাচ্ছি তুমি লিখে নাও।”

সমীর বললে, “কাগজ তো নেই।”

তুমি ঐ সাদা পাটাতনটার ওপরেই লিখতে সুরু কর।”

“আচ্ছা বলো।”

“শোন এবং যা লিখতে বলি তা লেখ। এই যে এইখানটায় “পাঁচ, চুয়াল্লিশ” রয়েছে। এই “পাঁচ, চুয়াল্লিশের” মধ্যে একটা কমা আছে। তার মানে হচ্ছে ও দু'টো আলাদা শব্দ। একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে যে প্রত্যেক কমার পর যে সকল শব্দ আছে সেই সকল শব্দের প্রথম অক্ষরগুলো একত্র করলে একখানা চিঠির কতকাংশ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এটা আমি কি করে বুঝতে পারলুম তা যদি জানতে চাও তাহ'লে আমি

বলবো যে চিঠির শেষে "নয়, বীরাশী, নব্বই" কথাগুলোর মধ্যে "বীরাশী" শব্দটির বানানটি ভুল নয় কি? "বীরাশীর" "বী" বানানটা দীর্ঘ ঈকার না হয়ে হ্রস্ব-ইকার হবে। * সুতরাং যখন এই শব্দটার প্রথম অক্ষরটা ভুল তখন নিশ্চয়ই ওটা বিশেষ জরুরী।"

সমীর বললে, "কিন্তু ভুল তো মানুষের হয়েই থাকে।"

"হ্যাঁ, সেটাও মানি, কিন্তু এটা অতি সাধারণ বানান এবং এই চিঠির আর কোথাও একটুও ভুল নেই। এখন শোন, যদি প্রথম অক্ষরটাকে তারা ইচ্ছে করেই ভুল করে থাকে তবে এ চিঠির সব শব্দেরই প্রথম অক্ষরগুলো বিশেষ দরকারী এবং তা যদি মেনে চল তা'হলে "নয়, বীরাশী, নব্বই" থেকে পাওয়া গেল "নবীন"। নবীনকে নিশ্চয়ই জান। 'নবীন' লিখতে হ'লে 'ব'এর সঙ্গে দীর্ঘ ঈকার যোগ করতে হয়। তাদের দলের চিহ্ন অক্ষর দিয়ে নাম লেখা। "ব"-র দীর্ঘ ঈকার কোন সংখ্যা নেই। বিশ, বিয়াল্লিশ, বিরাশী, বিরানব্বই প্রভৃতি সংখ্যাগুলো সমস্তই হ্রস্ব-ইকার। কিন্তু সে নিজের নামটার বানান ঠিক রাখতে চেয়েছিল বলে সংখ্যার বানানটা নাম অনুযায়ীই দিয়েছে। তারপর শেষের দিকে কমা দিয়ে একটি একটি করে যে সকল অক্ষর বসানো আছে তা পিছন দিক থেকে পড়লে চিঠির বাকি অংশটুকু পড়া হয়ে যায়। আচ্ছা সমীর লেখ, আমি বলে যাচ্ছি।" বিজয় বলে যেতে লাগল আর সমীর লিখতে আরম্ভ করলে। লেখা শেষ হ'লে চিঠিটা দাঁড়ালো এই রকম—

পাঁচু,

তোমার চিঠিতে জান্‌তে পারলুম সরিত বাবু ফাঁদে পড়েছে। বেশ করেছ। সমীরবাবুর বাসার ঘাটে বোট রাখবে। ওদের দু'জনকেই আটকাবে। সাবধান, যেন ধরা না পড়ে। আমি দু'টোর সময় আসব। ধরতে পারলে বক্‌শিস্ পাবে।

নবীন।

সমীর বললে, "তা'হলে নবীন বাবুর বিরুদ্ধেও একটা জোর প্রমাণ পেলুম। আর আফ্‌তাব উদ্দিনের বিরুদ্ধে প্রমাণ তো আগেই পেয়েছি। এখন তাদের নামে দু'টো ওয়ারেন্ট বের করে কি লোক দু'টোকে গ্রেফ্‌তার করা চলে না?"

"না হে না, তা চলে না। এ চিঠিটা যে তার নিজের লেখা সে বিষয়ে তো নিঃসন্দেহ নই? সুতরাং আরও প্রমাণ চাই। তবে আফ্‌তাব উদ্দীনের জন্য আর প্রমাণের দরকার নেই। এখন একবার তাকে পেলেই হয়। আচ্ছা সরিৎবাবু! এখন ক'টা বাজে বলুন ত?"

সরিৎবাবু হাতঘড়ি দেখে বললেন, "তিনটে বাজতে ষোল মিনিট আছে।"

বিজয় বল্‌লে, "ঠিক হয়েছে ঐ বোটে নবীনবাবুই এসেছিল। কারণ তার দু'টোর সময় আসার কথা ছিল। যাক্ নফর তুমি বোট বাড়ীর ঘাটের দিকে ঘুরিয়ে দাও। সরিৎবাবু, আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা ছিল। কিন্তু আপনার অবস্থা এত খারাপ হয়ে পড়েছে যে আপনি এখন আর কথা বল্‌তে পারছেন না। যাক্ আমি এখন আর আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করবো না। চলুন আমার বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া সেরে বিকেল বেলা সব আলোচনা করা যাবে। অশোক, তুইও আয় আমার বাড়ীতে। "অশোক বল্‌লে, "থাক্ আর নিমন্ত্রণ করতে হবে না। ও আমি আগেই ঠিক করে রেখেছি।"

অশোকের কথা শুনে সকলেই হেসে উঠল।

অশোক বললে, "হাসলে চলবে না, আমি যখন তোমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছি তখন আমার ইচ্ছে মত আমাকে পেট পুরে খাওয়াতে হবে।"

বিজয় বললে, "এ আর বেশী কথা কি? একখানা নোট নিয়ে যা, যা খুশী কিনে নিয়ে এসে খা।

"আমি তো দোকানের তৈরী খাবার খাই না। আমাকে বাড়ীতে খাবার তৈরী কোরে খাওয়াতে হবে। কেমন কানাইদা, সব তৈরী করতে পারবে তো?" কানাই বললে, "তা আর বাবু পারব না? বাঁধতে রাঁধতে মাথার চুল পেকে গেল। কি কি তৈরী হবে হুকুম করুন।" "শোন, এক নম্বর হচ্ছে, চারটি ফুরফুরে সরু আতপ চালের মোগলাই পোলাও আর খানকতক ফুলকো লুচি। দু' নম্বর হচ্ছে কিঞ্চিৎ ফাউলকারী। তিন নম্বর খান চার পাঁচ মটন চপ আর ফাউল কাটলেট্, চার নম্বর হচ্ছে চিংড়ী মাছের মালাইকারী। পাঁচ নম্বর সামান্য একটু ছানার পুডিং। ছয় নম্বর এই বেশী কিছু নয় দু'টো ডিমের ডবল মাম্‌লেট্। সাত নম্বর ভেটকি মাছের দু'খানা ফ্রাই, আর

আট নম্বর একটুখানি মটন কোর্মা। নয় নম্বর হচ্ছে "অমনি বিজয় বলে উঠলো, "ন' নম্বর হচ্ছে তোমার মাথা আর আমার মুণ্ডু দিয়ে একটা ঘণ্ট। কেমন?" অশোক বললে, "কেন, তোমার ঠাকুর কি এসব রাঁধতে জানে না?" অমনি ঠাকুর বললে, "কেন পারব না? বাবুর হুকুম হলে এখনি রাঁধতে শুরু করবো। যোগাড় তো প্রায় সবই ঘরে আছে। শুধু কিছু চিংড়ী মাছ আর একটা ভেটকী হলেই চল্‌বে। মাংস সকালে আনা আছে।" অশোক বললে, "তা'হলে আর কয়েকটা নামের লিষ্ট্‌ দি?" বিজয় বললে, "আজ থাক্‌, তিনটে বাজল। রাঁধবেই বা কখন আর খাবেই বা কখন? অশোক বললে, "আচ্ছা তা'হলে ঐ আট রকম খাবারই তৈরী হোক।"

সাঁ সাঁ করে মোটর বোটখানা ঘাটের কাছে এসে হঠাৎ আট্‌কে গেল। মেসিন তখনো চলছিলো কিন্তু বোট আর এগুলো না। বিজয় বল্‌লে, "যে ঘাটে বোট ছিল সেখানে নিয়ে চল। এর তলায় যে মস্ত চোঙ্গাটা আছে ওটা ঘাটের চড়ায় আটকে গিয়েছে। সে ঘাটটা গভীর আছে সুতরাং বোটটা সেখানে যেতে পারবে। বোট ঘাটে ভিড়লো এবং সবাই নেমে স্নান করে বাড়ী মুখো হল।

চতুর্দশ

(ফাঁকি)

এখন পৃথিবীর একটা দিক্‌ একেবারে নিঃস্তব্ধ। পূর্ণ চন্দ্রের মৃদু জ্যোৎস্না পৃথিবীর এই দিক্‌টায় ছড়িয়ে পড়েছে। অল্প অল্প হাওয়া বইছে কিন্তু এ হাওয়ায় গাছের পাতা নড়্‌ছে না। অট্টালিকাগুলো এক একটা নীরব নিশ্চল দৈত্যের ন্যায় মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে আছে। গাছ থেকে দু' একটা কাক জোৎস্নাআলোয় সকাল হয়েছে মনে করে হঠাৎ 'কা-কা' করে ডেকে উঠ্‌ছে। যে পাকা রাস্তাগুলো দিনের বেলায় লোক চলাচলে মুখরিত হয়ে ওঠে তা এখন কয়েকটা পথের কুকুরের বিচরণ ভূমি হয়ে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ দু একটা শৃগালের কর্কশ ও ভয়প্রদ চীৎকারে রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হচ্ছে। বহুদূরে বড় কুঠির গম্বুজ থেকে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বেজে জানিয়ে দিলো যে তখন রাত্রি তিনটে।

হঠাৎ পথের কুকুরগুলো ভয় পেয়ে চিৎকার করতে করতে পালিয়ে গেল কেন? ঐ যে দূরে একটা গাছের ঝোপ যেন নড়ে উঠ্‌লো মনে হচ্ছে! এ আবার কি? দু'টো ছায়ামূর্তি ঐ ঝোপ থেকে বেরিয়ে এলো যে! হ্যাঁ ঠিক, ছায়া মূর্তিই তো বটে। কাদের ও ছায়া? এত রাত্রে চোর, ডাকাত, দস্যু, বদমায়েস্‌ আর কোতয়ালীর চৌকীদার ছাড়া তো আর কেউ বের হয় না? এরা যদি চৌকীদার হয় তাহলে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। কিন্তু জ্যোৎস্নার আলোকে তো বেশ দেখা যাচ্ছে যে এরা কালো পোষাকে আবৃত। মুখ দু'টো যে ওদের মুখোস দিয়ে ঢাকা তাও বেশ বোঝা যাচ্ছে।

নিঝুম রাত্রি জনশূন্য পথ। দু'জনে এগিয়ে চল্‌ল। অবশেষে একটা দ্বিতল অট্টালিকার সাম্‌নে এসে তারা দাঁড়াল। দু'জনেই নিঃশব্দে গেটের প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে ওপারে গিয়ে পড়ল। একজনের কাঁধে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আর একজন একটা জানালার মাথায় উঠে পড়লো। তারপর জল নিকাসের লম্বা নল বেয়ে একেবারে দোতালার জানালায় গিয়ে দাঁড়াল। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলে যে কালো পোষাকে আবৃত দ্বিতীয় লোকটি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে। তখন সে কোমর থেকে মোটা দড়ির মই বের করে জানালার শিকের সঙ্গে বাঁধলো এবং অপর মাথা নীচে ছুঁড়ে দিল। দ্বিতীয় লোকটি তখন মই বেয়ে উপরে এলো এবং প্রথম লোকটি আবার নীচে নেমে গেল। দ্বিতীয় লোকটি তখন পকেট থেকে একখানা টোটা ভরা অটোমেটীক পিস্তল বের করলে। তারপর জানালার ভিতর দিয়ে হাত গলিয়ে একটা বিছানা লক্ষ্য করে পর পর দু'বার গুলি ছুড়লে। সামান্য ধূম্ররাশির উৎপত্তি হোল কিন্তু কোনও শব্দ হোল না। ভিতর থেকে একটা ক্ষীণ আর্তনাদ বাতাসের সঙ্গে ভেসে এসে আবার বাতাসেই মিলিয়ে গেল। হঠাৎ ভিতর থেকে টর্চ্চের তীব্র আলো এসে জানালাস্থিত ব্যক্তির মুখের উপর পতিত হোল এবং সঙ্গে সঙ্গে বিজয়ের অট্টহাসি শোনা গেল। জানালাস্থিত ব্যক্তি তিলমাত্র ভয় না পেয়ে পর পর আরও দু'বার টর্চ্চের আলো লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লে। টর্চ্চ নিভে গেল। আবার বিজয়ের অট্টহাসি কর্ণভেদ করে চলে গেল। বিজয় চীৎকার করে বল্‌লে,

"সাবধান আফতাব, আজ তোমাকে পেয়েছি, পালাবার চেষ্টা করো না। নীচেয় আমার লোক পাহারা দিচ্ছে। তোমার দ্বিতীয় সঙ্গী ছিলুম আমি নিজেই। ছদ্মবেশে তোমাদের দলে ভিড়ে পড়ে ছিলুম এবং একাজে তোমাকে সাহায্য করবো বলে ধাক্কা দিয়ে তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি, এতক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে সাহায্য করেওছি। কিন্তু বুঝতেই পারছ বোধহয় যে এখন আর আমি ছদ্মবেশী ইয়াকুব নই। আমি এখন তোমাদের পরম শত্রু বিজয় গোয়েন্দা। বিছানায় মানুষের মত শুয়ে ছিল একটা আমারই রাখা পাশবালিস। তোমার হাতের টিপের বাহাদুরী আছে। তারিফ করছি—তোমার গুলি বালিশের বক্ষ ভেদ করেছে, কিন্তু, কাতরধ্বনি নির্গত হয়েছে আমারই কণ্ঠ থেকে। সুতরাং আর গুলি ছোঁড়া-ছুঁড়ি না কোরে দড়ির মই বেয়ে শুড় শুড় করে নীচে নেমে পড। পিস্তলটি জানালায় রেখে দাও।" বিজয় ঘরের বৈদ্যুতিক আলো জ্বেলে দিল। দরজার আড়ালে বিজয়, সমীর, অশোক ও সবিৎবাবু প্রভৃতি দাঁড়িয়ে। আফ্‌তাব জানালার শিক ধরে ক্ষণকাল কি যেন ভাবলে। তারপর পিস্তলটা ঘরের মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিল। পরে নীচু হ'য়ে দড়ির মইখানা খুলে নীচেয় ফেলে দিয়ে, আবার দ্বিতলের নল বেয়ে ছাদে উঠতে চেষ্টা করলো। অমনি বিজয়ের পিস্তল গর্জে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে একটা কালো পদার্থ নীচে পড়ে গেল। বিজয় প্রভৃতিরা আফতাবের চূর্ণীকৃত দেহ দেখবার জন্য আস্তে আস্তে নীচে নেমে যেতে লাগলো। নীচে গিয়ে দেখলে, চৌকীদারেরা যেটা ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে শুধু একটা কালো পোষাক, আর কালো মুখোস! মানুষটা নেই তার মধ্যে!—বিজয় হতাশ হয়ে মাটিতে বসে পড়লে। সমীর বললে, "আরে, বসে পড়লে কেন? চলো চলো—যাবে কোথা ব্যাটা?—এখনও ছাদ খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে।"

বিজয় বিরক্ত হ'য়ে বললে, "ছাই পাওয়া যাবে। দোতালা থেকে নামতে নামতেই আমাদের দু'মিনিট সময় কেটে গেছে। আর ছাদটার ওপাশ দিয়ে যে দেয়ালঘেসে একটা সুপারী গাছ রয়েছে তাওকি এ পর্যন্ত দেখনি?" "তা'হলে উপায়। আমাদের এত আয়োজন ও রাত্রি জাগরণ সব বৃথা হ'ল। খাঁচার পাখী ফাঁকি দিয়ে উড়ে গেল?" "যাবেনাত কি? তোমরা যে কেউ বুঝতেই পারলে না যে লোকটাই নীচে পড়ে গেল না তার কালো পোষাকটা পড়ল। আমি তো গুলি চালাতে ব্যস্ত ছিলুম, ওদিকে ভাল কোরে লক্ষ্যই রাখবার আবশ্যক হয় নি। যাক্, চল এখন ঘরে গিয়ে শোয়া যাক্। আর বসে থেকে রাত জেগে লাভ কি? এই ব্যাপারে আটকে পড়ে সবিৎবাবুর বিবরণটাও শুনতে পারিনি।" অশোক বললে, "ঘাবড়াও মৎ। মিঞাকে আমি কাল কি পরশুর মধ্যে ধ'রে দেবো। এই আমার কথা রইল। ।"

[ক্রমশঃ

গতি

শ্রীসনৎকুমার দে

তোমারে জিনিতে পারি শক্তি কোথা হেন?
তবু মোরা যুগে যুগে করি যে সাধনা।
হৃদয়ের অত্যুন্মত্ত উদগ্র বাসনা
সৌরকর রাশি সম ছুটে চলে যেন
অজানার তমোময় রুদ্ধ রন্ধ্র কোণে
জ্বালিতে প্রদীপ্ত তেজে জীবন-আলোক;
মরণের বিভীষিকা রোষরক্ত চোখ
পারে না টলা'তে তারে ভয়ার্ত-স্পন্দনে।
এই কি চলা'র গতি? সহজের মোহ
কোনো দিন পারে না কি ভোলা'তে মানবে?
মানুষ সহজে অতি দীপ্ত-ভয়াবহ
বজ্রেরে জিনিতে চাহে জীবন-আহবে।
এ-ই তো আনন্দ তার, মরীচি-মায়ায়
অজানার-আকর্ষণ টানিছে আমায়।

ইথার ও তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী

শ্রীবিভূতিভূষণ চক্রবর্ত্তী বি-এস্-সি

প্রতিদিন পাখীর গানে প্রভাতে ঘুম ভেঙ্গে উঠে আমরা দেখি ধরণী যেন "পরেছে কিরীট কনক কিরণে—মধুর মহিমা হরিতে হিরণে,"—মন আমাদের আনন্দে নেচে ওঠে। বাস্তবিক আলোকের এমন একটা যাদুকরী শক্তি আছে যে, সচেতন প্রাণী মাত্রই তাকে সাদরে বরণ না করে থাকতে পারে না। শুধু কি তাই ? আমরা যাকে অচেতন পদার্থ বলি ··তাদের মধ্যেও নাকি আলোকের স্পর্শে একটা অনুভূতি না জেগে থাকতে পারে না। তাই বিশ্বপ্রকৃতিও এ বিষয়ে কৃপণ হন নি। সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রপুঞ্জ আলোকের অফুরন্ত ভাণ্ডার। কিন্তু, প্রথম প্রশ্ন জাগলো মনে, লক্ষ লক্ষ যোজনব্যাপী দূরে বিমানচারী আলোক-ভাণ্ডারগুলি থেকে আমাদের কাছে আলো এসে পৌছায় কি করে? আলোর প্রকৃতি সম্বন্ধে বিজ্ঞানের কষ্ঠীপাথরে নিরূপিত হয়েছে যে, আলো শক্তিরই তরঙ্গায়িত একটি রূপ। শক্তির পক্ষে বাহনের ত একান্ত দরকার। তবে এই শক্তিটির বাহন কে ? আমাদের ভূপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ৫০ মাইল পর্যন্ত বায়ু মণ্ডল বিস্তৃত। তারপর এই পৃথিবী ও নক্ষত্রের লক্ষ লক্ষ যোজনব্যাপী ব্যবধানের মধ্যে আছে শুধু শূন্য,—অনন্ত মহাশূন্য। বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করলেন এই অনন্ত মহাশূন্য, পদার্থসুলভ অন্যগুণ বিশিষ্ট না হলেও এমন একটা "কিছুর" দ্বারা পরিপূর্ণ যার মধ্য দিয়া তরঙ্গ সঞ্চারিত হতে পারে।... আলোক একটী তরঙ্গায়িত শক্তি কাজেই আলোক ইহার মধ্য দিয়া অনায়াসেই আসতে পারে। এই আলোক বাহন "কিছু"টার তাঁরা নামকরণ করলেন—"ইথার"।

কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা শুধু আকাশের শূন্যকেই তাঁদের ইথার দিয়ে ভরিয়ে নিরস্ত হলেন না। শূন্য, পূর্ণ, সর্ব্ব স্থানকেই তাঁরা পরিপূর্ণ করে দিলেন ইথার দিয়ে। চুম্বকের একটী মেরু অপর একটী চুম্বকের বিপরীত ধর্ম্মী মেরুকে আকর্ষণ করে। লৌহখণ্ডকে আকর্ষণ করে উভয় মেরুতেই। বিদ্যুৎ সম্পন্ন কোন পদার্থ অন্য একটী বিদ্যুৎ সম্পন্ন পদার্থকে করে আকর্ষণ। কিন্তু চুম্বকও বিদ্যুতের ক্ষেত্রে সমধর্ম্মী হলে বিকর্ষণ ঘটে। এ সব ব্যাপার আমরা নিত্যই প্রত্যক্ষ করি। আবার দূরস্থিত পদার্থদ্বয়ের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রয়োগও অহরহ আমাদের চোখের সামনে ঘটছে। আমরা অবাক হ'য়ে ভাবি, এই সব "শক্তির" যোগাযোগ ঘটছে কেমন করে। বৈজ্ঞানিকেরা উত্তর দিলেন এখানেও ইথারের মধ্যস্থতায় ঐ ঘটনা সম্ভব হচ্ছে। তাই তাঁরা পূর্ণকেও করেছেন "ইথারের" দিয়ে পরিপূর্ণ।

যাই হোক এখন "ইথারের" কতকগুলি গুণ বা ধর্ম্ম পাওয়া গেল। ইথারের মধ্য দিয়ে তরঙ্গ প্রবাহিত হয়, শক্তির প্রয়োগ ঘটে। আর, যার মধ্য দিয়ে তরঙ্গ সঞ্চারিত হয়, বলের যোগাযোগ হয়, সে নিশ্চয়ই স্থিতিস্থাপকতা গুণ বিশিষ্ট। তথাপি ইথার শুধু "কিছু"ই, এ কোনো পদার্থ নয়। কারণ, পদার্থ বলতে আমরা বুঝি যাহা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য এবং যাহার গুরুত্ব আছে। কাজেই এই "কিছু" রূপ ইথারটার কল্পনা বৈজ্ঞানিকরা অতি সহজে করলেও সাধারণের পক্ষে বুঝা একান্ত কষ্টকর।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইথার পণ্ডিতদের মধ্যে খুব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলে। এঁদের মধ্যে ম্যাক্সওয়েল সাহেব ইথারের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে গণিতের সাহায্যে আলোকের প্রকৃতি সম্বন্ধে দুরূহ প্রশ্ন সব সুন্দরভাবে এবং সহজে

সমাধান করে ফেললেন। পণ্ডিত সমাজে ইথারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকল না। এমন কি, দু' একজন পণ্ডিত আরও অগ্রসর হলেন—তাঁরা বল্লেন যে কোন দুইটী বস্তুর স্বতন্ত্র অবস্থান ইহাই প্রমাণ করে যে উহাদের মধ্যে নিশ্চয়ই 'অন্য কিছু' বিরাজমান।

এই আকস্মিক চাঞ্চল্য কতকটা প্রশমিত হলে বৈজ্ঞানিকরা ইথারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে পরোক্ষ প্রমাণ ছেড়ে অগ্রসর হলেন প্রত্যক্ষ প্রমাণের দিকে। সূর্য থেকে আলো আমাদের কাছে আসতে সময় নেয় প্রায় ৮ মিনিট। কিন্তু ৪ মিনিট সময় বরাবর আলো কোথায় থাকে? নিশ্চয়ই মহাশূন্যে, ইথারের বুকে। আলো একটী শক্তি, তাকে যদি ইথার আঁকড়েই থাকতে হয় তবে শক্তির ধর্ম্ম নষ্ট হয়। কারণ, ইথার পদার্থ নয়—অথচ শক্তির প্রকৃতি অনুযায়ী দেখা যায়, পদার্থের আশ্রয় ব্যতীত অন্য কিছুর শরণ নেওয়া শক্তির পক্ষে একেবারে অসম্ভব। তবে— ?

বৈজ্ঞানিকরা চিন্তিত হয়ে অন্যভাবে পরীক্ষার দিকে মন দিলেন। ইথারের অস্তিত্ব অনুসারে এই কথাই বলতে হয়—এই পৃথিবী, গ্রহ, নক্ষত্র, সব কিছু ইথার সমুদ্রের বুকে ভীষণ বেগে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পৃথিবীর অন্যান্য গতি ছেড়ে দিলেও আমরা জানি পৃথিবীর দৈনিক আবর্ত্তনে ভূপৃষ্ঠের যে কোন স্থান ঘণ্টায় প্রায় চার হাজার মাইলের অধিক বেগে পশ্চিম দিক থেকে পূর্বদিকে আবর্তিত হচ্ছে ইথারের মধ্য দিয়ে। আমরা এ কথাও বলতে পারি, পৃথিবী না ঘুরে, ইথারই এই পূর্বোক্ত বেগে পূর্ব থেকে পশ্চিমে ছুটছে। এতে আমাদের একই কথা বলা হয়, কারণ তাতে মূল বিষয়, আবর্তনের কিছু পার্থক্য ঘটে না। এই সত্য অবলম্বন করে বৈজ্ঞানিকরা আলোর একটী বিশেষ পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হলেন। ভূ-পৃষ্ঠের যে কোন স্থান হতে পূর্বদিকে একটী আলোকরশ্মি এসে একটী দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে সেই স্থানে ফিরে যেতে যে সময় লাগে, উত্তর বা দক্ষিণ হতে এসে এইরূপ প্রতিফলিত হ'য়ে পূর্বস্থানে ফিরে যেতে আগের বারের চেয়ে কম সময় লাগা উচিত, কারণ, ইথারের স্থিতিস্থাপকতাগুণ আছে।

বিষয়টা নদীর উপমা দিয়ে ভাল করে বোঝা যাক্। এক স্থান থেকে একখানি নৌকা নদীর উজানে কিছুদূর গিয়ে আবার পূর্ব স্থানে ফিরে এল, এতে নৌকাখানি যাতায়াতে যা সময় নিল এবার নৌকা যদি আড়াআড়িভাবে (নদীর উপর লম্বভাবে) ঐ পূর্বেকার একই দূরত্বে যায় এবং আসে তবে তার এতে নিশ্চয়ই কম সময় লাগবে তার আগের বারের যাওয়া-আসার চেয়ে। আমরা জানি নদীর জলের স্থিতিস্থাপকতা গুণের জন্যই এইরূপ হয়। এখন ইথারের উপর দিয়ে আলোক রশ্মি যাওয়া আসার পক্ষেও যদি এরূপ ঘটে তবে ইথারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। কয়েকজন বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এই আলোক রশ্মির ও দর্পণের পরীক্ষায় বিশেষ ভাবে আত্মনিয়োগ করলেন। তাঁরা তাঁদের যন্ত্রপাতির ভুল ভ্রান্তি নিরসনে নানা কৌশলও অবলম্বন করলেন। কিন্তু তবও কিছুতেই এই সময়ের পার্থক্য দেখাতে পারলেন না। কাজেই এবার ইথারের অস্তিত্ব অস্বীকার করা ভিন্ন তাঁদের আর উপায় কি?

এই সময় বিংশ শতাব্দীর নব যুগ এলো এই প্রহেলিকাময় ইথারের প্রতিদ্বন্দ্বী আর একটি দুর্বোধ্য রহস্যকে সঙ্গে নিয়ে। সুবিখ্যাত গণিতশাস্ত্রবিদ্ আইন্‌ষ্টাইন্ এইবার আসরে নামলেন তাঁর আপেক্ষিকতাবাদ নিয়ে। (Theory of Relativity)। এই আপেক্ষিকতাবাদের মূলমন্ত্র ইথারের অস্তিত্ব অস্বীকার। এই আপেক্ষিকতাবাদ যেমন দুর্বোধ্য তেমনি আরও এক জটিল গণিত হইতে এর উৎপত্তি। আমরা জানি 'স্থান' চিরন্তন কিন্তু 'কাল' প্রবহমান। আইন্‌ষ্টাইন্ তাঁর আপেক্ষিকতাবাদে দেখালেন স্থান ও কাল পরস্পর নির্ভরশীল। আচ্ছা, এই সত্য সম্বন্ধে আমরা কতটুকু ধারণা করতে পারি দেখা যাক্। আলিপুরের আবহাওয়া অফিসে যেই বেলা "১টা বাজলো সেখানকার কর্মচারী অমনি বিদ্যুতের সাহায্যে গড়ের মাঠের কেল্লায় সংবাদ পাঠালেন। এবং "একটার" তোপ ছোঁড়া হ'ল কেল্লা থেকে। আমরা কলিকাতার বিভিন্ন স্থানের অধিবাসীরা প্রত্যেকের ঘড়িতে সময় মিলিয়ে নিলাম। এখন কথা হচ্ছে: আলিপুর থেকে আরম্ভ করে আমাদের ঘড়ি সব একই সময় নির্দেশ করলো কি না? বাস্তবিক ভেবে দেখতে গেলে তা হয় নি। কারণ আলিপুরে "একটা" বাজবার সঙ্গে সঙ্গে কেল্লায় বিদ্যুৎ গতিতে সংবাদ দেওয়া হলো বটে কিন্তু

বিদ্যুতের প্রবাহ যতই দ্রুত হোক একটা নির্দিষ্ট গতি আছে। সেই হেতু কেল্লায় আসতে একটা নির্দিষ্ট সময় লেগেছে (সে সময় হয়তো প্রায় এক সেকেণ্ডের এক কোটী ভাগের এক ভাগ)। তাই ওখানেই দুই স্থানের "একটা" এক হতে পারে নি। তারপর আমাদের প্রত্যেকের ঘড়ি মেলানাও এক হয়নি। কারণ শব্দের গতির সীমা তো আছেই। বস্তুতঃ এই হতে আমরা সাধারণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, আলিপুরে যখন "একটা" তখন সেটা আলিপুরেই "একটা" তোপের "একটার" সঙ্গে তা এক নয়। (যতই তুচ্ছ পার্থক্য হউক)। আবার তোপের "একটা" সেটা তোপেরই "একটা" অপরের ঘড়ির সঙ্গে তার মিল হতে পারে না।

সময়ের এই যে একান্ত তুচ্ছ পার্থক্য, আমাদের ব্যবহারিক জীবনে কোন আবশ্যক না হলেও বা ব্যবহারিক জীবনের জন্য এ পার্থক্য বুঝবার প্রয়োজন না হলেও এখন আমরা আপেক্ষিকতাবাদ মেনে নিয়ে বলতে পারি স্থান ও কাল পরস্পর নির্ভরশীল। এই আপেক্ষিকতাবাদের ধারণা করা যেমন কঠিন, যে গণিত শাস্ত্র হতে এর উদ্ভব তাহাও তেমনি দুরূহ। কাজেই এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা এ প্রবন্ধে করা সম্ভব নয়।

উনবিংশ শতাব্দীতে মাসওয়েল ইথারের সাহায্য নিয়ে যে সমস্ত প্রমাণ করেছিলেন, বিংশ শতাব্দীতে আইনষ্টাইন বিনা ইথারে তাঁর আপেক্ষিকতাবাদ দিয়ে সেগুলি সমস্তই আবার সুন্দররূপে প্রমাণ করলেন। ইথারের জন্ম হয়েছিল শূন্যে, প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে হেরে ইথার সেই মহাশূন্যেই আবার মিলিয়ে গেল। আর তার স্থান অধিকার ক'রে রইল কয়েকটী দুর্বোধ্য অঙ্ক। ভবিষ্যতের গর্ভে এইরূপ আরও কত রহস্য আছে কে জানে?

লজ্জা নিবারণ

শ্রীহীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্বপ্রকাশিতের পর

দু এক ঘা প্রহার ছাড়া আর সবই শুনলেন দয়াময়ী। এঁ্যা এই কাণ্ড। ওমা কি হবে গো। সখারাম তখন জমি নিয়েছেন, মানে, জমিই তাঁর ক্লান্ত জর্জরিত দেহকে আশ্রয় দিয়েছে। দয়াময়ী গামছা ভিজিয়ে আনেন। সখারাম বুকে মাথায় ভিজে গামছার প্রলেপ দিতে দিতে ছাড়েন হুঙ্কার—আর দয়াময়ী করেন ভীতিপ্রকাশ।

সিদ্ধিদাতা গণেশ নিশ্চয় দয়াময়ীর সেই পুরোনো তেঁতুল খাননি, আর খেলেও তাঁর সিদ্ধির নেশা এত জোর যে বাঘাতেঁতুলও নেশাকে ছাড়াতে পারে নি।

এখন উপায় কি? আত্মীয় ভায়রাভাইরা পরামর্শ দিলেন ওর চিকিৎসা করাও। চিকিৎসা! ওরে বাবারে!! সে যে খরচ সাপেক্ষ। একজন বললে, ডাক্তারি। একজন বললে 'না-না, কবিরাজি করাও হে, খরচ কমে উগ্‌গার হবে।' কবিরাজি চিকিৎসার নামেই দয়াময়ী নির্মম হন। বলেন 'খবরদার কবিরাজি নয়। মা গো, অনুপান করতেই আমার জান্‌ বেরিয়ে যাবে। ডাক্তার দেখাও।'

ডাক্তার খরচের কথা মনে পড়তেই সখারামের মনে হয় ডাক তার এলো বুঝি পরপার থেকে। দয়াময়ীর অনু-পান-ভীতি নিবারণের প্রাণপণ চেষ্টা করেন, কিন্তু দয়াময়ী কি অতো বোকা, মনে আছে স্বামীর সেই অম্বলের

অসুখে কবিরাজি ওষুধের অনুপান নিয়ে তাঁর সেই নাকানি-চোকানি খাওয়া। আবার। শেষে ভোটাধিক্যে ডাক্তারিই স্থির হয়।

সখারাম খুঁজে খুঁজে নূতনতম এক ছোকরা ডাক্তারকে আবিষ্কার করে পাড়ায়। সবেমাত্র পাশকরে বেরিয়ে ডিস্পেন্সারি খুলে বসেছেন। তিনি জানেন ওকালতী ডাক্তারি ইত্যাদি পেশায় যৌবনের বাজারদর সবচেয়ে কম। কম্পমান মাদারকে নিয়ে একদিন হাজির হলেন সকাল নয়টা নাগাদ। ছোকরা ডাক্তার জনবিরল ঘরে টেবিলের সামনে বসে হাঁ করে রাস্তার দিকে চেয়ে আছে, এ গ্রীষ্মেও পেনটুলুনের খাতিরে বেচারার গায়ে গরম কোট, কিন্তু বিষে বিষক্ষয় সব সময় হয় না, ডাক্তার মারাত্মক ঘামছে আর হাতপাখা চালাচ্ছে। তাদের ঢুকতে দেখেই ডাক্তার হাওয়া খাওয়া বন্ধ করল। সখারাম সশব্দে একটা চেয়ার টেনে, পা তুলে বসে পাখা নিয়ে প্রাণপণে বাতাস খেতে লাগলেন। মাদার একটা চেয়ারের পেছনে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে। ডাক্তার বার দুই বলতে তবে বসল। ডাক্তার কেস্ শোনবার জন্যে ভালো হ'য়ে বসে চিবুকের তলায় তর্জনী দিয়ে শান্তকণ্ঠে বললেন: 'কেস্‌টা বলুন।'

সখারাম হাতপাখাতে ঝড় বহাতে বহাতে বলেন লজ্জা—লজ্জা—লজ্জা—আর বলেন কেন।' ডাক্তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে, একটু পরে আবার কেস শুনতে চায়। সখারাম সেই ভাবে বলেন 'লজ্জা—লজ্জা—লজ্জা।'

ডাক্তার শান্তকণ্ঠে বলেন: 'যত লজ্জারই হোক ডাক্তারের কাছে কি আর লজ্জা করলে চলে, বলুন? নয়তো বাইরে চলুন, চুপি চুপি বলবেন।'

সখারাম অবাক্ কণ্ঠে বলেন: 'গোপন করছি কোথায়? বাইরে যাবারই বা দরকার কি-এ্যাঁ? বলছি ত বার বার, ব্যামোটা ওর লজ্জার—'

ডাক্তার হাঁ করে বলেন: 'লজ্জা করবেন না, খুলে বলুন।'

'লজ্জাইত রোগ মশাই।' সখারাম সব কাহিনী খুলে বলেন—মার খাওয়া আর টগ্-অফ্-ওয়ার বাদ দিয়ে।

ডাক্তার চোখ বড় করে বলেন: 'ও! বটে? তারপর মাদারকে খুব মন দিয়ে পরীক্ষা ক'রে বলেন: 'হুঁ।'

সখারাম সভয়ে বলেন: 'কি দেখলেন অসুখটা?'

ডাক্তার বলতে থাকেন: 'এই অস্বাভাবিক লজ্জা বড় ভয়ংকর রোগ। এর উৎপত্তি হলো নার্ভাস উইকনেস থেকে। নার্ভাস উইকনেস থেকে সব রকম রোগ আসে। ভালো করে ইলেকট্রিক্ ট্রিটমেন্ট করাতে হবে।'

"আরে মশাই, আপনিত খুব বাৎলালেন, এই পাড়াগাঁয়ে ইলেকট্রিরি' পাবো কোথা?" সখারাম বলে—"পিদ্দীমে হবে কিনা বলুন?" ডাক্তার বলেন—সেজন্য আপনার ভাবনা নেই, আমার কাছে যন্ত্র আছে, কিন্তু শুধু নার্ভাস উইক্‌নেস দূর করলেই চলবে না, লজ্জা নিবারণের জন্যে 'সাইকোলজিক্যাল ট্রিটমেণ্টও করা চাই।'

"সাইকেল চড়তে ওর ফাদার কোনোদিন জানে না, তার 'মাদার।'—খুব চিকিৎসার ব্যবস্থা করছেনত। কতদিন সারতে লাগবে খুলে বলুন—"

"একমাসও লাগতে পারে, দুমাসও লাগতে পারে। আবার ছ'মাসও যেতে পারে—চিকিৎসা আরম্ভ করুন তো। এই আন-ন্যাচুরেল লজ্জা প্রায় দেখা যায় পৃথিবীর জীনিয়াসদের মধ্যে। আমার মতে জীনিয়াসরা সবাই নার্ভস্, আর তাদের সকলেরই লিভার খারাপ।'

'কৈ আমার তো ওসব খারাপ নয়।'

"হাতে কতক্ষণ?" বলে ডাক্তার নাম ঠিকানা নিয়ে প্রেসক্রিপসন লিখে দিল, আর বলল: 'এই ওষুধ দুবেলা খাওয়া এবং এর সঙ্গে আর একটা জিনিস ওকে করতে হবে—যেটা এসেনসীয়াল। অনেক লোকের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে একে চেঁচিয়ে কিছু বলানো বা আবৃত্তি করানো অভ্যাস করাতে হবে—নইলে লজ্জা যাবে না। এটা করানোই চাই।' সখারাম হাঁ করে চিকিৎসা পদ্ধতি শোনে এবং মাদার কাঁদো কাঁদো হয়ে ডাক্তারের দিকে তাকায়।

'ওষুধ?'

'আমার কাছ থেকেই নিতে পারেন—আমেরিকার বেষ্ট মেডিসিন রাখি আমরা।'

তবে একমাসের মতই ওষুধ দিন।' সখারাম বলেন।

তাঁর বাজারে কেনা বেচার কথা মনে হয়, যত বেশি জিনিষ নেওয়া যায় ততই নাকি দাম কম পড়ে।

ওষুধ ও টনিক দিয়ে ডাক্তার দাম চান। সখারাম বলেন: 'এখন তো কিছুই বিশেষ সঙ্গে আনিনি—'

'অন্ততঃ পাঁচটাকা দিয়ে যান—বাকিটা একদিন বাড়ী গিয়ে নেব।' সখারামের ধাত ছাড়বার উপক্রম হয় টাকার অঙ্ক শুনে। এ কি রে বাবা। পাঁচ চেয়ে আবার বলে কিনা বাকি রইল। কি আর করে, মুখ পাঁচন খাওয়ার মতন করে টাকাটা দিয়ে শূন্য হৃদয়ে সখারাম সাইকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্টের পদ্ধতি জেনে মাদারকে নিয়ে বাড়ী ফেরেন, সাতদিন পরে, আবার রোগীর অবস্থা জানাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে।

এসে দয়াময়ীকে বলে: 'শেষ। এই শেষ চিকিৎসা। বুঝেচো?' এর মধ্যে কি আর দয়াময়ীর পুরাণো তেঁতুলের য়্যাক্‌সান হবে না?

ওষুধ খাওয়ানো চলে। এবার সাইকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট আরম্ভ হবে মাদারের। যেদিন দিনস্থির হলো সেদিন মাদারের জ্বর এলো। দয়াময়ী গায়ের উত্তাপ পরীক্ষা করে সখারামকে বল্লেন গিয়ে: 'ওগো ছেলের জ্বর যে—'

শুনে সখারাম ছাড়েন হুঙ্কার,: 'জ্বর না আরো কিছু। ওসব চালাকি। ওর লজ্জাটজ্জা সব ঝাড়ব আমি বোঝার মতো—নগদ পাঁচ পাঁচটা টাকা দিতে হয়েচে'—ছুটে যান মাদারের ঘরে—মাদার গলা থেকে পা পর্যন্ত মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। সখারাম পাশে বসেন—দয়াময়ীও। আরে সখারাম ও করছে কি? সরাসরি হাতটা জামার বোতাম খুলে চালিয়ে দ্যান ভেতরে—মাদার মরিয়া হয়ে হাত ঠেলে দিয়ে উঠে কাঁদো কাঁদো হয়ে দয়াময়ীর দিকে চেয়ে বলে: 'আমি ঠিক মরে যাব—এ্যাঁ-এ্যাঁ।'

দয়াময়ী শঙ্কিত হয়ে বলে: 'ছেলের জ্বর হয়েচে—ওকি করচো ওকে?'

সখারাম বলেন: 'বগলে রসুন রেখে জ্বর করেচে। পাছে ভীড়ের মধ্যে যেতে হয়—পরীক্ষা করব—ছাড়ব না। তাগাদায় বেরিয়ে এসব ফিচলেমি বুদ্ধি তো আসেনা—তাতে দু'পয়সা আসবে যে।'

অবশেষে মাদারের বগল থেকে রসুনই বেরয়। দয়াময়ী হেসে লুটিয়ে পড়েন, সখারাম ছাড়তে থাকেন গর্বিত হুঙ্কার। মাদারের অবস্থা কহতব্য নয়। দয়াময়ী বলেন:—'তোমার অত্যাচারে ও কোন্‌দিন না পালায়।'

বেরতেই হয় মাদারকে সখারামের সঙ্গে, নিস্তার নেই। মাদারের হাত ধ'রে রাস্তায় চলেন সখারাম। ভীড় চাই তাঁর—ভীড় চাই বিনা খরচে—মানে সিনেমা থিয়েটারে না গিয়ে। হঠাৎ একটা জায়গায় ভীড় দেখে দাঁড়ান। একটা লোক বিচিত্র পোষাক পরে কি যেন ফিরি করছে, তার চারপাশে অনেক লোক। সখারাম আনন্দে বলেন: 'ঠিক হয়ে'ছে।' মাদারকে সস্নেহে বলেন: 'মাদার, মাণিক আমার। বলো, এইখানে দাঁড়িয়ে এদের কিছু বলো।'

মাদার কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে: কি 'বলব?'

'তোমার যা প্রাণচায় মাণিক আমার। খুব চেঁচিয়ে বলো, গলা যাতে চিরে যায়। এ না করলে তো তোমার অসুখ সারবে না ধন।'

'আমি তো কিছু জানিনে।'

'জানো বৈকি সোনামণি, ইস্কুলে পড়া পদ্যটদ্য যা মনে আসে বলো।'

'আমি যে সব ভুলে গেছি।'

সখারাম ফ্যাঁসাদে পড়েন। এ ছেলে সোজা নয়। মনে মনে রেগেই তিনি সামলে নেন। ডাক্তার বারণ করেছে ধমক দিতে। পথে গোরু যাচ্ছিল হেলতে দুলতে। সেইদিকে চেয়ে সখারাম বলেন: 'ভুলে গেছো—হুঁ। আচ্ছা ইয়ে, গৌ গাবৌ গাব: ওইটাই মুখস্ত বলো। বলো তাড়াতাড়ি, ভীড় পাতলা হয়ে যাবে যে এখুনি।'

'আমি ওসবও ভুলে গেছি।'

সখারাম পড়েন অকূল পাথারে। এদিক ওদিক তাকান, পকেট হাতড়ান, না: কোনো কিছু দেখে যে পড়বে এমন কিছু আনেননি সঙ্গে।

হঠাৎ হাতে যেন স্বর্গ পান, একটা একুশ ইঞ্চি লম্বা থিয়েটারের বিজ্ঞাপন তাঁর হাতে এসে পড়ে। ইয়া গণেশ। উল্লাসে চেঁচিয়ে বলেন: 'এই। এই পেয়েছি—এইটাই আগাগোড়া পড়ো চেঁচিয়ে—খুব চেঁচিয়ে। তোমারও

উপকার হবে থিয়েটারেরও প্রচার হবে—চাই কি পাশও পেতে পারো এই জন্যে।'

চারপাশে লোকের কৌতূহলী দৃষ্টি—মাদার ভয়ে নীলবর্ণ হয়ে গিয়ে থর থর করে কাঁপে। সখারাম বলেন: 'আচ্ছা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আগে, তারপর তুমি পোড়ো।' বলে সখারাম হ্যাণ্ডবিল দেখে চীৎকার করে পড়তে আরম্ভ করেন: 'শ্রীশ্রীনটনাথায় নমঃ, মিনার্ভা থিয়েটার—যে নাটকের হৃদয়বিদারক অভিনয় দেখিয়া সহস্র সহস্র নরনারী-শিশু কাঁদিয়াই আকুল সেই মর্ম্মস্পর্শী—'

পাশের লোকদের মধ্যে হাসির রব ওঠে। কিন্তু সখারাম পড়ে যান, একজন বলে: 'লোকটা পাগল—'

মাদার ভয়ে নীলবর্ণ হয়ে চোখ বুজে অস্ফুট কাতরকণ্ঠে কি যেন বলতে থাকে—মনে হয় সে যেন সহসা অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছে। মুহূর্তে হাসি থেমে যায়। একজন বলে: 'ও মশাই—শুনচেন—ছেলেটাকে তাড়াতাড়ি ডাক্তারখানায় নিয়ে যান, অসুস্থ হ'য়ে পড়েচে।'

সখারাম হাতের হ্যাণ্ডবিল মুখের কাছে থেকে নামিয়ে ব্যাপারটা দেখেন, তারপর রেগে যান: 'চালাকী! ধাপ্পাবাজি—বস্তুনের মতো বিচ্ছু ছেলে—'

'বলেন কি মশাই? দেখচেন না মুখ নীল, সর্বাঙ্গ কাঁপচে। আর দেরী করবেন না।' মাদার তখন কাঁপতে কাঁপতে নীলবর্ণ হয়ে রাস্তায় পড়ে যায় আর কি।

'ফিটের পূর্ব লক্ষণ। কী সর্বনাশ! চলুন আমরাই নিয়ে যাই, কাছাকাছি ডাক্তার আছে কোথাও। আপনি আসুন সঙ্গে—রুগ্ন ছেলে।' চলো খোকা চলো।'

মাদারকে একরকম কোলে ক'রে এবং সখারামকে ঠেলতে ঠেলতে জনতা এগোয়। সখারাম তাজ্জব বনে বিস্ফারিত চোখে তাকান। একটু পরেই হন্তদন্ত হয়ে বাইরে ট্যাবলেট মারা এক ডাক্তারের বাড়ী মাদারকে নিয়ে জনতা ক্ষিপ্রগতিতে ঢুকে পড়ে। ঠেলার চোটে সখারামও বাদ যায় না। এ কী রে বাবা। প্রতিবাদের শক্তি তাঁর বিলুপ্ত।

একটি বুড়ো গোছের লোক বৈঠকখানায় বসে মোটা বই পড়ছিলেন, 'সীরিয়াস কেশ' 'সীরিয়াস কেশ' মাদারকে নিয়ে এই কথা বলতে বলতে জনতার প্রবেশ, পশ্চাতে কম্পমান সখারাম। লোকের ভীড়ে বাহির ও বৈঠকখানা ভরে যায়—মাদার চোখ বুজে চেয়ারে বসে ভয়ঙ্কর কাঁপে।

বৃদ্ধ ডাক্তার উঠে প্রথমে বলেন: 'এই ছেলেটিকে নিয়েই—হুঁ, এর ফাদার কে।'

'এই যে ইনি—ইনি।' সমস্বরে জনতা সখারামকে দেখায়। ডাক্তার সখারামকে বলেন: 'আপনি ওর বাবা? আপনার মুখ থেকেই'—সঙ্গে সঙ্গে সখারাম চীৎকার করে বলেন: 'আসল বাপ নই। নকল—নকল, নইলে এতো ধকল সইতে হয়?'

এ্যা।' ডাক্তার মুখের দিকে চেয়ে শুধু বলেন: 'ও—তা তাতেই হবে—কেসটা কি শুনি।'

একজন বলে:—রাস্তায় ছেলেটি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েচে—চিকিৎসার জন্যে আপনার কাছে এনেচি—তাড়াতাড়ি দেখুন—হার্টের—'

ভদ্রলোক বলেন: 'তা আমার কাছে কেন?' আমি তো ডাক্তার নই।'

'এ্যা সে কি! সে কি। ট্যাবলেটে এম.-বি লেখা আছে তাই জন্যেই তো ঢুকলুম।' সকলে সবিস্ময়ে বলে। জনতার মধ্যে চাঞ্চল্য জাগে। একজন বলে: 'এম, বি কি ডাক্তারি ছাড়াও আর কিছুর টাইটেল হয় নাকিরে বাবা।'

'ভুল হ'য়েচে। ভুল হ'য়েচে আপনাদের—যদিও তার জন্যে অপরাধী আমি নিজে, ব্যাপার কি জানেন? আমি, আমি এম, এ, বি, এল। ট্যাবলেটটা অনেকদিনের পুরণো কি না তাই 'এমের' পাশে 'এ' 'বি' এর পাশে 'এল' উঠে গিয়ে এই 'এম, বি' বিভ্রাট! তা আমি ডাক্তার না হই, আমার ভাইপো ডাক্তার। তাকেই ডেকে আনাচ্ছি ঐ মোড়ে থাকে।" জনতা তাজ্জব বনে মুখ চাওয়া-চাউয়ি করে। একটু পরে কোট প্যাণ্ট পরা আসল ডাক্তার আসে। সখারামকে জনতা ছেলের বাবা বলে পরিচিত করে দেয়। ডাক্তার শান্ত কণ্ঠে বলেন: 'এর অসুখটা কি?'

সখারাম কথা কন না, শুধু হাঁপাতে থাকেন। আবার প্রশ্ন। কিন্তু, সখারাম নিরুত্তর। ডাক্তার বিচলিত হয়ে বলেন: 'কি অসুখটা বলুন?'

'কি অসুখ?' সখারাম সহসা বোমার মতো ফাটে: 'এ যা অসুখ তার ওষুধ নেই। এলাপাতিক হোমোপাতিক

বায়োকেমিক সাজারি কবিরাজি হেকিমি জলপড়া কোথাও ওষুধ নেই এর—বুঝেছেন। শিবও পারবে না সারাতে। স্বয়ং শিবকে খলনুড়িতে মেড়ে মধু মকরধ্বজের সঙ্গে খাওয়ালেও এ ব্যাটাচ্ছেলের আশা নেই—এক শুধু ওষুধ আছে—প্রহার—প্রহার—প্রহার।' বলে কাঁপতে কাঁপতে সংহার মূর্তিতে সখারাম ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

বাড়ীতে ঢুকতেই বাধা পান। সেই ডাক্তার দরজার কাছে মোলায়েম ভাবে 'স্বাগতম' জানান কম্পিত ক্রুদ্ধ সখারামকে।

'কি—চাই কি আপনার?' সখারাম কটমটিয়ে তাকান।

'ছেলেটি কেমন আছে—অনেক দিন খবর পাইনি।' ডাক্তার বলে।

'হ'য়ে গেছে—হ'য়ে গেছে—আর কিছু দরকার নেই আপনার।' বলেন সখারাম হাঁফাতে হাঁফাতে।

'সেরে গেছে—বেশ বেশ। কী যে প্রীত হলাম সখারামবাবু—' যাক্, এখন একমাসের ওষুধের দামটা আমার চুকিয়ে দিন। খুব তাড়াতাড়ি ওষুধের ফল হয়েছে যাহোক।'

'সাতদিন খেয়েচে—বাকীটা আপনাকে ফেরৎ দিচ্চি—আপনাকে পাঁচটাকা দেওয়া হয়েছে, সাতদিনের কেটে বাকী দামটা ফেরৎ দিয়ে যান।' বলেন সখারাম।

'বলেন কি মশাই। ওষুধ ফেরৎনেব কি?' ডাক্তার অবাক।

'নেবেন না কেন? ওষুধ নতুনই আছে। ও ওষুধ কি আমরা খাবো নাকি।'

'আচ্ছা নিয়াসুন—হিসেব করে বলচি সাতদিনের ওষুধ আর ভিজিট নিয়ে আমার কত পাওনা হয়।'

'পাওনা হবে আমার।' বলে সখারাম রাগে গোঁ-গোঁ করতে করতে উপরে ওঠেন। 'জুচ্চুরি বার করচি। কান মলে টাকা আদায় করে ছাড়ব' মনে মনে সখারাম তাল ঠোকেন। 'বাঁচোয়া, মস্ত বাঁচোয়া! দুতিন টাকার ওপর দিয়েই যাবে, পাঁচটাকার মধ্যে ২।৩ টাকা অন্তত সখারাম ডাক্তারের কাছ থেকে ফেরৎ পাবার আশা করেন। উপরে ঘরে গিয়ে আলমারিতে যেখানে ওষুধ রেখেছিলেন সেটা খোঁজেন, কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা—ওষুধ নেই। শুধু খালি শিশিগুলো একের পর একটি বেরতে থাকে—ওরে বাবারে। এ কী সর্বনাশ। ব্যাটারছেলে একমাসের মিষ্টি মিষ্টি ওষুধগুলো এক দিনেই খেয়ে মেরে দিয়েছে। টনিকের বোতলটা কই, সেটাও নিশ্চয় খালি করে ছিলো—দয়াময়ী বোধ হয় শিশিবোতল-ওলার কাছে তিন পয়সায় বাণিজ্য করেছে। সখারাম মাথায় হাত দিয়ে নিচে নেমে আসে—কী হতাশ চেহারা বেচারির।

ডাক্তার বলে: 'ওষুধ কই?'

সখারাম মাথায় হাত দিয়ে বিহ্বল হয়ে বলে: 'নেই-নেই, ব্যাটার ছেলে কদিনেই সন্দেশের মতো সব খেয়ে ফেলেছে।'

'তাই বলুন—তাই বলুন। ঐ জন্যেই এত তাড়াতাড়ি ফল হয়েছে।' ডাক্তার বলেন বুক ফুলিয়ে: 'যান এবার টাকাটা নিয়াসুন, কিছু পুরস্কার দেবেন তাড়াতাড়ি সারানোর জন্যে। ওরকম করে দাঁড়িয়ে কেন—চটপট যান।'

'ক—ত।'

'আজ্ঞে এই সাতাশটাকা বারো আনা।'

'এ্যাঁ।' আর্তনাদ করেন সখারাম।

'হ্যাঁ—তাড়াতাড়ি যান।'

সখারাম সহসা বোমার মতো ফেটে পড়েন, চীৎকার করে বলেন: 'সাতাশ টাকা ঐ ওষুধের দাম? চালাকী পেয়েছেন! সাত আনাও দেবো না। দামী ওষুধে বিষ থাকে, একসঙ্গে বেশি খেলেই লোকে অক্কা পায়। এ স্রেফ্ চিনির বড়ি! নইলে সবটা খেয়েও ব্যাটাচ্ছেলে এখনো টিঁকে আছে।

আমেরিকান্ ওষুধ, দাম এক পয়সাও কম হবে না ওর—দিতেই হবে।' বলেন ডাক্তার।

'আপনার লজ্জা করে না—লজ্জা করে না এতো দাম চাইতে। একটুও লজ্জা করচে না?' সখারাম হুঙ্কার ছাড়েন।

ডাক্তার তো অবাক।

'লজ্জা করবে কি বলচেন মশাই? আপনি লজ্জা নিবারণের জন্যে এত টাকা খরচ করচেন, আমি ওষুধ দিয়ে সারিয়ে দিলুম সেই লজ্জা, আর আপনি আমাকে এখন বলচেন কিনা লাজুক হতে? এ্যাঁ?

আরে মশাই নিজের এ রোগ থাকলে কি আর পরের এ রোগ এতো তাড়াতাড়ি কিওর করতে পারি? ঐ লজ্জা নিবারক দামী ওষুধ যা খাইয়ে আপনার ছেলেকে এত তাড়াতাড়ি সারালুম তারই আবহাওয়ায় থাকি দিনরাত, তাই লজ্জা একেবারে কাছে ঘেঁসতেই পারে না। হাঁ দেখুন আপনার ছেলেকে আর ওষুধ খাওয়াতে হবে না বটে, তবে আমার ডিস্পেনসরির ওষুধের আবহাওয়ায় রোজ কিছুক্ষণ করে থাকলে ভালো হয়—তার জন্যে চার্জ লাগবে না আপনার। তারপর মোলায়েম হেসে বলেন: 'টাকাটা নিয়ে আসুন—প্লিজ!'

'মাদার' কিন্তু এরপর থেকে সত্যিই একেবারে নির্লজ্জ হয়ে উঠেছিল।

শেষ

স্নেহের যাদুবল

বালক যাদুকর দেবকুমার ঘোষাল

কিছুদিন পূর্বে "কাল্পনিক সম্মোহন" (Suggestive Hypnotism) সম্বন্ধে আমি পাঠশালায় একটী প্রবন্ধ লিখি, তাহার তাৎপর্য ছিল এই যে মানুষের মধ্যে অনন্ত শক্তি বিদ্যমান, উহার স্তর ও প্রকাশভেদ এতই বিচিত্র যে আমরা তাহার আংশিক প্রকাশ দেখিলেই বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যাই। হিপ্‌নোটিজম্, মেসমেরিজম্, থট্‌রিডিং, মাইণ্ডরিডিং এগুলি ঐ অনন্ত শক্তির বিভিন্ন স্তরের সামান্য অভিব্যক্তি মাত্র, কিন্তু ঐ শক্তির যথার্থ অনুশীলন করিতে পারিলে—এই মানুষ কত যে অসাধ্য সাধন করিতে পারে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ক্ষুদ্র শক্তি মানব বলিয়া আমরা আত্মদিগকে অবজ্ঞা করি, নিজেদের উপর বিশ্বাস হারাইয়া দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিই, কিন্তু, আমরা যদি—আত্মশক্তির সম্যক অনুশীলনে অগ্রসর হই তাহা হইলে সকল দুর্বলতা দূর হইয়া—আমাদের জীবন এক মহামহিমায় মণ্ডিত হইয়া উঠিতে পারে। আজ একটী গল্প অবলম্বনে এ বিষয়ের সত্যতা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব।

কোন এক হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক একটী গাভী পুষিয়াছিলেন। তিনি বারানসীতে পুলিশ ষ্টেশনে জমাদারের কায করিতেন। ঐ গাভীটিকে তিনি স্বীয় জননীর ন্যায় সেবা ও যত্ন করিতেন, এবং অত্যন্ত ভালবাসিতেন। যথাকালে উক্ত গাভীর একটী অতি প্রিয়দর্শন বৎস হয়। অতি কঠোর কর্তব্যের অবসরেও তিনি উহাদের যত্ন ও তত্ত্বাবধান লইতে কোন ত্রুটি করেন নাই। গৃহে ফিরিয়া যখনই তিনি 'মা' বলিয়া ডাকিতেন, গরুটী তখনই 'শব্দ', করিয়া উত্তর দিত এবং কাছে ছুটিয়া আসিত, বৎসটীকেও 'বহিন্' বলিয়া ডাক দিবা মাত্র কোলের ভিতর আসিয়া শুইয়া পড়িত। একদিন তিনি থানা হইতে আসিয়া শুনিলেন বৎসটীকে পাওয়া যাইতেছে না। শুনিয়াই তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন এবং চতুর্দিকে বৎসের সন্ধানে লোক পাঠাইলেন ও নিজেও ছুটিলেন, কিন্তু বহু অনুসন্ধানেও বৎসটীর খোঁজ মিলিল না। তিনি হতাশ হৃদয়ে ঘরে ফিরিয়া শোকে মুহ্যমান অবস্থায় বসিয়া আছেন, এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া সংবাদ দিল পাঠানমহল্লার কসাইরা বৎসটিকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়েছে। বোধ হয় এতক্ষণ হত্যা করিয়াছে। ইহা শুনিবামাত্র তিনি পাগলের মত সেইখানে ছুটিয়া গিয়া দেখিতে পাইলেন সেখানে কোন লোকজন নাই, কিন্তু বৎসটি ছিন্ন-মুণ্ড অবস্থায় মাটিতে পড়িয়া আছে। দেখিয়াই তিনি বালকের ন্যায় কাতরভাবে চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। পরক্ষণে কি ভাবিয়া গৃহে ফিরিলেন এবং একটী শাণিত তরবারী হস্তে পুনরায় সেই মৃত বৎসটীর কাছে ছুটিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিতে পাইলেন জনৈক কসাই উক্ত বৎসটীর চামড়া তুলিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে। তিনি বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া সেই শাণিত তরবারির এক আঘাতে কসাইয়ের মুণ্ডটী

কাটিয়া ফেলিলেন এবং রক্তাক্ত অবস্থায় থানায় গিয়া নিজ অপরাধের কথা জানাইলেন। তারপর আর তিনি একটি কথাও বলেন নাই।

যথাকালে আদালতে বিচার আরম্ভ হইল। আসামী পক্ষের নিযুক্ত উকীলেরা এবং জজসাহেব নিজে আসামীকে তাহার অপরাধেব বিবরণ এবং তাহাব নির্দোষিতা প্রমাণেব জন্য তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিতে কত অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু আসামী একেবারে নিরুত্তর।

জজ সাহেব তখন নিরুপায় অবস্থায় জুরীদের সহিত একমত হইয়া আসামীব ফাঁসিব হুকুম দিতেই বাধ্য হইলেন। এই ঘটনা ও মামলাব বিবরণ চারিদিকে প্রচাব হইয়া পড়িয়াছিল। কাজেই ফাঁসি দেখিবাব জন্য বহু লোক সেখানে উপস্থিত হইল। ফাঁসি কাষ্ঠে তুলিয়া দিয়া যখন আসামীকে জিজ্ঞাসা করা হইল—'তোমাব কি অন্তিম বাসনা কিছু আছে?' এইবার সকলকে স্তম্ভিত করিয়া আসামী উত্তর করিলেন—'আমাব স্নেহময়ী জননী মা ভগবতীকে মৃত্যুব পূর্বে একটীবার মাত্র দেখিতে চাই'। তৎক্ষণাৎ লোক পাঠাইয়া তাঁহার গরুটীকে সেখানে আনা হইল। গাভীটি আসামীর দিকে চাহিবা মাত্র দেখা গেল গাভীর দুই চক্ষু বহিয়া জলধারা পড়িতেছে এবং আসামী অপলক নেত্রে গরুটীর দিকে তাকাইয়া আছে। জেলার হাকিম সাহেব মুহূর্তের জন্য তাঁহাব কর্তব্য বিস্মৃত হইলেন, এ দৃশ্যে তিনিও আত্মহারা হইলেন। কিছুক্ষণ পরে আত্মসম্বরণ করিয়া তিনি ফাঁসি সম্পন্ন করিতে আদেশ দিলেন। আসামীর পায়ের তলা হইতে ফাঁসিকাষ্ঠ সরাইয়া লওয়া হইল। কিন্তু সমবেতজনতা আশ্চয হইয়া দেখিল—আসামীর পায়ের তলা হইতে কাঠখানি সরিয়া গিয়াছে বটে,—আসামীর গলদেশে রজ্জুও বাধা রহিয়াছে—কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র টান পড়ে নাই। আসামীও বেশ সুস্থ ও সহজ অবস্থায়—পূর্বের ন্যায় স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছে।. এই অভূত পূর্ব ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া সকলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত! হাকিম সাহেব তখন হুকুম দিলেন আসামীকে আব দ্বিতীয়বাব ফাঁসি দেওয়ার আইন নাই (তখন till death অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত ফাঁসি—একথাটী আইনে ছিলনা) উহাকে এখনি খুলিয়া আনা হউক। আসামীকে খুলিয়া আনা মাত্র আসামী 'মা' 'মা' শব্দে গাভীর পদপ্রান্তে মূর্ছিত হইয়া পড়িল। বহু চেষ্টা ও সেবা শুশ্রূষাব পর আসামীর জ্ঞান হইল।

এই ঘটনা দেখিয়া হাকিম সাহেব ও অন্যান্য সকলে তাঁহাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিলেন এই অসম্ভব ব্যাপাব কি করিয়া সম্ভব হইল আমাদের বলুন। আসামী বলিলেন আমি তাহার কিছুই জানিনা, শুধু এইমাত্র জানি—ফাঁসি কাষ্ঠখানি যখন আমাব পায়েব নিচ হইতে সরিয়া গেল তখন অকস্মাৎ দেখিলাম সেই কসাইদেব দ্বারা নিহত গো-বৎসটি আসিয়া তাহাব পিঠের উপর আমাব পাদুটি ধরিয়া রাখিয়াছে। আমি এই আশ্চর্য ও অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে মূর্ছিত হইয়াছিলাম।

অনেকেই বিস্ময়কর ম্যাজিক দেখিতে ও শিখিতে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হন, কিন্তু, ভাবিয়া দেখুন ইহার অপেক্ষা বড় বা আশ্চর্য ম্যাজিক দুনিয়ায় আর কিছু হইতে পারে কি? কত বড় গভীর সত্য—স্নেহ প্রীতি ভালবাসার কী অদ্ভুত শক্তি এই দৃষ্টান্তের মধ্যে নিহিত আছে। কিন্তু আমাদেব মন—আমাদেব চোখ সেদিকে যায় কই? আমরা উন্নত হৃদয় বৃত্তিজাত এই মহাশক্তি সাধনা ভুলিয়া কৃত্রিম ম্যাজিক ও ভোজবাজী ইত্যাদি—তুচ্ছ জিনিষে মত্ত রহিয়াছি—কাঞ্চন ফেলিয়া কাচ কুড়াইতেছি।
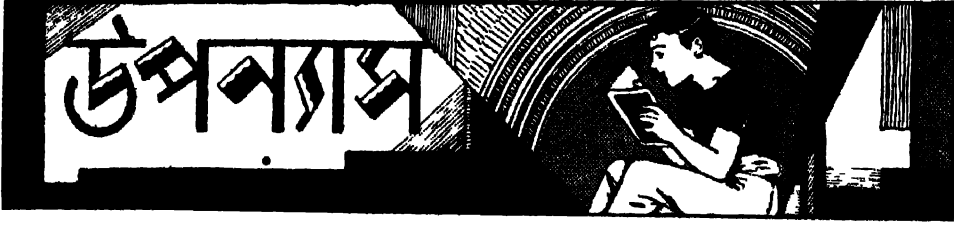
পরাগ ও রেণু

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(দেওয়ানজী ম'শায়)

দেওয়ানজী ম'শায়ের জীবনের অধিকাংশ কেটে গেছে লক্ষ্মীপুরেই। বৈষয়িক কাজকর্ম উপলক্ষে যদিও তাঁকে মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতে হয়েছে, কিন্তু সে দু'চার দিনের জন্য। কাজেই কলকাতা শহর এবং শহরবাসী সম্বন্ধে তাঁর নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না। আজ প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর তিনি লক্ষ্মীপুরের এই রায় পরিবারের একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী হিসাবে দায়িত্বপূর্ণ দেওয়ানী পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। রায়েদের জমিদারীর কোথায় কি আছে সমস্ত তাঁর জানা। হিসাব নিকাশ তাঁর নখদর্পণে। কোষাগার ও তোশাখানার প্রত্যেকটি মূল্যবান জিনিসের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় রয়েছে।

লক্ষ্মীপুরের দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার রাজা বাহাদুর মহেন্দ্ররায়কে সবাই যমের মত ভয় করে। ভয় করেন না তাঁকে শুধু এই দেওয়ানজী ম'শায়। কারণ তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ কর্তব্যপরায়ণ অক্লান্তকর্মী। রাজা বাহাদুর সেটা ভাল করেই জানতেন বলে তাঁর বিশাল জমিদারীর এই সর্বোচ্চ কর্মচারীকে সম্মান করে চলতেন। দেওয়ানজী ম'শায়ও প্রভুর প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেই চলতেন। ফলে উভয়ের মধ্যে প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধটা ক্রমে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমপূর্ণ বন্ধুত্বের সম্পর্কে পরিণত হয়েছিল।

রাজাবাহাদুর এই দেওয়ানজী ম'শায়কে ভাল করেই চিনতেন, অর্থাৎ, তিনি কি চরিত্রের লোক কি প্রকৃতির মানুষ, এসব খুঁটিয়ে তাঁর জানা ছিল। দেওয়ানজী ম'শায়েরও খামখেয়ালী মহেন্দ্র রায়ের অন্তরের পরিচয় অগোচর ছিল না। তিনি যে কি মেজাজের লোক এটা দেওয়ানজী ম'শায় যতটা জানতেন তেমন আর কেউই জানত না। কিন্তু, সেই দেওয়ানজী ম'শায়ও আজ কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিলেন না যে রাজাবাহাদুর মহেন্দ্রবাবু তাঁর এমন গুণবতী লক্ষ্মীস্বরূপিণী পুত্রবধূর এ পর্যন্ত মুখদর্শন করেন নি কেন, এবং তাঁর একমাত্র বংশধর অমন সোনার চাঁদ ছেলেকেই বা এমন একটি সর্বগুণালঙ্কৃতা মেয়েকে বিবাহ করার জন্য জন্মের মত ত্যাগ করেছিলেন কেন? সে কি শুধু বংশ মর্যাদার দম্ভে ও আভিজাত্যের অহঙ্কারে?

আজ এই কয়দিন কলকাতায় এসে পরাগ ও তার মায়ের সঙ্গে পরিচিত হয়ে দেওয়ানজী মনে মনে এদের গুণের অনুরাগী হয়ে পড়েছিলেন। পরাগের পিতাকে তিনি শিশুকাল থেকেই দেখে এসেছেন। সেই শান্ত প্রকৃতির সংস্বভাবের ছেলেটিকে তিনি আপন সন্তানের মতই ভালবাসতেন। তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, প্রখর মেধা ও সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের তিনি মনে মনে প্রশংসা করতেন। ভবিষ্যতে এই ছেলেই লক্ষ্মীপুরের জমীদার হবে একথা মনে করে তিনি আত্মপ্রসাদ ও গর্ব অনুভব করতেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে সেই ছেলে যখন পিতার ত্যাজ্যপুত্র হয়ে অজ্ঞাত অপরিচিতের মত এই শহরের এক সওদাগরী অফিসের কর্মচারীরূপে কাজ করতে করতে অকালে স্বর্গে চলে গেল, দেওয়ানজী ম'শায় বালকের মত কেঁদেছিলেন। এটা তাঁর কাছে ভগবানের অবিচার বলে মনে হয়েছিল। সন্তানের প্রতি আপন প্রভুর নিষ্ঠুর অন্যায়ের জন্য তিনি আন্তরিক বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

পরাগকে চোখে দেখে পর্যন্ত, ছেলেটির সঙ্গে অল্প

গুটিকয়েক কথা বলার পর থেকে, হঠাৎ দেওয়ানজী ম'শায়ের মনে সেই পূর্ব স্মৃতি প্রবল হয়ে ফিরে এসেছিল। এ ছেলেটিরও বুদ্ধির প্রখরতা তাঁকে বিস্ময়ে অভিভূত করে ফেলেছিল। পরাগের প্রতি প্রথম থেকেই একটা প্রগাঢ় স্নেহের আকর্ষণ তিনি অন্তরে অনুভব করেছিলেন। আজকের এই আত্মীয়পরিত্যক্ত অসহায় ছোট ছেলেটির ভবিষ্যৎ যে একদা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে প্রবীণ দেওয়ানজী সেটা নিঃসংশয়ে বুঝতে পেরেছিলেন। লক্ষ্মীপুরের জমিদার বংশের গৌরব ও মর্যাদা যে একদিন এই ক্ষুদ্র বালকের দ্বারা মহিমান্বিত হয়ে উঠবেই এই সুনিশ্চিত সম্ভাবনা কল্পনা করে তিনি আনন্দে যত শীঘ্র সম্ভব পরাগকে তার পিতামহের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়েছিলেন।

আজ তাঁর কেবলই মনে পড়ছিল সেদিনের কথা, যেদিন রাজাবাহাদুর মহেন্দ্ররায় কলকাতা থেকে রণেন্দ্রের চিঠি পেলেন যে, সে উমাকেই বিবাহ করবে বলে কথা দিয়েছে। একটি পিতৃমাতৃহীনা দুখিনী অনাথা মেয়েকে অভয় দিয়ে এখন আর কোনো কারণেই সে তাকে পরিত্যাগ করতে পারবে না, তা যদি সে করে তাহ'লে সে হবে তার পক্ষে কাপুরুষতা। শেষের দিকে সে লিখেছিল—'আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি আপনার এ অন্যায় আদেশ কিছুতেই পালন করতে পারব না। আমি আপনার অযোগ্য সন্তান নই।' উঃ! সেদিন মহেন্দ্র রায়ের সে কী ভীষণ মূর্তি! ক্রোধে আত্মহারা হয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ দেওয়ানজী ম'শায়কে ডেকে পাঠিয়ে হুকুম দিয়েছিলেন—"তাকে লিখে দিন আপনি এই মুহূর্তে যে লক্ষ্মীপুরে সে যেন জীবনে আর কখনও না আসে। আজ থেকে আমার সন্তান বলে যেন আর পরিচয় না দেয়। আমিও ছেলের মুখদর্শন করতে চাইনা। আমার সম্পত্তির এক কপর্দকও পাবার সে যেন কখন না আশা করে।"

দেওয়ানজী ম'শায় তাঁকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁর ক্রোধ শান্ত করবার জন্য বহু প্রয়াস করেছিলেন, কিন্তু, সমস্ত চেষ্টাই তাঁর ব্যর্থ হয়েছিল। যেমনি উগ্র ছিল বাপের জিদ—তেমনি কঠিন ছিল ছেলেরও পণ। পিতা পুত্রে জন্মের মত বিচ্ছেদ হয়ে গেল। রাজা বাহাদুরের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল সেই অনাথা মেয়েটির উপর। মহেন্দ্র রায়ের দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে তাঁর ছেলে রণেন্দ্রকে ভালমানুষ পেয়ে ঐ হা-ঘরের মেয়েটা তাকে ভুলিয়ে জমিদার বাড়ীর বউ হবার লোভে বিয়ে করেছে।

আজও তাঁর সে রাগ একটুও কমেনি। পরাগের মায়ের নাম শুনলে তিনি এখনও ক্ষেপে উঠে এই নিরপরাধী মেয়েটির উদ্দেশে অকথ্য কটু কথা বর্ষণ করেন। বলেন, 'আমার ছেলেকে ঐ ডাইনীই ত' খেয়েছে!'

কলকাতার মেয়েদের সম্বন্ধে দেওয়ানজী ম'শায়ের ধারণাও খুব ভাল ছিল না। দেশে বসে তাঁদের সম্বন্ধে যে সব কথা লোকের মুখে শুনতেন, তাতে একথা মনেকরা তাঁর পক্ষে কিছুমাত্র আশ্চর্য নয় যে—শহরের লেখাপড়া শেখা সৌখীন মেয়েগুলোর অসাধ্য অন্যায় কাজ কিছুই নেই। মহেন্দ্র রায়ের মুখে বার বার একই কথা শুনে শুনে দেওয়ানজী ম'শায়ের মনেও এ সন্দেহ এসেছিল যে হয়ত রাজাবাহাদুর যা বলেছেন তা মিথ্যে নয়। এমন করে জমিদারের ছেলেকে ভুলিয়ে ফাঁদে ফেলে বিবাহ করা কলকাতার মেয়েদের পক্ষে অসম্ভব নয়। শহর অতি ভয়ানক জায়গা। কতরকম মন্দ মতলব নিয়ে কত লোকই সেখানে ঘুরছে, যাদের লোক ঠকিয়ে খাওয়াই পেশা। হয়ত রণেন্দ্র তেমনি এক দলের পাল্লায় পড়ে এইরকম একটা অবাঞ্ছিত বিবাহ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছে।

দেওয়ানজীর গাড়ী প্রথম যেদিন পরাগের খোঁজে এসে ওদের বাড়ীর সরু গলির মধ্যে ঢোকে, মোড়ের মুদির দোকান, মণিহারির দোকান তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। গলির ভিতর এগিয়ে খাবারের দোকান, দর্জির কারখানা, স্যাকরার দোকান প্রভৃতি দুধারে দেখে তিনি শিউরে উঠেছিলেন এই ভেবে যে, এইরকম একটা বাজারের নোংরা গলির মধ্যে বাস করছে কিনা লক্ষ্মীপুরের জমিদার বংশের অশেষ মর্যাদাসম্পন্ন কুললক্ষ্মী? পরাগদের বাড়ীর সামনে গিয়ে যখন তাঁর গাড়ী দাঁড়াল, সেই দিয়াশলাইয়ের খোলের মত ছোট্ট নীচু একখানি বাড়ীতে লক্ষ্মীপুরের রাজপ্রাসাদ তুল্য সাতমহলা বাড়ীর মালিকরা কোনো রকমে মাথা গুঁজে বাস করছে জেনে তাঁর বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস পড়েছিল। এইরকম স্থানে এইরকম

বাড়ীতে এইরকম পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনেব মধ্যে বাস করছে যাবা, তারা না জানি কি ধবণেব লোক। কেমন দেখব যে ছেলেটাকে কে জানে। ছেলেব মাযের সম্বন্ধে হয়ত কর্তাব ধাবণাই ঠিক। ছেলেকে নিয়ে যেতে বোধহয় তাঁকে বিশেষ বেগ পেতে হবে। হয়ত ছেলের বিনিময়ে তাব মা' প্রচুর টাকা দাবী করে বসবে। এধবণেব মেয়েরা সবই পাবে।

ছেলেটা যদি ছোটলোকেব ছেলেদেব মত বেয়াড়া হয়ে থাকে, ছেলেব মা'টা যদি ইতব জাতীয়া স্ত্রীলোক হয়। এই বকম আশঙ্কায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মন নিয়ে দেওয়ানজী সেবাড়ীতে ঢুকে দ্বিধায় ইতস্তত করে প্রথম ডাক দিয়েছিলেন—'বাড়ীতে কে আছে?'

মণিব মা বেবিয়ে এসে দেওয়ানজীকে নিয়ে গিয়ে যখন উপবেব বৈঠকখানায় বসিয়ে তাব কর্ত্রীকে দেওয়ানজীব দেওয়া চিঠি হাতে খবব দিতে গেল, দেওয়ানজী সেই অবকাশে ঘব খানার চাবিদিকে চোখ বুলিয়ে দেখে নিলেন।

ঝকঝকে তকতকে ঘর, সামান্য কয়েকটি আসবাব পত্র সুন্দর কবে সাজানো। অল্প বটে কিন্তু, একটিও সস্তাব খেলো জিনিস নয়। প্রত্যেকটি সুরুচি সঙ্গত ও মূল্যবান বলে বোঝা যায়। বুককেসে ভাল ভাল বই বয়েছে। ঘবের এককোনে চীনাচ্ছাদনে ঢাকা একটি ছোট টেবিলেব উপব একটি ধ্যানী বুদ্ধ মূর্তি। ঘবেব দবজা জানালায় হাতেব কাজ কবা সুশোভন পবদা। দেওয়ালেব গায়ে মাত্র দুখানি ছবি ঝুলছে। একখানি রণেন্দ্রেব ব্রোমাইড্ এনলার্জ কবা আলোকচিত্র, অপব-খানি কাব্যবচনাবত বিশ্বকবি ববীন্দ্রনাথেব। কুশন কভাব ও টেবিলেব ঢাকা নিপুণ শিল্পীব কারুকার্যের পরিচয় দিচ্ছে। সুদৃশ্য একটি ফুলদানীতে গুটিকয়েক বিচিত্র বর্ণেব ফুল সুরম্য গুচ্ছেব আকাবে সাজানো—অভিজ্ঞ দেওয়ানজীর সতর্ক দৃষ্টি থেকে কিছুই বাদ পড়ল না। তিনি মনে মনে বলে ফেললেন—বাঃ। চমৎকার সাজিয়ে রেখেছে ত ঘরখানি। মেয়েটিব রুচিবোধ আছে বলে মনে হচ্ছে। খুব সম্ভব বণেন্দ্রেব কাছেই এসব শিখেছে। হাজার হোক বড় ঘবের ছেলের সঙ্গে বাস করেছে এতদিন, কিছুত শিখবেই।

মণির মা এসে দেওয়ানজীকে জানালেন মা এসেছেন। দেওয়ানজী ফিরে দেখে একটু চমকে উঠলেন। বিস্মিতও হ'লেন নিতান্ত কম নয়। দূরে প্রায় দোয়েব কাছাকাছি একখানি পুরু রেশমী চাদবে গা মাথা ঢাকা একটি অবগুণ্ঠিতা মহিলা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। পবণে তাঁর হিন্দু বিধবার সাদা গবদেব থান। দেখা যাচ্ছে শুধু গৃহতলেব মর্মব পৃষ্ঠে লীন দু'খানি অনাবৃত সুগৌবচরণ। লক্ষ্মীব সুগঠিত চবণ কমলেব মতই তা' সুশ্রী ও সুন্দব।

গলায় আঁচল দিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে ভদ্র মহিলাটি যখন তাঁব উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করে দিলে দেওয়ানজী ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ে বললেন—আমাকে প্রণাম করে অপরাধী কববেন না মা, আমি আপনাদের একজন পুবাতন ভৃত্য। আপনি মনিব আমি দাস, আমি আপনাব সন্তান তুল্য যে মা।

স্নিগ্ধ সুমিষ্ট কণ্ঠে উত্তব এল—আপনি ব্রাহ্মণ দেবতারও নমস্য। বয়সে প্রবীণ—আমাব পিতৃস্থানীয়। ওবকম কথা বলে আমাদেব অপবাধী কববেন না। আপনি বসুন অনুগ্রহ কবে। আমি খোকাকে আনতে পাঠিয়েছি।

দেওয়ানজী ম'শায় বললেন—আপনি না বসলে ত আমি বসতে পাবব না মা।

উমা বললে—আমাকে 'আপনি' বলবেন না। আমার স্বর্গগত স্বামীর মুখে শুনেছি তিনি আপনাব কোলে পিঠে চড়েই মানুষ হয়েছেন। এ অনাথাকে আপনাব অভাগী মেয়ে বলে গ্রহণ কবলেই সুখী হব। আপনি বসুন—

কিন্তু তুমি অমন জড়সড় হয়ে ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে আমি বসি কেমন কবে? সে তো হয় না মা।

উমা এবাব তাব অবগুণ্ঠন মাথার উপব টেনে তুলে দিয়ে বললে—খুব হয় কাকাবাবু, আপনি বসুন। আমি ঠাকুব ঘরে ছিলুম, আপনি এসেছেন জেনে পুজোর কাপড়েই চলে এসেছি। বৈঠকখানাব এসব সোফা-কৌচে কি বসতে পাবি। আমাব কথা রাখুন, আপনি বসুন, বুড়ো মানুষ অকারণ দাঁড়িয়ে থাকবেন না।

দেওয়ানজী ম'শায়কে বসতেই হল : উমাব অবগুণ্ঠন-মুক্ত মুখেব পানে চেয়ে দেখে তিনি বিস্মিত হয়ে গেলেন। এ যে দেবতাব আশীর্বাদী ফুলের মত এক বালিকাব সরল সুন্দর নিষ্কলঙ্ক-নিষ্পাপ মুখ। একে দেখে ত আট নয় বছরের ছেলেব মা বলে মনেই হয় না।

একটা যেন বিষাদের করুণ ছায়ায় সে মুখের উপর বিধবার নিরন্তর বেদনা প্রতিবিম্বিত হ'য়ে রয়েছে। সম্ভ্রান্ত ঘরের পুত্র বধূ হবার সকল ঐশ্বর্যেই মণ্ডিত বলে মনে হল সে লাবণ্যময়ীকে।

দেওয়ানজী মনে মনে বললেন, হাজার হোক সিংহের বাচ্ছা, রণেন্দ্র কি আর যাকে তাকে বিবাহ করতে পারে! সে যোগ্য সঙ্গিনীই নির্বাচিত করে নিয়েছিল দেখছি। তার বুদ্ধি বিবেচনাকে সন্দেহ করে আমরা শুধু ভুলই করিনি, অন্যায়ও করিছি। তাকে বিষয় থেকে বঞ্চিত করে বঞ্চিত হয়েছি আমরাই। (ক্রমশঃ)

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ইউরোপের সমস্ত দেশই টাহিটিতে কয়েকজন করে লোক পাঠাবার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগল। ইংল্যাণ্ডও তাদের সঙ্গে তৈরী হতে লাগল।

ইংল্যাণ্ডের রাজা তখন তৃতীয় জর্জ। তাঁর অনুমতি অনুসারে 'রয়াল জিওগ্রাফিকাল সোসাইটি' একটি অভিযান পাঠাবার জন্যে প্রস্তুত হল। তার জন্যে "এনডেভার" নামে একটি জাহাজও বন্দরে তৈরী হয়ে রইল। কিন্তু মুস্কিল হল দলের নেতা নির্বাচনের ব্যাপারে। যাকে নেতা করা হবে সমুদ্র যাত্রায় তার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা এবং জ্যোতিষশাস্ত্রেও তার বিশেষ জ্ঞান থাকা চাই। এরকম লোক পাওয়াই মুস্কিল। অবশেষে অনেক খোঁজাখুঁজির পর লোক পাওয়া গেল—নাম তাঁর জেমস্ কুক্।

আগষ্ট মাসের এক আলো-ঝলমল সকালে কুকের নেতৃত্বে "এনডেভার" জাহাজটি ইংল্যাণ্ডের সমুদ্রোপকুল ছাড়ল। কুকের সঙ্গে চলল দুজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক—ব্যাঙ্কস্ এবং সোলাণ্ডার।

নানা বিপদ আপদের মধ্যে দিয়ে কুক এগিয়ে চললেন। পথে তাঁকে এমন ভীষণ ঝড়ের হাতে পড়তে হয়েছিল যে অনেক সময় জাহাজ থেকে অনেক জিনিষ উড়ে সমুদ্রের জলে গিয়ে পড়েছিল। শুধু তাই নয়, যায়গায়

লেখক : শ্রীমান নিখিলেশ সেন

যায়গায় তাদের অনেক অসভ্য জাতির সঙ্গে যুদ্ধ করতেও হয়েছিল। কোথাও বা নানারকম ঘুষ দিয়েও তাদের সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপন করতে হয়েছিল।

টাহিটি দ্বীপে তিনি যখন পৌছুলেন, তখন দ্বীপবাসীরা তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীদের সাদর অভ্যর্থনা করলে। এমন কি, দ্বীপের রাণী নিজে কয়েক কাঁদী কলা এবং একটি শূকর বাচ্ছা নিয়ে তাঁকে উপহার দিতে এলেন। কুক

তার বদলে রাণীকে একটা মস্ত বড পুতুল উপহার দিলেন। পুতুলটা পেয়ে রাণী খুব খুশী হয়ে উঠলেন—অত বড পুতুল তিনি কখনো দেখেন নি। আর যারা সেখানে উপস্থিত ছিল তাদেরও সকলেরই পুতুলটা খুব ভাল লাগল। কিন্তু, যেহেতু পুতুলটা রাণীকে উপহার দেওয়া হয়েছে, তারা আর পুতুলটা সম্বন্ধে কোন কথা তুলতে সাহস করলে না। কিন্তু একজন বড় সর্দার লোভে পডে আর নিজেকে সামলাতে পারলে না—রাণীর কাছ থেকেই সে পুতুলটা চেয়ে বসল। কিন্তু রাণী তাকে পুতুলটা দেবেন কেন? তখন দুজনের মধ্যে ঝগডা বেধে গেল—সর্দার বলে যে পুতুলটা তার চাইই, কিন্তু, রাণী কিছুতেই তারে দেবেন না। অবশেষে কুকই ব্যাপারটার মীমাংসা করে দিলেন। ঠিক সেই ধরণেরই আর একটা পুতুল সর্দারকে দিয়ে, বাকি যারা সেখানে উপস্থিত ছিল তাদেরও প্রত্যেককে কিছু না কিছু উপহার দিলেন। তাতে সকলেই কুকের ওপর প্রসন্ন হয়ে উঠল।

কিন্তু, কয়েকদিন পরে দেখা গেল যে উপহার পেয়েও দ্বীপবাসীরা সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত হয় নি। জাহাজ থেকে তারা প্রায়ই নানা রকম জিনিষ চুরি করতে লাগল। কোন বাছ-বিচার না করেই তারা চুরি করত। সামনে যা পেত তাই নিত। কখনও একটা কোট, কখনও এক জোডা চটিজুতো, কখনও বা একটা টুপী, আবার কখনও একখানা ক্ষুর। দ্বীপবাসীরা এভাবে চুরি করবার সুযোগ পেত এইজন্যে যে জাহাজে তাদের অবাধ গতিবিধি ছিল। একদিন এক সর্দার একটা বন্দুক চুরি করে পালাবার সময় ধরা পডে গেল। কিন্তু ক্যাপ্টেনের আদেশে তাকে কিছু বলা হল না, বরং তাকে বন্দুক ছোড়া শিখিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু বেচারা সর্দার বন্দুক ছুঁডতে গিয়ে এমন শক খেলে যে সে ধাক্কায় উল্টে মাটিতে পড়ে গেল।

এদিকে যাইহোক, যে উদ্দেশ্য নিয়ে কুক টাহিটি দ্বীপে গিয়েছিলেন সে উদ্দেশ্য তাঁর সম্পূর্ণ সফল হল। তখন কুক টাহিটি দ্বীপটা জরিপ করতে আরম্ভ করলেন। কুকের চেষ্টায় সেই প্রথমবারের মত টাহিটি দ্বীপ জরিপ হল। কুক তখন নিকটবর্তী অন্যান্য দ্বীপগুলোতে অভিযান করলেন। এই সব অভিযানে প্রায়ই দ্বীপের সর্দারেরা তাদের স্ত্রীপুত্র পরিবার নিয়ে কুকের সঙ্গী হত। তাতে কুকের লাভই হত, কেননা অন্যান্য অসভ্য দ্বীপবাসীদের হাতে বিপদে পড়লে এদের কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যেত। এমনি এক অভিযানে একবার এক দ্বীপে এক টাহিটি সর্দারের ছেলে চুরি গেল। চারিদিকে খোঁজখোঁজ পডে গেল। অবশেষে অনেক খোঁজাখুঁজির পর ছেলে মিলল। আর একবার এক দ্বীপে গিয়ে কুক দেখলেন যে তাঁরা একেবারে মানুষ-খেকোর দেশে এসে পড়েছেন। এই দ্বীপবাসীরা তাদের দেশে যে সব নতুন লোক যেত তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করত এবং যুদ্ধে যারা মারা পডত বা বন্দী হত তাদের মাংস খেত। ব্যাপারটা কি রকম একবার কল্পনা করে দেখ। যাই হোক, কুক বা তাঁর দলের কারও কোন অনিষ্ট হল না—তারা নির্বিঘ্নে সে দ্বীপ থেকে ফিরে এলেন। এই দ্বীপের কাছেই তাঁরা একটা উপসাগর আবিষ্কার করলেন, এবং তার নাম রাখলেন "ক্যানিবাল উপসাগর", কেননা তার কাছেই মানুষখেকোদের দ্বীপ। এমনিভাবে অভিযান করে একে একে তিনি প্রশান্ত মহাসাগরের প্রায় সমস্ত দ্বীপই আবিষ্কার করলেন। এই সব দ্বীপের যে যে নাম তিনি দিয়েছিলেন সেই সব নামেই দ্বীপগুলি এখনও পরিচিত।

অবশেষে ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি নিউজিল্যাণ্ডে পৌছুলেন। তাঁর আগে ইউরোপের লোকেদের দ্বীপটি সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না। ট্যাসমান নামে একজন ইংরেজ তাঁর আগে সেখানে গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু, দ্বীপটির মধ্যে ঢুকে তাঁর সম্বন্ধে কোন তথ্যই তিনি সংগ্রহ করেন নি। কিন্তু কুক তা করলেন। সুতরাং একরকম কুকই প্রথম নিউজিল্যাণ্ড আবিষ্কার করেন বলা চলে।

এর পরেই কুক অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ আবিষ্কার করেন। তাঁর অন্য সব আবিষ্কারের কথা ছেড়ে দিলেও শুধু এই একটি মাত্র আবিষ্কারের জন্যে তাঁর নাম আবিষ্কারের ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। ১৫৫২ খৃষ্টাব্দে কয়েকজন স্পেনীয় এবং ওলন্দাজ নাবিক অষ্ট্রেলিয়ার পশ্চিম উপকূল আবিষ্কার করেন। কিন্তু এই উপকূলভাগ এত অনুর্বর ছিল যে তাঁরা অষ্ট্রেলিয়া সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা করে সম্পূর্ণ মহাদেশটিকে অনাবিষ্কৃত রেখেই চলে যান। তার প্রায় দেড়শ বছর পরে ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে ড্যাম্পিয়ার নামে একজন ইংরেজ অষ্ট্রেলিয়ার উত্তরপূর্ব

উপকূলে পৌছন। কিন্তু তিনিও অষ্ট্রেলিয়ার ওই অংশকে পার্বত্য এবং অনুর্বর দেখে সম্পূর্ণ মহাদেশটিকে অনাবিষ্কৃত রেখেই ফিরে যান। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে কুক অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে পৌছুলেন, এবং প্রকৃত অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশকে আবিষ্কার করলেন—সুন্দর এবং চমৎকার, বিশাল এবং উর্বর।

অষ্ট্রেলিয়া আবিষ্কারের পর কুক যখন ইংল্যাণ্ডে ফিরে গেলেন, দেশবাসী তাঁকে সাদরে বিপুল অভ্যর্থনা জানালে এবং "ক্যাপ্টেন" সম্মানে ভূষিত করলে। [ক্রমশ

আবীর

শ্রীশচীন্দ্রনাথ গুহ

সরস্বতী পূজার পরই আমরা যে উৎসবের আশাপথ চেয়ে আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকি তা যে, শ্রীশ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা এ তোমরা নিশ্চয়ই মানবে। তার দিন যতই নিকটবর্তী হতে থাকে ততই আমরা উৎফুল্ল হয়ে উঠি, চিত্ত আমাদের নৃত্যপর হয়, মানসনেত্রে আমাদের পরিস্ফুট হয়ে ওঠে বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন ধাতুর পিচকারী, আর মনে মনে আমরা হিসেব করতে থাকি নানাপ্রকার রংয়ের। খুনখারাপী থেকে আরম্ভ করে সুগন্ধ অভ্র আবীর পর্যন্ত। তারপর যখন সত্যি সত্যি সেই শুভলগ্ন এসে একদিন উপস্থিত হয়, আমাদের স্বপ্ন যখন বাস্তবের ক্ষেত্রে রূপ পায়—সে সময়ের সে অবিমিশ্র আনন্দের আর তুলনা হয় না। কিন্তু সে কথা থাক, আজ আবীরের বিষয় কিছু বলি।

সংস্কৃত ভাষায় আবীরের নামকরণ হয়েছে—ফল্গু, এ থেকেই বাঙ্গালায় 'ফাগ' কথাটার উৎপত্তি। কথিত আছে দেবাসুরের যুদ্ধের সময় ব্রহ্মা অসুর বধ করবার জন্য প্রথম এই ফল্গু বা আবীর আবিষ্কার করেন।

পূর্বে আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে আবীর প্রস্তুত হত। আবীরের প্রধান উপাদান আর্দ্রক জাতীয় এক প্রকার গুল্মের মূল বিশেষ। স্থান বিশেষে ঐ মূল বন-আদা ও শটী নামে অভিহিত হয়ে থাকে। এর গাছ যশোহর, খুলনা প্রভৃতি স্থানের পতিত জমিতেই প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতে দেখা যায়। গাছগুলি শুষ্ক হয়ে গেলেই বোঝা যায় তাদের মূল সম্যকরূপে পরিস্ফুট হয়েছে। তখন সেগুলিকে মাটি থেকে উত্তোলন করে বেশ করে ঢেঁকিতে কোটা হয়। তদনন্তর সেগুলিকে ধুয়ে রৌদ্রে শুষ্ক করে ছেঁকে কতকটা পালোর মত করতে হয়। এই পালোকে বলে টিখুর। এই টিখুর রঞ্জিত করলেই যা হয় তাই আবীর। রং করবার জন্য দরকার হয় লোধছালের গুঁড়া আর ব্রেজিল উড বা বকম কাঠের ক্বাথ। প্রথমে টিখুরে মণ করা আট দশ সের লোধছালের গুঁড়া মিশ্রিত করে রাখতে হয়। তার পর বকম কাঠগুলি উত্তমরূপে ছেঁচে জলে সিদ্ধ করতে হয়, যখন জলটা গাঢ় লালবর্ণ ধারণ করে তখন নামাতে হয়। পূর্বোক্ত লোধমিশ্রিত টিখুরে ঐ ক্বাথের কিয়দংশ দিয়ে মিশ্রিত করে রৌদ্রে শুষ্ক করতে হয়। এইরূপ পাঁচ ছয় বার সিক্ত করে শুষ্ক করলেই সেই টিখুর রঞ্জিত হয়। তখন তা ঠিক তামাকের তালের মত তাল তাল করে থলের মধ্যে দশ বারো দিন রেখে দিতে হয়। এইরূপ থলে বন্ধ করে রাখার নাম জাগান দেওয়া। জাগান দেওয়ার নির্দিষ্ট দিন অতীত হলে তার রং বিলক্ষণ উজ্জ্বল হয়। এইবার তালগুলিকে চূর্ণ করে সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত চালনী দ্বারা ছেঁকে নিলেই আবীর প্রস্তুত পর্ব শেষ হয়। যে সিটা অবশিষ্ট থাকে তা যাঁতা দ্বারা পেষণ করে গালা বা সোলার ঠুলির মধ্যে পুরে কুমকুম্ প্রস্তুত হয়, অবশ্য উৎকৃষ্ট আবীর দ্বারাও যে কুমকুম প্রস্তুত হয়না তা নয়।

আজ কাল বাজারে যে আবীর দেখতে পাওয়া যায় তা কিন্তু এই উপায়ে প্রস্তুত হয় না। সে আবীর ম্যাজেণ্টা দ্বারা রঞ্জিত এরোরুটের পালো মাত্র। এই আবীর অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বলবর্ণবিশিষ্ট ও মসৃণ, কিন্তু হলে

কি হয় এ ব্যবহার করা সম্পূর্ণ অনুচিত। আমাদের দেশীয় প্রণালীতে যে আবীর প্রস্তুত হত তা চোখে লাগলে চোখের কোনই অনিষ্ট হত না, বরং উপকার সাধিত হত কিন্তু আধুনিক কালের আবীরে চোখের অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। কি উৎসবে, কি আমোদ প্রমোদে, কি প্রয়োজনে, সব বিষয়েই এখন দেখা যায় আমাদের লাভ হচ্ছে এই, আমরা স্বাস্থ্যের পরিপন্থী দ্রব্য ব্যবহার করে ক্রমেই স্বাস্থ্য হারাতে বসেছি এবং অর্থ যা ব্যয় করছি সবই বিদেশে চালান দিচ্ছি অকুণ্ঠিত ভাবে। এমনি করেই আমাদের অপরিণামদর্শিতার জন্য আমরা দেশীয় কত শিল্পই না বিনষ্ট করে দিয়েছি। এ বিষয়ে চিন্তা করে প্রতিকার খুঁজে বার করবার সময় আজ এসেছে

আবীর ও কুমকুম প্রধানতঃ ক্রীড়নক হিসাবেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় দোলযাত্রার সময় দেববিগ্রহের এবং বন্ধুবান্ধবের গাত্রে শুষ্ক আবীর ছড়িয়ে দেওয়া হয়। দূর থেকে গাত্রে নিক্ষেপ করবার জন্য কুমকুমের ব্যবহার। আবীর জলে গুলে পিচকারী দেওয়া হয়, কেহ কেহ আতর মিশ্রিত করে এই রং সুবাসিত করেন। ইহা ব্যতীত আবীর কিছু টান বলে বিকারগ্রস্ত রোগীর যখন অধিক পরিমাণে ঘাম নিঃসরণ হয় তখন দেশীয় চিকিৎসকগণ কখন কখন রোগীর গাত্রে আবীর লেপন করবার ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন। আবার অভ্র-আবীর না হোলে মা সরস্বতীর পূজা উপচারের অঙ্গহানি হয়, এ কথাটাও আশাকরি তোমাদের সকলেরই জানা আছে।

"অভিনব গণনা"

শ্রীব্যোমকেশ মুখোপাধ্যায়

মনে কর তোমাদের বাড়ীতে গণক ঠাকুর এসেছেন শুনেই তুমি ভাগ্য জানবার জন্যে ছুটে গেলে। গণকঠাকুর বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য তোমাকে প্রথমে বল্লে—এক হাতে লাল ফুল আর এক হাতে সাদা ফুল মনে মনে ধর। তুমিও সরল মনে তাই করলে আর সেও ঠিক ঠিক বলে দিয়ে তোমাকে তাক্ লাগিয়ে দিলে। আজ আমি তোমাকে তার চতুরীটুকু বলে তোমার বেকামিটুকু ধরে দিব।

আচ্ছা, তোমার সবচেয়ে ছোট এবং সরল ভাইটিকে ডেকে বেশ গম্ভীর হয়ে বলো—মনে মনে এক হাতে লাল আর এক হাতে সাদা ফুল ধরিতে। তুমি চট্ করে বলে দাও—ডান হাতে লাল আর বাম হাতে সাদা ফুল ধরেছিস্। কারণ পুরুষের ডান হাতটাই বেশী কর্মঠ; তুমি যা প্রথমে বল্‌বে সে ডান হাতে তাই ধরিবে আর অপরটা বাঁ হাতে নিশ্চয়ই। স্ত্রীলোকের পক্ষে কিন্তু সম্পূর্ণ উল্টো। তার বাম হাতটাই বেশী কর্মঠ অতএব প্রথমটা বাম হাতে আর অপর ডান হাতে। কিন্তু একটু চালাক চতুর হলে তার কাছে এ পরীক্ষা চলবে না। অতএব একটু সরল প্রকৃতির লোকের নিকটই পরীক্ষা করিবে এবং একজনের নিকট বার বার পরীক্ষা করিবে না। সফল হলে জানাবে।

পূর্ববঙ্গের ভুঁইয়া

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(৩)

ত্রিপুরা-রাজ্য বহু পুবাতন। চন্দ্রবংশীয় বাজা নহুষেব পুত্র মহাবাজ যযাতিব দুই মহিষী আব পাঁচ পুত্র ছিল। শর্মিষ্ঠাব গর্ভজাত সন্তান পুরুরাজ পিতৃপবিত্যক্ত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলে দেবযানীব গর্ভজ পুত্র দ্রুহ্য বাজধানী ত্যাগ কবত প্রয়াগ সমীপবর্তী প্রতিষ্ঠান নগবে বাস কবিতে থাকেন। ইতিহাস লিখে নাই, কেন তিনি সে স্থান ত্যাগ করত উত্তব দিকে অগ্রসব হইতে থাকেন। ক্রমে তিনি হিমালয়েব পাদদেশে উপনীত হন। স্থানটী মনোবম, উর্বব, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী-বিধৌত, ফুলময়। বন্যজাতি কর্তৃক অধ্যুষিত এই স্থান নববাজ্য প্রতিষ্ঠার উপযোগী বলিয়া তাঁহাব অনুচরদেব প্রতীতি হইল। তখন তিনি স্বল্প প্রদেশ জয় কবিয়া বাজধানীব নাম দিলেন ত্রিবেগ। তাবপর আসিলেন চেদিবাজ। তিনি রাজ্য বিস্তাব করত বাজ্যেব নাম দিলেন ত্রিপুব—ক্রমে ত্রিপুবা। বাজাবা অত্যন্ত যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন। নিকটবর্ত্তী রাজ্যসমূহেব সহিত ত্রিপুবার যুদ্ধ প্রায় চলিত, আরাকান, কামরূপ, প্রভৃতি দেশের সহিত তাহার বিবাদ লাগিয়াই থাকিত। সকল বাজা যে বীর ও যোদ্ধা ছিলেন তাহা মনে কবিবাব কোনো হেতু নাই। একবার ইহার এক বাজা, গৌড রাজ্যের সহিত ঝগড়া করেন। রাজাব নাম কীর্তিধব, তিনি মন্ত্রীদের পবামর্শানুসারে হিরাবন্ত নামে গৌড়েব এক অবস্থাপন্ন প্রজাকে গ্রেপ্তার করেন। গৌড এ অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য এক দল সৈন্য পাঠাইল। সৈন্য আসিয়া যখন ত্রিপুবা আক্রমণ করিল, তখন রাজা ভীত হইয়া সন্ধির জন্যে ব্যাকুল হইলেন। কিন্তু রাণী গর্জিয়া উঠিলেন, বলিলেন, সন্ধি কিছুতেই নয়,—আমি নিজে যুদ্ধে যাব। বাণী চলিলেন বাহিনীসহ যুদ্ধক্ষেত্রে এবং মহাবিক্রমে শত্রুসৈন্য আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে পবাস্ত ও দূবীভূত কবিলেন।

রাজ্যেব অধিকাংশ প্রদেশই জঙ্গল ও পাহাড়ে আচ্ছন্ন। জঙ্গল কাটিয়া জনপদ বসাইতে বাজা প্রতীপ ছিলেন অগ্রগণ্য। তাঁহার সময়ে বাজ্যের বহু উন্নতি সাধিত হয়। মহাবাজা বিজয় মাণিক্যেব সময় বাজ্য বিস্তৃত হয়, আসাম ও পূব বঙ্গেব অধিকাংশ প্রদেশ ত্রিপুবা রাজ্যভুক্ত হয়। তাবপব আমবা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় বাংলায় পাঠান নাই, মোগল আসিয়া গৌড়ে আস্তানা গাড়িয়াছে। ত্রিপুবাব আর সে আস্ফালন নাই, সে বিক্রমও নাই।

মহারাজ অমব মাণিক্য কাপুরুষ না হইলেও মোগলেব সহিত বিবোধ কবিতে অনিচ্ছুক। ঈশা খাঁ যখন তাঁহার দ্বাবে আসিয়া সাহায্য প্রার্থনা কবিলেন, তখন মহাবাজ বলিলেন, "দেখ রাজা সাহেব, আমাব কথা শোন, মোগলকে আব ঘাঁটিও না—সর্বনাশ আহ্বান করে এনো না।"

ঈশা। সর্বনাশ হয় পরাধীনতায়—

রাজা। তা বুঝি, কিন্তু স্বাধীন হোতে পারছ কই?

ঈশা। চেষ্টা করতে দোষ কি?

রাজা। বৃথা চেষ্টা। এই যে আকবর বাদশা সিংহাসনে বসেছে, এর মত হিন্দুর আর শত্রু নেই। সব একাকাব করবে, ছলে, বলে, মিষ্টি কথায়।

ঈশা। রাজপুতরা ত চেষ্টা করছে—

রাজা। চেষ্টা করা ছেড়ে দিয়ে এখন কেউ কেউ আত্মীয়তা করছে। আর দেখ রাজা সাহেব, দেশে যখন বিশ্বাসঘাতক স্বার্থপর ব্যক্তির আবির্ভাব হয়, তখন দেশের কিছুতেই কল্যাণ নেই।

ঈশা। আমাদের বাংলায় এখনও—

রাজা। হ্যাঁ, আবির্ভাব হয়েছে—তা' তুমি জান না। আজ দশ দিন তুমি বাংলা ছেড়ে এসেছ, বাংলার খবর জান না। তোমার বন্ধু চাঁদরায় হয়ত তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে।

ঈশা। অসম্ভব, আমি আজই লোক পাঠিয়ে সন্ধান নিচ্ছি।

রাজা। নিতে পার, কিন্তু আমি তোমাকে স্পষ্ট বলে দিচ্ছি, আমার নিকট হতে কোনো সাহায্য প্রত্যাশা কোরো না।

ঈশাখাঁ বুঝিলেন, মহারাজের নিকট সাহায্য প্রাপ্তির আপাততঃ কোনো আশা নাই। কিন্তু সাহায্য না পাইলে জাতীর রক্ষা নাই। তিনি শুনিয়াছিলেন, মহারাজের দরবারের উপরে আর একটা দরবার আছে, তিনি সেই সর্বোচ্চ দরবারে আর্জি পেশ করিবার অভিপ্রায়ে সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কাজেই তাঁহাকে ত্রিপুরায় রাজ-অতিথি-রূপে আরও কয়েকদিন অবস্থান করিতে হইল। বাংলায় ফিরিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া তিনি কয়েকখানা পত্র লিখিয়া বাহক মারফৎ যথাযথ স্থানে প্রেরণ করিলেন। একখানা পত্র ছিল কেদার রায়ের নামে, তাহাতে সোনামণি ঘটিত ব্যাপার লিখিত ছিল।

সর্বোচ্চ দরবারে উপস্থিত হওয়া বড় কঠিন। ঈশাখাঁ তাহা বুঝিলেন, তথাপি তিনি সুযোগ অন্বেষণে নিরস্ত হইলেন না। একদিন সুযোগ মিলিল অদ্ভুত উপায়ে। একদা তিনি চিন্তাক্লিষ্ট মনে রাজপথে ভ্রমণ করিতেছিলেন, সহসা রমণী কণ্ঠ-নিঃসৃত চীৎকার ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। দূরে দেখিলেন, এক বিপুলাকার বৃষ জনৈকা রমণীকে তাড়া করিয়া ছুটিয়াছে, সে চীৎকার করিতেছে 'রক্ষা কর, রক্ষা কর'। বৃষ ক্রমেই রমণীর নিকটবর্তী হইতে লাগিল। রমণী বুঝিল তাহার রক্ষার উপায় নাই। তাহার চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া অনেকেই ছুটিয়া আসিল, কিন্তু কেহই বৃষের নিকট যাইতে সাহস পাইল না। ঈশাখাঁ—মহাবীর ঈশাখাঁ মহাবেগে ছুটিয়া আসিয়া পশুর শৃঙ্গ দুইটী আচম্বিতে ধরিয়া তাহার পৃষ্ঠোপরি লম্ফত্যাগে উঠিয়া পড়িলেন। এবম্প্রকার ব্যবহারে বৃষ অভ্যস্ত নয়,—মহারোষে প্রবল গর্জনে সে তাহার প্রতিবাদ জানাইল। জনতা ভীত চকিত হইয়া যে যেদিকে পারিল পলাইতে লাগিল। ক্রোধোন্মত্ত বৃষ লম্ফ ঝম্ফ করিয়া আরোহীকে ফেলিবার সবিশেষ চেষ্টা করিল। আরোহী সাধারণ ব্যক্তি নহেন,—যে দুর্দান্ত অশ্বকে কেহ বশীভূত করিতে পারে নাই, তিনি তাহার নগ্নপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাহাকে বশীভূত করিয়া ছাড়িয়াছেন, পদাঘাতে বন্য শূকরকে মারিয়াছেন, তাঁহার বীরত্বের কাহিনী অনেক কিছু ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছে। আমরা ক্রমে ক্রমে তাহা বলিব।

বৃষ যখন শত চেষ্টাতেও আরোহীকে ফেলিতে পারিল না, তখন সে প্রবল নিশ্বাসে ধূলি উড়াইয়া, মহা গর্জনে দিগ্বিদিক্ কম্পিত করিয়া, জ্ঞানশূন্য হইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে লাগিল। ক্রমে সে ক্লান্ত হইয়া পড়িল। যখন অবসন্ন দেহ টানিয়া সে ধীর পদে চলিতেছিল, তখন গৃহচূড়াশ্রয়ী বহু ব্যক্তি ঈশাখাঁকে অযাচিত উপদেশ দিতেছিল, 'এইবার নেমে পালাও', 'সিং ছেড়ো না, আগে নামো' 'আমরা এখানে আছি, ভয় কি?' ইত্যাদি। বৃষ রাজপথ ছাড়িয়া যখন পথিপার্শ্বস্থ উদ্যান বা জঙ্গলে প্রবেশ করিল, তখন ঈশাখাঁর নামিয়া পড়িবার সুবিধা হইল। একটা বড় গাছের মোটা ডাল হেলিয়া পড়িয়াছিল, ঈশা শৃঙ্গ ছাড়িয়া শাখা আকর্ষণ করত চকিতমধ্যে তাহার উপর উঠিয়া পড়িলেন। পশু দাঁড়াইল; যে মানুষ কৌশলে ও বুদ্ধিতে তাহাকে পরাস্ত করিল, তাহাকে কৌতূহলচিত্তে ঊর্ধ্বমুখ হইয়া ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিল। তারপর সরিয়া পড়িল, হয়ত পুনরাক্রমণের আশঙ্কায় সে এই দুর্দান্ত মনুষ্যের সামীপ্য হইতে সরিয়া গেল। ইহার পূর্বে মনুষ্যকে যে ভয় করিতে হয় তাহা সে জানিত না। ঈশা তখন নিশ্চিন্তমনে বৃক্ষশাখা ছাড়িয়া ভূতলে নামিলেন এবং ঘটনাস্থলাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

ঘটনাস্থলে আসিয়া ঈশা দেখিলেন, ক্রমবর্ধমান্ জনতা এই অপূর্ব যুদ্ধের পরিণাম দেখিবার আশায় দণ্ডায়মান্ রহিয়াছে। তবে সকলেই নিরাপদ স্থানে। অনেকেরই

হাতে অস্ত্র, কেহ লাঠি, কেহ বা মুদ্গর, কেহ সড়কি প্রভৃতি অস্ত্র আস্ফালন করত নিজ নিজ বাহুবলের পরিচয় দিতেছিল। জনৈক রহস্যপ্রিয় ব্যক্তি সহসা চীৎকার করিয়া উঠিল, 'ঐ আসছে রে'। ইহা শুনিবামাত্র অস্ত্রধারী অভিনেতারা পরস্পর পরস্পরকে ঠেলিয়া ফেলিয়া লম্ফত্যাগে গৃহচত্বরের উপর উঠিয়া পড়িল। যাহারা চত্বরে স্থান পাইল না, তাহারা রমণী-বৃন্দের পশ্চাতে আত্মগোপন করিল। এমন সময় একটা গোল উঠিল।

গোলমালটা ঘটনাস্থলে মহারাণীর আগমন জনিত। তিনি নারী-সৈন্য ও পরিচারিকা পরিবৃতা হইয়া আসিলেন। মহারাণী ভানুমতী যখন শুনিলেন যে, তাঁহার প্রিয় ও প্রধানা পরিচারিকা শীলা হস্তি-পদতলে পিষ্ট ও মর্দিত হইয়া সকাতরে চীৎকার করিতেছে "রাণী মা রক্ষা কর", তখন তিনি জ্ঞানশূন্যা হইয়া সদলে ছুটিয়া আসিলেন। তাঁহার আগমন বার্তা অবগত হইবামাত্র শীলা ছুটিয়া আসিল। সে, ঈশাখাঁর কাছে যাইতেছিল। শীলা আসিয়া মহারাণীকে তাহার বিপদের কাহিনী সালঙ্কারে বর্ণনা করিল। তাহার উদ্ধারকর্তা কিরূপে হস্তিতুল্য বৃষকে মুষ্টাঘাতে কাবু করিয়া তাহার পিঠের উপর উঠিয়া তাহাকে মারিতে মারিতে ছুট করাইল তাহা সে জানাইল। বর্ণনা চলিতেছে, এমন সময় দূরে উদ্ধারকর্তা আসিয়া দাঁড়াইলেন। ঈশা দূর হইতে নারি-সৈন্য পরিবৃতা মহিয়সী মহিলাকে দেখিয়া বুঝিলেন, ইনিই মহারাণী ভানুমতী। তিনি আর অগ্রসর না হইয়া দূর হইতে মহারাণীকে প্রণাম করিলেন। শীলা তখন রাণীর অনুমতি লইয়া ক্ষিপ্রপদে ঈশাখাঁর সমীপস্থ হইল এবং সম্মানসহকারে নতি জানাইয়া কহিল, আপনি আমার প্রাণদাতা, আপনার ঋণ অপরিশোধ্য।

"তোমার পরিচয় জানতে পারি কি দিদি? এমন মিষ্ট কথা"—

"আমি মহারাণীর পরিচারিকা, নাম শীলা।"

"তবে ত তুমি আমার ভগ্নী হলে, মহারাণী যে আমার মা।"

"মহারাণীকে বলব, তিনি একটী ছেলে পেয়েছেন, আর আপনার মত বীর্য্যবান সন্তান। আপনার পরিচয় আমরা পেয়েছি—বাংলার রাজসিংহাসনের'—

"আমি রাজা নই বোন্—জন্মভূমির একজন পরিচারক।"

নমস্কার করিয়া শীলা বিদায় হইল। ঈশাখাঁ তাঁহার আবাসে ফিরিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন। কতদিন হ'ল তিনি বাংলা ত্যাগ করে এসেছেন, বাংলার সংবাদ পান নি। তাঁহার বন্ধু ও প্রধান সহায় উদয়নারায়ণের নিকট হতে একখানি পত্র পেয়ে বুঝেছিলেন, মোগল সেনা আজও দিল্লী ত্যাগ করে নি। বিক্রমপুর, বাক্লা, ভূষণা, উলাইল, খলসী, ফতেবাদ, সতঙ্গ, সাহাজাদপুর প্রভৃতি স্থানের ভূঁইয়াদের উপদেশ পাঠিয়েছেন সরাইলের দিকে অগ্রসর হতে, সেইখানে যেন মোগলকে বাধা দেওয়া হয়। পাঠান ও আরাকান সৈন্য যেন এগার সিন্ধু-দুর্গ রক্ষা করে। এই সব চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় শীলা আসিয়া ডাকিল, "রাজাসাহেব, দাদাজী"—

ঈশা চমকিয়া উত্তর করিলেন, "কে, দিদি?"

"মহারাণী ত্রিপুরেশ্বরী আপনাকে সন্তান বলে গ্রহণ করেছেন এবং আপনার জন্যে স্তন-ধৌত জল পাঠিয়েছেন।"

বলিয়া শীলা এক জলপূর্ণ স্বর্ণপাত্র ঈশার হস্তে প্রদান করিল। ঈশা ব্যস্ততার সহিত সেই সুবাসিত স্তনধৌত জলপান করিলেন, অতঃপর কহিলেন, "মাকে আমার প্রণাম দিয়ে বলবে দিদি, ইহা জল নয়, ইহা মাতৃদুগ্ধ। তাঁকে আশীর্বাদ করতে বলবে, এই দুগ্ধের সম্মান রক্ষা করতে আমি যেন সমর্থ হই। এই স্তনধৌত জলপানের সঙ্গে সঙ্গে আমি দেহে ও মনে অসীম শক্তি পেয়েছি— মোগলকে আর ভয় করি না।"

পরদিবস প্রাতে ঈশাখাঁকে মহারাজাধিরাজ ডাকিয়া পাঠাইলেন। এবার দরবারে নয়, নিভৃত কক্ষে। ঈশা হিন্দু প্রথায় নমস্কার করিলেন। রাজা কহিলেন, "কাল তুমি শীলাকে খুব রক্ষা করেছ। বহু লোক সমবেত হয়েছিল, কিন্তু আর কেউ ত সাহস করে বৃষের সামনে অগ্রসর হয়নি। আমার মনে হয় তোমার মত শক্তিশালী ও সাহসী ব্যক্তি বাংলায় নেই।"

"সকলে ত আপনার সন্তান নয় পিতা।"

'পিতা।' মহারাজ প্রীত হইলেন, বলিলেন, "কত সৈন্য সাহায্যে মোগলকে তুমি তাড়াতে পার ঈশাখাঁ?"

"সেটা আমার চেয়ে আপনি ভাল বোঝেন, পিতা।

আপনার ন্যায় বিচক্ষণ সৈন্যচালকের সামনে আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তি কি বলবে ?

এবার রাজা অত্যন্ত পুলকিত হইলেন। তাঁহার খুব ইচ্ছা তিনি একজন দক্ষ সেনানায়করূপে রাজ্যময় পরিচিত হ'ন। কিন্তু এতাবৎ বলবীর্য বা দক্ষতা প্রকাশের সুযোগ না ঘটায় তিনি স্তাবক বৃন্দের প্রশংসা লাভ করিয়াই হৃদয়ের ক্ষুধা মিটাইতেন। ঈষা খাঁর ন্যায় একজন প্রসিদ্ধ বীর তাঁহাকে প্রথম স্থান দেওয়ায় তিনি সাতিশয় পুলকিত হইলেন, কহিলেন, "আমি তোমাকে বাহান্ন হাজার সেনা দেব। এই সঙ্গে তোমাকে একটা বড় উপাধিও দিলাম—মচনন্দালি।" *

[ক্রমশঃ

* রাজমালা, তৃতীয় লহর।

ভাগ্যে জামাই উর্দ্দ বোঝে !

ওয়াহেদ আলি মিঞা

[গ্রাহক নং ৩৩০৪]

এক কৃপণ ব্রাহ্মণের একটিমাত্র কন্যা ছিল। পুত্র ছিল না। তাহার কিঞ্চিৎ বিষয় সম্পত্তিও ছিল। ব্রহ্মোত্তর জমির খাজনার আয়ে ও তেজারতি কারবারে সংসার স্বচ্ছন্দে চলে, কোনও অভাব থাকে না। অবিবাহিতা কন্যাটির ক্রমে বয়স হইতেছে। দুই এক বৎসর করিয়া শেষে অরক্ষণীয়া হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ নানাস্থানে পাত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কোথাও মনোমত পাত্র মিলিল না। অপুত্রক ব্রাহ্মণের ইচ্ছা যাঁহাকে জামাতা করিবেন, সে পুত্রবৎ তাঁহার বাড়ীতেই থাকিবে। বিষয়-কর্ম মামলা মকর্দমা বুঝিবে, তাহা হইলে আর নিজেকে এত ঝঞ্ঝাট ভোগ করিতে হইবে না। কন্যাদায় হইতে অব্যাহতিও পাইবেন আর সেই সঙ্গে একটা সরকার বলিলেও হয়, নায়েব বলিলেও হয় অথবা মকর্দমা মামলার তদ্বির কারক গোমস্তা ধরণের লোক বিনা বেতনে পেট ভাতায় মিলিয়া যাইবে। নিতান্ত অকর্মণ্য আত্ম সম্মানহীন ব্যক্তি ভিন্ন কে আর এমন ঘরজামাই হইতে রাজী হইবে? সুতরাং ব্রাহ্মণ অনেকদিন ঘুরিলেন, কিন্তু কন্যার জন্য মনোনত পাত্রের সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

অবশেষে এক নির্বোধ ও মূর্খ ব্যক্তি পাড়ার পাঁচজনের পরামর্শে ব্রাহ্মণের কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার বাড়ীতেই থাকিবে বলিয়া স্বীকার করিল। গ্রামবাসীরা তাহাকে শিখাইয়া দিল ব্রাহ্মণ তাহাকে যে বিষয়ই জানো কিনা জিজ্ঞাসা করিবেন, সে যেন সবেতেই সপ্রতিভভাবে হাঁ বলে। "হাঁ" ভিন্ন 'না' যেন কিছুতেই বলে না।

ব্রাহ্মণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেই ব্রাহ্মণ তাহাকে প্রশ্ন করিল, বাবাজির জমিদারী সেরেস্তার কাজকর্ম জানা আছে ?

উত্তর। হাঁ।

প্রঃ। আইন আদালত সংক্রান্ত মামলা মকর্দমার বোধ আছে ?

উঃ। আজ্ঞে হাঁ।

প্রঃ। তেজারতীর কাজ জানাশুনা আছে তো ?

উঃ। আজ্ঞে হাঁ।

ব্রাহ্মণ বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। ভাবিলেন—এতদিনে ভগবান আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়াছেন, আর বিলম্ব করিয়া দরকার কি—যতশীঘ্র পারা যায় কন্যাটি পাত্রস্থ করিয়া ফেলি। এই ভাবিয়া তিনি দিন-ক্ষণ দেখা হউক আর না হউক, তাড়াতাড়ি কন্যাটিকে সম্প্রদান করিলেন।

বিবাহের পর কিছুদিন সুখেই অতিবাহিত হইল। ইতিমধ্যে টাকা অনাদায়বশতঃ জনৈক খাতকের নামে ব্রাহ্মণকে মকর্দমার আয়োজন করিতে হয়। এবার আর ব্রাহ্মণের চিন্তা নাই, আদালতের তদ্বির কারকের জন্য কাহাকেও তোষামোদ করিতে হইবে না। ব্রাহ্মণ তাহার জামাতাকে বলিলেন, 'বাবাজী। একটা খাতকের নামে মকর্দমা করতে হবে।' জামাই সপ্রতিভভাবে বলিল "যে-আজ্ঞে।" নির্দিষ্ট দিনে ব্রাহ্মণ খুব আনন্দের সহিত জামাতাকে সঙ্গে লইয়া জেলার সদর আদালত অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ব্রাহ্মণের নিবাস বর্ধমান ষ্টেশন হইতে পাঁচ ছয় ক্রোশ দূরে।

ব্রাহ্মণ অগ্রে এবং জামাতা তাঁহার পশ্চাতে যাইতেছে। জামাতা বড় ধীরে ধীরে চলিতেছেন। কিছুদূর যাইবার পর ব্রাহ্মণ একটু অধিক অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছেন, জামাতা তখন অনেকটা পিছাইয়া আছে, এমন সময় একজন লম্বা চওড়া জোয়ান কাবুলিওয়ালা, হাতে লাঠি, গোঁফ পাকানো, বর্ধমান হইতে জাহানাবাদের পথে আসিতেছিল। সে ব্রাহ্মণকে বলিল—"এহ্ জী! জাহানাবাদ যানেকো রাস্তা কিদার্ বাতাদো'। ব্রাহ্মণ চীৎকার করিয়া জামাতাকে বলিলেন, "ও বাবাজী, এ কি বলে ?'

জামাতা। আজ্ঞে ও কিছু জলখাবার চায়।

ব্রাহ্মণ। জলখাবার তো সঙ্গে নাই।

জামাতা। তবে মূল্য ধরে দিন।

ব্রাহ্মণ কাবুলিওয়ালাকে চারি আনা পয়সা দিলেন, তথাপি সে তাহার পূর্বোক্ত প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তি করিল। "জাহানাবাদ যানেকো রাস্তা কিদার্ বাতাদো।" ব্রাহ্মণ পুনরায় চীৎকার করিয়া জামাতাকে বলিলেন, "ও বাবাজী! এ ব্যাটা পয়সা পেয়েও ক্ষান্ত হয় না যে, করি কি ?

জামাই গম্ভীরভাবে বলিল, কাপড় চোপড় যা আছে সঙ্গে সব দিয়ে দিন। ব্রাহ্মণ তাঁহার গামছা কাপড়ের পুঁটুলিটি কাবুলিকে দিলেন। কাপড় পাইয়াও কাবুলি বলিল 'মেহেরবানি করকে জাহানাবাদ যানেকো রাস্তা কিদার্ বাতা দিজিয়ে' ব্রাহ্মণ এবার কাতর হইয়া পুনরায় জামাতার শরণ লইলেন। জামাতা এতক্ষণে নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিল। এবার জামাতা ব্রাহ্মণের কানের কাছে মুখ আনিয়া ফিশ-ফিশ করিয়া শ্বশুরকে বলিল, "উপায় কিছু নেই। আপনার সঙ্গে যা রেস্ত আছে সব দিয়ে পালিয়ে আসুন, না হলে বেটা কাবুলি খুন করবে বলছে।" "এ্যাঁ" বলিয়া ব্রাহ্মণ তাঁহার পরণের ধুতিখানি বাদে আর সমস্তই কাবুলিওয়ালাকে দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে বাড়ীর দিকে ছুটিলেন। জামাতা তাঁহার আগেই দৌড় দিয়াছিল। সেদিন ব্রাহ্মণের আর বর্ধমান যাওয়াই হইল না। বাড়ী পৌঁছিতে রাত্রি হইল। ব্রাহ্মণ আসিবামাত্র ব্রাহ্মণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কইগো, তোমার বর্ধমান যাওয়া হোলো না ?"

ব্রাহ্মণ তখনও ভয়ে খাবি খাইতেছিলেন। ইঙ্গিতে সহধর্মিনীকে পানীয় জল আনিতে বলিলেন। পূর্ণ একঘটি জল পানান্তর ব্রাহ্মণ একটু সুস্থ হইলে ব্রাহ্মণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হয়েছে কি ?" ব্রাহ্মণ হাঁপাইতে হাঁপাইতে উত্তর করিলেন, "ভাগ্যে জমাই উর্দ্দু বোঝে' নাহলে আজ ঘোর বিপদ হয়েছিল। প্রাণ যেতে বসেছিল এক কাবুলির হাতে। বড্ড বেঁচে গেছি।"

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র সরকার

যুদ্ধরত য়ুরোপের বর্তমান পরিস্থিতির কিছু কিছু পরিচয় তোমরা 'পাঠশালার' প্রতিসংখ্যাতেই পাও। য়ুরোপে "নূতন ব্যবস্থা" প্রবর্তন করবার প্রচেষ্টায় জার্মাণী, ইটালি ও জাপান একত্রিত হয়ে যে সন্ধি করেছেন, তোমরা অনেকেই তা জানো। এই "নূতন ব্যবস্থার" মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে য়ুরোপে শান্তি, সমৃদ্ধি, উন্নতি ও আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃ-ভাবের প্রতিষ্ঠা করা। প্রাচ্য এশিয়াতে জাপান বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটিয়ে অপূর্ব সমৃদ্ধি ও উন্নতির প্রতিষ্ঠা করবেন, এবং য়ুরোপে করবেন জার্মাণী ও ইটালি সম্মিলিতভাবে।

জার্মাণী ও ইটালি যে-সব প্রদেশ অধিকার করে নিজেদের ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন, সে সব প্রদেশে "নূতন ব্যবস্থা" প্রবর্তনে কতদূর সফলতা লাভ করেছেন তা দেখা দরকার।

নাৎসিজম্ ও ফ্যাসিজম্—এ দুই দমন নীতিভাবাপন্ন শাসন পদ্ধতির ফলে অন্যায়, অত্যাচার, বর্বরতা, বন্দীত্ব, খুন, ডাকাতি, নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি যে বিস্ময়করভাবে প্রসার লাভ করেছে, তার জলন্ত প্রমাণ দেবে চেকো-শ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, আবিসিনিয়া, আল্‌বেনিয়া, আরব প্রভৃতি দেশের নিপীড়িত অত্যাচারজর্জরিত বিক্ষুব্ধ জনসাধারণ।

হিটলারের নাৎসিজম ও মুসোলিনীর ফ্যাসিজম্ কোন আদর্শে ও কোন উপায় অবলম্বন করে তাঁদের আকাঙ্খিত "নূতন ব্যবস্থা" প্রবর্তন করবেন? এ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পেতে হলে আমাদের সর্বাগ্রে দেখতে হবে যে হিটলার ও মুসোলিনী নিজেদের দেশে ও সমগ্র জন-সাধারণের মঙ্গল ও উন্নতির জন্যে এ পর্যন্ত কি করেছেন ও কতদূর সফলতা লাভ করেছেন?

এঁরা (হিটলার ও মুসোলিনী) বহুবার বলেছেন যে জার্মাণী ও ইটালির সর্বাঙ্গীন মঙ্গল ও উন্নতির জন্য সর্বদাই আপ্রাণ চেষ্টা করে এসেছেন এবং সর্বতোভাবে কামনা করেন যে তাঁদের শাসননীতি ও পদ্ধতির সুফল অন্যান্য দেশ ও জাতির মধ্যে ব্যাপক ভাবে প্রসার লাভ করুক।

* * *

চিন্তাধারার উৎকর্ষতার, বিস্ময়কর শিল্পোন্নতি ও উদারমনশীলতার জন্যে ইটালি এককালে সুবিখ্যাত ছিল। দেশের ধনী, দরিদ্র সকলেই সম্মিলিত হয়ে আনন্দে ও শান্তিতে বাস করত। ফ্যাসিজমের কঠোর নীতিতে চারুশিল্পের প্রসার ও উন্নতি চিরদিনের মতো রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে এবং উদার ভাবাপন্ন লোকেদের হয় মেরে ফেলা হয়েছে না হয় তাঁরা কারাদণ্ড ভোগ করছেন। ইটালিয়নরা বর্তমানে শোচনীয়ভাবে দুর্দশাগ্রস্ত।

ফ্যাসিস্ত নীতির আদর্শে শিশুকাল থেকেই ইটালিয়নরা শিক্ষা পেয়েছে যে বলপ্রয়োগ ও যুদ্ধের মধ্যেই সত্যকার মহত্ব নিহিত আছে এবং বিশ্বাসও হয়েছে যে শুধু ভয়াবহ নীতি ও বর্বর নিষ্ঠুরতার ভিত্তির উপরই সাম্রাজ্য গঠন করা যায়।

হিট্‌লার ও তাঁর নাৎসি নীতি জার্মাণীর জন্য যা করেছে তাও কম কৌতূহলজনক নয়। জার্মাণী এককালে ছিল শ্রেষ্ঠ, চিন্তাশীল মনীষীদের দেশ। বিজ্ঞানের অত্যাশ্চর্য উন্নতি ও প্রসারতায় সে ছিল সবাগ্রগণ্য। সঙ্গীতবিজ্ঞানে তার অপূর্ব দান ও ব্যবসা বাণিজ্যের বিস্ময়কর উন্নতিতে জার্মাণী ছিল নিঃসন্দেহ শ্রেষ্ঠ।

নাৎসি শাসনের কঠোরতায় জার্মাণীর সবচেয়ে পুরান বিদ্যায়তনও এই সত্য প্রচার করতে বাধ্য হয়েছে যে সমগ্র জার্মাণ জাতির একনায়কের দাসত্ব স্বীকার করা ব্যতীত জ্ঞান আহরণ ও প্রচারের কোনও সার্থকতাই নেই। এই নীতি অনুসারে জার্মাণীর সমস্ত চিন্তাশীল ও উদার ভাবাপন্ন লোকদের কারাবরণ, নির্বাসন ও মৃত্যুও বরণ করতে হয়েছে। এডল্‌ফ হিট্‌লার (Adolf Hitler) দেশনায়ক এবং একমাত্র তাঁকেই দেবতার মতো পূজো করবার শিক্ষা প্রত্যেক ছেলেমেয়ে ও যুবকদের দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া গুপ্তভাবে বাপ-মায়ের চালচলন, কথা-বার্তা, ইত্যাদির উপর খুব সতর্কদৃষ্টি রাখার জন্যে প্রত্যেক জার্মাণ ছেলেমেয়েদের আদেশ দেওয়া হয়েছে। বাপ-মা, ভাই বোন অথবা অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন হিট্‌লার বা নাৎসিজমের বিরুদ্ধে কখনও কিছু যদি বলেন তবে তখনই তা গুপ্ত পুলিশের কাছে ছেলেমেয়েরা জানিয়ে দেয়।

ছেলেবেলা থেকেই জার্মাণ ছেলেদের এই শিক্ষা দেওয়া হয়—তাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ও মহত্ব হওয়া উচিত হিট্‌লারের আদেশে জার্মানীর জন্য যুদ্ধে প্রাণ দেওয়া। মেয়েদেরও সযত্নে শিক্ষা দেওয়া হয় বলিষ্ঠ ও স্বাস্থ্যবান সন্তানের মা হওয়ার জন্য, ভবিষ্যতে যারা হিট্‌লারের জন্য প্রাণ দেবে।

হিট্‌লার নিজেও তাঁর "মিয়েন কেম্ফ" বইয়ে এ-কথা লিখেছেন যে জার্মাণীকে সবদিক দিয়ে বড় করবার একটি প্রধান উপায় হচ্ছে এমন এক কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতায় জাতিকে চালিত করা যার বিরুদ্ধে অন্য কেউ মাথা তুলতে পারবে না। তিনি দম্ভ করে এও বলেছেন যে তাঁর পরিকল্পিত 'নূতন ব্যবস্থায়' দয়া-মায়া সহানুভূতি অথবা সহায়তার কোনও স্থান নেই।

নাৎসি জার্মাণীতে যে ধরণের "নূতন ব্যবস্থা" প্রবর্তন করা হয়েছে বা হচ্ছে, সে ধরণের ব্যবস্থা যদি অন্যান্য জাতির মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করে, তাতে জগতের মঙ্গল বা উন্নতি সাধিত হবে না। নাৎসি জার্মাণরা বিশেষভাবে এই শিক্ষাই পেয়েছে যে মানব জাতির মধ্যে তারাই সর্বশ্রেষ্ঠ, সুতরাং তাদের অধীনে অন্যান্য জাতির দাসত্ব করতেই হবে।

হিট্‌লার যে-সব দেশ বর্তমানে জয় করে নিজের শাসনাধীনে এনেছেন, তারা ভালভাবেই জানতে পারছে যে নাৎসি "নূতন ব্যবস্থা" হচ্ছে বর্বর দমননীতি ও মানুষের প্রত্যেক সাধারণ ও ন্যায়সঙ্গত অধিকারের বিরুদ্ধে অন্যায় হস্তক্ষেপ—অর্থাৎ কঠোর নির্যাতন ও হীনতম দাসত্বেরই নামান্তর।

নাৎসি শাসনের অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতায় জর্জরিত জাতিরা নিশ্চয়ই একদিন এর প্রতিশোধ নিতে চাইবে। হিট্‌লার তাঁর "Political Testament" গ্রন্থে জার্মাণদের তাই স্পষ্টই বলেছেন, যে সব জাত তাদের অধিকারে অন্যায় হস্তক্ষেপ করবে অথবা মাথা তুলে দাঁড়াতে চাইবে, সে-সব জাতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা এবং প্রয়োজন হলে তাদের অস্তিত্ব লুপ্ত করে দেওয়া, জার্মাণদের শুধু অধিকারই নয়—অন্যতম কর্তব্যও।

* * *

ইটালি-জার্মানি পরিকল্পিত "নূতন ব্যবস্থা" প্রবর্ত্তনের মর্মকথা হল এই।

আজ য়ুরোপে ও অন্যান্য কয়েকটি দেশেও যে সঙ্কটময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হ'য়েছে ও দিন দিন অবস্থা জটিল হ'তে জটিলতর হ'তে চলেছে, তার মূল হচ্ছে অন্যায় ও অশান্তির পরিবর্তে ন্যায় ও শান্তি স্থাপনের চেষ্টায় মানুষের জীবন-মরণ সংগ্রাম। গ্রেট ব্রিটেন ও ব্রিটিশ্ কমন্‌ওয়েল্‌থ মানুষের হিংস্র পশু-প্রবৃত্তি ও নিষ্ঠুর বর্বরতার হাত থেকে অন্যান্য জাতিকে বাঁচাবার জন্য তাঁদের সমস্ত শক্তি ও সম্পদ নিয়োজিত করে জীবন-মরণ সমস্যায় যুদ্ধে নেমেছেন। তাই আমেরিকা প্রমুখ অনেকেই ব্রিটেনের বিজয় কামনা করছেন।

এ-যুদ্ধের অগ্রগতি ও ফলাফল সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা অসঙ্গত ও অসম্ভব। তবে হয়তো এটা আশা করা অন্যায় নয় যে অদূর ভবিষ্যতে যুদ্ধ অশান্তি দূর হয়ে গিয়ে প্রতি দেশেই শান্তি, উন্নতি ও সমৃদ্ধি ফিরে আসবে ও স্বাধীনতার অমলিন আবহাওয়ায়, আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃভাবের বন্ধনে মানবজাতি মুক্তির আনন্দে উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে।

আঙুর ও শৃগাল

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র

আহার অন্বেষণে
একদা শেয়াল করিয়া খেয়াল
ঢুকিল দ্রাক্ষা বনে।
দেখে সেথা আছে ঝুলি'
পাকা পাকা ফলগুলি
দ্রাক্ষালতার গায়,
কিন্তু সে বহু ঊর্ধে, শেয়াল
নাগাল নাহিকো পায়।

লোভে জিভে ঝরে জল,
করি' নানা কৌশল
লম্পঝম্প মারে;
সকলি বিফল একটিও ফল
শৃগাল পাড়িতে নারে।
হতাশ হইয়া বলে:
দূর হোক ছাই, প্রয়োজন নাই
অম্ল আঙুর ফলে।"
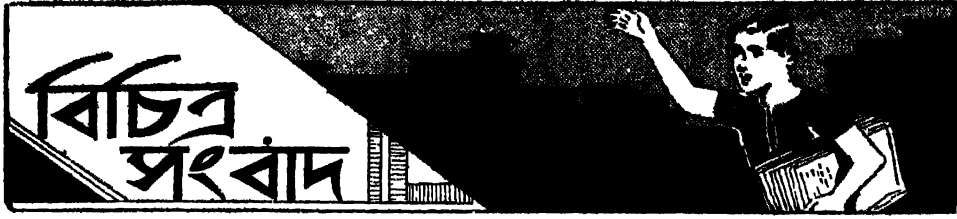
শ্রীবিশ্বনাথ সেনগুপ্ত

গ্রাহক নং ২৮০৫

ঘুমের বছর—

একজন ইতালীয় মহিলা এক নাগাড়ে ৭০ বছর ঘুমিয়ে আছেন। ১৫ বছর বয়সে তিনি ঘুম সুরু করেছেন। তবে রোজ তিনি ক্ষণিকের জন্য জেগে উঠে তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরেই আবার ঘুমিয়ে পড়েন।

* * * *

দামী কলম—

মিঃ লয়েড জর্জের একটি কলম আছে, সে কলমটি দিয়ে তিনি ভার্সাই সন্ধিপত্রে সই করেছিলেন। সে কলমটি আমেরিকার একজন লোক ৭ হাজার পাউণ্ড (প্রায় লক্ষ টাকা) দিয়ে কিনতে চেয়েছিলেন, তিনি সে দামেও বেচতে রাজী হননি।

* * * *

পেট্রোল ছাড়া কাঠের আগুনের গ্যাসে চলতে পারে এই ধরণের মোটর রাশিয়াতে খুব বেশী তৈরী হচ্ছে।

* * * *

যুদ্ধে কুকুরদের কাজ—

ইংলণ্ডের সমস্ত ভাল কুকুরকে যুদ্ধে যোগদানের জন্য বাধ্য করানো হবে বলে জনৈক লেফটেনান্ট কর্ণেল মত দিয়েছেন।

ইংলণ্ড ছাড়া বড় বড় সব দেশেই কুকুরদের যুদ্ধ শিক্ষালয় আছে। সেখানে কুকুররা সংবাদবাহী, প্রহরী, পাহারাওয়ালা, ঔষধবাহী ও অস্ত্রশস্ত্রবাহীর কাজে শিক্ষিত হয়। তারা শত্রুকে আক্রমণ করতে, পরাস্ত করতে ও নিরস্ত্র করতে শেখে। তারা শত্রু শিবিরে গ্যাস-বোমা নিক্ষেপ করে, এমন কি মেশিন-গান চালাতে অভ্যস্ত হয়। আর আমাদের ছেলের দল?

* * * *

পৃথিবীর কনিষ্ঠতম ডুবুরি—

জর্জ লাইট পৃথিবীর কনিষ্ঠতম ডুবুরি। ডুবুরির পুরো পোষাক পরে সে সমুদ্রের তলায় নেমে ডুবুরির কাজ করে। এই ডুবুরির বয়স মাত্র ১৫ বছর।

* * * *

পুতুলের দুর্গ—

কেলিফোর্নিয়ার এক মিস্ত্রি অনেক পরিশ্রম করে একটি ছোট দুর্গ তৈরী করেছেন। এই দুর্গে অবশ্য পল্টন থাকতে পারে না। এটাকে পুতুলের দুর্গ বললেও চলে। দুর্গের যা কিছু সবই এ পুতুল দুর্গে আছে। ঘরগুলোতে মাথা নুইয়ে একজন ঢুকতে পারে। দুর্গটি দেখতে খুব সুন্দর। সাজ সরঞ্জামের কমতি নেই। যে ঘরে যা দরকার ঠিক তাই আছে। একটু দূর থেকে দেখলে মনে হয়, যেন অনেক দূরের কোনো দুর্গ দেখছি।

* * * *

ডাকাত ধরা মোটর—

নিউইয়র্ক শহরে প্রত্যেক বছর ডাকাতরা অনেক টাকা পয়সা শহরের বুকের উপর থেকে লুটে নিয়ে যায়। নানাপ্রকার দাঙ্গা-হাঙ্গামাও প্রায়ই লেগে আছে। সম্প্রতি এসব দমাবার জন্য পুলিশ বিভাগ এক রকম অভিনব মোটরগাড়ী বের করেছে। পুলিশ এই গাড়ীতে বসে নির্ভয়ে ডাকাতদের পিছনে ধাওয়া করে তাদের ধরতে পারবে। গাড়ীতে মেসিনগান, বন্দুক, বোমা ইত্যাদি সবই আছে।

* * *

ট্রেণে সিনেমা—

ইংলণ্ডের 'লণ্ডন এণ্ড ইস্টার্ণ রেলওয়ে' যাত্রীদের জন্য ট্রেণে সিনেমার ব্যবস্থা করেছেন। যাত্রীরা নিজ নিজ আসনে বসেই বায়োস্কোপ দেখতে পাবে। জার্মাণীতে এক বছর আগে ট্রেণে বায়োস্কোপ দেখানর ফলে যাত্রীর সংখ্যা অনেক বেড়েছে। আমেরিকার কোনো কোনো বিমান কোম্পানী যাত্রীবাহী বিমানে যাত্রীদের চিত্ত-বিনোদনের জন্য বার্লেস্ক বা নৃত্যগীতের ব্যবস্থা করেছেন। এতে তাদের যাত্রীর সংখ্যা ও আয় বেড়েছে।

* * *

খুকীর চেয়ার—

সম্প্রতি ছোট ছোট শিশুদের জন্য একপ্রকার অভিনব চেয়ার তৈরী করা করা হয়েছে। এই চেয়ারে বসে সে টেবিলে খেতে পাবে। সামনে টেবিলের মত একটি তক্তা লাগান আছে। চেয়ারে বসে দোল খাওয়া যায়—আবার দরকার মত চেয়ারটিকে ঠেলা গাড়িতে পরিণত করে হাওয়া খাওয়াও যায়। চেয়ারে বসলে পড়ে যাবার ভয় নেই—চার পাশ ভাল করে ঘেরা আছে।

আবার একদিন কলকাতা শহর ও আশেপাশে নির্দীপের মহড়া হয়ে গেল। এবার সূর্যাস্ত হ'তে সূর্যোদয় পর্যন্ত আলো না জ্বালবার আদেশ হয়েছিল। কেবল ট্রাম বাস মোটর প্রভৃতি যান বাহনগুলো পেয়েছিল ম্লান আলোক বা নিষ্প্রভ-দীপ নিয়ে পথ চলবার অনুমতি। নিত্য সন্ধ্যার দীপোজ্জ্বলা কলিকাতা নগরীর সে ঘন তমসাবৃত রূপ যাঁরা দেখেছেন তাঁরা বিস্মিত না হয়ে পারেন নি। রাজ-আদেশ অনুসারে শহরের রাজপথ সম্পূর্ণ নির্দীপ ছিল। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে শহরের অনেক বাড়ীর উপর তলায় এবং কোনো কোনো দোকানের মধ্যে এমন ভাবে আলো জ্বেলে রাখা হয়েছিল যে সেই অন্ধকার রাত্রে সেটা সকলের চোখেই বেশ একটু দৃষ্টিকটু লেগেছিল। আমরা যে এখনও ঠিক আবেদন ও অনুরোধ মেনে চলবার মত শিক্ষিত ও সভ্য হয়ে উঠতে পারিনি, সেটা সপ্রমাণ করেছে সে রাত্রের নির্দীপ ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ সফল ক'রে তোলবার দিকে আমাদের স্বেচ্ছাকৃত অযত্ন ও অবহেলা। তারপর, অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত গৃহে গৃহে ও প্রতি বিপণিতে এমন ভাবে আলোক নিয়ন্ত্রণের উপদেশ ছিল যাতে সে আলোক পথিকের দৃষ্টিতে না পড়ে। কিন্তু পরের দিন থেকে দেখা যাচ্ছে কেউই সে উপদেশ মেনে চলছেন না। মেনে চললে আমরা যে ধীরে ধীরে অন্ধকারে চলা ফেরায় অভ্যস্ত হতে পারতুম এবং প্রয়োজনের দিনে নিরবিচ্ছিন্ন অন্ধকারের মধ্যেও আমাদের যে আর কোনো অসুবিধা হ'ত না—এটা আমরা কেউ ভাবিনি। পূর্বাহ্নে প্রস্তুত হওয়ার শিক্ষা আমাদের নেই। আমাদের সকল ব্যাপারেই দেখি শেষ মুহূর্তে গা ঘামে, এবং একটা প্রবল চেষ্টা দেখা যায়, কিন্তু তখন হয়ে উঠে সেটা Too Late।

* * *

অথচ, আমরা জানি এই নির্দীপের ব্যবস্থাই রাতের পর রাত সুশৃঙ্খলেই চলবে, যখন রাজ অনুরোধ আসবে রূঢ় আদেশের কঠোর মূর্তি ধরে, উপদেশ আসবে দৃঢ় পরওয়ানার উগ্ররূপ নিয়ে—এবং মোটা টাকা জরিমানার বেত উঁচিয়ে—তখন শুড় শুড় করে আমরা আলোক নিয়ন্ত্রণের সকল নিয়মই মেনে চলব। কিন্তু, তার আগে নৈব—নৈবচ! কিছুতেই নয়। এর কারণ আর অন্য কিছুই নয়, জাতি হিসাবে আমরা কোনোদিনই 'ডিসিপ্লীন্' বা নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা করবার সুযোগ পাইনি। কাজেই উপদেশ ও অনুরোধ মেনে চলতে আমরা একেবারেই অভ্যস্ত নই। সার্কাসে যেমন শিক্ষিত জীব-জন্তু গুলি প্রভুর ইঙ্গিতের উপরও চাবুকের শব্দ না পেলে কোনো খেলা দেখাতে চায় না, আমাদের ব্যবহারও অনেকটা সেই রকম। আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ও কর্তৃপক্ষের রক্তচক্ষু ও কঠিন শাস্তির ভীতি প্রদর্শন ব্যতীত কোনো বিষয়ে অগ্রসর হ'তে নারাজ। ফাঁকি দেওয়ার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আমাদের মধ্যে এমনভাবে পরি-পুষ্ট হয়ে উঠেছে যে আমরা আমাদের নিজেদেরও অনেক সময় নানা ব্যাপারে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করি। যেমন ইস্কুল কলেজের পড়া-শুনায়, ব্যবসা-সংক্রান্ত কাজ-কর্মে, জমিদারী ও বৈষয়িক হিসাব-নিকাশে, বিবাহ-শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সামাজিক ক্রীয়াকর্মে। আমরা ভাল করে মুখ ধুতে চাইনা, ধীরে-সুস্থে বসে খেতে পারি না, নিজেদের ব্যবহারের জামাকাপড় জুতা প্রভৃতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে যেটুকু পরিশ্রম দরকার তাতেও আমরা বিমুখ। আলস্য বশতঃ স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং দৈহিক বল ও শক্তি বৃদ্ধির জন্য সামান্য কিছুক্ষণ ব্যায়ামেও অবহেলা করি। ফলে বাঙালী ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর এবং ভারতবর্ষেরও সকল জাতির চেয়ে পিছিয়ে পড়ছে।

* * *

হিন্দিভাষাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করবার জন্য মহাত্মা গান্ধীর পৃষ্ঠপোষকতায় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যখন সমগ্র ভারত ব্যাপী প্রবল প্রচেষ্টা চলেছে, সেই সময়, যাঁর মাতৃভাষা হিন্দি এমন একজন দেশপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতের মুখে যদি শোনা যায় যে বাংলাভাষাই বর্তমানে ভারতের শ্রেষ্ঠভাষা এবং বাংলা সাহিত্যের কাছে আধুনিক হিন্দিসাহিত্য বহু বিষয়ে ঋণী তাহলে বাঙালীর হৃদয় গর্বোৎফুল্ল না হ'য়ে পারে না। প্রয়াগ বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলার পণ্ডিত অমরনাথ ঝাঁ সেদিন এই কথাই বলেছেন। যাঁরা সাহিত্য রসিক—যাঁরা ভাষাবিদ্ পণ্ডিত অমরনাথ ঝাঁর অভিমত তাঁদের নতশিরে স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কারণ, হিন্দিই হোক, গুজরাতিই হোক, মহারাষ্ট্রীয়ই হোক বা তামিলই হোক, ভারতের সমস্ত প্রাদেশিক ভাষার তুলনায় বাংলাভাষা যে অদ্বিতীয় এ আজ সর্ববাদী সম্মত সত্য। মহাত্মা গান্ধী যে এটা জানেন না, তা নয়, তবুও তিনি যে বাংলা ছেড়ে হিন্দিকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করতে

উন্মত্ত হয়েছেন, এর কারণ, বাংলাভাষা গণভাষা নয়, বাংলাভাষা আভিজাত্যপূর্ণ ভাষা—শিক্ষিত সুধীগণের ভাষা—উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের ভাষা। হাটে-বাজারে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের ভাষা এ'নয়। ও সকল গুণ হিন্দিভাষার আছে, সুতরাং হিন্দিরপক্ষেই সর্বভারতীয় ভাষা হয়ে উঠা সহজ।

* * *

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় অশীতি বৎসরে পদার্পণ করায় বাংলার বৈজ্ঞানিকেরা তাঁর একটি জয়ন্তী উৎসবের আয়োজন করছেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের কমার্শিয়াল মিউজিয়ম উদ্যোগী হয়ে এই উপলক্ষে একটি ভারতে প্রস্তুত রাসায়নিক ও ভৈষজ্য বস্তুর প্রদর্শনী খোলবার আয়োজন করছেন। আচার্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্রের সম্বর্ধনার এর চেয়ে উপযুক্ত আর কিছু হতে পারে না। ভারতীয় রাসায়নিক শিল্পের উন্নতি ও প্রসারের জন্য আচার্য আজীবন সাধনা করেছেন। রাসায়নিক বিজ্ঞানে বাংলাকে প্রবুদ্ধ করবার জন্য এই বিজ্ঞান তপস্বী নিজের সর্বস্ব দান করেছেন! আশা করি সমস্ত বাংলাদেশ এই জয়ন্তী উৎসবে সানন্দে যোগ দিয়ে এই ঋষিকল্প রাসায়নিককে সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে অভিনন্দিত করবে।

* * *

আগামী ২৫শে বৈশাখ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের আশী বৎসর পূর্ণ হবে। বাংলা দেশ ত কই তাদের গর্বের ও গৌরবের নিধি, তাদের প্রিয়তম কবির জয়ন্তী উৎসবের কোনো আয়োজনই করছে না। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে যিনি অভিনব রূপ দিয়েছেন, ঐশ্বর্য দিয়েছেন, বিবিধ বিভূতি মণ্ডিত করেছেন, বিশ্বের দরবারে তাকে মহিমান্বিত করে তুলেছেন, দেশের ও দশের মধ্যে মর্যাদার আসনে টেনে নিয়ে বসিয়েছেন, সেই অদ্ভুতকর্মা ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের অশীতিতম আবির্ভাব দিনটিকে এক বিরাট উৎসব ও জাতীয় মহা মেলায় পরিণত করবার জন্য প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালীর যত্নবান হওয়া উচিত নয় কি?

* * *

গ্রামে গ্রামে পাঠশালা উঠে গিয়ে মক্তব বসছে। হিন্দুর ছেলেরা পাঠশালার অভাবে মক্তবে গিয়ে পড়ছে। ১৯৩৮ খৃস্টাব্দে সমস্ত বাংলাদেশে মোট ৩২ হাজার ছেলে মক্তবে পড়াশুনা করতো, কিন্তু ১৯৪০ খৃস্টাব্দে তাদের সংখ্যা বেড়ে ৭৪৫০০ দাঁড়িয়েছে। এতে শিক্ষার জন্য হিন্দুর ছেলের আগ্রহ প্রকাশ পাচ্ছে এবং সেই সঙ্গে এও প্রকাশ পাচ্ছে যে গ্রামে তাদের শিক্ষার কোনো সুব্যবস্থা নেই। মক্তবে হিন্দুর ছেলেরা পড়াশুনা করলেও কোনো আপত্তির কারণ থাকত না, যদি না সেখানে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যা দীর্ঘকাল ধরে হিন্দুরা গড়ে তুলেছে তাকে বিকৃত ও অসুন্দর করে তোলবার একটা নির্লজ্জ প্রচেষ্টা চলতো। মক্তবের পাঠ্য পুস্তকের অদ্ভুত ভাষার যে সব নমুনা প্রকাশ হয়েছে তাতে এ অপবাদের আর প্রতিবাদ করা চলে না। হিন্দু ছেলেরা মক্তবে পড়ে যে সুষ্ঠু ও সুন্দর বাংলা ভাষা শিখতে পারবে না সে বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই। তবে, আমরা বলব—নিরক্ষর থাকার চেয়ে শিখুক হিন্দুর ছেলেরা যা উপস্থিত শেখবার সুযোগ পায়। পরে তাদের রুচি ও শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে শৈশবের ত্রুটী হয়ত একদিন সংশোধন করে নিলেও নিতে পাবরে। মক্তবে পড়ব না বলে মূর্খ হয়ে থাকা ভাল নয়। হিন্দুরা যতদিন না নিজেদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার আয়োজন নিজেরা করতে পারবে ততদিন মক্তবের সুযোগই তাদের নিতে হবে।

* * *

প্রবন্ধ চুরি!

মাঘের পাঠশালায় শ্রীমান অসীম দত্ত "ক্নুট হামসুন" শীর্ষক যে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন সেটি "ছায়াপথে" (অগ্রহায়ণ ১৩৪৬) প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সুদীনকুমার মিত্রের প্রবন্ধটি না-বলে অপহরণ করা! শ্রীমান অসীমদত্তের এই কুকীর্তি ধরিয়ে দিয়েছেন শ্রীযুক্ত সুদানকুমার মিত্র স্বয়ং। তিনি আমাদের পাঠশালার একজন লেখক। আর এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সিটি কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান বৈদ্যনাথ বসু, গোয়াবাগানের শ্রীমতী শিবানী দাস, প্যারীমোহন সুর লেনের শ্রীমান ব্রজপদ রায় ও বিডন ষ্ট্রীটের শ্রীমান উদয়ভানু সিংহ। এদের সকলকে আমরা সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। শ্রীমান অসীম দত্ত তাঁর এই অন্যায় অপরাধের কি কৈফিয়ৎ দেন জানতে চাই!

চৈত্র—১৩৪৭

নিয়মাবলী—(১) ধাঁধাঁ-সম্পাদকের মতে শব্দসন্ধানের যেটি সবচেয়ে নির্দোষ ও নির্ভুল সমাধান,—তার সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে উত্তর মেলা চাই। নির্ভুল সমাধানটি পরের মাসের পাঠশালায় প্রকাশিত হবে। (২) সাদা ঘরগুলির প্রত্যেকটিতে একটি ক'রে সংযুক্ত বা অসংযুক্ত অক্ষর বসবে। (৩) প্রতি সংখ্যার প্রতিযোগিতা-কুপনখানি কেটে ভর্তি ক'রে পাঠাবে সেই মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে। দেরি হ'লেই বাতিল। খামের উপরে ঠিকানা লিখবে—'শব্দ-সন্ধান" পাঠশালা কার্যালয়, ৩০ কর্নওআলিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। (৪) হরফগুলি সব পরিষ্কার হওয়া চাই—কাটাকুটি চলবে না। বানান ভুল হলে ভুল ধরা হবে। (৫) যে কোন পাঠক পাঠিকা যতগুলি ইচ্ছা কুপন পাঠাতে পারবে। (৬) 'শব্দ-সন্ধান'-সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ব'লে মেনে নিতে হবে।

সঙ্কেতসূত্র

—পাশাপাশি—

১। বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের জন্মদিন।
৪। "যাহা চাই তাহা পাই না।
যাহা পাই তাহা চাই না"
৭। পানীয়ের প্রয়োজন জ্ঞাপন করে।
৮। স্বীকার ক'রে নেওয়া।
৯। ক্ষুদ্র দৃশ্য কাব্য।
১১। এ আমাদের মন প্রফুল্ল করে তোলে।
১২। এ মানুষের ইজ্জৎ বাড়ায়।
১৪। একটি অক্ষরত দেওয়াই আছে অপরটিকে ডাকলেই পাবে।
১৬। এরকম যোগ থাকলে বড় হবেই হবে।
১৭। এ সময়ে বিলেতে প্রত্যেকের খাদ্য এই।
১৯। এ রকম জলপানে যথার্থ তৃপ্তি পাওয়া যায়।
২০। এর যা কিছু মান আকারের জন্যই, নইলে এ আমাদের লজ্জার কারণ হত!
২১। পাহাড়।
২৩। ইনি একজন বড় গোছের দেবতা।
২৫। ঈশ্বরারাধনার এও এক রকম প্রক্রিয়া।

২৭। আমাদের সামাজিক জীবনকে উপভোগ্য করে তোলে।

২৮ লোকে বলে এ গাছে পাঁঠা জন্মায়।

২৯ একখানা ইট তুলে দেখলেই একে পাবে।

—উপর থেকে নীচে

১। এ অবস্থায় কর্তব্য স্থির করা কঠিন।

২। এও আমাদের খাদ্য।

৩। সাহেবিয়ানার মোহে যারা নিজেদের—কে অবহেলা করে তারা কৃপার পাত্র।

৫। বিমান আক্রমণে এদেরই অবস্থা শোচনীয় দেখা যাচ্ছে।

৬। "বিদেশীর ইতিবৃত্ত দস্যু বলি করে পরিহাস
অট্টহাস্য রবে।
তব পুণ্যচেষ্টা যত তস্করের নিষ্ফল প্রয়াস
এই জানে সবে।"

১০। ললাট লিখন।

১২। কেটে গেলে বলি—

১৩। হ্রাস প্রাপ্তি।

১৫। পাটনা শহরের প্রাচীন নাম।

১৬। এই বিরোধই আমাদের পক্ষে বেদনা দায়ক।

১৮। এ কাঠের তক্তায় তৈরী।

২১। পঞ্চভূতেরই একজন।

২২। ঈশ্বর বিশ্বাসীরা অনেকেই এটা নিয়মিত করে থাকেন।

২৪। সুবৃহৎ তৃণাসন।

২৬। অন্যায়ের প্রশ্রয় দিলে ছেলেদের—খাওয়া হয়।

ফাল্গুনের শব্দ-সন্ধানের ফলাফল ১৩৪৭

ফাল্গুনের শব্দ-সন্ধান প্রতিযোগিতায় পাঠশালার একজনও গ্রাহক গ্রাহিকা নির্ভুল উত্তর দিতে পারেন নি। শব্দ-শিক্ষায় উৎসাহ বর্ধনের জন্য পাঠশালার কর্তৃপক্ষরা তিন ভুল পর্যন্ত হলেও তাঁকে পুরস্কার দিতে প্রস্তুত আছেন বলেই শ্রীমান হরিকমল পুরকায়স্থ ও পাঁচুগোপাল বসু যুক্তভাবে এবার পুরস্কার পেয়েছেন। পাশাপাশি ১৯নং ঘরে এঁরা দুজনেই 'মজ্জন' লিখে সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু শ্রীমান পাঁচুগোপাল উপর নীচের ২নং ঘরে 'পামর' লিখে আপামর জনসাধারণকে হাসিয়েছেন। শ্রীমান হরিকমল এখানে 'পাথর' লিখে শব্দ সন্ধানে নিজ শক্তির দৃঢ়তা প্রকাশ করেছেন, তবে উপর নীচের ১৬নং ঘরে 'অনতিক্রম্য' লেখায় হিমালয় শৃঙ্গ তাঁর কাছে 'অনধিগম্য' রয়ে গেছে। এখানে অবশ্য পাঁচুগোপাল 'অনধিগম্য' লিখে অধিকতর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু পাশাপাশি ১৬ ও ১৭নং ঘরে শ্রীমান পাঁচুগোপাল বসু 'অস্থি' ও 'বসু' লিখে তাঁর অস্থিরতা ও বসুপ্রীতির পরিচয় দিয়েছেন মাত্র। 'অগ' মানে যে পর্বত, আর 'বন্ধ' হওয়া ভিন্ন যে বিবাহ হতে পারে না, সে বিষয়ে তাঁর অজ্ঞতাই প্রকাশ পেয়েছে। এ দুটি ঘরে শ্রীমান হরিকমল 'অগ' ও 'বর' লিখে শব্দ সন্ধানে তাঁর বরেণ্য চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছেন বটে, তবে একটু ভুল করেছেন এই যে, বিবাহ ব্যাপারটাকে 'বন্ধন' বলে তিনি স্বীকার না করলেও তিনি এ ক্ষেত্রে 'বর'কে প্রাধান্য দিয়ে বধূকে খর্ব করেছেন। বিবাহের সময় পিঁড়ে উঁচু করে তুলে ধরে আমরা 'বধূ'কেই বড় বলে প্রমাণ করি, সুতরাং বধূকে অনাদর করে তিনি ভাল করেন নি। এখন কথা হচ্ছে, 'বর' ছাড়া ও যে বিবাহ হতে পারে এ সম্বন্ধে কুমারী সাধনা বসু একখানি সুন্দর পত্র লিখেছেন। সেখানি শব্দসন্ধান প্রতিযোগিদের জ্ঞাতার্থে এখানে প্রকাশ করা হল। তাঁর যুক্তি অখণ্ডনীয়। 'বধূ' সম্বন্ধে তিনি যে আপত্তি তুলেছেন 'শ-র' তা নতশিরে মেনে নিচ্ছেন, তবে এ কথাও ঠিক যে 'বহ' অপেক্ষা 'বন্ধ' কথাটাই যে এখানে অধিকতর সমীচীন আশা করি কুমারী সাধনা বসু তা স্বীকার করবেন। কারণ, প্রথমতঃ এটা 'শব্দ-সন্ধান'—'ধাতু-সন্ধান' নয়, দ্বিতীয়, 'বিবাহ' হওয়া মানে 'বন্ধ' হওয়া নয় কি? দুটি জীবন একত্র হবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়াই বিবাহ। এটা সকল দেশে সকল ধর্মে ও সকল আচারে মানে। বিবাহের পক্ষে এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া বা চুক্তিবদ্ধ হওয়াই সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। সমস্ত প্রতিযোগিদের মধ্যে একমাত্র রায়পুর সি-পির কল্যাণীয়া উমা বাগচী এর কতকটা সন্ধান পেয়েছিলেন। তিনি 'বন্ধ' লিখেছেন। 'বন্ধ' লিখলে তাঁর এ উত্তর 'শ-র'র মতে নির্ভুল হত। পাশাপাশি ২৬নং ঘরে মাত্র 'দিবা' ও 'দিন' এই ভুলে কুমারী সাধনা বসু ও শ্রীমান সৌরভ সনাতনী এবার পুরস্কারে ভাগ বসাতে পারলেন না। 'দিবা' ও 'দিন' এ দুটি শব্দেরই একই অর্থ। তবে এখানে 'দিন' লিখলে ভুল ধরা হবে কেন? এ প্রশ্ন অনেকের মনে আসতে পারে। তাঁদের এস্থলে লক্ষ্য করে দেখা উচিত সংকেতসূত্রে 'শ-র' এখানে কি ভাষা ব্যবহার করেছেন? তা থেকে সহজেই অনুমান হ'তে পারে তিনি এখানে

কোন্ উত্তরটি চান—'দিন' না 'দিবা'? মাত্র অল্প কয়েকজন প্রতিযোগী উপর নীচে ১৮নং ঘরে 'দিগীশ্বর' লিখে তাঁদের ব্যাকরণ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন, বাকী সকলেই 'দিকেশ্বর' 'দিগেশ্বর', 'দিশেশ্বর' প্রভৃতি লিখে ব্যাকরণে তাঁদের অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। উপর নীচে ২২নং ঘরেও মাত্র চার পাঁচ জন 'সংলাপ' লিখে তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও শব্দ-জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। যাঁরা 'আলাপ' লিখেছেন তাঁদের এই সহজ জ্ঞান এবার বিলাপের কারণ হয়ে উঠেছে। যদিও প্রলাপ হয়ে উঠিনি তাঁদের এ উত্তর, তবুও 'আলাপ' ছাড়া আর কি হতে পারে এখানে সেটা ভাবা উচিত ছিল তাঁদের। পাশাপাশি ২৮নং ঘরে 'ক্ষত্রপ' ও 'সত্রপ' দুইই হয়, সুতরাং যাঁরা 'সত্রপ' লিখেছেন তাঁদের উত্তরও সঠিক বলেই ধরা হয়েছে। উপর নীচে ১নং ঘরে 'বীতস্পৃহ' ও 'বীতরাগ' নিয়ে অনেকেই এখানে গোলমালে পড়েছেন, কিন্তু যাঁদের বুদ্ধি প্রখর তাঁরা ঠিক ধরতে পেরেছেন এখানে 'বীতরাগ' হবে। কারণ পাশাপাশি ১০নং ঘরে 'গত' হলেই পৃথিবীর সঙ্গে সকল সম্বন্ধ শেষ হয়ে যায়, কিন্তু 'হত' হলে তা নিয়ে মামলা মকর্দমা চলতে পারে। উপর নীচে ২নং ঘরে যাঁরা 'পাথার' লিখেছেন তাঁরা অকূলপাথারে পড়েছেন, কারণ সমুদ্রে কিছু ছুঁড়ে ফেললে 'তৎক্ষণাৎ' তা ফিরে আসে না, কিছুক্ষণ পরে ফিরে আসে বটে। কিন্তু 'পাথরে'র গায়ে কিছু ছুঁড়ে ফেললে 'তৎক্ষণাৎ' তা rebound হয়ে ফিরে আসে। উপর নীচে ২০নং ঘরে অধিকাংশ প্রতিযোগী 'জমা' লিখে সঞ্চয়ের প্রতি তাঁদের অনুরাগ প্রকাশ করেছেন বটে, কিন্তু মুস্কিল এই যে, যা দিন কাল পড়েছে তাতে 'জমা' যার কিছু আছে তারই যে দুর্ভাবনা হবে সবচেয়ে বেশী। নির্ভাবনায় মোটেই থাকতে পারবে না সে। সুতরাং যাঁরা এখানে 'জমি' রেখেছেন তাঁরা যথার্থই বিষয় বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। কারণ জমি থাকলেই আর কোনো ভাবনা নেই, চাষ আবাদ করে দুবেলা দু মুঠো অন্ন সংস্থান হবেই। "—শ-র"

শ্রদ্ধেয় 'পাঠশালা' সম্পাদক মহাশয়, সমীপেষু

মহাশয়,

ফাল্গুনের শব্দ-সন্ধান করলাম বটে, কিন্তু লক্ষ্যভেদে কতটা সফল হব জানি না। বিশেষ বিচার-বিবেচনা করে শব্দ নির্বাচন কর্লেও 'শ-র'র মনে কি আছে কে জানে?

এবারে ১৭ নম্বরের পাশাপাশি ঘরে আমি 'বর' 'বধূ'কে না বসিয়ে 'বহ্'কেই বরণ করে নিয়েছি। বিয়ে ব্যাপারে অবশ্য 'বর'ও 'বধূ' (বা বউ) সবার আগেই মনে পড়ে, কিন্তু সেইটেই তাদের বিরুদ্ধে প্রধান বাধা। তা ছাড়াও বধূকে এক কথাতেই বিদায় দেওয়া যায়। কারণ, 'বধূ', বধূ হন বিয়ের পরে, আগে নয়, তখন থাকেন তিনি 'কনে'। সুতরাং 'বধূ'র দাবী একেবারেই বাতিল। এখন বাকি রইলেন 'বর', কিন্তু একটু ভেবে দেখলে তাকে বাদ দিতেও বড় বেশী বেগ পেতে হবে না। বিয়ের অনুষ্ঠানে বরের প্রয়োজন খুবই —সত্য, কিন্তু এমন সব বিয়েরও নজীর আছে যাতে আমরা বর বল্‌তে যা বুঝি তার দরকার হয়নি। পূর্বকালে নাকি অনেক বয়স্কা কুমারীর (বিশেষতঃ কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারে) কুমারীত্বভঙ্গ করা হত ফুলগাছের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে। আবার মহাভারতেও দেখতে পাই, গান্ধারীর প্রথম বিয়ে হয় 'অজ' অর্থাৎ ছাগের সঙ্গে। এই সব ক্ষেত্রে কারণ বিশেষে বিয়ের অনুষ্ঠানটা এদের দিয়ে চুকিয়ে নিলেও বরের বরণীয় পদের দাবীটা এরাও কর্তে পারে এরূপ বিবেচনা করা আদৌ বিধেয় নয় বটে, তবু, 'বর'কেও বর্জন করতে বাধ্য হলাম। বিয়েতে বর-বধূই যখন বিদায় নিলেন তখন আর মিছে অনুষ্ঠানের দিকে চেয়ে বসে না থেকে শব্দটার মধ্যেই অনুসন্ধান করা যাক, যদি তাতে সে শব্দের সন্ধান মেলে। 'বিয়ে' শব্দটি 'বিবাহ' শব্দ থেকে হয়েছে, আর 'বিবাহ' শব্দ নিষ্পন্ন কর্তে প্রয়োজন 'বহ্' ধাতুর। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সব বিয়ের মূলে আছেন 'বহ্'—তাঁকে চাইই। এই কারণে বিয়েতে 'বহ্'র দাবীই বহাল রাখলাম্। নিবেদন ইতি।

বিনীতা কুমারী সাধনা বসু গ্রাঃ নং ৩৩৯৯।
বারুইপুর, ২৪ পরগণা

তিনটি ভুল

পাঁচুগোপাল বসু, বারাসত, হরিকমল পুরকায়স্থ, শিলং।

(শব্দ-সন্ধানের পুরস্কার এঁদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে)

চার ভুল

সাধনা বসু, বারুইপুর, সৌরভ সনাতনি, অমলনার।

পাঁচ ভুল

অণিমা চাটার্জি, উত্তরপাড়া, অসীমা দেবী, চন্দননগর, উমারাণী ঘোষ, কদমতলা; কল্যাণকুমার সরকার, হাওড়া, দিলীপকুমার সেন, ভবানীপুর, পাঁচুগোপাল বসু, বারাসত; পার্বতিশঙ্কর ও সুলেখা মুখোপাধ্যায়, রামপুরহাট, লালবিহারী চক্রবর্তী, গোকর্ণ।

ছয় ভুল

অজিতকুমার ঘোষ, কলিকাতা, আবুল হোসেন মিঞা, কুঠিবাড়ি, কল্যাণী দেবী, টালা; নীরদচন্দ্র রায়, মৈনাম্, পাঁচুগোপাল বসু, বারাসাত; লালবিহারী চক্রবর্তী, গোকর্ণ।

সাত ভুল

অমল বিমল গাঙ্গুলী, উয়ারী; অসীমা দেবী, চন্দননগর, উদয়ভানু সিংহ, কলিকাতা, উমারানী ঘোষ, কদমতলা; গীতা ও বাদল পালিত, আসানসোল; লালবিহারী চক্রবর্তী, গোকর্ণ, সিদ্ধেশ্বর মিত্র, বালিগঞ্জ।

আট ভুল

আভাসচন্দ্র দাশগুপ্ত, বেন্দা, কল্যাণী দেবী, টালা; কালিদাস সাহা, সাহাজাদপুর, কৃষ্ণপদ চট্টোপাধ্যায়, আরিয়াদহ; গোবর্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজের সভ্যবৃন্দ, সালিখা, নির্মল, সনৎ, শ্যাম ও শক্তি, জামসেদপুর; মধু ঘোষাল, যুগকল্যাণ, রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য আরিয়াদহ; লালবিহারী চক্রবর্তী, গোকর্ণ, শোভনলাল মুখোপাধ্যায়, টালিগঞ্জ, সিদ্ধেশ্বর মিত্র, বালিগঞ্জ, হেনা বাহা, বরকান্তা।

নয় ভুল

অমলকুমার দত্ত ও নীলিমা দত্ত, কলিকাতা, কালিদাস সাহা, সাহাজাদপুর নীতিশরঞ্জন দে, কায়েৎটুলি, "লতা" বারাকপুর, শৈলেন্দ্রকুমার রায়, হাটখোলা, সিদ্ধেশ্বর মিত্র, বালিগঞ্জ।

দশ ভুল

অসীম রাহা, বালিগঞ্জ, উমা বাগচী, বায়পুর, কালিদাস সাহা, সাহাজাদপুর; গোবিন্দলাল ভট্টাচার্য, সনকপাড়া; দেবব্রত মজুমদার, কলিকাতা, বিনয়ভূষণ পাল, কলিকাতা, মধু ঘোষাল, যুগকল্যাণ, রিষড়া বয়েজ লাইব্রেরীর সভ্যবৃন্দ, রিষড়া, শঙ্করকুমার ভট্টাচার্য, আরিয়াদহ।

এগার ভুল

অশ্বিনীকুমার মণ্ডল, আহমদপুর, অবনী সরকার, বজবজ, মিস্ লিলি স্যামুয়েল, বারাকপুর, সমীরকুমার ঘোষাল, কলিকাতা, সুধানাথ রায়চৌধুরী, কণেশ্বর।

নির্ভুল সমাধান—মাঘ, ১৩৪৭

বারো ভুল

আবুল হোসেন মিঞা, ফরিদপুর, উমাশঙ্কর বসু, কলিকাতা, চন্দ্রকুমার ঘোষ ও মধুসূদন মণ্ডল, বালি দেওয়ানগঞ্জ, ফিরোজা খাতুন, ঠাটপাড়া, বিশ্বনাথ সেনগুপ্ত, চট্টগ্রাম; শশাঙ্কশেখর বসু, ভবানীপুর, সুধানাথ রায়চৌধুরী, কণেশ্বর।

এক ডজন ভুলের উপর যাঁরা গেছেন তাঁদের নাম ঠিকানা প্রকাশ করে লজ্জা দেওয়া অনুচিত। 'শ-র।

পত্রী-মৈত্রী

এঁরা পত্রের সাহায্যে পরস্পরের সঙ্গে আলাপ ও বন্ধুত্ব স্থাপন করতে ইচ্ছুক :—

আভাস দাশগুপ্ত—Cf. Dr P. C Das Gupta, Bsc. M. B Benda, vill Kalia Jessore শ্রীগোপাল চক্রবর্তী—২৯ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট কলিকাতা। কুমারী সুরভি রায়চৌধুরী—Cf. Miss P. Roy 1/1A Preonath Banerjee, St. Cal. ধীরেন্দ্রনাথ মহান্তী—দাঁতন, দাঁতন পোঃ আঃ মেদিনীপুর। অনিলবরণ ঘোষ—দাবড়া, হুগলী, তারাপদ চক্রবর্তী—Cf T. D. Chakraborty., Dental Surgeon, ফেনী, নোয়াখালী। সলিলা মুখার্জ্জি—৫৮নং বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন, কলিকাতা। অশ্বিনীকুমার মণ্ডল—আহমদপুর, বীরভূম। আবুলহোসেন মিয়া—ফরিদপুর, নীলতুলি, ফরিদপুর। অসীমা দেবী—Students Library. হাটখোলা, চন্দননগর। কমলেন্দু মুখার্জ্জি—Cf. K S Mukherjee, Gold Finch, Matunga, Bombay. পুণ্যজ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, রাণাঘাট। রঞ্জিৎকুমার সেন, গিরিধাম P 75 Raja Nabakissen St. Calcutta. সমীর চৌধুরী, ব্রজধুলি, গণেশ ঘাট, চাঁদনিচক্ কটক। বীরেন্দ্রনারায়ণ সরকার, Cf. ডাঃ সুবোধচন্দ্র সরকার, ফরিদপুর।
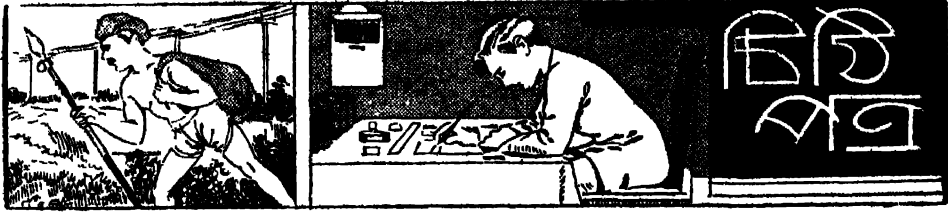
প্রিয় সম্পাদক মহাশয়—

ফাল্গুন সংখ্যার পাঠশালায় দেখলাম আমার মতটা আপনারা ভুল বুঝেছেন।

মৃত এবং জীবিত কবিদের কাব্য যে কোনো কালেই পুরাতন হয়ে যায় না—কাব্য যে চির নূতন এ জ্ঞান আমার আছে। আমি শুধু বলতে চেয়েছিলাম জীবিতা বাঙালী মহিলা কবিদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করাই যুক্তিসঙ্গত। তাই আমি মাননীয়া মানকুমারী বসুকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছিলাম। ইতি

ভবদীয়—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সেওড়াফুলি

ভাই অসীম—

আমার মাঘ মাসের প্রশ্ন ছিল "পৃথিবীর বৃহত্তম নগরের যা নাম ঐ নামের আর কয়টী নগর কোথায় অবস্থিত?" কিন্তু পাঠশালায় প্রশ্নটি পরিবর্তিত হয়ে ছাপা হয়েছে= "পৃথিবীর বৃহত্তম নগর কোনটী—ইত্যাদি?" সুতরাং অপরাধ আমার নয়। ইতি

তোমার প্রিয়বন্ধু—অশ্বিনীকুমার মণ্ডল, আহমদপুর

শ্রীমান অনিলবরণ ঘোষ—

ভাই, আপনার ঐ ধরণের প্রশ্ন করা এখানে মোটেই উচিত হয় নি, কারণ ও দুটি নিজের মনের অনুভূতির উপর নির্ভর করে; যদি একটু চিন্তা করে দেখেন তাহলে বুঝবেন আমি যে উত্তর দিয়েছি সেটা ঠিক কিনা।

হেনা দে শীল, কলিকাতা

মাননীয় 'পাঠশালার' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

পাঠশালার প্রশ্নোত্তর সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার আছে। প্রশ্নোত্তরের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে পাঠশালার ভাইবোনদের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞান বৃদ্ধি করা, সুতরাং তার মধ্যে এমন সব প্রশ্নের স্থান দেওয়া উচিত যা থেকে প্রকৃতই জ্ঞান লাভ হয়। কতকগুলি বাজে প্রশ্নের কোন সার্থকতা নেই। যেমন, ফাল্গুন মাসের পত্রিকায় এম, ফিরোজা খাতুন প্রশ্ন করেছেন—কাজী নজরুল ইসলাম কি কি বই লিখেছেন, কোথায় পাওয়া যায়, প্রত্যেক খানির দাম?" ইত্যাদি। এ প্রশ্ন 'পাঠশালায়' কেন? পুস্তক বিক্রেতাদের তালিকা দেখলেই ত জানা যায়।

বিনীত—শ্রীগৌরাঙ্গ রুদ্র, চট্টগ্রাম

মাননীয় "পাঠশালার" সম্পাদক মহাশয়—

'পাঠশালা'র প্রশ্নোত্তর বিভাগের দিকে একটু কড়া নজর রাখবেন। অত্যন্ত বাজে এবং অর্থহীন প্রশ্নও এতে স্থান পাচ্ছে দেখে সত্যই দুঃখ হয়। যে সকল প্রশ্ন বা উত্তর কেবল আমাদের শিক্ষা বা জ্ঞানলাভের সহায়তা করবে কেবল সেইগুলিরই এ বিভাগে স্থান পাওয়া উচিত নয় কি?

বিনীতা—কুমারী সাধনা বসু, বারুইপুর

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়—

আপনার পাঠশালা ক্রমশঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া খুবই সুখী হইলাম। বাংলা ও আসামের প্রত্যেক স্কুলে এ পত্রিকা লাইব্রেরীতে রাখার নিমিত্ত আমি স্কুল সমূহের শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করিতেছি। ইহাতে ছেলেরা বাহিরের জ্ঞান পাইবে। দরকারী প্রশ্নগুলাই যেন কেবল ছাপান হয়—এ বিষয়ে অনুগ্রহ করিয়া দৃষ্টি রাখিবেন। প্রত্যেক সংখ্যায় যাহাতে মহাপুরুষদের জীবনী প্রকাশিত হয় এজন্য চেষ্টা করিলে সুখী হইতাম। কারণ জীবনী পাঠ করিলে কোমলমতি ছেলেরা চরিত্র গঠনে সাহায্য পাইবে।

নিবেদন ইতি—শ্রীসুধীন্দ্রমোহন দে

মান্যবরেষু—

আমার মতে শরৎচন্দ্রের পর উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম দেওয়া উচিত ছিল। নিয়মাবলীতে দেওয়া আছে যে কোন মাসের ১৫ই তারিখে শব্দ-সন্ধান পাঠাতে কিন্তু কুপনে ১০ তারিখে পাঠাবার কথা লেখা কেন? প্রণাম নেবেন। বিনীত—উমাশঙ্কর বসু

মাননীয় শ্রীযুক্ত পাঠশালা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়, ফাল্গুনের পাঠাশালা পড়ে আমি খুব আনন্দিত হলাম। পাঠশালা দিন দিন যেন ঠিক হীরের টুকরো হয়ে উঠেছে। আমি আরও কতকগুলি মাসিক রাখি। কিন্তু পাঠশালার মতন এত সুন্দর পত্রিকা আর দ্বিতীয়টি দেখতে পাই না। পাঠশালা পেলেই আমি সব আগে নানাপ্রসঙ্গ প্রশ্নোত্তর বিভাগ, এবং নানারকম খুচরো খবরগুলি পড়ে নিই। কেননা ঐগুলি আমার বড় ভাল লাগে। পাঠশালার গল্পের দিকটার চেয়ে শিক্ষার দিকটাই বেশী এগিয়ে গিয়েছে দেখে আমি খুব আনন্দিত

হলাম। কারণ আমাদের দেশে এই রকম শিক্ষামূলক পত্রিকা ইতিপূর্বে আর একটাও ছিল না।

ফাল্গুন সংখ্যায় যে কটি শিশু মাসিকের নাম দেওয়া হয়েছিল আমি তা ছাড়া আরও ৫টীর নাম পেয়েছি।

১। কেয়া—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহামায়া সাহিত্য মন্দির, সেওড়াফুলি। বার্ষিক ১৷৹

২। ছেলেখেলা—শ্রীশম্ভুচন্দ্র সেন, ৩১ প্রসন্নকুমার ঠাকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। বার্ষিক ৸৹

৩। বাঙ্গালার শিক্ষক—খান সাহেব আবদুল হাকিম ও সুরেশচন্দ্র দাস ১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। বার্ষিক ১৲

৪। আলো—শ্রীরমাপ্রসাদ মিত্র, ২৮এ, চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, ভবানীপুর, কলিকাতা। বার্ষিক ১৲

৫। ধূপের ধোঁয়া—শ্রীপবিমল সরকাব, "ধূপের ধোঁযা প্রকাশ ঘব", পোঃ মহেশতলা, ২৪ পবগণা। বার্ষিক ১৲

এই কয়টিব মধ্যে "কেয়া" এবং 'বাংলাব শিক্ষক' বাদে বাকি গুলি বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

শ্রীশক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডিব্রুগড়।

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়—

বন্ধুবব দেবলকুমাব সেনগুপ্ত আমাদেব প্রিয় পাঠশালাতে "বালক সঙ্ঘেব" জন্য যে প্রস্তাব কবেছেন, আমি তা সর্বান্তঃকবণে সমর্থন কবি। আমাদেব গ্রাহক বন্ধুগণের সকলেব একত্রিত হওয়া সত্যিই অত্যন্ত গৌরবেব কথা। দেবলবাবু যেভাবে প্রস্তাব করেছেন সে ভাবে না কবে অন্য ভাবে কবা যেতে পারে। আসব বসবে আমাদেব পাঠশালাতেই। সংক্ষেপে যাবা কবিতা, গল্প ইত্যাদি লিখতে পাববেন তাদের বচিত প্রবন্ধগুলি 'সঙ্ঘে' ছাপান হবে। যে বকম 'আনন্দবাজারে' 'আনন্দমেলা' হচ্ছে—কতকটা সেইবকম হবে। তবে চাঁদাব হার সেজন্য কিছু বেশী দিতে হবে। চিঠিপত্র, প্রশ্নোত্তব, ধাঁধাঁ খেলাধূলা থাকবে আমাদের সঙ্ঘে'তে, অর্থাৎ পাঠশালাব এই নূতন বিভাগে। আপনার এবং অন্যান্য গ্রাহকদের কি মত তাহা জানাবেন। আব একটি কথা, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি আমাদের কয়েকজন গ্রাহকবন্ধু পাঠশালায় কতগুলি বাজে প্রশ্ন কবে অজ্ঞতার পবিচয় দেন মাত্র। বন্ধুবর অশোককুমাব নন্দী জানতে চেয়েছেন সাহিত্যজগতে বঙ্কিমচন্দ্র বড় না শবৎচন্দ্র বড়। এর উত্তরে আমি তাঁকে বলতে চাই আমরা পাঠশালার গ্রাহকগণ প্রায় সকলেই স্কুলের ছাত্র। শরৎচন্দ্র এবং বঙ্কিমচন্দ্রের কয়খানি বই আমরা পড়েছি? কে বড়? কে ছোট? তাহা বিচার করা আমাদের শোভা পায় না এবং সে ক্ষমতাও এখনও আমাদের জন্মেনি। এ রকম আরও অনেক অন্যায় ও নিরর্থক প্রশ্ন আছে যা ছাপা উচিত নয়। আপনি আমাব সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করবেন। ইতি

পাঠশালার বন্ধু
বীরেন্দ্রনাবায়ণ সবকার গ্রাহক নং ২২৬১।

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,

"পাঠশালা"ব জন্ম থেকেই আমি তাব গ্রাহক। পাঠশালাকে আমি ভালবাসি খুব। "পত্রী-মৈত্রী" "বিনিময় সঙ্ঘ" 'প্রশ্নোত্তব' 'শব্দসন্ধান' 'ধাঁধাঁ' প্রভৃতি বিভাগগুলো থাকাতে 'পাঠশালা'কে যে সবাই আপন কবে নিয়েছে, তা' আমি জোব গলায়ই বল্‌ছি। প্রথমটা গ্রাহকগ্রাহিকাদেব অনেকেই 'পাঠশালায়' যেতে চায়নি—গুরুমহাশয়েব বেত্রাঘাতের ভয়ে, কিন্তু আজ তারা সবাই উৎসাহী হয়ে বন্ধুবান্ধব নিয়ে দলে দলে "পাঠশালায়" ভর্ত্তি হচ্ছে।

পাঠশালায় আমি একটা 'প্রতিযোগিতাব' ব্যবস্থা করতে চাই। 'প্রতিযোগিতার' বিষয় হ'ল—"এপ্রিল ফুল"। পুবস্কাব থাকবে দুটি—প্রথম পুরস্কাব, ২য় পুরস্কাব। প্রথম পুবস্কাব, দু'টাকা দামেব গল্পবই, ২য় পুবস্কার ১ টাকা দামেব একটা জীবনী। পুবস্কাব দাতা আমি। পুবস্কাব আমি এখান হ'তে সোজা পুবস্কাবপ্রাপ্তদেব কাছে কিংবা আপনার কাছে পাঠিয়ে দিতে পাবি। বচনা লিখে ১৫ই বৈশাখেব মধ্যে আমার ঠিকানায় পাঠাতে হ'বে। আমি তাব মধ্য থেকে শ্রেষ্ঠ পাঁচটি বচনা আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব। আপনি তাব থেকে ১ম ও ২য় নির্বাচন কববেন।

এ সম্বন্ধে আপনাব মতামত কি, লিখে জানাবেন।

ইতি—কে, এম, ছায়ফুলহক,
ফিরোজ লাইব্রেবী, মৈমনসিংহ

কুমাবী হেনা বাহা,

আপনার প্রশ্নের কোন মানে হয় না। আপনার প্রশ্ন হওয়া উচিত ছিল—বাংলা দেশে কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুবেব পবই কাহাব স্থান?" অথবা "ভারতে ববীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরেই কাহাব স্থান?" যেহেতু বাঙ্‌লা দেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরই যাঁর স্থান সমগ্র ভাবতে তাঁব স্থান না হ'তে পারে। কেননা, বাঙ্‌লাভাষা সমগ্র ভারতেব ভাষা নহে। যা'হোক, আমার মতে বাঙ্‌লাদেশে কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেব পরই কাজী নজরুল ইস্‌লামের এবং সমগ্র ভারতে মরহুম ডক্টর মোহাম্মদ ইক্‌বালের স্থান। ইতি—

এম, ফিরোজা খাতুন—জলপাইগুড়ী

প্রণম্য সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

শ্রীমান মধু ঘোষালের গদ্য কবিতা সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তরে আমি যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম ঠিক সেইটাই প্রকাশ না হইয়া দুই একটী কথা বদলাইয়া মাঘ মাসে প্রকাশ হওয়ায় আমাকে এ মাসে নবনীকুমারের কাছ হইতে প্রতিবাদ সহ্য করিতে হইয়াছে। আমি যাহা লিখিয়াছিলাম তাহার অনুলিপি পাঠাইলাম, প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

প্রণত:—শ্রীঅনিলবরণ ঘোষ—গ্রা: নং ৩২২৭
দাবড়া, হুগলী

অনুলিপি

শ্রীমান মধু, মুগকল্যাণ: গদ্য কবিতাকে এক কথায় গবিতা বলতে পারো। ছন্দযুক্ত সুললিত শ্রুতিমাধুর্যকেই আমরা কবিতা বলি। তাছাড়া সবই গদ্য। গদ্য কবিতার বিশেষত্ব এই যে গদ্যকে ছন্দহীন অবস্থাতেই কবিতার ছাঁচে ঢেলে তাতে সুললিত শ্রুতিমধুরিমা আরোপিত হয়েছে। প্রাক্ আধুনিক কবিতার সঙ্গে পার্থক্য যে সে ছন্দ বর্জিত।

শ্রদ্ধেয় পাঠশালার সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—
মহাশয়,

মাঘের শব্দ-সন্ধানে প্রথম স্থান অধিকার করায় যেমন আনন্দিত হয়েছি। দুটি ভুলের জন্য দুঃখিতও হয়েছি তেমনি। আর একটু সাবধান হ'লে 'রঞ্জন'কে রঞ্জন' করা যেত ঠিকই, কিন্তু 'কামান'এর স্থলে 'কাহন'এর কথা হয়ত তবু মনে আসিতো না। কারণ যুদ্ধ ব্যাপারে 'কাহন' শুধু অতি প্রয়োজনীয় নয়। সবচেয়ে প্রয়োজনীয়—'Sinews of war'. তাই মনে হয় 'শ-ব' 'অতি' দিয়ে আমাদের উপর অতি অবিচার করেছেন, 'অতি'র জায়গায় 'সবচেয়ে' দিলেই কি সবচেয়ে ভাল হত না?

বিনীত—কুমারী সাধনা বসু, বারুইপুর, ২৪ পরগণা

পত্র

সবিনয় নিবেদন—

"দেবলবাবুর প্রস্তাব যা গতবার মৃণালকান্তি গুপ্ত মহাশয় সমর্থন করেছেন আমি তার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। কারণ আমরা যারা কলকাতার বাইরে থাকি তাদের এরকম একটা সম্ভব উৎসবে ও অধিবেশনে যোগ দেওয়া সম্ভব নয়।

স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পর আমার মতে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিনীত—শ্রীসমীর চৌধুরী, কটক।

পত্রের উত্তর

অশ্বিনীকুমার মণ্ডল, আহমদপুর।

তোমার ধাঁধার উত্তরটি হয় আমাদের হাতে আসেনি, নয়ত দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। 'Aware' উত্তরটি ভালই, সুতরাং ছাপা হয়নি বলে তোমার চেয়েও আমরা বেশী দুঃখিত জেনো।

কালিদাস সাহা, সাহাজাদপুর।

তোমার 'ক্যালেণ্ডার নেভার এণ্ডিং' রচনাটি এবার পেয়েছি। এই ধরণের একটি রচনা পাঠশালায় পূর্বে প্রকাশ হয়ে গেছে, সুতরাং তোমারটি আর ছাপা চলতে পারে না। পাঠশালার 'প্রশ্ন' সম্বন্ধে তুমি যা লিখেছ তা খুব ঠিক। "শরৎচন্দ্রের পর বাংলার শ্রেষ্ঠ কথা সাহিত্যক কে?" বা "রবীন্দ্রনাথের পর কবি হিসাবে কাহার স্থান?" "বঙ্কিমচন্দ্র বড় না শরৎচন্দ্র বড়?" এসব বড় বড় প্রশ্ন নিয়ে তোমাদের চেয়ে বড় যারা তাঁরাই অনেকে আলোচনা করবার যোগ্য নন, সুতরাং এরূপ বিতর্কমূলক প্রশ্ন পাঠশালার পাঠক পাঠিকা বা গ্রাহক গ্রাহিকার না করাই উচিত।

অসীমা রাহা, বালিগঞ্জ।

পাঠশালায় ছাপার ভুলের জন্য দুঃখিত ও লজ্জিত হওয়া ছাড়া উপায় নেই। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ছাপাখানার ভূতের উপদ্রবে পত্রিকাখানির ছাপা নির্ভুল করা যাচ্ছে না। আমাদের যত্নের ক্রটি নেই জেনো। যাতে ভুল কম হয় সেদিকে এবার বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। একই প্রশ্নের দুই তিন রকম উত্তর আসছে এ কথা সত্য, তবে তোমরা যদি বুঝতে না পার কোনটি সঠিক উত্তর 'ভূ-গো'কে প্রশ্ন করো তিনি উত্তর দেবেন। শব্দ-সন্ধানের নির্ভুল উত্তরদাতাকে নগদ ৫৲ পাঁচ টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়। উপস্থিত যুদ্ধের জন্য ব্যয় হ্রাস করবার উদ্দেশ্যে পাঠশালায় ছবি ছাপা বন্ধ রাখা হয়েছে। খেলাধূলার খবর পাঠশালায় এক মাস পরে ছেপে কোনো লাভ নেই, কারণ সে খবর তখন সকলের জানা হয়ে যায়।

অনিলবরণ মহান্তি, যাদবপুর।

তুমি মহাত্মা গান্ধীর যে চিত্র পাঠিয়েছ তা আকারে এত ক্ষুদ্র যে পাঠশালায় ছাপা চলে না। তোমার প্রেরিত

রচনাগুলির জন্য ধন্যবাদ নাও। পাঠশালায় ক্রমশঃ তা প্রকাশ হবে। রচনা পাঠাবার কোনো নির্দিষ্ট শেষ তারিখ নেই। যখন ইচ্ছা পাঠাতে পারো।

আভাস দাসগুপ্ত, বেন্দা।

'বিনিময় সঙ্ঘ' তোমাদের মধ্যে সখের জিনিস বিনিময়ের সুযোগ এনে দেবে। তুমি যদি স্ট্যাম্প্ জমাও, চকোলেটের ছবি জমাও, বা দেশ বিদেশের মুদ্রা জমাও তোমার যেগুলি একাধিক আছে তার বিনিময়ে অপরের কাছ থেকে তোমার যা নেই তা বদলে নিতে পারবে। উদয়শঙ্কর সম্বন্ধে উত্তর পূর্বেই পাঠশালায় বেরিয়েছে। তাঁর বাড়ী যে যশোহর জেলায় কালিয়া গ্রামে এ অনেকেই বলেছেন। পাঠশালায় ছবি দেওয়া সম্বন্ধে উপস্থিত যে বাধা হয়েছে তা অসীম রাহার পত্রোত্তরে জানতে পারবে।

হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়, ফরিদাবাদ।

বড় বড় মনীষী ও মহাপুরুষদের জীবনী পাঠশালায় প্রায়ই প্রকাশিত হয় সুতরাং তোমার অনুরোধ বাহুল্য মাত্র। নিখিলেশ বাবুর "অভিযান ও অভিযাত্রী" তোমার ভাল লেগেছে জেনে সুখী হলুম। ওটি এখন কিছুদিন ধারাবাহিক প্রকাশিত হবে। পাঠশালাকে তোমরা ভালবাস বলেই পাঠশালার দিন দিন উন্নতি হচ্ছে। তোমার প্রশ্নগুলি ইংরাজী ভাষায় লিখে পাঠিয়েছ বলে পাঠশালায় ছাপা হ'ল না। চিঠিপত্র প্রশ্ন সব কিছু এবার থেকে তোমার মাতৃভাষায় লিখে পাঠাবে।

কমলেন্দু মুখার্জি, বোম্বাই।

তোমার "অজন্তা এলোরা" সম্বন্ধে রচনাটি পেয়েছি। কিন্তু ওর মধ্যে আরও কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য দেওয়া উচিত ছিল। যাই হোক তোমার রচনা যথাসময়ে সংশোধন করে নিয়ে প্রকাশ করা হবে। রাণাঘাটের পুণ্যজ্যোতিকে তুমি পত্র লিখলে তাঁর সঙ্গে তোমার আলাপ পরিচয় হতে পারে।

আবুল হোসেন মিঞা, ফরিদপুর।

তোমার ধাঁধার উত্তরটি ভালই লেগেছিল। সম্ভবতঃ সেটি গোলমালে হারিয়ে যাওয়াতেই ছাপা হয়নি, এজন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত।

কে. এম. ছায়ফুল হক্, মৈমনসিংহ।

তোমার প্রস্তাব আমি সমর্থন করি। তোমার চিঠিখানি পাঠশালায় প্রকাশিত হল।

মধু ঘোষাল, যুগকল্যাণ।

'শব্দ-সন্ধান' ১৫ই তারিখে পাঠালেই চলবে, কিন্তু 'প্রশ্নোত্তর' ও চিঠিপত্র প্রভৃতি ১০ই তারিখের মধ্যে না পাঠালে পাঠশালায় প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। কারণ এগুলির সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। যথাসময় না পেলে সে মাসে আর প্রশ্নোত্তর ছাপা হয় না। এই জন্যই বোধ হয় তোমার প্রশ্নটি বাদ গেছে।

কুমারী রেবা ভদ্র, ঢাকা।

তোমার রচনাগুলি পাঠিও, যদি প্রকাশযোগ্য হয় পাঠশালায় সাদরে ছাপা হবে।

কুমারী সুরভি রায় চৌধুরী, কলিকাতা।

তোমার পত্র যথাসময় পাওয়া যায়নি বলে উত্তর ছাপা হয়নি। যারা 'পত্রী-মৈত্রী' স্থাপন করতে ইচ্ছুক তাদের নাম ঠিকানা পাঠশালায় দেখে চিঠি লিখে আলাপ করতে পারবে।

কুমারী সাধনা বসু, বারুইপুর।

সময়ে চিঠি পেলে আর একখানি পাঠশালা পাঠান হত। কুপন না থাকায় দপ্তরীকে ফাইন করা হবে।

শ্রীনীতিশরঞ্জন দে ও নিখিলরঞ্জন দে, ঢাকা

"ইংরাজীতে সবচেয়ে বড় শব্দ কি?" এ প্রশ্নটি ধাঁধাঁর আকারে পাঠশালায় পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল বলে এবার আর প্রশ্নোত্তরে ছাপা হল না।

উমাশঙ্কর বসু, কলিকাতা

'শব্দ-সন্ধান' ১৫ই তারিখে পাঠালে চলবে, কিন্তু প্রশ্নোত্তর ১০ই তারিখের মধ্যে না পেলে পাঠশালায় সে মাসে মুদ্রিত করার অসুবিধা হয়। 'শব্দ-সন্ধান'ও ১০ই পাঠালে তোমাদেরই ডাকখরচ বাঁচবে।

সুধীন্দ্রমোহন দে, গেন্দাউরী ও কুমারী সাধনা বসু, বারুইপুর

প্রশ্নোত্তর সম্বন্ধে এবার যে নিয়মাবলী প্রকাশিত হল আগামী মাসের 'পাঠশালা'য় কেবলমাত্র সেই নিয়মাধীনে প্রাপ্ত প্রশ্নই ছাপা হবে।

পার্বতীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, রামপুর হাট

'পত্রী-মৈত্রী' স্থাপনের পর পত্রী মৈত্রীরা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে নিজেরাই চিঠিপত্র বিনিময় করতে পারেন। এই স্বাধীনতার অপব্যবহার বশত ভবিষ্যতে কখনও পাঠশালার মধ্যস্থতার আবশ্যক উপস্থিত হলে, তখন সেই ব্যবস্থাই হবে।

চৈত্রের প্রশ্ন

নিয়ম ঃ প্রশ্নের উত্তর ১০ই চৈত্রের মধ্যে পাঠাতে হবে। প্রশ্নোত্তরের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় নাম ঠিকানা থাকা চাই। প্রশ্নের নম্বর অনুযায়ী উত্তর ঠিক পর পর দিতে হবে। যিনি যে সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন না তিনি সেই সংখ্যা বাদ দিয়ে পরের সংখ্যাটি উল্লেখ করবেন। এলোমেলো উত্তর দিলে সে উত্তর-পত্র অগ্রাহ্য হবে। নির্বোধের ন্যায় যা-তা বাজে প্রশ্ন পাঠালে ছাপা হবে না।

১। শ্রীগোপাল চক্রবর্তী, কলিকাতা।
পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় লাইব্রেরী কোন্ দেশে, কি নামে এবং কত বই আছে?

২। ধীরেন্দ্রনাথ মহান্তি, দাঁতন।
অনেকেই নানা ব্যাপারে দেখি নিজের নাম প্রকাশ করতে ইচ্ছুক নন, এর কারণ কি?

৩। অনিলবরণ ঘোষ, দাবড়া।
'Iron Lung' জিনিষটা কি?

৪। হেনা বাহা, বরকাত্তা।
পৃথিবীতে মোট কতকগুলি ভাষা প্রচলিত এবং উহাদের নাম কি?

৫। রেবা ভদ্র, ঢাকা।
আফ্রিকায় 'মানুষ খায়' এরূপ গাছ আছে শুনিয়াছি, ইহা কি সত্য?

৬। নবনীকুমার চৌধুরী, লঙ্গাই।
"কমলা লেকচার্স" ও 'অধর মুখার্জি লেকচার্স' কি, এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এর কি সম্বন্ধ?

৭। সনৎকুমার ভট্টাচার্য, আরিয়াদহ।
বাংলা কবিতা সর্বপ্রথম রচনা করেন কে এবং সে কবিতাটি কি?

৮। পার্বতীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, রামপুর হাট।
বেতারে জার্মান, ইটালি প্রভৃতি শত্রুপক্ষের স্টেশনের সহিত ভারতের সংযোগ ছিন্ন করা যায় কিরূপে?

৯। তারাপদ চক্রবর্তী, ফেনী।
'নাৎসীজম্' ও 'বলশেভিজম্' এর মধ্যে মূলগত পার্থক্য কি, কারা এর স্রষ্টা এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে এদের স্থান কোথায়?

১০। সত্যেন্দ্রচন্দ্র সরকার, জামসেদপুর
এরোপ্লেন কে প্রথম আবিষ্কার করেন, তিনি কোন দেশের লোক এবং কত খ্রীস্টাব্দে আবিষ্কার করেন।

১১। কুমারী ইন্দ্রানী রায়, পাটনা।
শরৎসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য কি?

১২। সুধীন্দ্রমোহন দে, গেন্দাউরী।
বাংলার তথা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম প্রতিষ্ঠান

অর্থাৎ মঠ বা মিশন কোনটি, তাহার প্রতিষ্ঠাতা কে এবং বর্তমান অধ্যক্ষের নাম কি ?

১৩। শৈলেশ ঘোষ, মেমারি।
বৈষ্ণব, শাক্ত, ও ব্রাহ্মদিগকে যখন হিন্দু বলা হয় তখন শিখ, জৈন ও বৌদ্ধদিগকে হিন্দু বলা হয় না কেন ?

১৪। সৌরভ সনাতনি, অমলনার।
সমগ্র পৃথিবীতে কয়জন F. R S. আছেন, তাঁহাদের মধ্যে এশিয়ার কোন দেশে কয়জন ?

১৫। শশাঙ্কশেখর বসু, ভবানীপুর।
কোন গুণ অর্জন করিলে বাঙালী বাঁচিবে ?

১৬। উদয়ভানু সিংহ, কলিকাতা।
বর্তমানে শিশু সাহিত্যে জীবিত কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ?

১৭। গোবর্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজ, হাওড়া।
কোন্ কোন্ ইংরাজী গ্রন্থ জেলের মধ্যে বন্দী অবস্থায় রচিত এবং রচয়িতাদের নাম কি ?

১৮। সাধনানন্দ মিশ্র, মুগবেড়িয়া।
আনন্দবাজারের 'আনন্দ-মেলা'র পরিচালক 'মৌমাছির' প্রকৃত নাম ও পরিচয় কি ?

১৯। বিশ্বনাথ সেনগুপ্ত, চট্টগ্রাম।
কোনও বিদেশী লেখার স্বাধীন বা স্বচ্ছন্দ অনুবাদ বলতে কি বুঝায় ?

২০। দিলীপ সেন, ভবানীপুর।
এক মাসের শিশুরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাসে, কাঁদে, চমকায়, চোখ চায় পিট পিট করে, আবার চোখ বোজে কেন ?

২১। বীরেন্দ্রনারায়ণ সরকার, ফরিদপুর।
কাঠের গুড়া (Saw-dust) থেকে কি কি জিনিস পাওয়া যায়।

২২। সিদ্ধেশ্বর মিত্র, বালিগঞ্জ।
মানুষ জরাগ্রস্ত হয় কেন ?

২৩। পঙ্কজমোহন রায়, কোতুলপুর।
পঞ্জিকায় ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায় ফাল্গুনী দোল পূর্ণিমায় গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্ম, কিন্তু 'শিশুভারতী'তে স্বর্গীয় রায়বাহাদুর দীনেশ চন্দ্র সেন লিখেছেন বৈশাখী পূর্ণিমায় মহাপ্রভুর জন্ম, এর কোন্‌টা ঠিক ?

২৪। ফিরোজা খাতুন, জলপাইগুড়ি।
কাগজের আবিষ্কারক কে, কোন দেশে কত খ্রীস্টাব্দে তাঁর জন্ম, এবং প্রথম যে কাগজ ব্যবহৃত হয়েছিল তা কিসের দ্বারা তৈরী ?

২৫। আবুল হোসেন মিঞা, ফরিদপুর।
নোবেল প্রাইজ কত সাল হইতে প্রবর্তিত হয় এবং এ যাবৎ কোন কোন বৎসর কোন কোন দেশের লোক কে কোন বিষয়ে এই পুরস্কার পেয়েছেন ?

২৬। কে, এম, জায়ফুল হক, মৈমনসিংহ।
বাঙালী মেয়েরা আজ কোন পথে ?

২৭। কমলেন্দু মুখার্জি, বোম্বাই।
১৯৪২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেরা প্রাইভেট ম্যাট্রিক দিতে পারবে কিনা ?

২৮। অনিমা দেবী, চন্দননগর।
আলু সিদ্ধ করিলে নরম হয় কিন্তু ডিম সিদ্ধ করিলে শক্ত হয় কেন ?

২৯। ঠাকুরপ্রসাদ সান্যাল, পাবনা।
মানুষের কি খাদ্য গ্রহণ করা উচিত, আমিষ না নিরামিষ, দুটির কোনটি ভাল এবং কেন ভাল ?

৩০। সলিলা মুখার্জি, কলিকাতা।
মুখে যে ব্রণ হয় তা সারে কিসে এবং সেরে গেলে সে দাগ মেলায় কি করে ?

৩১। মৃণালকান্তি গুপ্ত, শিয়ালদহ।
গান রেকর্ডে তোলে কেমন করে ?

৩২। সলিলকুমার সেনগুপ্ত, কলিকাতা।
ফ্যাসিস্ট, কম্যুনিস্ট ও ডেমক্র্যাটিক গভর্ণমেন্ট বলিতে কি বুঝায় ?

৩৩। নীহার ব্যানার্জি, জব্বলপুর।
আমাদের পৃথিবী ছাড়া অন্য কোনো গ্রহে মানুষ ও জীবজন্তু এবং ঘরবাড়ী আছে কিনা ?

৩৪। বিনয়ভূষণ পাল, কলিকাতা।
ছোটদের হাসির গল্প সবচেয়ে ভাল লেখেন কে এবং তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা কি ?

৩৫। অশোককুমার নন্দী, কলিকাতা।
মানুষের মত মানুষ হতে হলে আমাদের কি কি গুণ থাকা চাই ?

৩৬। আভাসচন্দ্র দাসগুপ্ত, বেন্দা।
প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঠিকানা কি ?

৩৭। অজিতকুমার ঘোষ, কলিকাতা।
ভয় পাইলে আমাদের শরীরের রোম খাড়া হইয়া উঠে কেন ?

৩৮। অনিল বরণ মহান্তি, যাদবপুর।
কোন কোন ভারতবাসী সারা বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক খ্যাতি (International fame) অর্জন করেন এবং তাঁদের মধ্যে প্রথম কে ?

৩৯। অসীম রাহা, বালিগঞ্জ।
বাংলা লিপিতে মুদ্রিত প্রথম পুস্তকের নাম কি ?

৩৭। গৌরাঙ্গ রুদ্র, চট্টগ্রাম।
অনেক ফল কাঁচা বেলায় টক থাকে কিন্তু পাকলে মিষ্টি হয় কেন?

৩৮। শৈলেন্দ্রকুমার রায়, কলিকাতা।
পার্লমেন্টে বর্তমানে সভ্য সংখ্যা কত এবং তাদের মধ্যে প্রধান প্রধান সভ্যের নাম কি?

৪১। রণেন্দ্রনাথ ঘোষ চৌধুরী, চন্দ্রভাগা।
উপন্যাসের 'টেক্‌নিক' কি?

৪২। সুধানাথ রায়, কণেশ্বর।
সভ্যতার পথে যুদ্ধ কি অনিবার্য?

৪৩। হেনা দে শীল, কলিকাতা।
সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় আকাশ লাল দেখায় কেন?

৪৪। সাধনা বসু, বারুইপুর।
'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়' কি?

৪৫। অশ্বিনীকুমার মণ্ডল, আহমদপুর।
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম লেখক কে?

৪৬। নীলিমা দাস, সি, পি।
বাংলায় প্রথম উপন্যাস কবে লেখা হইয়াছিল এবং তার লেখক কে?

৪৭। আবদুল ওয়াহেদ, বরিশাল।
হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কখনও একতা হওয়া সম্ভব কি না?

৪৮। অরুণা সেন, কলিকাতা।
সিনেমার প্রধান অভিনেতা অভিনেত্রীদের 'স্টার' (Star) বলে কেন?

৪৯। মথুরাপ্রসাদ বাজপেয়ী, কানপুর।
পৃথিবীর সকল দেশের এবং ভারতবর্ষেরও সকল প্রদেশের লোক টুপী বা উষ্ণীষ ব্যবহার করে, কিন্তু একমাত্র বাঙ্গালীরা মাথায় কিছু পরে না দেখি, ইহার কারণ কি?

৫০। বীণা দাস, বালিগঞ্জ।
রেলওয়ে ও ট্রামওয়ের মধ্যে পার্থক্য কি?

ফাল্গুনের প্রশ্নের উত্তর

১। বঙ্কিম সাহিত্যের মূলে কল্পনা, আর শরৎ সাহিত্যের মূলে বাস্তবতা। বঙ্কিম সাহিত্যের অবলম্বন ধনী অভিজাত সমাজ, শরৎ সাহিত্যের অবলম্বন মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রের জীবনযাত্রা। নানা চরিত্র-বৈচিত্র্য বঙ্কিম সাহিত্যের বিশেষত্ব, শরৎ সাহিত্যে এই বৈচিত্রের অভাব দেখা যায়। সমাজের নিগৃহীত অবজ্ঞাত পরিত্যক্ত অপাংক্তেয়দের প্রতি দরদ শরৎ সাহিত্যের বিশেষত্ব, শরৎচন্দ্র ছিলেন বাস্তববাদী, কিন্তু, বঙ্কিম সাহিত্যে নীতি ও আদর্শবাদই প্রধান বা মুখ্য বস্তু হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্র স্রষ্টা, শরৎচন্দ্র শিল্পী। বঙ্কিম সাহিত্য দেশকে ভালবাসতে শিখিয়েছে, শরৎ সাহিত্য মানুষকে শ্রদ্ধা করতে শিখিয়েছে। বঙ্কিম সাহিত্যের পটভূমিকা যেমনি বিরাট তেমনি বিশাল কিন্তু শরৎ সাহিত্যের পটভূমিকা সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা বহুমুখী, শরৎচন্দ্রের এ পরিচয় পাওয়া যায় নি। বঙ্কিমসাহিত্য আমাদের ভবিষ্যতের জন্য সজাগ করে তুলেছিল, শরৎসাহিত্য আমাদের বর্তমানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক সচেতন করে তুলেছে।

২। নিউজিল্যাণ্ড, গ্রীনউইচ, বুলডগ, গ্রীনল্যাণ্ডের নেকড়ে জাতীয় এস্কিমো কুকুর, স্প্যানিয়াল জাতীয় নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড, চীনের পুড্‌ল্, গ্রেহাউণ্ড, বুলগেরিয়ান ডগ, ককেশিয়ান ডগ, স্প্যানিশ ডগ, ল্যাপ্‌ ডগ, পাহাড়ী কুকুর, সেণ্ট্‌ বার্ণাড ডগ, স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ার কুকুর, রাশিয়ার কুকুর, এ্যালসেশিয়ান ডগ, স্ট্যাগ্‌ হাউণ্ড, হল্যাণ্ডের ব্লাডহাউণ্ড বা শ্লটহাউণ্ড, স্প্যানিয়ান ডগ, ল্যাপ ল্যাণ্ড দেশীয় কুকুর, অস্ট্রেলিয়ান ডগ।

মন্তব্য। অমলনাথ সৌরভ সনাতনি প্রশ্ন করেছেন 'কোন দেশীয় কুকুর সবচেয়ে ভাল?' কিন্তু কি বিষয়ে ভাল সেটা তিনি জানতে চাননি বলে বিভিন্ন ভাল কুকুরের নাম করেছেন পাঠশালার ভিন্ন ভিন্ন পাঠক পাঠিকা। এমন কোনো জাতীয় কুকুর নেই যাকে সব বিষয়েই শ্রেষ্ঠ বলা যেতে পারে। এক এক জাতীয় কুকুর এক এক বিষয়ে অপরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। যেমন সেণ্টবার্ণাড বা এ্যালসেশিয়ান প্রভৃতির চেয়েও আকারে বৃহৎ ও বলবান হচ্ছে 'স্ট্যাগ হাউণ্ড', এরা গাড়ী টানে। সকল জাতীয় কুকুরের অপেক্ষা দ্রুত ছুটতে পারে গ্রে হাউণ্ড, ইহারা শিকারের পক্ষে ভাল, কিন্তু সবচেয়ে ভাল 'পয়েণ্টার'। 'বুলডগ' সবচেয়ে সাহসী। সেবার কাজে সেণ্টবার্ণাডের তুলনা নাই। পাহারা দেবার পক্ষে সবচেয়ে ভাল এ্যালসেশিয়ান। চোর ডাকাত খুনী প্রভৃতির সন্ধানের পক্ষে 'ব্লাড হাউণ্ড' অদ্বিতীয়। মেয়েদের পোষার পক্ষে পুডল্ জাতীয় ল্যাপ ডগই ভাল। ইত্যাদি।

৩। কয়লা থেকে বহু প্রকার দ্রব্য উৎপন্ন হয়, যথা—আলকাতরা, কেরোসিন, পেট্রোল, পিচ, ম্যাজেণ্টা প্রভৃতি ৯০ রকম রং, গ্যাস, এ্যামোনিয়া, কার্বন, বেনজীন ফেনল, ক্রেসল, ন্যাপথালীন, নকল রবার, স্যাকারীন (চিনি জাতীয় মিষ্ট পদার্থ) হীরক, গন্ধসার, কার্বলিক এ্যাসিড, লুব্রিকেটিং অয়েল, বিবিধ বিস্ফোরক পদার্থ, নানাপ্রকার ঔষধ, যেমন এ্যাসপিরীন ইত্যাদি, লাইজল, ফ্লিট সীসা, ধূম, ভস্ম, নানা রাসায়নিক দ্রব্য, কৃত্রিমসার, ব্যাকেলাইট, ফটোগ্রাফিক কেমিক্যালস্, ফ্লীট, গ্রাফাইট, টোলুইন, পিক্রিক এ্যাসিড, গ্যাসলাইম বা স্পেণ্টলাইম, কোক, গ্যাসলাইট, গ্যাসকার্বন, গ্যাসলিকর।

৪। "পাঁচকড়ি দে" সুধানাথ রায়, কনেশ্বর।

"ভূতো গোয়েন্দা" মধুসূদন মণ্ডল ও রামচন্দ্র সেন গুপ্ত, হুগলি।

"রবার্ট ব্লেক" আবুল হোসেন মিঞা, ফরিদপুর।

"হের হিমলার" (জার্মাণ 'গেস্টাপো'র সর্বময় কর্তা) মধু ঘোষাল, মুগকল্যাণ।

"শার্লক হোমস্' গৌরাঙ্গ রুদ্র, চট্টগ্রাম।

মন্তব্য—শ্রীমান মধু ঘোষাল সঠিক উত্তর দিতে পেরেছেন।

৫। পাঠশালার দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ থেকে 'বাংলা সাহিত্যে পরিচয়' সুরু হয়েছে।

৬। বিদ্যুৎ চমকাইবার সঙ্গে সঙ্গেই একই সময়ে মেঘ গর্জ্জনও হয়। কিন্তু আলোর গতি শব্দের গতির চেয়ে ঢের বেশী দ্রুত বলে আমরা বিদ্যুতের আলো আগে দেখতে পাই এবং মেঘ গর্জ্জনের শব্দ শুনতে পাই পরে। ঠিক কতক্ষণ পরে শোনা যায় সেটা নির্ভর করে মেঘের অবস্থানের উপর। মেঘ যদি কাছাকাছি থাকে তবে বিদ্যুৎ চমকের অল্পক্ষণের মধ্যেই গর্জ্জন শোনা যায়, কিন্তু মেঘ যদি দূরে থাকে শব্দ শুনতে পাব দেরীতে। আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬০০০ফিট কিন্তু শব্দের মাত্র ১১০০ফিট।

৭। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব প্রথম টমাস ওয়েজ উড্ নামে একজন ইংরাজ ফটোগ্রাফী আবিষ্কার করেন। পরে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের Daguieerre & Neipge, সর্বপ্রথম 'ক্যামেরা' আবিষ্কার করেন। ১৫৭৫ সালে ব্যাপটিস্টা পোর্টা প্রথম আলোক চিত্রের সন্ধান দিয়েছিলেন।

৮। মাঘের পাঠশালার ৯নং প্রশ্নের উত্তর দেখ। মনের দুঃখের কারণ ঘটিলে তখনই যেমন অশ্রুগ্রন্থি হইতে রসস্রাব হয় তেমনি কোনো লোভনীয় খাদ্য সম্মুখে দেখিলে চক্ষু তৎক্ষণাৎ afferent nerve যোগে মস্তিষ্কে সংবাদ পাঠায়, একে বলে Reflex action. সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্ক বা ব্রেণ থেকে efferent nerve impulse এসে মুখের রসস্রাবী গ্রন্থিগুলিকে উত্তেজিত করে। এই গ্রন্থিগুলিকে Salivary glands বলে। সমস্ত বস্তুরই রসাস্বাদনের যন্ত্র হইল জিহ্বা। এইজন্য জিহ্বার অপর নাম রসনা। রসনার মধ্যে যে স্নায়ু আছে তাহাকে বলে Hypoglossal nerve এই স্নায়ু উত্তেজিত হইলেই জিহ্বা সরস হইয়া উঠে। পরিচিত ও পূর্বাস্বাদিত খাদ্যবস্তু আমাদের খাইতে দিলে বা কেহ ভোজন করিতেছে দেখিলে reflex actionএর ফলে উপরোক্ত উপায়ে আমাদের মুখে লালা ঝরিয়া থাকে।

৯। ১৮৪০ খৃঃ অব্দে স্কটল্যাণ্ডের শ্রীযুক্ত হিলকার্ক প্যাট্রিক ম্যাকমিলান সাহেব সর্বপ্রথম বাইসাইকেল আবিষ্কার করেন। তার আগে ১৮১৬ খৃঃ অব্দে ফ্রান্সে মঁস্যে নেপিশকে ও তৎপরে জার্মানিতে কার্ল ফন্ ড্রাইস্ লিভার চালিত Velocepede বাইসিকেল তৈয়ার করেছিলেন। তারও আগে ১৭৭৯ খৃঃ অব্দে ফ্রান্সের ব্লানকার্ড নামে একজন ব্যোমচর বাইসাইকেলের সন্ধান দিয়েছিলেন। বর্তমানের উন্নত বাইক সৃষ্টি করেন। কভেন্টি শহরে মিঃ জেম্স কেম্প্ স্টারলী ১৮ ৫ খ্রীষ্টাব্দে।

১০। ১৯২৯ খৃঃ অব্দে লাহোরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে 'পূর্ণস্বাধীনতার' প্রস্তাব গৃহীত হয়। তদনুসারে ১৯৩০ সালে ৬ই জানুয়ারী ঐ সময়ের কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুক্ত জহরলাল নেহেরু ১৯৩০ খৃঃ অব্দের ২৬শে জানুয়ারী সমগ্র ভারতের পক্ষ হইতে স্বাধীনতা লাভের সঙ্কল্প গ্রহণ করা হবে বলে ঘোষণা করেন। তদনুসারে ১৯৩০ খৃঃ অব্দ হইতে প্রতি বৎসর এই ২৬শে জানুয়ারী ভারতে স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। ২৬শে জানুয়ারী তারিখটি স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য বিশেষভাবে নির্বাচিত হয়েছিল এইজন্য, যে ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে ২৬শে জানুয়ারীই ভারতে সবপ্রথম 'ন্যাশন্যাল কংগ্রেস' স্থাপিত হয়। 'স্বাধীনতা-দিবস' পালনের উদ্দেশ্য ভারতবাসীর মনে স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছাকে ক্রমেই দৃঢ় ও বলবৎ ক'রে তোলা।

১১। পৃথিবীর কোন জাতির জাতীয় চিহ্ন কি?

চীন—নারসিসাস্ (Narcissus)

ইংলণ্ড—গোলাপ (Rose)

ফ্রান্স—ফ্লুয়োর-ডি-লিস (Fleur-di-lis)

জার্মাণ—কর্ণ-ফ্লাওয়ার (Corn Flower)

গ্রীস—ভায়োলেট (Violet)

ভারত—(Lotus)

ইটালী—সাদা লিলি (White Lily)

সুইজারল্যাণ্ড—এডেন-উইস।

জাপান—চন্দ্রমল্লিকা (Chrysanthemum)

স্কটল্যাণ্ড—থিস্‌ল (Thistle)

স্পেন—পমিগ্রানেট্ (Pomegranate)

আমেরিকা—স্বর্ণ-দণ্ড (Golden Rod)
পারস্য—গোলাপ (Rose)
ওয়েলস—ডাফোডিলস্ (Defodils)
কানাডা—ম্যাপেল্ (Mapple)
আয়ার্ল্যাণ্ড—শ্যামরক (Sham Rock)
মেক্সিকো—ক্যাকটাস্ (Cactus)
রাশিয়া—লিনডেন (Linden)

মন্তব্য—এই প্রশ্নটি ঠিক বুঝতে না পেরে চট্টগ্রামের বিশ্বনাথ ও কলিকাতার উদয় ভানু পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির জাতীয় পতাকার রং ও চিহ্ন গুলির তালিকা দিয়েছেন।

১২। **হিটলার—**

অজিতকুমার ঘোষ, কলিকাতা। সলিলা মুখার্জি, কলিকাতা। শশী ভট্টাচার্য, হেমনগর। ইন্দ্রাণী রায়, পাটনা। উদয়ভানু সিংহ, কলিকাতা। মধু ঘোষাল, মৃগকল্যাণ। বিনয়ভূষণ পাল, কলিকাতা। আভাসচন্দ্র দাস গুপ্ত, বেন্দা। হেনা দে শীল, কলিকাতা। অশোক ঘোষ, দিল্লী। সিদ্ধেশ্বর মিত্র, বালিগঞ্জ। ফিরোজা খাতুন, জলপাইগুড়ি। কে, এম ছায়ফুস হক, মৈমনসিংহ। সাধন দাশ গুপ্ত। অনিলবরণ ঘোষ, দাবড়া। পার্বতি-শঙ্কর মুখোপাধ্যায়, রামপুর হাট।

স্ট্যালীন—

আবুল হোসেন মিঞা, ফরিদপুর। শক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডিব্রুগড়। অসীম সাহা, বালিগঞ্জ। গৌরাঙ্গ রুদ্র, চট্টগ্রাম। পুলিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়, বৈষ্ণবাটী। পঙ্কজমোহন রায়, কোতুলপুর। মধুসূদন মণ্ডল ও রামচন্দ্র সেনগুপ্ত, বালিদেওয়ানগঞ্জ। অনিলবরণ মহান্তী, যাদবপুর। সুধানাথ রায় চৌধুরী, কণেশ্বর। নীতিশরঞ্জন দে ও নিখিলরঞ্জন দে, ঢাকা। ঊষারঞ্জন ঘোষ ও কল্পনা ঘোষ, মেমারী। তারাপদ চক্রবর্তী। নবনীকুমার চৌধুরী, লঙ্গাই। অশোককুমার নন্দী, কলিকাতা। ধ্রুবরঞ্জন সরকার, হাওড়া। রেবা ভদ্র, ঢাকা। নীলিমাদেবী মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা। বিশ্বনাথ সেনগুপ্ত, চট্টগ্রাম।

রুজভেল্ট—

শশাঙ্কশেখর বসু, ভবানীপুর।

মুসোলিনী—

শূন্য।

মন্তব্য—পাঠশালার পাঠক পাঠিকা ও গ্রাহক গ্রাহিকাদের মধ্যেও অধিকতর বুদ্ধিমান ও চতুর তাঁরাই যাঁরা স্ট্যালীনের বুদ্ধি ও চাতুরীকেই শ্রেষ্ঠ বলে বুঝতে পেরেছেন। স্ট্যালীন দেশের ক্ষতি না করে এবং জাতীয় শক্তি ও সম্পদ ক্ষয় না করে নিজেদের অপহৃত দেশগুলি উদ্ধার করে নিয়েছেন। ফলে, এই যুদ্ধের পর রাশিয়ার পক্ষেই ভবিষ্যতে য়ুরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি হয়ে উঠবার সম্ভাবনা রয়েছে।

১৩। ডি, এম, লাইব্রেরীর পুস্তকের তালিকায় আছে

১৪। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত নূতন বানান এবং 'চলন্তিকা' ও সুবলচন্দ্র মিত্রের সরল বাংলা অভিধান।

১৫। ১৮১৬ খৃস্টাব্দে ৺গঙ্গাচরণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত "বেঙ্গল গেজেট"।

১৬। ১৯৩৪ খৃস্টাব্দের বোম্বাই কংগ্রেসে একটি প্রস্তাব সম্পর্কে পরিচালক সমিতির সহিত মহাত্মা গান্ধীর মতভেদ হওয়ায় তিনি কংগ্রেসের সভাপদ পরিত্যাগ করেন। কিন্তু পরিচালক সমিতি তাঁহাকে পরিত্যাগ না করায় তিনি ।০ আনার সদস্য না হইয়াও কংগ্রেসের সর্বময় কর্তা হইয়া আছেন।

১৭। এ সম্বন্ধে 'চিঠি-পত্র' দ্রষ্টব্য। রবীন্দ্রনাথের পরই ভারতের গর্ব করবার মত কবি স্যার মহম্মদ ইকবাল। রবীন্দ্রনাথের পরই বাংলার গর্ব করবার মত কবি কেউ বলেছেন, ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, কেউ বলেছেন ৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কেউ বলেছেন কাজী নজরুল ইসলাম, কেউ বলেছেন কালিদাস রায়, কেউ বলেছেন কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কেউ বলেছেন ৺রজনীকান্ত সেন, কেউ বলেছেন শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী সুতরাং এ ব্যাপারের মীমাংসা ভোটের উপর ফেলে দেওয়া গেল।

১৮। দিল্লী হইতে "Children's News" (Connaught Place, Few Delhi -।3।- as per copy) বোম্বাই হইতে "Puspa" বাহির হয়। ("Gulistan" 12 Road, Bombay) subs 2।- yearly কলিকাতা হইতে "Modern Student" (14G. Bowbazar st cal) subs. student 3।- only yearly.)

১৯। 'প্রেম' মানুষকে 'কর্তব্যে' অবহিত করে তোলে, কিন্তু কেবলমাত্র শুষ্ক কর্তব্য পালনে প্রেমের মর্য্যাদা রক্ষা হয় না। তাছাড়া, 'কর্তব্য' বোধ মানুষের সামাজিক বুদ্ধি প্রসূত কিন্তু প্রেম মানব হৃদয়ে স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ দান।

২০। "বিজ্ঞান পরিচয়" বার্ষিক মূল্য ৫৲ টাকা। প্রত্যেকখানি ৷৹ আনা, প্রাপ্তি স্থান, ২৭নং পুরান পল্টন রমনা, ঢাকা। সম্পাদক :—শ্রীনীরদ কুমার সেন। 'প্রকৃতি' (ত্রৈমাসিক) ৪৷৹ কৈলাসবসু স্ট্রীট্, কলিকাতা।

২১। বাংলা বর্ণ পরিচয় প্রথম ভাগ, সংস্করণ অশেষ, বীর পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

২২। এ্যালবার্ট আইনস্টাইন।

মন্তব্য :—যাঁরা সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও ডক্টর মেঘনাদ সাহার নাম করেছেন তাঁদের স্বাজাত্য প্রীতি প্রশংসনীয় কিন্তু, উত্তর সঠিক নয়। সংক্ষিপ্ত জীবনীর মধ্যে শ্রীমান অনিলবরণ মহান্তির লেখাটি সংক্ষিপ্তও বটে এবং জীবনীও হয়েছে বলে সেইটি এখানে ছাপা হইল।

বর্তমানে শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আলবার্ট আইনস্টাইন। ১৮৭৯ সালের ১৪ই মার্চ তারিখে জার্মানীর দনিয়ুব নদীর তীরে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক কেপ্‌লারের জন্মভূমি উম্ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম হারমন আইনস্টাইন ও মাতার নাম প্যালিনা কচ (Paulina Koch)। ইঁহারা ইহুদী। মিউনিক শহরের অনতিদূরে একটী ভাড়াটীয়া বাড়িতে আইনস্টাইনের শৈশব অতিবাহিত হয়। শিশু অবস্থায় তিনি অত্যন্ত ভাবুক ছিলেন। ১৮৯৭ সালে আরান হইতে Matriculation পাশ করেন। ১৯০০ সালে জুরিক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডিগ্রি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। কিছুদিন পেটেন্ট অফিসে চাকরী করেন ও সেই সময় হইতেই তাঁহার খ্যাত বৈজ্ঞানিক গবেষণা সমূহ আবিষ্কৃত হয়। ইঁহার স্ত্রীর নাম এলসা, ইনি ১৯২১ সালে নোবেল প্রাইজ পান। "Theory of Relativity" (আপেক্ষিকবাদ তত্ত্ব) আবিষ্কার ক'রে বিজ্ঞান-জগতে অমরত্ব অর্জন করেছেন। ইহুদী বলে ইনি জার্মানী থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। বর্তমানে আমেরিকায় আছেন।

২৩। সর্বপ্রথম ভারতীয় 'এফ-আর-এস্' মাদ্রাজের ৺কে রামানুজম্। তারপরেই বাংলার ৺ সার জগদীশচন্দ্র বসু। এখন ভারতে মাত্র চারজন 'এফ্-আর এস্' আছেন—

১। সার সি, ভি, রমন্ (মাদ্রাজ)
২। ডাঃ মেঘনাদ সাহা (বাংলা)
৩। ডাঃ বারবল সাহনী (পাঞ্জাব)
৪। ডাঃ কে, এস্, কৃষ্ণন্ (মাদ্রাজ)

২৪। বঙ্কিম চন্দ্রই বড়, (চিঠিপত্র' দেখ)

২৫। ছুঁচ ভারতবর্ষে হয় না, কারণ অভিজ্ঞ লোক নেই, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নেই, এবং কারুর চেষ্টাও নেই।

২৬। উচ্চডিগ্রীধারীদের উচ্চশিক্ষিত বলে মনে করলে যদিও ঠিক ভুল হবে না, তবে কোনো ডিগ্রী না থাকলেও যথার্থ উচ্চশিক্ষিত বলে স্বীকৃত হতে পারেন, এমন লোকও আছেন অনেকেই। সুতরাং উচ্চশিক্ষিত বলতে কেবলমাত্র উচ্চডিগ্রীর দাবীই একমাত্র গ্রাহ্য নয়, যদি না তাঁর মধ্যে যথার্থ পাণ্ডিত্য, ঔদার্য্য, সুরুচি ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ থাকে।

ফাল্গুনের প্রশ্নের উত্তরদাতা

নাম	ঠিকানা	নিম্ন সংখ্যক প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর দিয়েছেন
অনিলবরণ মহান্তি	যাদবপুর	১, ২, ৩, ৬, ৭, ৯, ১০, ১২, ১৪, ২২, ২৩, ২৬
অজিতকুমার ঘোষ	কলিকাতা	১, ২, ৩, ৬, ১৯, ২৪, ২৬
অশোককুমার ঘোষ	দিল্লী	১, ৬, ৭, ৯, ১৩, ২৪
অনিলবরণ ঘোষ	হাবড়া	১, ২, ৩, ৮, ৯, ১০, ২২, ২৩, ২৪, ২৬
অসীম রাহা	বালিগঞ্জ	২, ৩, ৬, ৭, ৯, ১৪, ২১, ২২, ২৩, ২৬
অমলকুমার সেন	খুলনা	৬, ৭
অশোককুমার নন্দী	কলিকাতা	৯, ১০, ২৩, ২৬
অরুণলাল মুখোপাধ্যায় ও নীলিমা দেবী	কলিকাতা	২২
আভাসচন্দ্র গুপ্ত	বেন্দা	৩, ৬, ১৪, ২২, ২৩, ২৬
আবুল হোসেন মিঞা	ফরিদপুর	১, ২, ৩, ৮ (আংশিক) ১৩, ২০, ২২, ২৪, ২৬
ইন্দ্রানী রায়	পাটনা	২, ৩, ৯, ১৪, ২২, ২৬,
উদয়ভানু সিংহ	কলিকাতা	১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৯, ১৯, ২২, ২৫,
উমাশঙ্কর বসু	কলিকাতা	২২,
ঊষারঞ্জন ঘোষ ও কল্পনা ঘোষ	মেমারী	১, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ২৩, ২৪,

কলিদাস সাহা	সাহাজাদপুর	১, ৭, ৯, ১১, ১৩, ২৩
কে এম ছায়রুল হক্	মৈমনসিংহ	১, ৩, ৫, ৭, ৮, ৯, ১১, ১৮, ১৯, ২৪
গায়ত্রী দেবী	বরহামগঞ্জ	৭, ১৫, ১৬, ২৩, ১৯,
গোবর্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজ	সালিখা	৬, ৭,
গৌবাঙ্গচন্দ্র রুদ্র	চট্টগ্রাম	২, ১৯, ২৪
তারাপদ চক্রবর্তী	ফেনী	১, ৩, ৬, ৭, ৯, ১০, ১৫, ২২, ২৩, ২৪
ধীরেন্দ্রনাথ মহান্তি	দাঁতন	৭,
দিলীপ সেন	ভবানীপুর	৭,
ধ্রুবরঞ্জন সরকার	হাওড়া	১, ৭, ৯, ১০, ১৪, ১৩, ১৫, ১৮, ১৭, (আংশিক) ২৩, ২৪
নবনীকুমার চৌধুরী	লঙ্কাই	১, ৩, ৭, ১০, ১৩, ১৪, ১৭, (আংশিক) ২২, ২৪, ২৬
নীলিমা দাশ	আকোলা, সিপি	৩, ১০,
নীলিমা দেবী মুখোপাধ্যায়	কলিকাতা	১, ২, ৩, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬ ১৮, ২০, ২১, ২৪, ২৫, ২৬
নীতিশরঞ্জন দে ও নিখিলরঞ্জন দে	ঢাকা	৬, ৭, ৯, ১০, ১১, ১৩, ১৭ (আংশিক)
পঙ্কজমোহন রায়	কোতুলপুর	৬, ৭, ৯, ১১, ২৩
পার্বতীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়	রামপুর হাট	১, ২, ৩, ৭, ৯, ১০, ১৬, ১৮, ২৪,
পুলিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়	বৈদ্যবাটী	১, ৭, ৮, ১৭, ২২, ২৩, ২৪
বিনয়ভূষণ পাল	কলিকাতা	১, ২, ১৪, ২২, ২৩, ২৪
বিশ্বনাথ সেনগুপ্ত	চট্টগ্রাম	১, ৩, ৭, ৯, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৬, ২২, ২৩, ২৬
বীরেন্দ্রনারায়ণ সরকার	ফরিদপুর	৫, ৬, ১৬, ২৩, ২৬
মধু ঘোষাল	মৃগকল্যাণপুর	১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৮, ৯, ১৪, ১৯, ২৪, ২৬
মধুসূদন মণ্ডল ও রামচন্দ্র সেনগুপ্ত	হুগলী	১, ২, ৭, ১৪, ১৯, ২৪, ২৬,
মীরা নন্দী	শিলং	৫,
মৃণালকান্তি গুপ্ত	কলিকাতা	৩, ৬, ৭ ২৩, ২৪,
রণেন্দ্রনাথ ঘোষ চৌধুরী	চন্দ্রভাগা	৬, ৭, ৯, ১১, ২৬,
রেবা ভদ্র	ঢাকা	১, ২, ৩, ১১, ২০, ২২, ২৩, ২৪, ২৬
লালবিহারী চক্রবর্তী	গোকর্ণ	৭, ১০,
হেনা রাহা	বরকান্তা	৬, ১০, ২৬,
হেনা দেশীল	কলিকাতা	২, ৩, ৮, ৯, ১১, ১৪, ২৩, ২৬,
শকুন্তলা বসু	খুলনা	৮, ১৪, ২২, ২৪, ২৬
শক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	ডিব্রুগড়	২, ৩, ৬, ১৩, ১৭, ২৪
শশাঙ্কশেখর বসু	ভবানীপুর	২, ৩, ৬, ১০
শশী ভট্টাচার্য	হেমনগর	৭, ১০, ১১
শৈলেন্দ্রকুমার রায় (২১৩৯)		৩, ৭, ৯, ২৩
শ্রীগোপাল চক্রবর্তী (১০০৮)		৩, ৫, ৬, ৭,
সত্যেন্দ্রচন্দ্র সরকার	জামসেদপুর	৭,
সরসীমোহন দে		২, ৭,

... মুখার্জি	কলিকাতা	৯, ১০,
...নৎকুমার ভট্টাচার্য	আরিয়াদহ	১, ২, ৩, ১৯
সাধন দাশগুপ্ত	রাণীগঞ্জ	৩, ৭, ২৩ (আংশিক)
সাধনা বসু	বারুইপুর	১, ২, ৩, ৬, ৭, ৯, ১১, ১৩, ২৩
সিদ্ধেশ্বর মিত্র	বালিগঞ্জ	১, ৩, ৯, ২৩
সুধানাথ রায়চৌধুরী	কণেশ্বর	১, ২, ৩, ৭, ৮, ৯, ১০, ২৪, ২৬
সুপ্রিয়া পাল	কাঁথি	১৭,
সুরভি রায়চৌধুরী	কলিকাতা	৬

মন্তব্য—২৬টি প্রশ্নের মধ্যে ২০টির সঠিক উত্তর দিয়ে নীলিমাদেবী **প্রথম** স্থান অধিকার করেছে

ভোটের ফলাফল

ডা: শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ১৬ ভোট।

তারাপদ চক্রবর্তী, ফেনী, লালবিহারী চক্রবর্তী, গোকর্ণ, পার্বতীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, রামপুরহাট, সত্যেন্দ্র-চন্দ্র সরকার, জামসেদপুর, দিলীপ সেন, ভবানীপুর, অসীমা দেবী, চন্দননগর, বিমলেন্দু গাঙ্গুলী, উয়ারী, মৃণালকান্তি গুপ্ত, শিয়ালদহ, মহামায়া সাহিত্য মন্দির, শেওড়াফুলি, হরিকমল পুরকায়স্থ, শিলং, সনৎকুমার বাগচী, জামশেদপুর, হেনা বাহা, বরকান্তা, পাঁচুগোপাল বসু, বারাসাত, চন্দ্রকুমার ঘোষ ও মধুসূদন মণ্ডল, হুগলী, রেণু ঘটক, মালদহ।

শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮ ভোট।

নীরদচন্দ্র রায়, মৈনাম, কুমারী ইন্দ্রাণী রায়, পাটনা, আরিয়াদহ সাধারণ পাঠাগার, আরিয়াদহ, উদয়ভানু সিংহ কলিকাতা; উমারাণী ঘোষ, কদমতলা, গোবর্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজের সভ্যবৃন্দ, হাওড়া; বিশ্বনাথ সেনগুপ্ত, চট্টগ্রাম; নমিতা গাঙ্গুলী, টালিগঞ্জ, সাধন দাশগুপ্ত, রাণীগঞ্জ, পুলিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়, বৈষ্ণবাটী, মেম্বার্স অফ দি সি, আই, টি মেস্‌ ও অনিল, যাদবপুর, শৈলেন্দ্র-কুমার রায়, কলিকাতা, অসীম রাহা, বালিগঞ্জ; উমা বাগচী, রায়পুর, সিপি, নরেশচন্দ্র রায়, মেদিনীপুর, কমলেশ মিত্র, নবদ্বীপ; কেশবলাল মুখোপাধ্যায়, বর্ধমান।

শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০ ভোট।

সুরভি রায়চৌধুরী, কলিকাতা, ধীরেন্দ্রনাথ মহান্তি, দাঁতন, দেবব্রত মজুমদার, কলিকাতা, অনিলবরণ ঘোষ, দাবড়া, রেবাভদ্র, ঢাকা, সৌরভ সনাতনি, অমলনার; শশাঙ্কশেখর বসু, ভবানীপুর; শঙ্করকুমার ভট্টাচার্য, আরিয়াদহ; কৃষ্ণপদ চট্টোপাধ্যায়, আরিয়াদহ, মীরানন্দী, শিলং; সাধনানন্দ মিত্র, মুগবেড়িয়া, রিষড়া বয়েজ লাইব্রেরী, রিষড়া; এম, ফিরোজা খাতুন, ঠাটপাড়া, আবুল হোসেন মিঞা, রাজের, সুপ্রিয়া পাল, কাঁথি, হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়, ঢাকা, গীতা ও বাদল পালিত, আসানসোল, অমলকুমার দত্ত ও কুমারী নীলিমাদত্ত, কলিকাতা; বিনয়ভূষণ পাল, কলিকাতা; আভাসচন্দ্র দাশগুপ্ত, বেন্দা, কল্যাণী দেবী, টালা, গৌরাঙ্গ রুদ্র, চট্টগ্রাম, হেনা দে শীল, কলিকাতা, গায়ত্রী দেবী, বরহমগঞ্জ, সাধনা বসু, বারুইপুর, অশ্বিনীকুমার মণ্ডল, আহমদপুর, সলিলা মুখার্জী, কলিকাতা, অশোককুমার ঘোষ, দিল্লী।

শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার সান্ন্যাল ১৩ ভোট।

উমাশঙ্কর বসু, কলিকাতা, রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, আরিয়াদহ, সরসীমোহন দে, কলিকাতা, নীতীশরঞ্জন দে ও নিখিলরঞ্জন দে, ঢাকা; কে, এম, ছায়ফুল হক, ফিরোজ লাইব্রেরী, ময়মনসিংহ; সিদ্ধেশ্বর মিত্র বালিগঞ্জ, অবনী সরকার, বজবজ, অনিলবরণ মহান্তি, যাদবপুর, অজিত কুমার ঘোষ, কলিকাতা; অনিমা চ্যাটার্জি, উত্তরপাড়া, মধু ঘোষাল, মুগকল্যাণ। সমীরকুমার ঘোষাল, কলিকাতা।

সম্পাদকীয় মন্তব্য

'চিঠিপত্র' বিভাগে এই বিষয়ে দু'একজন গ্রাহকের চিঠি মুদ্রিত করা হয়েছে, সেদিকে পাঠশালার গ্রাহক গ্রাহিকাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। '৺শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পর বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কথা শিল্পী' কে, এ প্রশ্নটি পাঠশালার যে গ্রাহক করেছেন সেই চট্টগ্রামের শ্রীমান বিশ্বনাথ সেনগুপ্ত এবং তাঁর প্রশ্নের যাঁরা উত্তর দিয়েছেন এবং যাঁরা এই ভোটের ব্যাপারে যোগ দিয়েছেন তাঁরা সকলেই কিশোর বয়স্ক ছাত্র ছাত্রী, তাঁদের পক্ষে এই পাঠ্যাবস্থায় সকলের লিখিত সব উপন্যাস ও গল্প পড়া যে সম্ভব নয় এ কথাও যেমন সত্য, তেমনি একথাও সত্য যে রচনার দোষ গুণ বিচার করে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয় করবার মত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতাও তাঁদের নেই, সুতরাং এটাকে যেন ছেলেখেলা বলেই ধরা হয়।

গ্রন্থাগারিক

প্রভু জগদ্বন্ধু

রচয়িতা—ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ পরিমলবন্ধু দাস।

প্রকাশক—শ্রীশ্রীহরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহানাম সম্প্রদায়।

২৯নং রামকান্ত মিস্ত্রী লেন, কলিকাতা

১৮৯ পৃঃ, মূল্য এক টাকা। ছাপা, বাঁধাই, কাগজ সাধারণ।

সাধু মহাত্মা প্রভু জগদ্বন্ধুর জীবনী। ভক্তের রচনা যেমন মর্মস্পর্শী হইয়া থাকে এ বইখানিরও সে গুণ আছে। পাঠককে উচ্চস্তরে টেনে নিয়ে যায়। পুস্তকের ভূমিকায় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেছেন "প্রভু জগদ্বন্ধুর জীবন হইতে ছাত্র ও তরুণদের অনেক জানিবার এবং শিখিবার বিষয় আছে।" আমরা তাঁর এ অভিমত সম্পূর্ণ সমর্থন করি। বইখানি ছাত্রসমাজের মন দিয়ে পড়া উচিত।

য়ুরোপের মহাযুদ্ধ

রচয়িতা—শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

প্রকাশক—শ্রীনির্মলচন্দ্র দে, ৪, কার্তিক বসু লেন, কলিকাতা।

১১১ পৃঃ, মূল্য এক টাকা, ছাপা, বাঁধাই, কাগজ ভাল

ইতিহাসকে গল্পের মত সরস ও চিত্তাকর্ষক করিয়া বলিতে শচীশ-বাবুর সমকক্ষ কেহ নাই। গ্রন্থের নাম শুনিয়া ভয় পাইবার কোনো কারণ নাই, ১৯০০ হইতে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ পর্যান্ত সুদীর্ঘ বিশ বৎসর সমগ্র য়ুরোপের আভ্যন্তরীণ অবস্থা প্রবীণ ও বিচক্ষণ ঐতিহাসিকের উন্মুক্ত দৃষ্টি ও অপক্ষপাত মন লইয়া যেভাবে তিনি অনুশীলন করিয়াছেন তাহা একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের এই সুযোগ্য বংশধরের পক্ষেই সম্ভব। বইখানি পড়িতে সুরু করিলে শেষ না করিয়া ছাড়া যায় না এবং এমন অনেক বিষয় এই পুস্তক পাঠে শেখা যায় ও জানা যায় যাহা য়ুরোপ সম্বন্ধে একাধিক গ্রন্থ পাঠের অপেক্ষা রাখে। আশা করি ঐতিহাসিক কাহিনীর অনুরাগীদের কাছে এ বইখানির যথাযোগ্য সমাদর হবে।

দাবী

রচয়িতা—শ্রীতড়িৎকুমার বসু, এম-এ, বি-এল

প্রকাশক—শ্রীঅনিলকৃষ্ণ রায়চৌধুরী।

১৯০।২ রাসবিহারী এভেনিউ, বালিগঞ্জ, কলিকাতা

১৮৫ পৃঃ, মূল্য দেড় টাকা, ছাপা, বাঁধাই ও কাগজ উৎকৃষ্ট

বইখানির আদ্যোপান্ত অভিনবত্বে ভরা। নাটক, উপন্যাস ও কাব্যের ত্রিবেণী সঙ্গম! অথচ আলোচ্য গ্রন্থখানিকে উপরোক্ত কোনো শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। 'দাবী' বাংলা সাহিত্যে এক নূতন দাবী লইয়া উপস্থিত! তড়িৎবাবু একজন যশস্বী লেখক। তিনি একাধার কথাশিল্পী ও নাট্যকার। পরে সিনেমা জগতেও তাঁহার সুদীর্ঘ অভিযান চলিয়াছিল, ফলে, বাংলা সাহিত্য তাঁহার নিকট পাইয়াছে আজ এই এক সম্পূর্ণ নূতন জিনিষ 'চিত্র-নাট্য-রূপী-কথা-সাহিত্য'। ভাষায় আঁকিয়াছেন তিনি আলোকচিত্র, অতি চিত্তাকর্ষক এক অপূর্ব কাহিনী দৃশ্যের পর দৃশ্যে জীবন্ত ছবির মত ফুটিয়া উঠে পাঠকের মুগ্ধ মনের পটে, কল্পনার প্রেক্ষাগারে। আমরা তড়িৎবাবুর এ 'দাবী' শীঘ্রই পর্দার উপর সজীব চিত্ররূপে দেখিবার আশা রাখি।

সহযোগী সাহিত্য

ফাল্গুন—১৩৪৭

মৌচাক

প্রথমেই সুকবি প্যারীমোহন সেনগুপ্তের ছোট্ট একটি কবিতা 'গ্রামের ছবি' গ্রামখানি সম্ভবত কবির কল্পনার গ্রাম, নইলে কি আর সেখানে—

'কেউ কাহারে দেয়না বাধা, সহজ পথে যায় সবাই
সাপ ও পাখী অবাধ চলে মানুষ যেন সবাই ভাই।"

প্রতিভাবান কথাশিল্পী মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প 'তৈলচিত্রের ভূত' উপভোগ্য রস রচনা। বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে রচিত ইলাদেবীর 'মা' সুখপাঠ্য। শ্রীবিশ্বেশ্বর মিত্রের 'আজগুবী খেয়াল' চিত্তাকর্ষক। পৃথিবীর বড় বড় মনীষীদের খেয়ালের খোস খবরে ভরা। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের উপন্যাস 'উঁচু নীচু' চলছে। মৌ ভাণ্ডারে মৌমাছি বন্ধুদের ও মধুদিদির মধুমাখামাখি ক্রমে চটচটে হ'য়ে উঠছে। ছেলেমেয়েদের এ ন্যাকামী না শেখালেই ভাল হয়। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের নাট্যচিত্র 'দুষ্টুমী' ছেলেদের দুষ্টুবুদ্ধিকে প্রখর করে তুলতে পারবে। ধীরেন্দ্রলাল ধরের যুদ্ধ-উপন্যাস 'প্রলয়ের পথিক' এগিয়ে চলেছে।

শিশু সাথী

শ্রীপ্রতিমা ঘোষের 'আলপিন' প্রবন্ধটি শিক্ষাপ্রদ। শ্রীতারকদাস বাগচীর 'এলোরা ও অজন্তা' জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ ভ্রমণকাহিনী। ননী-গোপাল চক্রবর্ত্তী বি-এর 'এ্যালুমিনিয়মের পরিণতি' সারবান রচনা। অবিনাশচন্দ্র রায়ের 'পথের সাথী' গল্পটি জ্ঞানগর্ভ রচনা। সুধীন-কুমার মিত্র বি-এর 'কলিকাতার আশে পাশে' জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ সুপাঠ্য প্রবন্ধ। বিমলকৃষ্ণ সিংহের 'হরিহর ছত্রের মেলাতে'ও জানবার মত কিছু আছে।

ভাইবোন

শ্রীমান হরিভূষণ মৈত্রের রস রচনা 'কুনোরাম' উপভোগ্য। সম্পাদক প্রভাতকিরণ বসুর 'নাটিকা' 'বাংলার স্বপ্ন' সুখ স্বপ্নের মতই মধুর! জয়গুকুমার ভাদুড়ীর 'মুক্তা' প্রবন্ধটি মুক্তার মতই মূল্যবান। যাদু সম্রাটের যাদুবিদ্যা চিত্তাকর্ষক। সম্পাদকের ভ্রমণকাহিনী 'হিমালয় হইতে কুমারিকা' জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ সরস রচনা। কাকাবাবুর বৈঠকটিকে জামাইবাবুর আসর বলাও চলে।

কৈশোরক

ডক্টর নৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী 'ক্ষীরচোরা গোপীনাথ' তথ্যপূর্ণ প্রাচীন কাহিনী। 'সাত সাগরের ঢেউ' কৈশোরকের গৌরব। 'বিমানবাহক' রবীন্দ্রনাথ ঘোষের শিক্ষামূলক রচনা। মাখনলাল সেনের 'ইতিহাসের গল্প' সুখপাঠ্য। 'হিমালয় অভিযান' চিত্তাকর্ষক। সম্পাদকের 'সুন্দর বনের চিঠি' সুন্দর রচনা। তাছাড়া 'শিকারের কথা' 'ভ্রমণকাহিনী' 'সাধারণ জ্ঞান' ইত্যাদি অনেক বিষয় আছে যাহা ছাত্রদের 'জ্ঞান আহরণের' সহায়ক।

. বিনিময় সঙ্ঘ

পরিচালক :—অমিয়লাল মুখোপাধ্যায়

১। **অসীম রাহা**—ইটালীর ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ৫০ সেণ্ট মূল্যের নীল রঙের টিকিটখানিতে আছে প্যোটিনভাম্পর বিখ্যাত কবি হোবেস বা হোবাটিয়াসের চিত্র।

২। **রেবা ভদ্র**—আপনাব উৎসাহ দেখিয়া মনে হইতেছে অবসর সময় অনেক। আপনি শীঘ্রই একটি সুন্দব সংগ্রহ গড়িয়া তুলিতে পাবিবেন। তখন আপনাব অনাবশ্যক একই বকমেব অতিবিক্ত (Dublicate) টিকিট-গুলি বিনিময় সঙ্ঘেব সাহায্যে পবিবর্তন কবিয়া লইবেন।

*　　　*　　　*

(১) **সলিলা মুখোপাধ্যায়**—টিকিট দুইখানি কিছুদিন পূর্বে গ্রেটবৃটেনে প্রচলিত ছিল। উহার প্রথমখানি অর্থাৎ ½d. মূল্যের খানিতে আছে ভূতপূর্ব সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ড ও দ্বিতীয় 1d মূল্যেব টীকিট-খানিতে আছে স্বর্গগত সম্রাট পঞ্চম জর্জের ছবি।

(২) **সুনীলকুমার ব্যানার্জ্জী**—যে টিকিট দুইখানি চাহিয়াছেন তাহার কোনখানিরই মূল্য দুই আনাব কম নয়, অথচ বদলে দিতে চাহেন অল্প মূল্যের দুইখানি টিকিট যাহা ৵০ মূল্যেব ১০০ টিকিটেব মোড়কে পাওয়া যায়। এরূপ ক্ষতিজনক বিনিময়ে কেহই রাজী নহে। যদি পশুপক্ষীব ছবিযুক্ত কোন টিকিট প্রেরণ কবিতে পারেন তাহা হইলে নীলিমা মুখার্জী তাহার পরিবর্তে উহার যে কোন দুইখানি (অবশ্য যাহা সমমূল্যের হইতে পারে) দিতে পারেন। না হইলে অধুনা প্রচলিত ভারতের ৮০ মূল্যের কিম্বা ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে উড়োজাহাজের জন্য যে পৃথক ডাকটিকিট ব্যবহার হইয়াছিল, তাহার ৵০ আনার খানি বাদে অন্য যে কোনও খানি পাঠাইলেও তৎপবিবর্তে পঞ্চম জর্জের (১৯২৬ খৃঃ) ৫৲ টাকা মূল্যের টিকিটখানি পাইতে পারেন।

*　　　*　　　*

সমীর চৌধুরী—আপনার অনুমান ঠিকই হইয়াছে। পোল্যাণ্ডেরই জাতীয় নাম Poeza Polska। আব অপব যে টিকিটখানিব কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা হায়দ্রাবাদেব। উহাতে আছে বাজপথের উপর অবস্থিত তোরণদ্বাবেব ছবি।

সিদ্ধেশ্বর মিত্র—আপনার নায়েসার ১৯১১ খৃষ্টাব্দের টিকিট ১২খানিতে উট, জীরাফ, জেব্রা প্রভৃতির ছবি থাকায় নীলিমা দেবী উহার বিনিময়ে ঐ মূল্যের অন্য টিকিট দিতে স্বীকৃত আছেন। টিকিট কয়খানি পাঠাইলে পববর্তী ডাকে অন্য টিকিট পাইবেন।

জার্মাণ, সুইজাবল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, জাপান, সাউথ আফ্রিকা ও ত্রিবাঙ্কুরের টিকিটের বদলে আমি নেপালের টিকিট চাই। ইতি—　　　সমীর চৌধুরী।

নিম্নলিখিত Stampএর বদলে আমি Nepalএর A Stamp চাই—

প্রত্যেকের একখান করে—জার্মাণী, সুইজারল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, জাপান, সাউথ আফ্রিকা, ত্রিবাঙ্কুর এবং কয়েক-খানি ইংল্যাণ্ডের।

শ্রীসমীব চৌধুরী
গ্রাহক নং—২৬৭৬

আমাব চকোলেটের ছবি জমাইবার সখ আছে। 'Pictorial World Atlas' সংক্রান্ত চকোলেটের ছবি যদি কেহ বদলাইতে চাহেন আমাকে লিখুন।

অসীমা দেবী
C/. Students Library
Hatkhola, Chandernagore

হরফের হেরফের—অক্ষর ক্রীড়া

আগামী মাসের জন্য পাঠশালার জনৈক গ্রাহিকা একটি পদ পাঠিয়েছেন—"Men in a route" এই পদের হরফগুলি সাজিয়ে এমন একটি শব্দ তৈরি কর যে শব্দটি আজকাল অনেক লোকের মুখেই শুনতে পাওয়া যাচ্ছে।

ফাল্গুনের উত্তর

কুমারী সাধনা বসু, বারুইপুর—I love no rut
শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী, কলিকাতা—Rout on evil
কুমারী লক্ষ্মীরাণী সেন, ঘোলসাহাপুর—Volute Iron
সৌরভ সনাতনি, অমলনার—I love to run
কুমারী নীহার ব্যানার্জি, জব্বলপুর—To ruin love
নির্ম্মল, সনৎ, শ্যাম, শক্তি, জামসেদপুর—To love ruin
পাঁচুগোপাল বসু, বারাসাত—On vile route
অশ্বিনীকুমার মণ্ডল, আহমদপুর—To ruin love

'REVOLUTION' কথাটি নিয়ে হরফের হেরফেরে এঁরা কজনেই বিশেষ বাহাদুরী দেখিয়েছেন, এবং ইংরাজী ভাষায় নিজেদের ব্যুৎপত্তির প্রশংসনীয় পরিচয় দিয়েছেন।
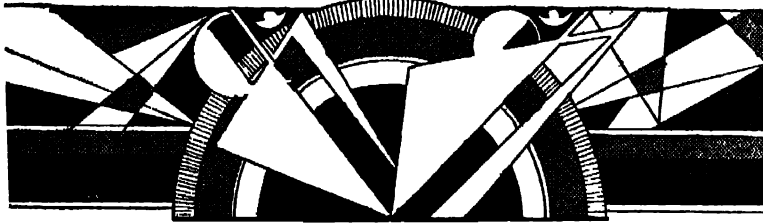
চৈত্র—১৩৪১

৪টি ৩৫ গজ Square একসঙ্গে যোগ করলে মোট ক'গজ Square হবে?

ফাল্গুনের ধাঁধাঁর উত্তর

সঠিক উত্তর—**কাচ** (Glass) কারণ, নীরেট পদার্থের কোনো গুণই এর মধ্যে নেই। বিশ্লেষণ করলে এর মধ্যে কোনো আকারেরই কোনো জমাট বাঁধা দানাদার পদার্থ দেখতে পাওয়া যায় না। এর কোনো নির্দিষ্ট 'melting point'ও নেই, এবং Gravityর সঙ্গেই এ বহে চলে। সুতরাং কাচ তরল পদার্থের মধ্যে গিয়ে পড়ল। কিন্তু,—

কুমারী লক্ষ্মীরাণী সেন ঘোলসাহাপুর। হেনা বাহা, বরকান্তা। আভাস দাশগুপ্ত, বেন্দা। শৈলেন্দ্রকুমার রায়, কলিকাতা। বণেন্দ্রনাথ ঘোষ চৌধুরী, চন্দ্রভাগা সুধানাথ রায়চৌধুরী, কণেশ্বর। রেণু ঘটক, মালদহ। অশ্বিনীকুমার মণ্ডল, আহমদপুর, উত্তর দিয়েছেন—বরফ। এবং মধু ঘোষাল, যুগকল্যাণ, মধু ব্রাদার্স এণ্ড সিষ্টার্স, যুগকল্যাণ, গোবর্দ্ধন সঙ্গীত সমাজ, সালখিয়া। বিমলেন্দু গাঙ্গুলী, উয়ারী। কুমারী নীহার ব্যানার্জি, জব্বলপুর। পাঁচুগোপাল বসু, বারাসত। নীলিমা দাশ, সিপি, উত্তর দিয়েছেন—পারা বা পারদ।

Printer and Publisher B. Bhattacharya, Prabhu Press, 30, Cornwallis Street, Calcutta.

"শব্দ-সন্ধান"

(প্রতিযোগিতা-কুপন)

(যে কোনো পাঠক বা পাঠিকা এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারেন,
এবং যতগুলি ইচ্ছা কুপন পাঠাতে পারেন)

১ দো		২ পূ		৩		৪	৫	৬ না
				৭ তৃ			৮ মা	
৯	১০ টি					১১		সা
			১২		১৩ ক		১৪ ত	
১৫		১৬ ম			১৭	১৮		
১৯ স্থ			ল			২০ টা		
				২১		ত		২২
		২৩	২৪	ব		২৫	২৬ মা	
২৭ র			২৮ প				২৯	ন

(পাঠশালা, চৈত্র)

নাম. ....

ঠিকানা ....

....

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আগামী ১৫ই চৈত্রের মধ্যে কুপনখানি পাঠশালা-কার্যালয়ে পৌঁছনো চাই।

☞ কুপনে কোনো কাটাকুটি বা বানান ভুল চল্‌বে না।

আমার মতে রবীন্দ্রনাথের পরই বাংলার গর্ব করবার মত কবি—

৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

৺রজনীকান্ত সেন

৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী

" কুমুদরঞ্জন মল্লিক

" কালিদাস রায়

" কাজী নজরুল ইসলাম

নাম ______________________

ঠিকানা ______________________

গ্রাঃ নং ______________________

যাঁকে ভোট দেবেন তাঁর নামের আগে × ঢেরা চিহ্ন দেবেন।

বিশ্বকবির একাশীতিতম জন্মদিনে

প্রীতিঅর্ঘ্য

"রবীন্দ্রনাথ"

এই ১৪ বছর বয়সেই কাব্য-রচনা স্থরু করেন
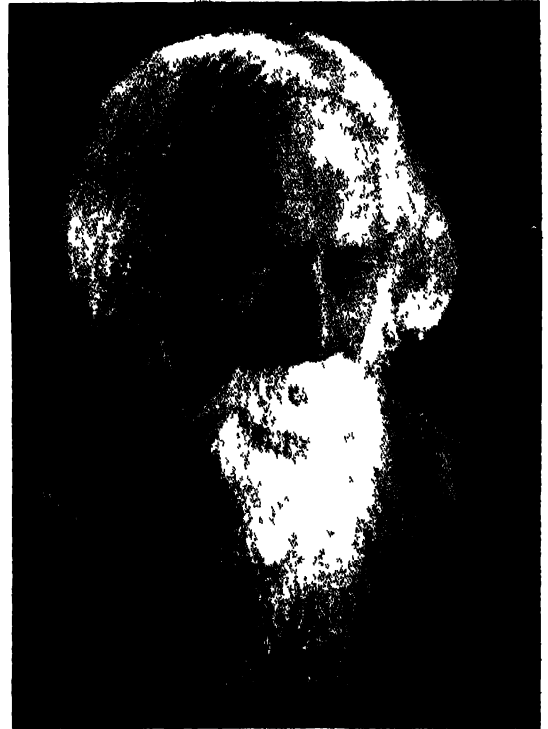
"রবীন্দ্রনাথ"

আজ ৮০ বছর বয়সেও তা' সমান তেজে চলেছে।

চতুর্থ বর্ষ] বৈশাখ- ১৩৪৮ [অষ্টম সংখ্যা

স্বাগতবরষে

শ্রীশম্ভুনাথ ভট্টাচার্য

স্তিমিত চাঁদেব ভীরু দীপশিখা ধীরে হযে আসে ম্লান,
নবীন ববষ সমাগত দ্বারে—দেহ কিবা দিবে দান।
জাগো জাগো সবে আঁখিদল মেলি,
সত্য ডাকিছে, সুপ্তিরে ফেলি
শুনাও তাহারে অরুণ প্রভাতে তরুণ নূতন গান,
পূবালী হাওযায় কে গাহে পূরবী—প্রাচীনের অবসান

ম্লানবেশ ত্যজি আশা উজ্জ্বল নববেশে উঠ সাজি,
সত্যেরে কর ধ্রুব আদর্শ, শুভ গান গাহো আজি।
মর্মে আসুক মুক্তি হরষ,
কর্মে আসুক পুণ্য পরশ,
সত্য ও শিব সুন্দর তব আদর্শ—সবে বলো।
ঝর্ণার মত বন্ধুর পথে আনন্দে নেচে চলো।

নবীন বরষে জন্মভূমিরে মন-প্রাণ করো দান,
নব উদ্যম নব প্রেরণায হযে ওঠো বলীয়ান্।
ভুলিয়া তুচ্ছ স্বার্থের সুখ,
উচ্চ উদার করে তোলো বুক,
ঘুচাও সকল বিভেদ বিরোধ দূর করো সংশয়।
মহান্ কর্মে জীবন দানিয়া মৃত্যুরে করো জয়।

বাঘের প্রতিবেশী

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

আমি তখন ছোটনাগপুরের একটা বড় জমিদারের সেরেস্তায় কাজ করতাম।

সে অনেক দিনের কথা। এখন যেমন সেখানে এক সহর থেকে অন্য সহরে যাতায়াতের জন্য বাস পাওয়া যায়, তখন সে সুবিধা ছিল না। সম্বলের মধ্যে তখন ছিল ই, আই, রেলওয়ের গ্রাণ্ড কর্ড্ লাইন আর পুশপুশ গাড়ী এবং পালকী।

পুশপুশ গাড়ী একটা অদ্ভুত যান। পালকী বলো পালকী, রিক্সা বলো রিক্সা। পালকীর মতো তার বডিটা, রিক্সার মতো দুটো চাকা, কতকগুলো লোক সামনে টানে, কতকগুলো পিছন থেকে ঠেলে। যারা টানে তারা ম্যালেরিয়া-জীর্ণ দুর্বল লোক নয়। তারা ওখানকার আদিম অধিবাসী, ছিপছিপে লম্বা দেহ, যেন কষ্টি পাথরে খোদাই করা। মাথায় বড় বড় বাবরি চুল। একদমে তারা দশ-বারো মাইল পথ ছুটে চলে। এক শহর থেকে আর এক শহর পর্যন্ত চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল পথ তারা এইভাবে দশ-বারো মাইল অন্তর চটিতে চটিতে লোক বদলে নিয়ে যায়।

ছোটনাগপুরের সম্বন্ধে যাদের ধারণা আছে তাদের পক্ষে বুঝতে ব্যাপারটা সুবিধা হবে। বাঙ্গলার সঙ্গে তার কিছুমাত্র মিল নেই, সেখানে সমতল প্রান্তর নেই, দিগন্ত প্রসারিত উন্মুক্ত ধানক্ষেতও নেই। চারিদিকে চাইলেই সেখানে চোখে পড়বে মেঘের মতো ধূসর পাহাড়ের পর পাহাড় আকাশে গিয়ে মিশেছে। আর যোজনব্যাপী ঘন বনের মধ্য দিয়ে চলেছে উঁচুনীচু ঢেউ-খেলানো পথ। অনেক দূরে দূরে তার ধারে ধারে ছোট-ছোট গ্রাম। সে গ্রাম বাঙ্গলার গ্রামের মতো বড় নয়, সুন্দর নয়, সমৃদ্ধও নয়। তা মাত্র কয়েকখানি অতি জীর্ণ কুঁড়ে ঘরের সমষ্টি মাত্র।

আর যে ঘন বনের কথা বললাম, তাও ট্রেনে চলতে রেল লাইনের দু'পাশে লতাগুল্মে ঢাকা যে দুষ্প্রবেশ্য জঙ্গল বাঙ্গলা দেশে চোখে পড়ে, তার মত নয়। দূর থেকে সেই নীল বন ঘন দেখায় সত্যি, কিন্তু ভিতরে এলেই কতকগুলো গাছের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। তা জঙ্গল নয়, দুষ্প্রবেশ্য তো নয়ই। সেখানে কেবল বড় বড় শাল, আমলকি, পলাশ, মহুয়ার গাছ।

দেখবে শাল গাছে সাদা ফুল ফুটেছে। পলাশ-মহুয়া লালে লাল, যেন বনে কে রঙের আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। দেখবে তারই মধ্য দিয়ে অসংখ্য ছোট-ছোট পাথর-নুড়ি ডিঙিয়ে একটা বেতের মতো লিকলিকে নদী ছোট মেয়ের মতো হাসতে হাসতে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে। হয় তো দেখবে অসংখ্য টিয়া পাখী মহুয়ার মধু খেতে ন্যাড়া গাছ ছেয়ে ফেলেছে। সে এক অপূর্ব শোভা।

যদি রাত্রে কোনদিন সেদিকে যাও, দেখবে সেই অন্ধকার কালো বনের স্থানে স্থানে আগুন জ্বলছে। কাঠুরেরা কাটছে কাঠ, তারই ঠকাঠক্ শব্দ উঠছে। মাঝে মাঝে তারা হাঁক দিয়ে পরস্পরের সাড়া নিচ্ছে। সেই হাঁকে ঘুমন্ত বন থেকে থেকে শিউরে উঠছে।

কিন্তু সাড়া নিচ্ছে কেন জান?

বাঘের ভয়ে। ছোটনাগপুরের জঙ্গল বাঘে ভরা। যে-সে বাঘ নয়, একেবারে রয়াল বেঙ্গল টাইগারের রাজত্ব!

সে বাঘ একটা মস্ত বড় বুনো মোষকেও পিঠে ফেলে নদী লাফ দিয়ে পার হতে পারে।

সুতরাং কাঠুরেদের সাহস এবং শক্তির কথাটা একবার ভাবো। সেই রাত্রে, অন্ধকার জঙ্গলে তারা পঁচিশ ত্রিশজন একা-একা দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়ে নির্ভয়ে কাঠ কাটছে। তাদের কত আত্মীয় যে ঐভাবে বাঘের পেটে গেছে, তার ইয়ত্তা নেই। তেমনি ওদের যদি জিগ্যেস কর তাহলে জানতে পারবে, ওরা কতগুলি করে বাঘ মেরেছে,—বন্দুক দিয়ে নয়, ওদের কোমরে যে অতিরিক্ত একখানা কুড়ুল থাকে, তাই দিয়ে। সে শক্তি সাহস না থাকলে, কখনই ওরা বাঘের রাজত্বের মধ্যে বাস করতে সাহস করত না। ওদের কর্মঠ, শক্তিমান অথচ ছিপছিপে শরীরের নিখুঁৎ গড়নের দিকে চাইলেই বুঝতে পারবে, ওদের রয়াল বেঙ্গল টাইগারের প্রতিবেশী হবার যোগ্যতা আছে।

জমিদারের কাজে আমাকে বনে জঙ্গলে ঘুরতে হয় প্রায়ই। সে পথে ওরাই আমার সঙ্গী, আমার বাহক, আমার বন্ধু। ওদের সঙ্গে আমার খুব ভাব। আমাকেও ওরা খুবই ভালবাসে। সত্যিকারের বন্ধুত্ব যদি করতে চাও, ওদের চেয়ে বড় বন্ধু তুমি পাবে না, খল কপটতার চিহ্নমাত্র নেই। তোমার একটা কথায় ওরা এক মুহূর্তে প্রাণ নিতেও পারে, দিতেও পারে। ওদের ডাকাত বল ডাকাত, সাধু বল সাধু, কিন্তু ওরা ভালোবাসার প্রতিদান দিতে জানে। জীবনের কুড়িটা বছর ঘনিষ্ঠভাবে মিশে ওদের সম্বন্ধে এই ধারণা আমার বদ্ধমূল হয়েছে।

ছোটনাগপুরের জঙ্গলের পথে সন্ধ্যে হলে চটিতে আশ্রয় নেওয়াই ভালো, অন্নগতপ্রাণ চাকুরীজীবি আমি অন্ততঃ তাই করতাম। সন্ধ্যার মুখে চটি কিম্বা ডাক-বাংলো পেলে আমি সেইখানেই রাত্রি যাপন করতাম। চাল-ডাল-নুন-তেল আমার সঙ্গে থাকত, কিছু আলু-বেগুনও। হয়তো সকলের জন্যে ভাতে-ভাত চড়িয়ে দিতাম। নয়তো পাঁউরুটি আর জেলি।

আমার বন্ধুরা বড়শিতে আগুন দিয়ে তার চারিদিকে সকলে মিলে চক্রাকারে বসত। তাদেরই কাছে হয়তো একটা ডেকচেয়ারে, নয়তো একটা পায়া-ভাঙ্গা খাটিয়ায় শুয়ে থাকতাম আমি। তারপর গল্প।

ওদের বাড়ী ঘরের গল্প, শিকারের গল্প, ভূত-প্রেত দেবদেবীর গল্প, ওদের জীবনযাত্রার কত কি গল্প।

প্রথম প্রথম আমার সে সব অদ্ভুত লাগত, কতক বা বিশ্বাসও হ'তনা। কিন্তু যতই ওদের চিনতে লাগলাম, ততই বুঝলাম, আমাদের গল্প লিখিয়েদের মতো আগা-গোড়া বানিয়ে বলা ওদের আদিম মনের পক্ষে অসম্ভব। ওরা সত্যবাদী, তার কারণ মিথ্যে বানিয়ে বলবার জন্যে যে কল্পনাশক্তি দরকার তা ওদের নেই।

সেই কারণে ওদের কাছ থেকে যে সব গল্প শুনতাম, তার বেশীর ভাগই আগাগোড়া সত্যি। কোনো কোনোটার মধ্যে যদি কিছু মিথ্যে থাকেও, তাও একেবারে মিথ্যে নয়। মোটামুটি একটা সত্যি গল্পের উপর কিছু পরিমাণ কল্পনার (মিথ্যের নয়) রং চড়ানো। কিন্তু রং চড়ানোর অভ্যাস না থাকায় তা খুব সহজেই ধরা পড়ত।

এমন এক দিন হয়েছে, গল্প যখন পুরাদমে চলেছে, ঠিক তখনই বাঘের ডাক শোনা গেল অত্যন্ত কাছে। খোলা জানালা দিয়ে দেখা যেত, প্রকাণ্ড বড় একটা বাঘ নবাবী চালে হেলে-দুলে চন্দ্রালোকিত মাঠের উপর দিয়ে চলেছে। কিংবা হয়তো এক পাল হুড়ার সমরাভি-যানকারী সৈন্য দলের মতো দ্রুতবেগে চলেছে।

এজঙ্গলের অধিকাংশ বাঘই আমার বন্ধুদের পরিচিত। প্রত্যেক বাঘের তারা নামকরণ করেছে। চেহারা দেখে তো বলতে পারতই, ডাক শুনেই অনেক সময় বলে দিতে পারত, ওটা কালুয়া না ভালুয়া।

বিশেষ ভাবে পরিচিত ছিল একটা একচক্ষু খঞ্জ ব্যাঘ্র। এর ডাকের এমন বৈশিষ্ট্য ছিল যে, আমার মতো অনভিজ্ঞ লোকের পক্ষেও তাকে চেনা সম্ভব হয়েছিল।

এই বাঘটার জীবনের ইতিহাসে বগ্গির কুঠারের চিহ্ন ছিল।

রঙ্গি আমার বাহক বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সের। ফুল তার অত্যন্ত প্রিয়। সব সময় তার কানে একটা সুন্দর ফুল গোঁজা। শত কাজের মধ্যেও কোথাও একটা সুন্দর ফুল দেখলেই সেটা তার চাই-ই।

যখন ওর বয়স ষোলো কি সতেরো, সেই সময় ওই কানা বাঘটির হাতে ওর বাবার মৃত্যু হয়। ঘটনাটি আরও একটু বড় করেই বলি।

রঙ্গির বাবা কখনও পুশপুশ টানেনি।

সে ছিল দুর্ধর্ষ গোছের লোক। পুশপুশ টানার মতো নিরীহ কাজে তার মন বসেনি। গভীর রাত্রে জঙ্গলে গিয়ে সে কাটতো কাঠ। পিছন থেকে আচমকা এসে বাঘ না আক্রমণ করতে পারে সেজন্য আর সকলের মত সব সময় কাঠের আগুন জ্বালিয়ে রাখত। আর সকলের মত একখানা কুড়ুল দিয়ে সে কাঠ কাটতো আর জরুরী অবস্থার জন্য আর একখানা সব সময় পিছন দিকে কোমরে গুঁজে রাখত। সেই কুড়ুলে জঙ্গলের অনেক বাঘ সে মেরেছে। শক্তিশালী বলে তার খ্যাতি ছিল।

রঙ্গির বাবা এই কাজ করত রাত্রে জঙ্গলে গিয়ে কাঠ কাটত, আর দিনের বেলায় সহরে গিয়ে তাই বিক্রি করে আসত।

রঙ্গি তখন ছোট, বাড়ীতে যে ছাগল মোষ ছিল, তাই চরানো ছিল তার কাজ। আর বাঁশী বাজানো। সকালে উঠে কিছু খেয়ে নিয়ে মোষের পিঠে চড়ে বাঁশী বাজাতে বাজাতে সে যেত মাঠে, কানে গোঁজা থাকতো ফুল। কখনও কখনও ছোট ভাইটিকেও নিজের কোলের কাছে নিয়ে মোষের পিঠে চড়ে বার হত। তাকেও তো মোষ চরানো শিখতে হবে। রঙ্গির ষোলো সতেরো বছর বয়স হ'ল। কত কাল সে আর নাবালকের মতো মোষ চরাবে। এইবার তো তাকে বাপের সঙ্গে জঙ্গলে গিয়ে কাঠ কাটতে হ'বে। সহরে গিয়ে তা বিক্রি ক'রেও আসতে হবে।

তার তো আর মোষ নিয়ে চিরকাল ছেলেমানুষের মতো প'ড়ে থাকলে চলবে না।

অবশ্য শুধু যে সে মোষ চরাত তা নয়।

সে তীর ধনুক নিয়ে কখনও খরগোস কখনও বা কোনো পাখী শীকার করত। বাড়ীর রান্নার জন্য ছোটো ছোটো শুকনো ডালপালাও বয়ে নিয়ে আসত।

কিন্তু তখন তার বিয়ের কথা হচ্ছিল। সুতরাং ও সব নিরীহ নেশা ছেড়ে দিয়ে তাকে জঙ্গলে যেতে হবে।

মাঝে মাঝে যেতও। কিন্তু পুরোপুরি সাবালক হবার আগেই একটা দুর্ঘটনা ঘটল।

একদিন সকালে তার বাপের সঙ্গের লোকেরা এসে খবর দিলে, তার বাপকে বাঘে নিয়ে গেছে।

বাড়ীতে কান্নার রোল উঠল। প্রতিবেশী মেয়ে পুরুষ সব কাজ ফেলে এল তার মাকে সান্ত্বনা দিতে।

ওদের মধ্যে এরকম ঘটনা বিরল নয়, আশ্চর্যেরও নয়। কিন্তু রঙ্গির বাবা ছিল এ অঞ্চলের সবচেয়ে বলবান ব্যক্তি। অনেক বাঘ সে কুড়ুলের আঘাতে মেরেছে। তার মতো লোককে হঠাৎ এসে বাঘে নিয়ে গেল, সে কিছু করতে পারলে না, এইটেই আশ্চর্যের।

কিন্তু রঙ্গির বাবার একটা ত্রুটি হয়েছিল, যা তার এত দিনের কাঠুরে জীবনের মধ্যে আর কখনও ঘটেনি।

কাঠ কাটতে কাটতে সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। একটা গাছ কেটে সে আর একটা গাছ কাটতে লাগল। তারপর আর একটা। তার যেন কাঠ কাটার নেশা চেপে গিয়েছিল। কাঠ কেটে চলেছে তো চলেছেই। কাঠের স্তূপ করেছে। এমন কি অতগুলো কাঠ কি করে বয়ে নিয়ে যাবে তা পর্যন্ত ভাবেনি।

ইতিমধ্যে নূতন কাঠের অভাবে তার পিছনের আগুন কখন গেছে নিভে সে দিকে তার খেয়ালই নেই। শুধু যে নিভেই গেছে তা নয়, কাঠ কাটার নেশায় সে নিজেও যে তার থেকে অনেকখানি সরে এসেছে, তাও বুঝতে পারেনি।

সুযোগের অপেক্ষায় বাঘ অনেকক্ষণ থেকেই বোধ হয় ঘুরছিল। আগুন নিভে যেতে নতুন শিকারের লোভে তার নিশ্চয় জিভে জল এসে গিয়েছিল। তার উপর যখন রঙ্গির বাবা সেখান থেকেও খানিকটা দূরে সরে গেল, তখন সে লোভ সামলানো বাঘের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল।

পিছন থেকে আচম্বিতে এসে একটা থাবায় তার ঘাড় ভেঙ্গে দিয়ে সে কোনো শব্দ করবার আগেই বাঘ তাকে মুখে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। দুটো কুড়ুল কোনো কাজেই এলনা।

অবশ্য এই তাদের অনুমান, এ দৃশ্য কেউ চোখে দেখে নি। দেখলে এ দুর্ঘটনা ঘটবেই বা কেন?

ফিরে এসে রঙ্গি এই ঘটনা শুনলে। সে তখন মোষ চরাতে গিয়েছিল।

একটা কথাও সে বললে না। বাইরের দাওয়ায় তার শোকার্তা মা লুটিয়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। তার মেজ ভাই উঠানের এক পাশে কাঁদছে, তার সব ছোট বোনটী

ঝুঁছুই বুঝতে না পেরে একটী আঙুল মুখে পুরে বিহ্বলের মতো কাঁদছে।

তাদের থেকে দূরে দাওয়ার একপাশে রঙ্গি দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকিয়ে ঝিম হয়ে বসে রইল।

অনেকক্ষণ

তারপর যখন সে চোখ তুলে চাইলে তখন তার চোখ দুটো জবা ফুলের মতো রক্তবর্ণ। তার মধ্যে এক ফোঁটা জল নেই।

রঙ্গি একটা কথাও কইলে না। নিঃশব্দে উঠে ঘরের ভিতর থেকে তার তীর ধনুক বার করলে, আর একটা কুড়ুল। তার পরে কেউ কিছু বোঝার আগেই সে উন্মার মতো বেরিয়ে গেল।

বেরিয়ে গেল জঙ্গলে, যেখান থেকে তার বাবাকে বাঘে নিয়ে গেছে। সেখানে শুধু তার মাথায় বাঁধবার ছোট ন্যাকড়াটা পাওয়া গেল। সেখান থেকে উন্মাদের মতো সমস্ত বনময় রঙ্গি ছুটে বেড়াতে লাগল। তার বাপকে খুঁজে বের করবে, বের করবে সে বাঘটাকে। তারপরে রয়েছে সে আর তার তীর ধনুক ও কুড়ুল।

তারই জন্য সমস্ত বন সে পাঁতি পাঁতি করে খুঁজতে লাগল। সে জানে কি রকম জায়গায় দিনের বেলায় বাঘ লুকিয়ে থাকে। পাহাড়ের গুহায়, ঘন সন্নিবিষ্ট শালগাছের অন্ধকার ছায়ায়, নদীর বাঁকে বাঁকে, সর্বত্র সে খুঁজতে লাগল। নদীর ভিজা বালুতীরে সে বাঘের পদচিহ্ন খুঁজে বেড়াতে লাগল। না খুঁজে সে জলগ্রহণ করবে না, বাড়ীও ফিরবে না, এই তার পণ।

সকাল গড়িয়ে দুপুর হ'ল। দুপুর গড়িয়ে অপরাহ্ন। গাছের ছায়া বড় থেকে ছোট হ'ল, আবার ছোট থেকে বড়।

কিন্তু কোথাও সন্ধান পাওয়া গেল না।

না বাঘের, না তার বাবার।

সেই সকালে কি দুটি খেয়ে রঙ্গি বেরিয়ে ছিল, এর মধ্যে সে এক ফোঁটা জলও গ্রহণ করেনি। ক্ষুধা তৃষ্ণা সমস্ত কিছু যেন তাকে ত্যাগ করেছে।

পরশুরাম যেমন কুঠার হস্তে ক্ষত্রিয় নিধনে সমস্ত ভারত পরিভ্রমণে বার হয়েছিলেন, রঙ্গি তেমন ব্যাঘ্র নিধনের জন্য সমস্ত বন দাপাদাপি করে বেড়াতে লাগল।

কিন্তু কিছুতে বাঘের সন্ধান পাওয়া যায় না।

সন্ধ্যা হয়ে আসে। সূর্য অস্ত যাবার আর দেরী নাই। আমলকি গাছের আড়ালে দেখা যায় লাল সূর্য। তার ছায়া এসে পড়েছে নদীর জলে।

রঙ্গি নদীর ধার দিয়ে উন্মত্তের মতো চলে। কখন দুপুর এল, কখন বিকেল এল তার খেয়ালই নাই। সন্ধ্যা যে হয়ে আসে, এখনই সূর্য অস্ত যাবে, বনে নামবে অন্ধকার সে দিকেও তার ভ্রূক্ষেপ নেই।

সে চলেছে, চলেছেই।

হঠাৎ এক সময় সে থমকে দাঁড়াল। নদীটা যেখানে পূর্ব দিকে বেঁকেছে তারই আড়ালে কয়েকটা আমলকি গাছের নীচে খস্ খস্ খুট খুট শব্দ হচ্ছে না?

রঙ্গি সচকিত হয়ে উঠল।

উঁকি দিয়ে চেয়ে দেখে সত্যি। তার দিকে পিছন ফিরে একটা মস্ত বড় বাঘ একটা নরদেহের উপর থাবা দিয়ে বসে আছে।

বিদ্যুতের মতো তার সমস্ত শরীরে একটা শিহরণ খেলে গেল।

চক্ষের পলকে সে তার তীর ধনুক উঁচিয়ে ধরলে। ঠিক সেই মুহূর্তে বাঘটা এদিকে চাইতেই তীরটা একেবারে তার চোখে গিয়ে বিঁধল। হতচকিত বাঘ লাফিয়ে জলে পড়ল। এবং সেখান থেকে একটা আর্তনাদ করে ওদিকের জঙ্গলের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গিও সেইখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

* *
*

যখন জ্ঞান হল দেখলে তার গ্রামের লোকেরা তার চারিদিকে বসে জটলা করছে।

তারাও সমস্ত দিন ওর সন্ধানে ঘুরেছে। বাঘের গর্জনে আকৃষ্ট হয়ে তারা এইখানে এসেছে।

সেই থেকে ঐ বাঘটির এক চক্ষু অন্ধ। বোধ করি আচমকা নদীতে লাফ দিতে গিয়েই পা'টাও ভেঙ্গে যায়। এখনও সে সেই অবস্থাতেই আছে।

সে যাই হোক, তার মা আর তাকে কাঠ কাটতে যেতে দেয়নি। সে তাই তার পৈত্রিক কাঠুরের ব্যবসা ছেড়ে এখন পুশপুশ টানছে। কিন্তু বাঘের ডাক শুনলে এখনও তার চোখ জ্বলে উঠে

পূর্ববঙ্গের ভুঁইয়া

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এত সৈন্য পাইবেন, ঈশা আশা করেন নাই, তিনি পুলকিতচিত্তে আবাসে ফিরিলেন। তথায় আসিয়া দেখিলেন, শীলা তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ দিদি?"

শীলা। মা আপনার কাছে একটা জিনিস চেয়েছেন।

ঈশা। মা হুকুম করলে এনে দেবার চেষ্টা করব, চাইতে হবে কেন?

শীলা। ও-সব চোঁদা কথা রাখুন, এখন দেবেন কিনা বলুন।

ঈশা। সাধ্যাতীত না হ'লে দেবো।

শীলা। মায়ের একটি ভাই আছে, মস্ত যোদ্ধা। মা শুনেছেন আপনার একটি ভগ্নী আছে, নাম যশোধারা। সে নাকি প্রসিদ্ধ সুন্দরী। মা এই মেয়েটীকে চাইছেন তাঁর ভাইয়ের জন্য,— খুব সুখে থাকবে।

ঈশা। এতো মেয়ের মহাসৌভাগ্য, কিন্তু দিদি, আমি ত তার অভিভাবক নই। মাতাপিতৃহীনা বালিকার অভিভাবক হচ্ছে তার বড় ভাই বলরাম। *

শীলা। শুনেছি আপনি তাদের দেখাশোনা করেন।

ঈশা। দেখাশুনা আর কি দিদি, তারা তো খোকা খুকী নয়। আমি থাকি খিদিরপুরে আর তারা থাকে শিবপুরে তাদের ঠাকুর দেবতা নিয়ে। লোকের মুখে শুনেছি উলাইয়ের জমিদার উদয়নারায়ণের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেছে, অথবা দু'একদিনের মধ্যে বিয়ে হবে। তারা হিন্দু, আমাকে তো নিমন্ত্রণ করবে না, তাই ঠিক কিছু বলতে পারছিনে।

শীলা। মা শুনেছেন, আপনার প্রাসাদ হতে কিছু দূরে ভিন্ গাঁয়ে তাদের জমিজমা বাড়ী ঘর আপনি দিয়েছেন।

ঈশা। আমি তাদের এক রৈখিক কাঠাও দিইনি। তার বাপের হাজার বিঘা জমি, বাড়ী ঘর আছে। এই কথা বলা যায় যে, পৈত্রিক বিষয়ের অংশ দাবী করে আমি কিছুই তাদের কেড়ে নিই নি।

শীলা। মাকে গিয়ে তাই বল্‌ব। যদি মেয়ের বিয়ে না হয়ে থাকে, তাহলে তার দাদার কাছে প্রস্তাব করা যাবে, তিনি সম্মত না হলে কেড়ে আনা যাবে, এই মেয়ের উপর মামার যখন লোভ পড়েছে তখন তাকে আনতেই হবে।

শীলা প্রস্থান করিল। ঈশা চিন্তামগ্ন হইলেন। যশোধারা তাঁর বড় আদরের। তাঁরই উপর ধারার পিতা মৃত্যুকালে তাহার সকল ভার অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। তাহাকে গৃহের বাহিরে আসিতে দিতেন না, পর্দানশীল করিয়া রাখিয়াছিলেন—পাছে বাদশা বা গৌড় সুলতান তাঁহার রূপের কথা শুনিয়া তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া যান। তথাপি তাহার অসামান্য রূপের খ্যাতি রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। এই রূপময়ী গুণময়ী বালিকার উপযুক্ত পতি বাংলা দেশে একজন ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই, ইহাই ঈশার বিশ্বাস। তিনি সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ উদয়নারায়ণকে আমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছিলেন এবং উভয়ের মধ্যে পরিচয় ঘটাইয়া দিয়াছিলেন। প্রথম দর্শনেই যশোধারা উদয়কে মনে মনে

* রাজমালা, তৃতীয় লহর।

ভিষে বরণ করিয়াছিল। উদয়নারায়ণ তাঁহার বন্ধু বলরামকে বলিয়াছিলেন আমি ধারাকে স্ত্রীরূপে চাই— বাক্যদান কর। উভয় পক্ষে বাক্যদান হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধের হাঙ্গামায় এতদিন বিবাহ হয় নাই। এই বাগ্‌দত্তা কন্যাকে ঈশা খাঁ অপরের হস্তে দিতে পারেন না। ঈশা খাঁ ছিলেন ধর্ম্মে মুসলমান, কর্ম্মে হিন্দু। দুই পুরুষে খাঁটী মুসলমান হওয়া যায় না। তাঁহার পিতা কালাচাঁদ স্বার্থের খাতিরে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঈশার ও বলরামের পিতামহ একই ব্যক্তি। তাই আজও বিশ্বাসে ও শ্রদ্ধায় মাথা তাঁর আপন হতেই নীচু হয় মন্দির-দ্বারে, তবে সেটা তিনি কাহাকেও জানিতে বা বুঝিতে দিতেন না। একমাত্র যশোধারা তাঁহার আশা আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্বাসের কথা জানিত।

এখন তিনি মহারাণীর প্রস্তাবে মহা সমস্যায় পড়িলেন। যদি তিনি আগস্ত সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলেন, যশোধারা বাগ্‌দত্তা, অন্যত্র তাহার বিবাহ হইতে পারে না, তাহা হইলে তাঁহাকে বাহার হাজারের আশা ছাড়িতে হয়। একবার ভাবিলেন, আজই যদি আমি বলরামের নিকট দূত পাঠাইয়া তাহাকে আদেশ করি যে, অনতিবিলম্বে উদয়নারায়ণের হস্তে যশোধারাকে সম্প্রদান করিয়া তৎক্ষণাৎ উলাইতে পাঠাইয়া দিতে, তাহা হইলে এ বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়া যাইতে পাবে। কিন্তু সেটা মিথ্যাচরণ, কপটতা হইবে না কি? যাঁহাকে আমি মা বলিয়াছি, যাঁহার স্তনধৌত জল পান করিয়া আমি জননী বলিয়া স্বীকার করিয়াছি, তাঁহাকে আমি কিরূপে প্রতারণা করিব? তাহা আমি পারিব না। জননীকে প্রতারণা আমার দ্বারা হইবে না। তবে কি হইবে? কি হইবে খোদা জানেন, আমি ভাবিয়া কি করিব? কালী-মায়ের ভক্ত যশোধারাকে দুঃখ দেওয়া যদি মায়ের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে শত ঈশা খাঁ মেয়েটার দুঃখ রোধ করিতে পারিবে না। আমি ত ক্ষুদ্র পতঙ্গ।

[ক্রমশঃ

ইংরাজি সাহিত্যের ধারা

ডাঃ শ্রীকুমার ব্যানার্জী এম্-এ, পি-আর-এস্, পি-এচ্-ডি

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

আর একজন মনীষির আলোচনা না করিলে এলিজাবেথীয় সাহিত্যের বিবরণ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। ইনি সেই যুগের বিখ্যাত গদ্য লেখক বেকন্। নাটক ও কাব্য ছাড়াও গদ্য রচনার ক্ষেত্রেও অসাধারণ কৃতিত্ব এই যুগের সমৃদ্ধি ও বহুমুখীনতার সাক্ষ্য দেয়। বেকন্ রাজ-কার্য্য ও রাজনীতি চর্চ্চার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার এই বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে তিনি যে বহুদর্শিতা ও ব্যবহারনীতি-কুশলতা আহরণ করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার রচিত সন্দর্ভাবলীতে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। যে যুগে কবিরা সাধারণতঃ আদর্শবাদ ও স্বপ্নবিলাসের পক্ষপাতী ছিলেন ও নাট্যকারেরা জীবনের উচ্চতম বিকাশ-গুলি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, সেই যুগে বেকন্ ব্যবহারিক জীবনের দুর্বলতা ও রাজ নীতির বক্র কুটিল উপায়-প্রয়োগের কথাই লিখিয়াছেন। মানুষের লোভ মোহ দুর্বলতার সুযোগ লইয়া কিরূপে তাহাদিগকে বশীভূত করা যায়, ব্যবসায়ক্ষেত্রে কিরূপ কৌশলে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন সম্ভব, রাজ্য পরিচালনায় কূটনীতি প্রয়োগের দ্বারা প্রজার অসন্তোষ ও বিরুদ্ধতাকে কি ভাবে পরিহার করা যায়; আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিবেশী শক্তির মনে নিজ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিরূপে ভ্রান্ত ধারণা জন্মান যায়, এই সমস্ত মূল্যবান্ উপদেশে তাঁহার সন্দর্ভগুলি পূর্ণ। তাঁহার ভাষা ও বাক্য-বিন্যাসরীতিও বাহুল্যবর্জ্জিত, সংক্ষিপ্ত, সূচ্যগ্রের ন্যায় তীক্ষ্ণ ও প্রবাদবাক্যের ন্যায় স্মরণীয়। রাজনীতি চর্চা

যাঁহাদের জীবন-ব্রত তাঁহাদের পক্ষে বেকনের এই সন্দর্ভাবলী অমূল্য সম্পদ

বেকনের নৈতিক আদর্শ খুব উচ্চ ছিল না বলিয়া তিনি অনেকের নিকট নিন্দাভাজন হইয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক এই নিন্দা তাঁহার প্রাপ্য নহে। মানুষের আদর্শ কি হওয়া উচিত তাহা তাঁহাব বক্তব্য বিষয় নয়। কি ভাবে চলিলে আমাদের এই বাস্তব জীবনে আধিপত্য ও প্রভাব লাভ করা যায় সেই উপায়গুলি তিনি নির্দেশ করিয়াছেন। এই যশ যাঁহাদের কাম্য, তাঁহাদের বেকন্ নির্দিষ্ট পথে চলিতেই হইবে। পার্থিব প্রতিষ্ঠার উচ্চতম চূড়ায় আরোহণ কবিতে চাই, অথচ যে আঁকা-বাঁকা বন্ধুর পথ এই চূড়াতে পৌছাইয়া দিতে পাবে তাহার প্রতি অবজ্ঞা সূচক নাসিকা কুঞ্চন করিব—এই মনোবৃত্তি আদর্শবাদের প্রতি নিষ্ঠা ত নয়ই বরং ভণ্ডামি। গীতা ও উপনিষদেব আদর্শে যেমন কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের বিচাব চলিতে পারে না, তেমনি খৃষ্টধর্মের পর্বতে বাণী প্রচারের (Sermon on the Mount) মানদণ্ডে বেকনের মূল্য নির্দ্ধাবণ চেষ্টাও অবিধেয়। যেমন চাণক্যনীতি তেমনই বেকনেবও সন্দর্ভ, বাস্তব প্রয়োজন ও অবস্থা হইতেই উদ্ভূত।

বেকনেব চরিত্রে একটা আদর্শবাদের দিকও ছিল। কোন কোন সন্দর্ভে তিনি সত্য ভগবানেব আরাধনা প্রভৃতি উচ্চ আধ্যাত্মিক বিষয়েরও আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনাতেও গভীব আন্তবিকতা ও শ্রদ্ধাবনত বিশ্বাসেব স্থর ধ্বনিত হইয়াছে। সংসারে উন্নতিব কথা লিখিতে গিয়াও তিনি ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতাব উৎকর্ষ স্বীকার কবিয়াছেন। তাঁহার তীক্ষ্ন, আকাশ-স্পর্শী মনন-শক্তি এই সমস্ত রহস্যের নিকট সম্ভ্রমে মাথা নীচু করিয়াছে। বাস্তবিক বেকনের চরিত্রের এই দুইটা দিকেব মধ্যে সামঞ্জস্য করা কঠিন। তাঁহার এই দ্বৈত প্রকৃতি সমালোচকের নিকট একটা প্রহেলিকার মতই রহিয়া গিয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে এই সংশয় এক অদ্ভুত মতবাদে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কেহ কেহ এমন ইঙ্গিতও করিয়াছেন যে বেকন্ই শেক্স্পিয়ারের নাটকাবলীব প্রকৃত রচয়িতা।

আর এক দিক দিয়াও বেকনের উপর যুগ-প্রভাব লক্ষিত হয়। তিনি কেবল সাহিত্যিক নহেন, বিজ্ঞান ও দর্শনের ক্ষেত্রেও তিনি যুগান্তরকারী পবিকল্পনা প্রবর্তন করিয়াছেন। যাহাকে এখন বলা হয় Experimental Method, পবীক্ষামূলক পদ্ধতি, তাহার ভবিষ্যৎ রূপ বেকন্ সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ করেন। অবশ্য তিনি নিজে বিজ্ঞান ও দর্শনে কোনও মৌলিক আবিষ্কার করেন নাই—কিন্তু নূতন পথ নির্দেশ করিয়াছেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকেরা বেকনেব কৃতিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান ও তাঁহার ঋণ স্বীকার করেন না। কিন্তু সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমন্বয়ে যে বিবাট কল্পনা তাঁহাব মনে জাগিয়াছিল তাহার অসমসাহসিকতা আমাদিগকে বিস্মিত করে। তিনি সমস্ত জ্ঞান আত্মসাৎ করিবার মহান্ ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। আধুনিক যুগে জ্ঞানচর্চা যেন একটা শুষ্ক নীবস আলোচনা , জ্ঞানী জীবন হইতে দূবে থাকিয়া নিজ পাঠাগাবে আবদ্ধ থাকেন। কিন্তু বেকনেব যুগে জ্ঞান আহরণ ছিল একটা অজ্ঞাত দেশাবিষ্কারের মত উন্মাদনাপূর্ণ। কলম্বস যেমন মহাসমুদ্রে পাড়ি দিয়া নূতন মহাদেশেব তীরে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, বেকন্ও সেইরূপ জ্ঞান-বিজ্ঞানের নূতন নূতন বাজ্য জয় করিবাব কল্পনায় বিভোর ছিলেন। জ্ঞানার্জনে এই উন্মাদনাপূর্ণ অনুভূতিই বেকনেব উপব তাঁহাব যুগের সর্বাপেক্ষা লক্ষ্যণীয় প্রভাব। এলিজাবেথীয় যুগের শেষ রশ্মিরেখা তাঁহার বুদ্ধি-প্রদীপ্ত মুখের উপর পড়িয়াছে।

[ক্রমশঃ

৩১শে মার্চ মঙ্গলবার বেলা ১২টা

শ্রীতাপসরঞ্জন সরকার

পঞ্চদশন্

(পূর্ব্বকথা)

রাত্রে আট রকম পদ দিয়ে খাওয়াব পর বিজয় সরিৎ বাবুকে বলেছিলো, "দেখুন সরিৎবাবু, আপনার কথাগুলো আজ আর আমার শোনা হবে না। আমাকে এক্ষুণি বের হতে হবে। আমার সন্দেহ হচ্ছে যে আজ রাত্রেই নবীন আমার বাড়ীতে হানা দেবে। প্রতিশোধ সে নেবেই এবং দেরী না করাটাই তার পক্ষে সম্ভব। সুতরাং আমি এখন বেরিয়ে অন্য কোথাও যাই। এই অবসরে আপনারা আমার বিছানাটায় একটা পাশ বালিশ র‍্যাপার দিয়ে ঢেকে রেখে মধ্যেব ঘরে গিয়ে শোবেন। আর পূব দিকের দরজাটা একটু খোলা রাখবেন। আমি যাই।"

বাড়ী থেকে বেরিয়েই বিজয় কয়েকটি পাহাবাওয়ালার সন্ধানে নিকটস্থ ফাঁড়িতে চলে গেল। আধ ঘণ্টা পর সাত আট জন পাহারাওয়ালা নিয়ে এসে নিজ বাড়ীর চতুর্দিক ঘিরে দিলে। তারপর প্রত্যেককে বল্লে, "দেখ, তোমরা সব গা-ঢাকা দিয়ে থাক্বে। যে লোকই ভিতরে আসুক না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি সাড়া না দিই ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কেউ বেরুবে না, বুঝ্লে?" সর্দার উত্তর দিল, "জী হুজুর।"

বিজয় তখন নীচের তলার একটি ক্ষুদ্র ঘরে ঢুকে আলো জ্বেলো দিলে। তারপর বাইরের দরজা বন্ধ করে দিলে। পনের মিনিট পর সেই দরজাটা আবার খুলে গেল এবং সেখান থেকে বেরিয়ে এলো একটি শীর্ণ, রোগা চেহারা মলিন ভিক্ষু। আবার দরজা বন্ধ হোল।

অন্ধকারের মধ্যে ভিক্ষুকটি ত্রস্তপদে ছুট্তে ছুটতে সেই লণ্ঠীর ধারে এসে পড়লো। তারপব সেখান থেকে সে একটি বাড়ীর ধারে এসে বস্লো। বাড়ীর ভিতবে একটি ঘরে তখন কয়েকটি লোক কথাবার্তা বল্ছিলো। এদেব মধ্যে দু'জন একটি নবীন ও অপরটি আফতাব্।

এক মিনিট দু' মিনিট করে দশ মিনিট কেটে গেল। হঠাৎ বিজয় একটি কথা শুনতে পেল। নবীন বল্ছিলো, "দেখ আফতাব, আর দেরী কোর না। এই বেলা কাউকে সঙ্গে নিয়ে সোজা বিজয়ের বাড়ী চলে যাও। রাত্রের মধ্যে তাকে শেষ করা চাই।" আফতাব্ অন্য লোকদেব বল্লো, "তোমরা কি কেউ আমার সঙ্গে যেতে রাজী নও?" সকলেই প্রায় এক সঙ্গেই বলে উঠলো, "সাধ করে খাঁচায় ঢুকে পায়ে শিকল লাগাতে চাই না।" তখন আফতাব ক্ষুণ্ণ মনে একাই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো। গেটের সাম্‌নেই ভিক্ষুকটির সাথে তার দেখা হল। আফতাব্ ভিক্ষুককে দেখতে পেয়ে কর্কশ স্বরে প্রশ্ন করলো, "কে-রে, এখানে দাঁড়িয়ে কে?" ভিক্ষুকটি দতদূর সম্ভব মুখভঙ্গী করে এবং গলার আওয়াজ বদলিয়ে উত্তর দিল, "হুজুব, তিন দিন হোল না খেয়ে আছি। একেবারে উপোস বললেই চলে।" আফতাব বললে, "হ্যাঁ, ন্যাকামী রেখে সোজা উত্তর দাও তো তোমার উদ্দেশ্যটা কি? এত রাত্রে কিজন্যই বা বেরিয়েছ? মিছে কথা বললেই কিন্তু এর এক গুতোয় মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।" এই বলে আফতাব পকেট থেকে পিস্তল বের করে তার সামনে ধর্লে। ভিক্ষুক, বললে, আল্লার নামে শপথ করে বল্ছি আমি চুরি কর্তে আসিনি।" "কেন দিনের বেলায় তোমার ভিক্ষে করবার সময় ছিল না? এখন রাত্রি প্রায় দেড়টা। কেই বা তোমায় এখন ভিক্ষে

দেবে? কেউ কি এখনো জেগে আছে? নিশ্চয় তোমার কোনও মতলব আছে। তোমার নাম কি? চটপট উত্তর দাও।" ভিক্ষুক বল্‌লে, "হুজুর, আমার নাম ইয়াকুব আলী। "হুজুর মাপ করবেন, আমার উদ্দেশ্য কোন খারাপ নয়। তবে... ।" "ঠিক এই তবেটাই শুনতে চাই। তাড়াতাড়ি বল।" "কিন্তু হুজুর ওটাতো তাড়াতাড়ি বলা যায় না। একটু সময় লাগবে।" "তা লাগুক্। বলে যাও।" ভিক্ষুক ওরফে বিজয় যখন দেখতে পেলে যে তার ফন্দী অনেকটা খেটে আসছে, তখন বল্‌লে, "হুজুব, সারাদিন খাবারেব চেষ্টায় ফিরেছি কিন্তু কোথাও চারটে ভাত মিল্‌লো না। সবাই বল্‌লে, 'ব্যাটা জোয়ান মর্দ কাজ কোরে খেতে পার না?' হুজুর বল্‌বো কি, ভিক্ষে করা আমার ব্যবসা নয়। তবুও আমাকে তাই করতে হচ্ছে, কেন জানেন হুজুর? ও পাড়াব গেয়েন্দা বাবুকে চেনেন না?" আফতাব বিস্ময় প্রকাশ করে বল্‌লো, "হ্যাঁ, চিনি বৈ কি? বিজয় তো? সে তোমার কি কবেছে?" "হ্যাঁ, হুজুর উনিই আমাব দফা শেষ করে দিয়েছেন।" "কেন সে কি করেছে? তুমি তার কি করেছিলে?" "হুজুর, ওনার বাড়ীর পূব দিকে ছোট্ট একটা ঘরে আমি থাক্‌তুম। উনিই আমাকে চাবটে খেতে দিতেন। আব আমি ওনার কথামত কাজ কর্‌তুম।" "তোমাকে কি করতে হত?"

"বিশেষ কিছু নয় হুজুর। তিনি হয়তো বল্‌তেন, 'ইয়াকুব তোকে আজ আর খেতে দেবো না।' আমি বলতুম, 'তাহলে হুজুর খাবো কি করে?' উনি বল্‌তেন, 'কেন, ভিক্ষে করে?' আমি বলতুম, 'কোন্ বাড়ীতে?' উনি বাড়ী দেখিয়ে অথবা বাড়ীর নম্বর দিয়ে বল্‌তেন, 'অমুক বাড়ীতে। আমি বলতুম, 'আর কি করব?' উনি বল্‌তেন, 'আর বাড়ীর ভিতরটা ও লোকগুলোকে দেখে আস্‌বি। দু'চারটে কথাবার্তাও শুনে এসে আমাকে বল্‌বি।' আমি তাই করতুম আর ভিক্ষের চাল দিয়ে সেদিনটা কাটিয়ে দিতুম। উনি আমাকে কোন দিনও একটি পয়সা হাতে দিতেন না বা কোন দিনও দু'বেলার বেশী খেতে দিতেন না। আচ্ছা আপনিই বলুন এভাবে কি দিন কাটানো যায়? তাই একদিন ওনার পকেট থেকে কুড়িটা টাকা চুরি করলুম। কিন্তু টাকাটা চুরি করে কাটা পকেটের টুকরোটুকু আমার দরজার সাম্‌নে অসাবধান হয়ে ফেলে দিই। তাই তিনি আমাকে ধরে ফেল্‌লেন, বল্‌লেন, 'তুমি আমার পকেট কেটে টাকা নিয়েছো?' আমি বললুম, 'না।' ব্যস্ আর কথা নেই এই বলার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পিস্তল বের করে আমার কব্জিতে এক গুলি করলেন। এই দেখুন, সে ঘা এখনো শুকোয় নি।" বলেই বিজয় কৃত্রিম রক্ত মাখানো ন্যাকড়া দিয়ে বাঁধা কব্জিখানা আফতাবকে দেখালে। তারপর বল্‌তে লাগলো, "আমি ব্যথার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে টাকা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েই বেরিয়ে এলাম। এখন পর্যন্ত আর ওমুখো হইনি। নেমকহাবামের আমি কত কাজ করে দিয়েছি আর তার ফলে কিনা এই দশা করে দিলে! এক হপ্তাব মধ্যে যদি আমি এব শোধ না তুলি তো আমি মোছলমানের বাচ্চা নই।" বিজয় থাম্‌লো।

আফতাব প্রথমতঃ একে বিজয়েব গুপ্তচর বলে মনে করেছিল কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ভিক্ষুকটির কথা ও মুখের ভাব দেখে তার আর সন্দেহ রইলো না যে এ বিজয়ের চর নয়। উপরন্তু এব কথাগুলোকে সত্য বলেই মনে করলে। বল্‌লে, "তবে এতো রাত্রে এখানে এসেছ কেন?" "হুজুর, সারাদিন খেতে পাইনি ক্ষিদের জ্বালায় বাত্রেও ঘুম এলো না। ভাবলুম বেবিয়েপড়া যাক, যদি বা চারটে মিলে যায়। কিন্তু সমস্ত রাত্রি ঘুরলুম কোথাও ভাত মিল্‌লো না। এত ঘোরার পর আর দাঁড়াতে পারছিলুম না, তাই এখানে একটু বসেছিলুম।"

আফতাব বললে, "শোন ইয়াকুব, এক কাজ করতে পারবে?" "হুজুর আগে না খেয়ে কিছুই করতে পার্‌বো না।" রাত্রি তখন দু'টো। শহরের একমাত্র শ্রেষ্ঠ হোটেল, 'দি রিফিউজ' ব্যতীত সব হোটেল বন্ধ হয়ে গেছে। 'দি রিফিউজ'ও তখন বন্ধ হওয়ার পথে। আফ্‌তাব প্রবেশ কোরে খাবারের হুকুম দিলে। এই হোটেলেই খাওয়ার আশায় বিজয় রাত্রে পেট বেশ খালি রেখে আহার সমাপন করেছিলো। এখন সে আফতাবের পয়সায় পেটপুরে খেয়ে আত্মাকে সন্তুষ্ট করলে।

হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে আফ্‌তাব বিজয়কে বল্‌লে, "এখন আমি যা বলবো তোমাকে তাই করতে হবে।"

"হুজুর তাই করব।"

"বিজয় কোন্ ঘরে শোয় জান?" "জানি হুজুর।" "দোতালার সাম্‌নের বাঁ দিকের ঘরটাতেই।" "বেশ, ঐ ঘরে এখন ঢুকতে পারবে?" "তা কি করে পারবো হুজুর? এখন তো সব দরজা বন্ধ।" "জল গল্‌বার নল বেয়ে জানালায় উঠে একটা দড়ির মই উপরে বেঁধে ঝুলিয়ে দিতে পার্‌বে?" "তা পারবো, হুজুর।" ইত্যাদি বহুবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে ও বহুরকম আশানুরূপ উত্তর পেয়ে আফতাব তার কাজে সাহায্যকারী রূপে বিজয়কে সঙ্গে করে উভয়েই কালো পোষাকে শরীরাবৃত করে বিজয়ের বাড়ীর দিকে রওনা হল। এর পর কি ঘটেছিল তা পাঠক পাঠিকা পূর্ব পরিচ্ছেদেই সবিস্তারে অবগত হয়েছেন।

[ক্রমশঃ

কৃষ্টি-সাধন

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

শব্দকল্পদ্রুমের পাতা
বিশ্ব এবং অমরকোষ
হাত্‌ড়ে তবে খুল্‌লো মাথা
বাজিয়ে ভাঙ্গা তক্তপোষ,

অনেক কষ্টে কাব্য লিখি
তোমরা ভাবো সহজ কাজ?
আমার জুড়ি দেখাও দিকি
ছন্দে ভরা মগজ আজ?

সেদ্ধ কোরে শকুন্তলা
শুখিয়ে রোদে উর্বশী
রঙিন্ করি কাব্যকলা
আঁৎকে ওঠে দূর শশী।

লাঙ্গল দিয়ে কৃষ্টি ভূমি
নিত্য করি উর্বরা,
বুঝবে নাকো পাঠক তুমি
ছন্দ আমার সুরভরা।

ধমক্ দিয়ে গমক্ লাগাই
সরস্বতীর চিত্তেতে
পঞ্চাননের শঙ্কা জাগাই
মত্ত মাতাল নৃত্যেতে।

বাজ্ বিজলী চমকে ওঠে
গগন ফাটা ঝঙ্কারে
বন্য-মুকুল চমকে ফোটে
কাব্য ধনুষ্টঙ্কারে।

বন্ধুরা কেউ বলতে পার?
বাংলাতে মোর নামটি কি?
ধারধাবিনা মর্ত্যে কা'রো
প্রাচীন—তবু নাই টিকি।

প্রাকৃত ভাষায় কাব্য লিখি
অত্যাধুনিক বয়েসটা
আমার তুল্য দেখাও দিকি
কৃষ্টি-সাধন প্রচেষ্টা।

ইরাণ ও তার শাহ

শ্রীসুধীনকুমার মিত্র বি-এ

ইরাণ আজকে পৃথিবীর সভ্যজাতির মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু মাত্র কয়েক বছর আগেও আমরা ইরাণের নাম এমন ভাবে শুনিনি। এশিয়ার অধিকাংশ দেশগুলোর মত ইরাণেরও পূর্ব গৌরব লুপ্ত হ'তে বসেছিল। পাশ্চাত্যের চিরবুভুক্ষু জাতগুলোর সর্বগ্রাসী ক্ষুধার খোরাক জোগাতেই তার দিন কেটে যেত, নিজের উন্নতির দিকে তাকাবার মত অবসরই তার ছিল না। বৃটেন ও রুষের কূটনীতি ও আধিপত্যের ফলে ইরাণ ক্রমেই দুর্বল ও হৃতবীর্য হয়ে পড়েছিল এবং সেখানে গৃহযুদ্ধ দেখা দিয়েছিল। তখন তার নামও ছিল পারস্য। আজ তার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নামটাও বদলে গিয়ে ইরাণ হয়েছে। ইরাণ বোধ হয় তার সেই ভয়াবহ দিনগুলোর স্মৃতিটাকেও সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলতে চায়, তাই পুরাণো স্মৃতি জড়ানো পারস্য নামটাকেও সে বদলে ফেলেছে।

খুব প্রাচীন দেশ এই ইরাণ। তার ভৌগোলিক সীমান্ত বড় কম নয়,—একদিকে তার কাস্পিয়ান হ্রদ, অপর দিকে পারস্য উপসাগর। এই বিরাট ভূখণ্ডটি বৃটীশ ভারত আর সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে ব্যবধানের সৃষ্টি করছে। তাই ইরাণের উপর এই দুটি জাতেরই এত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। রুশিয়া যে কোনও মুহূর্তে ইরাণের মধ্য দিয়ে বৃটিশ ভারতে প্রবেশ করতে পারে। এই রুষভীতিই বৃটেনকে ইরাণের দ্বারে টেনে নিয়ে গিয়েছে। কত যুগ ধরে এই দুটো জাত ইরাণকে হাত করবার চেষ্টা করছে তার ঠিক নেই। ইরাণের উত্তর অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে এসেছে রুশিয়া, আর দক্ষিণ অঞ্চলে আধিপত্য করে এসেছে বৃটেন্।

ইরাণের রাজধানীর নাম তেহ্‌রাণ। এত সুন্দর সহর পৃথিবীতে খুব কম আছে। প্রকৃতি তার সমস্ত সৌন্দর্য যেন এর উপর উজাড় করে ঢেলে দিয়েছে। তুষারাবৃত ডেমাভেণ্ড্ পাহাড়ের গায়ে অবস্থিত এই তেহ্‌রাণ। কিছুদিন আগে পর্যন্ত তেহ্‌রাণে মনুষ্যবাসের সুযোগ—সুবিধা ছিল না। সেই বিখ্যাত পারসিক রাজা জারেক্সসের আমলে ইরাণে যে সমস্ত ঘরবাড়ী পথ-ঘাট ছিল সেই সব রয়ে গিছিল বর্তমান ইরাণেও,—কোনই পরিবর্তন হয় নি। মাটীর ঘর, মেঠো পথ, আগাছা আর জঙ্গল—এই ছিল ইরাণের ভিতরকার রূপ। অধিবাসীরা অধিকাংশই ছিল সংরক্ষণশীল মুসলমান,—অন্ধবিশ্বাস প্রতি পদে তাদের জীবনের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করত।

আজ সেই ইরাণকে চেনাই যায় না। অদ্ভুত পরিবর্তন সেখানে দেখা দিয়েছে। নবজাগ্রত তুর্কীর মত ইরাণের প্রতি বিভাগে নব জাগরণের সাড়া পড়ে গিয়েছে। এসব উন্নতি সম্ভবপর হয়েছে একটি প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের আপ্রাণ চেষ্টার জন্য। তিনি হচ্ছেন ইরাণের শাহ বা রাজা রিজা শাহ পহলবী। মুস্তাফা কামালকে বাদ দিয়ে যেমন তুর্কীর কথা বলা যায় না, তেমনি রিজাশাহের কথা বাদ দিয়ে ইরাণকেও কল্পনা করা যায় না। ইরাণের প্রতিটি অনুষ্ঠান এই মহাপুরুষের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে। তিনিই নব জাগ্রত ইরাণের স্রষ্টা, ইরাণীদের জাতীয়তাবোধের জন্মদাতা।

রিজাশাহের জীবনের কথা ভাবলে বিস্ময়ে অভিভূত হ'তে হয়। কি অদ্ভুত রোমাঞ্চকর তাঁর জীবন। রাখাল ছেলেও যে রাজতক্তে বসে দেশ শাসন করতে পারে

তার জলন্ত প্রমাণ এই রিজাশাহ। কিছুদিন আগে পর্যন্ত তাঁকে কেউ চিন্‌তো না, অথচ আজ য়ুরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী জাতগুলো পর্যন্ত তাঁকে শ্রদ্ধা করে চলে আর ইরাণেদের লোকের ত কথাই নেই। তারা তাঁকে শাহেরশাহ বা রাজার রাজা বলে পূজা করে।

গরীবের এক কুঁড়ে ঘরে রিজা শাহের জন্ম হয়। ছেলেবেলায় তিনি রাখাল ছেলেদের সঙ্গে পাহাড়তলীতে ভেড়া চরিয়ে জীবন কাটাতেন। ইবাণে তখন মহা দুর্দিন না ছিল শান্তি, না ছিল শৃঙ্খলা। ইরাণের তখনকাব শাহ থাকিতেন বিলাস-ব্যসনে মত্ত, তাছাড়া য়ুরোপীয় জাতগুলো তাঁকে হাতের পুতুল করে রেখে দিয়েছিল। দেশময় তখন অরাজকতা। পশ্চাৎপদ ইরাণীদের দুঃখেব কথা কারও মনে ঠাঁই পেতো না। তখন দেশরক্ষা করা হ'ত ভাড়াটিয়া সৈন্যের সাহায্যে। অশিক্ষিত দেশ-বাসীবা আমোদ-প্রমোদ আব স্বার্থচিন্তা নিয়ে ব্যস্ত থাকতো। এই ভীষণ সময় রিজাশাহ ইবাণেব পাহাড়-তলীতে ভেড়া চবিয়ে বেড়াতেন।

রিজাশাহ যখন কৈশোরেব সীমানায় এসে পৌছিলেন, তিনি একটা ভাড়াটিয়া সৈন্যদলে যোগ দিলেন। এই সেনাদলটিকে পরিচালনা কবতেন রুশ-সেনানায়কের দল। রিজাশাহের অদ্ভুত সাহস আর নৈপুণ্যের ফলে, তাঁব নাম পারিচালকদের কানে এসে পৌছালো। শীঘ্রই তাঁকে সৈন্যদলে উঁচু পদ দেওয়া হ'ল। এব পরে এল মহাযুদ্ধের ভয়াবহ দিন। ইরাণ যুদ্ধের সময় নিরপেক্ষ রয়ে গেল, কারও দিকেই যোগ দিল না। মহাযুদ্ধ যদি বা থামলো, বলশেভিক বিপ্লবের আলোড়নে সাবা পৃথিবী আবাব কেঁপে উঠলো। ইরাণের উপর রুশ আর বৃটেনেব শক্তি ক্রমেই দুর্বল হ'য়ে আসতে লাগলো, এদিকে দেশে অরাজকতা দিনের পর দিন বেড়েই চললো। মূর্খ রাজা সুলতান আহম্মদ শাহ নিজের বিলাস নিয়েই ব্যস্ত, অথচ গরীবের কুটিরে কুটিরে অন্নহীনেব হাহাকার দিনের পর দিন অসহনীয় হ'য়ে উঠ্‌তে লাগলো। মানুষে আর কত সহ্য করবে? শেষে দলে দলে লোক রাজার বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠ্‌লো।

১৯২১ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী তারিখটা ইরাণের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। সেদিন ইরানের শক্তিশালী যুবকের দল রিজাশাহকে তাদের নেতারূপে বরণ করে নিয়েছিল; সেইদিনই রাত্রে তারা দল বেঁধে তেহরানেব পথে এগিয়ে গিয়ে, রাজার বিলাস আর অত্যাচার বন্ধ করেছিল। একবিন্দু রক্তপাত হয়নি, অথচ শাসন প্রণালীতে যুগান্তর দেখা দিয়েছিল, নূতন মন্ত্রীদল গঠন করা হয়েছিল। সেদিন থেকে ইরানের সমস্ত শাসনভার একরকম রিজাশাহেব হাতেই চলে এসেছিল। রিজাশাহ অতি ধূর্ত লোক। তাঁব চেষ্টাব ফলেই ইরাণেব উপর বৃটেনের আধিপত্য অনেক পবিমাণে খর্ব হ'য়ে গেল। আগে ইরাণের নোট ছাপবার অধিকাব, তার টেলিগ্রাফ লাইন, তার ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় সম্পূর্ণরূপে বৃটেনের করতলগত ছিল। এবারে বৃটেনের সঙ্গে তার এক নতুন চুক্তি হ'ল, তাতে ইরাণের উপর বৃটেনের বাণিজ্য করবার অধিকারটুকুই রইলো।

এদিকে রিজাশাহের শক্তি ক্রমেই বেড়ে চললো। ইরাণের "মজলিস্" বা পার্লিয়ামেণ্টের উপব তাঁব দখল সম্পূর্ণরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ল। পবে ১৯২৬ সালে ২৫শে এপ্রিল, রিজাশাহ সর্বসম্মতিক্রমে ইরাণের একচ্ছত্র রাজা নির্বাচিত হলেন। নেপোলিয়নের মত তিনি রাজার মুকুট নিজেই ধারণ করলেন। কুঁড়ে ঘরের গরীব মেষপালক এইভাবে রাজার আসন লাভ করলেন। কিন্তু আসলে আজ তিনি ইরাণের ডিক্টেটর বা একনায়ক।

এরপরে তিনি ইরাণকে উন্নত করবার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেলেন। তাঁর জীবনের মন্ত্র হ'য়ে দাঁড়ালো ইরাণকে শক্তিশালী করে তোলা, সকলদিক দিয়ে ইরাণীদের শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত কবা। আজ ইরাণের যেটুকু উন্নতি সম্ভব হয়েছে, তা সমস্তই রিজাশাহের কীর্ত্তি। প্রথমেই তিনি মোল্লাদেব ধর্মের গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগলেন। যে দেশে ধর্মের একাধিপত্য, সে দেশ কোনও কালে উন্নত হ'তে পারে না,—একথা রিজাশাহ মানতেন। ইরাণের অন্ধবিশ্বাসী মোল্লার দল রিজাশাহের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠ্‌লো। কিন্তু তিনি তাদের নির্মমভাবে দমন করলেন। আজ ইরাণ থেকে ধর্মের গোঁড়ামী প্রায় উঠে গিয়েছে।

ঘৃণ্য পর্দাপ্রথাও আজ সেখানে লুপ্ত হয়েছে। স্ত্রী-স্বাধীনতা সকলেই মেনে নিয়েছে। নারীদের মধ্যে

অনেকেই লেখাপড়া শিখেছেন, তাই দেশে শিক্ষিতা নারীর অভাব নেই। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য দেশের সর্বত্র রাস্তাঘাট নির্মাণ করা হয়েছে। চলাফেরার কোনই অসুবিধা নেই। আগে ইরাণের ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে বিদেশীরা লাভবান হ'ত অথচ ইরাণ বঞ্চিত হ'য়ে পড়ে থাক্‌তো। এখন রিজাশাহের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আর কঠোর চেষ্টার ফলে, বিদেশীদের সে সুযোগ চলে গিয়েছে। ফলে জাতীয় সম্পদও আজ অনেক বেড়ে গিয়াছে।

ক্রমে নতুনের মোহ রিজাশাহকে পাগল করে তুললো। যা কিছু পুরানো, তারই তিনি উচ্ছেদসাধন করতে লাগলেন। পারস্যের নাম তো পরিবর্তন করলেনই বহু দেশ ও সহরের নামও তিনি বদলে দিলেন। ইরাণের গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে স্কুল কলেজ স্থাপিত হ'ল, ছেলেমেয়েদের সহশিক্ষা প্রবর্তিত হ'ল। আগে দেশ-শাসন চলত ধর্মের বিধান অনুসারে। আদালতের বিচারেও কোনও আইন কানুন ছিল না। তিনি বহু চেষ্টায় নতুন আইন কানুন প্রবর্তন করলেন। মেডিকেল কলেজ, দেহবিজ্ঞান শিখবার সুবিধা তাঁর চেষ্টাতেই প্রথম দেখা দিল।

শিল্প কলার উন্নতির জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন, নানারকমে শিল্পীদের উৎসাহ আর অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। ইরাণের রাজপ্রাসাদ, বিলাসকানন বা তোরণদ্বার শিল্প ও কারুকার্যের দিক দিয়ে যে অতুলনীয়, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

পৃথিবীতে এমন কোনও জাত নেই, যা তেহরানে দেখতে পাওয়া যায় না। পারসীক ব্যতীত রুষ, ফরাসী, জার্মান, ইংরাজী—সকল ভাষাতেই সেখানে কথা বলা হয়। য়ুরোপীয় আদব-কায়দা ক্রমেই সেখানে প্রচলিত হ'চ্ছে।

রিজাশাহ শুধু সমাজ-সংস্কার করেই ক্ষান্ত হ'ন নি, রাষ্ট্রীয় উন্নতির জন্যও প্রাণপণ পরিশ্রম করেছেন। বর্তমান সভ্যতার মাপকাঠি হ'চ্ছে সামরিক শক্তি। বর্তমান ডিক্টেটরদের মত তিনিও ইরাণে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী গঠন করেছেন। এই সৈন্যদল বিদেশীর হাত থেকে ইরাণকে সহজেই রক্ষা করতে পারে। কূটনীতি, বাহুবল ও ছল কৌশল—এসবের সাহায্যেই তিনি ইরাণের রাষ্ট্রীয় শক্তিকে উন্নত করেছেন।

আজ সারা এসিয়ার মধ্যে ব্যক্তিগত জমিদারী রিজাশাহেরই সবচেয়ে বেশী, অথচ একদিন এই ইরাণেরই সীমারেখা কত অল্প ছিল। প্রতিদিনই ইরাণ-সভ্যতা আরও উন্নতির পথে অগ্রসর হ'চ্ছে। শীঘ্রই সে পৃথিবীর একটা শ্রেষ্ঠ দেশ হ'য়ে দাঁড়াবে। আর তখন প্রত্যেক ইরাণী নবজাগ্রত ইরাণের জন্মদাতা রিজাশাহ পহলবীর জয়গান করে বেড়াবে।

গুণের আদর

সেখ হবিবর রহমান (সাহিত্যরত্ন)

শক্তি যদি থাকে তোমায় মান্‌বে সকলেই,
শক্তি হীনের স্থান জগতে কোনও কালেই নেই।
চলে যারা সমুখ পানে আপন বলেই চলে,
ধাক্কা দিলে পিছন থেকে উল্টা ফলই ফলে।

সাধ্য কাহার যোগ্য জনের করতে পারে ক্ষতি?
নামিয়ে দিতে চাইবে যে, তার হবেই অধোগতি।

উজ্জ্বলতা বাড়ে সোনার অগ্নিমাঝে জ্বলি',
খাদ যদি তার থাকেই, তখন যায় সকলি চলি'।

শাঁসালো বীজ দেখ মানুষ পোঁতে মাটির নীচে,
গোপন তারে যতই কর, যায় তা' হয়ে মিছে।

দু'দিন পরে চারা রূপে হয় সে কেমন বাহির!
ফলের দানে আপ্‌নারে সে করে ক্রমে জাহির।

বনভোজন

শ্রীপ্রবোধ ঘোষ

দেশের স্কুলে সে বছবে যাবা একসঙ্গে ম্যাট্রিক পডতাম পরীক্ষার পরে সকলে মিলে আমবা একটা বন-ভোজনের আয়োজন করেছিলাম এবং তার জায়গা ঠিক হয়েছিল অতুলেব মামাদেব বাগানবাডীতে।

ছোট আমাদেব শহরেব এধাব থেকে ওধার ফুঁডে যে রাস্তাটা জেলার সদবের দিকে গিয়েচে সেই বড বাস্তার উপরে বাঙলা ধরণের ছোট বাগানবাডীটি দূরে থেকে দেখাতো যেন একখানি ছবি। সামনে রাস্তার দিকে এত রকমেব ফুলের গাছ ছিল আর বোশেখেব বিকেলে এত সব ফুল ফুটেছিল এবং এমন মিঠে হাওয়া দিচ্ছিল যে বনভোজনের কথা ভুলে বাগানের পাথব বাঁধানো চাতালে আমরা বসেছিলাম—শুয়েও কেউ কেউ। ওঠবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। অনেক ডাকাডাকি কবেও ওঠাতে না পেরে মোটা একগাছা লাঠি হাতে কেষ্ট শেষ পর্যন্ত আমাদেব তেডে এসেছিল। ছুটোপুটি করে আমবা বাডীর ভেতবে ঢুকতে সামনের চওড়া বারান্দায় সে সকলকে বসিয়ে দিয়ে কাউকে ময়দা ঠাসতে কাউকে আলু ছাড়াতে লাগিয়ে দিলে।

তিন দিকে ঘুরোন সেই বাবান্দায় বসে আমরা যে যাব কাজ কবে যাচ্ছিলাম। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল ইতিমধ্যেই। হাতের চেয়ে মুখটাই চলছিল বেশি।

ভাল ছেলের দল এখন একে একে আসতে আরম্ভ করেছিলেন, অথচ সকাল সকাল সব শেষ করে দেবার কথা তাঁরাই বলেছিলেন। সরোজ একটু আগেই এসেছিল এবং বড় একটা ময়দার তাল দিয়ে সতীশ তাকে একদিকে বসিয়ে দিয়েছিল। কাজটা সম্ভবতঃ তার মনের মত হয়নি তাই ঘাড় গুঁজে মুখ বুঁজে সে সেই ময়দাব তাল নিয়ে কসরত্ করছিল আমাদের উশৃঙ্খল বাকবিভূতি ও উচ্চহাস্যকে নির্লিপ্ত নিষ্ঠায় পবিহাব করে। বড ঘরের ঘডিতে টং টং করে ন'টা বাজতে খগেন তার পটোলের খোসা ছাডানো বেখে হঠাৎ উঠে দাঁডাল এবং বলল—তা'হলে যাই আমি—

তার মানে?

মানে এই যে যখন বেশ বোঝা যাচ্চে যে দশটার মধ্যে সব হবে না তখন মিছিমিছি আব বাত করে লাভ কি? আমি যাই। অতুল তার হাতের কাজ ফেলে তাকে বাধা দেবার ভাবে দাঁডিয়ে উঠে বলল—না, যাওয়া হবে না তোমার। এক এক ক'রে তোমবা যদি সকলে স'রে পড তাহলে এ আয়োজন করাব কি দরকার ছিল?

কিন্তু আমি ত ভাই আগেই বলেছিলাম যে দশটার ওদিকে আমি থাকতে পারব না

বলেছিলে ত মাথা কিনেছিলে আমাদের—

কিন্তু দশটা ত এখনো বাজেনি—

এখনো বাজেনি কিন্তু একটু পরেই বাজবে এবং দেখা যাবে যে বিশেষ কিছুই হয়নি তখনো—

সে হোক আর না হোক আমি তোমাকে দশটার মধ্যে খাইয়ে দেবো—

আমাকেও দিয়ো ভাই ঐ সঙ্গে—সরোজ বলে উঠল। এসে পর্যন্ত এই তার প্রথম কথা

ননী চেঁচিয়ে উঠল—না দশটার মধ্যে তোমার বাড়ী যাওয়ার কথা নেই—

—বাবাকে আমি বলে এসেচি যে দশটার মধ্যে ফিরব—

পরামর্শ করে এসেচ দুজনে তোমরা—আচ্ছা দশটার সময় ত যাবে, এসেচ কখন বলত—

—সাতটার সময়ে এসেচি—

—আর আমরা যে সেই খেয়ে উঠেই এসেচি—উনুন করলাম, জিনিষপত্র আনালাম—সকলে এসে এক একটা কাজের ভার নিলে দশটার মধ্যেই হয়ে যেতো—

—সে সব আমি জানিনে—আমি দশটার পরে থাকতে পারব না—

—আচ্ছা তোমাদের থাকতে হবে না। দশটার মধ্যেই আমি তোমাদের দুজনকে খাইয়ে দেব—বলে পরেশ তার চারদিক চেয়ে জিজ্ঞাসা করল—আর কেউ যেতে চাও দশটার মধ্যে ?

অতুল পরেশের পাশেই বসেছিল আস্তে আস্তে সে পরেশকে জিজ্ঞাসা করল দশটার মধ্যে ত খাওয়াবে, কিন্তু কি খাওয়াবে—বকুনি ?

কেন ? খাবার জিনিষের অভাব কি ? আম আছে দই আছে সন্দেশ আছে—দুজনের ওদের পেট ভরবে না—কত খাবে ওরা ?

ঠিক সেই সময়ে জহর এসে দাঁড়াতে ননী একবারে মারমুখী হয়ে উঠল তার উপরে—এই সব ভাল ছেলেদের জন্তই ত—

—কেন ভাল ছেলেরা কি করল ? কি হয়েচে ?

—কি হয়েচে ? ন'টা বেজে গিয়েচে আর এখন তোমার আসবার সময় হ'ল ?

এতক্ষণে হঠাৎ সরোজের দিকে চোখ পড়ায় জহর বলল—এই যে সরোজ, ভাই একটা কাবুলি তোমায় খুঁজছে।

কাবুলি আমায় খুঁজবে কেন ?

খুঁজচে—আবার খুঁজবে কেন কি ? একবার বাইরে বেরিয়ে দেখেই এস না কেন ?

—কিন্তু কাবুলি আমাকে খুঁজবে কেন ?

—শোন কেন ওর কথা ? দেরি করে এসেচে, পাছে আমরা কিছু বলি তাই একটা ধাঁপ্পা দিয়ে দিলে।

পাশে ছিল সত্য। সে জেরা আরম্ভ করল—আচ্ছা তোমার কাবুলিটার চেহারা কি রকম হে ? দাড়ি আছে ? লাঠি ? জহর হঠাৎ ঝাঁঝিয়ে উঠল—বলল—মনে করচ মিথ্যা বলচি আমি ? একটু পরেই বুঝতে পারবে আমি সত্যি বলচি কি না।

সুরেন চিনি কিনতে গিয়েছিল। ফিরে এসে রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে এদের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে বলল—ওহে সরোজ—কে একজন কাবুলি যে তোমায় খুঁজচে—বাইরে দাঁড়িয়ে—

—শুনলে ? আমি মিথ্যা বলচি কিনা শুনলে ?

—আরে সুরেন ত তোমার মাসতুতো ভাই !

—ঠিক ধরেচ। পরামর্শ করে এসেচে দুজনে। আর দেখেচো মজা—একজনের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আর একজন এসে উপস্থিত।

—আচ্ছা ধরে দিচ্চি আমি তোমাদের চালাকি—বলে তপন উঠে দাঁড়াল এবং সুরেনের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল—কোথায় দেখলে কাবুলিটাকে ?

—ফটকের সামনে।

—কি বলল সে তোমায় ?

আগে আমি তাকে দেখিনি—হন্ হন্ করে চলে আসছিলাম। হঠাৎ দেখি সাদা আলখেল্লা পরা একজন কে দাঁড়িয়ে রয়েচে ফটকের সামনে—

—ভূত মনে হল না ?

—ভয় হয়েছিল ভাই, কিন্তু লোকটা কথা কয়ে উঠল—জিজ্ঞাসা করল—সরোজ কোথায় ?

—তুমি কি বললে ?

—বল্লাম জানিনে।

—সটান মিথ্যা কথাটা বলে দিলে ?

—ভেবে দেখিনি, কিন্তু মিথ্যাটাই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—

—আমরাও ত তাই বলচি মিথ্যাই তোমার মুখ দিয়ে বেরোচ্চে এখনো—

—না আমি মিথ্যা বলচিনে। বিশ্বাস কর বা না কর বলে সুরেন রান্নাঘরের দিকে চলে যাচ্ছিল, তপন তাকে আটকে বলল—চল দেখিয়ে দেবে তোমার কাবুলিকে—বলে প্রায় টানতে টানতে সুরেনকে বাইরের দিকে নিয়ে

গেল। আরো তিন চার জন তাদের সঙ্গে গেল—মজা দেখবার জন্য।

একটু পরেই তারা ফিরে এল। তপন বলল কোথাও কোন কাবুলিকে দেখতে পেলাম না—দূরে সাদামত একটা সুরেন আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে কিন্তু দেখতে দেখতে অন্ধকারের মধ্যে সেটা মিলিয়ে গেল।

—তাহলে ত ভয়ের কথা বললে ভাই। দূরের সেই সাদা বস্তুটা কাবুলির আলখেল্লা হলেই বরং ভাল ছিল—

—তা বটে—কারণ বাড়ীটার সম্পর্কে ভয়ের কথা একটা শোনা যায় মাঝে মাঝে—

—কিন্তু কাবুলি নয় সে—

—পুরুষ মানুষও নয়—

—কিন্তু কথাটা যদি সত্যি হয় তাহলে কাবুলি হওয়া বা পুরুষ মানুষ হওয়া কিছুই শক্ত নয় তার পক্ষে—

—ও সব বাজে কথা রেখে হাতের কাজে একটু মন দাও—

হবি আর কেশব হাত ধরাধরি করে এসে দাঁড়াল। কেশব জিজ্ঞাসা করল কি নিয়ে তোমাদের তর্ক?

বিপিন তাদের অভ্যর্থনা করে বলল—এলে মানিকজোড়? নেমন্তন্ন খেতে এলে।

—সকালে সকালে এসে কি করব? বারোটার আগে ত হবে না—

—বারোটাতেও হবে না। কারণ এ নেমন্তন্নবাড়ী নয়। নিজেরা করেকর্মে নিতে হবে জানো না?

—ঠিক কথা, আমি ভাই হরিকে কতবার বললাম ও কিছুতেই শুনল না—

সে কথা ভেবে আর লাভ নেই এখন দুজনে তোমরা কাজে লেগে যাও। দেখো দেখি খাবার জলের দরকার হবে কিনা—কেশবের সঙ্গে হবি রান্নাঘরের দিকে চলে গেল এবং একটু পরে দেখা গেল যে দড়া বালতি নিয়ে তারা ইন্দারার দিকে যাচ্ছে।

বিপিন বলল ওদের জিজ্ঞাসা করলে হ'ত, পথে কোন কাবুলি টাবুলির সঙ্গে দেখা হয়েছে কি না।

—দেখা হলে সে কথা ওরা নিজে থেকেই বলত। অতুলের কথাটা শেষ হবার আগেই নন্দ ছুটতে ছুটতে এসে তাদের মধ্যে দাঁড়াল।

—কি হে ব্যাপার কি? বাঘে তাড়া করল নাকি?

—না—আমি তাড়াতাড়ি আসচি সরষে নিয়ে—

—এত রাত্রে সরষে কেন?

—চাটনিতে যে সরষে ফোড়ন দিতে হয়। কথাটা আগে মনে হয় নি—আসচি আমি তাড়াতাড়ি—ফটকে একটা কাবুলি আমাকে দেখেই হুঙ্কার দিয়ে উঠল—সঙ্গে সঙ্গে লাঠি তুলে দাঁড়াল—

—আর তুমি বুঝি দিলে ছুট?

—কি করব? খামকা মার খাব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে?

—তাইত—ব্যাপারটা যে ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠচে।

—না ভাই—খাওয়া দাওয়া সব থাক—চল সব বাড়ী যাওয়া যাক এক সঙ্গে—

—বাড়ীতো যেতেই হবে এবং একসঙ্গেই যাব কিন্তু কিছু না খেয়ে যাব কেন?

—খেয়ে দেয়ে বরং জোর বাড়িয়ে নেওয়া যাক্, তেমন তেমন হ'লে দু'ঘা দিতে হবে ত বেটাকে।

—দু'ঘা ত দেবে—কিন্তু কে দেবে কাকে?

—এতগুলো লোক রইচি আমরা, আর একটা কাবুলিকে ভয়?

—ভয় ঠিক কাবুলিকে নয়—কাবুলি না হয়ে যদি অন্য কিছু হয় সেই ভয়—

—ভূতকেও ভয় নেই, কারণ ঘাড় মটকে দিলে আমরাও ত বধ হয়ে যাব তখন?

"—আমরা ভয় করব না—করব না—করব না"—বলে সঞ্জীব উচ্চ কণ্ঠে গান ধরে দিলে।

খানিকক্ষণ পরে টক্ করে একটা শব্দ হল, বিপিন বলল সাড়ে দশটা বাজল—

—না হে না—দশটা নয়—সাড়ে ন'টা।

—সে আবার কাল বাজবে।

—বল কি? তাহলে ত অনেক রাত হয়েছে—

—না না আর বেশি দেরি হবে না। প্রায় সবইত হয়ে গিয়েছে—এই আমি দেখে এলাম রান্নাঘর থেকে—

—মোহিত কিন্তু এখনো আসেনি—

—এখনো যখন আসেনি তখন আর সে আসবে না—

—নিশ্চয় আসবে। সেই ত বনভোজনের প্রধান উদ্যোগী—

—তার জন্যে একটা পাতা করে রাখা যাক্।

—তা কর কিন্তু এত রাত্রে কি সে আর আসবে?

—আমার মনে হয় তাকে ডেকে নিয়ে আসা ভাল—বলে কেশব যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠল।

—কিন্তু আমি ত আসবার সময়ে তাকে ডেকে এসেছি—

—কি বলল?

—বাড়ীতে বলল সে বনভোজনে গেছে।

—তাহলে আর তাকে ডাকতে গিয়ে লাভ নেই—

—কিন্তু গেল কোথায় সে?

—আমায় কিন্তু সে বলেছিল একটু দেরি হবে আসতে—

—এর নাম একটু দেরি?

হয়তো কোথাও আটকে পড়েছে, ঠিক আসবে—

—আচ্ছা একটু আগিয়ে দেখে আসি, আসছে কিনা ? কেশব ও ননী তৈরী হয়ে দাঁড়াল।

—কথাটা বলেচ মন্দ নয়—একটু আগিয়ে দেখে আসা ভাল—পথে কাবুলিটা আছে, আর সে যে ভীতু মানুষ—

—কিন্তু কাবুলির জন্য তোমাদের সাবধান হওয়া উচিত—

—একগাছা লাঠি হলে হত—

—লাঠি না আছে নাই আছে। হাত ত আছে দু'টো করে'—

—চল আমিও তোমাদের সঙ্গে যাই—বলে অতুল দাঁড়িয়ে উঠল।

ততক্ষণ আমরা সব ঠিক করে ফেলি এদিকে—বলে সকলে উঠে জায়গাটা পরিষ্কার করবার কাজে লেগে গেল।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ওরা তিন জনে ফিরে এল—বলল মোহিতের বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়েছিলাম—পথটা দু'তিন-বার ঘুরেচি।

তাহলে তার আর আসবার সম্ভাবনা নেই—

পাতা সব ঠিক করে এদের জন্য সকলে বসেছিল। এরা ফিরে এলে সকলে পাতে বসে গেল।

খগেন প্রস্তাব করল—বাইরের দোরটা বন্ধ করে দিয়ে এলে ভাল হ'ত।

তা মন্দ বলনি কথাটা—খাবার সময় একটা হাঙ্গামা না বাধিয়ে বসে কাবুলিটা এসে—

—কিন্তু যদি মোহিত আসে ইতিমধ্যে—

—না হে না মোহিত আসবে না—

—তাহলে দোরটা বন্ধ করে দিই বলে খগেন গিয়ে দোরটা বন্ধ করে এল।

সব পাতে লুচি দেওয়া হয়েচে—ভাজার চুপড়ি আর তরকারির গামলা নিয়ে দুজন দু'দিক থেকে দিতে আরম্ভ করে দিয়েচে।

সকলেই বসে গিয়েচে কেবল রান্নাঘরে যারা এতক্ষণ আগুনের তাতে কাজ করেচে একটু ঠাণ্ডা হবার জন্য তারা তিন চার জন ইন্দারার ধারে গিয়ে বসেচে। বিপিন চেঁচিয়ে তাদের ডাকল—লুচি দেওয়া হয়েচে পাতে, আর দেরি করো না—

খেতে বসে জহর বলল—কিন্তু মোহিতই এল না ? তারই উৎসাহে হল ব্যাঁপারটা আর সেই এল না—এমনি ধারাই হয় হে, এমনি ধারাই হয়—

হঠাৎ এমন সময় দোরের দিকে নজর পড়তে আমার মনে হল যেন পাঁচিলের উপর কি একটা সাদা জিনিষ নড়চে। পাশের সঙ্গীকে সে দিকটা দেখাবো মনে করচি ইতিমধ্যে ঝুপ করে একটা শব্দ হল এবং আমরা স্পষ্ট দেখলাম বিপুল বপু এক কাবুলি তার সাদা আলখেল্লা, প্রকাণ্ড পাগড়ি এবং লম্বা লাঠি নিয়ে তিন লাফে আমাদের মধ্যে এসে একেবারে সবোজের হাত ধরে আর কি!

নিমেষের জন্য আমরা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম এবং একটু আগে যারা রীতিমত হট্টগোল বাধিয়েছিল অকস্মাৎ তারা একবারে চুপ হয়ে যেতে ইন্দারার ধারে যারা ছিল তারা চেঁচিয়ে উঠল—চুপ করে গেলি কেন রে, কি হল ?

সেই শব্দ কানে যেতে যেন আমাদের সম্বিৎ ফিরে এল এবং দেখলাম তরকারির গামলা নামিয়ে রেখে শঙ্কর নিমেষের মধ্যে ছুটে গেল কাবুলির দিকে, ডান হাতে প্রকাণ্ড এক চড় উঁচিয়ে, বাঁ হাতে কাবুলির লম্বা দাড়ি ধরে মারল একটা টান।

আর যাবে কোথা ? সেই একটানে কৃত্রিম দাড়ি গোঁফ মুখোস সব খুলে শঙ্করের হাতে খসে এল এবং উজ্জ্বল আলোকে যে সুকুমার হাসিমাখা মুখখানি আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠল তার অধিকারীর দিকে চেয়ে প্রায় সকলেই আমরা সমস্বরে বলে উঠলাম—মোহিত!

—আরে তোর এই কাণ্ড ?

—আর একটু হলে যে মুণ্ড ঘুরিয়ে দিয়েছিলাম তোর—

—মোহিত কোন কথা বলল না—শুধু হাসতে লাগল।

হট্টগোল আবার চলল, কিন্তু মোহিত বলল—আর দাঁড়াতে পারচিনে—সেই আটটা থেকে এই এগারোটা পর্য্যন্ত ঘুরচি—পায়ের নড়ি ছিঁড়ে যাবার যো ভাই—বলে সে পাশের একটা পাতে বসে পড়ল।

অনেকরাত্রে আমাদের খাওয়া শেষ হল এবং সকলে হৈ হৈ করতে করতে বাড়ী ফিরে এলাম সে রাত্রে।
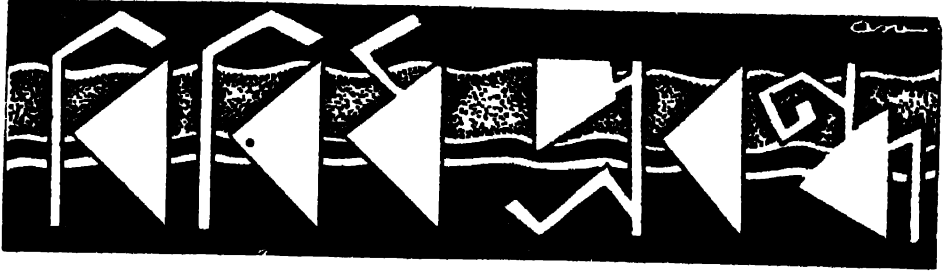
স্বদেশ যার নাই

শ্রীগোপাল ভৌমিক, এম্-এ,

প্রত্যেক লোকেরই স্বদেশ থাকে। এমন কোনও লোকের কথা ভাবতে পারো, স্বদেশ ব'লে যার কোন কিছু নেই? আজ তোমাদের এমনি একজন হতভাগ্য লোকের গল্প বলব যার সত্যই কোন স্বদেশ ছিল না। তাঁর জীবনের ইতিহাস পড়লে আমরা অতি সহজেই বুঝতে পারি যে স্বদেশদ্রোহিতা কত বড় অপরাধ। এই লোকটির নাম বেনেডিক্ট্ আর্ণল্ড। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র যখন স্বাধীনতা লাভের জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তখন জর্জ ওয়াশিংটন ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যদলের প্রধান নেতা। আর্ণল্ড্ ছিলেন ওয়াশিংটনের অধীনে সেনাপতি। কিন্তু হঠাৎ তিনি বড় বিলাস-প্রিয় হ'য়ে উঠলেন—ফলে আর্ণল্ড্‌কে আমেরিকা ছেড়ে চ'লে যেতে হল, কারণ জাতি যখন স্বাধীনতা-সংগ্রামে ব্যস্ত তখন তাদের বিলাসিতার অবসর কোথায়? সেই যে আর্ণল্ড্ বিদেশে গেলেন আর তিনি স্বদেশে ফেরেন নি। পৃথিবীর নানা দেশে তিনি ঘুরেছিলেন কিন্তু কোথাও গিয়ে কি তাঁর শান্তি ছিল? সব সময় দুটি অর্ধোচ্চারিত কথা ছায়ার মত তাঁর পিছনে পিছনে ফিরত: "বিশ্বাসঘাতক আর্ণল্ড।"

তিনি যখন ইংলণ্ডে এসে লর্ড সভায় রাজার পাশে দাঁড়িয়েছেন, তখন সমবেত লর্ডদের মধ্যে কি একটা অস্পষ্ট গুঞ্জনধ্বনি তিনি শুনতে পেলেন। ক্রমে ক্রমে গুঞ্জন স্পষ্টতর হ'তে লাগল। অবশেষে একজন লর্ড উঠে দাঁড়িয়ে সবিনয়ে রাজাকে বললেন যে তাঁরা সবাই রাজাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন কিন্তু যতক্ষণ রাজার পাশে "বিশ্বাস-ঘাতক আর্ণল্ড্" দাঁড়িয়ে থাকবে ততক্ষণ তাঁদের মুখ দিয়ে কথা বেরুবে না।

আর্ণল্ড্ সেজেগুজে তাঁর সুগঠিত বলবান দেহ নিয়ে থিয়েটার দেখ্‌তে যেতেন, কিন্তু যে মুহূর্তে তাঁর মুখ দেখা যেত, তখনই দর্শকেরা সবাই একযোগে চীৎকার ক'রে উঠত: "বিশ্বাসঘাতক আর্ণল্ড।"

তিনি যখন তাঁর সুরম্য প্রাসাদতুল্য বাড়ী থেকে বেরিয়ে গাড়ীতে উঠে বসতেন তখন তাঁরই নিজের চাকর আরেকটি চাকরকে অস্ফুটস্বরে বলত: "বিশ্বাসঘাতক আর্ণল্ড্।"

একদিন রাস্তায় একটি লোক তাঁকে ভয়ানক রকম অপমান করলে—তিনি সমবেত পথচারীদের কাছে তাঁর আবেদন জানালেন এবং রেগে লোকটার গায়ে থুথু দিলেন। লোকটি তখন বললে: "এর উচিত শাস্তি তোমায় দিতে পারতাম কিন্তু বিশ্বাসঘাতককে হত্যা ক'রে আমি কলঙ্ক কিনতে চাইনে।"

এরকম অপমান সহ্য ক'রে মানুষ কতদিন টিঁকতে পারে? অবশেষে আর্ণল্ড্ লণ্ডন ত্যাগ করলেন—এবং ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করলেন। সমুদ্রে তাঁর জাহাজ চলতে লাগল—নিউ ব্রান্‌সউইকে তাঁর মাল গুদাম তৈরী হ'ল—ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে জমি কিনে তিনি চাষবাস শুরু করলেন। কিন্তু করলে কি হয়? দুর্ভাগ্য তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফিরতে লাগল। একদিন রাত্রে আগুন লেগে তাঁর মাল-গুদামগুলি পুড়ে ভস্ম হ'য়ে গেল। সেণ্ট্ জন্ শহরের সমস্ত অধিবাসীই কিন্তু বলতে লাগল যে বীমা কোম্পানীকে ফাঁকি দেবার জন্য আর্ণল্ডই নিজে হাতে আগুন লাগিয়ে সব গুদাম পুড়িয়েছেন। তারপর অধিবাসীরা একত্রিত হ'য়ে তাঁর ঘরের জানালার সামনে একটা প্রতিকৃতি ঝুলিয়ে দিল, সেই প্রতিকৃতির উপর লেখা ছিল: "বিশ্বাসঘাতক আর্ণল্ড্।"

একদিন প্যারী থেকে তালের্ঁা নামে একজন ধনী লোক হন্তদন্ত হ'য়ে হাভারে এসে পৌঁছিলেন। তখন ফরাসী বিদ্রোহের সময়। ফরাসী দেশের সব গরীব প্রজারা ক্ষেপে গিয়ে ধনীদের উপর অশেষ অত্যাচার করছিল। তাই ধনীরা ফ্রান্স ছেড়ে যে যেখানে পারছিল পালাচ্ছিল। তালের্ঁা পালিয়ে যাচ্ছিলেন আমেরিকায়। একদিন ইনি ফরাসী দেশের প্রধান মন্ত্রী পর্যন্ত হয়েছিলেন;

কিন্তু আজ তাঁর ভিখারীর মত অবস্থা। বিদেশ আমেরিকায় গিয়ে কিভাবে জীবিকা নির্বাহ করবেন এখন তাই হ'ল তাঁর সমস্যা। তিনি হ্যাভারে যে হোটেলে উঠেছিলেন তার মালিককে জিজ্ঞাসা করলেন: "আচ্ছা এ হোটেলে কি কোনও আমেরিকান ভদ্রলোক থাকেন? আমি আমেরিকায় যাচ্ছি—কোনও আমেরিকান্ ভদ্রলোকের কাছ থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে যেতে পারলে কাজ দিত।" দ্বিধাগ্রস্তভাবে হোটেলের মালিক বললে: "উপরতলায় একটি বিদেশী ভদ্রলোক আছেন বটে তবে তাঁর বাড়ী ইংলণ্ডে না আমেরিকায় আমি ঠিক বলতে পারলাম না।" হোটেলের মালিক তাঁকে পথ দেখিয়ে দিলেন। প্রদর্শিত পথে উপরে উঠে তালের্ঁা বিদেশী ভদ্রলোকের ঘরে ঢুকলেন।

স্বল্পালোকিত ঘরটির এককোণে বছর পঞ্চাশ বয়সের একজন ভদ্রলোক ব'সেছিলেন; হাতদুটি গুটিয়ে মাথা বুকের উপর নামিয়ে তিনি ব'সেছিলেন। তাঁর ঠিক বিপরীত দিকের জানালা থেকে এক ঝলক আলো এসে প'ড়েছিল ঠিক তাঁর কপালে। অবনত মাথাটি কিছু উঠিয়ে তিনি অদ্ভুত সন্ধানী দৃষ্টিতে তালের্ঁার দিকে তাকালেন। তাঁর মুখ আর চিবুকে ছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং সাহসের চিহ্ন। পরিধানে ছিল কালো দামী একটা পোষাক। তালের্ঁা অগ্রসর হ'য়ে তাঁকে জানালেন যে তিনি একজন পলাতক ফরাসী ধনী, তাঁকে আমেরিকান মনে ক'রেই তিনি তাঁর সাহায্য নিতে এসেছেন।

তালের্ঁা বললেন—"আমি এখন ফরাসী দেশ থেকে নির্বাসিত। বন্ধুবান্ধবহীন অবস্থায় আমাকে আমেরিকায় পালিয়ে যেতে হচ্ছে। আপনি ত আমেরিকান্? দয়া ক'রে স্বদেশে আপনার কোনও বন্ধুর কাছে যদি আমাকে একটা পরিচয়পত্র দেন তবে অন্ততঃ আমি জীবিকা-নির্বাহের ব্যবস্থাটাও করতে পারব। আপনার মত ভদ্রলোকের নিশ্চয়ই অনেক বন্ধুবান্ধব আছে।"

বিদেশী ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। ভদ্রলোকের চোখের সে দৃষ্টি তালের্ঁা জীবনে ভুলতে পারেন নি; ভদ্রলোক পাশের ঘরের দরজার দিকে পিছু হটতে হটতে বলতে লাগলেন: "আমিই আমেরিকার একমাত্র লোক যে হাত তুলে দাঁড়িয়ে বলতে পারে যে সমস্ত আমেরিকায় তার একটিও বন্ধুবান্ধব নেই।"

তালের্ঁা উত্তেজনায় চীৎকার ক'রে উঠলেন: "আপনি কে? আপনার নাম কি?"

"আমার নাম বেনেডিক্ট আর্ণল্ড্" এই কথা ব'লে ভদ্রলোক পাশের দরজা দিয়ে অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন। আর পাশের চেয়ারটায় ধপ ক'রে বসে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে তালের্ঁা বললেন: "বিশ্বাসঘাতক আর্ণল্ড।"

এইভাবে নির্যাতিত হ'য়ে অনুতপ্ত মনে আর্ণল্ড পৃথিবীর সবদেশে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন; কোথাও গিয়ে তিনি শান্তি পেলেন না। কোন দেশই তাঁকে নিজের বলে স্বীকার করলো না। তিনি কি ভাবে মারা গিয়াছিলেন তা আমরা জানি না, তবে একথা সত্যি যে তাঁকে বন্ধুবান্ধবহীন অবস্থায়ই মৃত্যু বরণ করতে হয়েছিল। সারা জীবন তিনি স্বদেশদ্রোহিতার জন্য অনুতাপ ভোগ ক'রেছিলেন। মৃত্যুর সময় তিনি হয়ত নিজেকে উদ্দেশ্য ক'রে মনে মনে বলেছিলেন: "হে বিশ্বাসঘাতক আর্ণল্ড, তুমি যদি নিজের দেশকে ভালবাসতে তবে কি-ই না করতে পারতে?"

কাজ ও বিশ্রাম

মৌলভী মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, এম্-এ

একদা গ্রীষ্মের এক সন্ধ্যাকালে জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক টমাস এডিসন তাঁহার কর্ম্মস্থল হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে বলিলেন "তুমি ত অনেক কাজ করিলে, বিশ্রাম না লইয়াই। এখন তুমি কিছুকালের জন্য ছুটি লও।"

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "কিন্তু যাইব কোথায়?" উত্তর পাইলেন "স্থির কর যেখানে তোমায় কেহ বিরক্ত করিবে না পৃথিবীর এমন কোন একটি স্থান; এবং সেইখানেই যাও।"

এডিসন বলিলেন, "বেশ। আগামী কল্য আমি সেইখানেই যাইব।" পরদিবস যথানিয়মে তিনি তাঁহার অনুশীলনাগারে (laboratoryতে) গমন করিলেন।

How dull it is to pause, to make an end,
To rust unfurnish'd, not to shine in use.

Tennyson.

পৃথিবী মায়ের অশান্ত চঞ্চল বুড়োখোকা ক্যাপ্টেন কুক কিন্তু চুপ করে ঘরে বসে বসে থাকতে পারলেন না। সমুদ্র তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকত। তাই অল্পদিনের মধ্যেই তিনি আবার সমুদ্রে জাহাজ ভাসালেন। এই অভিযানের ফলে তিনি অনেক নতুন দেশ আবিষ্কার করলেন, এবং সেই সঙ্গে আবিষ্কার করলেন দক্ষিণ মেরুপ্রদেশ। অবশেষে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে আবার তিনি ইংল্যাণ্ডে ফিরে এলেন।

কিন্তু ঘরে বসে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না। দেশ আবিষ্কারের নেশা তাঁকে পেয়ে বসেছিল, তাই ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে তিনি আবার যাত্রা করলেন সমুদ্রপথে। এই সময় তিনি আটলাণ্টিক মহাসাগর অতিক্রম করে আমেরিকার উত্তর উপকূল থেকে ইংল্যাণ্ডে পৌছুবার চেষ্টা করলেন। তার ফলে আরও অনেক নতুন জায়গা তিনি আবিষ্কার করলেন—যাদের মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছে স্যাণ্ডউইচ এবং হাওয়াই দ্বীপ।

তাঁর সঙ্গীরা এবার তাঁকে দেশে ফেরবার জন্য অনুরোধ করলেন কিন্তু কুক তাদের কথায় কান দিলেন না। দক্ষিণ দিকের সাগরগুলো একবার ভাল করে পাড়ি না মেরে তিনি দেশে ফিরবেন না।

যখন তাঁরা হাওয়াই দ্বীপে ছিলেন, তখন একদিন দ্বীপবাসীরা কুকের একখানি বোট চুরি করল। ফলে কুকের সঙ্গীদের সঙ্গে দ্বীপবাসীদের বাধল ঝগড়া এবং মারামারি। একটু একটু করে মারামারি ভীষণ আকার ধারণ করল এবং দু' তরফই নানা রকম অস্ত্র ব্যবহার করতে লাগল। এই সময় দ্বীপবাসীদের ছোঁড়া একটা বল্লম এসে কুকের পিঠে বিঁধল, এবং তাতেই কুক প্রাণ হারালেন।

আর একজন বিখ্যাত অভিযানকারী স্যার জন্ ফ্র্যাঙ্কলিন ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম দিকে অভিযান করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই অভিযানে তিনি এবং তাঁর সমস্ত সঙ্গীরা প্রাণ হারান। স্যার ফ্র্যাঙ্কলিন, তাঁর সঙ্গীদের এবং তাঁর দুটি বিখ্যাত জাহাজ "এরেবাস" ও "টেররের" খোঁজে একটা অভিযান বেরোয়, এবং এই অভিযানে যে অভিজ্ঞতা লাভ হয় তারই ফলে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ম'ক্লিওর উত্তর-পশ্চিম পথ দিয়ে জাহাজ চালাতে সক্ষম হলেন।

এই সব অভিযানে শত শত লোক অনাহারে প্রাণ দিত, শত শত লোক জাহাজডুবিতে প্রাণ হারাত। কিন্তু তবুও মানুষের উৎসাহ কমত না। নূতন নূতন লোক এসে অসমাপ্ত অভিযান সমাপ্ত করবার জন্য সমুদ্রের আরও অজানা দুর্গম প্রদেশে যাত্রা করত। নরওয়েবাসী অভিযানকারী ন্যানসেন ও তাঁর সঙ্গীদের অভিযান-কাহিনী এমনই চমকপ্রদ। তাঁরা প্রথমে কয়েকবার বরফ-ঢাকা গ্রীণল্যাণ্ড অতিক্রম করেন। গ্রীণল্যাণ্ডের মধ্যস্থলে পৌছুতে প্রথমবার তাঁদের তিন সপ্তাহ ধরে বরফের উপর দিয়ে শ্লেজগাড়ি চালাতে হয়েছিল। পরে গ্রীণল্যাণ্ড থেকে তিনি উত্তর মেরুতে যাবার চেষ্টা করেন—প্রথমে জাহাজে, পরে কখনও শ্লেজে চড়ে, কখনও হেঁটে। কিন্তু মেরুকেন্দ্র তিনি আবিষ্কার করতে পারেন নি। তবে মেরুপ্রদেশ সম্বন্ধে যে সব তথ্য তিনি সংগ্রহ করেন তাতে পরবর্তী অভিযানকারীদের যথেষ্ট সাহায্য হয়েছিল।

পরে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে এ্যাণ্ড্রি নামক একজন দুঃসাহসী সুইডেনবাসী কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে বেলুনে উত্তরমেরুতে যাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁরা সকলেই সেই অভিযানে ধ্বংসপ্রাপ্ত হন। ১৯৩০ সালের আগে তাঁদের কোন পাত্তাই পাওয়া যায় নি। অবশেষে ১৯৩০ সালে হোয়েল দ্বীপে বরফের মধ্যে এ্যাণ্ড্রি ও তাঁর সঙ্গীদের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। সেই সঙ্গে আবিষ্কৃত হয় তাঁর নোটবই ও ক্যামেরা। খাদ্যাভাবে ও ঠাণ্ডায় যে তাঁরা প্রাণ দেন তা স্পষ্টই বোঝা যায়।

অবশেষে অনেক চেষ্টার পর রবার্ট এডুইন পিয়েরী নামক একজন আমেরিকাবাসী ইঞ্জিনীয়ার ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল তারিখে উত্তর মেরুকেন্দ্রে পৌছুতে সক্ষম হন।

এর পর দুজন নাবিক, ক্যাপ্টেন স্কট ও রোয়াল্ড আমুণ্ডসেন, এক সঙ্গে দক্ষিণ মেরুকেন্দ্র আবিষ্কার করবার জন্য যাত্রা করেন ১৯১০ খৃষ্টাব্দে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর আমুণ্ডসেনই প্রথম সেখানে পৌছলেন। স্কট সেখানে পৌছুলেন এর একমাস পরে—১৯১২ খৃষ্টাব্দের

১৭ই জানুয়ারী। আমুণ্টসেন যথাসময়ে দেশে ফিরে এলেন কিন্তু স্কট ও তাঁর সঙ্গীরা খাবারের অভাবে এবং ঠাণ্ডায় পথেই প্রাণ হারালেন। (১৩৪৭ সালের আষাঢ় মাসের "রংমশালে" মেরু অভিযান সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে—লেখক।)

এর পরে আরও কয়েকজন এই অংশটি সম্বন্ধে সঠিক ভাবে নানা খবর সংগ্রহ করবার জন্য যাত্রা করেন। এঁদের মধ্যে ক্যাপ্টেন বার্ডের নাম সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তিনিই প্রথম এরোপ্লেনে উত্তর ও দক্ষিণ উভয় মেরুতে যান, এবং মেরু সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করেন।

মেরু আবিষ্কারের কথা উঠলেই আর একজনের নাম সকলের চেয়ে আগে মনে পড়ে। তিনি হচ্ছেন আর্নেষ্ট শ্যাক্‌ল্‌টন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন স্কটের সহকারী হিসাবে "ডিসকভারী" জাহাজে প্রথম তিনি দক্ষিণ মেরু প্রদেশের দিকে যাত্রা করেন। দুরন্ত শীতে বরফের ঝড়ের মধ্যে কেপ হর্ণ ঘুরে এসে এবং অন্যান্য কয়েকটি দুঃসাহসিক অভিযান করে ইতিমধ্যেই তিনি পরিচিত হয়ে পড়েছিলেন। তাই ক্যাপ্টেন স্কটের জাহাজে একজন নিম্ন-শ্রেণীর সহকারী কর্ম্মচারী হিসাবে তাকে নেওয়া হয়। জাহাজটি দক্ষিণ দিকে যাত্রা করল এবং নিউজিল্যাণ্ড পৌছুল। সেখান থেকে আবার যাত্রা করল দক্ষিণ মেরু প্রদেশের দিকে। শীঘ্রই জাহাজের নাবিকেরা বরফের রাজ্যের সন্ধান পেলে এবং দেখলে সামনে পথ বন্ধ। তখন তাঁরা পূর্বদিকে জাহাজ চালালে এবং বরফের মধ্যে প্রবেশ করবার একটা পথ পেলে। সেখানে শ্যাক্‌লটন একটা বেলুনে করে আকাশে উড়ল চতুর্দিক ভাল করে দেখে নেবার জন্যে। কিন্তু বরফ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না।

তারা কিছুদিন অপেক্ষা করল, এবং একদিন নভেম্বরের সকালে ক্যাপ্টেন স্কট, শ্যাক্‌লটন ও ডাক্তার উইলসন—এই তিনজনে জাহাজ ছেড়ে শ্লেজ গাড়ীতে চড়ে দক্ষিণ মেরু কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। ঠাণ্ডায়, উপযুক্ত খাদ্যাভাবে কষ্ট পেতে পেতে তাঁদের যাত্রা করাই সার হল, কারণ কিছুদিন যাবার পর তাঁরা দেখলেন যে তাঁদের পথ বন্ধ—সামনে রয়েছে পথ আগলে প্রায় ৭০ ফুট উঁচু এক বিরাট বরফের চাঙড়। সুতরাং তাঁদের ফিরতে হল।

ছ বছর পরে আবার শ্যাক্‌ল্‌টন যাত্রা করলেন দক্ষিণ মেরু প্রদেশের দিকে "নিম্রোড" নামক একটি জাহাজে। যাত্রার জন্যে শ্যাক্‌ল্‌টন তাঁর যথাসাধ্য আয়োজন করেছিলেন। যথাসময়ে তাঁরা মেরু প্রদেশে পৌছুলেন, এবং জাহাজ থেকে অভিযানের জন্যে যে সব জিনিষ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তা বরফের ওপর নামিয়ে নেওয়া হল। তারপর শ্যাক্‌ল্‌টন ও তাঁর সঙ্গীদের বরফের মধ্যে রেখে জাহাজটি সেখান থেকে চলে গেল।

শীত কেটে যাওয়ার পর অক্টোবরের চমৎকার একটি পরিষ্কার দিনে শ্যাক্‌ল্‌টন তিনজন সঙ্গী নিয়ে মেরুকেন্দ্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। কখনও কখনও দুরন্ত বরফ-ঝড়ের মধ্যে দিয়েই তাঁদের যাত্রা করতে হচ্ছিল। চলতে চলতে তারা দেখতে পেলেন যে সামনে থেকেই মালভূমি শুরু হয়েছে, এবং দূরে উঁচু বরফের চূড়ায় তা শেষ হয়েছে।

কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর হঠাৎ "বাঁচাও" বলে একটা চীৎকার শুনে শ্যাক্‌ল্‌টন ফিরে দেখলেন যে এক জায়গার বরফ ভেঙ্গে গর্ত হয়ে গেছে এবং সেই গর্তের ঠিক ধারেই ঝুলছে একখানা শ্লেজ গাড়ী—তার উপর একটা লোক। গাড়ী টানছিল যে ঘোড়া সে ও গাড়ীর অধিকাংশ জিনিষপত্তরই বরফের নীচের খাদের অতল তলে তলিয়ে গেছে।

এগোতে এগোতে যখন তাঁরা মালভূমিটির প্রায় শেষ সীমায় পৌছুলেন, তখন শ্লেজ ছেড়ে পায়ে হেঁটে উপরে উঠবার চেষ্টা করলেন তাঁরা। যতক্ষণ পর্যন্ত শক্তি ছিল ততক্ষণ তাঁরা এগোলেন। তারপর যখন আর এগোতে পারলেন না, তখন বরফের উপর জাতীয় পতাকা পুঁতে ব্রিটেনের নামে জায়গাটা অধিকার করে তাঁরা ফিরে এলেন।

[ক্রমশঃ

মূল্য

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

বীজের বিচার আছে নির্ভার গাছের কুসুমে ফলে
ফলের কদর পুষ্ট পীবর রুচির মধুর হলে।
শিশুর আদর হৃষ্ট নধর, যৌবন সমাগমে
যুবকের দাম অর্জিলে নাম বীর্য পরাক্রমে।
দেশের মূল্য কৃষি বাণিজ্য ঋদ্ধি স্বাধীনতায়
হায় মা ভারত, হায় মা ভারতী কতদিন বাকী তায়?

রবীন্দ্রনাথের ছেলে-বেলা

শ্রীবিশ্বনাথ সেনগুপ্ত

"রাত্রি হ'ল ভোর।'
আজি মোর
জন্মের স্মরণপূর্ণ বাণী
প্রভাতের রৌদ্রে লেখা লিপিখানি
হাতে করি আনি,
দ্বারে আসি দিল ডাক
পঁচিশে বৈশাখ।"

* *

"উদয় দিগন্তে ঐ শুভ্র-শঙ্খ বাজে
মোর চিত্ত মাঝে
চির নূতনেরে দিল ডাক
পঁচিশে বৈশাখ।"

পঁচিশে বৈশাখ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আশী বছর পূর্ণ হবে। এই বিশ্ববরেণ্য সত্যদ্রষ্টা মনীষীর একাশী বৎসরে পদার্পণ উপলক্ষে শুধু বাঙালী নয়, শুধু ভারতবাসী নয়, বিশ্বমানবের সাথে আমরাও তাঁর উদ্দেশে হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি। বার্ধক্য তাঁর দেহকে অধিকার করলেও মন তাঁহার চিরনবীন।

এই মনীষীর ছোটবেলা কেমন করে কেটেছে তা' তোমাদের নিশ্চয়ই জানতে খুব ইচ্ছে হয়, নয় কি? তাঁর ছোটবেলার কাহিনী যেমনি করুণ তেমনি হাস্যকর ঘটনায় ভরা। "ছেলেবেলা" বলে তাঁর বই আছে, সেখানি পড়ে দেখ। আমি এখানে তার ছেলেবেলার কয়েকটি ঘটনা দিলাম।

তিনি ছিলেন ধনীর দুলাল। কিন্তু সাধারণতঃ ধনীর ছেলে বলতে যেরকম বোঝায় মোটেই সেরকম নয়। তাঁর খাওয়া দাওয়া, সাজ পোষাক ছিল নিতান্ত মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলের মতো। তাঁর নিজের ভাষায় বলছি :—

"আহারে আমাদের সৌখিনতার গন্ধও ছিল না। কাপড় চোপড় এতই যৎসামান্য ছিল যে এখনকার ছেলের পক্ষে তাহার তালিকা ধরিলে সম্মানহানির আশঙ্কা আছে। বয়স দশের কোঠা পার হইবার পূর্বে কোনদিন কোন কারণেই মোজা পরি নাই। শীতের দিনে একটা সাদা জামার উপরে আর একটা সাদা জামাই যথেষ্ট ছিল।

তখন ঠাকুরবাড়ীর দরজী ছিল নেয়ামত খলিফা বলে একটি লোক। আমাদের জামায় তিনটের কম পকেট হলে চলে না, বড় জোর দুটো পর্যন্ত। এই নেয়ামত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :—

"আমাদের বাড়ীর দরজী নেয়ামত খলিফা অবহেলা করিয়া আমাদের জামায় পকেট যোজনা অনাবশ্যক মনে করিলে দুঃখ বোধ করিতাম।" একে তো একটা কি দুটো জামা তাও আবার পকেট-ছাড়া হলে ছোট ছেলের পক্ষে কি কম অসুবিধার কথা।

ধনীর ঘরে জন্ম হলেও কবিগুরুর ছেলেবেলাটা দুঃখের মাঝে কেটেছে। শৈশবে তাঁর দিন কেটেছে ভৃত্য মহলে। ছেলেবেলায় যতটুকু স্বাচ্ছন্দ্য দরকার তাঁর ভাগ্যে তাও ঘটেনি। ধনীর গৃহে ছেলেদের তত্ত্বাবধায়ক চাকর। রবীন্দ্রনাথের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

রবীন্দ্রনাথের ভার যে চাকরদের উপর ছিল তারাও যে খুব শান্ত শিষ্ট ছিল না তা বোঝা যাবে তাঁর লেখা থেকে। তিনি এক জায়গায় লিখেছেন, "আমরা ছিলাম চাকরদেরই শাসনের অধীনে। নিজেদের কর্তব্য সরল করিয়া লইবার জন্য তাহারা আমাদের নড়াচড়া একপ্রকার বন্ধ করিয়া দিয়াছিল।" আর একজায়গায় তিনি লিখেছেন "এই আমাদের শিশুকালের শাসনকর্তাদের মধ্যে অনেকেরই স্মৃতি কেবল কিল চড় আকারেই মনে আছে।" এখন ভেবে দেখ কেমন ভাবে বিশ্বকবির শৈশব কেটেছে।

ভৃত্যদের মধ্যে একজনের নাম ছিল ঈশ্বর। তাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "আমাদের জলখাবার সম্বন্ধে তাহার অত্যন্ত সঙ্কোচ ছিল। আমরা খাইতে বসিতাম। লুচি আমাদের সামনে একটা মোটা কাঠের বারকোষে রাশ করা থাকিত। প্রথমে দু'একখানি মাত্র লুচি যথেষ্ট উঁচু হইতে শুচিতা বাঁচাইয়া সে আমাদের পাতে বর্ষণ করিত। তাহাতে পরিবেশনকর্তার কুণ্ঠিত দক্ষিণ হস্তের দাক্ষিণ্য প্রকাশ পাইত না। তাহার পর ঈশ্বর প্রশ্ন করিত আর দিতে হইবে কি না। আমি জানিতাম কোন্ উত্তরটি সর্বাপেক্ষা সদুত্তর বলিয়া তাহার কাছে গণ্য হইবে। তাহাকে বঞ্চিত করিয়া দ্বিতীয়বার লুচি চাহিতে আমার ইচ্ছা করিত না। বাজার হইতে আমাদের জন্য জলখাবার কিনিবার পয়সা ঈশ্বর পাইত। আমরা কি খাইতে চাই প্রতিদিন সে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া লইত। জানিতাম সস্তা জিনিস ফরমাস করিলে সে খুশী হইবে। কখনও মুড়ি প্রভৃতি লঘুপথ্য কখনও বা ছোলা সিদ্ধ, চিনাবাদাম ভাজা প্রভৃতি অপথ্য আদেশ করিতাম।" শুধু তাই নয়, আফিং খাওয়া তার অভ্যাস ছিল। তাই ছেলেদের

বরাদ্দ সবটুকু দুধ তাদের দিতেও সে কুণ্ঠিত হতো। কি মুস্কিলের কথা দেখতো!

আর একটা চাকরের কথা শুনলে তাঁর ভক্তিটা বেশ স্পষ্টই হবে। তিনি এ চাকরটার সম্বন্ধে লিখেছেন "বাহির বাড়ীতে ..চাকরদের মহলে আমার দিন কাটিত। আমাদের যে চাকর ছিল তাহার নাম শ্যাম। শ্যামবর্ণ দোহারা বালক, মাথায় লম্বা চুল, খুলনা জেলায় তাহার বাড়ী। সে আমাকে ঘরে একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসাইয়া আমার চারিদিকে খড়ি দিয়া গণ্ডি কাটিয়া দিত। গম্ভীর মুখ করিয়া তর্জ্জনী তুলিয়া বলিয়া যাইত, 'গণ্ডির বাহিরে গেলেই বিষম বিপদ।' বিপদটা আধিভৌতিক কি আধিদৈবিক তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতাম না। কিন্তু মনে বড় একটা আশঙ্কা হইত। গণ্ডি পার হইয়া সীতার কি সর্বনাশ হইয়াছিল তাহা রামায়ণে পড়িয়াছিলাম। এই জন্য গণ্ডিটাকে নিতান্ত অবিশ্বাসীর মত উড়াইয়া দিতে পারিতাম না।"

(ক্রমশঃ)

বাঙলা-সাহিত্য পরিচয়

ধর্মমঙ্গল কাব্য

অধ্যাপক শ্রীতারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এম্-এ,

বপ্যটের রণকুশল পুত্র গোপাল ছিন্ন-ভিন্ন, বিক্ষিপ্ত বঙ্গদেশকে এক অখণ্ড রাজ্যে পরিণত করিয়া শাসন ও শৃঙ্খলা প্রবর্তন করিয়াছিলেন। গোপালের বংশধরগণ কয়েকপুরুষ ধরিয়া বাঙলা দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশ পাল রাজবংশ নামে পরিচিত। এই পাল বংশের পূর্বে বাঙলা দেশের কোনও ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না।

পালরাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন, তাঁহাদের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম রাজধর্মের মর্যাদা লাভ করিয়া অল্প দিনের মধ্যেই বাঙলাদেশে বিস্তার লাভ করে। এই সময়ে বাঙালীর ধর্ম বলিতে বৌদ্ধ-ধর্মকেই বুঝাইত।

পাল রাজগণের পর যখন সেন রাজবংশ বাঙলা দেশের অধীশ্বর হইল তখন বৌদ্ধ-ধর্মের প্রাধান্যেরও অবসান ঘটিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থানের ফলে আবার বাঙলা দেশে বৈদিক আচার অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হয়। এই সময়ে হিন্দুগণ যে নবপ্রেরণা লাভ করিল, তাহারই ফলে তাহারা বৌদ্ধগণের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করিতে লাগিল। মুণ্ডিতমস্তক বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগকে নাড়িয়া বা নেড়া নামে অত্যন্ত ঘৃণার সহিত অভিহিত করিয়া সভ্য সমাজ হইতে বিতাড়িত করিতে লাগিল। নিরুপায় বৌদ্ধগণ সমাজের এক অন্ধকার কোণে আশ্রয় লইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিল।

বাঙলাদেশে এক সময়ে আর্যেতর অথবা বৈদিক ক্রিয়াকর্মের গণ্ডীর বহির্ভূত অনার্যদিগের যথেষ্ট প্রভুত্ব ছিল। আর্যগণের চাপে পড়িয়া ইহারা লোকালয় হইতে দূরীভূত হইলেও আপন স্বাতন্ত্র্য হারায় নাই। আর্য সমাজের বাহিরে ইহারা নিজেদের এক সমাজ গঠন করিয়া বাঘ, সাপ, গাছ, পাথর প্রভৃতি স্থূল পদার্থের পূজা করিত। উৎপীড়িত বৌদ্ধগণ ইহাদের সহিত মিলিত হইয়া আত্মগোপন করিল বটে, কিন্তু আত্মবিস্মৃত হইল না। এই সকল গাছ পাথরের পূজার সহিত তাহাদের ধর্ম মিশ্রিত করিয়া এমন আকারে আত্মপ্রকাশ করিল যে ব্রাহ্মণগণ পর্যন্ত উহাকে চিনিতে পারিলেন না। বৌদ্ধধর্মের কঠোরতা অনেক পরিমাণে শিথিল হইলেও আর্যেতরদিগের পূজা এক-একটি পদ্ধতি লাভ করিল এবং প্রত্যেকের উপযোগী শাস্ত্র ও সাহিত্য সৃষ্ট হইয়া ইহাদিগকে ধর্মের মর্যাদা দান করিল। রাঢ়দেশে এইরূপ একটি বহু-আকার বিশিষ্ট শিলাকে ধর্মঠাকুর বলা হয়। এই ধর্মঠাকুরের বিগ্রহ সাধারণতঃ লোকালয়ের বাহিরে কোনও গাছের তলায়, কোন কোন ক্ষেত্রে গর্তের মধ্যে কূর্মাকৃতি, অথবা শালগ্রামশিলার ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট হইয়া থাকিতে দেখা যায়। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, ইহার মধ্যে বৌদ্ধ-ধর্মের প্রভাব কোথায়?

রাঢ়ে ধর্মঠাকুরের যে 'গাজন' বা উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া

থাকে, তাহা সাধারণতঃ বৈশাখী পূর্ণিমায়ই হয়। এই তিথি বুদ্ধদেবের মহানির্বাণের তিথি। কাজেই, এই ঠাকুর-রূপী ধর্মের সহিত বুদ্ধদেবের একটা মুখ্য বা গৌণ সম্বন্ধ থাকা নিতান্ত অসম্ভব নহে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ময়ূরভঞ্জরাজ্যে প্রাপ্ত ধর্মঠাকুরের বলিয়া প্রচারিত যে মূর্তিগুলি আছে তাহাতে ঠাকুর কখনও পুরুষ কখনও স্ত্রী। পুরুষরূপী-ধর্ম সম্ভবতঃ বুদ্ধদেবের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। আর স্ত্রীরূপী ধর্ম সম্ভবতঃ বৌদ্ধদিগের ত্রিশরণ (বুদ্ধ, ধর্ম, সঙ্ঘ) ধর্ম, কারণ ইহাকে স্ত্রীরূপেই কল্পনা করা হইয়াছে।

ধর্মমঙ্গল-সাহিত্যে উল্লিখিত হইয়াছে যে এই ধর্ম-ঠাকুরের 'সিংহলে বহুত সম্মান'। ইহা তো সোজাসুজি বৌদ্ধধর্মকেই বুঝাইতেছে। ধর্মঠাকুরের পূজায় চূণের ব্যবহারও ইহার বৌদ্ধ সম্পর্কই সূচিত করিতেছে। যে ধর্মঠাকুর বেদের নিন্দা করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই বুদ্ধদেব।

অনেকে আবার বলিয়া থাকেন যে ধর্মঠাকুরের কূর্মাকৃতি দেখিয়া মনে হয় যে, এগুলি যেন বৌদ্ধ বিহারের আকৃতির অনুকরণে গঠন করা হইয়াছে। প্রকাশ্যভাবে বৌদ্ধ সঙ্ঘ বা বিহার পরিচালনায় জনসাধারণের নিকট হইতে বাধা পাইয়া বৌদ্ধগণ ইহাকে ধর্মঠাকুরের শিলা-মূর্তির অন্তরালে প্রচ্ছন্ন করিলেন।

এই সকল যুক্তি হইতে আমরা ইহা নিঃসংশয়ে গ্রহণ করিতে পারি যে ধর্মঠাকুরের সহিত বৌদ্ধধর্মের নিকট সম্পর্ক আছে। এই সম্পর্ক প্রচ্ছন্ন ভাবে আছে বলিয়াই বৌদ্ধধর্মের অত্যন্ত দুর্দিনেও আত্মগোপন করা এত সহজ হইয়াছিল।

অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের ন্যায় ধর্মমঙ্গল শাখারও বিশিষ্ট সাহিত্য আছে, অধিকন্তু ইহাদের বিশদ পূজা পদ্ধতির বিবরণী পুস্তকও আছে। এই গ্রন্থটি শূন্য পুরাণ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে বটে এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে ইহার সর্বপ্রথম প্রকাশিত সংস্করণটি রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতি নামে পরিচিত হইলেও, গ্রন্থকার রামাই পণ্ডিত ইহাকে আগম পুরাণ নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই গ্রন্থে ধর্মঠাকুরের পূজাপদ্ধতিই বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ-সন্তান রামাই ধর্মঠাকুরের পূজার পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন বলিয়া পতিত হইয়াছিলেন, ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে ডোমের পুরোহিত বলিয়া ঘৃণা করিতেন। ধর্ম-মঙ্গলের লেখকের মধ্যে ঘনরাম চক্রবর্তী-ই প্রসিদ্ধ, তিনি জাতিনাশের আশঙ্কায় ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য কীর্তনে ভীত হইয়াছিলেন। শেষে দেবাদেশে গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন ঘোষণা দ্বারা ব্রাহ্মণগণের ক্রোধকে অগ্রাহ্য করিয়া ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

কাজেই, দেখা যাইতেছে যে ধর্মঠাকুরের পূজা এবং পূজারী উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজে স্থান লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু ইহাতে ধর্মপূজা প্রচারের কোনও বিঘ্নই ঘটে নাই। ইহার কারণ ধর্মমঙ্গলকাব্যে বর্ণিত কাহিনী।

মঙ্গলকাব্য শাখায় যতগুলি কাহিনী প্রচারিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে ধর্মমঙ্গলের কাহিনী সর্বাপেক্ষা অধিক চিত্তাকর্ষক। ইহাতে আদর্শ চরিত্র চিত্রন যেরূপ হৃদয়গ্রাহী, সেরূপ অপর কোথাও দৃষ্ট হয় না। লাউসেনের ন্যায় আদর্শ ভক্ত, কালু ডোমের ন্যায় বীর, কর্পূরের ন্যায় বঞ্চক, হরিহরের ন্যায় ধর্মভীরু ব্রাহ্মণ, লখাই ডোমনীর ন্যায় বীরাঙ্গনা বাঙলার কোনও প্রাচীন সাহিত্যে দৃষ্ট হয় না। ইহাদের অপূর্ব কীর্তিকলাপের মধ্যে ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রচারিত হইয়াছে বলিয়াই এই সকল চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মঠাকুরও পাঠকের চিত্ত জয় করিতে পারিয়াছিলেন; হেয়, অবজ্ঞেয় অবস্থা হইতে সমাজের মধ্যে একটা স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তাই ধর্মঠাকুরকে কেন্দ্র করিয়া পরবর্তীকালে সমাজের সকল স্তরের লোকের মধ্যে একটা মিলনের সম্বন্ধ স্থাপনের সুযোগ ঘটিয়াছিল। ধর্মপূজায় সমবেত ইতর-ভদ্র, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল পরস্পরের সুখ-দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া একটা স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ক পাতাইয়া ঐক্যবন্ধনের দ্বারা সমাজকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিল।
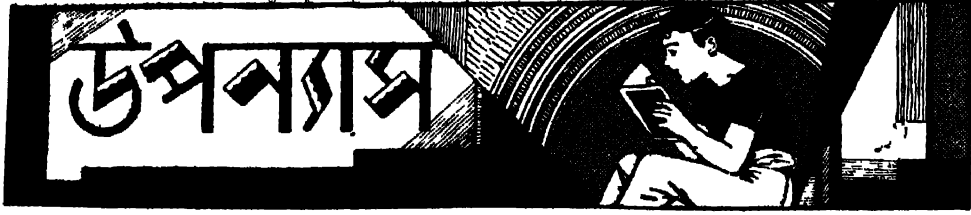
পরাগ ও রেণু

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(দেওয়ানজী ও দোকানদার)

দেওয়ানজী মহাশয়ের মুখে উমা যখন শুনলে যে তিনি এসেছেন স্বর্গগত রণেন্দ্রের পুত্র পরাগকে সঙ্গে করে লক্ষ্মীপুরে নিয়ে যেতে, পরাগের পিতামহ রাজা বাহাদুর মহেন্দ্র রায় পাঠিয়েছেন দেওয়ানজীকে তাঁর একমাত্র বংশধর লক্ষ্মীপুরের ভবিষ্য-উত্তরাধিকারীকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে আনবার জন্য, উমার বড় বড় চোখ দুটি সজল হয়ে উঠল। মুখখানি দিনান্তে স্তিমিত কমলের মত ম্লান হয়ে গেল। অবরুদ্ধকণ্ঠে বললে—"খোকাকে নিয়ে যাবেন? কিন্তু ওকি আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে? আর . আর আমারও যে ও ছাড়া আর কেউ নেই কাকাবাবু।"

উমা দু'হাতে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে উঠলো। কাতর ভাবে বললে আমি ত ওকে একটুও অযত্ন করিনি, যাতে ও মানুষের মত মানুষ হতে পারে, ওর মহৎ পিতার যোগ্য সন্তান হয়ে উঠতে পারে তেমনি করেই আমি ওকে পালন করতে চেষ্টা করছি।"

দুখিনী জননীর কাতরতা দেখে বৃদ্ধ দেওয়ানজীর চোখ দুটিও জলে ভরে উঠল। তিনি গলাটা ঝেড়ে পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, "সেত আমি নিজের চোখেই দেখে যাচ্ছি মা, তোমায় কিছুই বলতে হবে না। আমি তো তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব মা, তবে, তোমার মতো বুদ্ধিমতী সুশীলা মেয়েকে আমার জানাতে কিছু বাধা নেই যে, রাজাবাহাদুর তোমার উপর অত্যন্ত বিরূপ। পুত্রের এ বিবাহে তাঁর একেবারেই মত ছিল না, তাই সমস্ত রাগটা তোমার উপরেই জমা হয়ে আছে। একে বুড়ো মানুষ, তায় রেতো রোগী। মেজাজ সর্বদাই রুক্ষ। ভীষণ জেদী স্বভাব, যা ধরবেন তা করবেনই। কারুর সাধ্য নেই যে তাঁর মত্ বদলে দিতে পারে। কোনো বিষয়ে একবার যে ধারনা তাঁর মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয়, সে আর কিছুতে যায় না। তোমার সম্বন্ধে তাঁর একটা ভয়ানক ভুল ধারণা মনের মধ্যে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে আছে। প্রতিজ্ঞা করেছিলেন জীবনে কখনও পুত্র ও পুত্রবধূর মুখদর্শন করবেন না—সে প্রতিজ্ঞা যে তাঁর অটল এ লক্ষ্মীপুরের ছেলেবুড়ো সবাই জানে। ছেলে ত ফাঁকি দিয়ে চলে গেল, বিধবা পুত্রবধূ আজও তাঁর দু'চক্ষের বিষ হয়ে রয়েছে; তাই নাতিকে তিনি তোমার কাছে আর রাখতে চান না। নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে তার শিক্ষা দীক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করবেন মনস্থ করেছেন। নাতিটিকে চব্বিশ ঘণ্টা চোখের উপরই রাখতে চান। অবশ্য বংশ মর্য্যাদার খাতিরে তিনি এটাও ইচ্ছে করেন না যে তাঁর মৃত পুত্রের বিধবা পত্নী এই কলকাতার মতো শহরে একা অসহায় অবস্থায় পড়ে থাকে। তাঁর ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী ও একমাত্র বংশধরের জননীকে তিনি সমাদরে গৃহে স্থান দিতে সম্মত না হলেও অমর্য্যাদা করতেও চান না। তোমাকে তিনি লক্ষ্মীপুরের 'অতিথি ভবন' বাড়ীখানি দান করেছেন। রাজবাড়ী থেকে অল্প দূরে হাতার ভিতরেই এ বাড়ীটি, এই বাড়ীতে তুমি থাকিবে। মাসিক একটা বৃত্তিও পাবে তোমার নিজের হাতখরচের জন্য। তাছাড়া তোমার চাকর দাসী খাওয়া পরার সমস্ত ব্যয় মহেন্দ্র রায়ের এস্টেটই বহন করবে। তোমার ছেলে প্রতিদিন একবার তোমার সঙ্গে দেখা করে যাবে। কেবল তোমাকে একটি মাত্র কথা দিতে হবে মা, যে তুমি কখনও রাজবাড়ীতে প্রবেশ করবে না বা রাজাবাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার চেষ্টা করবে না।

পরাগের জননী কোনো উত্তর না দিয়ে নতমুখে দাঁড়িয়ে আছেন দেখে দেওয়ানজী আবার বলতে লাগলেন—"তোমার সঙ্গে সন্তানের তো আর সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হচ্ছে না মা, দেখা সাক্ষাৎ তোমাদের মায়ে পোয়ে রোজই হবে। বর্তমান অবস্থায় এটা মেনে নেওয়াই হবে তোমার মত ধীরবুদ্ধি মেয়ের উপযুক্ত কাজ। রাজবাহাদুরের তত্ত্বাবধানে পরাগের যে ব্যবস্থা হবে তা যে রাজকুমারদেরই উপযুক্ত একথা বলাই বাহুল্য। সামান্য মান অভিমানের অন্ধ প্রভাবে সন্তানের এমন উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ উপেক্ষা করা উচিত হবে না। এ বুড়োর পরামর্শ বা উপদেশ যদি

অবহেলা করতে না চাও, চলো মা ছেলেকে নিয়ে আমার সঙ্গে। শ্বশুরঘরে যাবে—তোমার স্বামীর গৃহে—তোমার পুত্রের গৃহে—এতে লজ্জা বা অপমানের কিছু নেই।"

উমা উঠে গিয়ে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ আকাশের দিকে চেয়ে রইল।

দেওয়ানজী মহাশয় শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তাঁর ভয় হ'ল হয়ত সিংহের পত্নী সিংহিনী এ লজ্জা ও অপমান স্বীকার করে লক্ষ্মীপুরে পদার্পণ করতে সম্মত হবে না। তিনি মনে মনে ভগবানকে ডেকে বলতে লাগলেন "ঠাকুর, এ অভাগিনীকে তুমি সুমতি দাও, সুবুদ্ধি দাও।" মুখে বললেন, বুড়োর কথা শোনো মা, তোমার জন্য আমি বলছিনি, বলছি তোমার ওই অসামান্য বুদ্ধিমান মেধাবী পুত্রের জন্য—উপযুক্ত শিক্ষা পেয়ে মানুষ হবার সুযোগ পেলে ভবিষ্যতে ওছেলে যে তোমার দেশগৌরব হয়ে উঠবে মা। পুত্রের কল্যাণের জন্য যদিই তোমাকে উপস্থিত একটু নত হয়েই সেখানে যেতে হয়, আশা করি সন্তানের মুখ চেয়ে তুমি এটুকু করতে রাজি হবে।"

উমা দেওয়ানজীর দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল। তখনও দুই চোখ বেয়ে তার অবিরল জলধারা গড়িয়ে পড়ছে। বললে—"আমি যাব কাকাবাবু, আমার স্বামী লক্ষ্মীপুরকে ভালবাসতেন নিজের স্নেহময়ী মায়ের মতো। সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হওয়ায় একদিনের জন্যও তাঁর মনে এতটুকু দুঃখ হয়নি, কিন্তু লক্ষ্মীপুরে আর তিনি যেতে পাবেন না এই আক্ষেপেই তাঁকে কাতর হতে দেখেছি সবচেয়ে বেশী। তাঁর বড়সাধের লক্ষ্মীপুর। তিনি আজ বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই খোকাকে পাঠাতেন তাঁর সেই বড় আদরের বড় গর্বের লক্ষ্মীপুর দেখে আসতে। তিনি আশৈশব সেখানে যে আদরে যে সম্ভ্রমে মানুষ হয়েছিলেন, তাঁর ছেলেকে সে সৌভাগ্য থেকে আমি বঞ্চিত করতে চাইনে।"

উমা দেওয়ানজীর কাছে এগিয়ে এসে তাঁকে প্রণাম ক'রে পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে বললে, "আপনি আমার স্বামীকে আপন সন্তানের তুল্য স্নেহ করতেন। তাঁর পুত্রের ভবিষ্যতের জন্য আপনি যে ব্যবস্থা করবেন আমি তা মেনে নেব, যে আদেশ করবেন আমি তার অবাধ্য হব না। শুধু এইটুকু আপনার কাছে আমার মিনতি রইল, খোকা যেন তার পিতামহর কাছ থেকে এমন শিক্ষা কখনও না পায় যাতে সে তার মাকে ঘৃণা করতে শেখে। আশা করি আমার প্রতি রাজাবাহাদুরের যে বিরাগ তা তিনি কখনই আমার সন্তানের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চেষ্টা করবেন না। ও নেহাৎ শিশু, তবু এ বিশ্বাস আমার আছে যে ওর মনটি ঠিক ওর বাপের সমস্ত সদ্গুণে এখন থেকেই সমুন্নত। মাকে সে ভুলবে না—মাকে সে অশ্রদ্ধা করতে পারবে না। আমার সঙ্গে যদি রাজাবাহাদুর কখনও খোকার দেখা সাক্ষাৎ বন্ধও করে দেন, তবু জানি সে তার মাকে মনে রাখবে। চলুন, আমি যাব খোকাকে নিয়ে—আমি ভয় করিনে ওর নিষ্ঠুর পিতামহকে। আমাদের মায়ে পোয়ের দেখাসাক্ষাতের সুযোগ তিনি দেন বা না দেন আমার সন্তানকে তিনি আমার কাছ থেকে কখনই কেড়ে নিতে পারবেন না।"

দেওয়ানজী অবাক হয়ে এই তেজস্বিনী মহিলার দীপ্ত মুখের দিকে ক্ষণকাল সম্ভ্রমের দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলেন, তারপর ধীরে ধীরে বললেন—"আমি সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করছি মা তুমি সুখী হবে, তোমার সন্তান দেশের মুখোজ্জ্বল করবে, এবং আজ তুমি এই যে তার ভবিষ্যৎ কল্যাণের মুখ চেয়ে নিজের আত্মমর্য্যাদাকে মাথা উঁচু করতে দিলে না এজন্য তোমার সন্তান বড় হয়ে তোমার কাছে একদিন তার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাবে। আর, এভরসাও আমি তোমাকে দিচ্ছি মা, যে তোমার ছেলে তোমার চোখের আড়ালে থাকলেও কোনোদিন তার এতটুকু অযত্ন হবে না জেনো। রাজাবাহাদুর যতই কঠোর হোন শিশুদের কাছে তিনি একান্ত দুর্বল। ছোট ছেলেমেয়েদের তিনি যথার্থ ই অন্তরের সঙ্গে ভালবাসেন।"

"তিনি যত কঠোরই হোন কাকাবাবু, আমার পরাগকে ভাল না বেসে কখনই থাকতে পারবেন না। পরাগ যে ঠিক তার বাপের মত হয়েছে। সকলকে ভালবাসা প্রীতির চক্ষে দেখা আপনার করে নেওয়াই তার জন্মগত স্বভাব। আমি জানি সে তার ঠাকুরদাদাকে ভালবাসতে পারবে। রাজাবাহাদুরের যতই কেন না দোষ থাক, পরাগ তাঁকে আপনার করে নেবেই।"

দেওয়ানজী মনে মনে একটু সংশয় পোষণ করছিলেন এই ভেবে যে সেই বদ্‌মেজাজী প্রচণ্ডরাগী বাতগ্রস্ত বৃদ্ধ জমীদারকে দেখে এই ফুলের মতো কোমল কচি সরল-স্বভাব শিশুর সুকুমার মন নিশ্চয়ই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়বে, এবং শেষ পর্যন্ত হয়ত সে ঠাকুরদা'র সান্নিধ্য সাধ্য মত এড়িয়ে চলবারই চেষ্টা করবে, সহজে আর তাঁর কাছে ঘেঁষতে চাইবে না। কিন্তু পরাগের মায়ের কাছে তিনি আর সেকথা প্রকাশ করতে সাহস করলেন না। শুধু হাতজোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বললেন, ভগবান করুন যেন তাই হয়। কিন্তু কই, আজ আমি এসে পর্যন্ত শ্রীমানকে দেখতে পাচ্ছিনি কেন? তার সঙ্গে যে আমার গোটাকতক জরুরী কথা আছে।"

"সে বোধ হয় এই গলির মোড়েই মণিহারীর দোকানে বসে আছে, আমি মণির মাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি তাকে এখনি ডেকে আনবে।" বলে উমা মণির মাকে ডাক দিলেন পরাগকে গিয়ে আনবার জন্য।

পরাগ গলির মোড়ে মণিহারীর দোকানে বসে আছে শুনে দেওয়ানজী চমকে উঠলেন। এই সর্বনাশ করেছে। যত সব ছোটলোক দোকানি পশারীর সঙ্গে মিশছে ছেলেটা এই বয়স থেকেই। তবেই হয়েছে।

কিন্তু দেওয়ানজীর দুশ্চিন্তা বেশী দূর অগ্রসর হবার আগেই পরাগের মা বললেন, "দোকানের মালিক কালীবাবু একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক, তিনি খোকাকে নিজের ছেলের মত ভালবাসেন। খোকা যখন ছ'মাসের ছেলে তখন থেকেই কালীবাবুর সঙ্গে ওর একটা গভীর স্নেহের সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে।"

দেওয়ানজীর মন তবু শান্ত হ'ল না। লক্ষ্মীপুরের জমীদারবংশের একমাত্র উত্তরাধিকারী একজন দোকানদারের কাছে গিয়ে বসবে এ যেন তিনি কল্পনাও করতে পারেন না। তিনি উঠে পড়লেন। বললেন, "থাক্, মণির মা'র গিয়ে কাজ নেই। আমি গাড়ী নিয়ে নিজেই যাচ্ছি শ্রীমানকে আনতে। হ্যাঁ, কিসের দোকান বললে—

মণিরমা এসে পড়েছিল, বললে, "এই গলির মোড়েই বাঁদিকের মণিহারীর দোকানে গো। সেখানে যদি দাদাবাবুকে না পাওয়া যায় কর্তাবাবু তাহলে স্কুলের মাঠে আছে, সেখানে নিশ্চয় খেলতেছে।"

দেওয়ানজী গাড়ীখানাকে পিছু পিছু আসতে বলে গলির মোড় পর্যন্ত হেঁটেই চললেন। কালীবাবুর দোকানে উঁকিঝুঁকি মেরে পরাগকে দেখতে পেলেন না। স্কুলের মাঠ কোথা সে ঠিকানাও তাঁর জানা নেই, অগত্যা তিনি ফিরে যাবেন না ইস্কুলের মাঠটা কোথা খোঁজ করবেন ভাবছেন এমন সময় কালীবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "মহাশয়ের কী চাই ?"

দেওয়ানজী মহাশয় একটু চমকে উঠে বললেন, "না-এই, হ্যাঁ, ছেলেদের—ছোট ছেলেদের খেলবার উপযোগী কোন কিছু—

"কত বয়সের ছেলের ?" কালী বাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

"এই বছর সাত আট হবে আর কি, হ্যাঁ ঐ যে ফুটবল রয়েছে দেখছি, ওই একটা দিলেও ত মন্দ হয় না।"

"কিছু মনে করবেন না, মহাশয়কে মফঃস্বলের লোক বলে মনে হচ্ছে। নিবাস কোথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?"

"বিলক্ষণ, খুব পারেন। আমার নিবাস লক্ষ্মীপুর, থানা শুশনি—"

বাধা দিয়ে কালীবাবু বললেন, "ও! নমস্কার মশাই, আপনিই তাহলে পরাগের দেওয়ানজী দাদু ? তা ফুটবল কি খোকার জন্য চাইচেন ? বেটার তিনটে ফুটবল আছে ১নং, ৩নং, আবার সেদিন নিয়ে গেছে ৫নং, বলে 'কাবু' আমি এখন বড় হয়েছি কিনা, এখন বড় বলে খেলতে হবে।

"ও। বটে। আপনিই বুঝি কালীবাবু ? নমস্কার মশাই। তা ফুটবল যদি থাকে তার, তাহলে না হয় অন্য কিছু—"

"মাপ করবেন দাদা, খোকার খেলনা সরবরাহের ভারটা ওর জন্মাবধি আমারই এক চেটে। ওতে আর আপনাকে ভাগ বসাতে দেব না"—কালীবাবু বললেন হেসে।

"না—না, তা হ্যাঁ এমন কোনো কিছু খেলনা যা তার নেই এবং দাম বেশী বলে হয়ত আপনাকে অর্ডার দিতে পারেন নি ওঁরা—এই যেমন ধরুন 'ট্রাইসাইকেল' বা 'বেবী মোটর"—

"খোকা চড়ে চড়ে পুরানো করে পাড়ার অন্য ছেলেদের দিয়ে দিয়েছে—"

"বটে—বটে। ও। তা হ্যাঁ শ্রীমান গেলেন কোথা শুনলুম আপনার দোকানে—"

"হ্যাঁ এখানেই ছিল, একটু আগে স্কুলের মাঠে খেলতে গেছে—"

"সেটা আবার কোন্‌খানটা বরাবর"—

"চলুন আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি—" [ক্রমশঃ
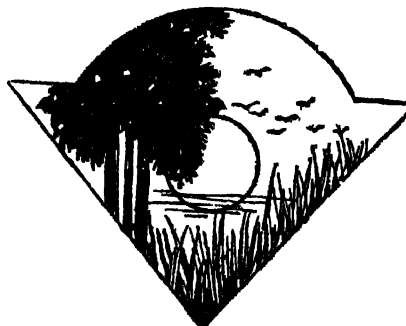
জরাসন্ধের দেশে

শ্রীবিমলাচরণ দাস, বি, এ,

পূজার ছুটির পূর্বে বিহার অঞ্চলের কয়েকটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। বর্তমান পাটনা এবং গয়া এই দুইটি শহরই ছিল প্রাচীন মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের এই অভিযানের পরিচালক ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস সঙ্ঘ।

গয়াধাম বলিলেই হিন্দুর একটি অদ্বিতীয় তীর্থক্ষেত্রই বুঝায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝায়—পাণ্ডাঠাকুরের দল আর তাঁদের আদর আপ্যায়ন। কিন্তু আমাদের ন্যায় পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েটের শান্তশিষ্ট ছাত্রদের নিকট তাঁহারা বড় একটা সুবিধা করিতে পারিলেন না। নিরুপদ্রবেই আমরা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অঙ্গনে আসিয়া উঠিলাম। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন এবং ধর্মের নামে যে সব উৎকট অনাচার তাহা অপনোদনও তাঁহাদের একটা ব্রত। যাহা হউক, এখানে যে দিনটি আমরা ছিলাম তাহা আমরা পরম তৃপ্তি ও আনন্দেই কাটাইয়াছিলাম। ভালো কথা, সেদিন এখানে একটি নূতন যাত্রীনিবাস খোলা হইল—উদ্বোধন করিলেন বিহারের ভূতপূর্ব অর্থসচিব শ্রীযুত অনুগ্রহনারায়ণ সিংহ।

ইতিহাসের ছাত্রের নিকট গয়া অপেক্ষা বোধগয়াই শ্রেষ্ঠতর তীর্থ। কয়েক মাইল দূরে এই বোধগয়া—দ্বিপ্রহরে দুইটি বাসে করিয়া সেখানে গেলাম। ভারতের বৌদ্ধযুগের ইতিহাসে বোধগয়া একটি পীঠস্থান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বুদ্ধদেব এখানে 'সম্যক্ সমাধি' লাভ করেন—এই বোধিদ্রুমমূলে। বোধিদ্রুমের প্রতি সমাদর বৌদ্ধ ইতিহাসে যথেষ্ট হইলেও, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আদর কিন্তু সকল যুগেই আছে সকলেরই কাছে। তবে বনস্পতির পূজা, বুঝিবা ইহা ভারতীয় বৈশিষ্ট্য, এবং বৌদ্ধ যুগেই প্রথম ইহা প্রচলিত হয় নাই (Budhist India, p. 231) Macdonell সাহেবের Vedic Mythology, p 154 পাঠ করিলে দেখা যায় যে বেদেও আমরা এমন কয়েকটি দৃষ্টান্ত পাই যেখানে বৃক্ষকে দেবতাজ্ঞানে সম্মান দেওয়া হইয়াছে। বোধিদ্রুম বলিয়া যে গাছটিকে দেখান হইল তাহা একটি প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছ। তবে উনিই সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বৃক্ষটি কি-না সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র। গাছটির মূলেই প্রস্তরখণ্ডে অঙ্কিত দুইটি বৃহৎ পদচিহ্ন। মন্দিরগাত্রের চতুর্দিকে বিভিন্ন বুদ্ধমূর্তি ও অন্যান্য মূর্তি। মন্দিরের অংশবিশেষ ভূগর্ভ হইতে কানিংহাম্ সাহেব উদ্ধার করিয়াছিলেন। চারিদিকে চারিটী বড় গম্বুজ ও ঠিক মাঝখানটিতে একটি অপেক্ষাকৃত বড় গম্বুজ (dome)। মন্দিরের মধ্যে ব্রহ্মদেশীয় বুদ্ধমূর্তিও দেখা গেল। মন্দিরের ভিতরে প্রদীপের অস্পষ্ট আলোক মূর্তিটির সারা অঙ্গে যেন ধ্যানের রূপ দিয়াছে। ইহার চারিপার্শ্বের প্রাচীন বেষ্টনী স্বর্গীয় প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দীর বলিয়া অনুমিত হয় (১৪১) আর Bloch সাহেবের মতে বোধগয়ার প্রস্তরনির্মিত প্রাচীর বেষ্টনে উল্লিখিত আর্য্যা কুরঙ্গীর স্বামী রাজা ইন্দ্রাগ্নি মিত্রের সহিত বোধগয়া মন্দির পত্তনের ইতিহাস ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট (Pol. Hist, 327 : Barua. Gaya and Bodh-Gaya) আমাদের সহযাত্রী অধ্যাপক শ্রীসরসী লাল সরস্বতী, এম,এ মহাশয় বিভিন্ন সময়ের নির্মিত স্তূপগুলি দেখাইলেন। রাস্তার অপরদিকে শীলমোহর প্রভৃতি প্রাপ্ত প্রাচীন দ্রব্যাদি একটি প্রকোষ্ঠ মধ্যে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গাড়ীতে উঠিয়া মনটা যেন কেমন ভারী হইয়া উঠিল—ভাবিলাম জগতে ইহাই ত সরল ও সত্য কথা। এমন একদিন ছিল যখন 'মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেন তিষ্ঠতি' জ্ঞানে মানুষ রাজসম্মান দিতে কুণ্ঠা বোধ করিত না কিন্তু

সেই মানুষই যখন শাক্যসিংহের সংস্পর্শে আসিল তখন বলিয়া ফেলিল—'এ কেথতী ভংক্তে ভগবতা বুধেন ভাষিতে সবে সুভাষিতে।' আজ সে কথা স্মরণ করিয়া আড়াই হাজার বছর পূর্ব্বে এই অসাধারণ মানুষটির নৈরঞ্জনাতীরের পুণ্য সাধনক্ষেত্র দর্শনে আমার চিত্তে আলোড়ন উঠা ত অসম্ভব নহে।

অক্ষয়বটের কাছেই যে পর্বতটি আছে সেটির নাম ব্রহ্মযোনি। আমরা তাহার উপর উঠিয়াছিলাম—মুক্তি-কামীর মুক্তিপথে যে বহুবিধ অন্তরায় তাহা ইহার শীর্ষদেশে অবস্থিত মন্দিরে উঠিবার সময় হাতে হাতে বুঝিয়াছিলাম।

আবার রেলগাড়ী। পাটনা জংশন। পাটনায় পৌঁছিয়া আমরা দেখিতে গেলাম প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীরাধাকৃষ্ণ জালানের 'জালান্-বাগ।' পাশ দিয়া প্রবাহমানা খরস্রোতা ভাগীরথী। শুনিলাম নবাব মীরকাশিমের স্মৃতি এই স্থানটির প্রতি ধূলিকণায়। ফিরিবার পথে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হাউস এবং বিজ্ঞান কলেজ চোখে পড়িল। পাটনায় খুদাবক্স লাইব্রেরী হস্তলিখিত পার্শী পুঁথি সংরক্ষণের জন্য বিখ্যাত। এখানকার যাদুঘরের সংগ্রহও সামান্য নহে। সোমবার সাধারণতঃ 'মহিলা-দিবস' থাকে, তাহা সত্ত্বেও বিশেষ অনুমতি লইয়া ইহা দেখিবার আমাদের সুযোগ ঘটিল। মনে হইল, এই পুরাতন প্রস্তরের এক একটি অংশ পণ্ডিতজনকে কত কথাই না বলে। শ্রীযুত ঘোষ কয়েকটি চীনা সিল্কের কাপড়ের উপর শিল্পের নমুনা দেখাইলেন। রাস্তাগুলি বেশ, যেমন চওড়া তেমনি সোজা।

অতঃপর আমরা জরাসন্ধের রাজধানীতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। রাজগীর যাইতে হয় বখ্তিয়ারপুরে গাড়ী বদল করিয়া ছোট গাড়ীতে। রাজগীর—রাজগৃহ, মগধের পুরাতন রাজধানী। এই স্থানটি জরাসন্ধ ও বিম্বিসারের কথা মনে আনিয়া দেয়। ইহার পূর্ব নাম গিরিব্রজ বা বার্হদ্রথপুর। তখনকার দিনে এখানকার রাস্তা ছিল দুর্গম। পাঁচটি পর্বতমালায় ইহা সুদৃঢ়ভাবে সংরক্ষিত—বৈহার, বরাহ, বৃষভ, ঋষিগিরি ও চৈতক। বায়ুপুরাণে নিম্নলিখিত উল্লেখ পাওয়া যায়—

• কিকতেষু গয়া পুণ্যা পুণ্যাম্ রাজগৃহম্ বনম্
চ্যাবনস্যাশ্রমম্ পুণ্যম্ নদী পুণ্যা পুনঃপুনা।

বায়ু, ১০৮, ৭৩

বখ্তিয়ারপুর হইতে রাজগীরের পথে 'পুন্-পুন্' পার হইলাম এবং নালন্দা পশ্চাতে রাখিয়া রাজগীরের দুরতিক্রম্য পর্বতমালা নয়নগোচর হইল। রাজগৃহ যে একদা বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল উহার বর্তমান ভগ্নাবশেষ তাহার বেশ প্রমাণ দেয়। ওখানকার জনশ্রুতি—প্রতি বর্ষায় পর্বতগাত্র হইতে নানারূপ প্রাচীন মুদ্রা ও ব্যবহার্য্য প্রসাধন সামগ্রী জলস্রোতে অধিবাসীদের হস্তগত হয়। এখানকার উষ্ণপ্রস্রবণ বিখ্যাত, পাহাড়ের গাত্র হইতে নিঃসৃত বারিরাশি জৈন প্রধান মন্দিরের মধ্যস্থিত কুণ্ডের ভিতর সপ্তধারায় ঝরিয়া পড়িতেছে। সপ্তধারা ধর্মপ্রাণ যাত্রীর এক তীর্থ। এই জৈন মন্দিরের কিঞ্চিৎ উপরিভাগে পর্বতোপরি সরকারি সংরক্ষণ বিভাগ কর্তৃক রক্ষিত 'জরাসন্ধ কা বৈঠক' চোখে পড়িল। এইস্থানে যে এককালে দুর্লঙ্ঘ্য দুর্গ (frontier fort) ছিল তাহা অনুমান করা কঠিন নহে এবং উহাই যে জরাসন্ধের দুর্গ তাহা মহাভারতবিশ্বাসী লোকের সঠিক করিয়া মনে করাই স্বাভাবিক। ইহার গাঁথুনীই ইহার বৈশিষ্ট্য। সাধারণ পাথরের উপর মসৃণ পাথর সাজাইয়া ইহা নির্মিত। উপরটি পিচ দিয়া বর্তমানে সংস্কৃত হইয়াছে। এস্থানে আসিবার পূর্বে মন্দিরের প্রবেশপথে 'Non-Hindus are not allowed' এই নোটিশ চোখে পড়িল। বিস্ময়ের কথা এই যে, জরাসন্ধের বৈঠকের উপর কয়েকটি কবর বিরাজমান। ইহার প্রথম প্রতিষ্ঠাতা বসু হইলেও মহারাজ জরাসন্ধই মহাভারত ও প্রাচীন কাহিনীর মধ্য দিয়া আমাদের নিকট জীবন্ত রহিয়াছেন।

প্রাচীন বেষ্টনীটীও পাথরের প্রস্তুত। রাখালবাবু বলেন ইহার ভগ্নাবশেষ গ্রীসের অন্তঃপাতী MYCENÆ এবং Tirynsএর সাইক্লোপীয়ান (Cyclopean Wall) প্রাচীরের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। "সপ্তপর্নী গুহা"য় বুদ্ধের দেহান্তর ঘটিলে এইখানে বৌদ্ধদিগের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল, বুদ্ধের বাণী প্রচার ও বৌদ্ধদিগের পরবর্ত্তী কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ। সাধারণের নিকট ইহা "শোনভাণ্ডার" অর্থাৎ গুপ্তধনের গুহা বলিয়া পরিচিত। ইহার মধ্যে একটা প্রশস্ত হলঘর। বাহিরের কিয়দংশে অবলোকিতেশ্বর প্রভৃতি মূর্তি। কিয়দ্দূরে নাগ মণিভদ্রের মন্দির—সাধারণ ভাবে উহা 'মণিহার মঠ' নামে পরিচিত। Symbol বা Totem বা Nature worshipএর কথা সকল দেশের পুরাকালের ইতিহাসে পাওয়া যায়। তাই মনে হয় নাগপ্রাধান্যের দেশে নাগ অথবা মনসাপূজার প্রচলন এবং বসন্তের প্রাদুর্ভাবে শীতলাদেবীর পূজা অস্বাভাবিক নহে। এই মন্দিরটী সংস্কৃত হইয়াছে বহুবার এবং সর্বশেষ সংস্কৃত হয় খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে। মন্দির মধ্যে বর্তমানে বিশেষ কিছুই নাই, কেবল মন্দিরগাত্রের নাগমূর্তিগুলি এখনও সুস্পষ্ট দেখা যায়। এই স্থানে শিখদিগের একটী 'সঙ্গৎ' (মেলা ?) আছে. শুনিলাম প্রতি দীপান্বিতায় ধর্মপ্রাণ শিখগণ এ স্থানে সমবেত হইয়া বিরাট উৎসবের অনুষ্ঠান করেন।

রাজগীর হইতে ফিরিবার পথে নালন্দা ষ্টেশনে নামিলাম

কিছুদিন পূর্বেও এই স্থান বরগাঁও নামে পরিচিত ছিল। ষ্টেশন হইতে নালন্দার এই অঞ্চলটী প্রায় দেড় মাইল। এই স্থানটী জনশূন্য না হইলেও বাসিন্দার তদ্রূপ সংখ্যাধিক্য নাই এবং ধর্মশালার মধ্যে একটী কেবল চৈনিক শ্রমণদিগের নিমিত্ত নির্দিষ্ট দেখিলাম। নালন্দার যাদুঘরের ভারপ্রাপ্ত মিঃ রায় আমাদিগকে যত্নসহকারে সকলই দেখাইলেন। স্থাপত্যশিল্পের সৌকুমার্য বাস্তবিকই আমাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। গুপ্তযুগে বালাদিত্য ও বজ্র এই স্থানের উন্নয়নকালে চৈত্য ও সঙ্ঘারাম নির্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায় (EHI, 3rd Ed., 333) ইহা ব্যতীত শক্রাদিত্য, বুদ্ধগুপ্ত, তথাগতগুপ্ত, ও মধ্যভারতের অপর একজন রাজার উল্লেখ হিউয়েন্ সাঙ্-এর বিবরণে দৃষ্ট হয়। (Watters on Yuan Chwang's Travels vol II, p. 164-5.) এই প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজকের বিবরণ হইতে আমরা নালন্দা সম্বন্ধে অনেক কথাই জানিতে পারি। "রাজগৃহ হইতে ইউয়ান চোয়াং (Yuan Chwang) নালন্দায় গমন করেন এবং সেই স্থানে দুই বৎসর কাল বাস করিয়া বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তখন নালন্দার সঙ্ঘারামসমূহে সহস্র সহস্র ভিক্ষু বাস করিতেন। নানা দেশ হইতে বিদেশীয় ছাত্রগণ নালন্দায় আসিত। ইউয়ান চোয়াঙের অবস্থিতিকালে সমতটদেশের রাজপুত্র মহামতি শীলভদ্র নালন্দা মহাবিহারের মহাস্থবির ছিলেন। (নালন্দাবাসী মহাপণ্ডিত) স্থিরমতি প্রণীত 'মহাযানাবতারকশাস্ত্র' নামক গ্রন্থ খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর শেষভাগে চীনভাষায় অনূদিত হইয়াছিল এবং তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ 'মহাযানধর্মধাতুবিশেষতাশাস্ত্র' ৬৯১ খ্রীষ্টাব্দে চীনভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল।" (বাংলার ইতিহাস, ১ম ভাগ, ১১৫ পৃঃ) নালন্দার ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি ভারতের সেই গৌরবময় যুগের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এখানকার আলোকচিত্র গ্রহণ নিষিদ্ধ বলিয়া অনেকে কার্ডের ফটো ক্রয় করিলেন—ইত্যবসরে তৃষ্ণার্ত আমরা কয়েকজন নালন্দার প্রাচীন একটি ব্যবহার্য কূয়ার জল পান করিলাম। এখানকার গাঁথুনি কিন্তু একই সময়ের নহে, বিভিন্ন সময়ের তাহা ইট ও নির্মাণ প্রণালী লক্ষ্য করিলেই বেশ বুঝা যায়। কয়েকটী স্থানে গাঁথা কয়েকটি লম্বা গর্ত দেখিলাম—বোধ হয় সেই কক্ষগুলি রসায়নাগার অথবা রঞ্জনাগার (Dyeing house) হিসাবে তৎকালে ব্যবহৃত হইত।

ফিরিবার পথে বিহার বখ্তিয়ারপুর লাইট রেলওয়ের Traffic Inspector Mr S. Banerjee-র সহিত আলাপ হইল। ভদ্রলোক বেশ মিষ্টভাষী ও অমায়িক। বাংলার বাহিরে বাঙালীর এই আদর আমাদের জীবনের এক অভিনব অভিজ্ঞতা।

বক্তিয়ারপুরে রাত্রে বড় গাড়ীতে চড়িলাম। গৃহে ফিরিতেছি, সম্মুখে দীর্ঘ পূজাবকাশ—কিন্তু আনন্দ কই? মনটা কেমন ভারী হইয়া আসিল। 'ইতিহাস সন্ধের' এই ভ্রমণ কেবল ধ্বংসস্তূপ ও পাষাণের সমষ্টি দেখিয়াই শেষ হইল।
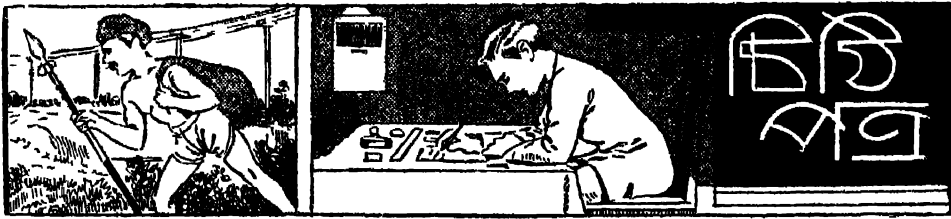
শ্রীমান অনুপম রায়, ঝাড়গ্রাম।

বিমান আক্রমণের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা প্রধানতঃ নির্ভর করে বিমানবাহিনীর শক্তির উপর, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতের নিজস্ব কোনো শক্তিশালী বিমানবাহিনী নেই। দ্বিতীয় উপায় মৃত্তিকাগর্ভে ৫০।৬০ ফুট নীচেয় অবস্থানের ব্যবস্থা, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এ দেশে সেরূপ ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব নয়, কারণ, না বলাই নিরাপদ। এখানে যে সব ব্যবস্থা হচ্ছে তা 'মধুর অভাবে গুড়ের ব্যবহার'। সুতরাং সে আলোচনায় লাভ নেই।

শ্রীমান বীরু ও বিশু, ফরিদপুর।

তোমাদের মতের সঙ্গে আমার মতের সম্পূর্ণ মিল আছে। সত্যই গতবারে কয়েকজন নির্বোধের মত এমন প্রশ্ন করেছেন যার উত্তর দিতে হলে সমস্ত পাঠশালাখানাই ভরে যাবে। সুতরাং সেরূপ প্রশ্ন আর ছাপা হবে না।

শ্রীমান মনোজ দত্ত, চট্টগ্রাম।

তুমি ঠিকই বলেছ, গত কয়েকবার কতকগুলি প্রশ্ন এমন এসেছে যার উত্তর দিতে যাওয়ার মানে মূল্যবান সময়ের অপব্যবহার করা। পাঠশালায় ওরূপ প্রশ্ন আর স্থান পাবে না।

শ্রীমান ধ্রুবরঞ্জন সরকার, হাওড়া।

তোমার প্রতিবাদটি মূল্যবান। 'বেঙ্গল গেজেট' বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সাময়িক পত্র হ'তে পারে কিন্তু মাসিক পত্র নয়। প্রথম মাসিক পত্র বলতে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত জন্‌ক্লার্ক মার্শম্যানের 'দিগ্দর্শন'ই বোঝায়। এ বিষয়ে শ্রীমান সুধানাথ রায়চৌধুরী একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়েছেন। আগামী মাসের পাঠশালায় সেটি প্রকাশিত হবে। তোমার পরামর্শগুলি খুব সঙ্গত। আমরা তা সাদরে গ্রহণ করলাম। ছায়ফুল হককে জানানো হবে যে প্রতিযোগিতার সমস্ত প্রবন্ধই পাঠশালার ঠিকানায় পাঠাতে হবে এবং সময় বাড়িয়ে দেওয়া দরকার। সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক প্রশ্নের নির্ভুল উত্তরদাতাকে 'Champion' ঘোষণা করার প্রস্তাবটিও ভাল, কিন্তু তিনমাস অন্তর নয়, বছরের শেষে হবে। 'বালক-সঙ্ঘ'র পরিবর্তে 'কিশোর-সঙ্ঘ' নামটি অধিকতর উপযোগী। এ সম্বন্ধে অধিকাংশের মতামত জানতে পারলেই এর একটা ব্যবস্থা করা হবে। 'শান্তি-নিকেতনে' দল বেঁধে বেড়িয়ে আসা মন্দ নয়, কিন্তু একটা কথা মনে রাখা দরকার যে সর্ব্বত্র মফঃস্বলের অসংখ্য গ্রাহক গ্রাহিকা এ আনন্দলাভে বঞ্চিত হবে, সুতরাং পাঠশালার পক্ষ থেকে এ ব্যবস্থা করলে সেটা স্থানীয় গ্রাহক গ্রাহিকাদের প্রতি পক্ষপাতমূলক হয়ে দাঁড়াবে যে।

শ্রীমান সমীর চৌধুরী, কটক।

আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮,৬০০০ মাইল হবে, ফিট নয়, তোমার এই ভ্রম সংশোধনের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 'প্রশ্নোত্তর' ১০ই তারিখের পরে এসে আর প্রকাশ করা সম্ভব হয় না, কারণ, পাঠশালা ঠিক নিয়মিত মাসের পয়লা তারিখেই বার করতে হয় যে। তোমার রচনাটি পড়ে পরে মতামত জানাব। পাঠশালায় ফাল্গুনে যে রচনা প্রতিযোগিতা দেওয়া হয়েছিল তাতে মাত্র দু' একজন যোগ দিতে পেরেছে, ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য সকলেই পড়াশুনায় ব্যস্ত বলে প্রবন্ধ লিখে পাঠাতে পারেনি, সময় চেয়েছে। এবার প্রশ্নোত্তরও অনেকে পাঠাতে পারেনি এই ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য। অনেকেই সময় বাড়িয়ে দেবার জন্য আমাদের পত্র লিখে জানিয়েছে। আমরা এই প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা ও প্রশ্নোত্তরের সময় আরও বাড়িয়ে দিলাম। বৈশাখে আর প্রশ্নোত্তর না ছেপে একেবারে জ্যৈষ্ঠে ছাপা হবে। ফাল্গুনের ঘোষিত রচনা প্রতিযোগিতার প্রবন্ধও ১৫ই বৈশাখ পর্যন্ত নেওয়া হবে। পাঠশালায় 'জীবনী' প্রায়ই থাকে, তবে গল্পের মত নয়, জীবন কাহিনীর মতই, কারণ 'পাঠশালা' 'আনন্দ মেলা'র মত শিশুদের জন্য নয়, এখানি বয়ঃপ্রাপ্ত উচ্চ শ্রেণীর কিশোর ছাত্র ছাত্রীদের পত্রিকা। ফটো প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে গত আশ্বিনের পাঠশালা দেখ। যে সব লেখক পাঠশালায় লেখেন না তাঁদের রচনা পাঠশালায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

শ্রীমান অসীম বাহা, বালিগঞ্জ।

'টাকার রহস্য' পাঠশালার তৃতীয় বর্ষ (মাঘ, ১৩৪৬) থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। তোমার নামে 'আকার' যোগ হওয়ায় আমরা বিশেষ দুঃখিত, কারণ এরূপ ভুলে আকার পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় নয়। তোমার রচনাগুলি পাঠিও, প্রকাশযোগ্য হলে পাঠশালায় অবশ্যই ছাপা হবে।

শ্রীমান শক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডিব্রুগড়।

'বালক সঙ্ঘ' সম্বন্ধে শ্রীমান ধ্রুবরঞ্জনকে যা লিখিছি তোমাকেও তাই বলছি। পাঠশালা তোমাদের ভাল লাগছে এবং পাঠশালা পড়ে তোমরা আনন্দ পাচ্ছ এ জেনে সুখী হলুম।

শ্রীমান রঞ্জিতকুমার রায়, কলিকাতা।

'রায়' যদি 'সেন' হয়—সেটা কভু ভাল নয়,
বাগ তাতে হয়ই জমা—তবু বলি কর ক্ষমা।
ঠিকানাত ঠিক আছে—চিঠি দেখো যাবে কাছে,
'ভোটে' নাম ভণ্ডুল—এটা ভয়ানক ভুল।
করেছ শিকার বাঘ—লিখো সেটা ভুলে বাগ।

কুমারী উমা বাগচী, রায়পুর, সি, পি,

প্রশ্নোত্তর সুরু হবার পর প্রথম দু'চার মাস সব প্রশ্নই ছেপে দেখান হ'ল যে তোমরা কি রকম প্রশ্ন পাঠাও। নইলে "আমার প্রশ্ন ছাপা হ'লনা কেন" বলে তোমরাই বেচারা সম্পাদককে চোখ রাঙাতে। এইবার তোমরাও যখন বুঝতে পেরেছ যে সব প্রশ্ন ছাপাবার যোগ্য নয় এবং বাজে প্রশ্ন ছাপা উচিত নয়, তখন ভবিষ্যতে সমস্ত অযোগ্য প্রশ্নই নির্ভয়ে বাতিল করা যাবে।

শ্রীমান সমীরকুমার ঘোষাল, কলিকাতা।

তোমার প্রশ্নটি অবাস্তব। নিজেই যখন লিখছ 'গুজব' শুনেছ—তখন আবার সত্য-মিথ্যা নির্ণয়ের প্রয়োজন থাকে কোথা? সংবাদ সত্য কি মিথ্যা এ নিয়ে আলোচনা চলে:—যেমন ধরো—যুদ্ধের সংবাদ, কিন্তু 'গুজব' যা গুজবই।

শ্রীমান বিকাশ রায়, লক্ষ্ণৌ।

তোমার প্রেরিত রচনা "ভুটিয়াদের সঙ্গে কয়েকদিন" পাঠশালায় প্রকাশের জন্য মনোনীত হয়েছে। 'সামরিক জীবন' সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ লিখে পাঠালে সাদরে মুদ্রিত হবে।

শ্রীমান উদয়ভানু সিংহ, কলিকাতা।

তোমার প্রস্তাবটি ভাল, কিন্তু মফঃস্বলের পুরস্কার-প্রাপ্ত গ্রাহক-গ্রাহিকারা কলিকাতায় অনুষ্ঠিত পাঠশালার পুরস্কার

উৎসবে এসে যোগ দিতে পারবে না যে! সেটার বিষয় কি করা যাবে ভেবে দেখা উচিত নয় কি?

কুমারী সলিলা মুখার্জি, কলিকাতা।

সম্পাদক মহাশয়কে 'সম্পাদক মহাশয়' না বলে তুমি এমন কিছু বলতে চাও যাতে তাঁর সঙ্গে তোমাদের একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আমি তোমার এ প্রস্তাবে খুশী হয়েছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকাল এত বেশী ছেলেমেয়েদের কাগজ হয়েছে এবং সম্পাদকরা গ্রাহকদের সঙ্গে এত রকম মধুর সম্বন্ধ পাতিয়েছেন যে ওটা এখন একটা উপ-হাসের ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে; সুতরাং পাঠশালার সম্পাদক আর সে দলে ঢুকতে রাজি নয়। 'বালকসঙ্ঘ' বা "কিশোরসঙ্ঘ" সম্বন্ধে অন্যের চিঠির উত্তরে জানতে পারবে। যিনি 'ছদ্মনামে' লেখেন তার নাম জানবার চেষ্টা করা অন্যায় কৌতূহল, এ কথা যে তুমি শ্রীমান সাধনানন্দকে বলতে চেয়েছ এতে তোমার শুভবুদ্ধি ও সুবিবেচনাই প্রকাশ পেয়েছে।

শ্রীমান মণীন্দ্রমোহন মজুমদার, পুরুলিয়া।

'প্রশ্নোত্তর' সম্বন্ধে বৈশাখ থেকে কঠিন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে।

শ্রীমান মধু ঘোষাল, মুগকল্যাণ।

কুমারী উমা বাগচীকে লেখা উত্তরটি দেখ। যারা 'প্রশ্ন' করতেও জানে না এবং 'প্রশ্ন'ও যারা অন্য কাগজ থেকে 'চুরি' করে পাঠায় তাদের ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই অন্ধকার। তোমাকেও আমাদের নববর্ষের প্রীতি সম্ভাষণ জানাচ্ছি।

শ্রীমান নবনীকুমার চৌধুরী, লঙ্গাই।

কটকের শ্রীমান সমীর চৌধুরীকে লেখা উত্তরটি দেখ। চিঠি-পত্র পৃথক লেখাই উচিত। কিন্তু এক খামের মধ্যে দেওয়া চলবে। বিভিন্ন বিভাগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কাগজে চিঠি দেওয়ার দরকার, কারণ একজন সব দেখতে পারেন না। স্বর্গীয় রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর "বঙ্গভাষা সাহিত্য" নামে প্রসিদ্ধ পুস্তকে লিখেছেন 'রামমণিও' একাধিক পদাবলী রচনা করেছিলেন সুতরাং তাঁকে চন্দ্রাবতীর পূর্ববর্তী মহিলা কবি বলা যেতে পারে। কারণ চণ্ডীদাসের সময় চতুর্দশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে ধরা হয়। তোমার পত্রখানি কুমারী নীলিমা দেবীকে পাঠান হয়েছে। 'স্বর্ণমণি' ও 'সোনামণি' মনে হয় একই। এ বিষয়ে তুমি শচীশবাবুকে পত্র লেখ। পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট মায়ের বয়স ৫ বা ৬ যাই হোক দুটোই আজগুবী বলে মনে হয়।

কুমারী নীহার বসু, কণেশ্বর।

তোমার প্রস্তাব অনুসারে 'পাঠশালায়' এই শুভ নব-বর্ষের প্রথম বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ থেকে 'কন্যামহল' সুরু করা হবে। মেয়েদের সিনিয়ার-জুনিয়ার ট্রেণিং সম্বন্ধে তোমার প্রশ্নটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদের কাছে পাঠিয়ে দাও।

শ্রীমান সাধনানন্দ মিশ্র, মুগবেড়িয়া।

'শব্দ-সন্ধানে'র মুদ্রিত কুপনের সঙ্গে যতগুলি ইচ্ছা সাদাকাগজে কুপন হাতে লিখে পাঠানো চলবে। কিন্তু একখানি মুদ্রিত 'কুপন' সঙ্গে না থাকলে হাতেলেখা কুপন গ্রাহ্য হয় না। ১৩৪৭ সালের অগ্রহায়ণের পাঠশালা পেতে হলে তোমাকে ।/• পাঁচ আনার ডাক টিকিট পাঠাতে হবে।

শ্রীমান অনিলবরণ মহান্তি, যাদবপুর।

শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট তেজস্বিনী 'নারীচরিত্রগুলি' সবই প্রায় একরকম ধরণের। মাত্র দু'চারজনের মধ্যে একটু বৈচিত্র্য দেখা যায়, তাছাড়া সুস্থ ও বলিষ্ঠ পুরুষ চরিত্রের সংখ্যা তাঁর রচনায় নিতান্ত অল্প। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর নানা গ্রন্থে অসংখ্য বিভিন্ন নারী ও পুরুষ চরিত্র সৃষ্টি করে গেছেন যাঁদের কারুর সঙ্গে অপরের কোনো সাদৃশ্য নেই। বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের সমস্ত রচনাবলী নিরপেক্ষ সমা-লোচকের দৃষ্টি নিয়ে মনযোগের সঙ্গে পড়লে এ পার্থক্য সহজেই বুঝতে পারবে। পরাধীন ভারতবর্ষে প্রকৃত রাজনৈতিক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি একজনও নেই, সুতরাং তোমার প্রশ্নটি অবাস্তব।

শ্রীমান সুবোধ বাহা, শ্রীপুর।

তোমার পত্র পড়ে ঈশপের সেই গল্পটি মনে পড়ে গেল যার মর্ম্মকথা হচ্ছে:—"One cannot please everybody!" পাঠশালার অধিকাংশ গ্রাহক গ্রাহিকাদের ইচ্ছায় ও অনুরোধে গল্প ও প্রবন্ধের সংখ্যা কমিয়ে শিক্ষা-মূলক চিত্তরঞ্জনের দিকটা বাড়ানো হয়েছে। তোমার এ দিকটা একেবারেই ভাল লাগে না জেনে বিস্মিত হলুম। তবে হ্যাঁ বাজে প্রশ্ন সম্বন্ধে তুমি যা লিখেছ সে কথা খুব ঠিক। প্রশ্নগুলিকে সংযত ও সঙ্গত করার ব্যবস্থা এ মাস থেকে হয়েছে। ঠিক এই কারণেই তোমার প্রশ্নটি ছাপা হল না। কারণ শ্রীকৃষ্ণকে ঐতিহাসিকেরা ভগবানের অবতার বলে স্বীকার করেন না। ওটা ভক্তদের কল্পনা। তিনি একজন রাজনীতিজ্ঞ প্রতিভাবান মহাপুরুষ ছিলেন মাত্র।

শ্রীমান হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়, ঢাকা।

'শব্দ-সন্ধানের' কুপনের সঙ্গে 'ভোট'ও ১৫ই তারিখে পাঠালে চলবে। পাঠশালায় কোথাও কিছু লেখা নাই এমন যে 'ভোট' ১০ই তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে। পাঠশালার 'শব্দ-সন্ধান' খুবই সহজ করে দেওয়া হয়।

জয়ন্তী ও রাহুল সেন, মেদিনীপুর।

তিনটি বছর নামের ভুল,—এদ্দিনে তা করলে কবুল?
এবার হবেই সংশোধন—আনন্দে থাক যুগল মন!

শ্রীমান প্রিয়তোষ গাঙ্গুলী, বরাহনগর।

কুমারী উমা বাগচীকে লেখা উত্তরটি দেখ।

শ্রীমান ইন্দুমাধব বিশ্বাস, নদীয়া।

রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী বাংলার কবিদের সম্বন্ধে তুমি যা লিখেছ তার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। বাস্তবিকই রবীন্দ্রনাথের পর আমাদের বাংলা কাব্য সাহিত্যে গর্ব করবার মত কবি এঁরা সকলেই।

কুমারী নীলিমা দাশ, আকোলা, সি, পি।

কুমারী উমা বাগচীকে লেখা উত্তরটি দেখ। ঠিক এই কারণে তোমার প্রশ্নটি পাঠশালায় প্রশ্নোত্তর বিভাগে ছাপা হল না।

শ্রীমান দেবেন্দ্রনাথ দাশ, জামসেদপুর।

তোমার অভিযোগ বর্ণে বর্ণে সত্য। 'গুপ্ত চিঠির' "বিরাশী" শব্দটি আমাদের 'প্রুফরীডার' মহাশয় লেখকের বানান ভুল মনে করে সংশোধন করে দিয়েছিলেন, কিন্তু পড়ে দেখেন নি যে ওটি ওখানে 'ইচ্ছাকৃত' ভুল। ফলে সঙ্কেত অনুসারে চিঠিখানি পড়া যে মুস্কিল হয়ে দাঁড়িয়েছে এ কথা স্বীকার করতেই হবে। এস্থলে তাঁর নাকে একটি 'বিরাশী-সিক্কা' ওজনের ঘুসি মারা ছাড়া উপায় নেই।

শ্রীমান গৌরাঙ্গ রুদ্র, চট্টগ্রাম।

তোমার প্রেরিত রচনাগুলি পড়ে পরে মতামত জানান হবে।

কুমারী রেবা ভদ্র, ঢাকা।

ঢাকার অধিবাসীরা যে কি রকম বিপন্ন হয়ে রয়েছেন সংবাদপত্রে প্রতিদিন তা দেখছি, এর মধ্যেও যে তুমি পাঠশালার কথা মনে রেখেছ এতে বোঝা যাচ্ছে তুমি সাহসী মেয়ে। প্রশ্নের উত্তর অনেকেই পাঠাতে পারে নি ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য, সময় চেয়েছে তারা। সুতরাং চৈত্রের প্রশ্নের উত্তর পাঠাবার সময় ১০ই বৈশাখ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীমান তারাপদ চক্রবর্তী, ফেণী।

সত্য কথা রূঢ়ভাবে বলবার তোমার শক্তি আছে। এই মেরুদণ্ডহীন জাতির ছেলের পক্ষে এ একটা প্রশংসনীয় গুণ। কুমারী উমা বাগচীকে লেখা উত্তরটি পড়লে তোমার ক্রোধের উপশম হতে পারে একটু। তোমার রচনাগুলি পাঠাও। প্রকাশযোগ্য হলে পাঠশালায় সাদরে ছাপা হবে।

শ্রীমান অরবিন্দ বিশ্বাস, চট্টগ্রাম।

'ফিট' হয়ে গেছে না-হয়ে' মাইল',—বেড়ে চলে দেখি ভুলেরই ফাইল।

শ্রীমান কমলকুমার গুহ, এলাহাবাদ।

'পাঠশালা' তোমাদের খুব ভাল লাগছে জেনে খুশী হয়েছি।

শ্রীমান সাধনানন্দ মিশ্র, মুগবেড়িয়া।

প্রত্যেক বিভাগের পত্র ও উত্তর পৃথক্ পৃথক্ কাগজে লিখে না পাঠালেই গোলমাল হয়। কারণ, বিভিন্ন লোকের উপর ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের ভার আছে। একজনে সব দেখতে পারেন না।

হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়, ঢাকা।

পাঠশালায় প্রতিমাসে একজনের মাত্র একটি প্রশ্ন নেওয়া হয়। তোমার চারটি প্রশ্ন ছাপা হতে পারে না।

পঙ্কজমোহন রায়, কোতুলপুর।

শ্রীমান ধ্রুবরঞ্জন সরকারকে লেখা উত্তরটি পড়ে দেখতে অনুরোধ করি।

সৌরভ সানাতনি, অমলনার।

অসীম বাহাকে লেখা উত্তরটি দেখ।

অশ্বিনীকুমার মণ্ডল, আহমদপুর।

প্রতিযোগিতায় কে শ্রেষ্ঠ হয়েছে পরীক্ষা হবে, তবে ষাণ্মাসিক নয়—একেবারে বার্ষিক। তুমিও আমাদের নববর্ষের প্রীতি সম্ভাষণ নাও।

আভাস দাসগুপ্ত, বেন্দা।

চৈত্রের প্রশ্নোত্তর পাঠাবার সময় তোমাদের জন্য ১০ই বৈশাখ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

বিশ্বনাথ সেনগুপ্ত, চট্টগ্রাম।

তোমার যুক্তি সুবিবেচনার পরিচায়ক। রচনা পাঠিও, প্রকাশযোগ্য হলে ছাপা হবে।

আবুল হোসেন মিয়া, রাজৈর।

ছোটদের জন্য ইংরাজী সাপ্তাহিক আছে কিনা এ আলোচনা পাঠশালায় পূর্বে হয়ে গেছে। উত্তরগুলি একই কাগজে লিখে পাঠালে গোলমাল হয়ে যায়। বিভিন্ন বিভাগের উত্তর ভিন্ন ভিন্ন কাগজে লিখে পাঠিও, গোল হবে না। প্রশ্নোত্তর ছাড়া আর সব ১৫ তারিখে পাঠানো চলবে। নাম ঠিকানা স্পষ্ট করে না লিখলেই ভুল হয়। এবার স্পষ্ট করে লিখেছ, সুতরাং ভুল হবার সম্ভাবনা কম। কেবলমাত্র চৈত্রের প্রশ্নোত্তরের সময় বাড়ান হল।

নীলিমা দেবী মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা।

তোমার "ডাকটিকিটের চিড়িয়াখানা" প্রবন্ধটি আসছে মাসে ছাপা হবে।

অনিলবরণ ঘোষ, দাবড়া।

তোমার প্রস্তাবটি জানালে সে সম্বন্ধে বিবেচনা করতে পারি। 'পত্রী-মৈত্রী' পাতিয়ে পাঠশালার গ্রাহক গ্রাহিকারা পরস্পরের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের সুযোগ পায়। তুমি সেই সুযোগ নিয়ে তোমার বন্ধু বান্ধবীদের ধন্যবাদ জানাও ও নিমন্ত্রণ কর।

কুমারী সাধনা বসু, বারুইপুর।

তোমার পুরস্কার ১১।৩।৪১ তারিখে বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের উপর ক্রস চেক পাঠানো হয়েছে, বাড়ীতে খোঁজ নাও।

ধীরেন্দ্রনাথ মহান্তি, দাঁতন।

পাঠশালা তোমার খুব ভাল লেগেছে জেনে খুশী হলুম। তুমি যে বইয়ের কথা জিজ্ঞাসা করেছ সে বই গুরুদাস চ্যাটার্জি এণ্ড সন্স্‌ ২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট এই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

তাপসরঞ্জন সরকার, মৈমনসিংহ।

'শব্দ-সন্ধানে' একই ঘরে দুটি অক্ষর বসালে সে কুপন 'শ-র' বাতিল করে দেন।

দেবপ্রসাদ ঘোষ, আলিপুর।

কলিকাতা কর্পোরেশনকে জানালে তাঁরা ইঁদুর মারার ব্যবস্থা করে দেন।

সনৎকুমার ভট্টাচার্য্য, আড়িয়াদহ।

তোমার "পাঠশালা" শীর্ষক কবিতাটির জন্য ধন্যবাদ। ওটি বার দুই পড়েছি কিন্তু ছাপা চলবে না বলে ছিঁড়ে ফেলেছি।

শ্রীযুক্ত অনিলবরণ ঘোষ।

প্রিয়বরেষু—

আমার গদ্য-কবিতা সম্বন্ধীয় প্রশ্নের তোমার অনুলিপি পড়লাম। একটু মতান্তর হচ্ছে আমার সঙ্গে—কিছু মনে ক'রো না যেন।

তুমি বলছো গদ্য-কবিতার ছন্দ নেই। কিন্তু ভাই ছন্দহীন হয়ে কিছু কি সুললিত শ্রুতিমধুর হ'তে পারে। গদ্য-কবিতারও ছন্দ আছে। তবে সেটা তার নিজস্ব তৈরী করা ছন্দ। সে চিরাচরিত ছন্দের আনুগত্য মেনে চলে না। কবিগুরুর কথা একটু তুলে দিচ্ছি :

"...তার বিশেষত্ব হচ্ছে ভাবের আনুগত্য স্বীকার করতে হয় ছন্দকে, ভাবের মধ্যে ছন্দের গতিবিধি, ভাব ভঙ্গী দেয় ছন্দকে। সত্যি কথা বলতে কি এই শ্রেণীর রচনায় যে ছন্দের পরিচয় পাই সেটা স্বাভাবিক কেননা তা ভাবের সম্পূর্ণ অনুবর্তী, একসঙ্গে চলে নিঃসঙ্কোচে, এর মধ্যে ভাসুর-ভাদ্দর বউর সম্বন্ধ নেই, কেউ কারো ভয়ে তটস্থ নয়। এই সাহিত্যের প্রকাশ ছন্দ নিজস্ব এবং এর ছন্দ ভাব অনুপন্থী।"

তোমাকে ভাই অনুরোধ করি—"গদ্য-কবিতার ছন্দ" এই প্রবন্ধটি পড়তে। বের হয়েছিল—'দেশ', ৮ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ১২ই মাঘ, ১৩৪৬। নাম ছিল 'রবীন্দ্র-দৈনিকী'।

প্রীতি-সম্ভাষণ গ্রহণ করো।

ইতি—মধু ঘোষাল

মুগকল্যাণ।

পত্রী-মৈত্রী

নিম্নলিখিত গ্রাহক গ্রাহিকারা পরস্পর পত্রালাপ করতে চান।

শ্রীমান গৌরাঙ্গ রুদ্র, Class X প্রবর্ত্তক বিদ্যাপীঠ, চট্টগ্রাম। শ্রীমান উদয়ভানু সিংহ, ৫২ নং রিডন রো, কলিকাতা। শ্রীমান সুনীলকুমার ব্যানার্জি, C/o Late J L Banerjee, রামপুরহাট, বীরভূম। কুমারী কল্যাণী রায় C/o শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ রায়, পোঃ তালন্দ, জেলা রাজসাহী। শ্রীমান অজয়কুমার ব্যানার্জি, ৫০।৬এ হরিশ মুখার্জি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। শ্রীমানতারাপদ চক্রবর্ত্তী, C/o শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, বি-এল, ফেনী, নোয়াখালি। শ্রীমান সাধনানন্দ মিশ্র, মুর্গাবেড়িয়া। ইনি মুগকল্যাণের শ্রীমান মধু ঘোষালের সঙ্গে পত্রালাপ করতে চান।

বৈশাখ—১৩৪৮

নিয়মাবলী—(১) ধাঁধাঁ-সম্পাদকের মতে শব্দসন্ধানের যেটি সবচেয়ে নির্দোষ ও নির্ভুল সমাধান,—তার সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে উত্তর মেলা চাই। নির্ভুল সমাধানটি পরের মাসের পাঠশালায় প্রকাশিত হবে। (২) সাদা ঘরগুলির প্রত্যেকটিতে একটি ক'রে সংযুক্ত বা অসংযুক্ত অক্ষর বসবে। (৩) প্রতি সংখ্যার প্রতিযোগিতা-কুপনখানি কেটে ভর্তি ক'রে পাঠাবে সেই মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে। দেরি হ'লেই বাতিল। খামের উপরে ঠিকানা লিখবে—'শব্দ-সন্ধান', পাঠশালা কার্যালয়, ৩০ কর্নওআলিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। (৪) হরফগুলি সব পরিষ্কার হওয়া চাই—কাটাকুটি চলবে না। বানান ভুল হলে ভুল ধরা হবে। (৫) যে কোন পাঠক পাঠিকা যতগুলি ইচ্ছা কুপন পাঠাতে পারবে। (৬) 'শব্দ-সন্ধান'-সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ব'লে মেনে নিতে হবে।

সঙ্কেতসূত্র

—পাশাপাশি—

১। বাংলায় বারো মাসের বিভেদ ত এরই জন্য।
৪। নিদর্শন।
৭। এ ঘরে সহজেই আগুন ধরে।
৮। বাঙালীর ছেলে সবচেয়ে—হীন বলেই আজ সে বাঁচবার অধিকার হারাতে বসেছে।
৯। বনের আড়াল খুঁজতে একটু ঘুরে ফিরেই যেতে হবে।
১২। পশুর দান হলেও সভ্যজগতে এর আদর আজও সর্বত্র।
১৩। এরকম চটা লোকের মেজাজত ভাল না হবারই কথা।
১৪। আমাদের প্রাণধারণের প্রধান উপকরণ।
১৬। পণ্ডিতের কাছে মূর্খের সংজ্ঞা এই।
১৮। এটা খুব কঠিন মনে হবে বটে কিন্তু সন্ধান পেলে দেখবে এ শুধু বাতাস।
২০। যে কোনো কৌশলের মূলে এ আছেই।
২১। এর দাম মোটে চার পয়সা।
২২। খুব ঘন চাপ দিলে পাবে।

২৩। খেতে সুস্বাদু।
২৪। দীপ।
২৬। এ মালা শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়ে দেয়।
৩০। কৌটো-বাটা।
৩১। 'হরিহর' রূপের মধ্যে এর সন্ধান পাবে
৩২। কত প্রাণীকেই না এ আশ্রয় দিচ্ছে।

—উপর থেকে নীচে—

১। অনেক ঝগড়ার মূলে শুধু এই।
২। এ অবস্থায় মানুষ অকর্মণ্য হয়ে পড়ে।
৩। জলবাসের উপযোগী নৌকা।
৫। বিমান আক্রমণের সময় এ সংগ্রহ করে রাখবার জন্য সরকারি ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে।
৬। পদ্মের ডাঁটা।
১০। এ জীবের অতি কঠিন বন্ধন।
১১। এ পথ দুর্গম।
১২। সংসারে এমন কাজ করে যাও যাতে মাথা—রেখে চলতে পারো।
১৪। এ রাতে সমস্ত পৃথিবীতে 'ব্ল্যাক আউট' হয়।
১৫। জীবনের নির্ভর।
১৭। ক্ষতান্তক প্রলেপ।
১৯। প্রকৃতিদত্ত সাবান।
২০। কালিদাসের কাব্য উপবনে এই তরুটির দেখা মেলে একটু বেশি।
২৫। এদেশে কাউকে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করবার জন্য এর প্রয়োজন সর্বাগ্রে।
২৭। এই পতিদেরই আজকাল দুর্গতি বেশি।
২৮। বিমান আক্রমণে এখন ওদেশের পথে ঘাটে এর সৃষ্টি হচ্ছে।
২৯। এখানে আঘাত হলে অঙ্গ অসাড় হয়ে যায়।

চৈত্রের শব্দ-সন্ধানের ফলাফল—১৩৪৭

এবারও শব্দ-সন্ধানের নির্ভুল উত্তর একটিও হ'ল না। শিলঙের শ্রীমান হরিকমল পুরকায়স্থ ঈষৎ অসতর্ক হওয়ার ফলে নির্ভুল উত্তরদাতার গৌরব অর্জন করতে পারেন নি। তিনি যদি 'পাইনা' বলে পাশ না কাটিয়ে 'চাইনা' বলে দম্ভ প্রকাশ করতেন তাহলে শ্রীমান্ পুরকায়স্থর উত্তর পুরোপুরিই নির্ভুল হত। শতকরা নব্বইজন প্রতিযোগীই এই পাশাপাশি ৪নং ঘরে 'পাইনা' লিখেছেন। একাধিক বার শব্দ-সন্ধান-বিজয়ী হরিকমলের সে দলে যাওয়া উচিত হয়নি। 'যাহা চাই তাহা পাই না' বলে শ-র প্রতিযোগীদের যে ধাঁধায় ফেলেছেন শ্রীমান্ হরিকমলও সেই ফাঁদে পা দিয়েছেন দেখে শ-র দুঃখিত। এখানে শব্দ-সন্ধানে যাহা পাই না তাহা—চাইনা। যাই হোক শ্রীমান হরিকমল পুরকায়স্থর বাহাদুরী এই যে মাত্র এক-খানি কুপন পাঠিয়েই তিনি পুরস্কার পেয়েছেন একটিমাত্র ভুল করে কিন্তু তাঁর সঙ্গে ফরিদপুরের যে বন্ধুদ্বয় বীরু ও বিশু পুরস্কারের ভাগ পেয়েছেন তাঁরা একাধিক কুপন পাঠিয়ে অনেকগুলি 'চান্স' নিয়ে তবে এক ভুলে কৃতকার্য্য হয়েছেন। তবে এঁদের ভুল 'পাইনা'য় হয়নি। এঁরা 'চাইনা' লিখেছেন, কিন্তু 'তৃষ্ণা'য় এঁরা কাতর হয়ে পড়েছেন। 'তৃষা' শব্দেও যে 'তৃষ্ণা'র প্রয়োজন মেটে এটা অনেকেই ধরতে পারেন নি। কদমতলার কুমারী উমারাণী ঘোষও এক ভুলে এঁদের সঙ্গে পুরস্কারের ভাগ বসাতে পারতেন যদি তিনি 'সুশীতল' শব্দটি সঠিক লিখতে পারতেন। এঁর প্রধান ভুল হয়েছে 'রসে'। এঁর মতো আরও অনেকেই রসে পা হড়কেছেন, কিন্তু শ-র বড় বেরসিক লোক। সামাজিক জীবনে উপভোগ্য বলে 'রসের' চেয়ে 'রঙ্গ'টাই সে পছন্দ করে বেশী। লক্ষ্ণৌর আভা ও প্রমথনাথের জন্য দুঃখ হচ্ছে। এঁরা মাত্র একটি 'ঋ'ফলার জন্য পুরস্কৃতদের দলে ঢুকতে পারলেন না। 'তৃষ্ণা'য় শুষ্ক কণ্ঠ হওয়ার ফলেই বোধ হয় 'মাতৃভাষা' লিখতে গিয়ে এঁরা লিখে ফেলেছেন 'মাতৃভূমা'। শব্দ-সন্ধান' পূরণ করে ডাকে পাঠাবার আগে সকলেরই আর একবার মিলিয়ে দেখে পাঠানো উচিত। এইটুকু আলস্য করার ফলে কুমারী উমারাণী এবং আভা ও প্রমথনাথ পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। উপর নীচের ১নং ঘরে এসে অধিকাংশ প্রতিযোগীই 'দোটানায়' পড়ে হোঁচোট খেয়েছেন। যাঁরা চতুর তাঁরা 'দোমনা' হয়ে বেঁচে গেছেন। পাশাপাশি ১৬নং ঘরে অন্যমনারা 'মনোযোগ' দিয়ে গোলযোগ বাধিয়েছেন, কিন্তু যাঁরা 'মহাশয়' তাঁরা ঠিক মহামতির মতো বড় হবারই লক্ষণ দেখিয়েছেন। দশ বিশখানা কুপন পাঠিয়েও যাঁরা বিশ-পঁচিশটা ভুল করেছেন তাঁদের প্রত্যেক ভুলের তালিকায় নাম না দিয়ে, সবচেয়ে কম ভুল করেছেন যে কুপনখানিতে কেবলমাত্র সেই ভুলের সংখ্যাতেই নাম দেওয়া হ'ল।

এক ভুল

হরিকমল পুরকায়স্থ, শিলং, বন্ধুদ্বয় বীরু ও বিশু, ফরিদপুর। (শব্দ-সন্ধানের পুরস্কার এঁদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে।)

দুই ভুল

আবুলহোসেন মিয়া, রাজৈর, আভাষচন্দ্র দাশগুপ্ত, বেন্দা, আভা ও প্রমথ মুখার্জী, লক্ষ্ণৌ; উমারাণী ঘোষ, কদমতলা, জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, ঢাকা, গীতা ধর, মুঙ্গের, পান্না ও কেশবলাল আটা, শালিখা, বিনয়ভূষণ পাল, এণ্টালী, বিবেকানন্দ ও ভিক্টোরিয়া ক্লাবের সভ্যবৃন্দ, ফরিদপুর, বিষ্ণুপদ স্মৃতি পাঠাগারের সভ্যবৃন্দ, শালিখা, বীরেন্দ্রনারায়ণ সরকার, ফরিদপুর, সমরেন্দ্র, রণেন্দ্র, বীরেন্দ্রনারায়ণ, ফরিদপুর, মনোজ দত্ত, চট্টগ্রাম, শোভারাণী রায়, রাণাঘাট, শ্যামাপ্রসন্ন চক্রবর্তী, বালিগঞ্জ, সলিলকুমার ধর, মুঙ্গের।

তিনটি ভুল

কনকলতা দেবী, কলিকাতা, কল্যাণী দেবী, টালা, জয়ন্তী ও বাহুল সেন, মেদিনীপুর, "নাক", মানভূম, প্রতিমা মিত্র, আবিয়াদহ, বিশ্বনাথ সেনগুপ্ত, চট্টগ্রাম, বীরু, বিমল, দেবল, বিশু ও মুকুন্দ, ফরিদপুর, মণীন্দ্রমোহন মজুমদার, পুরুলিয়া, মনোজ দত্ত, ধলঘাট, রাধারমণ ধর, হুগলী, রীণা, মানু, নানু ও খোকা, ফরিদপুর, বিষিড়া বয়েজ লাইব্রেরী, বিষিড়া, সুধানাথ রায়চৌধুরী, ফরিদপুর, সৌরভ সনাতনি, অমলনার।

চার ভুল

অরুণিমা প্রতিমা, অনিমা ও নীহার, ফরিদপুর; অসিতকুমার মিত্র, হাওড়া, আব্দুর রহিম মিয়া ও আবুল হোসেন মিয়া, ফরিদপুর, কণিকা মুখার্জী, গোবরপুর, গোবর্দ্ধন সঙ্গীত সাহিত্যসমাজ, শালিখা, নারায়ণদাস মিত্র, সোণারপুর, নীতিশরঞ্জন দে, ঢাকা, বিনয়ভূষণ পাল, পার্ক সার্কাস, বীরু সরকার ও ভাইয়েরা, ফরিদপুর, মণীন্দ্রকুমার গুহ, কণেশ্বর; রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, আবিয়াদহ, শেফালিকা সেন, বৈষ্ণবাটী, শোভনলাল মুখার্জী, টালিগঞ্জ, শ্যামচন্দ্র বন্দ্যো, বেগমপুর, সাধনা বসু, বারুইপুর, সাধনানন্দ মিশ্র, মেদিনীপুর, সুজাতা সিংহ, পুরুলিয়া; সুনীলকুমার ব্যানার্জী, রামপুরহাট, সুধীরচন্দ্র দেবরায়, হবিগঞ্জ, সুশীলচন্দ্র রায়, রাজসাহী, হেনা রাহা, ত্রিপুরা।

পাঁচ ভুল

অবনী সরকার, বজবজ, অসীম রাহা, বালিগঞ্জ, আশারাণী মুখার্জী, লক্ষ্ণৌ, উমা বাগচী, রায়পুর; ইন্দু বসু, কণেশ্বর, কৃষ্ণপদ চট্টোপাধ্যায়, আবিয়াদহ, গীতা ধর, জামালপুর, গীতারাণী ধর, হুগলী; গোপীকেশ চক্রবর্তী, আবিয়াদহ, নিরঞ্জন রায়চৌধুরী, ময়মনসিংহ, পঙ্কজ গাঙ্গুলী, কণেশ্বর, পার্থসারথী বসু, কলিকাতা, মহামায়া সাহিত্যমন্দির, সেওড়াফুলি, সুপ্রিয়া পাল, কাঁথি, "সুরসিক", শালিখা।

ছয় ভুল

উমাশঙ্কর বসু, কলিকাতা, এভাটিমা ঈশোব, বনগ্রাম; কমলকুমার গুহ বিশ্বাস, এলাহাবাদ; তাপসরঞ্জন সরকার, মৈমনসিং; ধ্রুবরঞ্জন সরকার, হাওড়া, পদ্মরাণী মিত্র, কালিঘাট, পার্ব্বতীশঙ্কর, রামপুরহাট; বাসন্তী সিংহ, কলিকাতা, ভূপেন্দ্রনাথ কানুনগো, রমনী, মধুসূদন মণ্ডল, বালীদেওয়ানগঞ্জ, মীরা দাস, সিলেট, সুলেখা বসু, বালিগঞ্জ।

নির্ভুল সমাধান—চৈত্র, ১৩৪৭

সাত ভুল

অরুণচন্দ্র বাগচী, ডিব্রুগড়, চন্দ্রকুমার ঘোষ, রাম সেনগুপ্ত, সরসী পাঁজা ও মধুসূদন মণ্ডল, বালীদেওয়ানগঞ্জ; দিলীপকুমার সেন, ভবানীপুর; নবনীকুমার চৌধুরী, লঙ্গাই চা'বাগান, পাঁচুগোপাল বসু, বারাসাত, বৈদ্যনাথ শেঠ, বাঁশবেড়িয়া; মীরা ব্যানার্জী, কলিকাতা; সলিলা মুখার্জী, কলিকাতা।

আট ভুল

অনিমা চ্যাটার্জী, উত্তরপাড়া, অমলকুমার ও নালিমা দত্ত, কলিকাতা; দেবপ্রসাদ ঘোষ, কলিকাতা, পার্বতীশঙ্কর মুখার্জী, বীরভূম, বিজয়কুমার গাঙ্গুলী, বালিগঞ্জ; মহিবুর রহমান চৌধুরী, সিলেট, শৈলেন্দ্রকুমার রায়, কলিকাতা।
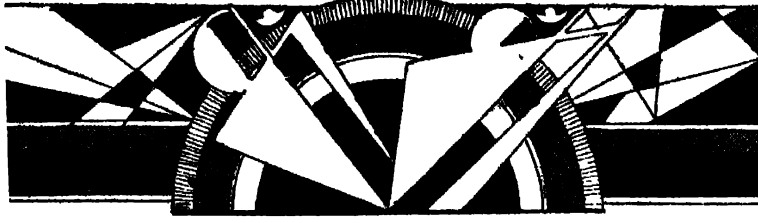
বৈশাখ—১৩৪৮

কত কম সংখ্যক স্বরবর্ণের (vowel) সাহায্যে কত বেশী সংখ্যক ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant) যোগ দিয়ে একটি ইংরাজী শব্দ গঠন করা যায় ? শব্দটি লিখে দেখাও। কুমারী সাধনা বসু, বাকইপুর।

চৈত্রের ধাঁধাঁর উত্তর

৭০ গজ স্কোয়ার। সঠিক উত্তর দিয়েছেন—দেবেন্দ্রনাথ দাস, জামসেদপুর, গোপীকেশ চক্রবর্তী, আরিয়াদহ, পান্নালাল ও কেশবলাল আটা, সালিখা, বিষ্ণুপদ স্মৃতি পাঠাগারের সভ্যবৃন্দ, সালিখা, গোবর্দ্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজ, সালিখা, পার্বতী, শান্তি, কুঙ্কুম ও তারা, অসীম বাহা, বালিগঞ্জ, মনোজ দত্ত, চট্টগ্রাম, বিশ্বনাথ সেনগুপ্ত, চট্টগ্রাম, বন্ধুদ্বয় বীরু ও বিশু, ফরিদপুর, সবিতা বাগচি, জামসেদপুর, মহিবুর রহমান চৌধুরী, সিলেট, কুমারী নীহার ব্যানার্জি, জব্বলপুর, অনিলবরণ মহান্তী, যাদবপুর, কুমারী পঙ্কজ গাঙ্গুলী, ইন্দু বসু, নীহার ভৌমিক ও দিদি, শিশু ভারতী, কণেশ্বর, অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়, আজমীর, অসিতকুমার মিত্র, দীপশিখা সাহিত্য-মন্দির, কমলকুমার গুহ, এলাহাবাদ, সাধনানন্দ মিশ্র, মুগবেড়িয়া, নীতিশরঞ্জন দে ও নিখিলরঞ্জন দে, ঢাকা, মধু ঘোষাল, মুগকল্যাণ অশ্বিনীকুমার মণ্ডল, আহমদপুর, ধ্রুবরঞ্জন সরকার, হাওড়া, কুমারী নীহার ব্যানার্জ্জি, জব্বলপুর, ধীরেন্দ্রনাথ মহান্তী, দাঁতন।

হরফের হেরফের—অক্ষর ক্রীড়া

এবারও আমাদের একজন গ্রাহক একটি পদ পাঠিয়েছেন "A United Co."এর হরফগুলিকে নিয়ে এমনভাবে সাজিয়ে একটি শব্দ তৈরি করতে হবে যে শব্দটি সভ্যতার পথে প্রধান পাথেয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে পাঠশালার গ্রাহকটি An United Co. না লিখে A United Co. লিখেছেন। তবে এটা ধাঁধাঁ বলে তাঁর এই ব্যাকরণের ভুল অগ্রাহ্য করা চলে।

চৈত্রের উত্তর

"Men in a route" এই পদটির হরফগুলিকে হেরফের করে সাজিয়ে যে শব্দটি তৈরি করতে বলা হয়েছিল সেটি 'আজকাল অনেক লোকের মুখেই শুনতে পাওয়া যাচ্ছে'—শেষের এই ইঙ্গিতটির প্রতি লক্ষ্য করে যাঁরা শব্দ গঠন করেছেন তাঁদের উত্তরই নির্ভুল হয়েছে। সে উত্তরটি হল—Enumeration কিন্তু অনেকে ভুল করে 'Enumerator' লিখেছেন। এদের মিলিয়ে দেখা উচিত ছিল সব হরফগুলি এর মধ্যে আছে কিনা। নির্ভুল উত্তর দিয়েছেন—অমিতাভ বসু, বনগ্রাম; পান্নালাল ও কেশবলাল আটা, সালিখা; বিষ্ণুপদ স্মৃতি পাঠাগারের সভ্যবৃন্দ, সালিখা; গোবর্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজ, সালিখা; পার্বতী, শান্তি, কুঙ্কুম ও তারা, দেবপ্রসাদ ঘোষ, কলিকাতা, বিশ্বনাথ সেনগুপ্ত, চট্টগ্রাম; শ্যামকুমার বাগচী, জামশেদপুর, সুনীলকুমার ব্যানার্জি, রামপুরহাট, অনিলবরণ মহান্তী, যাদবপুর, কুমারী পঙ্কজা গাঙ্গুলী, ইন্দু বসু, নীহার ভৌমিক ও দিদি. শিশু-ভারতী, কণেশ্বর, শশী ভট্টাচার্য, হেমনগর, ধ্রুবরঞ্জন সরকার, হাওড়া।

কয়েকজন উত্তর দিয়েছেন—Mean routine কিন্তু তাঁদের উত্তর দেবার আগে ভেবে দেখা উচিত ছিল যে এটি একটি শব্দ নয়। একটি খুব ভাল শব্দও অনেকে পাঠিয়েছেন "Mountaineer". কিন্তু তাঁরা এটা লক্ষ্য করেন নি যে এমন একটি শব্দ তৈরি করতে হবে যা আজকাল অনেক লোকের মুখেই শুনতে পাওয়া যাচ্ছে।

ভোটের ফলাফল

৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—২১ ভোট।

অরুণচন্দ্র বাগচী, ডিব্রুগড়, অনিলবরণ মহান্তি, যাদবপুর; অমলকুমার ও নীলিমা দত্ত, কলিকাতা, ইন্দ্রানী রায়, পাটনা, উমারানী ঘোষ, কদমতলা, কমলকুমার গুহ বিশ্বাস, এলাহাবাদ, গোপিকা ঘোষ, বজ্ বজ্, তাপসরঞ্জন সরকার, ময়মনসিং, দেবপ্রসাদ ঘোষ, কলিকাতা, ধীরেন্দ্র নাথ মহান্তি, দাঁতন, নবকুমার মুখার্জি, টালিগঞ্জ; নন্দলাল ভট্টাচার্য্য, সত্য মালিক, সত্য সরকার ও মধুসূদন মণ্ডল, বালীদেওয়ানগঞ্জ, পশুপতিনাথ ঘোষাল, কলিকাতা, পাঁচুগোপাল বসু, বারাসত প্রণবকুমার রায়চৌধুরী, ভবানীপুর; বিজয়কুমার গাঙ্গুলী, বালিগঞ্জ, মীরা দাস, সিলেট, সুশীলকুমার সরকার, বারহামগঞ্জ, শোভনলাল মুখার্জী, টালিগঞ্জ, শোভারানী রায়, রাণাঘাট, হেনা রাহা, ত্রিপুরা।

৺রজনীকান্ত সেন—৪ ভোট।

গীতা রায়, জামালপুর, দিলীপ সেন, ভবানীপুর, পীযূষকান্তি সেন, সিম্‌লা হিল্‌স্, রাধারমণ ধর, হুগলী,

৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—৬৩ ভোট।

অমিতাভ বসু, বনগ্রাম, অসিতকুমার মিত্র, কলিকাতা অরুণলাল মুখার্জী, কলিকাতা, অসীম রাহা, বালিগঞ্জ, আভাষ দাশগুপ্ত, বেন্দা, আভারানী মুখার্জী, লক্ষ্ণৌ, ইন্দুমাধব বিশ্বাস, আমলাসদরপুর, কল্যাণী দেবী, কলিকাতা, কৃষ্ণপদ চট্টো, আরিয়াদহ, গীতা ধর, হুগলী, গোপীকেশ চক্রবর্তী, আরিয়াদহ, গোবর্দ্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজ, শালিখা, জয়ন্তী ও রাহুল সেন, মেদিনীপুর, তারাপদ চক্রবর্তী, ফেণী, দেবব্রত মজুমদার, কলিকাতা; "নারু" মানভূম, নবনীকুমার চৌধুরী, লঙ্গাই চা বাগান; নীতীশ ও নিখিলরঞ্জন দে, রমনা, নিরঞ্জন রায়চৌধুরী, টাঙ্গাইল; নীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার, বালিগঞ্জ, পঙ্কজা গাঙ্গুলি, কণেশ্বর, পান্না ও কেশবলাল আটা, হাওড়া, পার্বতীশঙ্কর মুখার্জী, বীরভূম, প্রতিমা মিত্র, আরিয়াদহ, বাসন্তী সিংহ, কলিকাতা, বিশ্বনাথ সেনগুপ্ত, চট্টগ্রাম, বিষ্ণুপদ স্মৃতি পাঠাগার সভ্যবৃন্দ, শালিখা, বৈদ্যনাথ শেঠ, বাঁশবেড়িয়া, ভূপেন্দ্রনাথ কানুনগো, রমনা, মধু ঘোষাল, মুগকল্যাণ, মণীন্দ্রমোহন মজুমদার, পুরুলিয়া; মনোজ দত্ত, বলঘাট; মহামায়া সাহিত্য মন্দির, সেওড়াফুলি, মৃণালকান্তি গুপ্ত, কলিকাতা, মৃণালকুমার মিত্র, কলিকাতা, মৃত্যুঞ্জয়কুমার মিত্র, কালীঘাট; বঙ্কু ও শশাঙ্ক বসু, ভবানীপুর; রনেন্দ্রনাথ ঘোষ চৌধুরী, মুগকল্যাণ; রিষিড়া বয়েজ লাইব্রেরীর সভ্যবৃন্দ, রিষিড়া, রীবারাণী ব্যানার্জী, কলিকাতা, রেবা ভদ্র, ঢাকা, লীলা মিত্র, মজঃফরপুর, শশাঙ্কশেখর বসু, হরিনাভি, সুশীল চাটার্জী, উত্তরপাড়া, শেফালিকা সেন, বৈদ্যবাটী, শৈলেন্দ্রকুমার রায়, কলিকাতা, শ্যামচন্দ্র বন্দ্যো, বেগমপুর, শ্যামাপ্রসন্ন চক্রবর্তী, কলিকাতা, সমীর চৌধুরী, কটক, সমীরকুমার ঘোষাল, কলিকাতা; সলিল সেনগুপ্ত, কলিকাতা, সলিলা মুখার্জী, কলিকাতা; সাধনা বসু, বারুইপুর; সুজাতা সিংহ, পুরুলিয়া, সুধীর চন্দ্র দেবরায়, হবিগঞ্জ; সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রামপুর হাট, সুপ্রিয়া পাল, কাঁথি, সুবোধ রাহা ও সমবোধ রাহা, যশোহর, "সুরসিক" শালিখা; সৌরভ সনাতনি, অমলনার, সিদ্ধেশ্বর মিত্র, বালিগঞ্জ, হরিকমল পুরকায়স্থ, শিলং, হৃষিকেশ মুখার্জী, ঢাকা।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী—৩ ভোট।

ধ্রুবরঞ্জন সরকার, কলিকাতা, রণেন্দ্রকৃষ্ণ সরকার, কলিকাতা; শক্তি বাগচী, জামসেদপুর।

শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক—৪ ভোট।

নীহারকণা ব্যানার্জী, জব্বলপুর; বিনয়ভূষণ বন্দ্যো, কলিকাতা, বিনয়ভূষণ পাল, এন্টালী, শিশিরকুমার সেনগুপ্ত, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়—৬ ভোট।

অবনী সরকার, বজ্ বজ্; অভিজিৎ চ্যাটার্জী, আজমীড়, উমাশঙ্কর বসু, কলিকাতা, মিনতি গাঙ্গুলী, সাহারাণপুর; রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, আরিয়াদহ, সাধনানন্দ মিত্র, মুগবেড়িয়া।

কাজী নজরুল ইসলাম—১৩ ভোট।

অনুপম রায়, বালিগঞ্জ; অশ্বিনীকুমার মণ্ডল, আহ্‌মদ পুর; আবুল হোসেন মিয়া, রাজৈর; ইন্দু বসু, কণেশ্বর; উমা বাগচী, রায়পুর, কে, এম, ছায়াফুল হক, ময়মনসিং; গৌরাঙ্গ রুদ্র, চট্টগ্রাম, দেবেন্দ্রনাথ দাস, জামসেদপুর, বিশ্বনাথ সেনগুপ্ত, চট্টগ্রাম; মহিবুব রহমান চৌধুরী, সিলেট্, রঞ্জিৎকুমার রায়, কলিকাতা; শেখ সিরাজুদ্দিন, মুর্শিদাবাদ, সনৎকুমার ভট্টাচার্য্য, আরিয়াদহ।

পাঠশালার গ্রাহক গ্রাহিকা পাঠক পাঠিকা ও লেখক লেখিকা সকলকে আমাদের নববর্ষের প্রীতিসম্ভাষণ ও নমস্কার জানাচ্ছি।

এবার নববর্ষ এসেছে বাংলা দেশের জেলায় জেলায় হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিয়ে, ভারতবর্ষে এসেছে সে পাকিস্থানের প্রলয় কল্পনা নিয়ে, পৃথিবীতে এসেছে মহাযুদ্ধের ভয়াবহ করাল মূর্তি নিয়ে। আমাদের মাথার উপর আজ বিমান আক্রমণের আতঙ্ক এসে দাঁড়িয়েছে তার সর্ব বিধ্বংসী পক্ষ বিস্তার করে। দুর্মূল্য হয়ে উঠেছে দেশে অন্ন বস্ত্র, সাংসারিক নিত্য প্রয়োজনের দ্রব্য সামগ্রী। আজ এই নববর্ষের প্রথম প্রভাতে চারিদিকে চেয়ে দেখতে পাচ্ছি আমরা ভারতবাসীরা পৃথিবীর অন্যান্য জাতির তুলনায় কতনা নিঃসহায়, কতনা নিরুপায়, একান্ত দুর্বল পরমুখাপেক্ষী ও আত্মরক্ষায় অসমর্থ জীব। আমাদের না আছে সামরিক শক্তি সামর্থ্য ও উপযুক্ত বণ সম্ভার, আমাদের না আছে উপযুক্ত শিক্ষা দীক্ষা শৌর্য বীর্য সাহস ও চরিত্রের দৃঢ়তা। না আছে শিল্প বাণিজ্য বিজ্ঞান ও অর্থ সম্পদ। নিজেদের মধ্যে সহস্র প্রকার ভেদাভেদ দলাদলি মনান্তর। জাতীয় একতাবোধ ও সঙ্ঘবদ্ধ মৈত্রীর অভাবে আমরা আজ সকলের চেয়ে হীনবল। এই ভাবে কোনো জাত বেশী দিন বাঁচতে পাবে না। অজ এই নববর্ষের পুণ্য প্রভাতে আমরা কায়মনপ্রাণে এই দৃঢ় পণ করি আসুন যে, সামাজিক সকল ভেদাভেদ, জাতি ধর্মের সকল পার্থক্য ভুলে মানুষ হিসাবে ভারতবাসী হিসাবে সকলে একই লক্ষ্য ও একই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে ভারতের কল্যাণে ভারতবাসীর কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করব। দেশের স্বাধীনতা, বাণিজ্য ও শিল্প সম্পদ, জাতীয় গৌরব এবং শিক্ষা দীক্ষা ও শিল্প বিজ্ঞান পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করব। জগতের কোনো জাতির চেয়ে ভারতবাসী হীন ও অপদার্থ হয়ে থাকবে না।

* * *

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ভাইস্ চ্যান্সেলার সার আজিজুল হক ছাত্রদের মধ্যে সামরিক শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করবার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জানিয়েছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি মাত্র "য়ুনিভার্সিটি ট্রেনিং কোর" গঠিত হয়েছে। এই দলের ছাত্রেরা সকলে উচ্চশিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও এদের মাত্র সামান্য সৈনিকের কাজ শেখানো হয়, তাও আংশিক ভাবে। কিন্তু সে যাই হোক আমরা সার আজিজুলের প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। কারণ, দেশের যুবকদের যদি দেশ রক্ষার শিক্ষিত করে তোলা না হয় তবে সে দেশ চিরদিন অসহায় ও শত্রুর আক্রমণে নিরুপায় হয়ে থাকতে বাধ্য। বাংলার প্রত্যেক জেলায় প্রত্যেক শিক্ষা কেন্দ্রে শিশু ও বালকদের ক্যব ও বয় স্কাউট্ এবং যুবকদের 'ট্রেনিং কোরে' নিয়মিত সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা বহুদিন পূর্বেই উচিত ছিল। তা যদি করা হত তাহলে সৈন্য সংগ্রহের জন্য গভর্নমেণ্টকে আজ এত বেগ পেতে হত না। উচ্চশিক্ষিত যুবকদের উচ্চ সামরীক কর্মচারীর উপযোগী শিক্ষা দেওয়াই উচিত, কারণ সাধারণ সৈনিকের জন্য অল্প শিক্ষিত লোকের অভাব হবে না। সামরিক পরিচ্ছদ, সরঞ্জাম ও অর্থেরও কোনো অভাব হবে না—যদি গভর্ণমেণ্ট সাহস করে, ভরসা করে এবং বিশ্বাস করে এ কাজে অগ্রসর হতে পারেন।

* * *

ডক্টর মেঘনাদ সাহা সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের এক সভায় বলেছেন "গ্রামে ফিরে চল!" (Back to the Village) যাঁরা বলেন তাঁরা দেশের ও জাতির সমস্যা বা প্রয়োজন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। বাংলাদেশের ও ভারতের এখন আদর্শ লক্ষ্য হওয়া উচিত 'শহরে চলে আসা।', গ্রামে ফিরে যাওয়া মানে চাষবাসে নিযুক্ত হওয়া। সমগ্র ভারতবর্ষে সাড়ে সাত লক্ষ গ্রাম আছে আর শহর আছে মাত্র পাঁচ হাজার। ৪০ কোটী অধিবাসীর মধ্যে প্রায় ছত্রিশ কোটী গ্রামে বাস করে শহরে বাস করে মাত্র চার কোটী। আবার গ্রামে যারা বাস করেন তাঁদের মধ্যে শতকরা আশী জনের কৃষি কার্য্যই উপজীবিকা। সুতরাং গ্রামে ফিরে যাওয়া মানে দেশের দুঃখ দারিদ্র আরো বাড়ানো। তাই ডক্টর মেঘনাদ বলছেন দলেদলে শহরে এসে নব নব শিল্প বাণিজ্যে নিযুক্ত হতে পারলেই ভারতের আর্থিক দুরবস্থা দূর হবে। জমির উপর চাপ কমবে, কৃষকদের অবস্থাও সচ্ছল হবে। ডক্টর মেঘনাদ ভারতের দারিদ্র সমাধানের একটা ইঙ্গিত করেছেন বটে কিন্তু শহরগুলির পরিধি বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধ হওয়ায় পরিত্যক্ত গ্রামগুলির অবস্থা যে সেই পরিমানে শোচনীয় হয়ে উঠবে এর কি প্রতিকার সে সম্বন্ধে তিনিকিছু বলেননি। আমাদের মনে হয় প্রত্যেক বর্ধিষ্ণু গ্রামকে শহরে পরিণত করে তুলতে পারলেই এ সমস্যার সমাধান হতে পারে।

* * *

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জয়ন্তী উৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়ে গেল। এই ভারত-গৌরব প্রবীণ রাসায়নিকের অশীতিতম জন্মোৎসবে একটি বিজ্ঞান প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে কর্মকর্তারা বৈজ্ঞানিকের সম্মানের যথাযোগ্য অনুষ্ঠানই করে ছিলেন। স্বদেশপ্রেমিক, স্বজাতীবৎসল, মাতৃভূমির কল্যাণব্রত উৎসর্গিত জীবন এই চিরকুমার ব্রহ্মচারী বিজ্ঞান তপস্বীকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে আমরা তাঁর শতায়ু কামনা করি।

* * *

২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ একাশী বৎসরে পদার্পণ করবেন। দুঃখের বিষয় তিনি এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন নি। শোনা যাচ্ছে বাংলা দেশ তাঁর এই একাশী বৎসরে পদার্পণ উপলক্ষে উৎসব আয়োজন করতে উদ্যোগী হয়েছে। আমরা এই আয়োজনের সম্পূর্ণ সাফল্য কামনা করি এবং ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি ভারতের হিমাচল তুল্য উত্তুঙ্গ প্রতিভাশালী এই মহামণীষী বিশ্বকবি সত্বর সুস্থ ও সবল হয়ে উঠুন এবং দীর্ঘতর জীবন লাভ করে জাতীকে তাঁর মনীষার অক্ষয় সম্পদ আরও দান করুন।

* * *

দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র বসুর বিরুদ্ধে গভর্নমেণ্ট যে মামলা রুজু করেছিলেন সেই মকদ্দমার শুনানি শেষ হবার আগেই সুভাষচন্দ্র নিরুদ্দেশ হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা ও হুলিয়া জাহির হয়েছে এবং তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবার আদেশ হয়েছে। এই সম্পত্তির মধ্যে সুভাষচন্দ্রের নামে কর্পোরেশনের কাছে ইজারা নেওয়া যে জমিতে সাধারণের প্রদত্ত চাঁদায় কংগ্রেসের 'মহাজাতি সদন' নির্মিত হচ্ছিল সেই সম্পত্তিও আদালত থেকে বাজেয়াপ্ত করবার হুকুম হয়েছে। শরৎচন্দ্র বসু প্রমুখ কয়েকজন এই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করেছেন।

* * *

একটি আপত্তিজনক প্রবন্ধ প্রকাশ করবার অপরাধে 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকাকে তিন সপ্তাহের জন্য ভারত রক্ষা আইন অনুসারে প্রকাশ বন্ধ রাখবার আদেশ দেওয়া হয়েছে। ভারত রক্ষা আইনের বিরুদ্ধে কোন আপীল চলে না, কাজেই বসুমতী নিরুপায় হয়ে পুনরায় হাজার টাকা জমা দিয়ে 'টেলিগ্রাফ বসুমতী' নামে আর একখানি নূতন কাগজ প্রকাশের অনুমতি নিয়েছেন। সংবাদপত্রে কোনো স্বাধীন মতামত প্রকাশ করা এমনই বিপদজনক হয়ে উঠেছে।

* * *

য়ুরোপীয় যুদ্ধের রঙ্গস্থল এইবার পশ্চিম থেকে ঘুরে পূর্বদিকে এসে পৌছেচে। সূর্য অস্ত যায় পশ্চিমে কিন্তু উদয় হয় পূবে। যাঁদের সাম্রাজ্যে সূর্য কখনও অস্ত যায় না আশা করি তাঁরা পূবের এই সমরক্ষেত্রে জয়গৌরবে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবেন। আফ্রিকার রণাঙ্গণে যে জয়ের সূচনা দেখা দিয়েছে, প্রাচ্যের সিংহদ্বারে তার বিজয় ভেরী হয়ত শীঘ্রই বেজে উঠবে। আফ্রিকার ক্ষণেক জয় ক্ষণেক পরাজয়ের অশান্তি আশু দূর হবে। যে ক্ষুদ্র গ্রীসের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষের ফলে দাম্ভিক ইটালি আজ হতমান, কে জানে হয়ত জার্মানীর বিপুল জয়-গৌরব আজ সেই সামান্তের শৌর্যের তেজেই ম্লান হয়ে পড়বে। কে জানে বিধাতার মনে কি আছে?

* * *

বৈশাখের বিজ্ঞাপিত অনেকগুলি রচনা স্থানাভাবে এবার গেল না। জ্যৈষ্ঠের পাঠশালায় সেগুলি দেখতে পাবে। চৈত্রের প্রশ্নগুলির উত্তর ১০ই বৈশাখ পর্যন্ত নেওয়া হবে স্থির হয়েছে বলে চৈত্রের ও বৈশাখের প্রশ্নগুলি এক সঙ্গেই জ্যৈষ্ঠে প্রকাশিত হবে। রচনা প্রতিযোগিতার সময়ও যে ১৫ই বৈশাখ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, এ সংবাদ চিঠিপত্রের মধ্যে পাবে। গত মাসে একথা গ্রাহকদের জানাতে ভুল হয়েছিল। পরীক্ষার জন্য পড়ায় ব্যস্ত থাকায় 'অহিংসা' সম্পর্কে ঘোষিত রচনা প্রতিযোগিতায় মাত্র দু'চার জন যোগ দিতে পেরেছেন, আর সকলেই সময় চেয়েছেন। 'বিনিময় সঙ্ঘ' এবার গেল না, কারণ 'বিনিময় সঙ্ঘে'র চিঠিপত্রগুলি পরিচালকের নিকট পাঠাবার সময় পাঠশালার পিয়ন সেগুলি পথে হারিয়ে ফেলেছে। সুতরাং 'বিনিময় সঙ্ঘে' যাঁরা চৈত্রে পত্রাদি লিখেছিলেন তাঁদের অনুরোধ জানাচ্ছি যে তাঁরা অনুগ্রহ করে আর একবার তাঁদের কি প্রয়োজন লিখে জানাবেন। কয়েকজন গ্রাহিকার বিশেষ অনুরোধে আগামী মাস থেকে পাঠশালায় 'মেয়েদের কথা' বিভাগে 'কন্যামহল' বলে আর একটি শাখা বিভাগ খোলা হবে। পাঠশালার গ্রাহিকা, পাঠিকা ও ছাত্রীরা এবার থেকে এই কন্যামহলে তাঁদের আসর জমাবেন; নিজেদের অভাব অভিযোগ, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের নানা সমস্যার আলোচনা করবেন। কুমারী নীলিমা দেবী এর পরিচালনা ভার গ্রহণ করছেন। এ বৎসর থেকে আর একটি নূতন প্রতিযোগিতার কথা তোমাদের জানাচ্ছি। পাঁচজন নূতন গ্রাহকের নাম ঠিকানা সহ এক বৎসরের চাঁদা ১৫৲ টাকা যিনি মণি অর্ডারে বা লোকের হাতে পাঠশালার ঠিকানায় পাঠাবেন তাঁকে এক বৎসরের জন্য বিনামূল্যে পাঠশালা পাঠান হবে। মণি অর্ডারের ব্যয় পাঠশালাই বহন করবে। যিনি একা বা যাঁরা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে পাঠশালার একশত গ্রাহক করে দিতে পারবেন তাঁকে বা তাঁদের সঙ্ঘকে নগদ ২৫৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

Printer and publisher R Bhattacharya, Prabhu Press, 30, Cornwallis Street, Calcutta

শব্দ-সন্ধান

(প্রতিযোগিতা-কূপন)

(যে কোনো পাঠক বা পাঠিকা এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারেন,
এবং যতগুলি ইচ্ছা কুপন পাঠাতে পারেন)

১ ম		২ বি		৩		৪	৫ শা	৬
				৭ জ			৮	ল
৯ স্ত	১০		১১ ব			১২ উ		
১৩	গ				১৪ অ			১৫
	১৬	১৭ ম			১৮		১৯ রি	শ্বা
২০ কু				২১	নি		২২	স
		২৩ ম			২৪	২৫ মা		
২৬ ব	২৭			২৮				২৯
৩০	র			৩১ হ			৩২	ক্ষ

(পাঠশালা, বৈশাখ)

নাম...... .. ..

ঠিকানা ....

....

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আগামী ১৫ই বৈশাখের মধ্যে কুপনখানি পাঠশালা-কার্যালয়ে পৌঁছনো চাই।

☞ কুপনে কোনো কাটাকুটি বা বানান ভুল চল্‌বে না।

নিয়মাবলী

"পাঠশালা" প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয়।

আশ্বিন মাস থেকে পাঠশালার বর্ষারম্ভ।

লেখা ও ছবি প্রতিমাসে অন্তত ৪০ পৃষ্ঠা থাকবে; আকার ডবল ক্রাউন ৮ পেজি।

বার্ষিক মূল্য মণি অর্ডারে পাঠালে তিন টাকা। ষাণ্মাসিক দেড় টাকা। ভি পিতে বার্ষিক মূল্য ৩।০ তিন টাকা চার আনা। ষাণ্মাসিক ভি পি করা হবে না।

নগদ মূল্য প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা।

নমুনার জন্য পাঁচ আনার ডাকটিকিট পাঠাবেন।

মফঃস্বলের গ্রাহকগণ প্রকাশকের ঠিকানায় মনিঅর্ডারযোগে টাকা পাঠাবেন। শহরের গ্রাহকগণও ঐ ঠিকানায় টাকা জমা দিবেন।

মাসের প্রথম সপ্তাহে কাগজ না পেলে ডাকঘরের জবাব সহ ১৫ই তারিখের মধ্যে জানা'লে আর এক কপি দেওয়া হবে।

ডাকটিকিট দেওয়া থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠানো হবে। চিঠির উত্তর রিপ্লাইকার্ড পেলে দেওয়া হবে।

বিজ্ঞাপনের হার

কভারের প্রথম পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে না।

ঐ দ্বিতীয় ও তৃতীয় পৃষ্ঠা	.	২৫৲ হিঃ
ঐ চতুর্থ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন	.	৫০৲
বিজ্ঞাপনের প্রথম পৃষ্ঠা	.	২২৲
পুস্তকাবন্তের পূর্ব পৃষ্ঠা	...	২৫৲
সূচীর পার্শ্বে অর্ধ পৃষ্ঠা	.	১৫৲
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	...	২০৲
ঐ অর্ধ পৃষ্ঠা	.	১২৲
ঐ সিকি পৃষ্ঠা	...	৭৲

সিকি পৃষ্ঠার কম বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে না।

রচনার মধ্যে বিজ্ঞাপন . ৫০৲

বিজ্ঞাপন পরিবর্তন ক'রতে হ'লে পূর্বমাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে পাঠা'তে হবে।

বিজ্ঞাপন বন্ধ ক'রতে হ'লে একমাস পূর্বে নোটিশ দেওয়া দরকার।

নূতন বিজ্ঞাপন পূর্বমাসের ২০শে তারিখ পর্যন্ত নেওয়া হবে।

এক বৎসরের জন্য বিজ্ঞাপন দিতে চুক্তিবদ্ধ হ'লে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে।

প্রকাশক—**রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য**

পাঠশালা কার্যালয়

৩০, কর্নওআলিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা PHONE—B. B. 4099

প্রাপ্তিস্থান—সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

"—পঁচিশে বৈশাখ জীবনে তোমার
আসুক ফিরিয়া কবি বার বার

চতুর্থ বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ—১৩৪৮ [নবম সংখ্যা

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীমোহিতনাথ ঘোষ

ওগো কবি। মহাকবি।
জীবন-বীণায় ছন্দ-পরাগে
মর্ম মথিয়া প্রীতি অনুরাগে
সারা জগতের নয়নের আগে
ফুটায়েছ নব-ছবি,
ভারতের তুমি রবি।

নীল নভতলে ওই যে হোথায়,
কোটী দ্যুতি লয়ে ভাস্কর ভায়·
হেথা বহুমুখী দেব প্রতিভায়
রাজ তুমি মহারবি।
ভারতের তুমি কবি।

গগনের ভানু বহি বহুদূর—
কোটী করে যথা পরশে মধুর,
তুমি আমাদের অন্তরপুর
আলো করি আছ রবি;
তুমি যে প্রাণের কবি।

তোমাব দানের আজও নাহি শেষ;
ধ্বনিছে ধরায় নব সুর-রেশ;
তোমারি বাণীতে জেগেছে এদেশ
নূতন জনম লভি;
তুমি যে মোদের রবি;
ভক্তি-অর্ঘ্য লহ তরুণের
জগৎ-পূজ্য কবি!।

—

পৃথিবীর প্রাচীনতম গল্প

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

[বহু পণ্ডিতেরা বলে থাকেন যে লেখাগল্প হিসাবে এই গল্পটিই সবচেয়ে পুরাতন। মিশর দেশের পিরামিডগুলির মধ্যে মৃত ফ্যারাওদের শবাধারের কাছে বহু পুঁথি পাওয়া গেছে। সেগুলি Papyrusএর ওপর মিশর দেশীয় ছবির অক্ষরে (hieroglyphics) লেখা। তার মধ্যে বেশীর ভাগই মৃত রাজাদের গুণকীর্তন ও বংশ-পরিচয়ে ভরা। যে গল্পটি নীচে দেওয়া হল সেটীও একটি Papyrusএ লেখা। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি প্যারিসের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কর্তা Vicomte de Rougeর (ভাইকণ্ট্ দ্য রুজে) কাছে একজন ইংরাজ মহিলা একখানা Papyrus নিয়ে যান। সেখানি ইতালি ভ্রমণকালে তাঁর হস্তগত হয়। দ্য রুজে মিশরীয় ছবির ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। সেই Papyrus পাঠে তিনিই আবিষ্কার করেন যে তাতে একটী সম্পূর্ণ লেখা গল্প রয়েছে। ফ্রান্সের রিভিউ আর্কলজিক্ (Revue Archeologique) পত্রিকায় তিনি ফরাসী ভাষায় প্রথম গল্পটী প্রকাশিত করেন। গল্পটি নাকি লেখা হয়েছিল তিন সহস্র বৎসর পূর্বে ফ্যারাও রামসেস মিআমুনের (Pharaoh Ramses Miamun) পুত্র যুবরাজ সেতি মারনেফ্থার (Seti Marnephtah) জন্য। এর লেখকের নাম আন্নানা (Annana)]

দুটি ভাই—বড়টীর নাম আনেপু, ছোটটীর নাম বাতাউ। আনেপুর ছিল ঘরদোর আর ঘরে বউ। বাতাউ দাদার কাছেই থাকতো।

তার কাজ ছিল গরু চরানো। দিনের শেষে সন্ধ্যেবেলা বাতাউ গরুগুলি তাড়িয়ে গোয়ালে নিয়ে আসতো; সঙ্গে আনতো অনেক ঘাসপাতা রাত্রে গরুকে খেতে দেবে বলে। তার দাদা আর বৌদি খেয়ে দেয়ে ঘরে শুতো আর সে বেচারী গোয়াল ঘরের এক কোণে শুয়ে রাত কাটাতো।

আবার রাতের শেষে ভোর বেলা যখন পৃথিবী আলোয় ভরে যেতো, ঘরে ঘরে প্রদীপ যখন আর জলতো না—তখন তার দাদার আগেই বাতাউ উঠে, মজুরেরা যে মাঠে কাজ করছে, সেখানে তাদের জন্য রুটি নিয়ে হাজির হোত। মাঠে তাদের সঙ্গেই বসে খেয়ে তারপর সে যেতো গরু চরাতে।

ক্ষেতে যখন লাঙল দেবার সময় এলো, তার দাদা বল্লে, "চল্ ক্ষেতে লাঙ্গল দিইগে; নীলনদের জল সরে গেছে। সবে ক্ষেতগুলি দেখা দিয়েছে, লাঙ্গল দেবার সময়টিও ভাল। তুই যা ঘরে গিয়ে বীজ নিয়ে আয়।" বাতাউ ছুটে বাড়ী গেলো।

গিয়ে দেখে তার বৌদি চুল বাঁধছে। সে তার বৌদিকে বললে, "ওঠ বৌদি। শীগ্‌গির বীজ দাও। দাদা বলেছে চট্ করে বীজ নিয়ে মাঠে যেতে হবে।"

এই বৌদি বাতাউকে দু চক্ষে দেখতে পারতো না। সে রেগে উঠে বললে, "যাও নিজে গিয়ে গোলাঘর খুলে যত খুশী বীজ নিয়ে যাও। আমার খোঁপা অর্ধেক বাঁধা হয়েছে, এখন উঠলে সব খুলে যাবে।"

বাতাউ একটা বড়ো ঝুড়ি নিয়ে গোলাঘরে গেলো। গিয়ে ঝুড়ি ভর্তি করে গম আর যব নিলে। যাবার সময় তার বৌদি জিজ্ঞেস করলে, "কত নিলে?" সে জবাব দিলো, "তিন মাপ্না যব আর দুই মাপ্না গম। সব সমেত পাঁচ মাপ্না। দেখে নাও।" এই বলে সে ছুটে মাঠে চলে গেলো।

সে যাবার পর তার দুষ্টু বৌদি গাময় নিজেই নিজেকে মেরে দাগ করে চুপ করে শুয়ে রইলো। তারপর সন্ধ্যা-বেলা তার দাদা মাঠের কাজ সেরে ঘরে ফিরলো। বাড়ী ফিরে দেখে তার বউ চুপ করে মাটিতে শুয়ে আছে। তার গায়ে মারের দাগ। ঘর অন্ধকার, আলো পর্যন্ত জ্বালা নেই।

তার দাদা বললে, "কী হয়েছে? ওঠো, ওঠো—কে কী বলেছে?" বউ বললে, "কে আর কী বলবে? সারা দিন ত বাড়ীতে আর জনমানব আসে না। আসবার মধ্যে এসেছিলেন তোমার গুণধর ভাই।"

এইটুকু শুনেই তার দাদা গেলো ভীষণ রেগে। সে ভাবলে বাতাউ নিশ্চয়ই তার বউকে মেরেছে। রেগে মেগে সে একখানা কুড়ুলে খুব শান দিয়ে গোয়ালঘরে ঢুকে দরজার পাশে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

এখন বাতাউ ত আর কিছু জানে না। সে রোজ যেমন মস্ত এক বোঝা ঘাস নিয়ে গরু চরিয়ে ফিরতো, তেমনি ফিরে এলো। প্রথম বাছুরটা গোয়ালে ঢুকেই বাতাউকে বল্লে, "এখন গোয়ালে ঢুকোনা। তোমার দাদা তোমায় খুন করবে বলে কুড়ুল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।"

বাতাউর একটা বিশেষ গুণ ছিলো। সে পশুপক্ষীর কথা বুঝতে পারতো। ততক্ষণে আবার দ্বিতীয় বাছুরটা ঢুকেও ঐ কথাই বল্লে। তখন বাতাউ মাথার বোঝা মাটিতে ফেলে উর্ধ্বশ্বাসে ছুট দিল।

ছুটল তার দাদাও তার পিছনে। তার দাদার সঙ্গে কী আর বাতাউ ছুটতে পারে?

তখন বাতাউ নিরুপায় হয়ে মিশরের সূর্যদেবতা হারমাকিস্‌কে ডেকে বল্লে, "সূর্যদেব তুমি ত জানো কোনটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যে?" এই শুনে সূর্য-দেবতার ভারি দয়া হোল, তিনি চক্ষের নিমেষে দুই ভায়ের মধ্যে একটা মস্তো বড়ো নদী সৃষ্টি করে দিলেন, তার মধ্যে বড়ো বড়ো মানুষখেকো কুমীর ভরা। হঠাৎ বাতাউ আর আনেপু দেখলে যে সেই নদীর একপারে একজন ও অপর পারে আর একজন।

বাতাউ এপার থেকে চেঁচিয়ে বল্লে, "দাদা ওপারেই থাকো। কাল যখন সকাল হবে, সূর্যদেব আকাশে উঠবেন, তখন এসে আমি তোমায় সত্য ঘটনা কি, তা জানিয়ে যাবো। আমি কি কখনো জেনেশুনে অন্যায় করতে পারি? আজ আমি চল্লুম, দেবদারু গাছ যে পাহাড়ে আছে সেই পাহাড়ে। কাল আসবো।"

আনেপু এপারে বসে রইলো। পরের দিন সকাল হলে বাতাউ এলো, ওপার থেকেই বল্লে, "দাদা, কেন মিছামিছি আমায় মারবার জন্য তাড়া করেছিলে? আমি তোমার ছোট ভাইটী হই, তুমি আর বৌদি আমায় ছোট্ট থেকে মানুষ করেছ, তোমাদের আমি বাবা আর মার মতন ভক্তি করি। তুমি কী বিশ্বাস করো যে তোমার ছোট্ট ভাই বাতাউ কখনো তার বউদির গায়ে হাত তুলতে পারে?" তারপর সে সব কথা খুলে বললে।

সব শুনে তার দাদার ভারী দুঃখ হোল। সে নিজের ভুল বুঝতে পারলে। হাউ হাউ করে কেঁদে বল্লে, "বাতাউ! ফিরে আয়!" তার ইচ্ছে হচ্ছিল ওপারে গিয়ে বাতাউকে বুকে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু কুমীরের ভয়ে সে জলে নামতে সাহস করলে না।

বাতাউ কিন্তু আর ফিরলো না। বললে, "দাদা, ভালোই হোল। মন্দ ভেবে এলে—ভালো বুঝে গেলে। এখন এক কথা বলি শোন,—বাড়ী যাও। গরুর পালের তুমিই দেখাশুনো কোরো। আমি আর যাবো না। আমি চল্লাম দেবদারু গাছ আছে যেখানে, সেই পাহাড়ে। তবে আমায় যদি কোন দিন খুঁজতে চাও, তা হলে কোথায় দেখা মিলবে বলে দিই শোন: আমি আমার "প্রাণ"টাকে আলাদা করে দেবদারু গাছের মাথায় সবচেয়ে উঁচুতে যে ফুলের কুঁড়ি আছে, তাইতে রেখে দেবো। দেবদারু গাছ কাটলেই ফুলটী মাটীতে পড়ে যাবে।

"যদিই আমায় খুঁজতে এসো, তা হলে সাত বছর ধৈর্য ধরে খুঁজতে হবে, তবেই দেখা পাবে। আসবার সময় সঙ্গে করে একটী পাত্রে ঠাণ্ডা জল এনো। আমার প্রাণ-শুদ্ধ ফুলের কুঁড়িটা সেই জলে রাখলেই আমি বেঁচে উঠে তোমার সঙ্গে কথা কইবো। আর এক কথা—আসবার সময় এক বোতল যবের জল মাটি দিয়ে মুখ এঁটে সঙ্গে করে এনো। আজ আমি যাই।"

এই বলে বাতাউ চলে গেলো সেই পাহাড়ে যেখানে দেবদারু গাছ আছে। তার দাদা কাঁদতে কাঁদতে মাথায় মুখে ধুলো মাখতে মাখতে বাড়ী গেলো। বাড়ী গিয়েই সে ধারালো কুড়ুলটা দিয়ে তার বউকে টুকরো টুকরো করে কেটে কুকুরকে খাওয়ালে। তারপর বসে বসে তার ছোট ভায়ের জন্যে কাঁদতে লাগলো।

এদিকে বাতাউ একলাটি দেবদারু বনের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। সারাদিন বনের জীবজন্তু শিকার করে। আর রাতের বেলা একটা উঁচু দেবদারু গাছের মাথার ওপরকার কুঁড়িতে নিজের প্রাণটা লুকিয়ে রেখে সেই গাছটার গোড়ায় ঘুমায়।

এমনি করে দিন যায়। একদিন মিশরের নয়জন দেবতা বেরিয়েছিলেন দেশে কার কী প্রয়োজন তারই তদারক করতে। একজন দেবতা বাতাউকে দেখে বল্লেন, "ওহে বাতাউ! তুমি তোমার বৌদি আনেপুর স্ত্রীর জন্য কেন ঘর দোর ছেড়ে এই নির্জন পাহাড়ে রয়েছ? তোমার বৌদি নেই, সে মরে গেছে, এবার বাড়ী ফিরে যাও।"

তার বৌদি খুব দুষ্টু ছিলো। কিন্তু তবু তার মরার খবর পেয়ে বাতাউর ভারী দুঃখ হোল। সে দেবতাদের হাতজোড় করে বল্লে, "হে দেবতারা! আমায় ক্ষমা করুন। আমি ঘরে ফিরে যেতে পারবো না।"

এখন এই দেবতাদের মধ্যে সূর্যদেবতাও ছিলেন। সব দেখে শুনে তাঁর ভারী দয়া হোল। তিনি আর একজন নুম নামে দেবতাকে বললেন, "নুম দেবতা!

তুমি বাতাউর জন্যে একটী বউ তৈরী করে দাও। আহা সে বেচারী একাটী থাকে।"

নুম দেবতা তক্ষুণি একটী অতি সুন্দর মেয়ে সৃষ্টি করে দিলেন। সে মেয়ের জোড়া দেশে মেলে না। মেয়েটিকে বাতাউব হাতে দিয়ে তাঁরা চলে গেলেন।

বাতাউ মেয়েটীকে খুব ভালবেসে ফেল্‌লে। তাকে যত্ন করে সে বাড়ীতে রাখলে আর সারাদিন শিকাব কোবে সে যা কিছু আনতো, সব সেই মেয়েটীকে দিতো।

শুধু সে রোজ যাবার সময় মেয়েটীকে বলে যেতো, "দেখো, ঘবেব বাইরে বেশী দুব যেন যেও না। সমুদ্রের ধারেও যেও না। কারণ সমুদ্র তোমায় নিয়ে গেলে তোমাকে আমি বাঁচাতে পারবো না। তারপব একদিন সে কোথায় তার প্রাণ লুকিয়ে রেখে ঘুমায়—সে কথা, আব তাব সারাজীবনের সব ঘটনা তাকে খুলে বললে।

এমনি করে কতদিন কেটে গেলো। সেদিন সকালে বাতাউ শিকার করতে বেরিয়েছে, আর তার বউ কুঁড়ের কাছাকাছি দেবদারু গাছগুলোর তলায় বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। এমন সময় দুর থেকে সমুদ্র তাকে দেখতে পেয়ে হুড়মুড় করে ছুটে এলো ধরবার জন্য। বেচাবী প্রাণভয়ে ছুটে এক লাফে তাব কুঁড়েটীতে গিয়ে দরজা বন্ধ করে রইল।

সমুদ্র কিন্তু নাছোড়বান্দা। ছুটে পালাবাব সময় দেবদারু গাছেব ডালে মেয়েটীব একগোছা চুল আটকে গিয়েছিল। সমুদ্র সেটা নিয়ে চলে গেলো।

সমুদ্র সেই চুলের গোছা নিয়ে ভাসাতে ভাসাতে চলে গেলো মিশরে। যেখানে মিশরের সম্রাট ফ্যারাওর কাপড় কাচা হত, সেইখানে নিয়ে গিয়ে সেটী রেখে দিলে।

এখন সেই চুলের এমনি সুগন্ধ ছিলো যে ফ্যাবাওএর সব কাপড় চোপড় সেই চুলের সুগন্ধে ভরে গেলো। ফ্যারাওএর ধোপারা বুঝতেই পারে না, কোত্থেকে সে গন্ধে এলো।

রোজকার এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে ফ্যারাও এর সর্দার ধোপা মহাচিন্তিত হয়ে পোড়ল। এর সন্ধান করতে সে সমুদ্রের ধারে এসে বোসল।

সে যেখানে এসে বোসল সেখানেই চুলের গোছাটী পড়ে ছিল। তার অসাধারণ সুগন্ধ দেখে সর্দার ধোপা তাড়াতাড়ি সেটী তুলে নিল। সে বুঝলে যে এই চুলের গোছাটীর জন্যেই কাপড়-চোপড়ে এত সুগন্ধ হয়। সে তখন সেটী ফ্যারাওএর কাছে এনে দিলে।

ফ্যারাও সেটী পেয়ে তৎক্ষণাৎ সভার গুণীদের ডাকালেন। গুণীরা দেখেশুনে বল্লেন, "হে মহিমান্বিত ফ্যারাও! এই চুলের গোছাটী সূর্যদেবতার এক মেয়ের। এখুনি তাকে খুঁজে আনতে দেশে দেশে লোক পাঠান। তবে দেবদারু গাছ যে পাহাড়ে আছে, সেখানে দুতের সঙ্গে বেশী লোক পাঠাবেন। কারণ হয়ত তার দেখা সেখানেই মিলবে। সম্রাট রাজী হলেন ও দেশে দেশে লোক পাঠালেন সেই মেয়ের খোঁজে।

বহুদিন পরে সকল দেশ থেকেই সব দুতেরা বিফল হয়ে ফিরে এলো। কেবল দেবদারু গাছের পাহাড়ে যারা গিয়েছিলো, তাদের মধ্যে মাত্র একজন ফিরে এলো। সে এসে বললে যে তার সঙ্গী সাথীদের বাতাউ মেরে ফেলেছে।

এই শুনে রাজা আবার অনেক সৈন্য সামন্ত, ঘোড়-সওয়ার পাঠালেন, সেই সূর্যকন্যাকে আনবার জন্য। বাতাউ তখন বাড়ী ছিল না। তারা গিয়ে ধরে বেঁধে মেয়েটীকে এনে ফ্যাবাওব কাছে হাজির কবলে।

রাজা তাকে দেখেই ভাল বেসে ফেল্লেন। তিনি তার মন ভোলাবার জন্যে নানা রকম দামী গয়না কাপড় তাকে দিতে লাগলেন। শেষে একদিন লোভে পড়ে গিয়ে মেয়েটী রাজার বাণী হতে রাজী হয়ে গেলো।

তখন ফ্যারাও তার কাছে তার ও তার স্বামীর ইতিহাস শুনতে চাইলেন। মেয়েটী সব কথা বললে। কোন দেবদারু গাছের ফুলেব কুঁড়ির মধ্যে তার স্বামীর প্রাণ থাকে, সেকথাও বলে দিলে, আর রাজাকে অনুরোধ করলে দেবদারু গাছটী কেটে ফেলতে যাতে তার স্বামী আর বেঁচে থাকতে না পারে।

এই শুনে বাজা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লোকজন পাঠিয়ে দিলেন সেই দেবদারু গাছ কাটবার জন্যে। বাজার লোকজন এসে সেই দেবদারু গাছ কেটে ফেললে। আর যে ফুলের কুঁড়িটীতে বাতাউর প্রাণ ছিল সেটী ছিঁড়ে ফেলে দিলে।

বাতাউ মরে গেলো।

এদিকে বাতাউর দাদা আনেপুর একদিন মনে হোল, তাই ত, অনেকদিন হয়ে গেলো, এইবার বাতাউকে খুঁজতে হবে ত। সে বাতাউর কথামত একটী পাত্রে যবের জল নিয়ে বেরিয়ে পড়লো বাতাউর খোঁজে।

যখন সে দেবদারু গাছের পাহাড়ে তার ভাইয়ের কুঁড়েতে এসে পৌছুল তখন সে দেখলে যে একটা মাদুরের ওপর বাতাউ মরে পড়ে আছে। তাই দেখে সে খুব খানিকটা কাঁদলে। কিন্তু সে দমলো না। বাতাউ যেমন ভাবে বলে দিয়েছিলো, তেমনি করে সে তার প্রাণের খোঁজ করতে লাগলো।

প্রত্যেক দেবদারু গাছের উপরকার ফুলকুঁড়িটি সে খোঁজে। কিন্তু হায়! বাতাউর প্রাণ সে কোথাও পায় না। এমনি করে তিন বছর ধরে খুঁজে খুঁজে সে হয়রাণ হয়ে গেলো। শেষে যখন চার বছর হোল তখন সে হতাশ হয়ে ভাবলে, "নাঃ এবার মিশরেই ফিরে যাই।"

তবুও পরের দিন ভোরবেলা সে শেষবার প্রতি দেবদারু গাছের কাছে গিয়ে গিয়ে খোঁজ করে দেখলে। কিছু না পেয়ে সন্ধ্যাবেলা বাতাউর কুঁড়েতে ফিরবার বেলা সে চারদিকে তাকাতে লাগলো,—যদিই যাবার সময় বাতাউর প্রাণের খোঁজ কোথাও পায়। হঠাৎ একটা ফুল তার নজরে পড়লো—তুলে দেখে—একি। তাতেই বাতাউর প্রাণ লুকানো রয়েছে।

সে তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা জলের মধ্যে প্রাণটীকে ভিজিয়ে রেখে দিলে। ক্রমে ক্রমে বাতাউর মৃতদেহ ধীরে ধীরে নড়ে উঠলো।

[এখানে বলে রাখা দরকার যে আমরা একালে তিন বৎসরের মৃতদেহ কিরূপে অবিকৃত থাকতে পারে তা ধারণাই করতে পারি না। কিন্তু প্রাচীন মিশরীয়েরা এমন সব ওষুধ জানতো যে তারা মৃতদেহগুলিকে সেই ওষুধ মাখিয়ে রেখে দিলে, বহুদিন ধরেও সেই দেহগুলি নষ্ট হত না। মিশরের পিরামিডের মধ্যে প্রাপ্ত এই রকম রক্ষিত মৃতদেহ—"মমি" সহস্র সহস্র বৎসর পর্যন্ত এক অবস্থায় আছে। সুতরাং সে যুগে তিন বৎসরের পুরাণো মৃতদেহ মনে হয় খুবই সাধারণ জিনিষ ছিল। তাই হয়ত গল্প-লেখক "আন্নানা" কী করে তিন বৎসর ধরে মৃতদেহটী ছিল, তা আর বিশদ করে বুঝিয়ে বলেন নি।]

বাতাউ আস্তে আস্তে তার দাদার দিকে তাকালে। কিন্তু তখনো তার দেহে প্রাণ নেই। তাই তার দাদা তাড়াতাড়ি প্রাণশুদ্ধ সেই ঠাণ্ডা জলটা বাতাউকে খাইয়ে দিলে—অমনি তার ধড়ে প্রাণ এসে গেলো। তারপর দুই ভাই অনেকক্ষণ পরস্পরকে বুকে জড়িয়ে বসে থাকল।

বাতাউ তার দাদাকে সব কথা বললে। তারপর বল্লে, "দেখো দাদা, আমি এখনি চেহারা বদলে দৈবচিহ্ন-যুক্ত বৃষরূপ ধারণ করছি। তুমি আমার পিঠে চড়ে মিশরে যেখানে আমার স্ত্রী ফ্যারাওএর রাণী হয়ে বসে আছে, সেখানে নিয়ে যেও। আমাকে দেখে পয়মন্ত বৃষ ভেবে সকলে খুব আদর যত্ন করবে। দেশে সকলে আমায় পুজো করবে। তোমায় ফ্যারাও ভারে ভারে সোনা রূপা দেবেন। সেই সব নিয়ে তুমি দেশে ফিরো। আমায় সেখানেই রেখে যেও।" আনেপু তাতেই রাজী হোল।

আনেপু ফ্যারাওএর দরবারে গিয়ে পৌছুল। তার সঙ্গে সেই দৈবচিহ্ন দেওয়া বৃষরূপী বাতাউকে দেখে রাজা ভারী খুশী হলেন। মস্ত ভোজ আর ধুমধাম করে দেশের সবাইকে জানান হল যে এই দৈবীবৃষ রাজার ও রাজ্যের ভাগ্য ফিরিয়ে দেবে। ফ্যারাও আনেপুর খুব খাতির যত্ন করলেন। তাকে বহু ধন রত্ন দিয়ে তার গ্রাম পর্যন্ত পৌছে দিয়ে আসা হোল। ফ্যারাও তাকে অনেক চাকর বাকরও দিলেন।

সেই বৃষের জন্য একটা পবিত্র মন্দির তৈরী করে তাকে অতি সমাদরে রাখা হোল।

বহুদিন পরে একদিন রাণী (অর্থাৎ যে আগে বাতাউর বউ ছিলো) একলাটি সেই মন্দিরে এসেছেন, এমন সময়ে সেই বৃষ বল্লে, "এদিকে তাকিয়ে দেখো আমি এখনও বেঁচে আছি।" রাণী আৎকে উঠে বল্লেন, "তুমি কে?"

বৃষ বল্লে, "আমি সেই বাতাউ, যার প্রাণ কোথায় আছে তুমি ফ্যারাওকে বলে দিয়েছিলে, যাতে আমি মরে যাই। চেয়ে দেখো, আমি বেঁচে আছি, শুধু অন্যরূপ ধরে—বৃষ হয়ে আছি।"

এই না শুনেই রাণী ভীষণ ভয় পেয়ে পালিয়ে গেলেন। রাজবাড়ীতে গিয়ে তিনি গোঁসা করে শুয়ে থাকলেন। রাজা এলেন মান ভাঙ্গাতে। তখন রাণী বল্লেন, "আগে বলো আমি যা চাইব তাই দেবে, তবেই আমি উঠবো, নাইবো, খাবো।" রাজা অগত্যা রাজী হলেন।

রাণী বললেন—তোমার দৈবী বৃষর আর কোন শক্তি নেই; ওকে কেটে তার কলজেটা আমায় দাও, আমি খাবো।

রাজার বড় দুঃখ হোল। কিন্তু কী করেন, কথা দিয়ে ফেলেছেন। শেষে তিনি ঐ বৃষটী বলি দেবার হুকুম দিলেন।

রাজার অনুচরেরা যেই বৃষের গলায় এক ঘা মেরেছে, অমনি ফিন্‌কি দিয়ে দু'ফোটা রক্ত রাজার সিংহদ্বারের দুপাশে গিয়ে পড়লো। অমনি দেখতে দেখতে ফ্যারাওএর সিংহদ্বারের দুই পাশে দুটী সুন্দর পারসীয়া গাছ গজিয়ে উঠলো।

অনুচরেরা রাজাকে গিয়ে খবর দিলে; হুজুর দৈবী বৃষকে বলি দেবার পর সিংহদ্বারের দুই পাশে দুটি সুন্দর পারসীয়া গাছ গজিয়েছে।

তার বহুদিন বাদে একদিন মহামান্য ফ্যারাও, রত্নমালা, ফুলের মালা গলায় দিয়ে সোনার রথে চড়ে সভা থেকে ফিরছেন। পিছনের একটি রথে রাণীও আসছেন। যেমন তাঁরা পারসীয়া গাছের নীচ থেকে ফিরছেন, পারসীয়া গাছ রাণীকে বললে—ওরে দুষ্টু স্ত্রীলোক! আমি সেই বাতাউ। গাছরূপ ধরে আজও বেঁচে আছি।

এই শুনে রাণী গোঁসাঘরে গিয়ে আবার গোঁসা করলেন। রাজা এলেন আবার মান ভাঙ্গাতে। রাণী বললেন আগে বলো আমি যা চাইবো তাই দেবে, তবেই আমি উঠবো, নাইবো, খাবো। রাজা রাজী হলেন। তখন রাণী বললেন, সিংহদ্বারের দুই পাশের দুটো পারসীয়া গাছ

কাটিয়ে তার তক্তা করিয়ে দাও। আমি অনেক জিনিষ তৈরী করবো। অবশেষে রাজা তাই হুকুম দিলেন।

ভালো ভালো কারিগর ছুতোর মিস্ত্রীরা এলো পারসীয়া গাছ কাটবার জন্য। রাণী নিজে দাঁড়িয়ে গাছ কাটাতে লাগলেন। যেই না গাছটাতে প্রথম ঘা দিয়েছে, অমনি কাঠের কুচিগুলো উড়ে রাণীর মাথায় মুখে গিয়ে পড়লো। একটা কুচি সুট করে একেবারে পেটের ভিতর গিয়ে ঢুকলো।

তারপর কতদিন বাদে রাণীর একটী ছেলে হোল। রাজা ছেলের মুখ দেখে ভারী খুশী হলেন। দেশশুদ্ধ সবাই খুব উৎসব করতে লাগলো।

একটু বড় হতেই ফ্যারাও রাজপুত্রকে ইথিওপিয়ার যুবরাজ করে দিলেন। তার পর বেশ জোয়ান হতেই রাজা তাকে সমস্তদেশের রাজ-প্রতিনিধি করে দিলেন।

এমনি করে দিন যায়। শেষে বুড়ো ফ্যারাও মরে স্বর্গে গেলেন। তাঁর জায়গায় তাঁর ছেলে ফ্যারাও হলেন।

রাজা হয়েই তিনি সমস্ত দেশ বিদেশের গণ্যমান্য লোকদের ডেকে এক বিরাট সভার আয়োজন করলেন। সেই সভায় তিনি বাতাউর কাহিনী আগাগোড়া বলে, শেষে বললেন যে তিনিই সেই বাতাউ। কাঠের কুচো হয়ে তিনিই রাণীর পেটে ঢুকে ছিলেন আর রাণীর ছেলে হয়ে তিনিই জন্মেছেন। তখন দেশের লোকে সেই দুষ্টু রাণীকে ভীষণ শাস্তি দিলে।

তার পর বাতাউ তার দাদা আনেপুকে ডাকিয়ে পাঠিয়ে সমস্ত দেশের রাজ-প্রতিনিধি করে দিলে। নিজে বাতাউ ত্রিশ বৎসর ঈজিপ্তে রাজা হয়ে রইলো।

ত্রিশ বৎসর পর বাতাউ মারা গেলে তার দাদা তার জায়গায় রাজা হোল।

[সেই পুরাতন তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বের পুঁথিতে লেখা প্রথম কাহিনী এখানেই শেষ হয়েছে। যে Papyrusএ এই কাহিনীটী ছবির অক্ষরে লেখা আছে, সেই ঝুরঝুরে প্রাচীন Papyrus আজও ব্রিটীশ মিউজিয়ামে মজুদ আছে। তোমরা বড়ো হয়ে দেখে এসো।]

প্রতীক্ষা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

দিদিমা মোদের যেতেন গঙ্গা নাইতে,
গোরুর গাড়ীর পথ চেয়ে থাকি মোরা
সে চাওয়া মিষ্ট সব প্রতীক্ষা চাইতে,
প্রাপ্যের চেয়ে আনন্দ বুক জোড়া।

২

দূরে বহু দূরে যেত খর শিশু দৃষ্টি,
সকল গাড়ীকে মনে হ'ত সেই গাড়ী,
বলদের রঙ বদলাতো অনাসৃষ্টি
টপ্পরগুলা ভ্রম লাগাইত ভারী।

৩

ছুটিয়া যেতাম দূর থেকে গাড়ী দেখে,
গাড়ী নয় মহারাণীর সে ভাণ্ডার,
সকল জিনিষই আসিত আদর মেখে—
বাঁশী টুমটুমি লাট্টু কত কি আর।

৪

দিদিমার হাসি টবটবে স্নেহরসে
সে দৃষ্টি শুধু সোহাগ মমতা মাখা,
প্রাণ ঢের শোনে—কাণে কটা কথা পশে
মোরা মৌমাছি, দিদিমা আঙুর পাকা।

৫

সে পথ চাওয়ায় শুধু আনন্দ আশা,
ছিলনাক দ্বিধা, শঙ্কা, কি সঙ্কোচ,
কানায় কানায় পূর্ণ সে ভালবাসা
মেনকার গৃহে অমৃতের যেন ভোজ।

৬

তারপর কত বছর চলিয়া গেছে
জীবন কাটিল কেবলি প্রতীক্ষায়,
আনন্দের সে স্মৃতিটুকু মনে আছে
মোছা আলিপন উৎসব-আঙিনায়।

৩১শে মার্চ মঙ্গলবার বেলা ১২টা

তাপসরঞ্জন সরকার

ষোড়শ

(সবিৎবাবুর উক্তি)
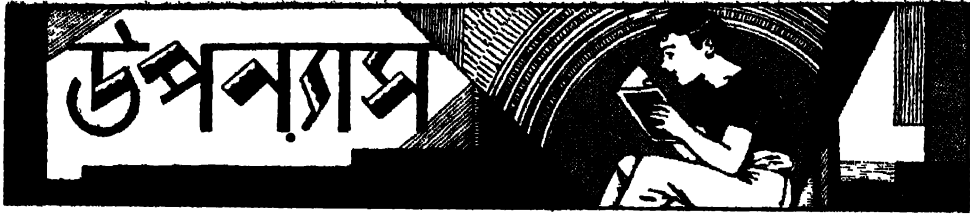
অদ্য ৬ই ফেব্রুয়ারী। সবে মাত্র ভোরের প্রথম কাক ডেকে উঠেছে। সকলের আগে অশোক ঘুম থেকে উঠে ঠাকুরকে চায়ের হুকুম দিল। চা পান শেষ করে অশোক কাউকে না জানিয়ে বাড়ী থেকে চুপ করে বেরিয়ে পড়ল।

ক্রমশঃ যমুনার গর্ভ থেকে সোনার থালার ন্যায় উজ্জ্বল সূর্যদেব ধীরে ধীরে নভোমণ্ডলে উদিত হলেন। পূব দিকের জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে সূর্যদেবের রঙিন রক্তচ্ছটা প্রবেশ করে সরিৎবাবুর বিছানায় লুটোপুটি খেতে আরম্ভ করল। সবিৎবাবু রবিকরস্পর্শে জাগ্রত হয়ে শয্যা ত্যাগ করলেন। খাবার ঘরে প্রবেশ করে দেখলেন যে বিজয় ও সমীর তাঁর জন্যই অপেক্ষা করছে। বিজয় বল্লে, "বসুন, আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।" সরিৎবাবু খেতে খেতে বল্লেন, "বেশ জিজ্ঞাসা করুন।" বিজয় প্রশ্ন করলে, "আপনার বাড়ীতে ক'জন লোক থাকে?" সবিৎবাবু বল্লেন, "আমার ছেলেমেয়েরা সব দেশের বাড়ীতেই থাকে। এখানে শুধু আমি, স্বর্গীয় জমিদার বাবুর একজন আমলা, ঠাকুর আর চাকর বাকর মোট সবশুদ্ধ ছ'জন থাকি।" বিজয় বল্লে, "কাল রাত প্রায় চারটার সময় থানা থেকে একজন লোক এসে আমাকে খবর দিয়ে যায় যে সরিৎবাবুকে পাওয়া যাচ্ছে না, অর্থাৎ তিনি নিরুদ্দেশ। জমিদারের সেই আমলাটির নামটা যেন কি? হ্যাঁ, মনে পড়েছে, দিলীপবাবু। তিনিই নাকি থানায় গিয়ে এই খবর দিয়েছিলেন। থানার লোকটিকে আমি সব কথা জানিয়েছি। বাড়ীতেও খবর পাঠানো হয়েছে। সুতরাং আপনি নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন। এখন আমার জিজ্ঞাস্য হচ্ছে এই যে, কেষ্টা বলেছিলো যেদিন উইল চুরির কথা প্রকাশ হয় তার পর দিন থেকে আপনি তার উপর একটু কড়া নজর রাখতেন, কিন্তু কেন?" সরিৎবাবু বল্লেন, "আমার মনে হয়েছিল এটুকু যে কেষ্টা এই ব্যাপারে নিশ্চয় জড়িত ছিল।" "আচ্ছা, আর একটা কথা, সেদিন সকাল বেলায় একটা গুপ্তচর এসে আমার বাড়ীর কাছে কোথাও লুকিয়ে ছিল, এবং যখন সমীর বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায় তখন সে তার পিছু নেয় কিন্তু তাকে ধরতে না পেরে অন্য রাস্তায় বাইসিকেল ঘুরিয়ে দেয়, কিন্তু, আমি সেদিকে লক্ষ্য রেখে আবার তাকে অনুসরণ করি এবং অবশেষে কি দেখতে পাই জানেন? দেখি যে সেই লোকটি আপনার বাড়ীতেই ঢুকে পড়লো। নিশ্চয় লোকটা আপনারই গুপ্তচর, নইলে আপনার বাড়ীতে ঢুকবে কেন? কিন্তু এটা বুঝতে পারছিনা যে আপনি কি উদ্দেশ্যে তাকে আমার বাড়ীর কাছে পাহারায় নিযুক্ত করেছিলেন?" সরিৎবাবু বললেন, "দেখুন বিজয়বাবু, আমি আপনাকে বহুদিন থেকেই চিনি এবং আপনিও আমাকে চেনেন। সেই ভরসাতেই আমি বলছি যে আপনি যে ঘটনা বল্লেন আমি তার বিন্দুবিসর্গও জানিনা। কথাটা হয়ত আপনি অবিশ্বাস করবেন কিন্তু আমার এমন কোন প্রমাণ নেই যা উপস্থিত করলে আপনি বিশ্বাস করবেন।" বিজয় বল্লে, "না, না, বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা হচ্ছে না। আর আপনি যে দোষী নন সে প্রমাণ আমি আগেই পেয়েছি। তবে একটা কথা হচ্ছে এই যে সেদিন লোকটা যখন আপনার বাড়ী ঢোকে তখন আমি বাড়ী ফিরে—এক কাপড়-ওয়ালার বেশ ধরে আপনার বাড়ীতে যাই কিন্তু আপনি কাপড় না রেখেই আমায় বিদায় দিলেন। তারপর বাইরে এসে আমি এক জায়গায় বসে থেকে আপনাদের অনেক কথাবার্তা শুনি। একজন লোক বলছিল, "সরিৎবাবু, আপনি যদি আমায় তিনশ টাকা দেন তাহলে আমি যে কোরেই হোক নবীনের কাছ থেকে উইল এনে আপনাকে দেব।" তখন আমি বুঝতে পারলুম যে উইলখানা নবীনের কাছেই আছে। কিন্তু সেই লোকটা

আপনাকে উইল এনে দিতে চাইল কেন? এবং আপনিই বা সে উইল চাচ্ছিলেন কেন? সরিৎবাবু বল্‌লেন, "দেখুন, আমার বন্ধুর ছেলের উইল, আমি তার অভিভাবক, আমি চাইব না ত চাইবে কে? আর যদি চাইলেই পাওয়া যেত তাহলে কি কাল আপনার আর আমার সলিলসমাধি হত? তবে আমার উইল চাইবার আরও কারণ ছিল। প্রথমতঃ সঞ্জীববাবুর মৃত্যুর পর যে দিন অজয় আমার কাছে উইলটি এনে তার মানে বুঝিয়ে দিতে বল্‌লে সেদিন আমি তাকে মানে বুঝিয়ে দিইনি বরং যথাস্থানে আবার সেটাকে রেখে দিতে বলেছিলাম। সেটাই আমার সবচেয়ে বড় ভুল হয়েছিল এবং সেইজন্যই এখন অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছি। কিন্তু তাকে তখন মানে না বুঝিয়ে দেবার কারণ কি জানেন? সেটা হচ্ছে এই যে সঞ্জীববাবু আমাকে না জিজ্ঞেস করেই এইরূপ উইল করেছিলেন এবং যখন উইলখানি আমি অজয়ের হাতে দেখতে পাই তখন আমার মনের মধ্যে একটা দারুণ সংশয় ও ধিক্কার উপস্থিত হয়। এবং নিজেকে এর জন্য দায়ী বলে মনে হয়, অজয়কে উইল-খানি রেখে দিতে বলে আমি বাড়ী চলে যাই। আমার মনে ধিক্কার আসার প্রধান কারণ হচ্ছে যে আমিই যথাসময়ে সঞ্জীববাবুকে উইল প্রস্তুত করতে দিইনি এবং সেইজন্যই তিনি পরে অন্য কারো হাতে পড়ে বা অন্য কারো ভীতিজনক নির্দেশে নিরুপায় হয়ে এরূপ উইল প্রস্তুতে বাধ্য হয়েছেন, সুতরাং এই উইল প্রস্তুত ব্যাপারে সম্পূর্ণ দোষী আমিই। আমি ভেবেছিলুম আরও দীর্ঘকাল তিনি বাঁচবেন এবং সেই জন্যই বলেছিলুম পরে উইল করলেই চলবে। কিন্তু তখন যদি উইল করতেন তবে এসব কাণ্ড আর হতে পারত না। যাক্, তারপর উইল চুরি হ'তে আমার মনে এত অনুতাপ হোল যে আমি স্থির করলুম, যে কোরেই হোক্ উইলখানি উদ্ধার করে যথাসময়ে অজয়ের হাতে পৌঁছে দেব এবং তারপর থেকে কি কি করেছি তা হয়ত আপনি জানেন।"

বিজয় বললে, "আপনাকে আর একটী কথা আমার জিজ্ঞাসা করবার আছে। ৩রা ফেব্রুয়ারী রাত্রে আপনার ও নবীনবাবুর লঞ্চ দুটো যখন দেখতে পাই, এবং লঞ্চ দুটোর একটীর মালিক আপনি জানতে পেরে গভীর রাত্রিতে আমি আপনার বাড়ীতে যাই এবং জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ঘরের ভিতর কি কথাবার্তা হচ্ছিল শুনতে চেষ্টা করি, কিন্তু কোন কথা বুঝতে না পেরে বাড়ী ফিরে যাই। বাড়ীতে গিয়ে সদর দরজা বন্ধ করতে গিয়ে একটী লোককে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি, এবং তাকে আমার অনুসরণকারী বলেই মনে হয়। এখন জিজ্ঞাসা করছি, সে কি আপনার লোক?" সরিৎবাবু বললেন, "ও, আপনি সেই রাত্রির কথা বলছেন? হ্যাঁ, সেই লোকটী আমারই নিযুক্ত। আপনার বোধ হয় মনে নেই যে যখন আপনি জানালা থেকে নামতে চেষ্টা করেন তখন জানালার খিড়কীতে একটী শব্দ হয়েছিল, এবং শব্দ হওয়ামাত্র আমি সেদিকে তাকাই এবং দেখতে পাই যে একখানি হাত জানালা থেকে চট করে সরে গেল। অমনি আমি একটী লোককে বাইরেটা দেখে আসতে বল্লুম। সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর আমাদের নিজেদের মধ্যে কথা-বার্তা চলতে লাগল কিন্তু সে লোকটীর আর দেখা নেই। প্রায় আধঘণ্টা পর সে এসে উপস্থিত। তাকে দেরী হবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বল্লে, "আমি বাইরে গিয়ে একটী লোককে দেখতে পাই। অন্ধকারে তাকে চেনা গেল না কিন্তু সে কোথায় যায় তা দেখবার জন্য তার পিছু পিছু চলতে থাকি। অবশেষে দেখলুম সে বিজয়বাবুর বাসায় ঢুকলো। ভাবলুম উনিই হয়ত বিজয়বাবু হবেন। এই জন্যই ফিরতে দেরী হল।" তার কথা শুনে আমরা অনুমান করলুম আপনি হয়ত ইতিমধ্যে এর পিছনে লেগে গিয়েছেন। আমরা তখন এই ভেবে নিশ্চিন্ত হলুম যে আপনি যখন এই উইলঘটিত ব্যাপারের পিছনে লেগেছেন তখন আমরা উইল উদ্ধার করতে না পারলেও আপনি এর একটা কিনারা না কোরে ক্ষান্ত হবেন না।" এই বলে সরিৎবাবু চুপ করলেন। আজকের এই কথাবার্তায় বিজয় ও সমীরের মনে সরিৎবাবুর সম্বন্ধে যে সকল মন্দ ধারণা ছিল তা সব একসঙ্গে অন্তর্হিত হয়ে গেল এবং সরিৎবাবুর উপর তাদের একটা শ্রদ্ধার উদ্রেক হোল। বিজয় বললে, "আচ্ছা। তা হলে আপনি বাড়ী যান। কোন দরকার হোলে আপনাকে ডাকব। এ সম্বন্ধে আপনাকে আর মাথা ঘামাতে হবেনা। যা করবার আমিই করব। কিন্তু, কই? অশোক কোথায়? সে যে এখনও এলনা?"

এতক্ষণ জরুরী কথাবার্তা চলাতে অশোকের কথা কারুরই মনে পড়েনি। হঠাৎ বিজয়ের খেয়াল হল যে অশোক তো এখনও খাবার ঘরে আসে নি। কিন্তু, বিছানাও যে খালি, অশোক ত নেই। সমস্ত বাড়ী খুঁজে অশোককে না পেয়ে শেষে বিজয় ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলে, "অশোক বাবু কি খেয়ে গেছে?" তিনি তো সেই সকালে বেরিয়ে গেছেন?" "খেয়ে গেছেন কিছু?" "হ্যাঁ, আমি তাঁকে চা টোস্ট করে দিয়েছুম।" "কিছু বলে যায় নি?" "শুধু বলেছেন, বিজয়কে বলো আমার ফিরতে দেরী হোতে পারে।" "এতক্ষণ তুমি আমাকে কিছু বলনি কেন?" "মনে ছিল না বাবু তাই!" বিজয় তখন সমীরকে বল্লে, "বুঝেছি। কাল রাত্রে সে যা বলেছিল তা করবে তবে ছাড়বে। যা গোঁয়ার ছেলে! প্রাণ দেবে তবু কথার নড়চড় করবে না।"

(ক্রমশঃ)

পূর্ববঙ্গের ভূঁইয়া

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(৪)

পূর্বে বলিয়াছি ঈশা খাঁর রাজধানী ছিল খিদির-পুরে।* তাহারই কিছুদূরে শিবপুর গ্রাম। এই গ্রামখানি ও চতুঃপার্শ্বস্থ জমির মালিক ছিলেন বলরাম ও তাঁহার অবিবাহিতা ভগ্নী যশোধারা। তাঁহারা কৃষক রাখিয়া চাষআবাদ করিতেন। প্রচলিত প্রথানুসারে উৎপন্ন ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ রাজসরকারে খাজনা স্বরূপ প্রদত্ত হইত এবং দুই-ষষ্ঠাংশ কৃষকরা পারিশ্রমিক স্বরূপ পাইত। তৎকালে জমিতে সোনা ফলিত; সোনা ফলিত বলিয়াই বাংলা দেশ সোনার বাংলা নামে পরিচিত হইত। হাজা, শুখা, মরা, অজন্মা বাংলায় ছিল না। যে বৎসর প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইত, সে বৎসর টাকায় আট নয় মণ চাল বিক্রয় হইত। আর এখন?…হায়, সোনার বাংলা!

বলরামের তিন মহল বাড়ী ছিল নদীর উপর। প্রথম মহলে বেতনভোগী কৃষকরা থাকিত, আর বিস্তৃত অঙ্গনের তিন পার্শ্বে থাকিত বিশালোদর ধানের মরাইনিচয়। মাঝের মহলে থাকিতেন অতিথি অভ্যাগত। আর নদীবকূলে যে মহল তাহাতে ভ্রাতা ও ভগ্নী পরিচারকবর্গ সহ বাস করিতেন। ভ্রাতা ও ভগ্নী উভয়েই অস্ত্রচালনায় সুনিপুণ। দাসদাসী ও কৃষকদেরও কিছু কিছু অস্ত্রশিক্ষা ছিল। তখনকার দিনে সকলকেই কিছু কিছু অস্ত্রচালনা শিখিতে হইত।

যশোধারার রূপের খ্যাতি চারিদিকে রাষ্ট্র। কেহ তাহার সঙ্গে স্বর্গের অপ্সরীর, কেহ বা দেবী ভগবতীর তুলনা করিত।

যশোধারা রূপসী, বিদুষী, বুদ্ধিমতী, অস্ত্রচালনায় সুনিপুণা। তাহার রূপ-গুণের খ্যাতি শুনিয়া বহু রাজা মহারাজা যশোধারার পাণিপ্রার্থী হইয়াছিলেন, কিন্তু সকলেই প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিলেন। তাহার পিতার নির্দেশ ছিল যে, যে ব্যক্তি ঈশা খাঁর বিচারে শ্রেষ্ঠ বীর বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে তাহার হস্তে যশোধারাকে প্রদত্ত হইবে। ঈশা খাঁ কয়েক ক্ষেত্রে উদয়নারায়ণের শিক্ষা ও শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকেই যশোধারার উপযুক্ত পাত্র স্থির করিয়াছিলেন, এবং তদনুযায়ী বাক্‌দান উৎসব মহা আড়ম্বরে সম্পন্ন হইয়াছিল। পূর্বেই বলিয়াছি সামাজিক বিবাহ ঘটিতে পারে নাই যুদ্ধের গোলমালে।

পরিচয়ের পর আখ্যায়িকা।

একদা সন্ধ্যার পাঁচ সাত দণ্ড পরে ভ্রাতা ভগ্নী ভোজনে বসিয়াছেন। বাতায়ন নিম্নে নদী; আকাশে চাঁদ; চন্দ্রকিরণ চঞ্চল জলে ছিন্নভিন্ন হইয়া লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের সৃষ্টি করিয়াছিল। ধারা তাহা দেখিতে দেখিতে কহিল, "মোগল বাদশা আমাদের সোনার ভারতকে ছিন্নভিন্ন করেছে। আমাদের চাঞ্চল্য, অনৈক্য হ'ল পরাধীনতার মূল কারণ—"

"তুমি খাচ্ছ না কেন ধারা? নদী দেখ্‌লে ত পেট ভরবে না।"

"কি জানি, আজ আমার মন কেন চঞ্চল হয়েছে। মন বলে দিচ্ছে আমাদের সম্মুখে মহা বিপদ্‌।"

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে প্রাসাদের প্রবেশ-দ্বারসমীপে একটা গোলমাল উঠিল। উভয়ে একবার উৎকর্ণ হইয়া শুনিলেন, পরে আহার ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। রুদ্ধ দ্বারে কে বা কাহারা যেন কুঠারাঘাত করিতেছে এইরূপ মনে হইল। ক্ষণমধ্যে দ্বার ভাঙ্গিয়া পড়িল। ভ্রাতা ভগ্নী চমকিয়া উঠিলেন, অবিলম্বে অস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া বাহিরে আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন, ভৃত্য ও কৃষকেরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আক্রমণকারী একদল দস্যুকে বাধা দিতেছে। তাহাদের অস্ত্রের মধ্যে ছিল কুঠার, আর শস্ত্রের মধ্যে ছিল শূল ও শলাকা। সরি

* বর্তমান নারায়ণগঞ্জ হইতে এক মাইল উত্তরে।

কয়েকজনের হাতে ধনুঃশর খড়্গ তুলিয়া দিয়া নিজে খড়্গ হস্তে দাঁড়াইয়াছিল, প্রতিবেশীরাও আসিয়াছে, কেহ পীড়ার ভান করিয়া গৃহদ্বার বন্ধ করতঃ নীরব থাকে নাই, অথবা ঘর ছাড়িয়া জঙ্গলে আশ্রয় লয় নাই। যাহার যা' অস্ত্র ছিল তাহা লইয়া আসিয়াছে। তবে তাহাদের শিক্ষা সামান্ত এবং তাহারা সংখ্যাতেও অল্প। যতই অল্প হউক স্বধর্মীকে সাহায্য করিতে, বিপন্নকে রক্ষা কবিতে বাঙ্গালী ছুটিয়া আসিল। আক্রমণকারীরা প্রবল, দলেও ভাবি—চাঁদ রায়ের শিক্ষিত সৈন্য। তথাপি অপদার্থ দলপতি জনার্দন দিবালোকে বলরামের গৃহ আক্রমণ করিতে সাহস পায় নাই। জঙ্গলে লুকাইয়া থাকিয়া রাত্রিতে চন্দ্রালোকে পথ দেখিয়া অগ্রসর হইয়াছিল। আসিয়া দ্বাব ভাঙ্গিল। প্রতিবেশী ও কৃষকরা বাধা দিল, ভৃত্যেরা খড়্গাদি আস্ফালন করিল। কিন্তু সমস্তই বৃথা হইল। বলরাম সবিকে রক্ষা করিতে গিয়া নিজে নিরস্ত্র হইলেন। তদ্দৃষ্টে ধাবা তরবাবি ছাড়িয়া ধনুঃশর ধবিলেন। প্রত্যেক শর নিক্ষেপে এক এক দস্যু আহত বা নিহত হইল। তখন জনার্দন প্রমুখ কয়েক ব্যক্তি ছুটিয়া আসিয়া ধারাব উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং তাহার ধনুঃশব কাড়িয়া লইল। জনার্দন ধারার দক্ষিণ হস্ত চাপিয়া ধরিয়া চীৎকার করিল, "পেয়েছি, পেয়েছি, যার জন্যে আসা তাকে পেয়েছি—বেঁধে নিয়ে—"

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে জনার্দনেব দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া পড়িল। জনার্দন ফিরিয়া দেখিল, তাহার সম্মুখে মহাকালরূপে উদয়নাবায়ণ। যন্ত্রণায় ও ভয়ে জনার্দন অধীর হইয়া বিকৃতকণ্ঠে কহিল, রক্ষে করুন, আমার অপরাধ নেই—মনিব পাঠিয়েছেন—"

"কে তোর মনিব ?"

"চাঁদ রায়।"

"তোর মিথ্যে কথা—তিনি মহৎ লোক—আমাদের সুহৃদ্।"

"মহৎ ছিলেন, কিন্তু এখন ঈশা খাঁ রাজাকে রাগিয়েছে।"

বলিতে বলিতে জনার্দন পড়িয়া গেল। তাহার অনুচরেরা ছুটিয়া আসিয়া উদয়কে আক্রমণ করিল। উদয়েব সঙ্গে কতিপয় শরীররক্ষী ছিল; তিনি তাহাদের সাহায্যে দস্যুদিগকে নিপাত কবিতে লাগিলেন। নিজেও অক্ষত বহিলেন না। দেহময় বক্তরাগ। সবি ও ধারা উভয়ে ধনুঃশর লইয়া দাঁড়াইল, ভৃত্যেবা নবশক্তি লাভ করিয়া কুঠারাঘাতে শত্রু মারিতে লাগিল। দস্যুরা অবশেষে পরাস্ত হইয়া পলায়নপর হইল।

গৃহ শত্রুমুক্ত হইলে নিজে শ্রান্ত ও আহত হইলেও উদয়নারায়ণ জনার্দনের চৈতন্যশূন্য দেহ বাহুমধ্যে উঠাইয়া লইয়া নিকটেব এক কক্ষে আনিলেন এবং তাহার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাঁর অবস্থা তখন শোচনীয়,—রক্তপ্লাবিত—স্বল্পকাল মধ্যে তিনি জ্ঞান হাবাইয়া পড়িয়া গেলেন। তখন তাঁহাব দেহ ধারা ও বলরাম উঠাইয়া লইয়া গেলেন তাঁহাদের কক্ষে। সবি দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। [ক্রমশঃ

বছরের পর বছর কেটে যেতে লাগল। আমুণ্ড সেন কতৃক দক্ষিণ মেরু-কেন্দ্রও আবিষ্কৃত হল। কিন্তু, তবুও মেরুপ্রদেশ দুঃসাহিক মানুষকে তখনও পর্য্যন্ত আকর্ষণ করতে লাগল।

স্যাকল্টন আবার মেরুপ্রদেশে যাত্রা করলেন। এবার আর মেরুকেন্দ্রে যাবার জন্য নয়, মেরুপ্রদেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অতিক্রম করবার জন্য। এবার তিনি যে জাহাজে যাত্রা করলেন তার নাম "এনডিওবেন্স"।

অবশেষে তাঁরা মেরুপ্রদেশের মধ্যে প্রবেশ করলেন, এবং আগের দুবার যে যায়গায় এসে, তাঁদের বরফের বাধার জন্যে থামতে হয়েছিল, এবারেও সেখানে এসে তাঁরা থামলেন। তখন শীতকাল। তাই তাঁরা অপেক্ষা করতে লাগলেন। ক্রমশঃ তাঁদের জাহাজের

চতুর্দিকে বরফ জমতে শুরু করল এবং জাহাজটি বরফের মধ্যে আটকা পড়ে গেল।

বসন্তকালে বরফ গলতে শুরু হল, এবং বড় বড় বরফের চাঙড় জাহাজটির দিকে ভেসে আসতে লাগল। তাদের ধাক্কায় জাহাজটি ফাটতে শুরু করল, এবং অবশেষে তিনটি মস্ত চাঙড়ের ধাক্কায় সেটি একেবারে চৌচির হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি জাহাজ থেকে সমস্ত জিনিষপত্র বরফেব উপর নামিয়ে ফেলা হল। কিন্তু যে-বরফের চাঙড়েব উপর জিনিষপত্র নামান হল সেটিও হঠাৎ চিড খেল। ফাটলটা বড হবাব আগেই জিনিসপত্রগুলো আবার বরফের বড় অংশটিতে সবিয়ে ফেলা হল। কিন্তু এইভাবে অনবরতই ববফে ফাট ধরতে আরম্ভ হল, প্রত্যেকবারেই স্যাক্‌ল্টনের লোকদের ব্যস্ত হয়ে পড়তে হল জিনিষপত্র সরাবার জন্য।

অবশেষে অনেক চেষ্টার পব তারা জিনিষপত্তরগুলোকে কতকগুলো ছোট ছোট বোটে তুলে ফেললে। জাহাজটি ধ্বংস হবার সময় এই বোটগুলিকে তারা অনেক কষ্টে রক্ষা করেছিল। সেই বোটে চডে ভাসতে ভাসতে তারা কয়েক সপ্তাহ পবে এলিফ্যাণ্ট দ্বীপে পৌছাল। কিন্তু তখনও পর্যন্ত বাঁচবার কোন আশাই তারা দেখতে পেলে না। কারণ, সেখান থেকে প্রায় এক হাজার মাইল দূরে লোকালয়—সাউথ জর্জ্জিয়া।

মবিয়া হয়ে স্যাক্‌ল্টন ছজন নাবিক নিয়ে একখানি বোটে চড়ে সাউথ জর্জিয়ার উদ্দেশ্যে ভেসে পড়লেন। ঠাণ্ডায় জমে ও ঝড় তুফানে ডুবতে ডুবতে, বোটটি কোন রকমে বেঁচে গেল, এবং ১৪ দিন পরে তাঁরা মেঘের ফাঁক দিয়ে দূরে সাউথ জর্জিয়ার চুড়া দেখতে পেলেন।

অনেক চেষ্টার পর বোট ভিডিয়ে তাঁরা ডাঙ্গায় এসে নামলেন, এবং ৩৬ ঘণ্টা ধরে বরফপূর্ণ পার্বত্য পথের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অবশেষে লোকালয়ে পৌছলেন।

কয়েক সপ্তাহ পবে একখানি ভাল বোট সংগ্রহ করে তাঁবা আবার এলিফ্যাণ্ট দ্বীপের দিকে যাত্রা কবলেন। দ্বীপের কাছাকাছি এসে স্যাক্‌ল্টন চীৎকাব কবে জিজ্ঞাসা কবলেন,—তোমরা সব ভাল আছ ত?

হ্যাঁ, ভাল আছি, বেশ নিরাপদেই আছি সকলে,—উত্তর এল।

এবপর, ১৯২১ খৃষ্টাব্দে শবৎকালে স্যাক্‌ল্টন আর একবার এবং শেষবাব মেরুপ্রদেশের দিকে যাত্রা করলেন "কোয়েষ্ট" জাহাজে। সেণ্ট জর্জিয়ায় গিয়ে স্যাক্‌ল্টন জাহাজ থামিয়ে যে সব লোকেরা তাঁকে আগের বারে সাহায্য কবেছিল তাদেব সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। তারপব জাহাজে ফিবে এসে তাঁর ডায়েরী লিখলেন। কিন্তু অভিযানে অগ্রসর হওয়া আর তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না। সেইদিনই বাত্রিতে তিনি হঠাৎ মারা গেলেন।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ১০ই মে রুষ বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক স্পিড এবোপ্লেনে উত্তব মেরুতে যান। তাঁর সঙ্গে ছিল দশজন সহকর্মী, পাঁচটা তাঁবু ও একটা বেতার যন্ত্র। তিনি সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করে ফিরে আসেন।

[ক্রমশঃ
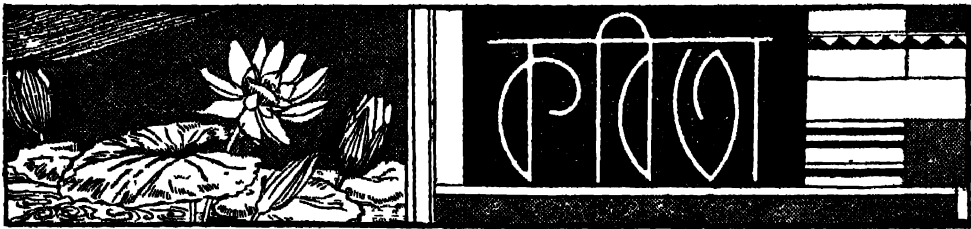
রাজা গোপাল সিংহ

শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ

'গোপাল সিংহ' নামে এক রাজা ছিলেন বিষ্ণুপুরে,
সংসারী হ'য়ে সংসার হ'তে থাকিতেন তিনি দূরে।
হরি-প্রেম-নীরে অবিরত তাঁর বিচরিত মনোমীন,
তিনটি লক্ষ হরিনাম তিনি জপিতেন প্রতিদিন।

সহসা তাঁহার হ'লো কি খেয়াল,—আদেশ করেন জারী,-
যত প্রজা আছে রাজ্যে তাঁহার,—হউক নর বা নারী—
আঠারোর বেশি বয়স যাদের,—করিতে হইবে সবে
হরিনাম জপ প্রতিদিন,—নয় কঠোর শাস্তি হবে।

রাজার আদেশ দিকে দিকে বহি' ফিরে রাজ-অনুচর,
শাস্তির ভয়ে নামজপ রোজ শুরু হ'লো ঘর-ঘর।
গুপ্তচরেরা ছদ্মবেশেতে যথারীতি রাখে খোঁজ,—
রাজাদেশ কেবা অবহেলা করে,—কেইবা পালিছে রোজ।
অপরাধী পেলে ধরে এনে' তারে রাজার গোচর করে,
গোপাল সিংহ শাস্তি-বিধান করেন তাহার 'পরে—
'এইখানে বসি' চক্ষু মুদিয়া নাম জপ' সারা দিন,
আমার আদেশ অবহেলা কর, হইয়াছ এত হীন?'
কারে বা বলেন,—নাকে দাও খৎ, মুখে বল হরিনাম,—
করহ শপথ ঘুরাইবে তুমি জপমালা অবিরাম।

একদা তখন রাত্রি দুপুর,—জনেক সূত্রধর
ঘুম ভাঙি উঠি সহসা চমকি বসিল শয্যা'পর।
শঙ্কা আকুল হইয়া ডাকিল পত্নীরে ভীতস্বরে,—
"ওগো ওঠ, ওঠ, দাও নামাবলী কোথা আছে বার করে।
তাড়াতাড়ি দাও, নয়ত বিপদ। হ'য়ে গেছে ভারী ভুল,
রাজা যদি পাবে জানিতে, তাহলে বাধিবে হুলস্থুল।
না জানি কোথায় রাজ-অনুচর গোপনে দাঁড়ায়ে আছে,
সকাল হইলে নিয়ে যাবে ধরি সটান রাজার কাছে।
দাও নামাবলী, 'গোপাল সিং-এর বেগার' খাটিয়া ফেলি,
জ্বালাতন বটে,—কিন্তু কি বলে রাজার আদেশ ঠেলি।"

পরদিন প্রাতে রাজ-দরবারে ছুতারের পড়ে ডাক;
জরুরী তলব। শুনিয়া সে হলো বিস্ময়ে হতবাক্।
কি-বা দোষ তার ভাবিয়া না পায়। ভয়ে কাঁপে তবু বুক,
রাজার সমীপে দাঁড়ালো আসিয়া শুষ্ক-মলিন মুখ।
রাজা কন্ তারে,—"নাম জপিবারে দিনু আমি উপদেশ;
'গোপাল সিং-এর বেগার' বলিয়া কর তুমি তারে শ্লেষ।
বন্দী করিয়া রাখিব তোমায় তিনটি বছর ধরে,—
'গোপাল সিং-এর বেগার' কেমন বুঝাইব ভাল ক'রে।"

গত রজনীর বাক্য তাহার,—বুঝিল সূত্রধর,—
রাজার কর্ণে বহন করিয়া এনেছে গুপ্তচর।
শাস্তির কথা শুনিয়া তাহার শঙ্কায় ওড়ে প্রাণ,
নতজানু হয়ে জোড় হাতে কয়,—নয়নে অশ্রুবান—

"মহারাজ, তুমি দিলে যে আদেশ, দোষ কিছু নাহি তার,
ভগবানে তুমি ডাকিতে বলেছ,—সকল কাজের সার।
কিন্তু তাঁহারে ডাকিতে সুযোগ তিনিই দেন্‌নি মোরে,
সম্বলহীন, আমি অতি দীন,—ছয়টি পোষ্য ঘরে।
তাদের মুখের অন্ন জোগাতে প্রতিদিন ভোর থেকে
সাঁঝ ব'য়ে যায় খাটিয়া খাটিয়া, তবু নাহি বিধি লেখে
দু'বেলা আহার কোন দিন হায়। কি হবে আবার কাল?
ভাবিয়া ভাবিয়া দেহখানা দেখ হইয়াছে কঙ্কাল।
দারুণ শ্রমের ক্লান্তি বহিয়া সন্ধ্যায় ফিরি ঘরে
মৃতের সমান এলাইয়া পড়ি, ঘুমে আসে চোখ ভরে।
বসিয়া বসিয়া জপিব যে নাম,—সময় কি পাই তার?
বড় বেদনায় তাই মুখ দিয়ে ও-কথা হয়েছে বার।
দণ্ড এখন যাহা দেবে দাও,—কি আর উপায় আছে?"—
অশ্রুপূর্ণ আঁখি দু'টি তার কিন্তু করুণা যাচে।

সকল শুনিয়া রাজা গোপালের মুখে নাহি সরে বাণী
অ-নিমিখ্ চোখে নেহারে কেবল ছুতারের মুখখানি।
কিয়ৎ পরেতে জোর নিশ্বাস ফেলিয়া কোমল স্বরে
কহেন ছুতারে,—সরলতা তব করিয়াছে প্রীত মোরে।
আজ হ'তে আর বেগার তোমায় খাটিতে হবে না কভু,
উপায় তাহার করিয়া দিতেছি, জপিতে হইবে তবু
রোজ হরিনাম।...দশ বিঘা জমি নিষ্কর আজ হ'তে
যথারীতি তোমা করিতেছি দান, আপন ইচ্ছামতে
পুত্র এবং পৌত্রাদি ক্রমে ভোগ কর চিরকাল,
প্রাণ ভ'রে জপ কর হরিনাম,—ভাবিও না জঞ্জাল।"
বলিয়াই ধরি' লেখনী তখনি আদেশপত্রখানি
লিখিয়া দিলেন ছুতারের হাতে বিস্ময় সবে দানি।
তারপর ডাকি মন্ত্রীরে ক'ন্,—"শুনুন সচিববর।
অনুচরগণে করুন আদেশ রাখিতে অতঃপর
সন্ধান তার রাজ্যে আমার কোথা দীন আছে কত;
অভাবের চাপে কে-বা জপে নাম 'বেগার খাটার' মত।
রাজ ভাণ্ডার খুলিয়া তাদের দুঃখ করুন লয়,—
দৈন্যের জ্বালা ভুলিয়া সকলে গাহুক বিভুর জয়।"

'মহারাজ! তুমি ধন্য ধরায়!'—কহেন মন্ত্রীবর।
কৃতজ্ঞতায় ছুতারের চোখে বহে জল ঝর্‌ঝর্।

"রবীন্দ্রনাথের ছেলে-বেলা"

বিশ্বনাথ সেনগুপ্ত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দেখতো কি অনাসৃষ্টি কাণ্ড। আমরা হলে "ড্যাম-কেয়ার" বলে সেখান থেকে চলে যেতাম। তার উপর বিশেষ অসুবিধা দেখ্‌লে চাকরকে পারি না পাবি দুএক ঘা দিতেও কসুর করতাম না। যাক্।

এমনি ভাবে তাঁর দিন কাটতো সেই ঘরটায়। বন্দী বালক জানালার খড়খড়ি খুলে বাইবের পানে তাকিয়ে কতো দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছেন। জানালাব নীচে ছিল ঘাট-বাঁধানো এক প্রকাণ্ড পুকুব। পুকুবে লোক স্নান করছে, কেউ কেউ স্নান কবে জল নিয়ে চলে যাচ্ছে আবার কেউ কেউ স্নান করতে আসছে। তিনি এ স্নান পর্বটা বেশ উপভোগ করতেন। বেলা প্রায় একটাব পর পুকুবঘাটে আব কেউ স্নান কবতে আসে না। তখন শুধু হাঁসগুলো পুকুরে সাঁতাব কাটতো। আর ডুব দিয়ে গুগলি তুলে খেতো, মাঝে মাঝে ঠোঁট দিয়ে তাদেব পিঠের পালকগুলো সাফ কবে নিত। বড় হবে তিনি লিখেছেন—

*　　*　　*

পুকুর গলিব ধাবে
বাঁধা ঘাট এক পাবে,
কত লোক যায় আসে
　　স্নান করে তোলে জল।
রাজহাঁস তীরে তীরে
সারাদিন ভেসে ফিবে
ডানা দুটি ধুয়ে ধুয়ে
　　কবিতেছে নিরমল।

*　　*　　*

সেই পুকুরটাব পুবধারের প্রাচীবেব গায়ে ছিল একটা চীনা বট। দুপুরে যখন পুকুরঘাটে লোকজন থাকতনা তখন তিনি এই বটগাছটার পানে চেয়ে দুপুর কাটাতেন। এই বটগাছটার চাবিদিকে ঝুবি নেমেছে। এটাকে লক্ষ্য করে তিনি বড় হয়ে লিখেছেন—

*　　*　　*

লুটিয়ে পড়া জটিল জটা
ঘনপাতায় গহন ঘটা
হেথা হোথায় রবির ছটা
　　পুকুব ধাবে বট

*　　*　　*

দশদিকে ছড়িয়ে শাখা
কঠিন বাহু আকা বাঁকা
স্তব্ধ যেন আছ আঁকা
　　শিরে আকাশ পট।

*　　*　　*

মাথার উপর রবির খরদীপ্তি। দূরে আকাশের এক প্রান্ত থেকে তৃষ্ণার্ত চিল করুণ স্বরে ডেকে ডেকে চলে যেত। এ কবিতায় তা বুঝতে পারবে।

*　　*　　*

অনন্ত আকাশ নীল
ডেকে চলে যেত চিল
জানায়ে সুতীব্র তৃষা
　　সুতীক্ষ্ণ করুণ স্ববে।

*　　*　　*

ছেলেবেলায় তিনি বেশ গাইতেও পাবতেন। তখন তাঁব গলা ছিল খুব মিষ্টি।

একদিন তিনি তাঁর ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদের সাথে এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিব বাড়ী বেড়াতে যান। সেখানে সবাই তাঁর গান শুনে খুব প্রশংসা করল।

এখন তাঁব কবিতা শেখার ইতিহাসটা দিয়ে এ রচনার যবনিকা টানব। কবিতা লেখা সম্বন্ধে তিনি সর্বপ্রথম উপদেশ পান শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রকাশ বাবুর কাছ থেকে।

তারপব তাঁব স্কুলেব পণ্ডিতমশায়ের কাছে বেশ উৎসাহ পান। পণ্ডিতমশায় কয়েক লাইন কবিতা লিখে তার পাদপূবণের জন্য তাঁকে দিতেন। রবীন্দ্রনাথও তা পূরণ করে আনতেন। একদিন তিনি দিয়েছিলেন:—

রবিকরে জ্বালাতন আছিল সবাই
বরষা ভরসা দিল আব ভয় নাই।

ববীন্দ্রনাথ পূরণ করেছিলেন:—

মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে
এখন তাহারা সুখে জলক্রীড়া করে।

*　　*　　*

তিনি তাঁদেব এক কর্মচাবীর কাছ থেকে একটা নীলখাতা চেয়ে নিয়েছিলেন। সেটা অল্প কয়েকদিনেব মধ্যে আঁকা বাঁকা অক্ষরে লেখা কবিতায় পূর্ণ হয়ে গেল। তারপব অন্য খাতা এলো।

এমনি ভাবে লিখে লিখে তাঁব কবিতা বেশ সুন্দর হতে লাগলে পরে পত্রিকায় ছাপা হতে লাগলো।

ববীন্দ্রনাথের প্রতিভা সর্বতোমুখী—তিনি একাধারে কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার ও দার্শনিক। এরকম সর্বতোমুখী প্রতিভা বিশ্বের খুব অল্প লোকেরই আছে।

কবিগুরুর জন্মদিন এই পঁচিশে বৈশাখ নব নব আশা ও আনন্দেব বাণী নিয়ে তাঁর জীবনে বারে বারে ফিরে আসুক, এই কামনা করে এস তাঁকে প্রণাম জানাই।

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম পত্রিকা

শ্রীসুধানাথ রায়চৌধুরী

ফাল্গুন মাসের প্রশ্নবিভাগের কুমারী মীরাদাস কর্তৃক উত্থাপিত পনের নম্বরের প্রশ্নোত্তরে পাঠশালার পাঠক-পাঠিকারা যাহারা ১৮১৮ সনে প্রবর্তিত 'সমাচার দর্পণ'কেই বাংলা ভাষার প্রকাশিত প্রথম পত্রিকার আসনে স্থান দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে আমি অন্যতম। কিন্তু পাঠশালার সম্পাদক মহাশয় গঙ্গাচরণ ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত 'বাংলা গেজেট' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকাকেই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম পত্রিকা বলে নির্ধারিত করিয়াছেন আমি এই সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিতে চাই।

বাংলা গেজেট ১৮১৬ সালে বাহির হইয়াছে বলিয়া সম্পাদক মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাংলা গেজেট প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮১৮ সনে ১২ই মে হইতে ২১শে জুলাইএর মধ্যে কোনও তারিখে। এই কথা যে আমি জোর করিয়া বলিতেছি তাহারও প্রমাণ আমি দেখাইতেছি। ১৪ই মে ১৮১৮ তারিখের 'গভর্ণমেণ্ট' প্রকাশিত ১২ই মে তারিখযুক্ত একটি বিজ্ঞাপনে এইরূপ লিখিত ছিল

"বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র গঙ্গাচরণ ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত 'বাংলা গেজেট' নামক পত্রিকা শীঘ্রই বাহির হইবে।"

পুনরায় ওরিয়েণ্টাল স্টারের ১৮১৮ সনের ১৬ই মে তারিখের সংবাদে দেখা যাইতেছে, "বাংলা গেজেট নামক সংবাদপত্রের মুদ্রণের আয়োজন চলিতেছে।" তারপর আবার ফ্রেণ্ডস অব ইণ্ডিয়া নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকার ২১শে জুলাই, ১৮১৮ তারিখে বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে যে বেঙ্গল গেজেট প্রতি শুক্রবার কলিকাতা হইতে বাহির হয়। সুতরাং ইহাতেই সপ্রমাণিত হয় যে, বেঙ্গল গেজেট ১৮১৮ সনের ১২ মে হইতে ২১শে জুলাইএ মধ্যে কোনও তারিখে প্রথম প্রকাশিত হয়।

শ্রীরামপুর হইতে সমাচার দর্পণ প্রকাশিত হয় ১৮১৮ সনের ২৩শে মে তারিখে। উক্ত পত্রিকা প্রতি শনিবার শ্রীরামপুর হইতে বাহির হইত, 'বেঙ্গল গেজেট' সম্পাদক দাবী করেন যে তাঁহাদের পত্রিকা ১৫ই মে, ১৮১৮ তারিখে কলিকাতা হইতে বাহির হয়। কিন্তু ১৮৩১ সনে 'সমাচার দর্পণের' সম্পাদক মহাশয় দৃঢ়তার সহিত বলেন, "বাঙ্গালা গেজেটের প্রকাশকাল 'সমাচার দর্পণে'র কদাচ পূর্বে নহে। ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গভাষায় যে সকল সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় তন্মধ্যে 'দর্পণ'ই আদি পত্র স্পষ্ট ভাবে জ্ঞাত হইয়াছি।"

ইতিপূর্বে মার্শম্যান সাহেব স্বয়ং লিখিয়াছেন, "The Bengal Gazette was published (we believe) a fortnight after the first number of our paper had appeared, certainly not before the publication of Durpan."

১৮২০ সনে ত্রৈমাসিক Friend of India প্রথম সংখ্যায় লিখিয়াছেন "Within a fortnight after the publication from the Serampur Press of the Samachar Durpan, the first native weekly journal printed in India, Ganga Kishore Bhattacharya published another, named Bengal Gazette, which we hear has been failed." বাংলা গেজেট প্রকাশের দুই বৎসর পরে 'Friends of India' এই উক্তি করেন।

এইরূপ অল্প বিস্তর বহু রকম লিখালিখি হইতে থাকিলেও বাংলা গেজেটের পরিচালকদ্বয় হরচন্দ্র রায় এবং গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ঐ সমস্ত কথার কোনও প্রতিবাদ করেন নাই। বাংলা গেজেট এবং সমাচার দর্পণের সমসাময়িক বহু পত্রিকাই 'সমাচার দর্পণকেই' বঙ্গভাষায় প্রকাশিত প্রথম পত্রিকার আসনে স্থান দিয়াছেন। বাংলা গেজেটের পরিচালকদ্বয়ও উহাতে কোন প্রতিবাদ না করায় বুঝা যায় যে তাহারাও 'সমাচার দর্পণ' প্রথম পত্রিকা এটা মানিয়া লইয়াছেন।

ইহার বহু পরে ১৮৫০ সনে পাদরি লং 'The Calcutta Review' ১৪৫ পৃষ্ঠার 'সমাচার দর্পণ'কেই প্রথম বাংলা সংবাদপত্র বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন।

এই সমস্ত প্রমাণ যখন চক্ষুর সামনে রহিয়াছে, তখন কিছুতেই 'বাংলা গেজেট'কেই প্রথম বাংলা সংবাদপত্র বলা যাইতে পারে না। শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত 'সমাচার দর্পণ'ই বঙ্গভাষায় প্রথম সংবাদপত্র।

বিচারক সাঙ্কো

শ্রীউদয়ভানু সিংহ

বহুদিন আগের কথা। লোকে তখন সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করতো। এক দেশে এক রাজা বাস করতেন। নাম তাঁর সাঙ্কো। খুব ভালো বিচারক হিসেবে এই সময়ে সাঙ্কোর খুব নাম হয়েছিল। তাঁর মত বিচক্ষণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি তখনকার সময়ে আর ছিল না। তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই একটা গল্প বলে।

একদিন সাঙ্কো রাজসভায় বসে আছেন। এমন সময়ে দুটি লোক এসে উপস্থিত হল। লোক দুটির বয়স অনেক। তাদের মধ্যে একজনের কাছে আছে একটা বেতের দণ্ড। দু' জনে রাজাকে কুর্নিশ করে দাঁড়িয়ে রইল। যার হাতে বেতের দণ্ড ছিল না সে হাত দুটি জোড় করে বলতে লাগল—"হে ধর্মাবতার, আজ আমি আপনার কাছে এসেছি সুবিচারের জন্য। এই যে লোকটিকে দেখছেন হাতে লাঠি। আমি ওকে ১০টি ক্রাউন ধার দিয়েছি এই সর্তে যে আমি যখনই ঐ টাকা চাইব তখনি ও আমাকে ঐ টাকা ফিরিয়ে দেবে। আমার এখন ঐ ক্রাউনের দরকার আমি ওর কাছে গিয়ে চাইলুম আমার প্রাপ্য ক্রাউন দাও। ও তার উত্তরে আমাকে বল্লে যে আমি টাকা দিয়ে দিয়েছি। কিন্তু হে ধর্মাবতার, আমি সত্যি সত্যি বলছি যে ও আমাকে টাকা দেয় নাই। ও যদি কোনও গীর্জায় গিয়ে বলে যে ও ক্রাউন দিয়ে দিয়েছে তা হলে আমি বিশ্বাস করবো নচেৎ নয়।" বলে সে অন্য লোকটির মুখের দিকে চাইলে। তার কথা শুনে সাঙ্কো বললে—ওহে দণ্ডধারী বৃদ্ধ, এ বিষয়ে তোমার কি বলবার আছে ?"

দণ্ডধারী ব্যক্তিটি বল্লে—"হুজুর, আপনি আপনার ঐ রাজদণ্ড নীচু করুন। আমি ঐ দণ্ড ছুঁয়ে শপথ করছি যে ওর টাকা আমি ফিরিয়ে দিয়েছি।"

বৃদ্ধলোকটির কথানুযায়ী সাঙ্কো তাঁর রাজদণ্ড নীচু করলেন। হঠাৎ তৎক্ষণাৎ সেই দণ্ডধারী লোকটি তার হাতের লাঠিটা দ্বিতীয় ব্যক্তির হাতে দিয়ে চীৎকার করে উঠলো—"বল তুই তোর ক্রাউন ফিরে পেয়েছিস।" সে লোকটি তো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়ে বল্লে—"পেয়েছি"। তার কথা শেষ হতে না হতেই প্রথম ব্যক্তিটি জোর করে তার হাত থেকে দণ্ডটি কেড়ে নিয়ে দ্রুত পদবিক্ষেপে রাজসভা ত্যাগ করলো।

এই ব্যাপারে সভাস্থ সবাই অবাক হয়ে গেল। মহারাজ সাঙ্কোও কিছুক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে রইলেন। তারপর চেঁচিয়ে প্রহরীকে বল্লেন—"নিয়ে আয় ঐ লোকটিকে এখানে।"

দণ্ডধারী লোকটি আবার সেখানে এসে হাজির হ'ল। সাঙ্কো তাকে দেখে স্মিতহাস্যে বল্লেন—"দেখি তোমার ঐ বেত্রদণ্ডটি। একবার আমার হাতে দাও।" বৃদ্ধলোকটি তাই করলে। তখন সাঙ্কো প্রথম ব্যক্তিটির হাতে বেত্রদণ্ডটি দিয়ে বল্লেন—"তুমি তোমার ক্রাউন ফিরে পেলে ত ?"

প্রথম ব্যক্তিটি বল্লে—"এই কি আপনার সুবিচার হ'ল মহারাজ।" সভার সবাই মহারাজের এই বিচারে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। তার কথা শুনে সাঙ্কো বল্লেন—"ও আমার কথা বুঝি বিশ্বাস হচ্ছে না। আচ্ছা এই দেখ।" বলেই তিনি তার কাছ থেকে বেত্রদণ্ডটি নিয়ে সকলের সামনে দু' ভাগ করে ভেঙ্গে ফেললেন। ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে দশটি ক্রাউন পড়ল। সভাস্থ সবাই সাধু সাধু বলে উঠলো। *

---

* ইংরাজী হইতে।

পরীক্ষা

কুমারী অরুণা চাটার্জ্জি

বালিগঞ্জ "কালীধন ইন্‌ষ্টিটিউসন্" স্কুলে দুইটি ছেলে পড়িত। তাহাদের নাম অজিত ও নরেন। তারা খুবই ভালো ছেলে এবং তাদের দুজনের মধ্যে যথেষ্ট ভাব। একজনে আর একজনকে একদণ্ড না দেখিলে থাকিতে পারিত না। উহারা দুজনেই একই শ্রেণীতে পড়িত এবং প্রতি পরীক্ষায় অজিত প্রথম ও নরেন দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিত।

গত বৎসর বার্ষিক পরীক্ষার কিছু পূর্বে অজিতের মাতার ভীষণ অসুখ হইল। অজিতের সাংসারিক অবস্থা ভালো ছিল না। শৈশবেই অজিতের বাবা মারা যান এবং তার ভাই বা ভগিনী কেহই ছিল না। মাতার শুশ্রূষা অজিতকেই করিতে হইত। সেইজন্য সে প্রায় দুই মাস পড়াশুনা করিতে পারিল না।

মাতার মৃত্যুর পর সে যখন পরীক্ষা দিল তখন সকলেই ভাবিল এবং ঠিক করিল যে সে এবার কিছুতেই পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারিবে না, নরেনই এবার প্রথম হইবে। কিন্তু পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা গেল, যে অজিতই—যে বরাবর প্রথম হইত, সে প্রথমই হইয়াছে এবং নরেন যে দ্বিতীয় সে দ্বিতীয়ই আছে।

এই ফল দেখিয়া সকলে অবাক হইল এবং শিক্ষকদের মনে বড়ই কৌতুহল জন্মিল। তাঁহারা উত্তরের কাগজ আনিয়া মিলাইয়া দেখিলেন, দ্বিতীয় বালক নরেন ইচ্ছা করিয়াই কয়েকটি সহজ প্রশ্নের উত্তর লেখে নাই।

তাহাকে ডাকিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় নরেন বলিল—"অজিত আমার চেয়ে ঢের ভালো ছেলে। ইহার মায়ের অসুখ ও মৃত্যুর জন্যই এবার আমি হয়ত প্রথম স্থান অধিকার করিতাম। কিন্তু তাহা কি উচিত? একে সে মাতৃশোকে কাতর—এ সময়ে সে পরীক্ষায় প্রথম হইতে পারিলে তবু একটু মনে শান্তি পাইবে—এই ভাবিয়া আমি ওরূপ করিয়াছিলাম। কিন্তু একথা কাহাকেও বলিবেন না। আপনাদের খোঁজ করিবার কারণ কি?"

নরেনের কথা শুনিয়া শিক্ষকেরা স্তম্ভিত। বলিলেন—"সংসারের সকলের চেয়ে বড় যে পরীক্ষা সেই হৃদয়ের পরীক্ষায় তুমি প্রথম হইয়াছ এবং চিরদিন প্রথম হইয়া থাকিবে, স্কুলের পরীক্ষা তাহার নিকট অতি তুচ্ছ।"

বৈশাখ

শ্রীঅণিমা দেবী

হে বৈশাখ, হে দীপ্ত দুর্জ্জয়—
প্রখর ভাস্কর তেজে নব বর্ষ স্পর্শে তব হোক্ জ্যোতির্ম্ময়।
শুষ্ক করি নদ নদী এসো তুমি অবনীর মরুতপ্ত কূলে—
শীর্ণ জীর্ণ বাহু মেলি ধরা লক্ষ্মী সযতনে কোলে নেবে তুলে।
মসীলিপ্ত কৃষ্ণাম্বর বিস্ফুরিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া দিবে বিদ্যুত-ব্রততী—
চন্দ্র সূর্য্য নত শিরে দিগন্তে জানায়ে দিবে স্বাগত-প্রণতি,
নৃত্যশীল বৈশাখের ডমরু গর্জ্জন শোনা যাবে মেঘের নিঃস্বনে,—
তপঃক্লিষ্ট মহাবীর! মেঘমন্দ্রে উত্তরিয়া সুতীব্র-স্বননে—
রুদ্রের প্রলয় নৃত্যে আকাশ বিদীর্ণ করি বাহিরিবে হাহাকার ধ্বনি,
মেদিনীর জীর্ণ বক্ষ করালের সঘন ফুৎকারে ব্যথায় উঠিবে রণরণি।
হে বৈরাগী, করে যাও সুকঠোর বজ্র-আশীর্বাদ
তোমারি সে মৃত্যু-অর্ঘ্য, সেই হবে আমাদের চরম-প্রসাদ॥

কুমারী পপী বসু, পটুয়াখালি।

তুমি ঠিকই বলেছ, পাঠশালায়' গল্প প্রবন্ধের ভাগ কমে আসছে, তার কারণ, তোমরা পাঠশালার সমস্ত পাতাই দখল ক'রে নিচ্ছ যে। একেই এই যুদ্ধের বাজারে কাগজ দুর্মূল্য হয়েছে বলে পাঠশালার পৃষ্ঠা কমাতে হয়েছে, তার উপর তোমাদের নিজেদের আটটি বিভাগ ছাপাবার পর আর অল্প স্থানই থাকে প্রবন্ধ ও গল্পের জন্য। চৈত্রে যাঁদের নাম ঘোষণা করা হয়েছিল বৈশাখের পাঠশালায় লিখবেন বলে, তাঁরা সকলেই পাঠশালায় লিখেছেন, বৈশাখে স্থানাভাবে যাঁদের লেখা পাঠশালায় দিতে পারা যায়নি, জ্যৈষ্ঠে তাঁদের রচনা প্রকাশ করা হয়েছে। সুতরাং তোমার অভিযোগ যে সত্য নয় আশা করি তালিকার সঙ্গে লেখকদের নাম মিলিয়ে দেখলে সেটা বুঝতে পারবে।

অশ্বিনীকুমার মণ্ডল, আহমদপুর।

'শ-র' তোমাকে জানিয়েছেন যে শব্দ-সন্ধানের কুপনে এক ঘরের মধ্যে একাধিক অক্ষর বসানো কিছুতেই চলবে না। কারণ এরূপ নিয়ম শব্দ সন্ধানের রীতিবিরুদ্ধ।

উদয়ভানু সিংহ, কলিকাতা।

'পাঠশালার' সমালোচনা পাঠশালাতেই প্রকাশ করা অশোভন হবে। তোমার প্রেরিত সমালোচনাটি নিরপেক্ষ হয়েছে, তুমি পাঠশালার দোষগুণ দুই-ই দেখিয়েছ বটে, তবু নিজেদের কাগজে নিজেদের সমালোচনা শিষ্টাচার-বহির্ভূত; তাই তোমার প্রস্তাবটি ভাল হ'লেও গ্রহণ করবার উপায় নেই।

ফণীন্দ্রকুমার দাস, সিলেট্।

তোমার উৎসাহ প্রশংসনীয়, আশা করি পড়াশুনা ও জীবনের অন্যান্য কর্তব্য কর্মেও তোমার এমনি উৎসাহ ও উদ্যম আছে।

পুষ্প ঘোষ, বালিগঞ্জ।

তোমার শব্দ-সন্ধান সমাধানের ফলাফল শব্দ-সন্ধান বিভাগে দেখতে পাবে।

দেবব্রত সিংহ, কলিকাতা।

এ যুদ্ধের ফলাফল কি হবে তা স্বয়ং 'চার্চ্চিল' বা 'রুজভেল্ট'ও বলতে পারবেন না। তবে শেষ পর্যন্ত মিত্র পক্ষের জয় হ'তে পারে এইটে তাঁরা আশা করছেন।

সাধনানন্দ মিশ্র, মুগবেড়িয়া।

পাঠশালায় গ্রাহকদের জন্য যে আটটি বিভাগ খোলা হয়েছে তাতে গ্রাহক ছাড়া অপর কেহ যোগ দিতে পারেন না। তোমার বন্ধুকে গ্রাহক হ'তে বলো।

শ্রীমান পার্বতীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, রামপুরহাট।

তোমার পত্রখানি ধাঁধাঁ সম্পাদক দেখেছেন। তিনি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে তাঁর ভুল স্বীকার করে বলেছেন "পার্বতী ঠিকই লিখেছিল, আমি তাড়াতাড়ি United কথাটাকে Untied পড়ে ছিলাম বলেই এই A এবং Anএর গণ্ডগোল হয়েছিল।" আশা করি ধাঁধাঁ নিয়ে যিনি কারবার করেন তাঁর এ ধাঁধাঁ লাগা তুমি ক্ষমা করবে।

শ্রীমান নীতীশরঞ্জন দে, ঢাকা।

তোমার গল্পটি পেয়েছি, পড়ে দেখে মতামত জানাব। তুমি বর্তমান ভারতে সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার কে বলে অসঙ্গত প্রশ্ন করেছ কেন? পাঠশালার পাঠকেরা কি ভারতের অন্যান্য ভাষার ও সাহিত্যের সংবাদ রাখেন? 'ভূ-গো' ওটা কেটে 'বাংলাদেশের' করে দিয়েছেন।

আবুল হোসেন মিয়া, রাজৈর।

তোমার কবিতা পেয়েছি, পড়ে দেখে মতামত জানাব। পাঠশালার আকার সম্বন্ধে তুমি কুমারী পপী বসুকে লেখা উত্তরটি পড়ে দেখ।

পরমেশ্বর তেওয়ারী, মিরবাজার।

তোমার কবিতা পেয়েছি, পড়ে দেখে মতামত জানাব।

শ্রীমান সুরথনাথ সরকার, নৈহাটি।

তোমার নববর্ষের শুভকামনার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শ্রীমান সুবোধ রাহা, শ্রীপুর।

শ্রীকৃষ্ণকে, যদি তুমি সাক্ষাৎ ভগবানস্বরূপ পরব্রহ্ম নারায়ণ ও শ্রীবিষ্ণুর অবতার বলে মানতে চাও আমরা তাতে আপত্তি কিংবা বাধা দেব না, কারণ, কারুর ধর্ম-বিশ্বাসে আঘাত করা অনুচিত।

কুমারী ঊষা ও শান্তি চক্রবর্তী, চাঁইবাসা।

'তোমাদের চিঠি পেয়েছি। 'পাঠশালা' পেয়ে তোমাদের খুব ভাল লেগেছে জেনে খুশী হলুম। গরমের ছুটিতে কোথায় যাবে তোমরা? আশা করি এতদিনে ওখানে কাল বৈশাখীর ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

কুমারী আবতি গুহ, নবগ্রাম।

তোমার নববর্ষের শুভেচ্ছা ও সাদর অভিনন্দনের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বিশ্বনাথ সেনগুপ্ত, চট্টগ্রাম।

'সহযোগী সাহিত্য' সমালোচনাব পরিবর্তে এবাব থেকে "এমাসে তোমবা কি পড়বে।" এই বলে শ্রেষ্ঠ রচনা ও পুস্তকেব উল্লেখ করা হবে।

আশাযচন্দ্র দাশগুপ্ত।

তুমি কুমারী হেনা রাহা ও শ্রীমান সাধনানন্দ মিশ্রকে যে পত্র লিখেছ সে পত্র পাঠশালায় না পাঠিয়ে সোজা তাদেব ঠিকানাতে পাঠানোই উচিত। 'পত্রী-মৈত্রী'তে ঠিকানা পাবে।

মনোজ, দত্ত, চট্টগ্রাম।

তোমাব আগেকার চিঠিপত্র প্রশ্নোত্তব প্রভৃতি এখন আর বাতিল কববার উপায় নেই। এবাব থেকে লিখে পাঠাবার সময় পড়ে দেখে পাঠিও।

নবনীকুমাব চৌধুরী, লঙ্গাই।

তুমি 'পত্রী-মৈত্রী' ব্যাপাবটা এতদিন ঠিক বুঝতে পারনি বলে তোমার নাম ওবিভাগে দেওয়া হয়নি। এবার দেওয়া হল। শচীশবাবুব ঠিকানা ফেরীঘাট, গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড, উত্তরপাড়া।

কুমাবী কল্যাণী বায়, বাজসাহী।

কুমাবী ইন্দ্রাণী রায়েব ঠিকানায় সোজাসুজি এই চিঠি দাও—তাহ'লেই দুজনের আলাপ জমে উঠবে।

কুমারী রেবা ভদ্র, ঢাকা।

তোমার নববর্ষের অতি সুন্দব অভিবাদন পত্রখানি পেয়েছি। সুলিখিত পত্র এবং মর্মস্পর্শীও বটে। পত্রখানি আগাগোড়া পাঠশালায় ছেপে দেবাব লোভ হয়েছিল, কিন্তু উপবওয়ালাদেব হুকুম ঢাকার দাঙ্গাব কোনো উল্লেখ কাগজে কবতে পাবে না। সুতরাং অত্যন্ত দুঃখেব সঙ্গেই তোমাব এই ব্যথিত চিত্তেব বেদনা-স্পর্শে বঙীন পত্রখানি "কন্যামহলে" প্রকাশ করবাব আগ্রহ সংববণ করতে হল। আব একটা কথা 'কন্যামহলে' কেবলমাত্র তোমাদের প্রয়োজনীয় ও শিক্ষনীয় আলোচনা এবং অভাব অভিযোগ থাকবে। সুতরাং তোমার 'হাস্য-কৌতুক' পাঠশালার অন্য পৃষ্ঠায় ব্যবহার কবা হবে। হ্যাঁ, 'কন্যামহলে' ছেলেদের "প্রবেশ নিষেধ"। ফটো ছাপানো উপস্থিত বন্ধ আছে। যুদ্ধেব পর আর্ট পেপার ও ব্লকের দাম কমলে আবার ছাপা হবে। তখন ফটো চেয়ে নেব। ঝুড়িঝুড়ি অযোগ্য প্রশ্ন বাদ দেওয়া সত্বেও তোমাদের প্রশ্নের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে, সুতরাং অল্পের মধ্যে উত্তরদাতার নাম দেওয়া ছাড়া উপায় কি?

মধু ঘোষাল, মুগকল্যাণ।

সাধনানন্দ মিশ্রকে লেখা তোমার পত্রখানি তুমি সোজাসুজি তার ঠিকানায় পাঠিয়ে দাও। সাধনের ঠিকানা—মুগবেড়িয়া, মেদিনীপুর। "দেশের" বর্ষ সংখ্যা ১৩৪৬ না হয়ে ১৩৪৭ হবে একথা অনিলবরণকে জানানো হবে। ভূতের উপদ্রবে পাঠশালার আটচালা নোংরা হয়ে উঠছে। তোমাদেব দেশের একজন 'ওঝা' পাঠিয়ে দিতে পাব?

শচীন্দ্রনাথ গুপ্ত, পূর্ণিয়া।

এক চক্ষু হবিণেব কবিতাটি ঠিক আবীরের মতো রঙীন ও সুন্দর লাগলো না, ছবিখানি কিন্তু ভাল হয়েছে, ছবিও লেখা যথাসময়ে ফেরত পৌছে যাবে কিন্তু, 'ছুঁচোব কীর্তন' পাঠশালায় ছাপা হ'ল। তুলি ও কলম দুই তোমার চলে দেখে খুশী হলুম। পাঠশালাকে চিত্র উপহারের জন্য ধন্যবাদ।

রাধারমণ ধর, হুগলী।

শব্দ-সন্ধানেব পুবস্কাব তোমার ভাগে মাত্র ৷৷৹ আনা পড়েছিল। সেই আট আনা তোমাব নামেই জমা আছে। আগামী বৎসরের চাঁদা থেকে বাদ যাবে অথবা তোমার চাঁদা শেষ হলে অতিরিক্ত আবও দু'মাস তোমাকে কাগজ পাঠানো হবে।

পীযূষকান্তি সেন, সিমলা হিলস্।

তোমাব নামে যে সুধাধাবা ক্ষরে,
অতএব তুমি হয়োনা তিক্ত;
যদিবা বানানে ভুল কেউ করে,
অমৃত তোমাব হবে না বিক্ত।

কুমাবী কণু ঘটক, মালদহ।

তোমাব চিঠির উত্তরে অত্যন্ত দুঃখেব সঙ্গে জানাচ্ছি যে পাঠশালার কোন পৃথক কুপন পাওয়া যায় না। অতিরিক্ত কুপন দরকার হ'লে আর একখানি পাঠশালা কেনা ছাড়া উপায় নেই। তবে একখানি ছাপা কুপনেব সঙ্গে একাধিক হাতে আঁকা ছক পাঠানো চলে। আশ্বিন কাতিকের পাঠশালার জন্য ডাক টিকিট পাঠালে অবশ্যই তোমাকে পাঠশালা দেওয়া হবে।

কুমারী সলিলা মুখার্জি, কলিকাতা।

'ডাক টিকিট' সম্বন্ধে পাঠশালায় প্রকাশিত প্রবন্ধটি পড়ে দেখো।

কুমারী দীপালী সরকার, টালিগঞ্জ।

তোমার কবিতাটি পাঠশালায় প্রকাশিত হয়েছে।

আবুল হোসেন মিয়া, রাজৈর।

তোমার 'প্রশ্নটি' বাতিল হয়ে গেছে, কারণ রাশিয়া

ও ইটালির গোয়েন্দা বিভাগের সন্ধানে ভারতের তরুণদের কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। বরং এখানকার 'ইলিশিয়াম্ রো' সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করো।

বীরেন্দ্রনারায়ণ সরকার, ফরিদপুর।

তোমার নববর্ষের অভিবাদন পেয়ে খুশী হলুম। তোমাকেও আমাদের প্রত্যভিবাদন জানাচ্ছি। 'পাঠশালা' তোমার কাছে শ্রেষ্ঠ পত্রিকা বলে মনে হয় জেনে ধন্য বোধ করছি।

হরিকমল পুরকায়স্থ, শিলং।

শ্রীমান ধ্রুবরঞ্জন সরকার তোমার চিঠির উত্তর দেন নি শুনে বুঝলুম তিনি 'পত্রী-মৈত্রীর' যোগ্য নন। তাঁকে আর চিঠি লিখ না।

চৈত্রের প্রশ্নোত্তর

১ পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বড় লাইব্রেরী প্যারিসের "বিব্‌লিওথিক্ ন্যাশানেল"। এখানে পৃথিবীর সকল ভাষায় লিখিত বই আছে, সংখ্যা প্রায় আশী লক্ষ।

২. নানা কারণে লোকে ছদ্ম নাম ব্যবহার করেন। প্রথমত, খ্যাতির লজ্জা বা অখ্যাতির ভয়ে দুর্বলচেতা অনেকেই আত্মগোপন করে থাকতে চান। দ্বিতীয়তঃ, লেখক হয়ত এমন কোনো কাজে বা ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন যাতে কবি বা ঔপন্যাসিক বলে পরিচিত হওয়া তাঁর জীবিকার পক্ষে ক্ষতিকর। তৃতীয়তঃ, অনেক সময় অপ্রিয় সত্য কথা স্বনামে প্রকাশের সাহস অভাবে ছদ্মনাম ব্যবহার করতে হয়। আবার অনেক শক্তিশালী লেখক খেয়ালের বশেও কখন কখন ছদ্মনাম ব্যবহার করে থাকেন। এছাড়া, আত্মপ্রচার-বিমুখতাও আত্মগোপনের আর একটা কারণ। আবার একই পত্রিকায় একজন লোককে বাধ্য হয়ে একাধিক রচনা প্রকাশ করতে হ'লে অনেক সময় তাঁকে একাধিক ছদ্মনামের শরণাপন্ন হ'তে হয়।

৩ Iron Lungs চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক মহৎ ও আশ্চর্য্য দান। এটকে এক কথায় 'কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্র' বলা যেতে পারে। যে সব রোগী ফুস্‌ফুস্ ও হৃদযন্ত্রের দুর্বলতায় ও শ্বাসরোগে কষ্ট পান তাঁরা এই বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন 'Iron Lungs'এর সাহায্যে সহজে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারেন, আরাম পান ও সুস্থ বোধ করেন। এক একটি Iron Lungsএর দাম প্রায় লক্ষাধিক টাকা। বিলাতের প্রসিদ্ধ দানবীর লর্ড ন্যাফিল্ড্ পৃথিবীর একাধিক হাসপাতালে এই বহুমূল্য শ্বাসযন্ত্র—Iron Lung উপহার দিয়েছেন। কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজও তাঁর কাছ থেকে এই রকম মূল্যবান একটি Iron Lung যন্ত্র উপহার

পেয়েছেন। এটি দেখতে একটি প্রকাণ্ড লোহার বাক্সের মতো। রোগীকে এর মধ্যে শুইয়ে দেওয়া হয়, কেবল মাথাটি বেরিয়ে থাকে।

৪. পৃথিবীতে অসংখ্য ভাষা প্রচলিত রয়েছে তার মধ্যে ৩৪২৪টির সন্ধান পাওয়া গেছে। সবগুলির নাম দেওয়ার মতো স্থান পাঠশালায় নেই, সুতরাং কেবলমাত্র যে ৬০টি ভাষা পৃথিবীর প্রধান ভাষা রূপে গণ্য, এখানে সেইগুলির নাম দেওয়া হল :—বাংলা, ইংরাজী, ফরাসী, ফার্সি, উর্দু, কেনরিজ, হিন্দি, জার্মাণ, তামিল, রাশিয়ান, তেলেগু, গ্রীক, গুজরাটি, লাতিন, মারহাটি, ম্যাগিয়ার, সিংহলী, চেক্, গেলিক, জিপ্‌সী, ইতালীয়ান, পুস্ত, পোলিশ, আর্বি, পোর্তুগীজ, তিব্বতী, তুর্কী, চীনা, স্প্যানিশ, জাপানী, ফ্লেমিশ, ফিনিশিয়ান, যাভানিজ, নরউইজিয়ান, বৈদিক, স্কচ, দিনেমার, ওলান্দাজ, কেনেরীজ, শ্লাভ, টিউটনিক, কোরিয়ান, আসামী, আফ্রিদী, হাবসী, বোহেমিয়ান, মালয়ালাম, প্রাকৃত, লেটিশ, সংস্কৃত, পালি, বার্মিজ, সায়ামীজ, সুইডিশ, ঈজিপশিয়ান, অসিরীয়ান, হিব্রু, ওড়িয়া, ব্রাহ্মী, মৈথিলী।

৫. আফ্রিকা ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও মাংসাশী ও রক্তপিপাসু বৃক্ষ আছে, তাহারা জীবজন্তুর ও কীটপতঙ্গের রক্ত মাংস শুষে নেয়। অবশ্য জীবজন্তু ও কীটপতঙ্গ যদি তাদের সংস্পর্শে এসে পড়ে তবেই এইসব বৃক্ষ তাদের বিনাশ করতে পারে।

৬ স্বর্গীয় সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁর কন্যা কমলা দেবীর অকালে পরলোক গমনে কাতর হয়ে কন্যার স্মৃতিরক্ষার্থ বিশ্ববিদ্যালয়ে টাকা জমা দিয়ে একটি অর্থ-ভাণ্ডার স্থাপন করেছিলেন। ঐ অর্থের আয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি বৎসর যে বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন তাকে 'কমলা লেকচার্স' বলা হয়। ঐরূপ স্কটিশচার্চ কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক স্বর্গগত অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিরক্ষার্থ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অর্থভাণ্ডার স্থাপিত হয়েছে, যার আয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি বৎসর ইতিহাস সম্বন্ধে বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন, তাকেই বলা হয় 'অধর মুখার্জি লেকচার্স'।

৭ যতদূর জানা গেছে তাতে স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তিব্বত ও নেপাল থেকে যে প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করেন তার মধ্যে 'বৌদ্ধ দোঁহা ও গান'ই সবচেয়ে পুরাতন বাংলা কবিতা বলে গণ্য হয়েছে। রচয়িতাদেরও নাম আছে কিন্তু প্রথম রচয়িতা যে কে তাঁর নাম জানা যায়নি।

৮. শত্রুপক্ষের বেতার স্টেশনের সঙ্গে ভারতের সংযোগ ছিন্ন করা অসম্ভব, কারণ, বেতার বার্তার যে শব্দতরঙ্গ তা বহন করে নিয়ে আসেন স্বয়ং প্রকৃতি —এই পৃথিবীব্যাপী শূন্যে প্রবাহিত ইথার তরঙ্গের সাহায্যে।

৯. পুরাতন পাঠশালা দেখ। এ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। 'বলশেভিজম্' কার্ল মার্কস প্রচারিত কমিউনিজমের অনুসরণে সমাজতন্ত্রবাদের পরিণত রূপ। স্বর্গীয় রুষ নেতা লেনীন এর প্রথম প্রবর্ত্তক। যারা দিন মজুরি করে খেটে খায় দেশের ধন সম্পদে ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তাদের সকলের সমান অধিকার এতে স্বীকৃত হয়েছে। 'নাৎসীজম্'ও অনেকটা সমাজতন্ত্রবাদই অনুসরণ করে, কিন্তু দেশের অর্থ ও সম্পদে সকলের সমান অধিকার এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নি। এইখানেই এদের মধ্যে মূলগত প্রভেদ। নাৎসীজমের প্রতিষ্ঠাতা হের হিটলার। বর্তমান পরিস্থিতিতে এদের স্থান সকলের পুরোভাগে।

১০ আমেরিকার 'রাইট ব্রাদার্স' ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম এরোপ্লেন আবিষ্কার করেন।

১১. চৈত্রের পাঠশালায় ফাল্গুনের প্রথম প্রশ্নোত্তর দেখ।

১২. শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম। পণ্ডিচেরী। প্রতিষ্ঠাতা: শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। বর্তমান অধ্যক্ষা শ্রীমতী Mother শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ও মঠ আধ্যাত্মিক অনুশীলন অপেক্ষা সমাজসেবা নিয়েই ব্যাপৃত আছেন।

১৩. বৈষ্ণব, শাক্ত ও ব্রাহ্মরা হিন্দুর প্রধান ধর্মগ্রন্থ বেদ, উপনিষদ ও শ্রীমদ্‌ভাগবত মানে, তাই এরা হিন্দু বলে গণ্য হয়; কিন্তু, শিখ, জৈন ও বৌদ্ধরা বেদবিধি মানে না। ওদের পৃথক ধর্মগ্রন্থ আছে, সুতরাং ওদের হিন্দু বলা চলে না। যদিও হিন্দুমহাসভা ওঁদের 'হিন্দু' বলে দাবী করছেন।

১৪. পৃথিবীর সমস্ত এফ্‌-আর-এসের তালিকা দেবার স্থান নেই পাঠশালায়।

১৫ শক্তি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাণিজ্য ও বিজ্ঞানের অনুশীলনের সঙ্গে একতা লাভ করতে পারলে বাঙালী বাঁচবে।

১৬. রবীন্দ্রনাথ তারপর ৺সুকুমার রায় তারপর শ্রীযুক্ত সুনির্মল বসু।

১৭ পৃথিবীর ইতিহাস—সার ওয়াল্টার র‍্যালে।
পিল্‌গ্রিমস্ প্রগ্রেস্—জন বানিয়ান
ডি প্রোফাণ্ডিস্—অস্কার ওয়াইল্ড্
মীয়েন কেম্ফ্—এ্যাডল্‌ফ্ হিটলার
আত্মজীবনী—জহরলাল নেহেরু
ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগ্‌ল—সুভাষ বসু
গীতার ভাষ্য—মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী

১৮. যিনি নাম গোপন রাখতে চান তাঁর নাম প্রকাশ করা অন্যায়।

১৯. বিদেশী রচনা অবলম্বনে নিজের ভাষায় ইচ্ছামত পরিবর্জন ও পরিবর্তন করে নিয়ে লেখাকে স্বাধীন বা স্বচ্ছন্দ অনুবাদ বলে।

২০. শিশুদের কচি দেহের গঠনশীল স্নায়ু ও পেশীগুলি থাকে কোমল ও দুর্বল। সেগুলির উপর শিশুদের কোনো আধিপত্য নাই। তাই জাগ্রত অবস্থায় তারা যা কিছু করে নিদ্রিত অবস্থায়ও তার প্রতিক্রিয়া হয়।

২১. কাঠের গুঁড়া থেকে কাগজ, বোর্ড, তক্তা, চিনি, মেথিল, এলকোহল, এসিড প্রভৃতি বিবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য, সুস্বাদু খাদ্য এবং সুরা ও ঔষধাদি প্রস্তুত হয়।

২২. দীর্ঘকাল ব্যবহারের ফলে যেমন সকল বস্তুই জীর্ণ হয়ে পড়ে তেমনি বয়স পঞ্চাশ পার হওয়ার পর থেকেই মানুষের শরীরও জীর্ণ ও জরাগ্রস্ত হতে থাকে। কারণ দেহের অভ্যন্তরস্থ শক্তি ক্রমে ক্ষীণ ও ক্ষয় হয়ে আসায় শরীরের স্নায়ু ও পেশীগুলি শিথিল হয়ে পড়ে।

২৩. ফাল্গুনী দোল পূর্ণিমায় গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্ম। স্বর্গীয় রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন অসাবধানতা বশতঃ ভুল লিখেছেন।

২৪ কাগজ সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয় চীন দেশে কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আবিষ্কারকের নাম অজ্ঞাত। পাঠশালায় কাগজ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ বেরিয়েছিল পড়ে দেখলে এ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ হবে।

২৫. ১৯০১ সাল থেকে প্রবর্ত্তিত নোবেল প্রাইজের এই ৪০ বৎসরের ইতিহাস একটি প্রশ্নোত্তরে দেওয়া চলে না। একটি বৃহৎ প্রবন্ধ লিখতে হয়, কিন্তু, এরকম প্রবন্ধ ভারতবর্ষ, প্রবাসী প্রভৃতি মাসিক পত্রে একাধিক বার প্রকাশিত হয়েছে। Sar'kar's, Diary, Hindus than year Book ও জ্ঞান ভারতী পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডেও নোবেল প্রাইজের সম্পূর্ণ বিবরণ আছে।

২৬. বাঙালী মেয়েরা আজ তাদের অপহৃত স্বাধীনতা, বিলুপ্ত ব্যক্তিত্ব ও বিনষ্ট মনুষ্যত্ব ফিরে পাবার পথে এগিয়ে চলেছে।

২৭. ১৯৪২ সালেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেরা প্রাইভেট ম্যাট্রিক দিতে পারবে।

২৮. আলু, শর্করা জাতীয় Starch বা শ্বেতসার প্রধান খাদ্য। উত্তাপে এর উপাদান সহজেই নরম হয়, কিন্তু ডিমের তরল এ্যালবুমেন উত্তাপে কোয়াগুলেট করে জমে যায়। আলুর মধ্যে আমাদের শরীরের রোমকুপের ন্যায় অসংখ্য ছিদ্র আছে এবং যথেষ্ট জলও আছে। আগুনের তাপে ঐ জল উষ্ণ হয়ে ওঠে এবং শর্করাজাতীয় শ্বেতসারপ্রধান আলুকে নরম করে কিন্তু ডিমের খোলা ছিদ্রহীন এবং ভিতরে জলের পরিবর্তে থাকে প্রচুর এ্যালবুমেন, যা, বায়ুহীন খোলের মধ্যে থাকায় ও আপন রস ধর্ম্মবশতঃ উত্তাপের সংস্পর্শে জমে কঠিন হয়ে উঠে।

২৯. প্রত্যেক মানুষের আমিষ ও নিরামিষ উভয়বিধ বলকারক ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করাই উচিত, তবে আমিষ আহারই শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণিত হয়েছে। অবশ্য মাছ মাংসের সঙ্গে প্রচুর তাজা শাক সব্জীও খাওয়া দরকার। কারণ তাতে ভাইটামিন থাকে বেশী, আবার নিরামিষ অপেক্ষা আমিষ খাদ্য অধিকতর 'প্রোটিন' যুক্ত, সুতরাং মানুষের সাহস ও কর্ম্মশক্তি বৃদ্ধি করে।

৩০. মুখের ব্রণ না খুঁটলে আপনিই ভাল হয়ে যায় এবং দাগ থাকে না। যদি খুঁটে ফেলার দরুণ দাগ হয়ে পড়ে তবে কিছুদিন দুতিন বার কচি ডাবের জলে মুখ ধুলে দাগ মিলিয়ে যায়। এছাড়া পাঠশালার পাঠক পাঠিকার আরও অসংখ্য উপায় বলেছেন, সেগুলি একত্র করে দিলে পাঠশালার একটি পাতা ভরে যাবে।

৩১ কণ্ঠস্বরের আঘাত বায়ুস্তরে যে কম্পন তোলে সেই বায়ু কম্পনের গতিকে বৈদ্যুতিক উপয়ে বর্দ্ধিত করে রবার, প্যারাফিন, মোম প্রভৃতির সংমিশ্রণে প্রস্তুত নরম আবরণে ঢাকা একটি সিলিণ্ডার বা ডিস্কের উপর টাঙস্টেন্ পিনযুক্ত যন্ত্রের সাহায্যে রেখায় উত্তীর্ণ করে নেওয়া হয়, ও রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে সেই শব্দের ছাঁচ সুসম্পূর্ণ করে নিয়ে পরে তাই থেকে গালা, পীচ, ব্দ রজনে নির্ম্মিত ডুপ্লিকেট রেকর্ডে তৈয়ারী হয়। সেই রেকর্ড গ্রামোফোন যন্ত্রের সাউণ্ডবক্সের সাহায্যে তদুপরে রেখাঙ্কিত বায়ুকে পুনঃ কম্পিত করে শব্দকে প্রতিধ্বনিত করে তোলে।

৩২. পুরাতন 'পাঠশালায়' খুঁজে দেখলে দেখতে পাবে ফ্যাসিজম, কম্যুনিজম্ ও ডেমোক্রাসির পার্থক্য তাতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

৩৩ অন্য কোনো গ্রহে মানুষ জীবজন্তু ও ঘরবাড়ী আছে কিনা বৈজ্ঞানিকেরা এখনও তার সন্ধান পাননি। মঙ্গলগ্রহে মানুষ আছে বলে অনেকের ধারণা হয়েছিল, কিন্তু, সম্প্রতি বিশেষভাবে জানা গেছে যে মঙ্গলগ্রহে কোনো প্রাণীর অস্তিত্ব নেই।

৩৪. শ্রীযুক্ত শিবরাম চক্রবর্ত্তী।

৩৫. পনেরো নম্বর প্রশ্নের উত্তর দেখ।

৩৬. "প্যারাডাইজ লজ", ৪১, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩৭ ফাল্গুনের ৯ নং এবং চৈত্রের ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দেখ। ঠিক যে কারণে চোখে জল পড়ে, মুখে লাল ঝরে সেই কারণেই ভয় হলে আমাদের শরীরের

লোম খাড়া হয়ে ওঠে। অনেক সময় আরামের ও আনন্দের শিহরণেও শরীরের লোম খাড়া হয়ে ওঠে।

৩৮. ভারতবাসীর মধ্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছেন প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধদেবই সর্ব্বপ্রথম। তারপর রাজা অশোক, তারপর রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মাগান্ধীর নাম করা চলে। রাজা রামমোহন, স্বামী বিবেকানন্দ, স্যার জগদীশচন্দ্র, স্যার সিভি রামণ, উদয়শঙ্কর, ধ্যানচাঁদ, প্রভৃতি ভারতবাসীরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বিশেষের নিকট মাত্র খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

৩৯. (৩৬) হ্যালহেড সাহেব রচিত 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ'ই সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত বাংলা বই।

৪০. (৩৭) কাঁচা অবস্থায় ফল অপুষ্ট থাকে বলেই তার স্বাদ কস। অথবা টক লাগে, কারণ কাঁচা ফলের রস acid গুণ সম্পন্ন। কিন্তু পাকা অবস্থায় ফল পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে এবং তার আভ্যন্তরীণ উপাদানের পরিবর্ত্তন ঘটে। Carbon যোগে টকরস তখন শর্করা গুণযুক্ত হওয়ায় ফল মিষ্টত্ব লাভ করে।

৪১. (৩৮) পার্লামেন্টের দুটি বিভাগ আছে, হাউস অফ লর্ডস, সভ্যসংখ্যা ৭৪০, হাউস অফ কমনস্, সভ্য সংখ্যা ৬১৫ জন। উভয় বিভাগের নির্ব্বাচিত বর্ত্তমান ক্যাবিনেটে মিনিস্টাররাই উপস্থিত প্রধান সভ্যরূপে গণ্য।

৪২ উপন্যাসের 'টেকনিক' বলতে ঠিক একরকমই বোঝায় না। বিভিন্ন লেখক ভিন্ন ভিন্ন টেকনিক অবলম্বনে রচনা করেন। যেমন, একরকম হচ্ছে Narrative বা বর্ণনামূলক। অর্থাৎ এতে পাত্র পাত্রীদের নিয়ে যা কিছু ব্যাপার ও ঘটনা ঘটে লেখক নিজের কথায় তা বর্ণনা করে যান। আর একরকম হল Subjective অর্থাৎ লেখকের নিজস্ব মতামত ও বৈশিষ্ট্য তিনি ফুটিয়ে তোলেন উপন্যাসের পাত্র পাত্রীদের মুখে। নিজেদের কথায় নিজেদের কাজে তারা নিজেদের পরিচয় দেয়। আর একরকম হল Annalytical বা বিশ্লেষণ ও সমালোচনা-মূলক। অর্থাৎ পাত্র পাত্রীরা যে সব কাজ করে যায় লেখক তার সম্যক আলোচনা করে ঘটনা বিশ্লেষণ করে তার ভিতরকার দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি বুঝিয়ে দেন, ইত্যাদি।

৪৩. প্রকৃত সভ্যতার পথে যুদ্ধ বরং সর্ব্বদাই নিবার্য। তবে তথাকথিত যে সভ্যতা গড়ে উঠে পররাষ্ট্র লোলুপ-ধনতন্ত্রের ভিত্তির উপর, তার প্রসার বা অগ্রসরের পথে যুদ্ধ অনিবার্য। যেমন বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া যে অভিনব রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার গোড়া পত্তন করেছে এর আদর্শ যদি সফল হয়ে ওঠে, তবে আর সভ্যজগতে যুদ্ধ হবে না।

৪৪. দূরস্থ আলোক আকাশে তির্য্যকভাবে প্রতিফলিত হলে তার রক্তবর্ণ টাই আমাদের দৃষ্টিকে সর্বাগ্রে আকর্ষণ করে। সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তকালে রবিরশ্মি বহুদূর হতে তীর্য্যকভাবে আকাশে প্রতিফলিত হয়, তাই আমাদের চোখে আকাশ লাল দেখায়। রক্তবর্ণ ছাড়া দূর হতে আলোকের অন্য কোন বর্ণ আমাদের দৃষ্টিপথে ধরা দেয় না।

৪৫. 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়' একখানি প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থের নাম।

৪৬। বহুমুখী প্রতিভার দিক দিয়ে শ্রীযুক্ত এইচ জি. ওয়েলসকে বর্তমানে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক বলা যায়।

৪৭. 'টেকচাঁদ ঠাকুর' এই ছদ্মনামে খ্যাত স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র রচিত 'আলালের ঘরের দুলাল' বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস। প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে।

৪৮. হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে একতা হওয়ার খুবই সম্ভব যদি সোভিয়েট রাশিয়ার মত ধর্ম্মমূলক সাম্প্রদায়িকতা এদেশ থেকে তুলে দেওয়া হয়।

৪৯. অন্ধকার প্রেক্ষাগারে চলচ্চিত্রের পর্দার আকাশে এঁরা নক্ষত্রের মতই উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেন বলে এঁদের 'স্টার' বলা হয়।

৫০। বাংলাদেশে শীতের প্রকোপ সামান্য বলে মাথায় পাগড়ী বাঁধা বা টুপি পরার প্রয়োজন ছিল না তাই এদেশে ওটা প্রচলিত নেই। আসাম ও উৎকল-বাসীরাও মাথায় কোনো আবরণ ব্যবহার করেন না।

৫১ রেলওয়ের লাইন উঁচু এবং ট্রেণের চাকা তার উপর দিয়েই যায় কিন্তু ট্রামওয়ের লাইন নীচু এবং ট্রামের চাকা লাইনের ভিতর দিয়ে যায়। রেলওয়ে এঞ্জিন অনেকগুলি ট্রেণ নিয়ে ছোটে শহরের বাইরে, কিন্তু ট্রামওয়ে মাত্র একখানি বা দুখানি গাড়ী নিয়ে ঘোরাঘুরি করে শহর ও তার উপকণ্ঠের মধ্যে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—আগামী মাস থেকে প্রত্যেকের একটিমাত্র প্রশ্ন ছাপা হবে। অনেক প্রশ্নের সঙ্গে শাখা প্রশ্ন থাকে, সেগুলি আর ছাপা হবে না। মূল প্রশ্নই কেবল প্রকাশিত হবে। পুরাতন প্রশ্ন ও অন্য পত্রিকা থেকে গৃহীত প্রশ্ন বাদ যাবে।

উত্তরদাতাদের নাম	ঠিকানা	কোন্ কোন্ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছেন
অজিতকুমার ঘোষ	কলিকাতা	৫, ১৬, ২৩, ২৭, ২৮, ৩৭, ৪৬
অনিলবরণ ঘোষ	দাবড়া	২, ৫, ৬, ১৫, ১৬, ১৭, ২ , ২৯, ৩৮, ৪৫
অনিলবরণ মহান্তি	যাদবপুর	১, ৯, ৫, ১০, ১৩, ১৫, ২১, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ৩৩, ৩৭, ৪৩, ৪৭, ৪৮
অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়	আজমীর	১, ৫, ১০, ১৭, ৩২
অমলেন্দু রুদ্র	চট্টগ্রাম	১০, ২৫ (নোবেল প্রাইজের সম্পূর্ণ ইতিহাস ও তালিকা ইনি দিয়েছেন), ২২, ৪৯, ৪৭, ৪৬, ৪২, ৩৯, (৩৬) ৩৫, ৩৪, ৪০, (৩৮) ৩১, ৪০, (৩৭) ২০, ২৪, ৪৩, ১৭, ১৬, ১৫, ১১, ১০, ৮, ৪, ১, ৩০, ২৭, ২৬, ২৩
অরবিন্দ বিশ্বাস	চট্টগ্রাম	১, ১০
অশোককুমার নন্দী	কলিকাতা	১, ১০, ১১, ১৫, ১৬, ১৭, ২৩, ২৭, ২৯, ৩১, ৩৮, ৩৯, (৩৬) ৪০, (৩৭) ৪৭, ৪৮
অশ্বিনীকুমার মণ্ডল	আহমদপুর	১, ৯, ১৫, ২৩, ২৮, ২৯, ৩১, ৩৭, ৩৮, ৪৬, ৪৭
অসীম রাহা	বালিগঞ্জ	৭, ১০, ১৫, ১৬, ১৭, ২৩, ২৫, ২৭, ২৮, ২৯, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৮, ৪০, (৩৭) ৪০, (৩৮) ৪৪
আবুলহোসেন মিয়া	বাজের	৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৭, ২২, ২৪, ২৭, ৩০, ৩১, ৩৪, ৩৫, ৩৭, ৩৯, (৩৬) ৪০, (৩৭) ৪১, ৪৭, ৫০
আভাষ দাশগুপ্ত	বেন্দা	১, ২, ৩, ৫, ৬, ৮, ৯, ১০, ১২, ১৩, ১৫, ২৪, ২৯, ৩০, ৩২, ৩৩, ৩৫, ৩৮, ১৬, ২৪, ২৭, ৪৩, ৪৪, ৪৬, ৪৬
ইন্দুমাধব বিশ্বাস	গ্রাঃ নং ৩২৪৭	১, ২, ৭, ১০, ১১, ১২, ১৫, ১৬, ১৭, ২৩, ২৫, ৩৮, ৪৫, ৪৬
ইন্দ্রাণী রায়	পাটনা	১, ৫, ১০, ১৮, ২৯, ৩০, ৩৪, ৪২
উদয়ভানু সিংহ	কলিকাতা	১, ২, ৩, ৪, ১০, ১১, ১২, ১৭, ১৮, ২৪, ২৬, ২৭, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, (৩৬) ৪৩, ৪৬, ৪৭, ৪৯
উমা বাগচী	রায়পুর, সি পি	১, ৩, ৪, ৫, ১০, ১৫, ২৩, ২৪, ২৫, ২৮, ৩২, ৩৫, ৪৩
সত্যেন্দ্রমোহন মৈত্র	ভবানীপুর	২, ৪, ৫, ৬, ৭, ১০, ১২, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২৩, ২৫ (নোবেল প্রাইজের সম্পূর্ণ ইতিহাস দিয়েছেন), ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৩৮, ৩৯, (৩৬) ৪০, (৩৭) ৪০, (৩৮) ৪৪, ৫০
কল্যাণী রায়	রাজসাহী	১৫, ৩০
কমলকুমার গুহ	এলাহাবাদ	২, ৫, ৯, ১০, ১১, ১৬, ২৩, ২৭, ৩৪, ৩৬, ৪৭
গোপীকেশ চক্রবর্তী	আরিয়াদহ	১, ২, ১৭, ৩৫
গোবর্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজ	সালিখা	১, ৫, ১০, ১৬, ৩০, ৩৪, ৪৬
গৌরাঙ্গচন্দ্র রুদ্র	চট্টগ্রাম	১, ১২, ১৬, ১৮, ২৩, ২৭, ৩৮, ৪৬
গ্রাহক নং	৩৪২৫	৫, ১২, ১৫, ১৭, ১৯, ২২, ২৩, ২৮, ৩০, ৩৩, ৩৮, ৪৭, ৪৯
ঠাকুরপ্রসাদ সান্ন্যাল	পাবনা	১, ২, ১০, ১৭, ২২, ২৩, ৩০, ৩৩, ৪৭
তারাপদ চক্রবর্তী	ফেনী	১, ৫, ১০, ১৩, ১৫, ১৬, ১৭, ২৪, ২৫, ২৭, ৩২, ৩৫, ৩৮, ৩৯, (৩৬) ৪০, (৩৭) ৪৭, ৪৯

উত্তরদাতাদের নাম	ঠিকানা	কোন্ কোন্ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছেন
দেবেন্দ্রনাথ দাস	জামসেদপুর	২০
ধীরেন্দ্রনাথ মহান্তি	দাঁতন	৮
ধ্রুবরঞ্জন সরকার	হাওড়া	১, ২, ৯, ২৬, ২৭, ৩৩, ৩৪, ৪০, (৩৮) ৪৭, ৪৯
নবনীকুমার চৌধুরী	লঙ্গাই	১৫, ১৬, ১৯, ২৩, ৩৩, ৩৪, ৩৮, ৩৯, (৩৬) ৪২, ৪৩, ৪৬, ৪৭
নমিতা গাঙ্গুলী	টালিগঞ্জ	৫, ৩০, ৩৭
নীতিশরঞ্জন দে ও নিখিলরঞ্জন দে	ঢাকা	১, ২, ৪, ৬, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৭, ২১, ২৩, ২৫, ২৬, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৭, ৩৮, ৩৯, (৩৬) ৪০, (৩৮) ৪২, ৪৪
নীলিমাদেবী মুখোপাধ্যায়	কলিকাতা	১, ৩, ৪, ৬, ১০, ১২, ১৪ (F.R.S. সম্বন্ধে ইনি সকলের চেয়ে বেশী সংবাদ দিতে পেরেছেন), ১৭, ১৮, ০২, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫ (নোবেল প্রাইজ সম্বন্ধে ইনি সম্পূর্ণ তালিকা দিয়েছেন), ২৭, ২৮, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, (৩৬) ৪০, (৩৭) ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৯, ৫০
নীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার	বালিগঞ্জ	১, ৭, ১০, ১২, ১৬, ১৭, ১৮, ২৪, ৩৩, ৩৬, ৪৬, ৪৭, ৩৯, (৩৬)
পঙ্কজমোহন রায়	কোতুলপুর	১, ১০, ২৫, ২৮, ৩৮, ৩৯, (৩৬) ৪০, (৩৭) ৪২, ৪৪, ৪৭
পপী বসু	পটুয়াখালি	১০, ১১, ৩৮, ৪৭
পশুপতিনাথ ঘোষাল	কলিকাতা	১০, ১৭, ২৩
পান্নালাল ও কেশবলাল আটা	শালিখা	১, ১০, ১৫, ১৩, ১৭, ২১, ২৩, ২৮, ৩৪, ৩৫, ৩৮, ৪৪, ৪৬, ৪৭, ৪৯
পীযূষকান্তি সেন	সিমলা হিলস্	৪, ১০
পুলিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়	শেওড়াফুলি	১, ২, ৩, ৫, ৭, ১০, ১৬, ১৮, ২৫, ২৮, ৩০, ৩৪, ৩৬, ৩৮, ৪৪, ৪৬, ৪৭, ৪৯
প্রিয়তোষ গাঙ্গুলী	বরাহনগর	১, ৪, ১১, ৪৫, ৪৯
বিশ্বনাথ সেনগুপ্ত	চট্টগ্রাম	১, ২. ৩, ৪, ৫, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৫, ১৬, ২০, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ৪০, ৩১, ৩২, ৩৪, ৩৫, ৩৭, ৩৮, ৩৯, (৩৬) ৪০, (৩৭) ৪৩, ৪৪, ৪৬, ৪৭
বীরেন্দ্রনারায়ণ সরকার	ফরিদপুর	১, ৫, ১০, ১১, ১৭, ২২, ২৬, ২৭, ৩০, ৩২, ৩৩, ৩৫, ৩৭, ৩৯, (৩৬) ৪৬, ৪৭, ৪৯
বৈদ্যনাথ শেঠ	গ্রাঃ নং ৩৩৭০	১, ৫, ১৫, ২৩, ২৬, ৩৬
মধু ঘোষাল	মুগকল্যাণপুর	১, ২, ৫, ৬, ১০, ১২, ১৫, ২১, ২২, ২৩, ২৮, ৩০, ৩৭, ৪০, (৩৭) ৪৪
মধুসূদন মণ্ডল	বালীদেওয়ানগঞ্জ	১, ২, ৫, ১০, ২৩, ২৪, ৪২, ৪৭
মণীন্দ্রমোহন মজুমদার	পুরুলিয়া	১, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৭, ২৩, ২৫, ৩৬
মনোজ দত্ত	চট্টগ্রাম	১, ২, ৫, ৮, ৯, ১০, ১২, ১৩, ১৬, ১৭, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৯, ৩০, ৩১, ৩৪, ৩৫, ৩৭, ৩৮, ৩৯, (৩৬) ৪০, (৩৮) ৪৩, ৪৬, ৪৭, ৪৯
মহবুল হোসেন	মৈমনসিংহ	১, ৯, ১১, ১৬, ২২, ৩৫, ৪২, ৪৫, ৪৯

উত্তরদাতাদের নাম	ঠিকানা	কোন্ কোন্ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছেন
মীরা দাস	সীলেট	৫, ২২, ২৩, ২৯, ৩০,
মৃণালকান্তি গুপ্ত	শিয়ালদহ	১, ১০, ১৭, ২৩, ২৬, ৩৪, ৩৫
রণেন্দ্রকৃষ্ণ সরকার	কলিকাতা	২, ১০, ১১, ১৫, ১৮, ১৯, ২৯, ৩০, ৪১, ৪৭, ৫০,
রেবা ভদ্র	ঢাকা	১, ২১, ১৭, ১০, ৩৭ ৪৪, ৫০
লীলা মিত্র	মজঃফরপুর	২, ৫, ১০, ১৪, ১৬, ১৭, ২১, ২৩, ৩০, ৩৪, ৩৫, ৩৭, ৪৪, ৪৯
হরিকমল পুরকায়স্থ	শিলং	১, ১৭, ২৩, ২৫, ২৭, ৪৯, ৩৮,
শকুন্তলা বসু	খুলনা	১, ২৩, ২৫, ৩৩, ৩৯ (৩৬) ৪৬,
শক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	ডিব্রুগড়	১, ২, ৩, ৫, ৯, ১০, ১৩, ১৫, ১৬, ১৯, ২১, ২২, ২৩ ২৬, ২৭, ২৯, ৩২, ৩৪, ৩৫, ৩৮, ৩৯ (৩৬) ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৬, ৪৭,
শশী ভট্টাচার্য	হেমনগর	১, ২, ৩, ৫, ৬, ১০, ১৫, ২০, ২১, ২৬, ২৭, ২৯, ৩০, ৩৩, ৩৫, ৩৮, ৩৯, (৩৬) ৪৬, ৪৭,
শৈলেন্দ্রকুমার রায়	কলিকাতা	১, ২, ৩, ৫, ১০, ১৫, ১৬, ১৭, ২২, ২৪, ২৫, ৩১, ৩৩, ৩৮, ৪৩,
সনৎকুমার ভট্টাচার্য	আবিরাদহ	৫, ১৫, ১৮, ২১, ৩০, ৩৯ (৩৬)
সমীর চৌধুরী	কটক	১, ৮, ১০, ১৬, ১৭, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩৩, ৩৪, ৩৮, ৪৭
সলিলা মুখার্জ্জি	কলিকাতা	৪৩
সাধনা বসু	বারুইপুর	১, ১০, ১৬, ১৭, ৩৩, ৩৮, ৪৪
সাধনানন্দ মিত্র	মুগবেড়িয়া	২০, ৩১ ৩৭, ৪০ (৩৭)
সিদ্ধেশ্বর মিত্র	বালিগঞ্জ	৪, ১০, ১২, ১৫, ২৪, ২৬
সুধীরচন্দ্র দেবরায়	হবিগঞ্জ	৫, ১০, ১১, ১২, ২৭, ৩০, ৩৯ (৩৬) ৪১, ৪৪, ৪৬
সুনীলকুমার ব্যানার্জি	রামপুরহাট	১, ১০, ১২, ১৫, ১৭, ২৩, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৪৬
সুপ্রিয়া পাল	কাঁথি	১০, ১৬, ১৭, ২১, ২৩, ৩৪, ৩৭, ৩৮, ৩৯ (৩৬) ৪৪, ৪৯
সুরভি রায়চৌধুরী	কলিকাতা	৩, ১০
সুশীলকুমার সরকার	বরহামগঞ্জ	৫, ১০, ১৭, ১৮, ২৩, ২৭, ৩০, ৩২, ৩৭, ৪৯
সৌরভ সানাতনি	অমলনার	১১, ১২, ১৬, ১৭, ৩৩, ৩৫, ৩৮, ৪৬, ৪৯

প্রশ্নোত্তর

১. মধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে জগতের সব কিছুই নিম্নগামী, কিন্তু আলোকশিখা উর্ধ্বগামী কেন ?

—পার্বতী, শান্তি, কুঙ্কুম ও তারা।

২. রবিবার দিন ছুটী থাকে কেন ?

—অসীম রাহা, বালিগঞ্জ।

৩. মানুষের চোখ নাচে কেন? শোনা যায় ইহা অমঙ্গলের কারণ, ইহা কি সত্য ?

—সুনীলকুমার ব্যানার্জি, রামপুর হাট।

৪. মানুষ মরবার পর কোথায় যায় ?

—নীহার ব্যানার্জি, জব্বলপুর।

৫. বাংলা সাহিত্যে প্রথম নাটক কে লিখেছিলেন, কবে এবং সে নাটকের নাম কি ?

—রঞ্জিৎকুমার রায়, কলিকাতা।

৬. পৃথিবীতে বর্তমানে ক'টি আশ্চর্য্য জিনিস আছে, সেগুলি কোথায় এবং তাদের নাম কি ?

—সলিলা মুখার্জি, কলিকাতা।

৭. সংবাদপত্র ছাপিবার 'রোটারি মেশিন' কে কোন দেশে সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন এবং কোন সংবাদপত্র সর্বপ্রথম রোটারি যন্ত্রে মুদ্রিত হয় ?

—অজয়কুমার ব্যানার্জি, কলিকাতা।

৮. টাটকা দুধ ও সিদ্ধ ডিমে Food-value হিসাবে পার্থক্য কি ?—অণিমা দেবী, উত্তরপাড়া।

৯. থার্মোমিটার কে প্রথম আবিষ্কার করেন এবং কবে কোথায় প্রথম তৈরি হয় ? —রেবা ভদ্র, ঢাকা।

১০. ডারউইন কিসের জন্য বিখ্যাত ?

—তারাপদ চক্রবর্তী, ফেণী।

১১. মহিলা ঔপন্যাসিকাদের মধ্যে বাংলা দেশে বর্তমানে শ্রেষ্ঠ কে ?—গৌরাঙ্গ রুদ্র, চট্টগ্রাম।

১২ টেলিস্কোপ সর্বপ্রথম কে আবিষ্কার করেন এবং কবে কোথায় প্রথম তৈরি হয় ?

—মধুসূদন মণ্ডল, বালি দেওয়ানগঞ্জ।

১৩. বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার কে এবং কোন নাটকখানি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ? —গোপীকেশ চক্রবর্তী, আরিয়াদহ।

১৪. উর্ধ্বে একটি তীর নিক্ষেপ করিলে উহা উপর দিকে শেষ সীমা পর্য্যন্ত পৌঁছিতে অধিক সময় লাগে ? না পুনরায় মাটিতে ফিরিয়া আসিতে অধিক সময় লাগে ?

—অরবিন্দ বিশ্বাস, চট্টগ্রাম।

১৫. পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় ফুলের নাম কি এবং কোথায় পাওয়া যায় ? —প্রিয়তোষ গাঙ্গুলী, বরাহনগর।

১৬. লাল, নীল, সবুজ ও কপিং পেন্সিলের শিস কি দিয়ে তৈরি হয় ?—পান্নালাল ও কেশবলাল আটা, শালিখা।

১৭ সূর্যমুখী ফুল সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে কেন ?

—মীরা দাস, শ্রীহট্ট।

১৮. 'প্ল্যানচেট' জিনিসটি কি এবং তার দ্বারা কি হয় ?

—সাধনানন্দ মিশ্র, মুগবেড়িয়া।

১৯. কৃষ্টি (বা সংস্কৃতি।) কি ?

—হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়, ঢাকা।

২০. শুক্রগ্রহটিকে মধ্যরাত্রিতে কখনও দেখা যায় না কেন ? —পঙ্কজমোহন রায়, বাঁকুড়া।

২১. বাংলা ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস কোনটি ?

—নীতিশরঞ্জন ও নিখিলরঞ্জন দে, ঢাকা।

২২. পাহাড়ের ধারেই সাধারণতঃ গভীর খাদ হয় কেন ? —নবনীকুমার চৌধুরি, লঙ্গাই।

২৩. শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই কাঁদে কেন ?

—গোবর্দ্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজ, সালিখা।

২৪. কবিত্বশক্তি কি ঐশ্বরিক দান ?

—নীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার, কলিকাতা।

২৫. বর্তমান রাজনৈতিক সঙ্কটে ভারতের লক্ষ্য কি হওয়া উচিত ? —শ্রীদিব্বেশ্বর মিত্র, বালিগঞ্জ।

২৬. চোখের জল লোনা হয় কেন ?

—মধু ঘোষাল, যুগকল্যাণ।

২৭. ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ কে ?

—সমীর চৌধুরী, কটক ও অশ্বিনীকুমার মণ্ডল, আহমদপুর।

২৮. ছোট গল্প রচনার প্রবর্তক কে ?

—শ্রীধ্রুবরঞ্জন সরকার, হাওড়া।

২৯. বর্তমানে যেমন সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে পরীক্ষা দিয়া ডি-লিট, পি-এইচ্-ডি, ডি-এস্-সি প্রভৃতি উপাধি পায়, পূর্বকালে অর্থাৎ প্রাচীন ভারতে এই সকল বিষয়ে কি উপাধি ছিল ? —পুলিন বিহারী চট্টোপাধ্যায়, মহামায়া সাহিত্য মন্দির।

৩০ কোথাও কালো রংয়ের ফুল আছে কি ? থাকলে সে কোন দেশে এবং সে ফুলের নাম কি ?

—আভাষ দাশগুপ্ত, বেন্দা।

৩১ পল্লীজীবন ও নাগরিক জীবনের মধ্যে কোনটি শ্রেয় ? —অজিতকুমার ঘোষ, কলিকাতা।

৩২. ভোরের সূর্য্যালোকে যে Ultra-violet রশ্মি থাকে, বেলা হলে আর তা থাকে না কেন ?

—সলিলকুমার সেনগুপ্ত, কলিকাতা।

৩৩ বর্তমান মহাযুদ্ধের মহা অস্ত্র 'ট্যাঙ্কে'র আবিষ্কারক কে ? কবে কোন দেশে প্রথম উদ্ভাবিত হয় ?

—মনোজ দত্ত, চট্টগ্রাম।

৩৪. চোখের স্বাভাবিক দৃষ্টি কতদূর পর্য্যন্ত যেতে পারে ?

৩৫. কোন গাছের পাতা দেখিয়া কৃষকেরা বৃষ্টির সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া থাকে ?

—নীলিমা দেবী মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা।

৩৬ ছাত্র আন্দোলনের কর্মসূচী কিরূপ হওয়া উচিত ?

—বীরেন্দ্রনারায়ণ সরকার, ফরিদপুর।

৩৭. কাব্য, মহাকাব্য ও গীতিকাব্য কি এবং তাদের পার্থক্য কোথায় ? —অনিলবরণ ঘোষ, দাবড়া।

৩৮. তেলে আর জলে মিশ খায় না কেন ?

—শৈলেন্দ্রকুমার রায়, কলিকাতা।

৩৯. অনুমতি না নিয়ে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকাকে 'French Leave' নেওয়া বলে কেন ?

—ইন্দ্রাণী রায়, পাটনা।

৪০. 'আমাজনস্' বলে কাদের ?

—লীলা মিত্র, মজঃফরপুর।

৪১. মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলবার কোনো বৈজ্ঞানিক প্রণালী আবিষ্কৃত হয়েছে কি ?

—সনৎকুমার ভট্টাচার্য্য, আড়িয়াদহ।

৪২. প্রেসিডেন্ট উইলসন League of Nationএর প্রতিষ্ঠাতা, কিন্তু আমেরিকা কখনও এর সদস্য হয় নি কেন ?

পপী বসু, পটুয়াখালি।

৪৩. দেশ নায়কের আদেশ নির্বিচারে পালন করে কোন কোন দেশ জগতে বড় হতে পেরেছে?

—অশ্বিনীকুমার মণ্ডল, আহমদপুর।

৪৪, মাথার চুল উঠে যায় কেন? কি উপায় অবলম্বন করলে চুল উঠে যাওয়া বন্ধ হয়?

—উদয়ভানু সিংহ, কলিকাতা

৪৫. গ্রীষ্মকালে ঘামাচি হয় কেন? প্রতিকারের উপায় কি? —বৈদ্যনাথ শেঠ, গ্রাঃ নং ৩৩৭০

৪৬. উদয়শঙ্করের নৃত্যগুরু কে?

—হেনা রাহা, বরকান্তা

৪৭. "চোরে চোরে মাস্তুতো ভাই" এ প্রবাদ বাক্যের উদ্ভব কেন, কবে এবং কোথায় হয়েছে?

—দেবব্রত সিংহ, কলিকাতা

৪৮. কাঁসার জিনিসে আঘাত লাগলে তা বাজে কেন এবং হাত দিয়ে ধরলে বা ছুঁলে বাজনা তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয় কেন?

৪৯ আকাশে রামধনু ওঠে কেন?

—পার্বতীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, রামপুরহাট

৫০. বর্তমান বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার কে?

—নীতিশরঞ্জন দে, ঢাকা

৫১. ছাত্র-জাগরণ ও ছাত্র সংগঠন সম্পর্কে প্রায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই আজকাল ছাত্রদের মধ্যে দেখা যায় নিয়মানুবর্তিতা বা নিয়মানুগত্যের একান্ত অভাব। যাবতীয় নিয়ম শৃঙ্খলা ও বিধিব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাতেই যেন তাঁহাদের আনন্দ। এ অবস্থায় ছাত্র নেতাদের এবং ছাত্রদেরই বা কর্তব্য কি?

—মনোজ দত্ত, চট্টগ্রাম

৫২ ছোট ছোট ছেলেমেয়ে বা ভাইবোনদের কি পদ্ধতিতে শিক্ষা দিলে তারা মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে পারে? —কল্যাণী রায়, রাজশাহী।

৫৩. টেমস নদীর সুড়ঙ্গ কে, কবে এবং কেন তৈয়ারী করেন? ধীরেন্দ্রনাথ মহান্তি, দাঁতন।

৫৪. জলছবি কি? কে, কবে, কোথায় প্রথম তৈরি করেছিল? ভাবতে প্রস্তুত হয় কিনা?

—সুরথনাথ সরকার, নৈহাটি।

৫৫. আমরা ঘুমের মধ্যে আবোল তাবোল বকি কেন এবং নানারকম স্বপ্ন দেখি কেন?

—অনিলবরণ মহান্তি, দাঁতন।

হরফের হেরফের—অক্ষর ক্রীড়া

DEMOCRATIC এই শব্দটিকে ভেঙ্গে চুরে এমন একটি পদ তৈরী কর—যাতে বর্তমান ডেমোক্রেসির আসল রূপটি ফুটে ওঠে।

বৈশাখের উত্তর

A United Co এই পদটির হরফগুলিকে ভেঙ্গে চুরে সাজিয়ে শব্দটি হবে 'EDUCATION' কারণ, সভ্যতার পথে প্রধান পাথেয় = শিক্ষা। সঠিক উত্তর দিতে পেরেছেন—

অণিমা চ্যাটার্জি, উত্তরপাড়া, অনিলবরণ মহান্তি, দাঁতন। অশ্বিনীকুমার মণ্ডল, আহমদপুর: হেনা রাহা, বরকান্তা; শ্যামাপ্রসন্ন চক্রবর্তী, বালিগঞ্জ, প্রতিমা চ্যাটার্জি, জব্বলপুর; শৈলেন্দ্রকুমার রায়, কলিকাতা; অরুণলাল মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা। নীহার ব্যানার্জি, জব্বলপুর, পার্বতীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, রামপুর হাট, সাবিত্রী গাঙ্গুলী, কানপুর. সাধনা বসু, বারুইপুর. ইন্দুবসু, শিশুভারতী, কর্ণেশ্বর; দিলীপকুমার সেন, ভবানীপুর, শেফালী, দীপালী ও শ্যামলী পাল, কটক; উমা মুখার্জি, বালিগঞ্জ, হরিকমল পুরকায়স্থ, শিলং, ধীরেন্দ্রনাথ মহান্তি, দাঁতন, মিনতি গঙ্গোপাধ্যায়, দেওবন্দ, গীতা ও বাদল পালিত, আসানসোল; আরতি গুহ, নবগ্রাম, কৃষ্ণপদ চট্টোপাধ্যায়, আরিয়াদহ, প্রতিভা মিত্র, আরিয়াদহ; সন্তু মিত্র, কলিকাতা, রমা ও মীরা, ডিব্রুগড়; দেবপ্রসাদ ঘোষ, কলিকাতা; পান্নালাল ও কেশবলাল আটা, শালিখা; বিষ্ণুপদ স্মৃতি পাঠাগার, সালিখা; প্রিয়তোষ গাঙ্গুলী, বরাহনগর; মনোজ দত্ত, চট্টগ্রাম, আবুল হোসেন মিয়া, রাউজের; কামদারঞ্জন ভট্টাচার্য, নূরপুর, পাঁচুগোপাল বসু, বারাসত; শর্মিষ্ঠা সরকার, সালিখা, সরসীবালা দেবী, নাকোদার; সৌরভ সানাতনি, বেনারস।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: পৃথক কাগজে উত্তর পাঠালে তবেই প্রকাশিত হয়। নাম, ঠিকানা ও গ্রাঃ নং থাকা চাই।

শ্রীগ্রন্থাগারিক

কালিন্দী (উপন্যাস)

রচয়িতা :—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মূল্য তিন টাকা

প্রকাশক—কাত্যায়নী বুকষ্টল।

২০৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

যাঁরা আক্ষেপ করে থাকেন বাংলার কথা-সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের লেখনি স্তব্ধ হবার পর আর উল্লেখ যোগ্য উপন্যাস সৃষ্টি হয়নি, তাঁদের আমরা এই বইখানি মনোযোগ দিয়ে পড়তে অনুরোধ করি।

তারাশঙ্কর বাবুর উপন্যাসের পটভূমিকা সংকীর্ণ বা সীমাবদ্ধ নয়, উহা বিস্তৃত এবং ব্যাপক। কেবলমাত্র স্নেহ, প্রেম, বাৎসল্য, প্রণয় প্রভৃতি হৃদয়বৃত্তিই তাঁর উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য নয়। মানুষের সুকোমল হৃদয়বৃত্তিকে অবলম্বন করে যে রসসাহিত্যের সৃষ্টি তা সহজেই মানুষের হৃদয় স্পর্শ করতে সমর্থ, সুতরাং কেবলমাত্র মনোজগতের কাহিনী, নিপুণ সাহিত্যিকের হাতে সহজেই সর্বসাধারণের চিত্তজয়ী হয়ে উঠতে পারে। বর্তমান মানবজীবনের আভ্যন্তরীণ ও বহির্মুখীন ছোট বড় বহু বিচিত্র সমস্যা, ঘাত-প্রতিঘাত এবং পারিপার্শ্বিকের কালানুগত অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন ও বিপর্যয় প্রভৃতি বিষয়গুলি মানুষের সমাজগত জীবনের সুখদুঃখ এবং হৃদয়বৃত্তি সমূহের নানাবিচিত্র প্রকাশের পাশাপাশি একত্রে যে উপন্যাসে স্থান পায় সে উপন্যাস সমগ্রতার দিক দিয়ে সুসম্পূর্ণ। জীবনের এই বিস্তীর্ণ পটভূমিকায় বহুবিচিত্র সমস্যার সাথে মানবজীবনের সবলতা, দুর্বলতা, ঔদার্য, সংকীর্ণতা, ত্যাগ ও কামনা, স্নেহ প্রেম প্রণয় প্রভৃতি সমস্ত কিছুরই স্বাভাবিক ও জীবন্ত প্রকাশ যে-লেখকের রচনায় সুসমঞ্জস হয়ে ওঠে, তাঁর শক্তিকে শ্রদ্ধানত্র চিত্তে স্বীকার করতে হয়। সে স্বীকৃতি যদি বর্তমানকাল দিতে বিমুখ হয়, ভবিষ্যকাল নিঃসন্দেহ সে প্রাপ্য অঞ্জলি ভরে মিটিয়ে দেয়।

"কালিন্দীর" লেখকের লেখনী সংযত এবং সুনিপুণ। মানবজীবনের সকল দিকে দৃষ্টি তাঁর বহু দূর বিস্তারী। অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিনকালের মধ্যে তিনি কোনও একটি কালের প্রতি সমধিক সংসক্ত দৃষ্টি হয়ে পড়েন নি। সেইজন্য তাঁর বর্তমান, অতীতকে স্বীকার ও মর্যাদা দান করলেও, ভবিষ্যতের প্রতি কিছুমাত্র উদাসীন ও বিমুখ নয়। তিনি অতীতের যতটুকু সত্য তা' স্বীকার করে বর্তমানকে রচনা করেছেন ভবিষ্যতের প্রতি মোহমুক্ত উজ্জ্বল দৃষ্টি রেখেই। তাঁর চিন্তাধারা ও চরিত্রানুশীলনের মধ্যে একটা বৈজ্ঞানিক সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায়।

কালিন্দী উপন্যাস খানি পড়ে মনে পড়লো বিরাট পৃথিবীর সমগ্র রূপ এবং সংস্থান যেমন ক্ষুদ্র একটি ভৌগোলিক গ্লোবের মধ্যে সুন্দররূপে ধারণা করা যায়, কালিন্দীর চরের ঘটনা পারম্পর্যও তেমনি আজ সমগ্র সভ্যজগৎব্যাপী সবল-দুর্বল সমস্যা, জমিদার-কৃষক, বণিক-শ্রমিক, রাজা-প্রজা, পুরুষ-নারী প্রভৃতি অনস্বীকার্য সমস্যাগুলিকে ক্ষুদ্র উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত পটে আমাদের মনের সম্মুখে সুস্পষ্ট প্রতিভাত করে তুলেছে। এ যেন শিশির বিন্দুর মধ্যে অসীম আকাশের প্রতিবিম্ব। কিন্তু "কালিন্দী"কে কেবলমাত্র সমস্যামূলক উপন্যাস বলে কেউ যেন ভুল করেনা। "কালিন্দী" রসোপন্যাস। এতে মানুষের হৃদয়বৃত্তি সমূহ কোনও খানেই অপ্রাধান্য লাভ করেনি। বরং সর্বত্রই সুন্দরভাবে তার প্রভাব স্বীকার করা হয়েছে। মানবজীবনের কতকগুলি বিজ্ঞান-পরীক্ষিত সত্যকে লেখক তাঁর উপন্যাসের মেরুদণ্ডরূপে গ্রহণ করেছেন। যেমন, হেরেডিটি বা শোণিতধারাগত সংস্কার ও প্রবৃত্তি।

কালিন্দী উপন্যাসের অপূর্ব চরিত্র সৃষ্টি রামেশ্বর। এই রামেশ্বর ও ইন্দ্ররায় শ্রেণীর পুরুষেরা একদিন বাংলাদেশের মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আজ তাঁদের উত্তর পুরুষদের মধ্যে তাঁদের চরিত্র নিদর্শন নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেছে। যে শক্তিশালী ঔপন্যাসিক বাংলা সাহিত্যের মধ্যে স্বদেশের ও স্বজাতির কোনও এক শ্রেণীর অধুনালুপ্ত গৌরবময় বলিষ্ঠ রূপ এমন জীবন্ত ও সার্থকরূপে অঙ্কিত করে রেখে গেলেন, তিনি ধন্যবাদের পাত্র, স্বজাতির কৃতজ্ঞতাভাজন। বাঙলাদেশে অল্পকাল পূর্বেও অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে যে উন্নততরের সূক্ষ্ম আর্টিষ্টিক রসিকতা এবং সুতীক্ষ্ণ ভাবগর্ভ অথচ ভদ্র ও শীলতা মণ্ডিত সুন্দর কথোপকথন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, যা দ্রুত সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে বা গিয়েছে বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না, সেই অপূর্ব নির্মল মর্যাদা সম্পন্ন স্বচ্ছ রঙ্গ-পরিহাস এবং বিচিত্র ভাবব্যঞ্জক কথোপকথন সাহিত্যের মধ্যে চিরঞ্জীব করে রেখে তারাশঙ্করবাবু বাঙালী জাতির বিগত সংস্কৃতির প্রথম ঐতিহাসিক হয়ে রইলেন।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসারতা সম্বন্ধে যাঁরা ক্ষুব্ধ ও সন্দিহান তাঁদের আমরা তারাশঙ্করবাবুর কেবল এই উপন্যাস খানি মাত্র নয়, 'ধাত্রী দেবতা,' জলসাঘর প্রভৃতি প্রত্যেকখানি বইই মনোযোগ দিয়ে পড়তে অনুরোধ করি।

ছোটদের কবি রবীন্দ্রনাথ

শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভা আজ সারা জগতে ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর কবিতা পড়েন নি কিংবা তাঁর নাম জানেন না এমন কাব্য রসিক পাঠক পৃথিবীতে নেই। কাব্যে, গানে, কবিতায়, গল্পে, প্রবন্ধে, ভ্রমণে, উপন্যাসে, সমালোচনায়, নাট্য প্রতিভায় তাঁর অসামান্য দক্ষতার কথা কে না জানে, কে না মানে? তাঁর সমকক্ষ প্রতিভা জগতে বিরল। আমাদের গর্ব, আমাদের অহঙ্কার যে তিনি আমাদের এই বাঙ্‌লা দেশের শ্যামল মাটিতেই জন্মগ্রহণ করেছেন। পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি বলেই তিনি আমাদের কবিগুরু। তাঁর প্রতিভার দীপ্ত আলোক আমাদের জাতির সাহিত্যকে উজ্জ্বল করেছে আমাদের জাতির ভাগ্যকে শ্রেষ্ঠতর করেছে।

এই বিশ্বপ্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে শিশুদের জগৎ কত মহান্ সেই কথাই সংক্ষেপে আজ তোমাদের বল্‌বো।

তোমাদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা কি অকৃত্রিম, তাঁর স্নেহ কি অপার তা তাঁর বিশ্বজনীন কাব্যের ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে। কাব্যে, গদ্যে, ছড়ায়, গল্পে, প্রবন্ধে, বিজ্ঞানে, নাটকে শিশুসাহিত্যকে তিনি নানাভাবে বিকাশ করেছেন। দেশের ভবিষ্যৎ আশা যে শিশুর দল তাদের মানুষ করে গড়ে তোলবার জন্যে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। এমন কি আদর্শ বিদ্যায়তন শান্তিনিকেতন বাঙালার মহাতীর্থ শান্তিনিকেতন সে তোমাদেরই মানুষ করে গড়ে তোলার মহান পরিকল্পনায় সৃষ্টি হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের শিশুকাব্য পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠকাব্য। জগৎ পারাবারের তীরে ছেলেদের যে খেলাঘর, ছেলেদের যে মেলা, তা এই সঙ্কীর্ণ পৃথিবীর সঙ্কীর্ণ চিত্তের স্বার্থ কোলাহলে ভরা নয়। তা বিশ্বপ্রকৃতির মাঝে স্বর্গজগতের মহামেলা। সে খেলা ঘরের দৃশ্য কি চমৎকার।

"বালুকা দিয়ে বাঁধিছে ঘর,
ঝিনুক নিয়ে খেলা।
বিপুল নীল সলিল 'পরি
ভাসায় তারা খেলার তরী,
আপন হাতে হেলায় গড়ি
পাতায় গাঁথা ভেলা।
জগৎ পারাবারের তীরে
ছেলেরা করে খেলা।"

রবীন্দ্রনাথের এ শিশুর জগতে সংসারের মলিনতা নেই, বাস্তবের ধূলি-ধূসরতা নেই। স্বপ্নের রঙে তা রঙীন, কাব্যের সুরে তা ছন্দমধুর, তন্দ্রালসতার আবেশে তা ভরপুর—

"ঘুমের বুড়ি আসিছে উড়ি
নয়ন ঢুলানী,
গায়ের' পরে কোমল করে
পরশ বুলানী।
মায়ের প্রাণে তোমারি লাগি,
জগৎ-মাতা রয়েছে জাগি,
ভুবন মাঝে নিয়ত রাজে
ভুবন-ভুলানী।
ঘুমের বুড়ি আসিছে উড়ি
নয়ন-ঢুলানী।"

বাঙলার শ্যামল মায়ের সবুজ তৃণ দূর্বাদল এই শিশু, কাব্যের কোমল ছন্দগানে, রূপে, রসে যে অপূর্ব সৌন্দর্যের রূপ পরিগ্রহ করেছে, পৃথিবীর কোন কাব্যের সঙ্গেই এর তুলনা হয় না।

এ শিশুর জগৎ পৃথিবীর মলিনতায় স্থান পায় না, স্বর্গের প্রকৃতির উদারতায় মহানতায় এর স্থান

"এই যে খোকা তরুণ তনু
নতুন মেলে আঁখি
ইহার ভার কে লবে আজি
তোমরা জান তা কি?
হিরণময়-কিরণ ঝোলা
যাঁহার এই ভুজে দোলা,
তপন শশী তারার কোলে
দেবেন এরে রাখি
এই যে খোকা তরুণ তনু
নতুন মেলে আঁখি।"

শিশুদের রবীন্দ্রনাথ কত ভালোবাসেন সে তাঁর বহু কবিতার মাঝেই ব্যক্ত হয়েছে। তাঁর অপার স্নেহে বিশ্ব প্রকৃতির শিশু স্নেহাসিক্ত—

"খোকা আমার কতখানি
সেকি তোমরা বোঝ?
তোমরা শুধু দোষগুণ তার খোঁজ।
আমি তারে শাসন করি
বুকেতে বেঁধে,
আমি তারে কাঁদাই যে গো
আপনি কেঁদে!"

আরও আশ্চর্যের কথা শোন। বিশ্বের কবি রবীন্দ্রনাথ সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতির মাঝে শিশুদের জগৎকেই শ্রেষ্ঠস্থান দিয়েছেন। পরিণত বয়সে বিপুল যশঃ ঐশ্বর্যের মাঝেও তিনি একান্তভাবে প্রার্থনা করেছেন শিশুদের রাজ্য—

"খোকার মনের ঠিক মাঝখানটিতে
আমি যদি পারি বাসা নিতে—
তবে আমি একবার
জগতের পানে তার
চেয়ে দেখি বসি সে নিভৃতে।"

এ জগতের মাঝে এসে বিশ্বের কবি কত প্রশ্নই না করেছেন। কত রূপ, ঐশ্বর্য, গল্প-গানকেই না উপভোগ করেছেন। কত হাসি মুখেতে মশগুল হয়ে কত বিচিত্র খেলাই না খেলেছেন। বিশ্বের প্রকৃতি কতরূপ রস গন্ধ সৌন্দর্য নিয়ে কবির এই শিশুর জগতে নেমে এসেছে তার বিস্তৃত আলোচনা করতে গেলে খাতার পর খাতা উঠ্‌বে ভরে অথচ তার কিছুই বুঝি বলা হবে না।

তাঁর 'বীরপুরুষ' তাঁর 'মাঝি' 'ছুটীর দিনে' কোনটি রেখে কোনটির নাম করি? শিশুসাহিত্যে, শিশুকাব্যে, তারা অবিস্মরণীয়, অতুলনীয় অবদান।

শিশু জগতের এসব অমর কাব্য ছোট বড় সকলকেই একযোগে মুগ্ধ করে, এমনি রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব কাব্য প্রতিভা।

ঘনঘটাচ্ছন্ন মেঘমেদুর বর্ষণ সন্ধ্যায় ছুটির দিনে শিশুর মন কবিতার সে কোন্ স্বপ্নরাজ্যে ছুটে চলেছে?

"এম্‌নিতর মেঘ করেছে
সারা আকাশ ব্যেপে,
রাজপুত্তুর যাচ্ছে মাঠে
একলা ঘোড়ায় চেপে।
গজমোতির মালাটি তার
বুকের পরে নাচে,
রাজকন্যা কোথায় আছে
খোঁজ পেলে কার কাছে?
মেঘে যখন ঝিলিক মারে
আকাশের এক কোনে
দুয়োরাণীর-মায়ের কথা
পড়ে না তার মনে?
দুখিনী মা গোয়াল ঘরে
দিচ্ছে এখন ঝাঁট,
রাজপুত্তুর চলে যে কোন
তেপান্তরের মাঠ?

বর্ষার সজল ধারার সঙ্গে এ কাব্যের কারুণ্য আর মিষ্টতা, এ কাব্যের কবি-অভিব্যক্তি শুধু শিশুদের জন্ম নয় সকলের জন্ম। পৃথিবীর সকল লোকই এ কাব্যের স্নিগ্ধ ধারায় অবগাহন করে শিশু-কবি-চিত্তলাভ করে।

তেপান্তরের মাঠের এ উদারতা, এ প্রসারতা কবির মনোদর্পণে কি নিখুঁত ভাবেই না ধরা পড়েছে।

বিশ্বের কবি রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব প্রকৃতিকে এই শিশুদের জগতেই বেশী করে উপলব্ধি করেছেন। কাব্য তাঁর শিশুদের মাঝে তাই বিশ্ব প্রকৃতির শোভা সৌন্দর্যে এমন রসঘন আর ভরপুর হয়ে উঠেছে।

"বাদলা যখন প'ড়্‌বে ঝ'রে
রাতে শুয়ে ভাববি মোরে,
ঝরঝরানি গান গাব ঐ বনে।
জানলা দিয়ে মেঘের থেকে
চমক মেরে যাব' দেখে,
আমার হাসি প'ড়্‌বে কি তোর মনে?"

একাব্যের কারুণ্য আর কবি চিত্তের সকরুণ স্বপ্ন অনুভূতি প্রকৃতিকাব্যে যে রস সৃষ্টি করেছে তার তুলনা আর কোন জাতির কোন দেশের শিশু কাব্যের সঙ্গে করা চলে না। এ শুধু আমাদের দেশের কবি রবীন্দ্রনাথেরই বৈশিষ্ট্য।

রবীন্দ্রনাথের শিশু কাব্যে চিরবসন্ত খেলা করে বেড়াচ্ছে। এখানে আছে শুধু প্রাণভরা সৌন্দর্যের মেলা। শুষ্কতাকে, প্রাণহীনতাকে, জড়তাকে শিশুর জগৎ থেকে তিনি দূরে ঠেলে দিয়েছেন—

"শীত তুমি হেথা কেন এলে?
উত্তরে তোমার দেশ আছে,
পাখী সেথা নাহি গাহে গান,
ফুল সেথা নাহি ফুটে গাছে।
সকলি তুষার মরুময়
সকলি আঁধার জনহীন,
সেথায় একলা বসি বসি
জ্ঞনী গো কাটায়ো তব দিন।"

চির বসন্তের রাজ্যে শিশুর কবি রবীন্দ্রনাথের যে কবিতা, মেঘে মেঘে ভরা আকাশের বর্ষণ ধারায় যে কাব্য সজল শ্যামল তা সেই বৃহত্তর মহত্তর এক কবি প্রতিভায় ব্যক্ত হয়েছে যিনি সারা বিশ্বে পূজিত, সারা বিশ্বে আদৃত।

আজ সেই ছোটদের কবি, বড়দের কবি, তোমার আমার কবি, সারা বিশ্বের কবি রবীন্দ্রনাথের জন্ম-তিথি।

এস আজ আমরা সবাই মিলে এই শুভদিনে তাঁর আরও, আরও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

ছোটদের জন্ম, বড়দের জন্ম, সারা বিশ্বের জন্ম, তিনি আরও, আরও অনেকদিন বেঁচে থেকে কাব্য লক্ষীকে লক্ষীশ্রীতে ভরিয়ে রাখুন।

পরাগ ও রেণু

শ্রীনরেন্দ্র দেব

স্কুলের মাঠে

কালীবাবু যখন দেওয়ানজীকে নিয়ে স্কুলের মাঠে উপস্থিত হলেন ঠিক সেই সময় ছেলেদের মধ্যে একটা দৌড় প্রতিযোগিতার উদ্যোগ হচ্ছিল। বাজীতে যারা যোগ দেবে তারা সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে, কেউ কেউ সামনের দিকে ডান পা বাড়িয়ে রেখেছে, কেউ কেউ একটু হেঁট হয়ে হাত দুটো মুঠো করে দাঁড়িয়েছে, স্টার্টার বাঁশী হাতে নিয়ে গুনছে "One—be ready, Two—steady!" হুইসল্ বাজলেই এই দল ছুটতে সুরু করবে। দেওয়ানজী দেখে বিস্মিত হলেন যে সেই দলের মধ্যে পরাগও রয়েছে। কারণ সে দলের প্রত্যেক ছেলেটিই ছিল পরাগের চেয়ে মাথায় লম্বা এবং বয়সেও বড়।

তিনি কালীবাবুকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলেন কিন্তু সেই মুহূর্তে হুইসল্ বেজে উঠলো এবং স্টার্টারের গলা শোনা গেল, "Three—Go-on!" সমবেত ছাত্রছাত্রীদের উত্তেজিত কণ্ঠের উচ্চ কলরবের মধ্যে প্রতিযোগীরা প্রাণপণে ছুটতে সুরু করে দিলে।

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেওয়ানজী দেখলেন সবার চেয়ে মাথায় ছোট সেই পরাগ সমস্ত দলকে পিছনে ফেলে রেখে সবার আগে ক্ষিপ্র বেগে ছুটে চলেছে যেন ক্ষুদ্র এক হরিণ শিশু।

চারিদিক থেকে হর্ষধ্বনি উঠছে, "বাহবা রায়, বাহবা" "Go on-go on" পরাগের সহপাঠী কেশর মিত্র এই সময় খুব জোর ছুট দিয়ে প্রায় পরাগের নাগাল ধরে ফেললে—মাঠের একদল ছেলেমেয়েরা তাকে উৎসাহ দিয়ে চীৎকার করে উঠল—"ব্যক্ অপ্ মিত্তির!" Sure you will win?" আর এক দল তার স্বরে বলে উঠল —"হুর্‌রে! রয় leading! হুর্‌রে!" দেওয়ানজী অধীর কণ্ঠে বলে উঠলেন—"অত ছুটতে ওকে বারণ করুন কালীবাবু, শেষে কি হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে হাত পা খোঁড়া করবে?" ছেলেদের ঘন ঘন চীৎকার উঠছে— 'ব্যক্ অপ রয়!' 'ব্যক্ অপ্! Go on! হুর্‌রে! হুর্‌রে!'

কালীবাবু হেসে বললেন—ভয় পাবেন না, ও এতে অভ্যস্ত। দৌড়ে ওকে কোনো ছেলেই হারাতে পারে না—কি খেলাধুলোয় কি পড়াশুনোয় পরাগ হল সবার উপর। দেখবেন শেষ পর্যন্ত খোকাই জিতবে।"

অকস্মাৎ দেওয়ানজী মহাশয় ভীত হয়ে বলে উঠলেন —"আরে আরে! সরে যেতে বল, খোকাকে সরে যেতে বল,—মিত্তির যে ওর ঘাড়ের উপর এসে পড়ল!

ছেলেদের ঘনঘন চীৎকার ও আনন্দধ্বনির উচ্ছ্বসিত অট্টরোলে দেওয়ানজী মহাশয়ের কথা কালীবাবু শুনতে পেলেন না।

কেশর মিত্তির এই সময় বিদ্যুৎবেগে পরাগের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল—

"হুর্‌রে! মিত্তির! হুর্‌রে!"

"ব্যক্ অপ্ রায়—ব্যক্ অপ্!"

দেওয়ানজী মহাশয় এবার হতাশ হয়ে বললেন—"নাঃ; পারলে না ছোকরা। ওর দৌড় দেখে প্রথমটা আমিও ভেবেছিলুম বোধ হয় আমাদের খোকাই জিতবে; কিন্তু মিত্তির ওর চেয়ে বয়সে ঢের বড়। পরাগ নেহাৎ ছেলে-মানুষ। ও পারবে কেন ছুটতে ওর সঙ্গে?

"হুর্‌রে! হুর্‌রে! থ্রী চিয়ার্স ফর মাস্টার পরাগ! হিপ্ হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে! হিপ্ হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে!" অকস্মাৎ স্কুলের মাঠের উত্তেজিত ছেলের দল হাত তুলে নাচতে নাচতে তারস্বরে চীৎকার সুরু করে দিলে।

দেওয়ানজী মহাশয় বিস্মিত হয়ে দেখলেন—উল্কা বেগে পরাগ ছুটে গিয়ে মিত্তিরকে পিছনে ফেলে রেখে উইনিং পোষ্ট পার হয়ে বেরিয়ে গেল।

চড়্ চড়্ চড়্ চড়্ চড়্ চড়্ চড়্ চড়্ পট্ পট্ পট্ পট্ পট্ চারিদিক থেকে অসংখ্য হাততালির শব্দ আর থামে না। দেওয়ানজী মহাশয়ের পাশে দাঁড়িয়ে কালীবাবুও বালকের মত লাফাতে লাফাতে হাততালি দিচ্ছিলেন এবং সমবেত ছেলেদের সঙ্গে সমান উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করেছিলেন "থ্রী চিয়ার্স ফর মাস্টার পরাগ!"

এ হেন অবস্থায় নিজের অজ্ঞাতসারে দেওয়ানজী মহাশয়ও এক সময়ে সজোরে হাততালি দিতে সুরু করেছিলেন। ছেলেদের এই খেলার উত্তেজনা যেন তাঁকেও পেয়ে বসেছিল।

কালীবাবু ছুটে গিয়ে পরাগকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। সমস্ত ছেলের দল তাদের ঘিরে দাঁড়াল।

পরাজিত কেশর মিত্র এগিয়ে এসে পরাগের সঙ্গে করমর্দন করলে, হাসি মুখে বললে—"এবারও আমি তোমার কাছে হেরে গেলুম পরাগ।"

পরাগ লজ্জিত হয়ে বললে—"না-না কেশর দা' তোমারই ত জেতবার কথা ভাই, তুমি আমার চেয়ে অনেক ভাল দৌড়েছ, কিন্তু আমি ছোট বলে তোমার চেয়ে হালকা, তাই শেষ বরাবর কোনো রকমে ছিটকে চলে এসেছি। তুমিও তো প্রায় আমার সঙ্গে সঙ্গেই এসে পোষ্ট ছুঁয়েছ। ওকে ঠিক হার বলে না। প্রাইজটা ভাই আমরা দুজনে ভাগ ক'রে নেব—কেমন?"

পরাগের এই মহৎ আচরণে, প্রতিপক্ষের পরাজয়ের গ্লানিকে এমন করে লঘু করে দেবার শিষ্টাচার দেখে কালীবাবুর মুখখানি গৌরবে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি বললেন—"আমি দেব মিত্তিরকে একটা প্রাইজ।"

"হুররে! হুররে! থ্রী চিয়ার্স ফর মাষ্টার মিটার।" ছেলের দল আর একবার মহোল্লাসে হৈ হৈ করে উঠল।

দেওয়ানজী মহাশয়ও গুটি গুটি পরাগের কাছে এগিয়ে এসেছিলেন। পরাগ তাঁকে দেখতে পেয়েই পায়ের কাছে ঢিপ করে মাথা নুইয়ে নমস্কার করে ফেললে।

দেওয়ানজী মহাশয় আনন্দে গদ গদ হয়ে তাকে আশীর্বাদ করলেন এবং বিশেষভাবে আদর করে ছেলেদের সবাইকে ডেকে বললেন, "আজ তোমাদের খেলায় যে ছেলেটি জিতেছে সে লক্ষ্মীপুরের ভাবি জমিদার। এই ক্লাবে সেই জমিদারের পক্ষ থেকে আমি পঞ্চাশ টাকা চাঁদা দিচ্ছি, তোমরা সকলে একদিন কোথাও বনভোজনের আয়োজন কর।"

আবার ছেলের দল মহোল্লাসে চিৎকারে উঠলো "থ্রী চিয়ার্স ফর লক্ষ্মীপুরের জমিদার। থ্রী চিয়ার্স ফর মাষ্টার পরাগ, হিপ্ হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে!"

স্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী কমলা দেবী এইবার এগিয়ে এলেন, সঙ্গে তাঁর নীল ফ্রক পরা একটি মেয়ে, হাতে তার দৌড়বাজীর একটি ঝকঝকে রূপোর কাপ, কমলা দেবী পরিয়ে দিলেন পরাগের গলায় একগাছি বেল-ফুলের গোড়ের মালা, দুলিয়ে দিলেন তার বুকে লাল ফিঁতেয় বাঁধা একটি সুদৃশ্য মেডেল।

ঘন ঘন পড়তে লাগল চারিদিক থেকে প্রচণ্ড করতালি! মুহুর্মুহুঃ উঠতে লাগল বিপুল জয়ধ্বনি! "হুর্‌রে! হুর্‌রে!" কান বুঝিবা ফেটে যায়।

প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর ইঙ্গিতে মেয়েটি ধরল এসে বিজয়ীর সম্মুখে সেই রৌপ্য পাত্রটি বাড়িয়ে।

অল্প কথায় একটি সুন্দর সময়োপযোগী বক্তৃতার পর কমলা দেবী দিলেন পরাগের হাতে সেই কাপটি তুলে। পরাগ শিক্ষয়িত্রীকে ও বয়োজ্যেষ্ঠ আর সকলকে নমস্কার করে সবিনয়ে গ্রহণ করলে সে পুরস্কার এবং পরক্ষণেই সাদরে তুলে দিলে সেটি সহপাঠী ও প্রতিপক্ষ মিত্তিরের হাতে।

আবার পড়ল করতালি—আবার উঠল কলরব—হুর্‌রে। আবার শোনা গেল—"থ্রী চিয়ার্স ফর রায় এণ্ড মিটার!" চললো ছেলের দল এইবার প্রোসেশন করে পরাগ ও কেশরকে তাদের বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসতে। একই পাড়ার ছেলে তারা, কাছাকাছিই সব থাকে।

নীল ফ্রক পরা মেয়েটি মুখ ভার করে পরাগকে বললে "তোমার প্রাইজটা তুমি কেশরদাকে দিলে কেন! আমি আর কক্ষনো নীল ফ্রক পরে আসব না—আর তোমার 'চৈতক' হব না।"

পরাগ বললে "আমার ত গেলবারের প্রাইজটা রয়েছে রেণু। আবার একটা কি হবে? কেশরদা ত প্রায় আমার সঙ্গে সঙ্গেই পোস্টটা এসে ছুঁয়েছিল। আর একটু আগে এলেই ত সেইই বাজী জিতে ও প্রাইজটা পেত। কারুর মনে কি কষ্ট দেওয়া উচিত? তুমিই বল না ভাই।"

রেণু প্রথমটা কিছুই বলতে পারলে না। মুখ নীচু করে চুপ করে রইল. তারপর হঠাৎ কি ভেবে বললে "তবে কেন তুমি আমার মনে কষ্ট দিলে?"

পরাগ আশ্চর্য হয়ে বললে "সে কি চৈতক। তোমার মনে আমি আবার কখন কষ্ট দিলুম?"

রেণুর ঠোঁট ফুলে উঠল, বললে "এই ত এক্ষুনি দিলে—কেশরদাকে প্রাইজটা দিয়ে—"

"ওঃ।" পরাগ হেসে ফেললে, বললে—"ওটার উপর বুঝি আমার নীল ঘোড়ার লোভ হয়েছিল?"

"না—ধেৎ। তা কেন?—তোমার প্রাইজ তুমি ওকে কেন দেবে?"

পরাগ বললে "চৈতক, তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন? তোমার প্রভু রাণা প্রতাপ সিংহ মাটিতে ঘাস বিছিয়ে শুতেন, নিজের হাতে রুটি তৈরী করে খেতেন, অঞ্জলিভরে জলপান করতেন, তাঁর একমাত্র অলঙ্কার ছিল তাঁর শাণিত তলোয়ার! মা বলেন খেলায় জেতা ভাল কিন্তু পুরস্কারের লোভে নয়। জেতার আনন্দই যেন হয় আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। কারণ, বিজয় গৌরবই সকল গৌরবের চেয়ে

বড়! আচ্ছা, এই নাও আমার এই মেডেলটা আমি তোমাকে দিচ্ছি, তাহলে তো আর তোমার মনে কোনো দুঃখ থাকবে না ?"

রেণু বললে "বারে! তোমার মেডেল আমি কেন নিতে যাব ? আমি ত আর কেশরদা নই।"

পরাগ বললে "রাণা প্রতাপসিংহ যেখান থেকে যা বহুমূল্য উপহার পেতেন তার প্রিয় অশ্ব চৈতকের লাগামে ঝুলিয়ে দিতেন। আমিও আমার চৈতকের গলায় ঝুলিয়ে দিচ্ছি আমার মেডেল—"

এত বড় যুক্তির পর রেণু আর কোন আপত্তিই করতে পারলে না।

বিউগিল বেজে উঠল, ভোঁপ্‌পর ভোঁপ্‌পর ভোঁ। ছেলের দল তাদের ঘিরে নিয়ে চলল মার্চ করে গান গাইতে গাইতে—

"জনগণ মন অধিনায়ক
জয় হে—
জয় জয় ভারত ভাগ্য বিধাতা।"

(ক্রমশঃ)
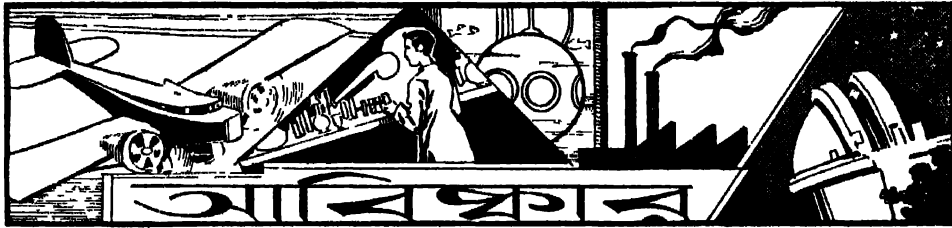
স্ফটিক রেশম :—

গ্রেটব্রিটেনে কাঁচ থেকে যে রেশম তৈরী হচ্ছে, তার চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে। ইংলণ্ডের বন্দর থেকে প্রতিবৎসর পৃথিবীর চারিদিকে এই 'স্ফটিক রেশম' রপ্তানি হচ্ছে। ১৯৩৯ সালে যে পরিমাণ কাঁচের রেশম রপ্তানি হয়েছিল ১৯৪০ সালে তার চেয়ে শতকরা আড়াইশ' গুণ বেশী রেশম পৃথিবীর নানাদেশ নিয়েছে।

উপস্থিত এই কাঁচের রেশম তাপ রক্ষণের কাজে লাগছে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় জানা গেছে যে কল-কারখানা ও রেলের বয়লার ইঞ্জিন প্রভৃতিতে কয়লা ও তেলের সাহায্যে যে অগ্নি-জাত উত্তাপ সৃষ্টি করা হয়। তার শতকরা ৭৫ ভাগ অপব্যয় হয়, অর্থাৎ এমনভাবে বেরিয়ে নষ্ট হয়ে যায় যে আমাদের কোন কাজে আসে না। সৌভাগ্যক্রমে সেই উত্তাপ ধরে রাখার শক্তি এই স্ফটিক রেশমের মধ্যে আশ্চর্যরকম আছে। বয়লার, স্টোভ, পাইপ, ইঞ্জিন প্রভৃতি উত্তাপ চালিত ও উত্তাপবাহক যন্ত্র এই কাঁচের রেশমে তৈরি আবরণে ঢেকে রাখলে উত্তাপ বহু পরিমাণে সংরক্ষিত থাকে। উত্তাপ নষ্ট ও অপব্যয় না হওয়ার ফলে কয়লা ও তেলের খরচও অনেক পরিমাণে কমে যাবে। সুতরাং কলকারখানা ওয়ালাদের লাভ বেশী হবে এবং তারা আরও সস্তাদরে জিনিস তৈরি করতে পারবে।

এই স্ফটিক রেশম প্রায় অগ্নি-সিদ্ধ বা উত্তাপ-জয়ী বলা চলে। কারণ, দেখা গেছে যে ফার্ণহীটের চেয়েও ৯০০ ডিগ্রী অধিক উত্তাপ এই কাঁচের রেশমীবস্ত্র অনায়াসে সহ্য করতে পারে! এই স্ফটিক রেশমে প্রস্তুত কম্বলের ন্যায় পুরু বা মোটা আচ্ছাদন প্রচুর পরিমাণে ভারতবর্ষ ও দক্ষিণআফ্রিকা আমদানি করেছে। পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জও নিয়েছে এই স্ফটিক রেশমে তৈরি মোটা কাপড় বা চাদরের মতো বস্ত্র। নিউজিল্যাণ্ড, পর্তুগাল প্রভৃতি অনেক দেশ নিয়েছে এজিনিষ পাটির আকারে। ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, আয়ার্লাণ্ড নিয়েছে বৈদ্যুতিক কারখানার সঞ্চয় যন্ত্রের উত্তাপ রক্ষার জন্য। ইস্পাতের রেশমের বিষয় তোমরা এর আগে পাঠশালায় পড়েছ। কিন্তু, তার চেয়ে ঢের বেশী কাজে লাগছে এই স্ফটিক রেশম। বেচারা গুটী-পোকারা এইবার একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে।

নারীর কথা

কন্যামহল

পরিচালিকা—কুমারী নীলিমা মুখোপাধ্যায়

পাঠশালায় পাঠিকাদের অনুরোধে 'কন্যামহল' নাম দিয়ে একটি নূতন বিভাগ খোলা হল। অতঃপর মেয়েদের জীবনের যা কিছু সমস্যা, তাদের অভাব, অভিযোগ, আশা আকাঙ্খার কথা এই বিভাগে প্রকাশিত হবে। অনেকে এই বিভাগের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভুল করে ইতিমধ্যেই তাঁদের রচিত গল্প কবিতা, হাস্যকৌতুক প্রভৃতি কন্যামহলে প্রকাশের জন্য পাঠিয়েছেন। কন্যামহলের উদ্দেশ্য অন্য। মেয়েদের রচনা প্রকাশ যোগ্য হ'লে সাধারণ বিভাগেই তা সমাদরে প্রকাশিত হবে, কিন্তু 'কন্যামহল' প্রকাশ করবে শুধু মেয়েদের প্রয়োজনীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয় মাত্র। যেমন কুমারী নীহার ভৌমিক, নীলিমা দাশ, শোভারাণী প্রভৃতি আলোচনা করেছেন। তবে একটা কথা সকলে মনে রাখবেন, পাঠশালায় উপস্থিত একান্ত স্থানাভাব, সুতরাং আলোচনা যত সংক্ষিপ্ত হ'তে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।

রাজশাহীর কুমারী কল্যাণী রায়, শহরের মেয়ে ও গ্রামের মেয়ের তুলনা করে গ্রামের নিন্দা করেছেন। অবশ্য একথা ঠিক যে শহরের শিক্ষিত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন সমাজের আবহাওয়া গ্রামে নেই, কিন্তু তেমনি আর একদিকে গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে উদার বিশ্ব প্রকৃতির যে একটা অন্তরঙ্গ যোগ আছে, ইটকাঠের খাঁচায় বন্দী শহরের মেয়েরা সে সুযোগ লাভে বঞ্চিত। নবীন ধানের মঞ্জরী, চূত মুকুলের সৌরভ, তুলসী বনের সুবাস উপভোগ করা তাদের ভাগ্যে ঘটে না। আশা করি 'কন্যামহল' পরস্পরের অভাব দূর করে পরস্পরের জীবনে পরিপূর্ণ আনন্দ পরিবেষণ করতে সক্ষম হবেন। - পরিচালিকা।

বাংলাদেশে মেয়েদের সিনিয়ার ও জুনিয়ার ট্রেইনিং শিক্ষা দিবার কেন্দ্র কোথায় কোথায় আছে?

উক্ত ট্রেইনিং লইতে হইলে, মেয়েদের কী কী ভাবে যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে।

বৎসরের কখন হইতে ছাত্রী গ্রহণ করা হয়। ছাত্রীদের এজন্য বৃত্তির ব্যবস্থা আছে কিনা? তাহা পাওয়ার সম্ভাবনা কিভাবে হইতে পারে।

এ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য সব জানিতে উৎসুক।

কুমারী নীহার ভৌমিক

বাংলাদেশে সিদ্ধ চাল কেন খাওয়া হয় এবং আতপ চাল কেন খাওয়া হয় না? সিদ্ধ চাল ধান সিদ্ধ করে চাল হয় পরে ফেন ফেলে দিয়ে (সারবস্তু ফেলে ছিবড়া খাওয়ার মত) ভাত খাওয়া হয়। আতপ চালে ধান সিদ্ধ করা হয় না এবং খাদ্য হিসাবেও সিদ্ধ চালের চেয়ে উপকারী এবং সুস্বাদু। বাংলার মেয়েরা যাঁদের উপর রান্নাঘরের ভার তাঁরা এদিকে দৃষ্টি দেবেন কি?

নারী শিক্ষার গতি

শ্রীশোভারাণী রায়

বর্তমান কালে মেয়েদের উপযুক্ত ভাবে গড়ে উঠতে হ'লে—কি অন্তর্জগত—কি বহির্জগত উভয়েরই নিত্যপরিবর্তিত গতির সাথে সমতালে পা ফেলে চলতে হবে। উভয়কেই অবলম্বন করে গড়ে তুলতে হবে আধুনিক নারী জীবন। এজন্য চাই নারীদের সর্বক্ষেত্রে অপ্রতিহত গতি। অতীতে, বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে—পুত্র, কন্যা সকলেরই জীবন গড়ে উঠেছে, উঠছে এবং উঠবে একমাত্র নারীকেই কেন্দ্র করে। কারণ নারীর সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় সে জননী। মাতার নিকটই শিশু সর্বপ্রকার শিক্ষা লাভ করে এবং মাতা যদি সুশিক্ষিতা ও

সচ্চরিত্রা হন তা'হলে শিশুও ভবিষ্যতে মুখোজ্জল কারী সন্তান হয়ে উঠতে পারে।

যাঁরা শিক্ষিতা হয়েছেন—আমি মনে করি তাঁদের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে—যে সব শহর ও গ্রাম স্ত্রীশিক্ষায় পিছিয়ে আছে—সে সব দেশের মেয়েদের অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করা।

আধুনিক শিক্ষার ফলে মেয়েদের আর যা কিছু উন্নতিই হোক তাদের নারীত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেনি। আজ নারীর অভাব অভিযোগ ও শিক্ষাদীক্ষা সম্বন্ধে সংস্কার করতে হলে সর্বাগ্রে তাদের সঙ্ঘবদ্ধ হ'তে হবে। এযুগে সংহতি ভিন্ন অগ্রসরের উপায় নেই। মানুষ হয়ে বাঁচতে হলে, নিজের কৃতিত্ব ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে মেয়েদের পূর্ণতার আয়োজন নিজেদেরই করতে হবে। শিক্ষার গতি নূতন পথে ফেরাতে হবে। ভারতের নারী আজ জগতের নূতন সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠা চায়, তারা মনে করে প্রাচীন জীর্ণ সমাজের আদর্শ ও মর্যাদার অনুসরণ করলে তাদের স্বকীয় প্রতিভার অবমাননা করা হবে। কালের প্রয়োজনকে স্বীকার করে বর্তমান নারীর উপযোগী নূতন সমাজনীতি সৃষ্টি করতে হবে। নারীশিক্ষার আধুনিক গতির মোড় ফিরিয়ে নিয়ে তাকে মনুষ্যত্ব ও ব্যক্তিত্ব অর্জনের উপযোগী করে তুলতে হবে।

রচনা প্রতিযোগিতা

যতগুলি প্রবন্ধ এপর্যন্ত পাওয়া গেছে তার মধ্যে পণ্ডিতিয়া রোডের শ্রীমান সিদ্ধেশ্বর মিত্রের রচনাটি সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়ায় তিনিই পুরস্কার পাবেন, এবং 'অহিংসনীতি' সম্বন্ধে তাঁর সুলিখিত প্রবন্ধটি আগামী মাসের পাঠশালায় প্রকাশিত হবে।

আষাঢ়ের রচনা

"শিশু সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ" সম্বন্ধে পাঠশালার গ্রাহক গ্রাহিকাদের একটি প্রবন্ধ লিখে পাঠাতে অনুরোধ করছি। রচনাটি সাধারণ এক্সারসাইজ বুকের দু'পাতা থেকে আট পাতার মধ্যে হওয়া চাই। কাগজের এক পিঠে লিখে পাঠাতে হবে, ১৫ই জ্যৈষ্ঠের মধ্যে।

পত্রী-মৈত্রী

নির্দেশ :—নিম্নের পাঠক পাঠিকারা পত্রযোগে পরস্পরের সঙ্গে আলাপ পরিচয় ও বন্ধুত্ব স্থাপন করতে চান। এর মধ্যে যিনি যাকে খুশী চিঠি লিখতে পারেন। অমুক লোকটি কেবল অমুক লোককেই চিঠি দিতে পারে এমন কোনো বাঁধা ধরা গণ্ডি নেই।

কুমারী নীহার ব্যানার্জি—C/o মিঃ এস, কে, ব্যানার্জী, গোলবাজার, জব্বলপুর, শ্রীসাধনানন্দ মিশ্র, মুগবেড়িয়া, মেদিনীপুর, পার্বতীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়—C/o শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আটাণ্ড, পোঃ রামপুর-হাট, বীরভূম। হরিকমল পুরকায়স্থ—C/o রায় বাহাদুর জে, এন, পুরকায়স্থ, লাবান, শিলং, নবনীকুমার চৌধুরী, লঙ্গাই চা বাগান, পোঃ চান্দ্‌খিরা, শ্রীহট্ট; কুমারী কল্যাণী রায়—C/o শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ রায়, পোঃ তালন্দ, রাজশাহী, মধু ঘোষাল, মুগকল্যাণ, পোঃ মুগকল্যাণ, হাওড়া। কুমারী ইন্দ্রানী রায়, কদমকুঁয়া, পাটনা। কুমারী হেনা রাহা, করকান্তা পোঃ ত্রিপুরা।

বিনিময় সঙ্ঘ

পরিচালক—শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায়

১। আমি সুডান, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, আজমীর, ইরাক প্রভৃতির বদলে অষ্ট্রেলিয়া, নেপাল, ভুটান, জাপান, মহীশূর প্রভৃতি দেশের ডাকটিকিট চাই। মুণীন্দ্রকুমার গুহ, ফরিদপুর।

২। জার্মানী, ভেনিজুয়েলা ও কোচীনের বদলে তিব্বতের টিকিট চাই।—প্রণব রায়চৌধুরী, গ্রাঃ নং ২৯৬৫।

৩। ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র এবং মালয়ের বদলে জার্মানী, ইটালী ও অষ্ট্রেলিয়ার টিকিট চাই।—বিশ্বনাথ সেনগুপ্ত, চট্টগ্রাম।

৪। যুক্তরাষ্ট্র ৩ সেণ্ট মূল্যের টিকিটের বদলে ঐ দেশেরই অন্য কোন টিকিট চাই।—উদয়ভানু সিংহ, কলিকাতা।

৫। ইজিপ্টের পিরামীড মার্কা টিকিটের বদলে জাপানের টিকিট চাই।—গৌরাঙ্গ রুদ্র, প্রবর্তক বিদ্যাপীঠ, চট্টগ্রাম।

৬। আমি যুক্তরাজ্য ও মিশরের বিমান ডাকের বিনিময়ে গ্রীস ও জাপানের টিকিট চাই।—সুধীর চন্দ্র দেব, গ্রাঃ নং ২৯০৬।

৭। সুনীলকুমার বন্দোপাধ্যায়, রামপুরহাট, চৈত্রের চিঠিগুলি পরে খুঁজে পাওয়া গেছে। তাতে জানলাম চৈত্রে তুমি কোন টিকিট পাঠাতে পার নাই অথচ চিঠিপত্র হারিয়েছে শুনে বৈশাখে লিখছ ভারতবর্ষের ৷৵০ আনা মূল্যের একটি টিকিট তুমি পাঠাইয়াছিলে, এটা সংবৃদ্ধি নয়, যাহা হউক নিলীমা মুখার্জী তাঁহার প্রতিশ্রুতি মত তোমায় ৫৲ টাকার ও পোর্টুগীজ ইণ্ডিয়ার টিকিট দু'খানি পাঠালেন, প্রাপ্তি সংবাদ দিও। এর পরিবর্তে তুমি যে, ৵১০ পয়সার টিকিট পাঠিয়েছিলে তা তিনি নিয়েছেন।

৮। আভাষ দাসগুপ্ত, বেন্দা—আমার মতই দেখছি তোমার অবস্থা। তবে তোমার একবার, আমার কিন্তু বার বার তিনবার খোয়া গেছে; তাতেই কি ছেড়েছি। যাই হোক এবার যত্ন করে রেখ।

কেনিয়া, ইউগেণ্ডা, সুইজারল্যাণ্ড ও ইংলণ্ডের টিকিটের বদলে কি তোমার ফরাসী, জার্মাণ, চীন বা সিংহলের টিকিট চাই?

৯। সিদ্ধেশ্বর মিত্র,—নায়েসার বদলে তুমি সিংহলের ২, ৩, ৬, ৫০ সেণ্ট ও ১ টাকা পঞ্চমজর্জের মুখচ্ছবি ও নানাবিধ দৃশ্য দেওয়া এবং ২, ৩, ও ৬ সেণ্ট ষষ্ঠ জর্জের মুখচ্ছবি দেওয়া, অধিকন্তু সিংহল করনেশনের ৬ সেণ্ট মূল্যের একখানি টিকিটও পেতে পার।

১০। সলিলা মুখার্জী, কলিকাতা। নূতন টিকিট জমাতে পারলে খুবই ভাল। অভাবে যথাসম্ভব বেদাগী পুরাতন টিকিটই সংগ্রহ করবে।

১১। অসীমরাহা, বালিগঞ্জ—তোমার ইটালীর টিকিট দু'খানির বদলে জার্মানী ও জাপানের দু'খানি করে মোট চারিখানি টিকিট পাঠালাম, প্রাপ্তি সংবাদ দিও। এবার যে টিকিটখানি পাঠিয়েছ, এটি হোরেসের বিংশতীতমজন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে মুদ্রিত হয়েছিল। এতে আছে capitalএর ছবি।

১২। সলিলা মুখার্জী—আপনার Pictorial world Atlasএর দোকড় ছবিগুলি অসীমাদেবীকে পাঠিয়ে দিন। তিনি তাথেকে তাঁর যা নেই সেগুলি নিয়ে বাকী আপনার কাছে ফেরৎ পাঠাবেন, ঐ সঙ্গে তাঁর দোকড়গুলিও আপনার হাতে এসে পড়বে।

১৩। রেবাভদ্র, ঢাকা। সঞ্চয়ে সুমতি হয়েছে জেনে সুখী হলুম।

পরিচালকের মন্তব্য—যে টিকিট যখন তোমরা বিনিময় করবার জন্য আমার নিকট পাঠাবে তা চিঠির তলায় গঁদের সাহায্যে এঁটে দেবে, আলপিন বা জেমপিনের সাহায্যে আটকাতে যেও না, কারণ সামান্য কাটা ছেঁড়া এমন কি একটি ফুটা থাকলেও ভাল সংগ্রাহকদের নিকট ঐ টিকিটের আর কোন মূল্য থাকে না, তাই বিনিময়ও চলে না।

দ্বিতীয় কথা এই গ্রাহক নম্বরটীও প্রত্যেকে নামের সঙ্গে লিখো. কারণ, পাঠশালার গ্রাহক ছাড়া অপর কেউ এই বিনিময় সংঙ্ঘের সুযোগ পাবে না।

জ্যৈষ্ঠ—১৩৪৮

নিয়মাবলী—(১) ধাঁধাঁ-সম্পাদকের মতে শব্দসন্ধানের যেটি সবচেয়ে নির্দোষ ও নির্ভুল সমাধান,—তার সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে উত্তর মেলা চাই। নির্ভুল সমাধানটি পরের মাসের পাঠশালায় প্রকাশিত হবে। (২) সাদা ঘরগুলির প্রত্যেকটিতে একটি ক'রে সংযুক্ত বা অসংযুক্ত অক্ষর বসবে। (৩) প্রতি সংখ্যার প্রতিযোগিতা-কুপনখানি কেটে ভর্তি ক'রে পাঠাবে সেই মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে। দেরি হ'লেই বাতিল। খামের উপরে ঠিকানা লিখবে—'শব্দ সন্ধান', পাঠশালা কার্যালয়, ৩০ কর্নওআলিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। (৪) হরফগুলি সব পরিষ্কার হওয়া চাই—কাটাকুটি চলবে না। বানান ভুল হলে ভুল ধরা হবে। (৫) যে কোন পাঠক পাঠিকা যতগুলি ইচ্ছা কুপন পাঠাতে পারবে। (৬) 'শব্দ-সন্ধান'-সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ব'লে মেনে নিতে হবে।

সঙ্কেতসূত্র

—পাশাপাশি—

১। অষ্ট বসুর জননী।
৬। মহৎ লোকের এতে কোনো ভাবান্তর ঘটে না।
৮। এ হল জিততে না পারা।
৯। ইংরাজীতে একে বলা চলে—visiting card
১১। এটি বিশেষ ভাবে কবিদের আকাঙ্খিত স্থান।
১৩। আমেরিকাকে পৃথক করেছে ত এ-ইই।
১৪। এটি যে শিশু তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু চেহারা ঠিক হাতীর বাচ্ছা।
১৫। কবিগুরু এঁকেই সম্বোধন করে বলেছিলেন:—"—রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।"
১৬। স্বাদ পেলে এতে তৃপ্ত হয় না কে?
১৮। ভৃত্যের ভগবান।
১৯। এতেও জাগে সাপের ভয়, ন্যায় শাস্ত্রে এটা কয়।
২০। বিবাদের বিবাদে হাবাদের স্ফূর্তি, দেখে যেন মনে হয় মাথাহীন মূর্তি।
২৩। এখানে এর সন্ধানে এ ছাড়া সব পাবে।
২৪। আগেকার দিনে এখানে শুধু সেপাই ছিল, ইংরাজ আমলে এরাও এসেছে।

২৫। গৌতম বুদ্ধ।
২৭। উদ্বিগ্ন।
২৮। ভাল করে সাজাতে পারলে সেটা হয়ে উঠবে একটা সূক্ষ্ম শিল্প।

—উপর থেকে নীচে—

১। ঘুমের প্রতিযোগিতায় কুম্ভকর্ণকে হাবাবার একমাত্র উপায়।
২। কোনো নির্দিষ্ট সর্তে কিছু করবার মৌখিক চুক্তি বা অঙ্গীকার।
৩। শব্দ সন্ধানে এভুল মারাত্মক।
৪। —মণ্ডলে ছয়মাস রাত, ছয়মাস দিন।
৫। বর্ষার কাব্যে এ ফুলের ছড়াছড়ি।
৭। যে জল দেয়।
১০। লজ্জার আধিক্য।
১২। যা লোক পরম্পরায় রটে।
১৪। পর্বতের গুহা।
১৫। উচ্ছৃঙ্খল।
১৭। বাহবা।
২১। স্বর্গলোকের এই গাছটি মর্ত্যলোকেও দেখতে পাওয়া যায়।
২২। পরিবর্তন করা।
২৩। পাঠশালাকে এরা ভালবাসে।
২৪। ভ্রষ্ট সাধু।
২৬। 'শ-র'র সঙ্কেতে সবই "—" থাকে তবু যদি তোমরা না পার তবে সে দোষ 'শ-র'র নয়।

বৈশাখের শব্দ-সন্ধানের ফলাফল

বৈশাখের শব্দ-সন্ধান প্রতিযোগিতায় 'শ-র'র কাছে পাঠশালার সমস্ত পাঠক-পাঠিকা ও গ্রাহক-গ্রাহিকা শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়েছে দেখে 'শ-র' বিশেষ দুঃখিত। পাঠশালার শব্দ-সন্ধানের নিয়মানুসারে তিন ভুল পর্যন্ত পুরস্কার দেওয়া হয়। কিন্তু এবার যাঁর সবচেয়ে কম ভুল হয়েছে তাঁরও চারটি ভুল। সুতরাং নববর্ষে 'শ-র' কাউকে পুরস্কার দিবার সুযোগ পেলেন না বলে মর্মাহত হয়েছেন। কুমারী সাধনা বসু সামান্য দু'একটা ভুলের জন্য পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। অবশ্য 'শব্দ' তিনি ঠিকই সংগ্রহ করেছিলেন কেবল 'সন্ধানের' একটু অভাব হয়েছে। যেমন পাশাপাশি ৭নং ঘরে তিনি আর সকলের মতই 'জন্তু' লিখে জব্দ হয়েছেন। মাত্র দু' চারজন বুদ্ধিমান লিখতে পেরেছেন 'জন্ত'। তারপর পাশাপাশি ৩২নং ঘরে ইনি 'কক্ষ' ছেড়ে 'বৃক্ষ' আশ্রয় করে ঠকেছেন। এখানে তাঁর মত আরও অনেকে ভুল করেছেন। উপর নীচের ১৫নং ঘরে জীবনের একান্ত নির্ভর যে 'বিশ্বাস' তা হারিয়ে 'নিঃশ্বাস' গ্রহণ করে 'আশ্বাস' দিয়েছেন যাঁরা কুমারী সাধনা বসু দুর্ভাগ্যক্রমে সেই দলে ভিড়ে 'শ-র'কে নিরাশ করেছেন। অবশ্য উপর নীচে ২০নং ঘরে কুরবক' লেখা তাঁর ভুল হয়নি কিন্তু যেহেতু 'শ-র'র নির্ভুল উত্তরে 'কুরবক' শব্দটা ছিল সেইজন্য সাধনার ভুলের সংখ্যা চারে গিয়ে পৌঁছেচে। উপর নীচে ২নং ঘরে সাধনা ও মাত্র আর দু'চার জন 'বিহ্বল' লিখে 'শ-র'কে আনন্দে বিহ্বল করেছেন, কিন্তু 'বিফল' লিখে যাঁরা বিফল হয়েছেন তাঁদের চেয়েও যাঁরা 'বিকল' লিখেছেন তাঁরাই শ-রকে বিকল করেছেন বেশী।

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ গুপ্ত 'শ-র'র উদ্দেশে যে সুন্দর কবিতাটি লিখে পাঠিয়েছেন তা 'পাঠশালায়' স্থানাভাবে প্রকাশ করতে পারা গেল না। চৈত্রের শব্দ-সন্ধানের নির্ভুল সমাধানের উপর অনেকেই অনেক কিছু টিকা টিপ্পনি করেছেন। রামপুর হাটের পার্বতীশঙ্কর বলেছেন 'শ-র' একজন প্রবঞ্চক। কারণ, তিনি নাকি একাধিক বার বলেছেন শব্দ-সন্ধানের সঙ্কেত পড়ে প্রথমেই যে শব্দটা মনে আসে সেটা না বসিয়ে ভেবে দেখা উচিত তদনুরূপ আর কোনও শব্দ আছে কি না। 'শ-র'র এই ইঙ্গিত অনুযায়ীই তিনি চৈত্রের উপর নীচে ও পাশাপাশি ২১নং ঘরে 'জীমূত' ও 'জীবন' বসিয়েছিলেন কিন্তু 'শ-র' এখানে অতি সহজ সাধারণ শব্দ 'পর্বত' ও 'পবন' বসিয়েছেন। সুতরাং এটা প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কি? শ্রীমান পার্বতীশঙ্কর ঠিকই বলেছেন। 'শ-র'র কাজই যে হল তোমাদের প্রবঞ্চনা করা। তবে কথা এই—এটা 'অর্থের' প্রবঞ্চনা নয়, 'শব্দের' প্রবঞ্চনা। বৈশাখের শব্দ-সন্ধানে এটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে দেখতে পাবে। পার্বতীর উচিত ছিল দুখানি 'কুপন' পাঠানো। কারণ alternative বা অনুরূপ শব্দই এ খেলার প্রধান অবলম্বন। কুমারী শোভারাণী 'তৃষা' ও 'তৃষ্ণা'র তুলনা করে বলেছেন জলের পিপাসা বলতে একমাত্র 'তৃষ্ণাই' বোঝায়, কিন্তু 'তৃষা' ধনের হ'তে পারে জ্ঞানের হ'তে পারে ইত্যাদি। কিন্তু শোভারাণীকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে এখানে যদি কেউ 'ধন তৃষ্ণা' বা 'জ্ঞান তৃষ্ণা' লেখেন তাহলে কি সেটা ভুল হবে? ফরিদপুরের শ্রীমান বীরেন্দ্রনারায়ণ সরকার যিনি এই 'তৃষা' ও 'তৃষ্ণার' জন্যই নির্ভুল উত্তর দেবার

গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন তিনি কিন্তু ভুল স্বীকার করায় 'শ-র' খুশী হয়েছেন। কুমারী সাধনা বসু অতি সহজ সুন্দর সাবলীল ভাষায় সুরচিত একখানি সুদীর্ঘ পত্র লিখে মাঘের শব্দ-সন্ধানে 'বহ্‌' না করে 'বদ্ধ' করায় 'শ-র'র প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন এবং চৈত্রের পাশাপাশি ১৪নং ঘরে 'তহে' শব্দটির সন্ধান সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে প্রশ্ন করেছেন "এটি, কোথায় পেলেন ?" কুমারী সাধনা বসুকে এই ১১নং ঘরের সঙ্কেত সুত্রটি আরও একবার ভাল করে পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। এটি কোনো 'শব্দ' বা 'ধাতু' এমন কথার কোথাও উল্লেখ নেই। তারপর এই বিদুষী বসু কন্যা 'তৃষা' ও 'তৃষ্ণা' নিয়ে 'শ-র'কে এমন যুক্তিপূর্ণ আক্রমণ করেছেন যে 'শ-র'র কণ্ঠও তৃষায় কাতর ও শুষ্ক হয়ে উঠেছে। কিন্তু এখানেই তিনি নিরস্ত হননি। 'সু'নির্মল' ও 'সুশীতল' নিয়ে এমন প্রবল আন্দোলন করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত নির্ভুল উত্তর 'সুশীতল' লেখায় 'শ-র'কে শীতকালে তৃষার্ত হ'লে এঁদো পচা ডোবার এক গ্লাস 'সুশীতল' জল খাইয়ে 'সু'নির্মল' ও সুশীতলের প্রভেদ বোঝাবেন বলে ভয় দেখিয়েছেন। শুনে পর্যন্ত দুশ্চিন্তায় 'শ-র'র অঙ্গ 'শীতল' হয়ে পড়েছে। 'শ-র' কুমারী সাধনা বসুর অকাট্য যুক্তির কাছে পরাজয় স্বীকার করে শুধু এই বলে বিদায় নিচ্ছে যে, দোহাই বসুবালা, তোমার কাছে তৃষ্ণার সময় কেউ এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল চাইলে তাকে সুশীতল জলই দিও, কিন্তু, তা যেন 'সুনির্মল'ও হয়।

"শ-র"

চার ভুল

কুমারী সাধনা বসু, বারুইপুর।

পাঁচ ভুল

গীতা ও বাদল পালিত, আসানসোল। "নাক", মানভূম। সলিলকুমার ধর, জামালপুর। সুরথনাথ সরকার, নৈহাটী। সুশীলচন্দ্র রায়, মৈনাম।

ছয় ভুল

কল্যাণকুমার সরকার, সালিখা। গীতাধর, জামালপুর। দীলিপঘোষ ও সন্ধ্যারাণী, ফরিদপুর। নীহার বসু, কণেশ্বর। শর্ম্মিষ্ঠা সরকার, সালিখা। সরোজবিহারী ভাদুড়ী, কলিকাতা। সুনীলকুমার পালিত, কলিকাতা। সেন্টু-পেন্টু-মণ্টু, রামপুরহাট।

সাত ভুল

অজিতকুমার ঘোষ কলিকাতা। অনুপম রায়, বালিগঞ্জ অনিলবরণ মহান্তি, দাঁতন। অমলকুমার ও নীলিমা দত্ত, কলিকাতা। ইন্দু বসু, কণেশ্বর। নির্ম্মলেন্দু গুহ, পাহাড়-তলি। পঙ্কজ গাঙ্গুলী, কণেশ্বর। পপী বসু, পটুয়াখালি। অরুণকুমার বাগচী, শ্রীরামপুর। পাঁচুগোপাল বসু, বারাসত। বিজয়া দেবী, ভবানীপুর। বীরু সরকার ও ভায়রা, ফরিদপুর। বীরেন সরকার ও বিমল বসু, ফরিদপুর। বিশ্বনাথ মজুমদার ও বিমলা দেবী, ফরিদপুর। ভারতী মজুমদার ও বৃষ্ণা মজুমদার, বালিগঞ্জ। মণীন্দ্রনাথ মিত্র, এলাহাবাদ। রাধারমণ ধর, হুগলী। হরিকমল পুরকায়স্থ, শিলং। হেনা বাহা, বরকান্তা।

নির্ভুল সমাধান—বৈশাখ, ১৩৪৭

আট ভুল

অণিমা চ্যাটার্জ্জি, উত্তরপাড়া। অরুণলাল মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা। আবুল হোসেন মিয়া, কুঠিবাড়ী। উমা ভাদুড়ী, রায়পুর। গীতা ধর, হুগলী। দেবব্রত সিংহ, কলিকাতা। নবনীকুমার চৌধুরী, লঙ্গাই। পঙ্কজমোহন সিদ্ধার্থকুমার, কোতুলপুর। প্রতিমা চ্যাটার্জ্জি, জব্বলপুর। ফণীন্দ্রকুমার দাস, সিলেট। বিমলকুমার ও বিনয়কুমার বাছাওত, আজিমগঞ্জ। বীরেন্দ্রনারায়ণ সরকার, ফরিদপুর। মধুসূদন মণ্ডল, বালীদেওয়ানগঞ্জ। মণীন্দ্রমোহন মজুমদার, পুরুলিয়া। মনোজ দত্ত, চট্টগ্রাম। রমা, রেখা, রেবা, মীরা, ডিব্রুগড়, রিষড়া বয়েজ লাইব্রেরী, রিষড়া: হীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও মোসলেম আলি, স্বরূপকাঠি, লিলি স্যামুয়েল, ব্যারাকপুর; হৃষিকেশ ভৌমিক, আমানত-গঞ্জ, সরসীবালা দেবী, নাকোদর, সলিলা মুখার্জ্জি, কলিকাতা; সুবোধ রাহা ও সমবোধ রাহা, শ্রীপুর।

নয় ভুল

অবনীভূষণ বেরা, ঘোলদিগরুই; অবনী সরকার, বজবজ, অশ্বিনীকুমার মণ্ডল, আহমদপুর, উদয়ভানু সিংহ, কলিকাতা, উমারাণী মুখার্জি, বালিগঞ্জ, কণিকা মুখোপাধ্যায়, গোরক্ষপুর, কালিদাস, গাঙ্গুলী, কণেশ্বর, তাপসরঞ্জন সরকার, থানাঘাট, দেবপ্রসাদ ঘোষ, কলিকাতা, ধীরেন্দ্রনাথ মহান্তি, দাঁতন, পুষ্প ঘোষ, বালিগঞ্জ, প্রতিভা মিত্র, অরিয়াদাহ, বিশ্বনাথ সেনগুপ্ত, চট্টগ্রাম, বেন্দা ছাত্রসঙ্ঘ, বেন্দা, মধুঘোষাল, মৃগকল্যাণ; মাণিককুমার ঘোষাল, বরাহনগর, নীহার ব্যানার্জি, জব্বলপুর, শোভা রায়, রাণাঘাট, রমলা দেবী, ঢাকা, "লতা" ব্যারাকপুর; শঙ্কর, মায়া, সুমনা, মতি, চন্দন-বাইসা; শিশিরকুমার সেনগুপ্ত, কলিকাতা, সত্য মিত্র, কলিকাতা; শ্যামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বেগমপুর, সুলেখা বসু, বালিগঞ্জ।

দশ ভুল

অনিমা চট্টোপাধ্যায়, সিঁথি, অনিমা চৌধুরী, কুস্তোর কলিয়ারী, অমরকুমার ঘোষাল, বরাহনগর, অমিয়কুমার ঘোষাল, আরিয়াদহ, অসীমকুমার মুখার্জী, ভাগলপুর, আরতি গুহ, নবগ্রাম, উমারাণী ঘোষ, কদমতলা, কৃষ্ণপদ চট্টোপাধ্যায়, আরিয়াদহ, দেবব্রত মজুমদার, কলিকাতা, নীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার, বালিগঞ্জ; পীযূষকান্তি সেন, সিমলা হিলস্; বিজলীপ্রভা দেবী, জয়নগর-মজিলপুর; বৈদ্যনাথ শেঠ, বাঁশবেড়িয়া, মণিমালা চক্রবর্তী, সাউথ গড়িয়া, মিনতি গাঙ্গুলী, দেওবন্দ, হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়, ফরিদাবাদ; শৈলেন্দ্রকুমার রায়, কলিকাতা; সবিতাকুমারী প্রণবকুমার ও আশুতোষ, টাটানগর;

এগার ভুল

অসীম রাহা, বালিগঞ্জ, ঊষারাণী চক্রবর্তী, চাঁইবাসা, দীলিপকুমার সেন ভবানীপুর, চিত্রারাণী, ভেড়ামারা, রঞ্জিৎকুমার দাশগুপ্ত, কলিকাতা,

বারো ভুল

অমলকুমার পাল, সৈদাবাদ, মাখন চক্রবর্তী, সীলেট, রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, জামসেদপুর, শিশিরকুমার সাহা, আমলা-সদরপুর।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—যাঁরা একখানি ছাপা কূপনের সঙ্গে একাধিক হাতে আঁকা কূপন পাঠাবেন তাঁরা যদি একই নামে সেগুলি পাঠান তবেই গ্রাহ্য হবে। কিন্তু বিভিন্ন নামে পাঠালে প্রত্যেকে নূতন নামের সঙ্গে এক একখানি ছাপা কূপন চাই। নইলে তা গ্রাহ্য হবে না।

"শ-র"
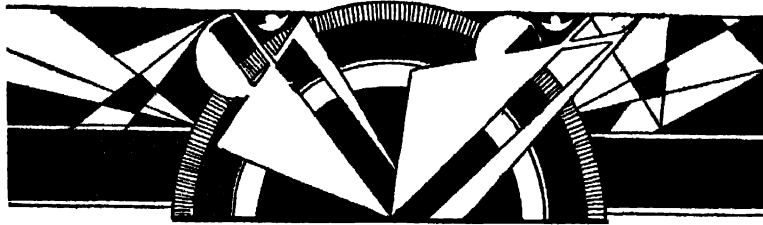
জ্যৈষ্ঠ—১৩৪৮

দুটি পরস্পর ঠিক সমান দীর্ঘ সরল রেখাকে এমনভাবে এঁকে দেখাও যাতে আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে একটি রেখা অপরটির অপেক্ষা দীর্ঘতর।

—অশ্বিনীকুমার মণ্ডল, আহমদপুর।

বৈশাখের ধাঁধাঁর উত্তর

বৈশাখের ধাঁধাঁর সঠিক উত্তর—STRENGTH

উত্তর দিতে পেরেছেন—পপী বসু, পটুয়াখালি। হেনা রাহা, বরকান্তা। শ্যামাপ্রসন্ন চক্রবর্তী, বালিগঞ্জ। অমলেন্দু রুদ্র, চট্টগ্রাম। কুমারী ইন্দু বসু, শিশুভারতী, কণেশ্বর। হরিকমল পুরকায়স্থ, শিলং। মিনতি গঙ্গোপাধ্যায়, দেওবন্দ। সৌরভ শনাতনি, বেনারস।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—পৃথক পৃথক কাগজে প্রত্যেক বিভাগের উত্তর না পাঠালে প্রকাশিত হবেনা। নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক নং দেওয়া চাই।

নববর্ষের প্রথম দিনে শান্তিনিকেতনের আশ্রম বাসীরা কবিগুরুর অশীতিতম জন্মোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের শরীর ও স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে। কবির ধারণা তাঁর জীবনে ১লা বৈশাখ আর হয়ত ফিরে আসবে না। তাই দেশ বাসীদের কাছে তিনি এবার তাঁর শেষ বিদায়বাণী নিবেদন করেছেন। যদিও তাঁর স্বদেশ বাসী এবং পৃথিবীর অন্যান্য প্রদেশের অসংখ্য অধিবাসীরাও এই মহামানবের স্বাস্থ্য ও শতায়ু কায়মনে কামনা করেন তবু কবির স্বাস্থ্য যে উদ্বেগজনক এ আশঙ্কা তাঁদেরও ব্যাকুল করেছে। তাই এবার নববর্ষে কবির জন্মোৎসব অনুষ্ঠানে তাঁর ভক্ত অনুরাগী অন্তরঙ্গগণ দলে দলে এসে যোগ দিয়েছিলেন এবং আশ্রমের বহু প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রীরাও দুর দুরান্তর থেকে এসে এই মহামানবেরতীর্থে সমবেত হয়েছিলেন কবিকে তাঁদের হৃদয়ের অকৃত্রিম প্রীতি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে দিতে।

*　　*　　*

কবিগুরু এই উপলক্ষে যে অপূর্ব অভিভাষণ দিয়েছেন তা শুধু ভারতবাসীদেরই নয় বিশ্বজনের সযত্ন প্রণিধানের দাবী রাখে। ভারতের অবস্থার এমন স্পষ্ট নির্ভিক নিরপেক্ষ সমালোচনা ও সূক্ষ্ম ন্যায় বিচারের পরিচয় এপর্য্যন্ত আর দেখা যায়নি। দেশের শিক্ষা দীক্ষা, শিল্প বাণিজ্য, সমাজ ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় অবস্থা, রোগ শোক দৈন্য দুঃখ দারিদ্র এবং বিশেষ করে এই সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্যের যে অভিসন্ধিমূলক কারণ তিনি নির্দ্দেশ করেছেন তা কোনও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষেই অস্বীকার করবার উপায় নেই। পাশ্চাত্য সভ্যতার সুদীর্ঘ শাসনে ভারত-ইতিহাসের যে সকরুণ কাহিনী তিনি বর্ণনা করেছেন, মনুষ্যত্বের যে শোচনীয় অবনতির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন তা যেমনি নির্মম তেমনিই মর্মান্তিক।

*　　*　　*

কবিকে আমরা সত্যদ্রষ্টা ঋষি, বলি "ঋষির নয়ন মিথ্যা হেরেনা, ঋষির বচন মিথ্যা বলে না।" কবি আমাদের বলেছেন মানবপীড়নের মহামারী পাশ্চাত্য মজ্জার ভিতর থেকে জাগ্রত হয়ে উঠে আজ মানবাত্মার অপমানে দিগন্ত পর্যন্ত কলুষিত করে দিয়েছে বটে, কিন্তু এই নিঃস্বদেশের দরিদ্রের কুটীরেই সেই আদর্শ মানুষ জন্মাবে যে আনবে ভবিষ্যৎ জগতে শান্তি, নিখিল মানবের মুক্তি।

*　　*　　*

ঢাকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শান্ত হয়ে আসতে না আসতে শোনা গেল আমেদাবাদে দাঙ্গা বেধেছে, বোম্বাইয়ে দাঙ্গা বেধেছে, এদিকে পাঞ্জাবে ও বেহারেও গোলমাল সুরু হয়েছে। ভারতবর্ষের দিকে দিকে এই যে অবাঞ্ছিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন জ্বলে উঠছে, এ অগ্নিশিখা ভারতের ভাবি দুর্ভাগ্যের সূচনা করছে। স্বদেশ ও স্বজাতির যাঁরা প্রকৃত কল্যাণকামী, জাতিধর্ম নির্বিশেষে তাঁদের আজ সকল কাজ ফেলে এই সাম্প্রদায়িক বিরোধ বন্ধ করবার জন্য যত্নবান হ'তে হবে। উভয় সম্প্রদায়ের প্রত্যেকের যাতে পরস্পরের সঙ্গে শ্রদ্ধার সম্বন্ধ, প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হয় সে বিষয়ে অবহিত হতে হবে। নচেৎ, উভয়েরই অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠবে। যাদের ভবিষ্যৎ একই স্বার্থ সূত্রে গাঁথা তারা যদি পরস্পরের সঙ্গে এইভাবে শত্রুতাচরণ করে তাহলে অদূর ভবিষ্যতে উভয় পক্ষেরই বিনাশ অবশ্যম্ভাবী এই সহজ জ্ঞানও যদি এদের বিরোধ ভুলিয়া একতার আবদ্ধ করতে না পারে তাহলে ভারতের একান্ত দুর্ভাগ্য বলতে হবে।
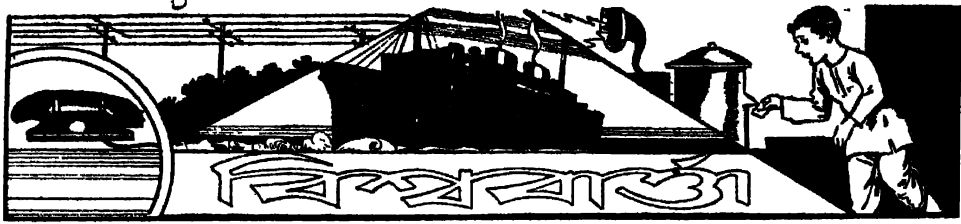
আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব কোণে মেঘ ঘনিয়ে উঠেছে। ইটালিকে বিতাড়িত করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বাহিনীর জয়োল্লাস বাতাসে মিলিয়ে যেতে না যেতে দুঃসংবাদ এসেছে—জার্মানীর সাহায্য ও সহযোগিতায় শত্রুপক্ষ আবার অগ্রসর হয়ে লিবিয়া পর্য্যন্ত পৌছেচে, মিশরের দ্বারে তার করাঘাত শোনা যাচ্ছে। সাম্রাজ্যের সেনাদল পুনরায় প্রস্তুত হয়ে শত্রুর অগ্রসরকে প্রাণপণে বাধা দিচ্ছে। সুখের বিষয় যে গ্রীসের যুদ্ধ শেষ হয়েছে এবং সেখান থেকে ৪৫০০০ সৈন্য নিরাপদে ফিরে এসে আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে অবতীর্ণ হয়েছে। রাজকীয় বিমানবাহিনী বল্কানের দায়মুক্ত হয়ে এসে এইবার পূর্ণ বিক্রমে মিশর তথা ভারতসাম্রাজ্যের প্রবেশ পথ রক্ষায় ব্রতী হয়েছে। সুতরাং আপাততঃ দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। তবে অবস্থা যে খুব গুরুতর একথা অস্বীকার করা চলে না।

* * *

আমাদের দেশে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, "মাতঙ্গ পড়িলে জালে পতঙ্গেতে কিনা বলে। ইরাকের স্পর্ধা ও দুঃসাহস দেখে আমাদের সেই কথাই মনে পড়ছে। জার্মাণ ও ইটালিয়ান সাহায্যের যদি তারা আশা করে থাকে তবে সে আশা শীঘ্রই দুরাশায় পরিণত হবে, কারণ ইরাকের সাহায্যে ছুটে আসবার কোন সহজ পথ নেই তাদের। ইংরাজের মিত্র তুর্কি সে পথ আগলে বসে আছে। অথচ কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই লক্ষাধিক সৈন্য ও সমরসম্ভার করাচী থেকে বসরায় অর্থাৎ ভারত থেকে ইরাকে গিয়ে পৌছিতে পারবে। সুতরাং ইরাকের ভবিষ্যৎ যে অন্ধকারাচ্ছন্ন সে বিষয়ে কোন ভুল নেই। তুর্কি যদি বিশ্বাসঘাতকতা না করে তবে ইরাকের ধ্বংস অনিবার্য্য। ইরাকের সৈন্যবল মাত্র ২৮০০০, বিমান-বাহিনী মাত্র ১২০ খানি। তার অধিকাংশই ইতিমধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। কামান গোলাগুলি প্রভৃতি সমর-সম্ভারের একান্ত অভাব, অতএব ইরাকের এই দুর্বুদ্ধির জন্য তাদের শীঘ্রই অনুতাপ করতে হবে।

* * *

আবিসেনিয়ার রাজধানী 'আদ্দিস-আবাবা' এতদিনে ইতালীর কবল থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার সৈনিকেরা উদ্ধার করেছে। সম্রাট হাইলে সেলাসী শোনা যাচ্ছে পরিপূর্ণ গৌরবে আবার রাজধানীতে প্রবেশ করেছেন। সমগ্র আবিসিনিয়া দখলের আয়োজন চলছে। ইতালীর রাষ্ট্রীয় ও সামরিক প্রতিনিধি ডিউক অফ্ আয়োস্টা সদলবলে—রাজধানী পরিত্যাগ করে চলে গেছেল বটে, কিন্তু, এখনও ইতালীয়নরা হাবসীদেশ ছেড়ে যায় নি। আবিসিনিয়ার স্থানে স্থানে এখনও ইতালীয় বাহিনীর সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকা বাহিনীর খণ্ডযুদ্ধ চলছে।

* * *

গ্রীস ও আলবেনিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে ইতালীর যখন প্রায় হার হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে, সেই সময় জার্মানী এসে পড়ে যুগপৎ গ্রীস ও যুগোশ্লোভিয়াকে আক্রমণ ক'রে সপ্তাহকালের মধ্যেই উভয়দেশ অধিকার করে বসেছে। বল্কান রাজ্যগুলির মধ্যে রুমানিয়াই সর্বপ্রথম রাজদ্রোহী হয়ে জার্মানপক্ষে যোগ দিয়েছিল, তারপর বুলগেরিয়াও যোগ দেয়, কিন্তু 'যুগোশ্লাভিয়া' ও 'গ্রীস' ক্ষুদ্রশক্তি হলেও জন্মভূমির স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য জীবন পণ করে জার্মানীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে সাহসী হয়। তারা পরাজিত হয়েছে বটে, তাদের দেশও আজ বিধ্বস্ত অবস্থায় জার্মানীর হস্তগত হয়েছে ঠিক, কিন্তু প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে এই যুদ্ধের গৌরবময় বারত্বের খ্যাতি, এই স্বদেশের সম্মান ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দেশভক্তদের অকাতরে প্রাণদান পৃথিবীর ইতিহাসে স্বর্ণ অক্ষরে লেখা থাকবে।

* * *

অবশেষে জাপানও ছুটে গিয়ে সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে একটা অনাক্রমণ চুক্তি ও একটা বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন করে এল। বর্তমান অবস্থায় পৃথিবীর চারিদিকে যেরকম যুদ্ধ বিগ্রহ ছড়িয়ে পড়ছে তাতে কখন কি হয় কিছুই বলা যায় না। এসময় রাশিয়ার মত একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি করে জাপান তার শক্তি আরও বাড়িয়ে ফেললে। চীনের সঙ্গে যুদ্ধ তার এখনও চলেছে, তার উপর ইন্দোচায়না, থাইল্যাণ্ডের হাঙ্গামা, পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, মালয়, সিঙ্গাপুর, চীনব্রহ্মপথ এবং আমেরিকা ও ব্রিটেনের যুক্ত হুমকী খেয়ে সে বেশ বিব্রত হয়ে পড়েছিল। এইবার আবার হয়ত মাৎসুওকার দল নিজমূর্তি ধারণ করবে।

Printer and publisher B. Bhattacharya, Prabhu Press, 30, Cornwallis Street, Calcutta.

শব্দ-সন্ধান

(প্রতিযোগিতা-কুপন)

(যে কোনো পাঠক বা পাঠিকা এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারেন,
এবং যতগুলি ইচ্ছা কুপন পাঠাতে পারেন)

১ ম	২ ক		৩	৪ হি	৫ নী	■	৬	৭ খ
৮ ছা		■	৯ না			১০	■	
১১		১২ জ		■	■	১৩		মা
	■		■	১৪ ক			■	
■	১৫		বি		■	১৬ র	১৭	■
১৮	নি		■	১৯ র		■	২০ বা	২১
■		■	২২	■	■	২৩ বা		
২৪ সা		■	২৫ দ		২৬ ব		■	
২৭	ত			■	২৮			রু

(পাঠশালা, জ্যৈষ্ঠ)

নাম ....

ঠিকানা ....

....

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আগামী **১৫ই** জ্যৈষ্ঠের মধ্যে কুপনখানি পাঠশালা-কার্যালয়ে পৌঁছনো চাই।

☞ কুপনে কোনো কাটাকুটি বা বানান ভুল চলবে না।

নিয়মাবলী

"পাঠশালা" প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয়।

আশ্বিন মাস থেকে পাঠশালার বর্ষারম্ভ।

লেখা ও ছবি প্রতিমাসে অন্তত ৪০ পৃষ্ঠা থাকবে; আকাব ডবল ক্রাউন ৮ পেজি।

বার্ষিক মূল্য মণি অর্ডারে পাঠালে তিন টাকা। ষাণ্মাসিক দেড় টাকা। ভি পিতে বার্ষিক মূল্য ৩।০ তিন টাকা চার আনা। ষাণ্মাসিক ভি পি করা হবে না।

নগদ মূল্য প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা।

নমুনার জন্য পাঁচ আনার ডাকটিকিট পাঠাবেন।

মফঃস্বলের গ্রাহকগণ প্রকাশকেব ঠিকানায় মনিঅর্ডারযোগে টাকা পাঠাবেন। শহরের গ্রাহকগণও ঐ ঠিকানায় টাকা জমা দিবেন।

মাসের প্রথম সপ্তাহে কাগজ না পেলে ডাকঘরের জবাব সহ ১৫ই তারিখের মধ্যে জানা'লে আর এক কপি দেওয়া হবে।

ডাকটিকিট দেওয়া থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠানো হবে। চিঠির উত্তর রিপ্লাইকার্ড পেলে দেওয়া হবে।

বিজ্ঞাপনের হার

কভারের প্রথম পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে না।

ঐ দ্বিতীয় ও তৃতীয় পৃষ্ঠা	...	২৫৲ হিঃ
ঐ চতুর্থ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন	...	৫০৲
বিজ্ঞাপনের প্রথম পৃষ্ঠা	..	২২৲
পুস্তকারম্ভের পূর্ব পৃষ্ঠা	...	২৫৲
সূচীর পার্শ্বে অর্ধ পৃষ্ঠা	..	১৫৲
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	...	২০৲
ঐ অর্ধ পৃষ্ঠা	..	১২৲
ঐ সিকি পৃষ্ঠা	...	৭৲

সিকি পৃষ্ঠার কম বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে না।

রচনার মধ্যে বিজ্ঞাপন	...	৫০৲

বিজ্ঞাপন পরিবর্তন ক'রতে হ'লে পূর্বমাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে পাঠা'তে হবে।

বিজ্ঞাপন বন্ধ ক'রতে হ'লে একমাস পূর্বে নোটিশ দেওয়া দরকার।

নূতন বিজ্ঞাপন পূর্বমাসের ২০শে তারিখ পর্যন্ত নেওয়া হবে।

এক বৎসরের জন্য বিজ্ঞাপন দিতে চুক্তিবদ্ধ হ'লে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে।

প্রকাশক—**রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য**

পাঠশালা কার্যালয়

৩০, কর্নওআলিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা PHONE—B. B. 4099

চতুর্থ বর্ষ]　　আষাঢ়—১৩৪৮　　[দশম সংখ্যা

ছোট্ট মানুষ

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুন্সী

ওগো ছোট্ট মানুষ,
তুমি ঘুমিয়ে পড়
আমার কোলে মাথা রেখে।
তোমার চোখে আসুক নেমে
একটা ঘন, নিটোল, নিবিড় ঘুম।
চোখ দু'টি তোমার হয়ে যাক
গোলাপের কচি পাপড়ির মত।
আর তুমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শোনো
আমার এই গানে
আমি যা বলতে চাই তোমাকে।

আমি বলতে চাই—
ছোট্ট মানুষ,
তুমি ঘুমোও।
তুমি জেগে উঠোনা,
জগতে চোখমেলে চেয়োনা কোনদিন,
বড় হোয়োনা কখনো।
বড় হবার আশা রেখনা মনে,
আজকের এই সভ্য জগতে
বড় হয় কেবল গর্বিতেরা
অত্যাচারী আর ধনিকরা।
তুমি বড় হোয়োনা কোনদিন
এই আমার আকাঙ্ক্ষা।
তুমি ছোট্টই থাকো।

ওগো ছোট্ট মানুষ
তুমি ঘুমোও, আর
আমি যা বলতে চাই শোনো—
আজকের এই সভ্য জগতে
চেয়োনা তুমি, মানুষ হ'তে
এ জগতে মানুষ হয় তারাই
যারা পরিচয় দেয়
কেবল অমানবতার।
মানুষ হয় শুধু অমানুষেই।
তুমি সে মানুষ যাতে না হও
আমি তাই চাই।
ছোট্ট মানুষ
ঘুমোও তুমি।

ছোট্ট মানুষ
ঘুমোও আমার কোলে
আর আমি যা বলতে চাই শোনো।—
ভালবেসনা কাউকে
ব্যথা পেতে হবে,
বিশ্বাস কোরনা কাউকে
ঠক্‌তে হবে,

সত্য বোলনা কাউকে
আঘাত পেতে হবে,
প্রশংসা কোরনা কারুর
অপমান হতে হবে।
অতএব—
ছোট্ট মানুষ,
তুমি শুধু ঘুমোও,
তুমি জাগ্‌তে চেওনা এ জগতে।

ছোট্ট মানুষ,
এইটুকু শিখে রাখো,
এ জগত যেখানে এসে পৌছেচে আজ—
সেখানে শুধু চলে বঞ্চনা,
চলে শুধু মিথ্যা,
চলে অধর্ম অশান্তি বিশ্বাসহীনতা
আর পাশবিক রীতি-নীতির পুনরাবৃত্তি।

এ জগতে বিচার নেই
নেই শিষ্টতা,
আছে শুধু অসত্য আর অধর্ম
ওড়ে হিংসা ও স্বার্থের জয়-পতাকা।

ছোট্ট মানুষ,
এই আমার শেষ অনুরোধ
কোনোদিন তুমি চেয়োনা বড়ো হ'তে।
তুমি শুধু ঘুমোও আমার কোলে।
বিশ্বাস কোরোনা সমাজকে,
সমাজ শুধু তাদেরই
যাদের হাতে আছে অন্যায়ের ধ্বজা।
তুমি শুধু ঘুমোও আমার কোলে,
তোমার গোলাপ-পাপড়ি চোখের উপর
আসুক নেমে
চিরশান্তিময়ী ঘুম।

আমি জানি, এ সব তুমি শুনবে না,
তবুও তোমাকে সাবধান করা
আমার সব চেয়ে বড় কর্তব্য।
পৃথিবীর সব মানুষই যেদিন
সমান হতে পাবে,
ছোট্ট মানুষ,
সেদিন তুমি চোখ চেয়ো।

শীঘ্রই আশেপাশে চতুর্দিকে বিদেশীদের আগমন সংবাদ পৌঁছে গেল, এবং দলে দলে লোক তাদের দেখতে আসতে লাগল। অবশেষে তাদের সঙ্গে সেখানকার গভর্নরও কিছুদিন পরে এসে হাজির। সেখানকার রাজার কাছ থেকে নানারকম উপহার এসে উপস্থিত হল। কোর্টেস আনন্দের সঙ্গেই সে উপহার গ্রহণ করলে এবং তার পরিবর্তে কিছু উপহার পাঠিয়েও দিলে। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই যারা উপহার নিয়ে রাজার কাছে গিয়েছিল তারা ফিরে এল, তাদের সঙ্গে আরও অনেক মূল্যবান জিনিস।

সেই সব দামী দামী জিনিসগুলো দেখে কোর্টেস ঠিক করল যে সে নিজেই একবার রাজার সঙ্গে দেখা করবে। সে তখন একখানি মাত্র জাহাজ রেখে বাকি সব জাহাজ ধ্বংস করে ফেললে এবং তার লোকদের বললে যে যারা ইচ্ছে করে তারা ওই জাহাজে দেশে ফিরে যেতে পারে। কিন্তু কেউই দেশে ফিরতে রাজী হল না, সকলেই চাইল তার সঙ্গে মেক্সিকোর অভ্যন্তরে যেতে।

তখন কোর্টেস সদলবলে এগিয়ে চলল—প্রথমে ফল-ফুল শোভিত গ্রামের মধ্য দিয়ে, তারপর রঙবেরঙের পাখীর কলকাকলিতে পূর্ণ বনের মধ্য দিয়ে, যে বনের

বাতাস সর্বদা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে সুগন্ধ। আরও এগিয়ে গিয়ে তারা পেলে পাহাড়। রাস্তাটা পাইনবনের মধ্য দিয়ে ক্রমশঃ উপরদিকে উঠে গেছে। এবং যতই উপর-দিকে উঠেছে বাতাস ততই ঠাণ্ডা হতে শুরু করেছে। সৌভাগ্যবশতঃ তাদের জামাকাপড় ছিল পুরু ও শক্ত, তাই তারা যখন আরও উপরে উঠল তখন বরফেও তাদের কিছু ক্ষতি করতে পারলে না। পপোক্যাটাপেট্‌ল পর্বতও তারা অতিক্রম করলে এবং তাদের মধ্যে একজন একটা বড় ঝুড়িতে বসে আগ্নেয়গিরির গহ্বরের মধ্যে প্রায় চারশ' ফুট নীচে নেমে গেল। যখন তাকে উপরে তোলা হল তখন দেখা গেল যে ভিতর থেকে সে সংগ্রহ করে এনেছে অনেকখানি গন্ধক। সেই গন্ধক দিয়ে তারা বন্দুকের বারুদ তৈরী করলে।

এমনি করে দুঃসাহসীর দল তিন মাস ধরে যাত্রা করে মেক্সিকোর উপত্যকার কাছে পৌঁছুল। সুবৃহৎ একটা উপত্যকা। তার মধ্যে রয়েছে পাঁচটি বড় বড় হ্রদ। দূরে ছায়ার মত দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের শিখর। উপত্যকার মধ্যে হ্রদের জলের উপর এবং চারিধারে রয়েছে শহর আর ছোট ছোট বন। হ্রদের জলের উপর রয়েছে বড় বড় মন্দির।

আসল মেক্সিকো শহরটি একটি বড় হ্রদের উপর অবস্থিত। সকলে এগিয়ে চলল তার দিকে, এবং অল্প-ক্ষণের মধ্যেই হ্রদের তীরে এসে পৌঁছুল। সেখান থেকে আরম্ভ হয়েছে পুল শহরে যাবার জন্যে।

রাজা স্বয়ং তাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তাঁর আগে আগে এল সভাসদরা। রূপকথার রাজার মত সোনার চটিজুতো পায়ে, হীরে জহরত দিয়ে মোড়া জামা গায়ে রাজা তাঁর রাজকীয় শিবিকা থেকে নামলেন। তারপর তিনি কোর্টসকে অভ্যর্থনা করে নিলেন। কোর্টসও তার পরিবর্তে রাজার গলায় একটি রঙীন কাঁচের নেকলেশ পরিয়ে দিলেন।

অতঃপর রাজা তাঁর শিবিকায় চড়ে রাজপ্রাসাদের দিকে এগিয়ে চললেন। তাঁর পিছনে পিছনে চলল স্পেনবাসীরা ঘোড়ায় চড়ে। সেইখানেই তাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে।

কোর্টস ও তার সঙ্গীরা রাজ প্রাসাদেই রইল এবং রাজাও তাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করতে আসতেন। এমনিভাবে কিছুদিন কাটবার পর কোর্টস হঠাৎ একদিন রাজাকে ধরে বন্দী করে ফেললেন এবং তাঁর মুক্তির জন্যে সোনা দাবী করলেন। তাদের খুশী করবার জন্য রাজাও সমস্ত দেশবাসীদের সোনা রূপা ও অন্যান্য দামী জিনিস এনে স্পেনবাসীদের দিতে আদেশ দিলেন।

প্রথম প্রথম সকলেই রাজার কথা মানলে। কিন্তু কিছুদিন যাওয়ার পর তাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিল এবং তারা হঠাৎ একদিন বিদ্রোহ করে বসল। প্রাসাদের কাছে এসে তারা হৈ চৈ শুরু করলে এবং রাজা যখন তাদের শান্ত করবার জন্যে বাইরে বেরোলেন তখন "কাপুরুষ" বলে সকলে তাঁকে গালাগাল দিতে লাগল, এবং তাঁর দিকে ইঁট ছুড়তে লাগল। একটা ইঁট এসে রাজার গায়ে লাগল এবং তাতে তিনি মনে এত ব্যথা পেলেন যে সেই দুঃখেই কয়েকদিনের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হল।

স্পেনবাসীরা এদিকে মহা বিপদে পড়ল। তারা বুঝতে পারলে যে তারা যত শীঘ্র সেখান থেকে পালাতে পারে ততই তাদের পক্ষে মঙ্গল। সুতরাং একদিন রাত্রিতে নিঃশব্দে তারা রাজ প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়ল, সঙ্গে যথাসম্ভব ধনরত্ন নিয়ে।

সেদিন রাত্রি ছিল মেঘাচ্ছন্ন। সুতরাং স্পেনবাসীরা মনে করলে যে তাদের পালাবার সুবিধাই হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যখন তারা সবেমাত্র পুলের মাঝামাঝি এসেছে তখন মেক্সিকোবাসীরা তাদের পলায়নবার্তা কি করে জানতে পারলে, এবং সকলে মিলে তাদের আক্রমণ করতে ছুটে এল। কোর্টস ও তার সঙ্গীদের উদ্দেশ্য ছিল পালান, কিন্তু আক্রান্ত হয়ে তাদের যুদ্ধ করতে বাধ্য হতে হল।

দুদলে তুমুল যুদ্ধ সুরু হল। দুদলেরই অনেক মরল। তবে কোর্টস ও তার সঙ্গীদের সঙ্গে বন্দুক থাকায় তাদের তুলনায় মেক্সিকোবাসীরাই মরল বেশী। কিন্তু কোর্টসের দলেরও খুব কম লোকই বেঁচে রইল।

সঙ্গীদের দুরবস্থা দেখে কোর্টসের কান্না পেতে লাগল। কিন্তু উপায় কি? তাই যে কজন বেঁচে ছিল তাদের নিয়েই সে সমুদ্রতীরের দিকে এগিয়ে চলল। অবশেষে কয়েক সপ্তাহ ধরে অক্লান্তভাবে চলবার পর তারা সমুদ্র তীরে পৌঁছুল।

এক বছর পরে কোর্টস আবার মেক্সিকোয় গেল দলবল নিয়ে এবং মেক্সিকো জয় করলে।

ট. সিটালা

শ্রীমণিমোহন পাল, বি-এ

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে এডিনবার্গে রবার্ট লুই ষ্টিভেন্‌সন জন্মগ্রহণ করেন। লুই ছোটবেলা থেকেই বিশেষ স্বাস্থ্যবান ছিলেননা। বাদামী রঙের দুটী চঞ্চল দ্যুতিময় চোখ দুর্বল দেহের মধ্যে প্রচুর জীবনী-শক্তির পরিচয় দিতো। শরীর দুর্বল হলে কি হবে, ঐ বয়সেই তাঁর মনে মনে নিজেকে রোমাঞ্চকর অভিযানের নায়ক বলে কল্পনা করত। এই অ্যাডভেঞ্চারের নেশা তাঁর ছেলেবেলাকার খেলার মধ্যেও প্রকাশ পেতো। ছোট্ট খেলার বন্দুকটি হাতে করে অন্ধকার ঘরে সোফার পাশ দিয়ে গুড়ি মেরে অগ্রসর হয়ে মনে কর্তেন দুর্গম বনপথে তাঁর এই অভিযান। আবার কখনো নিজেকে চমৎকার জলদস্যু-জাহাজের কাপ্তেন কল্পনা করে সিঁড়ির উপরে সোফা রেখে, তার উপর অনেক বালিশ চাপাতেন —সেই হতো তাঁর সমুদ্রগামী বড় যুদ্ধ জাহাজ। বিছানায় বালিশের অরণ্যে নিজেকে মনে হতো কোনও এক বিরাট দৈত্য। বড় হয়ে তাঁকে অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হবে, তার আভাস আমরা তাঁর ছোটবেলাকার কল্পনার মধ্যে খুঁজে পাই। তিনি একটী সুন্দর কবিতায় বলেছেন—"আমার সেই দেশেতে যেতে ইচ্ছে করে, যেখানে গাছে সোনার আপেল ফলে, সেই তোতাপাখীর দ্বীপে—জনহীন দ্বীপ যেখানে রবিনসন্‌ ক্রুসো তার একমাত্র সাথী কাকাতুয়া আর ছাগলদের নিয়ে নৌকো তৈরী করচে। আর সূর্যের প্রখর আলোয় উদ্ভাসিত বিরাট প্রাচ্যদেশ, যেখানে বালুকাময় উদ্যানের মাঝে মাঝে মিনার ও মসজিদের চূড়া দেখা যায়, আর চীনদেশ ঘিরে সেই বিশাল প্রাচীর যার একদিকে ধূ ধূ মরুভূমি।" ছোটবেলার এই সব সুন্দর সুন্দর কবিতা তাঁর "শিশুদের কাব্যোদ্যান" নামে চয়নিকা পুস্তকে লিখে গেছেন।

রুগ্ন শরীর নিয়ে তাঁকে বেশীর ভাগ সময়ই বিছানায় পড়ে থাকতে হতো। এমন ভাবে থাকলে সকলেরই ক্লান্তি আসা স্বাভাবিক, কিন্তু লুই নিজেকে প্রফুল্ল রাখবার চেষ্টা করতেন। তাঁর ছোটবেলাকার কথা তিনি বড় হয়ে লিখে গেছেন বটে, কিন্তু সে লেখা একটুও বড়দের মত নয়,— ঠিক যেন একটী শিশুই তার অপরিণত মন নিয়ে লিখে রেখেছে। শৈশব সম্বন্ধে তার স্মরণশক্তি ছিল অতিশয় প্রখর, তিনি নিজেকে তাঁর পুরাণো দিনের ভিতর ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারতেন। তখন তিনি শিশুর অবিকৃত অনুভূতি দিয়ে সমস্ত জিনিষ দেখতেন ও বুঝতেন। কল্পনাপ্রবণ শিশুটির মন যে সাময়িক হর্ষ, বিষাদ, ভয়, বিস্ময় ও চিন্তায় আন্দোলিত হত, সেগুলি আবার অবিকল ফিরিয়ে পেতেন। যথেষ্ট বড় হয়েও ষ্টিভেন্‌সন এই শিশুসুলভ প্রকৃতির অনেকখানি বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। চেহারায়ও তাঁকে অল্পবয়স্ক দেখাত—এ নিয়ে অনেক মজার গল্প আছে। একবার কোনও হোটেলে তিনি নাকি বড়দের টেবিলে বসতে পান্‌নি। পোষাক পরিচ্ছদেও তাঁর এই প্রকৃতিটী ধরা পড়ত। প্রায়ই তিনি পরতেন সামুদ্রিক নীল রংয়ের স্যুট, কালো সার্ট, এবং হলদে রংয়ের কার্পেট কাপড় নেকটাইয়ের কাজ করত, আর একটা আকৃতিবিহীন টুপি—যদি তাকে নিতান্তই টুপি বলতে হয়। তিনি তাঁর এই পুরানো টুপিটিকে কিছুতেই ছাড়তে পারতেন না। একবার বন্ধুরা তাঁকে দোকানে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে টুপি পছন্দ করছেন, আর ইতিমধ্যে লুই পুরানো টুপিকে বিদায় দেবার ভয়ে, নিজেই চুপি চুপি সরে পড়েন। রোগভোগের ফলে অসময়ে তাঁর দেহ ভেঙ্গে পড়েছিলো বটে, কিন্তু মনটা সব সময়েই তাজা থাকতো; শরীর বেশী অসুস্থ না থাকলে তিনি শিশুদের মত খেলা করেই আমোদ পেতেন। শিশুদের সঙ্গে তাদের খেলায় যোগ দিতে, তাদের ছোট্ট টিনের বাঁশীতে বিচিত্র সুর বাজাতে—এর চেয়ে আনন্দ

তাঁর কাছে আর ছিল না। এমন কি বড়দের জন্য লেখা বইয়েও তিনি অনেকবার ছোটদের খেলা এবং খেলনা সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন—এর থেকেই প্রমাণ হয় যে তিনি প্রায় সব সময়েই এই সব কথা চিন্তা করতেন। শিশুর মত অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি ও বিস্ময়বোধ তাঁর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। মানুষ হিসেবে যেমন ষ্টিভেন্সন্ সব বয়সী লোকের সঙ্গে মিশতে পারতেন, তাঁর লেখার মধ্যেও তেমনি সব বয়সের লোক আনন্দ পেতে পারে। ছোটবেলায় তাঁর Lord of Counterpane, My Shadow, Lord of Story Book, Foreign Lords, Pirate Story Windy Nights প্রভৃতি চমৎকার কবিতাগুলি আনন্দ দেবে, কিশোর বয়সে আনন্দ দেবার পক্ষে Treasure Islandএর জুড়ি নেই। আবও বড় হয়ে তাঁর ভ্রমণ কাহিনী, পত্রাবলী ও প্রবন্ধ পড়ে আসল মানুষটিকে আবিষ্কার করে মুগ্ধ হয়ে যাই। একাধারে এমন মানুষ ও লেখকের সংখ্যা জগতে বিরল।

শৈশবে এবং যৌবনেও তিনি একজন অলস প্রকৃতির লোক ব'লে বিবেচিত হ'তেন। একবার ট্রেনে লণ্ডন থেকে এডিনবর্গে যাবার সময় পকেটে থার্ডক্লাসের ভাড়াও না থাকাতে, তিনি রেলের কেরানীটিকে টিকিটের দামের বদলে Swinburneএর "Queen Mother and Rosamond" বইখানি দিতে গেলেন। অরসিক ভদ্রলোক তা'তে নাকি সম্মত হন নি। মাঝে মাঝে স্কুলে প'ড়ে সতের বছর বয়সে এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শুরু করেন। আর এই সময় থেকেই তাঁর লেখার সাধনা শুরু হয়। লুইয়েরা ছিল ইঞ্জিনীয়ারের বংশ—তাঁরা সমুদ্রে বাতিঘর ও বন্দর তৈরী ক'রে বিখ্যাত হ'য়েছিলেন। লুইয়ের বাবাও আশা করেছিলেন যে লুইও তার পৈত্রিক ব্যবসায়ে হাত দেবে। সুতরাং সেই উদ্দেশ্যে তাঁকে সূত্রধরের দোকানে এবং ধাতুর কারখানায় কাজ শিখতে দেওয়া হ'ল, কিন্তু অবশেষে দেখা গেল তিনি শিখছেন না কিছুই। কথায় কথায় লুই ব'লে ফেললেন "সাহিত্য ছাড়া কিছু আমি পছন্দ করি না।" পিতা তাঁকে বুঝালেন যে ওটা তো আর কোনও ব্যবসাই নয়, তার চেয়ে বরং আইন প'ড়তে ভাললাগে তো তাই পড়ো। অতএব ২১ বছর বয়সে আইন পড়তে ঢুকে ২৫ বছর বয়সে তিনি সসম্মানে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'লেন। কিন্তু সব সময়েই তাঁর লক্ষ্য ছিল সাহিত্য রচনা এবং তার ভিৎ গড়তেই তিনি ব্যস্ত ছিলেন। লেখা জিনিষটা চট ক'রে তাঁর হাতে আসেনি, বহুবার তিনি অকৃতকার্য্য হ'য়েছেন। কিন্তু সারা জীবনে তাঁর যে সাহস দেখা গেছে, সেই অপূর্ব সাহসে ভর ক'রে তিনি অধ্যবসায় সহকারে লিখে চললেন। লিখতে ইচ্ছে হ'ত, অথচ নিজে লিখে নিজেরই ভাল লাগত না, তাই, বন্ধুবান্ধবকেও সেগুলো দেখাতেননা। তাঁর ধারণা—তখনও তিনি লিখতেই শেখেন নি। ২৬ বৎসর বয়সে তাঁর প্রথমপ্রবন্ধ সঞ্চয়ন পুস্তক প্রকাশ করলেন।

তারপর তাঁর ভ্রমণ হোল আরম্ভ। বেলজিয়াম ঘুরে এসে লিখলেন দু'খানি ছোট বই—An Inland Voyage এবং Travels with a Donkey কতকগুলি পত্রপত্রিকাতেও তিনি এই সময় লেখা শুরু ক'রেছিলেন, কিন্তু তাতে খানিকটা খ্যাতি অর্জন ক'রলেও অর্থ উপার্জন হয়নি। ফ্রান্স বেড়িয়ে আমেরিকায় এলেন। এই সময় তিনি পর্যটনের কষ্টে মরণাপন্ন হ'য়ে পড়েছিলেন, একজন স্থানীয় আদিম অধিবাসীর শুশ্রূষায় সে যাত্রা রক্ষা পান। এরপর তিনি একজন আমেরিকান মহিলাকে বিয়ে ক'রে ক্যালিফর্ণিয়ার সূর্য্যালোকদীপ্ত সমুদ্রসৈকতে একটা পুরানো বাদামীরঙা কাঠের বাড়ীতে নীড় বাঁধলেন। শরীর ভাল না থাকা সত্ত্বেও তিনি সব সময়ে স্ফূর্তিতে ও কৌতুকে আনন্দিত থাকবার চেষ্টা করতেন। তাঁর বন্ধুরা যাতে তাঁকে কখনও অসুস্থ বলে না মনে করতে পারে এই তাঁর ভাল লাগত, জগৎকে হাসিমুখ দেখিয়ে আনন্দিত ক'রে রাখাই ছিল তাঁর বরাবরের প্রচেষ্টা। তাঁর বাণীই ছিল আনন্দের বাণী। তাঁর বিশ্বাস ছিল: "সুখ বা আনন্দ নিজের জন্য নয়, প্রত্যেক মানুষেরই কর্তব্য যেমন করে হোক অপরকে আনন্দ বিতরণ করা ও সুখী করা। একখানা পাঁচ পাউণ্ডের নোট খুঁজে পাওয়ার চেয়ে একটা সুখী নর বা নারী খুঁজে পাওয়া ভাল, কোনও ঘরে তার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই যেন মনে হয় সে ঘরে আরেকটা বাতি বেশী জ্বালানো হোল। সুখী হবার মহৎ কাজে যদি আমি পরাঙ্মুখ হ'য়ে থাকি, আমার সমাজে যদি আমার মুখে আনন্দের চিহ্ন না দেখা গিয়ে থাকে, সুখী লোকের চোখের কোনের হাস্যরেখা যদি আমাকে বিচলিত না ক'রে থাকে, প্রত্যুষের আকাশ, বই, খাবার, গ্রীষ্মের বর্ষণ যদি আমার অন্ধ হৃদয়কে বৃথাই আঘাত ক'রে গিয়ে থাকে,—তাহ'লে হে প্রভু, তোমার সবচেয়ে আনন্দময় অস্ত্রে আঘাত ক'রে আমার সুপ্তিমগ্ন আত্মাকে জাগিয়ে তুলো।" অবিরাম অসুস্থতা ও কষ্ট সত্ত্বেও তিনি সব সময়ে এই হাসিমুখ দেখিয়েছেন—এ তাঁর স্বার্থসম্পর্কহীন আত্মার আলো। তাই প্রকৃতির কবি-পুরোহিত ওয়ার্ডসোয়ার্থের (Stray Pleasures) সঙ্গে তাঁর অন্তরের মিল বেশী। লুই বলেছেন—

"The world is so full of a number of things,
I'm sure we should all be as happy as
kings."

এক জায়গায় বেশীদিন থাকা তাঁর পোষাতো না।

ক্যালিফর্ণিয়া থেকে স্কট্‌ল্যাণ্ড আবার সুইজারল্যাণ্ড ঘুরে স্কট্‌ল্যাণ্ডে। অ্যাবারডীন্‌সায়ারের স্যাঁৎসেঁতে ঠাণ্ডা আবহাওয়া তাঁর ভগ্ন স্বাস্থ্যকে আরও খারাপ করে দিলে। সারাদিন ধ'রে তাঁকে বিছানার আশ্রয়ে থাকতে হোত, কথা বলা পর্যন্ত নিষেধ। এমন অসুখের সময়ও, যখন কিছুই করতে ভাল লাগতে পারে না, তিনি বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে তাঁর বিখ্যাত অ্যাড্‌ভেঞ্চারের গল্প "রত্ন-দ্বীপ" লিখ্‌তে লাগলেন। এই সময় একটা ছবি আমাদের কাছে স্পষ্ট ধরা দেয়, একটী রোগা-মতন দুর্বল শরীর—তার হাত, পা, বুক এই দুর্বলতার সাক্ষী দিচ্ছে, কেবল তার গাঢ় বাদামী চোখে অধীরতার ঔজ্বল্য। লম্বা লম্বা অবিন্যস্ত চুল নিয়ে বালিশে ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে লেখায় ব্যস্ত। দিন প'ড়ে যায়। তিনি নেমে এসে সকলের সঙ্গে হাসি তামাসা, কথাবার্তায় যোগ দেন এবং তাঁর পরিবারের লোকের কাছে সারাদিনের-লেখা সেই গল্পটি পড়ে শোনান—সে গল্পের বিষয় অতি রোমাঞ্চকর—জলদস্যু, জাহাজডুবি, আর গুপ্ত ধনের ব্যাপার। বিশ্বাস হয় না, এই দুর্বল লোকটী এমন রোমাঞ্চকর অ্যাড্‌ভেঞ্চারের গল্প লিখ্‌তে পারে।

আবার তিনি সুইজারল্যাণ্ডের মনোরম পার্বত্য আবহাওয়ায় ফিরে গেলেন। শরীর তখনও অসুস্থ,—এত অসুস্থ যে কলম ধরা চলে না। কিন্তু অত অসুস্থতার মধ্যেও সমস্ত কষ্টকে পরাস্ত ক'রে মুখের উজ্বল হাসিটী সর্বদা ফুটে থাকৃত। শরীর বেশী খারাপ মনে হলে, আরও বেশী ক'রে তিনি লেখায় মন দিতেন। যদিও তাঁর পরিবারের ব্যয় নির্বাহ হ'ত এই লেখা থেকেই, তবু লিখে তিনি বছরে ২০০ পাউণ্ডের বেশী রোজগার করতে পারতেন না। ইংলণ্ডে ফিরে এসে Child's Garden of Verse ও তাঁর অলৌকিক বই Dr Jekyll & Mr. Hyde লেখেন। এই বই অচিরে তাঁকে বিখ্যাত করে তুলল। যে খ্যাতি তিনি চেয়েছিলেন—তাই পেলেন। এই বইয়ের খ্যাতির এক বছরের মধ্যে এক আমেরিকান পুস্তক-প্রকাশক তাঁকে দক্ষিণ সমুদ্রে ভ্রমণ কাহিনী লেখবার জন্য ২০০০ পাউণ্ড দিতে চাইল। ষ্টিভেন্‌সন সানন্দে সম্মত হলেন। ষ্টিভেন্‌সন-পরিবার দক্ষিণ সমুদ্রে বেড়াতে গেলেন। লুইয়ের স্বাস্থ্যের উন্নতি পরিদৃষ্ট হোল। অতঃপর ভ্রমণ শেষ হয়ে গেলেও এই দ্বীপপুঞ্জ তাঁকে পরীর দেশের মায়ায় ভুলিয়ে আকর্ষণ ক'রলে। তিনি 'সামোয়া'য় থেকে গেলেন। শরীর ভাল মনে হোত ব'লে লেখায় ও অন্যান্য কাজে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে লাগলেন। দ্বীপের আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে ভাব করলেন, তারাও তাঁকে ভালোবেসে তাদের ভাষায় নাম দিলে "টু-সি-টা-লা"—যা'র মানে "গল্পকথক"।

প্রায় তিন বছর তিনি সুস্থ দেহের আনন্দে বিভোর হয়ে এই অপরূপ দ্বীপে কাটালেন। কিন্তু আবার অত্যধিক পরিশ্রমে তাঁকে অসুখে প'ড়তে হ'ল। ১৮৯৩ খৃঃ অব্দের শেষের দিকে সাঙ্ঘাতিক ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হ'লেন। আবার সেই রোগ-শয্যা। St Ives-এর রচনা নিজের হাতে আর লেখা সম্ভব হ'ল না, তিনি মুখে ব'লে যেতে লাগ্‌লেন। অবশেষে যখন স্বরও বন্ধ হ'ল তাতেও তিনি নিরুৎসাহ না হ'য়ে কালা ও বোবাদের জন্য যে বিন্দুযুক্ত বর্ণমালা আছে, তাই আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বুঝিয়ে যেতে লাগ্‌লেন। কিন্তু এত ক'রেও ও-গল্প আর শেষ হ'ল না। জীবনের শেষ মুহুর্তটী পর্য্যন্ত প্রফুল্লতা বজায় রেখে ১৮৯৪-এর ডিসেম্বর হঠাৎ মারা গেলেন।

তাঁর প্রিয় সেই রমণীয় দ্বীপের একটা পাহাড়ের সানুদেশে তাঁকে সমাধিস্থ করা হোল। তাঁর সমাধি-স্তম্ভের উপর তাঁর নিজের কথাই খোদাই করা আছে। "নক্ষত্রাকীর্ণ উদার নীলিমার তলে কবর খুঁড়ে আমায় শুইয়ে দিও। আনন্দ নিয়ে আমি বেঁচে এসেছি, আনন্দের সঙ্গে মরণকে বরণ করলুম যেখানটীতে সে চেয়েছিল সেইখানে তার শেষ শয্যা রচিত হোল—এই কবিতাই আমার সমাধির কবিতা হোক।"

৩১শে মার্চ মঙ্গলবার বেলা ১২টা

শ্রীতাপসরঞ্জন সরকার

সপ্তদশ

(হুকুম জারী)
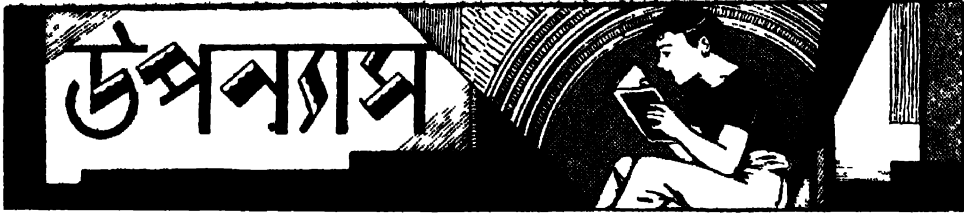
আজ সারাটা দিন বিজয় ও সমীর অশোকের অপেক্ষায় রইল, কিন্তু অশোক এলোনা। পরদিন বিকেলেও যখন অশোক এল না তখন বিজয় সমীরকে ডেকে বল্‌লে, "ও নিশ্চয় চম্পট দিয়েছে। কিন্তু আর বসে থাকা চলে না। ইতিমধ্যে হয় ত নবীন এ জায়গা ছেড়ে চলে যেতে পারে কেননা উইলটা ত তার হাতেই রয়েছে।" সমীর বল্‌লে, "তবে তার নামে একটা গ্রেফতারি পরওয়ানা বের কোরে কালই হাত কড়া লাগাও না কেন?" উভয়ের মধ্যে যখন এইরূপ কথাবার্তা চলছিল, বন্ধ ঘরের দরজায় ঠক্ ঠক্ কোরে আওয়াজ হোল। সমীর তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলে। ভিতরে ঢুকল একটী বার চৌদ্দ বছর বয়সের ছোকরা। সোজা বিজয়ের কাছে গিয়ে সে পকেট থেকে একখানা চিঠি বের কোরে বিজয়ের হাতে দিলে। চিঠিখানা না পড়েই বিজয় তাকে জিজ্ঞেস করলে, "চিঠি কে দিয়েছে?" একজন ভদ্রলোক।" "চেন তাকে?" "না বাবু।" "সেই ভদ্রলোক তোমাকে কি বলেছিলো?" "আমাকে ডাক দিয়ে নিয়ে বল্‌লেন, খোকা তুমি বিজয়বাবুকে চেন?" আমি বললুম, "হ্যাঁ।" "তাকে তুমি এই চিঠিখানা দিয়ে আসতে পারবে?" আমি বললুম, "দিতে পারলে কি দিবে বাবু।" সে আমার হাতে একটী আধুলি গুজে দিলে। আমিও চিঠিখানা নিয়ে সোজা ভিতরে চলে এলুম।" ছোকরাটী প্রসন্ন মনে লাফাতে লাফাতে চলে গেল। বিজয় চিঠিখানা পড়ে সমীরের হাতে দিয়ে বল্‌লে, "পড়ে দেখ।" সমীর পড়তে লাগল,—

বিজয়বাবু,

অশোককে ফিরিয়ে নাও। সে আমাদের পথে এসে দাঁড়িয়েছে। যদি আর একবার সে ছদ্মবেশে আমাদের দলে ভেড়ে তবে কাল সকালেই তার মৃতদেহ দেখতে পাবে। আর, সাবধান! তুমিও আমাদের ধরবার চেষ্টা কোরে প্রাণপাখী খাঁচা ছাড়া করবার চেষ্টা করো না।

নবীন।

সমীর বললে, "তা'হলে এখন কি কোরবে।" বিজয় বললে, "এতে বোঝা যাচ্ছে অশোক এদের দলের একজনকে না ধরে ফিরবে না। যাক ওর আশায় নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকলে চলবে না। আমাকে এখনি বেরুতে হবে।" বিজয়ের এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই টেলিফোন বেজে উঠলো। রিসিভার তুলে বিজয় বললে, "হ্যালো," উত্তর এলো, "আমি অশোক, তুই কি বিজয়?" "হাঁ," "তবে তুই সমীরকে বাড়ীতে রেখে রাত্রি সাড়ে আটটার প্যাসেঞ্জার ট্রেনে একেবারে 'বংগিরিতে' নামবি বুঝলি?" "হ্যাঁ, বুঝেছি, তারপর?" "তারপর কয়েকটি সরকারী পুলিশ জোগাড় করে পরের ট্রেনের অপেক্ষায় ষ্টেশনে বসে থাকবি। আমি নবীনের বাড়ী থেকে ফোন করছি। এক ঘণ্টা আগে নবীন ও আফতাব-এ জায়গা ত্যাগ করেছে। তবে কোনও ট্রেন না থাকায় তারা মটরে করে 'পূর্বধলায়' গিয়েছে সেখানে তাদের একটু কাজও আছে। রাত্রি সওয়া দশটার এক্সপ্রেসে তারা 'বংগিরিতে' নামবে এবং সেখানে নির্দিষ্ট কয়দিন থেকে এখানে আসবে। আমি সব খবর জানতে পেরেছি, সাক্ষাতে তা বলবো। আমি এখন মটোরে 'পূর্বধলায়' যাচ্ছি, তার পর সেখান থেকে গা ঢাকা দিয়ে এদের পিছু নেব এবং সওয়া দশটার এক্সপ্রেসে 'বংগিরিতে' গিয়ে নামব। অবশ্য ছদ্মবেশেই থাকব। তোকে যা যা বল্লুম সব অক্ষরে অক্ষরে পালন করবি। অধিকন্তু, রাত্রি আটটার আগে বাড়ী ছেড়ে বেরুবিনা, যদি এর মধ্যে কিছু হয় তবে আমি ফোন কোরে তোকে জানাব।" বিজয় রিসিভার ছেড়ে দিয়ে সমীরকে সব কথা বলে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে

বসলো। তখন মাত্র ছটা বাজে। সুতরাং এ দু'ঘণ্টা বসে থাকার চেয়ে গল্প করাই ভাল মনে কোরে সমীরকে বল্লে, "আধ ঘণ্টা আগে যে নবীন পূর্বধলা পৌঁছেচে তা আমি আগেই জানতে পেরেছি এবং সেখানে যাবার জন্যই আমি এখন বেরুতে চেয়েছিলুম কিন্তু আর হোল না। ভালই হোল, অনেকখানি কাজ অশোকের জন্যই হয়ে গেল। আমার শুধু 'বংগিবিতে' গেলেই চলবে। কিন্তু যদি অশোক 'পূর্বধলা' থেকে ওদের অনুসরণ কোরতে না পারে তবে সব মাটী হয়ে যাবে।"

সমীর বিস্ময় প্রকাশ করে বল্লে, "কিন্তু সারাদিন তুমি বাড়ীতে বসে থেকে কি কোরে বুঝলে যে নবীন ও আফ্‌তার 'পূর্বধলায়' গিয়েছে?" "হ্যাঁ, বলছি দাঁড়াও। কানাই দা! ও কানাই দা!" নীচ থেকে উত্তর এলো, "কেনবাবু?" "এদিকে এসো, শিগগীর।" কানাই উপরে এসে বললে, "কেন সুটকেশ গুছিয়ে দিতে হবে নাকি?" "আজ্ঞে হাঁ, দু'ঘণ্টা সময় আছে, এর মধ্যে আমার দরকারী জিনিস পত্রগুলো সব একটা সুটকেশে গুছিয়ে দেবে।" "ছদ্মবেশের জিনিসগুলোও কি দিতে হবে না কি?" "আরে হাবা! তাই যদি না দিলে তো দরকারী জিনিস দিলে কোথায়? যাও, চট কোরে শাড়ী, ধুতি, ব্লাউজ, শেমিজ, বডিজ, চুল, গোঁফ, দাড়ী, চুড়ি, লেডিজ সু, দুল, হার, স্নো, পাউডার, রং, কুমকুম, কজ্জ ইত্যাদি তারপর পিস্তল, ছোরা, কাঁচি, দড়ি, ব্যাগ, ইলেকট্রিক টর্চ্চ, হুইস্‌ল ইত্যাদি সব জিনিষগুলো গুছিয়ে দাও।" "বুঝেছি তুমি দূরদেশে যাচ্ছ। কিন্তু আমাকে না নিয়ে যেতে পারবে না। যদি হাত পা ভেঙ্গে যায় বা প্রাণটা খোয়া যায় তাহলে এ বুড়ো বয়সে আর সে শোক সহ্য হবে না তা বলে দিচ্ছি।" "বুড়ো হবার সঙ্গে সঙ্গে দেখছি তোমার বুদ্ধি লোপ পেয়ে যাচ্ছে! দরকার হলে তোমাকে ছাড়া আমি একপাও নড়তুম না। এখন তোমার যাওয়ার কোন আবশ্যকতা বোধ হচ্ছে না। যদি হয়— তা হলে সেখান থেকেই ফোনে জানাব।" "আচ্ছা, তাহলে যাচ্ছ কোথায়, তাও কি জানতে পারব না।" "কেন পারবে না! আমি যাচ্ছি সেই জায়গায় যে যায়গায় পাহাড়গুলো বংএ বঙময় হয়ে গেছে। বুঝেছ।"

কানাই হেসে বললে, "বুঝেছি গো, বুঝেছি। আচ্ছা আমি যাই। সময় প্রায় হয়ে এলো।" এই বলে বৃদ্ধ নীচে নেমে গেল। বিজয় হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সমীরকে বললে, "রেলিঙের একধারে দাঁড়িয়ে ছোট দূরবীনটা দিয়ে চেয়ে দেখ বহুদূরে রাস্তার ঠিক মোড়ে 20961. P R A, নম্বরের একখানা ছোট ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে।" সমীর রেলিঙের ধারে গিয়ে দেখলে ঠিক সেই নম্বরেরই একখানা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। বিজয় বললে, "দেখতে পেয়েছ।" সমীর বল্লে, "হ্যাঁ।" বিজয় বল্লে, "চলে এস।" সমীর আবার নিজ যায়গায় এসে বসল। তখন বিজয় হাত-ঘড়ির দিকে চেয়ে একমিনিট চুপ কোরে বসে থেকে বললে, "যাও এবার গিয়ে দেখতে পাবে গাড়ীখানা চলে গেছে।" সমীর আগের মত গিয়ে দেখলে সত্যিই গাড়ীখানা চলে গেছে। ফিরে এসে বললে, "গাড়ীখানা কি তোমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল?" বিজয় বললে, "ঠিক তাই, গাড়ীখানা আমার জন্যই অপেক্ষা করছিলো। আমার হুকুম ছিল দু'টা পনর মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করা। এই গাড়ীখানাতেই কিছুক্ষণ আগে আফতার ও নবীন 'পূর্বধলায়' গিয়েছে। শহরের প্রত্যেক গাড়ীর উপর আমার হুকুম ছিল যে, যে মুহূর্তে দু'টি লোক পূর্বধলাতে যাবার জন্য ট্যাক্সি ভাড়া কোরবে সেই মুহূর্তে যেন আমাকে সেই ট্যাক্সির নম্বর শুদ্ধ খবর দেওয়া হয় এবং এও হুকুম ছিল যে তাদের দু'জনকে নির্দিষ্ট যায়গায় পৌঁছে সেই গাড়ীখানা যেন এই রাস্তার মোড়ে এসে দুটা পনর মিনিট পর্য্যন্ত অপেক্ষা কোরে চলে যায়।" "কিন্তু তুমি কি কোরে বুঝলে যে তারা 'পূর্বধলায়' যাবে?" "হ্যাঁ, প্রশ্নটা করেছ বুদ্ধিমানের মতই বটে, কিন্তু উত্তরটা অতি সোজা। আফতারের বাড়ীর চাকরটাকে তো ঘুস খাইয়ে রেখেছি প্রায় এক মণ।" "কিন্তু, কখন?" "গত কাল, রাত্রি প্রায় সোয়া দু'টোর সময়।" "কিন্তু তা'হলে তো তোমার এতক্ষণ 'পূর্বধলায়' যাওয়া উচিত ছিল।" "ছিল বৈকি, কিন্তু আমাকে এও ভাবতে হয়েছিলো যে, কোন কারণ বশতঃ তাদের যাওয়া বন্ধও হয়ে যেতে পারে।" "আচ্ছা, কিন্তু 'পূর্বধলায়' তো কত লোকই যায়। সুতরাং এদু'জন লোকই যে তোমার তা কি কোরে ড্রাইভারেরা বুঝলে?" "কেন? তাদের প্রত্যেকের কাছে আমি আফতার ও নবীনের ফটো পাঠিয়ে দিয়েছি।" "এতো ফটো যোগাড় করলে কি কোরে?" "ফটো যোগাড় করেছি নবীনের চাকরের হাত দিয়ে। তাকে একটা ক্যামেরা দিয়ে দিয়েছিলুম এবং আজ বেলা প্রায় দশটার সময় সে দু'খানা ফটো পাঠিয়ে দিয়েছে এবং আমি তা থেকে অনেক কপি কোরে নিয়েছি।" "কিন্তু তারা যদি ছদ্মবেশে গিয়ে থাকে তো ট্যাক্সিওয়ালারা ফটো দেখে চিনবে কি কোরে?" "হ্যাঁ, তা ভাববার বিষয় বটে, কিন্তু নবীনের গালে যে একটা কাটা দাগ আছে সেটা তো ছদ্মবেশে লুকানো যায় না বন্ধু!" ইত্যাদি কথোপকথন সাঙ্গ হতে প্রায় রাত্রি আটটা হয়ে এলো। বিজয় আহার সমাপন কোরে সুটকেশ হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো ষ্টেশনাভিমুখে।
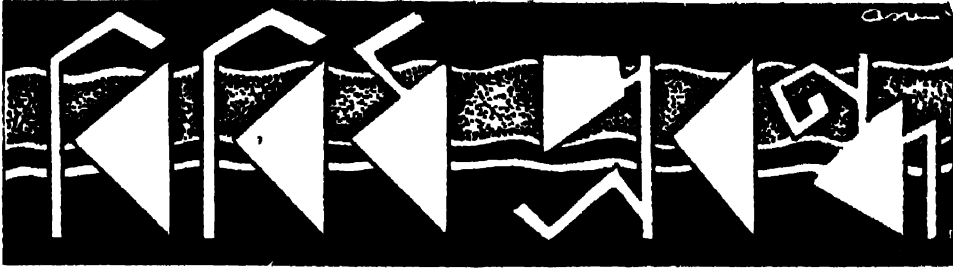
টাকার রহস্য

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ

টাকার চলন-গতি বলতে কি বোঝায়, এবার সেটা দেখা যাক। শ্রীমান সুনীল ও তার বোন শ্রীমতী পিনকু, তাদের বাবার কাছ থেকে আজ একটা করে 'টাকা' (রৌপ্য মুদ্রা) পেয়েছে। টাকাকড়ি খরচ সম্বন্ধে সুনীল একটু হিসাবী, সে ঠিক করলো এই 'টাকাটা' সহজে খরচ করবে না। সে সযত্নে সেটা ডেক্সে লুকিয়ে রাখলে। দিন পনেরো পরে সে ঐ 'টাকা' দিয়ে একটা ফুটবল কিনে এনে বললে "সেকেণ্ড হ্যাণ্ড হলে কি হয়, কি রকম ফার্স্ট ক্লাস কনডিশান, এক টাকায় ড্যাম চিপ্ হয়েছে।" একটা সংকীর্ণ গলির মধ্যে আধ-ভাঙা, ছোট্ট অন্ধকার ঘরে পুরাণ জিনিসের এই দোকানটির অবস্থান। কালেভদ্রে এই পুরাণ জিনিসগুলোর দু'একটি বিক্রি হয়। মাল কিছু বিক্রি হলে তবে দোকানদার আবার অন্য মালের সন্ধানে লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়ায়। সাত দিনের মধ্যে সুনীলের কাছে তার ফুটবলটি বিক্রি হয়ে গেলে, সে আর একটির সন্ধানে থাকলো। দু'চার দিন ঘোরাঘুরির পর সে একটা মুচির কাছ থেকে দুটো পুরাণ ফুটবল ঐ 'টাকা' দিয়ে খরিদ করলে। মুচি আবার পরের মাসে কিছু চামড়া খরিদ করবে বলে, সেই 'টাকাটি' রেখে দিল। পিনকুর স্বভাব অন্যরকম, পাওয়া মাত্র সে তার মুদ্রাটি খরচ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। সেই দিনই বড় রাস্তার ধারের মস্ত বড় মনিহারী দোকান থেকে ঐ 'টাকা' দিয়ে একটা ভাল ডল পুতুল কিনে তবে তার সোয়াস্তি। এই দোকানটির খুব বেচাকেনা আছে, দোকানের মালিককে প্রায় রোজই মুর্গীহাটা, চিনাবাজার থেকে মাল আনতে হয়, এই মালগুলি সে পাইকারী দরে (অনেক মাল এক সঙ্গে খরিদ করার জন্য অপেক্ষাকৃত যে-সুবিধা দর পাওয়া যায় সেই দরকে পাইকারী দর বলে) পায়। পিনকু যেদিন ডল পুতুল কেনে, সেইদিনই দোকানদার টেলিফোন করে চিনা বাজারের কোন প্রসিদ্ধ পাইকারী বিক্রেতার কাছ থেকে কিছু মাল আনিয়ে নিলে। এই মালের দরুণ যে টাকা দেওয়া হল, পিনকুর মুদ্রাটিও তার মধ্যে ছিল। এই পাইকারী বিক্রেতা শহরের ও মফঃস্বলের ছোট বড় বহু মনিহারী দোকানে মাল সরবরাহ করে থাকে। বম্বে, করাচি ও সোজাসুজি ম্যানুফ্যাকচারারদের কাছ থেকে মাল আনিয়ে দোকানটি তার এই বিস্তর চাহিদা মিটিয়ে থাকে। সুবিধা দরে ও পছন্দ মত মাল খরিদ করবার জন্য তার প্রতিনিধি প্রায়ই শিল্পপ্রধান দেশগুলিতে যাওয়া আসা করে। ডল পুতুল বিক্রেতা পিনকুর কাছ থেকে যেদিন টাকা পায়, তার পরদিন সকালে, পাইকারী বিক্রেতার একজন প্রতিনিধি কিছু টাকা সঙ্গে নিয়ে বম্বে যাত্রা করলো—মিলের তৈরী কতকগুলি জিনিস খরিদ করতে। তার সঙ্গে পিনকুর 'টাকা'টিও চলে গেল, ও তিন দিন পরে বোম্বাই প্রদেশের কোনো মিলের মালিকের হাতে সেই মুদ্রাটি গিয়ে পড়লো। সুনীল আর পিনকুর মুদ্রা দুটির চলাফেরার কোন পার্থক্য লক্ষ্য করছো কি। সুনীলের মুদ্রাটি দিন পনেরো ডেসকে বন্দী থেকে অর্থাৎ অকেজো হয়ে পড়ে থাকবার পর একটা পুরাতন জিনিসের দোকানে যাত্রা করলো। আবার এই দোকানে প্রায় চার দিন পড়ে থেকে তারপর মুচির হাতে গেল। মুচির কাছে আবার কিছুদিন অকেজো হয়ে পড়ে থাকবে। এপাড়া ওপাড়া করে মুদ্রাটি মাত্র তিন হাত (সুনীলের, দোকানদারের ও মুচির) ঘুরেছে, তাও আবার উনিশ দিনে। আর পিনকুর মুদ্রা চার হাত ঘুরছে, মাত্র চার দিনে। এক জনের হাত থেকে আর একজনের হাত এমনি করে ঘুরতে ঘুরতে এই মুদ্রাটি দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করলে। সুনীলের মুদ্রাটি যেন অকর্মণ্য বৃদ্ধ, দু'এক পা চলেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন বাধ্য হয়ে তাকে ক্যাস বাক্সে বা মণিব্যাগের মধ্যে বিশ্রাম করতে হয়, বিশ্রাম করে তবে আবার চলে সেই মন্থর গতিতে। পিনকুর মুদ্রাটি যেন একটি কর্মঠ যুবক—ক্লান্তি কাকে বলে সে যেন জানেনা।

সারাদিন ক্ষিপ্রগতিতে কাজ করে চলেছে, দূরদূরান্তরে ছুটে যাচ্ছে,—বর্ষার পার্বত্য নদীর মত তরতর্ করে। দুইটাইমুদ্রা, একই উপাদানে তৈরী, সরকারী আইন অনুযায়ী দুটোর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু বস্তু বা সামগ্রীর দরের উপর এই মুদ্রাটির প্রভাব এক নয়। মুদ্রা যত বার এক হাত থেকে অপর হাতে যায়, তত বার সে মুদ্রার কাজ অর্থাৎ বিনিময় কাজ সম্পাদন করে। ধরা যাক্, একটি মুদ্রা অকেজো হয়ে বাক্সে পড়ে আছে, আর একটি মুদ্রা লোকের হাত ঘুরে বার বার বিনিময় কাজের অর্থাৎ বেচাকেনার সাহায্য করেছে। একটু চিন্তা করলেই দেখতে পাবে, প্রথম অকেজো মুদ্রার তুলনায় দ্বিতীয় মুদ্রাটি চারগুণ কাজ করেছে, অর্থাৎ দ্বিতীয় মুদ্রাটি প্রথম মুদ্রারচারটির সমান। কাজেই টাকার পরিমাণ দ্বিগুণ হলে পণ্যসামগ্রীর দরের যে অবস্থা হবে, টাকার পরিমাণের কোনও বৃদ্ধি না হয়ে কেবল তার চলন-গতির দ্বিগুণ বৃদ্ধি হলেও দরের অবস্থা হবে ঠিক তাই। তোমাদের পূর্বেই বলা হয়েছে, চলতি টাকার পরিমাণের বৃদ্ধি হলে, জিনিসপত্রের দরেরও বৃদ্ধি হয় (অর্থাৎ টাকার ক্রয়শক্তি বা মূল্য কমে যায়), চলতি টাকার পরিমাণের হ্রাস হলে, জিনিস পত্রের দরেরও হ্রাস হয়ে যায় (অর্থাৎ টাকার ক্রয়শক্তি বা মূল্য বেড়ে যায়)। এবার জানতে পারলে, টাকার পরিমাণের কোন পরিবর্তন না হয়ে কেবল তার চলন-গতির পরিবর্তন হলেও, জিনিসপত্রের দরের পরিবর্তন হবে। টাকার পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি ও তার চলন-গতির হ্রাসবৃদ্ধির একই ফল। কোন মুদ্রা যে অন্য কতকগুলি মুদ্রার চেয়ে দশগুণ কাজ করতে পারে, অর্থাৎ একটি বিশেষ মুদ্রা অপর দশটি মুদ্রার সমান হতে পারে একথাটা অর্থশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ লোকগুলির কাছে 'হেঁয়ালীর' মত মনে হওয়া আশ্চর্য নয়। এসম্বন্ধে প্রথমটা তোমাদের যাই মনে হয়ে থাকনা কেন, আশা করি এখন তোমরা বুঝেছ ব্যাপারটা অসম্ভব নয়। একবার একটি মুদ্রা অল্প সময়ের মধ্যেই বহুবার হাত-ঘুরে বহু মুদ্রার কাজ করে ফেলে, কিরকম একটা বিয়োগান্ত নাটক সৃষ্টি করেছিল, সেই করুণ অথচ কৌতুকপ্রদ ঘটনাটি তোমাদের জানাচ্ছি। এই গল্পটি পড়বার পর এ সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকবে না।

কথাটা হল অনেকদিনের। তখন প্রায় সন্ধ্যা, ইস্কুল থেকে ফিরে দেখি, বাড়ীতে একটা কুরুক্ষেত্র লেগে গেছে। উঠানের এক পাশে দারোয়ান হরগোবিন্দ সিং গালে হাত দিয়ে বিরস-বদনে চুপচাপ বসে। তার হাত কয়েক দূরে পাচক লম্বোদর ঠাকুর খুব হাত পা নেড়ে উড়িয়া মিশ্রিত বাঙলা ভাষায় অনর্গল কি বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছে। শ্রোতৃবর্গ—বাড়ীর ছোটবড় প্রায় সকলেই। আমাদের দু'পুরুষের সরকার বৃদ্ধ "চক্রবর্তী" মশাই, তাদের দু'জনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, তাঁকে ভয়ানক উত্তেজিত বলে বোধ হল। তিনি তাঁর লাঠিটা সজোরে মেঝেতে বার কয়েক ঠুকে বললেন, "হামরা চোখমে ধুলা দেনা এতো সহজ নেই, সব চালাকী বার কর দেগা।" সিংজী কোন উত্তর দিলে না, একেবারে নীরব। পাচক ঠাকুর সাক্ষাৎ সাক্ষাৎ 'জগন্নাথ মহাপ্রভুর' দিব্য করে বললে, তারা একটুও মিছা কথা বলেনি, বা প্রতারণাও করেনি, কজেই ব্যাপারটাকে ভৌতিক ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। বিশেষতঃ যখন মেলাতে যেতে মাঝ রাস্তায় যে-তেঁতুল বন পড়ে, সে বনে কয়েকটি ভূত বাস করে বলে প্রসিদ্ধি আছে। 'চক্রবর্তী' মশাই ওসব বাজে কথায় কান না দিয়ে হরগোবিন্দকে লক্ষ্য করে বললেন, কি বাবা, ভক্তচূড়ামণি, এদিকে ত কপালজোড়া তেলক কেটে, সারা সকাল, দুপুর, রাত্তির "রামজী হনুমানজীর দোঁহা আওড়ে সকলকে জ্বালিয়ে মারো, এখন ত বাবা মুখে একটিও কথা নেই? সব বুজরুকী?" কথাটা খুব অতিরঞ্জিত নয়, সিং যখন তার খাটিয়ার উপর বসে, গদগদ স্বরে তুলসীদাসী রামায়ণ পড়ে, তখন বাড়ীর সকলকেই একটু সাবধানে চলাফেরা করতে হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে সে সময় কেউ তার দৃষ্টিপথে পড়লে, আর রক্ষা নেই—ভক্তশ্রেষ্ঠ সিং অযাচিতভাবে ভগবান রামচন্দ্র ও হনুমান সম্বন্ধে বহু গুপ্ততত্ত্ব তার কাছে ব্যক্ত করে ছাড়বেই। 'চক্রবর্তী' মশায়ের এই ধারালো কথাগুলোর খোঁচা আর সে সহ্য করতে পারলে না, তখনই দাঁড়িয়ে উঠে, খুব উত্তেজিত হয়ে বললে, "বাবুজী, সব বাত সাচ্চা আছে, এক বাত ভি ঝুট্ নেহি, আগার হামি ঝুট্ বল ছ ত ভগবান আজ বাত মে হামার ।" প্রাণপণ শক্তিতে চীৎকার করে কোনরকমে এই কয়েকটি কথা বলেই, সে সেখান থেকে ঝড়ের মত অদৃশ্য হল। 'চক্রবর্তী' মশাই পলায়মান হরগোবিন্দর উদ্দেশে গর্জন করে বললেন, "ভাগকে যাবি কোথায়? তোমরা কপালমে অনেক দুর্গতি হায়।"

শিকার

বন্দে আলী মিয়া

অনেক দিনের কথা—এক যুগেরও কিছু বেশী হবে। গেছলুম একজন আত্মীয়ের বাড়ীতে বেড়াতে। সময়টা বোধ হয় শীতকাল।

প্রাতঃকালে পাখীর মধুর কূজনে ঘুম ভেঙে গেল। আত্মীয় বাড়ীতে এই আমার প্রথম আগমন, সুতরাং আদর এবং অভ্যর্থনার বিন্দুমাত্র ত্রুটি হল না। আত্মীয় বাড়ীতে সম্পর্কে সবাই গুরুজন—এর মধ্যে আমার আসাটা যেন অনধিকার প্রবেশের মতো মনে হতে লাগল। কিন্তু ওরই মাঝে সমবয়সী দু'তিন জন বন্ধু জুটে গেল। ভাবলুম, বাঁচা গেল। মুখ গোমড়া করে গুরুজনদের সঙ্গে তত্ত্ব কথার আলোচনা করতে হবে না—যে ক'দিন থাকি এদের সঙ্গে হাসি গল্পে সময় কাটবে।

আমি তাদের অপ্রত্যাশিত সম্মানীয় অতিথি—বিশেষ করে শহরের লোক। সারাদিন ওরা আমাকে ঘিরে রইল এবং যতপ্রকারে পারে আমোদ প্রমোদে স্থানটিকে মুখরিত করে রাখল। রাত্রে বিদায় নেবার সময়ে তারা প্রস্তাব করে গেল পরদিন আমাকে নিয়ে ওদের গ্রামটা ঘুরে দেখাবে। আমার আত্মীয় সম্পর্কীয় বন্ধুটির একটি দোনলা বন্দুক ছিল, সে প্রস্তাব করলে ঐ সঙ্গে আমার বন্দুকটিও নেওয়া যাবে—বেড়ানো আর শিকার করা একসঙ্গে দু'কাজই হবে।

শিকারের নামে সবাই খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল।

পরদিন সকালবেলা সূর্যের মুখ দেখতে পাওয়া গেল না। রূপালী কুয়াশায় চারিদিক আচ্ছন্ন। বিশ পঁচিশ হাত দূরের গাছ পালা দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রকৃতির এই বিরুদ্ধতা আমাদের উৎসাহকে ক্ষুণ্ণ করতে পারলে না—আমরা তিন জনে বেরিয়ে পড়লুম।

মাটির চওড়া পথ গ্রামের বুক চিরে চলে গেছে। আমরা সেই পথ বেয়ে খানিকটা গিয়ে বাঁ পাশের সরু পথ ধরলুম। দু'দিকে ভাটির বন—ছোটো ছোটো কাঁটা গাছ। মাঝে মাঝে আম, পলাশ' তাল, নারিকেলের গাছ দীর্ঘ শাখা বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে। পাখীর কূজনে মুখরিত বনপথ বেয়ে আমরা এগিয়ে চললুম। কুয়াশা ধীরে ধীরে পাতলা হয়ে আসতে লাগল—পূব আকাশে রোদের খানিকটা আভাস জেগে উঠল। চারিদিকে প্রকৃতির শ্যামল সমারোহ। বাঁশ বাগানের আড়ালে কয়েকটা ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর—দূর থেকে ছবির মতো মনে হতে লাগল।

দুইটা ঘুঘু বাঁশের উঁচু ডগায় চুপ করে বসেছিল। শিকার দেখে আমাদের আনন্দ আর ধরে না। খানিকক্ষণ ফিস্‌ফাস হল। আত্মীয়টি আমাদের দু'জনকে দূরে দাঁড় করিয়ে রেখে বন্দুক নিয়ে চুপি চুপি গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে লক্ষ্য স্থির করে গুলী করলে। কিন্তু বিস্মিত হয়ে আমরা দেখলুম, ঘুঘু দুটি আমাদের নিরাশ করে চক্ষের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সত্যি সত্যি মন খারাপ হয়ে গেল। জলজ্যান্ত শিকার দুটো হাত ছাড়া হয়ে গেল। কী আর করবো—নতুন পাখীর সন্ধানে রওনা হলুম।

কুয়াশা কেটে গিয়ে পাতার ফাঁকে ফাঁকে উজ্জ্বল রোদ এসে পড়েছে। বনের পর বন ভেঙে চলেছি। পল্লীর কাছাকাছি এতবড়ো গভীর অরণ্য থাকতে পারে এখানে আসবার আগে আমার জানা ছিলো না। ঘন শাখায় পাতায় অচ্ছেদ্য বন্ধন। মাঘের শেষ সপ্তাহ—সুতরাং আমের গাছে গাছে মুকুল মঞ্জরিত হয়ে উঠেছে। অজানা ফুলে ফুলে লতা পাতা ছেয়ে গেছে—সমগ্র বনতল তার সৌরভে আকুল।

বনের পথ ছেড়ে প্রশস্ত মেটে সড়কে এসে পড়লুম। কয়েকদিন আগে অসময়ে বৃষ্টি হয়ে যাবার দরুণ স্থানে

স্থানে কাদা হয়েছে, গরুর গাড়ীর চাকার দাগ সমগ্র পথের গায়ে আঁকা। রাস্তাটি চওড়া বটে, কিন্তু দু'পাশে কোথাও বেতের ঝাড়—বিলেইআঁচড়ার কাঁটা ঝোপ—ছোটো বড়ো খেজুর গাছের সারি।

দূরে একটা বটগাছ দেখতে পাওয়া গেল। আত্মীয়ের বন্ধুটি তার হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নিয়ে বললে এবার আমার পালা। ওই গাছে বট খেতে অনেক হড়েলপাখী আসে। তোমরা আমার পিছু পিছু এসো—আমি আগে যাই। বলে দ্রুতপদে গাছটার দিকে এগিয়ে গেল।

দূরে দাঁড়িয়ে তার গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলুম। গাছের কাছাকাছি গিয়ে তাক করে বন্দুক ছুঁড়ল। গুলী লেগে হুমড়ি খেয়ে দুটো পাখী তলায় পড়ে গেল। হড়েল পাখী জীবনে সেই আমি প্রথম দেখলুম। পায়রার মতো আকৃতি—কিন্তু রক্তাভ সোণালি রঙে সমস্ত পালক আচ্ছাদিত। পাখীর সারাদেহে এত রূপ—এত সৌন্দর্যের ঐশ্বর্য—সহসা বিশ্বাস হতে চায় না। পাখীটি হাতে উঠিয়ে নিয়ে দেখতে লাগলুম, দু'চোখে তার অসহায় করুণ-দৃষ্টি, মুমূর্ষুর কাতরতা। বুকের পাশ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। সস্নেহে রক্ত মুছে দিলুম—কিন্তু সে নিতান্তই বেমানান দেখাল। মানুষের মধ্যেকার আদিম বর্বরতা সভ্যতার পোষাকের আবরণে এখনো ঢাকা আছে। সেই বর্বর হিংসা বৃত্তি চরিতার্থের জন্য নিরপরাধ প্রাণীকে খুন করতে দল বেঁধে আমরা বেরিয়েছি।

আত্মীয়টি পকেট থেকে ছুরি বের করে পাখী দুটির গলা কেটে ফেললে। খানিকক্ষণ পাখা ঝটপট করে পাখী দুটি স্থির হয়ে গেল।

বন্ধুটির মুখে আত্মপ্রসাদের হাসি এক সঙ্গে সে দুটি প্রাণী হত্যা করেছে। আগের বা যে গুলী ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল—এবারে সেটা উসুল হ গেছে। আমাদের দিকে সে কৌতুহলী দৃষ্টিতে চাইতে লাগল।

রক্ত দেখে খুনের উন্মাদনায় সকলে মেতে উঠল। পুনরায় কার্টিজ ভরে নিয়ে পাখী দুটো ডান হাতে ঝুলিয়ে নূতন শিকারের সন্ধানে বীর দর্পে চলতে আরম্ভ করলুম। পল্লীর ছোটো ছোটো ছেলে মেয়েরাও আমাদের দিকে কৌতুহলী দৃষ্টিতে চাইতে লাগলো।

গ্রামের সড়ক ছেড়ে মাঠে নামলুম। আলপথের দু' ধারে মটর কলাইএর ক্ষেত। কোনো গাছে ফুলের গুচ্ছ —কোনো গাছে ফল। যবের শীষের মাথায় মাথায় শিশিরকণা সূর্যের আলোয় ঝলমল্ করছে।

দূরে একটা বিল দেখতে পাওয়া গেল। জলের কূলে সাদা সাদা গোটা কয়েক বক মাছের ধ্যানে এক পায়ের উপরে দাঁড়িয়ে আছে। বন্দুক হাতে নিয়ে আত্মীয়টি এগিয়ে গেল। যব ক্ষেতের আড়াল থেকে গুলী ছুঁড়তেই বকগুলি 'ক' 'ক্ক' করতে করতে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমরা দৌড়ে গিয়ে দেখলুম একটা বক মাটির উপরে হুমড়ি খেয়ে ডানা ঝটপট করছে। কাছে যেতেই বকটা উঠে দৌড়তে সুরু করলে—বুঝতে পারা গেল ডানায় গুলি বিঁধেছে এজন্য উড়তে পারছে না।

বন্ধু তাড়া করে তাকে কলাই ক্ষেতের ঝোপের মধ্যে পাকড়াও করলে। প্রকৃতির শান্তিময় রাজ্যে আমাদের ন্যায় দানবের অনধিকার প্রবেশ হয়েছে। চতুর্দিকের দৃষ্টি সীমার মধ্যে একটা পাখীও নাই। বন্দুকের আওয়াজ শুনে তারা যে কোন ঝোপেঝাড়ে গা ঢাকা দিয়েছে কারো চিহ্নমাত্র নাই।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলুম—বেলা অনেক হয়েছে। ওরা বললে আর সুমুখের দিকে এগুব না, এবারে ফেরবার পথে শীকার করতে করতে যাওয়া যাবে।

ফিরে চললুম।

দূরে ছোটো কুঁড়েঘরের পাশে পাতাহীন একটা মাঝারি রকম জিগে গাছ। তারি শাখায় বসে একটা ঘুঘু গলা ফুলিয়ে মাথা দুলিয়ে 'ঘু—ঘু' 'ঘু—ঘু' করে সঙ্গীকে আহ্বান জানাচ্ছে।

এবারে আমার খুন চাপল—গুলি আমি করবো। বন্দুকটা হাতে নিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে গেলুম। ঘরের চালের নীচে আত্মগোপন করে তাক্ করে ঘোড়া টিপলুম। 'গুড়ুম' করে আওয়াজ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুঘুটা এসে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। এই আমার জীবনের প্রথম সন্ধান—লক্ষ্য অব্যর্থ হয়েছে এতে যে মনে কি আনন্দ হলো তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

ঘুঘু, বক ও হোড়েল হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে আমরা পুনরায় চলতে শুরু করলুম। পাশেই গহন জঙ্গল। সঙ্কীর্ণ পথ ধরে সেই বনের মধ্যে আমরা প্রবেশ করলুম। চারপাশে বহুকালের পুরাণো বড় বড় বট পাকুড় আপন মহিমায় বিরাজিত। বটের থলো থলো ঝুরি নেমে নূতন গাছের সৃষ্টি হয়েছে। উপরের দিকে চেয়ে বিস্ময়ে বাক্যহীন হয়ে গেলুম। মেঘলোক পানে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে গাছ গুলো ত্রিকালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঘন বনের এমন মহিমাময় গম্ভীর সৌন্দর্য আর কখনো দেখিনি। চেয়ে চেয়ে তাই দেখতে লাগলুম।

হঠাৎ একটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘট্‌লো। অদূরে ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ হলো। চমকে উঠে তিনজনে আমরা একসঙ্গে ভাঁটির গভীর জঙ্গল এবং কাঁটাঘন বেত ঝোপের দিকে চাইলুম। পুনরায় শব্দ হতেই আমাদের মনে আর সন্দেহমাত্র রইলো না। ক্ষণকাল বিলম্ব না করে আমরা পাশের পুরানো অশথ গাছের পাশে গিয়ে লুকিয়ে পড়লুম। আড়াল

থেকে দেখতে পেলুম ভাঁটি বনের পাশ থেকে বুনো শূয়োরের মাথা জেগে উঠলো—ছোটো খাটো নয়—প্রকাণ্ড মাথা।

আত্মরক্ষা তখন একমাত্র কাজ হয়ে উঠলো। এত সাধের পাখীগুলা হাত থেকে খসে পড়লো। এক ঝটকায় জুতা খুলে ফেলে অশথ গাছের ঝোলানো ঝুড়ি বেয়ে তিন জনে গাছের আধাআধি উঠেছি এমন সময় শূয়োরটা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে আমাদের দিকে ছুটে এলো।

দলের মধ্যে আমিই অপটু এবং গাছে চড়তে অনভ্যস্ত সুতরাং বিপদ প্রায় ঘটেছিল আমাকে নিয়েই। ওরা দু'জনে তিন লাফে মগডালে উঠে বসলো। আমি না পারি উঠতে—না পারি নামতে—না পারি ঝুলে থাকতে—ত্রিশঙ্কুর মতো অবস্থা আর কি। শূকরটার ভীমদর্শন কুৎসিৎ চেহারা আর গালের দু'পাশে সাদা বড়ো বড়ো দুটো দাঁত দেখে মাথা ঘুরে গেল। বন বাদাড় ভেঙে ঝড়ের বেগে আমার দিকেই ছুটে আসছে দেখে ভয়ে সর্ব শরীর অবশ হয়ে এলো। হাত দেড়েক নীচে দিয়ে শূকরটা বেরিয়ে গেল। ওরা দু'জনে গাছের উপর থেকে চীৎকার করে বলতে লাগলো উঠে আসুন—শীঘ্র উপরে উঠে আসুন।

বিপদে ধৈর্যহারা হতে নেই এই মহাজন বাক্য স্মরণ করেই হোক বা প্রাণের দায়েই হোক ঝুরি বেয়ে কোনো রকমে ডালের উপরে উঠে বসলুম। জামা কাপড় ছিঁড়েখুঁড়ে কী যে হলো সে আর বলবার নয়। শূকরটা খানিকটা দৌড়ে গিয়ে গাছের নীচে ফিরে এসে দাঁড়ালো।

আমি বললুম—গুলী করো।

আত্মীয়টি জবাব দিলে: বুলেট তো সঙ্গে নেই—কেবল পাখী মারবার ছররা রয়েছে, এতে কি আর ওর কিছু হবে?

বন্ধু তাকে বললে: দে দেখি বন্দুকটা, ঠিক ওর ব্রহ্মতালুতে লাগাতে পারলে কাজ হতে পারে। বলে হাত বাড়িয়ে বন্দুকটা নিলে।

ভয়ে ভয়ে আমি বললুম গুলীতে যদি আহত হয় তবে ভীষণ হয়ে উঠবে এ তোমাদের বলে দিচ্ছি। ভেবে চিন্তে কাজ কোরো।

বন্ধুটি আমার কথায় কর্ণপাত করলে না—বিন্দুমাত্র চিন্তাও করলেনা। বড়ো পাখী মারবার জন্য যে মোটা ছররার কার্টিজ ছিলো—বন্দুকে তাই ভরে নিয়ে মনযোগের সংগে লক্ষ্য স্থির করতে লাগলেন। আমরা শংকিত দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলুম।

'গুড়ুম' 'গুড়ুম' করে পর পর দুটি আওয়াজ। শূকরটা প্রচণ্ড চীৎকার করে একটা লাফ দিলে। মনে হলো, ভাঁটির গাছগুলা প্যাঁকাটির মতো মট্ মট্ করে ভেঙে পড়লো। খানিকটা দূর দৌড়ে গিয়ে লাটিমের মতো ঘুরতে লাগলে আর গোঁ গোঁ শব্দ করতে লাগলে।

বন্ধু পুনরায় কার্টিজ ভরে প্রস্তুত হয়ে রইল। বললে, মাথাতেই ঠিক লেগেছে—নইলে এ রকম করতো না।

শূকরটা ঘুরতে ঘুরতে মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়ে গোঙাতে লাগলো।

আত্মীয়টি দেখলে, এমন একটা দুর্লভ শীকারের গৌরব একা তার বন্ধুটিই ফাঁকি দিয়ে নিচ্ছে—সুতরাং সে তাড়াতাড়ি বন্দুকটা কেড়ে নিয়ে সেই শায়িত পশুটির উপরেই আর এক তরফা গুলীবৃষ্টি করলে।

খানিকক্ষণ পরে জন্তুটার গোঙানী আপনা আপনি থেমে গেল।

পুনরায় কার্টিজ ভরে নিয়ে ওরা দু'জনে সাহস করে নীচে নেমে গেল। আমি নামলুম না—মনে সাহস যোগাল না। কাছে গিয়ে দেখতে পেলে বেচারীর দেহে প্রাণ নাই, ওরা আনন্দে চীৎকার করে উঠলো। এইবার আমি নিরাপদ অবস্থা বুঝে ধীরে ধীরে গাছ থেকে নেমে পড়লুম।

দড়ির অভাবে লতা কেটে নিয়ে শূকরটার পিছনের পায়ে বেঁধে টানতে টানতে ওরা দু'জনে নিয়ে চলল। পাখীগুলা কুড়িয়ে নিয়ে ওদের পিছু পিছু বন হতে আমি বেরিয়ে পড়লুম।

পূর্ববঙ্গের ভূঁইয়া

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায

রাজা ঈশাখাঁর পত্র যথাকালে কেদার রায়ের হস্তগত হইল। তিনি তাহা পাঠান্তে দ্রবিতপদে ছুটিলেন পিতৃ-সমীপে। চাঁদরায় পত্রখানা দুই তিনবার পড়িলেন। অনুশোচনা একটা প্রবল ধাক্কা দিল, তথাপি তিনি বলিলেন, "না, না, ঈশার কথা মিথ্যা, আমি এত বোকা নই যে তার কথা মেনে নেবো। সে প্রতারণা করেছে, আমাকে মিথ্যা বোঝাবার চেষ্টা করেছে। প্রমাণ চাই, বিনা প্রমাণে—"

কে। প্রমাণ ত বাবা, হাতের কাছে আছে।

চাঁ। কি প্রমাণ নিয়ে এসো—আমি ধৈর্য হারিয়েছি।

কে। ঈশাভাই লিখেছেন, যে ব্যক্তি এই দস্যুদলের সর্দার তার তিনি কাণ কেটে দিয়েছেন।

চাঁ। তাতে হলো কি ?

কে। কি হ'ল তা আপনাকে এখনি বোঝাচ্ছি।

বলিয়া কেদার প্রস্থান করিলেন এবং স্বল্পকাল মধ্যে কয়েক ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। ইহারাই দুর্ঘটনার সংবাদ চাঁদ রায়কে দিয়াছিল এবং পুরস্কারস্বরূপ রাজসরকারে চাকরি পাইয়াছিল। কেদার লক্ষ্য করিয়াছিলেন, ইহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি সকল সময় মাথায় পাগড়ি বাঁধিয়া থাকিত। কেদারের ইঙ্গিত পাইবামাত্র জনৈক প্রহরী পাগড়ীধারীর উষ্ণীষ আচম্বিতে ছিনাইয়া লইল। দেখা গেল তাহার একটা কাণের অর্ধেকটা কাটা। ক্ষতস্থান আজও ভাল শুকায় নাই। কেদার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কাণের অর্ধেকটা কোথা গেল ?"

"আমাদের মধ্যে হুজুর, কিছুদিন আগে একটা ঝগড়া হয়েছিল—"

কেদার প্রহরীর পানে ফিরিয়া আদেশ করিলেন, একে বেঁধে চাবুক লাগাতে থাক, যতক্ষণ না সত্যকথা বলতে স্বীকার পায়। আর একজন যাও লোহা পুড়িয়ে আনো।

"হুজুর মারবেন না—এইবার সত্যি বলব, কিন্তু প্রাণে মারবেন না, ঘরে ছানা-পানা আছে। এ যাত্রা ক্ষমা—"

"ক্ষমা! আচ্ছা ক্ষমা করব, কিন্তু ছেড়ে দেবো না। তুই না বল্‌লেও আমি বলতে পারি তুই কি করেচিস। বাবার বিশ্বাসের জন্যে তোকে বলতে বল্‌ছি।"

দস্যু তখন বলিল, "আমার নাম কানাই। রাণী সোনামণির * শ্বশুর ঘরের নিকটে আমি কিছুদিন হতে বাস করছি।—পুরের রাজা আমাকে ধনদৌলতের লোভ দেখিয়ে পাঠিয়েছিলেন সোনামণিকে হরণ করতে। দল বেঁধে তাই গিয়েছিলাম। তিনি যখন শোয়ারি হয়ে দাস-দাসী সঙ্গে নিয়ে ব্রহ্মপুত্র চান্ করতে যাচ্ছিলেন, তখন আমরা রাণীকে ধরি। তাঁর লোকজন ছুটে পালায়, তিনি চীৎকার করতে লাগলেন, রাজা ঈশাখাঁ কোথা ছিলেন, ছুটে এসে আমাদের মারপিট করলেন, আর রাণীকে লোকজন টাকাকড়ি দিয়ে বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দিলেন।"

চাঁদ রায়। এখানে পাঠালেন না কেন ?

দস্যু। এখানেই রাজা পাঠাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু রাণী-মা বল্‌লেন, আমাকে পরপুরুষে ছুঁয়েছে, দেহ অশুদ্ধ হয়েছে, ঘরে আর ফিরব না, তীর্থি যাবো। রাজা ঈশাখাঁ তখন বল্‌লেন, 'আমি তবে আর কি করব মা, তোমার ইচ্ছেমত স্থানে যাও।' বিশ-পঁচিশ জন সোয়ার ও টাকা কড়ি সঙ্গে দিয়ে ঘোড়ায় চড়িয়ে তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন।

কে। আর তুই বেটা রাষ্ট্র করলি তিনি ধরে নিয়ে গেছেন।

দস্যু। আমার কাণ কেটে নেওয়াতে তাঁর উপর আমার যে খুব রাগ হয়েছিল।

কেদার রায়ের ইঙ্গিতে প্রহরীরা দস্যুদের লইয়া প্রস্থান করিল। চাঁদ তখন বলিলেন, "হায় হায়! এই

* কোনো পুস্তকে "স্বর্ণময়ী" দেখা যায়

ঈশাখাঁকে আমি সন্দেহ করেছিলাম। আমি অতি অধম, অতি মূর্খ।"

কেদার। এখন বৃথা অনুতাপ বাবা।

চাঁদ। নিয়ে এসো ঈশাকে, আমি তার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইব।

কেদার। তিনি এখন ত্রিপুরায়।

চাঁদ। তুমি সেখানেই যাও।

কেদার। আমাকে এখন যেতে হবে সেনা নিয়ে।

চাঁদ। তুমি দু'পাঁচ হাজার সেনা নিয়ে গিয়ে একা মোগলকে বাধা দিতে পারবে?

কেদার। আমি একা নই, ভাটীর সকলেই যাবে। ঈশা সেইমত ব্যবস্থা করেছেন। তিনি নিজেও যাবেন ত্রিপুরা-বাহিনী নিয়ে। ত্রিপুরার সাহায্য না পেলে আমরা মোগলকে বাধা দিতে পারব না, বোধ হয় বাধা দেওয়ার চেষ্টাও করব না—অনর্থক লোকক্ষয়।

চাঁদ। তবে আর কি করব, তুমি ঈশার দেখা পেলে তার হাতে পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ো। আর দেখো, যে মেয়েটিকে জনার্দন ধরে আনছে, তার সঙ্গে বিনোদের বিয়ে দেবো।

কেদার। সে মেয়ের উপযুক্ত বিনোদ নয়। আপনার ছেলে হ'লে সে তরওয়াল ধরতে জানে না। বিনোদরায় বংশের কলঙ্ক।

বিনোদরায় সহসা কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল, "হ্যাঁ, কলঙ্ক। তরওয়াল ধরতে জানিনে। তুমি বড় জানো কিনা। দেখুন বাবা, আমি সেই মেয়েকে বিয়ে করব, শুনিছি, সে খুব সোন্দর, আমি একদিন লুকিয়ে দেখে এসেছি।"

কেদার। দেখ্ বিনু, তুই যদি তাকে তরওয়াল খেলায় হারাতে পারিস, তবে তোর সঙ্গে তার বিয়ে হতে পারে।

বিনোদ। এই কথা। মেয়ে মানুষকে হারাতে কোন্ পুরুষ না পারে?

কেদার। তুই তবে তাকে জানিসনে। উদয় তার শিক্ষক। তাকে ধরে আনতে পাঠিয়ে বাবা যে কি ভুল করেছেন।

বিনোদ। ভুল আবার কি হ'ল? ভালই ত হয়েছে, আমার সাথে তার বিয়ে হ'বে।

কেদার। বিয়ের আগে উদয় ও ঈশা আমাদের ঘর দোর জ্বালিয়ে তোকে জ্যান্ত পুড়িয়ে ফেলবে। উদয় ও ঈশাকে ভয় করেনা ভাটিতে এমন কে আছে?

চাঁদ। তবে বিনোদ যাক সোনামনিকে আনতে।

কেদা। এখন পথ নিরাপদ নয় বাবা, একটু ধৈর্য—

চাঁদ। ধৈর্যের সঙ্গে আমার জীবন শেষ হয়ে এসেছে।

এমন সময় জনার্দনের সহকারী সৈনিক আসিয়া অভিবাদন করিল। চাঁদ জিজ্ঞাসা করিলেন, জনার্দন কই? মেয়েটি কই?

সৈনি। সেনাপতি মৃত, মেয়েটিকে আনতে পারি নি।

চাঁদ। সে কি। এত লোক গিয়েও পারলে না? তাদের কত লোক ছিল?

সৈনি। লোক কম হলে কি হয়, দুটী মেয়ে যা লড়াই করেছে তা' ভুলতে পারব না। একটা মেয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে তীর ও সড়কি মেরে আমাদের ভিতরে যাবার পথ বন্ধ করে দিয়েছিল, আমরা সেনাপতির সাহায্যে যেতে পারি নি। ভিতরে যারা আগে গিয়েছিল তাদের মারলে আর একটা মেয়ে ও উলাইলের রাজা।

চাঁদ। এ মেয়ে দুটী কে?

কেদা। একটীর নাম যশোধারা—উদয়ের বাক্‌দত্তা, আর একটীর নাম সবি বা সরমা—যশোধারার সহচরী। এই সরমা খুব সুন্দরী, কিন্তু মুখে কি একটা লাগিয়ে মুখখানাকে কুৎসিৎ করে রাখে—আমাদের সামনে বড় একটা আসে না। মনে হয় মেয়েটী খুব বড় ঘরের মেয়ে, কিন্তু কেউ তার পরিচয় জানে না। থাক্ যশোধারাকে যে আনতে পারা যায়নি ভালই হয়েছে। সীতাকে লঙ্কায় এনে—

চাঁদ নিভৃতে কেদারকে কহিলেন, তুমি পাঁচ হাজার শোয়ার নিয়ে যাও সোনামনিকে আনতে—

কেদা। বাবা, দেশ এখন বিপন্ন, এ সময় নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আত্মপরিজনের চিন্তা ত্যাগ করুন।

চাঁদ। তুমি ক্ষান্ত হও কেদার, বক্তৃতা আর ভাল লাগে না। নিজে বাচলে ত দেশ। সোনাকে না পেলে বাঁচব না।

তিনি বাঁচিলেনও না,—কয়েক মাসের মধ্যে শোকে ও অনুতাপে জ্বলিয়া মরিলেন। বিনোদ অপুত্রক অবস্থায় পিতার অনুবর্তী হইল। কেদার চিরদিন ঈশা ও উদয়ের বন্ধুরূপে মোগলের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছিল, এই গ্রন্থে তাহার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে।*

---

* পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলিতে 'খিদিরপুর' স্থানে 'খিজিরপুর' পড়িতে হইবে।

ধর্ম্মমঙ্গলের কাহিনী

অধ্যাপক—শ্রীতারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এম-এ

নানা দেশের

২৩

ধর্ম্মপালের অপদার্থ পুত্র তখন গৌড়েশ্বর। ব্যক্তিত্বহীন এই রাজাকে শিখণ্ডীর ন্যায় সম্মুখে রাখিয়া প্রধান মন্ত্রী মাহুদ্যা বা মহামদ নিজের ইচ্ছামত শাসনকার্য চালাইতেছিল। একদিন গৌড়েশ্বর হস্তীপৃষ্ঠে নগর-ভ্রমণে বাহির হইয়া দেখিলেন যে তাঁহার বিশ্বস্ত প্রজা সোম ঘোষ মন্ত্রীর চক্রান্তে কারাকদ্ধ হইয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে মুক্তি দিলেন এবং কর্ণসেনের উপর তাহাকে অজয় নদের তীরবর্তী ত্রিষষ্ঠীর গড়ের সামন্তরাজ নিযুক্ত করিলেন। সোম ঘোষ পুত্র ইছাইকে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলে কর্ণসেন মহাসমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন।

এখানে থাকিয়া ইছাই শরীর চর্চা এবং অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিলেন। যৌবনকালে ইনি যে অসীম বিক্রমের অধিকারী হইলেন তাহাতে কয়েকজন মাত্র অনুচরের সাহায্যে কর্ণসেনকে বিতাড়িত করিয়া নিজেই গড়ের মালিক হইলেন এবং ঢেকুর নামক স্থানটি সুরক্ষিত করিয়া সেখানে বসবাস করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে গৌড়েশ্বরের কর্মচারী কর আদায়ের জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি রাজস্ব প্রদানে অস্বীকার হইয়া তাহাকে দূর করিয়া দিলেন।

ইহাতে অপমানিত এবং ক্রুদ্ধ হইয়া গৌড়েশ্বর ইছাই-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। তিনি ঢেকুর আক্রমণ করিলে ইছাই-এর বিক্রম এবং কৌশলে পরাজিত হইলেন। কর্ণসেনের ছয় পুত্র এই যুদ্ধে নিহত হইল, পুত্র-বধূরা সহমরণে গেল এবং রাণী শোকাবেগে আত্মহত্যা করিলেন।

কর্ণসেন শোকে পাগলের মত হইয়া গিয়াছেন দেখিয়া গৌড়েশ্বর তাঁহার শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সহিত কর্ণসেনের বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু রঞ্জার ভ্রাতা রাজমন্ত্রী মহামদ তাহার আদরের ভগ্নীর সহিত বৃদ্ধের বিবাহ অনুমোদন করিল না। গৌড়েশ্বর রাণীর সহিত যুক্তি করিয়া মহামদকে অন্যত্র পাঠাইয়াদিলেন এবং বিবাহ সম্পন্ন করিয়া কর্ণসেনকে সামন্তরাজ নিযুক্ত করিয়া ময়না-নগরে প্রেরণ করিলেন। মহামদ ক্রুদ্ধ হইয়া ইহাদের মুখদর্শন করিবে না প্রতিজ্ঞা করিল।

কিছুদিন পরে ভ্রাতার সংবাদের জন্য ব্যাকুল হইয়া রঞ্জা বহু অনুনয়-বিনয় করিয়া কর্ণসেনকে গৌড়ে যাইতে স্বীকৃত করিলেন। কিন্তু গৌড়েশ্বরের রাজসভায় মহামদ ভগ্নিপতিকে অপমান করিল এবং ভগ্নিকে সন্তানহীনা বলিয়া বিদ্রূপ করিল। ভ্রাতার আচরণে ক্ষুব্ধা রঞ্জা পুত্র লাভের জন্য বহু ঔষধাদি ব্যবহার করিলেন, কিন্তু কিছুতেই অভীষ্ট ফল লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। শেষে রামাই পণ্ডিতের পরামর্শে ধর্মঠাকুরের প্রসাদ লাভের জন্য নানাবিধ কৃচ্ছ্র সাধন আরম্ভ করিলেন। তাঁহার ব্যাকুলতা দেখিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও কর্ণসেন সম্মতি দিলেন এবং রঞ্জা শালে ভর দিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার নিষ্ঠা ও ভক্তি দেখিয়া ধর্মঠাকুর বিশেষ প্রীত হইলেন, ধর্মের বরে রঞ্জা জীবন ফিরিয়া পাইলেন এবং যথা সময়ে লাউসেন নামক এক সুন্দর পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন।

এদিকে ভগ্নীর পুত্র-প্রসবের সংবাদে কংস-মাতুল মহামদ বিচলিত হইল এবং ভাগিনেয়কে হরণ করিবার জন্য এক চোর প্রেরণ করিল। পুত্র হারাইয়া রঞ্জা শোকাভিভূত হইলে ধর্মঠাকুর কর্পূরবিন্দু হইতে এক পুত্র সৃষ্টি করিয়া তাঁহার শোক দূর করিলেন, এই পুত্রের নাম হইল কর্পূরসেন। এদিকে ধর্মঠাকুরের নির্দেশে হনুমান চিলের রূপ ধরিয়া চোরের কবল হইতে লাউসেনকে উদ্ধার করিয়া আনিল। রঞ্জা লাউসেন ও কর্পূর ধবলসেন পুত্রদ্বয়কে লইয়া সুখে কাল কাটাইতে লাগিলেন।

ক্রমে পুত্রদ্বয়ের শিক্ষার সময় আসিলে ধর্মঠাকুর হনুমানকে পাঠাইয়া সকল প্রকার বিদ্যাতেই ইহাদের সুশিক্ষিত করিয়া তুলিলেন। একদিন দেবী পার্বতী লাউসেনের চরিত্রবল পরীক্ষা করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহাকে জয়খড়্গ পুরস্কার দিলেন। এই সময় স্বীয় বীর্য দেখাইয়া গৌড়েশ্বরের নিকট পুরস্কার লাভের ইচ্ছায় লাউসেন গৌড়ে যাইবেন স্থির করিলেন। বহু কষ্টে পিতা মাতার অনুমতি লাভ করিয়া কর্পূরের সহিত লাউসেন রওনা হইলেন, কিন্তু মহামদ সংবাদ পাইয়া তাহাদের গৌড়ে আসা নিবারণের জন্য আটজন মল্লকে পাঠাইল। মল্লগণ তাহার হাত পা ভাঙিয়া পঙ্গু করিতে

আসিলে লাউসেন অতি সহজেই তাহাদিগকে পরাজিত করেন।

গৌড়ের পথে ইহাকে নানাবিধ বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। কামদল নামক ভীষণাকার বাঘকে এবং এক অতিকায় কুমীরকে বধ করিয়া দুই ভাই জামতিতে প্রবেশ করেন। এখানকার বারুই স্ত্রীর অসৎ ষড়যন্ত্রে অসম্মত হইলে নয়ানী নামক একজন আপন পুত্রকে কূপে ফেলিয়া দিয়া বাজদ্বারে লাউসেনের নামে পুত্রহত্যার অভিযোগ করে। লাউসেন কারারুদ্ধ হইলেও ধর্মঠাকুরের কৃপায় মৃত পুত্রের মুখ দিয়া সত্য ঘটনা প্রকাশ করাইয়া মুক্তি পাইলেন। গোলাহাট নামক স্ত্রীরাজ্যের দুষ্টবুদ্ধি স্ত্রীগণের রাণী সুরিক্ষার হস্তে লাঞ্ছিত হইয়া ধর্মঠাকুরের কৃপায় লাউসেন তাহার সকল হেঁয়ালীর উত্তর দিলেন এবং শেষে হনুমানের সহায়তায় তাহাকে অপমান করিলেন।

এই ভাবে গৌড়ে পৌঁছাইয়াও লাউসেন নিস্তার পাইলেন না। মহামদের চক্রান্তে চৌর্যাপরাধে তাহার কারাবাস হইল। কিন্তু এখানেও ধর্মঠাকুরের কৃপায় যুদ্ধে রাজহস্তীকে বধ এবং পুনরায় জীবন দান করিয়া মুক্তিলাভ করেন। মহামদের চক্রান্ত ধরা পড়িয়া যায়। শেষে গৌড়েশ্বরকে বৃক্ষধ্বংস এবং পুনর্জীবন দেখাইয়া আপন পরিচয় জ্ঞাপন করেন। গৌড়েশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে অশ্বশালা হইতে একটি অশ্ব বাছিয়া লইতে বলিলে তিনি ইন্দ্রের পক্ষীরাজটিকে চিনিতে পারিয়া গ্রহণ করেন এবং ময়না তালুক পাইয়া ইহারা দেশে ফিরিলেন। পথে কালুডোম, তাহার স্ত্রী লখ্যা এবং তাহাদের পুত্র পরিজন-দিগের সহিত পরিচয় হইল; লাউসেনের অনুরোধে তাহারা ময়নায় বসবাস স্থাপন করিল।

লাউসেন গৌড় হইতে ফিরিয়া গেলে মহামদ তাহাকে নূতন বিপদের মধ্যে ফেলিয়া ধ্বংস সাধনের ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। তাহারই প্ররোচনায় গৌড়েশ্বর কামরূপের রাজাকে দমন করিয়া কর আদায়ের জন্য লাউসেনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। লাউসেনের জয়লাভ নিশ্চিত করিবার জন্য ধর্মঠাকুর হনুমানকে দিয়া গৌড়েশ্বরের মাতার নিকট হইতে জপমালা ও জয় কাটারি আনাইয়া দিলেন। ইহাদের সাহায্যে লাউসেন অতি সহজেই ব্রহ্মপুত্র অতিক্রম করেন এবং কামরূপের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে মন্দির হইতে দূর করিয়া কালুডোমের সহায়তায় অতি সহজেই কামরূপ জয় করিলেন। কামরূপের রাজা লাউসেনের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া কন্যা কলিঙ্গার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। লাউসেন ধর্মঠাকুরের কৃপায় মৃত সৈন্যগণকে প্রাণদান করিয়া গৌড়ে আসেন। গৌড় হইতে গৃহে ফিরিবার পথে মঙ্গলকোটের রাজা গজপতির কন্যা অমলা এবং বর্ধমানের রাজা কালিদাসের কন্যা বিমলাকে বিবাহ করেন।

ইহার কিছুদিন পরে বৃদ্ধ গৌড়েশ্বর সিমুলের রাজা হরিপালের সুন্দরী কন্যা কানড়াকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু কন্যাপক্ষ এই প্রস্তাবে অসম্মত হইলে গৌড়েশ্বর সসৈন্যে সিমুল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কানড়া, দেবীর অনুগৃহীতা উপাসিকা, তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য দেবী এক লৌহ গণ্ডার নির্মান করাইয়া বলিলেন যে, যে ইহার মুণ্ডচ্ছেদ করিতে পারিবে সে-ই কানড়াকে লাভ করিবে। গৌড়েশ্বর এবং মহামদ অকৃতকার্য হইলেন। তখন মহামদের পরামর্শে লাউসেনকে আনান হইল। লাউসেন ধর্মঠাকুরের কৃপায় কৃতকার্য হইলে গৌড়েশ্বর তাহাকে অন্যত্র পাঠাইয়া কন্যালাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি সিমুল আক্রমণ করিলে কানড়া ও তাঁহার দাসী ধুমসী যুদ্ধে নামিলেন এবং দেবীর কৃপায় গৌড়েশ্বরকে পরাজিত করিলেন। ইতিমধ্যে লাউসেন আসিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলে দেবীর কৃপায় কানড়া তাহাকে চিনিলেন এবং উভয়ের বিবাহ হইলে তাঁহারা ময়নায় ফিরিয়া গেলেন।

গৌড়েশ্বর ক্রোধান্বিত হইয়া রাজধানীতে ফিরিলেন এবং লাউসেনকে অপমানিত করিবার জন্য তাহাকে ঢেকুরে ইছাই ঘোষকে দমন করিতে পাঠাইলেন। লাউসেন ও কালুডোম অজয়ের তীরে উপস্থিত হইয়া লোহাটা সর্দারকে বধ করিলেন এবং তাহার কাটামুণ্ড গৌড়ে পাঠাইলেন। মুণ্ডটিকে মহামদ লাউসেনের মুখের মত করিয়া ময়নায় পাঠাইল। লাউসেনের মৃত্যু হইয়াছে মনে করিয়া সকলে হাহাকার করিতে লাগিল, তাঁহার চারি পত্নী সেই মুণ্ডের সহিত অগ্নিতে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ধর্মের নির্দেশে হনুমান চিলরূপে সেই মুণ্ড ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল এবং কলিঙ্গার নিকট প্রকৃত ঘটনা জানাইয়া সকলকে শান্ত করিল।

লাউসেন অজয় নদ পার হইতে গিয়া বন্দী হইলেন। তাঁহার অনুচরগণ জলে ঝাঁপ দিলে ধর্মঠাকুর অজয়ের জল হাঁটুভর করিলেন এবং সকলকে উদ্ধার করিলেন। অজয়ের অপর তীরে লাউসেনের সহিত ইছাই-এর যুদ্ধ বাধিল। ইছাই দেবীর অনুগৃহীত ভক্ত, তাই লাউসেন যতবার তাহার মাথা কাটিয়া দেন, ততবারই তাহার মাথা গজাইয়া উঠে। দেবী ইছাইকে বর দিলেন যে, সে লাউসেনের প্রাণ বধ করিবে; ধর্ম মায়া-লাউসেন নির্মাণ করাইয়া দিলেন। এদিকে দেবতারা ষড়যন্ত্র করিয়া দেবীকে মহেশের কাছে লইয়া গেলেন, ইছাইএর উপর তাঁহার দৃষ্টি না থাকাতে লাউসেন তাহার মুণ্ড কাটিয়া

ফেলিলেন এবং বিষ্ণু তাড়াতাড়ি সেই মুণ্ডকে মুক্তি দিলেন। কাজেই দেবী আব ইছাইকে পুনর্জীবন দান কবিতে পারিলেন না। সোমঘোষ গৌড়েশ্বরের বশ্যতা স্বীকার করিল। লাউসেন গৌড় হইয়া ময়নায় ফিরিলেন।

লাউসেনেব চিত্রসেন নামে এক পুত্র জন্মিল এবং তিনি সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। এদিকে মহামদেব অনাচাবেব ফলে গৌড়ে বর্ষা ও প্লাবন আবম্ভ হইল, কিন্তু লাউসেন গিয়া তাহা প্রশমিত কবিলেন।

এবাব লাউসেনকে পশ্চিমে সূর্যোদয় কবাইতে বলা হইল। তিনি অকৃতকার্য হইলে তাঁহাব পিতামাতাকে বধ করা হইবে বলিয়া গৌড়ে বন্দী করিয়া বাখা হইল। লাউসেন শাঙ্কুলাকে সঙ্গে লইয়া নৌকাযোগে হাকন্দ গিয়া ধর্মঠাকুবের পূজা কবিতে লাগিলেন।

এদিকে লাউসেনের অনুপস্থিতির সুযোগে মহামদ ময়না অধিকাব করিবার জন্য সসৈন্যে যাত্রা করিল। কালুকে লোভ দেখাইয়া বশীভূত করিয়া মহামদ মন্ত্রবলে সকলকে নিদ্রিত কবিয়া ময়না অধিকাব কবিতে উদ্যত হইলে লখ্যা একাই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। একে একে তাহাব পুত্রগণ নিহত হইলে সে কালুকে উত্তেজিত করিয়া যুদ্ধে পাঠাইল। কালু নিহত হইলে কলিঙ্গা যুদ্ধে গেলেন। তিনি নিহত হইলে কানড়া এবং ধুমসী যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া মহামদকে পবাজিত করিলেন।

এদিকে লাউসেন কঠোরভাবে ধর্মপূজা করিতেছেন। মহা বিষ্ণা জপ কবিতে করিতে শবীরের মাংস কাটিয়া হোম করিতেছেন। কিন্তু ধর্ম প্রসন্ন হইলেননা দেখিয়া শাঙ্কুলার পরামর্শে লাউসেন নিজ মস্তক কাটিয়া অগ্নিতে দিলেন। তখন ধর্ম প্রসন্ন হইয়া তাঁহাব জীবন দান করিলেন এবং পশ্চিমে সূর্যোদয় কবাইলেন। লাউসেন হরিহর বাইতিকে সাক্ষী বাখিয়া গৌড়ে আসিলেন।

মহমদ প্রলোভন দেখাইয়া হরিহরকে বশীভূত কবাব চেষ্টা কবিল, কিন্তু ধর্মের ভয়ে হরিহব বাজ সভায় সত্য সাক্ষ্যই দিল। মাতা পিতা ও ভ্রাতার সহিত লাউসেন দেশে ফিরিলেন। ধর্মের কৃপায় কলিঙ্গা, কালু, প্রভৃতি জীবন পাইল।

এদিকে মহামদ চুবিব অপবাদে বাইতিকে শূলে দিল। কিন্তু ধর্মেব কৃপায় বাইতি সশবীবে স্বর্গে গেল। মহামদেব অশেষ পাপেব জন্য তাহাব কুষ্ঠ হইল। লাউসেন ধর্মেব কৃপায় তাহাব বোগ সাবাইয়া দিল, কিন্তু তাহাব দুষ্কর্মেব জন্য মুখে একটি চিহ্ন বহিয়া গেল।

এইভাবে মর্ত্যে ধর্মঠাকুবেব পূজা প্রচার কবিয়া লাউসেন সপরিবাবে স্বর্গে গেলেন। চিত্রসেন ময়নায় বাজত্ব কবিতে লাগিলেন।

টিকিট-সংগ্রহ সমস্যা

শ্রীমান অরুণলাল মুখোপাধ্যায

আমাব দাদা টিকিট জমান। বেলের নয়—ডাকের। নানা বকম টিকিট তিনি জমিয়েছেন। টিকিট দেখিয়ে অনেক রকম বক্তৃতা তিনি দেন, কত নূতন নূতন কথা আমাদের শুনান। টিকিটে যদি একটা কাঙ্গারুব ছবি থাকে তিনি অমনি অষ্ট্রেলিয়াব ইতিহাস আরম্ভ করেন। স্ট্যাম্পের খাতার পাতা খুলে আফ্রিকাব আমেরিকাব আদিম নিবাসীদেব পরিচয় দেন। যদি টিকিট থেকেই ইতিহাস জানা যায়, তা হলে আর ইতিহাস কিনে গুরুজনেব পয়সা নষ্ট করবাব দরকাব কি? এ বিষয়ে আমি দাদাব দৃষ্টি আকর্ষণ কবে টিকিট জমাতে শুরু কবলাম। কিন্তু যখন উপদেশ পেলাম ভৌগোলিক টিপ্পনী সহ বর্ণানুক্রমে সূচী তৈয়ার করতে হবে এবং প্রত্যেক টিকিটখানির একটু করে পরিচয় নীচে নীচে লিখতে। তখনই খেয়ালের খাদ শুখিয়ে মরুভূমিতে পরিণত হল।

প্রথম কথা কিন্তু টিকিট সংগ্রহ। আমাদেব চেষ্টায় হতে পারে বৃটিশ ভাবতেব অধুনা প্রচলিত টিকিট সংগ্রহ। এই হিসাবে প্রাচীনতম টিকিট হল এক পয়সা মূল্যের "কুইন ভিক্টোবিয়া" ছবি আঁকা টিকিট। কিন্তু এতে হবে কি? একা ভাবতেই অতগুলি করদ বাজ্য আছে, তার মধ্যেই কত পার্থক্য। অনেকেবই নিজ নিজ টিকিট আছে। কিন্তু এমন করদ রাজ্য কতগুলি আছে তা আমাব জানা নাই, দাদাও তার তালিকা দেবেন না, অথচ সেই সব রাজ্যের টিকিট তাঁব চাই-ই। দাদা গম্ভীর লোক, প্রশ্ন করে বে-আদবী করার ভরসা আমাব নেই। কাজেই আমার অনুরোধ পাঠশালার বিনিময় সঙ্ঘের পরিচালক একটা সহজসাধ্য উপায় বলে দেবেন। বৈদেশিক ভাষা সম্বন্ধে আমি নিরীহ। কাজেই হায়দ্রাবাদের টিকিট খানি আমি যে আফগানিস্থানের পৃষ্ঠায় রাখব না এমন ভরসা কই। টিকিট সংগ্রহ করতে কি পৃথিবীর যাবতীয় ভাষা শিক্ষা করতে হবে?

টিকিট-সংগ্রাহকগণ টিকিট সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন কিন্তু কখনও কেউ বলেছেন কি না জানি না যে টিকেটের পাশের বিঁধগুলির সংখ্যা কত এবং সেই সংখ্যা হিসাবে ডাক টিকিটের কোন পার্থক্য হয় কিনা? চলতি এক আনার টিকিটে বিঁধ বা বেধের সংখ্যা ৬০। আমার গণনায় ভুল আছে কি না সেটা কন্যামহল ক্রুশ কাঠির সাহায্যে বলতে পারেন। ইংলণ্ডের ½ পেনীর টিকিটে আছে ৬০ টা। কিন্তু আমাদের দেশে ১৲ টাকার টিকিটে আছে ৮৬ টা। ঠিক সেই মাপের টিকিট অন্য দেশে আছে কি না আমার জানা নাই। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে সংখ্যা সমান নয়। পাঠকের অবগতির জন্য আমি এইটুকু বলতে পারি যে টিকিটের মাপ সমান হলেও ভিন্ন ভিন্ন দেশের টিকিটের বিঁধের সংখ্যা সমান নয়—কম বেশী হয়। যেমন আমাদের দেশের এক আনার টিকিটের বিঁধের সংখ্যা ৬০ অথচ জার্মানীর সমান মাপের টিকিটের বিঁধ সংখ্যা ৬৪, এই এই রকম আমাদের ১৲ টাকার বেধ সংখ্যা ৮৬, অথচ একই সময়ের কেডার (মালয়ের) টিকিটের বিঁধ ৭৪ টা। আর আমাদের চারি আনার ও ইটালীর সমান মাপের টিকিটের বিঁধ সংখ্যার তফাৎ হল ২, একটা ৮৮ অপরটা ৯০। সুতরাং এ থেকে বুঝা যায় যে, সব দেশে এক মাপের বিঁধ যন্ত্র ব্যবহার হয় না। এই বিঁধের সংখ্যা নিরূপণ করতে যান্ত্রিকদের কোন বিশেষ ভাববার কথা আছে কি না বা অন্য কারণে বিঁধের সংখ্যা কমবেশি নিরূপিত হয় সেটাও ভূগোল, ইতিহাসের সঙ্গে জানা দরকার, কেন না যান্ত্রিক যদি ইচ্ছা মত বিঁধের সংখ্যা ধার্য করেন, তাহলে বলতে হবে বিভিন্ন দেশের যান্ত্রিকদের ধ্যান ধারণা বা অপর কথায় মানসিক প্রবৃত্তি বিভিন্ন রকমের, যে রকমটা পড়ে মনস্তত্ত্বের কোঠায়। এ বিষয় সংগ্রাহকগণ যেন লক্ষ্য রাখেন। ডাক টিকিটের সাহিত্য গড়ে উঠছে। আশা করি মনস্তত্ত্ববিদেরাও এক অধ্যায় লিখে দিয়ে এ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করবেন।

অহিংসনীতি

শ্রীসিদ্ধেশ্বর মিত্র

(গ্রাহক নং ২১১৯)

অহিংসা জীবের স্বাভাবিক ধর্ম নহে। জীব যখন প্রথম জন্মগ্রহণ করে তখন তাহার ভিতর থাকে হিংসাবৃত্তি। অহিংসা লইয়া কেউ প্রথম পৃথিবীতে আসেনা। শিশুর মাতৃস্তন্যপান কি হিংসার নিদর্শন নহে? জীবদেহের অভ্যন্তরেও সদা সর্বদা হিংসাই চলিতেছে। প্রতি কণিকা অন্যটীর সহিত যুদ্ধে লিপ্ত। তারপর মানবজীবনে বহু বাধা বিঘ্ন আসে, যা এড়াইতে হইলে হিংসারই আশ্রয় লইতে হয়। অহিংসার বাণী সে বিঘ্ন দূর করিতে অসমর্থ।

* হিংসা বলিতে সাধারণতঃ আমরা বুঝি কোনও প্রাণীর উপর অত্যাচার করা। পৃথিবীর কোনও কোনও ধর্মসম্প্রদায় নিজেদের অহিংসাধর্মী মনে করেন। তাঁহারা মাছ মাংস খান না বটে কিন্তু দৈনিক যে খাদ্য গ্রহণ করেন যেমন ভাত, জল, আলু প্রভৃতি তাহাও কি প্রাণী দেহের অংশ নয়? গাছ পালারও জীবন আছে, তবে সে নির্বাক জীবন। আঘাত বুঝিতে পারে কিন্তু বোঝাইতে পারে না। তাহাদের দেহের অংশ নিলেও হিংসা করাই হয়। জীব হত্যার ভয়ে এই তথাকথিত অহিংস ধর্মীরা ডিম খান না, কিন্তু প্রতিটি ধানটিও ধান-গাছের ডিম। অথচ হিংসার ভয়ে যদি আমরা উদ্ভিদ জগৎ বর্জন করি, তবে আমাদের অস্তিত্ব জগৎ হইতে লুপ্ত হইয়া যাইবে। সুতরাং, আমরা বলিতে পারি, যে হিংসার উপর ভিত্তি করিয়াই মানব তথা জীব জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে।

যে সকল মনীষী বিশ্ব মানবের হিতকল্পে অহিংসার বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রথমে সফলকাম হইলেও পরিণামে তাঁহাদের ধর্মের অনুশাসন ব্যর্থ হইয়াছে। বুদ্ধদেব যে ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন তার মূল বাণী "হিংসা করিও না" কিন্তু সেই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী জাপান ও চীনের রক্ত পিপাসু মূর্তি দেখিলে আমাদের স্বতঃই মনে হয়, বুদ্ধের উপদেশ আজ বিফল হইয়াছে। যে মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন "যদি তোমার এক গালে কেউ চড় মারে তুমি অন্য গাল বাড়াইয়া দিও" সেই খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীরা আজ পরস্পর পরস্পরকে নৃশংসভাবে হত্যা করিতেছে, এই দৃশ্য দেখিয়া মনে হয়, তাঁর মহান আত্মত্যাগ আজ বিফল হইয়া গিয়াছে।

* কোনও ধর্মসম্প্রদায়কে বা ব্যক্তিকে আঘাত দিবার জন্য ইহা লিখিত হয় নাই।

এই রকম কত মহামানবের সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনা বিফল হইয়া গিয়াছে সন্ধান করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে।

অহিংসার দ্বারা বহিশত্রুর আক্রমণ হইতে স্বদেশ রক্ষা করা একেবারেই সম্ভব নয়। ইহার প্রমাণ আমরা ইতিহাস খুঁজিলেই পাইব। মহাত্মা অশোক ভারতবর্ষের অন্যতম জ্যোতিষ্ক। বুদ্ধদেবের অহিংসাধর্ম এত ব্যাপক ভাবে প্রচারিত হইতনা, যদি অশোক সাহায্য না করিতেন। আজ চীন, জাপান, শ্যাম যে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহা অশোকেরই প্রচারের ফলে। কিন্তু আগেই বলিয়াছি হিংসার উপর ভিত্তি করিয়াই মানবের জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে। তাই যখন অশোক অন্ধ কুণালকে দেখিতে পাইলেন, যখন জানিতে পারিলেন তার অন্ধতার জন্য কে দায়ী, তখন পরম অহিংস, অহিংসার প্রচারক অশোকও আদেশ দিলেন তিষ্যরক্ষিতাকে নৃশংস ভাবে হত্যা করিতে। ইহাতেই বুঝিতে পারি যে হিংসাকে তাড়াইতে চাহিলেও তাহা সহজে যায়না। তাহার পর যখন অশোকের মৃত্যু হইল তখন তাঁহার অহিংস সাম্রাজ্য, বিরাট মৌর্যসাম্রাজ্য তাসের ঘরের মতই ভাঙ্গিয়া গেল। অহিংসাধর্মে দীক্ষিত প্রজাসাধারণ ও সৈন্যগণ রাজ্যরক্ষা করিতে পারিল না। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে অহিংসা ধর্ম পালনের দ্বারা বহিশত্রুর আক্রমণ হইতে স্বদেশ রক্ষা করা যায় না।

উচ্চাশা অহিংসা ধর্মপালনের পথে প্রধান অন্তরায়। আজ হিটলারের উচ্চাশায় ইয়োরোপে অগ্নি জ্বলিয়াছে, জাপানের উচ্চাশার-অনলে চীন অর্দ্ধদগ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। অহিংসার ধর্মপালনের দ্বারা জগতের শান্তি রক্ষা হয়ত সম্ভব হইত যদি সকলেই নিজেরটা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিত। কিন্তু জগতে প্রত্যেকেই বড় হইতে চায় এবং এই বড় হইবার পথে একজনের সঙ্গে অপরজনের সংঘাত লাগিয়াই থাকে অর্থাৎ একজন অপরকে হিংসা করে। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে যতদিন উচ্চাশা থাকিবে ততদিন অহিংসার দ্বারা জগতের শান্তি রক্ষা করা সম্ভব হইবে না।

ভারতবর্ষ অহিংসার উৎস হইলেও অহিংসার উপাসক নহে। আমরা দেখিতে পাই যুগে যুগে বহু মহাপুরুষ এই ভারতবর্ষে অহিংসাধর্ম প্রচার করিয়াছেন। শিশু যেমন নূতন খেলনা পাইলে কিছুদিন সেটাকে লইয়া মাতিয়া থাকে ভারতবর্ষও তেমনি এই সব ধর্মকে লইয়া কিছুদিন মাতিয়াছে, কিন্তু পরে শিশুর পরিত্যক্ত পুরাতন খেলনার মতই তাহা পরিত্যাগ করিয়াছে। আজ সমগ্র জগতে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীর সংখ্যা পনর কোটী, কিন্তু ভারতবর্ষে বৌদ্ধ আছে মাত্র এক কোটী সাতাশ লক্ষ। ভারতের জনসংখ্যার তুলনায় এ কিছুই নয়। জৈনধর্ম ভারতে উপযুক্ত স্থান পায় নাই, মাত্র মুষ্টিমেয় লোক এই ধর্মের অনুগামী। ভারতের কবি বলিয়াছেন—

"অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে।"

ভারতবর্ষকে মনে রাখিতে হইবে তাহাদের আদর্শ শ্রীকৃষ্ণ ও তাহাদের আদর্শ গীতা।

ব্যর্থ পূজা

কুমারী দীপালি সরকার

ভেবেছিলাম সত্য হবে আপন আমার সবার চেয়ে,
মিথ্যা ভরা এই জীবনে আসবে আলোক সত্য পেয়ে।
তাইত আমার মনের ফুলে, অর্ঘ দিলাম তোমায় তুলে,
আমার আশার ধূপের ধোঁয়ায় তোমার আকাশ ছিলাম ছেয়ে
ব্যর্থ হ'ল ব্যথার পূজা, মিলিয়ে গেল ধূপের ধোঁয়া,
বুকের আশা রইল বুকে দেখনু তোমায় যায় না ছোঁয়া।
জল ভরা ঐ নদীর তীরে, জল না পেয়ে এলাম ফিরে,
কাটবে কি মো'র জীবন প্রভু ব্যর্থ পূজার গানটি গেয়ে।
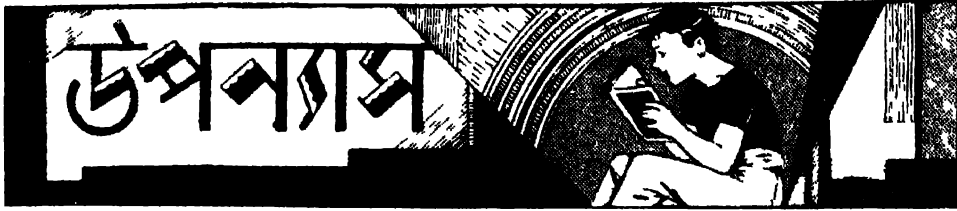
পরাগ ও রেণু

শ্রীনবেন্দ্র দেব

(লক্ষ্মীপুরের ভাবী জমিদার)

সেইদিন সন্ধ্যের সময় পরাগদের বাড়ীর বৈঠকখানায় বসে দেওয়ানজী মহাশয়ের সঙ্গে পরাগের গভীর আলোচনা চলছিল।

দেওয়ানজী মহাশয় বললেন তোমাদের দৌড়বাজী যা দেখলাম তাতে মনে হয় তোমাদের স্কুলের কেউ তোমাকে হারাতে পারবে না।

পরাগ বললে, না দেওয়ানজী মশাই, কেশব আমার চেয়েও জোরে ছুটতে পারে কিন্তু, ও, বাজিতে হারে। তার কারণ, আমার পা দুটো ওর চেয়ে একটু বেশী লম্বা কিনা। তাই শেষ পর্যন্ত আমিই জিতে যাই।

দেওয়ানজী হেসে বললেন—বটে?

পরাগ ঘাড় নেড়ে বললে—হ্যাঁ। কিন্তু, ও বেচারি হেরে গেলে এমন শুকনো মুখে কাঁদ কাঁদ হয়ে তাকায় যে আমার মন কেমন করে। আমি ওকে বলি—জেতবার কথাত তোমারই ভাই, তুমি আমার চেয়ে ঢের বেশি জোরে ছুটতে পারো, কিন্তু, ভাই তোমার পা আমার মত লম্বা নয় বলেই না শেষ বরাবর আমি একটু এগিয়ে যাই। তাও কতটুকুই বা! এক বিঘৎও নয়। প্রাইজটা তোমারই পাওয়া উচিত, এটা তুমিই নাও। তখন তার মুখে হাসি ফোটে। কেউ খুশি হলে আমার ভারি ভাল লাগে দেওয়ানজী মশাই।

—বটে। তবেত ভাল। কিন্তু, তুমি যখন লক্ষ্মীপুরের জমিদার হবে, তখনও কি কেউ খুশি হলে তোমার এই রকমই ভাল লাগবে?

পরাগ বললে—তাত জানিনি। আমি যে জমিদার কখনো দেখিনি। আচ্ছা দেওয়ানজী মশাই, জমিদার বুঝি খুব দুষ্টু হয়?

দেওয়ানজী বললেন—সবাই দুষ্টু হয় না। কেউ ভাল হয়, কেউ দুষ্টু হয়। যেমন ধরো তোমাদের স্কুলের ছেলেরা, তারা তো আর সবাই দুষ্টু ছেলে নয়, কেউ কেউ লক্ষ্মী ছেলেও ত আছে?

"—হ্যাঁ, অনেক লক্ষ্মী ছেলে আছে। কেশব তো খুবই লক্ষ্মী ছেলে। আমাকে যদি জমিদার করেন দেওয়ানজী মশাই, খুব ভাল জমিদার করে দেবেন, দুষ্টু জমিদার কোরবেন না। আচ্ছা, জমিদার কি করে হয় দেওয়ানজী মশাই?

—যার পৈতৃক বা নিজের বিবিধ অনেক জমি জমা থাকে, অনেক দিন ধরে পুরুষানুক্রমে তার প্রজারা সেই জমিতে চাষ-বাস করে আর তাকে খাজনা দেয়, সে হয় সেই জায়গার জমিদার। যেমন লক্ষ্মীপুর অঞ্চলে তোমার পিতামহ অনেক জমি-জমা গ্রাম ও পরগণার মালিক। তাঁর অনেক প্রজা আছে। বছরে বছরে তারা সকলে মিলে তোমার দাদুকে যে খাজনা দেয় তা লাখ টাকারও বেশি। তোমার দাদু সে টাকা সব খরচ করে ফুরুতে পারেন না, তাই অনেক টাকা জমে গেছে তাঁর তোসাখানায়। গবর্নমেণ্ট তাঁকে রাজা উপাধি দিয়েছেন, কারণ তিনি গতবার যুদ্ধের সময় গবর্নমেণ্টকে অনেক টাকা দিয়ে যুদ্ধে সাহায্য করেছিলেন।

—দাদু যুদ্ধ করতে পারে?

দেওয়ানজী মশাই পরাগের এ প্রশ্নের কি উত্তর দেবেন ভেবে পেলেন না। যুদ্ধ? সেত বাঙালী অনেকদিন ভুলে গেছে। সে চাঁদরায়, কেদার রায়, রাজাগণেশ, সীতারাম, প্রতাপাদিত্য, মহারাজ দিব্য বাঙলার বুক থেকে লোপ পেয়েছে। যুদ্ধ সে ভুলে গেছে। তার জমিদারির দখল নিয়ে, হাটের স্বত্ব সাব্যস্ত করতে, চরের উপর অধিকার বিস্তারে লাঠিয়ালদের সাহায্যে, পাইক বরকন্দাজদের নিয়ে দাঙ্গা হাঙ্গামা মাথা ফাটাফাটি এখনও তারা করে বটে। তারপর চালায় উভয় পক্ষই পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রবল মামলা মোকর্দমা। এ শিশু সে হিংস্র নৃশংসতা—সে মিথ্যা জাল জুয়াচুরির মর্ম বুঝবে কেমন করে? ক্ষণকাল চুপ করে থেকে দেওয়ানজী মশাই বললেন তোমার দাদুর বড় বড় বন্দুক আছে, একটা রিভলভার আছে। অনেক ঢাল, তরওয়াল, সড়কি, বল্লম :—

পরাগ উৎসাহিত হয়ে বলে উঠল,—ভীমের গদা আছে? অর্জুনের গাণ্ডীব ধনু?

দেওয়ানজী মশাই হেসে বললেন—না, এখন যে শুধু অগ্নিবাণ নিয়ে যুদ্ধ। কামান, বন্দুক, মেশিনগান, রাইফেল। প্রাচীন কালের সে তীরধনুক আর গদার যুগ চ'লে গেছে।

পরাগ সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে বললে—হ্যাঁ, কাবুও সেদিন ঐ কথা বললেন। মহাভারতের সময় এদেশে হাতী ঘোড়া রথে চড়ে যুদ্ধ হ'ত। কিন্তু এখন বিলাতে মোটর সাইকেল, ট্যাঙ্ক, এয়ারোপ্লেন নিয়ে যুদ্ধ হয়। মহাভারতের যুগে জলযুদ্ধ ছিল না, আকাশ যুদ্ধ ছিল না। এখন কিন্তু সমুদ্রে আকাশে যুদ্ধ হয়। ব্যাটলশিপ, ক্রুইজার, সাবমেরীণ, ডেস্ট্রয়ার কত রকমের যুদ্ধ জাহাজ আছে। ফাইটার প্লেন, বম্বার, ডাইভ বম্বার কতরকম রণবিমান তৈরি হয়েছে।

—তুমি তো সব জান দেখছি।

—কাবু যে রোজ আমাকে খবরের কাগজ পড়ে শোনায়। তাছাড়া আবার 'ভোরের আলো' মাসিকপত্র পড়ে আমি অনেক খবর জানতে পারি।

—বেশ বেশ। আচ্ছা, তুমি যখন জমিদার হবে, তখন তুমি কি করবে পরাগবাবু?

—আমি?

পরাগ ভ্রূকুঞ্চিত করে খানিকটা ভেবে বললে—আমি রাজা হতেও চাই না, জমিদার হতেও চাই না।

—তবে কি হতে চা'ও?

—আমি আগে দোকানদার হব ঠিক করেছিলুম, কিন্তু, কাবু বলছেন দোকানদার হওয়া ঠিক নয়। একদামে জিনিস কিনে আর একদামে লোককে বেচা অন্যায়, ওতে লোককে ঠকানো হয়। আমি চাষবাস করবো। কাবুও দোকান বেচে ফেলে চাষবাস করবেন বলেছেন। উনি বলেন প্রত্যেক মানুষের খেটে খাওয়া উচিত। বাড়ীতে বসে থেকে পরের পয়সায় যারা বাবুগিরি করে তারা মানুষের শত্রু। তাই দেশের রাজা মহারাজা জমীদারদের কাবু মোটেই বড় মানুষ বলে স্বীকার করেন না। বলেন, ওরা রক্তশোষক জীব, যেমন ছারপোকা, জোঁক, ভ্যাম্পায়ার বাদুড়।

দেওয়ানজী মশাই চমকে উঠলেন। মনে মনে স্থির করলেন, কাবুটির কাছ থেকে পরাগকে যত শীঘ্র সরিয়ে ফেলতে পারা যায় ততই মঙ্গল। লোকটা রাশিয়ার সোভিয়েট আদর্শের অনুরাগী বলে মনে হচ্ছে। তিনি এবার একটু গম্ভীর হয়েই বললেন—তোমার কাবু যাই বলুন, রাজা মহারাজা জমিদার হওয়া একটা মস্ত সুবিধার কথা, কিন্তু সেটা তিনি তোমাকে জানান নি, রাজা মহারাজা জমিদার হ'লেই যে তাকে খাটতে হবে না এমন কোনো কথা নেই। সে ইচ্ছা করলে সারাদিন খাটতে পারে। কত ভাল কাজ সে একলাই করতে পারে, যা তোমাদের দিনমজুরেরা কোনো কালে পারবেন না।

—সে কি কাজ দেওয়ানজী মশাই?

—তোমাকে ত একটু আগেই বলেছি যে প্রজারা বছর বছর জমিদারকে যে খাজনা দেয়, জমিদারের সমস্ত খরচ খরচার পরও অনেক টাকা তাঁর হাতে জমে যায়। সেই টাকাতে তিনি দেশের ও দশের অনেক উপকার করতে পারেন। লেখাপড়া শেখবার জন্য স্কুল করে দিতে পারেন। রোগীর চিকিৎসার জন্য হাঁসপাতাল করে দিতে পারেন। জল কষ্ট নিবারণের জন্য পল্লীতে পল্লীতে টিউব-ওয়েল বসাতে পারেন। বই পড়বার জন্য লাইব্রেরী করে দিতে পারেন।

পরাগ উৎসাহিত হয়ে উঠে বললে—আমি যদি অনেক টাকা পেতুম আমিও অনেক ভাল কাজ করতুম।

—কি কি ভাল কাজ করতে চাও বলো, আমি তোমার দাদুকে বলে তোমায় অনেক টাকা দেওয়াবো। দেওয়ানজী আগ্রহে তার মুখের দিকে চাইলেন। পরাগ বললে আমাদের স্কুলের ধারে যে বুড়ি ফুটপাথে বসে ফল বেচে, আহা তার একটা ছাতা পর্যন্ত নেই। বেচারা সারাদিন রোদে পোড়ে, বৃষ্টিতে ভেজে, আমার অনেক টাকা থাকলে আমি তাকে একটা ঘর তৈরি করে দিতুম, সেই ঘরে বসে সে ফল বেচতো। তাহলে আর সারা বছর রোদে জলে বুড়ো মানুষকে কষ্ট পেতে হতনা শীতকালে তার গায়ে দেবার একখানা কম্বল বা আলোয়ান নেই, জানেন? বেচারা ছেঁড়া কাঁথা গায়ে জড়িয়ে বসে হিহি করে কাঁপে। আমার টাকা থাকলে, আমি তাকে একখানা ভাল পুরু নরম কম্বল কিনে দিতুম।

দেওয়ানজী একটু কেসে গলাটা ঝেড়ে নিয়ে বললেন—বাঃ এটাত খুবই ভাল কাজ হবে। তারপর? আর কি ভাল কাজ করবে পরাগবাবু?

পরাগ উৎসাহিত হয়ে উঠে বললে—আরও অনেক কিছু ভাল কাজ করতে চাই আমি। আমার মা-মণিকে খুব ভাল ভাল' কাপড় জামা কিনে দেব, মামণি আমার জন্য মোজা বুনে দেয়, আমার শার্ট, পাঞ্জাবী, রুমাল সেলাই করে দেয়। আমি মামণিকে শেলাইয়ের কল কিনে দেব, মোজা গেঞ্জিরও একটা কল কিনে দেব, তাহলে আর মামণির কষ্ট হবে না বুনতে। আমি কাবুর সঙ্গে কত বেড়াই, আলিপুরে জুগার্ডনে যাই, চৌরঙ্গীর মিউজিয়মে যাই, গৌরিবেড়ের পরেশনাথের মন্দিরে যাই, 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল' দেখে আসি, ঢাকুরিয়ার

লেকে ঘুরে আসি, মা-মণি কিন্তু কোথাও যেতে পায় না। মা-মণি শুধু মাঝে মাঝে পালাপার্বনে ভোর বেলা উঠে মণির মাকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গাস্নান করে আসে। মা-মণিকে একখানা মোটর গাড়ী কিনে দেব, মা-মণি সেই গাড়ীতে চড়ে বেড়াতে যাবে। গঙ্গা নাইতে যাবে আর আমার ইচ্ছে আছে মাখনকে—

"মাখন আবার কে ?

দেওয়ানজী জানতে চাইলেন।

পরাগ বললে—মাখন হল আমাদের স্কুলের খাবার-ওয়ালা। খুব ভাল লোক সে। যে সব ছেলে মেয়েরা পয়সা দিতে পারেনা মাখন তাদের ধারে খাবার দেয় কিন্তু ওর একজন জুড়িদার আছে নাম কেনারাম। সে কিন্তু কাউকে এক পয়সারও খাবার ধারে দেয় না। মাখন দেয় বলে সে মাখনের সঙ্গে ঝগড়া করে। তাই কেনা-রামকে কেউ ভালবাসে না, সবাই মাখনকে ভালবাসে। আর মাখনই যত রকম নতুন নতুন খাবার তৈরি করে আনে, কেনারাম খাবার তৈরি করতে জানে না। তবে মাখনের পয়সা নেই, ঘি ময়দা চিনি এ সব কেনারাম পয়সা দিয়ে তাকে কিনে দেয় মাখন তাই নিয়ে সকাল থেকে আগুন তাতে বসে বসে খাবার তৈরি করে। কিন্তু খাবার বিক্রী করে সে বেচারা যে পয়সা পায় কেনারাম সমস্ত কেড়ে নেয়। মাখনকে সে যা দেয় তাতে মাখনের চলে না।

দেওয়ানজী বললেন—ও। তবেত মাখনের ভারি কষ্ট। তা তুমি তার জন্য কি করতে চাও পরাগবাবু ?

পরাগ খুশী হয়ে বললে—জানেন দেওয়ানজী মশাই, মাখন বলছিল সে যদি কিছু টাকা পায় তাহলে কেনারামের সম্পর্ক ছেড়ে দিয়ে নিজে একটা খাবারের দোকান করে। ছেলেরা তাকে বলেছে তোমার দোকানের মাথার উপর একখানা সাইনবোর্ডে 'কমলাটিফিনরুম' লিখে ঝুলিয়ে দিলে আমরা সবাই সেই দোকানের টিফিন খাবো। আচ্ছা, দেওয়ানজী মশাই, সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দিলে দোকানে খুব বিক্রি হয়, না ?

কি জানি দাদা, আমি পাড়াগাঁয়ের মানুষ, তোমাদের শহরের খবরত ঠিক জানিনি, হয়ত হয়, নইলে সবাই ঝোলায় কেন ?

পরাগ বললে—হ্যা হয় দেওয়ানজী মশাই, কাবুর দোকানে একটা মস্ত সাইনবোর্ড আছে, তাতে লেখা আছে—'দি কালী স্টোর্স' তাই জন্য কাবুর দোকানে বিক্রি হয়।

দেওয়ানজী মশাই এই শিশুর উদার মনটির পরিচয় পেয়ে এবং তার সরল বিশ্বাসের দৃঢ়তা দেখে খুশী হয়ে বললেন—আচ্ছা, এইবার বলত পরাগবাবু, তুমি নিজের জন্য কি করবে টাকা পেলে ?

পরাগ গম্ভীর ভাবে বললে—আমার অ-নে-ক টাকার দরকার দেওয়ানজী মশাই। প্রথমেই ধরুন মণিরমার ভাইঝী সুশীলাদিকে কিছু টাকা না দিলেই নয়, কারণ তার সাত আটটি ছেলে মেয়ে, অথচ ঠিক আমার মতই তাদের বাবা নেই। আহা, কি কষ্ট বলুনত। কে তাদের টাকা রোজগার করে এনে খাওয়াবে ? জামা কিনে দেবে ? মণির মা সামান্য মাইনে পায়, তাতে ভাইঝীর অতগুলো ছেলে মেয়ের খাওয়া পরা কুলোয় না। মামণি তাই ওদের কাপড় জামা কিনে দেন মাঝে মাঝে। হ্যাঁ, দেখুন। কাবুর কিন্তু 'রিষ্টওয়াচ' নেই। দোকানের দেওয়ালে একটা মস্ত ক্লক টাঙানো আছে শুধু। তাইত আমরা বেড়াতে গেলে কটা বেজেচে জানতে পারিনি। কাবুকে একটা খুব ভাল সোনার রিষ্টওয়াচ কিনে দেব আমি—'

এই সময় পরাগের মা উমা দেবী দেওয়ানজী মশাইয়ের জন্য চমৎকার শ্বেত পাথরের রেকাবিতে জলখাবার আর ঢাকা দেওয়া শ্বেত পাথরের গেলাসে শরবৎ নিয়ে ঘরে ঢুকল, বললে—আমার একটু দেরী হয়ে গেল, মণির মার ভাইঝী সুশীলা এসেছিল

দেয়ানজী বললেন—তার কথাইত এতক্ষণ হচ্ছিল আমাদের—

উমা বললে—তার একটি ছেলের বড় অসুখ, ডাক্তার দেখানো দরকার অথচ—

—হ্যাঁ, শুনেছি তার অবস্থা খুবই শোচনীয়। তা তুমি বৌমা তাকে বলোগে যে তোমার ছেলে পরাগবাবু এখন থেকে তাকে প্রতিমাসে দশ টাকা করে সাহায্য করবে। উপস্থিত এই নাও তাকে দু'মাসের জন্য আগাম কুড়িটাকা দিয়ে এসো—

দেওয়ানজী তাঁর পকেট থেকে কুড়িটাকার দুখানি নোট বার করে দিতেই পরাগ বললে—দিন, আমার হাতে দিন। আমি দিয়ে আসছি, বলেই সে আর অপেক্ষা না করে ছোঁ মেরে নোট দুখানা দেওয়ানজীর হাত থেকে টেনে নিয়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল—সুশীলাদি, সুশীলাদি—বলে ডাকতে ডাকতে,—দেওয়ানজীর মুখে একটা পরম পরিতৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল।

[ক্রমশঃ

বঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কনেশ্বর।
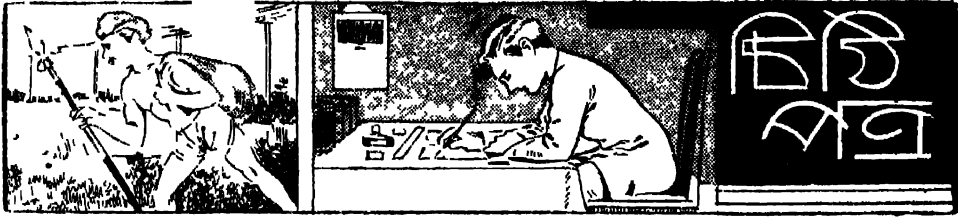
তোমার 'দিদি' গল্পটি পেয়েছি। পড়া হ'লে জানবো ছাপা হবে কিনা।

কালিকাপ্রসাদ রায়চৌধুরী, কনেশ্বর।

'পদ্মস্মৃতি' গল্পটি এত বেশি করুণ যে পাঠশালায় ছাপা অসম্ভব।

কণু ঘটক, মালদহ।

তোমার পাঠানো দশআনার টিকিটের বদলে ১৩৪৭ সালের আশ্বিন, কার্তিকের পাঠশালা পাঠান হ'ল।

অবনীভূষণ বেরা, খোলদিগরুই।

তোমার 'অবাধ্যতার পরিণাম' কবিতাটির জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু অত বড় কবিতা ছাপার পক্ষে পাঠশালার স্থানাভাব, এজন্য, বিশেষ দুঃখিত। ছোট কবিতা পাঠিও। তুমি 'প্রশ্নোত্তর' বিভাগ তুলে দেবার জন্য প্রস্তাব করেছো, অথচ তোমাদেরই তাগাদায় পাঠশালায় 'প্রশ্নোত্তর বিভাগ' খোলা হয়েছে। যদি পাঠশালার অধিকাংশ গ্রাহক গ্রাহিকা তোমার সঙ্গে একমত হয় তাহলে তুলে দিতে কোনো আপত্তি নেই, সুতরাং তোমার প্রস্তাব ভোটে দেওয়া হ'ল। 'পাঠশালায়' 'কিশোর সভা' বা 'বালক সঙ্ঘ' খোলবার জন্য একাধিক গ্রাহক ও পাঠকদের যে অনুরোধ এসেছে এবং আসছে, সে প্রস্তাব সম্বন্ধেও অধিকাংশের মতামত জানবার জন্য ভোটের ব্যবস্থা হ'ল। ভবিষ্যতে 'পাঠশালা' কেবলমাত্র তোমাদেরই কাগজ—"Boys & Girls Own Paper" হয়ে উঠবে, না—অন্যান্য পত্রিকার মত সেই মামুলি গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ নিয়ে প্রকাশিত হবে তা সম্পূর্ণ নির্ভর করবে তোমাদের এই ভোটের ফলাফলের উপর।

মণীন্দ্রমোহন মজুমদার, পুরুলিয়া।

গ্রাহক গ্রাহিকারা পরস্পরের সঙ্গে পত্রালাপে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারবে বলেই 'পত্রীমৈত্রী' বিভাগের সৃষ্টি। সুতরাং তুমি এই বিভাগের সভ্য হয়ে যার সঙ্গে খুশি পত্রালাপ করতে পারো। তোমার মতো আরও অনেকেই জানতে চেয়েছে—আমাকে তারা কি বলে ডাকবে? 'সম্পাদক মশাই' বলতে কেউ রাজি নয়। একটা সম্বন্ধ পাতাতে চায়। আমার মনে হয় যখন পরিচিত বয়োকনিষ্ঠেরা সকলেই আমাকে 'নরেনদা' বলে, তখন তোমরাও 'নরেনদা' বলেই সম্বোধন কোরো। কারণ, তোমরা সকলেই আমার পরম স্নেহাস্পদ ছোট ছোট ভাই বোনের মতো। তোমার 'পাঠাগার' প্রবন্ধটি ছাপতে পারলুম না বলে দুঃখিত। কিন্তু, এজন্য তুমি নিরুৎসাহ হয়ো না। তোমার অন্য কোনো রচনা পাঠিয়ো। তবে, রচনা যাতে খুব সংক্ষিপ্ত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবে।

প্রভাতকিরণ দে, বালী।

তোমার 'পাঠশালা' পত্রিকা খুব ভাল লেগেছে জেনে খুশী হলুম। তোমার 'প্রশ্নোত্তর' বিভাগটি বিশেষভাবে পছন্দ হয়েছে লিখেছো, কিন্তু অবনী প্রভৃতি কেউ কেউ এ বিভাগ তুলে দিতে বলছে। ভোটের ফলাফলে সেটা নির্ধারিত হবে।

প্রতিমা চাটার্জি, জব্বলপুর।

পাঠশালার প্রত্যেক বিভাগের চিঠি পৃথক কাগজে নাম ঠিকানা ও গ্রাহক নম্বর দিয়ে লেখাই নিয়ম। তবে প্রত্যেক চিঠির জন্য আলাদা খাম ব্যবহার করবার প্রয়োজন নেই। একই খামের মধ্যে বিভিন্ন বিভাগের ভিন্ন ভিন্ন চিঠি ভরে পাঠশালা অফিসের ঠিকানায় পাঠালেই চলবে। ডাকমাশুল যেন কম না হয়।

আরতি গুহ ও অমিতা অধিকারী, নবগ্রাম।

কেবলমাত্র প্রশ্নোত্তর বিভাগ ছাড়া আর সকল বিভাগের উত্তর প্রতিমাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে পাঠাতে হয়। প্রশ্নোত্তর কেবল ১০ই তারিখের মধ্যে পাঠানো নিয়ম। 'শব্দ-সন্ধানে' যে কোনো প্রতিযোগী যতগুলি ইচ্ছা কুপন পাঠাতে পারে। একখানি মাত্র কুপন পাঠিয়েও অনেকে প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন এবং ৩৬ খানি 'কুপন' পাঠিয়েও পুরস্কার অর্জন করতে পারেননি এমন দৃষ্টান্তও আছে। আসল কথা তোমাদের উত্তর নির্ভুল হলেই তোমরা প্রথম পুরস্কার পাবে।

কুমারী হেনা ঘোষ, সাভার, ঢাকা।

তোমর সচিত্র কবিতাটি পেয়েছি, কিন্তু, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে সেটি পাঠশালায় ছাপা চলবে না।

শ্রীকৃষ্ণা দেবী, রাঁচী।

তোমার কবিতাটি পাঠশালায় প্রকাশের জন্য সম্পাদকের বিবেচনাধীন আছে।

সুধানাথ রায়চৌধুরী, কনেশ্বর।

তোমার এ প্রবন্ধটি পাঠশালায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

হৃষীকেশ কাব্যবিশারদ,

আপনার নাটকখানির যতটুকু অংশ পাঠিয়েছেন পড়েছি। 'পাঠশালা' পত্রিকায় এ নাটক ছাপা চলতে পারে না।

অসীম বাহা, বালিগঞ্জ।

পুরানো পাঠশালা নিতে হলে।৵০ আনার ডাক-টিকিট পাঠাতে হবে। 'সহযোগী সাহিত্য' বন্ধ করা হ'ল সহযোগীরা ক্ষুণ্ণ হচ্ছেন বলে। 'সমালোচনা' ও 'চিঠিপত্র' বন্ধ হয়নি, পাঠশালা খুলে দেখ।

পপী বসু, পটুয়াখালি।

চৈত্রের প্রশ্নোত্তরের সংখ্যা ৩৮এর পর ভুলক্রমে আবার ৩৬ থেকে পুনরাবৃত্তি হওয়াতে তোমাদের মধ্যে যারা সল্পবুদ্ধি তাদের যে একটু অসুবিধা হয়েছে এজন্য আমরা দুঃখিত। ভবিষ্যতে এদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হবে। পুরাতন পাঠশালা যদি কাছে না থাকে পরিচিত কারুর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে দেখ। একই জিনিস একাধিকার কাগজে প্রকাশ করা রীতি বিরুদ্ধ। পৃথিবীর সমস্ত এফ্‌. আর এস্‌ দের তালিকা পাঠশালায় যিনি দেখতে চান তাঁর বুদ্ধি বিবেচনার প্রশংসা করা চলে না। বৈশাখে যাঁদের রচনা স্থানাভাবে প্রকাশ করতে পারা যায়নি, তাদের রচনা জ্যৈষ্ঠে ও আষাঢ়ে ছাপা হয়েছে, মাসিক-পত্রে এ প্রথা বরাবর চলে আসছে,—better late than never।

দেবব্রত সিংহ, কলিকাতা।

দপ্তরীর দোষে তোমার জ্যৈষ্ঠের পাঠশালায় যদি দুখানি পাতা কম থাকে এবং শব্দ সন্ধানের কুপনখানি না গিয়ে থাকে, তবে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। তোমার উচিত ছিল উক্ত বইখানি পাঠশালা অফিসে ফেরত পাঠিয়ে বদলে নিয়ে যাওয়া। তুমি যখন কলকাতায় থাক, তোমার ত' এতে কোনো অসুবিধাই ছিল না।

রেবা ভদ্র, ঢাকা।

তোমার পাঠানো গল্প আমরা পাইনি। বোধ হয় বেয়ারিং হওয়ায় ফেরত গেছে। এবার থেকে খামের উপর "From : রেবা ভদ্র, গ্রাহক নং ২৪৪৯" লিখে দিও, তাহলে বেয়ারিং হলেও চিঠি রেখে দেওয়া হবে এবং পরে তোমার কাছে মাশুল আদায় করা হবে। পাঠশালাকে তোমরাও ভালবাস বলেই ত "কল্যামহল" খোলা হল। শব্দ-সন্ধানের উত্তর নিয়ে অভিমান কর না। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আরও রচনা পাঠশালায় প্রকাশিত হবে।

সেখ সিরাজ উদ্দীন, খাগড়া।

'পত্রী-মৈত্রী' বিভাগে যাদের নাম ঠিকানা দেওয়া হয় তারা সকলেই পত্র যোগে পরস্পরের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে ইচ্ছুক, সুতরাং তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তুমি পত্র লিখতে পারো।

পুষ্প ঘোষ, বালিগঞ্জ।

'শব্দ-সন্ধানের' উত্তর ভুল হ'লে কিছু মাত্র লজ্জার বা ক্ষোভের কারণ নেই। ওটা শব্দ নিয়ে খেলা বা 'শব্দ' দিয়ে জব্দ করার চেষ্টা। ঐ চেষ্টার মধ্যেই আনন্দ। ভুল হলে হতাশ হয়ো না। বারবার চেষ্টা কর, কে জানে হয়ত একবার নির্ভুল হতে পারে।

ওয়াহেদ আলী মিয়া, ইটাচালি।

'প্রশ্নোত্তর বিভাগ' পাঠশালার অনেক পৃষ্ঠা অধিকার করছে ব'লে তুমি রাগ করেছ এবং পাঠশালার ভবিষ্যৎ ভেবে এ বিভাগটি তুলে দিতে উপদেশ দিয়েছ এজন্য তোমার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু তোমার বোধ হয় মনে নেই, গ্রাহক গ্রাহিকাদের অনুরোধেই এ বিভাগ খোলা হয়েছে। সুতরাং ভোটে যদি তারা অধিকাংশ এটা তুলে দিতে বলে তবেই তুলে দেওয়া হবে। আমরা মনে করি, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতার চেয়ে এতে ছেলে মেয়েদের সাধারণ জ্ঞান অনেক বাড়ে এবং শিক্ষারও উৎকর্ষ ও উন্নতি হয়।

শক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডিব্রুগড।

তোমার মতে 'প্রশ্নোত্তর' বিভাগ পাঠশালার সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষাপ্রদ বিভাগ, কিন্তু পাঠশালার গ্রাহক গ্রাহিকাদের মধ্যে কেউ কেউ তোমার সঙ্গে একমত নন, তাই ব্যাপারটা এবার ভোটের দ্বারা মীমাংসার ব্যবস্থা হয়েছে।

অশ্বিনীকুমার মণ্ডল, আহমদপুর।

তোমার প্রস্তাব ভোটে দেওয়া হল। কুমারী সাধনা বসুকে 'শ-ব' যে পত্রোত্তর দিয়েছেন সে বিষয়ে তুমি যে আপত্তিকর পত্র লিখেছ সে পত্র 'শ ব' কে পাঠানো হয়েছে।

নীলিমা দাশ, আকোলা।

তোমার 'প্রশ্নোত্তর' ও 'কল্যামহলের' লেখায় কোনো নাম ঠিকানা ছিল না বলেই ছাপা হয়নি, কেবল মাত্র গ্রাহক নম্বর থাকায় সেইটিই দেওয়া হয়েছে। এবারও ধাঁধাঁর উত্তরে তুমি নাম দিয়েছ কিন্তু ঠিকানা দাও নি। প্রত্যেক উত্তরের সঙ্গে নাম ঠিকানা না দিলে ছাপা হয় না। এবার একজনের প্রশ্নোত্তর, ধাঁধাঁ, হবফের হেরফের প্রভৃতি এসেছে এবং নির্ভুল উত্তরই এসেছে কিন্তু বেচারি নাম ঠিকানা বা গ্রাহক নম্বর কিছুই দেয় নি বলে কোনটাই তার ছাপা হল না।

বীরেন্দ্রনারায়ণ সরকার, ফরিদপুর।

ভারতের সর্বত্র ভাষার প্রভেদ থাকলেও উচ্চ সঙ্গীতের সুর ও রাগ রাগিণী একই। সুতরাং এক্ষেত্রে ভারতের শ্রেষ্ঠ গায়ক কে? এ প্রশ্নটিতে কোন ভুল হয়নি। কারণ সুর বা রাগ রাগিণীর কৌশলই গায়কের শ্রেষ্ঠত্বের মাপ কাঠি, ভাষা নয়। ফরিদপুরে পাঠশালার কতগুলি গ্রাহক আছে সেটা পোষ্ট অফিসে পত্র লিখলে জানতে পারবে। পৃষ্ঠার উভয়দিকে লিখে পাঠালে ছাপাখানার অসুবিধা হয়। ছাপার ভুলে 'ভাইয়েরা' 'ভায়রা' হয়েছে দেখে বিশেষ কৌতুক বোধ করলেও লজ্জাও বড় কম হচ্ছে না। ছাপার দোষে এরূপ সম্বন্ধ বিপর্যয় যাতে আর না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখা হবে।

মৃণালকান্তি গুপ্ত, শিয়ালদহ।

তোমার প্রস্তাব ভোটে দেওয়া হল। যদি অধিকাংশের মত হয় তাহলে পাঠশালায় 'বালক সঙ্ঘ' বা 'কিশোর সভা' খোলা হবে। তখন কিন্তু আবার গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ কবিতার জন্য কান্নাকাটি করা চলবেনা। 'পাঠশালা' সম্পূর্ণ তোমাদেরই কাগজ হয়ে উঠবে। পাঠশালা বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ কর্ণধারদের সাহিত্য সেবার জন্য প্রস্তুত হবার সুযোগ দেবে।

গৌরাঙ্গ রুদ্র চট্টগ্রাম।

তোমার রচনাগুলি সম্পাদকের বিচারাধীনে আছে। চট্টগ্রামের মনোজ দত্তর দুটি প্রশ্ন ভুলক্রমে ছাপা হয়েছে।

সলিলা মুখার্জি, কলিকাতা।

'রবীন্দ্র জয়ন্তী' উপলক্ষে পাঠশালা বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় কবির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছে এবং কিশোর বঙ্গ রবীন্দ্র জয়ন্তীতে যোগদান করে অনুষ্ঠানটিকে সুসম্পূর্ণ করে তুলেছে। তুমি শান্তিনিকেতনে কবিকে তোমার প্রণাম পাঠিয়ে খুব ভাল কাজই করেছ। তোমার ঠিকানা পরিবর্তন করা হয়েছে।

ধ্রুবরঞ্জন সরকার, হাওড়া।

তোমার পত্রী-মৈত্রী হরিকমল পুরকায়স্থ অভিযোগ করছিল যে তুমি তার চিঠির উত্তর দাও নি, কিন্তু তুমি যে তাকে প্রথম পত্রের উত্তর দিয়েছিলে একথা সে না বলায় তোমার সম্বন্ধে আমাদের ভুল ধারণা হয়েছিল। এজন্য আমরা দুঃখিত। হরিকমল যে তোমার বিরুদ্ধে অন্যায় অভিযোগ করেছে তোমার প্রেরিত তার পত্র পড়ে একথা বোঝা গেল। তোমার প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য মনে হল। এইবারেই তা প্রতিযোগিতায় দেওয়া হ'ল। প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, কবিতা প্রভৃতি সব কাগজেই ত' থাকে। পাঠশালা যদি সেগুলো বাদ দিয়ে কেবলমাত্র তোমাদের বক্তব্য ও আলোচনা নিয়েই থাকে এ সম্বন্ধে তোমার মত কি?

ঠাকুরপ্রসাদ সান্যাল, পাবনা।

তোমার প্রশ্নটি পাঠশালার উপযোগী নয় বলে ছাপা হয়নি। আয়ুর্বেদে ও ডাক্তারীতে প্রভেদ কোথায় সেটা বোঝা তোমাদের পক্ষে এখন সহজ নয়।

তারাপদ চক্রবর্তী, ফেণী।

তোমার এই প্রস্তাব আরও কেউ কেউ করেছেন। ব্যাপারটা তাই ভোটে দেওয়া হয়েছে। দুটি প্রশ্ন ছাপা ভুলক্রমেই হয়েছে। বিভিন্ন বিভাগে পৃথক পৃথক পত্র দিও। এবার সব একসঙ্গে দিয়েছ বলে কয়েকটি বিষয় তোমার বক্তব্য ছাপা গেল না।

বৈদ্যনাথ শেঠ, বাঁশ বেড়িয়া।

পুস্তকের প্রচ্ছদপট সম্বন্ধে তোমার মন্তব্য খুব যুক্তিপূর্ণ। ভিতরে যদি সারবস্তু কিছু না থাকে কেবল উপরটা ঝক্ ঝকে চক্‌চকে করে কোন লাভ নেই। ছেলেদের জন্য একটা বিভাগ খোলা হবে কিনা এ বিষয়টা ভোটে দেওয়া হয়েছে।

শৈলেন্দ্রকুমার রায়, কলিকাতা।

একই খামের মধ্যে সব পাঠাতে হলে ১০ই তারিখের মধ্যে সব শেষ করা ছাড়া উপায় নেই। Strength শব্দটি তোমার প্রেরিত শব্দটির চেয়ে সবল ও সরল সুতরাং তোমারটি বাতিল হয়েছে। ছেলেদের বিভাগ খোলবার জন্য ভোট দিও। শাখা প্রশ্ন গ্রহণ করলে 'প্রশ্নোত্তর অত্যন্ত বেড়ে যাবে। "ডাকঘর" অভিনয়ের বিবরণ গত মাসের খবরে দেখ। 'দীপালী'তে শ্রীমান অজিত মোহনকে আমি উত্তর দিয়েছি।

কামদারঞ্জন ভট্টাচার্য্য, নরপুর।

তোমার ছদ্মনাম কেবল 'ধাঁধা' ও 'শব্দসন্ধান' বিভাগে ব্যবহার করতে পারো কিন্তু প্রশ্নোত্তর ও চিঠিপত্রে পুরো নাম দিতে হবে। পাঠশালার মূল্য বৃদ্ধি সম্বন্ধে তোমার প্রস্তাব বিবেচনাধীন রইল। তোমার ধাঁধাটি দেওয়া চলবেনা।

ধীরেন্দ্রনাথ মহান্তি, দাঁতন।

কবিতাটি আবার লিখে পাঠিও। চিঠি পৌছানো সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে হলে রেজেষ্ট্রি করে পাঠাতে হয়।

বাংলা গভর্ণমেণ্ট ও তাঁদের এ-আর-পি বিভাগ যে ভাবে বিমান আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হ'চ্ছেন এবং শহর-বাসীদের প্রস্তুত হবার জন্য উপদেশ দিচ্ছেন, বিমান আক্রমণ কালে পথিকদের আশ্রয় স্থল নির্বাচনে, পরিখা খননে, নিষ্প্রদীপের ব্যবস্থায় ও বিশেষ বিশেষ ভবনের চারিদিকে প্রাচীর গাথায় মনে হয় এখানে বিমান আক্রমণ আসন্ন। অনেকে এখনও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারছেন না যে এই নীরিহ নিরস্ত্র নির্বিরোধী অহিংস বেচারিদের উপর, সত্যই কি এমন কোনো নৃশংস শত্রু আছে যারা আকাশ থেকে অগ্নিবান নিক্ষেপ করে সপরিবারে তাদের বিব্রত করে তুলবে? এরূপ অবিবেচকের ন্যায় কাজ করলে তাদের মূল্যবান বোমাগুলির শুধু যে অপব্যয়ই হবে তাই নয়, উহা সম্পূর্ণ অপপ্রয়োগ বলেই গণ্য হবে।

*　　*　　*

কারণ স্বরূপ তাঁরা বলতে চাইছেন যে আমরা তো মরেই আছি। আমরবাদের ঘা মেরে আর লাভ কি? একটু নিরাপদে স্ত্রীপুত্র পরিবার নিয়ে শান্তিতে সংসারধর্ম মাত্র পালন করছি। আহার-নিদ্রা ও চাকুরি ছাড়া আমাদের অস্তিত্বের আর কোনো চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যায় না। এহেন নির্বিবাদীদের ধ্বংসকামনা যারা করে, ভগবান কি তাদের ভাল করবেন? প্রতিবৎসর বসন্ত, প্লেগ, কলেরা, কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি বাংলাদেশের অন্তর্গত 'পঞ্চমবাহিনী'র আক্রমণে লক্ষ লক্ষ নরনারী শিশু ও যুবা তো নিঃশব্দে পঞ্চভূতে মিলিয়ে যাচ্ছেই, সুতরাং তাদের এ সল্পায়ু জানকে আর ব্যোমযান থেকে বোমা মেরে হায়রাণ করা কেন?

*　　*　　*

সম্ভবতঃ শত্রুপক্ষ এসব খবর জানে না। আমাদের ঘরে যে একগাছা লাঠি বা একখানা ছোরাও খুঁজে পাওয়া যায় না বাইরের বিদেশী লোকরা তা জানবেই বা কি করে? ঘরের খবর সম্বন্ধে শুধু ঘরের লোকেরাই ওয়াকিব হাল, কাজেই, তারা ঠিক তৈরি হয়েই আছে, একবার 'ব্ল্যাক আউট' শুরু হ'লে হয়। রাস্তায় অন্ধকার গলিতে ভদ্রলোকদের ধরে ঘড়ি আংটি বোতাম, মণিব্যাগ, ফাউণ্টেন পেন ইত্যাদি কেড়ে নেওয়াত কাগজে প্রায়ই দেখা যাচ্ছে। বাড়ীর ভিতর ঢুকে রাহাজানি চলতেও বেশিক্ষণ লাগবে না হয়ত। দোকান লুটপাটের সম্ভাবনাও রয়েছে। অন্ধকার নাকি মানুষের অপরাধ প্রবণতাকে উত্তেজিত করে তোলে বোলে শোনা যায়।

অবশ্য পুলিশ ও সিভিকগার্ডের দল শান্তিরক্ষার যতদূর সম্ভব সুব্যবস্থা করছেন। শহরের নামজাদা জন তিরিশেক গুণ্ডাকে ধরে রাখাও হয়েছে, এবং সন্দেহজনক চরিত্রের লোক যারা তাদের নাম ঠিকানা নেওয়া হয়েছে, খাক্সার দলকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়েছে, তবু যদি কোন গোলমাল হয়, সে আমাদেরই অসাবধানতার দোষে হবে, সে বিষয়ে কোনও ভুল নেই। কারণ কর্তৃপক্ষ ত' অনেকদিন থেকেই আমাদের সাবধান হ'তে উপদেশ দিচ্ছেন।

*　　*　　*

সম্প্রতি শহরের সবচেয়ে বড় লালকুঠিতে আমাদের সরকারি অভিভাবকদের একটি বৈঠক বসেছিল। শহর থেকে বেকার লোকদের সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা কি করা যেতে পারে স্থির করবার জন্য। কি যে স্থির হয়েছে সে বৈঠকে জানা যায় নি। তবে একটু আশার খবর পাওয়া গেছে এই যে বোমার আঘাতে ঘর বাড়ী ভেঙে চুরে যারা নিরাশ্রয় হয়ে পড়বে, কলিকাতা কর্পোরেশন নাকি তাদের আশ্রয় দেবার ব্যবস্থা করবেন।

*　　*　　*

বোমাত' দূরের কথা, একটা পট্‌কার আওয়াজ শুনলেই এদেশের ছেলেমেয়েদের, শুধু ছেলেমেয়ে কেন, তাদের পিতামাতারও দাঁত কপাটি লেগে যায়। এখানে সত্যিই যেদিন পালে বাঘ পড়বে—অর্থাৎ, প্রথম যেদিন বোমাবর্ষণ হবে তার পরদিনই আর শুধু বেকার নয় বেশির ভাগ 'সাকার' লোকই ভাগবার চেষ্টায় ছুটাছুটি করবেন। বড়বাজার হয়ত খালি হয়ে যাবে। 'ইভাকুয়েশান' তখন আপনিই শুরু হবে।

*　　*　　*

মুস্কিল হবে তখন সবচেয়ে বেশি আমাদের বাবু ভায়াদের। যাঁরা চাকরের সাহায্য ছাড়া এক পা চলতে পারেন না! চাকরের দল বিনা বাক্যব্যয়ে 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' নীতি অনুসরণে স্বদেশে রওনা হবে। বেচারা মনিবের দল পড়বেন মুখ থুবড়ে। অনেক বাবুই দেশের পাট চুকিয়ে দিয়ে শহরে বসবাস করছেন—তাঁদের কী দশা হবে? দোকানদাররা দোকান পাট বন্ধ রেখে পালাবে, শহরের লোকেরা খাবে কি? শোনা যাচ্ছে নাকি কর্পোরেশন সে ব্যবস্থাও করবেন। কর্পরোশেনের জয় হোক। আশ্রয় ও আহার যদি জোটে প্রাণ থাকলেই বা কি আর না থাকলেই বা কি?
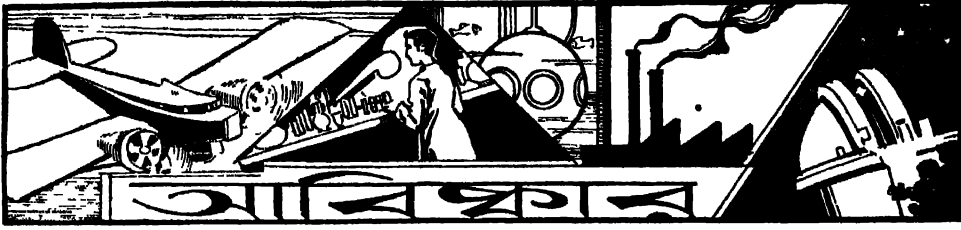
সাদা মাটি :—

উত্তর পশ্চিম ভারতের বান্নু, কোহাট, ডেরা ইসমাল খাঁ, পেশওয়ার, মর্দ্দান প্রভৃতি অঞ্চলে এক রকম মাটি আবিষ্কৃত হয়েছে যার বাসন তৈরি হ'লে চিনেমাটির বাসনকেও হার মানিয়ে দেবে। এর বর্ণ ঠিক হাতির দাঁতের ন্যায় ঈষৎ পীতাভ উজ্জ্বল শ্বেত। অথচ এ মাটিতে বাসন তৈরির খরচ সাধারণ মাটির বাসনের চেয়ে বেশী পড়বে না। স্থানে স্থানে চীনেমাটির চেয়েও সাদা মাটি পাওয়া গেছে যা সাধারণ মাটির সঙ্গে পরিমাণ হিসাবে মিশিয়ে নিলে ঠিক হাতীর দাঁতের তৈরি জিনিসের মতো দেখতে মাটির জিনিস গড়া চলবে। আশা করা যায় শীঘ্রই কোনো উৎসাহী ব্যবসায়ী এই মাটি কাজে লাগাবার চেষ্টা করে সোনা ফলাতে পারবেন।

* * *

সেঁকতাপ :—

যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদের যন্ত্রণার লাঘব করবার জন্য তৎক্ষণাৎ গরম জলের ব্যাগ পাওয়া সহজ সাধ্য নয়। অথচ যন্ত্রণা নিবারণের উপায় তৎক্ষণাৎ না করলেও মুস্কিল। অগত্যা সামরিক চিকিৎসকেরা সেস্থলে আদিম যুগের বর্বর প্রথা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁরা বালি, মাটি, টিন, লোহার পাত যা হাতের কাছে পাচ্ছেন, তাই গরম করে যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিকদের প্রাথমিক চিকিৎসায় সেঁকতাপের ব্যবস্থা করছেন। এতে না কি আশানুরূপ সুফলও পাওয়া যাচ্ছে।

* * *

যমজ শিশু :—

পৃথিবীর সকল দেশের মধ্যে আমেরিকা যুক্ত প্রদেশে যমজ শিশু জন্মায় সকলের চেয়ে বেশি। সম্প্রতি আদম সুমারি গণনায় জানা গেছে যে সেখানে প্রতিদিন যত শিশু ভূমিষ্ঠ হয় তার মধ্যে অন্ততঃ শতকরা দু'জন যমজ সন্তান থাকেই। তবে দুঃখের বিষয় যমজ শিশুর মধ্যে দুটিই সব ক্ষেত্রে প্রায় বাঁচে না, তাদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৫০ জন মারা যায়। তবু এই যমজের সংখ্যা আমেরিকায় প্রতি বৎসর বিশলক্ষেরও বেশী। এই যে বিশলক্ষ যমজ শিশু জন্মায় এদের মধ্যে আবার দেখা গেছে শতকরা যমজের সংখ্যা তিনটি করে। অর্থাৎ একই সময়ে একই মায়ের পেট থেকে এক সঙ্গে তিনটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। আবার এই ত্রিযমজদের মধ্যে আবার দেখা গেছে শতকরা চারটি করেও যমজ শিশু জন্মায়। মৃত্যুহার অবশ্য সকলের মধ্যে একই।

গতমাসের খবর

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অশীতিতম জন্মোৎসব আজ সারা বাংলা দেশের জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে শহরের প্রতি পল্লীতে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে ও ঘরে ঘরেও সুসম্পন্ন হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। ১লা বৈশাখ থেকেই কবির এই জন্মোৎসব সুরু হয়েছিল, এবার চলছে তা এখনও এই পয়লা আষাঢ় পর্য্যন্ত। পৃথিবীর আর কোথাও এমন সুদীর্ঘ ষাটদিন ধরে দেশের সর্বত্র আর কোন কবির জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে কিনা আমাদের জানা নেই।

* * *

রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে গিয়ে রাজার অধিক সম্মান পেয়েছিলেন একথা ঠিক, কিন্তু নিজের দেশের কাছে উপযুক্ত সমাদর পাননি বলে তাঁর মনে একটা ক্ষোভ ছিল বরাবর। বড়ই আনন্দের বিষয় যে তিনি আজ আমাদের মধ্যে উপস্থিত থেকেই দেখে যাচ্ছেন দেশ তাঁকে আদর করছে, এমন আদর করেছে—যে আদর এদেশে ওদেশে আর কেউ কখনও কারুর কাছে পায়নি।

* * *

কিন্তু, এই সঙ্গে আমরা বলব শুধু কবির সম্মান ও সমাদর উপলক্ষে উৎসব অনুষ্ঠানেই দেশবাসীর কর্ত্তব্য সম্পাদন করলে চলবে না। চার কোটী বাঙালীর মধ্যে শতকরা একজনও যদি শিক্ষিত থাকে তাহলেও শিক্ষিতের সংখ্যা চারলক্ষ হয়। এই চারলক্ষ লোক প্রত্যেকে আজ

রবীন্দ্রনাথের অন্ততঃ একখানি করে মাত্র ১৲ টাকা মূল্যের বইও যদি কেনে তাহলেও 'বিশ্বভারতী'র হাতে চারলক্ষ টাকা এসে পড়তে পারে। বিশ্বভারতীকে রক্ষা করাই কবির আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখা। সুতরাং সমস্ত শিক্ষিত বাঙালীর উচিত আজ মুক্তহস্তে এই প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করা।

* * *

গত ২৮ শে মে বুধবার এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে কিশোরবঙ্গ রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়েছে। এই উৎসবের সম্পাদক অক্লান্তকর্ম্মী শ্রীমান বিমল ঘোষের যত্নে চেষ্টায় ও বিপুল পরিশ্রমের গুণে সেদিনের উৎসবটি আশাতীত সফল ও সার্থক হয়েছিল। শ্রীযুক্ত ইন্দিরা দেবীর পরিচালনায় শিশুদের নৃত্য গীত আবৃত্তি ও অভিনয় অতি চিত্তাকর্ষক ও উপভোগ্য হয়েছিল। বাংলাদেশের সমস্ত শিশু পত্রিকার পক্ষ থেকে কবিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের পর শিশু মহলে পরিচিত কয়েকজন সাহিত্যিকের সহযোগে রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটকের অভিনয় হয়েছিল। অমলের ভূমিকায় শ্রীমান নিখিল ঘোষের অভিনয় দর্শনে সকলেই মুগ্ধ হয়েছিলেন, এবং স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে নিখিলকে সোনা ও রূপার ৩টি পদক উপহার দিতে চেয়েছেন। 'সুধা'র ভূমিকায় কুমারী রাণীর অভিনয়ও সুন্দর হওয়ায় কুমারী রাণীও দুটি রৌপ্য পদক পাবে। অন্যান্য ভূমিকায় কবি গিরিজাকুমার বসু: পাঠশালার সম্পাদক নরেন্দ্র দেব: সুনির্ম্মল বসু: অখিল নিয়োগী, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, মন্মথ রায় ও নির্ম্মল চৌধুরী নেমেছিলেন।

যুদ্ধের গতি পশ্চিম দিগন্ত ঘুরে দ্রুতবেগে পূর্বাভিমুখে এগিয়ে আসছে। নরওয়ে, ডেনমার্ক, হলাণ্ড, বেলজিয়াম, লাক্সেমবুর্গ, ফ্রান্স জয় করে বিজয়ী জার্মান বাহিনী পূর্ব-য়ুরোপে রুমানিয়া যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া, এলবেনিয়া ও সর্বশেষে গ্রীস অধিকার করেছে। বলা বাহুল্য যে ইতিপূর্বে পোল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া এবং হাঙ্গেরী তার আয়ত্তে এসেছিল। রাশিয়া, ইটালি, স্পেন ও তুর্কী জার্মানির সঙ্গে মৈত্রী সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়েছে। সুইডেন নিরপেক্ষ। সুতরাং এক কথায় সমগ্র য়ুরোপ আজ জার্মানির করতলগত। এইবার সে ওদিকে উত্তর আফ্রিকা, মিশর, স্যুয়েজ, এবং এদিকে সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, ইরাক প্রভৃতি অঞ্চলে হানা দেবার আয়োজন করছে। গ্রেটব্রিটেন তার ভারত সাম্রাজ্য এবং অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ক্যানাডা, ও দক্ষিণ আফ্রিকার সাহায্যে বীর বিক্রমে সকল দিকে যুদ্ধ করছে। এই যুদ্ধে গ্রেট ব্রিটেনের সবচেয়ে বড় বন্ধু আমেরিকা। অর্থে, সামর্থ্যে, রণসম্ভারে, অস্ত্রশস্ত্রে, জাহাজ ও বিমানপোতে, এবং আহার্য ও পরিধেয় প্রভৃতি সরবরাহে মার্কিনের সাহায্য এই বিপদে ব্রিটেনের শুধু বাহুতেই বল দিচ্ছে না, বুকেও বল দিয়েছে এবং মনেও ভরসা দিয়েছে প্রচুর।

* * * *

অবশ্য একথা ঠিক যে আমেরিকা নিস্বার্থভাবে কেবলমাত্র গণতন্ত্র রক্ষার উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই যে ব্রিটেনকে সাহায্য করেছে তা নয়। ব্যবসাদার আমেরিকা প্রত্যেক জিনিসটির নগদ মূল্য হিসাব করে ধরে নিয়ে তবেই ইংলণ্ডে মাল সরবরাহ করছে। সম্প্রতি ইংলণ্ডের পক্ষে সকল জিনিসের নগদ টাকা দিয়ে ওঠা সম্ভবপর হচ্ছে না বলে আমেরিকা ধারে মাল দিতে রাজি হয়েছে বটে, কিন্তু সেজন্য "Lease and Lend" আইন পাশ করিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে গ্রেট ব্রিটেনের যতগুলি দ্বীপ, বিশিষ্ট সামরিক ঘাঁটি, নৌ ঘাঁটি ও বিমান ঘাঁটি ছিল একে একে সমস্তগুলিই ধারে মাল দেওয়ার বিনিময়ে ইজারা নিয়ে অধিকার করে বসেছে। এর ফলে উপস্থিত গ্রেট ব্রিটেনের অনেক সুবিধা হলেও, যুদ্ধের পর সমুদ্র শাসনের পক্ষে ব্রিটিশের সে একছত্র আধিপত্য আর থাকবে কিনা সে বিষয়ে ভেবে দেখার অবকাশ রয়ে গেল।

* * * *

দ্বাদশ দিবস ব্যাপি যে ভীষণ এক অভিনব যুদ্ধ ক্রীট দ্বীপটির অধিকার নিয়ে হয়ে গেল, পৃথিবীর সমর ইতিহাসের রক্ত রঞ্জিত গ্রন্থে এ যুদ্ধ কয়েকটা নূতন পৃষ্ঠা যোগ করলে। ক্রীট দ্বীপ মাত্র ৩৬০ মাইল লম্বা এবং ৬৫ মাইল চওড়া। উভয় প্রান্ত সরু হয়ে মাত্র সাত আট মাইলে দাঁড়ি-

য়েছে। এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল গ্রীসের রাজা এবং গ্রীক গভর্নমেণ্ট। গ্রীসের নব নিযুক্ত মন্ত্রীমণ্ডল এবং হতাবশিষ্ট গ্রীক সৈন্যদলও এখানে ছিল, আর ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বাহিনী অর্থাৎ ইংরাজ স্কটিশ অস্ট্রেলিয়ান নিউজিল্যাণ্ডার ও ক্যানেডার সৈন্যদল, ছিল রয়েল এয়ার ফোর্স এবং ভূমধ্যসাগরে দুর্জয় ব্রিটিশ রণপোত বাহিনী। ক্রীট পার্বত্য দ্বীপ, ভৌগোলিক অবস্থানের গুণে এমনিই দুর্ভেদ্য যে শত্রু হস্তে ক্রীটের পতন কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু সেই অকল্পিত ব্যাপারই বারো দিনের মধ্যে আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের মতো ঘটে গেল এই ক্রীট দ্বীপে। জলপথে সৈন্য নিয়ে যাবার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় কেবলমাত্র বিমানবহর ও শূন্যচারী সৈন্য (Parachute Army) সাহায্যে জার্মানি ক্রীট অধিকার করে নিলে। হতাবশিষ্ট ১৫০০০ সৈন্যকে নিশ্চিত মৃত্যুমুখ থেকে বাঁচিয়ে ব্রিটিশ নৌবহর অদ্ভুত বীরত্ব ও সাহসের সঙ্গে মিশরের আলেকজাণ্ড্রিয়া বন্দরে ফিরিয়ে এনে দিয়েছে।

*

ইরাকে দুঃসাহসী রশিদ আলী জার্মানির ভরসায় ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যে অভিযান চালিয়েছিল ব্রিটেন তা অচিরে দমন করেছে। রশিদ আলী পলাতক। ইরাকের পুরাতন রাষ্ট্রনায়কের সঙ্গে ইংল্যাণ্ড সন্ধি করেছে। বাসরা ও বোগদাদের ভিতর দিয়ে ব্রিটিশ সেনা বাহিনীর গতি অবাধ হয়েছে। মশুলের তৈলখনি ইংরাজের অধিকারে এসেছে। এইবার ব্রিটিশ বাহিনী সিরিয়া অধিকার করতে উদ্যত হয়েছে। কারণ, ফরাসীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে জার্মানিরা নাকি সিরিয়ার সামরিক ঘাঁটি দখল করছে। জার্মানিকে এখানে দাঁড়াতে দিলে ভূমধ্যসাগরে ব্রিটিশ স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুতরাং জার্মানিকে এখান থেকে হঠাতেই হবে। এদিকে ফরাসীও প্রস্তুত হচ্ছে ইংরাজ আক্রমণ থেকে সিরিয়াকে রক্ষা করবার জন্য। শেষ পর্যন্ত এই নিয়ে কি এই দুই পরস্পরের ভূতপূর্ব বন্ধু ফরাসী ও ইংরাজের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যাবে? ওদিকে স্পেন নাকি জার্মানিকে পথ ছেড়ে দিতে চেয়েছে জিব্রল্টার আক্রমণ করতে যাবার জন্য। সুতরাং সাম্রাজ্যের যে ঘোরতর বিপদ ঘনিয়ে আসছে একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। জিব্রল্টার ও স্যুয়েজ রক্ষা করবার জন্য সমগ্র ব্রিটিশ শক্তির প্রস্তুত হয়ে থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

পত্রী-মৈত্রী

পাঠশালার যেসব গ্রাহক গ্রাহিকা পরস্পরের সঙ্গে পত্রযোগে আলাপ পরিচয় ও বন্ধুত্ব স্থাপন করতে ইচ্ছুক, নীচেয় তাদের নাম ঠিকানা দেওয়া হল। এদের সঙ্গে যে কেউ চিঠি লিখে পরিচিত হতে পারবে।

শ্রীঅবনীভূষণ বেরা, গ্রাম, ঘোলদিগরুই, পোঃ পারশ্যামপুর, জেঃ হুগলী।

শ্রীমণীন্দ্রমোহন মজুমদার, পোঃ পুরুলিয়া, গাড়ীথানা, জেলা মানভূম।

কুমারী ইন্দুবসু, শিশুভারতী কন্যাভবন, কনেশ্বর, ফরিদপুর

কুমারী পঙ্কজ গাঙ্গুলী ঐ ঐ ঐ

কুমারী প্রতিমা চাটার্জি Co. Sj. R.K. Chatterjee. Napier Town, 193 North Road, Jubbulpore.

পার্ব্বতীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, রামপুর হাট, পোঃ রামপুরহাট, বীরভূম।

অসীম রাহা, ২৭৷২।৩ কাঁকুলিয়া রোড, কলিকাতা।

এ, এন, সোলেমান, Co H. R. Chowdhury M. A. A.E.S. Kajitola, Sylhet, Assam.

সেখ সিরাজউদ্দিন, খাগড়া পোঃ খাগড়া, মুর্শিদাবাদ।

ওয়াহেদ আলী মিয়া, ইটাচালি, পোঃ নগাও, আসাম।

শশী ভট্টাচার্য, হেমনগর শশীমুখী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, পোঃ হেমনগর, জেলা মৈমনসিংহ।

মৃণালকান্তি গুপ্ত, Co Dr. Gupta M B. B. R Singh Hospital, Sealdah, Calcutta

গৌরাঙ্গ রুদ্র, প্রবর্তক বিদ্যাপীঠ, চট্টগ্রাম।

অমলেন্দু রুদ্র, কাটাপাহাড় লেইন, চট্টগ্রাম।

মনোজ দত্ত, গ্রাম ও পোঃ ধলঘাট, জেলা চট্টগ্রাম।

কুমারী সলিলা মুখার্জি. Co. Sj. Sanat Kumar Mukhrjee, 15. B Indra Biswas Rd. Calcutta

কামদারঞ্জন ভট্টাচার্য, গ্রাঃ নরপুর, পোঃ গোকর্ণ, জেলা ত্রিপুরা।

হরিপদ চক্রবর্তী, বাবুরহাট স্কুল, বাবুরহাট, ত্রিপুরা।

হৃষীকেশ কাব্যবিশারদ, গ্রাঃ দাঁতন, জেঃ মেদিনীপুর।

বিনিময় সঙ্ঘ

পরিচালক—শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায়

১। আমি ফ্রান্সের মাউন্ট সেন্ট মাইকেল ৫ ফ্রাঙ্ক টিকিটের পরিবর্তে লাক্সেমবুর্গের টিকিট চাই, এবং Pictorial World Atlas ১, ১২, ১৪, ১৭, ১৮, ২৫, ২৬, ৩১ ও ৩৩ সংখ্যা ছবির পরিবর্তে ১১, ২৪, ৫৪, ৭৫, ৯৫, ১২১, ১৩৩ ও ১৪০ সংখ্যা ছবি চাই।—প্রিয়ব্রত ঘোষ, বাঙ্গালোর।

২। আমি নেদারল্যাণ্ড, জার্মানি, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র এবং ইংলণ্ডের টিকিটের পরিবর্তে সুডান, জাপান, মিশর, গ্রীস, সুইজারল্যাণ্ড, রাশিয়া বা ইরাকের টিকিট চাই।—ফণীন্দ্রকুমার দাস।

৩। আমি ইংলণ্ডের ২½ পেনি ও ভারতের ॥০ আনা এবং ৵৯, ।০ সার্ভিস টিকিটের পরিবর্তে রাশিয়া, জার্মানি, ফ্রান্স, সিংহল প্রভৃতি দেশের টিকিট চাই।—পার্বতীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়।

৪। আমি যুক্তরাষ্ট্রের তিন সেণ্ট ও দুই সেণ্ট টিকিটের পরিবর্তে জাপান, জার্মানি বা ইটালির টিকিট চাই। —কুমারী পপী বসু, পটুয়াখালী।

৫। আমি আর্জেণ্টাইন, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের পরিবর্তে রাশিয়া, তুর্কী, জাপান, হাঙ্গেরি, ইরাক বা কেনিয়া ইউগেণ্ডার টিকিট চাই।—এ, এন, সুলেমান, সিলেট।

৬। গৌরাঙ্গ রুদ্র, চট্টগ্রাম—তুমি ওয়াশিংটনের ছবি বিশিষ্ট যুক্তরাষ্ট্রের টিকিটের বিনিময়ে শতবর্ষপূর্বে ব্যবহৃত সুইডেনের ২ খানি টিকিট চাহিয়াছ। কিন্তু তুমি বোধহয় জান না যে আজ হইতে শতবর্ষপূর্বে ঐ দেশে কোন টিকিটের ব্যবহার ছিল না। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ঐ দেশে ব্যবহারের জন্য সর্বপ্রথম ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়, যাহার এক একখানির মূল্য আজ অন্যূন ৬ পাউণ্ড হইতে ১৮ পাউণ্ড। যুক্তরাষ্ট্রের টিকিটের যে এইরূপ মূল্য হয় না. তাহা নয়। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ঐ দেশেই ওয়াশিংটনের ছবি বিশিষ্ট ডাকটিকিট যাহা প্রচলিত ছিল আজ তাহার মূল্য হইবে এক একখানির অন্যূন ৮ পাউণ্ড, তুমি কি সেই শ্রেণীর কোন টিকিট বিনিময় করিতে চাও? না ৵০ আনায় শত হিসাবে অধুনা প্রচলিত টিকিটগুলির বিনিময়ে উহা পাইবার আশা কর?

আমি যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যাণ্ড, কেনিয়া ইউগেণ্ডা ও হেলভেটিয়ার পরিবর্তে জাপান, জার্মানি, ইটালী, ফ্রান্স বা চীন দেশের টিকিট চাই। আভাষচন্দ্র দাসগুপ্ত, যশোহর।

আমি মালয়, সিংহল, নেপাল, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের টিকিটের পরিবর্তে জার্মাণ, জাপান ও মিশরের বিমানডাকের টিকিট চাই। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মহান্তি, দাঁতন।

আমি ভারতের ৵ আনার উর্দ্ধতম মূল্যের যে কোনো টিকিট পাইলে তাহার পরিবর্তে জার্মানি বা জাপানের টিকিট দিতে পারি। এবং হংকং (১৮৭৯) গ্রেটবৃটেন (১৮৯১) তুর্কী ও গোয়ালিয়রের তাম্রমুদ্রা বিনিময় করিতে চাই। অমরলাল মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা।

৭। মুণীন্দ্রকুমার গুহ, ফরিদপুর-তোমায় প্রিয়ব্রত ঘোষ অষ্ট্রেলিয়ার, ধীরেন্দ্রনাথ মহান্তির নেপাল চার পয়সা ও ইন্দ্রাণী রায় প্রেরিত নেপাল দুই আনা, এবং জাপান ও অষ্ট্রেলিয়ার টিকিট পাঠাইলাম। ইহার পরিবর্তে তুমি ২খানি আজমীর, ১খানি ইরাক এবং সুডানের টিকিট পাঠাইবে।

৮। বিশ্বনাথ সেনগুপ্ত, চট্টগ্রাম—ইন্দ্রাণী রায় তোমায় অষ্ট্রেলিয়ার ১½ পেনি ও ইটালীর ২৫ সেণ্ট মূল্যের এই টিকিট দুইটী দিতেছে, ইহার পরিবর্তে তুমি মালয় ও যুক্তরাষ্ট্রের টিকিট পাঠাইও।

৯। উদয়ভানু সিংহ, কলিকাতা-তোমার টিকিট খানির পরিবর্তে ধীরেন্দ্রনাথ মহান্তি প্রেরিত যুক্তরাষ্ট্রের একখানি ১½ পেনি মূল্যের টিকিট পাঠাইলাম।

১০। ভারতী মজুমদার, বালিগঞ্জ—সিলোনের ১৲ মূল্যের টিকিটখানি তুমি চাহিয়াছ, উহার মূল্য ৫ শিলিং ৬ পেন্স এবং উহার পরিবর্তে তুমি যাহা দিতে চাহিতেছ তাহার মূল্য মাত্র ৬ পেন্স এই কারণে ঐ টিকিটখানি পাইতে পার না। অন্য টিকিট দিলাম।

১১। অসীম রাহা,—তোমার গ্রাহক নম্বর জানা না থাকায় টিকিট পাঠাইতে পারি নাই। এ মাসের প্রশ্নোত্তরের সহিত তোমার গ্রাহক নম্বরটি পাঠাইও। তাহা হইলে পরবর্তী সংখ্যার সহিত তুমি ঐ টিকিট পাইতে পারিবে, না হইলে বৃথা ডাক মাশুল বাবদ ৴৫ খরচ হয়, সেটা ঠিক নয়।

১২। সুধীরচন্দ্র দেব—তুমি তোমার ইউ, এস, এ অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র এবং মিশরের উড়োজাহাজের টিকিটগুলি পাঠাইও তাহার পরিবর্তে অরুণলাল মুখোপাধ্যায় তোমায় গ্রীস ও জাপানের টিকিট পাঠাইতেছে।

১৩। সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রামপুরহাট—তোমার অষ্ট্রিয়া, আমেরিকা ও জ্যৈষ্ঠে প্রেরিত ৸০ মূল্যের ভারতের টিকিট খানির পরিবর্তে কয়েকখানি জাপান ও

জার্মানির টিকিট পাঠাইলাম, পরবর্তি পত্রে প্রাপ্তি স্বীকার করিও।

১৪। আভাষ দাসগুপ্ত,—কেনিয়া ইউগেণ্ডা ও সুইজারল্যাণ্ডের কি টিকিট তোমার জোগাড় আছে পাঠাইও উহার পরিবর্তে ফ্রান্স, জার্মানি, চীন প্রভৃতি দেশের টিকিট তুমি পাইবে।

১৫। সমীর চৌধুরী—সুইজারল্যাণ্ড, সাউথ আফ্রিকা, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি দেশের যাহা ডবল তোমার আছে পাঠাইলে তাহার পরিবর্তে নেপাল এবং অন্যান্য দেশের টিকিট তুমি পাইবে।

১৬। হরেন্দ্রনাথ মিত্র, কোন্নগর—যেহেতু তোমার দাদা মণীন্দ্রনাথ মিত্র আমাদের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত, সেইহেতু এই বিনিময় সঙ্ঘের সভ্য হইবার অধিকার তোমার আছে। পরবর্তী সংখ্যায় তোমার টিকিটের বিষয় বিজ্ঞাপিত হইবে।

১৭। ফণীন্দ্রকুমার দাস, সিলেট—তোমার অনুমান ঠিক। সংগ্রাহকেরা নূতন কোরা টিকিটের চেয়ে ব্যবহার করা টিকিটই বেশী পছন্দ করেন যদি সেটা পরিষ্কার হয়।

আভাষ দাসগুপ্ত, যশোহর-সাধারণতঃ জার্ম্মাণ মার্ক ও ইংরাজী শিলিং সমমূল্যের বলিয়া ধার্য্য হয়, কিন্তু যুদ্ধের পর ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ মার্ক আর বহির্জগতের কেহ লইতে চাহেন নাই, তাহাতেই উহার বাজার দর অত্যন্ত পড়িয়া যায়, ঐ সময় বা 50,000,000,000 M, মাত্র এক পাউণ্ডের সমমূল্য হইতে পারে বলিয়া নির্দিষ্ট হওয়ায় ঐ সময়ে 'এক্স্‌চেঞ্জের' অর্থাৎ অর্থ বিনিময়ের মূল্য ঐ হিসাবে বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

নারীর কথা

কন্যামহল

পরিচালিকা—কুমারী নীলিমা মুখোপাধ্যায়

১। কুমারী নীহার ভৌমিক—মাট্রিক পরীক্ষা না দিয়া সিনিয়র ট্রেনিং ক্লাসে ভর্তি হওয়া যায় না। জুনিয়র ট্রেনিং ক্লাসের জন্য ষষ্ঠ মান পর্যন্ত বিদ্যা থাকিলেই চলিবে। ২ বৎসর পড়িতে হয়। এই ট্রেণিং পাইতে হইলে জুলাই মাসে তাহার জন্য দরখাস্ত করিতে হয়। তাহা হইলে নভেম্বর মাসে প্রবেশিকা পরীক্ষায় তাহাদের লওয়া হয়। ঐ পরীক্ষায় পাশ করিতে পারিলে জানুয়ারী মাস হইতে ক্লাসে যোগদান করিতে পারা যায়। খাওয়া থাকা, ও পড়া সমেত ইহার মাসিক খরচ প্রায় ১৭৲। ইহার অতিরিক্ত কিছু জানিতে হইলে Inspectress of School নামে ৫নং গভর্ণমেণ্ট প্লেস নর্থ এই ঠিকানায় পত্র লিখুন।

আলোচনা—

২। রৌদ্রে শুকান আতপ চাউলের অন্নই উৎকৃষ্ট। তবে আতপ চাউলের পরিবর্তে অধুনা সিদ্ধ চাউল খাওয়ার যে প্রচলন হইয়াছে ইহার কারণ ইহা অপেক্ষাকৃত লঘুপথ্য, স্নিগ্ধ, বায়ু ও কফ বৃদ্ধি করে না, দেহে জড়তার ভাব আনে না, নিদ্রাকর্ষক বা মাংসবৃদ্ধিকরও নহে অথচ বলকারক। শুধু তাহাই নহে বৈজ্ঞানিকগণ সম্প্রতি জানাইয়াছেন যে দুইবার সিদ্ধ করার ফলে কোনরূপ রোগের বীজাণু আর জীবদেহে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। তবে ঢেঁকিতে ভাঙ্গা সিদ্ধ চাউল ব্যবহার করাই উচিত।

৩। কুমারী রেবা ভদ্র (ঢাকা) নিম্নলিখিত প্রশ্ন দুইটী জানিতে চাহিয়াছেন—

(১) মেয়েদের আই, এ, পাশ করে এল, টি, পড়ার নিয়ম উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে কেন ?

(২) মেয়েরা ছেলেদের মত আই, সি, এস, ব্যারিষ্টার, উকিল প্রভৃতি হইতে পারে না কেন ?

৪। শ্রীশোভা রাণী রায় (রাণাঘাট)—

তোমার প্রেরিত "স্বাধীনতার পথে নারী" একটি সুন্দর প্রবন্ধ। তাই সেটা আমি সম্পাদকের বৈঠকে পাঠাচ্ছি।

আষাঢ়ের প্রশ্ন

১ Fungus কি ?

—শঙ্কর ব্রজবাসী, মথুরা।

২ রবীন্দ্র সাহিত্যের বৈশিষ্ট কি ?

—রণেন্দ্রনাথ ঘোষ চৌধুরী, মৃগকল্যাণ।

৩. বর্তমানে ইংলণ্ডে রাজকবি কে ?

—মধুসূদন মণ্ডল, বালীদেওয়ানগঞ্জ।

৪ পচা ডিম জলে ভাসে কেন ?

—অসীম রাহা বালিগঞ্জ।

৫ ভাইকাউণ্ট হ্যালিফ্যাক্স যখন ভারতের গভর্ণর জেনারেল ছিলেন তখন তাঁর নাম লর্ড আরউইন ছিল কেন ?—পপী বসু, পাটুয়াখালি।

৬ আকাশের রং নীল বর্ণ কেন ?

—দেবব্রত সিংহ, কলিকাতা।

৭. প্যারাসুটের সাহায্যে যেমন নামা যায় তেমনি উপরেও কি উঠা সম্ভব ?—রেবা ভদ্র, ঢাকা।

৮. অমাবস্যার পর প্রতিপদ থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত চাঁদের ক্রমবর্ধমান অংশমাত্র দেখাযায় কেন ?

—মনোজ দত্ত, চট্টগ্রাম।

৯ বাংলা দেশে সর্ব প্রথম প্রকাশিত বাংলা ও ইংরাজি দৈনিক পত্রের নাম কি ?

—অনিলবরণ ঘোষ, দাবড়া।

১০. ইংরাজী সাহিত্যে সব চেয়ে বড় সমালোচক কে ? —নীতীশ রঞ্জন দে ও নিখিল রঞ্জন দে, ঢাকা।

১১. মহাভারতের বৈশম্পায়ন ঋষির বিশদ পরিচয় কি ? —হেনা রাহা, বরকান্তা।

১২. শিশু সাহিত্যে সবশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক কে ?

—সমীর চৌধুরী, কটক।

১৩ বৈজ্ঞানিকেরা দুধ থেকে কি কি নূতন দ্রব্য আবিষ্কার করেছেন ? —বীরেন্দ্রনারায়ণ সরকার, কবিদপুর।

১৫. ভারতবর্ষ থেকে নীলের চাস উঠে গেল কেন ?

রুবরঞ্জন সরকার, হাওড়া।

১৬. সমুদ্রে অত বড় বড় ঢেউ ওঠে কেন ?

—বৈদ্যনাথ শেঠ, বাঁশবেড়িয়া।

১৭. কোন প্রাণীর দৃষ্টি শক্তি সবচেয়ে বেশী,

বি, এ, ক্লাব, বাণীতলা।

১৮ কোথাও বজ্রপাত হইলে নিকটে দুধ থাকিলে তাহা টকিয়া যায় কেন ?

—শৈলেন্দ্রকুমার রায়, কলিকাতা।

১৯ ডিম ভূমিষ্ঠ হইবার সময় নরম থাকে কিন্তু পরে শক্ত হয় কেন ?

—কামদারঞ্জন ভট্টাচার্য, নবপুর।

২০. টাইপরাইটার আবিষ্কার করে কে ?

হরিপদচক্রবর্ত্তী, বাবুরহাট।

২১. দূর হতে কোনো আলো দেখলে মনে হয় যেন তার চারিদিকে আলোক শিখা ছড়িয়ে পড়ছে, এটা হয় কেন ? —ধীরেন্দ্রনাথ মহান্তি, দাঁতন।

২২. বাংলা অক্ষর কতদিনের পুরাতন ?

নীলিমা দেবী মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা।

২৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত "বিশ্ব ভারতীর" উদ্দেশ্য কী? —প্রিয়তোষ গাঙ্গুলি, বরাহনগর।

২৪. ক্রিকেট খেলার আবিষ্কারক কে?
—সিদ্ধেশ্বর মিত্র, বালিগঞ্জ।

২৫ কে প্রথম 'লাইট হাউস' নির্মাণ করেন?
—মৃণালকান্তি গুপ্ত, শিয়ালদহ।

২৬. সর্বপ্রথম সময় নিরূপণ পদ্ধতি কে আবিষ্কার করেন?—সনৎকুমার ভট্টাচার্য, আরিয়াদহ।

২৭. য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের মুদ্রার নাম কি?
—নীলিমা দাস, আকোলা।

২৮ আমাদের দেশে স্ত্রীলোকগণের পক্ষে উচ্চশিক্ষা ভাল না মন্দ? —অশ্বিনীকুমার মণ্ডল, আহমদপুর।

২৯. অন্ধকূপ হত্যার বিবরণ কি সত্য?
—পশুপতিনাথ ঘোষাল, কলিকাতা।

৩০. যুদ্ধের মহাযন্ত্র ট্যাঙ্কের (Tank) বিশদ বিবরণ কি?—অনিলবরণ মহান্তি, দাঁতন।

জ্যৈষ্ঠের প্রশ্নোত্তর

১। আলোক শিখা পদার্থটি কি? জলন্ত গ্যাস মাত্র। যার আপেক্ষিক গুরুত্ব বায়ুমণ্ডলের চেয়ে লঘু। এরূপ গ্যাসের ধর্মই হচ্ছে উপর দিকে উঠে যাওয়া। বিশেষতঃ, প্রজ্বলিত আলোক শিখা আপন উত্তাপে চারি পার্শ্বস্থ বায়ুমণ্ডলের চাপকে সরিয়ে অনবরত অক্সিজেন গ্যাসের সন্ধানে উর্ধ্বে ধাবমান। তাই অগ্নি শিখা সতত উর্ধ্বমুখী এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবমুক্ত।

২। খ্রীস্টান ধর্মগ্রন্থ বলে ঈশ্বর সপ্তাহে ছদিন ধরে ক্রমাগত সৃষ্টিকার্যে শ্রান্ত হয়ে রবিবার (Sabbath Day) বিশ্রাম নিয়েছিলেন। তাই খ্রীস্টান জগতে প্রত্যেক মানুষের কাছে রবিবার পবিত্র দিন। সেদিন তাই সমস্ত কাজ বন্ধ রেখে কেবল ঈশ্বর উপাসনায় দিন যাপনের ব্যবস্থা হয়েছে।

৩। চোখের পাতার অভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্ম স্নায়ু ও পেশী সমূহ হঠাৎ কখন অধিকতর রক্তের চাপে সঙ্কুচিত প্রসারিত হওয়ার ফলে আঁখিপল্লব মাঝে মাঝে স্পন্দিত হয়। আমরা একে বলি চোখ নাচা, ভাবি অমঙ্গলের সঙ্গে এর কোনও সংস্রব নেই; ওটা অশিক্ষিতদের ভ্রান্ত কুসংস্কার।

৪। পঞ্চভূতে গঠিত দেহ পঞ্চভূতের সঙ্গে মিলিয়ে যায়।

৫। স্বর্গীয় তারাচাঁদ শিকদারের প্রণীত "ভদ্রার্জুন" নাটক ১৮৫২ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়, তারপর ১৮৫৭ খৃস্টাব্দে রামনারায়ণ তর্কালঙ্কারের "কুলীন কুলসর্বস্ব", তারপর ১৮৫৯ খৃস্টাব্দে মাইকেল মধুসূদনের প্রথম উচ্চ অঙ্গের বাংলা নাটক 'শর্মিষ্ঠা' প্রকাশিত হয়। ১৮৪৯ সালে প্রকাশিত নীলমণি পাল রচিত 'রত্নাবলী' নাটক সংস্কৃতের অনুবাদ।

৬। বর্তমান পৃথিবীতে সমস্ত জিনিষই আশ্চর্য। এমন কোনো কিছু নেই যাকে বলা চলে—এটাত একটুও আশ্চর্য নয়।

৭। শিকাগোর শ্রীযুক্ত গস্ আধুনিক উন্নত রোটারি মুদ্রাযন্ত্র উদ্ভাবন করেন উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে। ইহাতে সর্বপ্রথম একখানি মার্কিন সংবাদপত্র মুদ্রিত হয়েছিল। কিন্তু এর গোড়াপত্তন করেছিল ১৮০৪ খৃস্টাব্দে জার্মাণ যন্ত্রবিদ্ হের কোয়েনিগ্। ১৮১৪ খৃঃ অব্দে কোয়েনিগের উদ্ভাবিত নূতন মুদ্রাযন্ত্রে সর্বপ্রথম লণ্ডনের 'টাইমস্' পত্রিকা মুদ্রিত হয়।

৮। সিদ্ধ ডিম অপেক্ষা টাটকা দুধের Food Value বেশি, কারণ ডিমের মধ্যে কেবল মাত্র 'ভাইটামিন-এ' এবং বি আছে, কিন্তু, টাটকা দুধে 'ভাইটামিন-এ' 'বি' 'সি' তিনটিই আছে, এবং তদতিরিক্ত আরও দুটি খাদ্যপ্রাণ আছে বলে বৈজ্ঞানিকেরা ঘোষণা করেছেন।

৯। ১৭২১ খৃঃ অব্দে বৈজ্ঞানিক ফার্ণহাইট্ ফ্রান্সে সর্বপ্রথম থার্মোমিটার আবিষ্কার করেন।

১০। ডারউইন তাঁর 'বিবর্তনবাদ' (Theory of Evolution) এবং 'প্রাণীতত্ত্ব' (Origin of Species) সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা পূর্ণ গ্রন্থ রচনার জন্য বিখ্যাত।

১১। বাংলাদেশের মহিলা ঔপন্যাসিকারা প্রায় সকলেই সমান লেখেন। এঁদের মধ্যে ছোট বড় ভেদ একরকম নেই বলা যেতে পারে। প্রত্যেকের রচনাই বিশেষত্ব বর্জিত। একমাত্র শ্রীযুক্তা শৈলবালা ঘোষজায়া ও আশালতা সিংহের রচনায় কিছু স্বাধীন চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তোমরা বড় হয়ে সকলের রচনা সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে না পড়লে বুঝতে পারবে না।

১২। বেকন ১৫৫১ খৃঃ অব্দে টেলিস্কোপের কল্পনা করেছিলেন কিন্তু ১৬০৯ খৃঃ অব্দে গ্যালিলিও প্রথম টেলিস্কোপ তৈরী করেন।

১৩। স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষকে নাট্যকার হিসাবে এখনও কেউ অতিক্রম করতে পারেনি। গিরিশচন্দ্রের

সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক 'সিরাজদ্দৌলা'। অনেকের মতে 'প্রফুল্ল', কিন্তু প্রফুল্ল আতিশয্য দোষে দুষ্ট।

১৪। মাটিতে ফিরিয়া আসিতে অল্প সময় লাগে।

১৫। সুমিত্রা দ্বীপের 'ব্যাফ্লেশিয়া' ফুল।

১৬। গ্র্যাফাইটের সঙ্গে বিভিন্ন বর্ণের 'এ্যানালাইন ডাই' বা রাসায়নিক রং মিশিয়ে বিবিধ রঙিন পেন্সিল প্রস্তুত হয়।

১৭। 'সূর্যমুখী' সূর্যালোকেই বাড়ে, তাই সূর্যের দিকে সর্বদা ফিরে থাকে।

১৮। 'প্ল্যানচেট্' একটা তেপায়া টেবিল নিয়ে 'প্রেতাত্মা' নামাবার বুজরুকি। ওটা নিয়ে খানিকটা সময় কাটে, অর্থাৎ সময় নষ্ট হয়। আর কোন কাজ হয় না।

১৮। সভ্যতাগর্বিত মানুষের শিক্ষা দীক্ষা রুচি ও রসবোধ এবং সূক্ষ্মশিল্প, সাহিত্য, নৃত্যগীত ইত্যাদি মানসিক উৎকর্ষ এবং চিন্তা ও কল্পনা ইত্যাদি মস্তিষ্কের উন্নতি ও উচ্চ আদর্শের অনুশীলনকে মানব সভ্যতার ভাষায় কৃষ্টি বা সংস্কৃতি বলে। ইংরাজিতে বলে 'কাল্‌চার'।

২০। ইহার কারণ পৃথিবী ঘুরিতে ঘুরিতে মধ্য রাত্রিতে যেখানে পৌঁছায় সেখান হইতে শুক্র গ্রহকে দেখা যায় না। যেমন মধ্যরাত্রিতে সূর্যকেও দেখা যায় না। শুক্রগ্রহ সূর্যের কাছাকাছি থাকে।

২১। বাংলা ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস এখনও লিখিত হয় নি। কারণ বঙ্কিমচন্দ্র যে উপন্যাস লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ তার চেয়ে উৎকৃষ্টতর উপন্যাস লিখেছেন, আবার রবীন্দ্রনাথের চেয়েও উৎকৃষ্টতর উপন্যাস লিখেছেন শরৎচন্দ্র। এবং শরৎচন্দ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপন্যাস লিখেছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। আরও শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের জন্য বাংলার কথা সাহিত্য অপেক্ষা করছে। ১১নং প্রশ্নের উত্তর দেখ।

২২। পাহাড়ের প্রথম উৎপত্তি হয়েছিল আদিম যুগের প্রবল ভূমিকম্পের ফলে। সেই প্রচণ্ড কম্পনে ভূগর্ভস্থ মৃত্তিকা ও প্রস্তর উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে সাগর তরঙ্গের মত, অর্থাৎ ঢেউয়ের আকারে। পাশাপাশি দুটি ঢেউয়ের মধ্যে যেমন বায়ুর চাপে একটা খাদের সৃষ্টি হয় পাহাড় উৎপত্তির সময়ও ঠিক সেইভাবে দুটি পাহাড়ের মধ্যে খাদের সৃষ্টি হয়েছে। চার পাশের মৃত্তিকা পর্বতাকারে উঁচু হয়ে ওঠার ফলেই পাহাড়ের পাশে আমরা খাদ দেখিতে পাই।

২৩। শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণের স্বাভাবিক প্রয়োজনে শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েই কাঁদে, এর ফলে তার ফুসফুসটি কার্যক্ষম হয়।

২৪। কবিত্বশক্তি ঐশ্বরিক দান।

২৫। স্বাধীনতা।

২৬। আমাদের শরীরের সমস্ত রসই লবণাক্ত। যেমন ঘর্ম ইত্যাদি। উহা স্যালাইন ও সোডিয়ম ক্লোরাইড় সংযুক্ত। চোখের জল তাই লোনা হয়।

২৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইনি সুরস্রষ্টা বা সুরকার ও সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ। 'সঙ্গীতজ্ঞ' মানে 'গায়ক' নয়।

২৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এর আগে যা ছিল তা 'রূপকথা'। সাহিত্যের উচ্চ আদর্শ তার মধ্যে নেই।

২৯। প্রাচীন ভারতে সাহিত্যরত্ন, সাহিত্য ভারতী, সাহিত্যাচার্য, বিজ্ঞানাচার্য, তত্ত্বভূষণ, তর্কালঙ্কার, বাচস্পতি, মহামহোপাধ্যায় ইত্যাদি উপাধি ছিল।

৩০। সম্পূর্ণ কালো রংয়ের ফুল নেই। কৃষ্ণাভ রক্তিম গোলাপফুল আছে ইংরাজী নাম 'ব্ল্যাক প্রিন্স'। 'ব্ল্যাক টিউলিপ' কাল্পনিক ফুল।

৩১। পল্লীর পরিবেশযুক্ত নাগরিক জীবনই শ্রেয়।

৩২। সূর্যালোক বেলা বাড়ার সঙ্গে প্রখর ও উত্তপ্ত হলে সূর্যকিরণের গুণের বিপর্যয় ঘটে। ভোরের সূর্যালোক 'ওজোন' পূর্ণ ভোরের বাতাসের ন্যায় স্নিগ্ধ ও জীবনী-শক্তিদায়ী অতি বেগুনে রশ্মিযুক্ত থাকে।

৩৩। ১৯১৪ খৃঃ অব্দে সুইনটন নামে জনৈক বেলজিয়ান ইহা প্রথম উদ্ভাবন করেন। সুইনটনের এই উদ্ভাবনার সুযোগ নিয়ে ইংরাজরা প্রথম 'ট্যাঙ্ক' নির্মাণ করেন ও ১৯১৬ সালে ফ্রান্সের যুদ্ধে ব্যবহার করেন।

৩৪। পৃথিবীর উর্ধ্বে যতদূর হইতে আলোক আসে ততদূর পর্যন্ত আমাদের দৃষ্টি যায়, তাই আমরা বহু দূরস্থ নক্ষত্রগুলিও দেখতে পাই। কিন্তু সমতল ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আশে পাশে সওয়া একমাইলের বেশী আমাদের দৃষ্টি যায় না কারণ পৃথিবী গোলাকার বলে দিকচক্রবালে আমাদের দৃষ্টি ব্যাহত হয়। কিন্তু বিমানপোতে একমাইল উর্ধ্বে উঠলে সেইখান থেকে আমাদের দৃষ্টি চারিদিকে ৯৬ মাইল পর্যন্ত যেতে পারে।

৩৫। একপ্রকার জলজ 'বেনা' বা 'নল-খাগড়া' (Sea weed) জাতীয় গাছের পাতা দেখে কৃষকেরা বৃষ্টির সম্ভাবনা বুঝতে পারে, কারণ ঐ পাতাগুলি বৃষ্টির পূর্বে সরস হয়ে ওঠে।

৩৬। স্বেচ্ছাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার কোনো সুযোগ যাতে না থাকে এবং কঠোর নিয়মানুবর্তিতা যাতে সম্পূর্ণ পালিত হয় সেইদিকে লক্ষ্য রেখেই ছাত্র আন্দোলনের কার্যসূচী প্রণীত হওয়া প্রয়োজন।

৩৭। যে কোনও বিভিন্ন বিষয়ের রসাত্মক বাক্য সমষ্টিকেই কাব্য বলা চলে। কিন্তু কাব্যে একাধিক সর্গে কোনো সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক বীর রসাত্মক বা

কাল্পনিক মহাভাবযুক্ত নবরসাত্মক কাহিনী বর্ণিত হলে উহাকে বলা হয় মহাকাব্য। গীতছন্দে রচিত মর্মস্পর্শী ভাবাত্মক খণ্ড কবিতাকে বলে গীতিকাব্য।

৩৮। জলের চেয়ে তেল লঘুতর তরল পদার্থ বলে জলের উপর ভাসে এবং উভয়ের মূল উপাদান বিভিন্ন বলে পরস্পর মিশে যায় না।

৩৯। ফরাসী সৈনিকেরা পূর্বকালে কোথাও যুদ্ধে জয়লাভ করলে ঊর্ধ্বতন অধিনায়কদের বিনা অনুমতিতেই লুট পাট সুরু করে দিত। তাই থেকে ইংরেজরা বিদ্রূপ-চ্ছলে বিনা অনুমতিতে কাজ থেকে ছুটী নেওয়াকে 'ফ্রেঞ্চ-লিভ' বলে।

৪০। পুরুষের ন্যায় প্রকৃতিবিশিষ্ট দুঃসাহসী বীর নারীদের 'আমেজনস্' বলে। কথাটার উৎপত্তি আমেরিকার আমেজন নদী তীরবাসী আদিম 'রেডইণ্ডিয়ান' রমণীদের উপমা থেকে। কারণ এদের চেহারাও যেমন লম্বা চওড়া বলিষ্ঠ ছিল, তেমনি এরা দুঃসাহসিকা যোদ্ধাও ছিল।

৪১। না।

৪২। প্রেসিডেণ্ট উইলসনের ১৪ দফা সর্ত শান্তি প্রতিষ্ঠার পর য়ুরোপে কেউ মানতে চাইলেনা বলে আমেরিকা য়ুরোপের 'জাতিসঙ্ঘে' প্রবেশ করেনি।

৪৩। রাশিয়া, ইটালি, জার্মাণি, তুর্কী।

৪৪। কেশমূলে 'ভাইটামিন-এফ' এর অভাবে। এই কেশপ্রাণ 'ভাইটামিন-এফ' যুক্ত ক্যালকেমিকোর "কেশ তৈল 'ক্যাষ্টরল' নামক পরিশ্রুত সুগন্ধি রেড়ির তৈল ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়।

৪৫। গ্রীষ্মকালে সারাদিন জামা গায়ে থাকায় শরীরে ঘাম বসে বলে ঘামাচি হয়। খালি গায়ে থাকলে এবং দেহে গ্রীষ্মকালে চন্দন লেপন করলে বা নিম তেল মাখলে ঘামাচি হয় না। ক্যালকেমিকের নিম তৈল-জাত সাবান 'মার্গো সোপ' এবং নিমের পাউডার 'রেণুকা' ব্যবহারে ঘামাচি নিবারণ হয়।

৪৬। ইনি নিজেই আপন প্রতিভাবলে নৃত্যশিল্পী হয়েছেন। তবে এঁকে ছাত্রাবস্থায় কতকটা সাহায্য করেছিলেন শিল্পী 'বদেনষ্টাইন।'

৪৭। এই কিংবদন্তির মূলে একটি গল্প আছে। দুই চোর রাত্রে চুরি করে পালাচ্ছিল। পথে ভোর হয়ে যায়, ধরা পড়ার ভয়ে তারা পথিপার্শ্বে পরিত্যক্ত একখানি খাটিয়া দেখতে পেয়ে তারই উপর চোরাই মাল রেখে চাদর চাপা দিয়ে মৃতদেহ বহনের মত কাঁধে তুলে নিয়ে যেতে সুরু করলে। সেই সময় আর দুই পাকা চোর দেখতে পেয়ে বললে 'কি দাদা, মেসোর গাড়ুর নল দেখা যায় যে।' পূর্বোক্ত চোর দুটি বুঝতে পেরে তাদের বললে 'এস ভাই ভাগে এস, মেসো মরেছে।' তখন তারাও ওদের সঙ্গে জুটে গিয়ে খাটিয়ায় কাঁধ দিয়ে 'বলো হরি হরিবোল' বলে নিরাপদে চোরাই মাল বহন করে নিয়ে যায়। সেই থেকে 'চোরে চোরে মাস্তুতো ভাই' কথাটার উৎপত্তি।

৪৮। কাঁসার জিনিসে আঘাত লাগলে ধাতুপাত্র কম্পিত হয় ও বাতাসের ভাইব্রেশনে বেজে ওঠে। হাত দিয়ে ছুঁলে সেই সূক্ষ্ম কম্পন থেমে যায় সঙ্গে সঙ্গে বাজনাও বন্ধ হয়।

৪৯। বৃষ্টির অব্যবহিত পরে বায়ুমণ্ডলে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা থেকে যায় তার উপর সূর্য রশ্মি এসে পড়লে আলোকের প্রতিসরণ ও প্রতিফলনের জন্য সূর্যকিরণের সাতটি রংই সুস্পষ্ট হয়ে উঠে এবং বৃহৎ এক ধনুর আকারে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, আমরা উহাকেই 'রামধনু' বলি।

৫০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৫১। ছাত্রসঙ্ঘে নিয়ম শৃঙ্খলা কঠোর উপায় অবলম্বনে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

৫২। গল্প, ছড়া, ও চিত্রের সাহায্যে খেলা ধুলার মধ্যে শিক্ষা দেওয়াই শ্রেষ্ঠ পন্থা।

৫৩। ১৮২৫ খৃঃ অব্দে মিঃ ব্রুনেল এর নির্ম্মাণ কার্য সুরু করেন, রেলপথ যানবাহন ও লোক চলাচলের সুবিধার জন্য। ১৮৪৩ খৃঃ অব্দে এর নির্মাণ কার্য শেষ হয়।

৫৪। জার্ম্মানিতে প্রথম তৈয়ার হয়। ভারতে প্রস্তুত হয় না। অশোষক কাগজের উপর পাতলা রংয়ের প্রলেপে এই ছবি ছাপা হয় এবং উপরে গঁদের আটার পালিশ থাকে। জলে ভিজিয়ে সেই ছবি অন্য যে কোন আধারের উপর তুলে নেওয়া যায়।

৫৫। নিদ্রিত অবস্থায় মানুষের মস্তিষ্ক যখন সক্রিয় থাকেনা তখন ভিতরের অবচেতন মনের সঞ্চিত ভাবনা স্বপ্ন রূপে দেখা দেয় এবং আমাদের অন্তরের অসংলগ্ন চিন্তা আবোল-তাবোল কথায় প্রকাশ পায়।

উত্তরদাতাদের নাম	ঠিকানা	কোন কোন প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পেরেছেন
শ্যামাপ্রসন্ন চক্রবর্তী	কলিকাতা	১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৯, ১০, ১২, ১৩, ১৪ ১৫, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২৩, ২৮, ২৯, ৩৩, ৩৭, ৩৮, ৪০, ৪২, ৪৩, ৪৫, ৪৮, ৪৯, ৫১
নীলিমা দেবী মুখোপাধ্যায	কলিকাতা	১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৭, ৮, ৯, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২২, ২৩, ২৬, ২৭, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৭, ৩৮, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩ ৫৪, ৫৫
পুলিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়	শেওড়াফুলি	১৩, ১৬, ১৯, ২২, ২৩, ২৪, ৩২, ৪৪
পঙ্কজমোহন, সিদ্ধার্থকুমার রায়	কোতুলপুর	১, ৩, ৪, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৯, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৬, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫৩, ৫৪
বিশ্বনাথ সেনগুপ্ত ও মনোজ দত্ত	চট্টগ্রাম	১, ২, ৩, ৪, ৬, ৮, ৯, ১০, ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৭ ১৮, ১৯, ২০, ২৪, ২৫, ২৬, ২৮, ২৯, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪১, ৪৩, ৪৫, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫৪, ৫৫
কামদারঞ্জন ভট্টাচার্য	নবপুর	৬, ২২, ৩৮, ৪৩, ৪৭
শৈলেন্দ্রকুমার রায়	কলিকাতা	৬, ৮, ১০, ১৩, ১৫, ১৮, ২৭, ২৬, ৩০, ৪০, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৮, ৪৯, ৫৪, ৫৫
সনৎকুমার ভট্টাচার্য	আরিয়াদহ	৬, ৯, ১২, ১৪, ২৪, ৩৩, ৪৩, ৪৪, ৪৮, ৫০, ৫৫
নীলিমা দাশ	আকোলা	১, ২, ৪, ৮, ১০, ১৯, ২২, ২৪, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১
অশ্বিনীকুমার মণ্ডল	আহমদপুর	১, ২, ২২, ২৪, ৩৮, ৪০, ৪৭, ৪৮, ৪৯
তারাপদ চক্রবর্তী	ফেণী	৬, ৯, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৭, ১৯, ২২, ২৪, ২৫, ৩১, ৩৬, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৯, ৫৩, ৫৫
ঠাকুরপ্রসাদ সান্ন্যাল	পাবনা	২, ৩, ১০, ১৩, ১৪, ১৮, ২৫, ২৬, ৪১, ৪৩, ৪৪, ৫২, ৫৫
ধ্রুবরঞ্জন সরকার	হাওড়া	৪, ৫, ৬, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৮, ২৪, ২৭, ৩০, ৩১, ৩৪, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫৫
ইন্দ্রাণী রায়	পাটনা	৩, ৬, ৯, ১০, ১২, ১৫, ১৬, ১৮, ২১, ২৪, ৩০, ৩১, ৪১, ৪৩, ৪৪, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫৩, ৫৫
গৌরাঙ্গ রুদ্র	চট্টগ্রাম	৯, ১২, ২৪, ১৫, ৩৪, ৩৮, ৪৪, ৪৯
বীরেন্দ্রনারায়ণ সরকার	ফরিদপুর	২, ৩, ৪, ৬, ৯, ১০, ১৪, ১৫, ১৮, ২৪, ২৫, ২৬, ৪১, ৪৩, ৪৬, ৪৮, ৪৯, ৫৩
শশীভূষণ ভট্টাচার্য	হেমনগর	১, ৩, ৪, ৬, ৯, ১০, ১২, ১৩, ১৬, ১৮, ২২, ২৪, ২৫, ২৬, ২৮, ৩৬, ৩৭, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৯, ৫১, ৫৫,
সমীর চৌধুরী	কটক	৬, ৮, ১০, ১২, ১৩, ২০, ২২, ২৪, ২৫, ২৬, ৩৩, ৩৮, ৪০, ৪১, ৪৩, ৪৮, ৪৯, ৫৪, ৫৫,
অনিলবরণ মহান্তি	দাঁতন	১, ৪, ৬, ৮, ৯, ১২, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ২২, ২৪, ২৫, ৩৭, ৩৮, ৪০, ৪৩, ৪৮, ৪৯

উত্তরদাতাদের নাম	ঠিকানা	কোন্ কোন্ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পেরেছেন
হরিকমল পুরকায়স্থ	শিলং	২, ৪, ৬, ৮, ৯, ১০, ১৩, ১৫, ১৮, ৪০, ৪৯
শক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	ডিব্রুগড়	১, ৫, ৬, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৮, ২৩, ২৫, ২৬, ২৮, ৩০, ৩৩, ৩৭, ৩৮
অনিলবরণ ঘোষ	দাবড়া	৩, ৮, ১০, ১৯, ২৩, ৩৮, ৪১, ৪৮
নীতীশরঞ্জন ও নিখিলরঞ্জন দে	ঢাকা	১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৯, ১০, ১২, ১৩, ১৫ ১৬, ২০, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৯, ৩০, ৩১, ৩৩, ৪০, ৪১, ৪৩, ৪৪ ৪৫, ৪৮, ৪৯, ৫৫
সেখ সিরাজউদ্দীন	খাগড়া	৬, ১৫, ২২, ২৪, ৩০, ৩৮, ৪৩, ৪৫, ৪৮, ৪৯, ৫৫
রেবা ভদ্র	ঢাকা	১, ৬, ১০, ১১, ১৫, ২৪, ৩৩, ৩৮, ৪১, ৪৩, ৪৭, ৪৯, ৫৫
বৈদ্যনাথ শেঠ	বাঁশবেড়িয়া	১, ২, ৬, ১০, ১২, ১৩, ১৫, ২৪, ২৮, ৩৩, ৩৮, ৪১, ৪৯, ৫২
সাধনা বসু	বারুইপুর	১ ২, ৩, ৯, ১০, ১২, ১৪, ২০, ৩৩, ৪০, ৪৮, ৪৯, ৫৫
প্রভাতকিরণ দে	আহমদপুর	৬, ৮, ১০, ১৬, ১৭, ২৪, ২৫, ৩১, ৪৮, ৩৮, ৪৩, ৪৯, ৫২, ৫৫
হরিসভা	মুন্সীগঞ্জ	১, ৪, ৬, ৮, ৯, ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ২০, ২৪, ২৭, ৩৩, ৩৭, ৩৮, ৪০ ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৮, ৪৯
রণেন্দ্রনাথ ঘোষচৌধুরী	চাঁদভাগ	২, ৪, ১৫, ২৮, ৪৩, ১০, ৪০,
দেবব্রত সিংহ	কলিকাতা	৯, ১৫, ৪০
মধুসূদন মণ্ডল	বালী দেওয়ানগঞ্জ	১, ৯, ১০, ১২, ১৪, ১৫, ২৪, ৩০, ৩৩, ৪৩
অণিমা চ্যাটার্জি	উত্তরপাড়া	১, ২, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮, ১৯, ২৪, ৪০, ৪৯
প্রণব রায়চৌধুরী	কলিকাতা	১, ২, ৬, ১২, ১৪, ৩৮, ৪০, ৪৩, ৪৯
আরতি গুহ	নবগ্রাম	১, ২, ৩, ৪, ৫, ৭, ১০, ১২, ১৩, ১৬, ১৮, ১৯, ২০, ২২, ২৩, ২৪, ২৬, ২৮, ২৯, ৩০, ৩৭, ৩৮, ৪০, ৪১, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৮, ৪৯, ৫২, ৫৪, ৫৫
প্রিয়তোষ গাঙ্গুলী	বরাহনগর	৩, ১০, ১২, ১৪, ৩৩, ৩৮, ৪৩, ৪৮, ৫৩
শকুন্তলা বসু	খুলনা	২, ৫, ৬, ১২, ১৫, ৩৪, ৩৮, ৫৩
চাঁদু মুখোপাধ্যায়	শেওড়াফুলি	২, ৩, ৬, ৪০, ৪৩
গোপীনাথ দে	বৈদ্যবাটী	৮, ৯, ১০, ১২, ১৫, ৩৮
সিদ্ধেশ্বর মিত্র	বালিগঞ্জ	৯, ১২, ১৩, ১৮, ৩৭, ৩৮, ৪৯, ৫৩
মৃণালকান্তি গুপ্ত	শিয়ালদহ	২, ৬, ৭, ৯, ১২, ১৩, ৩৮, ৪৩, ৪৯
পশুপতিনাথ ঘোষাল	কলিকাতা	২, ৬, ১৩, ১৪, ১৫, ২৪, ৪৩, ৪৮
নীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার	বালিগঞ্জ	১, ২, ৬, ৯, ১২, ১৪, ১৮, ১৯, ২৫, ২৮, ৩৮, ৪৩, ৪৮, ৪৯, ৫২, ৫৫
অসীম রাহা	বালিগঞ্জ	৩, ৪, ৬, ৯, ১৩, ১৪, ১৫, ২৪, ২৮, ৪০, ৪৯, ৫৫
পপী বসু	পটুয়াটুলি	২, ৬, ৮, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৮, ২৩, ২৪, ২৬, ২৮, ২৯, ৩১, ৩৭, ৪০

(গ্রন্থাগারিক)

গল্পসল্প—

রচয়িতা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রকাশক : বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২, কলেজস্কোয়ার, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৪৮, পৃষ্ঠা ৮৪, মূল্য—এক টাকা।

উৎকৃষ্ট মোটা এণ্টিক কাগজে সুন্দর ছাপা এবং সুদৃশ্য প্রচ্ছদে বাঁধা। 'বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়' বইখানির বিজ্ঞাপন দিয়েছেন 'ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য নূতন গল্প ও কবিতার বই।' কিন্তু বইখানি পড়ে মনে হল কোথাও যেন কি একটা তাঁদের ভুল হয়ে গেছে। গল্পসল্পের গল্প ও ছড়ার যিনি ভাগ্যবতী শোত্রী সেই শ্রীমতী কুসমি যে বালিকা বা কিশোরী নন, তিনি যে স্বামী সোহাগিনী ও দাদুর মনোহারিনী তরুণী এ তত্ত্বটা বইখানির প্রথম পাতা থেকেই যেমন আবিষ্কার করা যায়, তেমনি এর দু'চারিটি গল্প পড়লেই বোঝা যায় ছোট ছেলেমেয়েত দূরের কথা, কুসমির বিদ্যমামা ও নীলুর ভাগ্যেও এর মধ্যে ফল্গুধারার স্থায় প্রবাহিত বৃহৎ সমস্যাসম্বলিত গভীর রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে কিনা সন্দেহ। শানিত ইস্পাতের ঝল্‌কানো তরবারির সূক্ষ্ম ধারের ন্যায় প্রখর অথচ নমনীয় ভাষায় কবি এর প্রত্যেক গল্পের মধ্যে যে বে-পরোয়া কশাঘাত চালিয়েছেন তা হয়ত অনেকেরই পৃষ্ঠদেশের পীড়ার কারণ হ'ত, যদি না হাসির রেশমি-ঝিমুনিতে কবি সে চাবুক এমন সহনীয় করে তুলতেন।

'আলো যার মিটমিটে, স্বভাবটা খিটখিটে, বড়োকে করিতে চায় ছোটো' কিংবা 'সব ছবি ভুসো মেজে, কালো ক'রে নিজেকে যে মনে করে ওস্তাদ পোটো' এদের দলের মাথায় গল্পসল্পে যে বিদ্রূপের বোমা বর্ষিত হয়েছে তা বিস্ফোরকের মতোই অন্তর বিদারক, অথচ প্রীতিকর!

'চণ্ডী' গল্পটি উপলক্ষ করে কবি বলেছেন—'ও একটা ছবিমাত্র। কড়া কড়া লাইনে আঁকা। ওতে রস নেই।' (এটা অবশ্য কবির বিনয়, কেননা প্রত্যেকটি গল্প রসেভরা।) 'মানুষ বরাবর সত্যি খবর দিয়ে এসেছে গল্পের মধ্যে মুড়ে। একেবারে ময়রার দোকান বানিয়ে রেখেছে। সন্দেশের মধ্যে ছানাকে চেনাই যায় না।'

কবির আলোচ্য গ্রন্থ গল্পসল্পের আসল রূপই হল এই। এর ভিতরের কথাটি এই ইঙ্গিতের মধ্যেই রয়েছে। গল্পের কিংখাবে মোড়া খাঁটি সমালোচনার সোনা রয়েছে এর মধ্যে। 'মুনশী', 'ম্যাজিসিয়ান' 'ম্যানেজারবাবু', 'বাচস্পতি', 'ধ্বংস' ও 'ভালমানুষ' গল্পগুলির মধ্যে আত্মগোপন করে রয়েছে পৃথিবীর নানা চরিত্রের নানা স্তরের মানুষ, যাদের পেশা ওস্তাদী থেকে মাষ্টারী, ব্যবসা, চাকরি, রাজনীতি, সাহিত্য সেবা এমনকি চাঁদার নামে জুয়াচুরী পর্যন্ত! প্রত্যেক গল্পটি যেমনি চিত্তাকর্ষক তেমনি অন্তস্পর্শী। বহু পাঠকই হয়ত এর মধ্যে আয়নায় মুখ দেখার মতো আপন চরিত্রের ছায়া দেখতে পাবেন। এবং মজা এই যে সেটা দেখতে পেয়ে তাঁরা খুশিই হবেন, কবির উপর চটতে পারবেন না, এমনিই কবির কলমের মুন্সিয়ানা।

আহার ও আহার্য—

রচয়িতা : পশুপতি ভট্টাচার্য

প্রকাশক : বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২, কলেজস্কোয়ার, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ : ফাল্গুন ১৩৪৭, মূল্য—বারো আনা

ফুলিস্কাপ ১৬ পেজি ১৩৬ পৃষ্ঠা, ভাল কাগজ, ভাল ছাপা, মলাট নতুনত্ব আছে।

বইখানি বিশ্বভারতীর লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। লেখক ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্য বাংলার পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে দীর্ঘকাল ধরে গবেষণা করছেন। যোগ্য আহার নির্বাচনের দোষে বাঙালীর স্বাস্থ্য যে কতটা ভেঙে পড়ছে একথা আজ আর কারুর অবিদিত নেই। পথ্য বিচার সম্বন্ধে পরিভাষা বর্জিত সরল প্রণালীতে রচিত এই বইখানি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'আমাদের দেশে কুপথ্যজীর্ণ পাকস্থলীর পক্ষে এ গ্রন্থ বিশেষ উপযোগী হয়েছে। এই লেখা দেশের লোকে আহার সম্বন্ধে আপন অভ্যস্ত রুচির সংস্কার সাধনে শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যবহার করবে।" কবির সঙ্গে আমরাও সেই আশা পোষণ করি।

শিশুরবি—

রচয়িতা : শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

প্রকাশক : 'মধুচক্র' ৮০, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পুরু এণ্টিক কাগজে ছাপা। মূল্য ছয় আনা।

কিশোরবঙ্গ রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে ছোট ছেলেদের দ্বারা অভিনয়ের জন্য বিমলবাবু অতি অল্প সময়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালের কয়েকটি ঘটনা অবলম্বনে এই নাটকখানি রচনা করেছিলেন। কিশোর কবির জীবনী অবলম্বনে এরূপ একখানি নাটক রচিত হচ্ছে শুনে আমাদের খুবই আশঙ্কা হয়েছিল যে হয়ত নাটকখানি নির্দোষ ও ত্রুটীহীন না হতে পারে। আমরা দেখে সুখী হলুম, আমাদের আশঙ্কা যে অমূলক তা এই নাটকখানি সপ্রমাণ করতে পেরেছে। রবীন্দ্রনাথের মতো এক বিরাট পুরুষের বাল্য জীবনী নিয়ে নাট্য রচনার প্রচেষ্টা দুঃসাহসের পরিচায়ক বলতেই হবে, কিন্তু, বিমলবাবু যে এই কঠিন কায কোনো প্রকারে সম্পন্ন করতে পেরেছেন এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, তবে অত্যন্ত অল্প সময়ে ও তাড়াতাড়ির মধ্যে নাটকখানি তাঁকে শেষ করতে হয়েছে বলে তিনি যে এর মধ্যে কবির উত্তর জীবনের বিরাট সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ মূর্ত করে তুলতে পারেন নি, এজন্য তাঁকে দোষ দেওয়া চলে না। আশা করি ভবিষ্যৎ সংস্করণে তিনি এ নাটকখানিকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে তুলতে পারবেন।

আষাঢ়—১৩৪৮

নিয়মাবলী—(১) ধাঁধাঁ-সম্পাদকের মতে শব্দসন্ধানের যেটি সবচেয়ে নির্দোষ ও নির্ভুল সমাধান,—তার সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে উত্তর মেলা চাই। নির্ভুল সমাধানটি পরের মাসের পাঠশালায় প্রকাশিত হবে। (২) সাদা ঘরগুলির প্রত্যেকটিতে একটি ক'রে সংযুক্ত বা অসংযুক্ত অক্ষর বসবে। (৩) প্রতি সংখ্যার প্রতিযোগিতা-কুপনখানি কেটে ভর্তি ক'রে পাঠাবে সেই মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে। দেরি হ'লেই বাতিল। খামের উপরে ঠিকানা লিখবে—'শব্দ-সন্ধান', পাঠশালা কার্যালয়, ৩০ কর্নওআলিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। (৪) হরফগুলি সব পরিষ্কার হওয়া চাই—কাটাকুটি চলবে না। বানান ভুল হলে ভুল ধরা হবে। (৫) যে কোন পাঠক পাঠিকা যতগুলি ইচ্ছা কুপন পাঠাতে পারবে। (৬) 'শব্দ-সন্ধান'-সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ব'লে মেনে নিতে হবে।

সঙ্কেতসূত্র

—পাশাপাশি—

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—এবার শব্দ-সন্ধান সমাধানের আগে যুদ্ধের প্রারম্ভ থেকে কি কি ঘটনা ঘটেছে স্মরণ করে শব্দগুলি সন্ধান করতে হবে, কারণ এবার সাময়িক শব্দ-সন্ধান দেওয়া হয়েছে।

১। এঁরই দূরদর্শিতার ফলে ব্রিটেন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবার পূর্ণ এক বৎসর সময় পেয়েছিল, কিন্তু, এমনিই দুর্ভাগ্য এঁর যে, এই যুদ্ধের মধ্যে হতমান হয়ে এঁকে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে।

৩। সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে এঁর সমকক্ষ নেতা আর দ্বিতীয় কেউ নেই। এঁরই বক্তৃতার যাদুমন্ত্রে একতাবদ্ধ ব্রিটিশ জাতি যুদ্ধজয়ে কৃতসংকল্প হ'য়ে বহু ক্ষতি স্বীকার করেও মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষা কল্পে অকাতরে সমস্ত বিপদ মাথা পেতে নিচ্ছে।

৭। মধ্য য়ুরোপের এই স্থানটি সম্ভবত জার্মানির বিমান আক্রমণে উল্টে রয়েছে।

৮। ফরাসী ও ব্রিটিশ মিত্রশক্তি যুদ্ধের প্রারম্ভে জার্মানির দিকে অগ্রসর হয়ে প্রথমেই এস্থান অধিকার করেছিল, কিন্তু পরে জার্মাণ আক্রমণের প্রচণ্ডতাকে বাধা দিতে না পেরে ছেড়ে চলে আসে। সেই সঙ্ঘর্ষের ফলেই বোধ হয় স্থানটি এখানে উল্টে রয়েছে।

৯। এ দেশটি মাত্র চারদিনেই জার্মানির করতলগত হয়েছে, কিন্তু এর উপনিবেশ এখনও ব্রিটীশের পক্ষ অবলম্বন করে জার্মানির বিপক্ষতাচরণ করছে।

১০। ব্রিটিশ নৌবাহিনী সর্বপ্রথম এইখানেই জার্মানির একটি যুদ্ধ জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছে বলে ঘোষণা করেছিল। জাহাজ ডোবানোর জন্যই বোধ হয় এ স্থানটিও উল্টে রয়েছে।

১১। এই স্থানটুকুর অধিকার সাব্যস্ত করা নিয়েই 'মিউনিক-কনফারেন্স' বসেছিল।

১২। নার্ভিকের পর এই বন্দরেই জার্মানির সঙ্গে ব্রিটেনের দ্বিতীয়বার সংঘর্ষ হয়েছিল।

১৩। ইনিই ব্রিটেনের প্রধান শত্রু। এখানে একটু এলোমেলো হয়ে পড়েছেন—সম্ভবত 'আর-এফ-এ'র উপর্যুপরি বিমান আক্রমণে।

১৪। এই খালের মধ্যে জার্মানির নৌবাহিনী আশ্রয় নিয়ে রয়েছে বটে, কিন্তু, আর-এ-এফ ঘন ঘন আক্রমণে এদের নাস্তানাবুদ করে তুলেছে।

১৫। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডবদের প্রধান ভরসা ছিলেন যেমন শ্রীকৃষ্ণ বর্তমানযুদ্ধে তেমনি ব্রিটেনের প্রধান ভরসা হচ্ছেন ইনি।

১৬। বিসমার্ক বলেছিলেন এ জায়গাটি যে দখল করতে পারবে সে সমস্ত যুরোপের মালিক হতে পারবে। জার্মানি সম্প্রতি এ জায়গাটি দখল করেছে। তাই বোধ হয় স্থানটি এখানে উল্টে রয়েছে।

১৯। আলেকজেন্দ্রিয়া, সোমালিল্যাণ্ড, আবিসিনিয়া, এই তিন জায়গারই নামের এক একটা অক্ষর মাত্র এখানে খুঁজে পাওয়া যাবে। বিমান আক্রমণে আর কিছু বাকি নেই।

২১। জার্মানি তার নবাবিষ্কৃত এই যুদ্ধরীতির ফলেই দশদিনে ফ্রান্স অধিকার করতে পেরেছিল।

২৪। জার্মানির সমরানলের এ হ'ল শেষ আহুতি।

২৬। জার্মানির পোল্যাণ্ড অধিকারের সুযোগে রাশিয়া তার যে কটি হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করে নিয়েছে তার মধ্যে এও একটি। তবে স্থানটি এখানে একটু এলোমেলো হয়ে পড়েছে।

২৭। ভীষণ নৌযুদ্ধে এস্থানের 'পাটা' খোয়া গিয়ে কোনও রকমে উল্টে 'মান' রক্ষে হয়েছে।

২৮। বর্তমান যুদ্ধের সমস্ত উপকরণ ব্রিটেনকে এরই বিনিময়ে নিতে হচ্ছে।

২৯। জার্মানি তার যুদ্ধের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস এর পরিবর্তে না নিয়ে বিনিময় সাহায্যে সংগ্রহ করছে।

—উপর নীচে—

১। বর্তমান যুদ্ধ সুরু হবার পূর্বে এ হল জার্মানির যূপকাষ্ঠে প্রথম বলি।

২। বর্তমান যুদ্ধে ব্রিটেনের প্রথম পরাজয় ঘটে এইখানে।

৪। স্বদেশের বর্তমান রাষ্ট্র নেতাদের বিরোধী হয়ে যিনি ব্রিটেনের আশ্রয়ে স্বাধীন ফরাসী ফৌজ গঠন করে দেশোদ্ধারে ব্রতী হয়েছেন তিনি এখানে কয়েকটি বাজে অক্ষরের মধ্যে আত্মগোপন করে আছেন, সম্ভবত পেঁতে গভর্নমেন্টের ভয়ে।

৫। বর্তমান যুদ্ধে আমেরিকান সৈন্য প্রথম এই স্থান অধিকার করেছে। অনেকগুলি অক্ষরের আগাছা উপড়ে ফেললে তবে সেই সবুজ ক্ষেত্রের সন্ধান মিলবে এখানে একটু উল্টোপাল্টা ভাবে।

৬। বিমান আক্রমণের বিরুদ্ধে সব চেয়ে বেশি সুরক্ষিত এই স্থানেই সব চেয়ে বেশি বিমান আক্রমণ হচ্ছে।

১১। জার্মানি সিবিয়া ছেড়ে ধীরে ধীরে এইদিকেই অগ্রসর হয়ে আসছে বলে সকলে অনুমান করছেন।

১৭। নেপোলিয়নের পর কৈসার যে চেষ্টা করেছিল তা ব্যর্থ হয়, কিন্তু ইনি আবার য়ুরোপে সেই হুলস্থূল বাধিয়েছেন।

১৮। বোর্দো ও ভিচির আদ্যক্ষরের মাঝখানে যে হরফ এখানে বিরাজ করছে সে যে কাদের আদ্যক্ষর তা সবাই জানেন।

২০। সপ্তরথী মিলে অভিমন্যুকে যেমন বধ করেছিল তেমনি করেই ব্রিটিশ নৌবাহিনী একে জলে ডুবিয়ে দিয়েছে।

২২। এখানে রণকৌশলের এক অভিনব ও বিস্ময়কর ব্যাপার দেখে পৃথিবীর লোক অবাক হয়েছে।

২৩। ব্রিটিশের এ স্থানটি এ যুদ্ধে আমেরিকার তত্ত্বাবধানে চলে গেছে।

২৫। ১৩ তের মাইল দূর থেকে নিক্ষিপ্ত জার্মান যুদ্ধ জাহাজের একটি মাত্র গোলায় পৃথিবীর বৃহত্তম এই রণপোতের সলিল সমাধি ঘটেছে।

জ্যৈষ্ঠের শব্দ-সন্ধানের ফলাফল

জ্যৈষ্ঠের শব্দ-সন্ধান অত্যন্ত সহজ হওয়ায় এবার বেশ সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া গেছে। একই অর্থবাচক আর কি কি শব্দ আছে যদি একটু কষ্ট স্বীকার করে প্রতিযোগী বন্ধুরা সন্ধান করতেন, তাহলে অনেকেই এবার সম্পূর্ণ নির্ভুল উত্তর দিতে পারতেন, শ্রীমান অরুণকুমার মিত্র পাশাপাশি ১৪নং ঘরে 'করভ' লিখে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। প্রতিযোগিদের মধ্যে শতকরা নব্বই জনই যে 'করভ' লিখবে 'শ-র' এটা ঠিকই জানতেন, কারণ বাংলাদেশে আজকাল বুদ্ধিমান ও পরিশ্রমী ছেলে মেয়েদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। কিন্তু, অরুণ সমস্ত ঘরে সঠিক উত্তর বসিয়ে 'হস্তী-শিশুর' বেলা কেন যে হস্তী-মূর্খদের দলে গিয়ে ভিড়লেন বোঝা গেল না। 'করভ' ও 'কলভ' দুটোরই মানে যখন হাতীর বাচ্চা তখন নূতন শব্দটীকেই তাঁর বেছে নেওয়া উচিত ছিল যেমন বেছে নিয়েছেন তিনি উপর নীচে ২১নং ঘরে 'দেবদারু'র বদলে 'দেবতরু'টিকে! শব্দ-সন্ধানের বাহাদুরীত এইখানেই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই রকম ভুল গতমাসে কুমারী সাধনা-বসুও করেছিলেন, 'কুরবক' ও 'কুরুবক' নিয়ে। 'কুরুবক' শব্দটি দেশশুদ্ধ লোকই জানে, কিন্তু ওর আর একটা নাম রূপ যে 'কুরবক' এটা তিনি ভেবে দেখেননি, তাই লিখেছেন 'শ-র' তাঁর প্রতি অত্যন্ত অবিচার করেছেন। সাধনার একটা মস্ত গুণ এই যে সে প্রত্যেক শব্দটি ভেবে বিচার করে সাবধানে বসায়। যদি 'পরিবর্ত শব্দ' নিয়ে গোলে না পড়ে, শব্দ-সন্ধানের সাধনায় সাধনা যে অচিরে সিদ্ধিলাভ করবে এ ভবিষ্যৎবাণী নিঃসংশয়ে করা যায়। তবে প্রতিবার 'শ-র'র সঙ্গে সে যদি এমন লম্বা তর্কযুদ্ধ লাগায় তাহলে সে হয়ত একজন প্রসিদ্ধ মহিলা তার্কিকা হয়ে উঠবে কিন্তু 'শাব্দিকা' হ'তে পারবে কি না সন্দেহ! সাধনা যুক্তি দেখিয়েছে যে ফাল্গুনের শব্দ-সন্ধানে পাশাপাশি ২৮নং ঘরে যখন 'ক্ষত্রপ' ও 'সত্রপ' দুটোকেই নির্ভুল বলে ধরা হয়েছিল তখন কুরুবকের বেলাও তা করা হবে না কেন? তার কারণ 'সত্রপ' বা 'ক্ষত্রপ' বৈদেশিক শব্দ, ওটার নির্দিষ্ট কোনো রূপ আমাদের ভাষায় নেই, তাই প্রচলিত দুটো রূপকেই নির্ভুল ধরা উচিত। কিন্তু, 'কুরুবক' এদেশেরই ফুল, ওর আর একটা রূপও যখন নির্দিষ্ট রয়েছে, তখন সাধনার উচিত ছিল এবারকার মত সেবারও একাধিক কূপন পাঠানো।

জ্যৈষ্ঠের শব্দ-সন্ধানে একটি বৈদেশিক শব্দ আছে, পাশাপাশি ২৪নং ঘরে। কথাটি 'সান্ত্রি' ইংরাজী Sentry শব্দের বাংলারূপ। এর বানান 'সান্ত্রী' বা 'সান্ত্রি' দুইই হতে পারে। এটা না বুঝে যাঁরা 'সান্ত্রীর' ভয়ে অনিয়ন্ত্রিত শব্দটাতেও দীর্ঘ ঈ লাগিয়েছেন তাদের জন্য 'শ-র' দুঃখিত এবং লজ্জিত। পাশাপাশি ২৮নং ঘরের শব্দটির সঙ্কেতে ছিল "ভাল করে সাজাতে পারলে সেটা হয়ে উঠবে একটা সূক্ষ্ম শিল্প।" এই 'ভাল করে সাজানো' ব্যাপারটা হচ্ছে—'Decorative Art' অর্থাৎ 'কারুকলা'। জাতির সূক্ষ্ম শিল্প সুতরাং 'চারুকলা' যাঁরা লিখেছেন তাদের অদৃষ্টে 'কলা' যে কদলী হয়ে দাঁড়িয়েছে একথা বলাই বাহুল্য। পাশাপাশি ৬নং ঘরে 'সুখ' 'দুঃখ' নিয়ে অনেকেই দুঃখ পেয়েছেন, কিন্তু সে জন্য 'শ-র' দায়ী নয়। আশা করি মহৎ প্রতিযোগিদের এতে কোনো ভাবান্তর ঘটবে না। পাশাপাশি ১৯নং ঘরের সঙ্কেত ছিল—"এতেও জাগে সাপের ভয়, ন্যায় শাস্ত্রে এটা কয়।" ন্যায়শাস্ত্রে বলে 'রজ্জুতে সর্পভ্রম'। একথাটার সঙ্গে ছেলেবেলা থেকেই আমরা পরিচিত, এর জন্য ন্যায়শাস্ত্র পড়বার দরকার হয় না। কিন্তু তবুও এক্ষেত্রেও যাঁরা কুমারী সাধনা বসুর মতো রশা-রশি দড়া-দড়ি নিয়ে ভীষণ টানাটানি করেছেন তাঁদের যে হাতে দড়ি পড়েনি এইটুকুই রক্ষে।

কুমারী সাধনা বসুর 'বিশ্বাস' একান্ত শিথিল বলেই তিনি 'আশ্বাস' মাত্র সম্বল করে থাকতে চান, কিন্তু তিনি বোধ হয় এই মহাজন বাক্য ভুলে গেছেন যে 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর।' তাই বোধ হয় তিনি 'কক্ষ' ত্যাগ করে 'বৃক্ষ' আশ্রয় করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এই একগুঁয়ে মেয়েটির সঙ্গে কাঁহাতক আর তর্ক করে বোঝাবো যে 'ঘর' ছেড়ে 'গাছতলা' সার করাটা সুবি-বেচনার কাজ নয়। যারা গাছে থাকে সে সব প্রাণীর ঘরে থাকতে কি কোনো বাধা আছে? যে কোনো পোড়ো বাড়ীতে ঢুকলে দেখা যাবে কুমারী সাধনা বসু বৃক্ষ আশ্রয় করে যাদের প্রতিবেশিনী হ'তে ইচ্ছুক তারা সকলেই সে বাড়ীতে দিব্যি আরামে রয়েছে।

যেখানে একই অর্থবাচক বিভিন্ন শব্দের সন্ধান পাওয়া যায় এবং একটি শব্দের বিভিন্ন বানান দৃষ্টিগোচর হয় সেখানে একাধিক কুপনে সেই ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ও ভিন্ন ভিন্ন বানান পৃথক পৃথক লিখে পাঠানই নিরাপদ।

আহমদপুরের শ্রীমান অশ্বিনীকুমার মণ্ডল জানতে চেয়েছেন যে কুমারী সাধনা বসুর সহিত 'শ-র' পত্রোত্তরে এত রসিকতা করেন কি হিসেবে? এই বসু কন্যাটির সঙ্গে 'শ-র'র কোনো বিশেষ সম্বন্ধ আছে কিনা তিনি সেটা জানতে চান। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে অশ্বিনীকুমার 'শ-র'র উপর রীতিমত ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছেন। 'পত্রী-মৈত্রী' যোগে অশ্বিনীকুমারও তো সাধনার সঙ্গে আলাপ করতে পারেন, সুতরাং বেচারা 'শ-র'র উপর তাঁর এতটা ক্ষিপ্ত ও রুষ্ট হয়ে ওঠারত কোনোই কারণ নেই। সুলিখিত সরস পত্রের উত্তর সরসভাবেই দিতে হয়। 'শ-র'

কারুর কাছে 'বে-রসিক' অখ্যাতি নিতে রাজি নন। এতে যদি অশ্বিনীবাবু চটেন 'শ-ব' নাচার।

রামপুর হাটের শ্রীমান পার্বতীশঙ্কর গেলবারে শ-রকে বলেছিলেন 'প্রবঞ্চক', এবার তিনি 'শর' কে বলেছেন 'প্রতারক'। কারণ 'তৃষা' 'তৃষ্ণা' এবং 'সুশীতল' ও 'সুনির্মল' শব্দ নিয়ে যে তর্ক উঠেছিল আমি না কি তা এড়িয়ে গেছি। পাঠশালায় এত যুক্তি দেখানো সত্ত্বেও পার্বতী পরমেশ্বর যদি বলেন 'শ-ব' তর্ক এড়িয়ে গেল, তাহলে আমি বলবো ধরা পড়বার ভয় আছে যেখানে সেখান থেকে 'প্রবঞ্চক' ও 'প্রতারক'রা এমনি করেই গা-ঢাকা দিয়ে থাকে।

চট্টগ্রামের শ্রীমান মনোজ দত্ত গতমাসে ২৩নং পাশা-পাশি ঘরে 'মধু' পাবেন আশা করেছিলেন, কিন্তু তার পরিবর্তে 'মোণ্ডা' পেয়ে তিনি একেবারে ডাণ্ডা নিয়ে তেড়ে এসেছেন। চাঁটগাঁয়ের লোকেরা শুনেছি একটু গুণ্ডা প্রকৃতির। সুতরাং বিশেষ ভীত হয়েই 'শ-ব' তাঁকে নিবেদন করছে যে 'মণ্ডা' হলেও সে মণ্ডার নাম ছিল নিশ্চয়ই 'মধু মণ্ডা'। 'মধু টুকু চাটগাঁয়ের লোকেরা আর রাখেনি, শুধু 'মণ্ডাই' পড়ে আছে। সরোজ বাবু রাগ না করে যদি খেয়ে দেখতেন তাহলে বুঝতে পারতেন যে 'মণ্ডা'ও 'ক্ষেতে সুস্বাদু'। কেবল মাত্র 'মধু'র প্রতি এতটা আসক্তি মোটেই ভাল নয়। 'দহ' শব্দটা নিয়েও তিনি যে দুর্বিষহ তর্ক করেছেন সেটাও অত্যন্ত ভয়াবহ। 'শ-ব' বলছেন এ তর্কটা আপাততঃ মুলতুবী থাক বন্ধু, কারণ বিমান আক্রমণে বোমা পড়লে পথ ঘাটের অবস্থা কি হয় সে তুমিও দেখনি আমিও দেখিনি—অবশ্য সিনেমার পর্দায় ছাড়া। অতএব, শোনা যাচ্ছে যখন শীঘ্রই ভারতে বোমা পড়বে তখন অপেক্ষা করে থাকা যাক সেই দুর্দিনের, তখন ভাল করে দেখে নেওয়া যাবে—পথে ঘাটে 'দহ' সৃষ্টি হচ্ছে, না 'দাহ' ঘটছে। আমার আশঙ্কা হচ্ছে 'দাহ' করবার লোক তখন খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এক ভুল

অরুণকুমার মিত্র, C/*f* শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ মিত্র, মজঃফরপুর, বিহার। (শব্দ-সন্ধানের ৫৲ টাকা পুরস্কার ইনিই পাবেন। শ-ব)

দুই ভুল

গীতাধর, জামালপুর। ধ্রুবরঞ্জন সরকার ও সন্তোষকুমার ভট্টাচার্য, হাওড়া। মনোজ দত্ত ও বিশ্বনাথ সেনগুপ্ত, চট্টগ্রাম। মঞ্জুদত্ত গুপ্ত, মজঃফরপুর। রুণু ঘটক, ইংরেজ বাজার। শ্যামাপ্রসন্ন চক্রবর্তী, বালিগঞ্জ। সুলেখা কর, শ্রীপুর। হরিকমল পুরকায়স্থ, শিলং। নীতীশরঞ্জন দে, রমনা।

তিন ভুল

অজিতকুমার ঘোষ, কলিকাতা। অবনীভূষণ বেরা, ঘোলদিগরুই। কেয়া ও অসীম মুখার্জি, ভাগলপুর। চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য, টাটানগর। দেবব্রত সিংহ, কলিকাতা। প্রতিমা চাটার্জি, জব্বলপুর। ব্রজকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীঘাট। মঞ্জুলিকা মজুমদার, বাঁকীপুর। শোভারাণী রায়, রাণাঘাট। সধানা বসু, বারুইপুর। সুলেখা বসু, বালিগঞ্জ। হিমাংশু বিশ্বাস, জামশেদপুর। হেনা রাহা বরকান্তা।

নির্ভুল সমাধান—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭

চার ভুল

অণিমা চ্যাটার্জি, উত্তরপাড়া। অনিলবরণ মহান্তি, দাঁতন। অনিলবিহারী ভাদুড়ী, কলিকাতা। অমলকুমার দত্ত ও নীলিমা দত্ত, কলিকাতা। অমিতাভ বসু, বনগ্রাম। আমিনউদ্দিন আহম্মদ, পুর্ণিয়া। আরতি গুহ, নবগ্রাম। উমা বাগচী, রায়পুর, সিপি। কণিকা মুখোপাধ্যায়, গোরক্ষপুর। কাল্চারাল এসোসিয়েশন, বাঁকীপুর। গীতা ও বাদল পলিত, আসানসোল। দীলিপকুমার সেন, ভবানীপুর। ধৃতিকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী, কালীপুর। পঙ্কজ গাঙ্গুলী, কর্ণেশ্বর। পুষ্প ঘোষ, বালিগঞ্জ। বাণীতলা এথলেটিক ক্লাব, বাণীতলা। বিজয়া দেবী, ভবানীপুর। বীরেন্দ্রনারায়ণ সরকার, ফরিদপুর। রণেন্দ্রনাথ ঘোষ চৌধুরী, মুগকল্যান। শৌরীন্দ্রনাথ চন্দ, বরিশাল।

সুকুমার ভট্টাচার্য, টালা। সুনীলকুমার পালিত, কলিকাতা।

পাঁচ ভুল

অরুণলাল মুখোপাধ্যায় কলিকাতা। দেবব্রত মজুমদার, কলিকাতা। নির্মলেন্দু গুহ, পাহাড়তলা। পার্বতীশঙ্কর মুখার্জি, বৈদ্যনাথ, রামপুরহাট। বিমল, অমল গাঙ্গুলী, উখারি। রাজকুমার বসু, কদমতলা। রাধারমণ ধর, হুগলী। শক্তিকুমার বাগচী, জামশেদপুর। শান্তি গুপ্তা, জামশেদপুর। সরোজবিহারী ভাদুড়ী, কলিকাতা।

ছয় ভুল

অবনী সরকার, বজবজ। অমিয়কুমার ঘোষাল, অরিয়াদহ। নীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার, বালিগঞ্জ। পঙ্কজমোহন সিদ্ধার্থকুমার রায়, কোতুলপুর। বিজলীপ্রভা দেবী, জয়নগর মজিলপুর। মণীন্দ্রলাল মিত্র, এলাহাবাদ। রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, হরিনাভি। "হরিসভা" মুন্সীগঞ্জ।

সাত ভুল

ধীরেন্দ্রনাথ মহান্তি, দাঁতন। পপী বসু, পটুয়াখালি।

আট ভুল

আভাসচন্দ্র দাশগুপ্ত, বেন্দা। "ভাই কালো" কলিকাতা। শৈলেন্দ্রকুমার রায়, কলিকাতা। হৃষীকেশ কাব্যবিশারদ, দাঁতন।

নয় ভুল

মধুসূদন মণ্ডল, বালীদেওয়ানগঞ্জ। সিদ্ধেশ্বর মিত্র, বালিগঞ্জ।

দশ ভুল

বৈদ্যনাথ শেঠ, বাঁশবেড়িয়া।

এগার ভুল

অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়, আজমীর।

বারো ভুল

গৌরাঙ্গ রুদ্র, চট্টগ্রাম। পশুপতিনাথ ঘোষাল, কলিকাতা। সেখ সিরাজ উদ্দীন, খাগড়া। হরিপদ চক্রবর্তী, ত্রিপুরা।

বারোটির বেশি ভুল যাঁরা করেছেন তাঁদের নাম ঠিকানা প্রকাশ করলে 'শ-র' কে তাঁরা নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন না, অতএব তা অপ্রকাশিত রইল। অনেকেই সাদা কাগজে ছক এঁকে শব্দ-সন্ধান পাঠিয়েছেন, কিন্তু, সঙ্গে কোনো পাঠশালার ছাপা কুপন না থাকায় সেগুলি বাতিল হয়েছে। যদি কুপনের উপর কালি দিয়ে লিখতে গেলে চুপসে যায়, তাহলে কপিং পেন্সিল দিয়ে লিখে পাঠালেও চলবে। 'শ-র'।

শ্রীমান অনিলবরণ মহান্তি
(গ্রাহক নং ২৫০১)

কেবলমাত্র বাংলাদেশের ছেলে-মেয়েরাই টুকটাক খেলনা কিনে বছরে কত টাকা বিদেশে পাঠাচ্ছে জানেন? ২৩০০০০০ তেইশ লক্ষ টাকা।

* * *

আমাদের বাংলায় প্রতিবৎসর প্রয়োজন ৭৫ লক্ষ মণ লবণ, কিন্তু বাংলায় তৈরী হয় মাত্র ১০ হাজার মণ।

* * *

বাংলায় আজ মাত্র ২৩টি কলে কাপড় হয়, ৮ হাজার তাঁত চলে, ৪ লাখ মাকু চলে। বাংলার মিলে হয় ২০ কোটি গজ কাপড় আর বাংলার তাঁতে হয় ৮॥ কোটি গজ। অথচ বাংলায় বৎসরে প্রয়োজন ৯০ কোটি গজ কাপড়। বাকীটা আমরা অন্য প্রদেশ ও বিদেশ হ'তে কিনি। বাংলাদেশে জনপ্রতি বৎসরে গড়ে ১৮ গজ কাপড় লাগে, অন্য প্রদেশ এর চেয়ে কম কাপড় ব্যবহার করে। বাংলার তাঁত ও কলের সংখ্যা বাড়াতে হলে, বাঙ্গালীকে কেবল বাংলার কাপড়ই ব্যবহার করতে হবে।

* * *

এক বাংলা দেশেই প্রতি বৎসর ৮০ লক্ষ টাকার বিদেশী ঔষধ আসে। এর মূলে আছে বিদেশী শিক্ষা সভ্যতার প্রভাব এবং বিদেশী বলেই ঔষধ ভাল এই দাসসুলভ মনের ভুল ধারণা।

হরফের হেরফের—অক্ষর ক্রীড়া

DEMOCRATIC—COMIC TRADE

জ্যৈষ্ঠের উত্তর

সঠিক উত্তর দিতে পেরেছেন :—শ্যামাপ্রসন্ন চক্রবর্তী, বালিগঞ্জ, সাধনা বসু, বারুইপুর, অশ্বিনীকুমার মণ্ডল, আহমদপুর।

এই তিনজনের ছাড়া আর কারো উত্তর ঠিক হয় নি। কথাটি ভেঙে চুরে সাজিয়েছেন বটে অনেকেই। কিন্তু ডেমোক্রেসির বর্তমান রূপ তাতে ফুটে ওঠেনি। ডেমক্রেসির নামে পৃথিবীতে আজকাল যে অতি হাস্যকর ব্যবসা চলছে এইটে বুঝান দরকার।

আষাঢ়ের অক্ষর-ক্রীড়া

ইংরাজী অক্ষর **A** থেকে Z পর্যন্ত প্রত্যেকটি নিয়ে এমন একটি পদ তৈরি কর যাতে ২৬টি অক্ষরই থাকবে কিন্তু, কোনোটি একবারের বেশি ব্যবহার করা হবে না এবং পদটির একটি বেশ সহজ সরল অর্থও বোঝা যাবে।

—অশ্বিনীকুমার মণ্ডল, আহমদপুর

রচনা প্রতিযোগিতা

"শিশুসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ" সম্বন্ধে যতগুলি প্রবন্ধ পাওয়া গেছে তার মধ্যে হাওড়ার শ্রীমান ধ্রুবরঞ্জন সরকারের প্রবন্ধটি পুরস্কার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। ধ্রুবরঞ্জনের প্রবন্ধটি আগামী মাসের পাঠশালায় প্রকাশিত হবে। এই প্রতিযোগিতায় দিল্লীর শ্রীমান অশোককুমার ঘোষের প্রবন্ধটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য, কারণ, এটি আকারে সবচেয়ে ছোট, অথচ সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ।

আমাদের প্রতিযোগিতা

আশ্বিন ১৩৪৭ থেকে আষাঢ় ১৩৪৮ এই দশমাসের পাঠশালায় যে সব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে ভাল কোনটি এবং কেন সেটি ভাল সে সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করে একটি সমালোচনা লিখে পাঠাও। লেখাটি যেন ১৫ই আষাঢ়ের মধ্যে আসে এবং সাধারণ একসারসাইজ বুকের তিন চার পাতার বেশি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। যার আলোচনা উৎকৃষ্ট বিবেচিত হবে তাকে পুরস্কৃত করা হবে এবং রচনাটি পাঠশালায় প্রকাশিত হবে।

'রবীন্দ্র-বর্দ্ধাপন' রৌপ্য পদক

'ধাঁধাঁ', 'অক্ষরক্রীড়া' ও 'প্রশ্নোত্তর' বিভাগে পাঠশালার আশ্বিন ১৩৪৭ থেকে ভাদ্র ১৩৪৮ এই সারা বৎসরের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় সঠিক উত্তর দিতে পেরেছেন দেখা যাবে তাঁকে পাঠশালার 'রবীন্দ্র বর্দ্ধাপন' রৌপ্য পদক উপহার দেওয়া হবে।
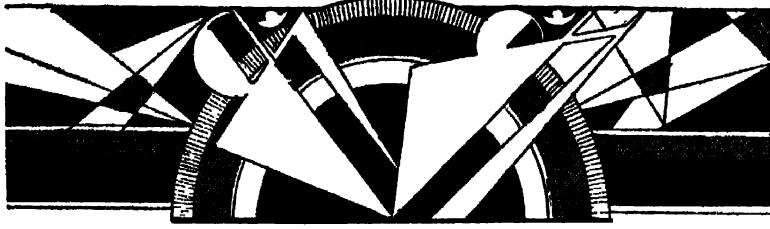
আষাঢ—১৩৪৮

এমন একটি ইংরাজী শব্দ খুঁজে বার করো যার মধ্যে চারবার ইংরেজীর আদ্য অক্ষর 'a' ব্যবহার হয়েছে।

কুমারী পপী বসু, পটুয়াখালি—(গ্রাহক নং ৩৩৭১)

জ্যৈষ্ঠের ধাঁধাঁর উত্তর

Fig No 1

এই ছবিতে AB রেখা BC রেখার চেয়ে বড় দেখাচ্ছে। কিন্তু রেখাদ্বয় সমান।
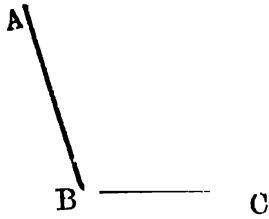
অরুণ লাল মুখোপাধ্যায়
১।১াই হরিতকী বাগান লেন,
কলিকাতা।
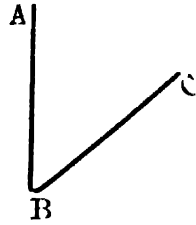
Fig No 2

উপরোক্ত চিত্রে AB রেখা BC রেখার চেয়ে বড় দেখাচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহারা সমান।

অরুণ লাল মুখোপাধ্যায়
১।১াই হরিতকী বাগান লেন,
কলিকাতা।

Fig No 3

উত্তরদাতাদের নাম

কুমারী আরতী গুহ ও অস্মিতা অধিকারী—

গ্রাহক নং—১৪৫৬

ধাঁধাঁর সঠিক উত্তর দিতে পেরেছেন—শঙ্করনাথ ব্রজবাসী, মথুরা। পীযুষ নিয়োগী, মাণিকগঞ্জ। সতী নিয়োগী, পাটগ্রাম। সরোজ বিহারী ভাদুড়ী, কলিকাতা। অমলকুমার দত্ত ও কুমারী নীলিমা দত্ত, কলিকাতা। আরতি গুহ ও অস্মিতা অধিকারী, নবগ্রাম। অসীম রাহা, বালিগঞ্জ। পপী বসু, পটুয়াখালি। শ্যামাপ্রসন্ন চক্রবর্তী, বালিগঞ্জ। মনোজ দত্ত ও বিশ্বনাথ সেনগুপ্ত, চট্টগ্রাম। নীতীশ রঞ্জন দে ও নিখিল রঞ্জন দে, ঢাকা। হেনা রাহা, বরকান্তা। নীলিমা দাশ, আকোলা। শশী ভট্টাচার্য, হেমনগর। ধ্রুবরঞ্জন সরকার, হাওড়া। সনৎকুমার ভট্টাচার্য, আরিয়াদহ। বাণীতলা এথলেটিক ক্লাব, বাণীতলা। শৈলেন্দ্রকুমার রায়, কলিকাতা। অরুণলাল মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা। "মক্ষিকা", নবপুর।

শ্রীমান অমলকুমার দত্ত ও কুমারী নীলিমা দত্ত জানিয়েছেন যে গতমাসে অশ্বিনীকুমার মণ্ডল যে ধাঁধাঁটী পাঠিয়েছিলেন সেটি নাকি ১৩৩৮ সালের ছোটদের বার্ষিকীতে শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার লিখিত 'যা দেখ তা নয়' প্রবন্ধের মধ্যে ছিল। ধাঁধাঁ যাঁরা পাঠান তাদের সকলকে অনুরোধ করছি তাঁরা যেন অন্য পত্রিকায় প্রকাশিত ধাঁধাঁ অপহরণ করে না পাঠান। কারণ একাজে কোনও বাহাদুরী নেই, অপযশই হয়।

—ধাঁধাঁ সম্পাদক

Printer and publisher R Bhattacharya, Pravu Press, 30, Cornwallis Street, Calcutta

শব্দ-সন্ধান

(প্রতিযোগিতা-কুপন)

(যে কোনো পাঠক বা পাঠিকা এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারেন, এবং যতগুলি ইচ্ছা কুপন পাঠাতে পারেন)

১ চে			২ ন	■	৩ চা	৪	৫	৬ ল
৭ কো		■	৮	সা	■	৯	ল্যা	
১০	অ	■		■	১১		ত	
১২ ভা		■		■	১৩		গো	■
১৪	ল	■	■	১৫	জ		ন্ট	■
১৬	মি	১৭	১৮	■	■	১৯		২০
■	২১	ট		২২ ক্রী	২৩	■	২৪	স
২৫	■	২৬	ভি		যা	■	২৭ ন	
২৮ ড			■	■		■	২৯	র্ক

(পাঠশালা, আষাঢ়)

নাম .. ..

ঠিকানা . ...

... .

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আগামী **১৫ই** আষাঢ়ের মধ্যে কুপনখানি পাঠশালা-কার্যালয়ে পৌঁছনো চাই।

☞ কুপনে কোনো কাটাকুটি বা বানান ভুল চলবে না

ভোট

প্রথম প্রস্তাব

পাঠশালার 'প্রশ্নোত্তর' বিভাগ তুলে দিয়ে গল্প ও প্রবন্ধ বাড়ানো হোক।

দ্বিতীয় প্রস্তাব

পাঠশালায় 'কন্যামহলের' ন্যায় একটি "কিশোর সভা" প্রবর্তন করা হোক।

তৃতীয় প্রস্তাব

পাঠশালাকে 'গ্রাহক গ্রাহিকাদের নিজস্ব পত্রিকায়' (Boys and Girls Own Magazine) পরিণত করা হোক।

প্রত্যেক প্রস্তাবের পাশে পাশে 'হাঁ' বা 'না' লিখে মতামত দিতে হবে।

নাম . .

ঠিকানা .

গ্রাহক নং . . .

চতুর্থ বর্ষ] শ্রাবণ—১৩৪৮ [একাদশ সংখ্যা

আষাঢ়ে

অণিমা চ্যাটার্জি

হে আষাঢ়,
দিগন্ত-বিস্তারী তব মেঘপুঞ্জভার
নিদাঘের খর রৌদ্র ভেদি
বিজয়ী বীরের মত রবিরশ্মি ছেদি'
ধরাবক্ষে দিল আসি দেখা,
বিদগ্ধ ধরায় যেন প্রাণবন্ত স্নিগ্ধ শান্তি-লেখা।

হে আষাঢ়, মহাশূন্য 'পরি,
তোমার সজল ঘন কালো রূপে চিত্তাকাশ ভরি'
শোনে সৃষ্টি সুগম্ভীর তোমার নির্ঘোষ
তোমার আহ্বানে বনে কেতকী মেলিছে মর্মকোষ।

হে আষাঢ়,
তব শুভস্নেহাশীষ ধারে
জুড়ালে তাপিত হিয়া পিপাসিত ধরণীর পারে,
যেথা নির্বিচারে
নিদাঘের নির্মম নির্দেশ, পরাইয়া প্রকৃতিরে
তৃষাদীর্ণ জীর্ণ রুক্ষ বেশ
এনেছিল মরণের প্রাণঘাতী সকরুণ বেশ।

তব স্পর্শে ধরণীর বুকে
অভিনব কি কৌতুকে
হরিৎ অঞ্চলখানি হিল্লোলিছে অপূর্ব উল্লাসে।
তাহারই বিচিত্ররূপে চারিদিকে শ্যামলিমা হাসে,
ঘন কালো নভতল ঘিরে
বিদ্যুৎ নাচিয়া ফিরে
বাদলের উন্মাদ সমীরে।

কদম্ব কলাপী সবে বন্দিতেছে চরণ তোমার
বিরহ বেদনা গীতি তব সুরে বাজে অনিবার।
তব কাব্য, তব ভাষা, তব অশ্রু ভালবাসা
অজস্র ধারায় ঢালি দিতেছ ধরায়,
কুটজ মল্লিকা তাই কণ্ঠে তব মালিকা পরায়।

পৃথিবীর ক্লিষ্ট ক্লান্ত হিয়া,
তোমার সজল ঘন ছায়ে উতরোল বায়ে
দিলে তার বেদনা মুছিয়া।
তারি তরে আপনা বিলায়ে
তোমার সজল সুরে দিলে আজ মল্লার মিলায়ে।

পূর্ববঙ্গের ভুঁইয়া

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৬

উদয়নারায়ণের জ্ঞান সঞ্চার হইলে তিনি দেখিলেন, তাঁহার পাশে যশোধারা বসিয়া সেবা করিতেছে, আর এক ব্যক্তি ঘর হইতে বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। যে ব্যক্তি সরিয়া গেল, তাহার নাম সরি বা সরমা। তাহার পরিচয় কেহ জানে না। সে যখন নিজমুখে পরিচয় দিবে, তখন আমরা জানিতে পারিব। উদয় বলরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কোথা আছি ?"

"যে ঘর ও শয্যা ধারা ব্যবহার করে।" "বলাই দা, তুমি আর ধারা আমার যা' সেবা করেছ"—"আমরা আর কি করেছি ? সেবা করেছে সরি—আহার নেই, নিদ্রা নেই, সকল সময় তোমার পাশে।"

"সে কই ?"

"তোমার জ্ঞান হোতেই পালাল।"

"সরমার কোনো পরিচয় পেলে ?"

"না, সে পরিচয় না দিলে পাবার কোনো উপায় নেই।"

ধারা কহিল, "আপনি ঠিক সময়ে এসে পড়েছিলেন, নইলে আমাদের রক্ষে ছিল না। আপনি বুঝি এখানেই আসছিলেন ?"

"না, আমি গিছলাম বক্তারপুরে, ফিরবার পথে গোলমাল শুনে—"

"বলরাম কহিল, তোমার অদ্ভুত অসিচালনা দেখে আমি ও ধারা অবাক হোয়েছি।"

"ধারা আমার পৃষ্ঠ রক্ষা করছিল, নইলে আমার নিস্তার ছিল না।"

"নিস্তার আমাদের কারুর ছিল না, যদি সরমা আমাদের রক্ষে না করতো।"

"সে কি রকম ? আমি ত তাকে সংঘর্ষের মধ্যে দেখি নি।"

"সে ছিল দ্বারপার্শ্বে, অন্ধকারে, ধনুর্বাণ-হস্তে। কাউকে সে ভিতরে প্রবেশ করতে দিচ্ছিল না। মৃতদেহের স্তূপে দ্বার পথ বন্ধ করে দিয়েছিল। তারা সকলে ভিতরে এসে পড়লে আমাদের নিস্তার ছিল না।"

উদয়নারায়ণ নীরব রহিলেন, নীরবে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। ধারা কহিল, "আমার মনে হয় সরি দি, কোনও বড়ঘরের মেয়ে।"

উ। শত্রুর গুপ্তচর ত হোতে পারে।

ধা। আমাদের এখানে শত্রু কে ?

উ। চন্দ্রদ্বীপের রামু রায়, শ্রীপুরের চাঁদ রায়।

বলরাম উঠিয়া গেল। উদয় বিষাদমাখা কণ্ঠে বলিলেন, "বাঙ্গালীর আর কল্যাণ নেই ধারা। আমরা বারো জন ছিলাম, দুজন সরে গেল। আরো হয়ত যাবে।"

ধারা। যাঁরা গেছেন, তাঁরা হয়ত আবার ফিরে আসতে পারেন।

উদ। এলেও, তাঁদের আর বিশ্বাস করা যাবে না। রামু অর্থলোভী, চাদ বিশ্বাসঘাতক। বাংলা দেশের দুর্ভাগ্য তুমি জাননা ধারা, আমরা আত্মকলহে এতই মগ্ন যে দেশের স্বার্থের পানে ফিরে দেখি না। আরাকান চায় ভাটীর সর্বেসর্বা হোতে। ত্রিপুরা চায় সারা বাংলার রাজা হোতে। সবাই ঘরোয়া লড়াই কোরে দুর্বল হচ্ছে। দেশভক্ত শ্রীপুরের কেদার—তার উপর অনেক ভরসা আমি করেছিলাম, সে আশা চূর্ণ হল।

ধারা। আপনি আর বড়দা বেঁচে থাকতে ভাটি কখনও মোগলের পদানত হবে না।

উদ। আমার শক্তি কতটুকু ধারা ? আমার রাজ্য ক্ষুদ্র, সৈন্যও অল্প। আমি কি করতে পারি ? আমরা শুধু যে একতা হারিয়েছি তা' নয়, আমরা বহুদিন পাঠানের দাসত্ব কোরে বলবীর্যও হারিয়েছি।

ধারা। বাঙালীর কখন বলবীর্য ছিল কি ? সেই আর্য্য বিজয়ের পর থেকেই দেখুন না, ভারতের অন্য প্রদেশের আক্রমণ ছাড়াও শক হূণ তাতার গ্রীক প্রভৃতি বৈদেশিক আক্রমণ সমানে চলেছে। তারপর এল পাঠান।

এখন আবার মোগল এলো পাঠানের স্থানে। আমরা কবেই বা স্বাধীন ছিলাম ?

উদ। ছিলাম, বৈদেশিক আক্রমণের আগে। তখন আমাদের বলবীর্য ছিল, অস্ত্রশিক্ষাও ছিল। রামায়ণ মহাভারতের সময়ে আমরা সকলেই বীর্যবান্ ছিলাম। ভারত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। আমরা তাই নির্বীর্য হবার অবসর পাইনি।

ধারা। কথাটা বুঝলাম না।

উদ। যখন ভারত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল, তখন পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ লেগেই থাকত, প্রতিবেশী প্রতিবেশীর সঙ্গে যুদ্ধ না করে থাকতে পারত না। তার পরিচয় মহাভারতে অভাব নেই। দেশে যুদ্ধ থাকলেই অস্ত্রশিক্ষার ও বীরত্ব অর্জনের দিকে মন যেতো কাজেই ভারত নির্বীর্য হবার অবসর পায়নি।

ধারা। এখনও তো দেশে অনেক রাজা—

উদ। করদ রাজা—একচ্ছত্রী সম্রাটের অধীনে অস্ত্রহীন বীর্যহীন কাপুরুষ সব করদ রাজা।

ধারা। রামায়ণ মহাভারতের সময়ে কেউ কি একচ্ছত্রী সম্রাট ছিলেন না ?

উদ। না, ছিলেন না। মুসলমান আসবার পূর্বে ভারতে ৬১ (একষট্টি) * জন স্বাধীন হিন্দু নৃপতি পর পর রাজত্ব করে গেছেন। লঙ্কেশ রাবণ সিংহলের নিকটবর্তী দশটী প্রদেশের রাজা ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যা প্রদেশের বাইরে রাজ্য বিস্তার করেন নি। দুর্যোধন বা যুধিষ্ঠির দক্ষিণ ভারতে যান নি। সুতরাং পুরাকালে কেউ একচ্ছত্রী সম্রাট ছিলেন না। ছিলেন না বলেই আমাদের বল বীর্য ও অস্ত্রশিক্ষা অক্ষুণ্ণ ছিল। মহারাজ অশোকের সময়ে অহিংসপন্থী বৌদ্ধ ভারত নির্বীর্য ও নিস্তেজ হোয়ে পড়েছিল, এখন সম্রাট আকবরের আমলেও আমাদের শক্তি সামর্থ্য যেতে বসেছে, আমরা দেখছি ক্রমে তরওয়াল ছেড়ে লাঙ্গল ধরব।

ধারা। তাহলে আপনি কি মনে করেন, বাংলার স্বাধীনতা ধ্বংস হবে ?

উদ। নিশ্চয় হবে। পশ্চিম বাংলা গেছে, ভাটীও যাবে। মাঝে মাঝে আমরা মোগলকে আঘাত করতে পারি, কিন্তু ঐ পর্যন্ত—আমরা কিছুতেই তার গতিরোধ করতে পারব না।

ধারা। তবে লড়াই করা কেন ?

উদ। জন্মভূমির প্রতি কর্তব্য পালন করা, দেশের সেবা করা, স্বদেশবাসী স্বধর্মীদের রক্ষা করা। আমার পিতা যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হোয়ে যখন দেহরক্ষা করেন, তখন আমার বয়স আঠার বছর। তিনি মৃত্যুশয্যায় আমাকে বলেছিলেন, 'দেশ রইল—দেখো।' তদবধি দেশ আমার মাতাপিতা, আমার উপাস্য দেবতা, আমার সর্বস্ব। আগ্নেয় অস্ত্র পরিচালনা শিক্ষা করতে আমি ছদ্মবেশে দিল্লী চলে গেলাম, কয়েক বৎসর সেখানে থেকে আমি মোগলের কাছে অনেক কিছু শিখে এসেছি।

ধারা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "যুদ্ধ কি মানুষকে করতেই হবে ?"

উদ। জগতের ইতিহাস, সমাজের ইতিহাস তাই বলছে। হিংসা, লোভ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা রাজ্য ও যশোলিপ্সা—

এমন সময় বলরাম ব্যস্ততাসহ আসিয়া কহিলেন, "কয়েক ব্যক্তি মাধবপাশা হোতে এসেছেন। তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান্—খুব জরুরি"—

"আমার সঙ্গে তাঁদের কি প্রয়োজন থাকতে পারে ? চন্দ্রদ্বীপের রাজা আমাদের মিত্র নয়, তিনি আমার নিকটাত্মীয় হলেও, তিনি আমার বিপক্ষ। আমার কাছে তাঁর লোক কেন ?"

"কেন, তা তাঁদের জিজ্ঞেসা করলেই জান্‌তে পারবে।"

"তাঁদের আমার অবস্থার কথা জানিয়ে বলবে, আমি এখন তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে অসমর্থ। তবে তাঁদের মধ্যে একজন কেউ এখানে এসে কি বক্তব্য জানাতে পারেন।"

বলরাম প্রস্থান করিলে উদয় ধারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার এ ঘরে অপরিচিতকে নিয়ে আসতে বলেছি, তোমার আপত্তি নেইত ধারা ?"

ধারা। এ ঘর ত এখন আপনার।

উদ। এ ঘর যে আমার কাছে দেবীর মন্দির তুল্য পবিত্র। ধূপের প্রয়োজন নেই, তোমার কুন্তল গন্ধে এ ঘর আমোদিত। দীপের প্রয়োজন নেই, তোমার আঁখির আলোয় এ ঘর প্রদীপ্ত, আমার ঘর আলো করতে কবে যাবে ধারা ?

ধারা। যেদিন হাত ধরে নিয়ে যাবেন—

উদ। চারিদিকে দস্যু, এ অরক্ষিত স্থানে তোমাকে রেখে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। এক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের বিবাহ, তার মধ্যে আমি বেশ সেরে উঠব, কি বল ?

বলরামের সঙ্গে এক বৃদ্ধ ব্যক্তি কক্ষে প্রবেশ করিয়া উদয়কে নতজানু হইয়া অভিবাদন করিলেন। উদয় কহিলেন, "আমি আপনাকে চিনি, আপনি দেওয়ান কালীচরণ—বসুন।"

কালীচরণ (করযোড়ে)—"আপনি এক্ষণে বাকলা চন্দ্রদ্বীপের অধীশ্বর—আমি আপনার ভৃত্য।"

উদ আপনি কি বলছেন ?

* আইন-ই-আকবরি ৬১ জন রাজার নাম আছে।

কালী। রাজা বাসুদেব দেহরক্ষা করেছেন, তিনি অপুত্রক, আপনি নিকটাত্মীয় বিধায় এক্ষণে রাজ্যাধিকারী। আপনাকে নিয়ে যেতে প্রজারা আমাদের পাঠিয়েছে।

উদ। আমার ভাই বাসুদেব বলিষ্ঠ তরুণ যুবাপুরুষ, সহসা তিনি দেহরক্ষা করলেন কিরূপে?

কালী। তিনি নূতন ধরণের মারাত্মক আগ্নেয় অস্ত্র নির্মাণ করছিলেন; সহসা বারুদের বিস্ফোরণে পরীক্ষা-কালে কয়েকজন শ্রমিকসহ—

উদ। হায় হায় কি দুর্ঘটনা।

কালী। তাঁর ইচ্ছা ছিল হিন্দুদের সঙ্ঘবদ্ধ করে মোগলদের ভারত থেকে বিতাড়িত করবেন। তাই গোপনে তিনি এমন একটা সংহারক অস্ত্র নির্মাণ করতে ব্যস্ত ছিলেন যে, যা' শত্রুমধ্যে পড়ে বহুলোককে এককালে ধ্বংস করতে সমর্থ হয়। রাজা বাসুদেবের মৃত্যুতে শুধু চন্দ্রদ্বীপের বসু বংশই লুপ্ত হ'ল না, একজন নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভাসম্পন্ন অস্ত্র-সুদক্ষ রণ-কুশলীর তিরোভাব ঘটল।

উদ। সংবাদটা বড় মর্মান্তিক, তেমনিই আকস্মিক, দেশের অত্যন্ত দুর্ভাগ্য বলতে হবে। যাই হোক আপনারা এক্ষণে বিশ্রাম করুন। আমি যে দু'একদিনের মধ্যে উঠতে পারব তা মনে হয় না। একটু সুস্থ হলেই আমি চন্দ্রদ্বীপে যাব।

কালী। আপনি শ্রাদ্ধাধিকারী—একাদশ দিবসে—

উদ। আপনি শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করুন গে। শ্রাদ্ধের পরই আমাকে ছুটতে হবে রণক্ষেত্রে। হয়ত বিবাহের আর এখন অবসর পাওয়া যাবে না।

কালী। বিবাহ?

উদ। হ্যাঁ, ইনিই আপনাদের ভবিষ্যৎ রাণী।

কালীনাথ যশোধারাকে অভিবাদন করিলেন। ধারার চোখ মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। কালীনাথ ভাবিলেন হ্যাঁ ইনি উদয়নারায়ণের মহিষী হবার উপযুক্ত বটে।

ম্যাক্সিম গোর্কি

শ্রীহিমাংশু রায়

কেউ যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করে, বলতো—ম্যাক্সিম ডিচ পিচ্‌কভ কে? তোমাদের অনেকেই জবাব দিতে পারবে না, নয় কি? কিন্তু তোমাদের যদি বলা হয়, বলতো—ম্যাক্সিম গোর্কি কে? তোমরা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠবে, ম্যাক্সিম গোর্কি? সে-তো আমাদের গোর্কি। তোমাদের আপন জন। এই গোর্কিরই আসল নাম হচ্ছে' ম্যাক্সিম ডিচ্ পিচ্‌কভ। নিশ্চয়ই ভাবছ, নাম আবার আসল আর নকল কি? একটা তুলে রাখা আর একটা ডাক্ নাম বুঝি? তা নয় কিন্তু। মা-বাপের দেওয়া নামটা ত্যাগ করে তিনি নিজের দেওয়া নামটা চালু করে নিয়েছিলেন। 'গোর্কি' শব্দের অর্থে 'তিক্ততা' বুঝায়। তাঁর জীবন-ঝুলিতে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছিল, তাকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্যই তিনি নিজের নামের সঙ্গে গোর্কি শব্দটা জুড়ে দিয়েছিলেন।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ১৪ই মার্চ রাসিয়ার অন্তর্গত নিজনি নভগোরড নামক স্থানে ম্যাক্সিম গোর্কির জন্ম হয়। গোর্কির বাবার নাম ম্যাক্সিম সাভাটিভিচ। মার নাম ভারভারা। সাভাটিভিচের জীবনটাও ছিল ছন্নছাড়ার মত। তাঁর বাবা অর্থাৎ গোর্কির পিতামহ যখন সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত জীবন যাপন করেছিলেন সে সময় সেখানে তাঁর জন্ম হয়। নয় বছর বয়সে বাপ-মাকে হারিয়ে তিনি পথে নেমে পড়লেন। ঘুরতে ঘুরতে এলেন ভারভারাদের গাঁয়ে। সেখানে কোন এক কারখানায় তিনি সামান্য একটা চাকরী পেলেন। পরে ভারভারাকে বিয়ে

করলেন। অবশ্য নানা কারণে ভারভারার বাবা ভাসিলি ভাসিলিচের এ বিয়েতে খুব অমত ছিল। বলতে গেলে চুপিচুপিই বিয়েটা হয়েছিল। ভাসিলিচের অসম্মতির প্রধান কারণ, সাভাটিভিচ দরিদ্র—চালচুলো বলতে কিছুই নেই। ভারভাবার মা একুইলিনা আইভানোভনার কিন্তু বিশেষ আপত্তি ছিল না। এবং তাঁরই ঐকান্তিক চেষ্টায় শুভ কাজ নির্বিঘ্নে হয়ে যায়। গরীব হলেও সাভাটিভিচ ও ভারভারা সুখেই ছিলেন। গোর্কিকে পেয়ে তাদের আনন্দ যেন শতগুণ বেড়ে গেল। কিন্তু ভারভারার অদৃষ্টে এত সুখ সইল না। গোর্কিকে নিতান্ত ছোট রেখে সাভাটিভিচ একদিন চিরতরে চোখ বুজলেন। ভারভারার জীবনের সত্যিকার দুঃখময় অধ্যায় আরম্ভ হল। গোর্কিকে নিয়ে বাপের বাড়ী এসে আশ্রয় নিলেন। কিন্তু সেখানে তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্য শান্তি পেতেন না। তাঁর ভাইগুলি ছিল নিতান্ত অমানুষ। বাপের উপর চোখ রাঙাতো, ঝগড়া করতো। বলতো, আমাদের বিষয় সম্পত্তি ভাগ করে দাও। আমরা চলে যাই। ভারভারার আগমনে তারা আরো অধৈর্য্য হয়ে উঠল। তাদের আশঙ্কা হচ্ছিল, বুড়ো বাপ হয়তো মেয়ের দুঃখকষ্ট দেখে সম্পত্তি তাকে খানিকটা দিয়ে ফেলতে চাইবে। সময় থাকতে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। বস্তুত এরা ছিল অশিক্ষিত, সঙ্কীর্ণমনা এবং অর্থগৃধ্নু।

ভাসিলি ভাসিলিচ, মানে গোর্কির মাতামহ, লোকটি একান্ত মন্দ ছিল না, তবে বেজায় বদরাগী। কথায় কথায় চটে যেতেন, যাকে তাকে বলতেন, তোকে আজ খুন করব। শুধু বলতেনই বা বলি কেন? খুন না করলেও জখম করতে তিনি অনুমাত্রও ইতস্ততঃ করতেন না—সে তার স্ত্রীই হোক আর সন্তানই হোক। কাজেই বুঝছ, কি রকম আবহাওয়ায় গোর্কি শৈশবের দিনগুলো কাটিয়েছেন।

যাক সে কথা। গোর্কি ভুলেও তাঁর দাদামশায়ের কাছে যেতেন না। যত আদর আব্দার সব দিদিমার কাছে। তিনি ছাড়া তার আর আপন জনটি কেউ ছিল না। গোর্কির একটিও বন্ধু ছিল না। পাড়ার সমবয়সীদের সঙ্গে তাঁর বনিবনা হতো না। তারা তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করতো—Kashmirian boy বলে ঠাট্টা করতো। এটা তাঁর বরদাস্ত হতো না। বয়সের অনুপাতে তাঁর শরীরে শক্তি ছিল বেশী। কিছুমাত্র না ভেবে তিনি যাকে হাতের সামনে পেতেন তাকে কয়েক ঘা লাগিয়ে দিতেন। ফলে হাতাহাতির সৃষ্টি হতো। ওরা দলে ভারী। কাজেই তাঁকেই প্রতিবারই হার স্বীকার করতে হতো। কোন দিন বা রক্তারক্তি করে বাড়ী ফিরতেন। দিদিমা তাঁর দুর্দ্দশা দেখে চোখের জল রাখতে পারতেন না। সস্নেহ-ভর্ৎসনার সুরে বলতেন, দুষ্টু ছেলে, ফের যদি ওদের সঙ্গে যাবে তা হলে ঠিক তোমার দাদুকে বলে দেব। বকুনি খেয়ে দমবার পাত্র গোর্কি নন। ছেলের দলের হল্লা কানে এলেই তিনি ছুটে যেতেন রাস্তায়, ওদের সঙ্গে পেরে না উঠবার গ্লানি বড় একটা গায়ে মাখতেন না। কিন্তু ওদের নিষ্ঠুর আচরণে তিনি মর্ম্মাহত হতেন। এরা অকারণে কুকুর বেড়াল ধরে ঠেঙাত, ইহুদিদের ছাগল-ভেড়াকে তাড়িয়ে নিয়ে যেত অনেকদূর। ভিখারী বা পাগলকে যা-তা বলে, ঢিল ছুড়ে তারা আমোদ পেত প্রচুর।

গোর্কি তার দিদিমার কাছ থেকে বাইবেলের অনেক সুন্দর সুন্দর গল্প জেনে নিয়েছিলেন। ভাসিলিচ কালেভদ্রে গোর্কিকে পড়াতে বসতেন। প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে পারলে খুসীতে উপচে উঠে পিঠ চাপড়িয়ে দিতে দিতে বলতেন, ভেরী গুড, ভেরী গুড। আর ভুল বললে রেগে চীৎকার করে বলতেন, তোকে আজ খুন করব। পাজী হতভাগা।

ভারভারা মাঝে মাঝে ছেলেকে পড়াতেন। তাঁর কাছে গোর্কিকে কবিতা মুখস্থ বলতে হতো। গোর্কি প্রায় পুরোপুরি বলে উঠতে পারতেন না। ভারভারা চটে যেতেন। গোর্কি দ্বিতীয়বার চেষ্টা করতেন। যেখানটায় ভুলে যেতেন সেটা তিনি নিজে বানিয়ে চালিয়ে নিতেন। ভারভারা তাঁর চালাকিটা ধরতে পেরে শাস্তির ভয় দেখাতেন। গোর্কি এতটুকু ভয় পেতেন না। বরঞ্চ দিব্যি তাঁর কাছটিতে সরে এসে হাসিমুখে বলতেন, তুমি কেন আমার উপর রাগ কর?

—করব না। তুমি পড়া বলতে পার না কেন?

গোর্কি বলতেন, সত্যি বলতে কি, মনে মনে আমি ঠিক ঠিক আবৃত্তি করতে পারি। বলতে গেলেই সব গোল পাকিয়ে যায়।

ভারভারা বিরক্ত হয়ে কখন-বা তাঁকে ধরে নিয়ে যেতেন ভাসিলিচের কাছে। দাদামশায়কে গোর্কি যে যমের মত ভয় করেন তা তিনি জানতেন। ভাসিলিচ কিন্তু উল্টো কথা বলতেন, তুই জানিসনে, চমৎকার স্মৃতিশক্তি ওর।

তাঁর মেজাজ ভাল থাকলে অবিশ্যি।

শুভদিন দেখে গোর্কি ও তার মামাতো ভাই সাচাকে স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হল। স্কুল গোর্কির কোনদিনই ভাল লাগত না। মাসখানেক ভাল ছাত্রের মত নিয়মিত স্কুলে গিয়ে তিনি এইমাত্র শিখলেন, নাম জিজ্ঞেস করলে কখন শুধু 'পিস্‌কভ্' না বলে বলতে হয়, My name is Maxim Ditch Peacekove আর শিক্ষককে কখন

বলতে হয় না, শাস্তির ভয় দেখিয়ে লাভ নেই, আপনাকে আমি একটুও ভয় করি না।

সাচার কাছে স্কুল একান্ত মন্দ লাগত না। কিন্তু গোল বাধল একদিন। ক্লাসে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। এবং ঘুমঘোরেই চীৎকার করে বলে উঠেছিল, আমি পারব না। ব্যস্ আর কথা নেই, শিক্ষক মশাই উঠে এসে বেদম প্রহার করলেন তাকে। নিষ্ফল আক্রোশে গর্জাতে গর্জাতে সেদিনকার মত সে বাড়ী ফিরে এল। পরদিন স্কুলে যাবার মাঝপথে এসে বেঁকে বসল। বলল, স্কুলে যাবে না সে। এতেই সে ক্ষান্ত হল না। হাতের বইগুলো সব বরফে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দিগ্বিজয়ী বীরের মত বুক ফুলিয়ে অন্য পথ ধরল। তার সঙ্গীটি হচ্ছেন গোর্কি। সাধ থাকলেও সাধনার অভাবে অতটা মরিয়া তিনি হয়ে উঠতে পারলেন না। তদুপরি পাছে মা আঘাত পান এ ভাবনাও তাঁর ছিল। কাজেই যথারীতি তিনি স্কুলে গেলেন। ঘটনাটা সেদিনই ভাসিলিচের কানে এল। যথাসময়ে তাঁদের ডাক পড়ল দাদামশায়ের ঘরে।

এলেন তাঁরা। সাচাকে জেরা শুরু করলেন ভাসিলিচ।

স্কুলে যাওনি কেন?

পথ ভুল হয়ে গিয়েছিল।

হুঁম।

সত্যি! আমি এদিক ওদিক পথ খুঁজতে

ভাসিলিচ বাধা দিয়ে বলল, গোর্কি তো সঙ্গে ছিল?

ওকে হারিয়ে ফেলেছিলাম।

কি করে হারালে?

সাচা এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বলল, কী ভীষণ ঝড়বৃষ্টি, কিছু দেখা যাচ্ছিল না।

ভাসিলিচ ছাড়া ঘরে গোর্কির মা ও দিদিমা উপস্থিত ছিলেন। সাচার কথা শুনে তাঁরা মৃদু হাসতে লাগলেন। আর গোর্কির অবস্থা? তিনি তখন বলির পাঁঠার মত কাঁপছেন।

ভাসিলিচ আবার বললেন, তুমি তো ওর হাত ধরে রাখতে পারতে?

সাচা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, ধরেই তো ছিলাম। বাতাসে হঠাৎ ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত শেষরক্ষা হল না। দুজনের উপরই শাস্তির হুকুম হল। অধিকন্তু এর পর থেকে তাদের স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসবার জন্যে একজন লোক নিযুক্ত করা হল।

সাচার শয়তানী কিন্তু এতে একটুও কমল না। ঠিক এর পরদিনই সে আবার বই ছুঁড়ে ফেলে পালিয়ে গেল। অনেক করে তাকে ধরে আনা হল। এক সময় সাচা গোর্কিকে চুপি চুপি ডেকে নিয়ে তার মনের গোপন বাসনা খুলে জানাল। বলল, কেউ আমাদের ভালবাসে না। আমি আর থাকব না এখানে। ঠাকুরমার কাছ থেকে জেনে নেব ডাকাতদের আস্তানা। তারপর তাদের দলে গিয়ে ভিড়ব। তুইও চল না আমার সঙ্গে, যাবি?

গোর্কি সম্মত হলেন না। তাঁর মস্ত আশা বড় হয়ে তিনি একজন 'অফিসার' হবেন। কাজেই যে করে হোক তাঁকে লেখাপড়া শিখতেই হবে। সাচা তাঁর অসম্মতিতে নিরাশ হল না। বলল, বেশ তুই হবি অফিসার আর আমি হব ডাকাত-সর্দার। তোকে একদিন আমায় খুঁজে বের করে বন্দী করতে হবে, কেমন? আর আমি চেষ্টা করব তোদের খুন করতে। অবশ্যি তোকে আমি কোনোদিন খুন করব না। তুই আমায় খুন করবি?

না। গোর্কিও প্রতিশ্রুতি দিলেন। (ক্রমশঃ)

প্রভাতী

জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী

সাগর পারের উদ্দাম কলরোল
দিনের আলোরে দেয় সে লজ্জা ভয়
বিষাক্ত বায়ু রক্তের ফিন্‌কি—
অনলে মানব নিজেরে করিছে ক্ষয়
গুঁড়াইয়া সব বুকের পাঁজর
"মার্সের" জয় রথ

ধরণীর বুকে লেপি' কলঙ্ক
লভিছে আপন পথ।
অন্ধকারেরে করো বিদূরিত
প্রভাতের হে সেনানী
নব দিবসের করো সঞ্চার
অমিয় দাও হে আনি'।
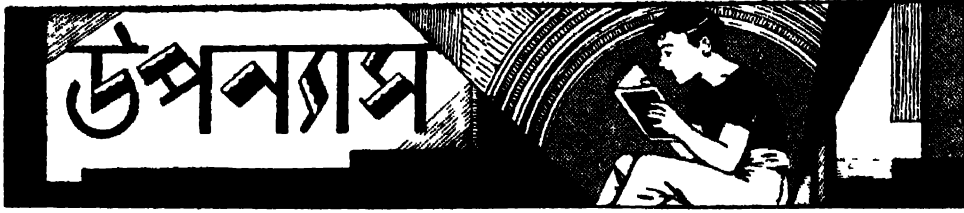
৩১শে মার্চ মঙ্গলবার বেলা ১২টা

শ্রীতাপসরঞ্জন সরকার

অষ্টাদশ

অনুসরণ

স্টেশনে পৌঁছে বিজয় দেখল যে তখনও গাড়ী আসবার মিনিট পাঁচেক বাকী। স্টেশনেও গাড়ী পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করবে, সুতরাং ইতিমধ্যে নিজের একটা দরকারী কাজ শেষ করা যেতে পারে এই ভেবে বিজয় 'ওভার ব্রিজ' পেরিয়ে এমন একটা যায়গায় এসে দাঁড়াল যেখানে দাঁড়ালে "পূর্বধলা" থেকে স্টেশনে আসবার রাস্তা স্পষ্ট দেখা যায়। স্টেশনের এ যায়গাটা বেশ অন্ধকার। মাল-গাড়ীগুলো পাশাপাশি সাজানো রয়েছে। দূর থেকে সান্টিংএর শব্দ ব্যতীত আর কোন রকম শব্দ কর্ণগোচর হচ্ছে না। উক্ত রাস্তার মোড়ে দু'টি পোষ্টে আলো জ্বলছে, সুতরাং রাস্তা আলোয় বেশ পরিষ্কার ঝকঝক্ করছে। এক মিনিট, দু' মিনিট কোরে পাঁচ মিনিট কেটে গেল কিন্তু বিজয় তার ইপ্সিত কোন বস্তুই সেই রাস্তায় দেখতে পেল না। এমন সময় হুস্ হুস্ কোরে স্টেশনের তিন নম্বর প্ল্যাটফরমে একখানা প্যাসেঞ্জার ট্রেন এসে দাঁড়ালো। বিজয় তাড়াতাড়ি সুটকেশটি হাতে নিয়ে একখানা সেকেণ্ডক্লাশ কামরায় ঢুকে দরজাটি নিঃশব্দে ভেজিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে গর্জ্জন করে ট্রেনখানা সজোরে ছুটে চললো "রংগিরি" অভিমুখে। স্টেশনের পর স্টেশন পেরিয়ে গাড়ীখানা ছুটে চলতে লাগলো, আর বিপরীত দিকে যেতে লাগলো গাড়ীর দু'ধারের নিবিড় তমসাচ্ছন্ন গভীর জঙ্গল—বনের পর বন। যেন তার শেষ নেই। মাঝে মাঝে দু' একটা আলোর ক্ষীণ রশ্মি চোখে পড়ছে। অবশেষে রাত্রি সাড়ে দশটায় গাড়ী এসে দাঁড়ালো "রংগিরির" পাহাড় কেটে তৈরী, অসমান, পাথরের উপর ছড়ানো কাঁকরভরা প্ল্যাটফরমে।

স্টেশনের চারিদিকে পাহাড় আর থমথমে গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন নিবিড় বন। স্টেশন থেকে একটা পাথর ও কাঁকরে তৈরী রাস্তা সোজা শহরের কেন্দ্রাভিমুখে চলে গেছে। রাস্তার দু'পাশে নানা রকম গাড়ী, বাস, ট্যাক্সি ইত্যাদি দাঁড়িয়ে আছে। বিজয় একটা টমটমে চেপে সোজা "মডার্ণ হোটেলে" ঢুকে দ্বিতলের পাঁচ নম্বর রুম খানা ভাড়া নিলে।

মেল ট্রেন রংগিরি স্টেশনে এসে পৌঁছুতে আরও দেড় ঘণ্টা বাকী। বিজয় খাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়লো থানার দিকে। সেখান থেকে দশজন সরকারী পুলিশ যোগাড় কোরে তাদের ছদ্মবেশে সাজিয়ে নিয়ে চললো স্টেশনের অভিমুখে।

রাত্রি বারোটা হয়ে গেছে। আকাশে নক্ষত্রের চিহ্ন-মাত্র নেই। সারা আকাশ ব্যেপে মেঘ করেছে। চন্দ্রমা মেঘের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে তার স্নিগ্ধ আলো থেকে ধরণীকে বঞ্চিত করেছেন। পৃথিবী যেন অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। "রংগিরির" পাহাড়গুলোও যেন সে অন্ধকারে আত্মগোপন করেছে। স্টেশনের কোথাও জনপ্রাণীর অস্তিত্ব নেই। না আছে কোন যাত্রীর চঞ্চল কলরব, না আছে কোথাও কোন ফেরিওয়ালার চীৎকার। দোকান পাঠও সমস্ত বন্ধ। আসন্ন ঝড় বৃষ্টির ভীষণ দুর্যোগ থেকে রেহাই পাবার জন্য যে যেখানে পেরেছে আশ্রয় নিয়েছে। বিজয়ের হঠাৎ মনে হল সেখানে যেন একটা অবশ্যম্ভাবী বিপদের আশঙ্কা বিরাজ করছে।

শুধু এগারজন দুঃসাহসী লোক এই অবশ্যম্ভাবী বিপদকে মাথায় নিয়ে তাদের ইপ্সিত বস্তু লাভের আশায় লাইনের এপারে, ওপারে, দূরে, নিকটে অন্ধকারের মধ্যে সতর্ক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারা বিজয় ও তার ছদ্মবেশী পুলিশের দল।

ইতিমধ্যে তুমুল ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। যেমনি মুষলধারে বর্ষণ তেমনি হাওয়ার ভীষণ গর্জন। স্টেশনের প্ল্যাটফরমটা আগেই জনশূন্য হয়ে পড়েছিল। এই দুর্যোগের মধ্যে হঠাৎ দেখা গেল একটি লোক একখানা আধভাঙ্গা ছাতাকে এই ঝড় বৃষ্টির বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে ছুটে চললো সিগনেল পোষ্টের দিকে। সিগনেল ডাউন হয়ে গেল।

মুহূর্ত পরেই তীব্রগর্জনে ঝড়ের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে করতে এক্স্‌প্রেস্‌খানা ছুটে এসে ষ্টেশনের বুকে ঢুকে পড়লো।

যাত্রীপূর্ণ গাড়ী, কিন্তু কেউই ট্রেন থেকে এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে নামতে সাহসী হলো না। কামরায় কামরায় দরজা বন্ধ, সমস্ত জানলা খড়খড়ি ও কাচ তোলা। হঠাৎ ট্রেন ছাড়বার হুইসল পড়তেই দেখা গেল যে দু'টি লোক সেই ভীষণ ঝড়বৃষ্টির মধ্যেই খুব ব্যস্ত হয়ে ট্রেন থেকে নেমে পড়লো। তারপর ছুটে চললো ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ডের দিকে ।

ষ্ট্যাণ্ড থেকে যে ট্যাক্সিখানা দু'জন প্রাণীকে কোলে নিয়ে বেরিয়ে এলো, এবং ছুটে চললো একটা সরু রাস্তা ধরে, একখানা বড় বাস কোথা থেকে বেরিয়ে সেই ট্যাক্সিখানার অনুসরণ করলে। বহুক্ষণ প্রবল বৃষ্টি হওয়ায় রাস্তায় জল দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সে জলস্রোত তুচ্ছ করে ট্যাক্সিখানা ছুটে চলেছে বিদ্যুৎ গতিতে। আর বাসখানাও তেরজন যাত্রী নিয়ে যেন তার সঙ্গে পল্লা দিচ্ছে।

বিজয় রিভলবার হাতে নিয়ে "রেডি" হয়ে রয়েছে কিন্তু গুলি ছোঁড়বার কোন সুযোগ হয়ে উঠছে না। সঙ্কীর্ণ গলিপথের জলকাদা ছেড়ে ট্যাক্সিখানা এখন পিচ ঢালা বড় রাস্তায় এসে পড়লো এবং ছুটলো বিদ্যুতের মতো। এপথে এসে পড়ে বাসের গতিও যেন সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে গেল প্রায় দেড়গুণ। বিজয় ড্রাইভারকে বললে, "আরও জোরে। ও গাড়ীকে বেশী তফাতে যেতে দিয়োনা।"—অমনি বাসের গতি হয়ে গেল ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল। তারপর পঁয়তাল্লিশ, তারপর পঞ্চাশ, তারপর ঝড় ঝড় করে উঠে পড়ল একেবারে ষাট। ক্রমশঃ শহর ও লোকালয় ছেড়ে গাড়ী দু'খানা এসে পড়লো গভীর বনের মধ্যে। বনের দুধার ঘেঁষে পাহাড়। অরণ্যের ফাঁকে ফাঁকে সরু রাস্তা সাপের মত এঁকে বেঁকে চলে গেছে।

বাস ও ট্যাক্সির তখন ব্যবধান ছিল প্রায় একশো গজ। এই ব্যবধান কিছুতেই কমান যাচ্ছে না দেখে বিজয় ট্যাক্সিটাকে লক্ষ করে হাতের রিভলভারে চাপ দিল। ট্যাক্সির পেছনের চাকার একখানা টায়ার সশব্দে ফেটে গেল। কিন্তু ট্যাক্সি তিন চাকাতেই ছুটে চললো আরও জোরে। বিজয় আবার গুলি করে ফাটালে পিছনের চাকার আর একখানা টায়ার। গাড়ী থামলোনা, হঠাৎ তার পিছনের স্ক্রীন ভেদ করে দুড়ুম দুড়ুম শব্দে দুটো গুলি ছুটে এল। অব্যর্থ সন্ধান! সে গুলিতে পিছনের বাসের হেডলাইট দুটো চুরমার হয়ে নিবে গেল।

একে তো ঘোর দুর্য্যোগের রাত্রি—তার উপর আবার চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার, সুতরাং হেডলাইট ছাড়া বাসখানা এই বনজঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ে রাস্তা দিয়ে আর এগুতে সাহসী হোল না। টর্চলাইটে পথ দেখে আস্তে আস্তে সামান্য একটু অগ্রসর হয়েই একটা রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়িয়ে গেল। এর ফলে বিজয় অত্যন্ত নিরুপায় ও অসহায় হয়ে পড়ল। তার সমস্ত চেষ্টা বুঝি ব্যর্থ হয়ে যায়। বিজয়ের বুকের ভিতরটা যেন ভেঙে পড়ল।

হঠাৎ একখানা ছোট্ট প্রাইভেট কার (car) সেই মোড় থেকে উজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ করে বেরিয়ে এসে পূর্বোক্ত ট্যাক্সির পিছনে বিদ্যুতবেগে ছুটে চললো। বিজয় তা দেখতে পেয়েই আনন্দাতিশয্যে লাফিয়ে উঠে বললে, "আর ভয় নেই ইন্সপেক্টার, ঐ গাড়ীখানায় আমার বন্ধু অশোক যাচ্ছে।" ইন্সপেক্টার বললে, "কিন্তু ওঁকে তো থামান গেল না। এরা গিয়ে শেষে হয়তো প্রাণটা হারিয়ে আসবেন।" বিজয় বললে, "কথাটা নেহাৎ মন্দ বলেননি। কিন্তু থামাবার তো কোন উপায় দেখছি না। তবে,—হ্যাঁ এক কাজ করতে পারলে দু'টো গাড়িকেই থামান যেতে পারে। কাছে কি কোথাও 'ফোন' আছে?" সর্দার বললে, "হ্যাঁ, আছে বৈকি, ঐ যে 'আউট পোস্টটা' দেখা যাচ্ছে না? ওখানে।" বিজয় বললে, 'টার্নপাইক গেট' এখান থেকে কতদূর? ইন্সপেক্টার উত্তর করলে, "মাইল ত্রিশেক হবে।" "তা'হলে শীগগীর চলুন। গাড়ীখানা হয়তো এতক্ষণ গেটের কাছাকাছি পৌঁছে গেল।" বলেই বিজয় সোজা ছুটলো টর্চ নিয়ে আউট পোষ্টের দিকে। Turn pike gate রক্ষককে ফোনে ডেকে বললে, "দু'খানি মোটর এক্ষনি গেট cross করবে। সামনের গাড়ীখানার আরোহী দু'জনের নামে পুলিশের ওয়ারেণ্ট আছে। গেট বন্ধ রেখে গাড়ী আটকে যেন বলা হয় যে ওধারের রাস্তা খারাপ, পাহাড় ধ্বসে পড়ে পথ বন্ধ হয়েছে। ইতিমধ্যে পুলিস ভ্যান গিয়ে পড়বে। আচ্ছা ··o k—।" ফোন সমাপনান্তে বিজয় আবার বাসে উঠে বসলো। টর্চের আলোতে পথ দেখে দেখে মন্দ গতিতে বাসখানা এগুতে লাগলো। রাত্রি প্রায় দুটো বাজার সঙ্গে সঙ্গে বাসখানা পূর্বোক্ত গেটের সম্মুখীন হোল। কিন্তু বিজয় সেখানে কোন গাড়ী দেখতে না পেয়ে বিস্মিত হল। তাড়াতাড়ি বাস থেকে নেমে টর্চ ফেলে দেখে টার্নপাইক গেট চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে পড়ে আছে।

আকাশ তখনও মেঘে আচ্ছন্ন, চারিদিক তখনও অন্ধকারময় । বিজয় টর্চের আলোক নিক্ষেপে দেখতে পেলে যে গেটের একমাত্র আলোটি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। নিকটে কোথাও জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নেই। গেট-কীপারের ঘরখানা তালাবদ্ধ হয়ে আছে। গেটও নিশ্চয়ই বন্ধ ছিল কিন্তু বন্ধ থাকা সত্ত্বেও যে সম্মুখের গাড়ীখানা সবলে ধাক্কা দিয়ে গেট ভেঙ্গে চলে গিয়েছে

তাতে কারো কিছুমাত্র সন্দেহ রইল না। এতক্ষণে যে তারা কোথায় উধাও হয়েছে তা কে জানে? অগত্যা আর অগ্রসর হওয়া নিষ্ফল বুঝে বিজয় গাড়ী থেকে সুটকেশ বের করে নিয়ে ইন্সপেক্টারকে বললে, "ভোর হলে আপনি বাস নিয়ে থানায় ফিরে যাবেন। আমি কাল সকালে একটু বেলায় ট্যাক্সি করে ফিরবো।" ইন্সপেক্টার বললে, "কিন্তু আপনি এই অন্ধকার রাত্রে—একা এভাবে কোথায় যাবেন?" বিজয় একটু হেসে বললে, "ভয় নেই, কেউ আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। আমার আগমন প্রতীক্ষা করবেন না। ভোর হলেই চলে যাবেন। কাল সকালে আমি হয় থানায় নয় ত মডার্ণ হোটেলের রুম নম্বর পাঁচে ফিরে আসবো। একবার খবর নেবেন।" তারপর ইন্সপেক্টারকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে বিজয় তাকে সাবধান করে দিলে যে তিনি যেন দয়া করে এ ব্যাপারে মাথা না ঘামান। দরকার বোধ হলে আমি থানায় ফোন করবো। আচ্ছা, নমস্কার," বলেই বিজয় সুটকেশ হাতে সেই অন্ধকারের মধ্যে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। (ক্রমশঃ)

শ্রীনিখিলেশ সেন

(২)

বহু প্রাচীন কাল থেকেই প্রাচ্য সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের একটা কৌতূহল আছে। অনেকদিন আগে থেকেই শিক্ষাদীক্ষা ও সভ্যতায় প্রাচ্যের স্থান বহু উচ্চে, তাই সুপ্রাচীন কাল থেকেই পাশ্চাত্ত্যবাসীরা যাত্রা করেছে প্রাচ্যে—প্রাচ্য শিক্ষাদীক্ষা ও সভ্যতা সম্বন্ধে তাদের কৌতূহল মেটাবার জন্যে।

১২৬৯ খৃষ্টাব্দে নিকলো এবং ম্যাফিও পোলো নামক দুজন ভিনিসবাসী বহুদিন অনুপস্থিতির পর দেশে ফিরল। তারা সুদীর্ঘ কয়েক বছর ধরে ব্যবসাবাণিজ্য উপলক্ষে কনস্ট্যান্টিনোপল্, চীন এবং এসিয়ার অন্য কয়েকটা দেশে ঘুরে বেড়িয়েছিল। দুবছর দেশে থাকার পর ১২৭১ খৃষ্টাব্দে তারা আবার প্রাচ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। এবার তাদের সঙ্গে চলল নিকলোর পনের বছর বয়স্ক ছেলে মার্কো। আর তাদের সঙ্গে চলল দুজন ধর্ম্মপ্রচারক।

প্রথমে তারা একটা জাহাজে যাত্রা করলে। তাদের উদ্দেশ্য ক্যাথেতে যাওয়া। জাহাজটা বাইরে খুব চাকচিক্যময় হলেও তার ভেতরে থাকবার ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ। যাই হোক, সমস্ত কষ্ট সহ্য করে তারা এগিয়ে চলল, এবং অবশেষে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী লেইয়াসাসে পৌঁছুল। সেখান থেকে তারা হাঁটা শুরু করল, চীন-সম্রাটের দরবারের উদ্দেশ্যে।

দিনের পর দিন ধরে তারা এগিয়ে চলল। কিন্তু শীতকালে তাদের যাত্রা বন্ধ করতে হল—বরফ, নদীর বান এবং ঠাণ্ডার জন্যে। তাছাড়া পথও খুব সুগম ছিল না। একে ত বন্ধুর পথ, তারপর আবার দস্যু ও অসভ্য লোকের ভয়। সব দেখে শুনে ধর্ম্মপ্রচারক দুজন ভয় পেয়ে ফিরে এল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাকি তিনজন এগিয়ে চলল। অবশেষে যখন তারা চীনের কাছাকাছি পৌঁছুল—চীন যখন তাদের কাছ থেকে আর তিন মাসের পথ—তখন তারা দেখলে যে তাদের সামনে রয়েছে এক সুবিশাল বালুসমুদ্র—গোবি মরুভূমি, যার একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত দেখা যায় না। তা দেখে মার্কোর ছোট্ট মনে হয়ত একটু ভয় দেখা দিয়েছিল, কিন্তু তার সঙ্গী দুজন পাকা অভিযাত্রী, তারা এ ধরণের বিপদ বহুবার উত্তীর্ণ হয়েছে। তাছাড়া গোবিমরুভূমির উপর দিয়েও তারা আগে চলেছে। তাই নির্ভয়ে তিনজনে সেই মরুসমুদ্রের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

অবশেষে যখন তারা চীন রাজদরবারে পৌঁছুল তখন তাদের সমস্ত দুঃখকষ্টের অবসান হল। চীনসম্রাট কুবলাই খাঁর মার্কোকে ভারি ভাল লাগল, এবং সে রাজদরবারেই থেকে গেল।

অবশেষে মার্কোর বয়স যখন কিছু বাড়ল তখন সম্রাট

তাকে রাজদূত করে কোচিন চীন, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে পাঠাতে লাগলেন। মার্কোকে রাজদূত করে পাঠানোর কারণ তার প্রতি চীন সম্রাটের স্নেহই শুধু নয়, মার্কোও এখন বেশ চালাক-চতুর হয়ে উঠেছিল এবং অনেকগুলো ভাষায় কথা বলতে শিখেছিল।

তার কাজ দেখে সম্রাটের স্নেহ তার প্রতি ক্রমশঃ বাড়তেই লাগল, কারণ যখনই তিনি তাকে যেখানে পাঠাতেন, সেখানে সে তার কর্তব্যই যে শুধু ভাল ভাবে করে আসত তা নয়, সেখানকার সম্বন্ধে এমন কতকগুলো তথ্য সে সংগ্রহ করে আনত যা সম্রাটের যথেষ্ট উপকারে লাগত।

সতের বছর চীন রাজদরবারে থাকবার পর মার্কো তার বাবা ও কাকাকে নিয়ে দেশে ফিরে যেতে চাইলে। চীন সম্রাট তাদের ছেড়ে দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না, কিন্তু মার্কোর সৌভাগ্যবশতঃ একটা সুযোগ ঘটে গেল। ক্যাথের এক রাজকুমারীর সঙ্গে পারস্যের এক রাজার বিয়ে হবার কথা ছিল। তাই কুবলাই খাঁ মার্কো, তার বাবা ও কাকার হাতে রাজকুমারীর ভার দিয়ে তাঁকে সমুদ্রপথে পারস্যে পাঠিয়ে দিলেন।

দেড় বছর ধরে সমুদ্রযাত্রার পর যখন তারা পারস্যে পৌঁছুল, তখন একটা দুঃসংবাদে সকলে চিন্তিত হয়ে পড়ল—যে রাজার সঙ্গে ক্যাথে রাজকুমারীর বিয়ে হবার কথা ছিল তিনি মারা গেছেন। অবশেষে পারস্যবাসীদের পরামর্শ মত যে রাজার সঙ্গে রাজকুমারীর বিয়ে হবার কথা ছিল, তাঁর ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে মার্কো, তার বাবা ও কাকা দেশে চলে গেল।

দেশে ঘোরবার এক বছর পরে ভিনিসের সঙ্গে জেনোয়ার যুদ্ধ বাধল, এবং মার্কো সে যুদ্ধে বন্দী হয়ে জেলে গেল। তিন বছর পরে সে মুক্তি পেল। এই তিনবছর জেলে সে অভিযান ও ভ্রমণকাহিনী লিখে কাটিয়ে দিলে। (ক্রমশঃ)
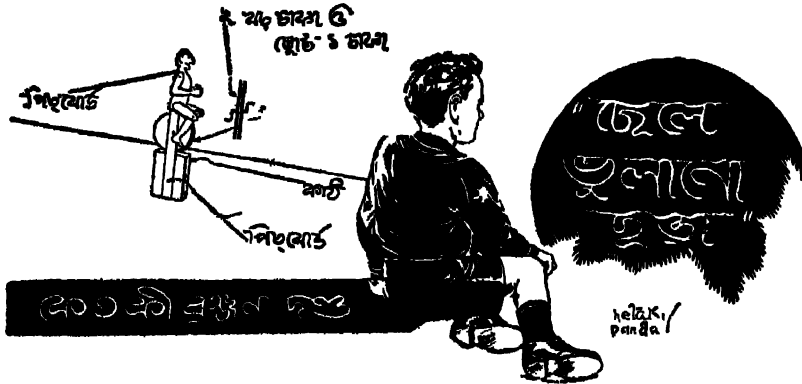
ছোট ভাইটি কাঁদছে,—আগের দিনে তুমি হয়ত ছুটো ছেলেভুলানো ছড়া বলেই তাকে হাসিয়ে ফেলতে, কিন্তু আজ আর সেদিন নেইত। কাজেই তোমাকে আশ্রয় নিতে হবে এমন একটা কিছুর যা তাকে আজ ওই ছেলে-ভুলানো ছড়ার মতই ভুলোবে, আবার জোগাবে মনের খোরাক এবং ভবিষ্যতে বড়ো হবার মতো বুদ্ধি। সেইদিক থেকে যে খেলনাটির কথা বলছি—তা তোমরা তৈরি করবার চেষ্টা করে দেখতে পারো।

একটা মোটা পিচবোর্ড থেকে ওই মানুষটির হাত-পা-গুলি কেটে সরু তারের টুকরো দিয়ে জুড়ে দাও। লোকটির পা দু'টায় যে চাকাটা থাকবে প্যাডেলের সাথে লাগানো,—তা তৈরী করতে হ'বে মোটা পিচবোর্ড কেটে এবং তার মধ্যে খাঁজের জন্য ছোট বোর্ড কেটে গঁদ দিয়ে লাগিয়ে নিতে হবে। তারপর শেষের দিকে দিতে হ'বে এক টুকরো চৌকোস কাঠ—ওজনের জন্য। সেটা লাগানো থাকবে লোকটির শরীরের সাথে শক্ত করে। ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে।

ঘরের এ ধার থেকে ও ধার পর্যন্ত একটা মোটা সুতো, যা চাকার খাঁজের মধ্যে সহজেই যেতে পারে, টানিয়ে দাও। সুতোটা খুব টান থাকবে আর থাকবে তার একমাথা অন্য মাথা থেকে একটু উঁচুতে।

লোকটিকে সুতোটার উপর ছেড়ে দিলেই তিনি দিব্বি পা দু'টো পেডেল করে সুতোর উপর দিয়ে চলবেন। মাত্র ক' মিনিটের অবসরে এই ছেলেভুলানো ছড়া তোমার ছোট ভাইবোনদের হাসিয়ে মারবে। অবশ্য একটু বাহাদুরীও নিশ্চয় পাবে।

জালিয়াৎ জ্যোতিষী

প্রবোধ সরকার

গল্পটা সত্যি।

খুব বেশী দিনের কথা না হলেও যে সময়ের কথা বলছি আমাদের পণ্ডিত মশাই তখন ছাত্র, শেষ উপাধি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। তিনজন হিন্দুস্থানী জ্যোতিষী এসে তাঁর বাড়ীতে হানা দিলে। বললে,—বাবুজী। আমরা খুব ভাল জ্যোতিষ জানি, ভূত ভবিষ্যৎ বলতে পারি। পরীক্ষা করে দেখুন। পণ্ডিত মশাই বললেন—"মাপ করুন, আমি এখন উপাধি পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছি, বড় ব্যস্ত, হাত দেখাবার সময় নেই।"

জ্যোতিষীরা বললে—"হাত না দেখেই অনেক কিছু বলতে পারি। দু'মিনিটের জন্য সময় দিন।"

কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে পণ্ডিত মশাই বললেন,—আচ্ছা। আমি এখন যা ভাবছি, তা যদি বলতে পারো তাহ'লে তোমাদের চার আনা বখশিস্ দেবো।

জ্যোতিষীর দল তৎক্ষণাৎ রাজি হ'ল। পণ্ডিত মশাইকে বললে, যা ভাবছেন একখানা কাগজে লিখে রাখুন।

পণ্ডিত মশাই বাড়ীর ভিতর গিয়ে একটুকরো কাগজে তাঁর বর্তমান ভাবনাটা লিখলেন—এবং ভাঁজ করে সেখানা হাতের মুঠায় নিয়ে ফিরে এলেন।

জ্যোতিষী বললে,—আপনি চোখ বুজে বসে ভগবানের নাম জপ করুন। আমি না বলা পর্যন্ত চোখ খুলবেন না। ক'বার জপ করলেন মনে মনে হিসাব রাখবেন।

পণ্ডিত মশাই বুদ্ধিমান লোক। তিনি ভৃত্যকে ডেকে সেখানে দৃষ্টি রেখে দাঁড়াতে ব'লে চোখবুজে ইষ্টনাম জপ করতে লাগলেন। এক মিনিট যায়—দু'মিনিট যায়—তিন মিনিট যায়, জ্যোতিষী চোখ আর খুলতে বলে না। এদিকে ভয়ও আছে,—কি জানি চোখ খুললে বা আড়-চোখে একটু চেয়ে নিলে জ্যোতিষীর গণনা পাছে ভুল হয়ে যায়। আবার বেশীক্ষণ চোখবুজে বসে থাকাও নিরাপদ নয়,—চাকর বেটাকে ফাঁকি দিয়ে চক্ষুদান দেবার ভয় আছে।

—বাবুজী এইবার চোখ খুলুন। কতবার জপ করা হ'লো?

পণ্ডিত মশাই একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলে চোখ চেয়েই তাড়াতাড়ি একবার চারদিক দেখে নিলেন। নাঃ সব ঠিকই আছে, আর সতর্ক প্রহরী হয়ে চাকরটাও সেখানে দাঁড়িয়ে।

পণ্ডিত মশাই তাঁর জপের সংখ্যা জানালেন।

জ্যোতিষী একখানা কাগজে কি সব লিখলে। তারপর বললে, "আপনি যা ভাবছিলেন তা আমি লিখেছি। এই নিন আপনার লেখার সঙ্গে মিলিয়ে নিন।"

পণ্ডিত মশাই দেখে অবাক হয়ে গেলেন—হুবহু সব মিলে গেছে।

পণ্ডিত মশাই তখন তাঁর উপাধি পরীক্ষার কথাই ভাবছিলেন, জ্যোতিষী গণনা করে তাঁর মনের কথা হুবহু ব'লে দিয়েছে। বাঃ লোকটা তাহ'লে গুণী তো। গুণগ্রাহী পণ্ডিত মশাই তাঁদের গুণের প্রশংসা করে প্রতিশ্রুত চার আনা বখ্‌শিস্ দিতে গেলেন।

ওষুধ ঠিক ধরেছে বুঝে জ্যোতিষী তাঁকে একটা রূপার বাটি, খানিকটা গঙ্গামাটি আর একঘটি গঙ্গাজল আনতে নির্দেশ করলে। আরো কিছু অলৌকিক শক্তি দেখাবে তারা।

পণ্ডিত মশাই এবার সাগ্রহে প্রার্থিত বস্তু কটি এনে দিলেন।

জ্যোতিষী অদূরস্থিত জলের কলের ধারে গিয়ে বাটিটা মেজে আনে। অবশ্য গঙ্গাজল আর গঙ্গামাটী দিয়েই বাটিটা ধোয়া মাজা হয়। তারপর জ্যোতিষীর নির্দেশ অনুসারে এক হাতের চেটোয় গঙ্গামাটি সমেত মাজা বাটিটা বসিয়ে অন্য হাত বাটির মুখে চাপা দিয়ে পণ্ডিত মশাই পূর্বের মত চোখ বুজিয়ে ব'সেন ইষ্টনাম জপ করতে। অল্পক্ষণ পরেই পণ্ডিত মশাই অনুভব করলেন বাটিটা ক্রমশঃই গরম হয়ে উঠছে। শেষে হাতে আর রাখা যায় না, এবার বুঝিবা ফোস্‌কা পড়ে যায়। উঃ কি ভীষণ

তেতে উঠেছে। মন্ত্র-তন্ত্রের কি অদ্ভুত শক্তি! পণ্ডিত মশাই গভীর বিশ্বাসে ইষ্টনাম জপ করতে লাগলেন।

"কি বাবুজী, পাত্রটি কি বড্ড গরম লাগছে?" জ্যোতিষী জিজ্ঞাসা করে।

"উঃ হাতে আর রাখা যায় না।"—পণ্ডিত মশাই বললেন চোখ বুজেই।

জ্যোতিষী বললে,—"আপনার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল! কিন্তু একটা কঠিন বাধা সেটাকে চেপে রেখেছে। তাকে নিস্তেজ করবার জন্য যজ্ঞ করতে হবে। যা চাইবো তা দেবেন তো?"

কি চাও না জেনে—কেমন করে বাক্য দান করি? মুদ্রিতনয়ন পণ্ডিত মশাই ঈষৎ বিরক্ত হয়েই বললেন।

জ্যোতিষী সবিনয়ে জানালে—"এমন কিছু নয় বাবুজী, ভয় পাবেন না—মাত্র ন'সের ঘি, আপনার ভাল—

জ্যোতিষীর মুখের কথা মুখেই রইলো, একটা প্রচণ্ড ধমক খেয়ে বেচারা ভড়কে গেল। কারণ ঠিক সেই সময় পণ্ডিত মশাইয়ের এক আত্মীয় এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। ইনি জ্যোতিষীদের উপর ভীষণ খড়্গহস্ত। তিনি ঢুকেই বজ্রনাদে ধমক দিয়ে বললেন,—তোরা এখানে কেন? কি চাস? বুজরুকির জায়গা পাস নি? দাঁড়াও পুলিসে ধরিয়ে দিচ্ছি।

জ্যোতিষীরা মানুষ চেনে, আমতা আমতা করে বললে,—"বাবুজী কিছু দেখতে চাইলেন তাই—"

"পণ্ডিত মশাই বাটি নামিয়ে রেখে চোখ, চেয়ে দেখেন —দাদা।"

পণ্ডিত মশাইয়ের আত্মীয়টি হুঙ্কার ছাড়লেন— "অভি নিকালো।"

বিনা বাক্যব্যয়ে তারা সুড় সুড় করে সরে পড়লো।

কিছুক্ষণ পরে পণ্ডিত মশাইয়ের মাতা বাটিটা মাজতে গিয়ে বললেন,—কি তুক্ তাক্ গুনটুন্ করে গেল বাপু। বাটির তলা থেকে শুধু ছাই উঠছে।

ব্যাপারটা পরীক্ষা করে তখন বোঝা গেল যে মন্ত্র-তন্ত্র কিছু নয়, বাটিটা মাজবার সময় জ্যোতিষীঠাকুর গঙ্গামাটির সঙ্গে এমন কোন একটি গন্ধবিহীন তীব্র 'এসিড্' মিশিয়ে দিয়েছিলেন অলক্ষ্যে যে রজতধাতুর সংস্পর্শে আসতেই বাটিটা ক্রমশঃ গরম হ'য়ে উঠেছিল এবং এখন বাটির তলাটা ক্ষয়ে যাচ্ছে।

পণ্ডিত মশাইয়ের দাদা মাকে বললেন,—শীগগির বাটির মধ্যে খানিকটা নারিকেল তেল ঢেলে দাও মা, নইলে রূপার বাটি তোমার এক্ষুনি ফুটো হয়ে যাবে।

পণ্ডিত মশাই ক্ষীণ প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন—"কিন্তু আমার উপাধি পরীক্ষার কথাটা—"

দাদা বললেন—তোমারই কাছে শুনে লিখে দিয়েছে নিশ্চয়।

* হয়তো আমার অক্ষমতার জন্য গল্পটা ঠিকমত বলা হলো না, ত্রুটি রয়ে গেল,—তজ্জন্য পণ্ডিত মশাইয়ের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

সন্ধ্যা-মালতী

শ্রীনীহারকান্তি ঘোষদস্তিদার

সাঁঝের আঁধারে ঘন ঝোপঝাড়ে
আবছায়া কালো পুকুরের ধারে
তোমরা ফুটিয়া থাক সারে সারে
বাতাসেতে খাও দোল,
চাঁদের স্বপন করে তোমাদের
সারা নিশি উতরোল।
চোখ মেলে দেখ আকাশের গায়
নীরবে রঙীন সন্ধ্যা ঘনায়
হয়তো তখন ঝুরু ঝুরু বায়
তোমাদেরো হিয়া মাঝে
শুদ্ধ নিঝুম সন্ধ্যার সুর
ঘনায় রঙীন সাঁঝে।

জোনাকী পোকার আলো ঝল মল
হেরি কি তোমরা হও চঞ্চল?
পুলকে শিহরি চিত্ত চপল,
ছলছল করে প্রাণ
ছোট ছোট আলো করে চুপে চুপে
তোমাদের আহ্বান।
সন্ধ্যাবেলার মন্দিরে কত
কাঁসর, ঘণ্টা বাজে অবিরত
তারি ভেসে আসা স্তব গান যত
আরতির বন্দন
পূজার পুষ্প বলি তোমাদের
করে অভিনন্দন।

টাইপ ও টাইপরাইটার

শ্রীপ্রভাস বসু

হাতে লেখা প্রাচীন পুঁথি পত্রের যুগ পার হয়ে আমরা যে যুগের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা শুরু করলাম সে যুগের প্রভাত তখন বিজ্ঞান-সূর্যের দ্যুতিতে ধীরে ধীরে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠতে শুরু করেছে। আমাদের আলোচ্য বিষয় অক্ষর ও তার আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি। লেখার ইতিহাস বা তার কোন প্রাচীন তথ্য নিয়ে গবেষণা নয়।

হাতে লেখার যুগ পার হয়ে অক্ষরের সাহায্যে ছাপা শুরু হয়েছে মাত্র কয়েক শতাব্দী আগে। তবে তারও বহু পূর্বে চীনদেশে মাটির বা কাঠের ব্লক তৈরী করে তাইতে লিখন উৎকীর্ণ করে ছাপানর ব্যবস্থা ছিল। এ রকম এক একটি অক্ষর আলাদা আলাদা সাজিয়ে নয়। অক্ষরের সাহায্যে ছাপার সম্বন্ধে দু' দলের দাবী শোনা যায়। ডাচেরা বলেন যে ১৪২০ খৃষ্টাব্দে Lourens Coaster আবিষ্কার করেন কিন্তু জার্মানরা বলেন যে ১৪৩৮ খৃষ্টাব্দে গুটেনবুর্গ বংশের Johann Gaues Fleisch আবিষ্কার করেন। যাই হোক, আবিষ্কারের পঁচিশ বছরের মধ্যেই ছাপার ব্যাপারটা বেশ বিস্তৃত হয়ে পড়ল, সকলেই এর উপযোগিতা বুঝতে পারলে। য়ুরোপের বড় বড় শহরে ছাপার কাজ হতে লাগল। ইংলণ্ডে ছাপার প্রবর্ত্তন করেন William Caxton, West-minster Abbeyতে ছাপাখানা খোলেন।

কিন্তু তবুও দু'শতাব্দী ধরে ছাপার কাজে প্রকৃতপক্ষে উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতি হয় নি, যদিও সে সময়ে ছাপার কাজে কেউ কেউ বেশ খ্যাতিলাভ করেছিলেন। যেমন Italyতে Aldus, Hollandএ Elzevir প্রভৃতি। এঁদের ছাপা এত সুন্দর হত যে এখনকার ছাপার সঙ্গে পর্য্যন্ত তুলনা করা যেতে পারে। তার কারণ সব কাজ তখন হাতে হত, ধীরে ধীরে, অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে। আর তার পিছনে আসল চেষ্টা যেটা ছিল সেটা হচ্ছে বড় বড় বুদ্ধিধারী বিদ্বান ও বুদ্ধিমানদের একাগ্র অধ্যবসায় ও উৎসাহ। কাজে কাজেই ছাপার কাজটাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করবার জন্য অত্যন্ত যত্ন নিতেন তাঁরা। United Statesএর ছাপাখানার পিছনে থেকে যিনি অক্লান্ত চেষ্টায় মুদ্রণ শিল্পকে বড় করে তুলেছিলেন তিনি হচ্ছেন Benjamin Franklin সেই সময়েই হাতে চালাবার যে ধরণের সুন্দর মেসিন তৈরী করেছিলেন তিনি আজও তা সামান্য অদলবদল করে ব্যবহার করা হয়।

আমেরিকায় প্রথম প্রেস আসে ইংলণ্ড থেকে—১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে। Stephen Dayeর চেষ্টায় প্রথম প্রবর্ত্তন হয়। ছাপার কেন্দ্রস্থান ছিল Antwerp, Leyden, Paris ও Venice এই সব শহরেই প্রাচীনকালের অক্ষর তৈরী হয়েছিল। 'Italic' বলে ছাপার অক্ষরের যে এক-রকম ধরণ আছে, তা হচ্ছে Petrarchএর হাতের লেখার অনুকরণ। ইংলণ্ডের অক্ষর হল্যাণ্ড থেকে আসত। ইংলণ্ডের Oxford প্রেসের অক্ষর এখনও হল্যাণ্ড থেকে তৈরি করে আনা ছাঁচে ঢালাই হয়। অত্যন্ত সুন্দর, সূক্ষ্ম ধরণের যে সব কাজ, তাতে হয় সেই সব অক্ষর ব্যবহার করা। পিতলের ছাঁচে ইস্পাতের চাপ দিয়ে অক্ষরের আকৃতি তৈরী হয়। অক্ষরের ধারগুলো খুব তীক্ষ্ণ হয় এতে। যে ধাতু সাধারণতঃ অক্ষর তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হয় তা তৈরী হয় tin, antimony আর সীসের খাদ তৈরী করে। প্রথমে ছাপার কাজে কালি লাগান হত বুরুশ দিয়ে, যেমন করে কিছু রঙ করা হয়। কাগজখানা ভিজিয়ে নরম করা হত, তারপর অক্ষরের ওপর বসিয়ে কিছুর সাহায্যে চাপ দেওয়া হত। যাঁরা হাতে বই লিখতেন তাঁরা ভাবতেন কত তাড়াতাড়িই না ছাপা হচ্ছে, আর কী খুশীই না হতেন?

ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ছাপাখানার যন্ত্রপাতির বিশেষ কোন উন্নতি হয় নি। তারপর যখন বাষ্পের ব্যবহার মানুষ করতে শিখল তখন অন্যান্য মেসিনের সঙ্গে ছাপাখানার মেসিনও বাষ্পের সাহায্যে চালাবার ব্যবস্থা করল। উন্নতি হল অনেক রকমে। আগে ছাপা হত চ্যাপ্টা ধরণের কাঠের বা লোহার ফ্রেমে টাইপ বসিয়ে তার উপর এক একখানা করে কাগজ দেওয়া হত। উপর থেকে মেশিনের চাপ দিয়ে সেই কাগজের উপর অক্ষরের ছাপ পড়ত, আবার সেই কাগজ ফিরে এলে হাতে করে তুলে নেওয়া হত।

মেসিনের ছাপবার ক্ষমতা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে মোটা নল বা চোঙ ধরণের (cylindrical) ফ্রেম তৈরী হল। অন্য মেসিন থেকে টাইপ তৈরী করে সেই টাইপ একসঙ্গে বেঁধে proof দেখা হত। এই টাইপ তৈরী করা 'লিনো টাইপ' মেসিনের কথা পরে বলছি। কোন খবরের কাগজের অফিসে গিয়ে দেখলে সুন্দর ভাবে বুঝতে পারবে। খবরের কাগজ যারা বিক্রী করে তাদের কাছে একরকম লালচে ধরণের কাগজ খুব সম্ভব দেখে থাকবে—বেশ মোটা। তাতে ছাপা কিছু নেই অথচ লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে অক্ষরের ছাপ কাগজের মধ্যে বসে গেছে। এই কাগজ হচ্ছে ঐ proof যে সাজান অক্ষর থেকে তোলা হয়েছে, সেই অক্ষরের চাপের দাগ।

এর পর এই কাগজ ঐ চোঙের গায়ে জড়িয়ে দিয়ে অপর একটা Socket তার মধ্যে লাগিয়ে মাঝখানে গালানো সীসে ঢেলে দেওয়া হয়। তার ফলে হয় কি, ঐ কাগজের বসে যাওয়া অক্ষরের গর্তের মধ্যে সীসে পড়ে চাব্‌ড়া হয়ে চোঙের আকারে অক্ষর বেরিয়ে আসে। তখন ছাপার মেসিনের চোঙে পরিয়ে দেওয়া হয় সেইটেকে। এই রকম অপর একটা চোঙে কাগজ জড়ানো থাকে। দুটো চোঙ যখন বিপরীত দিকে ঘুরতে থাকে তখন সুন্দর ভাবে কাগজ ছেপে বেরিয়ে আসে, কেটে ভাঁজ হয়ে। একে বলে রোটারি প্রিন্টিং। এসব বিষয়ে সকলের চেয়ে আগ্রহশীল হচ্ছে United States, তাঁরাই অধ্যবসায়ের সঙ্গে এ কাজটি শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ করেছেন।

উন্নতি হয়েছে ছাপার গতি ও মিতব্যয়িতার দিকেও। পুরোনো ধরণের হাতের মেসিনে দু'জন লোক ঘণ্টায় একশোখানা কাগজ, ১৮"×৩০" সাইজের একপিঠ ছাপতে পারতো। আর এখনকার রোটারি মেসিন দেখেছ—খবরের কাগজের অফিসে যাতে ছাপা হয়? এতে থাকে এক একটা পিপের মত প্রকাণ্ড সিলিণ্ডার। লম্বায় বোধ হয় ৭ ফুট আর তার ব্যাস হবে ৫ ফুট। ঘণ্টায় ৭২০০০ খানা খবরের কাগজ দুপিঠ ছেপে, ভাঁজ হয়ে, আঠা দিয়ে জুড়ে একেবারে বিক্রী হবার উপযুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসে।

শুধু ছাপা নয়, অক্ষর বসানোর কাজ পর্যন্ত আজ মেসিনে হচ্ছে। যে মেসিনের কথা পরে বলব বলেছি তা হচ্ছে এই মেসিন। দুরকমের মেসিন আছে—Line-o'-type আর Monotype. প্রকৃতপক্ষে অবশ্য এরা কেউই অক্ষর সাজায় না—কি করে তা বলছি।

Linotype আবিষ্কার করেন আমেরিকান এক ভদ্রলোক Otto Mergentherber. লাইনোটাইপের কাজ ছাঁচে অক্ষর ঢালাই করে জমাট একটি লাইন বেঁধে ছেড়ে দেয়। মেসিনের মধ্যে পেছনদিকে অক্ষর থাকবার ছোট ছোট খুপরী আছে, তার ওপরে খাঁজ কাটা একটা রডের মত আছে। আর আছে অক্ষর তৈরী হবার ফুটন্ত গলিত সীসার পাত্র। মেসিনের সামনের দিকে typewriterএর চাবী থাকে। সেই চাবী টিপলেই একটি একটি করে অক্ষর উঠবে। তারপর যে লাইনের মাপে হবে সেই মাপে আসার পরই সমস্ত লাইনটি ঢালাই হয়ে বেরিয়ে আসে বাইরে। ওদিকে যে অক্ষরের সাহায্যে ঢালাইয়ের ছাঁচ হয়েছিল তারা সেই অক্ষর থাকবার ঘরের ওপরের খাঁজ কাটা রড ধরে ফিরে যেতে যেতে যে যার ঘরে টুপ টুপ করে পড়ে যাবে। আবার পরের লাইন তৈরী হলে সে আগের লাইনের সামনে এসে পড়বে। লাইনো টাইপে মস্ত অসুবিধে হচ্ছে যে প্রুফ দেখার সময় যদি ধরা পড়লো যে কোন লাইনে একটি ভুল হয়েছে তাকে সংশোধন করবার জন্য সমস্ত লাইনটিকে নতুন করে ঢালাই করতে হয়। তারপর আগে যেমন বলেছি, পাশাপাশি সাজিয়ে বেঁধে—কাগজে ছাপ তুলে, সীসের চোঙে পরাবার মতো করে খাপ তৈরী করে ছাপা হয়। ছাপা হবার পর সমস্ত সীসের চাংড়াকে আবার গালিয়ে ফেলা হয়। কাজে কাজেই কোথাও এতটুকু ধাতু নষ্ট হয় না, অথচ রোজ নূতন নূতন অক্ষর পাওয়া যায়।

Monotype কলটা অদ্ভুত ধরণের। না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবে না যে মেসিন এত সুন্দরভাবে কাজ করতে পারে। এতে চাবী টেপবার সময় কাগজে জড়ানো রীলে ছেঁদা হয়ে যায়। সে কত রকমের ছেঁদা, সোজা, গোল, বেঁকা, কত রকম। সেই কাগজের রীল খুলে যে মেসিনে অক্ষর ঢালাই হবে সেই মেসিনে পরিয়ে দেওয়া হয়। তলায় কাঁটার মত সব যন্ত্র সেই ছেঁদার আকৃতি দেখে শুনে নিচ্ছে, আর ওপরে লাইনবন্দীভাবে একটি একটি করে অক্ষর—ঢালাই করে দিচ্ছে। এতেও কাজ ঐ একই ভাবে হয়। কলকাতার ছাপাখানায় monotype নেই, আমি দেখেছিলাম দিল্লীতে Government Press of Indiaতে। এ মেসিনের সুবিধে হচ্ছে যে একটা অক্ষর ভুল হলে লাইন না বদলে একটি অক্ষর নিয়ে বসিয়ে দিলেই চলে। অক্ষর প্রতিবারই নূতন, মোটে ভাঙা নয়। Linotype আর Monotype মেসিনের তফাৎ বোধ হয় এতক্ষণে বুঝতে পেরেছ। অবশ্য দুটি মেশিনের নামের মধ্যেই এদের পার্থক্যের কথা বলে দেওয়া আছে। Linotype—কথাটিকে ভাঙলে দাড়াবে Line-o'-type অর্থাৎ যার বাংলা মানে অক্ষরের লাইন। আর Monotype দাঁড়াবে mono-type, mono মানে 'একটি' অর্থাৎ 'একটি একটি অক্ষর'।

ছাপা আপনা থেকে হয় বা অক্ষর সাজানো আপনা

থেকে হয় বলে যে compositor-এর কাজ বন্ধ হয়ে গেছে তা নয়। এত উন্নতির পরেও তাকে সঙ্গে সঙ্গে থাকতেই হয়,—আধুনিকতম ছাপার অফিসেও। হাতে করবার বহু কাজই করতে হয়, বিশেষ করে ছাপার design অর্থাৎ কোন্‌খানে কিভাবে অক্ষর সাজালে দেখতে সুন্দর হবে, এ সব ত আর মেসিন করতে পারবে না। মেসিনের দ্রুত কাজ করবার ক্ষমতা থাকতে পারে, তাই বলে রুচি-জ্ঞানের পরিচয় দিতে পারবে এমন কোন কথা নেই। রুচিসঙ্গত ও সুন্দর অক্ষর সাজানোর কাজে আজও শিক্ষিত ও নিপুণ লোকের অভাব আছে। (ক্রমশ)

স্পেন্সার

নিরঞ্জন মজুমদার

সংস্কৃতে একটা প্রবাদ আছে, যে, বাণিজ্যে নাকি লক্ষ্মী বাস করেন। সরস্বতীও। এলিজাবেথ্‌ তখন ইংল্যাণ্ডের রাণী। এ-যুগটা ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে একটা অত্যাবশ্যক প্রাধান্য লাভ করেছে, কেননা এটা ছিলো ইংল্যাণ্ডের উর্দ্ধগতির, উন্নতির যুগ। ধর্মের গোঁড়ামি নিয়ে অধার্মিক যুদ্ধগুলির অবসান হোলো, সমাজে অসন্তোষের হোলো অন্তর্ধান। কেননা ব্যবসার প্রসারতা ইংল্যাণ্ডকে দিলো ঐশ্বর্য, অথচ এলিজাবেথের ঠিক পূর্বেকার সময়ে দেশে ছিলো দারিদ্র্যের হাহাকার, ধর্মের সংকীর্ণতায় লোকের মন ছিলো আচ্ছন্ন। এ-যুগটা সম্বন্ধে মিল্‌টন্‌ বলেছেন, যে, এ যেন সুপ্তোত্থিত এক বলবান মানব, নিঃশৃঙ্খল, মুক্ত। এ যেন অন্তহীন অন্ধকারান্তে অরুণোদয়। দিগন্তব্যাপী একটা দৃষ্টির প্রসারতায় সাহিত্য হোলো নতুন এক প্রাণোন্মত্ততায় পুষ্ট।

এলিজাবেথ-এর যুগটাকে বলা চলে নাটকের যুগ। তখনকার জীবনে যে-কৌতূহলের উন্মেষ হ'য়েছিলো তার প্রকাশের প্রকৃষ্টতম পন্থা ছিলো নাটক। কিন্তু সে-জীবন-নাট্যে কাব্যের স্থানও সামান্য নয়।

স্পেন্সার সম্বন্ধে আধুনিক সমালোচকরা দাক্ষিণ্যের পরিচয় দেননি। তাঁরা বলেন, যে, কবিদের কিছু একটা বলতে হবে। কেবলমাত্র শ্রুতিমধুর শব্দঝঙ্কারে এবং অর্থহীন ধ্বনিব্যঞ্জনায় সুখী হবে শিশু, তাঁরা নয়। এবং স্পেন্সারের কাব্যে সঙ্গীত ব্যতীত কিছুই নেই। সমালোচনাটা একেবারে অসত্য নয়।

স্পেন্সারের জীবনকে তিনটে স্পষ্ট অংশে ভাগ করা যায়। তিনটে অংশকে সুবিধার জন্য তিনটে জায়গার নাম ধরেই ডাকা যাক।

[কেম্‌ব্রিজ ; ১৫৫২ খৃষ্টাব্দে দরিদ্র পরিবারে লণ্ডন-টাওয়ারের ধারে জন্ম। সেখানেই প্রাথমিক শিক্ষা। সেখান থেকে তিনি এলেন কেম্‌ব্রিজে—এখানে তিনি অধ্যয়ন করলেন, পূর্বতন পণ্ডিতদের গ্রন্থাবলী। ইটালীর সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হ'লেন এমনভাবে, যে, তার প্রভাব তিনি আর কাটিয়ে উঠতে পরেন নি কোনোকালে।

লণ্ডন :—কেম্‌ব্রিজ ছেড়ে স্পেন্সার লণ্ডনে এলেন জীবিকার অন্বেষণে। কাব্যপ্রতিভার টিকিট দেখিয়ে রাজদরবারে প্রবেশ যদিবা মিললো, সুখ মিললো না। সেখানে চলেছিলো চক্রান্ত আর ষড়যন্ত্র, খ্যাতির জন্য হীনতাপূর্ণ তোষামোদ। দরবারের প্রথাগুলোর সঙ্গে কবি মনের একটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ছন্দের ব্যত্যয় আছে, তাই স্পেন্সারের মন উঠলো বিষিয়ে। তাঁর নিজের কথা :

"জানো না, জানো না, ভাবিছ প্রাসাদে আছি,
এ-ই তো নরক, মুক্তি বৃথাই যাচি।
দামী দিনগুলি কাটে নিষ্ফল কাজে,
রাতের আঁধারে আশা-আলো জ্বলেনা যে।"

আয়ার্ল্যাণ্ড :—দরবার থেকে রেহাই পেয়ে স্পেন্সার এলেন আয়ার্ল্যাণ্ডে, লর্ড গ্রে'র সহকারী হ'য়ে। আয়ার্ল্যাণ্ডে তখন অরাজকতার রাজত্ব। দুর্ভিক্ষের পীড়ন আর রাজকীয় সৈনিকের অত্যাচার প্রজাদের ধৈর্যকে টেনে এনেছিল বিদ্রোহের দ্বারদেশে। এখানেই তিনি তাঁর একমাত্র গদ্যগ্রন্থ "আয়ার্ল্যাণ্ডের অবস্থা" রচনা করেছিলেন, এ-গ্রন্থের বিষয়বস্তু ছিলো প্রজাবিদ্রোহের প্রতিকারপন্থা উদ্ভাবন। স্পেন্সার যে নিষ্ঠুর উপায় প্রস্তাব করেছিলেন স্পেন্সারের চরিত্র ইতিহাসে তা দুর্মোচ্য কলঙ্ক রেখে গেছে, যদিও সে-প্রস্তাব রাজদরবারে গৃহীত হ'য়েছিলো সানন্দে।

আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রাকৃতির সৌন্দর্য কাব্যরচনার জন্যে প্রশস্ত। স্পেন্সার এখানে বসে লিখলেন তাঁর সব চাইতে বিখ্যাত কাব্য, "ফেয়ারী কুইন"—পরীর রাণী। কবির সমসাময়িক র‍্যালে তো এ-কাব্য শুনে মুগ্ধ হ'য়ে নিয়ে গেলেন কবিকে রাণীর কাছে। তুষ্টা রাণী কবিকে পুরস্কৃত করলেন একটা নির্দিষ্ট বার্ষিক ভাতা নির্ধারিত করে। অবশ্য, এ-অর্থ কবির কাছে পৌঁছোতো কিনা সে-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে।

সেই সময়েই এলিজাবেথ নাম্নী এক আইরিশ মহিলার সঙ্গে কবির হোলো বন্ধুত্ব। মনের আনন্দ রচিত হোলো "অ্যামোরেটি" সনেট সমষ্টি। বিয়ে হোলো, কবির কলম দিয়ে বেরিয়ে এলো "এপিথ্যালামিয়ন্"—বিশ্বে শ্রেষ্ঠ বিবাহসঙ্গীতের অন্যতম। কবিবন্ধু ফিলিপ সিডনের মৃত্যুতে কবির শোক লিপিবদ্ধ হোলো "অ্যাষ্ট্রোফেল"-এ।

এমনি করে সাফল্য-নৈরাশ্য, আলো-আঁধারের পরে স্পেন্সার নিযুক্ত হলেন আয়ার্ল্যাণ্ডের কর্ক নামক স্থানের শেরিফ। প্রজাবিদ্রোহ তখন চরমে উঠেছে, বিদ্রোহীরা রাজকর্মচারীদের হত্যা করিতে লাগলো নির্দয়ভাবে, স্পেন্সারের আবাসের উপরও তাদের নজর ছিলো তাই আক্রান্ত হলেন স্পেন্সার, পলায়ন করলেন সপরিবারে, প্রবাদবাক্যের "স জীবতি" অংশটাও সৌভাগ্যক্রমে সত্য হোলো। আবার তিনি আস্তানা গড়লেন লণ্ডনে কিন্তু কবির ভগ্নহৃদয় তখন নৈরাশ্যে নিমজ্জিত, কাব্য-প্রেরণা তখন বিদায় নিয়েছে, দারিদ্র্য এসেছে। মৃত্যু এসে মুক্তি দিলো ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে। স্পেন্সার ছিলেন তুলিহীন চিত্রকর। তাঁর কাব্যে দার্শনিক তথ্যের অভাব আছে কিন্তু সঙ্গীতের নয়। ইংরেজি ভাষায় যে সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার দুর্ভিক্ষ নেই এ-কথা চসারের পরে এমন করে কেউ আর প্রমাণ করেন নি। স্পেন্সারের কাব্যে আমরা অনুভব করি একটা তীক্ষ্ণ সৌন্দর্যবোধ—এ-সৌন্দর্যবোধ পরবর্তীকালে কীটস্‌কে প্রভাবিত করেছিলো প্রভূত পরিমাণে। রূপক-বাহুল্যে কখনো-কখনো তাঁর বক্তব্য হয়তো ব্যাহত হয়েছে কিন্তু ছন্দঃপতন হয়নি কখনোই। ধর্মবোধের সঙ্গে সৌন্দর্য-বোধের এক অপূর্ব মিলন ঘটেছে স্পেন্সারের কাব্যে, তাঁর কাব্যপ্রান্তরে প্রতিভার মহীরুহ নেই একটিও, কিন্তু আছে এক সমোচ্চ, শ্যামল ধান্যশীর্ষের রাশি।

শিক্ষকের বেত্রাঘাত নেই, স্বর্গের যাবার জন্যে ধর্মপথের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ নেই, নাটকীয় রোমহর্ষণ নেই স্পেন্সারের কাব্যে, আছে একটা শান্ত স্নিগ্ধতা যা জীবন-সংগ্রামের ক্ষণজীবী অবসরগুলিকে মধুর করে দেয়।

নাম-বিভ্রাট

সমীর চৌধুরী

হঠাৎ সেদিন দেখতে পেলুম পথের ধারে মোদের খুড়ো,
মুখখানিকে গোমড়া করে বসে আছেন রসিক বুড়ো।
ব্যাপারটা কি? খুড়োমশাই? জানতে চাইলাম কাছে গিয়ে,
"ধ্যাঃ যতসব ভাল্ লাগে না" বলেন মোরে ধ'মকে দিয়ে।
"চুল পেকেছে, দাঁত পড়েছে বন্ধুরা তাও বলছে 'খোকা',
দিদি বলেন "বুদ্ধি নেইক, খোকা তুমি বড্ড বোকা।"
পাড়ার লোকে সবাই বলে "খোকা বাবু খবরটা কি?"
নাতি জানায় "খোকা দাদু, গল্প একটা বলবে নাকি?"
এমন সময় দৌড়ে এল খুড়োর ছেলে নামটা 'বুড়ো',
অমন ভাবে দেখেই তাকে চমকে ওঠেন হঠাৎ খুড়ো।
এসেই 'বুড়ো' ফেললে কেঁদে, বললে বাবা বাঁচাও মোরে,
নামটি আমার "বুড়ো" বলে সবাই বড়ো ঠাট্টা করে।
শুনেই খুড়ো বল্লে "তবে আয় নামটা বদল করি,
"বুড়ো" নিলুম আমি, এবং "খোকা" থাকুক নামটি তোরই।"
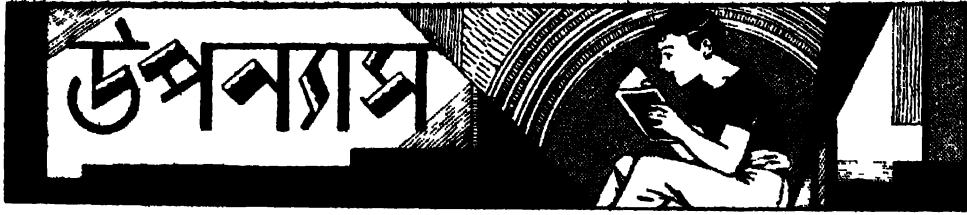
পরাগ ও রেণু

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(মায়ের আশঙ্কা)

পরাগ ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যাবার পর দেওয়ানজী মশাই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। উমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে সস্নেহে বললেন—এস মা এস, বস এখানে। উমা বললে ছোট ছেলেদের হাতে টাকা কড়ি দেওয়াটা যদিও আমি খুব খারাপ বলে মনে করিনি; কিন্তু তার একটা সম্ভব মত সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকা উচিত নয় কি?

দেওয়ানজী মশাই একটু গলাটা ঝেড়ে মাথা চুলকে বললেন:—হ্যাঁ, সেত ঠিকই। কিন্তু, মুস্কিল হয়েছে ওর ঠাকুরদাকে নিয়ে। তিনি চান নাতি যেন লক্ষ্মীপুরে যায় আর্থিক বিষয়ে অকৃপণ প্রকৃতি নিয়ে। আমার উপর ঢালা হুকুম হয়েছে পরাগ যা কিনতে চাইবে কিনে দেবেন, যাকে যা দিতে চাইবে তৎক্ষণাৎ দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। বলবেন তার ঠাকুরদা তাকে যা ইচ্ছা দিতে পারে। সে যেন বোঝে সামান্য লোকের নাতি সে নয়, সাধারণ ঘরের নগণ্য বংশের সন্তান সে নয়, তার দেবার ক্ষমতা আছে, নেবার শক্তি আছে—। সে যেন এটা নিঃসন্দেহ জানতে পারে যে,—ঠাকুরদা থাকতে, তার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবার পথে জীবনে কোনো বাধা নেই।

উমা মাথা নীচু করে একটু ম্লান হাসলে। দেওয়ানজী মশাই জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি হাসলে কেন মা? তোমার কি কথাটা বিশ্বাস হচ্ছে না? এই দেখ পরাগকে নিয়ে যাবার জন্য যদি পঞ্চাশ হাজার টাকাও খরচ করতে হয় আমি যেন তাতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করি এই বলে আজ সকালে বুড়ো আমাকে টেলিগ্রাম করেছে—পকেট থেকে একখানা টেলিগ্রাম বার করে তিনি বাড়িয়ে ধরলেন উমার দিকে।

উমা বললে—থাক, রেখে দিন। আপনাকে আর টেলিগ্রাম দেখাতে হবে না। কথাটা আমি একটুও অবিশ্বাস করিনি। আমি বেশ বুঝতে পারছি তিনি চান তাঁর পৌত্র যেন খুব খুশী হয়ে এবং বিশেষ করে তার ঠাকুরদার প্রতি একটা অতি প্রসন্ন মনোভাব নিয়ে লক্ষ্মীপুরে যায়। এর জন্য তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করতেও কুণ্ঠিত নন। অথচ, নিজের—

বাধা দিয়ে দেওয়ানজী মশাই বললেন—ঠিক ওই কথাই আমিও বলতে যাচ্ছিলুম মা, নিজের সর্বগুণান্বিত জ্যেষ্ঠ পুত্রের বেলায় তাঁর এ মনোভাব কোথায় ছিল?

উমা বললে—উপযুক্ত সন্তানকে হারিয়েই বোধ করি আজ তাঁর মতি গতির এই পরিবর্তন হয়েছে, এটা আমার খোকার সৌভাগ্যের কথা বলতে হবে—

দেওয়ানজী মশাই মাথা নেড়ে বললেন—নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই—

এমন সময় নীচে থেকে পরাগের গলা শোনা গেল প্রাণপণে চেঁচিয়ে সে ডাকছে "সুশীলাদি দাঁড়াও, সুশীলাদি চলে যেয়োনা,—এসো—"

সুশীলা সাড়া দিলে—কি বলছ দাদাবাবু।

—এই নাও তোমার জন্যে টাকা এনেছি। তোমাদের বাড়ীওয়ালাকে ঘরের ভাড়া দিয়ে দাও গে।

—ও মাগো! এযে দশটাকার দুখানা নোট দাদাবাবু। এককুড়ি টাকা যে! এ তুমি কোথায় পেলে?—

—আমার লক্ষ্মীপুরের দাদু আমায় দেওয়ানজী দাদুর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তুমি নিয়ে যাও।

—সে কি কথা গো দাদাবাবু! সুশীলার কণ্ঠস্বরে ভয় ও বিস্ময় ফুটে উঠল। বললে,—এত টাকা তুমি আমায় দিচ্ছ রাঙামা কি জানেন?

উমা উঠে পড়ে বললে—ছেলেমানুষের হাত থেকে অত টাকা নিতে সুশীলা ভয় পাচ্ছে। আমি যাই, তাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে আসি। ও যদি টাকাটা ভয়ে না নেয়, তাহলে খোকনের মনে বড় দুঃখ হবে—

উমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দেওয়ানজী মশাই একা ঘরের মধ্যে বসে এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছিলেন, হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল পরাগের

পিতার একখানি ছোটো ফটোগ্রাফ সুন্দর একটি রূপার ফ্রেমে আঁটা বুকশেলফের মাথার উপর সাজানো রয়েছে।

দেওয়ানজীর মনে পড়তে লাগল পরাগের বাবার ছোটবেলার কথা। যখন পরাগের মতই অমনি সুন্দর সবল সোনার চাঁদ ছেলে ছিল সে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল তাঁর প্রবল পরাক্রান্ত জমিদারের কথা, দুর্দান্ত অত্যাচারী, ভীষণ স্বার্থপর মানুষ। দুনিয়ায় একমাত্র নিজেকে ছাড়া আর কাউকে সে ভালবাসেনি। সারা লক্ষ্মীপুর খুঁজলেও এমন একটি লোকও পাওয়া যাবেনা যে এই বৃদ্ধকে যথার্থ ভালবাসে। ভয় করে বটে সবাই, কিন্তু ভক্তি করে না কেউ।

যৌবনে তিনি ছিলেন বিলাসী, আমোদপ্রিয়, উচ্ছৃঙ্খল ও অহঙ্কারী। 'রাজাবাহাদুর' উপাধি পাবার জন্য লাট বেলাটকে নিমন্ত্রণ করে আনা, সাহেবী ধরণে বাড়ী সাজানো, খানসামা বাবুর্চি রেখে বিলিতি খানা খাওয়ার ব্যবস্থা, সাহেব মেমেদের নিয়ে শিকারে যাওয়া, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট কমিশনারদের ভেট পাঠানো প্রভৃতি ব্যাপারে অজস্র অপব্যয় করতেন। 'রাজাবাহাদুর' হবার পর থেকে আবার এত বেশী খরচ বাড়িয়েছিলেন যে খরচ যোগাবার জন্য প্রজাদের নানাভাবে শোষণ করতে হয়েছিল, ফলে প্রজাদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল ঘোরতর অসন্তোষ। অথচ, এ না করলে বিষয় সম্পত্তি অল্প দিনের মধ্যেই দেনায় জড়িয়ে পড়ত। সৌভাগ্যবলে এই সময় তাঁর বিস্তীর্ণ জমিদারীর মধ্যে উৎকৃষ্ট এক কয়লার খনি আবিষ্কৃত হয়। এই কয়লার খনিই হয়ে ওঠে ক্রমে লক্ষ্মীপুর রাজবাড়ীর সোনার খনি। এই কয়লার খনি থেকে জমিদারীর আয় এত বেড়ে গেল যে দু'হাতে অপব্যয় করা সত্ত্বেও জমিদারীর হিসাবে অগাধ ধন সঞ্চয়ে কিছুমাত্র বাধা হয়নি।

অত্যাচারে, অনিয়মে, বিলাসে, আলস্যে দিন যাপনের ফলে এবং অখাদ্য কুখাদ্য খাওয়ার দোষে রাজাবাহাদুরের শরীর ও স্বাস্থ্য শীঘ্রই ভেঙে পড়ল। তিনি ভীষণ বাত-রোগে আক্রান্ত হলেন, পাকস্থলীর পীড়াও দেখা দিল। কিছু গুরুপাক আহার্য খেলে আর হজম হয় না। রাজা-বাহাদুর হয়ে পড়লেন ডিস্‌পেপটিক, সঙ্গে সঙ্গে মেজাজ হয়ে উঠল বিষম খিটখিটে ও রাগী। বারমাস বাতের যন্ত্রণায় কাতর। বাড়ীর বাইরে বেরুনো দীর্ঘকাল বন্ধ। লাঠি ধরে ভৃত্যের স্কন্ধে ভর দিয়ে অতি কষ্টে তিনি শোবার ঘর থেকে তাঁর সুসজ্জিত বৈঠকখানায় এসে বসেন।

সঙ্গী আর এখন বিশেষ কেউ নেই। টাকা ধার করতে মাঝে মাঝে কলকাতার কোনো কোনো পুরানো বন্ধু অকস্মাৎ উল্কার মত এসে উদয় হতেন বটে, কিন্তু বদমেজাজী রাজাবাহাদুরের কাছে অপমানিত হয়ে শূন্য-হাতেই ফিরে যেতেন। শুধু খবরের কাগজ আর গড়গড়ার নল ছিল তাঁর একমাত্র সম্বল। মাঝে মাঝে নায়েব গোমস্তারা আর দেওয়ানজী মশাই বৈষয়িক কাজে মনিবের সঙ্গে দেখা করতে আসেন আর আসেন নিয়মিত প্রত্যহ দুবেলা বাতের যন্ত্রণা ও পেটের অবস্থার তত্ত্বাবধান করতে ও নূতন নূতন ঔষধ বদলাতে এষ্টেটের ডাক্তার বিজয় গুপ্ত আর কবিরাজ শোকহরণ সেন। বিলাতের বড় বড় সাহেবদের অনুকরণে বাড়ীতে একটা মস্ত লাইব্রেরী তিনি করেছিলেন বটে, কিন্তু তার সদ্ব্যবহার করবার কেউ ছিল না। বড় লোকদের বাড়ীর আসবাব-পত্রের মত তা সাজানই আছে। একজন মাইনে করা লাইব্রেরিয়ান্ আছে বটে, কিন্তু রাজাবাহাদুর মহেন্দ্র-নারায়ণের সামনে আসতে ভয় পায় সে।

পত্নী গেছে, পুত্র গেছে, আত্মীয় বলতে যারা আছে তারা দূরে দূরে থাকে, কাছে ঘেঁষতে কেউ সাহস পায় না। সবার পরিত্যক্ত হয়ে রুগ্ন, জীর্ণ বৃদ্ধ একেবারে নেহাৎই একা সেই বৃহৎ পুরীতে বাস করছে এক অভিশপ্ত আত্মার মত। নিমন্ত্রণ করে পাঠালেও আজকাল আর কেউ আসতে চায় না, কারণ রাজাবাহাদুরের সঙ্গে কথা বলা মানেই অপমানিত হওয়া। অত্যন্ত বিশ্রী ও রুগ্ন মেজাজ এবং তার চেয়েও রুক্ষ হয়ে উঠেছিল তাঁর কথাবার্তা।

বৃদ্ধবয়সে সবকিছু স্নেহ মমতার স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে তাঁর অন্তরে সুখশান্তি ছিল না। রোগের যন্ত্রণায় 'আহা' বলবার কেউ নাই তাঁকে। সেবা করে বেতনভুক চাকরেরা। নার্সরা কেউ এসে দুদিন টিকতে পারে না তাঁর বদমেজাজ ও খিঁচুনির জন্য। অর্থের বিনিময়ে সেবা করলেও তাঁদের যে আত্মসম্মান বোধ আছে রাজাবাহাদুরের সে কথা মনে থাকে না।

দিনরাত সেই প্রকাণ্ড বৈঠকখানা ঘরের এক কোণে মস্ত বড় মোটা গদি মোড়া আরাম কেদারায় দিনের পর দিন একলাটি পড়ে তিনি যে কেবল নিজেই অস্থির ও ক্লান্ত হয়ে উঠেছিলেন তাই নয়, বাড়ীর লোকজন, চাকর-বাকর, জমিদারির কর্ম্মচারিদের পর্যন্ত অস্থির করে তুলেছিলেন। দেওয়ানজী মশাই শঙ্কিত হয়ে উঠছিলেন এই কথা ভেবে যে,—এই পরাগ, এই পুষ্পকলির মত সুকুমার সতেজ শিশুটি কেমন করে তার সমস্ত খেলুড়ে ও সহপাঠীর দল ছেড়ে দিনরাত নিঃসঙ্গ অবস্থায় সেই শূন্য পুরীতে এক কঠোর বৃদ্ধের অসহ্য সাহচর্যে দিন যাপন করবে?

লক্ষ্মীপুর জমিদারীর অগাধ ধনসম্পদের এ যেদিন মালিক হবে সেদিন সবাই নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবে। গরীব খেতে পাবে, দুঃখীর দুঃখ দূর হবে, সর্বহারাদের সকল অভাব ঘুচবে। রামরাজ্যের কথা কানেই শুনেছে লোকে, তখন সেটা তারা প্রত্যক্ষ করবে।

মায়ের হাত ধরে আনন্দে নাচতে নাচতে পরাগ ফিরে এসে বললে—দেওয়ানজী দাদু কি মজা হয়েছিল জানেন? সুশীলা কিছুতেই আমার কাছ থেকে টাকা নিচ্ছিল না। সে মনে ভেবেছিল যে আমি বুঝি কাউকে কিছু না বলেই চুপি চুপি তার হাতে দুখানা নোট এনে দিচ্ছি। ভাগ্যে মা-মণি গিয়ে পড়ে তাকে বুঝিয়ে দিলেন। তবে সে টাকা নিলে। কিন্তু—সুশীলা ভারি বোকা। টাকা পেয়ে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললে। আমি মনে করলুম বোধ হয় ওর মনে খুব কষ্ট হয়েছে, কিন্তু, মা-মণি বললেন না খোকন, সুশীলা তোমার কাছে টাকা পেয়ে আহ্লাদে কাঁদছে। ওই টাকায় সে তার রোগা ছেলেকে ডাক্তার দেখাতে পারবে—ওষুধ খাওয়াতে পারবে,—বাড়ীওয়ালার দেনা শোধ দিতে পারবে।—আচ্ছা তা যেন পারল, কিন্তু, বোকার মত কাঁদল কেন? আমিত জীবনে কখনও কাউকে আহ্লাদে কাঁদতে দেখিনি। আমার ভারি আশ্চর্য লাগল। আচ্ছা দেওয়ানজী দাদু, আপনি কি কাউকে কখনও আহ্লাদে কাঁদতে দেখেছেন?

দেওয়ানজীমশাই বললেন—হ্যাঁ ভাই, দেখেছি। এই আমাদের গ্রামের এক দুখিনী বিধবার একটি মাত্র ছেলে এ পাড়া থেকে ওপাড়ায় খেলা করতে গিছল, কিন্তু আর ঘরে ফেরেনি। তার মা ভাত বেড়ে বসে, ছেলে আর আসে না। রাত হয়ে গেল। তার মায়ের ভয় হল, কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাত, তার ছেলে যদি পথ হারায়। মা তখন সদরে একটি প্রদীপ জ্বেলে বসে রইল। বারে বারে দমকা বাতাসে সে প্রদীপ নিভে যায়, মা জ্বালে আবার বারে বারে। মিশনারীদের গির্জের ঘড়িতে যখন রাত বারোটা বেজে গেল, ছেলে তখনও ফিরল না। মা অস্থির হয়ে খুঁজতে বেরুল লণ্ঠন নিয়ে পাড়ায় পাড়ায়, কোথাও কেউ তার খোঁজ দিতে পারলে না। অনেকে বললে হয়ত নদীর দিকে গিয়ে থাকবে, সাঁতার কাটতে গিয়ে জোয়ারে ভেসে গেছে। পুকুরে ডুবে যাওয়াও কিছু আশ্চর্য্য নয়। রাত বারোটায় লোকের বাড়ী দোর ঠেলে ঘুম ভাঙিয়ে খোঁজা খোঁজি করায় সবাই রেগে উঠে তাকে ধমক দিয়ে বলছিল—'চুলোয় গেছে তোর ছেলে।' মায়ের বুকে বাজের মত বিঁধছিল একথাগুলো। এল সে সাহস করে আমার বাড়ী। সব শুনে তাকে বসিয়ে রেখে লোক-জন ডেকে আলো দিয়ে পাঠিয়ে দিলুম পাশের গাঁয়ে। সেখানে বারোয়ারী তলায় রক্ষেকালী পুজো উপলক্ষে মতিরায়ের যাত্রা হচ্ছিল। আমার কেমন মনে হল হয়ত ফটিক সেখানে গিয়ে যাত্রার আসরে জমে গেছে। যা ভেবেছিলুম ঠিক তাই। আমার লোকজন গিয়ে রাত দুটোর সময় ফটিককে ধরে এনে হাজির করে দিলে তার মায়ের কাছে। সেদিন দেখেছিলুম হারামণি ফিরে পেয়ে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে ফটিকের মা আনন্দে ঝরঝর করে কাঁদছে। (ক্রমশ)
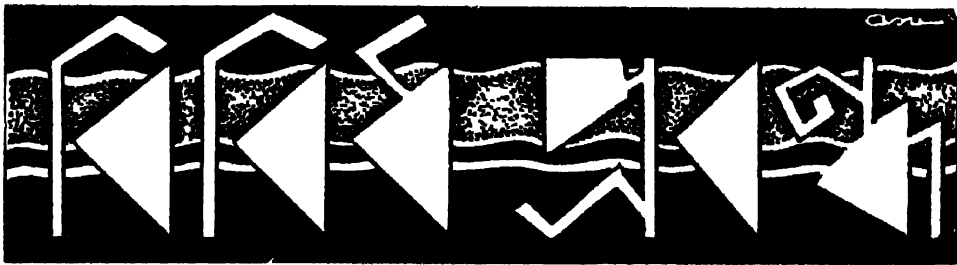
টাকার রহস্য

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ

এই ভয়াবহ বাগযুদ্ধের কারণটা কি এবার বলি। বাড়ী থেকে প্রায় ৮।১০ মাইল দূরে প্রতি বৎসর বড় রকমের একটা মেলা বসে। মেলা উপলক্ষে আশেপাশের গ্রাম থেকে বহু লোকের আগমন হয়। নানারূপ জিনিষ পত্র কেনাবেচা হয়ে থাকে। আমাদের পাঁড়েজী ও পাচক যুক্তি আঁটলে 'রথ দেখা ও কলা বেচা' দু'কাজই একসঙ্গে সারবে। দারোয়ানী করবার পূর্বে, পাঁড়েজী এক হালুয়ারী দোকানে কিছুদিন শিক্ষানবিসী করে 'মুগকা লাড্ডু' তৈরী করতে শেখে। কলকাতা শহরে কাজ করবার সময় লম্বোদর ঠাকুর কয়েকটি নূতন রকমের সন্দেশ তৈরী করতে শিখেছিল। তারা দেখলে 'মুগের লাড্ডু' আর 'ডিম সন্দেশ' দুটোই এ অঞ্চলে একেবারে নূতন। এই মিষ্টান্ন দুটি তৈরী করে মেলাতে নিয়ে যেতে পারলে বেশ দু'পয়সা লাভে সব বিক্রী হয়ে যাবে। এই লাভের পয়সা থেকে নিজেদের জন্য তারা অনেক কিছু কিনবে কিন্তু এই চমৎকার পরিকল্পনার

প্রথম ও প্রধান অন্তরায় হল টাকা। মাসের প্রায় শেষ —হাতে পয়সা নেই, এ সময়ে অপরের কাছ থেকে পাওয়াও শক্ত। সরকার মশাই নিজের গাঁট থেকে একটি রজত মুদ্রা দিতে পারেন, তবে তার শর্ত এই মেলা থেকে ফিরেই ঐ মুদ্রাটি চার আনা সুদ সমেত তাঁকে ফেরৎ দিতে হবে। এই মুদ্রা দিয়ে দুধ, ঘি, চিনি প্রভৃতি উপকরণগুলি খরিদ করে তারা ষোলটি লাড্ডু ও ষোলটি সন্দেশ তৈরী করে ফেললে। ঠিক হল, প্রত্যেকটি এক আনা করে বিক্রয় করা হবে, তাতে এক 'টাকায়' হবে 'এক টাকা' লাভ। কোন পথ দিয়ে গন্তব্য স্থানে যাওয়া হবে, তা নিয়ে দুজনের মতভেদ দেখা গেল। রাস্তা দিয়ে গেলে দূরত্ব প্রায় ১০ মাইল, বাগান ও মাঠ ভেঙে গেলে মাইল চারেক কম হয়। শেষটা বাগান দিয়েই যাওয়া স্থির হল। খুব ভোরে উঠে দুজনে দুটো হাঁড়ি মাথায় নিয়ে সহাস্যবদনে মেলার পথে অগ্রসর হল। ক্রমে সূর্য্য তাদের মাথার ওপর উঠলো, রৌদ্রতাপে ব্যবসায়ীবীরবা ক্লান্ত হয়ে পড়লো, গা দিয়ে ঘাম ঝোরতে লাগলো, তৃষ্ণায় গলা কাঠ হয়ে এলো। পথে মাঝে মাঝে দুএকটা পুকুর পড়ছে, বিনা পয়সায় অবশ্য জল পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু খালি পেটে জল খাওয়া কি উচিত? 'মুগগা লাড্ডু' তৈরী হবার সময় তার সুগন্ধ পাচকঠাকুরের মনের মধ্যে একটু বেশী রকম চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল, লজ্জায় সেটা তখন প্রকাশ করতে পারে নি। হাঁটতে হাঁটতে তৃষ্ণার সঙ্গে বেশ ক্ষুধার উদ্রেক হল। তার থলিয়াতে মাত্র একটি আনি ছিল, আনিটি বার করে সে পাঁড়ের হাতে দিয়ে গম্ভীর ভাবে বল্লে, "একঠো লাড্ডু দেও।" কথাটা শুনে পাঁড়ে জী ত একেবার 'হাঁ', কিন্তু যখন পয়সা পাচ্ছে তখন আর কোন কথা না বলে একটা লাড্ডু তাকে দিল, না দেবার কোন কারণ সে পেল না। এতে তার এক বিষয়ে বেশ সুবিধা হল, তারও পেটে অগ্নিদেবের উপদ্রব রীতিমত সুরু হয়ে গিয়েছিল, উড়িষ্যাবাসীর কাছে এ দুর্বলতাটুকু প্রকাশ করতে তার লজ্জা বোধ হওয়াতে এতক্ষণ সে নীরব ছিল। তা ছাড়া সঙ্গে সে পয়সা কড়ি কিছু আনেনি। পাচকঠাকুর প্রথম পথ দেখালে, হাতে এক আনা পয়সাও এসেছে, আর তার বাধা কিসের। সে পাচকঠাকুরের কাছ থেকে পাওয়া আনিটা তারই দিকে বাড়িয়ে বল্লে, "একঠো সন্দেশ দেও।" ঠাকুর বেশ প্রফুল্লচিত্তে আনিটি আবার তার থলিয়ার মধ্যে রেখে, পাঁড়েকে একটা সন্দেশ দিলে। পাঁড়ে সন্দেশে একটা কামড় দিয়ে, চোখ দুটি বুজে চিবাতে চিবাতে বল্লে "বহুৎ বঢ়িয়া।" পেটের মধ্যে যখন আগুন জ্বলে, সে সময় একটা ছোট্ট লাড্ডু ক্ষুধা আরো বৃদ্ধি করে অন্ততঃ আর একটা না হলে—পাচকঠাকুর তার থলিয়া থেকে আবার সেই আনিটি বার করে দারোয়ানের হাতে দিয়ে অম্লানবদনে বল্লে "আউর একঠো লাড্ডু দেও।" নগদ পয়সা পাচ্ছে. তখন আর দিতে আপত্তি কি? পাঁড়েরও সন্দেশের লোভ বেড়ে উঠেছে সেও ঐ আনিটা আবার পাচকের হাতে দিয়ে বললে "আচ্ছা সন্দেশ ভি একঠো দেনা।" একটু করে পথ চলে আর পাচকঠাকুর লাড্ডু ও দারোয়ানজী সন্দেশ খরিদ করে উদর পূর্ত্তি করে সেই একানির সাহায্যে। মেলা যখন প্রায় মাইল খানেক বাকী, তখন তারা হঠাৎ সবিস্ময়ে ও সশঙ্ক আবিষ্কার করলে—তাদের হাঁড়ি শূন্য। হাঁড়ীর শাল পাতাগুলি তারা পাগলের মত বার করে ফেললে—কিন্তু একটিও লাড্ডু বা সন্দেশের সন্ধান পাওয়া গেল না। দারোয়ানজী হতাশ হয়ে বললে— "সব খালাস্।" সন্দেশ ও লাড্ডু যে কোথায় অদৃশ্য হয়েছে, সেটা বুঝতে তাদের বেশী দেরী হল না। কিন্তু তারা ত নগদ বেচা-কেনা করেছে। হিসাব মত ষোল আনা পয়সা তাদের এক একজনের হাতে থাকা উচিত, কিন্তু আসলে দেখা যাচ্ছে, পাচকঠাকুর যে আনিটা সঙ্গে এনেছিল, সেইটেই পাঁড়েজীর কাছে রয়েছে। ঐ আনিটি ছাড়া তাদের কারো কাছে এক পয়সাও নেই। এই অদ্ভুত ও অসম্ভব ব্যাপারটি কেমন করে ঘটলো? এর জন্য ঠাকুর ও দারোয়ান পরস্পরকে দায়ী করলে, কারুর মুখ দিয়ে কোন কথা বার হল না। যা হবার হয়েছে, এখন মেলা থেকে জিনিস পত্র কিনবে কি দিয়ে আর সরকার মশায়ের সুদ দূরের কথা, আসলই বা দেবে কোথা থেকে? সত্য কথা বলেও নিস্তার পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না, এই অসম্ভব কাহিনী কেউ বিশ্বাস করবে না। মহা সমস্যায় পড়ে গেল তারা। (ক্রমশ)

একজন বিশিষ্ট কংগ্রেসনেতা এবং বোম্বাইয়ের ভূতপূর্ব কংগ্রেসী মন্ত্রী শ্রীযুক্ত কে, এম, মুন্সী কংগ্রেসের সভ্যপদ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। অহিংসনীতি নিয়ে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর মতভেদ উপস্থিত হল। মতভেদ সকলেরই কিছু না কিছু আছে, মুন্সিজী সাহস করে সেটা প্রকাশ করেছেন। অন্যেরা এখনও পারেন নি। যদি পারতেন তাহলে হয়ত এতদিন দেখা যেত কংগ্রেস-পতাকা কাঁধে নিয়ে মহাত্মা গান্ধীই একা বসে ওয়ার্ধায় অহিংস চরকা ঘোরাচ্ছেন। আর আচার্য্য কৃপলানি চঞ্চলভাবে অস্থির পাদচারণা করছেন। আসে-পাশে কংগ্রেস বলতে আর কেউ নেই। কারণ, যে সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সর্বাধ্যক্ষ বা প্রধান অধিনায়ক এমন একটা অপ্রাকৃত ও অস্বাভাবিক নিয়ম তার লক্ষ লক্ষ সভ্যদের জন্য বিধিবদ্ধ করেন যে,—

"হিংসভাবে বাধা প্রদানের কৌশল শিক্ষা দেওয়া হয় এরূপ কোন ব্যায়ামাগারের সহিতও কংগ্রেস কর্মীরা সংশ্লিষ্ট থাকিতে পারিবে না।"—

সে প্রতিষ্ঠানের ক্রমশঃ সঙ্কোচ ও অধঃপতন যেমন অবশ্যম্ভাবী, তেমনি যে দেশের ও যে জাতির নায়কের মনোবৃত্তি এরূপ শোচনীয় এক অযৌক্তিক আধ্যাত্মিকতার অধীন, সে দেশের ও সে জাতির ভবিষ্যৎও অন্ধকারময়। এ বিধানে জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে যায়, তার সাহস ও শক্তি লোপ পায়—তার অন্তরে কাপুরুষতা প্রশ্রয় পায়। তারা সাত্বিক গুণের অধিকারী হয়েছে মনে করে—ধীরে ধীরে তামসিক জড়তাকে আশ্রয় করে মৃতবৎ হয়ে পড়ে।

* *

বাংলা দেশের বিগত স্বদেশী আন্দোলনের যুগে শহরে ও মফঃস্বলে যুযুৎসু, লাঠিখেলা ছোরাখেলা প্রভৃতি আত্ম-রক্ষার কৌশল শিক্ষা ও শারীরিক বলাধানের জন্য ব্যায়াম শিক্ষা কল্পে 'অনুশীলন সমিতি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল। বাঙালী যুবক ও তরুণদের মধ্যে একটা নবীন উৎসাহ দেখা দিয়েছিল। কিন্তু, কিছুদিন পরে বোমার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই গভর্নমেন্ট এই প্রতিষ্ঠানটিকে এবং এর সমস্ত শাখা-প্রশাখাগুলিও সন্দেহ-বশে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। সে দিন অনেকেই গভর্নমেন্টের নিন্দা করেছিল—দেশের ছেলেদের দৈহিকশক্তি, সাহস এবং স্বাস্থ্য-লাভ ও আত্মরক্ষার কৌশল শিক্ষা থেকে এই ভাবে বঞ্চিত করার জন্য। মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের সভ্যদের জন্য যে নিয়ম বিধিবদ্ধ করেছেন তারও পরিণাম হবে দৈহিক শক্তি, সাহস ও স্বাস্থ্য অর্জন এবং আত্মরক্ষার কৌশল শিক্ষা থেকে ভারতবাসীদের বঞ্চিত হয়ে থাকা। ব্রিটিশ শাসনাধীনে আমাদের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের অধিকার নেই। অথচ দেশের চোর, ডাকাত, গুণ্ডা, বদমায়েসরা ত আর মহাত্মাজীর চেলা নয়, কাজেই, তারা নিরীহ, নিরস্ত্র লোকের উপর আক্রমণ চালানটা বেশ নিরাপদ জেনে এটা আরও জোর চালাবে। দেশের চিন্তাশীল মনীষী যাঁরা, যাঁদের দূরদৃষ্টি আছে, জাতির ভবিষ্যৎ কল্যাণ ও অকল্যাণ সম্বন্ধে যাঁরা সজাগ, দ্বিতীয় বুদ্ধ বা যীশু হবার দুরাকাঙ্ক্ষাজনিত কোনোরূপ ধর্মান্ধতা ও অধ্যাত্মিক গোঁড়ামীর নির্বুদ্ধিতা যাঁদের মধ্যে নেই, যাঁরা ভারতের অতীত ইতিহাস, আদর্শ ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এবং মানব প্রকৃতি ও মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশ্লেষণমূলক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে বিশেষজ্ঞ, মহাত্মার মতের সঙ্গে তাঁদের মতভেদ হতেই হবে। কারণ, শ্রীবুদ্ধ চৈতন্যের অনুসরণে যে পথে চলতে গিয়ে একদা ভারতের সমূহ সর্বনাশ হয়েছে সেই ভুল পথে আবার এদেশকে নিয়ে যাবার অমার্জনীয় অপরাধ তাঁরা কখনই করবেন না।

* * *

মহাত্মার মহান্ নির্দেশ কোনো ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত, সন্ন্যাসমার্গে দীক্ষিত, মোক্ষকামী, উচ্চ সাধক গোষ্ঠীর পক্ষে আদর্শ পন্থা বলা যেতে পারে। কিন্তু, স্বাধীনতাকামী কোটী কোটী ভারতবাসীর বা রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে সঙ্ঘবদ্ধ দেশভক্ত এক সম্প্রদায়ের পক্ষে যে এটা যোগ্য পন্থা একথা কোনও যুক্তির দ্বারাই সমর্থন করা চলে না। সুতরাং, মহাত্মার মতো কেবলমাত্র অন্ধ-বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে ধন-প্রাণ বিনাশের সঙ্কটজনক অবস্থায়, জননী জায়া কন্যা ভগিনীর সম্ভ্রমহানির সম্ভাবনায়, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধে যারা আস্থা স্থাপনে অক্ষম, কংগ্রেস ছেড়ে তফাৎ হয়ে আসা ভিন্ন তাদের আর কোনও পথ নেই। অবশ্য, একথাও বলা যেতে পারে, যে, সংখ্যায় তাঁরা যদি বেশী হন, তাহলে মহাত্মাকেই কংগ্রেস থেকে অবসর নিতে বলে, তাঁরা এই শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রনীতিগত একটা স্বাভাবিক ও সঙ্গত পথে পরিচালিত করতে পারেন।...পারেন বটে, কিন্তু সেটা বলা যত সহজ, কাজে করা তত সহজসাধ্য নয়। ভারত ধর্ম-প্রাণ দেশ, ভারতবাসী হিন্দুরা অধ্যাত্ম শক্তিকে

ভয় করে, ভক্তি করে। বিশেষত, তারা আবার গুরুবাদী ও অবতার-অনুরাগী মানুষ। হাজার হাজার বছরের এই সুদৃঢ় সংস্কারের মোহ কাটিয়ে আপন পৌরুষের উপর নির্ভর করে সাহসের সঙ্গে সোজা হয়ে দাঁড়ান তার পক্ষে অসম্ভব। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত' এ বীর বাণী এযুগে আর তার মুখে শোনা যায় না। কোনো বিষয়ে কূল-কিনারা দেখতে না পেলে তারা ছোটে কোনো মহাপুরুষের অভয় পদাশ্রয়ে সমস্যার সমাধানের আশায়। ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ আজ এমনই একটা জটিল অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যার সমাধান করতে দেশের তথাকথিত নেতারা অক্ষম। তাই নিরুপায় হয়েই মহাত্মা গান্ধীর ধর্মগতনীতির উপর কংগ্রেসের সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়ে তাঁরা স্বাধীনতা লাভের জন্য অধ্যাত্ম শক্তির মুখাপেক্ষী হয়েছেন। কিন্তু একটা কথা তাঁরা ভুলে গেছেন—'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য।'

*

ঢাকায় আবার দাঙ্গা বেধেছে। বাংলা গভর্নমেণ্টের বিশেষ সতর্কতা ও চেষ্টা সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা সেখানে পুনরুজ্জীবিত হওয়াটা বিশেষ দুঃখের ও ক্ষোভের ব্যাপার একথা বলাই বাহুল্য। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে প্রীতি ও সদ্ভাবের সম্বন্ধ এতকাল বিদ্যমান ছিল, যার ফলে দাঙ্গা করার কল্পনাও ছিল সুদূরপরাহত। তারা আজ পরস্পরের টুঁটি কামড়ে ধরছে, ঘরে আগুন দিচ্ছে, লুঠ করছে, ছুরি চালাচ্ছে, এমন কি মেয়েদেরও বেইজ্জৎ করছে,—এর কারণ কি? উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের মিলিত হয়ে একথাটা আজ ভেবে দেখবার সময় হয়েছে। রাজদণ্ডের কঠোর পরিচালনায় সাময়িক ভাবে বিরোধ বন্ধ হতে পারে বটে, স্থায়ী সদ্ভাব ও শান্তি তাতে ফিরে আসেনা। যে কোনো সুযোগে আবার সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হতে পারে। যে পর্যন্ত না উভয় সম্প্রদায়ের মন থেকে পরস্পরের প্রতি বিরাগ, বিদ্বেষ ও বিরুদ্ধতা সম্পূর্ণ দূর হচ্ছে সে পর্যন্ত অবস্থা আয়ত্তের মধ্যে এলেও নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া চলে না। সুতরাং বাংলা দেশ থেকে এ কলঙ্ক দূর করতে হলে সরকার-নিরপেক্ষ দলের এ বিষয়ে উদ্যোগী হতে হবে। সন্ধান করতে হবে এ বিষের মূল কোথায় এবং প্রতিকারের সমস্ত চেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে সেই মূল উৎপাটনের কাজে। সাম্প্রদায়িক বিরোধ প্রশ্রয় পেতে পারে এমন কোনো ব্যাপারকেই আমল দেওয়া চলবে না, না সরকার পক্ষে—না জনসাধারণের পক্ষে।

বিশ্বের বিস্ময়কর বার্তা হচ্ছে এবার জার্মান কর্তৃক সোভিয়েট রাশ্যা আক্রমণ। অবশ্য কিছুদিন থেকে একটা ভাসা ভাসা গুজব সংবাদপত্রে পাওয়া যাচ্ছিল যে উভয় পক্ষই সীমান্তপ্রদেশে বিরাট রণসজ্জায় ব্যস্ত। জার্মানির সঙ্গে রুষের সংঘর্ষ আসন্ন। কিন্তু সেকথা সত্য বলে কেউ বিশ্বাস করতে পারেনি, গুজব বলেই সেটা উড়িয়ে দিয়েছিল। কারণ, ব্রিটেনের মত শক্তিশালী শত্রুর সঙ্গে পশ্চিম রণাঙ্গনে যারা জীবন-মরণ যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে তাদের পক্ষে রাশিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে পূর্ব রণাঙ্গণেও সমরানল প্রজ্বালিত করা মানে আত্মহত্যা করা। এরূপ চরম নির্বুদ্ধিতা প্রদর্শন জার্মানির পক্ষে কখনই সম্ভবপর নয়। হিটলার বর্তমান যুদ্ধের প্রারম্ভে একাধিকবার বলেছে—১৯১৪ সালের ভুল আর আমরা করছি না। একসঙ্গে পূর্ব-পশ্চিম উভয় সীমান্তে জার্মানি এবার যুদ্ধ করবেনা। ১৯৩৯ সালে আগষ্ট মাসে রাশিয়ার সঙ্গে জার্মানির যখন এক অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে গেল, তখনও য়ুরোপ অবাক হয়ে গিয়েছিল। কারণ হিটলার তাঁর আত্ম-জীবনীতে নাজীদের বলশেভিক বিদ্বেষ স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করছিলেন এবং একথাও জানিয়েছিলেন যে য়ুক্রেনের শস্যক্ষেত্র জার্মানিকে নিতেই হবে। অথচ সেই নাজীরদল যখন বলশেভিক রাশ্যার সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হল তখন পৃথিবীর বিস্ময়ের আর অবধি রইল না।

* *

সবাই ভেবেচিন্তে সেদিন এই অঘটনের একটা কারণ এই সাব্যস্ত করলেন যে জার্মানির পুঁজিপাটা অল্প, কাঁচা মালেরও বিশেষ অভাব। যুদ্ধ সরঞ্জাম এবং খাদ্য অভাবেই তাকে হয়ত এ যুদ্ধে হারতে হবে। অথচ পাশেই রয়েছে

বিস্তীর্ণ রাশিয়া তার অগাধ রণসম্পদ ও প্রচুর খাদ্য নিয়ে। রাশিয়ার সঙ্গে সদ্ভাব রাখলে প্রয়োজনের সময় সে প্রতিবেশীকে সাহায্য করবেই নিশ্চয়। পরস্পর পরস্পরের সহযোগিতা করবার শর্তে তাই চুক্তিবদ্ধ হল ওরা। সোভিয়েট রুশের উপর ব্রিটেন কোনো দিনই প্রসন্ন ছিল না। আমেরিকাও কমিউনিষ্ট রাশিয়ার উচ্ছেদ চায়। ফ্রান্সও বলশেভিজমের বিরোধী। অতএব, এস্থলে বলশেভিজম্-বিরোধী জার্মানি যখন উপযাচক হয়ে সন্ধি স্থাপন করতে চাইলে, বুদ্ধিমান স্ট্যালিন তা প্রত্যাখান করলেন না। রুশকে অনাক্রমণ চুক্তির বন্ধনে আবদ্ধ করে জার্মানিও তার পূর্বসীমান্ত সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে পশ্চিম রণাঙ্গনে সকল শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বার সুযোগ পেল। ইতিপূর্বে পোল্যাণ্ড ভাগাভাগি হয়ে গেল তাদের মধ্যে। ফ্রান্সের ঘটল পতন, ব্রিটেনের হল ডানকার্ক থেকে অপসরণ, নরওয়ে, ডেনমার্ক, বেলজিয়ম, হল্যাণ্ড এসে গেল জার্মানির অধীনে। তখন ধূর্ত প্রতিবেশীকে ক্রমশ বিপুল শক্তিশালী হয়ে উঠতে দেখে রুশের আতঙ্ক উপস্থিত হল। সে তার ঘরের চারপাশের বেড়া শক্ত করে বাঁধতে লেগে গেল।

* * *

ফিনল্যাণ্ডের ভিতর দিয়ে শত্রু এসে সহজেই লেনিনগ্রাড অধিকার করতে পারে। রাশিয়া গেল ফিনল্যাণ্ডের খানিকটা অংশ দখল করে লেনিনগ্রাডের নিরাপত্তার জন্য ওদিকের রুষ সীমান্ত বাড়িয়ে নিতে। বাধল রুষ-ফিনল্যাণ্ডের যুদ্ধ। ক্ষুদ্র ফিনল্যাণ্ড বৃহৎ রুষের সঙ্গে সংঘর্ষে পরাস্ত হয়ে স্থান ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। তখন রাশিয়া রসনা বিস্তার করলে বাল্টিক তীরবর্তী প্রদেশগুলিকে গ্রাস করতে। 'এস্থোনিয়া', 'লিথুয়ানিয়া' প্রভৃতি গেল একে একে রুশের খর্পরে। এইবার রুশ ভল্লুক তার কাস্তে ও হাতুড়ি নিয়ে চললো কৃষ্ণসাগর তীরে শক্ত করে আল বাঁধতে। রুমানিয়া ও হাঙ্গেরীর সঙ্গে হাঙ্গামা করে সে 'ল্যাটভিয়া' ও 'বেসারাবিয়া' দখল করে তার সমীস্ত রক্ষা সম্বন্ধে নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হল। তারপর শুরু করলে মিলিটারী ম্যান্যুভিয়ার্স বা সামরিক কুচকাওয়াজ। প্রতিবেশীর রকম-সকম দেখে নাজীর 'গেস্টোপোর' দল ব্যস্ত হয়ে উঠল। রুষ-পোল সীমান্তে জার্মানির ৬০ ডিভিসন সৈন্য মোতায়েন হয়ে রইল। তারপর শুরু হল বল্কান-বিভ্রাট। চেকোশ্লোভকিয়াকে আগেই জার্মানির মুঠোর মধ্যে তুলে দিয়ে গিয়েছিল চেম্বারলেন সাহেব। এখন একে একে তার দলে এল হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, কেবল গোলমাল বাধালে গ্রীস আর যুগোশ্লোভিয়া। ফলে জার্মান যুদ্ধের হোমানলে শীঘ্রই তারা হল আহুতি।

* *

এ অবস্থায় রাশিয়ার পক্ষে আর স্থির ভাবে নিশ্চিত হয়ে বসে থাকা সম্ভবপর হল না। একটা কিছু করা দরকার বলে সে হয়ত মনে করেছিল এবং সেই খবরটা যথাকালে 'গেস্টাপো' মারফৎ পৌচেছিল নাজী হাইকমাণ্ডের দরবারে। ক্রীটের শোচনীয় ব্যাপারের পর—তুর্কী রেগতিক দেখে জার্মানির সঙ্গেও অনাক্রমণ চুক্তি ও বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন করে ফেললে। ফলে সে একসঙ্গেই ইংরাজের বন্ধু ও জার্মানির বন্ধুরূপে নিরপেক্ষ হয়ে রইল। কিন্তু, 'গেস্টাপোর' রিপোর্ট এবং রুশের হালচাল দেখে জার্মানি আর অপেক্ষা করতে পারলেনা। ক্রীট নিয়ে ক্রমে সে সুয়েজ ও মিশরের দিকে অগ্রসর হবে এই কথাই সবাই ভেবেছিল। আমেরিকা বৃটেনকে সকলরকমে সাহায্য দিচ্ছে দেখে লোকে ভেবেছিল জার্মানিও নিশ্চয় তার নূতন সোভিয়েট বন্ধুর কাছে সবরকমে সাহায্য পাবে। কিন্তু, অকস্মাৎ সমস্ত জল্পনা, কল্পনা, অনুমান ও ধারণাকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে বাল্টিক থেকে ব্ল্যাকসি পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ দেড়হাজার মাইল জুড়ে বিরাট জার্মান বাহিনী রুষ সীমান্ত আক্রমণ করেছে। এমন কি, ফিনল্যাণ্ডের সাহায্যে উত্তরে এবং উত্তরমেরু প্রদেশের দিকেও জার্মান আক্রমণ বিস্তৃত হয়েছে। দক্ষিণে—হাঙ্গেরী ও রুমানিয়ার সাহায্যে জার্মান আক্রমণে কৃষ্ণসাগর তীর রুধিরাক্ত হয়ে উঠল। হোয়াইট রাশিয়া লাল হয়ে উঠেছে, য়ুক্রেন অঞ্চলে তুমুল যুদ্ধ চলেছে। বিপুল শক্তি নিয়ে সমগ্র রাশিয়া শত্রুকে বাধা দিচ্ছে। উভয় পক্ষে এক সঙ্গে দশ বিশ লক্ষ সৈন্য যুদ্ধে নেমেছে। হতাহতের সংখ্যা ও ক্ষতির পরিমাণ উভয় পক্ষেরই সংখ্যাতীত। এতবড় যুদ্ধ না কি পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনও হয়নি। সবাই উদগ্রীব হয়ে এর ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছে। এ পর্যন্ত যতটুকু সংবাদ এসেছে, তাতে জার্মান বাহিনী ধীরে ধীরে রাশিয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছে বলে বোঝা যায়।
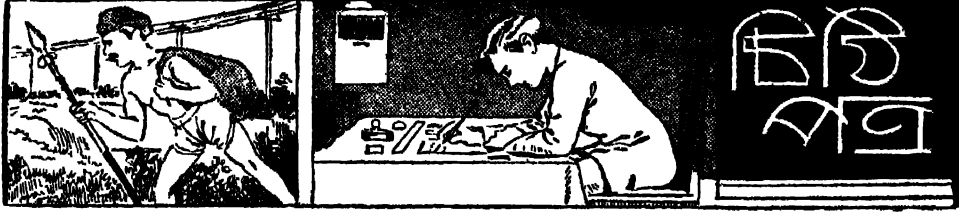
গৌরাঙ্গ রুদ্র, চট্টগ্রাম।

তোমার প্রশ্নের উত্তরে তোমাকে আমি একটি প্রশ্ন করছি—বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ গায়ক বলে যিনি দাবী করতে পারেন তাঁর কি কি গুণ থাকা চাই? সেই সেই গুণের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে কিনা? এই প্রশ্নের যদি সঠিক উত্তর তুমি দিতে পার তাহলে বুঝব এরূপ প্রশ্ন করা তোমার পক্ষে সঙ্গত হয়েছে এবং তখন তোমার প্রশ্নটি প্রশ্নোত্তর বিভাগে প্রকাশ করব। তোমাদের সকলেরই উচিত নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় যতটা তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে প্রশ্ন করা। আইনস্টাইনের Theory of Relativity বলতে কি বোঝায়? এ প্রশ্ন যদি তোমরা কেউ করো তাহলে 'ভূ-গো' নিশ্চয়ই তার উত্তর দেবার চেষ্টায় পণ্ডশ্রম করবেন না, কারণ ওর মধ্যে প্রবেশ করবার মতো উন্নত গণিত শিক্ষার জন্য তোমাদের এখনও কিছুকাল অপেক্ষা করতে হবে। তোমার প্রেরিত রচনাগুলির মধ্যে একটি এমাসের পাঠশালায় প্রকাশিত হল। অন্যগুলি ক্রমশঃ বেরুবে।

নীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার, বালিগঞ্জ।

'কন্যামহল' সম্বন্ধে তুমি যা লিখেছ তার সঙ্গে আমিও একমত। তবে দেখতে হবে যে 'কন্যামহল' মাত্র দু'মাসের শিশু, এখনও তার পরিণতির আশা রাখি। হয়ত ভবিষ্যতে বাংলার মেয়েদের নিজস্ব সমস্যা, তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আদর্শ ও উন্নতির বিবিধ দিক নিয়ে গভীর আলোচনায় কন্যামহল মুখর হয়ে উঠবে। পাঠশালাকে ছেলেমেয়েদের নিজস্ব পত্রিকা করা হবে মানে এ নয় যে, বিশেষজ্ঞদের রচনা এতে আর প্রকাশিত হবে না। প্রতিমাসে অন্ততঃ দু'চারজন শ্রেষ্ঠ লেখক লেখিকাদের লেখা থাকবেই। বাকিটুকুর ভার নেবেন 'কন্যামহল', 'কিশোরসভা', সম্পাদক নিজে, ভূত গোয়েন্দা মহাশয়, এবং 'শ-র', ধাঁধা সম্পাদক, বিনিময় সঙ্ঘ পরিচালক ও ও গ্রন্থাগারিক।

হরিসভা, পঞ্চসার।

'প্রশ্নোত্তর' ছাপা হবার সময় হঠাৎ চোখে পড়ে ১৪ নং প্রশ্নটি পাঠশালায় যাবার উপযুক্ত নয়, এবং শেষ মুহূর্তে এটি প্রশ্নোত্তর বিভাগ থেকে বাদ দেওয়া হয় বলে পরবর্তী সংখ্যাগুলি সংশোধন আর সম্ভবপর হয় নি।

অমিতাভ চৌধুরী, বালিগঞ্জ।

"প্রশ্নোত্তর" বিভাগটিকে তোমার মতো আরও অনেকেই রাখবার স্বপক্ষে যুক্তিপূর্ণ মতামত প্রকাশ করায় এবং ভোটেও তাঁদের সংখ্যা বেশী হওয়ায় 'প্রশ্নোত্তর' বিভাগ পাঠশালায় রয়ে গেল। 'কিশোর সভার' চাহিদা এত বেশী যে আগামী মাস থেকেই তার প্রবর্তন করা হবে। পাঠশালাকে ছাত্রছাত্রীদের নিজস্ব পত্রিকায় পরিণত করার বিরুদ্ধে তুমি যে যুক্তি দেখিয়েছ তা আরও অনেকে সমর্থন করেছে। তুমি ঠিকই বলেছো যে 'স্কুল ম্যাগাজিনে' এবং পল্লী প্রতিষ্ঠানের 'হাতে লেখা' পত্রিকায় তোমরা অনায়াসে হাত পাকাতে পারো, সেজন্য 'পাঠশালা'কে নোংরা করবার প্রয়োজন নেই। তোমাদের উপযুক্ত রচনা ত পাঠশালায় প্রকাশ হয়ই। 'শব্দ-সন্ধান' সম্বন্ধে তোমার অনুরোধ 'শ-র' কে জানান হয়েছে।

দেবব্রত সিংহ, কলিকাতা।

'প্রশ্নোত্তর' সম্বন্ধে তুমি যা লিখেছ সে কথা অস্বীকার করা চলে না। এটা অত্যন্ত লজ্জার কথা যে আজ বাঙালী ছেলেমেয়েরা বুদ্ধিমানের মতো একটা প্রশ্নও করতে পারে না। কোনো বিষয়ে জানবার ইচ্ছাটাও যদি অপর কাগজে প্রকাশিত প্রশ্নের নকল ছাড়া এরা করতে না পারে তাহ'লে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিতান্তই অন্ধকার বুঝতে হবে। কিন্তু প্রশ্নোত্তর রাখার স্বপক্ষে ভোট বেশি হওয়ায় প্রশ্নোত্তর বিভাগ রাখাই স্থির হয়েছে। এতে যে ছেলে মেয়েদের সাধরিণ জ্ঞান বাড়ে ও নানা বিষয়ে শিক্ষার প্রসার হয় এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। জীবনী, ভ্রমণকাহিনী ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রবন্ধত পাঠশালায় নিয়মিত প্রকাশিত হয়ই। পাড়ার মেয়েদের সঙ্গীত চর্চার জন্য তোমার পড়া-শুনার ব্যাঘাত উৎপাদন হচ্ছে' বলে যদি মনে করো তাহলে ওপাড়া ছেড়ে অন্য কোথাও উঠে যাওয়া ছাড়া আর উপায় নেই। তোমার প্রেরিত ধাঁধাঁটির উত্তর লিখে পাঠিও।

সন্ধ্যাগুহ, জামসেদপুর।

তোমার প্রেরিত 'বন্ধু' গল্পটি সম্পাদকের বিবেচনাধীন আছে।

কামদারঞ্জন ভট্টাচার্য, নরপুর।

জ্যৈষ্ঠের প্রশ্নোত্তরে ৪ ও ৪৯ নং প্রশ্নের উত্তর তুমি

নির্ভুল দিয়েছিলে লিখেছ, কিন্তু তোমার সঠিক উত্তরের সংখ্যায় এ দুটি ওঠেনি কেন জানতে চেয়েছ। তোমার উত্তর নির্ভুল ছিল এ সম্বন্ধে যদি তোমার দৃঢ় নিশ্চয়তা থাকে তাহলে স্বীকার করতেই হবে আমাদের পক্ষের ভুল-বশতই ও সংখ্যা দুটি ওঠেনি। তোমার 'আষাঢ়ে' কবিতাটি পাঠশালায় ছাপা হ'লে তোমার সুনাম হবে না। 'চোরে চোরে মাস্তুতো ভাই' গল্পটি যে পশ্চিমবঙ্গেই প্রচলিত হয়েছিল একথা বলা বাহুল্য। কবিত্বশক্তি যে ঐশ্বরিক দান এ সম্বন্ধে তোমার মতভেদ আছে জেনে কিছুমাত্র বিস্মিত হইনি। কারণ, এবিষয়ে একমত হলে তুমি 'আষাঢ়ে' কবিতাটি পাঠশালায় প্রকাশের জন্য কখনই পাঠাতে পারতে না। অকালবর্ষায় তোমাদের দেশের চাষবাসের ভীষণ ক্ষতি হয়েছে জেনে অত্যন্ত দুঃখিত হলুম। স্বাধীন দেশ হলে এর প্রতিকার সহজেই হতে পারত।

পরশুরাম তেওয়ারী, মিরবাজার।

ছিলেত 'পরশুরাম' হয়েছ 'পরমেশ্বর'
এতে এত ক্ষোভ কেন, এটাত উচ্চস্তর,
তবে যদি তুমি চাও থেকে যেতে 'অবতার'
কাট পরমেশ্বরে, কাঁধে ত আছে কুঠার।
সেকালে পরশুরাম করেছে নিক্ষত্রিয়
ভূতোর' মাথাটা ভাই কলিযুগে তুমিও নিও।
কবিতা লেখেনি বন্ধু সেযুগে পরশুরাম
এযুগে তুমি তা ক'রে ডোবাবে কি তাঁর নাম?

তারাপদ চক্রবর্তী, ফেণী।

'রবীন্দ্র বর্দ্ধাপন রৌপ্যপদক' সম্বন্ধে তোমার অশঙ্কা সত্য নয়। কেবলমাত্র প্রশ্নোত্তর বিভাগে অধিক সংখ্যক সঠিক উত্তর পাঠালেই কেউ এ পদক পাবে না। পাবেন তিনি, যিনি 'প্রশ্নোত্তর', শব্দ-সন্ধান', 'ধাঁধা', 'হেরফের হেরফের', 'রচনা প্রতিযোগিতা' সবেতেই প্রথম স্থান বা সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করতে পারবেন। সুতরাং তুমি নিশ্চিন্ত হতে পারো। গতমাসে তোমার নিজের দোষেই অনেক কিছুর উত্তর পাও নি। আষাঢ়ের 'চিঠিপত্র' দেখ।

মধু ঘোষাল, যুগকল্যাণ।

শক্তিকুমার বাগচির ঠিকানা পরে জানাব।

শান্তি গুপ্তার ঠিকানা—৭ নং এফ্ রোড, জামসেদপুর।

শশী ভট্টাচার্য, হেমনগর।

"Boys and Girls' Own Paper" বলতে তুমি যা বুঝেছ ঠিকই বুঝেছ। কিন্তু ওতে তোমার মতো আরও অনেকের আপত্তি আছে বলে ও প্রস্তাব সম্পূর্ণ গ্রহণ করা হল না। ভোটের ফলাফল দেখ।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈষ্ণবাটী।

'শিশু-সাহিত্যের গোড়ার কথা' প্রবন্ধটি সম্পাদকের বিবেচনাধীন আছে। 'পরীক্ষার পরীক্ষা' সম্বন্ধে এমাসের পাঠশালায় বলা হয়েছে গল্পটি চুরি। বাংলার প্রথম সংবাদপত্র সম্বন্ধে প্রতিবাদটি সুলিখিত হয়নি তবু ছাপা হল। 'মহামায়া সাহিত্য মন্দিরের 'আবেদন' সংবাদ পত্রে পাঠান। পাঠশালায় এরূপ আবেদন ছাপলে বাংলাদেশের আরও অসংখ্য প্রতিষ্ঠানের আবেদন আসবে। পাঠশালায় তাদের স্থান দেওয়া সম্ভব হবে না। 'কন্যামহল' ও 'কিশোর সভা' নামে ছেলেমেয়েদের জন্য পৃথক পৃথক বিভাগ করা সম্বন্ধে আপত্তিটি খুবই যুক্তিপূর্ণ। আমারও মত ছেলেমেয়েদের আলোচনা একত্রে হওয়াই উচিত, কিন্তু ছেলেমেয়েরা নিজেরাই তাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করায় আপাততঃ পরীক্ষামূলক ভাবে সেটাই বাহাল রইল। আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে ছেলেমেয়েরা নিজেদের এ সংকীর্ণতা পরিহার করে তাদের যা কিছু আলোচনা পাঠশালায় একত্রেই করবে। 'কালধুতরা'ও সম্পূর্ণ কাল নয় বলে তার উল্লেখ করা হয় নি। 'কিশোরবঙ্গ রবীন্দ্র জয়ন্তী' সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ আনন্দ বাজারের 'আনন্দ মেলা'য় প্রকাশিত হয়েছে। 'পাঠশালায়' আর পুনরাবৃত্তি কেন?

ধীরেন্দ্রনাথ মহান্তি, দাতন।

দেশগৌরব শ্রীযুক্ত সুভাসচন্দ্র বসুর বর্তমান ঠিকানা গভর্ণমেন্টের বিরাট সি-আই-ডি বিভাগও এখনও জানতে পারেন নি, সুতরাং পাঠশালা সম্পাদকের পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়।

সুধীরচন্দ্র রায়, হবিগঞ্জ।

এস্-এম লাইব্রেরী নাম দিয়ে তুমি নিজের জন্য একটি লাইব্রেরী খুলেছ জেনে খুশী হলুম। তোমার চেষ্টা প্রশংসনীয়। তোমার নিজস্ব লাইব্রেরীর সঙ্গে পাঠশালার সম্বন্ধ কিন্তু বিনামূল্যে বা অর্দ্ধমূল্যে হবার উপায় নেই, এজন্য আমরা দুঃখিত।

ওয়াহেদ আলী মিয়া, ইটাচাঙ্গী।

'পাঠশালায়' যে 'কিশোর সভা' খোলা হবে এতে মফঃস্বলের গ্রাহকরা অনায়াসে যোগ দিতে পারবেন, কারণ এ সভার অধিবেশন প্রত্যেক মাসে পাঠশালার পৃষ্ঠাতেই হবে। প্রত্যেক সভ্যই তাঁদের বক্তব্য লিখে পাঠিয়ে এতে আলোচনা করবেন। তৃতীয় প্রস্তাবটির সম্বন্ধে ভোটের ফলাফল দেখ।

নীলিমা দাশ, আকোলা।

'প্রশ্নোত্তর' বিভাগ রইল, সুতরাং তুমি নিশ্চিন্ত হতে পার। 'কিশোর সভা' পাঠশালার পক্ষে ক্ষতিকর হবার আশঙ্কা কোর না। তৃতীয় প্রস্তাব সম্বন্ধে ভোটের ফলাফল দেখ। তোমার ধাঁধাঁটি পাঠশালায় ছাপা হল।

রবিদবরণ রায়, ঢাকা।

ঢাকায় পাঠশালার বহু গ্রাহক গ্রাহিকা আছেন, দাঙ্গা হাঙ্গামার মধ্যেও তারা সকলেই নিয়মিত কাগজ পেয়েছেন। তুমি বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ দুমাস কাগজ না পেয়ে চুপ করে বসে ছিলে কেন? পাঠশালার নিয়ম হচ্ছে মাসের সাত তারিখের মধ্যে কাগজ না পেলে পোষ্ট অফিসের উত্তর সহ জানালে তবেই ডুপ্লিকেট কপি পাঠানো হয়।

হৃষীকেশ পানিগ্রাহী কাব্যবিশারদ

'ট্যাক্স্ বন্দন' কবিতাটি পাঠশালায় প্রকাশের জন্য মনোনীত হয়েছে।

সেখ সিরাজ উদ্দীন, মুর্শিদাবাদ।

'পত্রী-মৈত্রী' বিভাগের দুজনকে চিঠি লিখেও তুমি তাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় ও বন্ধুত্ব স্থাপনের সুযোগ পাওনি জেনে দুঃখিত হলুম। দুজনের এক জনও তোমার চিঠির উত্তর দেয়নি এ অত্যন্ত অন্যায় কথা। তুমি তাদের নাম ঠিকানা আমায় লিখে পাঠিও, আমি তাদের পত্রী-মৈত্রীর সম্মান রক্ষা করতে অনুরোধ করব।

মনোজ দত্ত, চট্টগ্রাম।

'শ-র'র বিরুদ্ধে তোমার কঠিন অভিযোগ তাঁকে জানাতে তিনি বললেন মনোজ বাবু আমাকে ভুল বুঝেছেন, আমি তাঁকে অপমান করবার উদ্দেশ্যে বা চট্টগ্রামবাসী ছেলেদের অসম্মান করবার অভিপ্রায়ে ও কথা লিখিনি। বাংলাদেশের ছেলেদের রসবোধের এত অভাব দেখে 'শ-র' বিস্মিত হয়েছেন। 'মোণ্ডা' ও 'ডাণ্ডা' শব্দের সঙ্গে অনুপ্রাসের খাতিরে তিনি 'গুণ্ডা' শব্দ ব্যবহার করেছিলেন নিছক পরিহাসের বশেই। মনোজবাবু এতে চটে গিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন দেখে 'শ-র' তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে জানিয়েছেন যে "অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্ শিরসি মা লিখ মা লিখ" এই মহাজন বাক্য অতঃপর তিনি কঠিন ভাবে মেনে চলবেন। কেবল তর্কের খাতিরে জিজ্ঞাসা করছেন Chittagong Armory Raid হবার পর ওদেশের ছেলেদের ভয় করা কি সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিক মনোবৃত্তির পরিচায়ক? তিনি যে শব্দটির জন্য আপত্তি করেছেন সেটাকে এক হিসাবে ত 'শ-র'র 'কম্‌প্লিমেণ্ট' বলেই তাঁর গ্রহণ করা উচিত ছিল।

নীতীশরঞ্জন দে, ঢাকা।

ভুতো গোয়েন্দা মহাশয় বলেন মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রতিকূল প্রভাবকে ঠেলে তীরটাকে যখন উপরে উঠতে হয় মাত্র ধনুকের ছিলার নিক্ষেপক শক্তির সাহায্যে, তখন উঠতে যে সময় তার লাগে উপর থেকে নীচে পড়বার সময়ে মাধ্যাকর্ষণের অনুকূল সাহায্যে সে তার চেয়ে অল্প সময়েই নেমে আসে। এইটাই তাঁর সহজ ধারণা। এটা আতস বাজী বা 'হাউই' ছোঁড়া লক্ষ্য করলে বুঝতে পারা যায়। আপাতদৃষ্টি আর যে ক্ষেত্রেই মানুষের ভুলের কারণ হোক, এ ক্ষেত্রে বোধ হয় নয়। অবশ্য নিক্ষিপ্ত বস্তুর নিক্ষেপণ বেগ ও ভার তারতম্যের উপরই এই ওঠা নামার সময়ের আপেক্ষিক পার্থক্য অনেকখানি নির্ভর করে। কারণ মাধ্যাকর্ষণের যে standard শক্তি তাতে velocity ও acclleration বরাবরই সমান। তোমার গাণিতিক প্রমাণ তিনি মানতে রাজি নন। কিন্তু আমি অঙ্কশাস্ত্রটাকে শুধু মানা নয় রীতিমত ভয় করি, কারণ এই শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে মানুষ অনায়াসে দুই আর দুইয়ে পাঁচ করতে পারে। সুতরং তোমার প্রতিবাদ ছাপা হল। তোমার গল্পটি এখনও পড়া হয় নি।

সাধনানন্দ মিশ্র, মুগবেড়িয়া।

তুমি লিখেছ পাঠশালার দাম বাড়িয়ে গল্প প্রবন্ধও বাড়ানো হোক, সেই সঙ্গে পাঠশালার সমস্ত বিভাগও রাখা হোক। কিন্তু বর্তমান যুদ্ধের বাজারে কাগজ, কালি, হরফ, ব্লক, দপ্তরীর ব্যয় সমস্তই বেড়ে যাওয়ায় পাঠশালার পৃষ্ঠা বাড়ানো অসম্ভব। বরং পূর্বের চেয়ে দু'এক ফর্মা আমাদের কমাতে হয়েছে কাগজখানিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য। তোমার প্রস্তাব মত পাঠশালা ছাপা চলবে যুদ্ধের পর। আর, ছোটদের কাগজ তিন টাকার চেয়ে বেশী দাম হওয়া উচিত নয়। পাঠশালাকে গ্রাহক গ্রাহিকাদের নিজস্ব কাগজে পরিণত করা সম্বন্ধে ভোটের ফলাফল দেখ। মানুষ মরবার পর কোথায় যায় এই প্রশ্নের উত্তরে 'ভুতো গোয়েন্দা' যা বলেছেন তার অধিক আর কিছু শুনতে হলে পাঠশালা সম্পাদকের মৃত্যুর পর আবার তাঁর ফিরে আসা পর্যন্ত তোমায় অপেক্ষা করতে হবে।

আরতি গুহ ও অমিতা অধিকারী, নবগ্রাম।

'রবীন্দ্র বর্দ্ধাপন বৌপ্যপদক' সম্বন্ধে তোমরা যা লিখেছ সে কথা ঠিক। যিনি প্রশ্ন করে পাঠান বা ধাঁধাঁ সংগ্রহ করে পাঠান প্রতিযোগিতায় তাঁর একটি সংখ্যা কম হবেই। 'দেবতরুর' উল্লেখ সুবল মিত্রের বাংলা অভিধানে পাবে। এসম্বন্ধে 'শ-র'কে তোমাদের পৃথক পত্র লিখা উচিত ছিল। 'শব্দ-সন্ধান' সম্বন্ধে সম্পাদকের কাছে কাঁদাকাটা বৃথা।

তিনি তোমাদের সঙ্গে শুধু সহানুভূতি করা ছাড়া আর কিছু করতে পারবেন না, কারণ, ওটা তাঁর এলাকার বাহিরে।

আরতি সিংহ, পাটনা।

পেয়েছি তোমার লিখা কবিতায় পত্র
গদ্যে লেখাও দেখি আছে কয় ছত্র।
উত্তর কবিতায় করিয়াছ ভিক্ষা
অথচ লিখেছ—নিবে ব্যস্ত পরীক্ষা।
তাই তব রচনায় নাই কোন ছন্দ,
এ সময় চিঠি লেখা রাখ দিদি বন্ধ।

অজিতকুমার দত্ত, মেদিনীপুর।

তোমার প্রস্তাবটি খুব ভাল লাগল। পাঠশালার গ্রাহক গ্রাহিকারা অধিকাংশই 'প্রশ্নোত্তর' বিভাগ ছাড়তে রাজী নয়। 'কিশোর সভা'ও প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছুক। এ ক্ষেত্রে তোমার প্রস্তাব মত কয়েকজন খ্যাতনামা লেখকের এক একটি বিশেষ রচনার সঙ্গে 'কিশোর সভা', 'কল্যাণমহল', 'প্রশ্নোত্তর' প্রভৃতি পাঠশালায় রাখা স্থির হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ মল্লিক, জলপাইগুড়ি।

আমাদের পাঠশালা গিয়েছে ঠিকানা চিনে,
'বৈশাখ' 'জৈষ্ঠ্যের' খোঁজ তাই এদ্দিনে?
চুপ করে বসেছিলে না পেয়েও দুটি মাস।
কাগজ পাঠাতে বলা—আজ এযে উপহাস।

নবনীকুমার চৌধুরী, লঙ্গাই।

তোমাদের দেশে যে মূর্তিতে বর্ষার আবির্ভাব হয়েছে লিখেছ সেটা যথার্থই বেদনাদায়ক। বর্ষা সংহার মূর্তিতে দেখা দিলে সেটা অসহ্যই হয়ে ওঠে। পাঠশালা সম্বন্ধে তোমার প্রস্তাব অধিকাংশের মতের সঙ্গে মিলে যাওয়ায় তা গ্রাহ্য হয়েছে।

রেবা ভদ্র, ঢাকা।

তুমি ঠিকই বলেছ, পাঠশালার সকল গ্রাহক গ্রাহিকাই কিছু গল্প প্রবন্ধ প্রভৃতি লিখতে পারেন না। যাঁরা লিখতে পারেন তাঁদের রচনাও সব সময় প্রকাশযোগ্য হয় না, সুতরাং পাঠশালাকে কেবলমাত্র গ্রাহক গ্রাহিকাদের পত্রিকা করে তোলা উচিত হবে না। তোমার গ্রাহক নং এবার সংশোধন করে দেওয়া হল। অশ্বিনীবাবু তাঁর পত্রের একটি কৈফিয়ৎ পাঠিয়েছেন। সাধনা বসুকে লিখিত 'শ-র'র পত্রোত্তরে তুমি কোনো দোষ বা অন্যায় হয়েছে বলে মনে করোনা জেনে তোমার রসবোধের প্রশংসা করছি। পাঠশালার উন্নতি ও দীর্ঘায়ু কামনার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পীযূষ নিয়োগী, মাণিকগঞ্জ।

রচনাটি পাঠিয়ে দিও, পড়ে দেখে মতামত জানাব।

পুষ্প ঘোষ, বালিগঞ্জ।

পাঠশালার বয়স ৪ বছর প্রায় পূর্ণ হ'ল। এই চার বছর ধরেই একাধিক গ্রাহক-গ্রাহিকা 'সম্পাদক মশাই' বলার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে আসছে ও একটা আত্মীয়তার সম্বন্ধ স্থাপন করতে চাইছে। চার বছরে একটা আত্মীয়তা গড়ে উঠে সেবিষয়ে কোনো ভুল নেই, কিন্তু প্রথম বছর থেকেই কোনো সম্বন্ধ স্বীকার করলে সেটা হত কৃত্রিম, তাই এতদিন তোমাদের প্রস্তাবটাকে আমি আমল দিইনি। আজও যে সম্পূর্ণ দিচ্ছি—তা নয়। কারণ, এ ব্যাপারটা আমি ঠিক অনুমোদন করিনি। ইস্কুলে বা কলেজে ৫।৬ ঘণ্টা নিত্য যাঁদের কাছে পাঠাভ্যাস করো তাঁদের সঙ্গে বেশ একটা ঘনিষ্ঠ স্নেহের সম্বন্ধ গড়ে উঠলেও তাঁদের যেমন 'স্যার' বা 'মাষ্টারমশাই' ছাড়া 'কাকাবাবু' বা 'দাদাবাবু' কিছু বলনা তোমরা, তেমনি আমার মনে হয় যে 'সম্পাদক মশাই'—সম্পাদক মশায়ই। তার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ পাতানো যেমনি অনাবশ্যক তেমনি অহেতুক। কিন্তু তোমাদের মধ্যে জনকতকের ক্রমাগত পীড়নে আমি কেবল এইটুকুতেই সম্মত হয়েছি যে তোমাদের মধ্যে নেহাৎই যারা 'সম্পাদক মশাই' ছাড়া আর কিছু বলতে চাও, তারা বড় জোর 'নরেনদা' বলতে পার। বয়োজ্যেষ্ঠদের এভাবে সম্বোধন আমাদের সমাজে বহুকাল থেকেই প্রচলিত আছে। এক্ষেত্রে নামধরে দাদা বলতে কোনো কুণ্ঠা বা সঙ্কোচ হওয়া উচিত নয়। 'সম্পাদক মশাই' বলাটাই কিন্তু আমি বেশী পছন্দ করি জেনো। কারণ সেইটেই সত্য ও স্বাভাবিক। 'শব্দসন্ধান' সম্বন্ধে তোমার যা বলবার সেজন্য 'শ-র' কে পৃথক পত্র দিও।

শিশিরকুমার সেনগুপ্ত, কলিকাতা।

পাঠশালা গতানুগতিকের পক্ষপাতী নয়। পরিবর্তনই নবীনতা সম্পাদন করে। যে ভাবে পাঠশালা শুরু হয়েছিল তাতে পুঁথিগত বিদ্যা কতকটা আয়ত্ত হতে পারত বটে, কিন্তু, সাধারণ জ্ঞান তাতে বাড়তোনা এবং ভবিষ্যৎ জীবনে চলবার পথে সে সব রচনা তাদের বিশেষ কোনো সাহায্যই করত না। তার Academic Value হয়ত থাকতে পারে, কিন্তু practical utility সামান্যই। বৈদিক যুগের গরুর গাড়ীর চাকা ধরে স্বর্গে যাওয়ার কল্পনা এযুগে ছাড়তে হবে। যেগুলিকে আপনি পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অপ্রয়োজনীয়, অবাস্তব ও বাজে বলে মনে করছেন আজকের দিনের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সহজ ও আনন্দজনক পদ্ধতিই হল সেইগুলো। খেলাধুলার ভিতর দিয়ে আমোদ-প্রমোদের ভিতর দিয়ে নিজেদের অগোচরে তারা যা শিখবে—চারুপাঠ, নীতিপাঠ, বোধোদয় তা শেখাতে

পারবে না। আপনি সংবাদপত্রের বর্তমান নিত্য নব বিভাগগুলির সম্বন্ধে যে কটাক্ষ করেছেন আমি মনে করি সেইগুলিই এ যুগের সংবাদপত্রকে সবিশেষ উন্নত ও সুপাঠ্য করে তুলেছে। সুতরাং যেখানে মূল আদর্শ সম্বন্ধে মতভেদ সেখানে আশঙ্কা করি আপনার 'গৌরবের' মানদণ্ড আমাদের কাছে মূল্যহীন মনে হতে পারে।

কামদারঞ্জন ভট্টাচার্য, নবপুর।

তোমার ভগ্নীর শুভ বিবাহে নিমন্ত্রণ পেয়ে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু উপস্থিত ত্রিপুরা যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয় বলে মার্জনা চাইচি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি নবদম্পতী সুখী হোক।

হরিপদ চক্রবর্তী, ত্রিপুরা।

প্রশ্ন একটির বেশী ছাপা হবেনা বলে তোমরা যে প্রশ্নও একটির বেশী পাঠাতে পারবে না এমন কোনো কথা নেই। যার যতগুলি ইচ্ছা alternative প্রশ্ন পাঠাতে পারো। 'বিনিময় সঙ্ঘ' সম্বন্ধে সঙ্ঘপরিচালককে পৃথক পত্র দিও। 'অবাককাণ্ড' অন্য কাগজে (ছেলেদের) যা প্রকাশিত হয়েছে তা আর পাঠিয়ো না। তোমার কবিতাটি প্রকাশযোগ্য নয়।

কমলকুমার চট্টোপাধ্যায়, ভবানীপুর।

ভোটের ফলাফলে তোমাদের দলেরই জয়লাভ হয়েছে, সুতরাং নিশ্চিন্ত হতে পারো।

আমলা হিন্দু হোস্টেলের ছাত্রবৃন্দ।

তোমাদের প্রেরিত ধাঁধাটি অত্যন্ত পুরাতন। নূতন ধাঁধা পাঠাও।

ধ্রুবরঞ্জন সরকার, হাওড়া।

পুষ্প ঘোষকে লেখা উত্তরটি দেখতে অনুরোধ করি। 'প্রশ্নোত্তর', 'ধাঁধাঁ', 'হেরফের হের ফের', 'শব্দ-সন্ধান' প্রভৃতির অধিক সংখ্যক নির্ভুল উত্তরদাতাকে যে 'রবীন্দ্র বর্দ্ধাপন রৌপ্য পদক' দেওয়া হবে সেত কেবলমাত্র প্রশ্নোত্তরের জন্যই নয়, সকল বিভাগে averageএ যে সকলের চেয়ে বেশী সঠিক উত্তর দিতে পেরেছে,সেই পাবে। সুতরাং তুমি যা আশঙ্কা করছ, তা হবার উপায় নেই। তাছাড়া সংখ্যা নির্ধারণের সময় প্রশ্নকর্তার নিজের দেওয়া উত্তর সঠিক হলেও তা গণনা করা হবে না। সুতরাং তুমি নিশ্চিন্ত হতে পারো। তোমার প্রতিবাদ ছাপা হল। ভোটে তোমাদের দলেরই জয় জয়কার। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়—তোমার পুরস্কার প্রাপ্ত প্রবন্ধটী হারিয়েছে। যদি কপি থাকে আবার লিখে পাঠিও পাঠশালায় ছাপা হবে।

উদয়ভানু সিংহ, কলিকাতা।

তোমার কাকাবাবুর কবিতাটি পেয়েছি, ধন্যবাদ। যথাসময়ে এর প্রতিদান যাবে। মাথায় আর টিকি রাখবার জায়গা ছিল না বলে তুমি এমাসে কি পড়বে তার টিকির সন্ধান পাওনি। বাংলা শিশু সাহিত্যে কি সত্যিই প্রতি মাসে পড়বার মত একাধিক বই বেরুচ্ছে? বেশত, তুমি দু' একমাস তালিকা পাঠাও না, দেখা যাক তোমার রুচি সকলের রুচির সঙ্গে মেলে কি না। 'নারীর কথা' নাম নয়, নাম ও বিভাগের 'কন্যামহল'ই, জমতে একটু সময় লাগবে। তোমাদের 'কিশোর সভার' পরিচালনা তোমরাই করবে। যাঁরা ঠিকানা জানতে চান তাঁদের জন্য একই লোকের নাম একাধিক বার 'পত্রমৈত্রী'তে দিতে হয়। 'বারভুঁইয়া' ক্রমশঃ প্রকাশ্য। বিনিময় সঙ্ঘ সম্বন্ধে পরিচালককে পৃথক পত্র দিও।

গতমাসের খবর

বাংলার কিশোর জগতের বন্ধু, ব্রতচারী নৃত্য আন্দোলনের প্রবর্তক, সদানন্দময়, দেশ-প্রেমিক গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের মৃত্যুতে বাংলা দেশ আজ এমন একজন উৎসাহী কর্মবীরকে হারালো যাঁর স্থান পূর্ণ হবার নয়। কর্মী আছেন অনেকেই, খাটেনও তাঁরা, কিন্তু এমন অকপট আন্তরিকতার সঙ্গে কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে আর কাউকে দেখিনি যেমন দেখেছিলাম এই ব্রতচারী ব্রতধারীকে। স্বর্গগত পত্নীর প্রিয় স্মৃতি রক্ষার্থ 'সরোজনলিনী আশ্রম' খুলে তিনি বাংলার অশিক্ষিত দরিদ্র ভদ্র কন্যাদের বিদ্যা শিক্ষা ও শিল্পকলা অনুশীলনের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। যখনই যে কাজ তিনি ধরতেন তা সফল ও সার্থক করে তুলতেন, এমনই ছিল তাঁর একাগ্রতা। ছেলেদের সঙ্গে ব্রতচারী নৃত্যে তিনি সমানে নাচতেন, আবার বস্তি সাফ ও কচুরিপানা উদ্ধারেও তাদের সঙ্গে সমানে ঝাড়ু কোদাল ও কাস্তে ছুরি নিয়ে এগিয়ে যেতেন। এমন অকৃত্রিম জনসেবক বাংলায় বিরল। আমরা তাঁর স্বর্গগত আত্মার শান্তি ও তৃপ্তি কামনা করি।

* * * *

প্রাচ্যরণক্ষেত্রে যিনি ছিলেন ব্রিটেনের প্রধান সেনাপতি যাঁর অধীনে আবিসিনিয়া ও আফ্রিকার যুদ্ধ পরিচালিত হওয়ার ফলে ইটালিয়ানরা সদলবলে পরাজিত, বিপর্যস্ত ও বিশৃঙ্খল হয়ে আত্মসমর্পণ করেছে। ইরাকের বিদ্রোহ যিনি হেলায় দমন করেছেন এবং মাল্টা থেকে

সাইবেরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত রণাঙ্গনের গুরুদায়িত্ব যাঁর উপর এতদিন ন্যস্ত ছিল সেই স্বনামধন্য সমরকুশলী সেনাধ্যক্ষ স্যার আর্চিবল্ড ওয়াভেল অকস্মাৎ ভারতের প্রধান সেনাপতি পদে বদলি হয়েছেন এবং যিনি হয়ে এসে ছিলেন সেদিন ভারতের প্রধান সেনাপতি সেই স্যার ক্লডে অচিনলেককে অকস্মাৎ টেনে নিয়ে গিয়ে তার পদে নিযুক্ত করা হয়েছে। সংবাদটা ভারতবাসীদের অতি-মাত্রায় বিস্মিত করেছে।

* * *

ডায়মণ্ড হারবারের নিকটস্থ হুগলী নদীর মোহনায় মাছ ধরতে গিয়ে জনৈক ধীবর যুবককে একটি প্রকাণ্ড কুমীর আক্রমণ করেছিল। কুমীর প্রথমে তার একটি হাত কামড়ে ধরে তাকে গভীর জলের মধ্যে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। যুবক তার আসন্ন বিপদ বুঝতে পেরে প্রত্যুৎপন্নমতির বলে হাত দিয়ে কুমীরের চখের মধ্যে আঙুল পুরে দেয়, কুমীর বেগতিক বুঝে ধীবর যুবককে ছেড়ে দেয়। যুবক সাঁতার কেটে প্রায় ডাঙ্গার কাছে এসে পড়েছে সেই সময় কুমীরটা আবার তেড়ে এসে তার একটি পা চেপে ধরে টানতে থাকে। এবারও যুবক কুমীরের চোখের মধ্যে আঙ্গুল পুরে দিয়ে সাহায্যের জন্য চীৎকার শুরু করে। কুমীর এবারও তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়, কিন্তু যুবক এবার আর তীর পর্যন্ত আসতে পারে নি। আহত হাত পা নিয়ে সে কতকদূর এসেই অচেতন হয়ে পড়ে। এই সময় তার চীৎকারে লোক জন এসে পড়েছিল। তারা ধীবর যুবককে জল থেকে তুলে এনে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে হাসপাতালে এই সাহসী যুবকের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠেছে।

* * * *

কাশী ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত রামকুমার চৌবে ইংরাজী, ইতিহাস, দর্শন, গণিত, হিন্দী, সংস্কৃত, পারসী এবং উর্দ্দু এই আটটি বিষয়ে 'এম্-এ' উপাধি পেয়েছেন। এইবার তিনি পালিতে 'এম্-এ' দিবার জন্য ১৪ই জুলাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'এম-এ পরীক্ষায় যোগ দিয়েছেন। এঁর বয়স উপস্থিত ৪৯ বৎসর। অষ্টবিধ এম-এ ছাড়াও এল-এল-বি, ও আর-বি-টি ডিগ্রী ও আছে। অধ্যাপক চৌবের জ্ঞান পিপাসা ও পরীক্ষা দিবার অধ্যবসায় যথার্থ প্রশংনীয়। আগে কেউ 'ডবল এম-এ' হলেই লোকে বলত ইনি পণ্ডিত। এখন নদফা এম-এর উপরে উঠতে না পারলে আর খাতির পাওয়া মুস্কিল।

* * * *

মাধ্যমিক শিক্ষা বিল নিয়ে দেশে আবার অশান্তি সৃষ্টি হবার উপক্রম হয়েছে। বঙ্গীয় শিক্ষাপরিষদের সভাপতি স্যার পি সি রায় জানিয়েছেন যে সিলেক্ট কমিটি এই বিলটির কোনো উৎকর্ষ বিধান না করে বরং আরও অপকর্ষতা সাধন করেছেন। বঙ্গীয় শিক্ষা পরিষদ এই মাধ্যমিক শিক্ষা বিলটি প্রত্যাহার করবার দাবী জানিয়েছেন। এ দাবী যদি গ্রাহ্য না হয় তাহলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও অসন্তোষ বৃদ্ধিপাবার সম্ভাবনা আছে।

* * * *

ব্রিটীশ পার্লামেন্টের মহিলা সদস্য মিস র‍্যাথবোন তাঁর ভারতীয় বন্ধুদের যে খোলা চিঠি লিখেছিলেন, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর রোগশয্যা থেকেও সে পত্রের তীব্র প্রতিবাদ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ঐ পত্রে ভারত বাসীদের সম্বন্ধে সাধারণ ইংরাজের যে শোচনীয় মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে, কবিগুরুর চিত্তকে তা ব্যথিত ও বিচলিত করে তুলেছিল। ভারত সম্বন্ধে মিস র‍্যাথবোন এবং তাঁর স্বদেশবাসীদের অজ্ঞতাই র‍্যাথবোনের উক্ত দম্ভ ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ পত্রে প্রকাশ পেয়েছে। আশা করা যায় কবি যে নির্ভীক ও সত্য প্রত্যুত্তর দিয়েছেন তাতে এই শ্রেণীর ইংরাজ নরনারীর ভারত সম্বন্ধে নূতন করে জ্ঞানলাভ হবে।

* * * *

আমরা এ সংবাদে অত্যন্ত চিন্তিত ও বিষণ্ণ হয়ে পড়েছি যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য পুনরায় উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে। তাঁর শরীরের উত্তাপ কিছুতেই স্বাভাবিক অবস্থায় আনতে পারা যাচ্ছে না। পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণে তিনি অক্ষম হয়ে পড়েছেন। ফলে তাঁর দেহ ক্রমেই এত বেশী ক্ষীণ ও দুর্বল হয়ে পড়েছে যে তিনি একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি কবি শীঘ্র নিরাময় হয়ে উঠুন।

* * * *

বরিশাল, নোয়াখালি প্রভৃতি অঞ্চলে দারুণ ঘূর্ণবাত্যা ও পূর্ব বঙ্গের অন্যান্য স্থানে বন্যা ও অতিবর্ষা যে ভীষণ ধ্বংস ও ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেছে তার মর্মান্তিক সংবাদ প্রতিদিন কাগজে পাওয়া যাচ্ছে। পাঠশালার গ্রাহক গ্রাহিকারাও অনেকে তাঁদের দেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুরবস্থার যে বর্ণনা পাঠিয়েছেন তা একান্ত হৃদয়বিদারক। পৃথিবীর একদিকে বিমান আক্রমণে ও বোমাবর্ষণে মানুষ মানুষের যে সর্বনাশ সাধন করছে—এদেশে প্রকৃতির তাণ্ডবলীলা ও করাল সংহার মূর্ত্তি তার চেয়েও ভীষণ। এর অবশ্যম্ভাবী পরিনামে উভয় দেশেরই ভবিষ্যৎ দুর্গতি আরও কঠোর হয়ে উঠবে। কিন্তু প্রতিকারের উপায় বলে দেবে কে এবং সে চেষ্টাই বা করবে কারা?

* * * *

বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের নায়করূপে যিনি পৃথিবীর

আকর্ষণ করেছিলেন—সেই ভূতপূর্ব জার্মান সম্রাট কাইজার উইলহেলম দি সেকেণ্ডের সম্প্রতি মৃত্যু হয়েছে। তিনি য়ুরোপ বিজয়ে উন্মত্ত হয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁর সংকল্প কার্যে পরিণত করতে পারেন নি। তাঁকে পরাজয়ের লজ্জা বরণ করে দেশ থেকে নির্বাসিত হতে হয়েছিল। ১৮৫৯ সালে ২৭শে জানুয়ারী বার্লিনে তাঁর জন্ম হয়। তিনি ব্রিটেনের রাজ্ঞী কুইন ভিক্টোরিয়ার দৌহিত্র ছিলেন। শোনা যায় তিনি নাকি গতযুদ্ধের সময় বলেছিলেন যে 'আমার শরীর থেকে ইংরাজরক্ত যে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারবে তাকে আমি আমার সাম্রাজ্য দিতে রাজি আছি।' এমনই কঠোর ছিল তার ব্রিটীশ বিদ্বেষ! মৃত্যুর পূর্বে তিনি দেখেগেছেন তাঁর সেই য়ুরোপ জয়ের পরিকল্পনা হিটলারের অধীনে নবজাত জার্মানরা কতকটা সম্ভব করে এনেছে।

সমর-কোষ

শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায়

আজকাল পাশ্চাত্যদেশে যুদ্ধ ও রাজনীতি সংক্রান্ত ব্যাপারে এমন অনেক গুলি বিশেষ শব্দ (Technical Terms) ব্যবহৃত হয় যা বোঝা শক্ত। 'অমর-কোষ' খুঁজলে তার অর্থ পাওয়া যায় না। তাই এই 'সমর-কোষ' প্রকাশ করা হ'ল। এগুলি জানা থাকলে ছাত্রদের ভবিষ্যতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় খুবই কাজে লাগবে। (লেখক)

সুয়েজ খাল—

এই খাল একজন ফরাসি ইন্‌জিনিয়ার দ্বারা খনিত হয়। এই খাল ভূমধ্যসাগর ও লোহিতসাগরকে যুক্ত করিয়াছে। এই খাল যদিও ইংরাজ ও ফরাসী "বোর্ড অব ডিরেক্টরস্"দ্বারা পরিচালিত হইত কিন্তু সংপ্রতি সম্পূর্ণরূপে ইংরাজের প্রভাবাধীনে আছে। সুয়েজ খাল এবং তৎ-সংলগ্ন স্থান মিশর দেশের অন্তর্গত হইলেও এখন ইংরাজের তত্ত্বাবধানেই আছে, কারণ মিশরের সঙ্গে চুক্তি এই যে—"খাল কোম্পানি"র সত্ত্বস্বামীত্ব ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে শেষ হইয়া যাইবে এবং খাল সম্পূর্ণরূপে মিশর রাজ্যসীমানার অন্তর্ভুক্ত হইবে। এই খালে যাতায়াতী জাহাজের উপর "ট্যাক্স" ধার্য আছে। ইতালির বহু জাহাজ এই পথে যায় আসে বলিয়া ইটালি "বোর্ডে" স্থান পাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ দাবী করিয়াও পায় নাই। বর্তমান যুদ্ধে ইতালির যোগদানের ইহা অন্যতম একটা কারণ।

পঞ্চমবাহিনী (Fifth column)

স্পেনের বিগত ঘরোয়া যুদ্ধের সময় হইতেই এই শব্দের প্রচলন হইয়াছে। স্পেনের সমাজতন্ত্রী দলের নেতা জেনেরেল "ফ্রাঙ্কো" (১৯৩৬—১৯৩৯) চার দিক হইতে স্পেনের "রিপাবলিক"—গভর্ণমেণ্টকে আক্রমণ করে। এবং অন্য একটি দলকে (পঞ্চম বাহিনী) রিপাবলিক্ গভর্ণমেণ্টের মধ্যে বন্ধুভাবে রাখে, যাহারা গুপ্তচরের কার্য করিয়া 'স্ট্রাইক' ইত্যাদি ঘটাইয়া কারখানার ধ্বংস সাধন, গোপনে গভর্ণমেণ্ট-বিরোধী প্রচারকার্য প্রভৃতির দ্বারা ফ্রাঙ্কোকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিল। জার্মানির নাজিদল বর্তমান যুদ্ধে নরওয়ে, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, প্রভৃতি দেশে এইরূপ এক একটা পঞ্চমবাহিনীর দ্বারা প্রভূত উপকার পাইয়াছে। এক্ষণে এইরূপ কার্যে যাহারাই নিযুক্ত থাকে তাহারা 'পঞ্চমবাহিনী' নামে পরিচিত হইয়া থাকে।

কুইসলিং (Quisling)

মেজর কুইস্‌লিং—নরওয়ের একজন রাজনীতিবিদের নাম। ১৯০৮ সালে ইনি নরওয়ে সৈন্যদলের একজন অফিসার হন, পরে রাশিয়া, ফিন্‌ল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে নিযুক্ত থাকেন। বর্তমান যুদ্ধে যাহাতে নরওয়ে প্রদেশ সহজেই জার্মানির হস্তগত হয় সেই উদ্দেশ্যে নরওয়েতে "ন্যাস্‌ন্যোনাল সামলিং"—নাম দিয়া একটা সমাজতন্ত্রীদল গঠন করেন। পরে নরওয়ে অধিকারের পর জার্মনি সেদেশে যে তাঁবেদার গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করে মেজর কুইসলিংকে তাহার প্রধান কর্তারূপে নিয়োগ করা হয়। (April—1940) সেই হইতে যাহারা বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা, স্বদেশকে শত্রুহস্তে তুলিয়া দেয় তাহাদের 'কুইস্‌লিং' আখ্যা দেওয়া হয়।

ম্যানডেট (Mandate)

ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্রের অনুরূপ এক প্রকার শাসনাধিকারের নাম—'ম্যানডেট শাসন'। বিগত মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৭) পর জার্মানির উপনিবেশগুলি ও তুরস্ক সম্রাজ্যের কতকাংশের শাসন ব্যবস্থা জাতিসঙ্ঘের (League of Nations) হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। জাতিসঙ্ঘকর্তৃক ইংরাজ, ফরাসী প্রভৃতি মিত্রশক্তিকে উক্ত প্রদেশগুলির শাসন ব্যবস্থা যে সর্তে ছাড়িয়া দেওয়া হয়—সেই অধিকারের নাম 'ম্যানডেট'। এই সময় হইতেই

এইরূপ শাসনের প্রবর্তন হয়। এই শাসন ব্যবস্থা তিন প্রকারের—। প্রথম শ্রেণী (A. class Mandate) সামরিক ভাবে অধিকার—এরূপ ব্যবস্থায় শাসিত প্রদেশ আত্মশাসনে ক্ষমতা সম্পন্ন হইলেই নিজের দেশ নিজেরা শাসন করিতে পাইবে—যথা সিরিয়া, ইরাক, প্যালেষ্টাইন। দ্বিতীয় শ্রেণী (B class Mandate)। বিজিত দেশের পৃথক অস্তিত্ব ও জাতি হিসাবে সমগ্রতা বজায় রাখিয়াই শাসন নিয়ন্ত্রণ অপরের হাতে থাকিবে—যথা আফ্রিকার জার্মাণ উপনিবেশের কতকাংশ ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও ইংরাজের শাসনাধিকারে আছে। তৃতীয় শ্রেণী (C. class Mandate)। শাসন ভার প্রাপ্ত প্রদেশকে কতকটা নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অংশ হিসাবে শাসন করিবে। যথা—জার্মাণ দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকা এবং অষ্ট্রেলিয়ার নিকটস্থ কয়েকটা দ্বীপ।

বিনিময় সঙ্ঘ

পরিচালক—শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায়

১। মণীন্দ্রমোহন মজুমদার, গ্রাঃ নং ৩৪৩২,

ডাক-টিকিট সংগ্রহের উপায়

বহির্ভারতে বিভিন্ন দেশে যাঁহাদের বন্ধুবান্ধবের বাস, অথবা কোনরূপ ব্যবসা বাণিজ্যের সম্বন্ধ আছে, সংগ্রাহকের কর্তব্য তাহাদিগের নিকট লিখিত পত্রাদি হইতে ঐ সকল টিকিট সংগ্রহ করা। ইহাতে যদিও একই টিকিট একাধিক হাতে আসিয়া জমা হইতে থাকে, কিন্তু সংগ্রাহকের পক্ষে উহা অনাবশ্যক নয়। কেননা, ঐগুলির বিনিময়ে তিনি অপর একজন সংগ্রাহকের নিকট হইতে এমন কতকগুলি টিকিট পাইতে পারেন যাহা তাঁহার নিজের নাই। কিন্তু, নানা দেশের বহু টিকিট সংগ্রহ করা কিঞ্চিৎ অর্থব্যয় ভিন্ন সম্ভব নয়।

টিকিট বিক্রেতা কৌশলী ব্যাপারীরা নানাবিধ উপায়ে ভিন্ন ভিন্ন মূল্যের বিভিন্ন দেশের টিকিট দেশহিসাবে অথবা সংমিশ্রিতভাবে ছোট বড় মোড়ক করিয়া বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত রাখেন। নূতন সংগ্রাহকের পক্ষে সুবিধাজনক ঐরূপ মোড়ক মাঝে মাঝে ক্রয় করা। প্রথম সংগ্রহ করা উচিৎ পাঁচশত বা হাজার সংমিশ্রিত টিকিটের একটি মোড়ক। পরে সংরক্ষণী পুস্তক বা এ্যালবামের পঙ্‌তি বা সেট পূরণ করিতে যেরূপ আবশ্যক বিচার করিয়া বিভাগীয় টিকিটের মোড়ক ক্রয় করা বাঞ্ছনীয়। বিভিন্ন দেশের সংমিশ্রিত কত টিকিটের কিরূপ মূল্য হইতে পারে নিম্নে তাহার তালিকা দিলাম।

১০০ ...।০ আনা, ২০০... ৷৵০ আনা,

৫০০ ২৲ টাকা, ১০০০ ৫৲ টাকা, ইত্যাদি।

উহার সমমূল্যের দুই পয়সা দামের ডাকটিকিট ডাকঘর হইতে ক্রয় করিয়া আমাদের নিকট পাঠাইলে উহার বিনিময়েও আমরা ঐ মোড়ক সংগ্রহ করিয়া দিতে পারি।

২। আমি ইংলণ্ডের ½d. টিকিটের বিনিময়ে স্পেন, এবং লিথুয়ানিয়ার বদলে ব্রেজীলের টিকিট চাই। শিশির কুমার সাহা, গ্রাঃ নং ৩২৮৭

৩। আমি সাউথ আফ্রিকার টিকিটের বিনিময়ে রাশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, ফরাসী, ইন্দোচীন, অথবা নিউগিনির টিকিট চাই। সুধীরচন্দ্র দেব, গ্রাঃ নং ২৯০৬

৪। আমি কেনিয়ার ইউগেণ্ডা ২০c, হেলভেটিয়া ৫ ও ইংলণ্ডের ½ পেনি মূল্যের টিকিটের বিনিময়ে ইটালি, চীন, রাশিয়া বা সিংহলের টিকিট চাই। আভাস গুপ্ত, গ্রাঃ নং ৪৮২৯

৫। আমি নেপাল, মালয়, যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতীয় টিকিটের বিনিময়ে বলিভিয়া, রাশিয়া, ইটালি বা অষ্ট্রেলিয়ার ক্যাঙ্গারু ও এমুর ছবি বিশিষ্ট ডাকটিকিট চাই। সাধনা নন্দ মিশ্র, গ্রাঃ নং ৩৩৬৬

৬। আমি কানাডা, সিংহল, আয়ার, সাউথ আফ্রিকা, ও ইটালির টিকিটের বিনিময়ে আইসল্যাণ্ড, রাশিয়া ও ব্রেজীলের টিকিট চাই। তারাপদ বাগচী, গ্রাঃ নং ৩১৭৪

৭। আমি নিউজীল্যাণ্ড, জার্ম্মানি ও যুক্তরাষ্ট্রের টিকিটের বিনিময়ে মিশর, প্যালেষ্টাইন, ও চীন দেশের টিকিট চাই। শঙ্কর নাথ ব্রজবাসী, গ্রাঃ নং ৩৬৩৯

৮। আমি সাউথ আফ্রিকা, জাপান, হেলভেটিয়া, জার্ম্মানি, যুক্তরাষ্ট্র ও বর্ম্মার টিকিটের বিনিময়ে রাশিয়া, ব্রেজীল, রুমানীয়া, আবিসিনিয়া, ফিনল্যাণ্ড ও আফগানের টিকিট চাই। ধ্রুবরঞ্জন সরকার, গ্রাঃ নং ১১১৮

৯। আমি ভারতের ১৲ টাকা মূল্যের টিকিটের বদলে আর্জেন্টিনা, কানাডা, লাক্সামবুর্গ, তুর্কী, জাপান বা হাঙ্গেরীর দুইখানি টিকট চাই অনিলবরণ মহান্তি, গ্রাঃ নং ২৫০১

১০। আমি পোল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড, নিউজীল্যাণ্ড, ইরাক, যুগোশ্লাভিয়া, ডেনমার্ক, ইজিপ্ট,

অষ্ট্রেলিয়া, ইটালী, জর্ম্মানি, সাউথ আফ্রিকা, ব্যাভেরিয়া, ফ্রান্স, স্পেন, সাদার্ণরোডেশিয়া, গ্রেটব্রিটেন ইত্যাদি মোট ১৯টা দেশের ১৯খানি টিকিটের বদলে লিথুয়ানিয়া, ল্যাটভিয়া, মন্টিনিগ্রো, ডাচইণ্ডিজ, সিরিয়া, লাক্সামবুর্গ, বৃটিশ সোমালী, ইটালিয়ন সোমালী, আবিসিনিয়া ও এলবেনিয়ার টিকিট চাই। কুমার ধীরেন্দ্রনাথ রায়, গ্রাঃ নং ২৩৬৪

১১। শিশিরকুমার সাহা—তোমার প্রেরিত টিকিট পোল্যাণ্ড অধিকৃত সেণ্ট্রাল লিথুয়ানিয়ায় ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ব্যবহার হইত।

১২। সুধীরচন্দ্র দেব—উড়োজাহাজের টিকিট বলিয়া তুমি যে টিকিট পাঠাইয়াছ উহা প্রকৃত তাহা নয়। মিশরের উড়োজাহাজের টিকিটে পিরামিডের উপর দিয়া উড়োজাহাজ উড়িয়া আসিতেছে এই দৃশ্য অঙ্কিত আছে। সাধারণ টিকিট হইতে আকারেও উহা অনেক বড়।

১৩। ধীরেন্দ্রনাথ মহান্তি—তুমি ভারতের ॥০ আনা ও ৵০ মূল্যের টিকিট যে পাঠাইয়াছি লিখিয়াছ আমরা কিন্তু তাহা পাই নাই।

১৪। ফণীন্দ্রকুমার দাস—তোমার ফ্রান্সের টিকিটখানির বদলে সুধীরচন্দ্র দেব—একখানি মিশরের টিকিট পাঠাইতেছে, তুমি তোমার টিকিটখানি ১৫ তারিখের মধ্যে সজ্যের ঠিকানায় পাঠাইয়া দিও।

১৫। সাধনানন্দ মিশ্র—পত্রের সঙ্গে টিকিটগুলি পাঠাইয়া দেওয়াই সংগ্রাহক মাত্রের কর্ত্তব্য।

১৬। উদয়ভানু সিংহ—বিনিময় সঙ্ঘের পৃষ্ঠার উপর অতিরিক্ত একটুকরা কাগজে তোমার টিকিটখানি আঁটিয়া দিয়াছিলাম, তুমি তাহা পাও নাই জানিয়া আবার একখানি পাঠাইলাম।

১৭। ইন্দ্রাণী রায়, গ্রাঃ নং ২৯১০, তোমাকে বিশ্বনাথ সেনগুপ্ত—মালয় ও যুক্তরাষ্ট্রের যে টিকিট দুইখানি পাঠাইয়াছেন, তাহা পাঠাইলাম।

১৮। এ, এন, সুলেমন—আপনি আর্জেণ্টাইনের টিকিটখানি ফিরত চাওয়ায় তাহা ফিরত পাঠাইতেছি এবং ডাকখরচ বাবদ যে ৵১০ মূল্যের ডাকটিকিট প্রেরণ করিয়াছেন তাহার বিনিময়ে কয়েকখানি টিকিট পাঠাইতেছি, আশা করি ইহাতে আপনার আপত্তি নাই।

১৯। ভারতের ডাকটিকিটের বিনিময়ে অমরলাল মুখোপাধ্যায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে টিকিট পাঠাইতেছেন—শিশিরকুমার সাহা—জাপান ২, মনোজ দত্ত—জার্মানি ২, সুধীরচন্দ্র দেব—জাপান ২, আভাস দাসগুপ্ত—জার্মানি ও জাপান ২, ধীরেন্দ্রনাথ মহান্তি—জার্মানী ২, অনিলবরণ মহান্তি—জাপান ও জার্মানি ২, বিশ্বনাথ সেনগুপ্ত—জাপান ও জার্মানি ৪, এ, এন, সুলেমন—জাপান ১ ও পার্বতীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়—জার্মানি ও ফ্রান্স ২ খানা।

২০। মুনীন্দ্রকুমার গুহ—তুমি ধীরেন্দ্রনাথ মহান্তির জন্য টিকিট পাঠাইলে না কেন? ১৫ই মের মধ্যে অবশ্য ঐগুলি পাঠাইবে।

২১। রণেন্দ্রকুমার বসু—গ্রাঃ নং ৩৪৩৮। অমরলাল তোমার বাটীতে যাইয়া দেখা করিবে বলিয়া জানাইয়াছে।

২২। আমি জাপান ১ ইয়েন, ইংলণ্ড ½ পেনি ও জার্মানী ৫ সেণ্ট মূল্যের টিকিটের বদলে জার্মান, ফ্রান্স, ইজিপ্ট বা অন্য কোন দেশের টিকিট চাই। হরেন্দ্রনাথ মিত্র গ্রাঃ নং ৩০১৯।

২৩। সিদ্ধেশ্বর মিত্র, গ্রাঃ নং ২৭১৯, নীলিমাদেবীকে তোমার টিকিটের কথা জানিয়েছি। ভারতের টিকিট ৪ খানির বদলে জাপানের টিকিট এই সঙ্গে পাঠাইলাম।

২৪। ফণীন্দ্রকুমার দাস, সিলেট—আমাদের সদস্য এ, এন, সুলেমন তোমার ঠিকানা জানিতে চাহেন 'মৈত্রী-মৈত্রী'তে উহা প্রকাশ করিও। জাপানের টিকিটের বিনিময়ে তুমি যে সিংহলের টিকিট দিতে পার বলিয়া জানাইয়াছ তাহা পাঠাইও।

২৫। অরুণলাল—তোমার পরিচয়, ঠিকানা বা গ্রাঃ নম্বর আমাদের কিছুই না জানা থাকায় টিকিট পাঠাইতে পারিতেছি না। সম্পূর্ণ নাম ও গ্রাঃ নম্বরটি জানাইও।

২৬। অসীম রাহা, বালিগঞ্জ—দুঃখের সঙ্গে আপনাকে জানাচ্ছি যে আপনি গ্রাহক না হইলে ভবিষ্যতে আর এ সকল বিভাগে যোগদিতে পারিবেন না, কারণ অপর গ্রাহকেরা এতে আপত্তি জানিয়েছে।

২৭। পরিচালকের মন্তব্য: যিনি যে টিকিট বিনিময় করিতে ইচ্ছা করিবেন পত্র সঙ্গে তাহা তাঁহাকে পাঠাইতে হইবে এবং আপনার গ্রাহক নম্বর ও ঠিকানা ঐ সঙ্গে জানাইতে হইবে, উত্তরের জন্য কোনো ডাক খরচ লওয়া হইবে না। বিনিময় হইয়া গেলে পত্রিকার মধ্যে উহার উত্তর পাইবেন, টিকিটও ঐ সঙ্গে প্রেরণ করা হইবে।

কন্যামহল

পরিচালিকা—কুমারী নীলিমা মুখোপাধ্যায

কুমারী রেবা ভদ্র (ঢাকা)

(১) এল টি পরীক্ষা উঠিয়া যাওয়ার একমাত্র কারণ মেয়েরা উচ্চতর শিক্ষা লাভার্থে সকলেই B. T পড়িতে চায়।

(২) মেয়েরা কেউ কেউ ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা দিয়াছেন এবং কৃতকার্যও হইয়াছেন। ৺রেজিনা গুহর নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ যোগ্য। I C S পরীক্ষা দিবার জন্য কেউ এ পর্যন্ত চেষ্টা করেন নাই।

কুমারী উমা ঘোষ ও অন্যান্য কন্যামহলের সভ্যাদের জানাইতেছি যে 'কন্যামহলে' প্রশ্নোত্তর প্রকাশ হইবে না। এর জন্য পাঠশালায় পৃথক বিভাগ আছে। 'প্রশ্ন' সেইখানে পাঠাইবেন। 'কন্যামহলে' শুধু মেয়েদের সমস্যামূলক আলোচনা থাকিবে।

স্বাধীনতার পথে নারী—

শ্রীশোভাবাণী রায়—রাণাঘাট।

ভাবতের আজ দুর্দিন। আজ কি? বহুদিন পূর্ব হতেই দুর্দিনের আঘাতে ভারত জর্জরিত। আজ হয়ত তাহা চরম সীমায় উপনীত। কবির দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে—

"যেদিন চৈতন্য মোর মুক্তি পেল সুপ্তি গুহা হতে ...
দেখিলাম একালের
আত্মঘাতীমূঢ় উন্মত্ততা, দেখিনু সর্বাঙ্গে তার
বিকৃতির কদর্য বিদ্রূপ।"

সকল দেশেই প্রভাত হ'ল। কিন্তু ভারত অন্ধকারেই রয়ে গেল। স্বাধীনতা অর্জন করা তারপক্ষে কেন অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে আজ? দেশের মেয়েরা পিছিয়ে আছে বলে।

নারীসমাজের জেগে ওঠা প্রয়োজন, আজ তোমরাই এই অসম্ভবকে সম্ভব করবে—তোমাদেরই সম্মিলিত শক্তি স্বাধীনতা আনতে সমর্থ হবে—তোমরাই হবে দুর্যোগ রাতের বিদ্যুৎ দীপ্তি স্বরূপ—তোমরাই কালবৈশাখীর প্রবল বাত্যার গতিবেগ পরিচালিত করবে।

আমরা লক্ষ্মীবাঈ, দুর্গাবতীর দেশের মেয়ে, সুতরাং তাদেরই মত আজ আমাদেরও স্বীয় কর্তব্যকার্যের ভার আমাদেরই গ্রহণ করতে হবে।

পৃথিবীতে রাজ্য ভাঙ্গা-গড়া নিয়তই হচ্ছে এবং আমরা প্রত্যক্ষভাবে বিস্তৃত ধনতান্ত্রিক সভ্যতার তিরোভাব বা ধ্বংস আসন্ন দেখতে পাচ্ছি। সেই ধ্বংসস্তূপ হতে নিশ্চয়ই নূতন পৃথিবীর আবির্ভাব হবে। তাকে সাদরে বরণ করে নেবার ভার—অনাগত ভবিষ্যতের অগ্রদূত-রূপে নারীসমাজকে বিশেষতঃ ছাত্রী সমাজকেই সেই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

আজ ছাত্র সমাজে যে শোচনীয় বিরোধ দেখা দিয়েছে—সেই বিরোধের অবসান ছাত্রী সমাজকেই ঘটাতে হবে। নিন্দা বা বিফলতার ভয়ে ভীত হয়ে পশ্চাৎপদ হলে চলবেনা—মনে দৃঢ় বিশ্বাস রেখে নিজেকে নিজে যাচাই করে নিয়ে অগ্রসর হতে হবে—কঠোর কর্মের সীমাহীন পথে। বিলাসিতা দূর করতে হবে—দূর করতে হবে মনের হীন বৃত্তি আর পঙ্কিলতা—তবেইত নারী সমর্থ হবে—পুরুষের মত-পার্থক্য ও জাতির সাম্প্রদায়িক অনৈক্য দূর করে স্বাধীনতা আনতে। নারীকে আজ সবলা হতে হবে—বীরাঙ্গনা হতে হবে—রক্তের তালে তালে ভৈরবের রুদ্র বীণা জাগাতে হবে—দুর্গমের দুর্গ হতে সাধনার ধন আহরণ করতে হবে।

"নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেহ নাহি দিবে অধিকার"—

প্রাণ পণ করে সেই অধিকার নারীর নিজেকেই অর্জন করতে হবে।

শিশু পালনে মাতার কর্তব্য—

সুরমা দেবী—পাবনা

মায়ের বুকেই শিশু বেড়ে ওঠে। মা শিশুর সাথে কথা কয় তা-ই শুনে শুনে শিশু কথা বলতে শেখে। শিশু মাত্রই নকলপ্রিয়, তাই মা যেমনটী বলেন তেমনটী করেই তারা বলতে শেখে। শুধু মুখের কথাই নয়, ব্যবহারেও ঠিক ঐ রকমটীই হয়। মা যদি শিশুকে কথায় কথায় প্রহার করেন। শিশুও প্রহার করতে শেখে। পিতার ব্যবহার বিশেষ কয়েকটী ক্ষেত্র ব্যতীত শিশুর মনে ছাপ দিতে পারে না—কেননা শিশুরা মাকেই বেশী আপনার ও প্রিয় মনে করে। মার উপর তারা অনেক-খানি নির্ভর করে। সেই মা যদি দুর্ব্যবহার করতে থাকেন শিশুদের প্রতি তাহলে তারাও অন্যের প্রতি ঐ রকমটীই করতে শিখবে। একদিন পথ দিয়ে যেতে

শুনি—একটী ছোট ছেলে বলছে "গাটেল মলা (ঘাটের মড়া), পেত্নী, পোলামুখী"। কাছে গিয়ে দেখলাম তার দিদি কিছুদূরে দাঁড়িয়ে হাঁসছে। মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। বুঝতে পারলুম, ছেলেটীর মা ঠিক এমনি করেই নিশ্চয়ই তার ছেলেমেয়েদের শাসন করে। তাই ছোট্ট ছেলেটী পর্য্যন্ত ঐসব ভাষা শিখেছে।

আরও কত মাকে দেখা যায় ছেলেদের হাতে ধরে চালিয়াৎ করে তোলেন। কোথাও বেড়াতে যাবার সময় ভাল করে ছেলেমেয়েকে সাজিয়ে শেষে জামার পকেট থেকে রুমালের কোনটা টেনে বার করে দেন হয়ত উল্টে, কাঁচার ফুলটি দেন হাতের মুঠোয় গুঁজে। মেয়েদের রংয়ে রং মিলিয়ে শাড়ী ব্লাউজটী পরান। মুখে পাউডার ক্রীম লাগান, ঠোঁটে রং দিয়ে দেন, চোখে ভ্রূ এঁকে দেন। এই রকম করে শিশুমনের ঝোঁকটা ষ্টাইলের ওপর গিয়ে পড়ে। বড় হয় তারা ফ্যাশান ও ষ্টাইলটাকেই বড় ভেবে। আর তাই করতেই দিন কেটে যায়।

শিশুমনকে এই রকমভাবে হাতে ধরে নষ্ট করা কোন মায়েরই উচিত নয়? মায়ের শিক্ষার উপরেই না দুনিয়ার ছেলে মেয়ের শিক্ষা নির্ভর করে?

আমার মনে হয়—দুনিয়ায় সবচেয়ে কঠিন কাজ যদি কিছু থাকে ত তা' মায়ের শিশুকে শিক্ষা দেওয়া। বড় কঠিন কাজ—অতি সাবধানে সতর্ক হয়ে চলতে হয়। তাঁদের চলার উপরেই নির্ভর করে তাঁদের ছেলেদের বড় হওয়া অথবা তলিয়ে যাওয়া।

সুতরাং বলি এমন ভাবে সবদিক ভেবে আমাদের চলা উচিত যাতে করে আমাদের সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার বুকে সহজ সবল ও স্বাভাবিক মানুষ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

প্রতিবাদ

প্রথম বাংলা সংবাদ-পত্র

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র পরিচালনা ও সম্পাদনার গৌরব পাইবার একমাত্র অধিকারী ৺গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য (ইনি হুগলী জেলার অন্তর্গত শ্রীরামপুরের অধিবাসী)। শ্রীমান সুধানাথের অনুমান ঠিক নয়। ১৮১৮ সনের ১৪ই হইতে ১৫ই মে'র মধ্যে, রামমোহনের আত্মীয় সভার সদস্য হরচন্দ্র রায় ও তদীয় বন্ধু গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য বিদেশীদের সাহায্য ও সহানুভূতি না লইয়া "বাঙ্গালা গেজেট" কলিকাতা হইতে প্রকাশ করেন। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য মহাশয় সুধু যে প্রথম বাংলা সংবাদ পত্রের সম্পাদক ছিলেন, তা নয়, কলিকাতায় প্রথম বাংলা মুদ্রাযন্ত্রও স্থাপন করেন। "বিদ্যাসুন্দর" প্রভৃতি পুস্তকের সচিত্র সুলভ সংস্করণেরও প্রথম প্রকাশক ছিলেন তিনি।

বাংলা সংবাদপত্রের সুবিখ্যাত গবেষক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত লোকও ভ্রমক্রমে 'সমাচার দর্পণে'র সম্পাদক মার্শম্যানের কথার উপর জোর দিয়াছেন —"The Bengal Gazette was published (we believe) a fortnight after the first number of our paper "—অথচ তিনি ওরিয়েণ্টাল ষ্টারের ১৬ই মে তারিখের সংবাদের—"The publication of a Bengalee News paper has been commenced." এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। সম্ভবতঃ গঙ্গাকিশোরের 'বাঙ্গালা গেজেট'কে বিনষ্ট করিবার জন্যই শ্রীরামপুরের পাদরীগণ 'বাঙ্গালা গেজেট' প্রকাশের দু তিনদিন পরেই 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশ করিয়াছিলেন। মার্শম্যান সাহেব "সমাচার দর্পণকে" প্রথম সংবাদপত্র বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি "বাঙ্গালা গেজেট" পত্রিকার প্রকাশের তারিখ প্রকাশ করেন নাই এবং "we believe" এই 'ইতিগজ' বলিলেন কেন? ইহাতে মনে হয় মার্শম্যান সত্য গোপন করিয়াছেন। এ সময়ে বাংলার অন্যান্য সাময়িক পত্রিকারা 'সমাচার দর্পণে'র মিথ্যা উক্তির প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া 'ওরিয়েণ্টাল ষ্টার' ১৬ই মে তারিখে বলিয়াছেন—"We observed with satisfaction."—পত্রিকা না দেখিয়া কেহই পর্য্যবেক্ষণের কথা লিখিতে পারেন না। ১৩৪৭ সালের প্রবাসীতে শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রাচীন নথীপত্রের সাহায্যে প্রমাণ করিয়াছেন যে "বাঙ্গালা গেজেট" বাংলায় প্রথম সংবাদপত্র।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও প্রভাত বাবুর মতে মত দিয়াছেন। ১৩৪৭ সালের ফাল্গুনের প্রবাসীর ৬৫৩ হইতে ৬৫৯ পৃষ্ঠা এবং ৬৭৫ পৃষ্ঠা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

শ্রাবণের প্রশ্ন

১ সিনেমায় ছবি কথা বলে কি করে?

—ধীরেন্দ্রনাথ মহান্তি, দাঁতন।

২ প্রত্যেক মানুষ বিভিন্ন রকমের কেন?

হৃষীকেশ কাব্যবিশারদ, দাঁতন।

৩ পারদের এমন কি গুণ আছে যার সংস্পর্শে সামান্য কাঁচ আয়নায় পরিণত হয়?

—চাঁদু মুখোপাধ্যায়, শেওড়াফুলি।

৪. বাংলায় আধুনিক কবিতার প্রবর্তক কে?

—নবনীকুমার চৌধুরী, লঙ্গাই চা বাগান।

৫. 'কারবুরেটার' কাকে বলে?

অণিমা চাটার্জি, উত্তরপাড়া।

৬ Air condition কি উপায়ে করা হয়?

—পঙ্কজমোহন, সিদ্ধার্থকুমার রায়, কোতুলপুর।

৭ বাংলা ভাষায় সব চেয়ে প্রাচীনতম মুদ্রিত পুস্তক কোন খানি? নীলিমা দেবী মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা।

৮ ভারতের কোন স্বাধীন নৃপতিকে কোন গভর্ণর জেনারেল কোন অপরাধে ফাঁসি দিয়েছিল।

—কামদারঞ্জন ভট্টাচার্য, নবপুর।

৯. বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রাচীন শিশু মাসিক কোনটি? কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, আরিয়াদহ।

১০. হিন্দুর বিবাহ রাত্রি ভিন্ন হয় না কেন?

রেবাভদ্র, ঢাকা।

১১. ভারতের প্রসিদ্ধ ক্রীকেটিয়ার সি, এস, নাইডুকে 'গুগ্‌লি-বোলার' বলে কেন? 'গুগ্‌লীবল' কী?

নীতীশরঞ্জন দে ও নিখিলরঞ্জন দে, ঢাকা।

১২. জার্মান 'স্টুকার' বিমান কি?

—সাধনানন্দ মিশ্র, মুগবেড়িয়া।

১২. ফাউণ্টেন পেন কোন দেশে কে প্রথম আবিষ্কার করেন? পরিতোষ চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা।

১৪ শীতকাল অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে নখ ও চুল বাড়ে কি?

—পশুপতি ঘোষাল, কলিকাতা।

১৫ উদয় ও অস্তকালে সূর্য রক্তিমবর্ণ ধারণ করে কেন? আরতি গুহ ও অমিতা অধিকারী, নবগ্রাম।

১৬. 'থার্মোফ্লাস্ক' কে কোনদেশে প্রথম আবিষ্কার করেন? অশ্বিনীকুমার মণ্ডল, আহমদপুর।

১৭ রেলওয়ে স্টেশনগুলির নামের উৎপত্তি কোথা থেকে? মধু ঘোষাল, মুগকল্যাণ।

১৮ ইংরেজ জাতকে 'John Bull' বলা হয় কেন?

—সাধনা বসু, বারুইপুর।

২০. আমাদের দেশের সঙ্গে অন্য দেশের পত্রাদি বিনিময়ে পোস্টেজের ডাক টিকিটের দামের এত তারতম্য দেখা যায় কেন? আভাস গুপ্ত, বেন্দা।

২১ কে সর্বপ্রথম যান বাহনের চাকায় ব্যবহারের জন্য Pneumatic Tyre উদ্ভাবন করেছিলেন?

—নীলিমা দাশ, আকোলা।

আরও অসংখ্য গ্রাহক গ্রাহিকাদের প্রশ্ন ছাপা হল না। কারণ, সেগুলি হয় বাজে প্রশ্ন, নয়ত পুরাতন প্রশ্ন, অথবা পাঠশালায় প্রকাশের অযোগ্য প্রশ্ন। এবার থেকে সকলে একাধিক Alternative প্রশ্ন পাঠাবে। তার মধ্যে যেটি উপযুক্ত বেছে নিয়ে প্রকাশ করা হবে। (ভুঃ গোঃ)

আষাঢ়ের প্রশ্নোত্তর

১। এক জাতিয় উদ্ভীদ। সাঁৎসেঁতে (damp) আবহাওয়ায় যে কোনো ভিজে কিছুর উপর জন্মায়। তাকে আমরা 'ছাতা' ধরে গেছে বলি। 'ফাঙ্গাস্' একাধিক রকমের হয়। যেমন moss, mushroom, প্রভৃতি অণুবীক্ষণের সাহায্যে লক্ষ্য করে দেখলে দেখতে পাবে ঠিক উদ্ভিদের মতই এর সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। শুধু এ গাছে কোনো ফুল বা ফল হয় না।

২। অখিল মানব চিত্তস্পর্শী বিশ্ব-জনীনতা।

৩। জন মেইস্‌ফিল্ড্।

৪। পচা ডিমের মধ্যে যে দুর্গন্ধময় দূষিত গ্যাস জন্মায় তা জলের চেয়ে লঘু বলে পচা ডিম হালকা শোলার মত জলে ভাসে।

৫। 'লর্ড আরউইন' ছিল তাঁর উপাধিমাত্র, নাম নয়। তেমনি 'ভাইকাউণ্ট হ্যালিফ্যাক্স'ও নাম নয়, তাঁর পৈতৃক উপাধি। ভারতবর্ষ থেকে ফিরে গিয়ে উত্তরাধিকার সূত্রে Vicsount Halifax উপাধি পেয়েছিলেন। লর্ড অপেক্ষা ভাইকাউণ্ট শ্রেষ্ঠতর উপাধি বলে এখন তাকে সবাই 'ভাইকাউণ্ট হ্যালিফ্যাক্স' বলেই উল্লেখ করে; যেমন, সার এস পি সিংহ 'লর্ড রায়পুর' হবার পর থেকে সবাই 'লর্ড সিনহা' বলত।

৬। শূন্যে বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পকণার সঙ্গে অজস্র ধূলি কণা বিরাজ করে। সপ্তবর্ণ সূর্য্যালোক আকাশে যখন প্রতিফলিত হয় তখন শূন্যের সেই ধূলিস্তর ও জলকণা ভেদ করে মাত্র নীলবর্ণটিই বিচ্ছুরিত হতে পারে কারণ অন্যান্য বর্ণগুলি এই আবরণ ভেদ করে বিচ্ছুরিত হতে অক্ষম, তাই আকাশ বা শূন্যলোক আমরা শুধুই নীলবর্ণ দেখি। প্রকৃতপক্ষে শূন্যলোকের কোন বর্ণ নেই।

৮। চন্দ্রকে পৃথিবী দেখতে পায় চন্দ্রের উপর সূর্য্যালোক প্রতিফলিত হয় বলে, কারণ, চন্দ্রের নিজস্ব কোন জ্যোতি নেই। চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে ঘোরে। এই প্রদক্ষিণ সম্পূর্ণ হতে ২৯॥৹ দিন সময় লাগে। পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে ঘুরতে ঘুরতে চাঁদ যেদিন ঠিক সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে এসে পড়ে সেদিন সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হয় চাঁদের উল্টো পিঠে কাজেই যে পিঠটা পৃথিবীর দিকে থাকে সে দিকটা থাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন, অর্থাৎ সেদিন আমাদের পাঁজিতে 'অমাবস্যা'। তারপর প্রতিপদ থেকে চাঁদ পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখান থেকে ঘুরতে ঘুরতে একটু একটু করে সরে যায়। অমনি তার উপর একটু একটু সূর্যের আলো এসে পড়ে। যেটুকুতে পড়ে সেইটুকু উজ্জ্বল হয়ে ওঠায় আমরা চাঁদের সেই অংশটুকু মাত্র দেখতে পাই। তারপর চাঁদ যেমন যেমন অগ্রসর হতে থাকে তত তার অধিকতর আলোকিত অংশ আমাদের দৃষ্টি গোচর হয়। এই ভাবে বাকি ১৫ দিনে চাঁদ পৃথিবীর এমন একদিকে এসে পড়ে যেখান থেকে আমরা পূর্ণ আলোকিত চন্দ্রকে দেখতে পাই।

৯। বাংলা দৈনিক ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর 'সংবাদ প্রভাকর' এবং ইংরাজি দৈনিক "Calcutta journal"

১০। তোমরা কি এত ভাল ইংরাজী শিখেছ যে এ ভাষার সবচেয়ে বড় সমালোচকের সন্ধান নিচ্ছ? এ প্রশ্ন তোমাদের উপযুক্ত নয়। তবু বলি, এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কোনও একজনকে বিশেষ করে সবচেয়ে বড় সমালোচক বলা চলে না, বড় সমালোচক বলতে জনকতকের নাম করতে হয়। যেমন Emerson, Mathew Arnold, Edmund Gosse, John Ruskin, Jonathan Swift, Thomas Carlyle, Dr. Johnson ইত্যাদি।

১১। মহর্ষি বৈশম্পায়ন পরীক্ষিত রাজার সমসাময়িক একজন অসাধারণ পণ্ডিত ও জ্ঞানী পুরুষ। মহর্ষি পরাশরের পুত্র দ্বৈপায়ন ব্যাসের শিষ্য। যজুর্বেদের প্রবক্তা বলে ইনি খ্যাত। জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ সভায় ইনি মহাভারত পাঠ করেছিলেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য এঁর শিষ্য ছিলেন। কথিত আছে কোনও কারণে গুরুর সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় যাজ্ঞবল্ক্য অধীত বিদ্যা গুরুকে প্রত্যর্পণ করে এঁর শিষ্যত্ব পরিত্যাগ করেছিলেন। ইঁনি পাণ্ডবগণের হিতৈষী ও অনুগত ছিলেন। কারণ এঁরা ছিল তাঁর গুরুবংশ।

১২। প্রশ্নটি অসম্পূর্ণ, কোন দেশের ও কোন ভাষার শ্রেষ্ঠ শিশু সাহিত্যিক লিখা নেই। যদি ধরে নেওয়া যায় বাংলাদেশের তবে উত্তর—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়।

১৩। চিনি, রেশম, কাঁচ, প্রভৃতি। এবং ভাইটামিন এ, বি, সি, ডি, ই।

১৫। জার্মানি রাসায়নিক উপায়ে নকল নীল প্রস্তুত করে খুব অল্প দামে দেওয়াতে প্রতিযোগিতায় অসমর্থ ভারতবর্ষ থেকে ব্যয়বহুল নীলের চাষ উঠে গেছে।

১৬। সমুদ্রের অগাধ ও অতল জলরাশি অবাধ বায়ুর বিপুল তাড়নে বিশাল ঢেউয়ের আকার ধারণ করে।

১৭। শ্যেন দৃষ্টি।

১৮। বজ্রপাতে নিকটস্থ বায়ুমণ্ডলে অম্লজানের আধিক্য ঘটায় দুধ টকে যায়।

১৯। হংসীর গর্ভস্থ অঙ্গতাপে ডিম নরম থাকে কিন্তু ভূমিষ্ঠ হবার পর, বাতাসের সংস্পর্শে আসায় ডিমের

নরম আবরনের কম্রতা দ্রুত হ্রাস পায়, এবং ক্যালশিয়মজাত ডিমের খোলা অবিলম্বে শক্ত হয়ে উঠে।

২০। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার পিটাব-মিটার-হপার টাইয়োলিজ প্রথম টাইপরাইটার উদ্ভাবন করেন এবং ১৮৭৩ খৃঃঅব্দে Mr. Sholes একে সুসম্পূর্ণ করেন।

২১। আলোক শিখা থেকে ছটা অবিরত বেবয়। কারণ আলোকের ধর্মই ছড়িয়ে পড়া। আমবা তা কাছ থেকে দেখতে পাই না আমাদের দৃষ্টিশক্তিব দুর্বলতার জন্য। দূরের আলোকশিখা বায়ুমণ্ডলস্থ ধূলিকণা ভেদ করে যখন আমাদেব দৃষ্টিগোচব হয় তখন আমাদেব চোখের রেটিনায় ঐ ছটার কতকটা এসে পৌছয়।

২২। ব্রাহ্মী অক্ষর রূপান্তবিত হয়ে ক্রমে বাংলা অক্ষবে পরিণত হয়েছে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে অর্থাৎ প্রায় ১৩০০ বছব আগে।

২৩। ভারতেব ছেলেমেয়েদের ভারতীয় আদর্শে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞানের সমন্বয়ে প্রকৃত শিক্ষা দিয়ে সম্পূর্ণ সুসংস্কৃত ভারতবাসী কবে গড়ে তোলা।

২৪। আবিষ্কাবক কে জানা যায় না, তবে ইংলণ্ডেই সাতআটশ' বছর আগে এ খেলা সর্বপ্রথম সুরু হয় এবং ক্রমে উন্নত ও জনপ্রিয় হয়ে উঠে।

২৫। মিশরের প্রথম ফ্যারাও সর্বপ্রথম তৈয়ার করান।

২৬। বরাহমিহির ও আর্যভট্ট প্রভৃতি ভারতীয় জ্যোতির্বিদগণ।

২৭। যেকোনো বছরের 'সরকার্স ডায়েরী' খুললেই দেখতে পাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুদ্রার নাম দেওয়া আছে। স্থানাভাবে পাঠশালায় তার পুনরাবৃত্তি করা হল না।

২৮। নিশ্চয়ই ভাল।

২৯। না।

৩০। পাঠশালায় ৩৩নং আষাঢের প্রশ্নোত্তর দেখ। পুরু ইস্পাতে গঠিত সুদৃঢ় এক সাঁজোয়া গাড়ী যার মধ্যে ছোট কামান ও মেশিনগান নিয়ে যোদ্ধারা থাকে। এর চাকা এমন বৈজ্ঞানিক উপায়ে লোহার বেল্ট দিয়ে প্রস্তুত যে, যে কোন বন্ধুর পথে সকল বাধা চূর্ণ করে যেতে পারে। বিপক্ষের কামানেব গোলায় এ গাড়ী সহজে চূর্ণ হয় না। এ এক চলন্ত লৌহ দুর্গ বিশেষ।

উত্তরদাতাদের নাম	ঠিকানা	কোন কোন প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছেন
অণিমা চ্যাটার্জি	উত্তরপাড়া	১, ২, ৩, ৫, ৬, ৭, ৯, ১১, ১২, ১৫, ১৭, ১৮, ১৯, ২৩, ২৮, ২৯, ৩০,
গেবাঙ্গ রুদ্র	চট্টগ্রাম	৩, ৪, ২৮
পঙ্কজমোহন সিদ্ধার্থকুমার বায়	কোতুলপুব	১, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ১১, ১৫, ১৯, ২০, ২৩, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০
হরিসভা	পঞ্চসার	১, ৩, ৪, ৭, ১০, ১১, ১৩, ১৫, ১৬, ১৮, ২০, ২৩, ২৫, ২৭, ১৯, ৩০
আলোককুমার ধর	ব্যারাকপুর	৩, ১৫, ২০,
দেবব্রত সিংহ	কলিকাতা	১, ৩, ১৫
মিনতি গাঙ্গুলী	দেওবন্দ	১, ৫, ৬, ৭, ১৫, ১৯, ২১, ২৮, ২৯
আর, হোসেন	হেমনগব	৬, ৭, ২৭, ২৯
কামদারঞ্জন ভট্টাচার্য	নরপুর	৭, ১৬, ২০, ২৮, ২৯,
কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	আরিয়াদহ	৭, ১৬, ১৯, ২০, ২৭, ২৮
নীতীশরঞ্জন দে ও নিখিলবঞ্জন দে	ঢাকা	১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ১৫, ১৮, ১৯, ২০, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০
সাধনানন্দ মিশ্র	মুগবেড়িয়া	১, ৭, ৮, ১২, ১৬, ১৯, ২০, ২৩, ২৭, ২৮, ৪০
শোভনলাল মুখোপাধ্যায়	টালিগঞ্জ	১, ৩, ৫, ৬, ৭, ১০, ১১, ১৩, ১৫, ১৯, ২০, ২১, ২৩, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০
পরিতোষ চট্টোপাধ্যায়	শ্যামবাজার	১, ৩, ৪, ৭, ৮, ১১, ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৯, ২৭, ২৯
পশুপতিনাথ ঘোষাল	শ্যামবাজার	১, ৩, ৪, ৭, ৮, ১১, ১২, ১৫, ১৬, ১৯, ২৭, ২৮
অনিলবরণ মহান্তি	দাঁতন	১, ৪, ৭, ১১, ১৬, ১৯, ২৮, ২৯
তারাপদ চক্রবর্তী	ফেনী	৩, ৫, ৬, ৮, ১৯, ২০, ২৫, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০
মঞ্জু দত্তগুপ্ত ও কল্যাণকুমার দত্তগুপ্ত	মজঃফরপুর	১, ৩, ৭, ১৫, ১৬, ২৯, ২৮

উত্তরদাতাদের নাম	ঠিকানা	কোন্ কোন্ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছেন
অশ্বিনীকুমার মণ্ডল	আহমদপুর	৬, ৭, ৮, ১৭, ২৯
আরতিগুহ ও অমিতা অধিকারী	নবগ্রাম	১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ১১, ১৩, ১৫, ১৮, ১৯, ২৩, ২৮, ২৯, ৩০
রেবা ভদ্র	ঢাকা	১, ৩, ৪, ৫, ৬, ১১, ১৫, ১৭, ১৯, ২০, ২১, ২৩, ২৭
নবনীকুমার চৌধুরী	লংগাই চা বাগান	৩, ৬, ৭, ৮, ১২, ১৫, ১৭, ২১, ২২, ২৩, ২৮, ২৯
রণেন্দ্রনাথ ঘোষ চৌধুরী	গ্রাঃ নং ৩১৮৭	৩, ৪, ৬, ১২, ১৫, ১৮, ১৯, ২০, ২৫, ২৯, ২৮
আভাস গুপ্ত	বেন্দা	৪, ৭, ১০, ১৫, ১৭, ১৮, ২৭, ২৮, ২৯
সাধনা বসু	বারুইপুর	১, ৪, ৬, ৭, ১৩, ১৭, ১৯, ২০, ২৮, ২৯
অশোককুমার নন্দী	কলিকাতা	৬, ৭, ১৬, ২০, ২৭
নীলিমা দাশ	বেবাব	১, ৩, ৫, ৭, ১৩, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২৩, ২৫, ২৮, ২৯
নীলিমা দেবী মুখোপাধ্যায়	কলিকাতা	১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ১০, ১১, ১৬, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০
চাঁদু মুখোপাধ্যায়, মহামায়া সাহিত্য মন্দির	শেওড়াফলি	১, ৪, ৯, ১২, ১৭, ১৮, ২২, ২৩, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০
শঙ্করনাথ ব্রজবাসী	মথুরা	৭, ২৭
সতী নিয়োগী	পাটগ্রাম	১, ২, ৩, ৪, ৬, ৭, ৮, ১২, ১৫, ১৬, ১৯, ২২, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০
পীযূষ নিয়োগী	মাণিকগঞ্জ	১, ২, ৩, ৪, ৬, ৭, ৮, ১২, ১৫, ১৬, ১৯, ২২, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০
হৃষীকেশ পানিগ্রাহী কাব্যবিশারদ	দাঁতন	১, ৪, ১০, ১১, ১২, ২৮, ২৯
বারিদ বরণ রায়	নরসিংদী	১, ৭, ৮, ১২, ১৫, ১৭, ১৯, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০
শশী ভট্টাচার্য	হেমনগব	১, ৩, ৪, ৫, ৭, ৮, ১৫, ১৮, ১৯, ২০, ২২, ২৩, ২৭, ২৮, ২৯
মনোজ দত্ত	ধলকোট	১, ৩, ৪, ৬, ৭, ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৯, ২০, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০
সেখ সিরাজুদ্দীন	খাগড়া	১, ৩, ৪, ৬, ৭, ৯, ১৫, ২০, ২১, ২৩, ২৮, ২৯
বিশ্বনাথ সেনগুপ্ত	চট্টগ্রাম	৩, ৬, ৮, ৯, ১১, ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৮, ১৯, ২০, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০
প্রভাত কিরণ দে	আহমদপুর	১, ৪, ৭, ১৩, ১৬, ১৯, ২৩, ২৭, ২৮, ২৯
সিংহ ব্রাদার্স, যোগেন্দ্র লাইব্রেরী	খুলনা	১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৭, ২৯, ৩০
রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	আরিয়াদহ	১, ৪, ৬, ৭, ৮, ১১, ১৯, ২৩, ২৭
সমীর চৌধুরী	কটক	১, ৩, ৪, ৭, ১৭, ২৭, ২৮, ২৯

বিশেষ দ্রষ্টব্য—প্রশ্নোত্তরের সঙ্গে প্রত্যেক পাতায় নাম ঠিকানা ও গ্রাহক নম্বর না থাকায় এবারও অনেকের সুলিখিত সঠিক উত্তরগুলি পাঠশালায় প্রকাশ করতে পারা গেল না। এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। প্রশ্নোত্তর পাঠাবার সময় প্রত্যেকে মনে করে উত্তরের কাগজে নাম ঠিকানা ও গ্রাহক নম্বর অতি অবশ্য দিও। ভুঃ গোঃ

(গ্রন্থাগারিক)

এদেশে-ওদেশে

রচয়িতা : শ্রীদিলীপকুমার রায়

প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ

১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

২৭৩ পৃষ্ঠা, এণ্টিক কাগজে ছাপা, বোর্ড বাঁধা, সুদৃশ্য বই,

মূল্য ২৸০ আনা।

এদেশকে সবচেয়ে বেশি ওদেশের কথা শুনিয়েছেন দিলীপকুমার। গল্পে উপন্যাসে প্রবন্ধে-নিবন্ধে চিঠিপত্রে ও আলাপ-আলোচনায়, এমন কি—মাঝে মাঝে কাব্য ও সঙ্গীতের ভিতর দিয়েও। এ'দেশ নিজেকেই ভাল করে জানেনা। নিজের কি অভাব অভিযোগ, নিজের কি দৈন্য ও দুর্বলতা—নিজের কি ঐশ্বর্য ও সম্পদ—সে সম্বন্ধেও তার পুরোপুরি কোনো সুস্পষ্ট ধারণা নেই। সুতরাং, ওদেশ সম্বন্ধে যে এদেশ আরও অজ্ঞ—একথা অস্বীকার করা চলে না। এখনও এদেশে এমন অনেক লেখা পড়া জানা তথাকথিত শিক্ষিত লোক আছেন, রবীন্দ্রনাথের রচনার সঙ্গে যাঁদের কোনো পরিচয় নেই। সেদিন কিশোর বঙ্গ রবীন্দ্র জয়োৎসব উপলক্ষে এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে অনুষ্ঠিত কবির 'ডাকঘর' নাটকের অভিনয় দেখতে গিয়ে পাশের আসনের এক দর্শকের প্রশ্নে বিস্মিত হলুম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন "নাটকখানি কি গিরীশচন্দ্র ঘোষের লেখা? অথচ তিনি এম-এ, বি এল, এবং কলিকাতা হাই-কোর্টের একজন প্রতিষ্ঠিত উকিল। সেদিন পয়লা আষাঢ় একটি 'মেঘদূত উৎসব সভায়' একজন কবি রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' কবিতাটি আবৃত্তি করছিলেন। উল্লেখযোগ্য উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করলেন "এটি কার লেখা?" আপনারা শুনে আশ্চর্য্য হবেন যে ইনি একাধিক সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একজন উৎসাহী কর্মী ইনি এবং একখানি মাসিকপত্র পরিচালনার সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট। সুতরাং আমাদের প্রত্যেককে যে এদেশের এবং ওদেশের কথা শোনাবার খুবই প্রয়োজন রয়েছে এতে আর কোনো সন্দেহ নেই। দিলীপকুমার সেই দুরূহ কর্তব্যভার আপন স্কন্ধে নিয়ে অতি সুচারুরূপে যে তা' সম্পন্ন করছেন তার উজ্জল প্রমাণ কিছুদিন পূর্বে প্রকাশিত দিলীপকুমারের 'তীর্থঙ্কর' এবং অধুনা প্রকাশিত এই আলোচ্য গ্রন্থখানি।

ফরাসী মনীষী দুহামেল (George Duhamel) বিদুষী গায়িকা ম্যাদাম কাল্‌ভে (Emina Calve), সুরসিক দার্শনিক পল রিশার (Paul Richard) বিশ্ববিশ্রুত সাহিত্যিক অলডাস হক্সলি (Auldus Huxley) এঁদের সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে কজনের ভালরকম জানা আছে? সুগায়ক ও সুলেখক সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের নাম হয়ত কেউ কেউ শুনেছেন, সুরেলা কবি অতুলপ্রসাদ সেন হয়ত তাঁর সুন্দর গানের ভিতর দিয়ে অনেকের কাছে পৌঁছেছেন, কিন্তু, এঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় বা অন্তরঙ্গতা এদেশের কজনের হয়েছে? দিলখোলা দিলীপ কুমার এঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে যে দিলখোলা অলাপ পরিচয় করেছিলেন 'এদেশে ও'দেশে' সে পরিচয় দিলখুলে লিখে আমাদের সঙ্গেও তিনি ওদের সকলের অন্তরঙ্গ পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, যা আর কেউ এমন ঘনিষ্টতরভাবে করে দিতে পারত না। এছাড়া গ্রন্থখানিতে আছে 'ছিটেফোঁটা' 'জল্পনা-কল্পনা' যার মধ্যে পাওয়া যায় বলশেভিকবাদের ভিতরের কথা, য়ুরোপের সভ্যতা, দর্শন, শিল্প ও সমাজের নানা ইঙ্গিত। "শিশু দিগ্বিজয়ী" কবিতাটি এক কথায় সারপ্রাইজ। "কলির গরুড়" যেমনি হাসায় তেমনি কিন্তু 'বিমান আতঙ্ক' জাগায়। এটা কিন্তু, একেবারেই ঠিক নয়। সমালোচকের দীর্ঘ বিমান-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আছে, এবং এ্যাটলাণ্টিক ক্রপার ও-পার হয়েছেন এমন একাধিক বৈমানিকের সঙ্গেও তাঁর জানা আছে। সকলেই একবাক্যে এই কথাই বলেন যে দূর পাল্লায় যাতায়াতের পক্ষে এর চেয়ে আরাম-দায়ক যান বাহন এ পর্যন্ত মানুষ আর আবিষ্কার করতে পারেনি। 'বলশেভিজম' সম্বন্ধে লেখক তাঁর যে পরিবর্তিত মতবাদ প্রচার করেছেন তা ও বিচার ও তর্ক সাপেক্ষ। বর্তমানে র্যাশায় তা' যেরূপ নিয়েই দেখা দিয়ে থাক না। বিশ্বের ভাবী মানবগোষ্ঠীর শান্তি ও সদ্ভাবে থাকবার আদর্শ হিসাবে এর সার্থকতা অনস্বীকার্য।

রোমাঞ্চকর কাহিনী

রচয়িতা : শ্রীনিখিলেশ সেন

প্রকাশক : দেবসাহিত্য কুটির, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

মূল্য ।৹ আনা।

বাংলা সাহিত্যে কিছুকাল ধরে (বটতলার ডিকেকটিভ উপন্যাসের শিশু সংস্করণ শ্রেণী) সস্তার বাজে আজগুবি রোমাঞ্চকর কাহিনীতে ছেলেদের বইয়ের বাজার গুলজার হয়ে উঠেছে। ঐ সকল বইয়ের মধ্যে না আছে সুস্থ সুন্দর উদার কল্পনাবৃত্তি না আছে সত্য শিক্ষা বা সারবস্তু। এই বইখানি নামে "রোমাঞ্চকর কাহিনী" হলেও ঐ শ্রেণীর বই নয় দেখে আশ্বস্ত হয়েছি। এর মধ্যে আদৌ গাঁজাখুরি গল্প নেই। "রোমাঞ্চকর কাহিনী" "ভুতুড়ে কাণ্ড" "ঝড়েররাতে" প্রভৃতি গল্পগুলি ছেলেদের কৌতূহল ও উত্তেজনা সৃষ্টি করলেও শেষ পর্য্যন্ত ঘটনার মূল কারণ স্বাভাবিক সত্য এবং বৈজ্ঞানিক সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। সুতরাং এ বই পড়ে ভূত প্রেতের ভয় এবং অসার সস্তা গোয়েন্দা কাহিনীর কল্পনায় ছেলেদের মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠবেনা, বরং প্রসারিত ও বলিষ্ঠ হবে। বইখানির ছাপা বাঁধাই ভাল, ছবিও আছে।

শ্রাবণ—১৩৪৮

নিয়মাবলী—(১) ধাঁধাঁ-সম্পাদকের মতে শব্দসন্ধানের যেটি সবচেয়ে নির্দোষ ও নির্ভুল সমাধান,—তার সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে উত্তর মেলা চাই। নির্ভুল সমাধানটি পরের মাসের পাঠশালায় প্রকাশিত হবে। (২) সাদা ঘরগুলির প্রত্যেকটিতে একটি ক'রে সংযুক্ত বা অসংযুক্ত অক্ষর বসবে। (৩) প্রতি সংখ্যার প্রতিযোগিতা-কুপনখানি কেটে ভর্তি ক'রে পাঠাবে সেই মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে। দেরি হ'লেই বাতিল। খামের উপরে ঠিকানা লিখবে—'শব্দ সন্ধান', পাঠশালা কার্যালয়, ৩০ কনওআলিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। (৪) হরফগুলি সব পরিষ্কার হওয়া চাই—কাটাকুটি চলবে না। বানান ভুল হলে ভুল ধরা হবে। (৫) যে কোন পাঠক পাঠিকা যতগুলি ইচ্ছা কুপন পাঠাতে পারবে। (৬) 'শব্দ-সন্ধান'-সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ব'লে মেনে নিতে হবে।

সঙ্কেতসূত্র

—পাশাপাশি—

১। এই ছেলেটি এক সময় যমরাজকে জব্দ করেছিল।
৪। ছেলেদের "—" করা ভাল নয়।
৬। এখানে এ রকম হওয়াই স্বাভাবিক।
৭। এ অবস্থা অসহ্য।
৮। এক সময় এদেশে কৃষ্ণপক্ষেই পূর্ণচন্দ্র উদয় হয়েছিল।
১০। এ রকম যন্ত্র নিয়ে কারখানার কাজ চলেনা।
১২। পলতার জাত।
১৪। এ দেখেও অনেকে ভয়ে পালায়।
১৬। জাহাজের খালাসী।
১৮। ফুটো।
২২। কৃষ্ণ লাভের প্রকৃষ্ট উপায়।
২৪। প্রতিজ্ঞা।
২৬। পাখীর ডানা।
২৮। জলযান।
২৯। আত্মরক্ষা ও শত্রু নিধনের অস্ত্র।
৩০। পলি।
৩২। গুম্ভ।

৩৩। কাঁসার একটি বিশিষ্ট উপাদান।
৩৪। এ রকম কোনও গুণ থাকলে সহজেই খুঁজে বার করা যায়।

—উপর থেকে নীচে—

১। ইনিই দেশের প্রধান।
২। এ এমন একটা আবরণ যে এর ভিতর থেকে বাইরেটা বেশ দেখা যায় অথচ বাইরে থেকে ভিতরে কিছু দেখা যায় না।
৩। এ যে কেমন সেটা সহজেই বোঝা যায়।
৪। এরা সবাই একে একে আসতে একটি বছর লেগে যায়।
৫। শর-নিক্ষেপক যন্ত্রবিশেষ।
৭। বান্ধব।
৯। পারস্য দেশীয় মুদ্রা।
১১। এ মাঝদরিয়ায় নৌকা ঠেলে দিতে পারে।
১৩। সঙ্গীতের অঙ্গ।
১৫। এ এমন উল্টো প্রকৃতির মানুষ যে একে সহজে ঘর থেকে বার করা যায় না।
১৭। ইনি চিরকুমার।
১৯। টাকাত এরই।
২০। ছোটরা যা শুনতে খুব ভালবাসে।
২১। বিস্তৃত।
২৩। হৃষ্ট।
২৫। এ সোজা হলেই অমনি মৃত্যু।
২৬। এ এক রকম শাক।
২৭। চকিত।
৩১। এদিনে ছুটি থাকলেও এর ছুটি নেই।

আষাঢের শব্দ-সন্ধানের ফলাফল

এবার শব্দ-সন্ধানে পাঠশালার গ্রাহক গ্রাহিকারা যুদ্ধের সম্বন্ধে যে বিশেষ জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন তা যথার্থই প্রশংসনীয়। কেবল যুদ্ধ সম্বন্ধেই নয়, এবার শব্দ-সন্ধানের উদ্দেশ্য ছিল য়ুরোপের ইতিহাস ভূগোল ও মানচিত্র সম্বন্ধে ছেলে মেয়েদের শিক্ষা কতদূর অগ্রসর হয়েছে সেটা পরীক্ষা করা। সুখের বিষয় যে এই পরীক্ষার ফলাফল অত্যন্ত সন্তোষ জনক হয়েছে। অন্তত জন সম্পূর্ণ নির্ভুল উত্তর দিতে পেরেছেন। এদের ৎধ্যে শব্দ-সন্ধানের পুরস্কার সমান ভাবে ভাগ করে দেওয়া হবে। এবার অধিকাংশ প্রতিযোগীই মাত্র একটি বা ছুটি ভুল করেছেন, এটাও কম গৌরবের কথা নয়। বানান সম্বন্ধে 'শ-র' এবার কারুরই ভুল ধরেন নি, কিন্তু, উচ্চারণ সম্বন্ধে যাঁরা একটু বেশী তফাৎ করে ফেলেছেন তারা পরিত্রাণ পান নি। যেমন নরওয়ের পশ্চিম দক্ষিণের খাঁড়ি-বন্দর Verde ক যারা 'ভার্দা''ভার্দো' বা 'ভার্দে' লিখেছেন তাঁরা ভুল করেছেন,বলেই ধরা হয়েছে,'ব্লিট্‌জ্‌ক্রীগ্‌'ব্যাপারে কেউ কেউ শ-রকে হতাশ করেছেন এবং 'গয়ানা'র অনেকেই সন্ধান করতে পারেন নি। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় 'গোয়েবিং'কে কেউ কেউ 'গেয়েব্ল' বলে চালাতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু এই নাজী প্রচারকের নাম ত 'গেয়েব্ল' নয়, তাঁর নাম যে 'গোয়েব্লস্‌' এ কথা তাঁদের ভেবে দেখা উচিত ছিল। যাই হোক, এবার শব্দ-সন্ধানের ফলাফল দেখে শ-র পাঠশালার পাঠক পাঠিকাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হয়ে উঠেছেন।

গত মাসে 'মোণ্ডা' ও 'ডাণ্ডা'র সঙ্গে মিলের খাতিরে 'গুণ্ডা' শব্দটি নিছক রহস্যচ্ছলেই ব্যবহার করা হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও চট্টগ্রামের দিঙ্‌নাগেরা অনেকেই এতে ক্ষুণ্ণ হয়েছেন এবং সম্পাদক মহাশয়ের কাছে শ-রর বিরুদ্ধে কঠোর অভিযোগ করেছেন। সম্পাদকের নিকট শ-র অভিযোগের কৈফিৎ দিয়েছে, চিঠিপত্রে তা দেখতে পাবে। রসবোধের শোচনীয় অভাব বশতঃ যাঁরা নির্দোষ পরিহাসকে অপমান বলে ভুল করে ক্ষুণ্ণ হয়েছেন শ-র তাদের সকলের কাছে বিনাসর্তে ক্ষমা প্রার্থনা করছে।

লঙ্গাই চাঁদক্ষীরার নবনীকুমার চৌধুরী সেই 'সুনির্মল' ও 'সুশীতল' শব্দ ছুটি নিয়ে তর্কটি পুনরুত্থাপন করেছেন—এবং 'সুশীতলের' চেয়ে 'সুনির্মল'কেই অধিকতর যোগ্য বলে রায় দিয়েছেন। এ তর্ক যদিও শেষ হয়ে গেছে, তবু চৌধুরী মশায়ের মনের সংশয়টা নির্মূল করবার জন্য বলছি—তৃষ্ণায় মানুষ যখন কাতর হয়ে পড়ে তখন 'সুনির্মল' জলের অপেক্ষায় থাকতে পারে না। সাহানশা বাদসা আলমগীরকেও একদা তৃষ্ণা নিবারণের জন্য নর্দমার পঙ্কিল জল পান করতে হয়েছিল। সুতরাং তৃষ্ণা নিবারণের পক্ষে 'সুশীতল' জলই প্রশস্ত এবং তা যদি 'সুনির্মল' হয় তাহলে আরও ভাল। শহরের বাইরে সুদূর পল্লীতে যাঁরা বাস করেন এবং চৈত্র বৈশাখের দারুণ রৌদ্রে জলাভাবে কষ্ট পান তাদের দুরবস্থ পুষ্করিণীর কাদা খুঁড়ে জল ছেঁচে নিয়ে যেতে দেখেছি। 'সুনির্মল' জল যেখানে দুর্লভ সেখানে তৃষ্ণা নিবারণের পক্ষে 'সুশীতল' জলই কি যথেষ্ট নয়?

শ্রীমান্‌ অশ্বিনীকুমার মণ্ডল 'শ-র'র উপর দেখছি অধিকতর অপ্রসন্ন হয়ে উঠেছেন। তিনি কুমারী সাধনা বসুর লিখিত পত্র দেখতে এবং তার ঠিকানা জানতে চেয়েছেন। এবং 'পাঠশালা' যে রসিকতা করবার উপযুক্ত স্থান নয় একথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে 'শ-র'কে ভর্ৎসনা করে বলেছেন রসিকতা চলতে পারে শুধু নাট্যশালায়। শুধু তাই নয়, তিনি কষ্ট করে পাঠশালা থেকে 'শ-র'র চৈত্রের উক্তি উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে 'শ-র' ঘোষণা করেছিলেন 'তিনি বড় বে-রসিক লোক' অথচ 'আষাঢে' বলছেন তিনি 'বে-রসিক আখ্যা নিতে রাজি নন' অতএব অশ্বিনীবাবু এক

বিষম সমস্যায় পড়েছেন 'শ-র'র কোন রূপটি আসল সেটা নির্ণয় করতে না পেরে। 'শ-র' তাঁকে করজোড়ে সবিনয়ে জানাচ্ছে যে তিনি অশ্বিনীবাবুর ন্যায় অরসিকদের কাছে অবশ্যই 'বেরসিক', এবং যাঁরা পরিহাস বোঝেন এবং তাতে আনন্দ পান তাঁদের কাছে তিনি 'সুরসিক' বলেই পরিচিত হবার চেষ্টা করেন। কুমারী সাধনা বসু যদি অনুমতি দেন তাহলে তাঁর পত্র ও ঠিকানা অশ্বিনী বাবুকে পাঠাতে পারি।

নির্ভুল উত্তর

অমলেন্দু ভট্টাচার্য, কলিকাতা। ইন্দ্রাণী রায়, পাটনা। জ্ঞানরঞ্জন চক্রবর্তী, ঢাকা। প্রতিভা মিত্র, আরিয়াদহ। প্রিয়ব্রত ঘোষ, ব্যাঙ্গালোর। ভুপেন্দ্রনাথ কানুনগো, ঢাকা।

এক ভুল

পশুপতি ঘোষাল, কলিকাতা। বারিদবরণ রায়, ঢাকা। মুহম্মদ মোসলেম আলী, স্বরূপকাঠি। অমিয় ও অজয়কুমার, বেরিলী। তারাপদ চক্রবর্তী, ফেণী। দয়ালরাম বসু রায়চৌধুরী, তেজগাঁ। নীতীশরঞ্জন দে, ঢাকা। অরূপকুমার দাশ, নাগপুর। অমিতাভ চৌধুরী। বালিগঞ্জ। নীহারকান্তি ঘোষদস্তিদার, বালিগঞ্জ। শান্তিসুধা সেন ও বীরেন সেন, বরিশাল। রাজকুমার বসু, কদমতলা। নীলিমা দাশ, আকোলা। শশী ভট্টাচায, হেমনগর। বাণীতলা এথলেটিক ক্লাব, বাণীতলা। শুভব্রত বসু, বালিগঞ্জ। বিধুভূষণ রায় ও গৌরিপ্রসাদ রায়, পানিহাটি। অমলকুমার দত্ত ও নীলিমা দত্ত, কলিকাতা। ভুপেন্দ্রনাথ বসু, মেমারি। সুনীলকুমার বন্দোপাধ্যায়, রামপুর হাট। হরিপদ চক্রবর্তী, ত্রিপুরা। কল্যাণকুমার দত্তগুপ্ত, মজঃফরপুর। শান্তি গুপ্তা, জামসেদপুর। অরুণকৃষ্ণ মিত্র, মজঃফরপুর। শিশিরকুমার সেনগুপ্ত, কলিকাতা। অজিতকুমার ঘোষ, কলিকাতা। অমলকুমার চক্রবর্তী, কলিকাতা। পাঁচুগোপাল বসু, বারাসাত। সাধনা বসু, বারুইপুর। পুষ্প ঘোষ, বালিগঞ্জ। সমু মিত্র, কলিকাতা। মিস্ 'নাইভল' সিংহ, কলিকাতা। বিশ্বনাথ ও বৈদ্যনাথ সিংহ, খুলনা। মিনতি গাঙ্গুলী, দেওবন্দ। দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়, দিনাজপুর। হৃষীকেশ ভৌমিক, বরিশাল। স্টুডেন্টস্ কালচারাল এসোসিয়েশন, বাঁকীপুর। দীলিপকুমার সেন, ভবানীপুর। ভুপেন্দ্রনাথ কানুনগো, ঢাকা। সুনীলপাল ও দিলীপ বসু, জামশেদপুর। নির্মলেন্দু গুহ, পাহাড়তলি। পীযুষকুমার নিয়োগী, মাণিকগঞ্জ। সতী নিয়োগী, পাটগ্রাম।

দুই ভুল

হেনা রাহা, বরকান্তা। অবনীভূষণ বেরা, ঘোলদিগরুই। অরুণলাল মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা। জয়ন্তী ও রাহুল, মেদিনীপুর। পঙ্কজমোহন সিদ্ধার্থকুমার রায়, কোতুলপুর। নির্মাল্য ঘোষাল, কলিকাতা। মঞ্জুলেখা সান্যাল, বেহার গভর্ণরস্‌ক্যাম্প। সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, কলিকাতা। সাগরিকা সরকার, শালিখা। সুলেখা বসু, বালিগঞ্জ। ঝেণ্টু পেণ্টু বেণ্টু কড়ি, রামপুর হাট। গীতা, ও বাদল পালিত, আসানসোল। প্রণবকুমার মুখার্জি, সৈয়দপুর। রণেন্দ্রকুমার বসু, কলিকাতা। উদয়ভানু সিংহ, কলিকাতা। রণেন্দ্রকৃষ্ণ সরকার, কলিকাতা। ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, জামশেদপুর। কল্পনা চৌধুরী, বায়কালী। মঞ্জীরা সাহা, কালিঘাট। রিষড়া ধয়েজ লাইব্রেরীর সভ্যবৃন্দ, রিষড়া। রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, হরিনাভি। মধু ঘোষাল, মৃগ কল্যাণ। শঙ্কর রায় ও সত্য মুখার্জি, রাজসাহী। মণীন্দ্রমোহন মজুমদার, পুরুলিয়া। হরিকমল পুরকায়স্থ, শিলং। সুনীতলাল মুখোপাধ্যায়, শিবপুর।

নির্ভুল সমাধান—আষাঢ়, ১৩৪৭

তিন ভুল

আরতিগুহ ও অমিতা অধিকারী, নবগ্রাম। এ, এন্, সুলেইমান, সীলেট। পরশুরাম তেওয়ারী ও 'কুলি' বিশ্বেশ্বর মিত্র, মিরবাজার। সুধীরকুমার ঘোষ, শিবপুর। নবনীকুমার চৌধুরী, লংগাই চা বাগান। রণজিৎকুমার রায়, কলিকাতা। রবীন্দ্রনাথ মল্লিক, জলপাইগুড়ি। রুনু ঘটক, মালদহ। বিজলীপ্রভা দেবী, জয়নগর মজিলপুর। মহামায়া সাহিত্য মন্দিরের সভ্যবৃন্দ, বৈদ্যবাটী। মনোজ দত্ত, চট্টগ্রাম। ধ্রুবরঞ্জন সরকার ও সত্যরঞ্জন সরকার,

হাওড়া। অসিতকুমার রায়, আসানসোল। মহিবুবরহমান চৌধুরী, সোলেট। অনিলবরণ ঘোষ, দাবড়া। উমা বাগচী, বায়পুর, সিপি। অশোকচন্দ্রগুহ, ববিশাল। শশরধর ও মোহন, সুকুমার, ঈশ্বন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। ববীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, আবিযাদহ। সিদ্ধেশ্বব মিত্র, কলিকাতা।

চার ভুল

আভাসচন্দ্র দাশগুপ্ত, বেন্দা। সাধনানন্দ মিশ্র, মুগবেড়িয়া। অমিয়কুমাব ঘোষাল, আবিয়াদহ। সুধীবচন্দ্র দেববায়, হবীগঞ্জ। আমলা হিন্দু বোডিংয়েব ছাত্রবৃন্দ, আমলাসদব। সেখ সিবাজুদ্দিন, খাগড়া। অশোককুমার নন্দী, কলিকাতা। বেণুকা চাটার্জি, ইটালি। প্রভাসচন্দ্র মুখার্জি, দিল্লী। বণজিৎ দাশগুপ্ত, কলিকাতা। সরোজবিহাবী ভাদুড়ী, কলিকাতা। শৈলেন্দ্রকুমাব বায়, কলিকাতা।

পাঁচ ভুল

বেবা ভদ্র, ঢাকা। গৌরাঙ্গ রুদ্র, চট্টগ্রাম। "অসোনীবিপ্র", যদু। শোভনলাল মুখোপাধ্যায়, টালিগঞ্জ। শর্মিষ্ঠা সবকাব, নিউদিল্লী।

ছয় ভুল

ওয়াহেদ আলা মিয়া, ইটাচালি। আইভিলতা ঘোষ, জামশেদপুর। নীহাব ব্যানার্জি, জব্বলপুর।

সাত ভুল

বাসন্তী সিংহ, কলিকাতা। প্রতিমা চ্যাটার্জি, জব্বলপুব।

আট ভুল

অনিলকুমাব দে, সোনাবপুব। "হবিসভা", মুন্সিগঞ্জ।

নয় ভুল

শোভাবাণী বায়, নদীয়া।

দশ ভুল

হেমচন্দ্র মুখার্জি, বহরমপুব।

ভোটের ফলাফল

প্রথম প্রস্তাব—

প্রশ্নোত্তব তুলে দেওযার স্বপক্ষে ভোট দিয়েছেন মাত্র ৪৬ জন গ্রাহক গ্রাহিকা, কিন্তু, প্রশ্নোত্তব তুলে দেওয়াব বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন ৯১ জন—অর্থাৎ প্রায় ডবলেব কাছা কাছি। সুতবাং প্রশ্নোত্তব পাঠশালাব বয়ে গেল। কিন্তু মনে রাখতে হবে অতঃপব কোনো বাজে প্রশ্ন, পুবাতন প্রশ্ন, এবং যে সকল প্রশ্ন পাঠশালাব গ্রাহক গ্রাহিকাদেব জ্ঞানেব সীমাব বাইবে তা পত্রস্থ কবা হবে না। যেমন এবাব একটি প্রশ্ন এসেছিল—ভাবতীয় দর্শন ও পাশ্চাত্য দর্শনেব মূলগত প্রভেদ কি? ইত্যাদি।

দ্বিতীয় প্রস্তাব—

'কিশোব সভা' প্রবর্তনেব স্বপক্ষে ৭৯ জন ভোট দিয়েছেন এবং বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন মাত্র ৩০ জন সুতবাং আগামী মাস থেকে পাঠশালার পৃষ্ঠায় 'কিশোব সভা' বসবে। গ্রাহক গ্রাহিকাদেব বচনা অতঃপব 'কিশোব সভা' ও 'কন্যা মহলে'ই পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হবে।

তৃতীয় প্রস্তাব—

পাঠশালাকে গ্রাহক গ্রাহিকাদের নিজস্ব পত্রিকায় পবিণত কবাব স্বপক্ষে ৬৯ জন ভোট দিয়েছেন এবং বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন ৬৩ জন। 'কিশোর সভা' 'কন্যা মহল' থাকলেই পাঠশালা গ্রাহক গ্রাহিকাদেব নিজস্ব পত্রিকাব গৌববই দাবী করতে পাববে। সেই সঙ্গে বিশেষজ্ঞদেব গল্প, কবিতা প্রবন্ধও নিয়মিত থাকিবে। সুতবাং কোনো পক্ষেবই আপাত্তব কাবণ বইল না।

পরীক্ষার পরীক্ষা

জ্যৈষ্ঠেব পাঠশালায় কুমাবী অরণা চ্যাটার্জির 'পবীক্ষা' নামে যে গল্পটী প্রকাশিত হয়েছিল তাব সম্বন্ধে আমাদের নিম্নলিখিত গ্রাহক গ্রাহিকারা জানিয়েছেন যে এ গল্পটি স্কুলপাঠ্য বই থেকে অপহরণ করে স্ববচিত বলে চালান হয়েছে। ছোটছোট ছেলেমেয়েদেব পরস্বাপহবণ প্রবৃত্তি জাতীয়চবিত্রেব কলঙ্কস্বরূপ। এ অপবাধ যেমনি লজ্জার তেমনি দুঃখের।

অণিমা চ্যাটার্জি, উত্তবপাড়া ('তোষিণী' ১ম শ্রেণীব পাঠ্য পুস্তক, শ্রীকৃষ্ণদয়াল বসু প্রণীত)

প্রীতীন্দ্র চৌধুরী, আলিপুর, ৺জলধর সেনের গল্প। ("ললিতপাঠ" অপরাজিতা বায় ও হেরম্বনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত)

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শেওড়াফুলি ("ললিত পাঠ" চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্য, প্রকাশক গোল্ড কুইন এণ্ড কোং)

অক্ষর-ক্রীড়া বা হরফের হের ফের

আষাঢ়ের উত্তর

ইংরাজী অক্ষর A থেকে Z পর্যন্ত প্রত্যেকটি নিয়ে এমন ভাবে সাজিয়ে একটি পদ তৈয়ার করতে বলা হয়েছিল যার বেশ সহজ সরল অর্থও বোঝা যাবে। আহমদপুরের শ্রীমান অশ্বিনী কুমার মণ্ডল মাত্র এই টুকুই চেয়েছিলেন, কিন্তু এ অতি সহজেই করা যায় বলে পাঁচা সম্পাদক তার মধ্যে একটা শর্ত আরোপ করেছিলেন এই যে—২৬টি অক্ষরই থাকবে বটে, কিন্তু কোনোটিও এক বারের বেশি ব্যবহার করতে পারবে না।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে পাঠশালার কোনো বুদ্ধিমান পাঠক বা বুদ্ধিমতী পাঠিকা এ শর্ত পালন করে একটি পদ রচনা করতে পারেননি। শ্রীমান অশ্বিনীকুমার মণ্ডলের উত্তর ছিল—

"The quick brown fox jumps over a lazy dog" এর মধ্যে a, e, o, r, u একাধিক বার ব্যবহার করা হয়েছে।

কলিকাতার শ্রীমান পবিতোষ চট্টোপাধ্যায় ও পশুপতিনাথ ঘোষাল উত্তর দিয়েছেন—

"Pack my box with five dozens of liquor Jugs" এর মধ্যেও i, e, o, u একাধিকবার ব্যবহার করা হয়েছে।

কিন্তু কোনো অক্ষরটি একবারের বেশি ব্যবহার না করেও যে একাধিক পদ তৈরী করা যায় তার দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হল।

1 "D V Pike flung J Q Schwartz my box"

2. J Q Plow might vex Z. D Burk's fancy"

শ্রাবণের অক্ষর ক্রীড়া

"একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল" এই পদটির মধ্যে যতগুলি হরফ আছে তার প্রত্যেকটি নিয়ে এমন ভাবে আর একটি পদ তৈয়ারী কর যার মানে কথামালা পড়া ছেলেরাও বুঝতে পারে।

রচনা প্রতিযোগিতা

১৩৪৭ সালের আশ্বিন থেকে শ্রাবণ ১৩৪৮ পর্যন্ত পাঠশালায় যতগুলি গল্প বেরিয়েছে তার মধ্যে সব চেয়ে ভাল কোনটি এবং কেন ভাল সে সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখে পাঠাও। প্রবন্ধটি সাধারণ এক্সেরসাইজ বুকের চার পাতার বেশী যেন না হয়। ১৫ই শ্রাবণের মধ্যে পাঠাতে হবে। গতমাসের প্রতিযোগিতায় যতগুলি প্রবন্ধ পাওয়া গেছে তার মধ্যে কোনটিই পুরস্কার যোগ্য রচনা বলে গণ্য হয়নি। কেবলমাত্র হাওড়ার ধ্রুবরঞ্জন সরকার ও নিউ দিল্লীর কুমারী শর্মিষ্ঠা সরকারের রচনা ওরই মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হয়েছে বলা যেতে পারে।

পত্রী-মৈত্রী

শ্রীমতী আরতি গুহ Co. Sj. Narendra Kumar Guha Esq. "Krishna Studio" Vill. & Po Nabagram Dst. Mymensingh.

শ্রীপশুপতিনাথ ঘোষাল Co. Nalin Behari Ghosal Esq. 2/1 Jadu Nath Mittra Lane Shambazar Calcutta

শ্রীবারিদবরণ রায়, নরসিংদী পোঃ, আটার পাড়া, ঢাকা।

কুমারী মঞ্জুলেখা সান্যাল, Co. H. K. Sanyal Esq Behar Governor's Camp P o.

শ্রীগৌরাঙ্গ রুদ্র, প্রবর্তক বিদ্যাপীঠ, চট্টগ্রাম।

কুমারী প্রতিমা চাটার্জি, 193 North Road Napier Town Jubbulpore

কুমারী নীলিমা মুখার্জি, 1/1E Huritucky Bagan Lane, Calcutta

ধ্রুবরঞ্জন সরকার, 23, Nilmoni Mallik Lane, Howrah
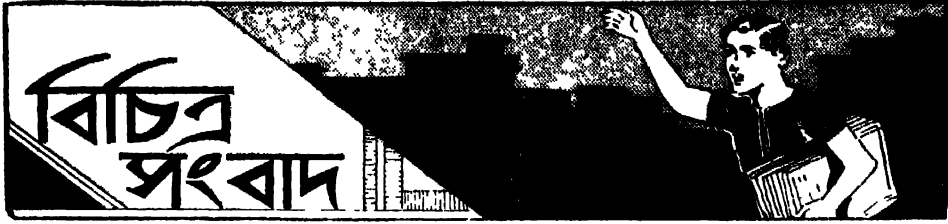
শ্রীঅমলেন্দু রুদ্র

পৃথিবীর সবচেয়ে বড কুকুর হচ্ছে St Bernard নাক থেকে লেজ পর্যন্ত প্রায় ৭ ফুট ২ ইঞ্চি লম্বা হয়। উচ্চতায় ৩ ফুট এবং ওজন প্রায় ৩ মণ ৬ সের।

*

কাথিবাড়ের পুলিশ অর্জুন ডাঙ্গার—এর গোঁফ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে লম্বা—লম্বায় ১০৩ ইঞ্চি। বাম দিকে ৫১ ইঞ্চি ও ডান দিকে ৫২ ইঞ্চি।

*

সবচেয়ে বড় পোকা—পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পতঙ্গ হচ্ছে 'ম্যাগাস্‌কোলাইডস্‌'। এরা অষ্ট্রেলিয়াবাসী লম্বায় সাড়ে পাঁচ হাত।

*

'২ লক্ষ ২১ হাজার টাকা মূল্যের ফারকোট।' আমেরিকার কোন এক ফ্যাশানেবল্‌ জামার দোকানে মেয়েদের একটা ফার-কোট ঝুলান ছিল যার দাম হচ্ছে, ২ লক্ষ ২১ হাজার টাফা।

—ভ্রম-সংশোধন—

শ্রীধ্রুবরঞ্জন সরকার

জ্যৈষ্ঠের ৯ প্রশ্নের উত্তরে লেখা আছে—'১৭২১ খৃঃঅব্দে বৈজ্ঞানিক ফার্ণহাইট ফ্রান্সে সর্বপ্রথম থার্মোমিটার আবিষ্কার করেন'। ভুল সংবাদ এটা। ফার্ণহাইট ১৭২১ খৃঃঅব্দে থার্মোমিটার আবিষ্কার করেন নি—১৭১৪ খৃঃঅব্দে —Dr Gamgee-র মতে ফার্ণহাইট মানব শরীরের উত্তাপ মাপবার জন্য আগেকার থার্মোমিটারের Freezing pt. ও Boiling pt. যথাক্রমে ০° ও ২১° পর্যন্ত ভাগ করেন। পরে এর আরও উন্নতি তিনি করেন।

কিন্তু থার্মোমিটার দিয়ে তাপ মাপার কথা প্রথম মাথায় আসে নিউটনের। মানব শরীরের উত্তাপ মাপার জন্য যে থার্মোমিটারের প্রচলন চলে আসছে তার আবিষ্কারক হলেন গ্যালিলিও—সেটা ১৫৯৯ খৃঃঅব্দে। Air Thermometer তিনি ব্যবহার করিতেন।

পরে Rivieri ও Re'aumur এই থার্মোমিটারের অনেক উন্নতি করেন। আধুনিক যুগে এর আরও উন্নতি হয়েছে।

শ্রীনীতীশরঞ্জন দে

জ্যৈষ্ঠের ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে—উর্ধ্বে নিক্ষিপ্ত তীর মাটিতে ফিরিয়া আসিতে অল্প সময় লাগে। কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে তাহা মনে হইলেও প্রকৃত পক্ষে লাগিবে সমান সময়।

ধরুন, তীরটি 'U' velocityতে উপর দিকে উঠছে এবং তার accelaration হলো 'g' তীরটি শেষ পর্যন্ত উঠতে, ধরুন সময় লাগলো 'T' সেকেণ্ড। এখন তীরটি $\frac{U^2}{2g}$ এত উপরে উঠবে। $\frac{U^2}{2g}$ উঠতে লাগলো 'T' সেকেণ্ড এখন T এর value বেরকরা যাক :—

$$O = U - gT$$

$$\text{or } gT = U$$

$$T = \frac{U}{g}$$ (এত সেকেণ্ড লাগবে $\frac{u^2}{2g}$ উঠ্‌তে)

পুনরায় ধরুন, তীরটির মাটিতে ফিরিয়া আসিতে T´ সেঃ লাগলো।

$$S = UT' + \tfrac{1}{2}gT'^2$$

$$\text{or } \frac{u^2}{2g} = UT' + \tfrac{1}{2}gT'^2$$

$$= O \times T' + \tfrac{1}{2}gT'^2$$

$$= \tfrac{1}{2}gT'^2$$

$$\text{or } T'^2 = \frac{u^2}{g^2}$$

$$\therefore T' = \frac{u}{g}$$ (এত সেকেণ্ড লাগবে $\frac{u^2}{2g}$ নামতে)

$$\therefore T = T'$$

অর্থাৎ উপরে উঠতে ও নামতে লাগছে সমান সময়।
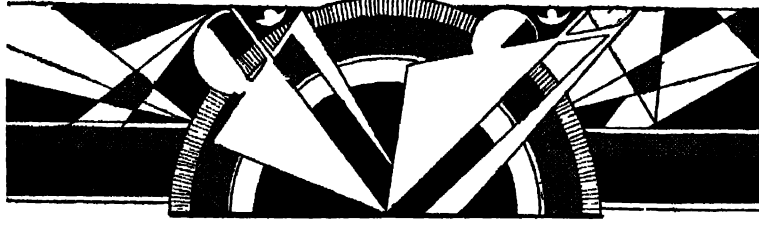
শ্রাবণ—১৩৪৮

১। ছোট্ট, সহজ ও প্রচলিত এমন একটি ইংরাজি শব্দ লিখে পাঠাও যার মধ্যে চার বার 'O' স্বরবর্ণটি ব্যবহার হয়েছে।

নীতীশরঞ্জন দে ও নিখিলরঞ্জন দে, ঢাকা।

২। এমন একটি সর্বজন পরিচিত ইংরাজী শব্দ বল যার মধ্যে A, E, I, O, U পাঁচটি স্বরবর্ণই আছে।

কুমারী নীলিমা দাশ,আকোলা, যোগেন্দ্র লাইব্রেরী,খুলনা।

আষাঢের ধাঁধাঁর উত্তর

Amalgamate—প্রভাতকিরণ দে. আহমদপুর। অশ্বিনীকুমার মণ্ডল, আহমদপুর। রেবা ভদ্র, ঢাকা। আব হোসেন, হেমনগর। বেন্দা ছাত্রসঙ্ঘ, বেন্দা। মিনতি গঙ্গোপাধ্যায়, দেওবন্দ। সরোজবিহারী ভাদুড়ী, কলিকাতা। অসীম বাহা, বালিগঞ্জ।

Amalgamation—কণ্ঠ ঘটক, মালদহ। শশী ভট্টাচার্য ও হারুণ-অল-রসিদ মিঞা, হেমনগর। অরুণ-কৃষ্ণ মিত্র, মজঃফরপুর। অনিলবরণ মহান্তি, যাদবপুর।

Ambassadorial—ওয়াহেদ আলী মিয়া, ইটাচালি। মঞ্জু দত্ত গুপ্ত, কল্যানকুমার গুপ্ত, মজঃফরপুর। বেন্দা ছাত্রসঙ্ঘ, বেন্দা।

Advantageable—বারিদবরণ রায়, নরসিংদী। প্রভাসকুমার মুখার্জি, সৈয়দপুর।

Arancaria—মণিমজুমদার, পুরুলিয়া।

* Australasia—মনোজ দত্ত, চট্টগ্রাম।

Anagramatic—অশ্বিনীকুমার মণ্ডল, আহমদপুর। নীতীশরঞ্জন দে ও নিখিলরঞ্জন দে, ঢাকা। বেন্দা ছাত্রসঙ্ঘ, বেন্দা। পরিতোষ চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা।

Alack-a-day—পশুপতি নাথ ঘোষাল, কলিকাতা। আরতি গুহ ও অমিতা অধিকারী নবগ্রাম। শৈলেন্দ্রকুমার রায়, কলিকাতা।

Bacchanalian—সুধীরচন্দ্র দেব রায়, হবিগঞ্জ। অরুণলাল মুখার্জি, কলিকাতা। কামদারঞ্জন ভট্টাচার্য, নরপুর। নীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার, বালিগঞ্জ। সুনীল কুমার ব্যানার্জি, রামপুরহাট। সিদ্ধেশ্বর মিত্র, বালিগঞ্জ।

* Casabianca—গৌরাঙ্গ রুদ্র, চট্টগ্রাম।

* Catamaran—শঙ্করনাথ ব্রজবাসী, মথুরা। অশ্বিনী কুমার মণ্ডল, আহমদপুর। অরুণলাল মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা।

Caravanserai or Caravansary—কামদারঞ্জন ভট্টাচার্য, নরপুর। অরুণলাল মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা। কুমারী নীহার ব্যানার্জি, জব্বলপুর। গীতা ও বাদল পালিত, আসানসোল।

Paraphernalia—মঞ্জুলেখা সান্ন্যাল, বেহার গভঃ-ক্যাম্প। নীতীশরঞ্জন দে ও নিখিলরঞ্জন দে, ঢাকা। সতী নিয়োগী, পাটগ্রাম। পীযূষ নিয়োগী, মাণিকগঞ্জ।

Paramatta—প্রতিমা চ্যাটার্জি, জব্বলপুর। নীতীশ-রঞ্জন দে ও নিখিলরঞ্জন দে, ঢাকা। সতী নিয়োগী, পাটগ্রাম। পীযূস নিয়োগী, মানিকগঞ্জ।

Parliamentarian—নীতীশরঞ্জন দে ও নিখিলরঞ্জন দে, ঢাকা। সতী নিয়োগী, পাটগ্রাম। পীযূষ নিয়োগী, মানিকগঞ্জ।

Paragraphically—নীলিমা দাশ, আকোলা। প্রতিমা চ্যাটার্জি, জব্বলপুর।

Maranatha —আমলা হিন্দু হোষ্টেলের ছাত্রবৃন্দ।

Sabbatarian—হেনা রাহা, বরকান্তা। হরিপদ চক্রবর্তী, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার মণ্ডল জানিয়েছেন এবং আমরাও মিলিয়ে দেখেছি যে তিনি ধাঁধাঁ ও সেই সঙ্গে যে উত্তর পাঠিয়েছিলেন তার সঙ্গে ছোটদের বার্ষিকীর উত্তর মেলে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—কোন জায়গার নাম, লোকের নাম, নদীর নাম ইত্যাদি পাঠালে হবে না। গতমাসে অনেকে এই ভুল * করেছেন। শব্দটি লিখে পাশে তার মানেটি কি তাও লিখে দেবে। (ধাঁধাঁ সম্পাদক)

Printer and publisher R Bhattacharya, Pravu Press, 30, Cornwallis Street, Calcutta.

শব্দ-সন্ধান

(প্রতিযোগিতা-কুপন)

(যে কোনো পাঠক বা পাঠিকা এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারেন,
এবং যতগুলি ইচ্ছা কুপন পাঠাতে পারেন)

১ ন	২ চি	৩		■	৪ মা	ব	৫	
৬ ব			■	৭ দা		■		■
	■	৮ ন	৯		■	১০	ক	১১ ল
১২	১৩ তা	■	১৪		১৫ না	■	■	
■	১৬	১৭ স্ক	ব	■	১৮		১৯ র	■
২০	■		■	২১ ত	■	■	২২	২৩ প
২৪ প	২৫	■	২৬ প		২৭	■	২৮	বি
২৯	ব			■	৩০ স্ত	৩১	■	
৩২ থা		■	৩৩ তা		■	৩৪ বি		

(পাঠশালা, শ্রাবণ)

নাম .. ..

ঠিকানা . . .

.. .. .

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আগামী **১৫ই** শ্রাবণের মধ্যে কুপনখানি পাঠশালা-কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই।

☞ কুপনে কোনো কাটাকুটি বা বানান ভুল চলবে না

বিশ্বকবির তিরোভাব

২২শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার—ঝুলন পূর্ণিমা
ইংরাজী ৭ই আগষ্ট ১৯৪১, বেলা ১২-১৩ মিঃ

জগদ্বরেণ্য মহাকবি বাংলার তথা ভারতের পরমারাধ্য কবিগুরু ঋষি রবীন্দ্রনাথের ৮১তম জন্মদিনের জয়ন্তী-উৎসব এখনও নীরব হয় নি, ইতিমধ্যে বাংলাদেশকে শোকাচ্ছন্ন করে কবি ইহলোক হ'তে সাধনোচিতধামে প্রস্থান করেছেন। বাংলার প্রদীপ্ত-সূর্য্য অস্তমিত হ'ল, বিশ্বের উজ্জ্বলতম রত্ন অন্তহিত হ'ল। এ বিপুল ক্ষতির কোনো সান্ত্বনা নেই। কবিগুরুর স্বর্গগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য আগামী আশ্বিনের পাঠশালা বিশেষভাবে রবীন্দ্র-স্মৃতিসংখ্যারূপে প্রকাশিত হবে।

চতুর্থ বর্ষ] ভাদ্র—১৩৪৮ [দ্বাদশ সংখ্যা

বর্ষায়

শ্রীনীহারকান্তি ঘোষদস্তিদার

আকাশেব নীল গায়
আধো আলো আবছায়
ঘন ঝড় ঝঞ্ঝায়
ক্ষেপা বায়
উড়ে আসে
সন্ত্রাসে।

আকাশেব এক পাশে
চমকায নাচে হাসে,
বর্ষাব সঙ্গিনী
রুনু ঝুনু শিঞ্জিণী
পায়ে বাঁধা কিঙ্কিনী,
কেঁপে ওঠে কালো মেঘ,
চুপে চুপে কথা কয়
কভু হাসি কভু ভয়
বুকে দোলে উচ্ছল কী আবেগ।
মনে তাব কত গান
গুঞ্জবে বাজে তান্
ধারা জলে
নভতলে
দিযে যায় সন্ধান,
ধবা মাঝে
বীর সাজে
বর্ষার অভিযান।

দিল্ খোলা খুসী তাব অন্তরে লেগেছে,
উন্মনা উন্মাদ সাথী আজ জেগেছে।
পূবে হাওয়া সঙ্গে,
অভিনব রঙ্গে
দুইজনা
আন্মনা
কবে কত জল্পনা ,
স্বপ্নেব আল্পনা
চিত্তেব আঙিনায়
নৃত্যেব ছন্দেতে এঁকে যায ঝড়ো বায়
নির্জন সন্ধ্যায়।

চুপি চুপি মুখ তুলে আঁধাবেব ওধারে,
নিঝ্ঝুমে ছোট তাবা চোখ চায় ও-পাবে।
লজ্জায় দিশাহাবা
অজানা যে দোঁহে তারা!
তাড়াতাড়ি ছুটে চলে উড়ে চলে নেচে চলে
নভতলে ছায়াতলে,
ঝোপ ঝাড় জঙ্গলে।
আকাশেব বুকে জাগে হর্ষের হিল্লোল
মুখ তোলে তারাদল
ঝাবা জল অবিরল
তোলে তার কল্লোল।
নিরিবিলি নিঃঝুম নিঃসাড় রাত্রি
পথ চলে ভিজে ভিজে বর্ষার যাত্রী।

পূর্ববঙ্গের ভুঁইয়া

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায

একদা অপরাহ্ণে সরমা ও ধারা নদীর ধারে বসিয়া মাছ ধরা দেখিতেছিল, একজন প্রৌঢ় মুসলমান, আর একজন হিন্দু যুবক ছিপে মাছ ধরিতেছিল। মাছ উঠে নাই, তবু উভয়ের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। চার, কেঁচো প্রভৃতি থাকা সত্ত্বেও নির্লোভ মৎস্যকুল দূরে ছিল। সরমা জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ চাচা, মাছ পেলে ?"

যুবক হরি কহিল, চাচা আর কবে মাছ পায় ?

চাচা কহিল, মাছ পাইনে রে গাধা ? কালই তোকে একটা মাছ ধরে' খাওয়াব।

হরি। আমার নাম করো না চাচা, তাহলে মাছ পালাবে। বল কালী—

সরমা গান ধরিল,—

আয়রে মাছ আয়রে ছুটে, আয়রে চারের মাঝে,
কোথায় বাছা যাবিরে তুই আঁধার ঘেরা সাঁঝে।
'চার' কিনেছি পয়সা ফেলে, টোপ গেঁথেছি মাটী ঠেলে
ওরে তোকেই দেব বলে, আদর করে দেব এলে।
কেঁচো গেঁথেছি আদর করে, ওরে তোরই তরে রে,
তোরে ভালবেসে খাইয়ে দেব, ভালবেসে রে।
ঢাকা আছে লোহার কাঁটা ? ভয় কি তাতে রে।
আসতে পাছে ব্যথা লাগে (তাই) তুলব টেনে রে।
বঁটির উপর ফেলে তোরে কাটব আদরে,
গা মুছিয়ে চান করিয়ে তুলবরে ঘরে।
ভয় পেয়ে তুই যাসনি সরে' আঁধার ঘেরা সাঁঝে,
আরাম কত জানিস্ যখন কড়ায় ফেলে ভাজে॥

ধারা কহিল, আমাদের দেশের অবস্থা আজ এমনিই দাঁড়িয়েছে। বাদসা 'চার' ফেলে আমাদের একে একে বঁড়সিতে গাঁথছে। যারা চারে আসছে না, তাদের জন্যে বড় বড় জাল ফেলা হ'চ্ছে।

সরমা। রাজার নিকট হতে আজ লোক আসবার কথা, এখনও কেন এলো না তাই ভাবছি। দুদিন কেউ আসে নি।

ধারা। মাধবপাশায় রাজধানী উঠে যাবার পর হতে চিন্তা করবার বিশেষ কোন কারণ নেই।

সর। মগেরা না হয় দৌরাত্ম্য করবে না, মোগল ত আছে। জানি না কেন, আজ আমার মন এত চঞ্চল হয়েছে।

ধারা। রাজা আছেন দূরে, তাই তাঁর জন্যে ব্যাকুল হয়েছ, নিকটে থাকলে ত তাঁর ত্রিসীমানায় পা দেও না।

সর। দেশের বর্তমান অবস্থায় হিন্দুর পদে পদে বিপদ। আরাকান, পাঠান, মগ কেউ হিন্দুর বন্ধু নয়—নিজের স্বার্থ সিদ্ধির অভিপ্রায়ে আমাদের সঙ্গে মিশেছে মোগলকে তাড়াবার জন্যে। হিন্দুর মিত্র কোথাও নেই। হিন্দুও হিন্দুর মিত্র নয়—দ্বেষ হিংসা স্বার্থ তাকে বিচ্ছিন্ন করেছে। রাজার জন্যে তাই চিন্তা। আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি—

জনৈক ভৃত্য ত্বরিতপদে আসিয়া কহিল, মাধবপাশা হতে দূত রামচরণ এসেছে। সরমা বুক চাপিয়া কয়েক পদ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। দূত সমীপস্থ হইয়া অভিবাদন করিল। সরমা জিজ্ঞাসা করিল, কি সংবাদ রামচরণ ?

"রাজাকে নবাব ধরে নিয়ে গেছে—"

"কবে ?"

"আজ সকালে।"

"রাজা কোন পত্র দিয়েছেন ?"

"পত্র লেখবার অবসর পান নি। সহসা হাজার ফৌজ এসে দুর্গ ঘিরে ফেললে—"

"আচ্ছা, তুমি এখন বিশ্রাম করগে। ফিরে গিয়ে দেওয়ানজিকে বলো চিন্তা করবার বিশেষ কোনো কারণ নেই—শীঘ্রই তিনি ফিরবেন।

"ফিরবেন ত ? সত্যি ফিরবেন ? মাধবপাশায় কান্না উঠেছে।

"মা কালী তাঁকে রক্ষা করবেন ; ভয় নেই রামচরণ।"

দূত সসম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলে ধারা অন্তরাল হইতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হবে দিদি ?"

সর। ভয় কি ? স্থির হও—চোখের জল রাণীর

উপযুক্ত নয়। এতদিন তোমাকে কি শিখালাম। অস্ত্র থেকে শাস্ত্র, উপনিষদ হতে গীতা পর্যন্ত তোমাকে শিখিয়েছি, তার ফল কি বিপদের সময় কান্না? আমি এখন চল্লুম গৌড়ে।* (চাচার প্রতি)—রহিম—

চাচা ছিপ ফেলিয়া উঠিয়া আসিল।

"তুমি গৌড়ের পথ চেনো রহিম?"

"চিনি বই কি দিদিমণি।"

"তবে প্রস্তুত হয়ে নেও, আমার সঙ্গে এখনি যেতে হবে, অস্ত্র নিতে ভুলবেনা (হরির প্রতি) হরি, যাও, দুটো ঘোড়া ঠিক রাখ গে; যে দুটা সবচেয়ে ভাল— দাদাকে একবার ডেকে দিও।

ধারা। তুমি মেয়েমানুষ, একা কোথা যাবে?

সর। আমি মেয়েমানুষ। আশ্চর্য কথা। মাথা মুড়িয়ে পুরুষবেশে ঘোড়ার পিঠে গোটা বাংলা মুলুক ঘুরে এলুম, আর এখন কিনা আমি মেয়েমানুষ। কোন্ মেয়েমানুষ কোমরে তলোয়ার, বুকে ছোরা, পিঠে ধনুক, কাঁধে বন্দুক নিয়ে ঘুরে বেড়ায়? পশুকর্তৃক পুনঃপুনঃ উপদ্রুত হয়ে মেয়ে মানুষের লাজলজ্জা বেশভূষা ত্যাগ করেছি। হৃদয় ছিল মরুময়, তোমার স্নেহ, শুষ্ক ভূমিতে আবার জলপ্রবাহ এনেছে, আমি যে একদিন নারী ছিলাম, তার স্মৃতি জাগিয়ে তুলেছে।

ধারা। চুপ কর, কাঁদিয়ো না। আজ রাতে না গিয়ে, কাল সকালে যাত্রা করলে হয় না?

সর। কাল সকালেই যে সেখানে আমার পৌছন চাই। চাঁদনী রাত আছে, ভয় কি? মানুষকে যতটা ভয় করি, বনের পশুকে ততটা করি না।

এমন সময় বলরাম ব্যস্ত হইয়া আসিয়া কহিল, "ধারা মহাবিপদ।"

ধারা। বিপদ্। আবার কি বিপদ?

বল। ত্রিপুরার মহারাণী লোক পাঠিয়েছেন তোকে নিয়ে—

ধারা। আমাকে নিয়ে যেতে? তুমি ভুল শুনে থাকবে।

বল। না না, ভুল নয়—রাণীর ইচ্ছে তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে তোর বিয়ে দেন।

ধারা। তাঁর হুকুম নিয়ে বিয়ে কর্তে হবে নাকি? ওরে বাপরে। দাও ফিরিয়ে দেও।

বল। শুধু তাঁর হুকুম নয়, দাদারও আদেশ—

ধারা। দাদার আদেশে দ্বিচারিণী হ'ব নাকি?

বল। ব্যাপারটা কি জান? মহারাজ সৈন্য দিতে রাজি হ'ন নি, এখন হোয়েছেন রাণীর অনুরোধে, এই অনুগ্রহের বিনিময়ে চাই তোমাকে।

*চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশোদ্ভূত ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু ব্রজসুন্দর মিত্রের মতে উদয়নারায়ণ মুর্শিদাবাদ দরবারে বিচারার্থে আহূত হইয়াছিলেন। এখানে তাঁকে গৌড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কারণ উপন্যাস ইতিহাস নয়।

ধারা। আমি কি বেচাকেনার সামগ্রী? আমাকে বেচবার দাদার কি অধিকার আছে?

বল। উত্তেজিত হয়ো না ধারা—কথাটা বুঝে দেখ।

ধারা। রেখে দেও তোমার কথা। বল্বে দেশ, দেশ, এই ত?—চুলোয় যাক্ তোমার দেশ।

বল। তোমার মাথা খারাপ হোয়েছে, শান্ত হও।

ধারা। মাথার বড় অপরাধ, না?

বলিতে বলিতে ধারা কাঁদিয়া ফেলিল। সরি তাহাকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া কহিল, "কেঁদো না বোন, তুমি কখনো দুঃখ পাবে না দেখো—

ধারা খুব খানিকটা কাঁদিয়া লইয়া একটু শান্ত হইল। পরে আবেগভরে কহিল, "তুমি কি কর্তে দাদা, যদি তোমার সর্বস্ব মুহূর্তে লুণ্ঠিত হত? তোমার সুখশান্তি, ধর্মকর্ম, ইহকাল পরকাল, যদি এক ফুৎকারে বিনষ্ট হত, তাহলে তুমি কি করতে দাদা? যদি তোমার এই বাড়ী-ঘর, জমিজমা কেড়ে নিয়ে, কেউ তোমার হাত পা ভেঙ্গে দিয়ে তোমাকে পথে বার করে দিত, তাহলে তুমি কি করতে? আমাকে শান্ত হতে বলো না।"

"শান্ত না হলে উপায় কি ধারা?"

"যার বুকে আগুন জ্বলছে, সে শান্ত হবে কি করে? যিনি আমার সর্বস্ব, তাঁকে ধরে নিয়ে গেছে শত্রুপুরীতে, আর তোমরা দস্যুর ন্যায় আমাকে নিয়ে যেতে চাও এক অজানা দেশে যপকাষ্ঠে বলি দিতে। আজ সিংহ গৃহে নাই, তাই তোমরা সাহস পেয়েছ সিংহীকে অপমান করতে।"

"তবে তুমি কি করতে চাও ধারা? ত্রিপুরার লোকদের কি বলব?"

সরি তাড়াতাড়ি কহিল, "বলে দেও, দিদিমণির শরীর ভাল নেই, শরীরটা একটু সারলেই যাবেন। দু পাঁচ দিন অপেক্ষা করতে বল।"

"কোন দিনই আমি যাব না।"

সরি কহিল, "তোমাকে যেতেই হবে ধারা, নইলে কেউ আমরা রক্ষে পাব না। যদি যাও, তোমাকে আমি শীঘ্রই ফিরিয়ে আন্‌ব"—

ধারা। তুমি ত যাচ্ছ গৌড়ে—

সরি। গৌড় হতে ফিরে এসে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে আমি যাব। তোমাকে ত আমি একা ছেড়ে দেবো না সেখানে।

ধারা। তুমি আমার সঙ্গে থাকলে আমি কোথাও যেতে ডরাই না।

সরি। আমি যতদিন না ফিরে আসি, ততদিন তুমি বাড়ীর বাইরে যাবে না।

বলরাম প্রস্থান করিলে, সরমা ধারাকে বুকে লইয়া অনেক আদর করিল ও সান্ত্বনা দিল। ধারার মুখে তখন হাসি ফুটিল। (ক্রমশঃ)

১৫৩১ খৃষ্টাব্দে পিজারো নামক একজন লোক তিনশ সঙ্গী নিয়ে স্পেন থেকে জাহাজ ভাসালে দক্ষিণ আমেরিকার তটভূমির উদ্দেশে। যথাসময়ে তারা সেখানে পৌছল। তারপর সমুদ্র থেকে একটি নদীর মধ্যে প্রবেশ করে তারা জাহাজ নোঙর করলে। তারপরে সকলে মিলে মহা উৎসাহে গাছপালা কেটে সেখানে একটা ছোট শহর তৈরী করে ফেললে। তাদের এত তোড়জোড় আয়োজনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পেরু জয়। পিজারো এর আগে দুবার পেরুর উদ্দেশে যাত্রা করেছিল, কিন্তু সঙ্গে বেশী লোকজন এবং বিজয় অভিযান করবার মত উপযুক্ত জিনিষপত্র না থাকায় তার সে উদ্দেশ্য বিফল হয়। কিন্তু বার বার দুবারের অভিযানে পথ সম্বন্ধে তার যে অভিজ্ঞতা হয় তা এই তৃতীয় অভিযানে তাকে যথেষ্ট সাহায্য করে।

একদল লোককে নবনির্মিত ছোট শহরটিতে রেখে পিজারো তার বাকি সঙ্গীদের নিয়ে অভিযান শুরু করলে। কয়েকজনকে পিছনে রেখে যাওয়ার উদ্দেশ্য এই যে পরে দরকার হলে তারা নিজেরা সাহায্য করতে পারবে অথবা স্পেন থেকে সাহায্য আনাতে পারবে।

যাই হোক, ১৭৩ জন লোক নিয়ে পিজারো ভিতর দিকে এগিয়ে চলল। প্রথমে তারা সমতলভূমির উপর দিয়ে অগ্রসর হল। কয়েকটা গ্রাম ও শহর তারা অতিক্রম করলে, এবং সেখানকার অধিবাসীরাও তাদের সঙ্গে বন্ধুভাবে ব্যবহার করলে। মাঝে মাঝে রেড ইণ্ডিয়ানদের কাছ থেকে তারা পেরুর সন্ধান গ্রহণ করতে লাগল, এবং তা থেকে তারা এইটুকুই জানতে পারলে যে পেরু আণ্ডিজ পর্বতমালার অভ্যন্তরে অবস্থিত। তাছাড়া, তারা আরও জানতে পারলে যে পেরুতে নাকি সোনার ছড়াছড়ি—ইটপাথরের মত তা কুড়িয়ে পাওয়া যায়।

এক সপ্তাহ পথ চলার পর পিজারো দেখলে তারা পাহাড়ের সামনে এসে পৌছেছে। এখানে তাদের সঙ্গে পেরু থেকে আগত একজন দূতের সঙ্গে দেখা হল। সে পেরুর রাজার পক্ষ থেকে তাদের সাদর অভ্যর্থনা করে নিলে, এবং পাহাড়ের ওপাশে রাজার যে তাঁবু পড়েছে সোজা সেখানে চলে যেতে বললে। পিজারো তাকে এই খবরের জন্য ধন্যবাদ দিলে, এবং তাকে বলে দিলে সে যেন রাজাকে গিয়ে বলে যে স্পেনবাসীরা শীঘ্রই সেখানে গিয়ে হাজির হচ্ছে।

তারপর তারা আণ্ডিজ পর্বতমালার উপর আরোহণ শুরু করলে। প্রথমে পড়ল ঘন অরণ্য, তারপর পাহাড়ের মসৃণ গা, যার উপর দিয়ে উঠবার সময় প্রত্যেকটি পদক্ষেপ সাবধানে করতে হয়। যতই তারা উপরে উঠতে লাগল পথ ততই সরু হতে লাগল, এবং ততই তাদের চোখে পড়তে লাগল আণ্ডিজ পর্বতমালার বরফঢাকা সব শৃঙ্গ, সূর্যের আলো পড়ায় তা চকচক করছিল। যে রাস্তা দিয়ে তারা উপরে উঠছিল তা এঁকেবেঁকে উপরদিকে উঠেছিল। এগোতে এগোতে কোন বাঁকের ঠিক পরেই হয়ত তারা দেখলে একটা গভীর খাদ, যার পাশ থেকে উঠেগেছে খাড়া উঁচু পর্বতশৃঙ্গ—দুএর মাঝের ব্যবধান একহাত বা দেড়হাত মাত্র, এবং সেইটিই হল তাদের পথ।

এমনি দুর্গম মৃত্যুভয়পূর্ণ পার্বত্য পথ অতিক্রম করতে করতে অবশেষে তারা চূড়ায় পৌছুল। তারপর শুরু হল তাদের নীচের দিকে নামা। পথের সমস্ত দুঃখকষ্টই তারা নীরবে সহ্য করছিল স্বর্ণোজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায়—পেরুর যে ধনরত্নের কথা তারা শুনেছে তার একাংশও যদি তারা পায় তবে তাদের সমস্ত পরিশ্রমেরই মর্যাদা তারা পেয়ে যাবে।

অবশেষে পাহাড়ের নীচে একটি ছোট শহরে তারা পৌছুল। পৌছেই পিজারো সেটি দখল করে ফেললে। সেখান থেকেই তারা দেখতে পেলে দূরে রয়েছে রাজার তাঁবু। তৎক্ষণাৎ পিজারোর ভাই ঘোড়ায় চড়ে চলল তাঁবুর দিকে। তার বলিষ্ঠ সুন্দর চেহারা ও ঘোড়ায় চড়বার বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গী দেখে রাজা যেন খানিকটা অভিভূত হয়ে পড়লেন। তিনি তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন, এবং পরের দিন পিজারোর সঙ্গে দেখা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

সেদিন দুপুরবেলা পিজারোর লোকেরা দেখলে যে রাজার তাঁবু থেকে একটা জনস্রোত বেরিয়ে তাদের শহরের দিকে আসতে আরম্ভ করেছে। তার ভিতরে সাধারণ

লোক থেকে আরম্ভ করে যোদ্ধা সৈনিক প্রভৃতি সবই আছে। আর তাদের মাঝে আছেন রাজা তাঁর রাজকীয় শিবিকায়।

সন্ধ্যার ঠিক আগেই সেই বিশাল জনস্রোত এসে পাহাড়ের পাদবর্ত্তী সেই ছোট শহরটিতে প্রবেশ করতে শুরু করলে। পিজারোর আদেশে স্পেনবাসীরা ততক্ষণে তাদের গোলাগুলি কামান বন্দুক নিয়ে কতকগুলো বাড়ীর মধ্যে লুকিয়ে পড়েছে।

পেরুবাসীরা কাছে আসতে হঠাৎ একটা বাড়ীর দরজা খুলে গেল এবং একজন পাদ্রী একখানি বাইবেল হাতে নিয়ে রাজার কাছে এগিয়ে গেলেন। নানারকম কথা বলে তিনি রাজাকে খৃষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু তার উত্তরে রাজা তাঁকে বললেন যে তাঁর নিজের যে ধর্ম আছে তা অন্য কোন ধর্মের চেয়ে খারাপ নয়। এই বলে তিনি পাদ্রীর হাত থেকে বাইবেল খানা নিয়ে ছুঁড়ে মাটিতে ফেলে দিলেন।

পিজারো আড়াল থেকে সমস্ত ব্যাপার লক্ষ করছিল। রাজাকে ওইভাবে বাইবেলখানা ফেলে দিতে দেখে সে একখানা লাল রুমাল নেড়ে তার লোকেদের যুদ্ধের আদেশ জানিয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের বাজনা বেজে উঠল কামান ও বন্দুকের গর্জন শোনা যেতে লাগল। স্পেন-বাসীরা বন্দুক নিয়ে যে যার যায়গা থেকে বেরিয়ে পড়ল। ফলে একটা ভীষণ যুদ্ধ লেগে গেল। কিন্তু কামান ও বন্দুকের সামনে দাঁড়াতে না পেরে পেরুবাসীরা পালাতে শুরু করলে। সেই সুযোগে পিজারো রাজাকে বন্দী করে ফেললে।

বন্দী অবস্থায় রাজার দিন কাটতে লাগল। পিজারো মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেত। দেখা হলেই রাজা মুক্তি প্রার্থনা করতেন, এবং তার পরিবর্তে ধনরত্ন দেবার প্রতিশ্রুতি দিতেন। পিজারো প্রথম প্রথম তার কথায় ঔদাস্য দেখাত। অবশেষে একদিন মরিয়া হয়ে রাজা মুক্তির বদলে তাঁর প্রায় সমস্ত ধনরত্ন পিজারোকে দিতে চাইলেন। দেওয়ালের ধারে পায়ের বুড়ো আঙুলের ওপর দাঁড়িয়ে যতদূর হাত যায় ততদূর পর্য্যন্ত দেখিয়ে বললেন যে তাঁকে মুক্তি দিলে তিনি ঘরটার অতখানি পর্য্যন্ত যত সোনারূপো ধরে তা পিজারোকে দেবেন। পিজারো তৎক্ষণাৎ দেওয়ালের সেই জায়গাটায় একটা দাগ দিয়ে নিলে।

রাজার আদেশে তখন পেরুবাসীরা সোনারূপা এনে সেই ঘরে জমা করতে শুরু করল। রাজার মুক্তির জন্যে তাদের সমস্ত ধনরত্ন বিলিয়ে দিতে কোন আপত্তিই ছিল না। দিনের পর দিন ধরে তারা সোনারূপো বয়ে আনতে লাগল। অবশেষে এমনি ভাবে দুমাস কাটবার পর দেখা গেল যে রাজার প্রতিশ্রুতি মত উপযুক্ত সোনারূপা এসে সেই ঘরটিতে জমা হয়েছে। সুতরাং এবার তাঁর মুক্তি পাওয়া উচিত। কিন্তু রাজাকে মুক্ত করবার পূর্বে পিজারো ও তার লোকেদের কানে একটা গুজব এল যে রাজা নাকি গোপনে তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছেন—মুক্তি পেলেই তিনি তাদের আক্রমণ করবেন। সুতরাং মুক্তি পাওয়া আর রাজার ভাগ্যে ঘটল না। সেদিন রাত্রিতে পিজারোর আদেশে তাঁর মৃত্যু হল।

পরের দিন সকালে পিজারো ও তার লোকেরা খবর পেলে যে, যে গুজব শুনে রাজাকে তারা মেরেছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যে। কিন্তু তখন আর করবার কিছুই নেই।

পিজারো ও তার লোকেরা তখন রাজধানীর দিকে এগিয়ে চলল। তাদের দেখে সেখানকার অধিবাসীরা সব ভয়ে পালাতে লাগল। কিন্তু তাদের দিকে নজর না দিয়ে পিজারো ও তার লোকেরা তখন সোনা ও রূপার সন্ধানে চতুর্দিকে খুঁজে বেড়াতে লাগল।

আরও কিছু সোনারূপা সংগ্রহ হলে পিজারো ও তার লোকেরা সমুদ্র তীরের দিকে যাত্রা করলে। সেখানে পিজারো নিজের জন্যে একটি নূতন রাজধানী তৈরী করলে, এবং পেরু জয়ের আনন্দে মশগুল হয়ে রইল। [ক্রমশঃ

প্রেমের জয়

শ্রীপ্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভালোবাসায় জয় করা যায়
লাভ করা যায় বন্ধু
এর মহিমায় বশ হয়ে যায়
হিংস্র বনের জন্তু।

হিংসা দিয়ে প্রাণ মেলেনা
মিলতে পারে রক্ত।
বিশ্ব-জয়ের সাধ থাকেতো
হওরে প্রেমের ভক্ত।
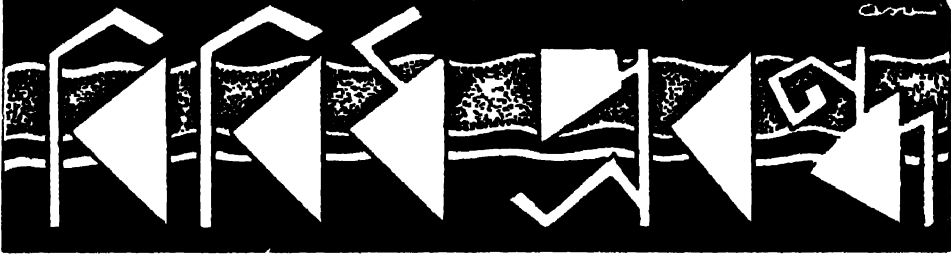
টাকার রহস্য

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেক ভেবে চিন্তে বুদ্ধিমান পাচক ঠাকুর পরামর্শ দিলে গায়ে পিঠে আচ্ছা করে ধূলা মেখে মাথার চুলগুলো উস্কো খুস্কো করে সন্ধ্যার দিকে বাড়ী ফিরতে। সেখানে বানিয়ে বলা—জঙ্গলের নির্জন পথে একদল গুণ্ডা তাদের সর্বস্ব অপহরণ করে নিয়েছে। তারা কোন রকমে প্রাণ হাতে করে ছুটতে ছুটতে পালিয়ে আসছে। দারোয়ান হুঙ্কার দিয়ে বল্লে এমন অপমানজনক 'ঝুটা বাত' প্রাণ গেলেও সে বল্‌তে পারবে না। তার বংশের কত লোক গত মহাযুদ্ধে যোগদান করেছিল, এখনো তার কয়েকজন নিকট আত্মীয় সৈন্যবিভাগে কাজ করছে, এমন বীর বংশে জন্মগ্রহণ করে সে কিনা বলবে গুণ্ডার হাতে সব তুলে দিয়ে, অক্ষত শরীরে প্রাণভয়ে পালিয়ে এসেছে, হাতে প্রকাণ্ড একটা ডাণ্ডা থাকা সত্ত্বেও। না, এ কথা সে প্রাণ থাকতে বল্‌বে না। অনেক তর্কাতর্কি ও আলোচনার পর স্থির হ'ল, তারা সত্য কথাই বলবে, এতে তাদের কথা কেউ বিশ্বাস করে ভালই, না করে এসে যায় না। সন্ধ্যার সময় অতি বিষণ্ণমুখে তারা বাড়ী ফিরলো। খবর পেয়ে সরকার মশাই তাদের ডেকে পাঠালেন। ইষ্ট নাম জপ করতে করতে তাঁর নিকট উপস্থিত হ'য়ে তারা যা বল্লে, তার সারমর্ম হল এই—পথ চল্‌তে চল্‌তে তাদের ভীষণ ক্ষুধার উদ্রেক হওয়াতে তারা হাঁড়ী দুটো শেষ করে ফেলেছে, তবে বিনা পয়সায় একটিও তারা খায়নি, প্রত্যেকটি নগদ পয়সায় নিজেদের মধ্যেই বেচা কেনা করেছে। কেবল তাই নয়, ঐ বিক্রীর পয়সা থেকে এক পয়সাও তারা বাজে খরচ করেনি। চক্রবর্তী-মশাই এ সব শুনে বিরক্ত হ'য়ে বল্লেন, "চুলোয় যাক্, কে কিনেছে বা কে খেয়েছে, আমার জানবার দরকার নেই, নগদ পয়সায় বেচেছো, এইটুকুই জেনেই খুশী। আমার দরকার পয়সার সঙ্গে, এখন আমার পাওনাটা দিয়ে দাও।" তারা শুষ্ক মুখে আমতা-আমতা করে জানালে তাদের কাছে একটি আনি ছাড়া কিছুই নেই। এ কথা শুনে সরকারমশাই রেগে আগুন, মুখটা ভয়ানক বিকৃত করে বল্লেন, ষোল আনার মাল নগদ বেচে একটি আনি পেয়েছো, আমাকে একথা বিশ্বাস করতে হবে। তারা অতি বিনীতভাবে জানালে, তারা নিজেরাও যে সহজে বিশ্বাস করতে পেরেছে, তা নয়, কিন্তু কথাটা একেবারে সত্য। সত্য বললে কিহবে, কথাটা যে নিছক মিথ্যা সে সম্বন্ধে 'চক্করবর্তী' মশাই ও অধিকাংশ শ্রোতারাই একমত। অথচ তারা বাস্তবিকই, মিথ্যা কথা বলেনি। টাকার রহস্যের সঙ্গে পরিচয় থাকলে তারা বুঝত এই অবিশ্বাস্য ঘটনার জন্য, রহস্যময় টাকাই দায়ী, এটি তাঁরই কীর্তি। পাচক ও ঠাকুর প্রত্যেকবার যে আনিটি সন্দেশ ও লাড়ু কেনা বেচায় উপার্জন করেছিল প্রত্যেকেই সেটি আবার তৎক্ষণাৎ ব্যয় করেছে বলে আনিটি অল্প সময়ের মধ্যে ষোলবার হাত ঘুরে, ষোল আনার কাজ করে ফেলেছে, তারই ফলে এই কাণ্ডটি ঘটেছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে একটা দৃষ্টান্ত দিলে, তোমাদের কাছে টাকার এই আচারণটি এমন কিছু সৃষ্টি ছাড়া বলে মনে হবে না। মনে কর, কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে একটা প্রকাণ্ড 'হল' আছে, বাড়ীর কর্তা সেটিকে বেশ ঝক্‌ঝকে রাখবার জন্য প্রায়ই চুনকাম করিয়ে থাকেন। তিনি দেখেছেন, একদিনের মধ্যে ঘরটি চুনকাম করতে হ'লে প্রায় ষোল জন মজুরের দরকার হয়। আমাদের দেশের মজুররা সাধারণতঃ যেরূপ হয়, এই লোকগুলিও সেইরূপ,—ভয়ানক কুঁড়ে ও ফাঁকিবাজ, যতটুকু সময় কাজ করে, তার চেয়ে অনেক বেশী সময় নষ্ট করে গল্পগুজবে ও তামাক বিড়ির শ্রাদ্ধ করে। ভাগ্যক্রমে ভদ্রলোকটি এবার একটি খুব চটপটে মজুর পেলেন। কাজ শেষ করাই হ'ল তার প্রধান লক্ষ্য, একটার পর একটা কাজ করে চলে, তাতে তার না আছে কোন বিরক্তি, না আছে শৈথিল্য। ভদ্রলোক এই মজুরটিকে কাজে নিযুক্ত করে স্থির করলেন, পরদিন পনেরটি মজুরকে কাজে

লাগাবেন, তা'হলে পুরো চুনকাম হ'য়ে যাবে। মজুরটি কতদূর কি করলে দেখবার জন্য বৈকালের দিকে তিনি সেখানে গিয়ে যা দেখলেন' তাতে আশ্চয না হয়ে থাকতে পারলেন না—দেখেন চুনকামের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তিনি সবিস্ময়ে তাঁকে প্রশ্ন করলেন, "তুমি কি একাই যোল জনের কাজ করে ফেল্লে?" সে উত্তর দিলে, "আজ্ঞে হাঁ।"

আমাদের পাচক ঠাকুরের চটপটে আনিটাও এইরূপ একাই যোলটি আনির কাজ করে ফেলেছে। মানুষের মধ্যে যেমন এক-একজন লোক 'একাই এক-শ'!—টাকার জগতেও এক একটা মুদ্রা দ্রুত হাত ফেরতা হওয়ার ফলে অমন হ'তে পারে। টাকার চলন-গতির তাৎপর্যটা এতক্ষণে বেশ বুঝতে পেরেছ ত? আশা করি, এ সম্বন্ধে আর কিছু বলবার আবশ্যক হবে না।
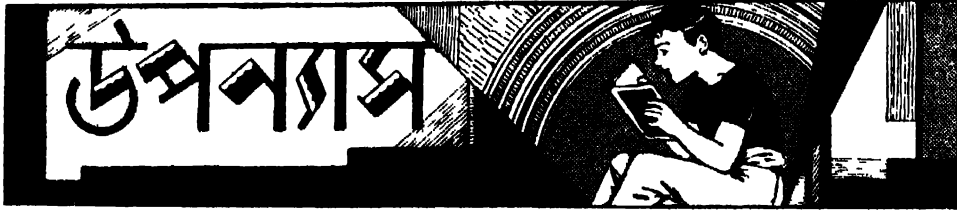
৩১শে মার্চ মঙ্গলবার বেলা ১২টা

শ্রীতাপসরঞ্জন সরকার

একোনবিংশতি

(বাঘে-মানুষে)

বিজয় সুটকেশ হাতে নিয়ে টর্চের আলোতে পথ দেখে আস্তে আস্তে এগলো। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে দেখতে পেল যে রাস্তায় মোটরের হেডলাইট-ভাঙ্গা কাঁচের টুকরো পড়ে রয়েছে। তখন বিজয় বুঝতে পারলে যে অশোকের গাড়ী খানাকেও সম্ভবত অন্ধ কোরে দেওয়া হয়েছে। আরও কিছুদুর গিয়ে বিজয় দেখলে যে বড় রাস্তা থেকে যে শাখা পথ বেরিয়ে ডানদিকের পর্বতশ্রেণীর ভিতর দিয়ে চলে গেছে সেই পথে বড় রাস্তা থেকে এক-খানা মোটরের চাকার দাগ বেঁকে এসেছে, আর একখানা মোটরের চাকার দাগ সোজা বড় রাস্তা দিয়েই চলে গিয়েছে। বিজয় রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে লাগলো যে কার গাড়ীখানা এই শাখা রাস্তা দিয়ে বেঁকে গেছে। বিজয় অবশ্য লক্ষ্য কোরেছিল যে দু'খানা গাড়ীর চাকার দাগ দু'রকম। বড় রাস্তা ধরে যেখানা গেছে তার চাকার লম্বা ডোরা কাটা দাগ আর যে গাড়ীখানা শাখা পথে বেঁকে গিয়েছে সেখানার চাকার দু'দিকে ছোট ছোট চৌকো দাগ কাটা রয়েছে। অশোকের গাড়ীর টায়ার কীরকম ছিল বিজয় স্মরণ করতে পারলে না। আবার সেই ভাঙ্গা গেটের কাছে ফিরে এসে টর্চের আলোতে কি যেন সে খুঁজতে লাগলো। রাস্তার এক পাশে ঘাসের ভিতর একখানা সদ্য ভাঙ্গা কাঠ পড়ে রয়েছে দেখতে পেয়ে তুলে নিল। এই কাঠের টুকরোটায় বিজয় একটা মোটরের চাকার দাগ দেখতে পেল। দাগটা মিলিয়ে দেখলে যে, শাখা পথে যে মোটরের চাকার দাগ রয়েছে সেই দাগের সঙ্গে এই কাঠের টুকরোটার দাগ হুবহু মিলে যাচ্ছে। তখন বিজয় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হোল যে পলাতক আসামীদের গাড়ীখানাই শাখা রাস্তা দিয়ে চলে গিয়েছে; কারণ পূর্বোক্ত সদ্য ভাঙা কাঠের টুকরোখানা বিদীর্ণ গেটেরই একটা অংশ। গেট বন্ধ থাকাতে সম্মুখের গাড়ীখানাই প্রথম গেটটাকে ধাক্কা মেরে ভেঙ্গে চলে গেছে, এবং সেই ধাক্কার চোটেই গেটের একটা অংশ ভেঙে ছিটকে দূরে পড়ে গেছে, এবং এই আঘাতের দরুণই সেই ভাঙা কাঠের টুকরোটায় পলাতক মোটরের চাকার একটা ছাপ রয়ে গেছে। বিজয়ের একথাও মনে হল যে রাস্তার উপর ছড়ান অন্যান্য কাঠের টুকরোগুলোতে অশোকের মোটরের দাগও হয়ত থাকতে পারে, তাই সে বুদ্ধি কোরে রাস্তার কিনারে ঘাসের উপর থেকে আরও দু'একখানা টুকরো যোগাড় করে দেখলে এবং বুঝতে পারলে যে অশোকের গাড়ী রাস্তা ছেড়ে ঘাসের উপর ওঠেনি। তখন সে কাঠের টুকরোখানা ছুড়ে ফেলে দিয়ে

খুশী হয়ে সেই শাখা রাস্তা ধরে চলতে চলতে পাহাড়ের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হয়ে গেছে। আকাশে তখনও মেঘের ছুটোছুটি চলছে। নক্ষত্রের চিহ্নমাত্র নেই। একমাত্র টর্চের আলোতে পথ দেখে দেখে বিজয় সুটকেশ হাতে সেই অজানা বিভীষিকাপূর্ণ পাহাড়ের সঙ্কীর্ণ পথ দিয়ে একে বেঁকে চলেছে। অনেকটা রাস্তা এগিয়ে বিজয় দেখতে পেলে যে এই রাস্তা থেকে আবার একটা সরু পথ ক্রমে উঁচু হয়ে সোজা পাহাড়ের দিকে উঠেছে।

বিজয় টর্চের তীব্র আলোতে দেখলে যে মোটরের চাকার দাগ এখানে বেঁকে সেই সরু পথে গিয়েছে। সেপথে অল্পদূর গিয়েই দেখে পথ আরও সরু হয়ে এসেছে। সে পথে মোটর যেতে পারে না। বিজয় টর্চের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখলে ভিজে মাটির পথে দুটি লোকের পায়ের গভীর দাগ। বিজয় তখনই সুটকেশ খুলে একটা পায়ের ছাপ বার করে মিলিয়ে দেখে বুঝতে পারলে দুজন লোকের মধ্যে একজন তার অতি পরিচিত আফ্‌তাব। ডান হাতে পিস্তলটা চেপে ধরে বাঁ হাতে সুটকেশ ঝুলিয়ে নিয়ে বিজয় সেই সরু রাস্তা দিয়ে বরাবর উঁচুতে উঠতে লাগলো। অন্ধকার রাত্রিতে এই পাহাড়ের উঁচু নীচু রাস্তায় বারবার হোঁচট খেতে লাগলো কিন্তু এখানে টর্চ জ্বালতে তার সাহস হল না। তাতে বিপদের সম্ভাবনা আছে।

প্রায় মিনিট পনর অগ্রসর হয়ে বিজয় একটা সমতল জায়গায় এসে উপস্থিত হল। জায়গাটা ঘন জঙ্গলে আচ্ছাদিত। কাছে কোথাও লোকালয় আছে বলে মনে হোলনা। বিশেষত চারিদিকে পাহাড়ের উপর এত উঁচু গাছ যে মাটিতে দাঁড়িয়ে দূরের কোন কিছুই দেখা যায় না। বিজয় তখন একটা খুব উঁচু গাছের গোড়ায় সুটকেশটা রেখে, মালকোঁচা বেঁধে কাপড় পরে সেই গাছ বেয়ে উপরে উঠতে লাগলো। হঠাৎ নাড়া পেয়ে গাছ থেকে দু'তিনটা পাখী পাখা ঝটপট কোরে উড়ে চলে গেল। কিন্তু বিজয় ভয় পাবার ছেলে নয়, সে উঠে এল এমন একটা উঁচু ডালে যেখান থেকে এই আঁধার রাতেও নীচটা স্পষ্ট দেখা যায়। বিজয় অনেকক্ষণ পর্যন্ত এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলে কিন্তু কোথাও জন প্রাণীর বা আলোর চিহ্নমাত্র দেখতে পেলে না। তবুও সে নিরাশ না হয়ে একটা কিছু দেখবার আশায় চারদিকে বার বার তাকাতে লাগলো। হঠাৎ এই সময় একেবারে খুব কাছেই একটা গুলির আওয়াজ শুনতে পেয়ে সে চমকে উঠল। কিন্তু, ভয় না পেয়ে যেদিক থেকে গুলির আওয়াজ এলো সেইদিকে নিঃশব্দে কান পেতে চেয়ে রইল। একটু পরে সেদিকে একটা উজ্জ্বল আলো দেখতে পেল। আলোটা ছোট্ট একখানা বাংলো বাড়ীর জানালা দিয়ে আসছিলো। সেই মুহূর্তেই দেখলে বাড়ীর একটা দরজা খুলে গেল, একটি লোক টর্চ হাতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলো এবং পূর্বোক্ত জানালার সামনে একটা ঝোপের মধ্যে আলো নিক্ষেপ করে কী যেন খুঁজতে লাগল। সহসা বিজয় সেই আলোতে স্পষ্ট দেখতে পেলে যে সেই ঝোপের ধারে পড়ে ছটফট করছে একটা সদ্যহত নেকড়ে বাঘ। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তিও ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হল। কিন্তু ব্যাপারটা অধিক দূর আর গড়ালো না কেননা আহত ব্যাঘ্রটাকে লক্ষ্য করে আর একটা গুলি মেরে তারা আবার বাড়ীর মধ্যে ফিরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ হয়ে গেল এবং আবার পূর্বের ন্যায় স্তব্ধ অন্ধকার রাত্রে মাত্র ঝিল্লীর রব শোনা যেতে লাগলো।

আস্তে আস্তে বিজয় তখন গাছ থেকে নামলো। সুটকেশ হাতে নিয়ে এগিয়ে চলল সেই বাংলোর দিকে। বাঘের পরিণাম স্বচক্ষে দেখেও তার চৈতন্য হল না।

তখন রজনী প্রভাতকল্পা। পূর্বাকাশে কালো মেঘের মাথায় লাল সিঁদুরের ঈষৎ আভা আয়ুষ্মতীর শিরোভূষণের ন্যায় শোভা পাচ্ছে। দূর থেকে ভোরের পাখীর সুমিষ্ট কলরব মৃদু বায়ু তরঙ্গে ভেসে আসছে। আর আসছে নানা সদ্য প্রস্ফুটিত সুগন্ধ পুষ্পের মনোমদ সুরভি সুবাস। মেঘ নেই, বৃষ্টি নেই, আলো নেই, আঁধার নেই, ঝড় নেই, ঝঞ্ঝা নেই, শুধু আছে নির্মল স্নিগ্ধ আকাশে তরুণ আলো ও তরল আঁধারের কোলাকুলি। বিজয়ের শরীর ক্লান্ত, দুই চোখে ঢুলে আসছিল আরাম দায়িনী নিদ্রা। সে ত্রস্তপদে গিয়ে ঢুকে পড়ল সেই ঘন ঝোপটার মধ্যে।

সেখানে মৃত ব্যাঘ্রটা আড়ষ্ট হয়ে পড়ে রয়েছে, একেবারে স্থির নিশ্চল। গুলিতে তার মস্তক বিদ্ধ হয়ে গেছে। বিজয় তাড়াতাড়ি সুটকেশ খুলে একটা কি যন্ত্র বের কোরে বাঘের মাথা থেকে গুলিটা বের কোরে নিলে। তারপর সুটকেশের একটা গুপ্ত অংশ থেকে সে আততায়ীর রিভলভারে নিহত কেষ্টার বক্ষ হোতে উদ্ধৃত ও সাবধানে রক্ষিত গুলিটি বের কোরে এই গুলিটার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলো যে দুটোই এক সাইজের এক মেকারের। তখন বিজয়ের বুঝতে আর বাকী রইলো না যে এরা দুজনই তার পূর্ব পরিচিত নবীন ও আফতাব।

চারিদিক থেকে "কা" "কা" রব বিজয়কে জানিয়ে দিল যে রাত্রি ভোর হয়ে গেছে। বিজয় তাড়াতাড়ি সুটকেশটিকে হাতে নিয়ে আবার খানিকটা উঁচু নীচু অসমতল পথ বেয়ে একটা জঙ্গলে ঢুকে পড়লো। একটা গাছের গোড়ায় মাঝারি রকমের একটু প্রশস্ত জায়গা দেখতে পেল। স্থানটি বেশ পরিষ্কার, অথচ বাইরে থেকে কিছু দেখা যায় না। রাত্রি জাগরণে অবসাদ গ্রস্ত

দেহকে একটু ঝরঝরে কোরে নেবার জন্ম উপরন্ত পলাতক আসামী দু'টোর উপর কড়া নজর রাখবার জন্ম বিজয় এই স্থানেই অবস্থানের ব্যবস্থা করে সুটকেশটিকে একটা পাথরের আড়ালে রেখে ছদ্মবেশে বেরিয়ে পড়ল পাবলিক ফোনের অভিমুখে। পূর্বোক্ত থানার সেই ইনসপেক্টারের কাছে ফোন করে বললে, "নবীন ও আফতাবের খোঁজ পাওয়া গেছে। থানা থেকে সাঁইত্রিশ মাইল উত্তরে বড় রাস্তা থেকে যে শাখা পথ ডানদিকে চলে গেছে সেই রাস্তার থার্ড মাইল পোষ্টের ডান দিকের পাহাড়ের উপর একটা জঙ্গলের মধ্যে আমি আছি। রাস্তার ধারে লোক-জন ও মোটর থামিয়ে নিঃশব্দে একজন যেন এগিয়ে এসে আমাকে খবর দেয়, যে গাছের ডালে একখানা ঘুড়ি আটকে আছে সেই গাছের তলায় আমায় পাবে।"

ফোন করে ফিরে এসে সেই ঝোপের মধ্যে একখানা পাথরে মাথা রেখে আরামের নিঃশ্বাস ফেলে বিজয় যখন আস্তে আস্তে চোখ বুজলে তখনও সূর্য ওঠেনি। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে অত্যন্ত শান্তিময় ঘুম এসে তাকে নিয়ে চললো কোন অজানা, রহস্যময়, বিভীষিকাপূর্ণ স্বপ্ন লোকে...।

বিংশতি
(গুহাগর্ভে)

পনর কি কুড়ি মিনিট মাত্র ঘুমুতে না ঘুমুতে বিজয় হঠাৎ কিসের যেন নাড়া পেয়ে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসলো। চোখটা একটু রগড়ে সে স্পষ্ট দেখতে পেল যে, যে পাথরটার উপর মাথা রেখে সে ঘুমিয়েছিল সেই পাথরটা একটু একটু কোরে সরে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে রিভল-বারটা বের কোরে বাগিয়ে ধরে বাঁ হাতে সে পাথরটা টেনে সরাতে চেষ্টা করলে। মিনিট পাঁচেক সবলে টানাটানির পর হঠাৎ পাথরটা সশব্দে উল্টে পড়ে গেল আর বিজয়ের বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টির সম্মুখে আবিষ্কৃত হোল এক অন্ধকারময় গুহাপথ। কিন্তু এই অন্ধকারময় গুহাপথে বিজয়ের কিছুই দৃষ্টি গোচর হোল না। বিজয় ভাবলে যদি এই পথে কেউ নাই এসে থাকে তো পাথর নড়লো কি কোরে? বিজয় তাড়াতাড়ি টর্চ বের কোরে নিঃশব্দে ও অতি সন্তর্পণে সেই গুহা পথে নেমে পড়লো। একহাতে টর্চ জেলে ও অন্য হাতে পিস্তল ধরে বিজয় কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পরেই সহসা কাঁধের উপর কার হস্তের কঠিন স্পর্শ অনুভব করলো। মুহূর্তের মধ্যে বিজয় পিস্তল ও আলো ঘুরিয়ে ধরে ঘোড়া টিপতে গিয়ে চীৎকার কোরে বলে উঠলো, "একি! অশোক! তুই এখানে? অশোক মুখে আঙুল চাপা দিয়ে চাপাগলায় ইঙ্গিতে বললে চুপ, আস্তে। বলছি সব। তুই এসে ঢুকেছিস এর মধ্যে আমি কল্পনাও করতে পারি নি। শীগগির আলো নিবিয়ে দে। স্টেশন থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে আমি তোদের বাসের পেছনে ধাওয়া না কোরে ডান দিকের রাস্তা ধরে এগিয়ে যাই। আমি জানতুম যে ডান দিকের রাস্তা ঘুরে গিয়ে বাসের রাস্তার সঙ্গে মিশেছে, সুতরাং এ রাস্তায় স্পীড দিয়ে যেতে পারলে হয়তো নবীনের ট্যাক্সিখানার সামনে গিয়ে পড়তে পারি। এই ভেবে গাড়ী ডানদিকের রাস্তা দিয়েই নিয়ে যাই। কিন্তু যা ভেবেছিলুম তা হল না, কারণ ট্যাক্সিখানা মাঝপথে হঠাৎ বিগড়ে গেল। ওটাকে সেরে নিতে অনেক সময় নষ্ট হল। নবীনের গাড়ীর সামনে যে আর যেতে পারবোনা সে বিষয়ে যখন স্থির নিশ্চয় হলুম তখন যাতে অন্ততঃ পক্ষে ওর ট্যাক্সিখানাকে ধরতে পারি সেইজন্য ফুল স্পীডে গাড়ী চালিয়ে দিলুম। তোদের রাস্তায় এসে পড়েই নবীনের গাড়ী দেখতে পেলুম। কিন্তু তোদের গাড়ী না দেখে বুঝতে পারলুম যে হয় তোরা ভুল পথে গিয়েছিস্ নয়ত রাস্তায় কোন বিপদ হয়েছে। যাক্, চখের সামনে পাখী উড়ে পালায় দেখে তোদের জন্য আর মাথা না ঘামিয়ে নবীনের গাড়ীরই পেছু নিলুম। কিন্তু এমনিই দুর্ভাগ্য, প্রায় যখন নবীনের গাড়ীর নাগাল ধরে ফেলেছি, ওদের গাড়ীর পিছনের উইণ্ডস্ক্রীন ফুঁড়ে দু'টো গুলি এসে আমার গাড়ীখানাকে একেবারে অন্ধ করে দিলে। বিজয় বললে, "হ্যাঁ এই পর্যন্ত আমিও জানি তারপর?"

[ক্রমশঃ

পোড়ো বাড়ী

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

পোড়ো জমি ঝরা পাতা বুনো ঝোপ ঝাড়
ভাঙ্গা বাড়ী পড়ে আছে মরা নিঃসাড়
কড়ি কাঠে দোল খায় চামচিকেরা
থম থমে অতীতের স্বপ্ন ঘেরা ;
কত ঘৃণা কত প্রেম কত বিদ্বেষ,
বালিখসা পাঁচিলেতে নাই স্মৃতি লেশ ॥

পশু-পক্ষী সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, এম, এ

প্রকৃতির খেয়ালে অনেক প্রকার মজার ব্যাপার ঘটতে দেখা যায়। কুকুরের ল্যাজ থাকাটাই স্বাভাবিক কিন্তু "স্কিপিকি" নামে এক রকমের কুকুর আছে তাদের ল্যাজ নেই। এক সময় নাকি এদের ল্যাজ ছিল, খুব লম্বা এবং সামনের পা দু'টো ছিল, অস্বাভাবিক রকমের ক্ষুদ্র। তারা তখন কাঙারুর মত লাফিয়ে লাফিয়ে চল্‌তো। এখন ল্যাজের বিনিময়ে নাকি তারা স্বাভাবিক পা পেয়েছে।

হাজার হাজার বছর আগে জলচর পাখীদের নাকি চঞ্চুতে দাঁত ছিল এবং তাদের কোন পাখাই ছিল না। এখনও অনেক পক্ষশূন্য পক্ষী আছে। এদের নাম "এ্যাপ্টারিক্স" বা "কিউই-কিউই।" "এ্যাপ্টারিক্স" লাটিন শব্দ। এর মানে,—পক্ষ-হীন। কিউই-কিউই করে ডাকে, তাই ডাক থেকে ওদের দ্বিতীয় ধ্বন্যাত্মক নামকরণ—কিউই-কিউই করা হয়েছে। এরা নিউজিল্যাণ্ডের অধিবাসী। এরা অতি দ্রুতগামী। শৈবালময় স্থানে বাস করে। রাত্রিতে ছাড়া বার হয় না ব'লেই সম্ভবতঃ এরা এখনও ধরাপৃষ্ঠ হ'তে বিলুপ্ত হয়নি।

সৃষ্টির আদিম সময়ে সমস্ত প্রাণীই নাকি ডিম পাড়তো এবং ডিমের ওপর ব'সে 'তা' দিয়ে ফোটাতো। গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে অনেক সময় সূর্যদেবের উপরেই ও কার্যের ভারটা দিয়ে তা'রা নিশ্চিন্ত থাক্‌তো। এখন কিন্তু পাখী আর সরীসৃপেরাই কেবল ডিম পাড়ে। পাখীদের ডিমের উপর থাকে—কঠিন খোলা, আর সরীসৃপদের ডিমের উপর বিরাজ করে—ঘন ত্বক, এইমাত্র প্রভেদ।

এপর্যন্ত যা' বলা হল, "প্লাটিপাস" নামক এক প্রকার ক্ষুদ্র উদ্বিবাড়লই বোধ হয় তা'র একমাত্র ব্যতিক্রম। এই উদ্বিড়ালদের পাতিহাঁসের মত চঞ্চু আছে।

এইবার পাখীদের রেখে পশুদের সম্বন্ধে কিছু বলি। অনেক ভুতুড়ে গল্পে নিশাচর জীবজন্তুদের কণ্ঠনিনাদই প্রধান উপাদান।

শজারুরা নাকি দুধ খেতে খুব ভালবাসে। গরুর বাঁট থেকে দুধ চুরি করে খাবার গল্প এতদিন আমরা সর্প মহাশয়দের একচেটে কীর্তি ব'লে শুনে' এসেছি। কিন্তু শজারুরাও ওই কার্যে সাপের চেয়ে কম ওস্তাদ নয়। যাক। এইবার ওদের নিনাদ সম্বন্ধে কিছু বলি।

অনেক সময় ওরা এমন শব্দ ক'রে যে তা' শুন্‌লে মনে হয়, যেন ভীষণ আঘাত-প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি অতি কষ্টে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করছে।

নিশীথ রাত্রে রুষ্টা শেয়ালীর ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর এমনি ভীতিপ্রদ যে সারা শরীর কণ্টকিত হয়ে ওঠে।

সিংহের ডাক যে ভীষণ তা' অবশ্য সকলেই আন্দাজ করতে পারে। কিন্তু, জেব্রার ডাক কি রকম মনে হয়? অশ্বের মত কি?

আফ্রিকায় এখনও অজস্র জেব্রা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। ওদের দেশের লোক জেব্রাকে বলে,—"পুণ্ডামিলিয়া" যার মানে,—ডোরা কাটা গাধা। ওদের নিনাদ কি তবে গাধার মত? না, তাও নয়।

তবে কি রকম? প্রায় থেঁকি কুকুরের মত। এইবার একপ্রকার পাখীর ও ডাকের সম্বন্ধে কিছু ব'লে বিদায় গ্রহণ করি।

আফ্রিকায় একপ্রকার সারস আছে, যাদের নাম,—"কার্বিরেন্দো।" তা'রা মাথার উপর দিয়ে সার বেঁধে যখন উড়ে চলে, তখন ডাক্‌তে ডাক্‌তে উড়ে যায়। তাদের কণ্ঠস্বর নাকি ঠিক ক্ষুদে বেরাল ছানার মিউ মিউ ধ্বনির ন্যায় শোনায়।

তাদের ডাক শুনে' কেউ যদি বেরাল ছানা ধ'রতে ছুটে যায় তা' হলে কিরূপ মজা হয়, সেটা ভেবে দেখ্‌বার কথা নয় কি?

কালিদাসের বুদ্ধি

মজহারুদ্দীন ভূঁইয়া

মহাকবি কালিদাসের নাম তোমরা নিশ্চয় শুনে থাকবে। হালে যেমন কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-জোড়া খ্যাতি, তেমনি সেকালে কালিদাসের নাম ভারতে লোকের মুখে মুখে ফিরত।

পুরাকালে মহারাজ বিক্রমাদিত্য ছিলেন খুব বিদ্যোৎসাহী। তিনি রাজ্যের বড়-বড় নয়জন জ্ঞানী ও গুণী কবিদের নিয়ে গ'ড়ে তুলেছিলেন—'নবরত্ন' সভা। এই নবরত্নের মধ্যে মহাকবি কালিদাস ছিলেন শ্রেষ্ঠ রত্ন।

কালিদাসের যেমনি ছিল কবিত্ব-প্রতিভা, তেমনি বুদ্ধি-কৌশল।

কালিদাসের আমলে ভারতে ভোজ নামে এক রাজা ছিলেন খুব বিদ্যোৎসাহী। কবিতা শোনা তাঁর বাতিক ছিল। দেশ-বিদেশ হতে কবিদের দরবারে ডেকে এনে নিত্য নূতন কবিতা শুনতে তিনি বেজায় ভালবাসতেন।

একদা ভোজরাজা রাজ্যময় ঘোষণা ক'রে দিলেন,—যে কবি তাঁকে নিত্য নতুন কবিতা শোনাতে পারবেন, তাঁকে রাজকোষ হতে একলক্ষ সোনার মোহর বখশিস্ দিবেন। এ সংবাদ রাষ্ট্র হ'য়ে পড়লে রাজ্যের ছোট-বড় যেখানে যত কবি ছিলেন, এসে জড়ো হলেন রাজসভায়।

প্রতিদিনই রাজা কবিতা শোনেন, কিন্তু কারো কবিতাতেই নতুনত্ব নেই, এই অজুহাতে কোন কবিই আর রাজ-ঘোষিত পুরস্কার পান না বরং পুরানো কবিতা আওড়ান ব'লে তাঁদের অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে যেতে হয়।

দেশবিদেশের অনেক প্রসিদ্ধ কবিরা নিজেদের অসামান্য প্রতিভার সাহায্যে কত সুন্দর কবিতা লিখে ভোজ-রাজের সামনে আবৃত্তি করেন, অথচ কারো কবিতাতেই নতুনত্ব নেই, এ কেমন কথা? আসলে ব্যাপার হ'ল কি,—ভোজরাজ নিজের সভায় এমন কয়েকজন শ্রুতিধর পণ্ডিত রাখতেন,—যাঁরা অপরের মুখে এক, দুই, তিন বা চারবার কবিতাটি শুনলে বেশ মনে রাখতে পারতেন এবং গড়গড় ক'রে মুখস্থ বলে দিতেন।

কবিরা আবৃত্তি করতেন, আর রাজা ও আর আর স্মৃতিশক্তিশালী পণ্ডিতগণ খুব মন দিয়ে শুনতেন। একবার শুনে যে পণ্ডিত অবিকল বলতে পারতেন, তিনি দাঁড়িয়ে রাজাকে বলতেন—"মহারাজ এ কবিতা অতি পুরানো, তার প্রমাণ এটি আমার মুখস্থ রয়েছে—অনেক আগে হতেই জানি।" এই না বলে গোটা কবিতাটা হুবহু আবৃত্তি করতেন।

এর পর আসত দ্বিতীয় পণ্ডিতের পালা। তাঁর তখন কবিতাটি দুবার শোনা হয়েছে—একবার কবির মুখে অপরবার ১ম পণ্ডিতের মুখে। কাজেই তিনিও সহজেই তা আবৃত্তি ক'রে কবিতার প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন করতেন।

এইরূপে তিন-চারবার শুনে যাঁদের আয়ত্ব হ'ত তাঁরাও আবৃত্তি করে যেতেন। এতে সকলেই ভাবত এ-কবিতা নিশ্চয় পুরানো, তা নৈলে এতগুলি লোকের কি ক'রে আগে থাকতেই জানা থাকল?

কবিরাও অবাক হয়ে ক্ষুণ্ণ মনে ফিরে যেতেন।

এমনি করে রাজার প্রতিশ্রুত লক্ষমুদ্রা আর কারো কপালে জুটে না।

অবশেষে এ খবর কবি-শ্রেষ্ঠ কালিদাসের কানে গেল। ভোজরাজার চালাকি বুঝতে তাঁর দেরি হ'ল না। তিনি ফন্দি আঁটলেন,—এই রাজা ও তাঁর শ্রুতিধর পণ্ডিতমণ্ডলীকে জব্দ করতে হবে। এই-না মৎলব ক'রে কালিদাস একটি কবিতা লিখে নিয়ে রাজদরবারে হাজির হলেন।

কবিতাটির মর্ম এইরূপ:—

"—মহামতি ভোজরাজ। আপনার পিতা আমার কাছ হতে এক কোটি নিরানব্বই লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ঋণ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এখন বেঁচে নেই, আপনি তাঁর কৃতি সন্তান; সে ঋণ শোধের কর্তব্য বর্তমানে আপনাতে বর্তেছে। আপনার পণ্ডিতগণকে জিজ্ঞেস করুন আমার কথা মোটেই মিথ্যে নয়। যদি পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে না জানার ভান করেন, তবে আমার কবিতাটি যে একেবারে নূতন, তা মহারাজ স্বীকার করবেন এবং কবিতার নূতনত্বের জন্য আপনার অঙ্গীকৃত এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা আমি অবশ্যই পেতে পারি।"

মহাকবির এই অসামান্য বুদ্ধিকৌশলময় কবিতা শুনে সভাস্থ সকলে হতবাক হয়ে এ ওর দিক চাইতে লাগল।

ভোজরাজ ভেবেছিলেন,—কবিতাও শোনা হবে অথচ কাউকে টাকাও দিতে হবে না। কিন্তু এবার কালিদাসের কৌশলে তিনি বিপদে পড়ে গেলেন।

অনেক ভেবে-চিন্তে তিনি কবিকে পরদিন এসে পুরস্কার নিতে ব'লে দিলেন।

তারপর ভোজরাজ পণ্ডিতদের নিয়ে মন্ত্রণা করতে বসলেন,—কি ক'রে মান ইজ্জত বজায় রাখা যায়।

সকলেই নীরব—চিন্তায় মগ্ন। সহসা সভার এক কোন থেকে এক প্রবীণ পণ্ডিত বললেন—"রাজন্! আপনার পিতৃদেবের নিজহাতে লেখা এক কবিতা আছে আমার কাছে, তাতে লেখা:—

শিপ্রা নদীর তীরে আমার প্রমোদভবনে যে একটি তালগাছ আছে, আমি আষাঢের দিবা দ্বিপ্রহরে সেই তালগাছের মাথায় অনেক ধনরত্ন রেখে গেলুম, আমার ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী সে ধন-দৌলৎ গ্রহণ করবে।

আপনি কালিদাসের কবিতাকে পুরাণো বলে বাদ দিয়ে দিন এবং এই কবিতায় নির্দেশিত গাছের মাথা হতে তাঁকে তাঁর ঋণ শোধ নিতে বলুন। এতে কালিদাসের দর্প চূর্ণ হবে, আমাদেরও মান সম্ভ্রম বজায় থাকবে।

রাজা একথা যুক্তিসহ ব'লে মেনে নিলেন। সবাই মত দিলেন—তাই হোক মহারাজ!

পরদিন কালিদাস আসতেই পণ্ডিতগণ মত দিলেন,—এ কবিতা নেহাৎ সেকেলে পুরাতন, বলেই সকলে একে একে অনর্গল আবৃত্তি করে গেলেন।

তালগাছের মাথায় অজস্র ধন-দৌলৎ থাকতে পারে, এ পাগল বৈ কে বিশ্বাস করবে? তাই না ভেবে মহারাজ সেই পিতৃ-লিখিত কবিতা কালিদাসকে দিয়ে ঋণ শোধ নিতে আদেশ দিলেন। এবং কবিকে খুব বোকা বানিয়েছেন ভেবে রাজা ও পণ্ডিতগণ খুব খুশী হলেন।

কালিদাস নিজের বুদ্ধিবলে কবিতার মর্ম বুঝে বৃক্ষমূল খুঁড়ে মাটিতে পোঁতা দু'কোটি সোনার মোহর পেলেন। অতঃপর রাজসভায় এসে বললেন,—"আমি তালগাছের গোড়ায় বিস্তর মোহর পেয়েছি তার পরিমাণ দু'কোটি। আপনার পিতৃ-ঋণ শোধ হয়েও একলাখ বেশি হচ্ছে, তা মহারাজকে ফেরৎ দিতে এসেছি।"

কালিদাসের কথা শুনে রাজা অতি বিস্মিত হয়ে বললেন,—"মহাভাগ, আপনার বুদ্ধির অপূর্বতা ও প্রতিভার নব নব উন্মেষশালিনী শক্তিকে অজস্র ধন্যবাদ। পিতার কবিতায় লিখিত ধনাগার তরুমূলে নিহিত আছে তা আপনি কেমন ক'রে ঠিক করলেন? অনুগ্রহ করে তা জানিয়ে কৌতূহল নিবৃত্ত করুন।"

কবি-চূড়ামণি কালিদাস হেসে জবাব দিলেন—"গাছের মাথায় কেউ ধন রাখে না। আষাঢ় মাসের দিবা দ্বিপ্রহরে গাছের মাথার ছায়া ঠিক পায়ে এসে ঠেকে, সেই মর্মানুযায়ি গাছের গোড়ায় খনন ক'রে এই ধনরাশি পেয়েছি।"

কালিদাসের কথা শুনে রাজা ও সভাসদ পণ্ডিতগণ তাঁর অপূর্ব বুদ্ধিমত্তার কাছে মাথা নত করলেন।

সোভিয়েট প্রাসাদ ক্রেমলিন

প্রতুলচন্দ্র সরকার

মস্কো শহরের ক্রেমলিন (Kremlin) প্রাসাদের প্রাচীরের অন্তরালে ষ্টালিন ও তাঁর অনুচরবর্গ নিরাপদে সোভিয়েট নীতি অনুসরণ করে আসছেন। বর্তমান যুগ থেকে নয়, ৎসার (Tsar) দের সময় থেকে রাশিয়ানরা ক্রেমলিনকে রাজশক্তির সংস্কারাচ্ছন্ন ভয় ও বিস্ময়ের চোখে দেখে এসেছে। পুরাতন রুশীয় প্রবাদ প্রচলিত আছে—

"Above Moscow is only the Kremlin, and above the Kremlin is only heaven"

"মস্কোর মস্তকে ক্রেমলিন দুর্গ।
ক্রেমলিন শিরে শুধু বিধাতার স্বর্গ॥"

ভ্রমণকারীদের চোখে নানান দেশের মন্দির, প্রাসাদ, অট্টালিকা ও বিশেষ বিশেষ দৃশ্য যে অভিনব রূপ নিয়ে ভেসে ওঠে, ক্রেমলিনের রহস্যময়, ঐশ্বর্যমণ্ডিত সৌন্দর্য তা থেকে বহু গুণে বিভিন্ন ও বৈচিত্র্যময়। পঁয়ষট্টি ফুট উঁচু প্রাচীরের উপর অপরূপ ভাস্কর্য্যময় উনিশটি সুবিশাল গম্বুজওয়ালা চূড়া এই বিরাট প্রাসাদের সম্মুখভাগে নির্ম্মিত হয়েছে, চোখে না দেখলে ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব।

ক্রেমলিনের অভ্যন্তরে এমন কতকগুলি অট্টালিকা আছে বহুবৎসর পূর্বে যেগুলি গীর্জা হিসাবে ব্যবহৃত হত। এদের মধ্যে একটি এখন সামরিক শিক্ষায়তন ও সেনানিবাস ও অপরটি উচ্চ আদালত গৃহ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। লেনিনের স্মৃতি মন্দিরও এইখানে অবস্থিত। বহু খ্যাতনামা বৈপ্লবিক নেতাদের দেহাবশেষও ক্রেমলিনের বহিঃপ্রাচীরের চারিধারে প্রোথিত আছে।

এই অপূর্ব সোভিয়েট প্রাসাদের বৃহত্তম সৌধ থেকে ক্ষুদ্রতম অট্টালিকা শ্রেণীর কোনটাই সাধারণের অধিগম্য নয়। সমগ্র প্রাচ্যের কোন অট্টালিকা বা প্রাসাদই ক্রেমলিনের মত এত বিস্ময়কর কৌশল ও নিগূঢ়তম গোপনীয়তায় সুরক্ষিত নয়।

সোভিয়েট প্রাসাদে অনুষ্ঠিত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন ও রাষ্ট্রীয় আলোচনা সভায় বৈদেশিক সাংবাদিকদের কচিৎ

প্রবেশাধিকার ঘটে। কোনও সভায় উপস্থিত হ'বার "সাংবাদিক ছাড়পত্র" পাওয়ার পূর্বে সাংবাদিককে কমিশেবিয়েট অফ্ ইন্টার্ণাল এ্যাফেয়ারস্' (Commissariat of Internal Affairs) এর অনুমতি অবশ্যই নিতে হবে। ছাড়পত্রে প্রত্যেক সাংবাদিকের ফটো মুদ্রিত থাকা সত্ত্বেও "প্রেস গ্যালারী"তে যেতে দেওয়ার পূর্বে বিভিন্ন স্থানে পুলিশ ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেককে অনুসন্ধান করে তবে ছেড়ে দেবে। গ্যালারীতেও নিস্তার নেই—সমান সংখ্যায় 'গে-পে-উ'র গোয়েন্দারা উপস্থিত থাকে।

ক্রেমলিন প্রাসাদাভ্যন্তরে সোভিয়েট রাষ্ট্রের যে কার্য কলাপ অনুষ্ঠিত হয় তা আজও উদ্ঘাটিত হয় নি। রাজনৈতিক ব্যাপারে ষ্টালিন কচিৎ ক্রেমলিনের বাইরে যান। যদিও গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির জটিল ব্যাপারে ষ্টালিনের জন্য নির্দিষ্ট অনেকগুলি অট্টালিকা আছে, কোন্‌টিতে কখন তিনি উপস্থিত থাকবেন তা কেউই জানতে পারে না। সুতরাং এথেকে অনুমান করা কঠিন নয় যে ক্রেমলিনের দুর্ভেদ্য প্রাচীরের অন্তরাল থেকেই সোভিয়েট নীতি ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়। এক কথায় এই রহস্যময় প্রাসাদই সমগ্র সোভিয়েট রাষ্ট্রের (U S S R) উচ্চতম পরিচালনা কেন্দ্র। নয় জন সভ্যমিলিত পলিট ব্যুরো (Polit Bureau) ও কাউন্সিল অফ্ পিপলস্ কমিশারস (Council of Peoples' Commissars)—এই দুই রাজনৈতিক সঙ্ঘই সম্মিলিত ভাবে সোভিয়েট রাজ্য শাসন করছেন। এই দুই শাসন সঙ্ঘের সব অধিবেশনই ক্রেমলিনে হয়ে থাকে।

সম্প্রতি, যুগান্তকারী বা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সব চুক্তিপত্রই ক্রেম্‌লিনে স্বাক্ষরিত হয়েছে। ফিনিস্ (Finis) রাষ্ট্রধুরন্ধরেরা রাশিয়ার শাসন সংক্রান্ত দাবী মেটাবার অসফল প্রচেষ্টায় বহুবার ক্রেম্‌লিনে এসেছেন এবং এঁদের মধ্যে শান্তি সন্ধি সব এইখানেই সমাপ্ত হ'য়েছে।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের অনুসৃত নীতি ও রাজ্যশাসন পদ্ধতির ব্যাপারে ক্রেম্‌লিন যেমন একদিকে অপরিহার্যরূপে সহায়ক, অন্যদিকে তেমনি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও জাতিগত মতামতের ব্যাপারে সবিশেষ অভিজ্ঞ, সুতরাং ক্রেমলিন রুষের ব্যাপকতর উন্নতি ও সভ্যতার প্রতিক স্বরূপ।

সোভিয়েটেরা বৈদেশিক সাংবাদিকদের সর্বদাই এড়িয়ে চলে এবং তাদের সান্নিধ্য বা প্রভাব থেকে নিজেদের যতদূর সম্ভব দূরে রাখা যায় তার চেষ্টা করে। কারণ অপবাধজনক ঘটনাচক্র বা সোভিয়েট স্বার্থের পরিপন্থী রাজনৈতিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে কোনও রুষেরই যে অব্যাহতি নেই এ তারা বেশ ভাল ভাবেই জানে। ফিনল্যাণ্ড-রাশিয়ার রাষ্ট্রনৈতিক অভিনয় ব্যাপারে বিদেশে সংবাদ সরবরাহ করার অপরাধে একাধিক সোভিয়েটকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে।

সোভিয়েট্-রাশিয়ার এই বিচিত্রতম প্রাচীন প্রাসাদ আজও দাঁড়িয়ে আছে রহস্যময় অস্তিত্ব নিয়ে, ভীতিপ্রদ বিস্ময় নিয়ে, স্থাপত্য শিল্পের অননুকরণীয় অপূর্বতা নিয়ে। কত শত বৎসর ধরে ক্রেম্‌লিনের প্রাচীরাভ্যন্তরে রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ও জাতিগত উত্থান পতনের বিচিত্র অভিনয় হয়ে এসেছে, এবং অনাগত ভবিষ্যতেও হয়তো হবে। ক্রেম্‌লিন মানব সভ্যতার চঞ্চল আবহাওয়ায় চিরদিনই বিস্ময়-বিমুগ্ধ অনির্বচনীয়তা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। যদি না নাজী বিমান আক্রমণ তাকে ধ্বংস করে দেয়।

অমর অভিলাষ

শ্রীঅতীন্দ্রনাথ মজুমদার

পৃথিবীর কবি আমি নই, হে আকাশ, অয়ি দূরস্থিতা
ছন্দে রূপে, লিখনীর মোহগ্রস্ত নির্বাক আবেগে—
আমার মানসপত্রে তোমাদের করিনি অঙ্কিত ,
বিভ্রান্ত চেতনা রসে মুগ্ধ আমি নহি কোনদিন।—
আমার সম্মুখে ছিল জরাগ্রস্ত বীর্যহীনা ধরা,
অচঞ্চল চক্ষু মেলি' জ্যোতিহীন মুমূর্ষু তপন,
গতিহীন ধরিত্রীর রুদ্ধমানা নির্ঝরের গীতি,
ম্রিয়মান ছিল যত—চিন্তানত কুঞ্জের মল্লিকা।

আজি দেখি ফাল্গুনের রৌদ্রস্নাতা বিশীর্ণা তটিনী
অবনীর প্রাণবৃন্তে আনিয়াছে উচ্ছল জোয়ার
চঞ্চল তরঙ্গাঘাতে ; মৌন গান হোল ঝঙ্কারিত
আজিকার বসুধার কুঞ্জে কুঞ্জে অশোক শাখায়।
আমারে বলিষ্ঠ কর, হে আকাশ, মোরে শক্তি দাও
অমর চুম্বন দানি মৃত্যুহীন, লয়হীন কর,
—অসংখ্য বন্ধন ছেদি দাও সেই অমর্ত্য শকতি
বীর্যবতী করিবারে নব রূপে নব ধরিত্রীরে।

ম্যাক্সিম গোর্কি

হিমাংশু রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

এদিকে গোর্কির মাকে নিয়ে বাড়ীতে একটা অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠছিল। ভাসিলিচ মেয়েকে আবার বিয়ে দিতে চান। ভারভারা রাজী নন। যা হোক শেষটা তিনি সম্মত হলেন। ইউগেন ম্যাক্সিমভ নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর বিয়ের কথাবার্তা এক রকম ঠিকঠাক হয়ে গেল। গোর্কি এসব জানতে পেরে খুব মনমরা হয়ে পড়লেন। একদিন তাঁকে ভাবী বাবা ও ঠাকুর-মার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। গোর্কি ক্ষোভে অভিমানে একটা কথাও বললেন না তাদের সঙ্গে। তাদের উপর হল বিজাতীয় ক্রোধ। কিভাবে এদের জব্দ করা যায় এ দুর্বুদ্ধি তাঁর মাথায় সব সময় খেলত। একদিন তিনি করলেন কি, ম্যাক্সিমভ ও তার মা যে চেয়ারে বসে খাবার খেতেন সে-চেয়ার দুটিতে বেশ করে চর্বি মেখে রাখলেন। তারা না জেনে বসে পড়ে নাকালের একশেষ হলেন। ভাসিলিচ এ কথা শুনতে পেয়ে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বেদম মারলেন। ভারভারাও অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন। তিরস্কার করে বললেন, কেন তুমি দিন দিন এমন দুষ্টু হচ্ছ? জান না এতে আমি কত কষ্ট পাই? বলতে বলতে তাঁর চোখ দুটো ছল্‌ছল্‌ করে উঠল।

গোর্কি মাকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন। মায়ের সজল চোখের দিকে চাইতেই তিনি বিচলিত হয়ে পড়লেন। বললেন, আর কোনদিন করব না। এবারটির মত আমায় ক্ষমা কর।

ভারভারা ছেলের মুখের দিকে স্নেহ-সুগভীর দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, ম্যাক্সিমভের সঙ্গে শীগগিরই আমার বিয়ে হবে। বিয়ের পর আমরা দুজন মস্কো যাব। ফিরে এসে তোমাকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাব। উনি সত্যিই খুব ভাল। তোমায় খুব স্নেহ করেন। দেখবে বড় স্কুলে তোমায় ভর্তি করে দেবেন। তুমি তাঁর মত লেখাপড়া শিখবে। বড় হয়ে হয়ত একজন ডাক্তার হবে—বা অন্যকিছু।

গোর্কি কিন্তু এতে একটুও উৎসাহিত হচ্ছিলেন না। তাঁর একান্ত ইচ্ছে হচ্ছিল তিনি বলেন, তুমি বিয়ে কর না মা। আমি তোমার জন্যে অনেক টাকা রোজগার করব।

কিন্তু শত চেষ্টা করেও তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করতে পারলেন না।

নির্দিষ্ট দিনে ভারভারার বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে তিনি চলে গেলেন। গোর্কি দাদু-দিদিমার কাছেই রইলেন। ভাসিলিচের আর্থিক অবস্থা সে সময় বিশেষ ভাল ছিল না। তার উপর ভারভারার বিয়ের খরচ যোগাতেও তিনি সর্বস্বান্ত হলেন। অভাবে মানুষের স্বভাব নষ্ট হয়। ভাসিলিচের খিটখিটে মেজাজ আরো উগ্র হয়ে উঠল। সামান্য কারণে বা অকারণে তিনি ভীষণ চটে যেতেন। এবং এর ফল ভোগ করতে হত গোর্কির দিদিমাকে। বুড়ো বয়সে স্বামীর উৎপীড়নে তাঁর আর ক্লেশের অন্ত রইল না। তিনি কিন্তু পতিব্রতা স্ত্রীর মত নীরবে নতমুখে সব দুঃখকষ্ট সহ্য করতেন। কোনদিনও প্রতিবাদ করেন নি। এমনি দূষিত পরিবেশের মধ্য দিয়ে গোর্কির দিনের পর দিন কাটতে লাগল।

কতদিন পর ভারভারা ও ম্যাক্সিমভ ফিরে এলেন। ভাসিলিচ ইতিমধ্যে জানতে পেরেছেন, মেয়েকে তিনি বিয়ে দিয়েছেন এক অপদার্থের সঙ্গে। লোকটা চরিত্রহীন। জুয়া খেলে বাড়ীঘর নষ্ট করে এসেছে। এত সাধ করে তিনি মেয়ের বিয়ে দিলেন তার পরিণাম কিনা এই হল। জামাতার উপর তাঁর আর রাগের সীমা রইল না। বেশ কতকগুলো কড়াকড়া কথা তিনি ম্যাক্সিমভকে শুনিয়ে

দিলেন। ম্যাক্সিমভ মিথ্যা যুক্তি দিয়ে ভাসিলিচের ধারণাকে ভুল প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করলেন। ফলে কথা কাটাকাটি শুরু হল। শেষটা ম্যাক্সিমভ রাগ করে স্ত্রী ও গোর্কিকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ী ছেড়ে চলে এলেন।

নতুন বাড়ীতে গোর্কির কিন্তু এক মুহূর্তও মন টিকত না। সব কিছুই যেন কেমন বিশ্রী ঠেকত। তা ছাড়া তার মার ব্যবহারও তাকে পীড়িত করে তুলছিল। দিন দিনই ভাবভারার মেজাজ রুক্ষ হয়ে উঠছিল। এর প্রধান কারণ স্বামীর মর্মান্তিক দুর্ব্যবহার। ম্যাক্সিমভের রূঢ় আচরণ তার সমস্ত মনপ্রাণকে বিষিয়ে তুলছিল। এবং এর প্রতিক্রিয়া প্রকট হয়ে প্রকাশ পেত গোবেচারা ছেলের উপর। এদিকে আর এক বিপদ এসে উপস্থিত হল। ম্যাক্সিমভের যা-ও সামান্য একটা চাকরী ছিল তা-ও গেল। গোর্কি স্কুলে পড়ছিলেন। চাকরী যাওয়াতে তার আর দুর্দশার অবধি রইল না। স্কুলে যাবার মত জামা-কাপড় পর্যন্ত তার জুটত না। দিদিমার বডিস কেটে তৈরী কোট, একটা হলদে জামা, অস্বাভাবিক লম্বা এক পা-জামা আর ভারভারার পায়ের জুতো—এই ছিল তার একমাত্র শ্রেষ্ঠ পোষাক। প্রত্যহ তাকে এই একই পোষাক পরে স্কুলে যেতে হত। তার এ প্রকার অদ্ভুত ও অপরিচ্ছন্ন শ্রী দেখে শিক্ষক মশাই প্রায়ই মন্দ বলতেন। সহপাঠীরা তার হলদে জামার জন্য তাকে The ace of Diamonds বলে ঠাট্টা তামাসা করত। গোর্কির লজ্জায় ও দুঃখে বুক ফেটে যেতে চাইত। মুখ বুজে তিনি সব সহ্য করতেন।

লেখাপড়ায় গোর্কি ভাল ছিলেন এ অপবাদ তাঁর অতিবড় শত্রুও কোনদিন দিতে পারবে না। তবে এ কথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে, দুষ্টামী বুদ্ধিতে গোর্কি সতীর্থদের অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। একটা ঘটনা উল্লেখ করছি। একদিন তিনি তরমুজের আধখানা এমনি ভাবে দরজার উপর টাঙিয়ে রেখেছিলেন যে শিক্ষক মশাই ক্লাসে ঢুকে যেই দরজা বন্ধ করতে গেছেন অমনি সেটা টপ করে দিব্যি টুপির মত তার ন্যাড়া ন্যাড়া মাথায় বসে গেল। এর পরিণামটা না বললেও তোমাদের বুঝে নিতে বেগ পেতে হবে না নিশ্চয়ই?

গোর্কিদের যিনি বাইবেল পড়াতেন তিনি গোর্কিকে দুচোখে দেখতে পারতেন না। ভদ্রলোকের একটা মুদ্রাদোষ ছিল। প্রতি কথার সঙ্গে তিনি অনাবশ্যক একটা 'yes' অর্থাৎ 'হাঁ' জুড়ে দিতেন। গোর্কির চোখ কিন্তু ছিল কি করে তাঁকে একটু ক্ষেপিয়ে তোলা যায়। তাঁর এ মুদ্রাদোষ গোর্কির মতলবের মস্ত সহায় হল। তাঁর সঙ্গে কথা বলবার সময় নিজের কথার সঙ্গে তিনিও অকারণ 'হাঁ' শব্দটা জুড়ে দিতে লাগলেন। পয়সার অভাবে গোর্কি বাইবেল কিনতে পারেন নি। ভদ্রলোক প্রত্যহ ক্লাসে ঢুকেই গোর্কিকে সম্বোধন করে বলতেন, কি হে বই এনেছ? হাঁ, বই!

না। হাঁ, গোর্কি গম্ভীর ভাবে জবাব দিতেন। আমার বই নেই। হাঁ।

'হাঁ'—এর মানে?

এর মানে? হাঁ, এর মানে 'না'।

ভদ্রলোক প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপটা বুঝতে পেরে জলে উঠতেন। এবং তক্ষুনি গোর্কিকে ক্লাস থেকে বের করে দিতেন।

একদিন এক ধর্মযাজক গোর্কিদের স্কুল পরিদর্শনে আসেন। তিনি ছেলেমেয়েদের খুব স্নেহ করতেন। গোর্কিদের ক্লাসে ঢুকে তিনি ক্লাসের সেরা দুষ্টু গোর্কিকেই সর্বপ্রথম ডেকে এনে দু-এক কথার পর বললেন, বলতো, বাইবেলের কোন গল্পটা তোমার সব চেয়ে ভাল লাগে।

গোর্কি পরিষ্কার জানালেন, তাঁর বাইবেল নেই।

ধর্মযাজক মৃদু তিরস্কার করলেন, রাগ করলেন না একটুও। তিনি যখন জানতে পারলেন বাইবেল না পড়েও গোর্কি মুখে মুখে অনেক গল্প শিখেছেন তখন তাঁর খুব আনন্দ হল। জিজ্ঞেস করলেন—কে তোমাকে শিখিয়েছেন? তোমার দাদু বুঝি? খুব ভাল লোক তিনি, নয়?

গোর্কি স্পষ্ট জানালেন, তিনি একটুও ভাল লোক নন।

ছিঃ ছিঃ, একথা বলতে হয় না। তুমি ভারী দুষ্টু, ঠিক নয়?

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে গোর্কি বললেন, হাঁ।

ধর্মযাজক তার সরলতা ও সত্যবাদিতা দেখে মুগ্ধ হলেন। বললেন, তোমার সম্বন্ধে গুরুমশাইরা কি বলেন জান? আচ্ছা, কেন তুমি পড়াশুনা করতে চাও না?

আমার ভাল লাগে না।

যাজক তাকে বুঝালেন, আসলে তা নয়। দুদিন মন দিয়ে পড, দেখবে কী চমৎকার লাগবে।

যাবার সময় তিনি তাকে ভাল ছেলে হবার কথা বিশেষ করে বলে গেলেন। তার প্রত্যেকটি কথা গোর্কির বুকে দাগ কেটে বসে গিয়েছিল। এর পর থেকে তিনি সত্যি সত্যি শান্তশিষ্ট হবার চেষ্টা করলেন।

ভারভারার উপর ম্যাক্সিমভের অত্যাচার ক্রমেই অমানুষিক হয়ে দাঁড়াতে লাগল। গোর্কি ছোট হলে কি হবে, সবই বুঝতেন। মার লাঞ্ছনা দেখে তিনি আর স্থির থাকতে পারতেন না। একবার রাগের মাথায় তিনি ম্যাক্সিমভকে খুন করছিলেন আর কি! ব্যাপারটা হয়েছিল কি, কোন একদিন ম্যাক্সিমভ ভারভারাকে চুলের মুঠি ধরে টেনে মাটিতে ফেলে দিয়ে বেপরোয়া বুকে পিঠে লাথি মারছিলেন। নিরুপায় ভারভারার সকরুণ আর্তনাদ আকাশ বাতাসকে ব্যথিত করে তুলল। গোর্কি এসে পড়ে দেখলেন। চোখদুটো তাঁর রক্তজবা হয়ে উঠল। খুন চেপে গেল তাঁর

মাথায়! চুপি চুপি একটা ধারাল ছোরা সংগ্রহ করে তিনি প্রবল বেগে সেটা ম্যাক্সিমভকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলেন। ম্যাক্সিমভের সৌভাগ্য বলতে হবে, সেটা তার গায়ে না লেগে ওভার-কোটের এক প্রান্ত ছিঁড়ে চলে গেল। ম্যাক্সিমভ একটা কথাও বললেন না; গোর্কির দিকে হিংস্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বেরিয়ে গেলেন।

ভারভারার উপর এ অত্যাচারের স্মৃতি বেদনা মত গোর্কি সারাজীবনে ভুলতে পারেন নি।

কিছুদিন পর গোর্কিকে তার ঠাকুর্দার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু ভাসিলিচ তাকে আশ্রয় দিতে সম্মত হলেন না। অভাব অনটনে তিনি পর্য্যুদস্ত। এর উপব গোর্কিকে স্থান দিয়ে সাধ করে অসচ্ছলতা বৃদ্ধি কববাব মত বোকা তিনি নন। পুরুষ যা সহজে করতে পাবে মেয়েরা তা পাবে না। উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীতে পার্থক্য আছে। তাদের এ প্রকৃতগত বৈষম্যেব অন্যতম জলন্ত দৃষ্টান্ত গোর্কির দিদিমার আচরণ। ভাসিলিচ যাকে আশ্রয় দেওয়া বোকামি মনে করলেন, তা তাঁর কাছে অবশ্য কর্তব্য হয়ে দেখা দিল। এই সদাশয়া রমনী সযত্নে গোর্কিকে কোলে তুলে নিলেন। এ জন্যে তাঁর দুর্ভোগের আর ইয়ত্তা রইল না। কারণ পারিবারিক কলহ ও আর্থিক দুরবস্থার জন্য ভাসিলিচ তাঁকে পৃথক করে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ যে যার ব্যয়ভার বহন করতেন।

এখানেও গোর্কিকে নিয়মিত স্কুলে যেতে হত। একে তো কোনদিনই গোর্কিব স্কুলের প্রতি অনুরাগ ছিল না— সতীর্থদের ক্রমবর্ধমান মর্মান্তিক রূঢ় ব্যবহারে তাঁর বিমুখতা আরো বেড়ে গেল। বেচারাকে তার দারিদ্র্যের জন্যে সবাই নানাভাবে বিদ্রূপ করত। কেউ বলত 'Ragman', কেহ 'tramp'—এমনি সব। এমন কি একদিন তারা তার নামে শিক্ষকের কাছে নালিশ করল। গোর্কির গায়ে নাকি ড্রেন-পচা গন্ধ। কথা কয়টি গোর্কির আজীবন মনে ছিল।

ওদিকে ভারভারা আর দারিদ্র্যের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছিলেন না। ম্যাক্সিমভ এত ঋণ করেছিলেন যে, বাধ্য হয়ে তাকে গা ঢাকা দিতে হয়। ভারভারা অন্য কোন উপায় না দেখে শেষটা তার দুই শিশুপুত্র সহ বাপের বাড়ী চলে এলেন। নানা কারণে তার মন ভেঙ্গে পড়েছিল, অনেক দিন আগেই। এবার তার শরীরেও দ্রুত ভাঙ্গন ধরল। সবাই বুঝল, দিন তাব সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে। সত্যই তাই। একদিন পুত্র পরিজন রেখে তিনি চিরতরে চোখ বুজলেন।

এর কিছুদিনপর গোর্কির ঠাকুর্দা তাকে ডেকে কোন প্রকার ভূমিকা না করে সরাসরি বললেন, বাপু হে, এবার তুমি তোমার পথ দেখ!

কিশোর গোর্কি দ্বিরুক্তি না করে নিতান্ত অনুগতের মত পথের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন।

পৃথিবী বড় কঠিন স্থান। যারা ভুক্তভোগী—সংসারের নগ্নতার সঙ্গে যাদেব ঘটেছে প্রত্যক্ষ পরিচয়—তারা এটা অতি অবশ্য স্বীকার করে নেবে। গোর্কি তাদেরই একজন —পৃথিবীকে আভিজাত্যের আলোকে দেখবার সুযোগ যাদের হয় নি কোনদিন। লক্ষ্মী ছেলেটির মত তো বেরিয়ে পড়লেন; এখন সমস্যা, যাবেন কোথায়? ধরিত্রীর বিস্তৃত বক্ষে এতটুকু ঠাঁই নেই তাঁর। কেউ তাঁকে ভুলেও বলবে না, যাও কোথা, আমাদের ঘরে এস। এমনি নিঃসহায়, নিঃসম্বল, দুর্ভাগা তিনি। বাধ্য হয়ে তাঁকে যাযাবর বৃত্তি নিতে হল। সাদা কথায় বলা চলে, তিনি হলেন ভবঘুরে। আজ এখানে, কাল সেখানে, এ ভাবে দিনের পর দিন বছরের পব বছর কাটতে লাগল। দিন কতক তিনি কোন এক মুচীর দোকানে শিক্ষানবীশ ছিলেন। এ সব কাজ তাঁর কি করে ভাল লাগবে বল? ভগবান যে তাঁর জীবন বৃহত্তর কাজেব জন্যে নির্দেশ কবে দিয়েছেন। সুবিধা বুঝে পালালেন তিনি সেখান থেকে। আবার সেই এক সমস্যা: কোথায় যাবেন? কি করে অন্ন-সংস্থান করবেন? সমস্যা নিত্য জটিলতর হয়ে সম্মুখীন হয়। অথচ সমাধানের কোন উপায়ই খুঁজে পান না তিনি। হাঁপিয়ে ওঠেন। নৈরাশ্যের জালে জড়িয়ে পড়েন। অন্তরতম প্রদেশ থেকে তখন কে এক অদৃশ্য পুরুষ যেন আশার বাণী উচ্চারণ করে। পুনরায় তিনি সহজ সজীব হয়ে ওঠেন। এ সময়টা তাঁর কত কষ্টে কেটেছে তা শুনলে তোমরা স্তম্ভিত হয়ে যাবে। ক্ষুধার তীব্র জ্বালায় অভিভূত হয়ে কতদিন মৃতবৎ তিনি পথের প্রান্তে পড়ে ছিলেন তার আর ইয়ত্তা নেই। প্রবল শীতে আর বরফ পড়া রাতে প্রায় অনাবৃত দেহে ফুটপাতের এক কোনে কুঁকড়ে নির্জীবের মত পড়ে থাকা তাঁর এক-রকম অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল বললে বাড়িয়ে বলা হয় না।

চাকরী করা গোর্কির ধাতে সইত না। 'চাকরী' 'চাকরী' করে তিনি ঘুবে বেড়াতেন বটে, কিন্তু সে শুধু পেটের দায়ে। মোট কথা দাসত্ব করা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। সামান্য কিছু হাতে আসলেই তিনি চাকরী ছেড়ে দিয়ে মুক্তির নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচতেন। এমনি করে তিনি কখন বা পাহারাওয়ালা, কখন ছুতার, আবার হয়ত জাহাজের ছোট বড় সব বাবুদের 'এটা ওটা' করে দেবার কাজ করেছেন। এমনি বিভিন্নরকম কাজ করাতে অনেকে তাঁর সম্বন্ধে রহস্য করে বলেন, এমন কাজ নেই যা গোর্কি না করেছেন। চণ্ডীপাঠ থেকে জুতো শেলাই পর্যন্ত! অত্যুক্তি নয়, বস্তুতই তাই। এবং এটাই তাঁর জগতে পরিচিত হবার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল।
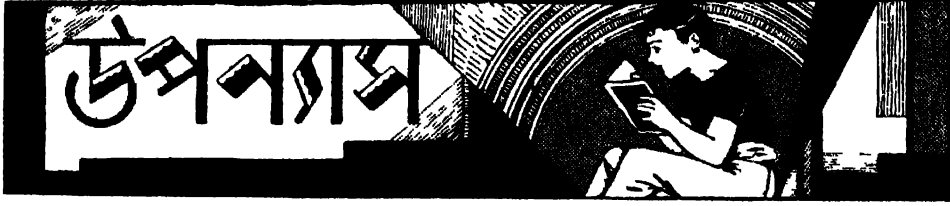
পরাগ ও রেণু

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(লক্ষ্মীপুর যাত্রার আগে)

দেশের জমিদারদের বিষয়ে পরাগ তার 'কাবু'র কাছে যে সব কথা শুনেছিল তাতে সে বুঝেছিল যে জমিদার হওয়াটা একটুও ভাল নয়। কিন্তু দেওয়ানজী মহাশয়ের সঙ্গে এই কয়দিন ক্রমাগত আলাপ আলোচনায় জমিদার হওয়া সম্বন্ধে তার ধারণা একটু একটু করে বদলাতে শুরু করেছিল। বিশেষ করে, মণিরমার ভাইঝি সুশীলাকে সেদিন এক কথায় কুড়ি টাকা সাহায্য করতে পাবায় পরাগের দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে দেওয়ানজী দাদু যা বলেছেন সেটা ঠিক—জমিদাররা ইচ্ছা করলে অনেক ভাল কাজ করতে পাবে।

এই ভাল করবার ঝোঁক যেন তাকে পেয়ে বসল। পরদিন সকালেই সে দেওয়ানজী দাদুকে সঙ্গে নিয়ে গেল তার সেই ইস্কুলের ধারে ফুটপাথের ফলওয়ালীর কাছে। তাকে ফুটপাথের উপর থেকে সরিয়ে একখানি দোকান ঘরে তুলে দিয়ে, শীতকালে গায়ে দেবার জন্য একখানি নরম আলোয়ান কিনে দিয়ে একজোড়া নূতন কাপড় ও কিছু টাকা দিয়ে তবে সে বাড়ী ফিরল।

বুড়ি আহ্লাদে ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠে বললে—রাজা হও বাবা, সুখী হও তুমি। আমার মাথায় যতগুলি চুল আছে ততবছর তোমার প্রমাই হোক। বুড়িকে যে দয়া তুমি করলে, ঈশ্বর তোমায় সে দয়া করবেন।

দুপুর বেলা আবার দেওয়ানজী দাদুকে ধরে নিয়ে সে চললো ইস্কুলের জলখাবার ওয়ালা মাখন ময়রার কাছে। সেই দিনই কেনারামের সঙ্গে মাখনের খুব ঝগড়া হয়ে গেছে। কেনারাম বলেছে কাল থেকে অন্য লোক রাখবে। মাখনকে সে জবাব দিয়েছে। মাখনের মনটা তাই বড্ড খারাপ হয়ে পড়েছিল সেদিন।

পরাগ গিয়ে যখন তাকে বললে—কাল থেকে তুমি নিজে দোকানদার হয়ে যাতে আমাদের ইস্কুলে খাবার বিক্রী করতে পারো আমার দেওয়ানজী দাদু সেই রকম ব্যবস্থা করে দেবেন মাখনদা। শুনে আনন্দে মাখনের দুই চোখ সজল হয়ে উঠল। প্রথমটা সে তার এ সৌভাগ্য বিশ্বাস করতেই পারে নি, কিন্তু, দেওয়ানজী মহাশয়ও যখন সেই কথা বললেন—সে একবার দেওয়ানজী মশাইয়ের পায়ে মাথা রাখে, একবার পরাগের পায়ে মাথা রাখে, বলে—আমার ভাগ্যে কি এমন সুদিন হবে? সত্যই কি আমি স্বাধীন ভাবে নিজে ব্যবসা করতে পারব। কেনারামের হাত থেকে কি আমার উদ্ধার আছে।

দেওয়ানজী মহাশয় সত্য সত্যই পৃথক একটি খাবারের দোকান চালাবার মতো মাখনের সমস্ত ব্যবস্থাই যখন করে দিলেন,—মাখন বিস্ময়ে ও কৃতজ্ঞতায় নির্বাক হয়ে রইল। পরাগ বললে—আমি লক্ষ্মীপুরে চলে যাচ্ছি মাখনদা, আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না। তুমি আমাকে মাঝে মাঝে চিঠি লিখে ইস্কুলের সব খবর জানিয়ো। তোমার খাবার কেমন বিক্রী হচ্ছে, কি কি নূতন খাবার তুমি তৈরি করছো, সব আমাকে লিখো মাখনদা, কেমন?

মাখন রুদ্ধ কণ্ঠে শুধু বললে—লিখবো, দাদামণি। সব লিখবো। মাখন ময়রা যত দিন বাঁচবে তোমার দয়া সে ভুলবেনা। তুমি মানুষ নও, তুমি দেবতা। ভগবান তোমাকে রাজা করেছেন আমাদের মতো দুঃখী গরীবের দুঃখ দূর করবার জন্যই।

বাড়ী ফেরার পথে দেওয়ানজী মহাশয় জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা পরাগবাবু, তুমি ঐ ফলওয়ালী বুড়িকে আর এই খাবারওয়ালা মাখনকে এত ভালবাস কেন?

পরাগ বললে—ওরা যে আমাকে ভালবাসে দাদু। অনেক দিন আগে আমি যখন আরও ছোট ছিলুম, সবে দুচারদিন হল ইস্কুলে ভর্তি হয়েছি, সেই সময় একবার ইস্কুলের ছুটির পর ছেলেরা হৈ হৈ করে ছুটে যখন ইস্কুল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, তখন পিছন থেকে ধাক্কা খেয়ে আমি ঐ ফলওয়ালী বুড়ির ঝুড়ির সামনে মুখ থুবড়ে

পড়ে গেছলুম। আমি কেঁদে উঠতেই ছেলেরা যে যার পালিয়ে গেল। মাষ্টার মশাইরা তখনও কেউ ইস্কুল থেকে বেরুন নি। বুড়ি তাড়াতাড়ি উঠে এসে আমাকে কোলে তুলে নিলে, আমার হাঁটুতে যেখানে লেগেছিল সেখানে কত ফুঁ দিয়ে হাত বুলিয়ে দিলে। আদর করে সব চেয়ে বড় দেখে একটা কমলালেবু আমার হাতে দিয়ে আমাকে ভুলিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দিলে। বুড়ির সেদিনের সেই আদর যত্ন আমি ভুলিনি, ওর সঙ্গে সেই থেকে আমার খুব ভাব।

দেওয়ানজী মহাশয় পরাগের এই কৃতজ্ঞ চিত্তের পরিচয় পেয়ে খুশী হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"আর ঐ মাখন? ও কোনোদিন কি তোমার কিছু করেছিল?

পরাগ উৎসাহিত হয়ে উঠে বললে—মাখন? মাখনদা' আমার সব চেয়ে বড় বন্ধু। আমি তখন নতুন ইস্কুলে ভর্তি হয়েছি, কিছুইত জানিনি। একদিন টিফিনের সময় খাবার কিনে মাখনদার কাছেই ঠোঙা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাচ্ছি, সেই সময় উঁচু ক্লাশের একজন ছেলে খাবার নিতে এমন ছুটে এল, যে, তার কনুইয়ের ধাক্কা লেগে আমার হাতের খাবারের ঠোঙাটা মাটিতে পড়ে সমস্ত খাবার ধুলায় ছড়িয়ে গেল। আশে পাশে ছেলেরা সব হেসে উঠলো। যে বড় ছেলেটা আমাকে ধাক্কা দেয়েছিল সেও হাসতে লাগল। তারপর আমাকেই ভর্ৎসনা করে বললে—খাবারের ঠোঙাটা চেপে ধরে খেতে পারনা? ছেলে যেন আহ্লাদে।

মাখনদা সেদিন আমার হয়ে খুব বকেছিল তাকে। বলেছিল তোমারই ত দোষ দাদাবাবু? খাবার খেতে আসছ এমন দৌড় ঝাঁপ করে যে চোখে কানে কিছু দেখতে পাচ্ছ না। এবেচারা ত এক পাশে দাঁড়িয়ে খাচ্ছিল। খাবারের ঠোঙা আবার কে কোথায় শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে খায় শুনি? তুমি ধাক্কা দিয়ে ওর মুখের খাবার গুলো যে ফেলে দিলে—এখন ও কি খায় বলত? তোমার উচিত পয়সা দিয়ে ওকে খাবার কিনে দেওয়া।

ছেলেটা বললে—আমার বয়ে গেছে। ও সাবধান হয়ে থাকেনি কেন? খাবার কিনতে এ সময় ভিড় হয়েই থাকে, একটু ধাক্কা ধাক্কিও হয়। ও যেমন অসাবধান ছেলে তেমনি আজ টিফিন না খেয়ে উপোস করে থাক।

মাখনদা বললে—তাকি হয় দাদাবাবু! তা হয় না। তোমরা সবাই খাবে, আর ও বেচারা মুখ শুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে? আহা! ছেলেমানুষ, ক্ষিধের সময় ওর মুখের খাবার তুমি ফেলে দিলে। এস, দাদামণি এস, ও যা পড়ে গেছে, গেছে, আমি তোমাকে আবার নতুন এক ঠোঙা খাবার দিচ্ছি, নাও।

দিলে মাখনদা তখনি আমাকে আর এক ঠোঙা খাবার সাজিয়ে, কিন্তু আমার পকেটে ত' আর পয়সা ছিল না। মা দু'আনা দিয়েছিলেন টিফিনের জন্য। সেই পয়সা দিয়ে যে খাবার কিনেছিলুম, সেত খেতে শুরু করা মাত্র মাটিতে পড়ে গেল। মাখনকে বললুম—না, আমি খাবার নেবনা মাখনদা, আমার আর পয়সা নেই। মাখন বললে—পয়সা দিয়েত রোজই খাও ভাই, আজও তো আমায় পয়সা দিয়েচ। একবার না হয় পয়সা নাইই দিলে। তুমি এতটা বেলা কিছু না খেয়ে থাকবে সে আমি শুনব না, তোমায় এ খেতেই হবে—বলে জোর করে মাখনদা, ঠোঙাটি আমার হাতে গুঁজে দিলে।

মাখনদার এই ব্যাপার দেখে ছেলেরা সব অবা'ক হয়ে গেল। কেউ কেউ বললে—'আমরাও তো রোজ পয়সা দিয়ে খাবার খাই, কই আমাদেরত তুমি একদিনও অমনি খাবার দাও না মাখন! পরাগকে বুঝি আমাদের চেয়ে বেশি ভালবাস?

মাখনদা বললে—নিশ্চয়! আমি যে ওর দাদা! তোমরা বলো আমাকে 'মাখন খাবারওয়ালা'। রাগ হলে বলো—'মাকনা বেটা।' কিন্তু, ও আমাকে বরাবর বলে মাখনদা!

সেইদিন থেকে মাখনদাকে আমি সত্যিই খুব ভালবাসি। মাখনদার দুঃখের কথা শুনে আমার খুব কষ্ট হত। তখন থেকেই ভাবতুম আমি যখন বড় হয়ে টাকা উপার্জন করব, মাখনদাকে নিশ্চয় একখানা দোকান করে দেব। কেনারামের অত্যাচার থেকে তাকে বাঁচাবই। আজ আমার সেই ইচ্ছেটা আপনি পূর্ণ করলেন দেওয়ানজী দাদু!

আমি নয় পরাগ বাবু, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করলেন তোমার লক্ষ্মীপুরের দাদু! তিনি আমায় হুকুম দিয়েছেন—তুমি যত টাকা চাইবে—যা কিনতে চাইবে—যাকে যা দিতে চাইবে, আমি যেন সমস্ত দিই।

—তাহলে 'কাবু'কে আমি একটা সোনার হাতঘড়ি কিনে দিতে পারবো? পরাগ জিজ্ঞাসা করলে, দেওয়ানজী মহাশয়ের মুখের দিকে তার বিস্ময়ানন্দদীপ্ত ডাগর দুটি চোখের সপ্রশ্ন দৃষ্টি মেলে।

দেওয়ানজী মহাশয় বললেন—নিশ্চয়ই পারবে'

—কবে দিতে পারবো দাদু? আমাদের যে শনিবারে আপনার সঙ্গে লক্ষ্মীপুর চলে যেতে হবে বলেছেন।... পরাগ শুধালে।

দেওয়ানজী বললেন—যেদিন—যখনই তোমার দিতে ইচ্ছে হবে তখনই দিতে পাবে।

পরাগ বললে—আজ বিকেলে দিতে পারি?

—হ্যাঁ, চল, আজই বিকেলে চৌরঙ্গীর সাহেবদের দোকান থেকে একটা ভাল সোনার হাত ঘড়ি কিনে এনে কাবুকে দিয়ে আসি। দেওয়ানজী মশায়ের কথা শেষ হতে না হতেই পরাগ আহ্লাদে হাততালি দিয়ে নেচে উঠে বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ, আজই! কী মজা!—সেই বেশ ভাল হবে—

[ক্রমশঃ

টাইপ ও টাইপরাইটার

শ্রীপ্রভাস বসু

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

এর বহুপরে তৈরী হল টাইপ-রাইটার। টাইপ-রাইটারের বিশদ বর্ণনার প্রয়োজন নেই, আশাকরি সকলেই অল্পবিস্তর পরিচিত আছেন এই মেশিনের সঙ্গে। কিন্তু এই টাইপরাইটার কাদের জন্য তৈরী করবার কল্পনা হয়েছিল জান?—অন্ধদের জন্য। টাইপরাইটারের জন্মদাতা হচ্ছেন Christopher Latham Sholes প্রথম চেষ্টা হল—কি করে কাগজের উপর উঁচু অক্ষর তোলা যায়। অন্ধেরা তাদের স্পর্শ সুকুল আঙুলের ডগার সাহায্যে যাতে পড়তে পারে, সেই জন্য। ১৭১৪ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে একজন ইংরাজ ইঞ্জিনীয়ার কাগজে উঁচু অক্ষর তৈরী করার চেষ্টা করেন। ফ্রান্স ও আমেরিকার বহু যন্ত্রবিদও সেই সময়ে এই একই কাজ নিয়ে মাথা ঘাটাচ্ছিলেন। সকলেই বুঝতে পেরেছিলেন যে এ মেশিন আবিষ্কারের পর ব্যবসার পক্ষে খুব সুবিধা হবে। প্রায় ১৫০ বছর ধরে পাঁচ-ছ'জন আবিষ্কারকের বহু চেষ্টায় আজকের টাইপরাইটার তৈরী হয়েছে। আমেরিকান আবিষ্কারক Charles চলনসই ধরণের তৈরী করলেন ১৮৪৩ সালে। তাতে শুধু—কাগজ ধরার আর লাইন শেষ হলে কাগজখানা ঘুরিয়ে এগিয়ে নেবার ব্যবস্থা ছিল। Type-bar যা প্রত্যেক মেশিনে আছে তা আবিষ্কার করেন Prigin নামে একজন সমসাময়িক ফরাসীদেশের ভদ্রলোক। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি Alfred E Beach নামে অপর এক আমেরিকান বহু মেশিন তৈরী করলেন। তারপর ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে আর একজন আমেরিকান John Pratt Lindoz অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ ধরণের মেশিন তৈরী করলেন।

কিন্তু, Christopher Latham Sholes ছিলেন শান্ত ও ধৈর্যশীল মানুষ। তাঁরই যত্নে ও ধৈর্যে শেষ পর্যন্ত এরূপ সুন্দর ও সু-সম্পূর্ণ মেশিন তৈরী হয়েছে। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে তাঁর বন্ধুদের কাছে যখন তিনি টাইপরাইটারের কথা জানান তখন তিনি সেখানকার collector ছিলেন। তাঁর মত একজন যন্ত্রবিদ্ বৈজ্ঞানিকের এমন ঘটনাপূর্ণ ও বিভিন্নধরণের কর্মবহুল জীবন খুব কম দেখা যায়। তিনি কাগজের সম্পাদক পর্যন্তও হয়েছিলেন।

সুসম্পূর্ণ টাইপরাইটার তৈরীর সম্পূর্ণ গৌরব একা Sholesএরই প্রাপ্য। এবিষয়ে তিনি বন্ধু Carlos S Glidden-এর সাহায্য নিয়েছিলেন। তাঁরই যত্নে মেশিন তৈরী হয়ে বাজারে বেরুতে পেরেছিল। আরও একজন যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন—তাঁর নাম হচ্ছে Samuel W Soule এঁদেরই কাছে তিনি প্রথম তাঁর মেশিন দেখান। প্রথম মেশিন তৈরী হয়েছিল একটা পুরোণো টেলিগ্রাফের চাবীর বোতাম নিয়ে, খানকতক টুকরো কাঠ, আর একখানা কাঁচ নিয়ে। এই চাবী টিপলে অক্ষর গিয়ে অপর দিকে একখানা কার্বন পেপারের উপর দিয়ে কাঁচের সামনের কাগজে ছাপ মারত।

বহু রকম পরিকল্পনা ও পরীক্ষার পর কাজ চলবার মত মেশিন তৈরী হল পিয়ানোর মত করে। ঠিক যেন ছোট একটি পিয়ানো। চাবীর মাথায় বোতাম ছিল। তাতে রঙ দিয়ে অক্ষর লেখা থাকত।

এখনকার উন্নত টাইপরাইটারের জন্য প্রথম দৃষ্টি দেওয়া হল 'key board'-এর উন্নতির জন্যে। key-board বলে, যে চাবাগুলো টিপে ছাপা হয়, তাকে। প্রথমে অক্ষরগুলো সাজাবার জন্যে চারটে শ্রেণী করা হল, আজকাল যেমন থাকে সেই রকম। তবে তখন শুধু বড় হাতের অক্ষরই ছাপা হত, ছোট নয়। পাঁচ বছর ধরে জল্পনা-কল্পনা করবার পর শেষে James Densmore বুলে এক ব্যবসায়ী এসে এঁদের সঙ্গে চতুর্থ অংশীদার হয়ে যোগ দিলেন। তখনও মেশিনে বহু ত্রুটি ছিল—অল্পে অল্পে অনেক কমে গেল সেগুলো। তখন ভেবে

দেখা গেল যারা বন্দুক বা ঐ ধরণের আগ্নেয়াস্ত্র তৈরী করে তাদের সাহায্য নিলে আরও অনেক সুবিধে হতে পারে। তখন এলেন Remington Bens Co তাঁরা মেশিনের পিছনে বহু পরিশ্রম, অর্থ, অধ্যবসায় ব্যয় করতে তবে মেশিন বাজারে চালু হল।

মেশিন বাজারে চালু হবার কিছুদিন পরে Sholes মারা গেলেন। প্রথম মেশিনে শুধু বড় অক্ষর ছাপা হত। ছোট অক্ষর ছাপার জন্যে আর এক সেট চাবী (key) তৈরী হল। তারওপরে shift key-র ব্যবস্থা হলো। তাছাড়া অক্ষর ঠিক মুদ্রিত হলো কিনা দেখবার জন্যে প্রতিবার 'রোলার' তুলে দেখতে হত। পরে এ অসুবিধাও দূর করা হল। টাইপ-রাইটারের উপযোগিতার বা প্রয়োজনীয়তার কথা বোধ হয় তোমাদের বলে দিতে হবেনা। শুধু এইটুকু জেনে রাখ যে, টাইপ-রাইটার সৃষ্টি না হলে ব্যবসায়ের একটা খুব বড়দিক পঙ্গু হয়ে থাকত, সভ্যতার একটা অঙ্গহানি ঘটত।

ইলেক্‌ট্রিক পাখার নিচেয় বসে কাজ করবার সময় বাতাসে কাগজ উড়ে উড়ে নড়ত বলে টাইপ করার ভারি অসুবিধা হত। কলিকাতার রেমিংটন কোম্পানীর অফিসের একজন বাঙালীবাবু শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু তারের সাহায্যে একটি Punkha Protector উদ্ভাবন করেন। রেমিংটন কোম্পানী তাঁকে টাকা দিয়ে এর সত্ব কিনে নিয়েছেন। বাংলা ভাষায় টাইপরাইটারও ইনিই আবিষ্কার করেন।

কিশোর সভা

বিজিত

(গল্প)

শ্রীসুগত দাসগুপ্ত

রেবেলো জাতিতে ছিল ইংরেজ, কিন্তু তার পিতা-মাতার ঠিকানা আজ পর্যন্ত কেউ দিতে পারে নি। সে মানুষ হয়েছিল তার এক দূর সম্পর্কের কাকার কাছে, লেখাপড়াতেও সে ভালই ছিল, কিন্তু মহাযুদ্ধ যখন তার সমর-জাল সমগ্র পৃথিবীতে বিস্তার করলে, তখন সেও মসী ছেড়ে অসিরই আশ্রয় গ্রহণ করলে।

ইংরেজ নৌসেনাপতি এ্যাডমির‍্যাল জেলিকো তাঁর কেবিনে বসে আছেন, নানারকম চিন্তা তাঁকে করে তুলেছে আজ বিব্রত।

কৈজার উইলহেলম্, ক্রাউন প্রিন্স ও হিণ্ডেনবার্গের প্রতাপে, সমস্ত ইউরোপ তথা সমস্ত জগৎ কম্পিত। কিন্তু বীর শ্রেষ্ঠ ইংলণ্ড তো সেই কম্পনে কম্পিত হতে পারে না। স্থল যুদ্ধে যদিও সে জার্মানীর সঙ্গে এঁটে উঠছে না কিন্তু জলযুদ্ধে? তাতে পিছু পা হলে তো চলবে না। সম্রাট নেপোলিয়নের প্রবল প্রতাপে সমস্ত ইউরোপ কেঁপেছিল, কিন্তু তা শুধু স্থলযুদ্ধে। তারপর মূর্তিমান যমের মত নেলসন্ উঠে দাঁড়ালেন, জল যুদ্ধে নেপো-লিয়নের পুঞ্জীভূত দর্প ভূমিসাৎ হোল ট্রাফাল্‌গারে, এবং তাই হোল সম্রাট নেপোলিয়নের পরাজয়ের কারণ। আর স্পেনিশ আর্মাডা, জগতে অজেয় আর্মাডা নাম নিয়ে সে এল ইংলণ্ড জয় করতে। কিন্তু, ইংলণ্ডের সুপরিচালিত জলশক্তির কাছে সে সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হল। সেই ইংলণ্ড, যার সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না, সে আজ দাঁড়িয়েছে জার্মানীর উদ্ধত দর্পের শাস্তি দিতে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সে ধরেছে অস্ত্র। সে কি আজ পরাজিত হবে? 'না-না-না', তা সে হবে না। কিন্তু উপায় কি? জার্মানী তার সুবিখ্যাত বন্দর ব্রীমেনকে আজ করেছে সুসজ্জিত। সেই বন্দরটিকে সাত দিনের মধ্যে ধ্বংস না করতে পারলে পরাজয় সুনিশ্চিত। সাতদিন। সাতদিন। মোটে সাত দিন। তাঁর মাথা ঘুরতে লাগল। কোনও উপযুক্ত যোদ্ধা তিনি এখনও পান নি। কে যাবে? অনিবার্য পরাজয়ের করুণ চিত্র তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল।

এমন সময় তাঁর নিরাশাবৃত মনে আশার আলো জ্বালিয়ে প্রবেশ করল রেবেলো। সে যুদ্ধে যাবে। জেনারেলের মনে জ্বলে উঠল আনন্দের দীপশিখা। হ্যাঁ, এই তো সুপুরুষ, এইত বীর, এই তো পারবে।

রেবেলো নিযুক্ত হ'ল।

দুই

তখন রাত দুটো। গভীর নীল জলরাশির গভীরতর স্তর ভেদ করে, তিনটি সাবমেরিণ ছুটলো। তাদের গতি ধ্বংসের উদ্দেশে, তারা বোঝে না শ্রী, তারা হিসাব রাখে না ন্যায় অন্যায়ের। তারা জানে খালি করতে ধ্বংস। ধ্বংস ‼ আর ধ্বংস ‼! এ যেন সাক্ষাৎ শয়তানের প্রতিমূর্তি।

নিজের দুটো সাবমেরিণকে দূরে রেখে রেবেলো একটিতে চড়ে ঘুমন্ত ব্রীমেনের পাশে এসে দাঁড়ালো। সে রেখে এল সেখানে ১৫০টি বোমা আর ৫০টি প্রচণ্ড বিস্ফোরক শেল। তারপর সেখান থেকে ইলেকট্রিক তার টেনে সে অন্য দুইটি সাবমেরিণে নিয়ে এল। সহসা ব্রীমেনে সতর্কতাসূচক ধ্বনি বেজে উঠল। ঘুমন্ত ব্রীমেন জেগে উঠেছে। দু'টো সাব-মেরিণ ছুটলো রেবেলোর পিছনে। তারা চায় প্রতিশোধ। কিন্তু রেবেলো তখন অন্য দু'টো সাবমেরিণের কাছে এসে পৌঁছেচে। সে এসেই হাতের মুঠয় ধরা তারের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রিসিটি 'পাস' করিয়ে দিলে। সহস্র, সহস্র, কোটি, কোটি বজ্র যেন গর্জে উঠলো। মুহূর্তমধ্যে স্থানটী প্রলয়ের অগ্নিশিখায় আলোকিত হয়ে উঠল। এক নিমেষে যেন একটা প্রকাণ্ড গ্রহ চূর্ণ হয়ে গেল। কর্ণবধিরকরা শব্দ করে ব্রীমেন উড়ে গেল। যেখানে ব্রীমেন ছিল, সেখানে দেখা গেল উন্মত্ত সমুদ্রের অকূল জলরাশি খল খল করে নিষ্ঠুর হাসি হাসছে। সমুদ্র তার অতল গর্ভে ব্রীমেনকে আশ্রয় দান করলে।

ব্রীমেন উড়ে গেল। আর তার সঙ্গে উড়ে গেল জার্মানীর সহস্র সহস্র নিরীহ নরনারী। এরই নাম বিংশ শতাব্দীর যুদ্ধ। শতসহস্র নিরীহ নরনারীর জীবন নষ্ট করাকেই বলে যুদ্ধ, পৈশাচিক যুদ্ধ।

স্বকৃত ধ্বংসরাশির দিকে তাকিয়ে রেবেলোর পাষাণের মত মনটাও একটু নরম হয়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই তার বিবেক তাকে দংশন করলে, "মূর্খ! এই কি শোকের সময়?" সে আত্মরক্ষার জন্য পলকে সাগর গর্ভে ডুব মেরে তড়িৎবেগে জলরাশি ভেদ করে ছুটলো। এর পরে যেখানে রেবেলোকে দেখা গেল, সে স্থানটী ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত বন্দর ডোভার।

তিন

অসংখ্য স্বর্ণ রৌপ্য মেডেল ও পুষ্পমাল্য ভূষিত হয়ে রেবেলো রঙ্গমঞ্চে উঠে দাঁড়ালে। স্বয়ং সম্রাট এসেছেন তাকে পুরস্কৃত করতে। সম্রাটকে অভিবাদন করে ও নগরবাসীর অভিনন্দন গ্রহণ করে সে দ্রুতপদে পিতৃব্যের গৃহের পাশে এসে দাঁড়ালো—এ ঘর সে ঘর পার হয়ে যে ঘরে সে এসে ঢুকলো, সে ঘরে এক সৌম্য-কান্তি বৃদ্ধ অর্ধশায়িত। রেবেলো চেঁচিয়ে উঠল "কাকা! আমি ফিরে এসেছি।" বৃদ্ধটী সোজা হয়ে বসলেন, তাঁর দুচোখে আনন্দাশ্রু। রেবেলো বলে উঠলো "কাকা, আমি গিয়ে-ছিলাম জার্মানিতে। সেখানকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দর ব্রীমেনকে আমি একা উড়িয়ে দিয়েছি। ধূলোয় লুটিয়ে দিয়েছি তাদের বিজয়গর্ব। আমি আজ রণজয়ী।"

"ব্রীমেন! কোন ব্রীমেন! জার্মানীর শ্রেষ্ঠ বন্দর ব্রীমেন?" বৃদ্ধটী আর্তনাদ করে ওঠেন।

"হাঁ বাবা, কিন্তু তুমি অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? এই তো যুদ্ধের নিয়ম।"

বৃদ্ধ সোজা হয়ে বসলেন, তারপর নিজেকে অসম্ভব রকম দৃঢ় করে নিয়ে বললেন। "রেবেলো! জান আজ তুমি পিতৃহত্যা করেছ। শোন সব কথা। তোমার জীবন এক অদ্ভুত রহস্যাবৃত। তোমার পিতামাতা হচ্ছেন জার্মান, আমি ছিলাম তাঁদের এক ইংরাজ বন্ধু। তোমাকে আমার কাছে রেখে একদিন তাঁরা অদৃশ্য হন, তখন তুমি ছিলে ছ' বছরের।

আমি ইংল্যাণ্ডে চলে আসি তখন তোমাকে নিয়ে। বহুদিন পরে যখন তোমার বয়স ১৭ কি ১৮ তখন তাঁরা আমাকে সংবাদ দেন, তাঁরা ব্রীমেনে এসেছেন এবং সেখানেই থাকবেন। আমি তোমাকে ফেরৎ দেই নি, তাঁরাও তোমাকে চান নি। ইতিমধ্যে লাগল যুদ্ধ। আমি ভেবেছিলাম যুদ্ধের শেষে তোমাকে সব বলবো। কিন্তু এর মধ্যে তুমি যুদ্ধে চলে গেলে, গিয়ে ব্রীমেনকে করলে ধ্বংস। আর তার সঙ্গে তোমার পিতামাতাকেও হত্যা করে এলে।

রেবেলোর সমস্ত জয়গর্ব ভূমিসাৎ হয়ে গেলো। এক মুহূর্ত আগে যে জয়গর্বে সে ধরাকে সরা জ্ঞান করছিল তা কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। এক নিমেষের জন্য শোনা পিতামাতাকে মনে করে তার মন দুঃখে ভরে উঠলো। তার মনে হোল জয় যেন তার হয়নি, তারই পরাজয় হয়েছে। সেই বিজিত।

প্রতিধ্বনি

রবীন্দ্রনাথ ভৌমিক

প্রতিমা ছিল এক বনদেবী। সে ছিল খুব সুন্দরী। তার বাড়ী ছিল প্রশস্ত নদী কিনারায়। আর বাগান ছিল গহন বনে। তাকে সকল দেবদেবীই ভাল বাসত। এক রাজা ছিলেন, তিনি প্রতিমার গল্প শুনতে ভাল বাসতেন। আর প্রতিমাও খুব সুন্দর-সুন্দর গল্প বলতে পারত। ঐ রাজার রাণী কিন্তু বড় পরশ্রীকাতর ছিলেন। কাউকে আদর যত্ন করতে ভালবাসতেন না। আর কাউকে অন্য লোকে আদর করে এটাও পছন্দ করতেন না। প্রতিমাকে সকলে ভালবাসে এটাও তিনি পছন্দ করলেন না। তিনি যাদুবিদ্যা বলে প্রতিমার কথা বলার শক্তি হরণ করলেন। তখন প্রতিমার কথার অনুকরণ করা ছাড়া নিজের কোন কথা বলার আর শক্তি রইল না। সে বনে বনে, খেলার মাঠে, নদীতীরে ঘুরে বেড়াত।

একটা যুবক ছিল, তার নাম পুষ্পকুমার। পুষ্পকুমার ছিল বলিষ্ঠ যুবক। বসন্তকালের সূর্য-কিরণে উদ্ভাসিত দিনের ন্যায় বড় সুন্দর সে। সাহস ও অন্যান্য গুণেও তিনি বিভূষিত ছিলেন। তাঁকে সকলেই ভাল বাসত। কিন্তু তার হৃদয় ছিল পাথরের ন্যায়। তিনি কাউকেই ভাল বাসতেন না।

একদিন পুষ্পকুমার গহন বনে পথভ্রষ্ট হল। সে চীৎকার করে তার বন্ধুদের ডাকলে, তারা উত্তর দিলে না। কাছে শুধু একটা ক্ষীণ শব্দ হল। তখন সে বলে উঠল "কেউ কি আছ এখানে?" প্রতিধ্বনি বলল—"এখানে।"

পুষ্পকুমার অবাক হলেন। তিনি অনেক খুঁজলেন কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলেন না। তিনি ডাকলেন 'এস'। প্রতিধ্বনি বলল 'এস'। তখন প্রতিমা কাছে এসে দাঁড়াল, কিন্তু একটিও কথা বললনা দেখে পুষ্পের পাষাণ হৃদয় ক্রোধে অধির হয়ে উঠল। প্রতিমাকে সে বধ করলে।

প্রতিমার দেহ শেষ হয়ে গেল। কিন্তু কণ্ঠস্বর রইল। প্রতিমা বাতাসে মিলিয়ে গেল। এই কণ্ঠস্বরই মাঝে মাঝে পাহাড়ে, বনে, মাঠে, নদীতীরে শোনা যায়।

এরই নাম প্রতিধ্বনি।

* বিদেশী গল্পের ছায়া।

সুধাংশুর বিপত্তি

শ্রীধরচন্দ্র সেনাপতি

বি-এ পাশ করে বসে আছে সুধাংশু।...চাকরির সন্ধানে তিন-তিনটে বছর কাটাল। কিন্তু চাকরি আর পেলনা! অবশেষে বিরক্ত হ'য়ে খুঁজতে লাগল যদি সুবিধামত একটা টিউসনি পায়।

সুধাংশু প্রত্যহ খবরের কাগজে 'ওয়াণ্টেড্' কলম দেখে। হঠাৎ একদিন একটা বিজ্ঞাপন দেখেই লাফিয়ে ওঠে সুধাংশু। একজন গৃহশিক্ষক চাই,—ত্রিশ টাকা মাইনে।—ছেলেকে মাত্র দু'ঘণ্টা পড়াতে হ'বে'—একঘণ্টা সকালে, আর রাত্রে একঘণ্টা।

সে বিজ্ঞাপনটা পড়ল,—একবার—দু'বার—তিনবার—

বন্ধু সমীর এসে বললে বিজ্ঞাপন দেখছ কেনহে, বিয়ে করবার সখ হ'ল নাকি?

সুধাংশু প্রতিবাদ করে বলল, না, না! বিয়ের বিজ্ঞাপন নয়,—একটা কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখছিলাম।—এই যে, পড়ে দেখনা।

সমীর কাগজটা নিয়ে বিজ্ঞাপনটা পড়'ল।—হেসে বলল, বেশ-বেশ! তা'হলে কলকাতায় যাচ্ছ কবে?

সুধাংশু তাড়াতাড়ি বলল, আজই—এখনিই!

আরে, আমিও ত আজ আমার মামারবাড়ী যাব! চলনা, দু'জনে একট্রেনেই যাই

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই চল! বিজ্ঞাপনের ঠিকানাটা লিখে নিয়ে সুধাংশু দাঁড়িয়ে উঠল।

(২)

ঠিক সময়ে তারা স্টেশনে উপস্থিত হল। দু'খানা টিকিট্ কেটে দুই বন্ধু সমীর ও সুধাংশু একটা সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় উঠে বসল।—তখন সন্ধ্যা সমাগত।

শ্রীরামপুরে সমীরের মামার বাড়ী।

শীতকাল।—তার উপর আবার ঠাণ্ডা হাওয়া গাড়ীর গতির সঙ্গে সঙ্গে হুহু করে গাড়ীর কাম্‌রার মধ্যে ঢুকছে।

সেকেণ্ডক্লাসের কামরাটায় আছে মাত্র সমীর ও সুধাংশু—অপর আরোহী কেউ নেই।

সুধাংশু বলল, সমীর, তুমি যখন শ্রীরামপুরে নামবে তখন আমাকে ডেকে দিও। ততক্ষণ আমি একটু ঘুমিয়ে নিই।

সুধাংশু তার র‍্যাপারটা ভালভাবে গায়ে জড়িয়ে শুয়ে পড়ল।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছে তার ঠিক নেই। ঘুম ভাঙ্গতেই সুধাংশু দেখল, সমীরও পাশের একটা বেঞ্চে র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে সশব্দে নিদ্রা যাচ্ছে। ট্রেনটা তখন শ্রীরামপুর স্টেশন পার হয়ে পরের স্টেশনে এসে থেমেছে। সুধাংশু তাড়াতাড়ি সমীরকে একটা ধাক্কা মেরে বলল, এই সমীর, শ্রীরামপুর পার হয়ে এলুম যে।

সমীর তখনও পূর্ববৎ নিদ্রায় মগ্ন।

এই সমীর, ওঠ্। সুধাংশু মারল তাকে দ্বিতীয় ধাক্কা। কি ঘুমরে বাবা।

তবুও সমীরের ঘুম ভাঙ্গে না।

এবার সুধাংশু একটা সরু কাঠি নিয়ে আস্তে আস্তে সমীরের নাকের ছিদ্র দুটোর মধ্যে ঢুকিয়ে দিল।

হ্যাচ্চো—হ্যাচ্চো,—নিদ্রিত লোকটি হাঁচতে হাঁচতে উঠে বসল।

একি! সমীরের পরিবর্তে উঠে বসলেন একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। একি ভেল্কি নাকি!! সমীর তাহলে শ্রীরামপুরেই নেমে গেছে। আর ভদ্রলোকটীও কখন তার স্থানে র‍্যাপার জড়িয়ে শুয়েছেন, তা সুধাংশুর অজ্ঞাত। কারণ, সেও এতক্ষণ ঘুমুচ্ছিল। কে কখন নামছে বা উঠ্‌ছে, তার খবর সে জানবে কি করে?

ভদ্রলোকটী খাপ্পা হয়ে উঠলেন, ইয়ার্কি করবার আর জায়গা পাওনি? হ্যাচ্চো—নাকে কাঠি দিয়ে ভদ্রলোকের—হ্যাচ্চো—ঘুম ভাঙ্গান! হ্যাচ্চো। আজ আমি তোমাকে পুলিশের হাতে দেব। হ্যাচ্চো—হ্যাচ্চো,—বাব্বাঃ!!!

গাড়ী হাওড়া স্টেশনে এসে থামতে না থামতে সুধাংশু তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নেমে ভীড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। মনে মনে বলেও উঠ্‌ল, খুব বেঁচে গেছি বাবা। জয় মা কালী।

(৩)

সুধাংশু তার কাকা নিখিলবাবুর বাড়ীতে এসে উঠেছে।

রাত্রে খাবার সময় নিখিলবাবু সুধাংশুকে বললেন, হঠাৎ এমন অসময়ে এসে পড়লি যে!

একটা টিউসনির সন্ধানে এসেছি। কালীঘাটে অখিল সেনের বাড়ীতে একটা ছেলের জন্যে একজন গৃহ-শিক্ষক চাই। যদি—

কোথা? কালীঘাটে অখিল সেনের বাড়ীতে?

হ্যাঁ,—ত্রিশ টাকা মাইনে। মাত্র দু'ঘণ্টা পড়াতে হবে

আরে, অখিল সেন যে আমার বাল্যবন্ধু। তার বাড়ীতে? বেশ-বেশ—

নানা রকম আলোচনার পর ঠিক হল—কাল সকালে সুধাংশুকে নিয়ে নিখিলবাবু অখিলবাবুর বাড়ীতে টিউসনির ব্যবস্থা করতে যাবেন।

পরদিন সকালে।

সুধাংশু কাকার সঙ্গে অখিলবাবুর বাড়ীতে এল। নিখিলবাবু সুধাংশুকে নিয়ে তাঁর ঘরে ঢুকলেন।

ঘরে ঢুকেই সুধাংশু যে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেল না, তার কারণ বোধ হয় পাশেই ছিল ঐ দেওয়ালটা। কিন্তু ভয়ে সে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগল। ঘরে যে ভদ্রলোকটী (অখিলবাবু) বসে আছেন, সুধাংশু দেখলে তিনিই হচ্ছেন, ট্রেনের সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক!!

আরে নিখিল যে, এস এস। তারপর,—খবর কি? অখিলবাবু প্রসন্ন হেসে বললেন।

নিখিলবাবু সুধাংশুর টিউসনির কথা পাড়লেন। সুধাংশু কম্পিতদেহে শুনতে লাগল।

অখিলবাবু সুধাংশুকে ভালকরে দেখে বললেন, ও! এই বুঝি তোমার ভাইপো সুধাংশু। এর সঙ্গেই যে কাল ট্রেনে আমার দেখা হয়েছিল!

নিখিলবাবু উৎফুল্লচিত্তে বললেন, তাই নাকি? কাল? —ট্রেনে।

সুধাংশুর অবস্থা তখন কেমন হচ্ছে, বুঝতেই পারছ। এইবার বুঝি অখিলবাবু তার কাকার কাছে ট্রেনের ব্যাপারটা প্রকাশ করে ফেলেন। ভয়ে কপালে তার বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল সেই শীতের সকালেও।

কিন্তু অখিলবাবু হেসে বললেন, এস বাবা সুধাংশু, আজ থেকে তুমি আমার পিণ্টুর মাস্টারমশাই হলে।

ওঃ!! সুধাংশুকে তখন পায় কে? ছুটে গিয়ে অখিলবাবুর পায়ের উপর ঠক্ করে মাথা ঠুকে ফেলল।

ক্যালেণ্ডার মেভার এণ্ডিং

শ্রীকালিদাস সাহা

১৩৪৭ সনের আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীঅনিলবরণ মহাস্তি লিখিত "ক্যালেণ্ডার ১৯৪০" পাঠ করিয়া আমি নিম্নের প্রক্রিয়াটী পাঠশালার গ্রাহক বন্ধুগণকে উপহার দিতেছি।

এই প্রক্রিয়া মত অতীত ও ভবিষ্যৎ যে কোন বছরের যে কোন মাসের যেরূপ ইচ্ছা তারিখে কী বার ছিল। বা হইবে তাহা নিরূপণ করা যাইবে।

সাধারণ বছর

জানুয়ারী	ফ্রেবয়ারী	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নবেম্বর	ডিসেম্বর
৩	৬	৬	১	৪	৬	১	৫	-	৩	৫	১

লিপইয়ার

জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নবেম্বর	ডিসেম্বর
৩	৪	০	২	৫	০	৩	৬	১	৪	৬	২

বর্ষের শতাব্দী জ্ঞাপক সংখ্যাকে ৪ দ্বারা ভাগ করিয়া উহার ভাগফল ও ভাগশেষ নিন।

বর্ষ জ্ঞাপক বাকী সংখ্যা হইতে ১ বিয়োগ করিয়া তাহাকেও ৪ দ্বারা ভাগ করিয়া উহার ভাগফল ও ভাগশেষ নিন।

প্রথমে প্রাপ্ত ভাগশেষের সহিত দ্বিতীয় বারের প্রাপ্ত ভাগফল যোগ করিয়া তাহাকে ৫ দ্বারা গুণন করুন। ঐ গুণন ফলের সহিত দ্বিতীয় বারের প্রাপ্ত ভাগশেষ, মাসের তারিখ জ্ঞাপক সংখ্যা ও উপরের ছকে লেখা নির্ণেয় মাস জ্ঞাপক সংখ্যার বামের সংখ্যা একত্র যোগ করিয়া ফলকে ৭ ভাগ করুন। কিন্তু জানুয়ারী মাসের বেলায় মাস জ্ঞাপক সংখ্যা যোগ করিতে হইবে না। এক্ষণে অবশিষ্ট যদি '০' হয় তবে রবিবার। '১' হইলে সোমবার '২' হইলে মঙ্গলবার—এইরূপে বার নির্ণয় করা যাইবে।

লিপ ইয়ার হইলে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত প্রক্রিয়া করিয়া লিপইয়ারের ছকে লেখা নির্ণেয় মাস জ্ঞাপক সংখ্যার বামের সংখ্যা লইতে হইবে তাহার পর সবই পূর্বমত নির্ণয় করুন।

দৃষ্টান্তঃ। ১৯৩৯।১০ই মার্চ কী বার ছিল ?

১৯ বর্ষের শতাব্দী জ্ঞাপক সংখ্যা।

৩৯ বর্ষ জ্ঞাপক সংখ্যার বাকী অংশ

	ভাগফল	ভাগশেষ
১৯ — ৪ =	৪	৩
৩৯ — ১ = ৩৮ — ৪ =	৯	২

৯ + ৩ = ১২ × ৫ = ৬০—গুণন ফল

২—দ্বিতীয় বারে প্রাপ্ত ভাগশেষ

১০—তারিখ জ্ঞাপক

৩—ছক অনুযায়ী মার্চের বামে পূর্ববর্তী মাসের সংখ্যা

৭) ৭৫

ভাগফল = ১০ — ৫ অবশিষ্ট

৫ অবশিষ্ট রহিল,

অতএব শুক্রবার ছিল।

শিশু-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীধ্রুবরঞ্জন সরকার

গ্রাঃ নং—১১১৮

রবীন্দ্র-প্রতিভা সাগরের মতোই বিরাট ও রহস্যে-ঘেরা। এর সামনে থমকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়—নির্বাক হয়ে। যে কবির কণ্ঠ হ'তে উৎসারিত হলো মহামানবের জয়গান, যে কবির লেখনীতে মানব-জীবনের চির-রহস্য, প্রেম, ভালোবাসা রূপ পেলো অপরূপভাবে, মুখর করলো প্রকৃতির মূক ভাষাকে যে কবি, করলো বিশ্লেষণ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মনঃস্তাত্ত্বিক রহস্য, তারই লেখনীর যাদু স্পর্শে প্রকাশ পেলো শিশু-মনের অপরূপ রূপরাজ্য তার রূপ, রঙ, রহস্য নিয়ে। পৃথিবীর কোন যুগে, কোন দেশে, কোন শ্রেষ্ঠ কবির কণ্ঠে শিশু-মনের রহস্যময় বাণী এমন ভাবে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে? তাই রবীন্দ্রনাথ সকল দেশের শিশুর শ্রেষ্ঠকবি, নিপুণ শিল্পী।

শিশুর ভালো-লাগা, মন্দ-লাগা, তার রহস্যে-ঘেরা অপরূপ মনের কোণে যে ভাব, যে কল্পনা ওঠে জেগে, তাকে রূপায়িত করতে যে সাহিত্যের প্রয়োজন—তাই হলো শিশু-সাহিত্য। এ সাহিত্য রচনা করতে হলে শিশু-মনের গহনে প্রবেশ করে শিশুর সরলতা, শিশুর দৃষ্টি নিয়ে তাকে হতে হবে শিশু। বিশ্বকবি ওদেরই মত একজন শিশু, ওদেরই খেলার সঙ্গী,—ওদের খেলাঘরের গায়ক ও কবি। রবীন্দ্র সাহিত্যের সু-সমালোচক চারু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—'রবীন্দ্রনাথ শিশুর ও শৈশবের অনুরাগী কবি। শিশুর মনস্তত্ত্ব, সুখ, দুঃখ এমন প্রাণ দিয়ে অনুভব ও প্রকাশ করতে পৃথিবীর আর কোন কবি পারেন নাই।'

রবীন্দ্রনাথকেই বাংলার প্রকৃত শিশু-সাহিত্য-স্রষ্টা বলা যায়। তার আগে কেউ কেউ এ কার্যে ব্রতী হলেও তাঁদের রচনা শিশুর মন স্পর্শ করে নি। তাঁরা এমন কিছু রেখে যান নি যাতে শিশু পায় তার কল্পনাপ্রবণ মনের 'দুরন্ত প্রকাশ'। তাঁরা শিশুকে দেখেছেন বয়স্কের দৃষ্টিতে তাই শিশু মনের রহস্য, অচিন্ত্যনীয়তা তাঁদের কাছে রয়ে গেছে অপরিচিত। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অন্যান্য শিশু-সাহিত্যিকদের তফাত এইখানে যে তিনি বিশ্ব-সংসারকে প্রকাশ করেছেন শিশুর দৃষ্টিতে আর অন্যান্য লেখকরা প্রবীণের দৃষ্টিতে বিচার করেছেন। শিশুর প্রকৃত পরিচয় তাঁরা পান নি তাই তাঁদের রচনা সাহিত্য হয়ে ওঠে নি।

আধুনিক শিশু সাহিত্যিকরা শিশুর মনকে না বুঝেই ব্রতী হয়েছেন সাহিত্য চর্চায়। তাই শিশু-চিত্ত গঠন করার মুখ্য বস্তুটাই আজকের শিশু-সাহিত্যের প্রধান অভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতে এড্‌ভেঞ্চার আছে, গল্প আছে, আছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা, নীতিপাঠ। কিন্তু নেই সেই আসল লেখা যা পড়ে শিশুর অবচেতন মন হঠাৎ কোন রহস্যের আলো পেয়ে চমকে উঠতে পারে, যা শিশুর অতি চঞ্চল মনকেও রহস্যময় অজানা চিন্তায় ক্ষণেকের জন্যও থমকে দাঁড় করাতে পারে। প্রাণকে স্পর্শ করে না, তাই আজকের শিশু-সাহিত্য প্রাণ-হীন, এতে নিচুদরের বাস্তবতা এসে ভিড় করেছে। রবীন্দ্রনাথের একটা কথা উদ্ধৃত করে দিলে এটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।—'ছেলেদের বই যাঁরা লেখেন, দেখি তাঁরা প্রচুর পরিমাণে কেনার যোগান দিয়ে থাকেন।'

শিশু-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান অতুলনীয়। একে বলা যায়—

One with a flash begins and ends in smoke,
Another out of smoke brings glorious light,
And (without raising expectation high)
Surprises us with dazzling miracles
(Rose Common)

শিশু চির-নবীন—আবার পুরানের মোহ আছে তাকে ঘিরে। রবীন্দ্রনাথেরই কথায় বলি—সর্বপ্রথম সে যেমন নবীন, যেমন সুকুমার, যেমন মূঢ় ছিল আজও ঠিক তেমনি আছে।' সে 'প্রভাতের আলোর সমবয়সী'। এই চির নবীনত্বের কারণ এই যে শিশু—প্রকৃতির সৃজন। আর বয়স্ক মানুষ—মানুষের নিজেরই করা রচনা। এই কথাটা ভুলে যান বলেই আধুনিক শিশু সাহিত্যিকদের ব্যর্থতা দেয় দেখা। প্রবাণের উপর শিশুর দাবী চিরদিন। সে সারল্যের প্রতিমূর্তি,—চিরদিন কবির হৃদয় জয় করে আসছে সে। সত্যকে জানতে তার মত কেউ পারে না—Children know the truth (Swinburn)

রবীন্দ্রনাথ শিশুকে দেখেছেন অনেকভাবে। শিশু যেন তাঁর নিকটআত্মীয়। কবি শিশু হয়ে তাকে তার নিজের দৃষ্টিতে দেখেছেন, আবার টেনিসন, ওয়ার্ডসওয়ার্থের মত শিশুকে দেখেছেন—দার্শনিকের চোখেও।

শিশু-সাহিত্যে 'শিশু' তাঁর শ্রেষ্ঠ দান। শিশুর চঞ্চল পদধ্বনি শোনা যায় কবিতাগুলিতে। 'মোহন মায়াস্বপ্ন ঘিরে আছে তাতে, শিশুর ব্যাকুল উৎসুক দৃষ্টি

পড়ে চোখে—সামনের পথ তার দুর্বোধ্য কলরবে মুখর, সে শোনে তার অশ্রান্ত সংগীত। মনে তার হাজার স্বপ্ন, অজানা চাঞ্চল্য, অদ্ভুত কামনা, নাম না-জানা নানাদেশের ছবি, আবার পরির দেশ, পুরাণের দেশ, রূপকথার রাজ্য জাগিয়ে তোলে এর অস্পষ্ট আনন্দ-বেদনা। সাত ভাই চম্পা আর পারুল দিদির দুঃখে তার হৃদয় আকুল, 'মধুমাঝির নৌকায় সে পাড়ী দিতে চায় সাত-সমুদ্র-তের নদী, 'সাত রাজার ধন-মানিক' আনার তার একান্ত সাধ।

"—এলেম আমি কোথা থেকে,

কোনখানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে ?" এ যেন শিশুর কাছে প্রহেলিকা একটা। কেমন করে সে আলোকময় অজানা ধরণীর মাঝে এলো—কোন অচিন রূপের দেশ হতে ? শিশু-মনের প্রশ্ন ও অনুসন্ধিৎসা এমন নিখুঁত-ভাবে রূপ দিতে আর কোনও কবি পেরেছেন বলে মনে হয় না।

শিশু ভালোবাসে রঙ, সে চায় ছবি। তার কাছে অসম্ভব বলে কিছু নেই, বাস্তব ও কল্পনার সীমাও তার কাছে অস্পষ্ট। 'তাহার নিকট অদ্ভুত কিছুই নাই, কারণ তাহার নিকট অসম্ভব কিছু নাই।' (রবীন্দ্রনাথ) সে রূপকথার অপূর্বতা ভালোবাসে, সেই অপূর্বতাই তার প্রধান কৌতুক। সে বোঝে না খোকা না হয়ে কুকুরছানা বা টিয়ে হতে চাইলে তার মা সায় দেয় না কেন? শিশুর মন Dynamic সে এক জিনিষে নিজেকে নিবিষ্ট রাখতে পারে না। এখন যা ভাবছে—কিছু পরেই অন্য কল্পনা এসে অধিকার করে তার মন। সে কাবুলিওয়ালার 'মিনু'। সে চাঁপা গাছে চাঁপাফুল হতে চায়, হতে চায় পাহারওয়ালা, দইওয়ালা, প্রহরী, বাজার ডাকহরকরা, ভিখারী হয়ে সে যেতে চায় দেশ থেকে দেশান্তরে—গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াবার লোভে। আবার সে বলে—'আমি পণ্ডিত হব না। যা—যা আছে সব দেখবো, কেবলি দেখে বেড়াবো' শিশুর মাঝে এই যে Bohemian spirit—একে সহজ সরল কথায় রূপ দিয়ে জীবন্ত করে তুলতে এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ পারেন নি। কত সহজ এর প্রকাশ—ফেরীওয়ালা দেখে শিশু চঞ্চল হয়ে ওঠে।

ইচ্ছে করে শেলেট ফেলে দিয়ে
অমনি করে বেড়াই করে ফেরী।

বাস্তবকে স্বীকার করে না শিশু—অন্য রাজ্যের বাসিন্দা সে। যেখানে কল্পনার অবকাশ আছে—আছে রূপ, আছে রঙ, অপরূপ সে দেশ, অপ্রত্যক্ষে তার অস্থায়ী আবাস—তেতলার নির্জন ছাদের কোণে, সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে আবার পাঁচমুড়া পাহাড় পেরিয়ে শ্যামলী নদীর ধারে তার মনের রূপরাজ্য। কবি শিশু হয়ে তার মনের গোপন খবরটি জেনে নিয়েছেন, তাই তাঁর মত শিশু-মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করতে আর কেউ পারে নি।

"। * * মাইনে দিচ্ছি আমি,
হয়েছি যে বাবার মত বড়"—

শিশু মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম অনুভূতি এমনভাবে আর কারও লেখায় ফুটে ওঠে নি।

শিশু ভালবাসে adventure অজানা বিপদ রোমাঞ্চ জাগায় তার ছোট বুকে · বীরত্ব প্রকাশের কাল্পনিক আনন্দে তার মন ভরে ওঠে অদ্ভুত শিহরণে । সে মনকে বলে—

"ছুটিয়ে ঘোড়া গেলাম তাদের মাঝে,
ঢাল তলোয়ার ঝন ঝনিয়ে বাজে,
কি ভয়ানক লড়াই হলো মা যে,
শুনে তোমার গায়ে দেবে কাঁটা!"

আধুনিক adventureএর গল্পের সাথে এর কত তফাৎ।

'শিশু' 'শিশুভোলানাথ', 'ডাকঘর' 'ছড়ার ছবি', 'সে', 'খাপছাড়া', 'ছেলেবেলা' শিশু সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

'সে'—অদ্ভুত গল্প, অসংলগ্ন, অবাস্তবের কল্পনা, গল্পের বাঁধুনি আলগা, ঘটনা এলোমেলো, সমস্তটা একটা অনিয়মের রাজত্ব। শিশু নিয়ম মানে না, মেনে চলতে জানে না। সে যে অল্পদিন হল নিয়মহীন রাজ্য হতে এসেছে। তার সতত চঞ্চল চিরন্তন খেয়ালী মন জানে না কোন বাধা, বোঝে না যুক্তি, বেপরোয়া অনিয়মে গড়া সে একটা অদ্ভুত জীব।'

'খাপছাড়া'য় আছে কতকগুলো মজাদার কবিতা। হালকা হাসির ছড়া, বেদনাহীন, উদ্দেশ্যহীন নিরর্থক কবিতাগুলোয় শিশু-মনস্তত্ত্ব এমন নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যে বিশ্বকবিকে শুধু কেবল শিশুরই একান্ত আপনার বলে মনে হয়।—

"নীলুবাবু বলে—শোনো নেয়ামৎ দর্জি
পুরানো ফ্যাশানটাতে নয় মোর মর্জি
শুনে নেয়ামৎ মিঞা যতনে পঁচিশটে
সম্মুখে ছিদ্র, বোতাম দিল পৃষ্ঠে।"

হালকা মেঘের মত ভেসে চলেছে—অর্থ-ভাবের বন্ধন নেই, সাবলিল, সুন্দর তার গতি।

গল্পের মত করে বলা, হাল্কা তুলিতে আঁকা, ছেলেবেলার কাহিনী আছে 'ছড়ার ছবি'তে।

'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' প্রভৃতি ছড়া শিশুর 'শৈশবের মেঘদূত'।

'নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোঁটন বেঁধেছে'।

বড় সাহেবের বিবিগুলি নাইতে এসেছে—' এই যে নিভৃতে বসে ছবি রচনা করে যাওয়া—এ স্বপ্নের মত—

'মানসিক মেঘরাজ্যের লীলা'—অর্থ নেই, ভাব নেই। তাই কেবল ছবি চিরকাল ধরে শিশুর মনোরঞ্জন করে আসছে। 'সে কেবল ছবি চায় কিন্তু সে ছবিকে ভাবের অশ্রুবাষ্পে ঝাপসা করিতে চাহে না' (রবীন্দ্রনাথ)।

'ছেলেবেলা' কবির ছেলেবেলার 'কাহিনী' নয় 'কাকলী'। এর মাঝে যে কোন শিশু তার মনের গোপন রাগিনীটি পাবে খুঁজে।

বিরাট প্রতিভাকে কথার দ্বারা মাপতে যাওয়ার মত পাগলামী ও ধৃষ্টতা আর নেই। তাই আজ সাগরের মতো বিরাট মনস্বিতা ও প্রতিভাকে প্রণতি জানিয়ে বিদায় নিই।

এই ভাদ্রে পাঠশালার চতুর্থ বৎসর শেষ হল। আগামী আশ্বিন থেকে এই পত্রিকা পঞ্চম বৎসরে পদার্পণ করবে।

চার বৎসরের মধ্যেই পাঠশালা যে রকম জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, যে কোনো নূতন মাসিকের পক্ষে তা গৌরবের বিষয়। দেশের প্রায় সমস্ত ছোট বড় প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মণ্ডলী, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, রাসায়নিক প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা পাঠশালার জন্য সকলেই লেখনী ধারণ করেছিলেন। আমরা তাঁদের কাছে বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ।

যুদ্ধের জন্য প্রত্যেক জিনিস দুর্লভ ও দুর্মূল্য হয়ে ওঠায়, পাঠশালার পৃষ্ঠা সংখ্যা কিছু কমাতে হয়েছে, ছবি দেওয়া একরকম বন্ধ করতেই হয়েছে। তিনরঙে প্রচ্ছদপট ছাপাবার বিলাস বর্জন করতে হয়েছে। লেখকদের মর্যাদার উপযুক্ত দক্ষিণা দেওয়াও এখন আর সম্ভব নয়, কারণ পাঠশালার আয় থেকে তার সম্পূর্ণ ব্যয় নির্বাহ হয় না। আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করেই কাগজখানিকে চালানো হচ্ছে দেশের ছেলেমেয়েদের সত্যকার শিক্ষিত মানুষ করে গড়ে তোলবার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে।

পাঠশালার প্রচার যত বাড়ছে, এর গ্রাহক সংখ্যা যতই উর্দ্ধে উঠছে ততই আমাদের শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হয়ে উঠছে জানি, কিন্তু, তবুও বৎসরের শেষে এ পত্রিকাখানির কোনো আয় হওয়া দূরে থাক, এখনও এ স্বাবলম্বী হতে পারছে না কেন এটা হয়ত অনেকের কাছে হেঁয়ালি মনে হবে। ব্যাপারটা তবে খুলে বলি—

প্রত্যেক কাগজের আয় ব্যয়ের মেরুদণ্ড হ'চ্ছে কাগজের বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠাগুলি। 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', প্রভৃতির ন্যায় চিত্রবহুল এবং প্রায় ১৫০।২০০ পৃষ্ঠার এক একখানি পত্রিকার প্রকাশ ব্যয়ই প্রায় একটাকর উপর অথচ তাঁরা কাগজগুলি মাত্র আট আনা মূল্য বিক্রয় করেন। এটা সম্ভব হয় কেবলমাত্র বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠাগুলির দাক্ষিণ্যে।

বিজ্ঞাপন প্রকাশের জন্য যে টাকা এঁরা প্রতিমাসে পান তাতে পত্রিকার সমস্ত ব্যয় কুলিয়েও তাঁদের হাতে অর্থ প্রচুর থাকে। প্রত্যেক বইখানিতে এক টাকা করে খরচ পড়লেও এঁরা বইখানি মাত্র আট আনায় অনায়াসেই দিতে পারেন।

কিন্তু তোমরা বোধহয় লক্ষ্য করে থাকবে যে পাঠশালা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন আছে মাত্র তিনটি—'ক্যালকাটা-কেমিক্যাল' 'বিশ্বভারতী' ও 'ডোঙ্গরের বালামৃত'। অবশ্য আরও কিছু কিছু বিজ্ঞাপন যুদ্ধ বাধবার পূর্বে ছিল, কিন্তু যুদ্ধের জন্য বিদেশ থেকে মাল আর আসছে না বলে বৃথা বিজ্ঞাপন দেওয়া তাঁরা বন্ধ করেছেন। বিজ্ঞাপন সংগ্রহের কাজে মাঝে মাঝে যে সব লোক নিয়োগ করা হচ্ছে, তাঁরা ব্যবসায়ী মহলে ঘুরে ফিরে এসে জানাচ্ছেন—ছেলেদের কাগজে কেউ বিজ্ঞাপন দিতে রাজি নন।

এ সংবাদটায় অবশ্য আমাদের দেশের ব্যবসায়ী মহলের বুদ্ধি বিবেচনা ও দূরদর্শিতার অভাবই সূচিত হয়। কারণ তাঁরা কেউ এটা ভেবে দেখেন না যে ছেলেদের কাগজের প্রধান অনুরাগীই হলেন ছেলেদের মা, মাসি, দিদি বউদির দল। তাছাড়া পাঠশালায় প্রতিমাস 'ক্রস্‌ওয়ার্ডপাজ্‌ল' থাকে বলে এটা ছেলে মেয়েদের মাষ্টার ও অভিভাবকদেরও হাতে হাতে ঘোরে। বাংলাদেশের বহু ইংরাজী হাই ইস্কুল, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পাঠশালা, লাইব্রেরী, ক্লাব, সঙ্ঘ, সমিতি ইত্যাদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠশালার প্রচার রয়েছে। যে কোনও এক সংখ্যা পাঠশালা খুলে দেখলেই তাঁরা দেখতে পাবেন যে পাঠশালা কেবলমাত্র বাংলা ও আসাম প্রদেশের সকল জেলাতেই যায় না, বাংলার বাইরেও জামশেদপুর, পূর্ণিয়া, পুরুলিয়া, রাঁচি, এলাহাবাদ, কানপুর, পাটনা, গয়া, দিল্লী, সিমলা, লক্ষ্ণৌ, লাহোর, রায়পুর, বেরার

(সিপি) জব্বলপুর, বাঙ্গালোর, বোম্বাই, কলোম্বো, রেঙ্গুন, প্রভৃতি ভারতের সুদুরস্থিত প্রবাসী বাঙ্গালীদের অন্তঃপুরেও পাঠশালায় নিয়মিত যাতায়াত রয়েছে।

সুতরাং অতি সামান্য মাসিক ব্যয়ে এমন বিস্তৃত প্রচারের সুযোগ যে দেশের ব্যবসায়ীরা নিতে আগ্রহশীল নন তাঁদের ব্যবসায় বুদ্ধির সম্বন্ধে সংশয় জাগা বিচিত্র নয়। কতকগুলি বিশেষ জিনিসের ব্যবসায়ীদের পক্ষে এই ছেলেদের কাগজই যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচার-বাহন একথা বলা বাহুল্য মনে করি। যেমন ধরুন ছেলেমেয়েদের পড়বার মত পুস্তক, পত্রিকা ও গ্রন্থাদির বিজ্ঞাপন, ছেলেমেয়েদের খেলবার উপযোগী পুতুল, বল, বাঁশী ইত্যাদি যাবতীয় ক্রীড়ার সরঞ্জাম, গৃহস্থ পরিবারের ব্যবহারোপযোগী ফার্ণিচার্স, টয়লেটস্, জুয়েলারি, স্টেশনারী দ্রব্যাদি, জামা কাপড় জুতা মোজা গেঞ্জি ছাতা লাঠি ইত্যাদি। ছেলেমেয়েদের পেরাম্বুলেটার, বাইসাইকেল, ট্রাইসাইকেল ইত্যাদি, ছেলেমেয়েদের প্রিয় টফি, লজেন্স, বিসকিট, চকোলেট প্রভৃতি, ছেলেমেদের ফুড, বার্লি, টনিক ও ঔষধপত্র, ছেলেমেয়েদের এডুকেশন ও ম্যারেজ ইন্সিওরেন্স ইত্যাদি। এইরকম অসংখ্য বিষয়ের নাম করা যেতে পারে যার প্রচারের পক্ষে পাঠশালা সর্বাপেক্ষা উপযোগী পত্রিকা। 'পাঠশালা' যদি এদের সকলের নিকট বিজ্ঞাপনে সাহায্য পেত, তাহলে সমস্ত ছেলেদের কাগজের মধ্যে যে স্থান সে আজ অধিকার করেছে তা অধিকতর উজ্জ্বল ও গৌরবময় করে তুলতে পারত।

বিনা বিজ্ঞাপনে যাতে সে বেঁচে থাকতে পারে, পাঠশালাকে উপস্থিত সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই অগ্রসর হতে হচ্ছে, কাজেই যুদ্ধের হাঙ্গামায় ও বিজ্ঞাপনের কার্পণ্যে চতুর্থ বৎসরের পাঠশালার পৃষ্ঠা সংখ্যা অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা কিছু কম হলেও বিষয় বৈচিত্র্যে পাঠশালা এবৎসরও যে সমস্ত সহযোগিদের অতিক্রম করেছে এর বার্ষিক সূচীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

পাঠশালা নিতান্ত ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য নয়। যারা একটু বড় হয়েছে এবং উচ্চশ্রেণীতে পড়ে, পাঠশালা তাদেরই কাগজ। ছেলেমেয়েদের গ্রাহক করে দেবার সময় এই কথাটা অভিভাবকদের স্মরণ রাখতে অনুরোধ করি।

পঞ্চম বর্ষের পাঠশালার যাঁরা গ্রাহক থাকতে চান তাঁরা ১০ই ভাদ্রের মধ্যে মণিঅর্ডারে তাঁদের বার্ষিক চাঁদা ৩৲ টাকা বা ষাণ্মাসিক চাঁদা ১৷৹ টাকা পাঠিয়ে দেবেন। যাঁদের গ্রাহক থাকবার আর ইচ্ছা নেই তাঁরা যেন ১০ই ভাদ্রের মধ্যে পত্র লিখে আমাদের জানান। কেন না—, যাঁদের কাছ থেকে কোনো খবর বা মণিঅর্ডার ১০ই ভাদ্রের মধ্যে পাওয়া যাবে না, **আশ্বিনের রবীন্দ্র সংখ্যা পাঠশালা** তাঁদের ঠিকানায় ভিঃ পিঃ করে পাঠানো হবে। ভিঃ পিঃ ফেরত এলে আমাদের অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয় এটা যেন সকলে মনে রাখেন। ষাণ্মাসিক গ্রাহকদের কাগজ ভিঃ পিঃ করা হয় না। কারণ তাতে গ্রাহকদেরই ক্ষতি হয়।
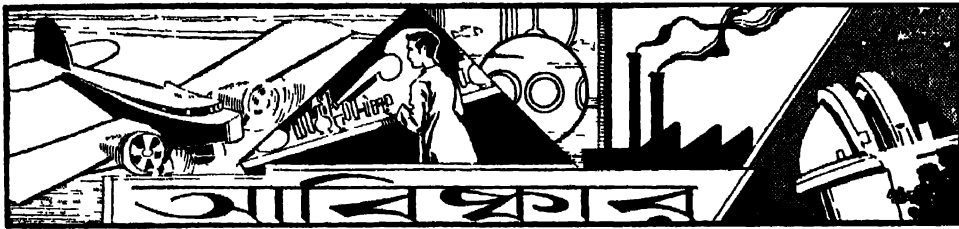
বিষাক্ত রক্তামাশয়ের প্রতিকার

'ব্যাসিলারী ডিসেণ্ট্রী' রোগের নাম শুনলে ভয় পায় না এমন লোক খুব কম আছে। এ রোগ সাক্ষাৎ মৃত্যুর দোসর। সময়ে ধরা না পড়লে এবং উপযুক্ত চিকিৎসা না হলে সত্বর প্রাণনাশের আশঙ্কা। এই বিষাক্ত রক্তামাশয় যেমনি ভীষণ মারাত্মক তেমনি প্রবলভাবে সংক্রামক। গত যুরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় এরোগ প্রথম দেখা দেয় মেসোপোটামিয়া ও প্যালেস্টাইন অঞ্চলে এবং দেখতে দেখতে দু'লক্ষ সৈন্য এতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। মেসোপোটামিয়ার সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ যোগ থাকায় এ রোগ অবিলম্বে এ-দেশেও এসে পৌঁছেছিল। এখানে যে আসে সেত আর যেতে চায় না, যেমন গত যুদ্ধের মহামারী 'ইনফ্লুয়েঞ্জা' এসে এক বৎসরের মধ্যে ভারতের ষাট লক্ষ লোককে নিশ্চিহ্ন করে এখানে পাকা বনেদ গেড়ে বসেছে, তেমনি এই 'ব্যাসীলারী ডিসেণ্ট্রী'ও ভারতে এসে স্থায়ী বসবাস শুরু করেছে। নোংরা জল পান করার জন্য, মাছিবসা খাদ্য গ্রহণের ফলে, মশার কামড়ে এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে এই বিষাক্ত রক্তামাশয় আমাদের মধ্যে সংক্রামিত হয়, ভারতবাসীরা এসব বিষয়ে

মোটেই সতর্ক নয়, ফলে রক্তামাশয় রোগ তাদের সহজেই ধরবে। এই রোগের মূল অনুসন্ধান করে শীগা নামে একজন জাপানী জীবাণুতত্ত্ববিদ প্রথম আবিষ্কার করেন এই বিষাক্ত জীবাণু। তাঁরই নামে চিকিৎসা জগতে এই জীবাণুর নামকরণ হয়েছে "শীগামেলা"। শীগা এই রোগের মূল কারণ আবিষ্কার করলেও এর প্রতিকার এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। আমেরিকা যুক্তরাজ্যের জনহপকিন্স্ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ডাঃ ঈ, কে,মার্শাল এই ব্যাসিলারী ডিসেণ্ট্রীর অব্যর্থ ঔষধ আবিষ্কার করেছেন। এই ঔষধের নাম "সালফাগিলাইল গুয়ানিডাইন"। এই দেড় গজ নামটিকে হ্রস্ব করে ঔষধটিকে বলা হয় 'সালফাগুয়ান'। এই ঔষধের একটি প্রধান গুণ যে ইনজেকশান না করে মুখেও খাওয়ানো চলে। রক্তের সঙ্গে মেশেনা বলে কোনো কুফল হয় না। ধীরে ধীরে অন্ত্রের মধ্যে গিয়ে কাজ করে। এই ঔষধ আবিষ্কারের ফলে বহু জীবন অকালে বিনষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পাবে।

বোমাতঙ্কগ্রস্ত রোগীর চিকিৎসা

লণ্ডনে বহুলোক এই বোমাতঙ্ক রোগে কষ্ট পাচ্ছেন। গত বৎসর ডানকার্ক থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা বহু সৈনিকও এই বোমাতঙ্কে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ছিলেন। কোনো একজন উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন চিকিৎসক এই বোমাতঙ্ক রোগ দূর করবার এক অভিনব উপায় আবিষ্কার করেছেন। তিনি গ্রামোফোন রেকর্ডের সাহায্যে বিমান আক্রমণের সমস্ত শব্দ গ্রহণ করে হাসপাতালে, রোগীদের কাছে অনবরত তা বাজাবার ব্যবস্থা করেছেন। শত্রুর এয়ারোপ্লেন আসছে। সতর্কতাসূচক 'সাইরীণ' বাঁশী বাজতে শুরু হল, উঠতে লাগল আকাশে আর-এ-এফ-এর বিমান যোদ্ধারা তাদের গর্জনকারী বিমান নিয়ে শত্রু বিমানকে বাধা দিতে। শুরু হল শূন্যে ভীষণ সজ্ঘর্ষ। ফট্-ফট্-ফট্-ফট্-ফট্-ফট চলেছে মেশিনগানের শব্দ; গুড়ুম গুড়ুম কামান ও বন্দুকের আওয়াজ। ঝাঁকে ঝাঁকে বোমা পড়ে ফাটতে লাগল বজ্রপাতের চেয়েও ভীষণ শব্দে, কাণে তালা লেগে যায়। সমস্ত শরীর চমকে চমকে কেঁপে ওঠে সে আওয়াজে। কিন্তু, আশ্চর্য যে বোমাতঙ্কগ্রস্ত রোগীরা অনবরত এই শুনে শুনে অভ্যস্ত হয়ে ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠছেন।

জার্মানি যখন অকস্মাৎ ডেনমার্ক ও নরওয়ে অধিকার করে বসল, গ্রেটব্রিটেন তখন আত্মরক্ষার প্রয়োজনে সত্বর আইসল্যাণ্ড দখল করে নিয়েছিল। গ্রীণল্যাণ্ড ও নরওয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত এই তুষার দ্বীপের উপর গ্রেটব্রিটেনের অধিকার নাকি ব্রিটীশ স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। 'আইসল্যাণ্ড' ছিল তখন ডেনমার্কের রক্ষণাধীনে এক স্বায়ত্ত শাসন প্রাপ্ত প্রদেশ। গ্রেট ব্রিটেন দিল তাকে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি। কৃতজ্ঞ আইসল্যাণ্ড ব্রিটীশ সৈন্য ও নৌবহরকে সাদর সম্বর্দ্ধনা জানিয়ে করলে তাদের সানন্দে অভ্যর্থনা। তার পর বৎসর ঘুরে গেছে। ব্রিটীশ নৌবাহিনী ও স্থলবাহিনী সেখানে ঘাঁটি গেড়ে বেশ কায়েমী, হয়ে বসেছে। এমন সময়, খবর এল 'আমেরিকা 'আইসল্যাণ্ড' দখল করেছে!

* * * *

গ্রেট ব্রিটেনের প্রধান মন্ত্রী চার্চহিল সাহেব এ সংবাদের প্রতিবাদে আমেরিকাকে এক পত্র লিখে জানালেন যে এরূপভাবে তাঁদের একটা ঘোষণা প্রচার করা গ্রেট ব্রিটেনের পক্ষে অসম্মানজনক। আমেরিকা এজন্য কোনো দুঃখ প্রকাশ করেছিল কিনা জানা যায়নি, তবে মার্কিণ নৌবহর ও সেনাবাহিনী গিয়ে যে আইসল্যাণ্ড দখল করেছে এ খবর পাওয়া গেছে। ব্রিটিশ বাহিনীও সেখানে আছে।

* * * *

কিছুদিন আগে আমেরিকা গ্রীনল্যাণ্ডেও নৌবহর ও সেনা নামিয়ে গ্রীনল্যাণ্ডের সামরিক সুবিধাজনক বিশেষ বিশেষ নৌ ঘাঁটি ও বিমান ঘাঁটি দখল করে নিয়েছে। গ্রীণল্যাণ্ডও ইতিপূর্বে ডেনমার্কেরই অধীন ছিল। কিন্তু, ব্রিটীশ স্বার্থ রক্ষার জন্য এর কোনো কোনো অংশ বহু পূর্বেই ব্রিটেনের অধিকারে হস্তান্তরিত হয়েছিল।

'লীজ এণ্ড লেণ্ড' বিল অনুসারে এ্যাটল্যান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের অন্যান্য ব্রিটীশ নৌঘাঁটি ও বিমান ঘাঁটি ৯৯ বৎসরের জন্য আমেরিকাকে ইজারা দেওয়ার সময় গ্রীন-ল্যাণ্ডের ঘাঁটিও মার্কিনের হাতে সমর্পণ করা হয়ে ছিল।

* * * *

সেদিন পার্লিয়ামেণ্টের বিতর্কের মধ্যে প্রকাশ হয়েছে যে 'উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ড' অর্থাৎ আলস্টার প্রদেশেও আমেরিকা নৌঘাঁটি ও বিমান ঘাঁটির জন্য উপযুক্ত স্থান অধিকার করেছে, এবং শত শত মার্কিণ শ্রমিক নাকি আমেরিকার প্রয়োজনানুযায়ী সেখানে কায়েমী ভাবে ঘাঁটি নির্মাণ করছে। শোনা যাচ্ছে, স্কটল্যাণ্ডেও তারা নাকি ঘাঁটি নির্মাণ করতে চাইচে, নইলে, আমেরিকার প্রস্তুত সামরিক দ্রব্যসম্ভার নিরাপদে এ্যাটল্যান্টিক পার করে ব্রিটীশ দ্বীপে পৌঁছে দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

* * * *

গতমাসেই আমরা বলেছি—উপস্থিত ধারে মাল নেবার গরজে ব্রিটেন তার এ্যাটল্যান্টিকের ঘাঁটিগুলি যে একে একে আমেরিকার হাতে তুলে দিতে বাধ্য হচ্ছে, এটা বেশ বোঝা যায়। বর্তমানে এর পরিবর্তে আমেরিকার কাছে যে প্রচুর সাহায্যও পাওয়া যাচ্ছে একথাও ঠিক। কিন্তু, এর পরিণামে ভবিষ্যতে ব্রিটেনের কোনো ক্ষতি হতে পারে কি না সেইটা ভেবে দেখা দরকার। অবশ্য এর স্বপক্ষে এই বলা চলে যে উপস্থিত বিপদ থেকে ত আগে রক্ষা পাই, তারপর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভাবা যাবে। এ কথা স্বীকার করে নিলেও এর মধ্যে ভেবে দেখবার আছে এই—যে, এক বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য আর এক বিপদ ডেকে আনা হচ্ছে কিনা।

* * * *

একথা তো অস্বীকার করা চলে না যে, রাষ্ট্রনৈতিক মিতালী অতি ক্ষণভঙ্গুর সম্বন্ধ। স্বার্থের সংঘাত উপস্থিত হলেই মুহূর্তে তা চূর্ণ হয়ে যায়। যেমন হয়েছে ইঙ্গ ফরাসী মৈত্রীর অবস্থা, যেমন হল রুষ-জার্মান চুক্তির দশা। আমেরিকার সঙ্গে ব্রিটেনের যে সদ্ভাব আজ নিবিড় হয়ে উঠেছে, কে বলতে পারে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের অবর্তমানে তা কোনোদিন শিথিল হয়ে পড়বে না ?

* * * *

ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে ব্রিটেনের সঙ্গে আমেরিকার স্বার্থের সংঘাত যে না ঘটতে পারে এমন নয়। আমেরিকার সাহায্যে বর্তমান যুদ্ধে জয় লাভ করতে পারলেও, দীর্ঘ যুদ্ধের ফলে নিঃস্ব ও দুর্বল ব্রিটেনকে আবার মাথা তুলে দাঁড়াবার জন্য ব্যবসা বাণিজ্যের উপর নির্ভর করতেই হবে। অথচ, এই যুদ্ধের সুযোগে অযুধ্যমান আমেরিকা পৃথিবীর পণ্যশালা অধিকার করে বসবে। সেদিন ব্রিটেন সেখানে এসে দেখবে বাজার মার্কিণের দখলে। মার্কিণ সেখানে আর কোনো প্রতিযোগী ব্যাপারীকে যে প্রবেশ করতে দেবে না তার প্রমাণ গত যুদ্ধের পরই পাওয়া গেছে। একটা সামান্য দৃষ্টান্ত দিই—এই যে 'সিনেমা' শিল্প, গতযুদ্ধের সুযোগে পৃথিবীর বাজার অধিকার করে বসেছে আমেরিকার ছায়াচিত্র। ব্রিটেন বহু চেষ্টা করে, এমন কি আইন করে শুল্ক বসিয়েও তার নিজের দেশে, ও নিজের সাম্রাজ্য ও উপনিবেশে 'মার্কিণ ফিল্মের' প্রচার বন্ধ করতে পারেনি। এবার আমেরিকা উঠে পড়ে লেগেছে, বিশ্বের লোহার বাজারে একচেটে অধিকার স্থাপন করতে। হয়ত করবেও সে ; শুধু লোহা নয় আরও অনেক কিছুরই বাজার সে চায়।

* * * *

কেবলমাত্র যে, ডেমোক্রেসীর দিক দিয়েই ব্রিটেনের সঙ্গে আমেরিকার ঐক্য তাত নয়।—'ক্যাপিটালিজম' অর্থাৎ 'ধন-তন্ত্রের' দীপ্ত মন্ত্রেও উভয়েই দীক্ষিত। জাতীয় সম্পদ ও ব্যক্তিগত ঐশ্বর্যের জন্যও উভয়েই সম্পূর্ণ নির্ভর করে আপন আপন ব্যবসা বাণিজ্যের উপরই। আমেরিকা যখন দেখবে ব্রিটেন আসছে তার অন্নে ভাগ বসাতে বা ব্রিটেন যখন দেখবে যে আমেরিকা তার বাণিজ্যক্ষেত্রে জয়যাত্রার পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে তখন আজকের বন্ধুত্ব স্মরণ করে তারা পরস্পরকে সেদিন কখনই ক্ষমা করবেনা। কারণ সেটা যে তাদের জীবন মরণ সমস্যা। তখন হয়ত বাধবে বিরোধ, বাধবে সংঘর্ষ, লাগবে সজ্ঘাত—ভয় ও ভাবনা সেই দিনের জন্যই।

* * * *

ব্রিটেন সহসা চোখ চেয়ে সেদিন দেখবে যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে তার সর্বাঙ্গ ঘিরে মার্কিণ অক্টোপাসের সুদৃঢ় বাহু তাকে জড়িয়ে ধরেছে। গ্রীনল্যাণ্ডে মার্কিণ, আয়ারল্যাণ্ডে মার্কিণ, স্কটল্যাণ্ডে মার্কিণ, আইসল্যাণ্ডে মার্কিণ, উত্তর সাগরে মার্কিণ, ইংলিশ চ্যানেলে মার্কিণ—এ্যাটল্যান্টিকের প্রত্যেক প্রয়োজনীয় নৌঘাঁটি ও বিমান ঘাঁটিতে মার্কিণ। মার্কিণ শ্রমিক তার ডকে ও বন্দরে, মার্কিণ নাবিক তার জাহাজে ও রণতরীতে, মার্কিণ বৈমানিক তার আকাশ ফৌজের মধ্যে! সেদিন ইংলণ্ডকে আজকের এই পরম বন্ধুর হাত থেকে রক্ষা করবে কে ? এই দুশ্চিন্তাই আমাদের শঙ্কিত করে তুলেছে।

গতমাসের খবর

বিজ্ঞান-তাপস আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের অশীতিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এবং বিবিধ রাসায়নিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি বিদ্বজ্জনসভা এ যুগের এই ঋষির, এই মানব-প্রেমিক, দেশপ্রেমিক, স্বজাতিবৎসল, জ্ঞান বিস্তারে সর্বস্ব উৎসর্গকারী ত্যাগী সন্ন্যাসীকে সাদর সম্বর্ধনা নিবেদন করেছে। পাঠশালার পক্ষ থেকে আমরাও তাঁকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি তিনি শতায়ু হোন।

*   *   *   *

বাঁচীর আবগারি বিভাগের অবসর প্রাপ্ত সুপারিন-টেনডেণ্ট শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চন্দ্র মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা ও জামাতা মমতা ঘোষ ও শৈলেন্দ্র ঘোষের সামান্য একটি দুর্ঘটনায় যে ভাবে অকস্মাৎ অকালে প্রাণবিয়োগ হল এর চেয়ে মর্মান্তিক ও শোচনীয় কিছু কল্পনা করা যায় না। পাঁচ পাঁচটি ছোট ছোট শিশু-সন্তান এক মুহূর্তে একসঙ্গে পিতৃমাতৃহীন হল। এর কোনো সান্ত্বনাও খুঁজে পাওয়া যায় না। আলো, পাখা, ইস্ত্রি, রেডিয়ো, রেফ্রিজারেটার প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য বৈদ্যুতিক জিনিসগুলি বালিগঞ্জ অঞ্চলে এ-সি অর্থাৎ Alternate Current সাহায্যে চলে। এই 'এ-সি' কারেণ্টের প্রধান দোষ এর সংস্পর্শ মানুষকে টেনে ধরে রেখে তড়িৎ পৃষ্ট করে। প্রতিবৎসর বহু নরনারী ও শিশু এ অঞ্চলে এই সর্বনেশে A C কারেণ্টের সংস্পর্শে প্রাণ হারাচ্ছে। গবর্নমেণ্টের উচিত অবিলম্বে ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীকে এই মানুষমারা কল A C.র বদলে D C বা 'ডাইরেক্ট কারেণ্ট' ব্যবহারে বাধ্য করা। আমরা যতীন্দ্রনাথকে তার এই আকস্মিক বিপদে আন্তরিক সহানুভূতি ও সমবেদনা জানাচ্ছি।

*   *   *   *

সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত পি জি উডহাউস্ বর্তমান যুদ্ধে জার্মানদের হস্তে বন্দী হয়েছিলেন। সম্প্রতি জানা গেছে জার্মানরা আমেরিকা-যুক্ত-রাষ্ট্রে বেতার-প্রচার-কার্য পরিচালনার জন্য শ্রীযুক্ত উডহাউসকে নিযুক্ত করেছে। উডহাউসের বয়স ৬১, তিনি অত্যন্ত সুরসিক ও আমোদ প্রিয় মানুষ। তাঁর সরস রচনাবলী বিশ্বজনের মনোহরণে সমর্থ। এহেন একজন সুযোগ্য ও জগদ্বরেণ্য ব্যক্তিকে জার্মানপক্ষে প্রচারকার্যে নিযুক্ত হতে দেখে ব্রিটীশ গভর্নমেণ্ট অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

*   *   *   *

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল সুদীর্ঘকাল ধরে গভর্নমেণ্টের প্রকাশিত 'ক্যালকাটা-গেজেটে' ছাপা হয়ে আসছে। সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে, গভর্নমেণ্ট নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফল অতঃপর তাঁদের 'গেজেটে' আর প্রকাশ করবেন না। কারণ কি?

*   *   *   *

বাংলা গভর্নমেণ্টের ভূতপূর্ব রাজস্ব সচিব, হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর সুযোগ্য পরিচালক শ্রীযুক্ত নলিনী-রঞ্জন সরকার দিল্লীতে বড়লাটের সম্প্রসারিত শাসন পরিষদে ভারত সরকারের শিক্ষা স্বাস্থ্য ও ভূমি সংক্রান্ত বিভাগের সদস্য নিযুক্ত হয়েছেন। নলিনীবাবুর এই সম্মানে বাংলাদেশ সম্মানিত বোধ করবে।

*   *   *   *

বাংলার বর্তমান প্রধান মন্ত্রী মাননীয় শ্রীযুক্ত ফজলুল হক্ সাহেব ভারতগভর্নমেণ্টের "জাতীয় দেশ রক্ষা পরিষদের" একজন সদস্য নিযুক্ত হয়েছেন। স্বর্গীয় সার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জির পুত্র মিঃ বীরেন মুখার্জির নামও এ প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে।

*   *   *   *

মিঃ জিন্না মোসলেম লীগের স্থায়ী সভাপতি ও সর্বাধ্যক্ষ। তাঁর আদেশ অমান্য করে বড়লাটের অনুরোধে কয়েকজন লীগ সভ্য যুদ্ধের ব্যাপারে ভারত গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করবার জন্য কেন্দ্রীয় সম্প্রসারিত শাসন পরিষদে ও জাতীয় দেশরক্ষা পরিষদে যোগ দেওয়াতে তাঁরা লীগ-দ্রোহী বলে গণ্য হয়েছেন। আমাদের মনে হয় স্বদেশ দ্রোহী হওয়ার চেয়ে লীগদ্রোহী বা কংগ্রেসদ্রোহী হওয়া অপেক্ষাকৃত লঘু অপরাধ।

*   *   *   *

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে চিকিৎসার জন্য শান্তি-নিকেতন থেকে কলিকাতায় আনা হয়েছিল। তাঁর মূত্রাশয়ের পীড়া বৃদ্ধি পাওয়ায় কবি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁকে সত্বর সুস্থ করবার জন্য চিকিৎসকেরা অস্ত্রোপচারের সাহায্য নিয়েছিলেন। প্রথমটা কবি একটু ভালবোধ করেছিলেন। কিন্তু, বাংলার একান্ত দুর্ভাগ্য এই প্রাচ্যের মুকুটমণি আর আরোগ্য হয়ে উঠলেন না। গত বৃহস্পতিবার ২২শে শ্রাবণ বেলা ১২—১৩ মিনিটে মহাকবি মহাপ্রস্থান করেছেন। বাংলার উজ্জ্বলতম দীপ নির্বাপিত হল।

ভাদ্রের প্রশ্ন

১ মানুষের অঙ্গে তিল দেখা দেয় কেন ?
—রাজকুমারী শর্মা, তালচের।

২. মাটির তলায় কতদূর পর্যন্ত নামা যায় ?
—ধ্রুবরঞ্জন সরকার, হাওড়া।

৩. সাধন পথের অন্তরায় কি ?
—হৃষীকেশ কাব্যবিশারদ, দাঁতন।

৪ 'প্যাগোডা' কি এবং কে প্রথম নির্মাণ করেন ?
—শৈলেন্দ্রকুমার রায়, কলিকাতা।

৫. ভারতে সর্বপ্রথম কোথায় কতদূর পর্যন্ত রেললাইন খোলা হয় ?—অবনীভূষণ বেরা, ঘোলদিগরুই।

৬. 'জয়ন্তী' উৎসব সর্বপ্রথম কোথায় কেন এবং কে প্রচলিত করেছিল ?—সৌরীন্দ্রমোহন তালুকদার, চাপাই।

৭ গরম কাঁচে জল দিলে তৎক্ষণাৎ ফেটে যায় কেন ?
—সুনীলকুমার ব্যানার্জি, রামপুরহাট।

৮. আষাঢ়ের ১৮নং প্রশ্নের উত্তর কি ঠিক, না ওতে ভুল আছে ?—পান্নালাল ও কেশবলাল আটা, শালিখা।

৯. 'পাকিস্থান' পরিকল্পনাটা কি ?
—মণীন্দ্রমোহন মজুমদার, গ্রাঃ নং ৩৪৪২।

১০. শীতকাল অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে নখ ও চুল বাড়ে কেন ?—পশুপতিনাথ ঘোষাল, কলিকাতা।

১১, জুলিয়ান ক্যালেণ্ডার ও গ্রেগোরিয়ান ক্যালেণ্ডারে তফাৎ কি ?—সেখ সিরাজউদ্দিন, খাগড়া।

১২ ভারতবর্ষে কে কখন প্রথম তামাকের প্রচলন করেছিলেন ?—প্রতিমা চ্যাটার্জি, জব্বলপুর।

১৩ 'ওয়াকিবহাল মহল' বলতে কী বুঝায় ?
—নীতীশরঞ্জন দে ও নিখিলরঞ্জন দে, ঢাকা।

১৪. ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে প্রথম মহিলা 'মেয়র' হয়েছেন এবং তাঁর নাম কি ?—রেবাভদ্র, ঢাকা।

১৫ শীত করলে আমাদের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে কেন ?—পশুপতিনাথ ঘোষাল, কলিকাতা।

১৬ সূর্য মণ্ডল ও চন্দ্রমণ্ডল ব্যাপারটা কি ?
—সরোজবিহারী ভাদুড়ী, কলিকাতা।

১৭ বিবাহিতা মেয়েদের সীঁথায় সিঁদুর পরা প্রথার উৎপত্তি প্রথম কোথায় ও কবে ?—মীরা দাস, সীলেট।

১৮. জ্বর বিচ্ছেদের সময় রোগীর ঘাম হয় কেন ?
—মধুঘোষাল, মুগকল্যাণ।

১৯. মানুষ প্রথম কথা বলতে শিখেছিল কবে এবং কি উপায়ে ?—শশী ভট্টাচার, হেমনগর।

২০ উদয়কালে চাঁদ, অত বড দেখায় কেন ?
—আরতি গুহ ও অমিতা গুহ, নবগ্রাম।

২১ লালরঙের চিহ্ন বিপদের চিহ্নরূপে কেন ব্যবহার হয় ?—অশ্বিনীকুমার মণ্ডল ও প্রভাতকিরণ দে, আহম্মদপুর

২২. ব্যবহৃত টর্চের নিঃশেষিত ব্যাটারি পুনরায় শক্তিশালী (Recharge) করা যায় কিরূপে ?
—বারিদবরণ রায়, সাটীরপাড়া।

২৩. উঁচু বাড়ীর উপর তলায় যাওয়া আসার জন্য যে 'লিফ্‌ট্' ব্যবহার হয় কে কবে কোথায় তা প্রথম উদ্ভাবন করেন ?—উদয়ভানু সিংহ, কলিকাতা।

২৪. কোনো কোনো তরল পদার্থ গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা শীতকালে ওজনে বাড়ে কেন ?—শঙ্করনাথ ভট্টাচার্য, মথুরা।

২৫ কবে কোথায় কে প্রথম 'রেফ্রিজারেটর' উদ্ভাবন করেন ?—তারাপদ চক্রবর্তী, ফেনী।

২৬ মাটি খুঁড়ে গর্ত করবার পর সেই গর্ত পুনরায় ভর্তি করবার সময় কম মাটি লাগে কেন ?

—ধীরেন্দ্রনাথ মহাস্তী, দাঁতন।

২৭. গাছের বয়স কি উপায়ে জানা যেতে পারে ?

—নীলিমা মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা।

২৮ বাংলার সবচেয়ে প্রাচীনতম ঐতিহাসিক স্থান কোনটা।

—কামদারঞ্জন ভট্টাচার্য, নবপুর।

২৯. মানচিত্র আবিষ্কার করেন কে ?

—চাঁদু মুখোপাধ্যায়, মহামায়া সাহিত্যমন্দির, শেওড়াফুলি।

৩০ 'কোর্টমার্শ্যাল' কাকে বলে ?

—অশোককুমার নন্দী, কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আরও অসংখ্য প্রশ্ন ছাপা হল না, কারণ সেগুলি ছাপার অযোগ্য। অনেক প্রশ্নকারী প্রশ্নপত্রে গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করেননি বলেও তাঁদের প্রশ্নগুলি প্রকাশের উপযুক্ত বিবেচিত হওয়া সত্বেও বাতিল হয়েছে। সুতরাং ভবিষ্যতে প্রশ্নকারীরা তাঁদের নাম ঠিকানা ও গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করতে ভুলবেন না।

শ্রাবণের প্রশ্নের উত্তর

১। সিনেমার ফিল্মে ছবি তোলবার সঙ্গে সঙ্গে কথা বলা ও অন্যান্য শব্দের কম্পন রেখাগুলিও ক্যামেরা সংযুক্ত বিশেষ একটি যন্ত্রের সাহায্যে আলোক রেখায় রূপান্তরিত হয়ে ফিলমের এক ধারে দাগ রেখে যায়। সেই ফিল্ম আবার প্রোজেক্টারের সাহায্যে যখন পর্দার উপর নিক্ষেপ করা হয় তখন আবার প্রোজেক্টার সংযুক্ত বিশেষ একটি যন্ত্রের সাহায্যে সেই আলোক রেখায় পরিবর্তিত শব্দের কম্পন রেখাগুলি পুনরায় ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়ে শব্দে পরিণত হয়।

(শ্রীনরেন্দ্র দেব প্রণীত 'সিনেমা' দ্রষ্টব্য)

২। এটা ভগবানের সৃষ্টির এক বিরাট কীর্তি। জগতে প্রত্যহ কোটী কোটী মানুষ জন্মাচ্ছে, সবার একই রকম আকৃতি, কিন্তু, প্রত্যেকেই একটু না একটু বিভিন্ন রকমের। নইলে কেউ কাউকে যে চিনতে পারত না।

৩। পারদের অতি উজ্জ্বল চাকচিক্য গুণের সংস্পর্শে কাঁচ আয়নায় পরিণত হয়। উপরন্তু আলোকরশ্মি পারদা-বরণ ভেদে অক্ষম। পুরাকালে মানুষ যখন পারদের সাহায্যে আয়না প্রস্তুত করতে শেখেনি তখনও তাদের মধ্যে আয়নার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। সে আয়না নির্মিত হত অতি উজ্জ্বল পালিশ করা চকচকে কোনো ধাতুর পাতের সাহায্যে। ভেদকরে বেরিয়ে যেতে অক্ষম এমন কোনো চকচকে উজ্জ্বল জিনিষের উপর আলোক রশ্মি সহজেই প্রতিফলিত হয় বলে তার উপর যে কোনো বস্তুর প্রতিবিম্ব বা ছায়া পড়ে। যেমন জলের মধ্যে, পালিশ করা দরজার গায়ে, বা মেঝের উপর, প্রাচীর লগ্ন সার্সির কাচে আমরা আমাদের প্রতিবিম্ব দেখতে পাই।

৪। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

৫। তৈল চালিত ইঞ্জিনের শক্তি বৃদ্ধির জন্য তৈলকে বায়ুর সাহায্যে গ্যাসে পরিণত করিবার যন্ত্র বিশেষ। সাধারণত মটোর গাড়ীর ইঞ্জিনের কার্বুরেটার একটি প্রধান অঙ্গ।

৬। বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে জলধারার শীতলতাকে বায়ুর মধ্যে সংক্রমিত করে সেই শীতল বায়ু আবদ্ধ কক্ষের মধ্যে সঞ্চালন পূর্বক এবং সঙ্গে সঙ্গে কক্ষস্থ উত্তপ্ত বায়ুকে অবিরত বৈদ্যুতির যন্ত্র সাহায্যে শোষণের দ্বারা বাইরে নিঃসরণপূর্বক ঘর Air-Condition করা হয়।

৭। হ্যালহেড সাহেবের বাংলা ব্যাকরণ অপেক্ষা প্রাচীন মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থ যদিও পর্তুগীজ পাদ্রী ম্যানুয়েল দ্য, আসসুম্পসাঁউ রচিত 'কৃপারশাস্ত্রের অর্থ ভেদ' (বাইবেলে উক্ত খ্রীষ্টের উপদেশাবলীর ব্যাখ্যা) বোঝায়, কিন্তু এটি বাংলা ভাষায় রচিত হলেও বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত হয়নি। রোমাণ অক্ষরে পোর্তুগালে ছাপা হয়েছিল। কাজেই হ্যালহেড সাহেবের ব্যাকরণকেই প্রকৃতপক্ষে এদেশের প্রথম মুদ্রিত বাংলা পুস্তক বলা উচিত।

৮। মণিপুর মহারাজের সহোদর ও রাজ্যের প্রধান সেনাপতি রাজা টিকেন্দ্রজিৎকে লর্ড ল্যান্সডাউন ফাঁসিতে হত্যা করবার আদেশ দিয়েছিলেন। কারণ, আসামের চীফ-কমিশনার মিঃ কুইনটনকে রাজমর্যাদা লঙ্ঘনের অপরাধে ও মণিপুরের স্বার্থ বিরোধী কাজ করার জন্য তিনি তরবারি আঘাতে বধ করেছিলেন। মহারাজা নন্দকুমারকে লর্ড হেষ্টিংস জালিয়াতীর অপরাধে ফাঁসি দিয়েছিলেন বটে কিন্তু মহারাজ নন্দকুমার কোনো দেশের স্বাধীন নৃপতি ছিলেন না। রাজা রামমোহন রায়ের মত তিনি একজন উপাধিধারী রাজা ছিলেন মাত্র।

৯। "সখা"

১০। হিন্দুশাস্ত্রে এইরূপই ব্যবস্থা আছে, দিনে

বিবাহ নিষেধ। হিন্দুর বিবাহ বর বধূর জন্ম পত্রিকা মিলিয়ে একটি বিশেষ লগ্ন স্থির করে রাত্রেই হয় নক্ষত্রের অনুকূল অবস্থান অনুসারে।

১১। 'বল' দেওয়ার একাধিক পদ্ধতি আছে। তারমধ্যে 'গুগ্‌লি বল' একটি। মিঃ নাইডু এই ধরণের বল দেওয়ায় বিশেষ সুদক্ষ বলে তাঁর 'গুগ্‌লি-বোলার' নাম হয়ে গেছে। যে বল ঘুরতে ঘুরতে আসে এবং মাটিতে পড়ে লাফিয়ে উঠে বাঁদিক ঘেঁষে ছোটে তাকে 'গুগ্‌লি বল' বলে।

১২। 'সময় কোষ দেখ।'

১৩। ১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দে আমেরিকার মিঃ এল, ই, ওয়াটার ম্যান' সর্বপ্রথম ফাউণ্টেন উদ্ভাবন করেন।

১৪। হ্যাঁ।

১৫। সপ্তবর্ণযুক্ত সূর্যালোক আকাশে তির্য্যকভাবে অর্থাৎ কোনাকুনি প্রতিফলিত হলে দূর থেকে তার রক্তবর্ণ টাই আমাদের দৃষ্টিকে সর্বাগ্রে আকর্ষণ করে। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তকালে রবিরশ্মি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের জলকণা, ধূম ও ধূলিকণার ভিতর দিয়ে তির্যকভাবে প্রতিফলিত হয়, তাই আমরা ঐ সময় সূর্যকে লাল দেখি।

১৬। সার জেমস ডেওয়ার নামে একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ১৮৯১ খৃঃ অব্দে সর্বপ্রথম 'থার্মোফ্লাস্ক' উদ্ভাবন করেন।

১৭। স্থানীয় গ্রামের নাম বা আশে পাশের নিকটবর্তী কোনও জনপদের নাম থেকে স্টেশন গুলির নামের উৎপত্তি হয়।

১৮। রঙ্গ রহস্য ও পরিহাসচ্ছলেই ইংরাজদের 'জনবুল' বলা হয়, ওরা ষণ্ডের ন্যায় বলিষ্ঠ ও একগুঁয়ে জাত বলে। ১৭১২ খৃঃ অব্দে আর্বুথনট 'History of John Bull' নামে একখানি রঙ্গ রহস্যকর সচিত্র বই লেখেন। বইখানি দেশবিদেশে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করে, সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজের 'জনবুল' নামটাও চারিদিকে প্রচার হয়ে পড়ে।

২০। যে দেশে ডাক বিভাগের ব্যয় বেশী, এবং গভর্ণমেণ্টের আয় কম সেদেশে ডাকমাশুল বাড়িয়ে গভর্নমেণ্ট আয়বৃদ্ধির উপায় করেন। দূরত্বের জন্য নয়।

২৪। অনেকের ধারণা নিউম্যাটিক টায়ারের আবিষ্কারক আমেরিকার ডানলাপ সাহেব, কিন্তু, তাঁর অনেক আগে ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে R. W. Thomson নামে একজন ইংরাজ নিউম্যাটিক টায়ার আবিষ্কার করেছিলেন। তবে ব্যবসা হিসাবে তিনি এর প্রচার করতে পারেন নি।

উত্তরদাতাদের নাম	ঠিকানা	কোন কোন প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছেন
বিশ্বনাথ ও বৈদ্যনাথ সিংহ	বেলফলিয়া	৫, ৬, ৮, ৩, ১৪, ১৭, ১৮,
শৈলেন্দ্রকুমার রায়	কলিকাতা	১, ২, ৩, ৫, ৭, ১২, ১৩, ১৫, ১৭
কামদারঞ্জন ভট্টাচার্য	নবপুর	২, ১০, ১৩,
গৌরাঙ্গ রুদ্র	চট্টগ্রাম	১২, ১৩, ১৪,
সেখ সিরাজুদ্দীন	খাগড়া	২, ৩, ৫, ৬, ১২, ১৩, ১৪,
নীতীশরঞ্জন দে ও নিখিলরঞ্জন দে	ঢাকা	৫, ৭, ৮, ৯, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৭, ২১,
বীরেন্দ্রনারায়ণ সরকার	ফরিদপুর	২, ৫, ৭, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬,
অশ্বিনীকুমার মণ্ডল ও প্রভাতকিরণ দে	আহমদপুর	২, ৩, ১৩, ১৪, ১৫,
মনোজ দত্ত	ধলঘাট	২, ৭, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৭,
চাঁদু মুখোপাধ্যায়, মহামায়া সাহিত্য মন্দির	শেওড়াফুলি	২, ৭, ৯, ১৩, ১৫, ১৬,
বারিদবরণ রায়	সাটীরপাড়া	১, ৩, ৫, ৭, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৫,
বেবা ভদ্র	ঢাকা	৩, ৫, ৭, ১২, ১৩, ১৪, ১৫,
উদয়ভানু সিংহ	কলিকাতা	৬, ৭, ৮, ১০, ১৩, ১৫, ১৬,
অশোককুমার নন্দী	কলিকাতা	২, ৭, ১৩,
পশুপতিনাথ ঘোষাল	কলিকাতা	১০, ১৮,
অনিলবরণ মহান্তি	যাদবপুর	১, ২, ৩, ৫, ৭. ১৩, ১৪, ১৫, ১৭,
হরিসভা	পঞ্চসার	২, ৩, ৫, ৭, ১৩, ১৪, ১৭, ১৮,
প্রণব রায় চৌধুরী	কলিকাতা	৫, ১৪,
শঙ্করনাথ ভট্টাচার্য	মথুরা	৩, ৭, ৯, ১৩,
শশী ভট্টাচার্য	হেমনগর	২, ৩, ৫, ৭, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৭,

উত্তরদাতাদের নাম	ঠিকানা	কোন্ কোন্ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছেন
আরতি গুহ ও অমিতা গুহ	নবগ্রাম	২, ৩, ৫, ৭, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৭,
তারাপদ চক্রবর্তী	ফেনী	২, ৭, ১৩, ১৪,
ধীরেন্দ্রনাথ মহান্তি	দাঁতন	১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৫,
নীলিমা মুখোপাধ্যায়	কলিকাতা	১, ৫, ৬, ৭, ৮, ১০, ১১, ১৩, ১৪, ১৬, ১৮.
সলিলেন্দ্রনাথ দাস	বালিগঞ্জ	৭, ১২, ১৩, ১৪, ১৬, ১৮,
সুনীলচন্দ্র ঘোষ	দিল্লী	৩,

বিশেষ দ্রষ্টব্য—গ্রাহক নম্বর ও নাম ঠিকানা না থাকায় এবারও অনেকের সঠিক উত্তর দুঃখের সঙ্গে বাতিল করতে হয়েছে। ভবিষ্যতে পত্রের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় নাম ঠিকানা ও গ্রাহক নম্বর লিখতে ভুল না।

কুমারী রেবাভদ্র, ঢাকা। কন্যামহলের জন্য নারীশিক্ষা সম্বন্ধে তুমি যে প্রবন্ধ পাঠিয়েছ, উপযুক্ত বিবেচনা হলে তা প্রকাশিত হবে। তোমার প্রেরিত 'হাস্য-কৌতুক'ও ছাপা হবে। শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসুর 'চলন্তিকা' ও সুবলচন্দ্র মিত্রের 'সরল বাংলা অভিধান' ব্যবহার কোরো। সন্ধ্যা গুহর ঠিকানা পরে জানাব। পাঠশালায় 'কিশোরসভা' খোলা হবে জেনে তুমি যে খুশী হয়েছ এতে তোমার সুমনের পরিচয় পাওয়া যায়। **শ্রীমান পশুপতি-নাথ ঘোষাল,** কলিকাতা। তুমি ঠিকই বলেছ। প্রশ্নটি সঠিকভাবে পুনরায় এবার দেওয়া হল। 'শ্যেনদৃষ্টি' মানে মানুষের দৃষ্টি নয়, 'শ্যেন' পক্ষীর দৃষ্টি। অভিধানে 'শ্যেন' শব্দের অর্থ দেখ। যুদ্ধের জন্য কাগজ দুর্মূল্য হওয়ায় পাঠশালার পৃষ্ঠা সংখ্যা কমাতে বাধ্য হয়েছি, নইলে 'পাঠশালা'কে বাঁচানো যায় না। এ সম্বন্ধে এ মাসের 'নানাপ্রসঙ্গ' পড়ে দেখ। **শ্রীমান অসিতকুমার রায়,** আসানসোল। যে প্রশ্নের উত্তর তুমি নিজে জানো সে প্রশ্ন পাঠিও না। যে প্রশ্নের উত্তর জান না অথচ জানবার খুব ইচ্ছা সেই প্রশ্নই কেবল পাঠাবে। **কুমারী মীরাদাস,** সীলেট। কন্যামহলের জন্য তোমার রচনা পাঠশালার ঠিকানাতেই পাঠিয়ো। **হরিসভা,** পঞ্চসার। পাঠশালার কতকগুলি ছাপার ভুলের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বন্ধুর কাজ করেছেন। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করি পত্রিকাখানিকে নির্ভুল ক'রে ছাপাতে কিন্তু তবুও কিছু কিছু ভুল থেকে যায়। উপায় নেই। 'হরিসভা'কে অতঃপর পঞ্চসার সংলগ্ন করেই সর্বত্র লেখা হবে। **শ্রীমান মধু ঘোষাল,** মুগকল্যান। মুগবেড়িয়ার সাধনানন্দ মিশ্র তোমার পত্রের উত্তর না দিয়ে 'পত্রী-মৈত্রীর' অমর্য্যাদা করেছে। আরও একটা সংবাদে আমরা দুঃখিত হলুম। কোনো কোনো কিশোর গ্রাহক 'পত্রী-মৈত্রীর' সুযোগ নিয়ে 'পত্রবান্ধবী'দের নিকট অসম্মানকর ও আপত্তিজনক পত্র লিখেছে। তারা যদি তাদের এই অন্যায়ের জন্য অবিলম্বে তাদের কাছে ক্ষমা না চায়, তবে আমরা পাঠশালায় 'Black List'এ তাদের নাম ঠিকানা প্রকাশ করে দেব এবং সকলকে অনুরোধ করব তাদের সঙ্গে যেন আর কেউ ভবিষ্যতে পত্র ব্যবহার না করে। কারণ, তারা বান্ধবীদের সঙ্গে পত্রালাপের যোগ্য নয়। 'কিশোরসভা' তোমাদের পরামর্শ মত সম্পাদকমহাশয়ই উপস্থিত পরিচালনা করবেন। **শ্রীমান তারাপদ চক্রবর্তী,** ফেণী। শ্রাবণের পাঠশালায় নীলিমাদেবী মুখোপাধ্যায়ের যে ৭নং প্রশ্নটি প্রকাশিত হয়েছে সে প্রশ্ন যে গত চৈত্রের পাঠশালায় শ্রীমান অসীম বাহার ৩৬ (ক) প্রশ্নের উত্তরে প্রকাশিত হয়েছে এদিকে তুমি ভুঃ গোঃ র দৃষ্টি আকর্ষণ করায় তিনি তোমাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং অনুরোধ করেছেন যে প্রশ্নকারীরা যেন ভবিষ্যতে নীলিমাদেবীর ন্যায় পুরাতন প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি না করেন। এটি ভু'গোর দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়ার জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তবে, 'হিন্দুর বিবাহ রাত্রে হয় কেন?' বা 'প্রত্যেক মানুষ বিভিন্ন রকম

হয় কেন?' এ প্রশ্ন দুটী সাধারণ জ্ঞান অর্জনের পক্ষে প্রয়োজনীয় বলে তিনি মনে করেন। হয়ত তুমি এর উত্তর জান, কিন্তু পাঠশালার অনেক গ্রাহক-গ্রাহিকা এর সঠিক কারণ না জানতে পারে। **শ্রীমান ধীরেন্দ্রনাথ মহান্তী**, দাঁতন। গ্রাহক নম্বর মাত্র একটি থাকায় প্রথমোক্ত উত্তরদাতার অর্থাৎ হৃষীকেশ পাণিগ্রাহীর উত্তর প্রকাশিত হয়েছিল। তোমারটি হয় নি। ভবিষ্যতে পৃথক পৃথক গ্রাহকনং যদি উল্লেখ করো তাহলে একখামে পাঠালেও দু'জনেরই উত্তর প্রকাশিত হবে। ছাপাখানার উৎপাতে ৭নং প্রশ্নের উত্তর গেলবারে বাদ পড়ে গেছে, এবার তা সংশোধন করা হল। পাঠশালার গ্রাহকগ্রাহিকাদের মধ্যে 'ব্যাজ'(Badge)ব্যবহার প্রচলিত করবার যে প্রস্তাব করেছ সে সম্বন্ধে ভেবে দেখে তোমাকে জানাবো। **শ্রীমান উদয়ভানু সিংহ**, কলিকাতা। 'কিশোরসভা' তোমাদের পরামর্শ নিয়ে সম্পাদক মহাশয়ই উপস্থিত পরিচালনা করবেন। 'এমাসে কি পড়বে?' এসম্বন্ধে কই তুমিত কিছু লিখে পাঠাও নি? 'কিশোরসভা'র জন্য এ ভারটা তুমিই নাও না। কিশোর সভায় কেবলমাত্র ছোট ছোট রচনা থাকবে। তিন মিনিটের গল্প, দু'মিনিটের প্রবন্ধ' এক মিনিটের আলোচনা, আধমিনিটের হাসি। উপন্যাস দেওয়া সম্ভব নয়। তোমার রচনা 'কিশোর সভার' জন্য মনোনীত হয়েছে। **কুমারী সাধনা বসু**, বারুইপুর। তোমার প্রস্তাব সমীচীন, কিন্তু, তাতে একটা অপ্রিয় ব্যাপারকে বড় বেশী প্রাধান্য দেওয়া হবে বলে মনে করি। অশ্বিনীবাবু ছেলেমানুষ। রাগের মাথায় একটা অন্যায় মন্তব্য করে ফেলেছেন বলে তাঁকে আর লজ্জা দেওয়া উচিত নয়। গতমাসেই এ ব্যাপারের যবনিকা পড়ে গেছে। সুতরাং তোমার এ-পত্র আর ছাপা উচিত হবে না। **শ্রীমান মনোজ দত্ত**, চট্টগ্রাম। তুমি যে 'শ-ব'র কৈফিয়ৎ প্রসন্ন মনে গ্রহণ করে তাঁকে ক্ষমা করেছ এজন্য তিনি তোমাকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানিয়েছেন। 'স্পোর্টিং স্পিরিট্' বা খেলোয়াড়ের সরল মনোভাব নিয়েই হাসি এবং তামাসাকে গ্রহণ করা উচিত। কোনো ব্যাপারেই তার মন্দ দিকটার (Black side) প্রতি আগে দৃষ্টি না দিয়ে তার নির্দোষ ভাল দিকটার কথাই ভেবে দেখো, তাহলে জীবনের অনেক জটিলতা বিলুপ্ত হবে। 'প্রশ্নোত্তর' একটু আগে না পাঠালে 'ভুঃ গো' সেগুলি দেখে শুনে সাজি'য় মিলিয়ে পাঠশালায় দেবার সময় পান না। দিল্লীর অশোক ঘোষকে লেখা উত্তরটি দেখ। "রবীন্দ্র বর্দ্ধাপন" রৌপ্যপদক দেবার সময় তোমার ২নং ও ১১ নং উত্তর সঠিক বলে ধরে নেওয়া হ ব। **শ্রীমান নীহারকান্তি ঘোষদস্তিদার**, বালিগঞ্জ।

পেয়েছি তোমার লিখিত লিপিটি ছন্দে
দোষ চাপায়েছ বৃথা দেখি মোর স্কন্ধে।
"হিংসা-বিরোধী" তোমার রচনা পত্রে,
অসঙ্গতি ও ভুল আছে প্রতি ছত্রে,
সে লেখা নহে যে কাগজে দেওয়ার যোগ্য,
ছেপেছি একটি প্রতিবাদ উপভোগ্য।
আষাঢ়ে দিয়েছে উত্তর যারা দেরীতে,
কেউ তারা নাম পায়নি শ্রাবণে হেরিতে।

মণীন্দ্রমোহন মজুমদার, কোদারমা। তোমার পত্র আমরা যথাসময়ে পাইনি বলেই উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি। 'বিনিময় সঙ্ঘ' সম্বন্ধে অমিয়বাবুর নামে পত্র দেবে। পাঠশালায় 'পত্রীমৈত্রী' বিভাগে যাঁরা নাম দিয়েছেন তাঁদের সঙ্গে তুমি সাক্ষাৎ করে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হতে পার কিনা সেটা তাঁদেরই চিঠি লিখে জিজ্ঞাসা করে জানা উচিত। গ্রাহকগ্রাহিকাদের রচনা প্রকাশযোগ্য হলে পাঠশালায় তা সাদরে মুদ্রিত হয়। **শ্রীমান গৌরাঙ্গ রুদ্র**, চট্টগ্রাম। সকলেই যাঁকে বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ গায়ক বলেন, তিনিই যদি তোমার মতে সর্বশ্রেষ্ঠ গায়ক হন, তবে আর সে বিষয়ে প্রশ্ন করবার কি থাকে? তাঁর নাম তাহলে নিশ্চয়ই তুমি জানো। যাই হোক 'ভুঃ গো'কে তোমার প্রশ্নটি পুনর্বিবেচনা করতে বলবো। 'প্রশ্নোত্তর' সম্বন্ধে পূর্বে যে যথেচ্ছাচার চলেছিল এখন থেকে তা বন্ধ করা হয়েছে। এখন কেবলমাত্র উপযুক্ত প্রশ্ন ছাড়া অন্য প্রশ্ন ছাপা হবে না। 'কিশোর সভা' সম্বন্ধে শ্রীমান উদয়ভানুকে লেখা উত্তর দেখ। 'কিশোর সভা' ও 'কন্যামহল' এই দুই বিভাগ নিয়ে পাঠশালা ত' Boys & Girls own Magazineই হয়ে উঠল। তোমার রচনাটি গতমাসে স্থানাভাবে শেষপর্য্যন্ত বাদ দিতে হয়েছিল। এমাসে প্রকাশিত হয়েছে। **সেখ সিরাজুদ্দিন**, খাগড়া। 'পত্রমৈত্রীদের' কাছ থেকে চিঠির উত্তর পেয়েছ জেনে খুশী হলুম। তোমার দেওয়া 'ধাঁধার' উত্তরটি কোনো ইংরাজি অভিধানে না পাওয়াতে ছাপা হয় নি। শব্দটির সঠিক বানান কি, এবং তুমি কোন অভিধানে পেয়েছ জানিয়ো। ধাঁধার উত্তরে তোমরা প্রধানতঃ প্রচলিত সহজ কথা খুঁজে দেবার চেষ্টা কোরো। তোমার 'সমুদ্রের দৈত্য', রচনাটি সব ছেলেদেরই স্কুল বইয়ে আছে, সুতরাং ও আর ছেপে কি লাভ? **শ্রীমান অশ্বিনীকুমার মণ্ডল**, আহমদপুর। তোমার প্রস্তাব খুবই যুক্তিযুক্ত। 'শব্দ-সন্ধানে'র যখন পৃথক পুরস্কার রয়েছে, তখন 'রবীন্দ্রবর্দ্ধাপন' রৌপ্যপদক প্রতিযোগিতার মধ্যে আবার ওটাও ধরা উচিত নয়। 'রবীন্দ্রবর্দ্ধাপন' রৌপ্যপদক কে পেলে আশ্বিনের পাঠশালায় তা ঘোষণা করা হবে। কেবলমাত্র

ধাঁধাঁ, 'অক্ষরক্রীড়া' ও 'প্রশ্নোত্তর' নিয়েই বিচার হবে। **শ্রীমান প্রভাতকিরণ দে,** আহমদপুর। হ্যাঁ, 'প্রশ্নোত্তর বিভাগ' 'ধাঁধাঁ', 'হবফের-হেরফের' প্রভৃতি বিভাগে যে সকল গ্রাহক গ্রাহিকা একবৎসরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সঠিক উত্তর দিতে পারবে—তাকে 'রবীন্দ্রবর্দ্ধাপন' রৌপ্যপদক পুরস্কার দেওয়া হবে। **শ্রীমান নীতীশ-রঞ্জন দে,** ঢাকা। 'ভূতোগোয়েন্দা' মহাশয় তোমার যুক্তি মেনে নিয়েছেন এবং তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়েছেন। সত্যই ত 'আতসবাজী' যখন উপরে ওঠে তখন তার মধ্যে বারুদ ও আরও অনেক কিছু থাকে কিন্তু নামবার সময় সে সমস্ত পুড়ে গিয়ে অপেক্ষাকৃত অনেক হালকা হয়ে যায়। সুতরাং ওঠা ও নামার সময় তার এক ওজন থাকে না। পাঠশালা সম্বন্ধে তুমি যে দুটি প্রস্তাব করেছ তার প্রথমটির অসুবিধা হচ্ছে যে, কতগুলি লেখা ধরবে তা ছাপা হবার আগে বোঝা যায় না। সুতরাং, প্রতিশ্রুতি দেওয়া চলে না যে আগামী মাসে অমুক অমুক লোকের লেখা ছাপা হবে। যেমন গতমাসে গৌরাঙ্গ রুদ্র সম্বন্ধে হয়েছে, তার আগের মাসে দীপালী সরকার সম্বন্ধে হয়েছিল। তাছাড়া অতিরিক্ত একটি পাতা ছেপে লাগাবার অতিরিক্ত ব্যয়ও আছে। কাগজ এখন দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য। দ্বিতীয় প্রস্তাবটি গ্রহণ করলে, প্রশ্নোত্তর পাঠাবার আর উৎসাহ থাকবে না তোমাদের। তার পরিবর্তে বরং এই নিয়ম করা ভাল যে প্রত্যেকমাসে যত-গুলি প্রশ্ন থাকবে তার অর্দ্ধেক সংখ্যার চেয়ে কম উত্তর যে পাঠাবে তার উত্তর ছাপা হবে না। যেমন 'শব্দসন্ধানে' এক ডজনের বেশি ভুল যারা করে, তাদের নাম আর ছাপা হয় না। যাতে 'গল্প ও প্রবন্ধ' বাড়াতে পারা যায় এই জন্যই গতমাসের ভোটের ফলাফলে ঘোষণা করা হয়েছে যে "কিশোর সভা" ও 'কন্যামহল' পাঠশালায় পর্য্যায়ক্রমে বেরুবে অর্থাৎ যেমাসে 'কিশোর সভা' বসবে সে মাসে 'কন্যামহল' পর্দার অন্তরালে চলে যাবে এবং যে মাসে 'কন্যামহল' থাকবে সে মাসে 'কিশোরসভা' পাঠশালার বাইরে অপেক্ষা করবে। কি বলো? **কুমারী উষা ও শান্তাদেবী,** দুমকা। নূতন দেশে গিয়ে তোমরা অসুখে পড়েছিলে জেনে দুঃখিত হলুম। আশাকবি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছ। 'পাঠশালা' ছেলেমেয়েদের শিক্ষামূলক মাসিক পত্র বলে বাজে গল্প এতে কমই থাকে। গল্প পড়েত' শুধু সময় নষ্ট করা হয়। তার চেয়ে খেলাধূলার ও আমোদ প্রমোদের সঙ্গে কত কি নূতন জিনিস শিখছ' এটা কি ভাল নয়? 'কন্যামহলে' যোগ দাওনা তোমরা, দেখবে তখন কত ভাললাগবে। **শ্রীমান রাখালদাস চৌধুরী,** নবীগঞ্জ। পাঠশালা তোমার ভাল লেগেছে জেনে খুশী হলুম। তোমার প্রশ্নগুলি ১০ই ভাদ্রের মধ্যে পাঠিয়ে দিও। 'কিশোর সভায়' কি রকম রচনা চলতে পারে সেটা তুমি শ্রীমান উদয়ভানুকে লেখা উত্তরটি পড়লে জানতে পারবে। পাঠশালায় 'চিত্রপ্রতিযোগিতা' ছিল বর্তমানে নানা অসুবিধার জন্য তা তুলে দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধের পর পুনরায় প্রবর্তিত হবে কিন্তু 'আলোকচিত্র' নয়, হাতে আঁকা ছবির প্রতিযোগিতা। **শ্রীমান বীরেন্দ্র নারায়ণ সরকার,** ফরিদপুর। পাঠশালাকে আগামী 'পঞ্চম বর্ষের' জন্য তুমি যে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছ সেজন্য তোমাকে আমাদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। **কুমারী রুণু ঘটক।** মালদহ। শ্রীমান অসিতকুমার রায়কে এসম্বন্ধে যে উত্তর দিয়েছি পড়ে দেখলেই তোমার প্রশ্নের জবাব পাবে? **শ্রীমান চিন্ময় কুমার গঙ্গোপাধ্যায়,** পাটনা। বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখক যাঁরা তাঁদের সকলেরই নামত তোমার উদ্ধৃত প্রশ্নোত্তরে দেওয়া আছে। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও তারাশঙ্কর। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে ২৫ বৎসরে এসেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, চতুর্থ পাদের ২৫ বৎসরে রবীন্দ্রনাথ, বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে ২৫ বৎসরের মধ্যে এসেছেন শরৎচন্দ্র, দ্বিতীয় পাদের ২৫ বৎসরের মধ্যে প্রথমেই এসেছেন—তারাশঙ্কর। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেরও রুচি, প্রসঙ্গ, আঙ্গিক ও ভঙ্গী বদলে চলেছে। সুতরাং এঁদের পরস্পরের মধ্যে কে ভাল কে মন্দ তুলনা চলে না, এঁরা পরস্পর বিভিন্ন যুগের লেখক। সাহিত্যে প্রগতি যদি স্বীকার করা হয় তাহলে একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে বঙ্কিম কথা সাহিত্যের সীমারেখা অতিক্রম করে রবীন্দ্রনাথ অগ্রসর হয়েছেন, রবীন্দ্র কথা সাহিত্যের সীমা রেখা অতিক্রম করে শরৎচন্দ্র এগিয়ে এসেছেন এবং শরৎচন্দ্রের সীমা রেখা পার হয়ে তারাশঙ্কর এগিয়ে এসেছেন। তথাপি বাংলা ভাষায় বিশ্বসাহিত্যের সর্ব্বোচ্চ স্ট্যাণ্ডার্ড অনুযায়ী শ্রেষ্ঠ উপন্যাস যে আজও লিখিত হয়নি এ কথা সত্য। 'সেন্টিমেণ্ট্যালিজম্' পরিহার করে আশৈশবের ধারণা এবং বিস্তৃত যশ, খ্যাতি ও নামের মোহ মুক্ত হয়ে প্রকৃত সমালোচকের দৃষ্টি ও সম্পূর্ণ উন্মুক্ত মন নিয়ে যেদিন কথা সাহিত্যের বিচার করতে শিখবে সেদিন এ সত্য আপনিই তোমার হৃদয়ঙ্গম হবে। **শ্রীমান অরুণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়,** কালীঘাট। তোমার সুদীর্ঘ পত্রখানি মনোযোগের সঙ্গে পড়লুম এবং তুমি যে পাঠশালার একজন অকৃত্রিম হিতৈষী বন্ধু এ সম্বন্ধেও নিঃসংশয় হলুম। পাঠশালায় গল্প উপন্যাস কম দিয়ে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ জীবনী ভ্রমণ সাহিত্য প্রভৃতি শিক্ষণীয় বিষয় বেশি দেওয়া হয়, কারণ, পাঠশালার উদ্দেশ্য গ্রাহক গ্রাহিকাদের স্কুল পাঠ্য পুস্তকের বাইরে সাধারণ জ্ঞান বাড়িয়ে তোলা। এ সম্বন্ধে শ্রাবণের পাঠশালায় শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার সেনগুপ্তের পত্রোত্তরে যা বলা হয়েছে সেটি তোমাকে পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। **কুমারী অনিমা**

দেবী, উত্তরপাড়া। তোমার প্রশ্নটি মন্দ নয় 'পাঠশালা সম্পাদককে 'গুরুমশাই' বলে ডাকার মধ্যে যুক্তি আছে। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার, গুরুমশাই হবার জন্য এযুগে টিকি বা তালপাতার চটির দরকার হবে না। তবে, ব্যবহার করা হোক বা না হোক বেতদণ্ডটা কিন্তু হাতে থাকা ভাল। 'শব্দ-সন্ধান' সম্বন্ধে তোমার সমস্যা 'শ-র'কে জানাও। 'আষাঢ়ের' গতি 'শ্রাবণে' হয়েছে। "অশেষ আশা" কিন্তু নিরাশা ব্যঞ্জক। **শ্রীমান কামদারঞ্জন ভট্টাচার্য**, নবপুর। তোমার প্রেরিত প্রথম রচনা অমনোনীত হওয়ায় তুমি যে নিরুৎসাহ হয়ে পড়নি এবং আরও কয়েকটি রচনা পাঠিয়েছ এ জন্য ধন্যবাদ, এরূপ অধ্যবসায় থাকলে ভবিষ্যতে তুমি নিশ্চয়ই কবি খ্যাতি অর্জন করতে পারবে। তোমার এদুটি রচনা সম্বন্ধে মতামত পরে জানাবো। আষাঢ়ের ৭নং প্রশ্নোত্তর ছাপাখানায় হারিয়েছে, শ্রাবণের ১৩ নং প্রশ্ন দু'বার ১২ নম্বরের মধ্যে লুকিয়েছে। প্রতিমা চ্যাটার্জির প্রশ্নটি গেল। **শ্রীমান পার্বতীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়**, রামপুর হাট। তোমার প্রশ্নটি 'ভ গো' ছাপা উপযুক্ত বিবেচনা করেন নি। তোমার এবারের প্রশ্নও তিনি বাতিল করেছেন। কারণ বাংলা ভাষায় প্রথম বই যা লেখা হয়েছিল তা পুঁথির আকারে হাতেই লেখা হয়েছিল। সুতরাং তার অস্তিত্ব আছে কি না আজও এবং সে কি বই তা জানাও অসম্ভব। তুমি যাদের লেখা পড়তে ভালবাস, তাঁদের ভাল রচনা পাওয়া গেলেই পাঠশালায় ছাপা হবে। তোমার প্রেরিত ধাঁধাঁ দুটি ভাল, কিন্তু পাঠশালায় দেওয়া শোভন হবে না। **কুমারী নীহার ব্যানার্জি**, জব্বলপুর। গেলবারে আমি ত তোমার কোনো পত্র পাই নি। পত্র পেলে নিশ্চয়ই তার উত্তর দেখতে পেতে পাঠশালায়। খুব সম্ভব তোমার চিঠিপত্র ও ধাঁধাঁ প্রভৃতি নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হবার পর এসেছিল। তাই গতমাসে তা প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। এই ব্যাপার উত্তরপাড়ার অণিমাদেবী প্রভৃতি আরও কয়েকজনের ঘটেছে। ১০ই থেকে ১৫ই তারিখের মধ্যে সমস্ত উত্তর ও চিঠিপত্র পাঠাতে চেষ্টা কোরো। তুমি পাঠশালার একজন গ্রাহক সংগ্রহ করেছ জেনে অগ্রিম ধন্যবাদ দিচ্ছি। তোমার মত পাঠশালার আর সকলেও চেষ্টা করে যদি এই ভাবে প্রত্যেকে দুএকজন করেও গ্রাহক সংগ্রহ করতে পারো তাহলে 'পাঠশালা'কে আরও ভাল কাগজ করে তুলতে পারা যায়। **অশোককুমার ঘোষ**, টিমারপুর, দিল্লী। ১৫ই তারিখেরও পর যদি তোমরা সময় চাও আরও তাহলে উত্তরগুলি পরের মাসের পাঠশালায় প্রকাশ করা যে অসম্ভব হয়ে পড়ে। কারণ, ২৫শে তারিখের মধ্যে 'পাঠশালা' ছাপা শেষ করে দপ্তরীর বাড়ী পাঠাতে হয়। তারা ২৮শে নাগাদ বেঁধে দিয়ে যায়। তখন কাগজ ডাকে পাঠান হয় কভার মুড়ে ঠিকানা লিখে কমপ্লিট করে, যাতে ১লা তারিখের মধ্যে তোমরা পাও। আমরা যদি ১৫ই তারিখের মধ্যে না পাই তাহলে ঐ রাশিকৃত চিঠিপত্র, প্রশ্নোত্তর, ধাঁধাঁ শব্দ সন্ধান প্রভৃতির পরীক্ষা ও তালিকা প্রস্তুত করা ও ছাপা কেমন করে সম্ভব হবে বলো? **কুমারী জয়শ্রী দাস**, কলিকাতা। তোমার প্রেরিত 'ধাঁধাঁ'টি পেয়েছি, ধন্যবাদ নাও। তোমার দাদু কেমন আছেন জানাবে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা-করি তিনি শীঘ্র সেরে উঠুন। শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী পাঠশালাকে বিশেষ অনুগ্রহ করেন। তাঁর রচনা পেলেই ছাপা হয়। গোবরডাঙ্গায় আমাদের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল লিখেছ, কিন্তু আলাপ পরিচয় করনি কেন? **শিশির-কুমার সেনগুপ্ত**, কলিকাতা। তোমার যে গোড়ায়ই গলদ হয়ে গেছে। সংবাদপত্রের যে অংশে এই সব বিষয় থাকে তুমি বোধ হয় জান না যে তার নাম Magazine Page যিনি এই সব দেখাশোনা করেন তাঁর নাম Editor, Magazine Section। সুতরাং বুঝতেই পারছ যে সংবাদপত্রগুলিই আমাদের অনুকরণ করছে, আমরা সংবাদপত্রের অনুকরণ করিনি। 'উদ্দেশ্য এক হলেও লক্ষ্য এক নহে' অর্থে তুমি কি বলতে চেয়েছ? উদ্দেশ্যও যা লক্ষ্যও তাই। লোকশিক্ষা ও জাতি গঠন উভয়েরই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। জীবনী পাঠশালায় নিয়মিত প্রকাশ হয়। 'জীবনী' লেখা কখনই প্রতিযোগিতার বিষয় হতে পারে না, কারণ ওটা মৌলিক রচনার অন্তর্গত নয়। পাঠশালায় প্রকাশিত গল্প ও উপন্যাসগুলির সম্বন্ধে বহু গ্রাহক-গ্রাহিকার নিকট হতে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পত্র এসেছে সুতরাং তোমার অভিমত ঠিক বলে মানতে পারলুম না। **কুমারী মিরাদেব**, কোহিমা। মাসের ১০ তারিখ থেকে ১৫ তারিখের মধ্যে চিঠিপত্র, ধাঁধার উত্তর, প্রশ্নোত্তর, শব্দসন্ধান সব কিছুই পাঠাতে হয়। ইচ্ছামত সব একখামের মধ্যে ভরে একই সময়ে পাঠাতে পার, অথবা, পৃথক খামে ভরে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পাঠাতে পার। কিন্তু ১৫ তারিখের পর কিছু পাঠালে তা বাতিল হয়ে যায়। **ধ্রুবরঞ্জন সরকার**, হাওড়া। তোমার প্রস্তাবটি ভাল। আমার এতে সম্পূর্ণ মত আছে, অবশ্য যদি গ্রাহক গ্রাহিকারা সকলে সম্মত হয় তাহলে 'কিশোরসভা' ও 'কন্যামহল' এক করে একটি 'কিশলয় শাখা' বা 'সবুজাঙ্গন' বা 'তরুণ বাসর' করা যেতে পারে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের অশীতিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে কেবলমাত্র বিজ্ঞানের প্রবন্ধ দিয়ে পাঠশালার একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করলে মন্দ হত না। কিন্তু তার আর সময় নেই। একাশীবৎসরে করা যাবে কি বলো? সোম মঙ্গল ও বুধ এই তিনদিনের মধ্যে সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৮টার মধ্যে পাঠশালা অফিসে এলে সম্পাদকের সঙ্গে দেখা হবে নিশ্চয়। আগামীবারের

প্রতিযোগিতায় 'ভ্রমণ কাহিনী'ই দেওয়া হল। **অনিল বরণ মহান্তি**, যাদবপুর। 'ধাঁধা' পাঠাবার সঙ্গে উত্তর না পাঠালে তা প্রকাশ হয় না। তুমি যদি সঙ্গে সঙ্গে উত্তরটিও পাঠাতে তাহলে তোমারটাই আগে ছাপা হত। **কুমারী** নীলিমা দাস ও যোগেন্দ্র লাইব্রেরী এক সঙ্গেই ধাঁধা ও তার উত্তর পাঠিয়ে দেওয়াতে তাঁদের 'ধাঁধা' প্রকাশ হয়ে গেল, তোমারটি হল না। মহাত্মা গান্ধীর ছবিখানি এত ছোট্ট যে কোথায় আছে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সম্ভবত হারিয়েছে। 'কিশোরসভা' সম্বন্ধে অন্য পত্রোত্তরে জানতে পারবে। **কুমারী আরতি গুহ ও কল্যাণী অধিকারী**, নবগ্রাম। সম্পাদককে 'সম্বোধন' সম্বন্ধে একমাস আগেই ত সকলকে জানান হয়েছে যে 'সম্পাদক মশাই' বলতে যার ভাল না লাগবে সে 'নরেনদা' বলতে পারবে। তোমরা চৈত্রমাস পর্যন্ত পাঠশালা পাবে। কিন্তু যদি গত আশ্বিন থেকে আগের সাতটি সংখ্যা নাও তাহলে আগামী ভাদ্রেই তোমাদের চাঁদা শেষ হয়ে যাবে এবং আশ্বিনে আবার ৩৲ টাকা জমা দিতে হবে। প্রশ্নোত্তর সম্বন্ধে তোমাদের বক্তব্যটুকু ওঁকে জানাব এবং যাতে তোমাদের 'পয়েন্ট' না কাটা হয় তার ব্যবস্থা করতে বলব **হেরম্ব মুখোপাধ্যায় ও সিটিক্লাবের সভ্যবৃন্দ**, দিল্লী। তোমাদের চিঠিতে তোমরা ঠিকানা পরিবর্তন করেছ দেখছি, অথচ পাঠশালা অফিসে যথাকালে এই ঠিকানা পরিবর্তনের কথা জানাও নি। তোমাদের কাগজ যথানিয়মে পুরাতন ঠিকানা "গোলিগুলানে" যাচ্ছে। তাই 'চাঁদনীচকে' গিয়ে তোমরা ঠিকসময়ে কাগজ পাচ্ছ না। এজন্য আমাদের উপর দোষারোপ করা কি উচিত? **নবনীকুমার চৌধুরী**, লক্ষ্ণৌ। তোমার যে চিঠি আমাদের হাতে এসেছে, তারই উত্তর দেওয়া হয়েছে, পাঠশালায় 'চিঠিপত্র' বিভাগে চোখ বুলালেই তার প্রমাণ পাবে। তার মধ্যে তোমার এ চিঠির সব প্রশ্নেরই উত্তর আছে। তোমার বন্ধুর কবিতাটি পাঠশালায় প্রকাশের জন্য মনোনীত হয়েছে। ৭০।৮০ লাইনের কবিতা ছাপাবার মত উপস্থিত পাঠশালায় স্থানাভাব। সুতরাং দ্বিতীয়টি আর পাঠিয়ো না। **কুমারী কল্যাণী রায**, তালন্দ। আরতি গুহকে লেখা উত্তর ও ধ্রুবরঞ্জন সরকারকে লেখা উত্তর দেখ। তোমার ভ্রমণ কাহিনীটি পাঠাও। কে সে 'পত্র-মৈত্র' তোমার চিঠির উত্তর দেয় নি? তার নাম আমায় জানিয়ো। আশাকরি পরীক্ষা বেশ ভালই দেবে এবং মেধাবিনী ছাত্রী বলে পরিচিত হবে।

বিনিময় সঙ্ঘ

পরিচালক—শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায

১। মণীন্দ্রমোহন মজুমদার—গ্রাঃ নং ৩০৩২

টিকিট সংরক্ষণের নিয়ম

টিকিটের মোড়ক যে সংগ্রহে যথেষ্ট সাহায্য করে গত মাসে সে কথা জানাইয়াছি। তবে, যাঁহারা বন্ধু-বান্ধবীগণের নিকট হইতে একত্র পাঁচ সাত শত টিকিট লাভ করিয়া সংগ্রহ ব্যাপারে মনোনিবেশ করিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে বিভিন্ন দেশের টিকিট মিশ্রিত মোড়ক ক্রয় করা অনাবশ্যক। প্রাপ্ত টিকিট সমুদায় রাজ্য, রাজ্যাঙ্ক, দেশ, মূল্য ও কালজ্ঞাপক চিত্রাদির উপর লক্ষ রাখিয়া বিভাগান্তর ঐগুলি সংরক্ষণীভুক্ত করিতে হইবে। টিকিটের পরিচয় টিকিটেই পাওয়া যায়। তবে সকল দেশের ভাষা সকলের পক্ষে সহজবোধ্য নহে। এই কারণে আবশ্যক করে একখানি সংরক্ষণী পুস্তক। এই পুস্তকে বিভিন্ন দেশে প্রচলিত টিকিটের এক একখানি ছবি মুদ্রিত থাকায়, ইহা যেমন ঐ বিঘ্ন দূরীভূত করে, তেমনি টিকিট-গুলি সুসজ্জিত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থায় প্রত্যেক টিকিট খানির জন্য ছক নির্দিষ্ট থাকায় উহার সৌন্দর্য ও মর্য্যাদাও উপযুক্ত ভাবে রক্ষা করা যায়। শিক্ষানবীশদিগের পক্ষে অন্যূন একটাকা মূল্যের এইরূপ একখানি সংরক্ষণী পুস্তক ক্রয় করা উচিত। সংরক্ষণী পুস্তক আকারে যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন প্রত্যেক পৃষ্ঠার প্রথম দুএকটি পংক্তি দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য টিকিটের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া যুক্তিযুক্ত। পরে শ্রেণী হিসাবে (set) টিকিটগুলি বসাইতে হয় এবং প্রত্যেক শ্রেণীর শেষভাগে অন্য টিকিট পাইবার আশায় দুইতিনটী ছক ছাড়িয়া রাখা আবশ্যক। অধিক ছাপ বিশিষ্ট, ছিন্ন বা মধ্যে বিযুক্ত কোন টিকিট সংরক্ষণী ভুক্ত করিতে নাই।

২। আমি ফ্রান্স, নেদারল্যাণ্ড, সিংহল, যুক্তরাষ্ট্র, এবং গ্রেটবৃটেন টিকিটের বিনিময়ে রাশিয়া, আবিসিনিয়া, গ্রীস, সুইজারল্যাণ্ড, স্পেন, রুমানিয়া প্রভৃতি দেশের টিকিট চাই। ফণী দাস, গ্রাঃ নং ৩৪৪৮।

৩। আমি গ্রীস, হংকং, নেপাল, হাঙ্গেরি, বেলজিয়ম, ডানজিগ, আয়ার, নরওয়ে, ইটালি, ইরাণ প্রভৃতি দেশের টিকিটের বিনিময়ে পেরু, সাইপ্রাস, আইসল্যাণ্ড, ইন্দোচীন,

অ্যালবেনিয়া, হাইতী, কেপ-অফ-গুডহোপ, টেসমেনিয়া, ফরাসীভারত, এস্তোনিয়া ও জার্মাণ কলোনির টিকিট চাই। রবিদবরণ রায়, গ্রাঃ নং ২২৮৭।

৪। আমি ফ্রান্স, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, সিলোন ও হেলভেটিয়ার টিকিটের বদলে ইন্দোচীন, নিউগিনি অথবা অন্য কোন দেশের টিকিট চাই। উদয়ভানু সিংহ, গ্রাঃ নং ২১৮৭।

৫। আমি ভারতের দুই টাকার উর্দ্ধে যে কোন মূল্যের টিকিট চাই, ইহার বদলে জার্মাণ, মালয়, ফ্রান্স, গ্রেটবৃটেন প্রভৃতি দেশের টিকিট দিতে প্রস্তুত। ধীরেন্দ্র নাথ মহান্তি, গ্রাঃ নং ২৭৯২।

৫ক। আমি বেলজিয়ম, হল্যাণ্ড, হাঙ্গেরি ও কেনেডার (সপ্তম এডোয়ার্ড) টিকিটের বদলে মিশর, ডেনমার্ক, তুর্কী, রুমানিয়া, আইসল্যাণ্ড, লিথুয়ানিয়া অথবা বলিভিয়ার টিকিট চাই। সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রাঃ নং ২২২২

৬। আমি জার্মানি, ফ্রান্স, চেকোশ্লোভিয়া, চীন, হাঙ্গেরি, সুইডেন, পোল্যাণ্ড, ইটালি অষ্ট্রিয়া, নরওয়ে, প্রভৃতি দেশের টিকিটের বিনিময়ে ভারত ও ইংলণ্ড ব্যতীত অন্য যে কোন দেশের টিকিট চাই। কুমাররঞ্জন রায়, গ্রাঃ নং ২৩২২।

৬ক। আমি ইটালি, সুইডেন, স্পেন, যুক্তরাষ্ট্র হংকং এবং হাঙ্গেরির টিকিটের অথবা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলের পোষ্টকার্ডের বিনিময়ে মাল্টা, জিব্রলটার, আয়ার্ল্যাণ্ড, রাশিয়া, আইসল্যাণ্ড, গ্রীনল্যাণ্ড, ইকোয়েডর, পাপুয়া প্রভৃতি দেশের টিকিট চাই। সৌরীন্দ্রমোহন তালুকদার। গ্রাঃ নং ২৯৬৩।

৭। শিশিরকুমার সাহা, গ্রাঃ নং ৩২৮৭—তোমার লিথুয়ানিয়ার টিকিটের বিনিময়ে ব্রেজিলের টিকিট পাঠাইলাম এবং বাকীগুলিও ঐ সঙ্গে ফেরৎ দিলাম।

৮। সাবিত্রী গঙ্গোপাধ্যায়, গ্রাঃ নং ২২০৮—তোমার প্রেরিত।০ আনা মূল্যের টিকিটখানি ছেঁড়া থাকায় ঐ খানির বিনিময় মিলিল না, অন্য দুইখানির পরিবর্তে জার্মানির টিকিট পাঠাইলাম।

৯। এ, এন, সুলেমান, গ্রাঃ নং—তোমার কানাডার টিকিটের বদলে জাপানের টিকিট দেওয়া হইল।

১০। কুমার বীরেন্দ্র রায়, গ্রাঃ নং ২৩৬৪, তোমার পোল্যাণ্ড, জার্মানি, ইরাক ও নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড এই চারিখানি টিকিট বিনিময় হইয়াছে,উহার পরিবর্তে লিথুয়ানিয়া, জাভা, লাকসাম্বুর্গ প্রভৃতি দেশের টিকিট পাঠাইলাম।

১১। প্রভাত দে, গ্রাঃ নং ৩২৮০, তোমাদের স্টেট-সেটেলমেণ্ট ও সিলোন জুবীলির টিকিট দুইখানি ছেঁড়া না হইলে উহার প্রত্যেকখানির বদলে তিনচারখানি করিয়া টিকিট পাইতে পারিতে। যাহাহৌক ঐ দুই-খানির বদলে চারখানি টিকিট পাঠাইলাম।

১২। অরুণ চাটার্জ্জী, গ্রাঃ নং ৩৮৪৩, তোমার দুইখানি চিঠিই পাঠাইয়াছি। অমরলাল তোমায় যে টিকিটগুলি দিয়াছে তাহা পাঠাইলাম।

১৩। মনোজ দত্ত, গ্রাঃ নং ২৯৫২, তোমার প্রেরিত ইংলণ্ডের টিকিটখানির মধ্যভাগ বিঁধযুক্ত, উহার বিনিময়ে অন্য টিকিট পাওয়া যাইবে না। সুডানখানির পরিবর্তে ইটালী ১ খানি ও চীনের একখানি এবং ভারতের টিকিট-গুলির পরিবর্তে ফ্রান্স, জার্মানি ও জাপানের টিকিট পাঠাইলাম। ১০০ টিকিটের যে মোড়ক তুমি চাহিয়া-ছিলে আশা করি ইতিমধ্যে তাহা তুমি পাইয়াছ।

১৪। আভাস গুপ্ত গ্রাঃ নং ২৮২৯, অমরলাল প্রেরিত টিকিট গ্রাহক নম্বরের ভুল হওয়ায় গতমাসে তুমি পাও নাই, উহা এমাসে পাঠাইলাম, এবং ঐ সঙ্গে অনিলবরণ মহান্তি (২৫০১) প্রেরিত ইটালী এবং সুনীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (২২২২) প্রেরিত রাশিয়ার টিকিট তোমায় পাঠাইলাম। উহার বিনিময়ে কেনিয়া ইউগেণ্ডার দুইখানি টিকিট পাঠাইও।

১৫। অনিলবরণ মহান্তি, গ্রাঃ নং ২৫০১, তোমার টিকিট কার্য্যালয়ে পাঠাইতে ভুল হইয়াছিল। এইমাসে চাহিয়া লইও।

১৬। ধীরেন্দ্রনাথ মহান্তি, গ্রাঃ নং ২৭৯২, ২০০ টিকিটের মোড়ক যে তুমি চাহিয়াছিলে ইতিমধ্যে তাহা তুমি নিশ্চয় পাইয়াছ।

১৭। ফণীন্দ্রনাথ দাস, গ্রাঃ নং ৩৪৪০, তোমার গ্রাঃ নং আমার জানা না থাকায় পাঠাইতে বিলম্ব ঘটিয়াছে।

১৮। ইন্দ্রাণী রায়, গ্রাঃ নং ২৯১০, গুহ মহাশয়ের নিকট হইতে উহার বিনিময়ে কোন টিকিট আমি না পাওয়ায় উহা পাঠাইতে বিলম্ব হইয়াছে।

১৯। সুধীরচন্দ্র দেব, গ্রাঃ নং ২৯০৬, অনিলবরণ মহান্তি—(২৩০১) ও সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (২২২২) তোমায় ফ্রান্সের দুইখানি এবং ফণীন্দ্র দাস সিলোন ও ফ্রান্সের দুইখানি, মোট চারিখানি টিকিট পাঠাইয়াছেন, এইগুলির বিনিময়ে তুমি মিশর ১, জাপান ১ ও আফ্রিকার ২ টিকিট পাঠাইও।

২০। রবিদবরণ রায়, গ্রাঃ নং ২২৯৭, তোমার টিকিটগুলি ছেঁড়া, ফাটা, ফুটা অথবা কোনরূপ দাগ না লাগা হইলে স্বচ্ছন্দে তাহা তুমি পাঠাইতে পার। উহার বিনিময়ে অন্য টিকিট তুমি পাইবে।

২১। গৌরাঙ্গ রুদ্র, গ্রাঃ নং ২৮১৭, অমরলালের বিজ্ঞাপন অনুসারে তুমি ভারতের দুইটাকা মূল্যের টিকিট অনায়াসে পাঠাইয়া দিতে পার।

২২। প্রণব রায়চৌধুরী,—তিব্বতের টিকিট দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য। তোমার ঐ টিকিটের বদলে উহা পাওয়া যাইবে না। অন্য কোন দেশের টিকিট চাও ত জানাইও।

২৩। প্রিয়ব্রত ঘোষ—লাক্সাম্বুর্গ ব্যতীত অন্য কোন দেশের টিকিট কি তুমি লইবে না? ইজিপ্টের টিকিটের বিনিময়ে যদি ঐগুলি দিতে চাও ত জানাইও।

২৪। অসীমা দেবী ও সলীলা মুখার্জী—তোমরা আষাঢ় সংখ্যায় প্রিয়ব্রত ঘোষের বিজ্ঞাপন দেখিয়াছিলে কি? ঐ ছবিগুলির মধ্যে কোন খানিই কি তোমাদের আবশ্যক নাই?

২৫। পার্বতীশংকর মুখোপাধ্যায় গ্রাঃ নং ৩১৪৮, তোমার টিকিট আশা করি তুমি পাইয়াছ। টিকিট মোড়ক পাঠশালার মধ্যে ভরিয়া প্রেরণ করা চলে না, এইজন্য ইহার ডাকখরচ পাঁচ পয়সা তুমি পাঠাইও

পত্রী-মৈত্রী

মহামায়া সাহিত্য মন্দিরের ছেলে মেয়েরা: মহামায়া সাহিত্য মন্দির, বৈষ্ণবাটী, সেওড়াফুলি, হুগলী, এই ঠিকানায় সাহিত্য মন্দিরের সম্পাদককে চিঠি দিলে তিনি পত্রের আদান প্রদানের ব্যবস্থা করে দেবেন।

শ্রীসুশীলচন্দ্র ঘোষ। Co K C Ghosh Esq 1318 Hamilton Road, Delhi

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মহান্তি। Co. Bhuban Mohan Mohanti Esq Po. Dantan, Dist Midnapore

শ্রীহরিকমল পুরকায়স্থ। Co Rai Br T N Purkayastha. Laban, Shillong

কুমারী মীরা দাস। Co Gopal Ch. Das Esq E A C. (Retd) Sylhet

গৌরাঙ্গ রুদ্র। প্রবর্তক বিদ্যাপীঠ, চট্টগ্রাম। তোমার ইচ্ছামত যে কোনো গ্রাহক গ্রাহিকার সঙ্গে পত্রী-মৈত্রী স্থাপন করা সম্ভব নয়। পত্রী-মৈত্রীতে যারা নাম ঠিকানা দিয়েছে কেবলমাত্র তাদেরই সঙ্গে তুমি পত্রী-মৈত্রী স্থাপন করতে পারবে।

কুমাররঞ্জন রায়, ১৭৬ বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা।

নীতীশরঞ্জন দে ও নিখিলরঞ্জন দে, ১নং কায়েৎটুলি পোঃ রমণা, ঢাকা।

কুমারী অনিমা চ্যাটার্জি, ২৫নং গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড, উত্তরপাড়া।

কুমারী ইন্দু বোস, "শিশুভারতী", কণেশ্বর, ফরিদপুর।

পঙ্কজ গাঙ্গুলী, ঐ　ঐ　ঐ

হৃষীকেশ কাব্যবিশারদ, দাতন, মেদিনীপুর।

মণীন্দ্রমোহন মজুমদার। Co. Bengal Central Bank Ltd ঝুমরি তেলাই, কোদারমা, হাজারীবাগ।

[পত্রী-মৈত্রী বিভাগের অপব্যবহার]

সম্প্রতি কয়েকজন গ্রাহিকা সম্পাদকের নিকট অভিযোগ করেছেন যে কোনো কোনো গ্রাহক তাদের এমন ধরণের পত্র লিখেছেন, যা শুধু শিষ্টাচার বিরুদ্ধই নয়, অত্যন্ত আপত্তিজনকও বটে, কয়েকখানি পত্র তাঁরা সম্পাদকের কাছে পাঠিয়েও দিয়েছেন। পত্রগুলি পড়ে দেখা যাচ্ছে আমাদের দেশের ছেলেরা এখনও মেয়েদের পত্র লিখতে এবং তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের উপযুক্ত শিক্ষা ও সহবৎলাভ করতে পারে নি। কেউ বেনামীতেও চিঠি দিয়েছে এবং গ্রাহক নয় এমনও কোনো কোনো ছেলে পাঠশালা থেকে ঠিকানা পেয়ে মেয়েদের অসম্মানজনক চিঠি দিয়েছে। এই সব পত্রলেখকদের নাম 'পাঠশালার' "Black List" এ তুলে দেওয়া হবে, যাতে আর কেউ তাদের সঙ্গে পত্র ব্যবহার না করে। ভবিষ্যতে পত্রী-মৈত্রী সংক্রান্ত গ্রাহিকাদের নামে চিঠিপত্র সমস্ত উপযুক্ত ডাক-টিকিট সহ সম্পাদকের কাছে পাঠাতে হবে। সম্পাদক যদি সে পত্র নির্দোষ মনে করেন তবেই 'পত্রী-মৈত্রী' স্থাপনে উৎসুক গ্রাহিকাদের কাছে পাঠাবেন। নচেৎ সে পত্র ছিঁড়ে ফেলা হবে এবং তার নাম 'Black List'এ প্রকাশ করা হবে। গ্রাহিকারাও পত্রের উত্তর উপযুক্ত ডাকটিকিট সহ সম্পাদকের কাছে পাঠাবে এবং সম্পাদক সে পত্র পাঠাবার যোগ্য মনে করলে পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন। অতঃপর 'পত্রী-মৈত্রীতে 'পেনফ্রেণ্ড' স্থাপনে ইচ্ছুক গ্রাহিকাদের নামই শুধু প্রকাশ হবে, ঠিকানা আর দেওয়া হবে না।

পাঃ সঃ

অক্ষর-ক্রীড়া বা হরফের হের ফের

শ্রাবণের উত্তর

"একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল" এই বাক্যটিতে নিম্নলিখিত অক্ষরগুলি আছে। এ, ক, দ, আ, এ, ক, ব, আ, এ, ঘ, ব, গ, ল, আ, য়, হ, আ, ড, ফ, উ, ট, ই, য়, আ, ই, ছ, ল, এখন এই ২৭টি অক্ষরের সাহায্যে যদি এই রকম একটি বাক্য রচনা কর তাহলে দেখবে যে তোমার উত্তর নির্ভুল হয়েছে :—"হাবুলাকে লইয়া এক দফা বগড় ঘটিয়াছে" কারণ এর মধ্যেও ঐ ২৭টি অক্ষর রয়েছে হ, আ, ব, উ, ল, আ, এ, ক, ল, ই, য়, আ, এ, ক, দ, ফ, আ, ব, গ, ড, ঘ, ই, ট, য়, আ, এ, ছ। দুঃখের বিষয় যে, কেউ এর সঠিক উত্তর দিতে পারে নি। উত্তর পাড়ার অণিমা চ্যাটার্জির চেষ্টা প্রশংসনীয় বটে কিন্তু, ঐ ২৭টি অক্ষরের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকায় অর্থাৎ অতিরিক্ত আরও অনেক অক্ষর ব্যবহার করায় কুমারী অণিমা ভুল পথে চলে গেছেন। হাজারিবাগের শ্রীমান মণীন্দ্রমোহন মজুমদারও ঠিক এই ভুলই করেছেন।

ভাদ্রের অক্ষর-ক্রীড়া

"গোপাল বড় সুবোধ বালক, যাহা পায়, তাহা খায়", এই বাক্যটির মধ্যে যতগুলি অক্ষর আছে মাত্র সেইগুলিকে নিয়েই উল্টে পাল্টে সাজিয়ে অপর একটি বাক্য রচনা কর যার মধ্যে করুণ রসটুকু হাস্য রসেরই উদ্রেক করে।

রচনা প্রতিযোগিতা

পূজার ছুটিতে অনেকেই তোমরা দেশ বিদেশ বেড়াতে যাবে। পাঠশালায় তোমাদের সেই ভ্রমণ কাহিনী লিখে পাঠিও। সাধারণ Exercise Book এর ৪।৫ পৃষ্ঠার বেশী যেন না হয়। ১৫ই কার্তিক পর্যন্ত রচনা পাঠাবার শেষ দিন। যার রচনা সর্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হবে তাকে পাঠশালার পূর্ব বিজ্ঞাপিত পুস্তকের মধ্যে তার ইচ্ছামত যে কোনও দুখানি বই সে চাইবে তাই উপহার দেওয়া হবে।

গতমাসের রচনা প্রতিযোগিতা

পাঠশালায় প্রকাশিত গল্পগুলির মধ্যে কোন গল্পটি সব চেয়ে ভাল এবং কেন ভাল ? এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখে পাঠাতে বলা হয়েছিল। মাত্র চার জন এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে তাদের রচনা পাঠিয়েছে, রচনাগুলি মন্দ নয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় একটিও পুরস্কার পাবার যোগ্য প্রথম শ্রেণীর রচনা বলে গণ্য হয় নি।

ভাদ্র—১৩৪৮

নিয়মাবলী—(১) ধাঁধা-সম্পাদকের মতে শব্দসন্ধানের যেটি সবচেয়ে নির্দোষ ও নির্ভুল সমাধান,—তার সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে উত্তর মেলা চাই। নির্ভুল সমাধানটি পরের মাসের পাঠশালায় প্রকাশিত হবে। (২) সাদা ঘরগুলির প্রত্যেকটিতে একটি ক'রে সংযুক্ত বা অসংযুক্ত অক্ষর বসবে। (৩) প্রতি সংখ্যার প্রতিযোগিতা-কুপনখানি কেটে ভর্তি ক'রে পাঠাবে সেই মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে। দেরি হ'লেই বাতিল। খামের উপরে ঠিকানা লিখবে—'শব্দ-সন্ধান', পাঠশালা কার্যালয়, ৩০ কর্নওআলিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। (৪) হরফগুলি সব পরিষ্কার হওয়া চাই—কাটাকুটি চলবে না। বানান ভুল হলে ভুল ধরা হবে। (৫) যে কোন পাঠক পাঠিকা যতগুলি ইচ্ছা কুপন পাঠাতে পারবে। (৬) 'শব্দ-সন্ধান'-সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ব'লে মেনে নিতে হবে।

সঙ্কেতসূত্র

—পাশাপাশি—

১। শব্দ-সন্ধানের ক্ষেত্রে এটা লজ্জার বিষয় না হ'তে পারে কিন্তু, ক্ষেত্রান্তরে নিশ্চয় অগৌরবের।

৪। হাত জোড় করে থাকার অবস্থা।

৭। শব্দ-সন্ধান সমাধানে যিনি সবচেয়ে বেশিবার পুরস্কার পেয়েছেন তাঁর পক্ষে এটা অশোভন নয়।

৮। 'পাঠশালা' এ পরিবর্তন না করেই আর এক সালে এগিয়ে এল।

৯। এই জন্যই লোকে সুপথ নির্দেশ করে।

১০। ধানের বিশেষণ মাত্র না হয়ে যদি এটা তার প্রধান প্রকৃতি হ'ত, তাহলে চাষীরা মাত্র এক ফসলেই ধনবান হ'ত বটে, কিন্তু দেশবাসীর বলাধান হত না তাতে।

১১। দেবী পূজার এ বিধি বিদেশী শাসনের অধীনে ফৌজদারী বিধির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

১৩। এ মানুষের আশীর্বাদ ও অভিশাপ দুইই।

১৪। যে কোনো আধুনিক শৈলাবাসে একটু ঘুরে এলেই এই জনপ্রিয় স্থানটির সন্ধান পাবে।

১৫। শহর।

১৯। অভাবগ্রস্ত লোক।

২১। এর কোনো দুঃখ নেই

২৩। ইস্কুল কলেজে ঢুকে বাংলার মেয়েরা এ পাঠ ভুলতে শুরু করেছে।

২৫। একথার সন্ধানে খুঁজে পাবে তাদের কথা হাতীর দাঁতের সঙ্গে তুলনা মেলে যার।

২৭। এতেও মাল বোঝাই নৌকা চলে কিন্তু এর সঙ্গে চাল চাপালেই নৌকার বিপদ!

২৮। মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ।

২৯। বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শনের ফলেই এর পরিচয় মেলে।

—উপর থেকে নীচে—

১। সেবার গুণে একে চেনা যায়।

২। সৃষ্টিকর্তাকে অনেকেই এ নামেও ডাকে।

৩। পাঠশালার মূর্খ ছেলেদের গুরুমশাইরা সেকালে এই বলে সম্বোধন করতেন।

৪। এ হাতে পায়ে দু'রকমেই সম্পন্ন হতে পাবে।

৫। এখানে একজন সরকারী পাহারাওয়ালা আত্মগোপন করে রয়েছে।

৬। এ যখন নড়ে তখনই মানুষের হুঁস হয়।

১০। কুলকুচা বা গ্রাস যা খুশী করতে পার।

১১। যখন রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় তখন এরই প্রাণ যায়।

১২। এরই আধিক্য মানুষের মেজাজ বিগড়ে দেয়।

১৫। একদিন এই ছিল ভারত নারীর গৌরবের শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

১৬। প্রবাহিনী।

১৭। এ শুধু সৈনিকদেরই খাদ্য।

১৮। নিষ্ঠুর স্বামীর হাতে নিত্য নির্যাতিতা পত্নীর এইত একমাত্র গতি।

২০। মন ঠিক করে দেখলে তবেই এর সন্ধান মেলে।

২২। দেড়শ' বছর আগেও বাংলাদেশে এরাই ছিল সর্বেসর্বা।

২৪। এরা অচল তবু নগরের রাজপথে দেখি এদেরই সমাদর বেশী।

২৬। দড়িদড়া।

শ্রাবণের শব্দ-সন্ধানের ফলাফল

ভুলের প্লাবন এসেছে শ্রাবণের শব্দ-সন্ধানে। এবার সবচেয়ে কমভুল যিনি করেছেন তাঁরও ৫টি ভুল। অবশ্য এ ভুলগুলিকে ঠিক ভুল বলা চলে না। প্রতিশব্দ নির্বাচনে 'শ-র'র নির্দিষ্ট সঠিক উত্তরের সঙ্গে গরমিল মাত্র। কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে শব্দ-সন্ধান প্রতিযোগিতায় এই 'গরমিল' গুলিই ভুল বলে গণ্য হয়। পরিবর্তশব্দ (Alternatives) এবার একটু বেশী ব্যবহার করা হয়েছিল ইচ্ছা করেই, কারণ, তা না থাকলে 'শব্দ-সন্ধান' সমাধানের যে প্রধান উদ্দেশ্য শব্দ-শিক্ষা সে দিকটার কোনো সার্থকতা থাকেনা। অতএব, আশাকরি যেসব প্রতিযোগীকে এবার একাধিক 'কূপন' বা সাদা কাগজে ছক এঁকে পাঠাতে হয়েছে তাঁরা 'শ-র'র প্রতি বিরূপ হন নি। কিন্তু, তাঁরা অনেকেই এই সব অতিরিক্ত ছকে তাঁদের নাম ঠিকানাটা লেখবার কষ্টটুকু আর স্বীকার করেন নি। এর ফলে তাদের আঁকা অতিরিক্ত ছকে যদি তাঁদের পাঠানো মুদ্রিত কূপন অপেক্ষা ভুল কমও হয়ে থাকে সে ছকখানি কার—এই পরিচয় না থাকায় তা বাতিল হয়ে যায়। প্রতিযোগিরা হয়ত মনে করেন 'পিন্' দিয়ে যখন এঁটে দিয়েছি বা 'সুতা' দিয়ে যখন গেঁথে দিয়েছি তখন ছাপা কূপনে নাম ঠিকানা থাকলেই যথেষ্ট, হাতে আঁকা ছকে আর দিতে হবে না। কিন্তু এটা তাঁদের ভুল ধারণা। রাশিকৃত কূপন ও হাতে আঁকা ছক পাঠশালা অফিসে এসে জড় হবার পর ১৬ই তারিখে রাত্রে সেগুলি খুলে 'পিন্' ও 'সুতা'র বাঁধন ছিন্ন করে প্রত্যেকটি উত্তর পৃথকভাবে সঠিক উত্তরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয় এবং তাদের ভুলের সংখ্যা নির্ণয় করা হয়। তারপর ভুলের ক্রমিক সংখ্যার অনুপাতে পরের পর সেগুলিকে সাজিয়ে নেওয়া হয়, সুতরাং নাম ঠিকানা যেসকল ছকে থাকে না সে যে কে পাঠিয়েছেন—তার কোনো হদিশ পাওয়া যায় না।

রামপুরহাটের শ্রীমান পার্বতীশঙ্কর জানতে চেয়েছেন আষাঢ়ের উত্তরে ২৮নং পাশাপাশি ঘরে কোন যুক্তিতে তাঁর প্রদত্ত উত্তর 'ডহর' ঠিক না হয়ে 'ডলার' শব্দটি বসেছে? সংকেত সূত্রটি ভাল করে বুঝে দেখবার চেষ্টা করলে তাঁকে এরূপ প্রশ্ন করতে হত না। একমাত্র পার্বতীশঙ্করবাবু ছাড়া আর সকলেই এ ঘরে 'ডলার' শব্দটি লিখতে পেরেছেন। কারণ তাঁরা জানেন আমেরিকা তাদের জিনিসের মূল্য বাবদ 'পাউণ্ড' নিচ্ছে না, 'ডলার' দাবী করছে। এই 'ডলার' যোগাতে না পেরেই আমেরিকার 'ইজারা ও ঋণ' দান ব্যবস্থা ব্রিটেনকে মেনে নিতে হয়েছে। সুতরাং 'ডলারই' আসল ব্যাপার, ডহর তারই অঙ্গ। 'বোর্দোর' আদ্য অক্ষর 'ব' নয় 'বো' বলে পার্বতীবাবু যে আপত্তি করেছেন তার উত্তরে পার্বতীবাবুকে জানাচ্ছি যে বর্ণপরিচয়ে 'বো' বলে কোনো অক্ষর নেই। আর নাম বেশ স্পষ্ট করে না লিখলে 'সেণ্টু'কে 'ঝেণ্টু' পড়া কিছুমাত্র বিস্ময়কর ব্যাপার নয়।

চট্টগ্রামের মনোজবাবু যে 'শ-র'র কৈফিয়ৎ মেনে নিয়ে তাঁকে প্রসন্নমনে ক্ষমা করেছেন এজন্য 'শ-র' তাঁকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাচ্ছে। কিন্তু, এই ব্যাপারের জন্যই

লংগাই চাবাগানের নবনীবাবু লিখেছেন—'শ-ব'ব এটা অমার্জনীয় অপবাধ। পাঠশালায় এবকম অনুপ্রাসেব সাহায্যে স্থূল রসিকতা করা শুধু অশোভন নয়, এতে নাকি 'শ-র'র অমার্জিতরুচি ও রসবোধেব একান্ত অভাবই প্রকাশ পেযেছে। নবনীবাবুব অভিযোগেব উত্তবে 'শ-ব' শুধু বলছেন—তথাস্তু। কলিকাতাব কুমাবী সলীলা মুখার্জি কিন্তু লিখেছেন—দোহাই 'শ-ব' মশাই। আপনি যেন অশ্বিনীবাবু প্রভৃতিব তিবস্কার ও তাড়নায় গম্ভীব হয়ে উঠবেন না, তাহলে আমাদেব একটুও ভাল লাগবে না।

দিল্লীব শ্রীমান সুনীলচন্দ্র ঘোষ 'Varde'ব ভৌগলিক অবস্থান জানতে চেয়েছেন। তাঁব অবগতিব জন্য জানাচ্ছি :—VARDE —a sea port on the west coast of Jutland

সুনীলবাবু আবও জানিয়েছেন যে 'ব্রিটিশ গয়ানা'ব উচ্চাবণ 'গয়ানা' হবে না ওটাব সঠিক উচ্চাবণ নাকি 'গিয়ানা'। সুতবাং I stand corrected। অতএব তাঁব 'ব্রিটজক্রীগ্' শব্দটা ভুল হয়ে যাওয়ায় 'শ-ব' বিশেষ দুঃখিত।

বালিগঞ্জেব কুমাবী পুষ্পঘোষ জানতে চেয়েছেন তাঁব চতুর্থ ভুলটি কি? তিনি যদি উত্তব পাঠাবাব সময় একটা নকল বাখতেন তাহলে 'শ-র'কে আব জ্যৈষ্ঠেব স্তুপাকাব শব্দ-সন্ধান ঘেঁটে দেখবাব কষ্ট পেতে হত না। এ'কমাস আগেব উত্তব ফেলে দেওয়া হয়, বাখা হয় না। সৌভাগ্য-ক্রমে এবাব জ্যৈষ্ঠেব উত্তবগুলি হাতে ছিল। দেখা গেল পাশাপাশি ৬নং ঘবে তিনি কিছুই লেখেন নি। এঘবটি ফাঁকে বেখে দিয়ে 'সুখ' 'দুঃখ' সম্বন্ধে তাঁব নিস্পৃহতা প্রকাশ কবেছেন।

বালিগঞ্জেব শ্রীমান নীহাবকান্তি ঘোষ দস্তিদাবও সম্ভবতঃ তাঁব উত্তবেব নকল বাখেন নি, কাবণ তা যদি তিনি রাখতেন তাহলে দেখতে পেতেন যে পাশাপাশি ৩নং ঘবে 'চাবচিল' লেখার জন্য তাঁব ভুল ধবা হয় নি। তাঁর ভুল ধবা হয়েছে পাশাপাশি ১২নং ঘবে 'ভাদু' লিখেছেন বলে। সুতবাং তিনি একাধিক নজীব দেখিয়ে 'চবৃচিল' লেখা সমর্থন কবতে গিয়ে বৃথা পণ্ডশ্রম কবেছেন।

ক্যাপনেব কাগজের উপর কালি দিয়ে লেখবাব সময় কালি চুপসে যায় বলে ঢুবরাজপুবেব শ্রীমান সনৎকুমাব দাঁ রাগ কবেছেন। বাগ কববারই কথা। কিন্তু তাঁব বোধ হয় মনে নেই 'পাঠশালায়' একবাব বলে দেওয়া হয়েছিল যে কপিং পেন্সিলেও উত্তব দেওয়া চলবে। শ্রীমান নির্মাল্য ঘোষালকে জানাচ্ছি যে 'অনুস্বব' ও 'বিসর্গ' পৃথক উচ্চারণ হয় না বলে ও দুটোকে সংযুক্ত বর্ণ ই ধবা উচিত। খণ্ড'ত' কিন্তু 'ত'য়ে হসন্ত দিয়ে উচ্চারণ কবা যায়, সুতবাং ওটাকে পৃথক ঘবেই বসান উচিত।

উত্তবপাড়াব কুমাবী অনিমাদেবী 'বৈদেশিক ভাষা' সম্বন্ধে 'শ ব'ব নির্দেশ বুঝতে ভুল কবেছেন। 'সহযোগীব' প্রতি শব্দ যখন বাংলায় 'সোসব' রয়েছে তখন বৈদেশিক 'দোসব' শব্দ লেখা উচিত নয় বলা হয়েছিল। আব, যে ক্ষেত্রে শব্দ সন্ধানে বৈদেশিক শব্দ ব্যবহাব কবা হবে—সে ক্ষেত্রে উক্ত শব্দেব বানান ভুল ধরা হবে না জানানো হয়েছিল। সুতবাং 'শান্ত্রী' সান্ত্রি, উল, 'উল' বা 'ক্ষত্রপ' 'সত্রপ' শব্দ ব্যবহাব করে প্রতিযোগিদের প্রতারণা কবা হয়েছে এ অভিযোগ তাঁব ভিত্তিহীন।

নির্দোষ হাস্যপবিহাসেব সঙ্গে 'শ ব'ব সবস উত্তব দেওয়া সম্বন্ধে ঢাকাব কুমাবী বেবা ভদ্র, পাটনাব কুমারী ইন্দ্রাণীবায়, উত্তবপাড়াব কুমাবী অনিমা চ্যাটার্জি, কলিকাতাব নীলিমাদেবী ও স্বয়ং বারুইপুবেব কুমারী সাধনা বসু 'শ-ব'কে সমর্থন কবে পত্র লেখায় 'শ-ব' তাদেব সকলকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাচ্ছেন।

পাচ ভুল

কুমাবী সাধনা বসু, বারুইপুব।

নির্ভুল সমাধান—শ্রাবণ, ১৩৪৮

ছয় ভুল

পার্বতীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, রামপুরহাট। আরতি গুহ ও কল্যাণী অধিকারী, নবগ্রাম। হবিকমল পুরকায়স্থ, শিলং।

সাত ভুল

কল্যাণীদেবী, টালা। আভাসগুপ্ত, বেন্দা।

আট ভুল

বি, এ, ক্লাব, বাণীতলা। পবশুবাম তেওয়ারী ও বিশ্বেশ্বর মিত্র, মিববাজার। সমীরকুমাব সোম, কানপুর। পশুপতিনাথ ঘোষাল, শ্যামবাজাব। অরুণকুমাব মিত্র, মজঃফবপুব। অরুণকুমাব বাগচী, শ্রীবামপুব। গীতাধর, হুগলী।

নয় ভুল

সাবিত্রী গাঙ্গুলী, কানপুর। কল্পনা ঘোষ ও শৈলেশ ঘোষ, সিমারি। বেবাভদ্র, ঢাকা। শোভাবাণী বায়, রাণাঘাট। প্রতিভা মিত্র, আবিয়াদহ। ব্রজকিশোব বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীঘাট। শিশিরকুমাব সেনগুপ্ত, কলিকাতা। শৈলেন্দ্রকুমাব বায়, শ্যামবাজাব। সলীলা মুখার্জি, বেলগাছিয়া। শ্যামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বেগমপুব। পাঁচুগোপাল বসু, বারাসত। গীতাধব, জামালপুব। পুষ্প ঘোষ, বালিগঞ্জ।

দশ ভুল

কৃষ্ণপদ চট্টোপাধ্যায়, আবিয়াদহ সমীব মুখার্জি, উত্তরপাড়া। সুনীলচন্দ্র ঘোষ, নিউ দিল্লী। পঙ্কজমোহন সিদ্ধার্থকুমাব বায়, কোতুলপুব। বাখালদাস চৌধুবী, নবিগঞ্জ। উষাদেবী ও শান্তা দেবী, দুমকা। নিবঞ্জন সান্ন্যাল, শ্যামবাজার। গৌরাঙ্গ রুদ্র, চট্টগ্রাম। নীহাব-কান্তি ঘোষ দস্তিদাব, বালিগঞ্জ। ইন্দ্রাণীবায়, কদমকুঁয়া। ললিতমোহন সামন্ত ও নীবদববণ মহান্তি, দাঁতন। বাবিদ ববণ বায়, নবসিংদী। কুমাবী প্রতিমা চ্যাটার্জি, নেপিয়ার টাউন। রথীন্দ্র, রমা, মীবা, রেবা ও বেখা, নাগাহিলস্। মনোজকুমাব ভট্টাচার্য, বালিগঞ্জ। ভবেন্দ্রনাথ দাস, চন্দননগব। জয়শ্রীদাস, কলিকাতা। অনিমা চট্টোপাধ্যায়, সাউথসিঁথি। কালিদাস সাহা, সাহাজাদপুব। রণেন্দ্রকৃষ্ণ সবকার, ভবানীপুব। অমলকুমাব দত্ত ও নীলিমাদত্ত, কলিকাতা। মণীন্দ্রমোহন মজুমদার, পুরুলিয়া। উমা বাগচী, বায়পুর, সিপি। অসিতকুমাব বায়, আসানসোল। মঞ্জবী সাহা, কালীঘাট। প্রণবকুমার বায় চৌধুবী, কলিকাতা। মহম্মদ মোসলেম আলী, স্বরূপকাঠি। সুলেখা বসু, বালিগঞ্জ। বিজলীপ্রভা দেবী, জয়নগর, মজিলপুর।

এগার ভুল

নীতীশরঞ্জন দে, কাহেৎটুলী। বতনসিংহ, গৌরীবেড়। অণিমা চ্যাটার্জি, উত্তরপাড়া। প্রণবকুমাব মুখার্জি, সৈয়দপুর। কুমারবঞ্জন রায়, কলিকাতা। সত্যেশ্বব ঘোড়ই, ইজমালিচক। মুক্তেশ্বর প্রসাদ সিংহ, সদরঘাট। প্রীতিভূষণ চৌধুরী, নবিগঞ্জ। হেনা রাহা, বরকান্তা। অনিলকুমার মুখোপাধ্যায়, গোন্দলপাড়া। বাজকুমারী শর্মা, তালচের। সুমিত্রা মজুমদার, বমনা। কামদাবঞ্জন ভট্টাচার্য, নবপুব। সেখ সিরাজউদ্দিন, খাগড়া। ধীরেন্দ্র নাথ মহান্তি, কৃষ্ণমাইতিবাড়। আইভিলতা ঘোষ, জামশেদপুর। দেবপ্রসাদ বায় ও সতীদেবী, কালীঘাট। মীবাদাস, সীলেট। কণিকা মুখোপাধ্যায়, মিয়াবাজার। দিলীপকুমার সেন, ভবানীপুব। সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, কলিকাতা। পার্থসাবথি বসু, কলিকাতা। মনজু, সনজু ও মায়া, কালীঘাট। পঙ্কজ গাঙ্গুলী, কণেশ্বর। ভূপেন কানুনগো, ঢাকা। সিদ্ধেশ্বর মিত্র, বালিগঞ্জ। অনিল কুমার দে, চাংড়িপোতা। নীহাব ব্যানার্জি, গোলবাজাব। বীবেন্দ্রনাবায়ণ সবকাব, ফবিদপুর।

বার ভুল

সবোজবিহাবী ভাদুড়ী, কলিকাতা। সনৎকুমাব দাঁ, দুবরাজপুব। শোভনলাল মুখোপাধ্যায়, টালিগঞ্জ। উমা পাল চৌধুবী, রাণাঘাট। সতী নিয়োগী, পাটগ্রাম। উমারাণী ঘোষ, কদমতলা। বাহুল ও জয়ন্তী সেন, মেদিনীপুব। কল্যাণী বায়, তালন্দ। সবিতাকুমারী দেবী, প্রণবকুমার ও আশুতোষ ভট্টাচার্য, টাটানগব। নির্ম্মলেন্দু গুহ, পাহাড়তলি। বাসন্তী সিংহ, কলিকাতা। নাবায়ণদাস মিত্র, হবিণাভি। হাওডা সঙ্ঘ পাঠাগার, ছাত্র বিভাগ, হাওড়া। কুমাবী রমলা ও শ্রীবণজিৎচন্দ্র মিত্র, কলিকাতা। বিশ্বনাথ ও বৈদ্যনাথ সিংহ, বেলফুলিয়া। হবিসভা, পঞ্চসাব। অণিমা চৌধুবী, কুন্তোব কলিযাবী। প্রভাবতী সেন ও লীলাসেন, পশ্চিম কাউলিয়া। অরুণ ও তরুণ চট্টোপাধ্যায়, ধানবাদ। সত্যেন্দ্রকুমাব চৌধুবী, শিলং। মহামায়া সাহিত্য মন্দির, সেওডাফুলি।

তের ভুল

রেণুকা চ্যাটার্জি, ইটালী। সাধনা, তরু ও জয়া, শালিখা। উমাবাণী মুখার্জি, বালিগঞ্জ। পরমানন্দ বায় চৌধুবী ও শান্তিবঞ্জন ভট্টাচার্য, ভদ্রকালী। সৌবীন্দ্র মোহন তালুকদার, মালদহ। সবসীবালা দেবী, নাকোদর। কণু ঘটক, মালদহ। সুনীল, ভাস্কর, গুলু, রামপুরহাট। নির্মাল্য ঘোষাল, ভবানীপুব। "নির্ভুলে প্রথম মনোজদত্ত" ধলঘাট। বাদল ও গীতা পালিত, আসানসোল। রবীন্দ্র-নাথ ভটাচার্য, আরিয়াদহ। মঞ্জু ও কল্যাণকুমাব দত্ত গুপ্ত, মজঃফরপুব। অজিতকুমার দত্ত, মেদিনীপুর। অনিলবরণ ঘোষ, দাবড়া। অশ্বিনীকুমাব ও প্রভাতকিরণ, আহমদপুব। অমিয়কুমার ঘোষাল, আরিয়াদহ।

তের ভুলের উপরে যারা উঠেছেন তাদের নাম গোপন রাখাই উচিত। তিনভুলের বেশি হলে 'শব্দ-সন্ধানে' কোনো পুরস্কার দেওয়ার নিয়ম না থাকায় 'শ-ব' এবার কাউকে পুরস্কার দিতে পারলেন না বলে দুঃখিত।

ধাঁধা

ভাদ্র—১৩৪৮

১। এমন একটি সহজ ইংরাজী শব্দ খুঁজে বার করো যার মধ্যে পাঁচবার ইংরাজি 'S' অক্ষরটি ব্যবহার হয়েছে।

শ্রীপ্রভাতকিরণ দে, আহমদপুর।

২। এমন একটি সহজ ইংরাজি শব্দ খুঁজে বার করো যার মধ্যে ছয়বার ইংরাজি 'I' অক্ষরটি ব্যবহার হয়েছে।

শ্রীদেবব্রত সিংহ, কলিকাতা।

শ্রাবণের ধাঁধাঁর উত্তর

অত্যন্ত কঠিন ও সাধারণত অপ্রচলিত শব্দ যাঁরা পাঠিয়েছেন তাঁদের উত্তরগুলি বাদ দেওয়া হল।

Monotonous,
Foot stool
Communicate
Octophoto
Corroboration
Locomotion
Goodlooking
Pooh-pooh
Non-co-operation
Education
Equation
Numeration
Favourite
Automobile
Tenacious
Behaviour
Authorities
Precaution
Popularise
Discourage
Simultaneous
Miscellaneous
Reputation
Revolutionary
Remuneration
Revaluation
Dishonourable
Regulation
Subordinate
Equivocal
Equation

কুমারী গায়ত্রী বসু, লিলুয়া। মায়া সেন গুপ্ত, কলিকাতা। আরতি গুহ ও অমিতা গুহ, নবগ্রাম। মীরাদাস, সীলেট। কুমারবঞ্জন রায়, গ্রাঃ নং ২৩২২। অরুণ বাগচী, শ্রীরামপুর। গীতাধর, হুগলী। সতী নিয়োগী, পাটগ্রাম। বি, এ, ক্লাব, বানীতলা। বিষ্ণুপদ স্মৃতিপাঠাগার, শালিখা। পান্নালাল ও কেশবলাল আটা, শালিখা। পঙ্কজমোহন ও সিদ্ধার্থকুমার রায়, কোতুলপুর। ফণীভূষণ সিংহ, মালদহ। সুলেখা বসু, বালিগঞ্জ। পাঁচুগোপাল বসু, বারাসত। মীরাসেন ও বেবাসেন, বরিশাল। সুনীল কুমার ব্যানার্জি, বীরভূম। পশুপতি নাথ ঘোষাল, কলিকাতা। উদয়ভানু সিংহ, কলিকাতা। তারাপদ চক্রবর্তী, ফেণী। শঙ্করনাথ ভট্টাচার্য, মথুরা। শশী ভট্টাচার্য, মৈমনসিংহ। মণীন্দ্রমোহন মজুমদার, পুরুলিয়া। কল্পনা ঘোষ, মেমারি। হরিসভা, পঙ্কসার। মঞ্জীরা সাহা, কালীঘাট। অসিতকুমার রায়, আসানসোল। "ললিত", বালিগঞ্জ। সরসীবালা দেবী, নাকোদর। জয়ন্তী ও রাহুল সেন, মেদিনীপুর। ইলা সেন ও সবিতা সেন, বরিশাল। মনোজদত্ত, চট্টগ্রাম। অজিতকুমার দত্ত, মেদিনীপুর। নীহারকান্তি ঘোষদস্তিদার, বালিগঞ্জ। গৌরাঙ্গ রুদ্র, চট্টগ্রাম। সেখ সিরাজুদ্দিন, মুর্শিদাবাদ। অশ্বিনীকুমার মণ্ডল, আমদপুর। নীতীশরঞ্জন দে ও নিখিলরঞ্জন দে, ঢাকা। কণু ঘটক, মালদহ। হেনারাণী, বরকান্তা। রাখালদাস চৌধুরী, নবিগঞ্জ। মুক্তেশ্বরপ্রসাদ সিংহ, মৈমনসিংহ। বেবাভদ্র, ঢাকা। দেবব্রত সিংহ, কলিকাতা। অশোককুমার ঘোষ, দিল্লী। হেরম্বকুমার মুখোপাধ্যায়, দিল্লী। সরোজবিহারী ভাদুড়ী, কলিকাতা। দীলিপকুমার সেন, গ্রাঃ নং ১১৪০। সমরেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বহরমপুর। সমীরকুমার সোম, ৩৪৮৭। কামদারঞ্জন ভট্টাচার্য, ত্রিপুরা। প্রণবকুমার মুখার্জি, সৈয়দপুর। ধীরেন্দ্রনাথ মহান্তী, দাঁতন। বজকুমারী শর্মা, তালচের। নীহার ব্যানার্জী, জব্বলপুর। শৈলেন্দ্রকুমার রায়, কলিকাতা। উমা পালচৌধুরী, রাণাঘাট। অবনীভূষণ বেরা, ঘোলদিগরুই। জয়শ্রী দাস, কলিকাতা। ইন্দু বসু, শিশুভারতী। পঙ্কজ গাঙ্গুলী, শিশুভারতী। কল্যাণী রায়, তালন্দা। ধ্রুবরঞ্জন সরকার, হাওড়া। 'মাষ্টার সেন্টু' রামপুরহাট। বিশ্বনাথ ও বৈদ্যনাথ সিংহ, বেলফুলিয়া। নীলিমা দত্ত, কলিকাতা। অনিলবরণ ঘোষ, দারড়া। অশোককুমার নন্দী, কলিকাতা। দীপালি সরকার, টালিগঞ্জ। মীরাদেব, কোহিমা। অনিলবরণ মহান্তি, যাদবপুর। প্রতিমা চ্যাটার্জী, জব্বলপুর। অরুণকুমার মিত্র, মজঃফরপুর। মঞ্জু দত্তগুপ্ত ও কল্যাণকুমার দত্তগুপ্ত, মজঃফরপুর। মনোজকুমার ভট্টাচার্য, বালিগঞ্জ। রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। প্রতিভামিত্র, আরিয়াদহ। কালিদাস সাহা, সাহাজাদপুর। হেরম্ব মুখোপাধ্যায় ও সিটি ক্লাবের সভ্যবৃন্দ, দিল্লী।

প্রতিবাদ

গীতায় অহিংসনীতি

শ্রীকৃষ্ণবিহারী বসু

ভারতবর্ষকে যদি মনে রাখিতে হয় যে তাহার আদর্শ শ্রীকৃষ্ণ ও তাহার আদর্শ গীতা তাহা হইলে এ কথাও মানিতে হয় যে সে হিংসার উপাসক নহে।

গীতায় অর্জুনকে তিনি যুদ্ধে নিয়োগ করিয়াছেন বটে কিন্তু তাহা কেবল স্বধর্মোচিত কর্মানুযায়ী যুদ্ধ করিবার জন্যই (গীতা ২।৩৮) হিংসা প্রণোদিত হইয়া নহে।

অহিংসা জীবের স্বভাবিক ধর্ম নহে—হিংসার উপর ভিত্তি করিয়াই মানব তথা জীব-জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে—এই তর্ক মানিয়া লইলেও অহিংসা জীবের লক্ষ্য বস্তু নহে এরূপ সিদ্ধান্ত করা গীতা অনুমোদন করেন না। গীতায় আছে ত্রিভুবনে এমন কোনও জীব নাই যাহা ত্রিগুণের প্রভাব হইতে মুক্ত (গীতা ১৮।৪০) অথচ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিস্ত্রৈগুণ্য হইতেই উপদেশ দিয়াছেন (গীতা ২।৪৫)।

বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীরা আজ পরস্পর পরস্পরকে নৃশংসভাবে হত্যা করিতেছেন সত্য, কিন্তু, তথাপি এই সকল অহিংসধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষদের ধর্মের অনুশাসন আজিও একেবারে বিফল হইয়া যায় নাই। এখনও যুদ্ধে আহতদের সেবাশুশ্রূষার বিরাট আয়োজন করা যুদ্ধের এক বিশিষ্ট অঙ্গ এবং এই সেবা শত্রুপক্ষ মিত্রপক্ষ নির্বিশেষে করা হয়। এখনও যুদ্ধ নিন্দনীয় এবং এখনও যুযুধানে বলিতেছেন যে পৃথিবী হইতে যুদ্ধ একেবারে লোপ করিব জন্যই তাঁহারা যুদ্ধ করিতেছেন। সুতরাং এখনও অহিং ধর্ম পৃথিবী হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই।

হিংসাকে তাড়াইতে চাহিলেও তাহা সহজে যায় ইহা খুব ঠিক। কিন্তু গীতা উপদেশ দিয়াছেন এসব ক্ষে অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা শুদ্ধ হওয়া যায় (গীতা ৬।৩৫)

আসক্তি হইতে কি করিয়া ক্রমপর্য্যায়ে হিংসার উৎপ হয় এবং শেষে ধ্বংস আসে গীতার ২য় অধ্যায়ে ৬২। শ্লোকে তাহা বর্ণনা করা হইয়াছে। এই আসক্তি ত্যাগ করিতে হইবে ইহাই গীতা বলিয়াছেন।

গীতার প্রধান শিক্ষা শ্রীভগবানের উপর চূড়ান্ত বি রাখা, 'মামেকং শরণংব্রজ' (১৮।৬৬)। এই বিশ্ব হিংসার কোনও স্থান নাই। অহিংসা দৈবীসম্পদ ম গণ্য করা হইয়াছে (গীতা ১৬।২) অহিংসাকে জ্ঞান হিংসাকে অজ্ঞান ধরা হইয়াছে (১৩।৭ ও ১৩।১১) শ্রীভগবানের প্রিয় হইতে হইলে হিংসা পরিত্যাগ কবি হইবে ইহা একাধিকবার বলা হইয়াছে (গীতা ১২।১ ১২।১৭)।

নিবেদন

এই সংখ্যায় 'পাঠশালা'র চতুর্থ বর্ষ শেষ হ'ল। আগামী আশ্বিনে "পাঠশালা" পঞ্চ বর্ষে পদার্পণ করবে। 'পাঠশালা'র গ্রাহক গ্রাহিকা যাঁরা পঞ্চম বর্ষেও পাঠশালা রাখতে ইচ্ছ করেন তাঁরা আগামী ১০ই ভাদ্রের মধ্যে তাঁদের এক বৎসরের চাঁদা ৩৲ তিন টাকা 'মণি অর্ডার' করে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাবেন।

যাঁরা "পাঠশালা" পঞ্চম বৎসরে রাখতে ইচ্ছা করেন না তাঁরা ১০ই ভাদ্রের মধ্যে আমাদের অনুগ্রহ করে সে কথা জানাবেন, নইলে আশ্বিনের পাঠশালা তাঁদের নামে ভিঃ পিঃ করে পাঠানো হবে। ফেরত এলে আমাদের অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে হয়। ভিঃ পি ডাকে 'পাঠশালা' নেওয়ার চেয়ে মণি-অর্ডারে আগামী তিন টাকা পাঠানোই সুবিধাজনক কারণ, ভিঃ পিঃতে নিলে ৩।৵০ খরচ পড়বে এবং টাকা না পাওয়া পর্যন্ত পরের সংখ পাঠশালা অর্থাৎ "রবীন্দ্র সংখ্যা" পাঠানো সম্ভব নয়।

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য—কার্যাধ্যক্ষ, পাঠশালা কার্যালয়, ৩০, কর্নওআলিশ স্ট্রীট, কলিকাতা

Printer and publisher R Bhattacharya, Prabhu Press, 30, Cornwallis Street, Calcutta